

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য

ইংরেজ প্রভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত

"নানান্ দেশের নানান্ ভাষা।
বিনে স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা॥"

—নিধুবাবু

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন



গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ছয় টাকা

ষষ্ঠ সংস্করণ

পরিশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে
শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।



শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

উৎসর্গপত্র

অশেষ-গুণ-সম্পন্ন চন্দ্রবংশাবতংস প্রজারঞ্জক

স্বাধীন-ত্রিপুরার শ্রী শ্রীমন্মহারাজ

বীরচন্দ্রমাণিক্য দেব-বর্ম্মণ বাহাদুরের

কর-কমলে—

ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার চিহ্ন-স্বরূপ

এই সামান্য পুস্তক

উৎসর্গ

করিলাম

গ্রন্থকার

উপহার—

শ্রীশচীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য
৩য় বার্ষিক বিঃ শ্রেণী—
চট্টগ্রাম, কলেজ।

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

অদ্য ছয় বৎসর হইল, একদিন আমার পুস্তকাধারস্থিত অতি জীর্ণ, গলিত-পত্র, প্রেমাশ্রুর নীরব নিকেতন চণ্ডীদাসের গীতিকবিতাগুলি পড়িতে পড়িতে প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের একখানি ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিতে ইচ্ছা জন্মে; ভিক্টোরিয়া স্কুলের সেই সময়ের অধ্যাপক পণ্ডিত ৺চন্দ্রকুমার কাব্যতীর্থের সাগ্রহ প্রবর্ত্তনায় এই ইচ্ছা সুদৃঢ় হয়। বৈষ্ণবকবিগণের গীতি, কবিকঙ্কণের চণ্ডীকাব্য, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, কেতকাদাস ও ক্ষেমানন্দের মনসা-মঙ্গল ও অপর কয়েকখানি বটতলার ছাপা পুঁথিমাত্র আমার সম্বল ছিল, আমি তাহা পড়িতাম ও কিছু কিছু নোট সংগ্রহ করিয়া রাখিতাম। ১৮৯২ খৃঃ অব্দের ফ্রেব্রুয়ারী মাসে কলিকাতার পিস্ এসোসিয়েসন হইতে বঙ্গভাষার উৎপত্তি ও পরিপুষ্টি সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লেখককে "বিদ্যাসাগর-পদক" অঙ্গীকার করিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, এই সুযোগ পাইয়া তিন মাস কাল মধ্যে আমি সংক্ষেপে বঙ্গভাষা বিষয়ক একটি প্রবন্ধ লিখি, উক্ত সমিতি আমার প্রবন্ধটি মনোনীত করিয়া "বিদ্যাসাগর পদক" আমাকে প্রদান করেন।

এই প্রবন্ধ রচনার সময় রতিদেব-কৃত 'মৃগলুব্ধের' একখানি প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি দৈবক্রমে আমার হস্তগত হয়, এবং বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হই যে, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের পল্লীতে পল্লীতে অনেক অপ্রকাশিত প্রাচীন পুঁথি আছে; এই সংবাদ পাইয়া নিজে নানা স্থানে পর্য্যটন করিয়া সঞ্জয়কৃত মহাভারত, গোপীনাথ দত্তের দ্রোণপর্ব্ব, [illegible]চন্দ্রদাসের শকুন্তলা, দ্বিজ কংসারির প্রহ্লাদচরিত্র, রাজারাম দত্তের দণ্ডীপর্ব্ব, ষষ্ঠীবর ও গঙ্গাদা[illegible] মহাভারতোক্ত উপাখ্যান প্রভৃতি বিবিধ হস্তলিখিত প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ করি। তখন বঙ্গভাষার একখানি বিস্তৃত ইতিহাস লিখিবার সঙ্কল্প মনে স্থির হয়। কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রের আশ্রয় হইতে সুদূরে দরিদ্রের পর্ণকুটীরে যে সব প্রাচীন পুঁথি কীটগণের করাল দংষ্ট্রাবিদ্ধ হইয়া কোনরূপে প্রাণরক্ষা করিতেছে, সেগুলিকে রক্ষা করিবার উপায় কি? প্রত্যেক বৎসর কীট, অগ্নি ও শিশুগণ কর্ত্তৃক উহারা নষ্ট হইতেছে। যাহা এখনও আছে, তাহা কিরূপে রক্ষা হয়? আমি এই বিষয় চিন্তা করিয়া এসিয়াটিক সোসাইটির খ্যাতনামা মেম্বর ডাক্তার হোরন্লি সাহেবের নিকট সমস্ত অবস্থা জানাইয়া এক পত্র লিখি। তিনি প্রত্যুত্তরে আমাকে বিশেষ

ধন্যবাদ ও উৎসাহ দিয়া সাহায্য অঙ্গীকার করেন ; এই সূত্রে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে আমার পত্রদ্বারা পরিচয় হয় ; তিনি প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য উদ্ধার করিতে ইতিপূর্ব্বেই উদ্যোগী ছিলেন,—আমার প্রতি তিনি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। তাঁহার উপদেশানুসারে এসিয়াটিক সোসাইটির পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ আমার সহায়তার জন্য কুমিল্লায় আগমন করেন। আমরা উভয়ে মিলিয়া পরাগলী (কবীন্দ্র পরমেশ্বর রচিত) মহাভারত, ছুটিখাঁর (শ্রীকরণ নন্দীর রচিত) অশ্বমেধপর্ব্ব প্রভৃতি আরও অনেক পুঁথি সংগ্রহ করি। বিনোদবাবু মধ্যে মধ্যে আসিয়া কতকদিন কাজ করিয়া চলিয়া যাইতেন; কিন্তু আমি বৎসর ভরিয়া ত্রিপুরা,নোয়াখালী, শ্রীহট্ট ঢাকা প্রভৃতি পূর্ব্ববঙ্গের নানা জেলা হইতে পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছি। মধ্যে মধ্যে আমার খুল্লতাত শ্রীযুক্ত কালীকিঙ্কর সেন, ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয়ের সঙ্গে মফঃস্বলে ক্যাম্পে বাস করিয়া ক্রমাগত পর্য্যটন করিয়াছি। এই সময় কবি আলওয়াল কৃত পদ্মাবতী, রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল কৃত কাশীখণ্ড, রামেশ্বর নন্দীব মহাভারত, মধুসূদন নাপিত প্রণীত নলদময়ন্তী, প্রভৃতি গ্রন্থ মৎকর্ত্তৃক সংগৃহীত হয়। সংগৃহীত পুস্তকের কয়েকখানি ও প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের অপরাপর কোন কোন গ্রন্থ সম্বন্ধে মধ্যে মধ্যে 'সাহিত্য' পত্রিকায় মল্লিখিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। * পল্লীগ্রামের হস্তলিখিত পুঁথি খোঁজ করা অতি দুরূহ ব্যাপার—বিশেষতঃ প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁথির অধিকাংশই নিম্নশ্রেণীস্থ লোকের ঘরে রক্ষিত ; আমাদের সাগ্রহ যুক্তি তর্ক ও বুদ্ধির কৌশল অনেক সময়েই তাহাদের কুসংস্কারের দৃঢ়ভিত্তি বিচলিত করিতে পারে নাই, তাহারা কোন ক্রমেই পুস্তক দেখাইতে সম্মত হয় নাই ; দৈবাৎ পুস্তক ধরা পড়িলে কেহ কেহ ট্যাক্সের ভয়ে নিতান্ত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে। কোন কোন দিন ১০ মাইল পদব্রজে গমন ও সেই ১০ মাইল পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন কেবল গমনাগমন সার হইয়াছে। কিন্তু ইহা ছাড়াও কোন কোন সময় নানারূপ বিপদে পতিত হইয়াছি, একদিন রাত্রি ১০টার সময় ত্রিপুরা জেলার গৈলারা গ্রাম হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে পথ হারাইয়া ফেলি ; ভয়ানক বৃষ্টি, ঝড় ও অন্ধকারে বিরলবসতি জঙ্গলের পথে প্রায় তিন ঘণ্টাকাল যে ভাবে হাঁটিয়াছিলাম, তাহা সেই দিনের সঙ্গী শ্রীযুক্ত ক[illegible]ণ্ড বর্ম্মণ আমার মনে চিরদিন মুদ্রিত থাকিবে। কিন্তু এই সব বহুদর্শিতার মধ্যে মধ্যে সুখের কথা না আছে, এমন নয় ; পাহাড়-বেষ্টিত

---

* ১৩০১ সনের শ্রাবণে "পরাগলী মহাভারত" ভাদ্রে "প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য ও ঘনরাম" আশ্বিনে "মাধবাচার্য্য ও মুকুন্দরাম", অগ্রহায়ণে "ছুটিখাঁর মহাভারত", পৌষে "৺কৃষ্ণকমল গোস্বামী", মাঘে "মুসলমান কবির বাঙ্গালা কাব্য" এবং ১৩০৩ সনের জ্যৈষ্ঠে "দুইজন প্রাচীন কবি", ভাদ্র ও আশ্বিনে "ভুকৈলাসের রাজকবি" ও চৈত্রে "পরাগলী মহাভারত সম্বন্ধীয়" প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

দেশের পল্লীতে পল্লীতে ভ্রমণ মধ্যে মধ্যে বড় প্রীতিকর হইয়াছে। ঘন শ্যাম পত্রাচ্ছাদিত চিত্রপটের ন্যায় সারি সারি তরুশ্রেণী, মধ্যে মধ্যে নির্ম্মল পুকুরের জলে ঝাপ্টা-বাতাসে নির্ম্মল ঢেউ উঠিতেছে, তাহাতে সপত্র পদ্মফুলগুলি এক একবার ডুবিয়া যাইতেছে ও কিঞ্চিৎ পরে সুন্দরীগণের ন্যায় মুখ দেখাইতেছে। দূর নীল গগনের সঙ্গে মিশিয়া ভূসংলগ্ন মেঘপংক্তির ন্যায় পাহাড়রাজি বিরাজিত; পল্লীললনাগণের সরল অনাড়ম্বর সৌন্দর্য্য, পল্লী-কৃষকগণের সরল কৌতূহলাক্রান্ত দৃষ্টি, এই সব এখনও কোন অভিনয়ের দৃশ্যপটে অঙ্কিত চিত্রের ন্যায় স্মৃতিতে জাগরূক রহিয়াছে।

এই ছয় বৎসরের চেষ্টায় বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের প্রথমভাগ অদ্য পাঠকগণের নিকট উপস্থিত করিতেছি। এই পুস্তকে ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়া, সাময়িক আচার ব্যবহার, দেশের ইতিহাস ইত্যাদি নানারূপ প্রসঙ্গ সম্বন্ধে আলোচ্য গ্রন্থগুলিতে যাহা কিছু পাওয়া গিয়াছে, তাহা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। প্রথম তিন অধ্যায়ে ভাষার উৎপত্তি, বিভক্তি চিহ্ন প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করিয়াছি। পরবর্ত্তী অধ্যায়গুলিতে সাহিত্যের আলোচনা করিয়া অধ্যায়ের পরিশিষ্ট ভাষা, সামাজিক আচার, ঐতিহাসিক বিবরণগুলি ও অপ্রচলিত শব্দার্থের তালিকা প্রদান করিয়াছি। যে সব শব্দ ভিন্নার্থ পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহাও সেই সঙ্গে উল্লেখ করিয়াছি। এই কার্য্যের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইয়াছে; ছাপা পুস্তক হইতে হস্তলিখিত পুস্তকেরই অধিক আলোচনার প্রয়োজন হইয়াছে। ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস দ্বারা দুই তিন শত বৎসরের প্রাচীন হস্তলিখিত তাম্রকূটপত্রসমষ্টির ন্যায় পুঁথির পাঠোদ্ধার করা সুকঠিন ব্যাপার, রোগীর দেহে হস্তক্ষেপ করার ন্যায় অতি সাবধানে পত্রগুলি উল্টাইয়া অগ্রসর হইয়াছি। এই ছয় বৎসর নানারূপ পারিবারিক অশান্তিতে মন উদ্বিগ্ন থাকা সত্ত্বেও বিষয়কর্ম্ম করিয়া প্রতিদিন ধৈর্য্য সহকারে নিয়মিত পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। এই পুস্তক লিখিতে যত্নের ত্রুটি হয় নাই, আমার অনুপযুক্ততা-হেতু যে সমস্ত দোষ রহিয়া গিয়াছে, আশা করি পাঠকগণ তাহা মার্জ্জনা করিবেন।

পুস্তক রচনার সময় আমি অনেক সুহৃদয় ব্যক্তির সাহায্য ও উৎসাহ পাইয়াছি, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের কথা [illegible] উল্লেখ করিয়াছি; আমি বঙ্গভাষার ইতিহাস লিখিব শুনিয়া তিনি আমাকে সর্ব্বদা উৎসাহ দিয়া পত্র লিখিয়াছেন, এতদ্ব্যতীত তিনি ১৩০০ সালের জ্যৈষ্ঠ-মাসে সাহিত্যে 'কবিকঙ্করাম' শীর্ষক প্রবন্ধে আমার পুস্তক সম্বন্ধে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। এই ত্রিপুরায় বসিয়া শ্রীরাধাগোবিন্দ স্মরণ ভিন্ন বৈষ্ণবসাহিত্যের আর কোনরূপ চর্চ্চা করা আমার পক্ষে সুবিধাজনক হইত কি না সন্দেহ; কিন্তু হুগলী বদনগঞ্জ-নিবাসী পণ্ডিত হারাধন [illegible]ভক্তিনিধি মহাশয়কে বৈষ্ণব সাহিত্য সম্বন্ধে আমি যখন যে প্রশ্ন

করিয়াছি, অগৌণে তাহার উত্তর দিয়া আমাকে উপকৃত করিয়াছেন; তাঁহার বয়স এখন ৬৫ বৎসর, কিন্তু আমার জন্য তিনি যুবকের ন্যায় শ্রম স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীহট্ট, মৈনানিবাসী গৌরভূষণ শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী মহাশয় অযাচিত ভাবে আমার নিকট পত্র লিখিয়া পরিচয় স্থাপন করিয়াছেন; তিনি বৈষ্ণব কবিগণের জীবনী সম্বন্ধে নানা বিষয় জানাইয়া আমাকে উপকৃত করিয়াছেন; তাঁহাকে আমি দেখি নাই, কিন্তু তাঁহার মূর্ত্তি আমার কল্পনায় দেবমূর্ত্তির ন্যায় নির্ম্মল—পর-উপকার-ব্রতের সুধা তাহা হইতে ক্ষরিত হইতেছে। আমার পরম শ্রদ্ধেয় আত্মীয় অক্রূরচন্দ্র সেন মহাশয় আমার জন্য নানা কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, তিনি সাহিত্য সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন—রামগতি সেন, জয়নারায়ণ সেন ও আনন্দময়ী দেবী এই তিন কবির পুঁথি আমি তাঁহারই অনুগ্রহে পাইয়াছিলাম, তাঁহার কৃতজ্ঞতা-ঋণ আজীবন বহন করিব। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় আমাকে নানারূপ পুস্তকাদি ও উপদেশ দ্বারা উপকৃত করিয়াছেন। তিনি ১৩০১ সালের চৈত্র মাসের সাহিত্যে আমার এই পুস্তক-রচনার উদ্যমের বিশেষরূপ প্রশংসা করিয়া আমার অকিঞ্চিৎকর গুণাপেক্ষা স্বীয় স্নেহেরই বেশী পরিচয় দিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত ১৮৯৩ খৃঃ অব্দের ১২ মার্চ্চ তারিখের হোপ পত্রিকার সম্পাদক আমার সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া আমাকে যথেষ্ট উৎসাহিত করেন। ঐ সনের ১৭ই আগষ্টের হিতবাদীতে, ১৩০০ সালের ৩২শে আষাঢ়ের অনুসন্ধানে, এবং সেই সালের ২০শে বৈশাখের দৈনিক ও সমাচারচন্দ্রিকায় আমার উদ্যমের উৎসাহবর্দ্ধক কথা প্রকাশিত হয়। ১৩০১ সালের শ্রাবণের পরিষদ পত্রিকায় শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় আমার পুস্তক সংগ্রহের বিষয় উল্লেখ করেন। ১৩০১ সনের মাঘ মাসের ও ১৩০২ সনের কার্ত্তিক মাসের পরিষদ পত্রিকায় সাময়িক প্রসঙ্গে এবং ১৮৯৫ খৃঃ অব্দের ৬ই মার্চ্চের ইণ্ডিয়ান মিরার পত্রিকায় আমার পুস্তক সংগ্রহ সম্বন্ধে নানারূপ উৎসাহসূচক সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হয়। ইহা ছাড়া পরম শ্রদ্ধেয় সুকবি বরদাচরণ মিত্র, সি, এস, মহোদয়, প্রিয় সুহৃদ সাহিত্যসম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, দাসীসম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, মাইকেলের জীবনচরিতপ্রণেতা যোগীন্দ্রনাথ বসু এবং কলিকাতা [illegible]সোসিয়েসনের সেক্রেটারী প্রবোধপ্রকাশ সেন গুপ্ত প্রভৃতি মহাশয়গণ আমাকে মধ্যে মধ্যে পত্র লিখিয়া উৎসাহিত করিয়াছেন, আমি ইহাঁদের নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম।

পূর্ব্ববঙ্গের সাহিত্য-গৌরব কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় এই পুস্তক রচনাকালে আমাকে যে অনুগ্রহ ও স্নেহ দেখাইয়াছেন, তাহা এ জীবনে ভুলিতে পারিব না। বঙ্গসাহিত্যের জন্য এখনও তাঁহার পূর্ণ উদ্যম, আমার সংগৃহীত সকলগুলি পুঁথিই তিনি সাহিত্যসমালোচনী-সভা হইতে মুদ্রিত

করিবেন, ইহা তাঁহার সঙ্কল্প ; এই জন্য তিনি আমাকে ঢাকায় আহ্বান করিয়া সাক্ষাতে নানারূপ উৎসাহিত করিয়াছেন ও পুস্তক রচনা সময়ে প্রতি সপ্তাহে পত্র লিখিয়া নানারূপ উপদেশ দিয়াছেন ; বলিতে কি, তাঁহার অবিরত উৎসাহ না পাইলে আমার উদ্যম শিথিল হইয়া পড়িবার আশঙ্কা ছিল। কলেজে অধ্যয়নকালে যখন সভামণ্ডপে তাঁহার বক্তৃতা শুনিতাম, তখন তাঁহার প্রতিভাপূর্ণ মূর্ত্তি র‍্যাফেল অঙ্কিত একখানা গ্রীক দেবতার ছবির ন্যায় বোধ হইত, আমার চক্ষে এখন তাহা আরও উজ্জ্বল হইয়াছে।

বস্তুতঃ এই গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া আমার এই এক বিশ্বাস দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছে যে, বঙ্গদেশে সহৃদয়তার অভাব নাই। আমার উপযুক্ততার এখন পর্য্যন্ত কোন প্রমাণ প্রদর্শিত হয় নাই, তথাপি সৎকর্ম্মের রবে মাত্র আহূত হইয়া সদাশয় ব্যক্তিগণ আমাকে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। পুস্তকের মুদ্রাঙ্কন ব্যয় সম্বন্ধে আমি প্রথমতঃ শ্রীশ্রীযুক্ত ত্রিপুরার মহারাজ বাহাদুরের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। ত্রিপুরার তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট ও ত্রিপুরা রাজ্যের পোলিটিকেল এজেণ্ট শ্রীযুক্ত আর. টি, গ্রীযাব সাহেব আমার আবেদন সমর্থন করিয়া পত্র লিখেন। কিন্তু সেই আবেদন পত্রের উপর হুকুম হইতে একটু গৌণ হওয়াতে আমি কলিকাতা শোভাবাজারের রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের নিকট আর একখানি আবেদন পত্র পাঠাই। তিনি আমার পুস্তকের সমস্ত ব্যয় বহন করিতে স্বীকৃত হইয়া পুস্তকের প্রুফ দেখার ভার পর্য্যন্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এই সময় ত্রিপুরেশ্বরের সাহায্য হস্তগত হওয়াতে শোভাবাজারের রাজাবাহাদুরের সাহায্য গ্রহণ করার আবশ্যকতা হয় নাই। কিন্তু তাঁহার স্নিগ্ধ অমায়িক ব্যবহার, বঙ্গসাহিত্যের প্রতি অনুরাগ ও তৎসম্বন্ধীয় প্রত্যেক শুভানুষ্ঠানে আন্তরিক সহানুভূতি গুণে তিনি বঙ্গীয় নূতন লেখক সম্প্রদায়ের অবলম্বন স্বরূপ হইয়াছেন। কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি, তিনি এই পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগের সমস্ত ব্যয় বহন করিতে স্বীকার করিয়াছেন। রাজাবাহাদুরের ভাগিনেয় আমার পরম শ্রদ্ধেয় বন্ধু কুঞ্জবিহারী বসু মহাশয় আমাকে সর্ব্বদা উৎসাহ দিয়া পত্র লিখিয়াছেন, তিনি আমার আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র।

পরিশেষে গভীর কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি, ত্রিপুরার শ্রীশ্রীমন্ মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য দেব বর্ম্মন বাহাদুর আমার পুস্তকের এই [illegible] সমস্ত মুদ্রাঙ্কন ব্যয় বহন করিয়াছেন ; সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার দানশীলতা বঙ্গদেশ-প্রসিদ্ধ। আমার এই সামান্য পুস্তক তাঁহার পবিত্র নামের সঙ্গে সংগ্রথিত করিতে পারিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। এই দানপ্রাপ্তি-বিষয়ে ত্রিপুরেশ্বরের প্রাইভেট সেক্রেটারি বৈষ্ণব-চূড়ামণি রাধারমণ ঘোষ, এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারি আমার সহাধ্যায়ী অশ্বিনীকুমার বসু ও প্রাতঃস্মরণীয় ৺রাজমোহন মিত্র দেওয়ানজি মহাশয়দিগের নিকট হইতে যে সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত উল্লেখযোগ্য।

পুস্তকপ্রণয়নকালে নানা গ্রন্থেরই সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে, তৎসমস্ত উল্লেখ করার স্থান-নাই। বঙ্গীয় আধুনিক লেখকগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী, ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য, অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ও কৈলাসচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি লেখকগণের মাসিক পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধ এবং ৺রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের বঙ্গভাষা বিষয়ক প্রবন্ধ, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রণীত প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য বিষয়ক ইংরেজী পুস্তিকা ও রমেশচন্দ্র দত্ত, আই, সি, এস, মহাশয়ের বঙ্গসাহিত্যের ইংরেজী ইতিহাস পাঠে বিশেষ উপকৃত হইয়াছি

এই পুস্তকে নানারূপ ত্রুটি দৃষ্ট হইবে। এখনও প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের একখানা পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিখিবার সময় হয় নাই। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ্ ও বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথির উদ্ধার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন; আশা করা যায়, আর কয়েক বৎসরের মধ্যে বহুসংখ্যক প্রাচীন অজ্ঞাত কাব্য সুপরিচিত হইবে। বোধ হয় বলিলে অত্যুক্তি হইবে না, বঙ্গদেশে এমন পল্লী নাই, যাহাতে প্রাচীনকালে দুএকজন পল্লী-কবির আবির্ভাব হয় নাই, বৈষ্ণব-সাহিত্য অতি বিরাট্—লূতাতন্তুজড়িত, জীর্ণ, গলিতপত্র শত শত বৈষ্ণবগ্রন্থ এখনও অজ্ঞাতভাবে পড়িয়া আছে। আর কয়েক বৎসর প্রাচীন পুঁথির অনুসন্ধান-চেষ্টা অব্যাহত থাকিলে প্রাচীন সাহিত্যের একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাস লিখিবার উপকরণ হস্তগত হইতে পারে। আমার এই পুস্তক ভাষার ভাবী ইতিহাস রচনাকালে যদি কিঞ্চিৎ আনুকূল্য করিতে সমর্থ হয়, তবেই শ্লাঘ্য জ্ঞান করিব। পুস্তক আকারে বৃহৎ হইল, এই জন্য তিন শত বৎসর পূর্ব্বের কবি অনন্তরামের মৈত্রের পুত্র জীবন মৈত্র রচিত পদ্মপুরাণ, বিপ্রদাস কবি কৃত মনসামঙ্গল, চূড়ামণি দাস কৃত চৈতন্যচরিত্র এবং দ্বিজ দুর্গাদাস প্রণীত মুক্তালতাবলী প্রভৃতি পুস্তকের বিষয় গ্রন্থভাগে উল্লেখ করিতে পারিলাম না। কিন্তু ১৩০৩ সালের বৈশাখের পরিষদ্ পত্রিকায় শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় 'গৌরীমঙ্গল' নামক একখানি পুঁথির পরিচয় কি[illegible]তদ্বিবরণ পূর্ব্বে অবগত না থাকায় উহা উল্লেখ করি নাই। এই পুস্তক ১৭২৮ শ[illegible]৬ খৃঃ অব্দে) পাকুড়ের রাজা পৃথ্বীচন্দ্র কর্ত্তৃক বিরচিত হয়। ইহার কবিত্ব মোটামুটি বেশ সুন্দর, কিন্তু আমরা এই কাব্যের কবিত্ব দেখাইতে আগ্রহান্বিত নহি। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যরূপ ফুলের বনে গৌরীমঙ্গলরূপ একটি সামান্য সেউতি ফুল অদৃশ্য হইলে বিশেষ ক্ষতির কারণ নাই; কিন্তু এই গ্রন্থের অবতরণিকায় কবি প্রাচীন সাহিত্যের সামান্যরূপ ইতিহাস দিয়াছেন, তাহা আবশ্যক মনে করি। সেই অংশ এই স্থানে উদ্ধৃত হইল;—"সত্যযুগে বেদ অর্থ জানি মুনিগণ। সেইমত চালাইল সংসারের জন॥ ত্রেতাযুগে বেদ

অর্থ জানিতে নারিল। তেকারণে মুনিগণ পুরাণ রচিল। অনেক পুরাণ উপপুরাণ হইল। দ্বাপরে মনুষ্যগণ ধারণে নারিল॥ স্মৃতি করি মুনিগণ সংগ্রহ করিল। কলিযুগে তাহা লোকে বুঝা ভার হৈল॥ মতে ভাষা আশা করি কৈল কবিগণ। স্মৃতি ভাষা কৈল রাধাবল্লভশর্ম্মণ॥ বৈদ্যক করিয়া ভাষা শিখে বৈদ্যগণে। জ্যোতিষ করিয়া ভাষা শিখে সর্ব্বজনে॥ বাল্মীকি করিল ভাষা দ্বিজ কৃত্তিবাস। মনসামঙ্গল ভাষা হইল প্রকাশ॥ মুকুন্দ পণ্ডিত কৈল শ্রীকবিকঙ্কণ। কবিচন্দ্রে গোবিন্দমঙ্গল বিরচন॥ ভাগবত ভাষা করি শুনে ভক্তিমান। চৈতন্যমঙ্গল কৈল বৈষ্ণব বিজ্ঞান॥ বৈষ্ণবের শাস্ত্র ভাষা অনেক হইল। অন্নদামঙ্গল ভাষা ভারত করিল॥ মেঘ ঘটা যেন ছটা তড়িতের পাতা। শিবরাম গোস্বামী করিল ভক্তিলতা॥ অষ্টাদশ পর্ব্ব ভাষা কৈল কাশীদাস। নিত্যানন্দ কৈল পূর্ব্বে ভারত প্রকাশ॥ চোর চক্রবর্ত্তী কীর্ত্তি ভাষায় করিল। বিক্রমাদিত্যের কীর্ত্তি পয়ার রচিল॥ দ্বিজ রঘুদেব চণ্ডী পাঁচালী করিল। কবিচন্দ্র চোর কবি ভাষায় হইল॥ গঙ্গা-নারায়ণ রচে ভবানীমঙ্গল। কিরীটমঙ্গল আদি লইল সকল॥ এ সকল গ্রন্থ দেখি মন আশা হইল। গৌরীমঙ্গলের পুঁথি ভাষায় রচিল॥" এখন দেখা যাইতেছে, রাধাবল্লভ-প্রণীত স্মৃতিগ্রন্থ, শিবরাম গোস্বামিকৃত 'ভক্তিলতা', চোর চক্রবর্ত্তী প্রণীত 'বিক্রমাদিত্যের উপাখ্যান', গঙ্গানারায়ণকৃত 'ভবানী-মঙ্গল' এবং 'কিরীটমঙ্গল' প্রভৃতি পুস্তকের বিষয় আমরা কিছুই অবগত নহি। উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বভাগে সেগুলি বিদ্যমান ছিল, অনুসন্ধান করিলে তাহা পাওয়া অসম্ভব নহে। প্রবন্ধ-লেখক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় উদ্ধৃত অংশে উল্লিখিত কাশীদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী নিত্যানন্দ কবির সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—"গত চৈত্রের সাহিত্যে বাঙ্গালাসাহিত্যের ইতিহাস-লেখক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন যে কয়খানি বাঙ্গালা মহাভারতের নাম দিয়াছেন, তাঁহার মধ্যে নিত্যানন্দ-প্রকাশিত মহাভারতের উল্লেখ দেখিলাম না।" (পরিষদ পত্রিকা ১৩০৩, বৈশাখ, ৫১ পৃঃ)। আমরা এই পুস্তকেও নিত্যানন্দ কবির উল্লেখ করি নাই, কিন্তু নিত্যানন্দ ঘোষ নামক এক কবির ভণিতাযুক্ত আদিপর্ব্বের অনেকাংশ আমরা পাইয়াছিলাম, [illegible] একটি স্থলের ভণিতা এইরূপ, "কাম্য কবি যে শুনিল ভারত পাঁচালী। সকল আপদ তরে [illegible] কুরালী॥ নিত্যানন্দঘোষ বলে শুন সর্ব্বজন। আগে এই অষ্টাদশ পর্ব্ব বিবরণ॥" এই মহাভারতখানি এক শত বৎসর পূর্ব্বের হস্ত লিখিত ও ইহার অধিকাংশ স্থল সঞ্জয় রচিত; ত্রিপুরা সদরের নিকটবর্ত্তী রাজপাড়া নামক গ্রামে এক ধোপার বাড়ীতে আমরা এই পুঁথি পাইয়াছিলাম। আমি ও এসিয়াটিক্ সোসাইটির পণ্ডিত বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ এই পুস্তকের জন্য ধোপাকে ২৫ টাকা দিতে সম্মত হইয়াছিলাম, কিন্তু সে পৈত্রিক পুঁথি দিতে স্বীকার করে নাই; দুর্ভাগ্যক্রমে তাহার কিছুদিন পরেই গৃহদাহে এই পুঁথি নষ্ট হইয়া যায়।

নজির লুপ্ত হওয়াতে তাহা হইতে যে নোট সংগ্রহ করিয়াছিলাম, উহা আর আমি ব্যবহার করি নাই। পূর্ব্বোক্ত নিত্যানন্দ ঘোষ, গৌরীমঙ্গলে উল্লিখিত নিত্যানন্দ হইতে পারেন। * আমরা এই পুস্তকে যে সব প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথির উল্লেখ করিযাছি, তন্মধ্যে লোকনাথ দত্ত-প্রণীত নৈষধ, অনন্তরাম প্রণীত ক্রিয়াযোগসার, দ্বিজ কংসারি প্রণীত পরীক্ষিৎ সম্বাদ, রাজারাম দত্তের দণ্ডীপর্ব্ব, কবীন্দ্র পরমেশ্বর প্রণীত (পরাগলী) মহাভারত, জাতক-সম্বাদ, রামেশ্বর নন্দীর অসম্পূর্ণ মহাভারত ইন্দ্রদ্যুম্ন-চরিত, কালিকাপুরাণ, প্রাচীন কৃত্তিবাসী রামায়ণ, সঞ্জয়-কৃত মহাভারত, ষষ্ঠীবরের স্বর্গারোহণ পর্ব্ব, গোপীনাথ দত্তের দ্রোণপর্ব্ব, রাজেন্দ্রদাসের শকুন্তলা, গঙ্গাদাসের অশ্বমেধ পর্ব্ব, শ্রীকরণ নন্দী প্রণীত (ছুটিখাঁর আদেশে রচিত) অশ্বমেধ পর্ব্ব, প্রভৃতি পুস্তক বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট লাইব্রেরীতে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, এই নিমিত্ত উৎসুক পাঠকবৃন্দের আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা উদ্ধৃত অংশের নিম্নে পত্র নির্দ্দেশ করিয়াছি। পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থগুলি ছাড়া গ্রন্থভাগে উল্লিখিত অপরাপর পুঁথির কতকগুলি আমার নিকট আছে, তদ্ব্যতীত অন্যগুলি কোথায় আছে, তাহা কেহ জানিতে চাহিলে আমরা বলিতে পারিব। পুস্তক মুদ্রিত না হইলে, হস্তলিখিত পুঁথি দৃষ্টে আলোচনা করা বড় কঠিন ব্যাপার, পাঠকেরও কৌতুহল নিবৃত্তির পথ নিতান্ত অসুবিধাজনক হয়। যে সব প্রাচীন পুঁথি পাওয়া যাইতেছে, তাহার সমস্তই প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক, তন্মধ্যে কোন কোন পুস্তকের কবিত্ব সুন্দর, তাহা কীর্ত্তি স্বরূপ সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার যোগ্য ; কিন্তু প্রাচীন সমস্ত পুস্তকই ভাষা ও ইতিহাস পর্য্যালোচনার জন্য প্রয়োজনীয় হইবে। এই বৃহৎ কার্য্য সম্পাদন করিতে বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ ও বিদ্যোৎসাহী জয়দেবপুরাধিপতির পক্ষে কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় ব্রতী হইয়াছেন, ইহা সাহিত্যের পক্ষে বিশেষ শুভ লক্ষণ বলিতে হইবে।

পুস্তক রচনার সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক মনে করি। পুস্তক সমাধা করিয়া যন্ত্রস্থ করিতে পারি নাই। কিছু কিছু করিয়া লিখিয়াছি ও ছাপাইতে দিয়াছি, এইজন্য ছাপা হইতে প্রায় দুই বৎসর লাগিয়াছে। পুস্তক লেখা শেষ না করিয়া [illegible] দেওয়ার কতকগুলি দোষ হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রধান এই পুস্তকের আদ্যন্ত সুশৃঙ্খল করিতে [illegible]। প্রথম হইতে তৃতীয় অধ্যায় পর্য্যন্ত ভাষার উৎপত্তি, বিভক্তি ও ক্রিয়া প্রভৃতির আলোচনা করিয়াছি, এই কয়েকটি অধ্যায় অতি ছোট ও পশ্চাতের অধ্যায়গুলি অতি বড় হইয়াছে। ভাষা সম্বন্ধীয় অধ্যায়গুলি উপক্রমণিকার অন্তর্ব্বর্ত্তী

---

* এবার নিত্যানন্দ ঘোষের প্রায় সমস্ত মহাভারত বাহির হইয়া পড়িয়াছে ; আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি নিত্যানন্দের মহাভারত কাশীদাসের মহাভারতেরই অন্যতম আদর্শ। ২য় সংস্করণ।

করিলে বোধ হয় এই দোষ বর্জ্জিত হইতে পারিত। অন্যান্য যে দোষ ঘটিয়াছে, তাহা প্রথম সংস্করণে একরূপ অপরিহার্য্য। জগৎরাম রায়ের কাল সম্বন্ধে আমরা ৫০৬ পৃষ্ঠায় যাহা লিখিয়াছি, তৎসম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে। আমরা জগৎরামের কাব্য দেখি নাই, দাসীতে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত বলরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধগুলি হইতে তদ্বিবরণ সঙ্কলন করিয়াছি। বলরাম বাবুর নির্দ্দিষ্ট সময়ই আমরা গ্রহণ করিয়াছিলাম, কিন্তু এই পুস্তকে উক্ত কবির বিবরণ মুদ্রিত হওয়ার পরে ১৮৯২ খৃঃ অব্দের মে মাসের দাসীতে শ্রীযুক্ত সত্যকুমার রায়, বলরাম বাবুর নির্দ্দিষ্টকাল সংশোধন করিয়াছেন। আমাদের মতে সেই সংশোধিত কালই গ্রহণীয় বলিয়া বোধ হইতেছে; তদনুসারে জগৎরাম রায় ১৬০২ শকে (১৭৭০ খৃঃ অব্দে) দুর্গাপঞ্চরাত্রি এবং ১৭১২ শকে (১৭৯০ খৃঃ অব্দে) রামায়ণ রচনা করেন। তা'পর পুস্তক দুর্গাপঞ্চরাত্রি নাম' অর্থ তারপর দুর্গাপঞ্চরাত্রি নামক গ্রন্থ বিরচিত হইল—নির্দ্দিষ্ট হওয়াতে রামায়ণের পরে দুর্গাপঞ্চরাত্রি রচিত হইয়াছিল বলিয়া বর্ণিত হয়, এইজন্য ১৭১২ শককে সম্বৎ নির্দ্দেশ করিয়া কাল নির্ণয় করা হইয়াছিল। কিন্তু সত্যেন্দবাবু দেখাইয়াছেন, তা'পর পুস্তক দুর্গাপঞ্চরাত্রি নাম' অর্থে 'তাহার অপর পুস্তকের নাম দুর্গাপঞ্চরাত্রি' সুতরাং দুর্গাপঞ্চরাত্রি রামায়ণের পরে রচিত হইয়াছিল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। এতদ্ভিন্ন জ্যোতিষিক গণনা দ্বারা সত্যবাবু স্বীয় মত সুন্দররূপে সমর্থন করিয়াছেন।

১৬৮ পৃষ্ঠায় মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় রচনার কাল উল্লিখিত হইয়াছে। ১৪৮০ খৃঃ অব্দে এই পুস্তক রচনা শেষ হয়, কিন্তু মুসলমান লেখকগণের নির্দ্দেশ অনুসারে ১৪৮৯ খৃঃ অব্দে হুসেনসাহ গৌড়ের সম্রাট হন, অথচ আমরা "গৌড়েশ্বর দিলা নাম গুণরাজখান" পদের উল্লিখিত গৌড়েশ্বরকে হুসেন সাহ বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছি, সুতরাং এসম্বন্ধে একটু ঐতিহাসিক গোল রহিয়া গেল। কিন্তু এবিষয়ে আমরা বৈষ্ণব সমাজে প্রচলিত মতই গ্রহণ করিয়াছি, এরূপ হইতে পারে পুস্তক শেষ হওয়ার ৯।১০ বৎসর পরে কবি উপাধি প্রাপ্ত হইয়া গ্রন্থশেষে তাহা জুড়িয়া দিয়াছেন। যাহা হউক এই মত ভ্রমাত্মক প্রতিপন্ন হইলে, আমরা ভবি[illegible] সংশোধন করিব।

উপসংহারে বক্তব্য, প্রাচীন বঙ্গসাহি[illegible]ন্ধে এখনও শিক্ষিত সম্প্রদায় একরূপ উদাসীন আছেন। আয়েম্বিক্ ও ট্রকেয়িক প্রভৃতি ছন্দের মনোহারিত্বে প্রীত যুবকগণ অবিরত পয়ার ও দীর্ঘছন্দে বিরক্ত হইয়া পড়েন; প্যারাডাইস লষ্ট কিম্বা টাস্কের অবতরণিকায় যাঁহারা কল্পনার স্তোত্র পড়িয়া সুখী, তাঁহারা প্রাচীন বঙ্গীয় কবিগণের 'লম্বস্থুল কলেবর,' ইত্যাদিরূপ গণেশ বন্দনা পড়িতে সহিষ্ণুতা রক্ষা করিতে পারেন না। তাঁহারা জুলিয়েট ও এণ্ড্রমেকি প্রভৃতি নামের পক্ষপাতী, কিন্তু বেহুলা, লহনা, কানড়া প্রভৃতি সেকেলে নাম শুনিয়া প্রীতি বোধ করেন না। প্রাচীন সাহিত্য

পড়িতে কতকটা ধৈর্য্য ও ক্ষমা চাই; আমরা সাহস সহকারে বলিতে পারি, পয়ারচ্ছন্দ ও গণেশ-বন্দনা উত্তীর্ণ হইয়া যাঁহারা প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য অধ্যবসায়ের সঙ্গে আলোচনা করিবেন, তাঁহাদের পরিশ্রম ব্যর্থ হইবে না; অন্ততঃ বাঙ্গালী পাঠক তাহাতে বিশেষরূপ উপভোগের সামগ্রী পাইবেন, কারণ বাঙ্গালীর মন যে উপাদানে গঠিত, সেই উপাদানে কাব্যগুলিও গঠিত। আমরা এই স্থলে মোক্ষমূলরের এই কয়েকটি বহুমূল্য বাক্য উদ্ধৃত করিয়া ভূমিকার পরিসমাপ্তি করিতেছি,—"যে দেশের লোকবৃন্দ স্বীয় প্রাচীন ইতিহাস ও প্রাচীন সাহিত্য স্মরণ করিয়া গৌরবান্বিত না হয়, তাহারা জাতীয় চরিত্রের প্রধান অবলম্বন শূন্য হইয়াছে, স্বীকার করিতে হইবে। যখন জার্ম্মেনী রাজ্য রাজনৈতিক অবনতির নিম্নতম গহ্বরে পতিত হইয়াছিল, তখন তদ্দেশীয় লোকবৃন্দ স্বদেশের প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন; এবং প্রাচীন সাহিত্যপাঠে ইঁহাদের হৃদয়ে ভাবী উন্নতির নূতন আশা সঞ্চারিত হইয়াছিল।"

কুমিল্লা,
১৪ই সেপ্টেম্বর ১৮৯৬

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই আমি উৎকট শিরোরোগে আক্রান্ত হই। প্রায় দুই বৎসর কাল উত্থান-শক্তি-রহিত ও শয্যাশায়ী হইয়া এখন কিঞ্চিৎ সুস্থতালাভ করিয়াছি।

পাঁচ বৎসর কাল আমি এইরূপ অকর্ম্মণ্য ও জীবিকা অর্জ্জনে সম্পূর্ণ অশক্ত হইয়া যার পর নাই আর্থিক অভাবে পতিত হইয়াছি। বঙ্গভাষার জন্য আমি যে সামান্য শ্রম স্বীকার করিয়াছি, তাহার ফলে আমার আপৎকালে আমি যে সহানুভূতি ও সৌহার্দ্দ্য লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি, তাহা স্মরণ করিলে চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হয়।

আমার এই অবস্থায় আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ মহামতি ছোটলাট বাহাদুর শ্রীযুক্ত উডবর্ণ ও রাজপ্রতিনিধি মহামান্য লর্ড কুর্জ্জন আমার প্রতি অনুকম্পাপরবশ হইয়া আমায় মাসিক ২৫ টাকা বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন।

পরম পণ্ডিত সহৃদয় শ্রীযুক্ত ডাক্তার গ্রীয়ারসন্ সাহেবের কৃপার কথা আমার হৃদয়ে চিরাঙ্কিত থাকিবে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার আলোচনা দ্বারা তিনি পণ্ডিত সমাজে যশস্বী হইয়াছেন। বহুসংখ্যক য়ুরোপীয় পণ্ডিত সংস্কৃত ভাষাকে সাদরে বরণ করিয়া লইয়াছেন,—কিন্তু বাঙ্গালা হিন্দী প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষাগুলিকে প্রীতির চক্ষে দেখিয়া অন্য কোন বিদেশী পণ্ডিত মহাত্মা গ্রীয়ারসনের মত অক্লান্ত অধ্যব[illegible]লনে জীবন উৎসর্গ করেন নাই। তাঁহার হিন্দী-সাহিত্যের ইতিহাসের বিষয় সকলেই অবগ[illegible]ছেন, কিন্তু বঙ্গভাষার আদি সঙ্গীত মাণিকচান্দের গান ইনি প্রথমে সংগ্রহ করিয়া এসিয়াটিক্ সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশ করেন। বিদ্যাপতি সম্বন্ধে ইঁহার সংগ্রহ অসীম অধ্যবসায়ের ফল। সম্প্রতি ইনি ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভারতবর্ষের প্রাদেশিক ভাষাতত্ত্ব সঙ্কলনে নিযুক্ত হইয়াছেন—সেই কার্য্য সমাহিত হইলে ইঁহার জীবনের অনশ্বর কীর্ত্তি স্থাপিত হইবে। আমার আপৎকালে এই মহাত্মা যেরূপ সহৃদয়তার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, তাহা আমি এ জীবনে ভুলিতে পারিব না। চট্টগ্রামের ভূতপূর্ব্ব কমিশনার শ্রীযুক্ত স্ক্রাইন সাহেব আমার

পুস্তকের প্রতি যে আদর ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। ঢাকাবিভাগের কমিশনার শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত স্যাভেজ সাহেব আমার বৃত্তি-প্রাপ্তি সম্বন্ধে সাহায্য করিয়া আমাকে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ রায়চৌধুরী, শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্র সি, এস, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দে, সি, এস, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত বাবু সারদাচরণ মিত্র, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত নীরদকৃষ্ণ রায় প্রভৃতি মহোদয়গণের নিকট আমি দুঃসময়ে বিবিধ আনুকূল্য পাইয়াছি। তজ্জন্য ইহাঁদের সকলেরই নিকট আমি চিরজীবন ঋণবদ্ধ রহিলাম। শ্রীযুক্ত ডাক্তার চন্দ্রশেখর কালী এল, এম, এস, শ্রীযুক্ত ডাক্তার নীলরতন সরকার এম, ডি, শ্রীযুক্ত কবিরাজ বিজয়রত্ন সেন, কবিরাজ গুরুপ্রসন্ন সেন সরস্বতী, কবিরাজ যোগীন্দ্রনাথ সেন এম, এ, মহাশয়েরা আমার পীড়ার সময়ে বিনা ব্যয়ে চিকিৎসা ও ঔষধ প্রদান দ্বারা আমার জীবন রক্ষা করিয়াছেন। এই অবসরে তাঁহাদের নিকট আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণে ৬০০ পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর মহোদয় সরকারী বিদ্যালয় সমূহের জন্য ৭০ খানি গ্রহণ করিয়া আমাকে অনুগৃহীত করেন এবং পূর্ব্ব-বিভাগের ভূতপূর্ব্ব ইন্‌স্পেক্টার স্বর্গীয় দীননাথ সেন মহাশয় তাঁহার অধীন বিদ্যালয় সমূহে এক একখানি পুস্তক ক্রয়ের জন্য সার্কুলার প্রচার করেন। সেই সার্কুলারের ফলে প্রথম সংস্করণ অতি অল্প সময়ে নিঃশেষ হইয়া যায়। বর্ষমধ্যেই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের আবশ্যক হয়; কিন্তু অর্থাভাবে আমি সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারি নাই।

চারি বৎসরকাল অতীত হইল, বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়ের নিবাসী রামকুমার দত্ত নামক এক ব্যক্তি আমার বাড়ীতে ভৃত্য নিযুক্ত হয়। আমার অভিপ্রায়ানুসারে এই ব্যক্তি বাঁকুড়া জেলা হইতে কতকগুলি পুঁথি সংগ্রহ করিয়া আনে। এই ব্যক্তি পুস্তক সংগ্রহ-কার্য্যে বিশেষরূপ দক্ষ দেখিয়া আমি ইহাকে সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশ[illegible] পুঁথি সংগ্রহ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিই। আমার যে অবস্থা, তাহাতে এই সকল পু[illegible]নবার শক্তি আমার নাই, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। নগেন্দ্রবাবু ইতিপূর্ব্বেই অনেক প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। রামকুমারকে নিযুক্ত করিয়া ইহার দ্বারা তিনি প্রায় ৫০০ শত পুঁথি সংগ্রহ করেন। প্রাচীন পুঁথির উদ্ধার কল্পে নগেন্দ্রবাবু যেরূপ মুক্তহস্তে ব্যয় করিয়াছেন, তজ্জন্য প্রত্যেক বাঙ্গালীই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে। তাঁহার পুস্তকাগারে প্রায় ১০০০ বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথি সংগৃহীত আছে, ইহার জন্য তাঁহার শুধু অর্থব্যয় নহে, বিস্তর কষ্ট স্বীকার করিয়া অনুসন্ধান করিতে হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির

এই অমূল্য পুস্তকাধারটি নগেন্দ্রবাবুর সম্পূর্ণরূপে অধিকৃত থাকা আমরা বাঞ্ছনীয় মনে করি না। স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং রজনীকান্ত গুপ্ত প্রভৃতি পণ্ডিতগণের লাইব্রেরীর পরিণাম স্মরণ করিয়া আমাদের ভীতি জন্মিয়াছে। এই পুঁথিগুলির অতি নগণ্য অংশও এখন পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। বাঙ্গালাভাষার এই দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন নিদর্শন গুলি গভর্ণমেণ্টের লাইব্রেরী কিংবা কোন অর্থশালী সাধারণ পাঠাগারে সুরক্ষিত থাকা উচিত। অন্ততঃ এমন কোন বিশিষ্ট ধনী ব্যক্তির হস্তগত থাকিলেও চলিতে পারে, যে স্থল হইতে ইহাদের নিলামে বিক্রয় হইবার আশঙ্কা অল্প। এই পুঁথিগুলির একখানি নষ্ট হইলে তৎস্থল পূরণ হওয়া দুষ্কর। নগেন্দ্রবাবুকে ইহাদের অধিকারের লোভ ছাড়িয়া দিতে প্রবর্ত্তিত করা বাঞ্ছনীয়। আমরা সাহিত্যের উন্নতিকল্পে এই পুঁথিগুলিকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিবার উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া যে মন্তব্য প্রকাশ করিলাম, আশা করি সুহৃদ্বর তাহাতে বিরক্ত হইবেন না। এই পুস্তকগুলি হইতে আমি বর্ত্তমান সংস্করণে বিশেষ সাহায্য লাভ করিয়াছি, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন।

যে সকল পুঁথি, আমার এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার পরে আবিষ্কৃত হইয়াছে, বর্ত্তমান সংস্করণে আমি তাহাদের অধিকাংশের ন্যূনাধিক বিবরণ প্রদান করিয়াছি। গ্রন্থভাগে অনুল্লিখিত পুঁথিগুলির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী পুস্তকশেষে প্রদত্ত হইল। এরূপ গ্রন্থে সমস্ত পুঁথিরই উল্লেখ তত আবশ্যক নহে এজন্য সামান্য সংখ্যক পুঁথির উল্লেখ করি নাই। এবার এই পুস্তকখানি পূর্ব্ব সংস্করণের আয়তনের অন্যূন একচতুর্থাংশ বাড়িয়া গেল। একটি বিস্তৃত বর্ণনানুযায়ী অনুক্রমণিকা সর্ব্বশেষে প্রদত্ত হইল। এই অনুক্রমণিকাটি এবং গ্রন্থের পূর্ব্বভাগে সন্নিবিষ্ট সূচিপত্র আমার প্রিয় বন্ধু সুলেখক শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ সেন, বি. এ., মহাশয় প্রস্তুত করিয়া আমার চিরকৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। অধ্যায়াংশগুলি পুস্তকের পূর্ব্ববর্ত্তী একটি ক্ষুদ্র সূচিকা দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইল। এই সংশোধন, পরিবর্ত্তন এবং পরিবর্দ্ধনাদি ব্যাপারে আমার যেরূপ গুরুতর পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল, তাহা আমার স্বাস্থ্যের পক্ষে নিতান্ত [illegible] হইয়াছে। তথাপি প্রাণান্ত পরিশ্রমে তাহা করিয়াছি। কখনও কখনও কিছু লিখিয়া এত অ[illegible] পড়িয়াছি যে ১০।১৫ দিন শয্যা হইতে উঠিতে সমর্থ হই নাই। ফরিদপুর থাকা কালে আমি নিজ হাতে লিখিতে একান্ত অক্ষম ছিলাম। আমি বলিয়া যাইতাম, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার নামক জনৈক বঙ্গভাষানুরাগী উৎসাহী যুবক স্নেহপরবশ হইয়া তাহা লিখিয়া দিতেন। তাঁহার নিকট আমি এজন্য একান্ত ঋণী।

আমার এরূপ সঙ্গতি নাই যে প্রুফ্ ইত্যাদি সংশোধনের ভাল বন্দোবস্ত করিতে পারি, সুতরাং প্রেস হইতেই পূজনীয় শ্রীযুক্ত কালীনারায়ণ সান্যাল মহাশয় তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন,

তথাপি আমাকে প্রুফ্ দেখিবার জন্য বহু প্রকার কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছে। সময়ে সময়ে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি এবং শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র সমাজপতি প্রভৃতি বন্ধুবর্গ প্রুফ্ সংশোধনে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। কিন্তু সকল সময়ে তাঁহাদের সাহায্য পাওয়ার সুবিধা ঘটে নাই, এ অবস্থায় ভুল থাকিবার নিতান্ত আশঙ্কা, কিন্তু পুস্তকখানি নির্ভুল করিয়া ছাপাইবার শক্তি এবং অর্থবল আমার নাই। আমার ন্যায় পীড়িত ব্যক্তির পক্ষে যতদূর সম্ভব, আমি তদতিরিক্ত শ্রম করিয়া অনেক সময় পীড়া বৃদ্ধি করিয়াছি, এসম্বন্ধে আমি আর কি লিখিব, পাঠকবর্গের নিকট আমি বিচারাধীন রহিলাম।

অতঃপর চিত্রের কথা। ফরিদপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট্ শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দে মহোদয়ের অনুরোধে বীরভূমের ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত এইচ. এম্. প্যারিশ মহোদয় আমার পুস্তকের জন্য চণ্ডীদাসের ভিটা, বাশুলীদেবীর মন্দির এবং বাশুলীদেবীর ফটোগ্রাফ তুলিয়া পাঠাইয়াছেন। ভিটার দুইখানি ছবি, একখানি দক্ষিণ পূর্ব্ব এবং অপরখানি উত্তর-পূর্ব্ব দিকের দৃশ্য। ভিটার পরিসর অতি বৃহৎ এবং উহার চতুর্দ্দিক্ ঘন তরুরাজি ও গৃহসমূহ দ্বারা পরিবেষ্টিত।* বাশুলীদেবীর মূর্ত্তির ফটোগ্রাফ তুলিতে সাহেব মহোদয়কে বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছে। মন্দির-স্বত্বাধিকারিগণ অনেক অনুরোধের পর সন্ধ্যাকালে দেবীমূর্ত্তিটি বাহির করিয়া দিয়াছিলেন। প্যারিশ সাহেব লিখিয়াছেন, তিনি এই মূর্ত্তির নিকটে যাইতে পারেন নাই, দূর হইতে ফটোগ্রাফটি তুলিতে হইয়াছে, মূর্ত্তিটিও অতি ক্ষুদ্র, এজন্য চিত্রখানি ছোট হইয়াছে।† দেবীর পূর্ব্বতন মন্দির ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তিন বৎসর হইল সেই স্থানে যে নূতন মন্দির উত্থিত হইয়াছে, এ ফটোগ্রাফখানি সেই নূতন মন্দিরের।

গৌরাঙ্গ সমাজ চৈতন্যপ্রভুর যে ছবি বিক্রয় করিতেছেন, তাহার মূল তৈলচিত্র মহারাজা নন্দকুমারের বংশধর রাজকুমারগণের বাড়ী বহরমপুর কুঞ্জঘাটায় সযত্নে রক্ষিত আছে। ইহা শ্রীনিবাসের বংশধর বৈষ্ণবকুলতিলক, পদামৃতসমুদ্র সঙ্কলয়িতা শ্রীযুক্ত রাধামোহন ঠাকুর মহারাজা নন্দকুমারকে প্রদান করেন। এই তৈলচিত্রখানি বড় সুন্দর এবং [illegible] বৎসরের প্রাচীন। আমি নিজে

---

* শ্রীযুক্ত প্যারিশ সাহেব লিখিয়াছেন—"The bhita I found difficult to photograph even with a wide angle lens as it is large and closely surrounded with houses or trees."

† "The image was brought outside for me to photograph very late in the evening and I had to take it without pre-arrangement. I was quite unprepared for such a very small image and could not get close enough to it for a larger picture or screen the wall behind it. A very strong wind too was blowing at the time. This negative could be cut down and enlarged."

অর্থব্যয় করিয়া কুঞ্জঘাটা হইতে একখানি ফটোগ্রাফ তোলাইয়া আনিয়াছি। গৌরাঙ্গসমাজের ছবিতে চৈতন্যপ্রভুর কপালে এবং নাসাগ্রভাগে যে তিলক ও চক্ষুপ্রান্তে যে অশ্রুবিন্দু দৃষ্ট হয়, মৎ-সংগৃহীত নিগেটিভ্ এবং ফটোগ্রাফে তাহা পাই নাই. সুতরাং গৌরাঙ্গ সমাজের ছবির সঙ্গে আমার ছবির একটুকু পার্থক্য আছে। এই ফটোগ্রাফখানির প্রাপ্তি সম্বন্ধে ফরিদপুরের স্বনাম-প্রসিদ্ধ উকীল অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয়ের অনুরোধে বহরমপুরের বিখ্যাত উকীল শ্রীযুক্ত অনারেবল বৈকুণ্ঠনাথ সেন মহাশয় আমাকে সাহায্য করেন। এজন্য আমি উভয়ের নিকটই কৃতজ্ঞ। 'দক্ষিণরায়' দেবের প্রতিমূর্ত্তি আমি বহু চেষ্টা করিয়া হাওড়া খুরুট-পঞ্চাননতলার উক্তদেবের একটি প্রাচীন মন্দির হইতে উদ্ধার করিয়াছি, তৎপক্ষে শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ আঢ্য মহাশয়ের সাহায্য পাইয়াছি। এই সকল ছবির জন্য আমার অনেক অর্থ-ব্যয় হইয়াছে। বৃন্দাবনে মহাপ্রভুর একখানি অতি প্রাচীন তৈলচিত্র আছে, এই সংবাদ জানিয়া বৃন্দাবননিবাসী জনৈক মহাশয়ের নিকট, তাঁহার ইচ্ছানুক্রমে অর্থ প্রেরণ করা হয়। কিন্তু ছবি পাওয়া দূরে থাক, অর্থ পর্য্যন্ত প্রত্যর্পিত হয় নাই। উদ্ধারণ দত্তের যে ছবি প্রদত্ত হইল, তাহা সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী মহাশয়ের প্রেরিত ছবি হইতে গৃহীত হইয়াছে, সেই ছবিখানি সম্বন্ধে অচ্যুতবাবু লিখিয়াছেন—"হুগলীর অন্তর্গত বালিগ্রামে উদ্ধারণ দত্ত বংশীয় ৺জগমোহন দত্ত মহাশয়ের শ্রীবিষ্ণুমন্দিরে উদ্ধারণ দত্তের এক প্রাচীন দারুময়ী মূর্ত্তি আছে; প্রাচীন কালাবধি ইহার যথারীতি সেবা পূজা হয়, প্রেরিত ছবি সেই প্রাচীন দারুময়ী মূর্ত্তি হইতে গৃহীত।" জগদানন্দের হস্তলিপি আমি শ্রীযুক্ত কালিদাস নাথ মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত হই। ইহা কবির খসড়ালেখার প্রতিলিপি। সেই খসড়ায় দেখা যায়, কবির কোন একটি পংক্তি মনোনীত না হওয়াতে সে পংক্তি সংশোধন করিয়া তিনি অপর এক ছত্র লিখিয়াছেন, সে ছত্রটিও ভাল না লাগাতে আর এক ছত্র দ্বারা উহা সংশোধন করিয়াছেন, এইরূপ উপর্য্যুপরি চেষ্টায় পরে যে ছত্র সর্ব্বশেষ মনোনীত হইয়াছে, তাহা স্বীয় পদরাশির অন্তর্ব্বর্ত্তী কোনও স্থানে সংযোজন করিয়া দিয়াছেন। বনবিষ্ণুপুর হইতে সংগৃহীত বাং ১০৬[illegible] লিখিত একখানি প্রাচীন চৈতন্য-ভাগবত পুঁথির মলাটে প্রাপ্ত সংকীর্ত্তনের যে তৈল চিত্রের [illegible] দেওয়া হইল, তাহা রামকুমার কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়াছিল।

প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় দাসী পত্রিকার একটি প্রবন্ধের মর্ম্মানুসারে গ্রন্থভাগে প্রদত্ত কবি জগৎরাম রায়ের কাল সংশোধন-উদ্দেশ্যে যাহা লিখিয়াছিলাম, তৎপর সে বিষয়ে সন্দেহের কারণ জন্মিয়াছে, আমরা এখনও এ সম্বন্ধে কোন মীমাংসা করিতে পারি নাই। সুতরাং পুস্তকের সে অংশটির পরিবর্ত্তন করিলাম না।

এবারও বৈষ্ণব কবিগণের জীবনী সম্বন্ধে আমি সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী মহাশয়ের নিকট হইতে কতক উপকরণ প্রাপ্ত হইয়াছি।

প্রথম সংস্করণের ৩৭০ পৃষ্ঠায় পাদ টীকায় আমরা লিখিয়াছি, স্বর্গীয় হারাধন দত্ত ভক্তনিধি মহাশয়ের মতে উমাপতি ধর স্বর্ণবণিক বংশীয়। সুলেখক শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় এবং ভিষক্‌প্রবর শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, এম, এ, মহাশয়দ্বয় আমাকে কতকগুলি প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তদ্দ্বারা দৃষ্ট হয়, কবি উমাপতি ধর বৈদ্যবংশীয় ছিলেন। মহামহোপাধ্যায় ভরতমল্লিক কৃত রত্নপ্রভা গ্রন্থে ইহা স্পষ্টরূপ উল্লিখিত আছে এবং জেলা ফরিদপুরের অন্তর্গত পিঞ্জারী গ্রামে এখনও উমাপতি ধরের বংশধরগণ বিদ্যমান রহিয়াছেন। এই পিঞ্জারী গ্রাম অতি প্রাচীন, লক্ষ্মণসেনের পুত্র বিশ্বরূপ সেন এই গ্রামখানি জনৈক সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণকে প্রদান করিয়া যে তাম্রফলক প্রচারিত করেন, তাহা কয়েক বৎসর হইল এসিয়াটিক সোসাইটির জ্যার্ন্নালে প্রকাশিত হইয়াছে। উমাপতি ধর বাঙ্গালাভাষার কবি নহেন, সুতরাং এ প্রসঙ্গের অধিকতর চর্চ্চা আমাদের বিষয় বহির্ভূত।

পদ্মাপুরাণের প্রাচীন কবি নারায়ণদেবের কোন বিবরণ ইতিপূর্ব্বে পাওয়া যায় নাই। সম্প্রতি একখানি প্রাচীন পুঁথিতে নিম্নলিখিত বিকৃতপাঠ বিশিষ্ট কয়েকটি ছত্র পাওয়া গিয়াছে।

"নারায়ণ দেএ কহে জন্ম মগদ। মিশ্র শ্রীপতি নহে ভট্ট বিশারদ॥ মধুকুল্যগোত্র হইল গাই গুণাকর। শূদ্রকুলে জন্ম মোর সৎ কাহেস্তের ঘর॥ নরহবি তনএ জে নরসিংহ পিতা। মাতামহ প্রভাকর রুক্মিণী মোর মাতা॥ চোদ্দ বৎসরের কালে দেখিল স্বপন। মহাজন সহিত পথেত দরশন॥ শিশুরূপেতে গোঁসাই হাতেতে করি বাঁশী। আলিঙ্গন দিয়া বলে যার মুখে হাঁসি॥ গোবিন্দের আসা মোর সেই সে কারণ। প্রণাম করিল মুঞি ভজিয়া চরণ॥ সকল স্বজন প্রভু তোমার কারণে। কি করিতে পারি আমি তোমা বিদ্যমানে॥ গোবিন্দ নিকট আমি কি কহিতে জানি। কোকিলের নিকটে জেন কাক করে ধ্বনি॥ শঙ্খের নিকটে সামুকের কিবা শোভা। সুমেরু নিকটে যেরূপ উলুতোপার প্রভা॥ অমৃত [illegible]কর কিবা কাজ। নক্ষত্র নিকটে যেন শোভে খদ্যোতরাজ॥ দুগ্ধের নিকটে ঘোলের ক[illegible] ক্ষীরোদ নিকটে যেন শোভে গড়খাই॥ যদিবা অশুদ্ধ হয় আমার বচন। পণ্ডিতের মুখে তাই করিবা শ্রবণ॥"

এই বিবরণটি সুকবি শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের বাড়ীর একখানি পুঁথিতে পাওয়া গিয়াছে। এই পুঁথি খানিতে পদ্মপুরাণের অপর লেখক দ্বিজবংশীদাসের পিতার নাম যাদবানন্দ বলিয়া উল্লিখিত দৃষ্ট হয়।

উপসংহার কালে আমি ত্রিপুরেশ্বর স্বর্গীয় বীরচন্দ্র মাণিক্য মহোদয়ের মৃত্যুতে গভীর পরিতাপ

প্রকাশ করিতেছি। তিনি এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণের ব্যয় ভার বহন করিয়াছিলেন, আমার নানারূপ বিপদের মধ্যে, ৪ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুও অন্যতম বলিয়া গণ্য করিয়াছি! তাঁহার মৃত্যুশয্যার এক প্রান্তে আমার এই সামান্য পুস্তকখানি পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। তিনি ইহা পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, ইহাই আমার ঈষৎ আত্মতৃপ্তি ও সান্ত্বনার কারণ। এবার যাঁহাদের নিকট পারিবারিক অভাব মোচনার্থ এবং পুস্তকের জন্য অর্থ সাহায্য পাইয়াছি, তাঁহাদের অধিকাংশের নিতান্ত অমত হওয়াতে, নাম প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

বঙ্গীয় শিক্ষা-বিভাগের বর্ত্তমান ডিরেক্টার শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত পেড্‌লার সাহেব বঙ্গীয় বিদ্যালয় সমূহের জন্য এই নূতন সংস্করণের ৭০ কাপি গ্রহণ করিয়া আমার অশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

কলিকাতা
১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯০১

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

পঞ্চম সংস্করণের ভূমিকা

এই সংস্করণের বিশেষ গৌরব করিবার বিষয়, জে, লঙ্ সাহেবের ক্যাটালোগ। এই বিখ্যাত পুস্তকখানি সমগ্রভাবে এবারকার সংস্করণে পরিশিষ্ট স্বরূপ জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার পত্র সংখ্যা প্রায় ১১০। এই ক্যাটালোগে ১৮০০ হইতে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ১৪০০ প্রকাশিত পুস্তকের বিবরণী আছে। মিঃ জে, লঙ সাহেব ৫নং কাশীতলা হইতে এই পুস্তক-বিবরণী প্রকাশ করেন। তাহার প্রকাশক ছিলেন স্যাণ্ডার্স কোন্স্ এণ্ড কোং। বিবরণীটির বিশেষত্ব এই যে তাহাতে বিভিন্ন বিষয়ের বহু পুস্তকের বিস্তৃত তালিকা দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে ক্ষেত্রতত্ত্ব, বীজগণিত ভূতত্ত্ব, শব্দতত্ত্ব, অভিধান, দর্শন, মস্তিষ্কতত্ত্ব, জড়বিজ্ঞান, জরীপ, উদ্ভিদবিদ্যা, শিক্ষাপদ্ধতি প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ের পুস্তকের উল্লেখ এবং বিবরণী দেওয়া আছে। আশ্চর্য্যের বিষয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই এইরূপ বিবিধ বিষয়ের পরিভাষা বাঙ্গালা ভাষায় সৃষ্ট হইয়াছিল। এখন আমরা এইরূপ পরিভাষার জন্য হাতড়াইয়া মরিতেছি; এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটে সম্প্রতি এরূপ প্রশ্ন উঠিয়াছিল যে বাঙ্গালাভাষায় ইতিহাস ও ভূগোল প্রভৃতির পরিভাষা আদৌ সৃষ্ট হইতে পারে কি না। লঙ্ সাহেবের ক্যাটালোগে যে সমস্ত পরিভাষা দেওয়া হইয়াছে, তাহার সকলগুলি অবশ্য নির্দ্দোষ নহে। ৭০।৮০ বৎসর পূর্ব্বের ভাষা কতকটা জটিল ও অমার্জ্জিত নিশ্চয়ই ছিল এবং পরিভাষা গুলির মধ্যেও অনেক বিসদৃশ ও উদ্ভট রকমের শব্দ রচিত হইয়াছিল। অশুভক্ষণে মেকলে সাহেব বাঙ্গালা শিক্ষার ধারা বদলাইয়া দিলেন; তিনি এবং তাঁহার সহকারীরা বিধিবদ্ধ করিলেন যে অঙ্কশাস্ত্র হইতে শব্দশাস্ত্র পর্য্যন্ত পৃথিবীর যাবতীয় বিষয় আমাদের ইংরাজীতে পড়িতে হইবে। এইভাবে যে স্রোতটি চলিয়া আসিতেছিল, তাহার মুখ ইহাঁরা ফিরাইয়া দিলেন। তাহার ফলে এই দাঁড়াইয়াছে যে আমরা বঙ্গভাষা শুধুই সাহিত্য—বিশেষভাবে—কবিতার আরাধনা ক[illegible]ক অপরাপর সমস্ত বিষয় ইংরাজীভাষায় শিখিতে যাইয়া একদিকে ভাষা আয়ত্ত করিবার দুরূ[illegible]—অপর দিকে বিষয়ের জ্ঞান অর্জ্জনের শ্রান্তি দ্বারা জীবনের অর্দ্ধেক সময় নষ্ট করিয়া ফেলিতেছি। যে সময় আমাদের ভাষায় এই পরিভাষা আপনা আপনি গড়িয়া উঠিতেছিল, সেই সময়ের মধ্যে জাপানেও এইরূপ চেষ্টা সুরু হইয়া তাহা কিরূপ কল্পতরুর ন্যায় ফুলে ফলে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। যে কোন বিষয়-সংক্রান্ত গ্রন্থ রচনার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে পরিভাষা আপনি সৃষ্ট হইয়া থাকে। বই লিখিত হইবার পূর্ব্বে পরিভাষা রচনা করায় কোন ফলোদয় হয় না। এজন্য রামেন্দ্রবাবু ও

যোগেশ রায় প্রভৃতি লেখকদের চেষ্টা এ বিষয়ে কতকটা অসাময়িক হইয়াছে। যে বিষয় পড়িতে হইবে—সেই বিষয়ের জ্ঞান হইবার জন্য পরকীয় ভাষায় সেই বিষয়ের পরিভাষা শিখিতে হইতেছে। ইহাতে যে কতটা অতিরিক্ত শ্রম করিতে হইতেছে তাহা সহজেই উপলব্ধি হয়। প্রত্যেক বিষয়ের জন্যই এই ভাবে কতটা যে ব্যর্থশ্রম করিতে হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। ইংরাজী ভাষা সমর্থকগণ বলেন, (১) বাঙ্গলা ভাষার বহু বিষয়ক পুস্তকাদির রচনার উপযুক্ত পরিভাষা নাই।—লঙ্ সাহেবের ক্যাটালোগ তুড়ি দিয়া এই যুক্তিকে উড়াইয়া দিতেছে। ৭০।৮০ বৎসর পূর্ব্বে যাহা অবাধে হইতেছিল এখন বঙ্গভাষার অশেষ শ্রীবৃদ্ধির যুগে তাহা হইতে পারিবে না এ যুক্তি অসার। বস্তুত পরিভাষা সৃষ্টির যে পরম হিতকর প্রচেষ্টা হইতেছিল, তাহা মেকলে সাহেবের বিধি গলা টিপিয়া না মারিলে এতদিনে আমাদের ভাষা নানা বিষয়ক বিশুদ্ধ পরিভাষায় শ্রীসম্পন্ন হইয়া অপরাপর ভাষার সমকক্ষতা করিত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যে বিষয় অধ্যয়ন করিতে হইবে তজ্জন্য যদি পরভাষা চর্চ্চার সঙ্গে একটা বিষম লড়াই করিতে হয় তবে সেই বিষয়ে কথনই মৌলিকতা জন্মিতে পারে না। এ জন্যই ক্রাইন সাহেব লিখিয়াছেন "মেকলে সাহেবের বিধির দ্বারা যদি বাঙ্গালা ভাষার এই ঘোর অনিষ্ট না হইত, তবে বাঙ্গালীরা যে মৌলিকতা দেখাইতে পারিতেছেন না এ কলঙ্ক কবে ঘুচিয়া যাইত। এখন ইঁহারা যে শ্রম স্বীকার পূর্ব্বক ইংরাজী ভাষার জ্ঞান অর্জ্জন করেন, তাহার দশমাংস যদি তাঁহারা স্বীয় ভাষার জন্য প্রয়োগ করিতেন—তবে বাঙ্গালা ভাষায় আমরা নানারূপ মৌলিক গ্রন্থ দেখিতে পাইতাম।"

ইংরাজী সমর্থকগণের (২) যুক্তি এই যে অপরাপর বিষয় ইংরাজীতে না পড়িলে আমাদের ইংরাজীর জ্ঞান সেরূপ সম্পূর্ণ হইবে না এবং ইংরাজি বিদ্যার্জ্জনের ভয়ানক বিঘ্ন হইবে।—যেন ইংরাজী শিক্ষা করাই আমাদের জাতির একমাত্র লক্ষ্য! ইংরাজের প্রতিবাসী ফরাসী, জার্ম্মাণ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতিরাও ত ইংরাজী শিখিয়া থাকেন। আমাদেরই কি শুধু ইংরাজি বিদ্যা জপতপ ও একমাত্র আরাধনার বিষয় করিতে হইবে? [illegible] শাসন ইংরাজীর উপরে এইরূপ অকথ্যভাবে জোর দিয়া যে আমাদিগকে নানা দিক হইতে [illegible] করিতেছে, তাহার একটি প্রমাণ এই যে, যদি জজ ও মেজিষ্ট্রেটেরা ভালরূপ বাঙ্গালা শিখিতেন [illegible] হইলে প্রত্যেক সাক্ষীর জবানবন্দী, প্রত্যেক প্রার্থীর আবেদন-নিবেদন প্রত্যেক উকীলের বক্তৃতা ইংরাজীতে করার জন্য শাসন যন্ত্র এরূপভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইত না। দুএকটি ইংরেজ যে দেশ শাসন করিতেছেন, তাঁহারা তদ্দেশের ভাষা শিখিবেন না, অথচ শত শত লোককে এজন্য ইংরাজী লইয়া কুস্তি করিতে হইবে এবং মতরজ্জং ও ইণ্টারপ্রেটার এক গোষ্ঠি নিযুক্ত করিয়া সেই দুএকটি সাহেবের অজ্ঞানতার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ দেশের অর্থ অজস্র ব্যয় করিতে হইবে!

অবশ্য ইংরাজী শিক্ষার উপকারিতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করা নিষ্প্রয়োজন। ইংরাজী শিক্ষা শুধু আমাদের বিষয়কর্মের জন্য নহে, বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতের নানা দেশের সঙ্গে ঐক্য সংস্থাপনের জন্য আমাদের এই ভাষা শিক্ষা করা একরূপ অপরিহার্য্য। কিন্তু চলনসই বিদ্যায় যেখানে কাজ হইতে পারে, সেখানে ইংরাজের উচ্চারণ ভঙ্গি, ইংরেজের হাসি, ইংরাজের কাশি, ইংরাজী ইতিহাসের খুঁটিনাটি, এ সমস্তই ঠিক ইংরেজের মত আমাদের নির্দ্দোষ ভাবে শিখিতে হইবে, এটা কি অত্যন্ত বাড়াবাড়ি নয়? সেকালে সংস্কৃত ব্যাকরণ শিখিতে জীবন কাটিয়া যাইত, কিন্তু যে সাহিত্য চর্চ্চার জন্য ব্যাকরণ দরকার, ব্যাকরণ পড়ায় অত্যধিক সময় ব্যয় করার পরে সেই সাহিত্য পড়িবারই অবসর অনেকের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিত না। আমাদের ইংরাজী পড়ার দৌরাত্ম্য প্রায় সেই ব্যাকরণ পড়ার দৌরাত্ম্যের মত হইয়াছে।

এই যে ১৪০০ পুস্তকের বিবরণ লঙ্ সাহেব দিয়াছেন তাহার মধ্যে এখন ১৪ খানি পাওয়াও দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। আমরা বড় বড় লাইব্রেরী স্থাপন করিতেছি, কিন্তু পুরাতন ছাপা বইগুলি আবর্জ্জনার মত ঝাঁটাইয়া ফেলিয়া দিতেছি। আশা করি এবার এই ক্যাটালোগের প্রকাশের পরে এই পুস্তকগুলির যতটা পারা যায় ততটা সংগ্রহ করিবার জন্য উদ্যমশীল যুবকেরা চেষ্টিত হইবেন। এখনও হয়ত কতকটা উদ্ধার করা যাইতে পারে, কিন্তু চার পাঁচ বৎসর পরে তাহা অসম্ভব হইবে। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রকাশিত পুস্তকের তালিকা পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু ১৮৫৫ হইতে ১৮৭৫ পর্য্যন্ত এই বিশ বৎসরে প্রকাশিত পুস্তকের কোন তালিকা নাই। আশা করি আমাদের সাহিত্যিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইবে। বাঙ্গালায় আবার শীঘ্রই নূতন করিয়া পরিভাষা গড়িতে হইবে। সেই সময়ে এই সকল পুস্তকের বিশেষ প্রয়োজন হইবে। বাঙ্গলার প্রাচীন সম্পত্তি ও সমৃদ্ধিকে আমরা চিরদিনই উপেক্ষা করিয়া স্বদেশী সঙ্গীত রচনা করিতেছি এবং দেশপ্রাণতার বড়াই করিতেছি। মূল কথা প্রকৃত স্বদেশ-প্রাণতা এখনও এ দেশে জন্মায় নাই। দুএকজন ক্ষণজন্মা চিত্তরঞ্জন ও সুভাষবসুকে বাদ দিলে অধিকাংশ স্বদেশ হিতৈষীদের প্রচেষ্টা একটা হজুক মাত্র। ইংরাজী ইতিহাসের একটা নকলবাজী করিয়া আমরা জগজ্জয়ী পরমকর্ম্মীদিগের কেবল [illegible] একটা অভিনয় করিতেছি মাত্র।

লঙ্ সাহেবের ক্যাটালোগ এখন অতীব দুষ্প্রাপ্য [illegible] টাকা দিলেও একখানি মিলিবে কিনা সন্দেহ। স্বতন্ত্র ছাপা হইলেও এরূপ সাধারণের অনধিগম্য দুষ্প্রাপ্য পুস্তকের মূল্য প্রতি খণ্ড চার, পাঁচ টাকার নীচে হইত না। আমরা এবার পুস্তকের মূল্য মাত্র ১৲ টাকা বাড়াইলাম। পূর্ব্ব সংস্করণের মূল্য পাঁচ টাকা ছিল, এবার ২০০ পৃষ্ঠা বাড়িয়া গেল। কিন্তু মূল্য মাত্র ৬৲ টাকা হইল।

লঙ্ সাহেবের ক্যাটালোগ ছাড়া আরো অনেক নূতন বিষয় এই সংস্করণের অন্তর্গত করা হইল। রামপ্রসাদ সম্বন্ধে সুদীর্ঘ সন্দর্ভ, রাম রাম বসুর নব তথ্যপূর্ণ জীবনী, এবং অপরাপর বহু বিষয় এবার

নূতন করিয়া লেখা হইয়াছে। বহু ভ্রম সংশোধিত হইয়াছে। মৈমনসিংহ গীতিকা সম্বন্ধে সুবিস্তৃত পরিশিষ্ট দেওয়া হইয়াছে। এক কথায় এই নব সংস্করণের নিকট চতুর্থ সংস্করণও একেবারে নিষ্প্রভ হইয়া গেল। বিগত সংস্করণের বহি এবার অচল হইল, কারণ বর্ত্তমান সংস্করণের জন্য আমাদিগকে অশেষ শ্রম স্বীকার ও অজস্র অর্থব্যয় করিতে হইয়াছে। এবার পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর প্রাচীন বঙ্গাক্ষরের একখানি প্রতিলিপি দেওয়া হইল। বলা বাহুল্য অনেক প্রাচীন পুঁথি ঘাঁটিয়া এই প্রতিলিপি প্রস্তুত করা হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন পুঁথিশালার কর্ম্মচারী শ্রীমান নিশিরঞ্জন দাশ এই বিষয়ে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন।

পুস্তকের প্রথমাংশ সংশোধনাদি কার্য্যে আমি শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ এবং শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয়দ্বয়ের নিকট বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি। এজন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

১৭ই ডিসেম্বর ১৯২৭
৭নং বিশ্বকোষ লেন, কলিকাতা

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

ষষ্ঠ সংস্করণের ভূমিকা

এবারও পুস্তকখানির অনেক পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের প্রতি লোকের দৃষ্টি ক্রমশ আকৃষ্ট হইতেছে, ফলে অনেক তত্ত্বের নব আবিষ্কার হইতেছে। বঙ্গসাহিত্যে প্রাচীন পল্লীগাথার আবিষ্কার একটি গুরুতর ঘটনা। বঙ্গে ভক্তি ও প্রেমধর্ম্মের আশ্চর্য্য বিকাশ ষোড়শ শতাব্দীকে চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছে; এই ধর্ম্ম হাওয়া হইতে উদ্ভূত হয় নাই,—নরনারীর কিরূপ দুশ্চর তপস্যা দ্বারা বঙ্গে জনসাধারণের মধ্যে চৈতন্যধর্ম্মের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা আমরা পল্লীগীতিকাগুলি হইতে জানিতে পারি। বাঙ্গালীর চিত্ত এরূপ কোমল কিরূপে হইল, কিরূপে বাঙ্গালীর দুটি চক্ষু এরূপ সজল নিত্যবর্ষণশীল "শাওণ ঘনে" পরিণত হইয়া কীর্ত্তনানন্দে এদেশকে মাতোয়ারা করিয়া তুলিল,—তাঁহার ভগবৎ প্রেমের তপস্যার বেদী কিভাবে প্রস্তুত হইল, এই পল্লীসাহিত্য হইতে তাহা জানা যায়। মহাপ্রভু সেই দুশ্চর তপস্যার ফল। এদেশে আর্য্যশাস্ত্রের অনাবিল শুদ্ধি ও তপঃ প্রভাব এবং বঙ্গীয় জনসাধারণের অপূর্ব্বপ্রেম একত্র মিশিয়া গঙ্গাযমুনা সঙ্গমের পবিত্রতা লাভ করিয়াছিল; পল্লীসাহিত্য পৃথিবী ছাড়িয়া স্বর্গ ছুঁইতে সচেষ্ট হইয়াছিল,—মহাপ্রভুর আবির্ভাবে—বাঙ্গলার মাটী প্রকৃতই স্বর্গে পরিণত হইয়াছিল। পল্লীসাহিত্য পাঠে দৃষ্ট হইবে, বাঙ্গালী কবিরা বৈষ্ণব কবিদের ভিতরকার উপাদান গড়িয়া দিয়াছিলেন—সেই উপাদানে চৈতন্যদেব তাঁহার ভক্তিধর্ম্মও প্রেমের বৈকুণ্ঠের ভিত্তি রচনা করিয়াছিলেন; এদেশ ভিন্ন অন্য কোন দেশের মনের সে উপাদান নাই। সুতরাং চৈতন্য ধর্ম্মের সুধাস্বাদ বাঙ্গলার বাহিরে শীঘ্র উপলব্ধি হইবে না।

আমি এই সংস্করণে পুস্তকখানি আমূল সংশোধন করিয়াছি। চণ্ডীদাস ও কৃষ্ণকমল সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা সন্নিবদ্ধ হইয়াছে, কবিকঙ্কনও চন্দ্রাবলী[illegible]ব্য হইতে অনেক নূতনতত্ত্ব সঙ্কলন করিয়াছি এবং অপরাপর অনেক বিষয়ে পুস্তকখানির [illegible]বর্ত্তন ও শ্রীবর্দ্ধন করিতে চেষ্টা পাইয়াছি। এক কথায় ৫ম সংস্করণে ও ষষ্ঠ সংস্কর[illegible]নেক প্রভেদ দাঁড়াইয়াছে।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতু[illegible] অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়ের পরিশিষ্ট (২৪১—২৫৯ পৃঃ)

সপ্তম অধ্যায়

শ্রীচৈতন্য-সাহিত্য বা নবদ্বীপে ১ম যুগ। (২৬০—৩৬৯ পৃষ্ঠা)

চরিতশাখা—(৩০৪—৩৪৯ পৃঃ)

সপ্তম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট—([illegible]—[illegible]৯ পৃঃ)

অষ্টম অধ্যায়

(২) অনুবাদ শাখা—(৪২২—৪৭৫ পৃঃ)।

অষ্টম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট—(৪৭৫—৪৮৩ পৃঃ)।

[illegible]বম অধ্যায়

কৃষ্ণীয়চন্দ্র যুগ অথবা নব[illegible]র দ্বিতীয় যুগ—(৪৮৪—৬২৪ পৃঃ)।

(১) নবদ্বীপ ও কৃষ্ণচন্দ্র—(৪৮৪—৪৮৮ পৃঃ)।

(২) সাহিত্যে নূতন আদর্শ—(৪৮৮—৪৯১)।

(৩) কাব্যশাখা—(৪৯১—৫৩০ পৃঃ)।

(৪) গীতি-শাখা—(৫৩০—[illegible])।

লিপি ও চিত্রসূচী



চৈতন্য-নিত্যানন্দ সংকীর্তন

(মুখপত্র)

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য

প্রথম অধ্যায়

বঙ্গভাষা ও বঙ্গলিপির উৎপত্তি

বঙ্গভাষা ও বঙ্গলিপি ১০০০ বৎসরেরও অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী।

বঙ্গভাষা ১ কোন্ সময়ে উৎপন্ন হইয়াছে তাহা বিশেষরূপে নির্দ্ধারণ করা সম্ভবপর নহে। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যেমন কোন ধর্ম্মবীর কি কর্ম্মবীরের আবির্ভাব-সময় সম্বন্ধে অঙ্কপাত দৃষ্ট হয়, পাঠকগণের মধ্যে হয় ত কেহ কেহ এই অধ্যায়-ভাগে সেইরূপ একটা খৃষ্টাব্দ কি শতাব্দের প্রত্যাশা করিতেছেন; কিন্তু ভাষার উৎপত্তিসম্বন্ধীয় প্রশ্নের তদ্রূপ সহজ উত্তর দেওয়া যায় না।

---

(১) শ্রীযুক্ত গ্রীয়ারসন্ সাহেব ভারতবর্ষের প্রচলিত ভাষাসমূহের (লোকসংখ্যা-সমেত) নিম্নলিখিত তালিকা দিয়াছেন;—

ক। উত্তর পশ্চিম ভারতীয় শ্রেণী।

সিন্ধী (২,৫৯০,০০০)

কাশ্মীরী (৪,০৯০,০০০)

পশ্চিম পাঞ্জাবী (২,০০০,০০০)

খ। মধ্য ভারতীয় শ্রেণী।

(অ) পশ্চিমাংশ।

পূর্ব্ব পাঞ্জাবী (১০,৭২০,০০০)

গুজরাতী (১১,০৬০,০০০)

রাজপুতী (১২,১৫০,০০০)

হিন্দী (৭৬,৮২০,০০০)



(আ) উত্তরাংশ।

মধ্যবর্ত্তী (পাহাড়ী ১,১৫০,০০০)

নেপালী (৩,০২০ ০০০)

গ। পূর্ব্বভারতীয় শ্রেণী।

(অ) পূর্ব্বমধ্য।

বৈশবারী (২০,০০০,০০০)

বিহারী (৩০,০০০,০০০)

(আ) দক্ষিণাংশ।

মহারাষ্ট্রী (১৮,২৩০,০০০)

(ই) পূর্ব্বাংশ।

বাঙ্গালা (৪১,৩৪০,০০০)

আসামী (১,৪৪০;০০০)

উড়িয়া (৯,০১০,০০০)

কোন কোন লেখক এই শ্রেণীর পাঠকবর্গের মনোরঞ্জনের জন্য বলিয়াছেন, '১০০০ বৎসর হইল, বঙ্গভাষা ও বঙ্গাক্ষরের সৃষ্টি হইয়াছে।' ললিতবিস্তরে দেখা যায়, বুদ্ধদেব বিশ্বামিত্র নামক অধ্যাপকের নিকট অঙ্গলিপি, বঙ্গলিপি, ব্রাহ্মী, সৌরাষ্ট্রী ও মাগধলিপি শিখিতেছেন। ইহা ত খৃষ্ট জন্মিবার পূর্ব্বের কথা। বিশ্বকোষের সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত ৯৩০ শকের হাতের লেখা একখানি কাশীখণ্ড আমরা দেখিয়াছি। উহার অক্ষর 'কুটিল' অক্ষরের লক্ষণাক্রান্ত প্রাচীন বঙ্গলিপি। সেনরাজগণের তাম্রশাসনগুলিতে ঐরূপ অক্ষরের ব্যবহার দৃষ্ট হয়; উহা ন্যূনাধিক ৮০০ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী। এই সকল লিপিমালার পূর্ণাবয়ব দেখিয়া তাহা যে বঙ্গাক্ষর উৎপত্তির অব্যবহিত পরেই উৎকীর্ণ হইয়াছিল, এরূপ অনুমান করা সঙ্গত হইবে না। আমরা পরে আলোচনা করিয়া দেখাইব, বঙ্গাক্ষরমালা ও তাহাদের আদি জননী ব্রাহ্মীলিপি বহু প্রাচীন। তাহাদের আদি খুঁজিতে যাইয়া ইতিহাসের অনধিগম্য গোমুখীর গহ্বর হইতে আমাদের ফিরিয়া আসিতে হইবে।

ভারতবর্ষীয় আর্য্যভাষাকথনশীল লোকের সংখ্যা সর্ব্বসমেত ২৯৯,৩২০,০০০।

—এসিয়াটিক্ সোসাইটির জারন্যাল্ নং ৪,১৮৯১।

ইহার ৩০ বৎসর পরের ১৯২১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট হইতে ভারতবর্ষের প্রচলিত আর্য্য ভাষা সমূহের নিম্নলিখিত তালিকা দিতেছি :—

পূর্ব্বভারতীয়—বাঙ্গলা ... ৪৯২৯৪০০০
উড়িয়া ... ১০১৪৪০০০
আসামী ... ১৭২৭০০০
বেহারী ... ৮০০০
মহাভারতীয়—প্রাচ্য হিন্দী ... ১৩৯৯০০০
পাশ্চাত্য হিন্দী ... ৯৬৭১৪০০০
রাজস্থানী ... ১২৬৮১০০০
গুজরাতী ... ৯৫৫১০০০
পাঞ্জাবী ... ১৬২৩২০০০
ভিলী ... ১৮৫৬০০০
উত্তর পশ্চিম ভারতীয়—পাশ্চাত্য পাঞ্জাবী ৫৬৫২০০০

সিন্ধী ৩৩৭১০০০
প... ভারতীয়— ইরাণী শাখা ১৯৮১০০০
...াখা— সিনা ২৮০০০
কাশ্মিরী ১২৬৮০০০
দক্ষিণভারতীয় মারহাটী ১৮৭৯৮০০০
পার্ব্বতীয় শাখা ১৯১৮০০০
জিপ্সি ভাষাসমূহ ১৫০০০

বাঙ্গলা-ভাষী পুরুষের সংখ্যা ২৫২৩৯০০০, স্ত্রীলোকের সংখ্যা ২৪০৫৫০০০।

ভারতবর্ষীয় আর্য্যভাষা কথনশীল লোকের সংখ্যা সর্ব্বসমেত ২৩২৭৩৯০০০।

ভারতবর্ষীয় অক্ষরমালার উৎপত্তি সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে কয়েকটি বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে। প্রিন্সেপ্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, ভারতবর্ষীয় অক্ষর গ্রীক্‌দিগের অক্ষর হইতে উদ্ভূত। সময়ের পৌর্ব্বাপর্য্য শাব্দিক সূত্রের বিচার করিলে, এই মত কোনরূপে সমর্থিত হইতে পারে না বলিয়া, অনেকেই উহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। স্যার্ উইলিয়ম্ জোন্স্ প্রভৃতি লেখকগণ অনুমান করেন, ভারতবর্ষীয় অক্ষর ফিনিসিয়ান্ অক্ষর হইতে গৃহীত। বিরুদ্ধবাদীরা বলেন, অশোকলিপিব সহিত ফিনিসিয়ান্ অক্ষরের বিশেষ কোন সাদৃশ্য নাই। টেলর্ প্রভৃতি কয়েক জন পণ্ডিত বলেন, ভারতবর্ষীয় লিপি সেবিয় (Sabian) লিপির অনুরূপ। কিন্তু এ পর্য্যন্ত শেষোক্ত লিপির যে সমস্ত নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, তাহার কোনটিই তাদৃশ প্রাচীন নহে; সুতরাং তাহা হইতে ভারতীয় লিপির উদ্ভব অঙ্গীকার করা যাইতে পারে না; মোক্ষমূলর প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এজন্য এই অনুমান অগ্রাহ্য করিয়াছেন। টেলর্ সাহেব স্বয়ং স্বীয় মতের সমর্থন করিতে অসমর্থ হইয়া কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন; তিনি বলেন, ভারতীয় লিপির আদি নিদর্শন হয় ত ওমান্, হাড্রাম, অর্মুয়া, সেবা কিংবা অন্য কোন অজ্ঞাত রাজ্য হইতে কালক্রমে আবিষ্কৃত হইতে পারে। টেলরের মতে দক্ষিণ সেমিটিক্ প্রদেশে ব্রাহ্মীলিপির জন্ম, কিন্তু ওয়েবার ও বুলারের মতে উত্তর সেমেটিক্ প্রদেশ হইতে উহা উদ্ভূত হইয়াছে, উক্ত প্রদেশান্তর্গত মোয়াবের রাজা মেশার প্রস্তরলিপি এবং সিঞ্জিরিলি ও এসেরিয়া রাজ্যের কতকগুলি উৎকীর্ণ লিপির সঙ্গে তাঁহারা ব্রাহ্মীলিপির বিশেষ সাদৃশ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। উত্তর সেমিটিক্ প্রদেশের এই লিপিমালা ৮৫০ খৃঃ পূর্ব্বে উৎকীর্ণ হইয়াছিল, পণ্ডিতগণের এই সিদ্ধান্ত। কানিংহাম এবং টমাস্ এই মতের বিরোধী, তাঁহারা বলেন, সেমিটিক্ বা ফিনিসিয়ালিপি দক্ষিণ হইতে বামে লিখিত হইয়া থাকে। অশোকলিপির অতি সামান্য অংশ [illegible] পদ্ধতিতে লিখিত। কিন্তু সমস্ত ভারতীয় লিপি বাম হইতে দক্ষিণ দিকে লিখিত হয়। [illegible]ও এই নিয়ম; সামান্য কয়েক স্থানে যদি অন্যরূপ রীতি অবলম্বিত হইয়া থাকে, তাহা সাধারণ নিয়মের বাদ। সুতরাং যে পর্য্যন্ত ইহা প্রমাণিত না হইবে, যে কোনও পূর্ব্বতন সময়ে ব্রাহ্মী বা অশোকলিপির দক্ষিণ হইতে বামে লিখিত হওয়ার রীতি বিদ্যমান ছিল, সে পর্য্যন্ত উহা সেমিটিক্ বা ফিনিসিয়লিপি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে এরূপ স্বীকার করা যাইবে না। এই মত বুলার কর্ত্তৃক সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়াছে। তিনি ব্রিটিশ-মিউজিয়মে রক্ষিত—ইরাণের একটি মুদ্রায় উৎকীর্ণ লিপি হইতে প্রমাণ করিয়াছেন যে ব্রাহ্মীলিপি পূর্ব্বে দক্ষিণ হইতে বামে লিখিত হইত। তিনি অশোকলিপির অনেকগুলি অক্ষর যে উল্টাভাবে লিখিত আছে—তাহা তাঁহার অনুশাসন হইতে দেখাইয়াছেন। পৃথক্ পৃথক্ অক্ষর ছাড়া ও

ভারতীয় অক্ষরসম্বন্ধে বিভিন্ন মত।

অশোক অনুশাসনের সংযুক্ত অক্ষরের অনেকগুলিই যে দক্ষিণ হইতে বামে গতির শেষ নিদর্শন তাহা তিনি প্রমাণ করিয়াছেন। সিংহলের অনেক ব্রাহ্মীলিপিতে এরূপ প্রাচীন ধারার নিদর্শন, বিদ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং এক সময়ে যে ব্রাহ্মীলিপি ভারতবর্ষে উল্টা দিকে লিখিত হইত, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে; টমাস্ ও কানিংহামের বিরুদ্ধযুক্তি পঙ্গু হইয়া পড়িল,—তাহা আর দাঁড়াইতে পারিতেছে না। আধুনিক য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের অধিকাংশই এখন বুলারের মতাবলম্বী, অর্থাৎ ভারতীয় লিপি উত্তর সেমিটিক দেশ হইতে আবির্ভূত হইয়াছে। কিন্তু এই মত ও যে সমিচীন নহে, তাহা আমরা পরে প্রতিপন্ন করিব।

অধ্যাপক ডসন্, টমাস্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণের মতে, ভারতবর্ষ স্বীয় অক্ষরমালার জন্য অন্য কোন দেশের নিকট ঋণী নহে। ডসন্ লিখিয়াছেন, "হিন্দুরা যে নিজেরাই স্বীয় অক্ষরের উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, তাহা অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ নাই। ভাষাতত্ত্বের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ে হিন্দুগণ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহারা ব্যাকরণের যেরূপ উৎকর্ষসাধন করিয়াছিলেন এবং কণ্ঠস্বরের যেরূপ সূক্ষ্ম বিভিন্নতার উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহাতে অক্ষরের উদ্ভাবন তাঁহাদের নিশ্চয়ই আবশ্যক হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত তাঁহারা অঙ্কশাস্ত্রে একটি উৎকৃষ্ট প্রণালীর উদ্ভাবন দ্বারা সংখ্যাবোধক-চিহ্ন-গঠনের যে প্রতিভা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা অনন্যসাধারণ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।" ক্যানিংহাম্ সাহেবও এই মতাবলম্বী। তিনি অনুমান করেন, হিন্দুদের অক্ষর মিসর-দেশীয় চিত্রাক্ষরের ন্যায় একই প্রণালীতে স্বাধীনভাবে উদ্ভূত হইয়াছে। তদনুসারে তিনি—

... (পালীর 'খ') ... খননের যন্ত্র (কোদাল) হইতে,
... (অন্তঃস্থ 'য') ... যব হইতে,
... ('দ') ... দন্ত হইতে,
... ('প') ... তল হইতে,
... ('ব') ... বীণা হইতে,
... ('ল') ... লাঙ্গল হইতে,
... ('হ') ... হস্ত হইতে,
... ('শ') ... শ্রবণেন্দ্রিয় হইতে,

এই ভাবে সমস্ত অক্ষরই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কিংবা দ্রব্যবিশেষ হইতে অনুকৃত হইয়াছে, এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। এই মতের ঐতিহাসিক মূল্য কি বলিতে পারি না, কিন্তু ইহাতে কিছু কবিত্ব আছে, সন্দেহ নাই।

যাঁহারা বলেন, ভারতীয় লিপিমালা বিদেশ হইতে আনীত, তাঁহাদের প্রধান যুক্তি এই যে, এতদ্দেশের প্রাচীনতম লিপি (অশোকলিপি) এত সুন্দর ও সুগঠিত (১) যে, উহা যদি দেশীয় সামগ্রী হইত, তবে যে প্রণালীতে ভারতীয় আদিম লিপি ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া অবশেষে সুশৃঙ্খল অশোক-লিপিতে পরিণত হইয়াছিল, তাহার কোন প্রকার নিদর্শন ভারতবর্ষের শৈলমালায় কিংবা কোন প্রাচীন প্রস্তরফলকে অবশ্যই রহিয়া যাইত; কারণ, আদিম লিপি পরিবর্ত্তিত হইয়া সুগঠিত অশোকলিপিতে পরিণত হইতে নিশ্চয়ই বহু শতাব্দীর প্রয়োজন হইয়াছিল। মিসর, চীন, জাপান প্রভৃতি যে যে স্থানে স্বাধীনভাবে অক্ষরের উদ্ভব হইয়াছিল, সেই সেই দেশে চিত্রাক্ষরের নানারূপ অসম্পূর্ণ গঠনের নিদর্শন প্রস্তারাদিতে সূচিত রহিয়াছে। সেই সকল দেশে দেখা যায়, আদিম অবস্থায় চিত্রাক্ষরগুলির সংখ্যা প্রয়োজন অপেক্ষা অনেক অধিক ছিল, উহাদের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়া ভাষাবিজ্ঞানের উপযোগী নির্দ্দিষ্ট কয়েকটি লিপিতে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু অশোকলিপির প্রারম্ভ হইতেই উহা স্বরবিজ্ঞানের অনুযায়ী নির্দ্দিষ্টসংখ্যক অক্ষরে সীমাবদ্ধ। এই পূর্ব্বোক্ত পরিণতিপ্রাপ্তির আরম্ভসূচক নিদর্শন ভারতবর্ষে নাই; এই কারণে কোন কোন পণ্ডিত অনুমান করেন, ভারতবাসিগণ বিদেশ হইতে লিপিমালা গ্রহণ পূর্ব্বক উহা শীঘ্র শীঘ্র তাঁহাদের বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গঠিত করিয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়াছিলেন। তাঁহারা আরও বলেন, অশোকলিপি নানা দূরবর্ত্তী প্রদেশে একই প্রকার দৃষ্ট হয়; প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষে লিপিমালার প্রচলন থাকিলে, অশোকের অনুশাসন ভিন্ন ভিন্ন দেশ-প্রচলিত লিপিভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপ অক্ষরে উৎকীর্ণ হইত।

ভারতীয় লিপির মৌলিকত্ব।

উক্ত যুক্তিগুলি সমীচীন বোধ হয় না। ভারতবর্ষের প্রাচীন কীর্ত্তিগুলি এখন লুপ্তপ্রায় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বারাণসী প্রভৃতি প্রাচীনতম স্থানে পুরাতন মন্দির প্রভৃতি নাই বলিলেও চলে। প্রাচীন কীর্ত্তির উপর এরূপ অশ্রুতপূর্ব্ব [illegible] সংসার কোন দেশে সংঘটিত হয় নাই। সহসা কোন

(১) "The elaborate and beautiful alph[illegible] emplayed in these records is unrivalled among the alphabets of the world for its scientifie excellence. Bold, simple, grand, complete —the charcters are easy to remember, facile to read, and diffcult to mistake, representing with absolute precision the graduated niceties of sound which the phonetic analysis of Sanskrit grammarians had discovered in that marvellous idiom. None of the artficial alphabets which have been proposed by modern phonologists excel it In delicacy, ingenuity. exactitude, and comprehensiveness."

Isaac Tarlors's *The Alphobet*, Vol. II, p. 289.

রাষ্ট্রবিপ্লবে বা অত্যাচারীর আক্রমণে যে সমস্ত গৌরব চিহ্ন নষ্ট হয়, তাহাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভবপর; অন্তত: সেরূপ আকস্মিক উৎপীড়নে দেশের সমস্ত কীর্ত্তি নষ্ট হইবার সম্ভাবনা ঘটে না। কিন্তু ভারতবর্ষ ক্রমাগত শত শত বৎসর ধরিয়া যে অত্যাচার সহ্য করিয়া আসিয়াছে, তাহাতে প্রাচীন কীর্ত্তির যে কিছু সামান্য নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই আশ্চর্য্যের বিষয় বলিতে হইবে। অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়েও হিউনসাঙ্ যে সকল বিগ্রহ ও মন্দিরের উল্লেখ করিয়াছেন তাহার কয়টি এখন বর্ত্তমান? কাশীর ১০০ ফিট উচ্চ ধাতুনির্ম্মিত শিববিগ্রহ এখন কোথায়? এখন আমাদের তীর্থগুলির প্রাচীনতার প্রমাণ শুধু কিম্বদন্তী ও প্রাচীন গ্রন্থাদি। ভারতের সর্ব্বত্র শত শত ভগ্ন বিগ্রহে অশ্রুতপূর্ব্ব নীরব অত্যাচারের কাহিনী অব্যক্ত ভাষায় লিখিত রহিয়াছে। এ অবস্থায় প্রাচীনগ্রন্থোক্ত প্রমাণ ভিন্ন অন্যরূপ প্রমাণ এদেশে স্বভাবতঃই বিরল হইবার কথা।

কিন্তু প্রমাণ বিরল হইলেও একেবারে দুষ্প্রাপ্য নহে। ভারতবর্ষের শৈলে ও গুহায় উৎকীর্ণ লিপি ও মন্দিরাদির এ পর্য্যন্ত অধিক অনুসন্ধান হয় নাই। পূর্ব্ববর্ত্তী প্রাচীন অক্ষরের অধিকতর নিদর্শন ভবিষ্যতে আবিষ্কৃত হইতে পারে। মহারাজ অশোক বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারে নিরত ছিলেন, সুতরাং দেশে দেশে উৎকীর্ণ অনুশাসনের প্রচার দ্বারা ধর্ম্মপ্রচারের উদ্দেশ্য সাধন করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে এ ভাবে ধর্ম্মপ্রচারের চেষ্টা এই সময়েই নূতন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী নৃপতিগণ এই ভাবের অনুশাসনপ্রচার আবশ্যক মনে করিয়াছিলেন, এরূপ বোধ হয় না। এ দেশে যুধিষ্ঠিরের পর অশোকের ন্যায় রাজচক্রবর্ত্তী আর কেহ জন্ম গ্রহণ করেন নাই। সেই অশোকেরই প্রস্তরানুশাসন ভিন্ন তদানীন্তন আর কোন লিপিচিহ্ন পাওয়া যাইতেছে না; এবং সেই চিহ্নগুলিও যে বহুসংখ্যক লুপ্ত গৌরবের মুষ্টিমেয় অবশেষ; তৎসম্বন্ধেও সন্দেহ নাই। কথিত আছে, মহারাজ প্রিয়দর্শী ৮৪,০০০ অনুশাসন প্রচারিত করিয়াছিলেন; বর্ত্তমান কালে তন্মধ্যে প্রায় ৪০ খানি পাওয়া গিয়াছে। সেই ৪০ খানির মধ্যেও যে [illegible] সূচিত হয় নাই, এ কথা বলা যায় না। দেখা যায়, এলাহাবাদের প্রস্তরানুশাসনে কতক [illegible] করিয়া ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ জাহাঙ্গীর তন্মধ্যে স্বীয় মহিমাজ্ঞাপক এক প্রস্তরলিপি সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। এমন অবস্থায় যদি তৎপূর্ব্ববর্ত্তী রাজাদের কোন মুদ্রিত নিদর্শন পাওয়া না যায়, তাহা হইলে ভারতীয় লিপির মৌলিকতায় সন্দিহান হইবার কারণ নাই। পাঞ্জাবে হারাপ্পা ও সিন্ধুদেশে মহেঞ্জো দারো নামক স্থানে কিছুকাল যাবৎ প্রাগৈতিহাসিক যুগের বহুবিধ নিদর্শন আবিষ্কৃত হইতেছে। এগুলি যে কত প্রাচীন, পণ্ডিতগণ এখনও তাহা নির্ণয় করিতে পারেন নাই, তবে ইহাদের তারিখ খ্রীষ্ট জন্মিবার ৪।৫ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে গিয়া পড়িবে, তাহা অনেকে অনুমান করিতেছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই সকল প্রাচীন দ্রব্যের মধ্যে কতগুলি 'তীরমুখ' চিত্রলিপিও পাওয়া যাইতেছে। যুরোপীয় প্রধান প্রধান প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ

অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহার পাঠোদ্ধার করিতে পারিতেছেন না। কালে এই লিপিমালার পাঠোদ্ধার হইলে ভারতীয় লিপিতত্ত্বের আর এক নূতন যুগ প্রবর্ত্তিত হইতে পারে। মগধপতি জরাসন্ধের রাজধানী গিরিব্রজে 'জরাসন্ধ-কা-বৈঠকে'র নিকটবর্ত্তী পথের উপর এক লিপি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বলেন যে, 'ঐ লিপি মগধরাজ জরাসন্ধের সমসাময়িক হইতে পারে; উহা চিত্রলিপি ও কীলরূপা শিল্পলিপির মধ্যবর্ত্তী আকারের, অথচ তদপেক্ষা কোন প্রাচীনতম লিপি।' (আধুনিক কোন প্রত্নতাত্ত্বিকই এই মত গ্রহণ করেন নাই।) বস্তী জেলায় প্রাচীন কপিলাবস্তুর অতি সান্নিধ্যে পিপারাও গ্রামে মিঃ পেপী একটী স্তূপ হইতে বুদ্ধদেবের দেহাবশেষবিশিষ্ট উৎকীর্ণ বিবরণযুক্ত প্রস্তরপাত্রের আবিষ্কার করিয়াছেন। বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত উক্ত উপহার মহা সমারোহের সহিত শ্যামাধিপতি স্বীয় রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইহার তারিখ মৌর্য্যযুগেই নির্দ্দেশ করিতে হইবে। সাচীর স্তূপ হইতে বুদ্ধদেবের দুই শিষ্য সারিপুত্র ও মহামৌদ্‌গল্যায়নের দেহাবশেষ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে; তাহার সহিত উৎকীর্ণ-লিপি পাত্রেরও উদ্ধার হইয়াছে। প্রত্নতাত্ত্বিকগণের মতে এই লিপি বুদ্ধ-নির্ব্বাণের একশত বৎসরের মধ্যে উৎকীর্ণ হইয়াছিল।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে অশোক-অনুশাসনে দুই প্রকার অক্ষর দৃষ্ট হয়; সাহবাজগরহি ও মান্সেরা অনুশাসনে খরোষ্ঠীলিপি ব্যবহৃত হইয়াছে; উহার গতি দক্ষিণ দিক্ হইতে বাম দিকে। অপর সমস্ত দেশীয় অনুশাসনে অশোকের রাজসভার অক্ষরই প্রাধান্যলাভ করিয়াছে। রাজশিল্পিগণ কর্ত্তৃক খোদিত অক্ষরে রাজধানীর গৌরবরক্ষা কিছু অস্বাভাবিক হয় নাই; কেবল লোকের বোধ-সৌকর্য্যার্থ অনুশাসনের ভাষা দেশভেদে কিছু ভিন্ন করা হইয়াছে। অশোকের ন্যায় প্রতাপান্বিত রাজা রাজকার্য্যের সৌকর্য্যার্থ স্বীয় প্রদেশের অক্ষর যে অধীনস্থ জনপদসমূহে প্রচলিত করিবেন, ইহাও বৈচিত্র নহে। নানারূপ প্রাদেশিক অক্ষর বর্ত্তমান থাকিলেও দেবনাগর এক সময়ে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল। অতএব অশোকের অনুশাসনে নানাস্থানে একরূপ লিপি ব্যবহৃত হইয়াছিল দেখিয়া সেই সেই দেশে অন্য লিপি [illegible], এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না।

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে ও বিদেশীয় ভ্রমণকারী[illegible]গের ভ্রমণবৃত্তান্তে ভারতবর্ষীয় লিপির মৌলিকত্ব বিশেষরূপে প্রমাণিত হইতেছে। মেগাস্থিনিস ভারতবর্ষে জন্মপত্রিকা লিখিবার পদ্ধতি ও দূরত্বসূচক ক্রোশাঙ্কযুক্ত প্রস্তরখণ্ডের উল্লেখ করিয়াছেন। আলেকসন্দারের সেনাপতি নিয়ার্কস্ লিখিয়া গিয়াছেন, ভারতবর্ষের লোকেরা তুলা দিয়া এক প্রকার কাগজ প্রস্তুত করিয়া থাকে। ললিতবিস্তরে ভারতীয় নানা লিপিমালার বিষয় উল্লিখিত আছে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। পাণিনি ব্যাকরণের অষ্টমাধ্যায়ে 'লিপি', 'গ্রন্থ', প্রভৃতি শব্দ পাওয়া যায়, এবং 'যবনানী' শব্দের উল্লেখ থাকায় স্বতন্ত্র আর্য্যলিপির সত্তাই প্রমাণিত হইতেছে। ব্রাহ্মণগ্রন্থে 'কাণ্ড', 'পটল' (যাহাদের অর্থ পুস্তকাধ্যায়)

শব্দ পাওয়া যাইতেছে। মহাভারত ও মনুসংহিতায় এ দেশে লিপি প্রচলিত থাকার নানারূপ প্রমাণ রহিয়াছে। শতপথব্রাহ্মণ গ্রন্থে বেদের ১০,৮০০ পংক্তি বোঝাবহ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, এবং যজুর্ব্বেদে পরার্দ্ধ সংখ্যা পর্য্যন্ত গণনা পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে, অথর্ব্ববেদে, ছান্দোগ্য বৃহৎ আরণ্যকেও উপনিষৎ প্রভৃতি ভারতীয় প্রাচীনতম গ্রন্থাবলীতে "অক্ষর" শব্দ বর্ণমালার অক্ষর অর্থে ব্যবহৃত দৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদে ½ বুঝাইতে অর্দ্ধ ¼ বুঝাইতে পদ, ¾ বুঝাইতে ত্রিপাদ, ⅛ বুঝাইতে শফ এবং ১/১৬ বুঝাইতে কলা শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। উক্ত বেদে (৬,৬৯,৮) ইন্দ্র এবং বিষ্ণু একস্থলে সমবেত চেষ্টায় ১০০ সংখ্যাকে তিন ভাগে বিভক্ত করিতেছেন। ঋগ্বেদের এক মন্ত্রে অষ্টকর্ণী গাভীর উল্লেখ আছে, সম্ভবতঃ মালিকত্ব বুঝাইবার জন্য গরুর কাণে সংখ্যাবাচক চিহ্ন মুদ্রিত করিবার রীতি প্রচলিত ছিল। শতপথব্রাহ্মণে দিবসকে ১৫ মুহূর্ত্তে, প্রত্যেক মুহূর্ত্তকে ১৫ ক্ষিপ্রে, প্রত্যেক ক্ষিপ্রকে ১৫ এতর্হিতে এবং প্রত্যেক এতর্হিকে ১৫ ইদানিতে, এবং প্রত্যেক ইদানিকে ১৫ প্রাণে বিভাগ করা হইয়াছে। সুতরাং এই ভাবে দিবসকাল ৭৫৯,৩৭৫ ভাগে বিভক্ত দৃষ্ট হয়। লেখার পদ্ধতি না থাকিলে এরূপ জটিল গণনা সম্ভব হইত না। কবিতাই কণ্ঠস্থ করিয়া শিক্ষালাভ করা কটা স্বাভাবিক, কিন্তু বৈদিক গ্রন্থগুলিতে গদ্যরচনারও অভাব নাই। আমরা এই সকল কারণে আর্য্যলিপির মৌলিকতা সম্বন্ধে কোন ক্রমেই সন্দেহ করিতে পারি না। ভারতীয় লিপির মৌলিকতার প্রধান বিরোধী মোক্ষমূলর ১৮৯৯ খৃঃ নবেম্বর মাসের 'নাইনটিন্থ সেঞ্চুরী' নামক পত্রিকায় স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, ক্রোশাঙ্ক-চিহ্ন প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষর হিন্দুগণ নিজেরাই উদ্ভাবিত করিয়াছিলেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে; অথচ তাঁহারা সমস্ত অক্ষরমালার উদ্ভাবন করেন নাই। এ যুক্তি বড়ই অদ্ভুত বোধ হয়।

ঋগ্বেদ অন্ততঃ খৃঃ পূঃ ২০০০ বৎসরের প্রাচীন। এই সময়নির্দ্দেশ খুব ঠিক নহে। বেদ বহু প্রাচীন, কিন্তু আমরা যথাসম্ভব অল্প করিয়া ধরিলাম; কোন [illegible]ক লিপি এত প্রাচীন নহে। যাঁহারা লিপির আদিভূমি বলিয়া ইজিপ্টকে বরণ করিয়া [illegible], তাঁহাদের যুক্তিতর্কও এখন টিকিবে না। সম্প্রতি মিঃ যাজদানি নিজামরাজ্যের অন্তর্গত রায়গড় হইতে কতকগুলি মৃত্তিকাপাত্র আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাদের গাত্রে অক্ষর-চিহ্ন বিদ্যমান। মিঃ ব্রুস্ ফুট মান্দ্রাজ মিউজিয়াম হইতে সেইরূপ চিহ্নযুক্ত আরও কতকগুলি পাত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। সে সমস্ত পাত্র মহীসুর এবং ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের নানা স্থান হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। এই সমস্ত পাত্রে ১৩১টি চিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে। মিঃ যাজদানি নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করিয়াছেন যে সেগুলি অক্ষর, এবং শুধু মালিকত্ব বুঝাইবার চিহ্ন নহে। শুধু তাহাই নহে, তাহাদের মধ্যে ব্রাহ্মীলিপির মত কতকগুলি অক্ষর আছে। এই পাত্রগুলির মধ্যে কতকগুলি নেওলিথিক যুগের, তাহা খৃঃ পূঃ ১৫০০ বৎসরের পরবর্ত্তীকালের নহে,

অ ই উ এ ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ

ঞ ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প

ফ ব ভ ম য র ল ব শ ষ স হ

অশোকের সময় (২৫০ খৃঃ পূঃ) হইতে বঙ্গীয় বর্ণমালার ক্রমবিকাশ।—৩ পৃঃ

অ আ ই

এ ও ঔ

উ

সকল

ক খ গ ঘ ঙ

চ ছ জ ঞ

ট ঠ ড ঢ ণ

ত থ দ ধ ন

প ফ ব ভ ম

য র ল ব

শ ষ স হ ক্ষ

সেন কুলকমল বিকাস ভাস্কর সোমবংশ।

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ বিশ্বরূপ সেনের তাম্রফলক হইতে গৃহীত বঙ্গীয় অক্ষর প্রতিলিপি।—

অপরগুলি নিওলিথিক্ যুগের—তাহাদের বয়ঃক্রম অন্যূন ৩০০০ খৃঃ পূঃ। আসাম হইতেও এইরূপ প্রাচীন অক্ষরমালার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, এসম্বন্ধে অধ্যাপক ডি, আর ভাণ্ডারকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ভারতীয় ইতিহাস-সংক্রান্ত তৃতীয় বক্তৃতায় আলোচনা করিয়াছেন। এই বক্তৃতাটি প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, ফিনিসিয়া ও আবর উপকূলে ভারতীয় লিপির আদি খুঁজিবার চেষ্টার পূর্ব্বে আমাদের দেশের ভূপ্রোথিত ঐতিহাসিক খণি খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। ইজিপ্ট অতি প্রাচীন দেশ, কিন্তু ভারতীয় সভ্যতা কত প্রাচীন তাহার শেষ মীমাংসা হইতে এখনও বাকী আছে, ইহা নিশ্চিত। যে অক্ষর আজ আমরা অবহেলায় লিখিয়া যাইতেছি তাহা ঐতিহাসিক যুগের নহে; তাহা ইতিহাস-পূর্ব্ব যুগের, তাহা কোন্ বৃক্ষবল্কলে বা প্রস্তরে বা শিলায় প্রথম উৎকীর্ণ হইয়াছিল কে বলিবে? মানুষের স্মৃতিশক্তি যেখানে পরাজয় পাইয়াছে বা পরাজয়ের আশঙ্কা করিয়াছে, সেখানে স্মারক সংকেতের প্রয়োজন হইয়াছে। অথবা চিহ্নদ্বারা প্রিয়জনকে কোন সন্ধান দিতে চাহিয়া কে কবে কোথায় কি ভাবে তাহা উৎকীর্ণ করিয়াছিল তাহা জানিবার উপায় কি? তাহা খৃষ্টের বহুপূর্ব্বে, বৌদ্ধজাতক এবং জরোস্থাস্ট্রর বহুপূর্ব্বে,এবং লুপ্ত কাহিনীর পরিষ্কার ইতিহাস কোথাও নাই; অনুমান এখন এমন জায়গায় দাঁড়াইয়াছে যে ভারতীয় লিপির মৌলিকত্বের দাবী আমরা এক কথায় ছাড়িয়া দিতে পারি না।

আর্য্যবর্ত্তবাসীদিগের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন অক্ষর ব্রাহ্মীলিপি নামে অভিহিত। ইহার প্রাচীনতম নিদর্শন অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। অশোকের অনুশাসনে যে অক্ষর দৃষ্ট হয়, তাহা ব্রাহ্মী লিপির এক বিশেষ পরিণত অবস্থা সূচিত করিতেছে। সুতরাং মৌর্য্য-যুগের বহু পূর্ব্বে যে এই লিপির প্রচলন ছিল, তৎসম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে না। কেবল অশোক-অনুশাসন হইতেই স্থানভেদে মৌর্য্যাক্ষরের ৩।৪টি বিভিন্ন শাখার পরিচয় পাওয়া যায়, ইহা হইতে সহজেই অনুমেয় যে অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে লিপিগত বৈচিত্র্য ও স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হইত। মৌর্য্যযুগের পরে কুশানযুগে ভারতীয় লিপির অনেক পরিবর্ত্তন হয়। লিপিকার্য্যের বিকাশের ইতিহাসে গুপ্তযুগের প্রভাব সামান্য নহে; গুপ্তরাজগণের প্রাদুর্ভাবকালে খৃষ্টীয় ৪র্থ ও ৫ম শতাব্দীতে দক্ষিণ, পশ্চিম ও পূর্ব্ব ভারতে তিনটি বিভিন্ন লিপিভাগের প্রচলন ছিল। এতদ্ব্যতীত মধ্য এশিয়া হইতেও গুপ্তলিপির এক স্বতন্ত্র ধারার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। এই প্রসঙ্গে কাশগড় হইতে আবিষ্কৃত সুপ্রসিদ্ধ বাওয়ার পুঁথির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গুপ্তযুগে উত্তর ভারতের পূর্ব্বাংশে যে লিপি ব্যবহৃত হইত, কালক্রমে তাহা নানাভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমান বঙ্গাক্ষরের রূপ ধারণ করিয়াছে। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষ হইতে পূর্ব্বদেশীয় লিপির প্রভাব ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইতে থাকে—ইহার প্রমাণ সমসাময়িক বহু

লিপিমালার পরিবর্ত্তন; প্রাচীন বঙ্গলিপি।

অনুশাসন হইতে পাওয়া গিয়াছে কিন্তু বাঙ্গলায় ইহার পূর্ণ পরিণতি লাভ হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যাল হইতে প্রকাশিত বঙ্গলিপির উৎপত্তি সম্বন্ধীয় পুস্তকে শ্রীযুক্ত রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। কয়েক শতাব্দীর মধ্যে পূর্ব্বাক্ষরও দুইটি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া যায়,—প্রতীচ্য ও প্রাচ্য। প্রতীচ্য অক্ষর ক্রমশঃ নাগরীর সহিত মিশিয়া বিবিধ প্রাদেশিক লিপির সৃষ্টি করিল, প্রাচ্য অক্ষর নাগরীর প্রভাব হইতে অনেকটা মুক্ত থাকিয়া নিজ স্বাতন্ত্র্য অব্যাহত রাখিতে পারিয়াছিল। ইহার ঐতিহাসিক ধারা বঙ্গলিপির ক্রমবিকাশের স্তরে স্তরে পরিস্ফুট রহিয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক বুহ্লর সাহেবের মতে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে পূর্ব্ব-ভারতীয় নাগরী লিপি হইতে ক্রমশঃ বঙ্গাক্ষরের সৃষ্টি হয়, কিন্তু রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই মত খণ্ডন করিতে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। বঙ্গাক্ষরের প্রাচীনতম রূপ খুঁজিতে গিয়া প্রথমেই এলাহবাদ স্তম্ভে উৎকীর্ণ হরিষেণ রচিত সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্তের প্রশস্তির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। গুপ্তযুগের প্রথমভাগে প্রাচ্য অক্ষরের কিরূপ অবস্থা ছিল তাঁহার পরিচয় এই লিপিতে পাওয়া যায়। পণ্ডিতদিগের মতে গুপ্তকালের ইহাই প্রাচীনতম অনুশাসন। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে এই প্রাচ্য অক্ষর হইতেই আমাদের বঙ্গ-লিপির উৎপত্তি। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পর্ব্বতগাত্রে মহারাজ চন্দ্রবর্ম্মার একখানি শিলালিপির আবিষ্কার করিয়াছেন। এলাহবাদ প্রশস্তিতে সমুদ্রগুপ্ত বিজিত আর্য্যাবর্ত্তের রাজাদিগের মধ্যে চন্দ্রবর্ম্মা নামধেয় এক নৃপতির নাম পাওয়া যায়। এই চন্দ্রবর্ম্মা ও শুশুনিয়া শিলালিপির মহারাজ চন্দ্রবর্ম্মা যদি একই ব্যক্তি হইয়া থাকেন, তবে শেষোক্ত শিলালিপি নিশ্চয়ই খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর কোন সময়ে খোদিত হইয়াছিল। (১) সম্ভবতঃ ইহা হরিষেণ প্রশস্তি হইতেও প্রাচীন। বাঙ্গালায় এতদপেক্ষা প্রাচীন লিপি অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। রাজসাহী জেলার অন্তর্গত ধানাইদহ ও দিনাজপুর জেলাস্থ দামোদরপুর গ্রাম হইতে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পুত্র মহারাজাধিরাজ প্রথম কুমারগুপ্তের কয়েকখানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। এই লিপিগুলি হইতে গুপ্তরাজগণের সময়ের বঙ্গদেশে ব্যবহৃত প্রাচ্য অক্ষরের নমুনা দৃষ্ট হয়। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মগধের রাজা আদিত্যসেনের সাহপুর ও আফসড় অনুশাসন হইতে আরম্ভ করিয়া পালরাজগণের লেখমালায় এই প্রাচ্যলিপির ক্রমোন্নতির ইতিহাস খোদিত আছে। কাশীখণ্ড পুঁথির বিষয় পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, উহা ১০০৮ খৃষ্টাব্দে লেখা। তৎপরবর্ত্তি যুগে বঙ্গীয় লিপির ইতিহাস আলোচনা করিতে হইলে, সেনরাজগণের তাম্রশাসন, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত কয়েকটি প্রাচীন পুঁথি, অশোকচল্লের গয়া-অনুশাসন, ১৪৩৫ খৃষ্টাব্দে

(১) সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০৩ সাল, ৬৬৯ পৃষ্ঠা।

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর প্রাচীন বঙ্গাক্ষর

—১০ পৃঃ

লিখিত নেপাল হইতে প্রাপ্ত বোধিচর্য্যাবতারের পুঁথি এবং বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থশালায় রক্ষিত চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনের উপরই আমাদের প্রধানতঃ নির্ভর করিতে হইবে। কেম্ব্রিজ নগরে যে পুঁথিগুলি রক্ষিত হইয়াছে, সে গুলি ১১৯৮—১২০০ খৃষ্টাব্দের বঙ্গাক্ষরে লিখিত। শ্রীগয়াকর নামক এক ব্যক্তি বৌদ্ধতন্ত্র সম্বন্ধীয় এই পুঁথি তিনটি নকল করিয়াছিলেন, ইহাদের একখানিতে মগধের পালবংশের শেষ রাজা গোবিন্দপালদেবের রাজ্যবিনাশের প্রসঙ্গ আছে, এই পুঁথিখানি নেপাল হইতে সংগৃহীত। সংস্কৃত কলেজের লাইব্রেরীতে কতকগুলি বাঙ্গালা হস্তলিখিত পুঁথি আছে; সেগুলিও বঙ্গে মুসলমান রাজত্বের প্রথম শতাব্দীতে লিখিত। খৃষ্টীয় দ্বাদশ কি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ লক্ষ্মণসেনের পুত্র বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসনের অনেক স্থলে ঠিক আধুনিক বাঙ্গালা লিপির মত অক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে, এবং অপরাপর স্থলের লিপিও বঙ্গাক্ষরেরই অপেক্ষাকৃত প্রাচীন রূপ। উৎকলরাজ দ্বিতীয় নৃসিংহ দেবের (১২৯৫ খৃষ্টাব্দে) প্রদত্ত যে তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে, তাহার অক্ষরের সহিত প্রাচীন বঙ্গাক্ষরের বিশেষ কোন প্রভেদ নাই।

১১৭০ (৫১ লসং৩) খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ অশোকচল্ল মহারাজের শিলালিপি (বুদ্ধগয়ায় প্রাপ্ত) এবং চট্টগ্রাম হইতে প্রাপ্ত ১২৪৩ খৃষ্টাব্দে দামোদর রাজার প্রদত্ত তাম্রশাসনে আমাদের চিরপরিচিত বঙ্গাক্ষরের-প্রতীক [illegible] বিদ্যমান। প্রাচীন লিপিমালার প্রতিরূপ এই অধ্যায় শেষে সন্নিবিষ্ট হইল।

গুপ্তবংশের অবনতির পর 'গুপ্তলিপির' প্রতীচ্য শাখা হইতে কাশ্মীর ও পাঞ্জাবের উত্তর পার্শ্বে 'সারদা,' অক্ষরের উদ্ভব হইল। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষে 'সারদা' ব্যবহৃত হইতে লাগিল। 'সারদা' অক্ষর হইতে বর্ত্তমান 'কাশ্মীরী,' 'গুরুমুখী' ও 'সিন্ধী' অক্ষরের উৎপত্তি। বর্ত্তমান সময়েও কাঙ্গরা ও তন্নিকটবর্ত্তী উপত্যকার অধিবাসীরা যে অক্ষর ব্যবহার করিয়া থাকে, গুপ্তলিপির সহিত তাহার অনেকটা সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। এই যুগে প্রচলিত মধ্যভারতীয় লিপি হইতে কালক্রমে বর্ত্তমান নাগরী এবং দক্ষিণ পাঞ্জাব ও রাজপুতানার অক্ষর উদ্ভূত হয়। মধ্যযুগে আর্য্যাবর্ত্তের কোন কোন স্থানে যে শ্রেণীর প্রাচ্য অক্ষর প্রচলিত ছিল, প্রিন্সেপ, ফ্লিট প্রভৃতি বিশেষজ্ঞগণ তাহাকে 'কুটিল' আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু কিলহর্ণ সাহেব এই নামের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি স্বীকার করেন নাই। উড়িয়া লিপি ও বঙ্গীয় লিপি অনেকটা একই প্রকারের। প্রভেদ এই যে, উড়িয়া অক্ষর গুলির মাত্রা গোলাকার। উৎকলবাসিগণ তালপত্রের উপর 'খুন্তি নামক লৌহ-সূচী দ্বারা লিখিতেন; সূক্ষ্মাগ্র খুন্তির দ্বারা অক্ষরের শিরোভাগে সরল রেখার ন্যায় মাত্রা টানিতে গেলে, তালপত্র ছিন্ন হইয়া যাইত, এই জন্য তাঁহারা গোলাকৃতি মাত্রা লিখিতে আরম্ভ করিলেন। বাঙ্গালা দেশে কঞ্চির কলমের অগ্রভাগ তির্য্যকভাবে কাটা হইত; এইরূপ লেখনী দ্বারা প্রাচীন বর্ণমালার বৃত্তাকার অক্ষরগুলি অঙ্কিত করা সুকঠিন; কলমের টানে অক্ষরের কোণগুলি পরিষ্কাররূপে ফুটিয়া

উঠে, এবং অতি সহজে ও অনায়াসে সরল রেখার মাত্রা টানা যায়; বলা বাহুল্য, কুটিলাক্ষরের শ্রেণীভুক্ত বঙ্গলিপির ইহাই বিশেষত্ব।

আসামী অক্ষর বঙ্গাক্ষরেরই প্রকারভেদমাত্র ইহাতে কয়েকটি অপ্রচলিত পুরাতন বাঙ্গালা ও মৈথিল অক্ষর রহিয়াছে। প্রাচীন মৈথিল ও প্রাচীন বঙ্গাক্ষরের প্রভেদ অতি সামান্য ছিল। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে লিখিত বাঙ্গালা ও মৈথিল পুঁথির হস্তাক্ষর দেখিয়া, সকলে উভয়ের পার্থক্য নির্ণয় করিতে পারিবেন না। বর্ত্তমান মৈথিল অক্ষর বাঙ্গালা ও দেবনাগরীর মধ্যবর্ত্তী। নেপালীদিগের অক্ষরে এখনও প্রাচীন মৈথিল অক্ষরের ছাঁদ অনেকটা বিদ্যমান। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর নেপালী অক্ষরের সহিত সমসাময়িক বঙ্গাক্ষরের বিশেষ সাদৃশ্য বর্ত্তমান।

বঙ্গদেশ হইতে বৌদ্ধ প্রচারকগণ এসিয়ার নানা স্থানে ধর্ম্মপ্রচারের জন্য পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। এখনও জাপানের বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থসকল দশম কিংবা একাদশ শতাব্দীতে প্রচলিত বঙ্গাক্ষরের লিখিত হইয়া থাকে; এই অক্ষর তদ্দেশবাসী পুরোহিতগণের নিকট অতি পবিত্র। জাপানের হুরিযুজি মন্দিরে "উষ্ণীষ-বিজয়ধারিণী" নামক একখানি প্রাচীন গ্রন্থ রক্ষিত আছে। উহা সেই মন্দিরের পুরোহিতগণ পূজা করিয়া থাকেন। এই পুস্তকখানি খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রচলিত মগধাক্ষরে লিখিত, তাহা সেই সময়ের বঙ্গাক্ষর হইতে ভিন্ন নহে। ইহার একখানি প্রতিলিপি অক্সফোর্ড-য়ুনিভার্সিটি সংগ্রহ করিয়া অনেক্‌ডোটা অক্সিনিয়েন্‌সিস্ (Anecdota Oxiniensis) গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে প্রকাশিত করিয়াছেন। অকালে পরলোকগত জাপানী যুবক এস, টি হোরি আমাকে জাপানী পুরোহিতগণের লিখিত অক্ষরের নমুনা দেখাইয়াছিলেন, তাহা একাদশ শতাব্দীর বঙ্গাক্ষরের অনুরূপ।

বঙ্গাক্ষর যেরূপ বহু শতাব্দী ব্যাপিয়া ক্রমে ক্রমে পরিপুষ্টি লাভ করিয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে, বঙ্গভাষাও সেইরূপ সুদীর্ঘকাল হইতে নানারূপ পরিবর্ত্তন ও বিবিধ দেশজ ভাষার মিশ্রণজনিত রূপান্তর গ্রহণ করিয়া বর্ত্তমান আকারে পরিণত হইয়াছে। আর্য্যগণ যে সময়ে এ দেশে প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই সময় হইতেই এই পরিবর্ত্তনের সূচনা; ক্রমশঃ বঙ্গবাসী আর্য্যগণের কথিত গৌড়ীয় ভাষা (১) অন্যান্য ভাষা হইতে পৃথক্ হইয়া দেশজ্ঞাপক স্বতন্ত্র আখ্যা গ্রহণ করিল। কিন্তু কোন্ সময়ে বঙ্গভাষার উৎপত্তি, কে বলিবে? আদি দেখিবার ঔৎসুক্য আমাদের নাই; প্রকৃতিও সৃষ্টির প্রথম কাহিনী যবনিকার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছেন, আদি বৃত্তান্তের চির রহস্যভেদে বিজ্ঞান অসমর্থ। মনুষ্য

আর্য্যভাষায় পরিবর্ত্তন।

(১) হরন্‌লি সাহেব নিম্নলিখিত ভাষাগুলিকে "গৌড়ীয় ভাষা", এই সাধারণ সংজ্ঞা দিয়াছেন:—উড়িয়া, বাঙ্গালা, হিন্দী, নেপালী, মহারাষ্ট্রী, গুজরাতী, সিন্ধী, পঞ্জাবী ও কাশ্মীরী। আমরাও এই সংজ্ঞাই ব্যবহার করিব।

জাতি যত প্রাচীন, ভাষাও তত প্রাচীন। মনুষ্যভাষার সে সর্ব্বপ্রাচীন অমর নিদর্শন রহিয়াছে, বঙ্গভাষার আদি রূপ অন্বেষণ করিতে গেলে, সেই বেদকেই অবলম্বন করিতে হইবে। যদি ললিত বিস্তরের প্রমাণ গণ্য করা যায়, তবে ২২০০ বৎসর পূর্ব্বেও বঙ্গাক্ষর প্রচলিত ছিল। তখনও নাগরী অক্ষরের উৎপত্তি হয় নাই অথবা কোনও লিপি নাগরী নামাঙ্কিত হয় নাই। (১)

আর্য্যজাতির প্রথম ভাষা বেদ, তাহার পর রামায়ণাদির সংস্কৃত এবং বৌদ্ধদিগের পালি ও গাথা প্রভৃতি প্রাকৃত; তৃতীয় স্তরে, বাঙ্গালা, হিন্দী প্রভৃতি গৌড়ীয় ভাষাসমূহ। এস্থলে শুধু লিখিত ভাষার কথাই বলা হইতেছে। বঙ্গভাষার উৎপত্তিকালের নির্দ্দেশ সুসাধ্য নহে; আমরা ইহার লিখিত ভাষার পরিণতির কাল নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব। ভাষার আদি নির্ণয় করিবার ভার কল্পনাশীল কবি ও দার্শনিকদিগের হস্তে অর্পণ করিয়া, ঐতিহাসিকগণ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন।

লিখিত ও কথিত ভাষা।

বোধ হয়, যে ভাষায় আদিম হিন্দুগণ কথা কহিতেন, বেদ ঠিক সেইরূপ ভাষাই ব্যবহৃত হইয়াছিল। কিন্তু তৎপরে ভাষার শ্রীবৃদ্ধিসাধনের চেষ্টা ও ব্যাকরণের সূত্রপাত হইতে কথিত ও লিখিত ভাষা স্বতন্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই, রামায়ণের ভাষা ঠিক কথিত ভাষা বলিয়া স্বীকার করা যায় না। যখন কালিদাস 'বালেন্দুবক্র পলাশ-পর্ণে'র বর্ণনা করিতেছিলেন, অথবা জয়দেব 'মদন-মহীপতি'র কনক-দণ্ড-রুচি কেশবকুসুমে'র কথা লিখিতেছিলেন, তখন তাঁহারা সে ভাষায় কথা কহেন নাই। এখনও বঙ্গের কত কবি মুখে 'বিদ্যুৎ' কি 'মেঘের ডাক' বলিয়া লেখনী দ্বারা 'ইরম্মদ' বা 'জীমূতমন্দ্রে'র সৃষ্টি করিতেছেন। তাই বলিতেছিলাম, লিখিত ও কথিত ভাষার মধ্যে একটা প্রভেদ আছে এবং চিরদিনই থাকিবে।

লিখিত ভাষা ও কথিত ভাষার মধ্যে একটা ব্যবধান বর্ত্তমান, কিন্তু সে ব্যবধানের একটা সীমা আছে, তাহা অতিক্রম করিলে লিখিত ভাষা মৃত হইয়া পড়ে ও তৎস্থলে কথিত ভাষা একটু বিশুদ্ধ হইয়া লিখিত ভাষার পরিণত হয়। লিখিত ভাষা উত্তরোত্তর উন্নত হইয়া শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়। ক্রমশঃ বাক্যপল্লবের প্রতি স্পৃহা ও শব্দের শ্রীবৃদ্ধি চেষ্টার ফলে লিখিত ভাষা জনসাধারণের অনধিগম্য হইয়া পড়ে;—তখন ভাষাবিপ্লবের প্রয়োজন হয়। যখন বৈদিক ভাষা ও সংস্কৃতের সঙ্গে কথিত ভাষার সেইরূপ প্রভেদ জন্মিল, তখন কথিত পালিভাষা কিঞ্চিৎ বিশুদ্ধ হইয়া লিখিত ভাষা হইয়া দাঁড়াইল; যখন পুনশ্চ প্রাকৃতের সঙ্গে কথিত ভাষার প্রভেদ অধিক হইল, তখন বর্ত্তমান গৌড়ীয় ভাষাগুলি কিঞ্চিৎ পরিশুদ্ধ হইয়া লিখিত ভাষায় পরিণত হইল। ব্যাকরণ, শিশু ও অকৃতির বাক্চেষ্টার শাসন করে; কিন্তু তাই বলিয়া উহা চিরপ্রবাহশীল ভাষার গতি স্থির রাখিতে

---

(১) সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০২ সাল, ৮৮১ পৃষ্ঠা।

পারে না। ব্যাকরণকে অগ্রাহ্য করিয়া ভাষা রূপান্তর গ্রহণ করে। ব্যাকরণ যুগে যুগে ভাষার পদাঙ্কস্বরূপ পড়িয়া থাকে। ভাষা যে পথে বহিয়া যায়, ব্যাকরণ সেই পথের সাক্ষী মাত্র। বিলুপ্ত মাহেশ ব্যাকরণের পর পাণিনি, তৎপর কাত্যায়ন-বার্ত্তিকাকার বররুচি, যাস্ক; ইহাদের পর রূপসিদ্ধি, লঙ্কেশ্বপ, শাকল্য, তরত, কোহল, ভামহ, বসন্তরাজ, মার্কণ্ডেয়, ক্রমদীশ্বর, মৌদ্গলায়ন, শিলাবংশ—ইঁহারা ব্যাকরণ রচনা করেন। পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে যাহা ভাষার দোষ বলিয়া, কীর্ত্তিত, পরবর্ত্তী যুগের ব্যাকরণে তাহাই ভাষার নিয়ম বলিয়া স্বীকৃত। তাই পাণিনির নিয়ম অগ্রাহ্য করিয়াও 'মহাবংশ' ও 'ললিতবিস্তর' শুদ্ধ বলিয়া গণ্য, এবং বররুচির নিয়ম অগ্রাহ্য করিয়াও চাঁদ কবির গাথা কি 'চৈতন্য চরিতামৃত' নিন্দনীয় হয় নাই। সময় সম্বন্ধে যেরূপ প্রাতঃ, সন্ধ্যা, রাত্রি,—ভাষা সম্বন্ধেও তদ্রূপ—সংস্কৃত, প্রাকৃত, বাঙ্গালা বা হিন্দী; পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থার রূপান্তর।

বঙ্গভাষার ক্রমবিকাশ

বঙ্গভাষা আমরা এখন যেরূপ বলি, তাহার মুখ্য চিহ্নগুলি কোন্ সময়ে গঠিত হইয়াছিল, তাহার নিরূপণ সহজ নহে। বঙ্গভাষা, জননীর গর্ভ হইতে শিশুর ন্যায় কোন শুভ লগ্নে ভূমিষ্ঠ হয় নাই। বহুদিন হইতে ক্রমে ক্রমে ইহার বর্ত্তমান রূপ গঠিত হইতেছিল। কথিত ভাষা, ব্যাকরণশাসিত 'লিখিত' প্রাকৃত হইতে বহু দূরে আসিয়া পড়িল—কিন্তু এক দিনে নহে। হয়্‌ন্‌লি সাহেবের মতে ৮০০ খৃঃ হইতে ১২০০ খৃঃ অব্দের মধ্যে প্রাকৃতের যুগ লুপ্ত ও গৌড়ীয় ভাষাসমূহের যুগ উদ্ভূত হইয়াছিল। বৌদ্ধ-শক্তির পরাভবে, হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানে, হিন্দুজাতির নব চেষ্টার স্ফুরণে ও সংস্কৃতের নববিকাশে, সেই পরিবর্ত্তন এত দ্রুত হইল,—প্রাকৃতের সঙ্গে কথিত ভাষার প্রভেদ এত বেশী হইল যে, প্রাচীন ভাষাকে বিদায় দিয়া, কথিত গৌড়ীয় ভাষাগুলিকে লিখিত ভাষার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইল। ইতিহাসেও বৌদ্ধাধিকারের লোপকাল ও হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থানকাল ৮০০ খৃঃ হইতে ১২০০ খৃঃ অব্দের মধ্যে বলিয়া বর্ণিত আছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সংস্কৃত, প্রাকৃত ও বাঙ্গালা

ধর্ম্মবিপ্লবে প্রাচীন ভাব ও ভাষার সংস্কার এবং নব ভাব ও ভাষার প্রতিষ্ঠা হয়। রোমান্ যাজকদিগের প্রভুত্ব লোপের সঙ্গে সঙ্গে লাটিনের একাধিপত্য নষ্ট হয়। বুদ্ধদেব মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে, স্বীয় শিষ্যগণকে তাঁহার বাক্য ও কার্য্যাবলী পালিভাষায় লিপিবদ্ধ করিবার আজ্ঞা দেন। (১) ভারতের ভাষার ইতিহাসে সেইদিন এক নবযুগ প্রবর্ত্তিত হয়। যদিচ বৌদ্ধগণও মধ্যে মধ্যে সংস্কৃতে পুস্তকাদি রচনা করিয়াছেন, তথাপি বুদ্ধের সেই অনুজ্ঞাপ্রচারের সময় হইতেই সংস্কৃতের অখণ্ড প্রভাব তিরোহিত হয়। দেবভাষা, দেব ও ঋষিগণের জন্য সেই দিন স্বর্গারোহণ করেন। অবশ্য মর্ত্ত্যলোকে তাহার উপাসকগণের সংখ্যা তখন প্রভুত পরিমাণে বিদ্যমান ছিল, এবং বৌদ্ধগণ ও পালী সংস্কৃত উভয় ভাষায়ই পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন।

ধর্ম্ম ও ভাষা।

বৌদ্ধাধিকারে প্রাচীন ভাষা ও ভাবের একটা যুগান্তর হয়। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় কোন কোন স্থানে জীব-হিংসা নিন্দিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণের হলকর্ষণের নিষেধ বিধি তাহার একটি প্রমাণ—

বৌদ্ধ প্রভাব।

"বৈশ্যবৃত্ত্যাপি জীবাংস্তু ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়োঽপি বা। হিংসাপ্রায়ং পরাধীনাং কৃষিং যত্নেন বর্জয়েৎ॥ কৃষিং সাধ্বিতি মন্যন্তে না বৃত্তিঃ সদ্বিগর্হিতা। ভূমি ভূমিয়াং চৈব হন্তি কাষ্ঠময়োমুখম্॥" মনুসংহিতা, ১০ম অধ্যায় ৮৪ শ্লোক।

এই সমস্ত ভাব বৌদ্ধগণ পরবর্ত্তীকালে বিশেষভাবে পরিপুষ্ট করেন। হল চালনায় পাছে কোন ক্ষুদ্র জীব নষ্ট হয়, সেই আশঙ্কায় এই নিষেধ। মুঞ্জশ্রী ব্রাহ্মণপণ্ডিত বলিয়া যেরূপ আদৃত ছিলেন, অপর দিকে বৌদ্ধগুরু বলিয়াও তেমনই প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। আদি চতুর্বর্ণ হইতে নানাপ্রকার সঙ্করজাতির উদ্ভব হয়। সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ চারুদত্ত মৃচ্ছকটিকের শেষাঙ্কে গণিকা বসন্ত-সেনাকে বিবাহ করিলেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। মৃচ্ছকটিক বৌদ্ধাধিকারে রচিত। যদি সমাজের পূর্ব্বোক্ত ভাবের বিবাহপ্রথা বিশেষ নিন্দার্হ হইত, তাহা হইলে নাটকের প্রধান নায়ককে গ্রন্থকার কখনই এইরূপ

---

(১) "আমার বাক্য সকল সংস্কৃতে অনুবাদ করিও না তাহা হইলে বিশেষ অপরাধী হইবে। আমি যেমত প্রাকৃত ভাষায় উপদেশ দিতেছি, ঠিক সেইরূপ ভাষা গ্রন্থাদিতে ব্যবহার করিবে।" বুদ্ধবাক্য ও ত্রিপিটক পালি ভাষায় রচিত হইয়াছিল, এবং ইহার টীকাকারও কহেন, বুদ্ধবাক্য সকল মকণিরুক্তি অর্থাৎ প্রাকৃত ভাষায় রচিত।

পরিণয়পাশে আবদ্ধ করিতে সাহসী হইতেন না। বৌদ্ধগণের সংস্কার ব্রাহ্মণগণের ধর্ম্ম-ধারণা হইতে উদ্ভূত হইলেও কালক্রমে পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছিল। বৌদ্ধ-জাতকে দেখা যায় রাজা দশরথের দুই পুত্র, রাম ও লক্ষ্মণ এবং একমাত্র কন্যা সীতা। রামায়ণের শেষে রাম সহোদরা সীতাকে বিবাহ করিলেন। (১) সমাজে বিবাহ-পদ্ধতি যে বিচিত্ররূপের ছিল, ইহা হইতে তাহারও আভাস পাওয়া যায়। বৌদ্ধ-জাতকের এই উপাখ্যানভাগ শোধরাইয়া লইবার জন্য হিন্দুগ্রন্থকারগণ নানারূপ কল্পনার সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন।

শুধু সমাজ-বন্ধন শিথিল ছিল, এরূপ নহে;—ভাষাও বিশৃঙ্খল এবং শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। কথিত ভাষার উপর লিখিত ভাষার প্রভাব সর্ব্বদাই দৃষ্ট হয়। সংস্কৃতের আদর্শ লোক চক্ষু হইতে অন্তর্হিত হইল ও তাহার স্থানে শিথিল প্রাকৃতভাষা রাজসভায় প্রচলিত হইল; কথিত ভাষাও পূর্ব্বাপেক্ষা মৃদুভাব অবলম্বন করিল। যথা,—

১। "পণমহ জমস্স চলণে"...মুদ্রারাক্ষস, ১ম অঙ্ক।

২) শূলে বিক্কন্তে? পণ্ডবে শেদকেদু পুত্তে লাধাএ লাবণে ইন্দদত্ত? অহো কুন্তীএ তেন লামেণ জাদে অশশথামে ধর্ম্মপুত্তে জাড়উ...মৃচ্ছকটিক ১ম অঙ্ক।

৩। "পলিত্তাঅদু দাশীএ পুত্তে দলিদ্দচালুদত্তাকে তুমং॥"...মৃচ্ছকটিক, ৮ম অঙ্ক।

সংস্কৃতজ্ঞমাত্রেই এইরূপ রচনা বহুবার পড়িয়াছেন চারুদত্ত, রাম, রাবণ, দরিদ্র, চরণ প্রভৃতি শব্দ স্থলে চালুদত্ত, লাম, লাবণ, দলিদ্দ ও চলন এইরূপ পদ দৃষ্ট হয়। এখন ভারতবর্ষের কোন প্রদেশে নিম্নশ্রেণীতে ক্বচিৎ ভাষার এরূপ শিথিল ভাব প্রচলিত থাকিতে পারে; কিন্তু কথিত ভাষাও এখন অনেক পরিমাণে বিশুদ্ধ হইয়াছে। ইহার কারণ, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিক্রিয়া। জৈমিনি ও ভট্টপাদ এই প্রতিক্রিয়ার কার্য্য আরম্ভ করেন। সাহসরামের প্রস্তর লিপিতে ব্রাহ্মণদিগের প্রতি অশোকের যে অত্যাচার বর্ণিত আছে, রাজা সুধন্বা সেই অত্যাচারের প্রতিশোধ লইয়াছিলেন। যথা শঙ্করবিজয়ে,—

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিক্রিয়া।

"দুষ্টমতাবলম্বিনঃ বৌদ্ধান্ জৈনান্ অসংখ্যাতান্ রাজমুখ্যাননেকাবিদ্যাপ্রসঙ্গভেদৈর্নিজিত্য তেষাং শীরাণি পরশু-ভিশ্ছিত্বা বহুধু উলুখলেষু নিক্ষিপ্য কণ্ঠভ্রমণৈশ্চূর্ণীকৃত্য চৈবং দুষ্ট-মতধ্বংসামচরন্ নির্ভয়ো বর্ত্ততে॥" আদিশূর বৌদ্ধদিগকে পরাজিত করিয়া গৌড়রাজ্য স্থাপন করেন, যথা—'জিত্বা বুদ্ধাংশ্চকার স্বয়মপি পতিগৌড়রাজ্যান্নিরন্তান্।"২

হিন্দুধর্ম্মের এই উত্থান কেবল উৎপীড়নেই পর্য্যবসিত হইল না; চতুর্দ্দিকে প্রাচীন শাস্ত্রের চর্চ্চা

(১) অথ বারাণস্যাং দশরথ মহারাজ নাম অগতি গমনমপহায় ধম্মেণ রাজ্যকমোরসি। তস্য ষোলসন্ন মইথি সহস্সনম জেঠ্ঠিকা অগমহেসি দ্ব পুত্ত একণ সধিরম বিজয়ি। জ্যেষ্ঠ পুত্তো রাম পণ্ডিতো অহোষি। দুতীয়লক্ষ্মণ কুমারোধিতা সীতাদেবী নাম॥" ইত্যাদি।... বৌদ্ধজাতকঃ।

(২) রাধাকান্ত দেবের শব্দকল্পদ্রুম দ্রষ্টব্য।

আরব্ধ হইল। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে আজমীরের রাজপুত্র সারঙ্গদেব বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন,—কিন্তু তদীয় পিতা রাজা বিশালদেব হিন্দুশাস্ত্র শুনাইয়া তাঁহার মতি-গতি পরিবর্ত্তন করিলেন। চাঁদকবি তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। (১) পাঠক দেখিবেন, রাজা বৌদ্ধধর্ম্মকে "নষ্ট জ্ঞান" আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন।

সংস্কৃতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং দেশে উহার প্রভাব।

সংস্কৃতের আদর্শ ভাষাক্ষেত্রে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলে, লিখিত ও কথিত ভাষা উভয়ই উত্তরোত্তর বিশুদ্ধ হইতে লাগিল। 'লাম' পুনরায় রাম হইলেন। রত্নাকর দস্যুর উচ্চারণ সংশোধন সম্বন্ধে লৌকিক বিশ্বাস কৃত্তিবাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—

"পাপে জড় জিহ্বা রাম বলিতে না পারে। কহিল আমার মুখে ও কথা না স্ফুরে। শুনিয়া ব্রহ্মার তবে চিন্তা হইল মনে। উচ্চারিবে রাম নাম এ মুখে কেমনে। মকার করিল অগ্রে রা করিল শেষে। তবে বা পাপীর মুখে রাম নাম আইসে॥ ব্রহ্মা বলিলেন তাঁরে উপায় চিন্তিয়া। মানুষ মরিলে বাপু ডাক কি বলিয়া॥ শুনিয়া ব্রহ্মার কথা বলে রত্নাকর। মৃত মানুষের সবে মড়া বলে নর॥ মড়া নয় মরা বলি জপ অবিশ্রম। তব মুখে তখনি স্ফুরিবে রাম নাম॥ শুষ্ক কাষ্ঠ দেখিলেন বৃক্ষের উপরে। অঙ্গুলি ঠারিয়া ব্রহ্মা দেখান তাঁহারে॥ বহুক্ষণে রত্নাকর করি অনুমান। বলিল অনেক কষ্টে মরা কাষ্ঠ খান॥ মরা মরা বলিতে আইল রাম-নাম। পাইল সকল পাপে মুনি পরিত্রাণ॥ তুলারাশি যেমন অগ্নিতে ভস্ম হয়। একবার রাম-নামে সর্ব্বপাপক্ষয়॥ · কৃত্তিবাসী রামায়ণ, আদিকাণ্ড।

পরস্বহারক দস্যুর জিহ্বা পাপে জড়, তাহার মুখে রাম-নাম বিকৃত হয়। ইহাতে বৌদ্ধদিগের প্রতি একটু কটাক্ষ আছে। ব্রহ্মার (না ব্রাহ্মণের ?) এত দোহাই ও যত্নের সহিত এই নূতন উচ্চারণশিক্ষা দিবার পর আর কোন্ চাষা রামকে 'লাম' বলিতে সাহস করিবে ? এই ভাবে লকারের প্রভাব লুপ্ত হইল এবং চালুদত্ত, লাম, লাবণ, দলিদ্দ স্থলে চারুদত্ত, রাম, রাবণ, দরিদ্র পুনরায় কথিত ভাষায় ফিরিয়া আসিল। সংস্কৃতানুযায়ী বর্ণশোধন কার্য্য অদ্যাপি চলিতেছে প্রাচীন হস্তলিখিত পুস্তকগুলির ভাষা ক্রমশঃ পরিশুদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। সেই সব পুঁথিতে এমন অনেক শব্দ দৃষ্ট হয়, যাহা এখন আর লিখিত ভাষায় ব্যবহৃত হয় না। যথা—পথা · পক্ষ, কাতি ··

---

(১) "অতি দুচিত ভয়ে সরাঙ্গ দেব। পিত প্রতি করৈ অবিহিতং সেব॥ বুধ ধম্ম লিয়ে বাঁধে ন তেগ। সুনি শ্রবণ রাজ মন ভৈ উদেগ॥ বুল্লাহ কুবংর সণমাণ কীন। কিহি কাজ তুমং ইহ ধ্রম্ম লীন॥ তুমং ছংড়ি সরম হম কহৈ বত। বণিক্ক পুত্র হন তেং দুচিত॥ ইহ নষ্ট জ্ঞান সুনিয়েণ কাণ। পুরষাত্তন ভজ্জৈ কিত্তী হান॥ তুম রাজবংশ রাজ নহ সংগ। মৃগয়া সর খেলো বন কুরংগ॥ পরমোধ ভজো বোধক · পুরান। রামায়ণ সুনহ ভারত নিদান॥ ইত্যাদি।···চাঁদ গাথা। মুণ্ডিত কেশ বৌদ্ধগণ মাথায় পাগড়ী বাঁধিতেন না ("বাঁধে ন তেগ") এইজন্যই বোধ হয় বৌদ্ধ-প্রাবল্যের দিনে বাঙ্গালীরা পাগড়ী ত্যাগ করিয়াছিলেন—তদবধি এদেশ হইতে উষ্ণীষ-ব্যবহার উঠিয়া গিয়াছে।

কার্ত্তিকমাস, নিমল…নির্ম্মল, নখ্‌তা…নক্ষত্র, মুরূখ…মূর্খ, বিভা বিবাহ, পুনি…পুনঃ, শুকুল…শুক্ল, বগা…বক, দে…দেহ, সভাই সবাই, বিনি…বিনা (১)

বস্তুতঃ, বাঙ্গালার সঙ্গে কালে সংস্কৃতের এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দাঁড়াইল যে, প্রাচীন বাঙ্গালা কবিতা স্থলে স্থলে সংস্কৃত কবিতা বলিয়াও গণ্য হইতে পারে। ভারতচন্দ্রের এই কবিতাটি দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত হইলে, কাশী বা পুণার পণ্ডিতগণ ঠিক বাঙ্গালীর মত তাহার রসাস্বাদ করিতে পারিবেন,—

"জয় শিবেশ শঙ্কর, বৃষধ্বজেশ্বর, মৃগাঙ্কশেখর, দিগম্বর। জয় শ্মশাননাটক, বিষাণবাদক, হুতাশভালক, মহত্তর। জয় সুরারিনাশন, বৃশেষবাহন, ভুজঙ্গভূষণ, জটাধর। জয় ত্রিলোককারক, ত্রিলোকপালক, ত্রিলোকনাশক, মহেশ্বর॥"

বিম্‌স্ সাহেব মনে করেন, বঙ্গভাষা গৌড়ীয় অন্যান্য ভাষা অপেক্ষা সংস্কৃতের অধিকতর সন্নিহিত; তিনি মনে করেন যে, বাঙ্গালা, উড়িয়া ও মারহাটীতে 'তৎসম' শব্দের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী এবং হিন্দী, গুজরাটী এবং পাঞ্জাবী ও সিন্ধীতে ঐরূপ শব্দের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা ন্যূন। (২) বিম্‌স্ নির্দ্দেশ করেন যে, পাঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশে মুসলমানগণের প্রভাববশতঃ ভাষা শীঘ্রই পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল; বঙ্গভাষা সুদূর সীমান্তে নিরুপদ্রবে সংস্কৃতের ভাবে গঠিত হইবার অবকাশ পাইয়াছিল।

বঙ্গদেশে সংস্কৃতের প্রভাব কখনই লুপ্ত হয় নাই। যখন সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল, তখনও হিউনসাঙ্ সমতট ও বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থলে হিন্দুধর্ম্মের প্রভাব দেখিয়া গিয়াছেন। তিনি এই দেশের অধিবাসীদিগকে পরিশ্রমী ও শিক্ষাভিমানী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বঙ্গদেশে সংস্কৃতের গর্ব্ব চিরদিনই সুরক্ষিত। গৌড়ীয় রীতি বৃথা শব্দাড়ম্বরে পূর্ণ বলিয়া অলঙ্কারশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ অনাদর করিয়াছেন। বৈদর্ভী রীতির প্রসাদগুণ, মাধুর্য্য, সুকুমারত্ব এবং গৌড়ীয় রীতির সমাসবহুলত্ব, দণ্ডাচার্য্য উদাহরণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। যথা—

বৈদর্ভী রীতি,—

মালতীমালা লোলালিকলিলা যথা।

গৌড়ীয় রীতি,—

"যথা নত্যর্জ্জুনাজন্ম সদৃক্ষাঙ্কো বলক্ষগুঃ॥"

কিন্তু এই সকল শ্রুতিকটু সমাসজটিল পদ দেখিয়া বোধ হয়, সংস্কৃত এই দেশে বদ্ধমূল হইয়াছিল। তাই গৌড়ীয় ভাষাগুলির মধ্যে বঙ্গভাষা সংস্কৃতের অতি সন্নিহিত।

---

(১) ইহার প্রায় সবগুলিই ডাক ও খনার বচনে পাওয়া যাইবে।

(২) Beame's *Comparative Grammar* Vol. I. p. 29

বঙ্গভাষা ও প্রাকৃত

কেহ কেহ বলেন, প্রাকৃত হইতে বঙ্গভাষার উৎপত্তি হয় নাই; উহা সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। গৌড়ীয় ভাষাগুলির মধ্যে বাঙ্গালা সংস্কৃতের অতিসন্নিহিত হইলেও, উক্ত মত এখন অগ্রাহ্য হইয়া গিয়াছে। দেখা যায়, ডাক ও খনার বচনের ভাষা এবং পরাগলী মহাভারতের ভাষাই স্থলে স্থলে এত জটিল যে, তাহার অর্থপরিগ্রহ সহজ নহে। এই সকল রচনা হইতে ৫০০।৬০০ বৎসর পূর্ব্বের ভাষা যে সংস্কৃত ছিল না, তাহা স্পষ্টই বোঝা যায়; কিন্তু বর্ত্তমান ভাষা হইতে তাহা এত দূরবর্ত্তী ছিল যে, তাহাকে বঙ্গভাষা আখ্যা প্রদান করাও সঙ্গত নহে। সুতরাং সে ভাষাকে প্রাকৃত না বলিয়া আর কি বলা যাইতে পারে? হয় ত যে সকল প্রাকৃত রচনা আমরা পাইয়াছি, এতদ্দেশ প্রচলিত প্রাকৃত ঠিক সেরূপ ছিল না;—কিন্তু উহাও সাহিত্যদর্পণ-নির্দ্দিষ্ট অষ্টাদশ প্রকার প্রাকৃতের অথবা অপভ্রংশ ভাষাগুলির অন্তর্গত ছিল, এরূপ অনুমান করা বোধ হয় অসঙ্গত ও অযৌক্তিক নহে। দণ্ডাচার্য্য-বিরচিত কাব্যাদর্শে গৌড়দেশীয় প্রাকৃতের উল্লেখ আছে :—

"শৌরসেনী চ গৌড়ী চ লাটী চান্যা চ তাদৃশী।
যাতি প্রাকৃতমিত্যেবং ব্যবহারেষু সন্নিধিম্॥"

বঙ্গভাষার ঠিক পূর্ব্বাবস্থা আমাদের পরিচিত প্রাকৃতগুলির কোনটীতেই দেখিতে পাই না, কিন্তু অনেকরূপ সাদৃশ্য পাই। নিম্নে শব্দগত সাদৃশ্য-প্রদর্শনের জন্য কতকগুলি উদাহরণ উদ্ধৃত হইতেছে। যদিও এই সকল শব্দ বিবিধ পুস্তকেই দৃষ্ট হইবে, তথাপি আমি যে পুস্তক হইতে গ্রহণ করিয়াছি, তাহা নিম্নের তালিকায় অনেক স্থলেই উল্লেখ করিলাম।

প্রাকৃত	(সংস্কৃত)		বাঙ্গালা	যে পুস্তক হইতে উদ্ধৃত হইল।
লোণ (১)†	(লবণম্)	....	লুন।	প্রাং প্র
পত্থর (২)†	(প্রস্তরঃ)	...	পাথর।	ঐ
বিজ্জুলী	(বিদ্যুৎ)	...	বিজলী	.. মৃঃ কঃ।
বাড়ী	(বাটী)	...	বাড়ী	... মৃঃ কঃ।
ঘর	(গৃহম্)	...	ঘর	...

(১) 'লুন' শব্দ পূর্ব্বে 'লোণ রূপেই ব্যবহৃত হইত; যথা কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে,...'
"বাহান্নপুরুষ যার লোণের ব্যাপার। সে বেটা আমার কাছে করে অহঙ্কার॥"

(২)† এইরূপ চিহ্নবিশিষ্ট শব্দগুলি বাঙ্গালা ও ইংরাজী পুস্তকাদি হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি। ইহার অধিকাংশেই ন্যায়রত্ন মহাশয়ের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে', শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বিদ্যাবিনোদ কৃত 'বাঙ্গালা সাহিত্য-সমালোচনাতে,' বিম্‌স সাহেবের *Comparative Grammar* ও রামদাস সেন মহাশয়ের প্রবন্ধগুলিতে পাওয়া যাইবে।

প্রাকৃত	(সংস্কৃত)	বাঙ্গালা	যে পুস্তক হইতে উদ্ধৃত হইল।
দুয়াব	(দ্বারম্)	দুয়ার্	মৃঃ কঃ
ঠাণ	(স্থানম্)	ঠাঁই	ঐ
বক্কল	(বল্কলম্)	বাকল	শকুঃ।
ভত্ত	(ভক্তম্)	ভাত	
লট্ঠী	(যষ্টিঃ)	লাঠী	
থম্ভা	(স্তম্ভ)	থাম্বা	
চক্কা	(চক্রং)	চাকা	
বহুঃ (১)	(বধূঃ)	বউ	মৃঃ রাঃ।
ঘিঅ	(ঘৃতম্)	ঘি	মৃঃ কঃ।
দহী	(দধি)	দই	ঐ
দুধ্বা	(দুগ্ধম্)	দুধ	
অন্ধআর	(অন্ধকারঃ)	আঁধার	মৃঃ কঃ।
শিআল	(শৃগালঃ)	শিয়াল	ঐ
হত্থী	(হস্তী)	হাতী	ঐ
ঘোড়ও	(ঘোটকঃ)	ঘোড়া	গাথা
চন্দ	(চন্দ্রঃ)	চাঁদ	মৃঃ কঃ।
সঞ্ঝা	(সন্ধ্যা)	সাঁঝ	ঐ
হত্থ	(হস্ত)	হাত	শকুঃ।
মত্থঅ	(মস্তকং)	মাথা	মৃঃ কঃ।
কণ্ণ	(কর্ণঃ)	কাণ	মৃ কঃ।
হিঅঅ	(হৃদয়ঃ)	হিয়া	ঐ
অত্তা (২)	(মাতা)	আই	মৃঃ কঃ।

(১) প্রাকৃত 'বহু' প্রাচীন বঙ্গীয় অনেক পুস্তকে দৃষ্ট হয়। যথা …

'যাহার বহু ঝি দূরে যান্তি। তাহার নিকটে বসে অসতী।' ডাকের বচন, বেণীমাধবদের সংস্করণ।

(২) বিজয় গুপ্তের পদ্মপুরাণে 'আতা'র ব্যবহার দৃষ্ট হয়। যথা…

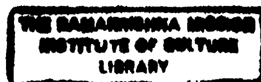
'আছিল আমার আতা কিছুই না জানি। ভূতের ডরেতে সেই হিন্দুয়ানি মানি'।

প্রাকৃত	(সংস্কৃত)	বাঙ্গালা	যে পুস্তক হইতে উদ্ধৃত হইল।
রাও, রায়	(রাজা) ...	রায়	... চঃ কোঃ ও প্রা পিঙ্গল।
চ্ছুরা	(ক্ষুরঃ) ...	ছুরি	...
মসাণা	(শ্মশানম্) ...	মশান	...
বম্ভণ	(ব্রাহ্মণঃ) ...	বামুন	... মৃঃ কঃ।
চেড়ী (১)	(চেটী) ..	চেড়ী	... মৃঃ কঃ।
সহি	(সখী) ...	সই	... ঐ
জেট্‌ঠা	(জ্যেষ্ঠ) ..	জেটা	...
উবজ্‌ঝাঅ	(উপাধ্যায়ঃ)	ওঝা	.. মুঃ রাঃ।
কজ্জা	(কার্য্যম্) ...	কাজ	
কম্মা	(কর্ম্ম) .	কাম	...
বহিণী	(ভগ্নি) ...	বোন, বহিন	... মৃঃ কঃ।
রাই	(রাধিকা) ..	রাই	... অপভ্রংশ ভাষা। (২)
কাণু	(কৃষ্ণঃ) ...	কানু	... ঐ
গোয়াল	(গোপঃ) ...	গোয়াল	... ঐ
বত্তা	(বার্ত্তা) ...	বতি	...
অপ্পি	(আত্মা) ..	আপন	... মুঃ রাঃ
আহ্মি (৩)	(অহং) ...	আমি	... মৃঃ কঃ।
তুহ্মি	(ত্বং) ..	তুমি	.. উঃ চঃ।
শে	(সঃ)	সে	... মৃঃ কঃ।
তুএ	(ত্বয়া)	তুই	.. ঐ
তুই	(তব) ...	তাহার	... শকুঃ।

(১) এই শব্দ পূর্ব্বে খুব প্রচলিত ছিল। কৃত্তিবাসী রামায়ণ দেখ।

(২) অপভ্রংশভাষামাহ আভীরাদিগিরঃ কাব্যেষপভ্রংশগিরঃ স্মৃতাঃ॥

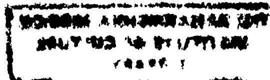
(৩) বাঙ্গালা ও প্রাকৃতের সান্নিধ্য দেখাইবার জন্য এই 'আহ্মি', 'তুহ্মি' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম নোয়াখালি প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত ১৫০ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত হস্তলিখিত পুঁথিতেই আমি ও 'তুমি' স্থলে সর্ব্বত্রই 'আহ্মি' ও 'তুহ্মি' দৃষ্ট হয়। বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের পুস্তকাগারে পরাগলী মহাভারত, সঞ্জয়-রচিত মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন পুস্তকেও এই প্রকারের প্রয়োগ দৃষ্ট হইবে।



প্রাকৃত	(সংস্কৃত)		বাঙ্গালা		যে পুস্তক হইতে উদ্ধৃত হইল।
এহু	(এষঃ)	...	এই	...	ঐ
ইমিণ	(অনেন)	...	এমনে	...	মুঃ রাঃ।
অজ্জ	(অদ্য)	...	আজ	...	উঃ চঃ।
ণা	(ন)	...	না	...	গাথা।
অ	(চ)	...	ও	...	ঐ
দঢ়	(দৃঢ়)	...	দড় (১)	...	
সচ্চ	(সত্যম্)	...	সাচা	...	মৃঃ কঃ।
অদ্ধ	(অর্দ্ধম্)	...	আধ	...	ঐ
বুডঢ	(বৃদ্ধঃ)	...	বুড়া	...	ঐ
দুঅ	(দ্বয়ং)	...	দুই	...	পিঙ্গল।
দুণা	(দ্বিগুণ)	...	দুনা	...	
তিণ্ণি	(ত্রি)	...	তিন	...	ঐ
চারি	(চতুর)	...	চারি	...	ঐ
ছ	(ষষ্ঠ)	...	ছয়	...	ঐ
সত্ত	(সপ্ত)	...	সাত	...	পিঙ্গল।
অট্ট	(অষ্ট)	...	আট	...	মৃঃ কঃ।
বারহ	(দ্বাদশ)	...	বার	...	পিঙ্গল।
চোদ্দহ	(চতুর্দ্দশ)	...	চৌদ্দ	...	ঐ
পণ্ণরহ	(পঞ্চদশ)	...	পনর		ঐ
সোলা	(ষোড়শ)	...	ষোল	...	ঐ
বাইস	(দ্বাবিংশ)	...	বাইশ	...	পিঙ্গল।
কেত্তকা	(কিয়ৎ)	...	কতক	...	
এত্তকা	(ইয়ৎ)	...	এতেক	...	

(১) এই 'দড়' শব্দ পূর্ব্বে দৃঢ় অর্থেই ব্যবহৃত হইত। যথা,—

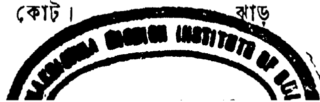
"মনে ভাবে শ্রীধর উদ্ধত দ্বিজবর। কোন দিন আমারে কিলায় পাছে দড়।" চৈ, ভা; এই "দড়" শব্দের অর্থ এখন দক্ষ হইয়াছে।



প্রাকৃত	(সংস্কৃত)		বাঙ্গালা		যে পুস্তক হইতে উদ্ধৃত হইল।
জেত্তক †	(যাবৎ)	...	যতেক	...	
জত্থক	(যত্র)	...	যথায়	...	উঃ চঃ।
এত্থ	(অত্র)	...	এথায়	...	মৃঃ কঃ।
পল্লাণ	(পলায়নম্)	...	পালান	...	মৃঃ কঃ।
মিচ্ছা	(মিথ্যা)	...	মিছা	...	
অম্ব	(অম্র)	...	আঁব, আম	...	
সরিষব	(সর্ষপঃ)	...	সরিষা	...	
আঅরিস	(আদর্শ)	...	আরসি	..	
রূপ্পা	(রৌপ্যম্)	...	রূপা	...	
মচ্ছি	(মক্ষিকা)	...	মাছি	...	
কেথু	(কুত্র)	...	কোথা	...	
ছিন্দ	(ছন্ন)	...	ছেঁড়া	...	
হলদ্দা	(হরিদ্রা)	...	হলুদ	...	
পোথি	(পুস্তক)	...	পুঁথি	...	
ণঙ্গল	(লাঙ্গলম্)	...	লাঙ্গল	...	
মহু	(মধু)	...	মৌ	...	
তেল	(তৈলম্)	...	তেল	...	
সেজ্জা	(শয্যা)	...	শেজ	...	

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বিরচিত 'দেশী নামমালা' নামক পুস্তকে গ্রন্থকার আচার্য্য হেমচন্দ্র অনেকগুলি তৎকাল-প্রচলিত শব্দের তালিকা দিয়াছেন; ইহাদের সঙ্গে অনুরূপ বাঙ্গালা শব্দের ংশ্রব অতি ঘনিষ্ঠ এবং ঐ সকল শব্দ যে প্রাকৃত শব্দ বলিয়াই গণ্য ছিল, তদ্বিষয়ে অনুমাত্র ন্দেহ নাই। আমরা নিম্নে অনুরূপ বাঙ্গালা শব্দসহ পূর্ব্বোক্ত শব্দের কতকগুলি উদ্ধৃত করিতেছি :—

দেশীপ্রাকৃত		চলিত বাঙ্গালা।	দেশীপ্রাকৃত		চলিত বাঙ্গালা।
খড়ি	...	থুড়ি।	জড়িত	...	জড়িত।
পাট্ট	...	পেট।	ঝড়ী	...	ঝড়ী, ঝড়।
কাট্ট	...	কোট।	ঝাড়	...	ঝাড়।



দেশীপ্রাকৃত		চলিত বাঙ্গালা।
গোচ্ছা	...	গোচ্ছা, গোছা।
ছল্লী	...	ছলি।
বুক্কই	...	বুক্নি।
তগ্গ	...	তাগা।
টিপ্পী	...	টিপ।
চট্টু	...	চাটু।
পপ্পিঅ	...	পাপিয়া।
ফুক্কা	...	ফক্কা।
ঢংঢল্লে	...	ঢলঢলে।
উৎথল্ল	...	উত্লা, উথলানো।
গঢ়ো	...	গড়।
খলী	...	খোল।
উত্থল-পথল	...	উথল-পাথল।
ওড়ণ	..	উড়ানী।
কোইলা	...	কয়লা।
ওইল্ল	...	ওলা।
ঘোড়ো	...	ঘোড়া।
ছিবই, ছিহই	...	ছোঁয়া।
ছিনাল	...	ছিনাল।
ছিনালী	...	ছিনালী।
ঘোলই	...	ঘোলা।
পলোট্টই	...	পালটানো।
ঝালংকিঅ	..	ঝলক।
ঝালিঅ	...	ঝালানো।
ঝলঝলিয়া	...	ঝলমলে।
ঝলসিঅ	...	ঝলসানো।
ডালী	...	ডাইল, ডাল।

দেশীপ্রাকৃত		চলিত বাঙ্গালা।
অল্লট্ট পলট্ট	...	উলোট পালট, উল্টা পাল্টা।
ভল্লু	...	ভালুক।
থরহরিঅ	...	থরহরি।
দোরা	...	ডোড়।
পুপফা	...	ফুপা, ফুফু।
ওসা	...	ওস্।
কোলাহল	...	কোলাহল।
খড়	...	খড়।
চাউল	...	চাউল।
টিক্ক	...	টিকা।
ডুম্ব	...	ডোম।
টুংটো	...	ঠুঁটো।
পেল্লই	...	ফেলা।
কড়ংত	...	কাঁড়ানো।
খাইয়া	...	খাই।
ঘোইল	...	ঘোলা।
ডম্ব, ডাবো	...	ডেবরা।
ডলো	...	ডেলা, ঢেলা।
ধন্ধা	...	ধাঁধা।
ডোলা	...	ডুলি।
বোকড়	...	বোকা, (পাঁঠা)।
হেলা	...	হেলা।
বল্লা	...	বল্লা, বোল্তা।
হড্ড	...	হাড়।
বিহাণ	...	বিহান।
রোল	...	রোল।

দেশীপ্রাকৃত		চলিত বাঙ্গালা	দেশীপ্রাকৃত		চলিত বাঙ্গালা
তড়ফড়িঅ	...	ধড়ফড়।	বট্টা	...	বাট।
আয়ডটী	...	আড়	চুড়ো	...	চুড়, চুড়ী
ওসরিআ	...	ওসরা (বারেন্দা)	ছেলও	...	ছেলী
ওহাড়ণী	...	ওয়াড়	ঝলা	...	ঝলা
কট্টারী	...	কাটারী	ঝংটী	...	ঝুটী
কড়চ্ছ	...	করচুল (হাতা)	ঝাড়ং	...	ঝাড় (যথা বাঁশ ঝাড়)
কংদোট্টং	...	কানড় (ফুল)	ঝুটঠং	...	ঝুটা
কবিল্লং	...	কোঁড় (বাঁশের কোঁড়)	ডুংগরো	...	ডুংরি (ছোট পাহাড়)
কণ্ণাসো	...	কানাচ্ (পুকুরের তীর)	ঢড্ঢো	...	ঢেঁড়া
কালং	...	কালো	ঢংকনী	...	ঢাকনী
কাহারো	...	কাহার	ণংদং	...	নান্দ (গরুকে জাব দেওয়ার মৃৎপাত্র বিশেষ)
করংকং	...	করঙ্গ			
খড্ডা	...	খাদ, খদ	ণক্কো	...	নাক এবং নেকা
খল্লা	...	খাল	ণাউড্ডো	...	নেওড়, নেওট (স্নেহজনিত আবদারশীল)
খড়ক্কী	...	খিড়কী			
খোড়ো	...	খোঁড়া	পংখুড়ী	...	পাপড়ি
গড্ডী	...	গাড়ী	ফগগূ	...	ফাগ (আবির)
চট্টী	...	শিখা	বপ্প	...	বাপ
চট্টু	...	চাটু	ববরী	...	বাবরী চুল
চাসো	...	চাস	মট্টঠো	...	মাঠো (মৃদু)
চিল্লা	...	চিল	মম্মী	...	মামী
চিল্লো	...	চেলা	বদ্দলং	...	বাদল

াঙ্গালা আর প্রাকৃতের নৈকট্য অতি স্পষ্টই দেখা যায়। যে কোন প্রাকৃতরচনা হইতে ঐ সকল ক্রিয়া খুঁজিয়া বাঙ্গালার সহিত তুলনা করিলেই পরস্পরের সম্বন্ধ অনায়াসে অনুমিত হইবে। প্রাকৃতের হোই, পড়ই, কিণই, করই বোলই, ণচ্চই, ফুট, গাঅ, থাঅ, বুজ্ঝ, চিণ, জাণ, লগ্গ, চ্ছ, ইত্যাদি স্থলে আমরা বাঙ্গালা হয়, পড়ে, করে, বলে, নাচে, ফোটা, গাওয়া, থাকা, বোঝা, না, জানা, লাগা, পোঁছা, ইত্যাদি পাইতেছি। প্রাকৃত—শুনিঅ, লভিঅ, লই, ভবিঅ, করিঅ,

ইত্যাদি বাঙ্গালায় শুনিয়া, লভিয়া, লইয়া, হইয়া, করিয়া, ইত্যাদি রূপধারণ করিয়াছে। প্রাকৃত 'অচ্চি'র সঙ্গে ভূ ধাতুর অসমাপিকা 'হইয়া'র মিলনে 'হইয়াছে' গঠিত। দেখিতেছে, করিতেছে ইত্যাদিও ঐরূপেই নিষ্পন্ন হইয়াছে। এখনও পূর্ব্ববঙ্গের কোনও কোনও স্থলে দুইটি শব্দ পৃথক্ ভাবে উচ্চারিত হয়; যথা—'দেখিতে-আছে,' 'করিতে আছে। অতীত কালের 'আসীৎ'-এর অপভ্রংশ 'আছিল' পূর্ব্বোক্তরূপে অন্যান্য ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়। (১)

শব্দের রূপান্তরাবলম্বনের পদ্ধতি অতি বিচিত্র। শুধু অনুকরণপ্রিয়তাবশতঃ সময়ে সময়ে কোনও ব্যাপক পদ্ধতি প্রচলিত হয়। 'চল,' 'খেল' ইত্যাদি ধাতুর 'ল অন্যান্য ক্রিয়ায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। যেখানে রকারের সংশ্রব আছে, সেখানে 'ল' কারে র পরিবর্ত্তন স্বাভাবিক বলিয়া ধরা যাইতে পারে "ড়লয়োরভেদঃ"; কিন্তু তদ্ভিন্নও অনেক স্থলে 'ল' প্রচলিত আছে। চলিলাম (চলামঃ), খেলিলাম খেলামঃ প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে হাসিলাম, দেখিলাম ইত্যাদিতে 'ল' প্রযুক্ত হইয়াছে। সংস্কৃত ব্রূমঃ স্থলে প্রাকৃত বোল্লাম, দৃষ্ট হয়ঃ—'ণ ভণামি এস লুদ্ধো নেহস্স রসেণ বোল্লামো'—মৃঃ কঃ, ৬ অঙ্ক।

করসি, খায়সি, করোন্তি, জানেন্তি ইত্যাদি প্রাকৃতের অনুযায়ী শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় পূর্ব্বে বিস্তর-পরিমাণে প্রচলিত ছিল। শুধু কয়েকটিমাত্র উদাহরণ দিয়া দেখাইব। পরবর্ত্তী অধ্যায়গুলির উদ্ধৃতাংশে সেইরূপ আরও অনেক শব্দ দৃষ্ট হইবে,—

(১) "ভিক্ষুকের কন্যা তুমি কহসি আমারে। দেবযানি পলাইল কূপের ভিতরে॥" সঞ্জয়; আদিপর্ব্ব।
(২) "সম্ভ্রম না করে ভীষ্ম হাতে ধনুঃশর। নির্ভএ বোলেন্ত তবে সংগ্রাম ভিতর॥" কবীন্দ্র; ভীষ্মপর্ব্ব।
(৩) "প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবী হৈল পরম মহান্তী। বড় বড় বৈষ্ণব তার দর্শনেতে যান্তি॥" চৈ, চ, অন্ত্য।
(৪) চতুর্দ্দিকে নরসিংহ অদ্ভুত শরীর। হিরণ্যকশিপু মারি পিবন্তি রুধির॥" "শ্রীকৃষ্ণবিজয়।
(৫) "পরনাম করিআ হংস বলন্তি সেই কালে। বার্ত্তা এক বলি পরভু তব পদতলে॥

—(শূন্যপুরাণ ৭ পৃষ্ঠা, সাহিত্যপরিষৎ-সংস্করণ)

'করোমি'র অপভ্রংশ 'করোমি' ললিতবিস্তরে অনেক স্থলে পাওয়া যায়, এবং সর্ব্বত্রই ঐ শব্দ 'করিষ্যামি'র অর্থে ব্যবহৃত দৃষ্ট হয়। পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন স্থলে এখনও 'করুম' ক্রিয়া কথায় ব্যবহৃত হয়। 'মৃগলব্ধ' পুঁথির ভূমিকায় এইরূপ আছে,—

"পিতা গোপীনাথ বন্দম মাতা বসুমতী। জন্মস্থান সুচক্রদণ্ডী চক্রশালা খ্যাতি॥" (২)

'করিমু' প্রাচীন বাঙ্গালা পুস্তকে অনেক স্থলেই পাওয়া যায়। 'কুর্ব্বঃ' হইতে 'করিব' ও ঐরূপেই হওয়া সম্ভব। 'করিমু'র স্থলে কচিৎ 'করিবু' শব্দও প্রাচীন রচনায় দৃষ্ট হয়; যথা,—

---

(১) ৺রামগতি ন্যায়রত্ন প্রণীত বঙ্গভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব, ১ম সংস্করণ, ২২ পৃঃ।

(২) কোন কোন পুঁথিতে "সুচক্রদণ্ডী স্থলে "সুক্ষ দণ্ডী" এইরূপ পাঠ দৃষ্ট হয়।

"নিতি নিতি অপরাধ করে। বলে ডাক কি করিবু তারে ॥" ডাক।

"পৈরাগ মাধব নহি কি করিবু বিচার।" শূন্যপুরাণ, ২ পৃঃ।

প্রাকৃত 'হউ (সং, ভবতু), 'দেউ' (সং দদাতু) স্থলে 'হউক', 'দেউক' বাঙ্গালাতে প্রচলিত। এই 'ক' কোথা হইতে আসিল? বাঙ্গালা অনেক ক্রিয়ার পরই ঐরূপ 'ক'এর ব্যবহার দৃষ্ট হয়, যথা,—করিবেক, খাইবেক, দেখুক ইত্যাদি। গ্রীয়ার্‌সন্ সাহেব বলেন, এই 'ক' কিম্ শব্দ হইতে উৎপন্ন; যখন ক্রিয়া (কৃ, ড়, দা ইত্যাদি) কর্ম্ম অথবা ভাববাচ্যে প্রযুক্ত হয়, তখন তাহার উত্তর কর্তৃসূচক 'ক, প্রত্যয় হইয়া ঐ সকল পদ (করিবেক, হউক, ইত্যাদি) নিষ্পন্ন হয়। (জার্ণ্যাল্ এসিয়াটিক্ সোসাইটি সংখ্যা ৬৪ পৃঃ ৩৫১।) উক্ত শব্দগুলির প্রাকৃতের মত (অর্থাৎ 'ক' ছাড়া) ব্যবহার প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থেও মধ্যে মধ্যে দেখা যায়,—

"জয় জয় জগন্নাথপুত্র দ্বিজরাজ। জয় হউ তোর যত ভকতসমাজ ॥"

চৈ, ভা,—আদি।

"সব্বলোকে শুনিয়া হইল হরষিত। সবে বলে জীউ জীউ এ হেন পণ্ডিত ॥"

চৈ, ভা,—আদি।

সংস্কৃতের 'হি' (যথা 'জানীহি) বাঙ্গালায় শুধু 'হ'তে পরিণত। পূর্ব্বে 'করিহ,' 'যাইও' রূপ বাঙ্গালায় প্রচলিত ছিল। প্রাকৃতেও অনুজ্ঞা বুঝাইতে 'হ'র ব্যবহার দৃষ্ট হয়;—

"আঅচ্ছ পুণো জুদংবমহ।"—মৃঃ কঃ, ২ অঙ্ক।

কোথাও 'হু' দৃষ্ট হয়; যথা—পিঙ্গলে, "মইন্দ করেহু!" এই হু (হুঁ) হিন্দীভাষায় প্রচলিত আছে। পূর্ব্বে বাঙ্গালায় প্রাকৃতের মতই 'য, স্থানে 'জ,' 'য়' স্থানে 'অ' বা 'এ' লিখিত হইত। প্রাচীন হস্তলিখিত পুস্তকে এইরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। মুদ্রিত অনেক পুস্তকেও ঐরূপ লেখার সংশোধন হয় নাই; যথা,—

"উচিত বলিতে পাড়ে গালি। পোযে ঝিযে হয় বেআলি ॥" ডাক।

"পৌসে যার নাহিক ভাত। তার কভু নাহিক সোআথ ॥" ডাক।

হস্তলিখিত পুস্তকে যথা,—

"ভীষ্মক মারিতে জাএ দেব জগন্নাথ। নিভয়ে বেলেগু তবে সংগ্রাম ভিতর ॥"

—কবীন্দ্র;—বেঃ গঃ পুঁথি ১০৫ পত্র।

বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথিগুলির অনেক স্থলে তিনটি 'স' কার (শ, ষ, স), দুইটি জ (জ, য) এবং দুইটি ণ (ণ, ন), স্থলে মাত্র স, জ, ন দৃষ্ট হয়; ইহা প্রাকৃতের অনুরূপ। কেবল 'ন' সম্বন্ধে আমাদের এই বক্তব্য যে, প্রাকৃতে সাধারণতঃ শুধু 'ণ' ব্যবহৃত হইলেও, পৈশাচিক প্রাকৃতে 'ণ' স্থলে 'ন' এর ব্যবহারের ব্যবস্থা আছে, "পৈশাচিক্যাং বণয়োলনৌ" (পৈশাচিক্যাং বেকস্য লকারো

ভবতি ণকারস্য নকার, চণ্ডপ্রাকৃত, ৩৩৮) অনেক প্রাচীন পুঁথিতে প্রাকৃতের মত 'দ' স্থানে 'ড' দৃষ্ট হয় ; যথা,—'দাণ্ডাঙ্কয়া' স্থলে 'ডাণ্ডাঞা, (তবর্গস্য চ টবর্গো। যথা,—দণ্ডঃ ডণ্ডো চণ্ডপ্রাকৃত, ৩।১৬)।

পূর্ব্বকালে ভারতের কথিত ভাষামাত্রই বোধ হয় 'প্রাকৃত' সংজ্ঞায় অভিহিত হইত। বাঙ্গালা ভাষা যে পূর্ব্বকালে 'প্রাকৃত' ভাষা নামেই পরিচিত ছিল, তাহার বহুল প্রমাণ প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যে বিদ্যমান আছে। সঞ্জয়-রচিত একখানি মহাভারতের ২০০ বৎসরের পুঁথিতে রাজেন্দ্রদাসের ভণিতাযুক্ত একটি পদে আমরা এই দুইটি ছত্র পাইয়াছি ;—ভারতের পুণ্য-কথা শ্রদ্ধা দূর নহে। পরাকৃত পদবন্ধে রাজেন্দ্রদাসে কহে॥" বিশ্বকোষ আফিসের (৩৪ নং পুঁথি) কৃষ্ণকর্ণামৃত পুস্তকে "তাহা অনুসারে লিখি প্রাকৃত কথনে।" যদুনন্দনদাস-কৃত গোবিন্দলীলামৃতের অনুবাদে "প্রাকৃত লিখিয়া বুঝি এই মোর সাধ।"—লোচন-দাসে চৈতন্যমঙ্গলের মধ্য খণ্ডে—"ইহা বলি গীতার পড়িল এক শ্লোক। প্রাকৃত প্রবন্ধে কহি শুন সর্ব্বলোক। এবং বিশ্বকোষ অফিসের (২৪৩ সংখ্যক পুঁথি) একখানি গীতগোবিন্দের বঙ্গীয় অনুবাদের দ্বাদশ সর্গের অন্তে এই কয়েকটী ছত্র দৃষ্ট হয় ;—"ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে মহাকাব্যে প্রাকৃতভাষায়াং স্বাধীনভর্তৃকাবর্ণনে সুপ্রীতপীতাম্বরনামঃ দ্বাদশঃ সর্গঃ।" এই কাব্যেব অপর একখানি অনুবাদে (৪৩ সংখ্যক পুঁথি) "ভাঙ্গিয়া করিল আমি সংস্কৃত প্রাকৃতে।" এবং রামচন্দ্র খান প্রণীত অশ্বমেধ পর্ব্বে (২৯৪ সংখ্যক পুঁথি) —"সপ্তদশ পর্ব্বকথা সংস্কৃত ছন্দ। মূর্খ বুঝিবার কৈল পরাকৃত ছন্দ॥" এইরূপ বহুস্থানে বাঙ্গালা ভাষা প্রাকৃত সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছে।

বঙ্গভাষা পূর্ব্বকালে প্রাকৃত নামে অভিহিত হইত।

অপভ্রংশ ভাষার রচনা স্থানে স্থানে বাঙ্গালার সঙ্গে ছত্রে ছত্রে মিলিয়া যায় ; যথা—

"রাই দোহারি পঠন শুণি হাসিঅ কানু গোয়াল।"
(রাইএর দোহারি পাঠ শুনি হাসিয়া কানু গোয়াল।)

—ছন্দোমঞ্জরী, প্রথম স্তবক।

এখন দেখা যাইবে, প্রাকৃত ও বাঙ্গালা ভাষার সঙ্গে তুলনায় সংস্কৃতের সম্বন্ধ অতি কৌতূহল-জনক। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, হিন্দুধর্ম্ম পুনঃপ্রবর্ত্তিত হইলে পর, গৌড়ীয় ভাষাগুলি প্রাধান্য লাভ করে। সংস্কৃতের পুনরুদ্ধারহেতু তদীয় বৈভবে গৌড়ীয় ভাষাগুলি গৌরবান্বিত হইল। ক্রমে প্রাকৃত হইতে উদ্ভূত হইয়াও ঐ সকল ভাষা প্রাকৃতের ঋণচিহ্ন স্খালন করিতে চেষ্টিত হইল। কিন্তু তাহা সম্ভবপর নয়। কেহ ভিন্নদেশীয় পরিচ্ছদ ধারণ করিতে পারে, কিন্তু তাহাব বর্ণ, কথা, ভাবভঙ্গী তাহাকে চিনাইয়া দেয়। পরিচ্ছদ দৃষ্টে ভ্রম অতি স্থূলচক্ষেরই হইয়া থাকে। সংস্কৃতের অধ্যাপকগণ গৌড়ীয় ভাষাগুলিকে পর্য্যাপ্ত

সংস্কৃত প্রাকৃত ও বঙ্গভাষা

সংস্কৃত শব্দে ধনী করিলেন। লাম, চন্দ, লাধা, লেখা দূরে থাকুক, এখন সাধারণতঃ তাহা আর কেহ মুখেও বলে না। তবে যে সকল শব্দ বৎসরে একবারমাত্র ব্যবহার করিলে চলে, সেখানে আচার্য্যের কথা মানিয়া লোকসাধারণের উচ্চারণ সংশোধন করা স্বাভাবিক; কিন্তু যাহা দিনে, দণ্ডে শতবার ব্যবহার করিতে হইবে, সেখানে আচার্য্যের অনুরোধ ও প্রয়াস ব্যর্থ। ক্রিয়াগুলি ও বিভক্তির চিহ্নগুলি সংস্কৃত হইতে অনেক দূরবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছিল, তাঁহার আর সংশোধন হইল না। প্রত্যেক ছত্রের গঠনে প্রাকৃতের ভাব মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহা এখনও সেইরূপই রহিয়াছে। শুধু নামশব্দের পরিবর্ত্তন করিলে এ ঋণ হইতে অব্যাহতি লাভ অসম্ভব। গৌড়ীয় ভাষাগুলির ক্বচিদ্ব্যবহৃত শব্দের সঙ্গে অনেক স্থলেই সংস্কৃতের সাদৃশ্য প্রাকৃত অপেক্ষা অধিক; কিন্তু প্রত্যেক ছত্রের গঠনগত, ক্রিয়াগত, বিভক্তিচিহ্নগত এবং নিত্যব্যবহৃত শব্দগত সাদৃশ্য প্রাকৃত অপেক্ষা অল্প। বলা বাহুল্য, বঙ্গভাষা যে প্রাকৃতের অধিকতর সন্নিহিত, ইহাই তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

শব্দগুলি যে ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া প্রথম প্রাকৃতে, তাহার পর গৌড়ীয় ভাষাগুলিতে পরিণত হইয়াছে, তাহাতে অনেকগুলি নিয়মের ক্রিয়া দৃষ্ট হয়। আমরা কেবল কয়েকটীর উল্লেখ করিতেছি।

সংস্কৃত শব্দ পরিবর্ত্তনের নিয়ম।

আদ্য বর্ণের পরে সংযুক্ত বর্ণ থাকিলে, সংযুক্ত বর্ণের আদ্যক্ষর লুপ্ত হয়, এবং আদ্য বর্ণে আকার যুক্ত হয়। যথা,—হস্তী—হাতি; হস্ত—হাত; সপ্ত—সাত; কক্ষ (১)—কাখ; মল্ল—মাল; লক্ষ—লাখ; অম্র—আম; বজ্র—বাজ; পক্ষ—পাখ; হট্ট—হাট; অষ্ট—আট; কর্ণ—কাণ; কজ্জল—কাজল; অক্ষ—আঁখি; ভল্লুক—ভালুক। কখনও কখনও শেষবর্ণের পরে আকার যুক্ত হয়; যথা,—ছত্র—ছাতা; চক্র—চাকা; চন্দ্র—চান্দা। (২) পক্ব—পাকা; পত্র—পাতা; কর্ত্তা—কাতা। (৩) কখনও বর্ণের শেষে আকার লুপ্ত হয়; যথা,—লজ্জা—লাজ; সজ্জা—সাজ; ঢক্কা—ঢাক। আদ্য বর্ণের

---

(১) কক্ষ, পক্ষ, লক্ষ ইত্যাদির 'ক্ষার উচ্চারণ' খাখ্ এইরূপ ধরা হইয়াছে।

(২) প্রাচীন বাঙ্গালা পুস্তকে 'চাঁদার' প্রয়োগ অনেক স্থলেই দৃষ্ট হয়; যথা,—

১। "দেখিয়া বরের রূপ লেগে গেল ধাঁধা। কি ভাগ্য সাপের মাঝে আলো করে চাঁদা॥" ক, ক, চ।

২। "জিনিয়া প্রভাত-রবি সিন্দুর কৌটার ছবি, তার কোলে চন্দনের চান্দা॥" ক, ক, চ।

৩। "তোমার বদন চান্দা, মোর মন মৃগ বাঁধা, তিল অদ্ধ না দেখিলে মরি॥" ক, ক, চ।

৪। "কাঁদিয়া আঁধার, কলঙ্ক চাঁদার, শ্মর লইল আসি॥" চণ্ডীদাস।

৫। "লগন চাঁদা।" খনা।

(৩) "ধাতা কাতা বিধাতার কপালে দিয়াছি ছাই।" চণ্ডীদাস।

পরস্থিত সংযুক্তবর্ণের আদ্যে 'ং' কি কি 'ন'কার থাকিলে, তাহা চন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়; যথা,— বাঁশ; ষণ্ড—ষাঁড়; হংস—হাঁস; দন্ত—দাঁত; চন্দ্র—চাঁদ।

'অ' স্থানে 'আ' হইবার উদাহরণ-পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে। অনেক স্থলে স্বরবর্ণ ও অন্যান্যরূপেও পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। যথা,—

'অ' স্থানে 'এ';—বঙ্গন—বেগুন।
'আ' স্থানে 'ই';—পঞ্জর—পিঞ্জর; সজ্ঞান—সিয়ানা।
'অ' স্থানে 'উ'; ব্রাহ্মণ—বামুন।
দ্বিপ্রহর—দুপুর; ঔষধ—ওষুধ।

ইহা ব্যতীত অন্যান্য অনেকরূপ সূত্র সঙ্কলিত হইতে পারে। (১)

ট ও ড স্থানে স্থানে 'ড়'তে পরিণত হয়; যথা—ঘোটক—ঘোড়া; ঘট—ঘড়া (২); ষণ্ড—ষাঁড়; চণ্ডাল—চাঁড়াল; ভাণ্ড—ভাঁড়।

'ধ' অনেক স্থলে 'ঝ' বা 'য'তে পরিণত হইয়াছে। যথা,—উপাধ্যায়—ওঝা; বন্দ্যোপাধ্যায় বাঁড়ুয্যা। ১৪।৭৬

স্থানে স্থানে বর্ণ পরিত্যক্ত হইতে দেখা যায়; যথা,—'ক'—সুবর্ণাকার—সোণার; চর্ম্মকার—চামার; কুম্ভকার—কামার; নৌকা—নাও, বা না; কোকিল—কোয়েল; নকুল—নেউল।

'খ'—মুখ—মু (৩)।
'গ'—দ্বিগুণ—দুণা; ভগ্নী—বোন; সুগন্ধ—সোঁধা।
'চ'—সূচি—সুই।
'জ'—রাজা—রায়।
'ত'—ভ্রাতা—ভাই; মাতা—মা; শত—শ; ঘাত—ঘা।
'দ'—হৃদয়—হিয়া; কদলী—কলা; খাদন—খাওন।
'প'—কূপ—কূয়া; প্রাপন—পাওন; পিপাসা—পিয়াসা।
দীপশলাকা—দিয়াশলাই।

---

(১) Beam's *Comparative Grammar* দেখ।

(২) "মনে মনে মহাবীর করেন যুকতি। ধন ঘড়া লয়ে পাছে পালায় পার্ব্বতী।"
ক, ক, চ।

(৩) "নাহি রাঁধে নাহি বাড়ে নাহি দেয় ফু। পরের রাঁধন খেয়ে চাঁদ পানা মু॥"
ক, ক, চ।

'ভ'—নাভি—নাই ; গাভী—গাই।

'ম'—গ্রাম—গাঁ।

কথিত ভাষা এইরূপে সর্ব্বদা সহজ আকারে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। বিম্‌স্ সাহেবের অভিপ্রায়, এই ভাষা লিখিত রচনাতেও প্রবর্ত্তিত হউক। তিনি বঙ্গদেশে সাধুভাষা-প্রয়োগশীল লেখকগণের প্রতি যেন কতকটা বিরক্ত। যাঁহাদের সহজ ভাষা মুখে না বলিলে চলে না, তাঁহারা লিখিতে বসিলেই সংস্কৃতের কথা স্মরণ করেন কেন? তখন 'খাওয়ার' স্থলে 'আহার করা,' 'ভাত' স্থলে 'অন্ন' ও 'জল' স্থানে 'নীর' ব্যবহার না করিলে তাঁহাদের মনঃপূত হয় না। আমাদের মতে এই আড়ম্বরপ্রিয়তা সর্ব্ব স্থলে নিন্দনীয় নহে। বাঙ্গালা ভাষার কল্যাণসাধনহেতু সংস্কৃতের নিকট সততই শব্দ ভিক্ষা করিতে হইবে। যদি বিষয় গৌরবজনক হয়, তবে একটু আড়ম্বরে ভাষার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি ব্যতীত ক্ষতি নাই। বিশেষতঃ ঠিক কথিত ভাষা কখনই লিখিত ভাষায় পরিণত হইতে পারে না। দেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশের প্রচলিত ভাষার একীকরণ জন্য লিখিত ভাষার স্বাতন্ত্র্য আবশ্যক। যদি কলিকাতার কথিত 'গেলুম' লিখিত রচনার স্থান পায়, তাহা হইলে শ্রীহট্টের 'গ্যাছলাম কি 'যাইবাম' সেই অধিকারে বঞ্চিত হইব কেন? স্বদেশ-বৎসলগণ তাহাও চালাইতে কৃতসংকল্প হইতে পারেন। বঙ্গভাষা তাহা হইলে দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে, পৃথক্ ভাব অবলম্বন করিয়া বহুরূপী হইয়া দাঁড়াইবে। লিখিত ভাষার বিশুদ্ধিরক্ষা সেইজন্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু লেখনী লইয়া বসিলেই যে সাধারণ ভাব বুঝাইতেও ভাষার কুজ্ঝটিকাপূর্ণ আভিধানিক ঘোর সমস্যা প্রস্তুত করিতে হইবে, ইহাও বাঞ্ছনীয় নহে। মাইকেল তাঁহার সুহৃদ্ মনোমোহন বাবুর মাতার নিকট পত্রে লিখিয়াছিলেন,—

কথিত ও লিখিত ভাষার প্রভেদ।

"আপনি পরম জ্ঞানবতী সুতরাং ইহা কখনই আপনার নিকট অবিদিত নহে যে, এরূপ তীক্ষ্ণ শর-স্বরূপ শোক এ সংসারে সর্ব্বদাই মানবকুলের হৃদয় বিদ্ধন করে। পিতৃ-চরণ দর্শন সুখ প্রিয়বর যে পৃথিবীতে লাভ করিতে পারিবেন না, ইহাতে তিনি নিতান্ত ক্ষুণ্ণমান।"

এই রচনাকে সহসা পাণ্ডিত্যাভিমান দিতে প্রবৃত্তি হয় না।

তৃতীয় অধ্যায়

পাশ্চাত্য মত,—বিভক্তি-চিহ্ন ও ছন্দ

এই সকল গৌড়ীয় ভাষা সংস্কৃত কি প্রাকৃত হইতে আসে নাই, অপর কোন অনার্য্য ভাষা হইতে উহারা উদ্ভূত হইয়াছে, কয়েক জন পণ্ডিত এইরূপ মত প্রচার করিয়াছিলেন। ক্রফোর্ড, ল্যাথাম, এণ্ডারসন্ কে এবং কল্ড্‌ওয়েল্, এই মতাবলম্বী। ইঁহারা বলেন, বঙ্গীয়, হিন্দী, কি অন্যান্য গৌড়ীয় ভাষার আদিকালে সংস্কৃতের সহিত কোন সংস্রব ছিল না। বিভক্তি ও ছত্রগুলির গঠন দ্বারাই কোন ভাষার আদিনির্ণয় সঙ্গত; কেবল শব্দগত সাদৃশ্য দেখিয়া সহসা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত নহে। তাঁহারা বলেন, আর্য্যজাতি ক্রমে দক্ষিণ পূর্ব্বে অবতরণ করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিলেন, কিন্তু বিজিত অনার্য্যদিগের সঙ্গে বাস হেতু, তাঁহাদের ভাষা পরিগ্রহ করিলেন। সংস্কৃতের প্রভাববিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল ভাষায় বহুলপরিমাণে সংস্কৃত শব্দ প্রবেশ করিল। কিন্তু বিভক্তি-চিহ্ন ও বাক্য-গঠনে উহাদের আদিম অনার্য্য সম্বন্ধ অদ্যাপি বর্ত্তমান। এতদনুসারে ডাক্তার কে বিবেচনা করেন যে হিন্দীর "কো" (যথা 'হামকো') ও বাঙ্গালার "কে" (যথা 'রামকে' তাতার দেশীয় অন্ত্যবর্ণ "ক" হইতে আগত হইয়াছে। ডাক্তার কল্ড্‌ওয়েল্, দ্রাবিড় (১) ভাষার বিরক্তি-চিহ্ন "কু" হইতে হিন্দীর "কো" আসিয়াছে, এইরূপ অনুমান করেন, এবং হিন্দী প্রভৃতি ভাষা দ্রাবিড়-ভাষা-সম্ভূত এই মত প্রচার করেন। ডাক্তার হরন্‌লি ও রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই সব মতের অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। পাদটীকায় কল্ড্‌ওয়েলের যুক্তি ও তাহার বিরুদ্ধে হরন্‌লীর খণ্ডনকারী যুক্তির সারাংশ সঙ্কলিত হইল। (২) গৌড়ীয় ভাষাগুলির বিভক্তি যে সমস্তই সংস্কৃত কি প্রাকৃত

বঙ্গভাষা অনার্য্যভাষা সম্ভূত নহে।

---

(১) দ্রবিড়ভাষা সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত হয় নাই, অনেক পণ্ডিতই এই মতাবলম্বী। See *Comparative Grammar of the Dravidian Languages* by Bishop Caldwell, p. 46, Ed. 1875; also Hunter's *British Empire*, p. 32.

(২) ডাক্তার কল্ড্‌ওয়েল্ বলেন, আর্য্যগণ আর্য্যাবর্ত্ত জয় করিয়া যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই তদ্দেশপ্রচলিত অনার্য্যভাষা সংস্কৃত-শব্দৈশ্বর্য্য দ্বারা পুষ্টিলাভ করিতে লাগিল। এই জন্য ঐ সকল অনার্য্যভাষা সংস্কৃতজাত বলিয়া

হইতে আসিয়াছে, তাহা মিত্র মহোদয়, হরনলি, দিট্যাছি ও জার্ম্মান পণ্ডিতগণ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু বঙ্গভাষার বিভক্তিগুলি সম্বন্ধে এখনও কেহ সম্পূর্ণরূপে স্থির সিদ্ধান্ত করেন নাই। আমরা এই অধ্যায়ে সেই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিব।

ফরাসী ইত্যাদি ভাষার কবিতায় মিত্রাক্ষরযোজনরীতি বর্ব্বর ভাষাবিশেষ হইতে অনুকৃত, এগেুস্, এবং হুয়ে এই মত প্রচার করিয়াছিলেন। এই মত এখন একরূপ খণ্ডিত হইয়াছে। গৌড়ীয় ভাষাগুলিও কোন অনার্য্য ভাষা হইতে নিঃসৃত হইয়া সংস্কৃত অভিধানের সাহায্যে পুষ্ট হইয়াছে, এই মতও এখন দাঁড়াইতে পারিতেছে না। এই সকল মতপ্রচারকদিগের যুক্তি-সেক্সপীয়র ও বেকন এক ব্যক্তি, বুদ্ধ কোন লোকবিশেষের নাম নহে, কাশ্মীরাধিপ মাতৃগুপ্ত ও কালিদাস একই ব্যক্তি,—প্রভৃতি মতবাদীদিগের যুক্তির সহিত এক প্রকোষ্ঠে রক্ষিত হইবে কি না বলিতে পারি না। হয়তঃ দুই এক জন গ্রন্থকীট দৈবাৎ কোন প্রাচীন আলমারীর পুঁথিতে তাঁহাদের বিচিত্র যুক্তিকুহক ও তর্কশক্তির পরিচয় পাইয়া বিস্ময়াপন্ন হইবেন। সম্প্রতি ডাঃ জে, ডি, এণ্ডারসন সাহেব এই মতের পোষকতা করিয়া গিয়াছেন। তিনি শব্দের উচ্চারণের হ্রস্ব দীর্ঘতার আলোচনা করিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইতেছেন যে, হিন্দী এবং বাঙ্গালা দুই স্বতন্ত্র রীতিতে উচ্চারিত হইয়া থাকে এবং বাঙ্গালার উচ্চারণ দ্রাবিড় রীতির অনুযায়ী। এই মত প্রথম আমার নিকট যতটা অদ্ভুত বোধ হইয়াছিল, এখন আর তাহা হয় না।

সহসা ভ্রম জন্মিতে পারে। কিন্তু সংস্কৃতের প্রভাব যতই প্রবল হউক না কেন, ঐ সকল ভাষার ব্যাকরণ তদ্দারা পরিবর্ত্তিত হয় নাই। তাহার উত্তরে ডাক্তার হরনলি বলেন, আর্য্যগণ বহুকাল আর্য্যাবর্ত্তে বাস করিয়া সহসা ঘৃণিত অনার্য্যগণের ভাষা গ্রহণ করিবেন এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে, তাঁহারা যে দীর্ঘকাল সংস্কৃতজাতীয় পালি ও প্রাকৃত ভাষার ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা বিশেষরূপে প্রমাণিত হইয়াছে এবং নাটকাদির প্রাকৃত দ্বারা ইহাও দৃষ্ট হয় যে, বিজিত অনার্য্যগণও তাহাদিগের প্রভুগণের ভাষাই পরিগ্রহ করিয়াছিল। এতাবৎ কাল হিন্দুগণ স্বীয় ভাষা ও ব্যাকরণ অনার্য্যগণের মধ্যেও প্রচলিত রাখিয়া কেনই বা শেষে ঘৃণিত অনার্য্য ব্যাকরণের শরণাপন্ন হইবেন? আর গৌড়ীয় ভাষাগুলির উৎপত্তির সময়ে আর্য্যভাষার সুদীর্ঘ-কালব্যাপী অখণ্ড রাজত্বের পরে যে বিজিত অনার্য্যগণের ভাষা এতদ্দেশে প্রচলিত ছিল, তাহারও কোন প্রমাণ নাই। ইতিহাসে অবশ্য মধ্যে মধ্যে এরূপও দেখা গিয়াছে যে, বিজেতৃ জাতিগণ বিজিতগণের ব্যাকরণ গ্রহণ করিয়াছেন; যথা, নর্ম্মানগণ ইংলণ্ডে, আরব ও তুর্কীজাতিরা আর্য্যাবর্ত্তে এবং ফরাসীগণ গলে; কিন্তু এই সব স্থলে বিজেতৃগণ বিজিতগণ অপেক্ষা অল্পশিক্ষিত ছিলেন এবং উপনিবেশস্থাপনের প্রারম্ভকাল হইতেই বিজিতগণের ভাষাপরিগ্রহের সূত্রপাত হইয়াছিল। বহুকাল বিজয়ী জাতি স্বীয় ভাষা ও স্বাতন্ত্র্যগৌরব রক্ষা করিয়া অসভ্যজাতিগণের নিকট শেষে তাহা বিসর্জ্জন দিয়াছেন, ইতিহাসে কোথাও এরূপ দৃষ্ট হয় না।

J A. S. 1872. Part I., No. II., p 122.

বাঙ্গালা বিভক্তি।

বাঙ্গালা প্রথমা বিভক্তি সংস্কৃতের মত; অনুস্বার কি বিসর্গবর্জ্জিত হয়, এই প্রভেদ। কিন্তু তথাপি উহা যে প্রাকৃতের অবস্থা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে, তাহা স্পষ্টই দেখা যায়। প্রথমার একবচনে প্রাকৃতে কোথাও 'এ' সংযুক্ত দেখা যায়। যথা, 'শু অনেহ, ভিচ্চানকম্পকে শামীএ নিদ্ধেণকেবি শোহেদি। মৃঃ কঃ, ৩ অঙ্ক। কর্ত্তৃবাচক তৃতীয়াতেও প্রাকৃতে ঐরূপ 'এ' অনেক স্থানে দৃষ্ট হয়। এই 'এ' বাঙ্গালা কর্ত্তৃকারকে পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইত। যথা,—

(১) "শুনিয়া রাজা এ বোলে হইয়া কৌতুক। সুগন্ধা অপছরা কেন হৈল মৃগরূপ॥"—সঞ্জয়; আদি।

(২) "কদাচিৎ না দেখিছ হেনরূপ ঠান। কোন মতে বিধাতাএ করিছে নির্ম্মাণ॥"

রামেশ্বরী মহাভারত; বেঃ গঃ পুঁথি; ৮৬ পত্র।

প্রথমার একবচনে ও বহুবচনের প্রভেদ, প্রাকৃতে রক্ষিত হয় নাই। অনেক স্থলেই প্রাকৃতে বহু-বচনে কেবল আকারযুক্ত প্রয়োগ দেখা যায়; যথা,—'ভব অদি তমসে অম্হং দাব পরিসো জাদো দেউণ ণ দেউণ ণ আণামিকুশলবা।' উঃ চঃ, ৩য় অঙ্ক। 'কহিংমে পুত্তআ, উঃ চঃ, ৭ম অঙ্ক।

প্রাচীন বাঙ্গালায় বহুবচনবোধক নামশব্দে অনেক স্থলে ঐরূপ আকার দেখা যায়। যথা,—

"নরা, গজা বিশে সয়, তার অর্দ্ধেক বাঁচে হয়। বাইশ বলদা, তের ছাগলা"। খনা।

ট্রুম্প অনুমান করেন, বাঙ্গালা কর্ম্ম ও সম্প্রদান কারকের 'কে' সংস্কৃতের সপ্তমীতে প্রযুক্ত 'কৃতে' শব্দ হইতে আগত (১) এই 'কৃতের' নিমিত্তার্থ প্রয়োগের উদাহরণ স্থলে স্থলে পাওয়া যায়। যথা—

"বালিশোবত কামাত্মা রাজা দশরথো ভৃশং। প্রস্থাপয়ামাস বনং স্ত্রীকৃতে যঃ প্রিয়ং সুতম্॥"

রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড।

মোক্ষমূলর বলেন, সংস্কৃতের স্বার্থে 'ক' হইতে বাঙ্গালা 'কে' আসিয়াছে। শেষ সময়ের সংস্কৃতে স্বার্থে 'ক'এর বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। আমরা মোক্ষমূলরের মতই সম্পূর্ণ সমীচীন মনে করি। বাঙ্গালা প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথির আলোচনা করিলে এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। এই 'ক' (যথা বৃক্ষক, চারুদত্তক, পুত্রক) প্রাকৃতে অনেক স্থলে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। (২) গাথা ভাষায় এই 'ক'এর প্রয়োগ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; যথা, ললিতবিস্তরের একবিংশোধ্যায়ে,—

---

(১) এই 'কৃত শব্দ প্রাকৃতে 'কিতে,' 'কিও এবং 'কো,' এই তিন রূপেই ব্যবহৃত হইত। ট্রুম্প, অনুমান করেন, শেষোক্ত 'কো'র সঙ্গে হিন্দীর 'কো' ও বাঙ্গালা 'কে'র সাদৃশ্য আছে।

(২) "তাম্রশাসনের ভাষার প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, ইহাতে স্বার্থে 'ক' এর, ব্যবহার কিছু বেশী। দূত' স্থানে 'দূতক', 'হট্ট' স্থানে 'হট্টিকা', 'বাট' স্থানে 'বাটক' 'লিখিত' স্থানে 'লিখিতক' এইরূপ শব্দপ্রয়োগ কেবল উর্দ্ধ তাংশ মধ্যেই দেখা যায়, এমন নহে, সমুদয় শাসনে আরো অনেক দেখা যাইবে।" শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বটব্যাল কৃত, "ধর্ম্মপালের তাম্র-শাসন।" সাহিত্য; মাঘ; ১৩০১; ৬৫৩ পৃং।

"সুবসন্তকে ঋতুবরে আগতকে। রতিমে প্রিয়া ফুল্লিত পাদপকে।
বশবর্ত্তি সুলক্ষণকো বিচিত্রতকো। তবরূপ সুরূপ সুশোভনকো॥
বয়ংজাত সুজাত সুসংস্থিতিকাঃ। সুখ কারণ দেব নারায়ণ বসন্ততিকাঃ।
উত্থি লঘু পরিভুঞ্জ সুযৌবনকং। দুর্লভ বোধি নিবর্ত্তয় মানসকম্॥" ইত্যাদি।

বাঙ্গালায় পূর্ব্বে এই 'ক' সংস্কৃত ও প্রাকৃতের মতই ছিল। পূর্ব্ববঙ্গে ২০০ বৎসরের পূর্ব্বের পুঁথিগুলিতে এই 'ক' এর প্রয়োগ অসংখ্য। আমরা এই স্থলে কয়েকটিমাত্র ছত্র উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব।

(১) "রথ হৈতে ফাল (লাফ) দিয়া চক্র লৈয়া হাতে।
ভীষ্মক মারিতে যায়, দেব জগন্নাথে॥"—কবীন্দ্র; বেঃ গঃ, ১০৬ পত্র।
(২) 'ভীষ্মক-ভয়ে যত সৈন্য যায় পলাইয়া।" ঐ
(৩) "সে যে ভার্য্যা অনুক্ষণ পতিক সেবয়।"—সঞ্জয়।
(৪) "শিখণ্ডীক দেখিয়া পাইবা অনুতাপ।"—কবীন্দ্র; বেঃ গঃ, ৭৫ পত্র।
(৫) "পঞ্চ ভাই দ্রৌপদীক কুশল জানাইব।" ঐ; ৭৭ পত্র।

এই ভাবে কর্ত্তা এবং কর্ম্ম উভয় স্থলে 'ক' থাকিলে কোনটী কর্ত্তা, কোন্‌টী কর্ম্ম, পরিচয় পাওয়া কঠিন। "সৌরন্ধ্র ক কীচক বোলয়ে ততক্ষণ"—(১) ছত্রে কে কাহাকে বলিল, নির্ণয় করা সহজ নহে। সেই জন্য কর্ম্ম ও সম্প্রদানে বাঙ্গালায় 'ক'র ব্যবহার পরে প্রচলিত হইল। গাথা ভাষায় ও প্রাকৃতে মধ্যে মধ্যে 'কে'র প্রয়োগ দৃষ্ট হয় যথা প্রাকৃতে,—

"পালি ও আদুদাসী এ পুত্তে দলিদ্দ চালুদত্তাকে তুমং।"—মৃঃ কঃ, ৮ম।

কোন কোন স্থলে বাঙ্গালা কর্ম্মকারকে কোন বিভক্তি-চিহ্নই প্রযুক্ত হয় না। যথা,—আম গাছ কাটিয়াছে। এইরূপ ব্যবহার ও পূর্ব্বোক্ত 'ক'-যুক্ত ব্যবহারের সহিত পূর্ব্বে কোন পার্থক্যই ছিল না। কারণ 'ক' পূর্ব্বে বিভক্তিবোধক চিহ্ন বলিয়া পরিগণিত ছিল না, উহা শব্দের অন্ত্যবর্ণ মাত্র ছিল। এই জন্য প্রাচীন কালে কর্ম্ম ও সম্প্রদান ব্যতীত অন্যান্য বিভক্তিতেও 'কে' ব্যবহৃত হইত। যথা,—

"মথুরাকে পাঠাইল রূপ সনাতন।" (চৈ, চ; আদি, ৮ম পঃ)

বহুবচন বুঝাইবার জন্য পূর্ব্বে শব্দের সঙ্গে শুধু "সব," "সকল" প্রভৃতি শব্দ সংযুক্ত হইত। যথা,—

"তুমি সব জন্ম জন্ম বান্ধব আমার। কৃষ্ণের কৃপায় শাস্ত্র স্ফুরুক সবার॥" চৈ ভা; আদ।

ক্রমে "আদি" সংযোগে বহুবচনের পদ সৃষ্ট হইতে লাগিল। যথ, নরোত্তমবিলাসে,—

শ্রীচৈতন্যদাস আদি যথা উত্তরিলা। শ্রীনৃসিংহ কবিরাজে তথা নিয়োজিলা॥

---

(১) কবীন্দ্র; বেঃ গঃ। ৬০ পত্র।

শ্রীপতি শ্রীনিধি পণ্ডিতাদি বাসা ঘরে। করিলেন নিযুক্ত শ্রীব্যাস আচার্য্যেরে॥
আকাই হাটের কৃষ্ণদাসাদি বাসায়। হইলা নিযুক্ত শ্রীবল্লভীকান্ত তায়॥

এইরূপে, "রামাদি", "জীবাদি", হইতে ষষ্ঠীর 'র' সংযোগে 'রামদের, জীবদের উদ্ভূত হইয়াছে। ইহা স্পষ্টই দেখা যায়।

আদি শব্দের উত্তর স্বার্থে 'ক' যুক্ত হইয়া 'বৃক্ষাদিক, 'জীবাদিক' শব্দের সৃষ্টি স্বাভাবিক। ফলতঃ উদাহরণেও তাহাই পাওয়া যায়। যথা, নরোত্তমবিলাস,—

"রামচন্দ্রাদিক যৈছে গেলা বৃন্দাবনে। কবিরাজ খ্যাতি তার হইল যেমনে।"

এই 'ক' এর 'গ' এ পরিণতিও সহজেই প্রতিপন্ন হইতে পারে। সুতরাং বৃক্ষাদিগ (বৃক্ষদিগ) জীবাদিগ (জীবদিগ) শব্দ পাওয়া যাইতেছে। এখন ষষ্ঠীর র-সংযোগে দিগের এবং কর্ম্মের ও সম্প্রদানের চিহ্নে পরিণত 'কে'র সংযোগে দিগকে পদ উৎপন্ন হইয়াছে, এরূপ বলা যাইতে পারে। (১) কাহারও কাহারও মতে পার্শী দিগর শব্দ হইতে বাঙ্গালা দিগের শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে।

আদি শব্দের সংযোগ ব্যতীত 'ক' বর্ণকে 'গ"এ পরিণত করিয়া পূর্ব্বাঞ্চলবাসিগণ আমাগো, রামগো প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার করেন। ঐ কথাগুলি দ্বারা 'অকস্মাৎ', 'রামকঃ, প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে প্রচলিত বাক্যের নিকট সম্বন্ধ প্রতীয়মান হইয়া থাকে।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের মতে, প্রাকৃত 'কেরউ' হইতে বাঙ্গালা 'গুলো' শব্দের জন্ম। হিন্দী 'ঘোড়াকের, নেপালী ঘোড়াহেরু বাঙ্গালা ঘোড়াগুলো একই অর্থবাচক ও একই ভাবে উদ্ভূত; (২) কিন্তু 'বালকটি', 'একটি', দুইটি'—ইত্যাদি ভাবের 'টি' স্পষ্টতই 'গুটি' শব্দ হইতে আসিয়াছে। প্রাচীন পুস্তকে ঐ ভাবে গুটি শব্দের প্রয়োগ অনেক স্থলেই পাওয়া যায়। যথা,- "দুইরো দুই কুটুম্ব আবার আন নাই। দন্দবাদ না করিবি দুই গুটি ভাই।" (দুয়ের দুই আত্মীয়, আর অন্য কে নাই, দুই ভাই দ্বন্দ্ব করিও না)—অনন্ত রামায়ণ। কাহারও কাহারও মতে "কুল" শব্দ হইতে "গুলো" উৎপন্ন হইয়াছে।

করণ কারকের পৃথক চিহ্ন বাঙ্গালায় নাই বলিলেও হয়। সংস্কৃত 'রামেণ' স্থলে প্রাকৃতে 'রামে' ব্যবহৃত হইত। ইহা হইতে বাঙ্গালায় পূর্ব্বে "রামে ডাকিয়াছে", "রাজায় (এ) বলিয়াছে" ইত্যা

---

(১) এই বিভক্তি-চিহ্ন প্রাকৃত হইতে আগত হয় নাই। ইহা সংস্কৃতের অভ্যুদয়ের পরে গঠিত হইয়াছে, তাই সংস্কৃতে সঙ্গে অধিক সংশ্লিষ্ট। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের প্রাচীন পুস্তকগুলিতে এইরূপ প্রয়োগ আদৌ নাই 'দিগকে' দিগের' এখন পূর্ব্ববঙ্গে কথায় প্রচলিত হয় নাই।

(২) ভারতী, ১৩০৫,—জ্যৈষ্ঠ।

রূপ প্রয়োগ প্রচলিত ছিল। এখনও "কুড়ালে পা কাটিয়াছে", "নৌকায় বাড়ী গিয়াছে" প্রভৃতি দৃষ্টান্তে প্রাকৃতের সঙ্গে বাঙ্গালার নৈকট্য দৃষ্ট হয়। 'দ্বারা' শব্দ সংস্কৃত 'দ্বার' শব্দ হইতে আগত উহা কথিত ভাষায় 'দিয়া'তে পরিণত। সম্প্রদান সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। বাঙ্গালায় কর্ম্মকারকের সঙ্গে সম্প্রদানকারকের কোন প্রভেদ নাই। প্রাকৃতে 'হিংতো' শব্দ (১) পঞ্চমীর বহুবচনে ব্যবহৃত হইত। এই 'হিংতো হইতে বাঙ্গালা 'হইতে' আসিয়াছে। এই 'হিংতো' পূর্ব্বে বাঙ্গালায় 'হন্তে' রূপে প্রচলিত ছিল। যথা,—

'কাকে ক'ল্ল নির্বলী কাহাকে বলী আর। হাড় হন্তে নির্ম্মিয়া করয় পুনি হাড়॥"

আলওয়াল কৃত পদ্মাবতী, ২ পৃষ্ঠা।

এই 'হিংতো'র অপর রূপ 'হনে' ও পূর্ব্ববঙ্গের প্রাচীন পুঁথিগুলিতে অনেক স্থলেই দৃষ্ট হয়। যথা,—

"তাকে দেখি মোহ পাইলু না দেখিলু পুনি। সেই হনে প্রাণ মোর আছে বা না জানি॥"—সঞ্জয় আদি।

প্রাকৃত ষষ্ঠীর চিহ্ন 'ণ' (২) বাঙ্গালা 'র'কারে পরিণত হয়। প্রাকৃত 'অগ্গীণ' স্থলে আমরা বাঙ্গালায় 'অগ্নির' পাইতেছি। 'ণ' সচরাচরই 'র' বা 'ড়'তে পরিণত হয়। এই পরিণতি সম্বন্ধে যদি কেহ বিশেষ প্রমাণ চান, তবে উড়িষ্যা দেশ ঘুরিয়া আসিলেই তাঁহার প্রতীতি জন্মিবে। কিন্তু ষষ্ঠীর সম্বন্ধে মতান্তর আছে। বপ অনুমান করেন, হিন্দীর 'কা' এবং বাঙ্গালা ষষ্ঠীর চিহ্ন সংস্কৃত ষষ্ঠীর বহুবচনের 'অস্মাকম্, 'যুষ্মাকম্' ইত্যাদির 'ক হইতে আসিয়াছে। (৩) কিন্তু হরনূলি সাহেব, বপের অনুমানের বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি দেখাইয়াছেন; এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। (৪) তাঁহার মতে, সংস্কৃত কৃতের প্রাকৃত রূপান্তর হইতেই বাঙ্গালা এবং হিন্দী ষষ্ঠীর চিহ্ন আসিয়াছে। 'কৃতে' হইতে প্রাকৃত 'কেরক' উৎপন্ন হইয়াছে। এই 'কেরকে'র অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। সেই সেই স্থলে 'কেরকে'র কোন স্বকীয় অর্থ দৃষ্ট হয় না, উহা শুধু ষষ্ঠীর চিহ্নস্বরূপই ব্যবহৃত হয়। যথা,—

"তুমং পি অপ্পণো কেরিকং জাদিং সুমরেসি।"—মৃঃ কঃ ৬ষ্ঠ অঙ্ক।

"কস্স কেরকং এদং পবণম্."

এই 'কেরক' (বা 'কেরিক') হইতে হিন্দী 'কর, কের, 'কেরি' আসিয়াছে। যথা,— তুলসীদাসের রামায়ণে—'ক্ষত্রজাতিকের রোষ'—লঙ্কাকাণ্ড। 'বন্দৌং পদসরোজ সবকেরে'—বালকাণ্ড।

---

(১) "ভাসো হিংতো সুংতো।"—ইতি বররুচিঃ।

(২) টামোর্ণঃ। অতোঽনন্তরং টামোস্তৃতীয়ৈকবচনষষ্ঠীবহুবচনয়োর্ণকারো ভবতীতি।—বররুচিঃ।

(৩) Bopp's *Comparative Grammar*, para 330, Note.

(৪) Journa Asiatic Soeiety. 1872, No II., p. 125.

এই 'কেরক' হইতে যেরূপ হিন্দীর 'কের' ইত্যাদি আসিয়াছে, সেইরূপ অন্য দিকে বাঙ্গালা ও উড়িয়া ষষ্ঠীর চিহ্ন 'এর' ও 'র উদ্ভূত। (১) রাজা রাজেন্দ্রলাল অনুমান করেন, বাঙ্গালা ষষ্ঠীর 'র' সংস্কৃত 'স্য'. হইতে আগত। এই মতের-সাপেক্ষ বলা যাইতে পারে যে, 'সে' এবং 'র' উভয়ই বিসর্গে পরিণত হয়। অনেক স্থলে (যথা, বহির্গত) স, রেফ অর্থাৎ রকারে পরিণত হয়। সপ্তমীর 'তে' সংস্কৃত 'তসিল' হইতে উৎপন্ন। সংস্কৃতের একার—যথা গহনে, কাননে,—প্রাকৃত এবং বাঙ্গালায় ঠিক তদ্রূপই আছে। কিন্তু বাঙ্গালার সপ্তমী একেবারে প্রাকৃত-চিহ্ন বর্জ্জিত নহে। সংস্কৃত শালায়াং, বেলায়াং, ভূম্যাং এর স্থলে প্রাকৃত শালাএ, বেলাএ, ভূমিএ দৃষ্ট হয়। প্রাচীন হস্ত-লিখিত বাঙ্গালা পুস্তকেও ঐ সব শব্দ প্রাকৃতের মতই পাওয়া যায়। আধুনিক 'শালায়, 'বেলায় 'এ' 'য়' হইয়াছে, এইমাত্র প্রভেদ।

বঙ্গভাষার ইতিহাসে বিভক্তির অধ্যায় অতি প্রয়োজনীয়। আমরা তাহা সংক্ষেপে আলোচনা করিলাম। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় এ বিষয়ে একেবারেই হস্তক্ষেপ করেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন,—"কিন্তু এই সকল বিভক্তি-চিহ্ন যে কোথা হইতে আসিল, তাহা ঠিক বলা যায় না।" (২) আমরাও হয়ত তাহা ঠিক বলিতে পারিলাম না।

বাঙ্গালার আদিম অসভ্যদিগের ভাষার সঙ্গে, আর্য্যদিগের কথিত ভাষা বহু পরিমাণে মিশ্রিত হইয়াছে। কোন্‌গুলি অনার্য্য-শব্দ, তাহার নির্ণয় সহজ নহে। এই বাঙ্গালাভাষার সঙ্গে অনেক শব্দ মিশ্রিত আছে, যাহা পার্শী, আরবী, কি উর্দ্দূতে নাই;—সংস্কৃত কি প্রাকৃত হইতেও তাহাদের উদ্ভবের কোন চিহ্ন লক্ষিত হয় না। ৺রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় উদাহরণ দিয়াছেন, যথা,—কুলা, ঢেঁকি, ধুঁচনি; এই ধুঁচনি শব্দ সংস্কৃত ধৌত শব্দ হইতে আগত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। বঙ্গীয় অভিধানে অনেক শব্দ দেশজ সংজ্ঞায় আখ্যাত হইয়াছে। প্রকৃতিবাদ অভিধানের সমগ্র শব্দসংখ্যা

অসভ্যগণের ভাষার কথঞ্চিৎ মিশ্রণ।

---

(১) In using কের in composition with the word in the genitive case, the initial 'ক' of the former is elided regularly. Thus we arrive at এর. Take for instance the genitive of সন্তান a child, It wold be সন্তানকেরকো ; this would change to সন্তানকের and this to সন্তান এর—সন্তানের which is the present genitive in Bengali. By analogy the other, Bengali genitive post—posi tion র which it shares wlth the Oriya, is probably a curtailment of the genitive case 'কর'—as ঘোড়াকর, ঘোড়াঅর,—ঘোড়ার। Journal Asiatte Society. 1872, No. II. p. 132—133.

(২) রামগতি ন্যায়রত্ন প্রণীত 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব'—প্রথম সংস্করণ পৃঃ ২০।

প্রায় সপ্তবিংশ সহস্র হইবে, তন্মধ্যে অন্যূন অষ্টশত শব্দ '<u>দেশজ</u>' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। (১) এই '<u>দেশজ</u>'-সংজ্ঞা-বিশিষ্ট শব্দগুলির ভালরূপ পর্য্যালোচনা করিলে ইহাদের অধিকাংশের মধ্যেই সংস্কৃতের ঘ্রাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা,—আজ, হুল, ওছা, পাণ্ডা, ফাঁপা, পোণে ইত্যাদি শব্দ '<u>দেশজ</u>' বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, ইহারা বোধ হয় অদ্য, শূল, উচ্ছিষ্ট, পণ্ডিত, স্ফীত, পাদোন ইত্যাদি সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে কোন না কোনরূপে সংশ্লিষ্ট। দেশজ-আখ্যা-বিশিষ্ট শব্দগুলির কতক অনার্য্য ভাষা হইতে গৃহীত, ইহা অসম্ভব নহে, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই সংস্কৃত বা প্রাকৃতের অপভ্রংশ বলিয়া বোধ হয়। কোন্ শব্দ বিকৃত বা পরিবর্ত্তিত হইয়া কি আকার ধারণ করে, তাহা অনেক সময় বুঝিয়া উঠা দুষ্কর। ইংরাজীতে মারগ্রেট্ হইতে 'পেগ্', এলিজাবেথ্ হইতে 'বেস্' যে দুর্জ্জেয় নিয়মে উৎপন্ন তাহা নিরূপণ করা সুকঠিন। এই প্রাকৃত-সম্ভূত বঙ্গভাষায় পার্শী, ইংরেজী, আরবী, পর্ত্তুগীজ, মগী প্রভৃতি নানা ভাষার শব্দ আছে। তবে অনুকৃতি দ্বারাও অনেক শব্দ আপনা-আপনি রচিত হয়; যথা,—ময়ূরের 'কেকা', বানরের 'কিচ্‌মিচ্।' কিঞ্চিৎ অনার্য্য শব্দের মিশ্রণ গ্রীকে আছে, লাটিনে আছে, সংস্কৃতে আছে, বাঙ্গালায়ও আছে; সে জন্য বাঙ্গালা ভাষার জাতি যায় নাই।

এখন বাঙ্গালা ভাষার ছন্দ পর্য্যালোচনা করা যাউক। '<u>পয়ার</u>' শব্দটি 'পদ' (চরণ) হইতে আসিয়াছে, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের এই মত গ্রহণীয় বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু পণ্ডিত মহাশয় বাঙ্গালা পয়ার কোথা হইতে আসিল, এই প্রশ্ন লইয়া একটু গোলে পড়িয়াছেন, এবং "কবিমা ব্যবকসায় বর্‌হালেমা" ইত্যাদি পার্শীর বয়েৎ তুলিয়া গবেষণা করিয়াছেন।

ছন্দ।

অতি প্রথমে ভাটগণ বিবাহাদির উপলক্ষে পাত্র-পাত্রীর গৃহে যশোগান করিত। পাল-রাজগণের স্তুতি-ব্যঞ্জক কবিতা বাঙ্গালা ভাষার অতি প্রাচীন গীত। তাহা ভাটগণের দ্বারাই প্রথম প্রচারিত হয়। এইরূপ গীতির প্রথা ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন। (২) প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য খুঁজিলেও অনেক স্থলেই এই ভাটগীতির উল্লেখ পাওয়া যায়। (৩)

---

(১) প্রকৃতিবাদ অভিধান; দ্বিতীয় সংস্করণ, সংবৎ ১৯৩৩।

(২) "The institution of Bhats is as old as Indo-Aryan civilization"—Indo-Aryans, Vol. II, P. 293.

(৩) "গাহিলে শুনিনু অপরূপ ধ্বনি কদম্বকানন হৈতে। তার পর দিন ভাটের বর্ণনা শুনি চমকিত চিতে॥"
"আর একদিন মোর প্রাণসখী কহিলে যাহার নাম।
গুণিগণ-গানে শুনিনু শ্রবণে তাঁহার নাম॥" প, ক, ত, ৩৩ নং।

শুধু ভাট-সংগীত নহে, পূর্ব্বে বাঙ্গালা রামায়ণ, মহাভারত, বৈষ্ণবদিগের গীতি সমস্তই গায়কেরা সুরসংযোগে গান করিত। চৈতন্য-ভাগবতের পূর্ব্ব নাম চৈতন্যমঙ্গল ছিল। রামমঙ্গল, চৈতন্যমঙ্গল, মনসামঙ্গল—এ সমস্তই গানের পালা। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে ত্রিপদী স্থলে 'লাচাড়ী' (সম্ভবতঃ লহরী শব্দের অপভ্রংশ, কেহ কেহ মনে করেন 'লাচাড়ী' নাচুনী শব্দ হইতে আসিয়াছে। কিন্তু প্রাচীনতম পুঁথিগুলিতে যেস্থানে শোক বর্ণনা করা হইয়াছে অধিকাংশ স্থলে সেইখানেই লাচাড়ী ছন্দ দেওয়া হইয়াছে, কিম্বা 'দীর্ঘছন্দ' বা কোন রাগ রাগিণীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়।) লেখকগণ স্ব স্ব ভণিতায় রামায়ণ গান দ্বিজ মন অভিলাষে" কি "পয়ার প্রবন্ধে গাহে কাশীরাম দাস" ইত্যাদি ভাবে পাদপূরণ করিয়াছেন। এই সব গান এক জনে গাহিয়া যাইত ও তাহার সঙ্গিগণ গীতির একভাগ সমাপ্ত হইলে সমবেত কণ্ঠে ধুয়া গাহিত। প্রাচীন বাঙ্গালা যে কোন গ্রন্থে ঐরূপ ধুয়া অনেক পাওয়া যায়। ভারতচন্দ্রের ধুয়াগুলি ভাষার মাধুর্য্যে অতুলনীয়, কিন্তু অন্যান্য প্রাচীন পুস্তকেও ধুয়াগুলি মাঝে মাঝে মধুর।

"দান দিয়া যাও মোরে বিনোদিনী রাই। বারে বারে ভাঁড়িয়াছ নাগর কানাই॥"

নারায়ণ দেবের পদ্মপুরাণ ;—হস্তলিখিত পুঁথি।

"রাম-নামের মহিমা কে জানে,
নাম সুধাময় অতি, গঙ্গা ভাগীরথী
উৎপত্তি ও রাঙ্গা চরণে।"

কৃত্তিবাসী রামায়ণ ; উত্তরকাণ্ড (হস্তলিখিত পুঁথি)।

গানে অক্ষর লইয়া কোন বাঁধাবাঁধি থাকে না, মাত্রার দিকেই অধিক দৃষ্টি থাকে। তাই পূর্ব্বকালের পয়ারে কোন শৃঙ্খলা দৃষ্ট হয় না। আমরা বাঙ্গালা পদ্যের প্রাচীনতম যে নিদর্শন পাইয়াছি, তাহাতে কোন ছন্দ বা প্রণালী দৃষ্ট হয় না। ডাক ও খনার বচন ছন্দোবদ্ধ কবিতা বলিয়া বোধ হয় না। উহাতে মিলের দিকে বিশেষ দৃষ্টি নাই। মাণিকচাঁদের গানে (১) অক্ষর, যতি বা মিলের কিছুমাত্র নিয়ম দৃষ্ট হয় না। ভাব প্রকাশের প্রয়োজন হইলে, অক্ষর সংখ্যা ২৪, ২৫, এমন কি ২৬ও অতিক্রম করিয়াছে ; আবার স্থলবিশেষে তাহা সংক্ষিপ্ত হইয়া ১২ কি ২০এ অবতরণ করিয়াছে, এরূপ দৃষ্ট হয়। মিলের প্রতি কথঞ্চিৎ দৃষ্টি আছে, কিন্তু অনেক স্থলেই নিয়ম লঙ্ঘিত হইয়াছে ; সুতরাং মিল নিয়মাধীন ছিল বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কয়েকটি স্থল উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব ;—

"যাঁহার মুরলিধ্বনি শুনি সেই বটে এই রসিকমণি।
ভাটমুখে যার গুণ গাঁথা দূতী মুখে শুনি যাঁর কথা॥" প, ক, ত, ৩৬ নং।

(১) Journal Asiatic Society, Bengal, 1878.—Part I., No. 3, P. 146.

(১) পরিধানের সাড়ী অর্দ্ধখান ময়নামতী দিল জলত বিছায়া। যোগ আসন ধরিল ময়না ধরম সরণ করিয়া॥

(২) সাত দিয়া সাত জনা গর্জ্জিয়া সোন্দাইল। চামের দড়া দিয়া বাঁধিল॥

(৩) তোর মাইয়া পাইয়াছে গোরকনাথের বর। নাগাইল পাইলে ময়না না করে কুসল॥

(৪) তোমার বুদ্ধি নয় বধু সকলের চক্র। যত বুদ্ধি শিখিয়ে দেয় নিরাসী সকল॥

কিন্তু এই গীতি এবং রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ, গোরক্ষবিজয়, ও ডাকের বচন প্রভৃতি ছাড়িয়া দিলে পরবর্ত্তী যে কবিতা দৃষ্ট হয়, তাহাতেও ত্রিপদী এবং পয়ারাখ্য কবিতার চরণ বর্ত্তমানরূপ সীমাবদ্ধ দৃষ্ট হয় না। চৈতন্যভাগবত প্রভৃতি দুই একখানি পুস্তকে পয়ার অনেকটা নিয়মিত দেখা যায়। অন্য সমস্ত পুস্তকেই ঐরূপ নিয়মের ব্যতিক্রমই অধিকাংশ স্থলে দৃষ্ট হয়। হস্তলিখিত পুঁথি যত প্রাচীন, যতি ও অক্ষরের ব্যতিক্রম তত অধিক। ত্রিপদীর ন্যায়, পয়ারও ভিন্ন ভিন্ন রাগ রাগিণী সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছে,—তাহার অনেক উদাহরণ দেখা যায়। নিম্নলিখিত পয়ার গান্ধার রাগ' অভিধান প্রাপ্ত হইয়াছে।

রাগ শ্রীগান্ধার।

"যুদ্ধে ত মরা হৈলে হয় স্বর্গগতি। পলাইলে অযশ হয় নরকে বসতি॥
এ বুলিয়া বৃহন্নলা ধরিবারে জায়। অন্তরে থাকিয়া সব কুরুবলে চাএ॥
নড়এ মাথার বেণী নপুংশক বেশে। দশপদ অন্তরে ধরিল গিয়া কেশে॥
কাকুতি করএ তবে উত্তর কুমার। না কর না কর মোর প্রাণের সংহার॥
স্থণ বৃহন্নলা মুই করম নিবেদন। রথ বাহুড়াই আমার রাখহ জীবন॥
একশত সুবর্ণ দিমু শুদ্ধ সুগঠিত। অষ্টশত মণি দিমু কাঞ্চন ভূষিত॥
বৈদূর্য্য বিচিত্র দিমু মণি মনোহর। দশ হস্তী দিমু তোক পরম সুন্দর॥"

কবীন্দ্র—বেঃ, গঃ পুঁথি, ৬৫ পত্র। (১)

এই পয়ার,—গান্ধাররাগে গীত হইলে কেমন শুনাইবে, তাহা আমরা বলিতে পারি না।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, গানে চৌদ্দ অক্ষরের নিয়মপালনের প্রয়োজন ছিল না, উপরি উদ্ধৃত অংশটি আমরা অক্ষর-নিয়ম-ভঙ্গের উদাহরণ স্বরূপ বাছিয়া উঠাই নাই, তথাপি উহার ১৪ চরণের মধ্যে ৫টি চরণে পয়ার নিয়মের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। প্রাচীন বাঙ্গালা যে কোন পুঁথি খুঁজিলেই ১১ হইতে ২০

---

(১) আমরা উদ্ধৃত অংশের অনেক স্থলেই বর্ণাশুদ্ধি সংশোধন করিব না। প্রথমতঃ, প্রাকৃতের সঙ্গে বঙ্গভাষার নৈকট্য দেখাইতে মূল হাতের লেখা অবিকৃত রাখা আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ, উদ্ধৃতকারীর প্রাচীন রচনা সংস্কার করিবার অধিকার আছে কি না তাহা সন্দেহস্থল। যাহা আমরা ভ্রম বিবেচনা করিয়া সংশোধন করিতে প্রয়াসী, তাহাই হয়ত ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কার করিবার একমাত্র পন্থা—শুদ্ধ করিতে গেলে সেই পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। তবে নকলকারীর অজ্ঞতা গ্রন্থকারের উপর আরোপ করা উচিত নহে।

অক্ষরের পয়ার বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হইবে। আমরা কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি; পাঠক সেগুলিতে অমিল পদ ও অক্ষরের ব্যতিক্রম উভয়েরই দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইবেন।

(১) সম্মুখে রাখিয়া করে বসনের বা। (১৩)
মুখ ফিরাইলে তার ভয়ে কাঁপে গা॥ (১৩) চণ্ডীদাস।

(২) ভৈরব সুত গজপতি বড় ঠাকুরাল। (১৪)
বারাণসী পর্য্যন্ত কীর্ত্তি ঘোষয়ে যাহার॥ (১৪) রামায়ণ; হস্তলিখিত পুঁথি।

(৩) যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণ নাম। (১৫)
তাঁহারে জানিও তুমি বৈষ্ণব প্রধান॥ (১৪) চৈঃ, চঃ, ১৬ পঃ।

(৪) খই কদলক আর তৈল হরিদ্রা। (১৩)
প্রত্যেক সবারে দিল শচী সুচরিতা। (১৪) চৈ ম, আদি।

(৫) ক্ষৌণি-কল্পতরু শ্রীমান দীন দুর্গতি বারণ। (১৭)
পুণ্য-কীর্ত্তি গুণাম্বাদী পরাগল খান॥ (১৪)
কবীন্দ্র; বেঃ গঃ পুঁথি। ৪৫ পত্র।

(৬) নারায়ণ নাম ফল কহিব একে একে। (১৫)
অজামিল মুক্তিপদ পাইল যেমতে॥ (১৪) শ্রীকৃষ্ণ বিজয়।

(৭) চৈতন্যচন্দ্রের পুণ্য বচন চরিত্র। (১৪)
গুরু প্রসাদে স্ফুরে জানিহ নিশ্চিত॥ (১৩) চৈ, ভা।

(৮) আজ্ঞা নাহি দেয় রাজা করি মায়া মো। (১৩)
শ্রীমন্তের নাহি রহে লোচনের লো॥ (১৩) ক, ক, চ।

(৯) প্রতি দ্বারে শোভে অতি বিচিত্র কপাট। (১৪)
প্রতি গলি নৃত্য গীত আনন্দিত প্রতি ঘরে বেদপাঠ॥ (২০)
জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গল।

এইরূপ অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। ত্রিপদীর (লাচাড়ীর) অবস্থা ইহা হইতেও শোচনীয় ছিল। কবীন্দ্র-রচিত ভারত হইতে নিম্নে ত্রিপদীর দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। ইহা কি প্রকারের পদ্য এবং কি রীতিতে সে কালের কাব্যাস্বাদিগণ ইহা পড়িয়া সুখী হইতেন, নিরূপণ করা সুকঠিন।

দীর্ঘছন্দ।

শিশু হোতে পুত্র, দেব গুরু পুজন্ত,
নাহিক যে পরস্পর ভেদ।
বিপ্র তর্পন্ত, সতত করেন্ত,
অভ্যাস করন্ত ধনুর্ব্বেদ॥

সতত সত্য ছাড়ি, অসত্য না বোলন্ত।
প্রতিবর্গের প্রাণ সমসর,
বিচিত্র যোদ্ধা মহাবীর।
মাদ্রী গর্ভে হৈল, মোহর প্রিয় পুত্র,
নকুল কোমল শরীর॥
বহু শত্রু ক্ষয়, করিল পুত্র মোর,
পুনি কি দেখিনু নয়নে।
কহত গোবিন্দ, হাহা শিশু পুত্র,
নকুল চলিয়া গেল বনে॥
কবীন্দ্র ; বেঃ, গঃ পুঁথি, ৭৯ পত্র।

এইরূপ দৃষ্টান্ত অল্প নহে, অনেক পাওয়া যায়। যে সময় অবধি গান আর কবিতার অধিকার পৃথক্ হইয়াছে, সেই সময় হইতে কবিতায় যতি ও অক্ষরের নিয়ম এত বাঁধাবাঁধি হইয়াছে।

এই সমস্ত ছন্দই যে সংস্কৃত এবং প্রাকৃতের অনুকরণে, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। যদি আদি হইতেই বাঙ্গালা পয়ারে চতুর্দ্দশ অক্ষর থাকিত, তবেও কি ইহার আদি খুঁজিতে আমাদের পার্শীর বয়েৎ খুঁজিতে হইত! এক হইতে ২৭ অক্ষর পর্য্যন্ত পদ সংস্কৃতে বহুল পরিমাণে রহিয়াছে; সুতরাং বাঙ্গালা ছন্দের কাঙ্গাল নহে। নিম্নোদ্ধৃত চতুর্দ্দশ অক্ষরযুক্ত সংস্কৃত কবিতা দুটির যতিও বাঙ্গালার মত।

"ফুল্লং বসন্ততিলকং তিলকং বনাল্যা লীলাপরং পিককুলং কলমত্র রৌতি।
বাত্যেষ পুষ্প সুরভির্মলয়াদ্রিবাতে যাতো হরিঃ স মথুরাঃ বিধিনা হতাঃস্ম।"
ছন্দোমঞ্জরী ; দ্বিতীয় স্তবক।

পদান্ত মিলাইতে বাঙ্গালী কোথায় শিখিল, এই প্রশ্নের উত্তর জন্য বহুদূর খুঁজিতে হইবে না। বোধ হয় যমক অলঙ্কারের প্রাচুর্য্যবশতঃ শেষ সময়ের সংস্কৃতে মিলের দিকে একটুকু বেশী দৃষ্টি পড়িয়াছিল। ল্যাটিনও ঐরূপ কারণেই মিত্রাক্ষরবিশিষ্ট হইয়াছিল (১) শঙ্করের 'অর্থমনর্থং' ও জয়দেবের,—

"বসতি বিপিন বিতানে, ত্যজতি ললিতধাম। লুঠতি ধরণীতলে বহু বিলপতি তব নাম॥"

---

(১) But the Latin language abounds so much in consonances, that those who have been accustomed to write verses in it, well know the difficulty of avoiding them, as much as an ear formed on classical model demands; and as this jingle is certainly pleasing in itself, it is not wonderful that the less fastidious vulgar should adopt it in their rythmical songs." Hallam's History of the European Literature, Vol, I., P. 32.

প্রভৃতি রাশি রাশি মিত্রাক্ষরযুক্ত কবিতা হইতে বঙ্গীয় মিত্রাক্ষর কবিতার প্রথা সূচিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। প্রাকৃত কবিতায়ও মিল দেওয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল। প্রাকৃত "চরণগণবিপ্প, পঢম লইথপ্প" বা "সত্তা দীহা জাণেহী, তিণ্ণা মাণেহী" (১) ও জয়দেবের "রতিসুখ সারে গতমভিসারে" প্রভৃতি পদ-গুলির অনুকরণে বঙ্গীয় ত্রিপদী গঠিত হইয়া থাকিবে। লঘু ত্রিপদী, লঘু চৌপদী ইত্যাদি প্রকার-ভেদে নূতন ছন্দ উদ্ভাবনের কৌশল কিছুই নাই, কেবল সংস্কৃতের অনুযায়ী পদবিন্যাসের কৌশল দৃষ্ট হয়। সংস্কৃতের ছন্দ অনন্ত প্রকারের উক্ত ভাষার অসীম ঐশ্বর্য্যের পরিচায়ক, বাঙ্গালী ঝিনুকে সেঁচিয়া এক লহরী আনিয়াছে মাত্র। কিন্তু বাঙ্গালার প্রথম ছন্দ বোধ হয়, বৌদ্ধ চারণ-গীতিকার অনুকরণে গঠিত হইয়াছিল। পৃথ্বীরাজের কীর্ত্তি-গাথা চাঁদ কবি যে ছন্দে গান করিয়াছিলেন, তাহার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি বাঙ্গালায় আসিয়া পৌঁছিয়াছিল সন্দেহ নাই।

---

(১) পিঙ্গল।

চতুর্থ অধ্যায়

হিন্দু-বৌদ্ধযুগ

(১) শূন্য-পুরাণ, (২) মাণিকচাঁদের গান, (৩) নাথ-গীতিকা, (৪) কথা-সাহিত্য, (৫) ডাক ও খনার বচন

৮০০ খৃঃ হইতে ১২০০ খৃঃ।

বৌদ্ধ-ধর্ম্ম ভারতবর্ষের ত্রিসীমা হইতে তাড়িত হইয়াছে। যে অধ্যায়ে আমরা অশোক, শীলভদ্র ও দীপঙ্করকে পাইয়াছিলাম, উহা ভারত-ইতিহাসের এক স্বতন্ত্র অধ্যায়। জয়দেবের গীতগোবিন্দের অনুকরণে কত শত বাঙ্গালা পদ বিরচিত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার উদার বুদ্ধ দেব-স্তোত্রে বঙ্গীয় কবিতায় কোনো উৎসাহের উদ্রেক করে নাই।

বৌদ্ধ-ধর্ম্মের বিলাপ

বাঙ্গালায় হিন্দু-গ্রন্থগুলির মধ্যে সেই স্তোত্রাংশ বিচ্ছিন্ন ভাবে পড়িয়া আছে। দু একজন কবি ভগবানের দশ অবতার বর্ণনার সময়ে জয়দেবের কথার পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহা অতি সংক্ষেপে, যেন অনিচ্ছাক্রমে। প্রাচীন সাহিত্যে গণেশ, রামচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া মনসাদেবী ও দক্ষিণরায়ের বন্দনাসূচক স্তোত্র অনেক গ্রন্থেই পাওয়া যায়, কিন্তু যাঁহার লোকমধুর চরিত্র-কাহিনীতে এক অপূর্ব্ব উন্নত আদর্শ প্রতিফলিত, যাঁহার পবিত্র নিবৃত্তি ও আত্ম-সংযম প্রকৃতই মহাকাব্যের বিষয়, সেই বুদ্ধ-দেবের একটি সামান্য বন্দনাও প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে সুলভ নহে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, হিন্দু ধর্ম্মের অভ্যুত্থানই বঙ্গভাষা ও গৌড়ীয় অন্যান্য ভাষার শ্রীবৃদ্ধির কারণ; এই জন্যই সেই সকল ভাষার সাহিত্যে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রতি এই অবজ্ঞা দৃষ্ট হয়। ভগবান্ বিষ্ণু বুদ্ধরূপ গ্রহণ করিয়া বেদ নিন্দা করিয়াছেন, সেই ক্রোধে এক লেখক বিষ্ণুবিগ্রহপূজা ও তুলসীপত্র স্পর্শ করাও নিষেধ করিয়াছেন। (১) শ্রীচৈতন্যদেব কাশীতে বৌদ্ধদিগের শেষ শক্তি নির্ম্মূল করিয়াছিলেন,

---

(১) "বেদবিনিন্দিতা যস্মাৎ বিষ্ণুনা বুদ্ধরূপিণা। ন স্পৃশেৎ তুলসী-পত্রং শালগ্রামঞ্চ নার্চ্চয়েৎ॥"

কুলার্ণবতন্ত্র।

চৈতন্য চরিতামৃত এই জয়ের ভেরী-বাদন উপলক্ষে বৌদ্ধগণের উল্লেখ করিয়াছেন। এই ভাবের অবজ্ঞাসূচক উল্লেখ বৈষ্ণব সাহিত্যের স্থানে স্থানে আরও পাওয়া যায়।

বঙ্গদেশ যে এক সময় বৌদ্ধধর্ম্মের দ্বারা বিশেষরূপে প্রভাবান্বিত ছিল, তৎপ্রসঙ্গের অবতারণা আমরা নিম্নে করিতেছি। এই বৌদ্ধপ্রভাবের আধিক্য দর্শনে বোধায়ন প্রভৃতি ধর্ম্ম সূত্রে একদা বঙ্গদেশে আগমন প্রায়শ্চিত্তের বিষয়ীভূত বলিয়া বিধি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এমন কি পালী ও প্রাকৃতের দ্বারা বিশেষরূপ প্রভাবান্বিত দেখিয়া খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কৃষ্ণপণ্ডিত তদীয় 'প্রাকৃত-চন্দ্রিকায়' বঙ্গভাষাকে পৈশাচিক প্রাকৃতের লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধপ্রভাবের আধিক্য নিবন্ধনই এই দেশ এবং এই দেশের ভাষা হিন্দু সম্প্রদায়ের উপেক্ষণীয় ছিল। কালের কুটিল গতি। যে দেশের সমেত-শেখরে তেইশ জন জৈন তীর্থঙ্কর মোক্ষলাভ করিয়াছিলেন এবং সর্ব্ব প্রধান তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামী যে দেশে অষ্টাদশ বর্ষব্যাপী প্রচারকার্য্যে নিরত ছিলেন, যে দেশের প্রিয়পুত্র বৌদ্ধাচার্য্য শান্ত রক্ষিত নালন্দাবিহারের শ্রেষ্ঠতম অধ্যাপকের আসনে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সমস্ত বৌদ্ধ জগতে বঙ্গীয় প্রতিভার অনন্যসাধারণ গৌরব প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন, সেই দেশ হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানে বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্ম্মের প্রতি এতাদৃশ প্রতিকূলতা অবলম্বন করিল যে, তদীয় সাহিত্যে উক্ত ধর্ম্মপ্রসঙ্গের জন্য কণিকামাত্র স্থানও ছাড়িয়া দিতে কুণ্ঠিত হইল।

বঙ্গদেশে এক সময়ে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রবল পরাক্রমের সহিত রাজত্ব করিতেছিল। সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে হিউএন্‌সাঙ্ মুঙ্গের এবং সমুদ্রের অন্তর্বর্ত্তী প্রদেশ সমূহে ১১৫০০ বৌদ্ধ পুরোহিত দেখিয়া গিয়াছিলেন। উক্ত সংখ্যক পুরোহিতের অন্যূন এক কোটী শিষ্য থাকিবার কথা। এই অসংখ্য লোকবর্গের অবলম্বিত ধর্ম্ম চিহ্নমাত্র না রাখিয়া বিলুপ্ত হইয়া গেল, ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। পালরাজ-গণের সময়েও বৌদ্ধধর্ম্ম বঙ্গদেশে প্রবল ছিল। মগধের রাজধানী ওদন্তপুরীতে মুসলমানগণ বহুসংখ্যক বৌদ্ধভিক্ষুর প্রাণ সংহার করিয়াছিলেন, উহা খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ঘটিয়াছিল। এই সময়ের পরেও বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিলয়োন্মুখ নিদর্শন বঙ্গদেশ হইতে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ১৬০৮ খৃঃ অব্দে তিব্বত দেশীয় পণ্ডিত বুদ্ধগুপ্তনাথ এতদ্দেশে উক্ত ধর্ম্মের কথঞ্চিৎ প্রাদুর্ভাব দেখিয়াছিলেন। মগধের জনৈক কায়স্থ ১৪৪৬ খৃঃ অব্দে একখানি বৌদ্ধপুঁথি নকল করিয়াছিলেন; উহা কেম্বিজ নগরে রক্ষিত আছে। এইরূপ অনেকগুলি বৌদ্ধ-ধর্ম্মসংক্রান্ত পুঁথি বঙ্গদেশীয় লেখকগণ ত্রয়োদশ হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে লিখিয়াছিলেন, সেগুলি নানা স্থানে পাওয়া গিয়াছে। চূড়ামণি দাস, গোবিন্দ দাস প্রভৃতি বৈষ্ণব লেখকগণ কৃষ্ণদাস কবিরাজের ন্যায় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন-উপলক্ষে প্রসঙ্গক্রমে বৌদ্ধগণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে রামায়ণ প্রণেতা বঙ্গীয় কবি

কিন্তু উহার গুপ্ত অস্তিত্ব, ধর্ম্মপূজা।

রামানন্দ নিজকে বুদ্ধের অবতার বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। চৈতন্যের সময়ে সপ্তগ্রামনিবাসী জনৈক প্রসিদ্ধ সুবর্ণ বণিক বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ সম্বন্ধে এই আপত্তি উত্থাপন করেন যে, যখন সমস্ত জগৎ দুঃখসাগরে মগ্ন, তখন তিনি নিজে উদ্ধার কামনা করিতে পারেন না। এই দুঃখবাদ বৌদ্ধদিগের নিজস্ব। প্রচলিত 'কৃত্তিবাসী' রামায়ণে বৌদ্ধপ্রভাবের পরিচয় আছে। (১)

কিন্তু ভগ্ন 'স্তূপ'রাশি, গলিত পুঁথি-পত্র এবং জয়দেবের স্তোত্র ব্যতীত কি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বৌদ্ধধর্ম্মের এদেশে আর কোন পরিচয় নাই ? চট্টগ্রামের সুদূর প্রান্তে এখনও সে ধর্ম্ম কথঞ্চিৎ জীবন রক্ষা করিতেছে, সমগ্র বঙ্গদেশ হইতে কি সত্য সত্যই তাহা তিরোহিত হইয়াছে ? মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় স্পষ্টরূপে প্রমাণ করিয়াছেন যে বঙ্গদেশের বহু সংখ্যক ডোম, কাপালী ও হাড়ি প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীব মধ্যে যে 'ধর্ম্মপূজা' প্রচলিত আছে, তাহা বৌদ্ধধর্ম্মের বিকৃতি এবং এক প্রকার রূপান্তর। এই ধর্ম্মের পুরোহিতগণও নিম্নশ্রেণীর। ধর্ম্মের মন্ত্রের এক চরণ এইরূপ "ভক্তানাং কামপূরং সুরনরবরদং চিন্তয়েৎ শূন্যমূর্ত্তিং"—এই 'শূন্য-মূর্ত্তি' শব্দ হিন্দু দেবদেবীর প্রতি প্রযোজ্য নহে, উহা বৌদ্ধধর্ম্মসংক্রান্ত 'শূন্য' এবং 'মহাশূন্য' শব্দের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। বঙ্গের নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে 'ধর্ম্মপূজার' প্রধান পাণ্ডা রামাই ডোম পণ্ডিত-জাতীয় ছিলেন ; ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলে দৃষ্ট হয়, রামাই পণ্ডিত মহারাজ ধর্ম্মপালের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। রামাইপণ্ডিতকৃত ধর্ম্মপূজাপদ্ধতি পাওয়া গিয়াছে ; ইহা 'শূন্যপুরাণ' নামে পরিচিত। তন্মধ্যে অনেক কথায়ই বৌদ্ধধর্ম্মের পরিষ্কার আভাষ আছে, যথা :—"ধর্ম্মরাজ যজ্ঞ নিন্দা করে" (নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহশ্রুতিজাতং) "শ্রীধর্ম্মদেবতা সিংহলে বহুত সম্মান।" এতদ্ব্যতীত রামাই পণ্ডিতোক্ত শূন্যবাদ ও বৌদ্ধধর্ম্মেরই কথা। পরবর্ত্তী কতকগুলি ধর্ম্মমঙ্গলে মীননাথ, গোরক্ষনাথ প্রভৃতি কয়েকজন নাথ-মহান্তের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ইহাঁদের ধর্ম্ম বৌদ্ধ ভাবাপন্ন। রামাই পণ্ডিতের ধর্ম্মপূজাপদ্ধতিতে সৃষ্টিরহস্যে নাগের বিশেষরূপ উল্লিখিত আছে, ইহা বৌদ্ধমতের অনুরূপ। ধর্ম্মপূজার মন্দিরেও বৌদ্ধধর্ম্মের নানারূপ লক্ষণ এখনও বিকৃত ভাবে বর্ত্তমান আছে। ধর্ম্মমন্দিরগুলিতে শীতলা দেবীর প্রতিমূর্ত্তি প্রায়শঃই দেখা যায়, ইহা বৌদ্ধমন্দিরের হারিতী দেবীর কথা স্পষ্টই উদ্রেক করে ; বৌদ্ধপূজার এক উপকরণ চূণ, ইহা কখনও হিন্দু দেবদেবীর ভোগ্য নহে ; ধর্ম্মপূজায়ও এই চূণ উপহার প্রদত্ত হইয়া থাকে। কিন্তু পরবর্ত্তী ধর্ম্মমঙ্গল গ্রন্থগুলিতে আমরা ক্রমশঃ বৌদ্ধপ্রভাবের বিলয় এবং চণ্ডীর মাহাত্ম্যের কীর্ত্তন দেখিতে পাই

(১) রঘুরাজা এক ব্যাপারোপলক্ষে "ব্রাহ্মণেরে দিলেন যতেক ধন॥ অন্ন ভক্ষ্য রঘুরাজা নাহি রাখে ঘরে। মৃত্তিকার পাত্রে রাজা জল পান করে॥"—এই ভাবের দানশীলতা, আমাদিগকে মহারাজ কনিষ্ক প্রভৃতি বৌদ্ধ রাজন্যগণের "ভিক্ষু" হওয়ার প্রসঙ্গ মনে করাইয়া দেয়। বাল্মীকির রামায়ণে এ সকল কথা নাই।

সুতরাং সেই সকল পুস্তক আমরা এই অধ্যায়ের অন্তর্বর্ত্তী করিতে পারিলাম না। ধর্ম্মপূজা বৌদ্ধ-শাস্ত্রীয় হইলেও উহার পূজকসম্প্রদায় ব্রাহ্মণগণের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে এবং আপনাদিগকে বৌদ্ধ বলিয়া অবগত নহে এবং উক্ত নামে অভিহিত হইতে স্বীকৃত নহে। পরবর্ত্তী ধর্ম্মমঙ্গলগুলি ব্রাহ্মণগণ রচনা করিয়াছেন, সুতরাং তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রভাব প্রদর্শনের চেষ্টা কিছু বিচিত্র হয় নাই। এস্থলে বলা উচিত যে, বৌদ্ধধর্ম্মের নানা কথাই অলক্ষিত ভাবে হিন্দু শাস্ত্রে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, ইহা অনিবার্য্য। বৌদ্ধদিগের শূন্যবাদ শুধু রামাই পণ্ডিতের পুঁথিতে নহে, অপরাপর বাঙ্গালা পুঁথিতেও দৃষ্ট হয়। স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় একখানি প্রাচীন বিদ্যাসুন্দরের হস্তলিখিত পুঁথি হইতেও ঐরূপ শূন্যবাদের দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। বঙ্গসাহিত্যে বৌদ্ধধর্ম্মের পূর্ব্বোক্ত পরিচয় ছাড়া আরও কিছু নিদর্শন আছে,' সেগুলি আমরা একেবারে উপেক্ষা করিতে পারি না। সম্ভবতঃ হিন্দুধর্ম্মের প্রভাব বিস্তারের পূর্ব্বেই বঙ্গভাষার কতকগুলি নীতিসূত্র ও স্তুতিগীতি রচিত হইয়াছিল। চৈতন্যভাগবতে উল্লিখিত আছে—"যোগীপাল ভোগীপাল মহীপাল গীত। ইহা শুনিতে যে লোক আনন্দিত"

বৌদ্ধযুগের অপরাপর নিদর্শন।

কোন রাজার তিরোধানের অব্যবহিত পরেই তদুদ্দেশ্যে লৌকিক স্তুতি-ব্যঞ্জক গীতি রচিত হওয়া স্বাভাবিক। উক্ত রাজন্যবর্গ মুসলমান আগমনের পূর্ব্বে এতদ্দেশে রাজত্ব করিতেছিলেন,—এবং খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দী ও তাহার পূর্ব্ব সময় হইতে যে প্রাগুক্ত প্রশংসাগীতি সকল বঙ্গদেশে বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্য হওয়া যায়। (১)

(১) শূন্য পুরাণ

এই পুস্তকের কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা রামাই পণ্ডিত বিরচিত। কয়েক বৎসর হইল সাহিত্য-পরিষদ্ পুস্তকখানি প্রকাশিত করিয়াছেন। বিশ্বকোষ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এই পুস্তক সম্পাদন করিয়াছেন। বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত ময়নাপুর গ্রামে যাত্রাসিদ্ধি রায় নামক যে ধর্ম্মঠাকুর প্রতিষ্ঠিত আছেন রামাই পণ্ডিতের বংশধরগণ এখনও সেই দেবমন্দিরের পৌরোহিত্য করিয়া থাকেন। তাঁহাদের নিকট হইতে রামাই পণ্ডিতের পরিচয় সম্বলিত একটী কবিতা পাওয়া গিয়াছে। রামাই জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন, ইহাই প্রতিপাদন করা প্রধানতঃ এই কবিতার উদ্দেশ্য। যদিও শূন্য-পুরাণে অনেক স্থলে রামাই পণ্ডিতের ভণিতায় দ্বিজ শব্দ উল্লিখিত দৃষ্ট হয় এবং যদিও সম্পাদক নগেন্দ্র বাবু এই পরিচয়ে আস্থাবান হইয়াছেন তথাপি আমাদের নিকট উক্ত বিবরণটী নিতান্তই অবিশ্বাস্য

(১) মদনপালের তাম্রশাসনে উল্লিখিত আছে যে, দ্বিতীয় মহীপালের কীর্ত্তিগাথা সর্ব্বত্র গীত হইত। 'ধান ভানতে মহীপালের গান'—এই প্রবাদ বাক্যও অনুশাসনোক্ত কথার সমর্থন করিতেছে।

বলিয়া মনে হয়। এই বিবরণের মধ্যে মধ্যে এরূপ অনেক কথা আছে যাহাতে লেখক তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয়টীকে স্বয়ংই সন্দেহার্হ করিয়াছেন। ধর্ম্মঠাকুর অতি সামান্য অপরাধে রামাইকে এই শাপ প্রদান করিলেন যে, তাঁহার জল সমাজের উচ্চ-শ্রেণীর ব্যক্তিরা স্পর্শ করিবেন না। রামাই পণ্ডিত তাঁহার পুত্র ধর্ম্মদাসকে সেই ভাবে আর একটী অভিশাপ দিলেন যে, তাঁহার বংশধরগণ ডোমপণ্ডিত হইবে। রামাই পণ্ডিতের বংশধব লেখক স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতেছেন,—

"ডোমেতে পণ্ডিত প্রভেদ আছয়ে নিশ্চয়।"

কিন্তু নিশ্চয়ই যে প্রভেদ আছে, এ সম্বন্ধে অনেকেই সন্দিগ্ধ; এ সম্বন্ধে লেখকের আগ্রহাতিশয়ই তাঁহার যুক্তিগুলিকে হতবল করিতেছে।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্র বসু মহাশয়ের মতে রামাই পণ্ডিত মহারাজ দ্বিতীয় ধর্ম্মপালের রাজত্বকালে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি বৌদ্ধ-ধর্ম্মের বিকৃতরূপ—ধর্ম্মপূজার যে একজন প্রধান পাণ্ডা ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই শূন্য পুরাণে এবং ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যসমূহে ইহাকেই ধর্ম্মপূজার সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ পুরোহিতরূপে বর্ণিত হইতে দেখা যায়। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই চারিযুগে ধর্ম্মপূজার চারিটী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পাণ্ডা বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া উল্লিখিত আছে। সত্যযুগে শেতাই পণ্ডিত, গতি সংখ্যা ৪০০; দ্বাপরে কংসাই পণ্ডিত, গতি সংখ্যা ১২০০; এবং কলিযুগে রামাই পণ্ডিত, গতি সংখ্যা ১৬০০। রামাই পণ্ডিত হাকন্দ নামক স্থানে মোক্ষলাভ করেন; উহা চাঁপাতলা ও ময়নাপুরের মধ্যে অবস্থিত। ব্রাহ্মণাদি জাতির পক্ষে উপবীত ধারণ যেরূপ অবশ্য কর্ত্তব্য, ধর্ম্মঠাকুরের পূজক সম্প্রদায়ের মধ্যে তাম্রধারণও তদ্রূপ। রামাই পণ্ডিতের বংশধরগণ এই তাম্রদীক্ষাব প্রধান পুরোহিত। তাঁহারা ছত্রিশ জাতিকে তাম্রদীক্ষা প্রদানের অধিকারী। রামাই পণ্ডিত ৮০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে বিবাহ করেন। তাঁহার পুত্র ধর্ম্মদাসের চারিপুত্র – মাধব, সনাতন, শ্রীধর ও সুলোচন। ইঁহাদের বংশধরগণ নানাস্থানে বিদ্যমান আছেন, এবং ধর্ম্মসেবক সম্প্রদায়ের তাঁহাদের মধ্যে যথেষ্ট প্রতিপত্তি।

শূন্য পুরাণে একান্নটী অধ্যায় আছে, তন্মধ্যে পাঁচটী সৃষ্টি-পত্তন সম্বন্ধে। এই সৃষ্টি-পত্তন সম্বন্ধে রামাই পণ্ডিতের মত অনেকটা মহাযান সম্প্রদায়ী বৌদ্ধগণের পথাবলম্বী। তৎপরবর্ত্তী অধ্যায়গুলিতে ধর্ম্মঠাকুরের পূজা পদ্ধতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। জলপাবন, টীকা পাবন, অধিবাস, ধুনাজ্বালা, সন্ধ্যাপাবন, ঢেঁকিমঙ্গলা, গান্তারীমঙ্গলা প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ে এই পদ্ধতি পরিপূর্ণ। যদিও রামাই পণ্ডিতের রচনার উপরে পরবর্ত্তী অনেক লেখক কারুকার্য্য করিতে ছাড়েন নাই, তথাপি স্থানে স্থানে যে আদিকবির রচনা অবিকৃত আছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

"জত দূর ধর্ম্মর ওঁকার জান। গারস্তের মহাপাপ দুরত পলান।"

কিংবা,—

"হে মধুসূদন বার ভাই বার আদিত্ত হাত পাতি লেহ সেবকের অর্ঘপুষ্পপানি সেবক হব সুখি ধমাৎ কন্নি গুরুপণ্ডিত দেউলা দান পতি মাংসুর ভোক্তা আমনি সন্ন্যাসী গতি জাইতি গাএন বাএন দুআরি দুআরপাল ভাণ্ডারি ভাণ্ডার-পাল রাজদূত কোমি কোটাল পাব সুখ মুকতি এহি দেউলে পড়িল জঅ জঅকার।"

প্রভৃতি রচনা প্রাচীন ও জটিল এবং খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর বলিয়া গ্রহণ করিতে আমাদের দ্বিধা হয় না। এইরূপ ভাবের রচনা মাঝে মাঝে এই পুস্তকে পাওয়া যায়। স্বয়ং নগেন্দ্রবাবু দুর্ব্বোধ্য বলিয়া সেই সকল রচনার অর্থ ব্যাখ্যা করার অক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন।

বৌদ্ধধর্ম্মের ত্রিরত্ন—বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ। কালক্রমে হিন্দুস্থানে বৌদ্ধ শব্দ অর্থদুষ্ট হইয়া পড়ে। বৌদ্ধ এবং নাস্তিক এই দেশে একার্থ বাচক হইয়াছিল। এই জন্যই কিংবা অন্য কোন কারণে এ দেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায় আপনাদিগকে ত্রিরত্নের দ্বিতীয় অর্থাৎ ধর্ম্ম শব্দের রূপান্তর দ্বারা পরিচিত করিতেন। তাঁহারা আপনাদিগকে 'সদ্ধর্ম্মী' বলিতেন। বুদ্ধ শব্দের পরিবর্ত্তে তাঁহারা ধর্ম্ম শব্দের দ্বারা আপনাদের উপাস্য দেবতাকে অভিহিত করিতেন। প্রাচীন উপনিষদের ব্রহ্মের সঙ্গে আধুনিক কালের পৌরাণিক দেবদেবীর যে সম্বন্ধ,জগৎপূজ্য বুদ্ধদেবের সঙ্গে এই কল্পিত ধর্ম্মঠাকুরের সম্বন্ধ তাহা হইতে অধিক নহে। তথাপি যেরূপ হিন্দুধর্ম্ম বলিতে বেদ ও উপনিষদের ধর্ম্ম এবং পৌরাণিক ধর্ম্ম সমস্তই বুঝায়, তদ্রূপ সৎধর্ম্ম বা বৌদ্ধ ধর্ম্ম বলিতে অশোকের সময়ের বিশুদ্ধ ধর্ম্ম এবং খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর ধর্ম্মপূজা—ইহা সমস্তই বুঝাইতেছে। ত্রিরত্নের তৃতীয়—সঙ্ঘ—শঙ্খ নামে বিকৃত হইয়া ধর্ম্মপূজায় স্থান পাইয়াছে। শূন্য পুরাণের ৮৩ পৃষ্ঠায় এই "সংখ" সম্বন্ধে বিস্তৃত পূজাপদ্ধতি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। শূন্যপুরাণে পুপ্প (পুষ্প), পসন্ন (প্রসন্ন), ছীফল (শ্রীফল), বজ্জ (বজ্র) প্রভৃতি প্রাকৃত ভাবাপন্ন শব্দের অবধি নাই। যাঁহারা এই পুস্তক যত্নের সহিত পাঠ করিবেন, তাঁহারা আমাদের প্রাচীন সমাজ ও ভাষার বিচিত্র প্রকারের নিদর্শন প্রাপ্ত হইবেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। "নিরঞ্জনের রূষ্মা" শীর্ষক অধ্যায়টী পরবর্ত্তী যোজনা। শূন্য পুরাণের প্রাপ্ত তিনখানি পুঁথির মধ্যে একখানিতে উহা পাওয়া গিয়াছে। উহা এরূপ অদ্ভুত যে, আমরা উহা উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

শ্রীনিরঞ্জনের রূষ্মা

জাজপুর পুরবাদি সোলসঅ ঘর বেদি
বেদি লয় কন্নয় যুন।
দখিণ্যা মাগিতে জাঅ জার ঘরে নাহি পাঅ
সাঁপ দিয়া পুড়ায় ভুবন॥ ১

মালদহে লাগে কর দিলঅ কম্ম যুন।
দাখিন্ত্যা মাগিতে জাঅ জার ঘরে নাক্রি পায়
সাঁপ দিয়া পুড়াএ ভুবন ॥২
মালদহে মাগে কর না চিনে আপন পর
জালের নাক্রিক দিসপাস।
বলিষ্ঠ হইল বড় দসবিস হয়্যা জড়
সদ্ধৰ্ম্মিরে করএ বিনাস ॥ ৩
বেদ করে উচ্চারণ বেরা্যাঅ অগ্নি ঘনে ঘন
দেখিআ সবাই কম্পমান।
মনেতে পাইয়া মম্ম সভে বোলে রাখ ধম্ম
তোমা বিনা কে করে পরিত্তান ॥ ৪
এইরূপে দ্বিজগণ করে সৃষ্টি সংহারণ
ই বড় হোইল অবিচার।
বৈকণ্ঠে থাকিয়া ধম্ম মনেত্তে পাইআ মম্ম
মায়াতে হোইল অন্ধকার ॥ ৫
ধর্ম্ম হৈল্যা জবনরূপি মাথাএত কাল টুপি
হাতে সোভে ত্রিরূচ কামান।
চাপিয়া উত্তম হয় ত্রিভুবনে লাগে ভয়
খোদায় বলিয়া এক নাম ॥ ৬
নিরঞ্জন নিরাকার হৈলা ভেস্ত অবতার
মুখেতে বলেত দম্বদার।
যতেক দেবতাগণ সভে হয়্যা একমন
আনন্দেতে পরিল ইজার ॥ ৭
ব্রহ্মা হৈল মহাম্মদ বিষ্ণু হৈলা পেকাম্বর
আদম্ফ হৈল সুলপানি।
গনেশ হইআ গাজী কার্ত্তিক হৈল কাজি
ফকির হইল্যা জত মুনি ॥ ৮
তেজিয়া আপন ভেক নারদ হইলা সেক
পুরন্দর হইল মলনা।
চন্দ্র সূর্য্য আদি দেবে পদাতিক হয়্যা সেবে
সবে মিলি বাজায় বাজনা ॥ ৯

আঁপুনি চণ্ডিকা দেবি তিহু হৈল্যা হায়াবিবি
পদ্মাবতী হল্য বিবি নূর।
জতেক দেবতাগণ হয়্যা সভে একমন
প্রবেশ করিল জাজপুর॥ ১০
দেউল দেহারা ভাঙ্গে কাড়্যা কিড়্যা খায় রঙ্গে
পাখড় পাখড় বোলে বোল।
ধরিয়া ধর্ম্মের পায় রামাঞি পণ্ডিত গায়
ই বড় বিসম গণ্ডগোল॥ ১১

কোন্ ঐতিহাসিক মুসলমান উপদ্রবকে লক্ষ্য করিয়া এই কবিতা রচিত হইয়াছে তাহা বলা যায় না; কিন্তু ব্রাহ্মণগণকৃত অত্যাচারের প্রতিশোধ মনে করিয়া সদ্ধর্ম্মীরা (বৌদ্ধগণ) যে হিন্দু দেব-মন্দির প্রভৃতির উপর উৎপাত দর্শনে হৃষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে।

(২) নাথ-গীতিকা

ময়নামতীর গান ও গোরক্ষ-বিজয়

১৮৭৪ সনের এসিয়াটিক সোসাইটির জারনালে (প্রথম ভাগ, ৩নং, ১৮১ সংখ্যা) বিজ্ঞবর গ্রীয়ারসন সাহেব মাণিকচাদের গীতি শীর্ষক একটি বঙ্গীয় পল্লীগাথা প্রকাশিত করেন। তিনি অনুমান করিয়াছিলেন, মাণিকচাঁদ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর লোক। এই গাথায় কড়ি দ্বারা রাজকর আদায়ের প্রথা পরিদৃষ্ট হয়, ইহা প্রধানতঃ হিন্দু-রাজত্বের প্রথা। আমি এই সকল যুক্তির উল্লেখ করাতে গ্রীয়ারসন সাহেব, আমার সঙ্গে একমত হইয়া মাণিকচন্দ্রকে একাদশ শতাব্দীর লোক বলিয়া মনে করিয়াছেন। ১

গোবিন্দচন্দ্রের সময় নির্দ্দেশ।

কিন্তু তদপেক্ষা প্রবলতর প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। মাণিকচন্দ্রের পুত্র গোবিন্দচন্দ্রকে দাক্ষিণাত্যের রাজা রাজেন্দ্র চোল পরাভূত করেন, তাঁহার জয়গাথা তিরুমলয়ের শৈল-লিপিতে উৎকীর্ণ আছে। রাজেন্দ্র চোল ১০৬৩ খৃঃ হইতে ১১১২ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশিত ময়নামতির গানে গোবিন্দচন্দ্রের সঙ্গে দক্ষিণ দেশের কোন রাজার যুদ্ধ বিগ্রহের উল্লেখ আছে, কিন্তু বাঙ্গালী কবি রাজা গোবিন্দচন্দ্রকেই

(১) ১৮৯৮ সনের ২৪শে জুলাইএর পত্রে মান্যবর গ্রীয়ারসন্ সাহেব লিখিয়াছেন:—

I think that in my former letter I have omitted to thank you for the corrections which you have made to my edition of the *manik Chandra Rajar Gan* which appeared in 1878. I now quite agree with you that its origin must be referred to Buddhist influence."

বিজয়ী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই সকল রাষ্ট্রীয় যুদ্ধবিগ্রহাদি ব্যাপারে বিজয়-লক্ষ্মী কাহার অঙ্ক-শায়িনী হন, তাহা ঐতিহাসিকের পক্ষে নিরূপণ করা অনেক সময় কষ্টসাধ্য হয়। কবি ও স্তাবকবৃন্দ সত্যের অপলাপ করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন না এবং অনেক সময় শৈল-গাত্রে উৎকীর্ণ লিপির ঘোষণাকেও আমরা অভ্রান্ত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। অনেক সময় পাষাণাশ্রিতা মিথ্যা কালজয়ী হইয়া অমর হইয়া থাকে।

সে যাহা হউক গ্রীয়ারসন সাহেব যে পল্লী-গাথা প্রথম আবিষ্কার করেন, তাহার সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক মূল্য কম নহে।

গোরক্ষ-বিজয়।

এখন গোরক্ষ-বিজয় নামক আর একখানি পুস্তক আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই পুস্তক শ্রীযুক্ত আবদুল করিম সাহেব কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ দ্বারা কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে আমরা পরে লিখিব।

ময়নামতী বা গোবিন্দ চন্দ্রের গান পূর্ব্ব ও উত্তর-বঙ্গের নানা স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঢাকা, রঙ্গপুর প্রভৃতি অঞ্চলে নানা আকারে একই পুঁথিই পুনরাবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। বিস্তর পাঠান্তর সত্বেও এগুলি যে একই প্রাচীন গাথার রূপান্তর, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই। বঙ্গীয় রাজা গোপীচন্দ্র বা গোবিন্দচন্দ্রের গাথা ভারত-বিশ্রুত। গোবিন্দচন্দ্র একই পুঁথিতে কোথায়ও বা গোবিন্দচন্দ্র কোথায়ও বা গোপীচন্দ্র, কোথায়ও বা গোবিন্দচন্দ্র বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন, সুতরাং এই পৃথক নামধারী ব্যক্তি যে এক ব্যক্তি, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই। ইহাঁর সন্ন্যাস-জনিত করুণ মর্ম্মস্পর্শী গীতি সমস্ত ভারতবর্ষের মনোবীণায় এক সময় করুণ সুরে বাজিয়া উঠিয়াছিল, সুতরাং ইনি সাধারণ লোক ছিলেন না। এই গাথা কে কখন রচনা করেন, জানা যায় নাই, কিন্তু গোবিন্দ-চন্দ্রের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই দ্বাদশ শতাব্দীতে ইহার সূত্রপাত হইয়াছিল বলা যাইতে পারে। কারণ কোন ধর্ম্মগুরু বা বীরের চরিত তাঁহার জীবিত থাকার কালে অথবা মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই রচিত হইয়া থাকে। রঙ্গপুর নীলফামারি হইতে সম্পাদিত পুঁথিতে ভবানী দাসের নাম ভণিতায় পাওয়া যায় এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে অর্থাৎ ষোড়শ কি সপ্তদশ শতাব্দীতে বিরচিত একটি গাথার সঙ্কলয়িতা দুর্ল্লভ মল্লিক তাহার নাম ভণিতায় দিয়াছেন। এই পুস্তকখানি শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল মহাশয় প্রকাশিত করিয়াছেন, বলা বাহুল্য দুর্ল্লভ মল্লিক প্রাচীন কবিগণেরই পদাঙ্ক অনুসরণ পূর্ব্বক স্বীয় গাথায় আবৃত্তি করিয়াছেন।

ময়নামতীর গানের প্রচার।

এক খানি গোবিন্দ-চন্দ্রের গীতি ময়ূরভঞ্জ হইতেও পাওয়া গিয়াছে, উহা উড়িয়া ভাষায় লিখিত। এই প্রসঙ্গ লইয়া মহারাষ্ট্র দেশে এখনও নাটক রচিত হইয়া থাকে। সুপ্রসিদ্ধ রাজ চিত্রকর রবিবর্ম্মা "গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস" শীর্ষক যে ছবি অঙ্কন করিয়াছেন, তাহা অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। ভাগলপুর, কাশী এমন কি পঞ্জাব প্রভৃতি

অঞ্চলে হিন্দী-ভাষায় বিরচিত "গোপীচাঁদকা পুঁথি"র প্রচলন আছে। মহারাষ্ট্র কবি মহীপতি (১৭১৫—১৭৯০ খৃঃ) এই প্রসঙ্গ লইয়া তাঁহার "সন্তলীলামৃত" ও পুণার আপ্পাজি গোবিন্দ "গোপীচাদ-নাটক (১৮৬৯ খৃঃ) রচনা করিয়াছেন। যে বঙ্গীয় রাজাকে লইয়া সমস্ত ভারতবাসী এক সময়ে প্রমত্ত হইয়াছিল, বাঙ্গালীর নিকট সে কাহিনী অবশ্যই শ্রুতি-সুখাবহ ও আদৃত হইবে সন্দেহ নাই।

গোবিন্দচন্দ্র কোন বংশীয়

আমাদের পূর্ব্বে ধারণা ছিল, চৈতন্য-ভাগবতকার ৪১০ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশ প্রচলিত, যোগীপাল, ভোগিপাল, মহীপাল, প্রভৃতি পালরাজবর্গের গাথা সম্বন্ধে যে উল্লেখ করিয়াছিলেন, এই গোবিন্দচন্দ্রের গান তাহারই অঙ্গীয়, কিন্তু গোরক্ষ-বিজয় আবিষ্কারের পর আমাদের সে ধারণা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। গোবিন্দচন্দ্র আদৌ পালরাজগণের কেহ ছিলেন কিনা তাহা সন্দেহ-স্থল; আমাদের বিশ্বাস তিনি পালরাজগণের কেহ নহেন। ইহাঁর পিতামহের নাম সুবর্ণচন্দ্র। আমরা বঙ্গীয় রাজা সুবর্ণচন্দ্রের নাম তাম্রশাসনে পাইয়াছি। তাম্রশাসনে আবার ত্রৈলোক্যচন্দ্রের নামও পাওয়া যায়। এই দুই নামই আমরা গোপীচন্দ্রের গানের কোন কোনটিতে পাইতেছি। শ্রীচন্দ্রদেবের তাম্রশাসনে উল্লিখিত অল্প-সংখ্যক নামের মধ্যে যখন দুইটি নাম গোপীচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষদের নামের সঙ্গে ঐক্য হইতেছে, তখন মাণিকচন্দ্র, তথা গোপীচন্দ্রকে আমরা শ্রীচন্দ্র দেবের বংশীয় বলিয়া আমরা অনুমান করি। নবদ্বীপের সুবর্ণবিহার সম্ভবতঃ ইহারই প্রতিষ্ঠিত। ঐ বিহারের নিকট সুবর্ণচন্দ্রের রাজ-প্রাসাদের কিঞ্চিৎ অবশেষ এখনও বিদ্যমান; এবং তথাকার একটি শিলালিপিতে যে তারিখ পাওয়া গিয়াছে, তাহা তাম্র-শাসনের তারিখ সমর্থন করিতেছে। মাণিকচন্দ্র বিবাহ-সূত্রে মেহের-কুলের (ত্রিপুরা রাজ্যের) উত্তরাধিকার লাভ করেন এবং পিতৃরাজ্য বিক্রমপুর প্রাপ্ত হইয়া উভয় রাজ্যের উপর আধিপত্য স্থাপন করেন। তাঁহার রাজধানী পটিকা এখনও বিদ্যমান। ত্রিপুরার পার্শ্বে যে বিস্তৃত শৈল-মালা দৃষ্ট হয়, তাহা ময়নামতী নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সুতরাং তিলকচন্দ্রের কন্যার নামের ইহা চির-স্থায়ী নিদর্শন স্বরূপ হইয়া আছে। গোবিন্দচন্দ্র এই বিশাল ভূখণ্ড ব্যতীত গৌড়ের সমীপবর্ত্তী উত্তর-বঙ্গের অনেকাংশ ইজারা লইয়াছিলেন, এজন্য রঙ্গপুর প্রভৃতি অঞ্চলেও তাঁহার কীর্ত্তিকথা জাগরূঢ়। আমরা এই সমস্ত তত্ত্বই ময়নামতী বা গোবিন্দচন্দ্রের গান হইতে সংগ্রহ করিয়াছি।

মহীপালের গান।

মহীপাল প্রভৃতি পাল-রাজগণের গাথা এ পর্য্যন্ত সংগৃহীত হয় নাই। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্ন, তেওতার স্বর্গীয় প্রাণশঙ্কর রায় চৌধুরী মহাশয় এবং অপরাপর কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোকের মুখে শুনিয়াছি, যে রঙ্গপুর রাজ বংশীয়গণ এবং অপরাপর নিম্নশ্রেণীর মধ্যে এখনও মহীপালের গান প্রচলিত আছে, যাঁহারা এদেশে

ঐতিহাসিক চর্চ্চা করিয়া যশস্বী হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা মহীপালের গান উদ্ধার করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যের একটা অন্ধকার দিক্ অনায়াসে উজ্জ্বল করিয়া গৌরব লাভ করিতে পারেন।

কিন্তু গোবিন্দচন্দ্রের গানের এই ভারত-ব্যাপী প্রচলনের কারণ কি? স্বর্গীয়া ভগিনী নিবেদিতার মতে ইহারই চলিত নাম গোপীচন্দ্র হইতে "গোপীযন্ত্রের" নামকরণ হইয়াছে—বস্তুতঃ ব্রজবাসীগণের সঙ্গে এই যন্ত্রের কোন সম্পর্ক নাই। এই গাথাতেই আমরা প্রমাণ পাইতেছি, গোবিন্দচন্দ্রের মাতা ময়নামতী গোরক্ষনাথের শিষ্যা ছিলেন; ইহাঁর যখন কৈশোর তখন যতি গোরক্ষনাথ তিলকচন্দ্রের রাজ-প্রাসাদে পদার্পণ করেন, তখন বালিকার নাম ছিল শিশুমতি। গোরক্ষনাথ কৃপাপরবশ হইয়া শিশুমতিকে সেই অল্প-বয়সেই দীক্ষা প্রদান করিয়া এবং 'মহাজ্ঞান' শিক্ষা দেন। মহাজ্ঞান প্রভাবে মৃতকে জীবন দান করা যাইতে পারিত। শিশুমতির গুরুদত্ত নাম ময়নামতী।

গল্প-সার।

মাণিকচন্দ্র ময়নামতীকে বিবাহ করিবার পরে উক্ত রাজকন্যা স্বামীকে "মহাজ্ঞান" শিখাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। 'এই জ্ঞান প্রভাবে চিরায়ু হওয়া যায় এবং রোগ শোক দূর হয়'—ময়নামতী এই ভাবের নানারূপ প্রলোভন দেখাইয়াও স্বামীকে মহাজ্ঞান গ্রহণে সম্মত করিতে পারেন নাই। মাণিকচন্দ্র সর্ব্বদাই উত্তরে বলিয়াছেন, স্ত্রীকে গুরু বলিয়া তাহার নিকট 'মাথা হেঁট করার অপেক্ষা পুরুষের আর কি অধিক অবনতি হইতে পারে? আমি তোমাকে কিছুতেই গুরু বলিয়া স্বীকার করিতে পারিব না। কাল-ক্রমে ময়নামতী প্রৌঢ় বয়সে পদার্পণ করিলেন, এবং মাণিকচন্দ্র ত্রিপুর-রাজগণের বহুবিবাহের চিরন্তন প্রথা পালন করিয়া আরও চারটি প্রধানা এবং ১৮০টি সামান্যা ভার্য্যা গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা নব যৌবন দৃপ্তা; দেব-পুরের কন্যাগণের সঙ্গে ময়নামতীর কলহ বাধিয়া গেল। মাণিকচন্দ্র রূপ-যৌবনের সমুচিত মূল্য প্রদান করিয়া প্রৌঢ়া স্ত্রীকে রাজধানী হইতে দূর করিয়া দিলেন। ময়নামতী স্বামী হইতে স্বতন্ত্র হইয়া "ফেরুসা" নগরে বাস করিতে লাগিলেন

ইতিমধ্যে মাণিকচন্দ্রের আসন্ন সময় উপস্থিত হইল, তখন ময়নামতী রাজ-প্রাসাদে আহুত হইলেন; রাজার নিদারুণ পিপাসা, ময়নামতীকে তিনি হীরামাণিক্য খচিত লক্ষ টাকা মূল্যের ভৃঙ্গ প্রদান করিয়া গঙ্গায় জল আনিতে প্রেরণ করিলেন। ইতি-মধ্যে যমদূত আসিয়া রাজার প্রাণ বাঁধিয়া লইয়া গেল। এক দীর্ঘশ্মশ্রু বাঙ্গালমন্ত্রীর উপদেশে রাজা প্রজাপীড়ন করিতেছিলেন। প্রজারা ধর্ম্মঠাকুরকে প্রসন্ন করিয়া রাজার মৃত্যুর জন্য অভিচার অনুষ্ঠান করিয়াছিল, সুতরাং রাজা অকালে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইলেন। ময়নামতী স্বামীর অকালে মৃত্যুর প্রতিশোধ কল্পে যমরাজ এবং তাঁহার দূতকে যথেষ্ট প্রহার-অত্যাচার করিয়াছিলেন এবং স্বামীর প্রাণ ফিরিয়া পাইবার জন্য, বহুপ্রকার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। মাণিকচন্দ্রের জীবনের উপর শেষ যবনিকা

পতিত হইল। পিতার মৃত্যুর সময় গোবিন্দচন্দ্র মাতৃগর্ভে ছিলেন। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তিনি সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন, কিন্তু রাণী ময়নামতীর হস্তে শাসনভার রহিয়া গেল।

গোবিন্দচন্দ্র ঢাকার অন্তঃপাতি সাভারের রাজা হরিশ্চন্দ্রের পরমাসুন্দরী কন্যা আদুনাকে বিবাহ করেন, এবং উক্ত রাজার দ্বিতীয়া কন্যা পাদুনাকে যৌতুক স্বরূপ প্রাপ্ত হন। ভট্টশালী সম্পাদিত ময়নামতীর গানে এরূপ আভাস পাওয়া যায় যে দাক্ষিণাত্যের রাজা রাজেন্দ্র চোল তাঁহার এক কন্যাকে গোবিন্দচন্দ্রের মহিষীরূপে অর্পণ করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি স্থাপন করেন। যাহা হউক হরিশ্চন্দ্রের কন্যা আদুনাই গোবিন্দচন্দ্রের শ্রেষ্ঠা মহিষী ছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। গোবিন্দচন্দ্রের যখনঅষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম তখন ময়নামতী তাঁহাকে ১২ বৎসর কালের জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে বাধ্য করেন, ইহা গোবিন্দচন্দ্রের যোটেই অভিপ্রেত ছিল না। অল্পবয়স্কা রাণীরা এই সন্ন্যাসের ঘোর প্রতিবাদী ছিলেন, এমন কি ময়নামতীকে কোনরূপে বিরত করিতে না পারিয়া তাঁহারা ষড়যন্ত্র করিয়া বৃদ্ধাকে বিষ প্রয়োগ করেন। কিন্তু ময়নামতী মহাজ্ঞান প্রভাবে তাঁহাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া দিলেন। গোবিন্দ চন্দ্রকে হাড়িজাতীয় এক সিদ্ধ ব্যক্তির নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিতে হইল। বৃদ্ধা রাণীর প্রবল যুক্তি এই ছিল, ১৮ বৎসর বয়সে গোবিন্দচন্দ্র সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক দ্বাদশবৎসর কাল প্রবাসে না কাটাইলে ১৯শ বৎসর বয়সে তাঁহার নিশ্চিত মৃত্যু। অদৃষ্টের এই নিদারুণ লিপি খণ্ডনের আর উপায়ান্তর নাই। এই সন্ন্যাস উপলক্ষে আদুনার বিলাপ কারুণ্যের নির্ঝর। প্রাচীন গ্রাম্য ভাষার কর্কশ উপলখণ্ডের মধ্য হইতে সেই মর্ম্মান্তিক কষ্টের ঝরণা বহিয়া আসিয়াছে। আমরা গ্রীয়ারসন সংগৃহীত গাথা হইতে সেই অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি।

"না যাইও না যাইও রাজা দূর দেশান্তর।
কারে লাগিয়া বান্দিলাম সীতল মন্দীর ঘর॥
বান্দিলাম বাঙ্গলা ঘর নাই পাড় কালী।
এমন বয়সে ছাড়ি যাও আমার বৃথা গাবুরালী॥
নিন্দের স্বপনে রাজা হব দরিসন।
পালঙ্গে ফেলাইব হস্ত নাই প্রাণের ধন॥
দস গিরির মাও বইন রবে স্বামি লইবে কোলে।
আমি নারী রোদন করিব খালি ঘর মন্দিরে॥
খালী ঘর জোড়া টাটি মারে লাঠির ঘা।
বয়স কালে যুবতী রাড়ী নিতে কলঙ্ক রাও।
আমাক সঙ্গে করি লইয়া যাও।
জীয়ব জীবন ধন আমি কন্যা সঙ্গে গেলে।
রাঁধিয়া দিমু অন্ন ক্ষুধার কালে।

পিপাসার কালে দিমু পানী।
হাসিয়া খেলিয়া পোহামু রজনী॥
আইল পাতার দেখিলে কথা কহিয়া যামু।
গিরি লোকের বাড়ী গেলে গুরু স্বাম বলিমু॥
সিতল পাটি বিছাইয়া দিমু বালীসে হেলান পাও।
হাউস রঙ্গে যাতিমু হস্ত পাও॥
হাত খানি দুঃখ হইলে পাএ খানি যাতিমু।
এ রঙ্গর কৌতুকর বেলা হুতি ভুঞ্জিমু এহুতি ভুঞ্জাইমু॥
গ্রীসকালে বদনত দিমু দণ্ডপাথার বাও।
মাঘ মাসি সিতে ঘেসিয়া রমু গাও॥"

গোপীচাঁদ বনের বাঘের ভয় দেখাইতেছেন, স্ত্রী উত্তরে বলিতেছেন,—

"কে কয় এগুলা কথা কে আর পইতায়।
পুরুসর সঙ্গে গেলে কি স্ত্রীক বাঘে ধরে খায়॥
ওগুলা কথা ঝুটমুট পালাবার উপায়॥
খায় না কেনে বনের বাঘ তাক নাই ডর।
নিত কলঙ্কে মরণ হউক স্বামির পদতল॥
তুমি হবু বট বৃক্ষ আমি তোমার লতা।
রাঙ্গা চরণ বেড়িয়া লমু পালাইয়া যাবু কোথা॥
যখন আছিনু আমি মা বাপের ঘরে।
তখনি কেন ধম্মি রাজা না গেলেন সন্ন্যাসি হইয়ে॥
এখন হইনু রূপর নারী তোর যোগ্যমান।
মোক ছাড়িয়া হবু সন্ন্যাস মুই তেজিম পরাণ।"

সন্ন্যাস গ্রহণের পর গোবিন্দচন্দ্র বহু কষ্ট সহ্য করেন। হীরা নাম্নী একটি রূপসী ধনাঢ্যা গণিকা তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতে বিফল প্রযত্ন হইয়া অবশেষে তাঁহাকে দুর্গতির চরম সীমায় উপনীত করে। তাঁহাকে দূর হইতে ভারে করিয়া জল আনিতে হইত। একদা জল আনয়নের সময় তাহার মনে হইল, দ্বাদশবর্ষ অতিক্রান্ত হইয়াছে। তখন উরুদেশের একটুকু স্থান কর্ত্তন করিয়া সেই রক্ত দ্বারা একটা কাঠিকে কলম স্বরূপ ব্যবহার পূর্ব্বক একখানি পত্র লিখিলেন এবং পায়রার দ্বারা তাহা পাঠাইয়া দিলেন। এই সময় গুরু হাড়ি সিদ্ধা আসিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া গেলেন। যখন বহুবর্ষ পরে তিনি স্বীয় রাজ-প্রাসাদে সন্ন্যাসীর বেশে উপস্থিত হন, তখন অদুনা তাহাকে চিনিতে পারেন

নাই। অন্তঃপুরীতে অপরিচিতের প্রবেশের হঠকারিতার জন্য রাজহস্তীকে তাঁহাকে পদদলিত করিতে নিযুক্ত করেন এবং রাজপুরীর বৃহৎ সারমেয়কে তাঁহার বিরুদ্ধে লেলাইয়া দেন। রাজহস্তী মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া শুণ্ড দ্বারা অভ্যর্থনা জানাইল এবং অশ্রু বিসর্জ্জন পূর্ব্বক রাজভক্তি জানাইল। সারমেয় লাঙ্গুল হেলাইয়া রাজ-সন্ন্যাসীর পদতলে লুটাইয়া পড়িল। তখন অদুনা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, "বনের পশু প্রভু তোমাকে চিনিতে পারিয়াছে। কিন্তু মন্দভাগিনী আমি তোমাকে চিনিতে পারি নাই।" গোবিন্দচন্দ্র পুনরায় রাজ-সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন।

এই গানে কতকগুলি বিষয় এরূপ আছে যাহাতে রাণী ময়নামতির উপর শ্রদ্ধা হইতে পারে না। সন্ন্যাস গ্রহণের প্রস্তাব হইলে গোবিন্দচন্দ্র প্রতিবাদ করিয়া বলেন, তিনি কিছুতেই হাড়িসিদ্ধার মন্ত্রশিষ্য হইতে সম্মত হইতে পারেন না; একে সে অতি নীচ জাতি, তাহার উপর যে তাঁহারই রাজধানীর হাটবাজারের জঘন্য স্থানগুলি পরিস্কার করিয়া বেড়ায়, তিনি রাজাধিরাজ হইয়া কি প্রকারে সেই হাড়িসিদ্ধাকে গুরু বলিয়া বরণ করিয়া লইতে পারেন? রাণী তখন ক্রুদ্ধ হইয়া হাড়ির অলৌকিক মন্ত্রশক্তির পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইন্দ্র স্বয়ং তাহাকে ব্যজন করেন। সোণার খড়ম পায়ে পরিয়া হাড়ি নদীতে হাঁটিয়া বেড়ায়। "চাঁদের পিঠে আঙ্কে বাড়ে, কুরুমের পিঠে খায়"—ইত্যাদি নানারূপ গুণপনার উল্লেখ করিয়া ময়নামতী হাড়িসিদ্ধার প্রতি রাজার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে যত্নপর হন। কিন্তু গোবিন্দচন্দ্র এই প্রসঙ্গে রাণীর বিরুদ্ধে অতি গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত করেন—তিনি বলেন; "আমি তোমার একটি কথাও বিশ্বাস করি না।"

ময়নামতী ব্যাভিচারিণী কি না?

"হাড়ির খাইছেন গুয়া মা হাড়ির খাইছেন পান। ভাব করি শিখিয়া নিছ ঐ হাড়ির গিয়ান॥
হাড়ির গিয়ানে তোমার গিয়ানে জননী একত্তর করিয়া। আমার পিতাকে মারছেন মা গরল বিষ খাওয়াইয়া।
বুদ্ধি পরামিশে আমাকে বনে পাঠাইয়া। গুয়া বীচি খাবেন তুমি ঐ হাড়ি লৈয়া॥
হাটে গেছেন বাজারে গেছেন কিনিয়া খাইছেন খই। আমার পিতার মরণের দিন সতী গেছেন কই?
আমার পিতার মরণের দিন সতী গেলেন হএ। সত্য রাজার পুত্র নাও পড়ামু হএ॥

ইহার সংক্ষিপ্ত অর্থ এই—মা তুমি এই হাড়ির হস্তের তাম্বুল ও গুবাক গ্রহণ করিয়াছ, এবং তাহার সঙ্গে ভাব করিয়া তাহার 'মহাজ্ঞান' শিখিয়া লইয়াছ। তাহার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া আমার পিতাকে বিষ প্রয়োগ দ্বারা হত্যা করিয়াছ এবং পুনরায় তাহারই সঙ্গে পরামর্শ করিয়া আমাকে বনে পাঠাইয়া উহার সঙ্গে নির্ব্বিঘ্নে সুখভোগের সংকল্প স্থির করিয়াছ। আমার পিতার মৃত্যুর পর তুমি তাহার চিতায় আরোহণ করিয়া "সতী" হইলে না কেন? তুমি যদি সহমৃতা হইতে, তবে বুঝিতাম আমি সত্য রাজপুত্র হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছি।"

এই গুরুতর অভিযোগ শুনিয়া রাণী অবশ্য পুত্রকে অভিসম্পাৎ ও ভৎর্সনা করিয়া অশ্রুবর্ষণ

করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, "হাড়িসিদ্ধা এবং আমি উভয়েই গোরক্ষনাথের শিষ্য, সেই সম্পর্কে সে আমার গুরু ভাই, পুত্র হইয়া এই ভাবে মাতৃ-চরিত্রে কলঙ্ক অর্পণ করিতেছে, এমন পুত্রকেও আমি হৃদয়ের রক্ত দিয়া পোষণ করিয়াছিলাম!"

এমন হইতে পারে গোবিন্দচন্দ্রের অদুনা প্রভৃতি মহিষীগণ বৃদ্ধা ময়নামতীর বিরুদ্ধে এরূপ উত্তেজিত ছিলেন, যে তাঁহারা একটা মিথ্যা কলঙ্ক রটাইয়া তাঁহাকে অপদস্থ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু 'গোরক্ষ-বিজয়' ময়নামতীর দলভুক্ত নাথ সম্প্রদায়ের লেখা। সেই পুস্তকে লিখিত আছে, যখন হাড়িসিদ্ধা পার্ব্বতীর মায়ায় মুগ্ধ হইয়া প্রকাশ করেন—"আমি তোমার মতন রূপসী রমণীর প্রেমলাভ করিতে পারিলে, নীচ হাড়ির কাজ করিতেও প্রস্তুত আছি।" পার্ব্বতী তাহা শুনিয়া বলিলেন, "তথাস্তু, তুমি মেহের কুলে গমন কর, তথায় রাণী ময়নামতী আমার মতই সুন্দরী, তুমি তথায় হাড়ির কার্য্য করিবে, এবং উক্ত রাণীর প্রেমলাভ করিয়া কৃতার্থ হইবে।" ঐ পুস্তকের অপর এক স্থানে উল্লিখিত আছে, কান্‌ফা নামক যোগীকে গোরক্ষনাথ জানাইতেছেন, যে হাড়িসিদ্ধা ময়নামতী রাণীর সঙ্গে চরিত্র ঘটিত দোষে ধৃত হইয়া রাজা গোবিন্দচন্দ্র কর্ত্তৃক কারাগারে প্রেরিত হইয়াছেন। সুতরাং ময়নামতীর দলভুক্ত লেখকগণ এই কলঙ্ক-কথাকে স্বীকার করিয়াছেন। অথচ এইরূপ কুলটা, পতি-হন্তারিকা, এবং পুত্র নির্ব্বাসনকারিণী রমণীই গোবিন্দচন্দ্রের গীতিকার শ্রেষ্ঠা নায়িকা। আমরা প্রাসঙ্গিক ভাবে তৎসম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি জানিতে পারিয়াছি মাত্র। কিন্তু এই সকল গাথার সর্ব্বত্র ময়নামতীর ও হাড়িসিদ্ধার অজস্র প্রশংসোক্তি; তাহাদের অলৌকিক প্রভাব ও গুণপনাসম্বন্ধে এরূপ সকল বর্ণনা আছে, যাহা পড়িলে মনে হয়, মহাজ্ঞানের প্রভাব দেখাইবার জন্যই যেন সকল গাথার সৃষ্টি হইয়াছে। এই মহাজ্ঞানের গুরু গোরক্ষনাথ, এবং তাঁহারই শিষ্য যোগীগণ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র এই গাথার প্রচার করিয়াছিলেন।

গোরক্ষনাথ।

গোরক্ষনাথ মানিকচন্দ্রের সমসাময়িক, কারণ তদীয় মহিষী তাঁহার শিষ্যা, সুতরাং তিনি একাদশ শতাব্দীর লোক। ডাক্তার ভাণ্ডারকার অনুমান করেন, গোরক্ষনাথ দ্বাদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন,—এসম্বন্ধে আরও অনেক প্রকারের অনুমান ও মত-ভেদ আছে। ইনি মীননাথের শিষ্য, কাহারও কাহারও মতে মীননাথের বাড়ী বাথর-গঞ্জে ছিল, এবং তিনি দশম শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের ধারণা। জন্ম-তারিখ সম্বন্ধে নানারূপ বাদানুবাদের গহনবনে প্রবেশ না করিয়া আমরা এখানে আমাদের স্থিরীকৃত সিদ্ধান্তই লিপিবদ্ধ করিতেছি। গোরক্ষনাথ একাদশ শতাব্দীর লোক ও তিনি পাঞ্জাবে জলন্ধর নামকস্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার রচিত অনেক সংস্কৃত-পুস্তক আছে, তন্মধ্যে গোরক্ষ-সংহিতাই শ্রেষ্ঠ। গোরক্ষনাথ নাথ-সম্প্রদায়ের অন্যতম নেতা। যে কয়েকখানি বঙ্গীয় গোরক্ষ-

বিজয়ের প্রাচীন পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাহার কোনখানিই ২৫০ বৎসরের অধিক প্রাচীন নহে। এই গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া চারিজনের নাম ভণিতায় পাওয়া যাইতেছে। কবীন্দ্রদাস, ফয়জুল্লা, ভীমদাস ও শ্যামদাস সেন। ফয়জুল্লার ভণিতাই সমধিক, এবং প্রাচীনতম হস্ত-লিখিত পুঁথিতে ইনিই একমাত্র লেখকরূপে পরিদৃষ্ট হন। সুতরাং ফয়জুল্লাকে আমরা "গোরক্ষ-বিজয় বা মীনচেতন" পুস্তকের আদি লেখক বলিয়া মাল্য-চন্দন দিতে প্রস্তুত, কিন্তু 'আদি লেখক' অর্থে আমরা শুধু সঙ্কলয়িতা বুঝাইতে চাই। যেরূপ শীতান্তে বকুলগাছের নীচে অজস্র ফুল পড়িয়া থাকে, বালিকারা আসিয়া সূতা পরাইয়া সেগুলি দিয়া মালা গাঁথিয়া লয়; সেইরূপ "গোরক্ষ বিজয়" ছড়ার মত দ্বাদশ শতাব্দীতে বঙ্গীয় গ্রাম্য সাহিত্যের এককোণে পড়িয়াছিল, ফয়জুল্লা প্রভৃতি লেখকগণ হয়ত পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দীতে তাহা কুড়াইয়া লইয়া সেগুলি কাব্যে পরিণত করিয়াছেন। সেই প্রাচীন দ্বাদশ শতাব্দীর রচনার অনেকাংশ এখনও ইহাতে বিদ্যমান।

গোরক্ষবিজয় বা মীনচেতন।

গোরক্ষ বিজয়ের মত এরূপ অপূর্ব্ব গ্রন্থ যে বঙ্গ সাহিত্যের আদি-যুগে রচিত হইয়াছিল, ইহা আমাদের গৌরবের কথা। গোরক্ষযোগীর চরিত্র শরৎ শেফালিকা বা যূথিকার ন্যায় শুভ্র; তাহার চরিত্র মাহাত্ম্য বঙ্গ-সাহিত্যের আদিযুগের একটি প্রধান দিক্ নির্দ্দেশক-স্তম্ভ। ইহা বৌদ্ধ-যুগের চরিত্র বল, উচ্চ-নীতি, গুরু-ভক্তি প্রভৃতি মহৎ গুণরাশিকে উজ্জ্বল করিয়া দেখাইতেছে। বিশালঅদ্রি-শ্রেণী যেরূপ বঙ্গদেশের সীমা-চিহ্ন, গোরক্ষ-বিজয় এদেশের সাহিত্যের সেইরূপ যুগ-নির্দ্দেশক চিহ্ন। এই চিহ্নের পর ভিন্ন যুগ ও ভিন্ন রাজ্যের এলাকা, তখন ব্রাহ্মণ আসিয়া সংস্কৃত-সাহিত্য মন্থন করিতেছেন; গ্রাম্যভাষাকে অবজ্ঞা করিয়া সংস্কৃত শব্দ দ্বারা বঙ্গভাষাকে সাজাইতেছেন এবং কঠোর জ্ঞানমার্গ ও চরিত্রবলের পথ ছাড়িয়া কোমল ভক্তি ও প্রেম কুসুমাকীর্ণ পথে লোক-রুচিকে সবলে টানিয়া লইতেছেন। এই অপূর্ব্ব পুঁথির গ্রাম্যভাষা ও রুচি যে পাঠককে শ্রান্ত ও ভগ্নোৎসাহ করিবে, তিনি সাহিত্যের এক মহার্ঘ খনির পরিচয় লাভে বঞ্চিত হইবেন। গোরক্ষ ভগবতীর সমস্ত প্রলোভন একটি একটি করিয়া জয় করিয়া ইয়ুদিশ্রেষ্ঠ জভের মত অকুণ্ঠিতভাবে স্থৈর্য্যপরায়ণ! নারীর ললাম সৌন্দর্য্য প্রেম-নিবেদনের নব নব কষ্টিপাথরে তাহার চরিত্র কতবার কষিত হইল,—কিন্তু প্রত্যেক বারই প্রমাণিত হইল,তাহা খাঁটি সোনা। পার্ব্বতী শিবের নিকট স্পর্দ্ধা করিয়া বলিয়াছিলেন, তাঁহার মায়ার নিকট যোগীর সাধনা কোন্ ছার। অন্যান্য যোগীরা রূপের জালে পড়িয়া ধৃত হইলেন,মীননাথ স্বয়ং মীনের মতই জালে আবদ্ধ হইলেন, কিন্তু গোরক্ষনাথের নিকট পার্ব্বতীর উচ্চ শির হেঁট হইল।

গোরক্ষনাথ কিরূপে নর্ত্তকী সাজিয়া কদলী-পত্তনে তাহার গুরুকে উদ্ধার করেন, মৃদঙ্গের ধ্বনিতে গুরুর উদ্বোধন কিরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, "কায়া সাধ" উপদেশ বারংবার মৃদঙ্গ হইতে ধ্বনিত হইয়া কিরূপে কদলী-পত্তনের রাজ-প্রাসাদ কম্পিত করিয়াছিল তাহা পাঠক নিজে পড়িয়া কৃতার্থ হইবেন।

যে চরিত্র-বল এবং নিস্বার্থ ও অহেতুকী ভক্তির উপর এই গ্রন্থের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত তাহা বঙ্গীয় অন্য কোন পুস্তকে নাই। যেমন অশোক-স্তম্ভ বৌদ্ধ-যুগের নিদর্শন,—এই পুস্তক তেমনই নাথধর্ম্মের একটি গৌরবজনক নিদর্শন। এই নাথ-ধর্ম্মে বৌদ্ধ ও শৈবধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ উপকরণে মিশিয়া গিয়াছিল। গোরক্ষবিজয় ও ময়নামতীর গানে বৌদ্ধ মহাযানের অনেক কথাই পাওয়া যাইতেছে। হাড়িপার উপদেশ গুলির অনেক গুলিই মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের নীতিসূত্র। দুর্লভ মল্লিকের পুস্তকে হাড়িপা শূন্য হইতে সমস্ত বিশ্বের উদ্ভব পরিকল্পনা করিয়াছেন এবং অহিংসা যে সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম, তাহার বারংবার উল্লেখ করিয়াছেন। গোরক্ষ তাহার গুরুকে ৩১টি প্রশ্ন করিয়াছিলেন—প্রশ্নগুলি এইরূপ "দীপ নিবিলে জ্যোতি কোথা গিয়া রহে?" "শব্দ উঠিলে ধ্বনি কোথায় চলি যায়?" "সুগন্ধি চন্দন গন্ধ কোথা থাকি পাএ?" ইত্যাদি। এই প্রশ্নগুলির অনেকই "সন্ধ্যা-ভাষায়" বিরচিত এবং যোগ সম্বন্ধীয়,—যথা—"অজপা কাহারে বলে, জপে কোন জন।" এই 'অজপা' শব্দের অর্থ করিতে হইলে তন্ত্র-শাস্ত্রের সাহায্যের প্রয়োজন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে গ্রাম্য মুসলমান ও অশিক্ষিত ব্যক্তিগণ এই দুরূহ যোগ-মার্গের বিষয় গুলির অনুশীলন করিয়াছিলেন। নাথধর্ম্মে যে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অনেক ছায়াপাত হইয়াছিল তাহা এই সকল গাথায় স্পষ্টই পরিদৃষ্ট হয়।

গোরক্ষবিজয় হইতে আভাষ পাওয়া যায় যে, এই যোগীই কালীঘাটের কালী প্রতিষ্ঠিত করেন। বিশ্বকোষ অভিধানে বহুপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল, লৌকিক প্রবাদ এই যে গোরক্ষনাথই কালীঘাটের কালীর প্রতিষ্ঠাতা। যখন এ কথা লিখিত হইয়াছিল, তখন গোরক্ষবিজয়ের অস্তিত্ব কেহ জানিত না। সুতরাং এই পুস্তক প্রাচীন প্রবাদকে দৃঢ়ীকৃত করিতেছে। সমস্ত ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া গোরক্ষ-নাথের শিষ্য সম্প্রদায়ে বিদ্যমান। এই নাথ-সম্প্রদায়ের চেষ্টায়ই গোরক্ষনাথের কীর্ত্তি-বিজ্ঞাপক সাহিত্য ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র প্রচার লাভ করিয়াছে। ময়নামতীর গান এই সাহিত্যের অন্তর্গত। এই রাজ্ঞীর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও নাথ-সম্প্রদায় ইঁহার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়াছেন। প্রত্যেক ধর্ম্ম সম্প্রদায়ই স্বীয় দলের উৎসাহী প্রচারক বর্গের দোষ লক্ষ্য করেন না। সাম্প্রদায়িক সত্যের প্রচার এবং তদুদ্দেশ্যে উৎসাহ উদ্দমের পরিচয় পাইলেই তাঁহারা চরিতার্থ হন। এই জন্যই ময়নামতী ও হাড়িসিদ্ধার গুণ-গানের জন্য এই সকল গাথা বিরচিত হইয়াছিল। গোরক্ষনাথের দল-ভুক্ত গুরুপদে আসীন কানফা, গাভুর সিদ্ধা প্রভৃতি ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে এইরূপ গাথা প্রচলিত আছে কি না তাহাও সন্ধান করিয়া দেখিবার বিষয়। গোরক্ষবিজয় ও ময়নামতীর গান যে এক যুগের এবং একই সম্প্রদায়ের রচিত তাহার অনেক নিদর্শন উভয় পুস্তকে বিদ্যমান রহিয়াছে। গোরক্ষবিজয় কদলীপত্তনের প্রজাবৃন্দের সুখসমৃদ্ধির সম্বন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে, "কার পোখরির পানি কেহ নাহি খায়। মণি মাণিক্য তারা রৌদ্রেতে শুখায়॥" শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য সংগৃহীত ময়নামতীর গানে মাণিকচন্দ্রের

প্রজাদের সম্বন্ধে লিখিত আছে, "কারু পুষ্করিণীর জল কেহ নাহি খায়। আখাইলের ধন কড়ী পাখাইলে শুখায় এবং ভট্টশালী সংগৃহীত পুঁথিতে পাওয়া যায়, "হীরা মণ মাণিক্য তলীতে শুখাইত। কাহার পুষ্করিণী জল কেহ না খাইত।" গোরক্ষবিজয়ে গোরক্ষ তদীয় গুরু মীননাথকে বলিতেছেন,—"প্রদীপ নিবিলে গুরু কি করিবে তেলে। আইল বান্ধিয়া কিবা ফল জল আগে গেলে॥ মূল কাটা গেলে গুরু না জীয়য়ে গাছ। বিনি জলে কথাত শুনিছ জীয়ে মাছ॥" ভট্টশালী সম্পাদিত ময়নামতীর গানে রাজ্ঞী তদীয় পুত্র গোবিন্দচন্দ্রকে বলিতেছেন, "প্রদীপ নিবিলে বাপু কি করিবে তেলে। আইল বান্ধিলে কিবা ফল জল ছুটি গেলে॥ শিব কাটিলে বাপু আপনি পড়ে গাছ। বিনি জলে কথাত শুখনায় যায় মাছ॥" গোরক্ষবিজয়ে গুরুকে সাধু গোরক্ষনাথ পুনরায় বলিতেছেন,

"ঠগের হাতেত গুরু সঁপিলা ভাণ্ডার।
ঢাঙ্গাতির হাতে ভরা সঁপিলা তোমার॥
মাছের প্রহরী দিলা দারুণ যে উদ।
বিরাল প্রহরী দিলা ঘন আওটা দুদ।
মহাতেজ কুড়ালেতে সমর্পিলা তরু।
ব্যাঘ্রের সম্মুখে তুমি সমর্পিলা গোরু॥
দরিদ্রেতে থুলে তুমি অমূল্য রতন।
কাষ্ঠের উপরে যেন অগ্নির স্থাবন॥
ধান্তের ভাণ্ডারে যেন উন্দুর পহরী
শ্রীকালের হাথে যেন হংস দিলা ধরি॥
হিমানিতে সমর্পিলা বিমল কমল।
জলের প্রহরী যেন দিয়াছে অনল॥
কুকুরের মুখে গুরু রাখিয়াছ গেজা।
মান কচু পহরী যেন রাখিয়াছ সেজা॥"

ভবানীদাস লিখিত ময়নামতীর গানে গোবিন্দচন্দ্রের প্রতিবার উক্তি এইরূপ,—

বাঘের সাক্ষাতে যেন গোরু সমর্পিলা।
মৎস্য পহরী যেন উদক রাখিলা॥
মানকচু পহরী তুক্ষি থুইয়াছ হেঁজা।
ঘিঞ্জিরের হাতে তুক্ষি সমর্পিলা গেজা॥
ধান্ত গোলা পহরী তুক্ষি উঁদুর থুইলা।
কাকের সম্মুখে রাজা মরিচ সমর্পিলা॥

সুতরাং ময়নামতীর গান ও গোরক্ষ বিজয়ের স্থানে স্থানে রচনা ও ভাবের আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। এই সমস্ত গ্রাম্য-গাথা যে একই উৎস হইতে উৎসারিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ধর্ম্মমঙ্গলের পুঁথিগুলিরও কোন কোনটিতে আমরা মীননাথ, গোরক্ষনাথ, হাড়িপা, কানফা প্রভৃতি নাথ-গুরুগণের সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ উল্লেখ পাইয়াছি। ধর্ম্মমঙ্গলগুলির সহিত বর্ত্তমানে আলোচ্য গাথাগুলির এই সৌহার্দ্দসূত্র টের পাওয়া যায়। সুতরাং ইহাদের মধ্যে ধর্ম্মগত কোন প্রকার ঐক্য যে বিদ্যমান ছিল তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।

এই সমস্ত গাথা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনরুত্থানের পূর্ব্ববর্ত্তী। সাধারণ জন সমাজে তখনও রামায়ণ-মহাভারতাদির অনুশীলন এদেশে আরম্ভ হয় নাই। অনেক রমণীর বর্ণনা আছে, কিন্তু কাহারও চক্ষু নীলোৎপলের ন্যায় নহে, কাহারও ওষ্ঠ পক্ক বিম্বকে কিম্বা কাহারও দন্ত দাড়িম্ব বীজকে লজ্জা প্রদান করে না। ইহাঁদের সুদীর্ঘ কেশপাশ কালভুজঙ্গ হইয়া নায়ককে দংশন করে না। অনেক বীরের বর্ণনা আছে, কিন্তু কাহারও ভুজ আজানুলম্বিত অথবা শালসম নহে। গোবিন্দচন্দ্রের রাণীর দশন-পঙক্তি অতি সুন্দর, গ্রাম্য কবি তাহাদিগকে শোলার সহিত উপমা দিয়াছেন। সর্ব্বত্রই গ্রাম্য ক্ষেত্রের গ্রাম্য পশু পাখী প্রভৃতির কথা। পরবর্ত্তী সাহিত্যে বঙ্গভাষার উপরে সংস্কৃতশব্দের যে সৌধ নির্ম্মিত হইয়াছিল, এই সকল গাথায় তাহার চিহ্নমাত্র নাই। চিরপরিচিত বঙ্গ কুটির, মেয়েলী ছড়া, প্রাচীন প্রবাদবাক্য এই সমস্ত গাথার প্রাণ স্বরূপ এবং ইহাতে বঙ্গীয় কাব্যশ্রী সামান্য বসন পরিহিতা বঙ্গীয় পুর-স্ত্রীর মতই অনাড়ম্বর ভাবে আমাদিগকে দর্শন দিতেছেন। আমরা যদি পাণ্ডিত্যাভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাদের নিজস্ব জিনিষ বুঝিতে শিখি, তবে সামান্য হইলেও এই পল্লীগাথাগুলি প্রিয় মনে করিব। এইটুকু জানা দরকার যে, আপাত সামান্যবৎ প্রতীয়মান ক্ষুদ্র জিনিষও প্রিয়জনের চক্ষে মহার্ঘ হইতে পারে।

এই পুস্তকগুলিতে হিন্দু-রাজত্বের সময়কার অনেক সামাজিক রীতিনীতির প্রতিচ্ছায়া পাওয়া যায়। বিশ্বেশ্বর বাবুর সংগ্রহে ময়নামতী স্বয়ং হাটবাজারে যাইতেন, এরূপ দৃষ্ট হয়। নলিনীবাবুর সংগ্রহে দেখা যায় গোবিন্দ-চন্দ্রের মহিষীরা কোন সামগ্রী কিনিতে হইলে নিজেরা দোকানে উপস্থিত হইতেন। ইহা দ্বারা অবাধ স্ত্রী স্বাধীনতা সূচিত হইতেছে। অনেকের বিশ্বাস খোল বা মৃদঙ্গ বৈষ্ণবেরা আমদানী করিয়াছেন, কিন্তু মহাপ্রভুর আবির্ভাবের বহু পূর্ব্ব হইতে এই প্রদেশ মৃদঙ্গ শব্দে মুখরিত হইয়া আসিতেছে। কৃষ্ণকীর্ত্তনে কৃষ্ণ স্বয়ং বংশী ত্যাগ করিয়া মৃদঙ্গ বাজাইয়া গোপীর মন ভুলাইতেছেন এবং গোরক্ষবিজয়ের স্বয়ং গোরক্ষনাথ খোলের মুখে এরূপ ধ্বনির উদ্ভব করিতেছেন যেন তাহা কথার ন্যায় সুস্পষ্ট হইয়া বাদকের মনের ভাবের অভিব্যক্তি করিতেছে। সুতরাং বহু-প্রাচীন কাল হইতে যে এই বাদ্যের উৎকর্ষ-সাধনের জন্য সাধনা চলিয়া আসিতেছে, তাহা প্রমাণিত

হইতেছে। ময়নামতীর গানে দৃষ্ট হয়, প্রজারা সদাশয় রাজার রাজত্ব কালে এরূপ সম্পন্ন হইত যে সামান্য লোকের ছেলেরা সোনার ভাটা (বল) লইয়া ক্রীড়া করিত, এবং কৃষকগণও পুষ্করিণী কাটাইয়া—নিজের রাস্তাঘাট নিজেরা প্রস্তুত করিয়া লইত, পর-প্রত্যাশী হইয়া থাকিত না। ব্যবসায়ী গণ একটু অবস্থাপন্ন হইলে হাতী কিনিয়া ফেলিত এবং ধনাঢ্যগণ গৃহ-প্রাঙ্গণে হীরা, মণি মাণিক রৌদ্রে শুকাইতে দিত। এই সকল পুস্তকে আরও দেখা যায় যে সমস্ত দেশময় তান্ত্রিক আচার ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, কথায় কথায় লোকে অগ্নিপরীক্ষা, তপ্ততৈল-পরীক্ষা কিম্বা বিষ প্রয়োগ পরীক্ষার সহায় লইয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধের বিচার করিত। অভিচার দ্বারা শত্রুবিশেষকে বিপর্য্যস্ত করিবার চেষ্টাও সর্ব্বদা অনুষ্ঠিত হইত। রাজাদের পাশাখেলা একটা ব্যসনের মধ্যে পরিগণিত ছিল। ব্রাহ্মণদের গলায় উপবীত সর্ব্বদা থাকার কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম ছিল না, অনেক সময় বস্ত্রাদির ন্যায় উহা টাঙ্গাইয়া রাখা হইত, বাহিরে যাইবার সময় তাহা ব্যবহারের প্রয়োজন হইত। এই রীতি মহাপ্রভুর সময় পর্য্যন্ত ছিল তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কোন কোন পরিবার যে উপবীত-বিরহিত হইয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ স্বরূপ বহুদিনের প্রবাদবাক্যে রহিয়াছে—"পৈতা ছাড়ি পৈতা লয় বৈদিকে দেয় পাতি।"

রাজসভার যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাহাতে দৃষ্ট হয় রাজাকে ঘিরিয়া ব্রাহ্মণ বৈদ্য পণ্ডিতগণ উপ-বেশন করিতেন। সম্মুখভাগে রাজগুরু বসিতেন। এক পার্শ্বে ভাট রাজগণ গাথা গাইত। এবং অপর পার্শ্বে প্রধান সচীব আসীন থাকিতেন। রাজার পশ্চাতে "আরণি" ও ছত্রধারকের স্থান ছিল; এবং তাহাদের সহিত সমসূত্রে জলের গাড়ু, পানের বাটা এবং ব্যজনী-বাহক ভৃত্যগণ দাঁড়াইয়া থাকিত। সভার উত্তর দিকে সম্ভ্রান্ত বণিকগণ উপবেশন করিতেন, এবং পশ্চিমদিকে সাধু সন্ন্যাসিগণের স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। বৃহৎ প্রাঙ্গণে প্রজাগণ উপস্থিত হইয়া অভিযোগাদি করিত। প্রত্যহ রাজ-ভাণ্ডারী রাজাকে আয় ব্যয়ের মোটামুটি হিসাব শুনাইত। (বঙ্গ-সাহিত্যপরিচয়, প্রথম ভাগ ৯৭ পৃঃ)।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তন্ত্রাদির প্রচলন দ্বারা দ্বাদশ শতাব্দীতে যে সকল অলৌকিক ব্যাপারের কাহিনীর উপর লোকের আস্থা স্থাপিত হইয়াছিল, ঐ যুগের য়ুরোপীয় পল্লীগাথাতেও প্রায় সেইরূপ অনেক অলৌকিক উপাখ্যান পাওয়া যাইতেছে; তাহাদের কোন কোনটির সঙ্গে বঙ্গীয় পল্লীগাথার আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। ময়নামতীর গানে রাণীর নানাপ্রকার আকৃতি গ্রহণ করিয়া গোদাযমকে অনুসরণ করার উপাখ্যান বিবৃত হইয়াছে। ময়নামতী যমদূতকে তাড়াইয়া নদীতে লইয়া গেলেন, যমদূত ঝাঁপ দিয়া নদীতে পড়িল। রাণী মহিষরূপ ধারণ করিয়া দূতকে জলের মধ্যে তাড়া করিলেন। যমদূত শফরী হইয়া নদীতরঙ্গে মিলাইয়া গেল, রাণী পানিকাউড়ী হইয়া শফরীকে আক্রমণ করিলেন।

যমদূত চিংড়ী মৎস্য হইয়া লাফাইতে লাফাইতে চলিল, তখন ময়নামতী রাজহাঁস হইয়া চিংড়ীকে তাড়া করিতে লাগিলেন, তারপর আরও নানা রূপ-পরিবর্ত্তন করার পর যমদূত পায়রা হইয়া আকাশে উড়িয়া গেল, ময়না বাজ হইয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। তারপর গোদাযম বৈষ্ণবের রূপ ধারণ করিয়া ভেকাশ্রিতগণের মধ্যে যাইয়া বসিল, রাণী মৌমাছি হইয়া সেই ছদ্মবেশী বৈষ্ণবের টিকির উপর বসিয়া মস্তকে হুল ফুটাইয়া দিলেন। (বঙ্গসাহিত্য পরিচয়, প্রথম ভাগ ৩৯ পৃঃ)। ভারতীয় প্রাচীন শাস্ত্রে ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে, বেদে ত্বিষ্টাকন্যা সরণার অশ্বিনীরূপ ধরিয়া পলায়ন এবং বিবস্বানের অশ্বরূপে তার অনুসরণ, শিবিরাজার উপাখ্যানে ইন্দ্র ও যমের যথাক্রমে শ্যেন ও কপোতরূপ স্বীকার; ধর্ম্মগুপ্ত-কন্যা সোমপ্রভার কথা (কথা-সরিৎ-সাগর ১৭শ তরঙ্গ) প্রসঙ্গে অগ্নিদেবও গুহচন্দ্রের ভৃঙ্গরূপ ধারণ প্রভৃতি বহু দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ম্যাবিনিজন নামক গ্রন্থের তৃতীয় ভাগে (ট্যালিসিন, ৩৫৯ পৃঃ) কারিডওয়েন সম্বন্ধীয় আখ্যানে এইরূপ বর্ণিত আছে;—

"গুইনবাচ্‌কে পলাইতে দেখিয়া কারিডওয়েন তাহাকে অনুসরণ করিল। গুইনবাচ্‌ অনুসরণকারিণীর হস্ত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য একটি খরগোশ রূপ ধারণ করিয়া দ্রুত যাইতে লাগিল। কিন্তু কারিডওয়েন সারমেয় রূপ ধরিয়া খরগোশের অনুসরণ করিল। প্রাণ ভয়ে গুইনবাচ্‌ একটি মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া নদীতে পড়িল। কারিডওয়েন পানিকউড়ী হইয়া মৎস্যকে অনুসরণ করিল। গুইনবাচ্‌ তখন পাখী হইয়া আকাশে উড়িয়া গেল। কিন্তু কারিডওয়েন বাজ হইয়া পক্ষীকে অনুসরণ করিতে লাগিল। উপায়ান্তর না পাইয়া তাড়িত ব্যক্তি একটা গোলার নিকট যবরাশির মধ্যে একটা যবের দানা হইয়া মিশিয়া গেল। কিন্তু কারিডওয়েন একটি কৃষ্ণকুক্কুটীর রূপ ধরিয়া যবের প্রত্যেকটি দানা খুঁজিয়া তাহাকে বাহির করিল।" গেলিক দেশের নানা আখ্যানে এইরূপ গল্প প্রচলিত আছে। টুরিএনের পুত্রগণ কর্ত্তৃক হেস্‌পেরিডেস্‌ উদ্যানের তিনটি আতা হরণের গল্পে লিখিত আছে;—সে দেশের রাজার তিন কন্যা ছিল, তাহারা মন্ত্র তন্ত্র জানিত। তাঁহারা মন্ত্রবলে ভোঁদড় হইয়া বাজরূপধারী তিন রাজপুত্রকে আক্রমণ করিল। কিন্তু রাজকুমারগণ বাজরূপ ছাড়িয়া সারসরূপ ধারণ করিলেন এবং সমুদ্রের ভিতরে প্রবিষ্ট হইলেন।" (সেল্‌টিক মিথ্‌ এ্যাণ্ড্‌ লিজেণ্ড, চারলস্‌ স্কোয়ার, ৯৯ পৃঃ)।

দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রচলিত বঙ্গীয় বহু উপাখ্যানের সঙ্গে য়ুরোপীয় গল্পের আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। আমাদের বিশ্বাস এই সকল উপাখ্যান ও মন্ত্রতন্ত্রের কথা ভারতবর্ষ হইতে অপরাপর দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। কি উপায়ে ভারতবর্ষ এই সকল আখ্যান বিদেশে পাঠাইয়াছিলেন, তাহা নিশ্চয় বলা যায় না। আরবগণ হিতোপদেশ, জাতক, এবং কথা সরিৎসাগরের গল্প য়ুরোপে পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু বঙ্গদেশের পল্লীগাথা কি সেই উপায়ে বিদেশে গিয়াছিল? ঢাকার মস্‌লিন যে জাহাজে বিদেশ গিয়াছিল, এই সকল গল্প কি তাহাতেই রপ্তানি হইয়াছিল? বহু শতাব্দী পূর্ব্ব হইতে আর্য্যাবর্ত্ত হইতে লুরি নামক বংশীবাদকের দল এদেশ ত্যাগ করিয়া য়ুরোপ প্রভৃতি নানা

রাজ্যে বসতি স্থাপন করেন, তাঁহাদের বংশধরগণ এখন জিপ্‌সি নামে পরিচিত, ইহাঁরাই কি এই সকল আখ্যানের বাহক হইয়াছিলেন ?

ক্রুসেডের সময় য়ুরোপীয় জাতি সমূহের সঙ্গে এসিয়াবাসিগণের একবার ভাবের আদানপ্রদান হইয়াছিল। অনেকের বিশ্বাস ভারতের অনেক গল্প এই সময়ে য়ুরোপে প্রবেশলাভের সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিল। বঙ্গীয় রামায়ণের ভস্মলোচনের সঙ্গে গ্যালিক উপাখ্যানের ব্যালর নামক অপ-দেবতার আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দৃষ্ট হয় এবং আমরা বহুসংখ্যক প্রাচীন বঙ্গীয় গল্পের সঙ্গে য়ুরোপ প্রচলিত গল্পের আশ্চর্য্য প্রকারের মিল পাইয়াছি। এ সম্বন্ধে আমি "Folk Literature of Bengal" নামক পুস্তকে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়াছি।

(৩) কথা-সাহিত্য

বাঙ্গালার কতকগুলি নিজস্ব ব্রতকথা ও রূপকথা আছে যাহা বহু প্রাচীন। ময়নামতীর গান এবং গোরক্ষবিজয়ের ন্যায় তাহাদের ভাষাও রূপান্তরিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তন্মধ্যে অতি প্রাচীন ভাষার নিদর্শন আছে। সেগুলি কত প্রাচীন তৎসম্বন্ধে কোন ঠিক সংবাদ দিতে না পারিলেও আমরা দেখাইব, যে যুগে বাঙ্গালীর ডিঙ্গা বহর বাঁধিয়া সমুদ্রে গমনাগমন করিত; যে যুগে সাধু বা বণিকের এ দেশে প্রায় রাজ-সম্মান ছিল; যে যুগে রাম লক্ষ্মণ, প্রহ্লাদ ধ্রুব প্রভৃতি পৌরাণিক চরিত্র গুলি এদেশের কল্পনামুগ্ধ করে নাই,—যে যুগে শ্রীকৃষ্ণের পরিবর্ত্তে শিবঠাকুর ষোড়শত গোপিনী লইয়া মথুরায় নৌ-বিহার করিতেন, এবং শিবের পরিবর্ত্তে সূর্য্যদেব গৌরীর পাণিগ্রহণের জন্য ব্যস্ত হইতেন,—যে যুগে ইন্দ্র-চন্দ্র বরুণের পরিবর্ত্তে থুয়া, ভাদালি, ধাতা কাতা প্রভৃতি গ্রাম্য অনার্য্য দেবতা এদেশের মহিলাগণের নিকট ভোগ ও পূজা পাইতেন,— যে যুগে বাঙ্গালী মেয়েরা স্বামী পুত্রকে বাণিজ্যের জন্য সমুদ্রে পাঠাইয়া অবিরত গ্রাম্যদেবতাগণের নিকট তাহাদের নিরাপদ প্রত্যাগমনের জন্য প্রার্থনা করিত এবং বলি 'মানসিক' করিত,—পৌরাণিক ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং বৌদ্ধ-শক্তির পরিণতির সেই যুগে এই সমস্ত গ্রাম্য কথা রচিত হইয়াছিল। এতৎসম্বন্ধে আমরা কতকগুলি প্রমাণের উল্লেখ করিব।

কথা সাহিত্যের প্রাচীনত্ব।

প্রথম প্রমাণ ভাষা। ভাষা রূপান্তরিত হইলেও মাঝে মাঝে প্রাচীন যুগের নিদর্শন এখনও রহিয়া গিয়াছে যথা প্রাচীন "থুয়া" এবং "ভাদালি" ব্রত কথায়—"থুয়া পুজি থুয়ালী। আঘন মাসের ভুঞ্জালী। অকালে ভাতন্তী। অকালে পুতন্তি।" "ঢেঁকি পড়ন্ত। গাই বিয়ন্ত।" যথা সূর্য্যগাথায়—"আজ যা গৌরী কান্দ্যাকাট্যা। কাইল আইস গৌরী হাস্তারস্তা। গৌরীর মা কাঁদে কাটে। হাজার টাকা গাইডে বাঁধে।" "তিন থ্যাকর থ্যাকনা তিন ঝাকর ঝাঁকনা।" (শঙ্খমালা)

এরূপ অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। ব্রত-কথার ভাষা বিশেষ প্রাচীন, কারণ তন্ত্রমন্ত্রের

ভাষা শুদ্ধ করিলে, তাহাদের শক্তির হানি হয়। সূর্য্যের গাথায় ভাষা একটুকু বেশী পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু যেখানে কবিতার চরণ পয়ারের মত নহে, ছড়ার মত, সেইখানেই প্রাচীন রচনা বুঝিতে হইবে—অবশ্য পাঁচালীকারগণ সেই সকল ছড়ার অনুকরণে আধুনিক কালেও অনেক আখ্যান লিখিয়াছেন—সেই সকল আধুনিক রচনায় সংস্কৃত-কথার বাহুল্য দেখিয়া রচনা-কাল সম্বন্ধে সংশয় থাকিতে পারে না, কিন্তু প্রাচীন ছড়া সে জাতীয় নহে। সেগুলি ডাক ও খনার-বচনের শ্রেণীর। কোন কোন স্থলে এই গ্রাম্য কথা গুলিতে ময়নামতীর গান ও গোরক্ষবিজয়ের যুগের ভাষা অবিকল রহিয়া গিয়াছে। রাজা গোবিন্দচন্দ্রের রাণী অদুনা স্বীয় যৌবন-শ্রী দ্বাদশ বৎসরে বিনষ্ট হইবে—সুতরাং সন্ন্যাসের সময় অতিবাহিত হইলে তিনি আসিয়া আর তাঁহাকে যুবতীরূপে পাইবেন না, এই কথা বুঝাইতে যাইয়া বলিতেছেন :—

"ধান চাউল বসন নহে গোলা বান্দি থুমু।
রাজায় রাজায় যুদ্ধ নহে মাল যোগাইমু।
বাদসাই যাচক নহে মোহর মারিমু।
মালী ঘরের পুষ্প নহে বসিয়া গাথিমু॥
তেলি ঘরের তেল নহে বাজারে বেচিমু।
সূতার কাপড় নহে ঝাড়া বদলিমু।
ধর্ম্মঘটী যৌবন মুই কিরূপে রাখিমু॥"

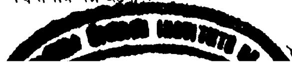
শঙ্খমালার গল্পে শক্তির যৌবনসম্বন্ধে শঙ্খবণিকের ভগিনী কুজী বলিতেছে ঃ—

"এত গোলার জিনিষ নহে যে গোলা ছাঁদিয়া রাখিব।
বাণিয়ার সিন্দুর নহে কৌটায় ভরিয়া থুব॥" *

ব্রত কথায় ময়নামতীর গানের ন্যায়, ধর্ম্মঠাকুর অতি উচ্চপদে আসীন আছেন; এবং রূপকথা ও ব্রতকথা এই উভয়েই "ধাতা-কাতা" দেবতার উল্লেখ আছে।

দ্বিতীয় প্রমাণ—এই সকল কথা ও গাথার মধ্যে অতীতের একটা সুস্পষ্ট চিত্র ফুটিয়াছে। পৌরাণিক যুগে হিন্দুর সমুদ্র যাত্রা নিষিদ্ধ হইয়া গেল; বণিকের আসন অনেক নিম্নে নামিয়া পড়িল। পঞ্চদশ কিংবা ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত মনসা-দেবীর ভাসান এবং চণ্ডী-মঙ্গল সমূহে সমুদ্র-যাত্রার যে বর্ণনা আছে তাহা অতিরঞ্জিত ও বিকৃত, বহুপূর্ব্ব হইতে সমাগত কিম্বদন্তী ও প্রবাদকে কবিগণ কল্পনাবলে রূপান্তরিত করিয়া সেগুলিকে সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল ব্রত কথা এবং রূপ-

* দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার সঙ্কলিত শঙ্খমালার গল্প দ্রষ্টব্য।



কথার মধ্যে আমরা সমুদ্র-যাত্রার সম্বন্ধে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য জানিতে পাই। বর্ষার দুর্দ্দিনে যখন দিঙ্‌মণ্ডল ব্যাপিয়া ঘনঘটার আবির্ভাব হইত, প্রবল ঝটিকার সঙ্গে বিদ্যুৎ স্ফুরিত হইতে থাকিত —তখন প্রবাসগত নিজজনের চিন্তায় বঙ্গললনার প্রাণ ব্যাকুল হইত, সেই ব্যাকুলতার প্রতিচ্ছায় আমরা দেবতাগণের নিকট তাঁহাদের বহু আবেদন-নিবেদন ও চিন্তাকুল প্রার্থনায় পরিষ্কার রূপে বুঝিতে পারি। রূপ-কথাগুলিতে সমুদ্র যাত্রার প্রাক্কালে বণিক-সীমন্তিনীরা কিরূপে স্বীয় কেশদাম উন্মুক্ত করিয়া স্বামিগণের পা মুছাইয়া দিতেন, আলিপনা দ্বারা গৃহ-প্রাঙ্গণ রঞ্জিত করিতেন, নাবিকগণ কি ভাবে বণিককে জিজ্ঞাসা করিত, 'পরিবার বর্গের জন্য সংস্থান করা হইয়াছে কিনা,—প্রত্যেকের নিকট অনুমতি লওয়া হইয়াছে কিনা, তাঁহারা সকলে আহ্লাদ সহকারে সম্মতি দিয়াছেন কিনা, দেবতাগণের ভোগের ব্যবস্থা ও দেবমন্দিরের "অষ্টচূড়া" অলঙ্কৃত করা হইয়াছে কি না'—সেই সকল বর্ণনা পড়িয়া মনে হয় যেন একটি অতীতযুগের যথাযথ চিত্রপট আমাদের চক্ষের নিকট উদ্‌ঘাটিত হইতেছে। ডিঙ্গাগুলিকে তৈল সিন্দুর ও চন্দন পরান, তাহাদের মধ্যে "মধুকরে"র বিশেষরূপ অঙ্গরা করা, দিনরাত্র জ্বালিয়া রাখিবার জন্য পঞ্চদীপের ব্যবস্থা ও মণির ঝালর ও বণিকের নামাঙ্কি পতাকার অজস্র ব্যবহার—এ সকলই যেন প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য বলিয়া মনে হয়। বণিকগণে কপটতা ও প্রতারণার নিম্নলিখিত বর্ণনার মধ্যেও যেন অনেকটা সত্য আছে বলিয়া বোধ হয়ঃ—

কোন হ বেনে দারচিনি দিতে দরমুজ বাহির করে।
কোন হ বেনে কাহনের বস্তু বেচে সিক্কার দরে॥
কোন যে বেনে 'খাণ্ডারা' পাথর ঝাঁপিতে ভরিয়া থোয়।
ওরে মহামাণিক্য, সাহা মাণিক্য কয়ে লোকেরে বিকোয়॥"

(ঠাকুর দাদার ঝুলি, প্রথম সংস্করণ ২৯০ পৃঃ)।

প্রত্যেক জাহাজের গুলুয়ে এক একটি চামর থাকিত। বহু খুঁটিতে বাঁধা কাছিগুলির দৈর্ঘ্য সম্ব এই সকল গল্পে অনেক কথা পাওয়া যায়। সমুদ্র যাত্রাকালে সাগরের পূজা এবং বহু ছাগ ব দিতে হইত।

এই যুগে রাজপুত্র ও সদাগরের পুত্র সামাজিক মর্য্যাদায় প্রায় সমকক্ষ। জাতিভেদ খুব প্রব ছিল বলিয়া মনে হয় না, কারণ বিবাহ-সময়ে জাতি-সম্বন্ধে কোন কথাই উঠিত না। ভাটগণ পাত্র পাত্রীর চিত্র লইয়া দেশ বিদেশে আনাগোনা করিত।

তৃতীয় প্রমাণ—মুসলমানী বঙ্গ-সাহিত্যে পাওয়া যায়। বাঙ্গলা দেশের মুসলমানগণের পূর্ব পুরুষেরা অধিকাংশই হিন্দু বা বৌদ্ধ ছিল। তাঁহাদের অনেকেই ত্রয়োদশ—চতুর্দ্দশ শতাব্দী কিংব তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তীকালে মুসলমান ধর্ম্ম পরিগ্রহ করেন। কিন্তু মুসলমান ধর্ম্মগ্রহণ করার পরে

অনেকে তাহাদের জাতীয় বৃত্তি ছাড়িতে পারেন নাই। এখনও পূর্ব্ববঙ্গের এক শ্রেণীর মুসলমানেরা লক্ষ্মীর পাঁচালী গাহিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিয়া থাকে। "প্রাতঃকালে ছড়া দেয় রে সাঁঝ হৈলে বাতি। লক্ষ্মী বলে সেই ঘরে আমার বসতি।" "সতী নারীর পতি যেন পর্ব্বতের চূড়া। অসতীর পতি যেমন ভাঙ্গা নায়ের গুড়া।" প্রভৃতি গান অনেকেই মুসলমান ফকিরের মুখে শুনিয়া থাকিবেন। এই ছড়াগুলিতে অনেক স্থানে খুব প্রাচীনভাষার নিদর্শন আছে। ইহা কখনই সম্ভবপর নহে যে মুসলমান ধর্ম্ম পরিগ্রহের পর এই সকল ফকিরেরা লক্ষ্মীর পাঁচালী শিখিয়াছিল। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী থাকার সময় যাঁহারা এই পাঁচালী গাইয়া জীবিকা অর্জ্জন করিত, তাহাদেরই বংশধরগণ সেই বৃত্তি এখনও অব্যাহত রাখিয়াছে। কেবল ইহাই নহে, হিন্দু বা বৌদ্ধাবস্থার সময় তাহারা যে সকল পূজা করিত ও রূপকথা শুনিত—তাহার চর্চ্চা এখনও কতক পরিমাণে তাহাদের মধ্যে বিদ্যমান আছে। এখনও তাহারা "জ্বরাসুরের" গাথা গাইয়া থাকে এবং সাপের মন্ত্রগুলি তাহাদের একরূপ একচেটিয়া ; এই সকল মন্ত্র-তন্ত্র এবং গাথা হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবতাগণের স্তুতিবাদে পূর্ণ, কিন্তু হইলে কি হয় ? এগুলি এখনও মুসলমানগণেরই একরূপ নিজস্ব হইয়া রহিয়াছে। সেই প্রাচীনকালে যে সমস্ত রূপকথা এদেশে প্রচলিত ছিল, মুসলমান হইয়াও রমণীগণ তাহাদের মাধুর্য্য ভুলিতে পারে নাই, তাহা তাহাদের শিক্ষার অস্থিমজ্জার মধ্যে ঢুকিয়াছিল, তাহাদের প্রভাব তাহারা এড়াইবে কিরূপে ?

একথা যদি বলা হয়, সে মুসলমান হওয়ার পর সেই সকল রমণীরা অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে হিন্দু মহিলাগণের নিকট হইতে এইরূপ কথাগুলি শিখিয়া লইয়াছে, সে কথা কখনও বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না। কারণ নিষিদ্ধ মাংস, পিঁয়াজ, রসুণ প্রভৃতির ব্যবহাব হিন্দু ও মুসলমান রমণীগণের মধ্যে এমন একটা দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর তুলিয়া রাখিয়াছে—যে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের কোন সম্ভাবনা এখনও হয় না। এই সকল রূপ-কথার মধ্যে দেব দেবীর কথা অনেক আছে এবং নায়ক নায়িকারা সকলেই হিন্দু, এরূপ অবস্থায় মুসলমান মহিলারা কেনই বা হিন্দুর নিকট হইতে এগুলি শিখিতে যাইবে। মুসলমান হওয়ার পর তাহাদিগকে মোল্লারা হিন্দুর নিকট হইতে কোন ধর্ম্ম শিক্ষা গ্রহণ করিতে দেয় নাই। তাহাদের গৃহের পার্শ্বে খোল কর্ত্তাল বাজাইয়া এই ৫।৬ শত বৎসর যাবৎ হিন্দুর যে পৌরাণিক ধর্ম্ম প্রচার করিতেছে, তাহার একটি বর্ণও মুসলমান-গণ গ্রহণ করে নাই। প্রহ্লাদের ভক্তি, ধ্রুবের তপস্যা, রাম রাবণের যুদ্ধ, কুরুপাণ্ডবের কীর্ত্তিগাথা—মুসলমানগণ গ্রহণ করে নাই। কিন্তু কাঞ্চন-মালা ও পুষ্পমালার রূপকথা সখী-সোনার গীতি-কথা তাহারা মাতৃক্রোড়ে বসিয়া এখনও শুনিয়া থাকে। এ সমস্ত রূপ-কথা পৌরাণিক-ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী, সুতরাং তাহাবা এসমস্ত উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়াছে। আমরাও যে ভাবে পাইয়াছি,

তাহারাও সেই ভাবে পাইয়াছে। এ সমস্ত বিষয়ই রামতনু লাহিড়ীর রিসার্চ্চ ফেলোরূপে আমি বিবিধ প্রবন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখাইয়াছি। এস্থলে তাহা অতি সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করিতেছি মাত্র।

মুসলমানগণের মধ্যে যে এই সকল অতি-প্রাচীন গীতিকথা এখনও প্রচলিত তাহা নিম্নলিখিত মুদ্রিত পুস্তকের তালিকা হইতে জানা যাইবে ঃ—

১। চন্দ্রাবলীর পুঁথি—মুন্সী মহাম্মদ আবেদ বিরচিত।
১৫৫ নং দরজিপাড়া মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীট্ হইতে প্রকাশিত।

২। মধুমালার কেচ্ছা—খোন্দকার জাবেদআলি কর্ত্তৃক বিরচিত।
১৫৫ নং মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীট্ হইতে প্রকাশিত।

৩। মালঞ্চ কন্যার কেচ্ছা—মুন্সী আয়জদ্দিন বিরচিত।
৩৭৭ নং চিৎপুর রোড পুস্তকালয় হইতে প্রকাশিত।

৪। ছরাসুবার পুঁথি—মুন্সী এনাতুল্লা সরকার কর্ত্তৃক বিরচিত।
১৫৫ নং মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীট্ হইতে প্রকাশিত।

৫। সতীবিবির কেচ্ছা—মুন্সী আয়জদ্দিন বিরচিত।
৩৩৭ নং অপার চিৎপুর রোড হইতে প্রকাশিত।

৬। মালতিকুসুম মালা—মহাম্মদ মুন্সী বিরচিত।
১৫৫ নং মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীট্ হইতে প্রকাশিত।

৭। কাঞ্চন মালার কেচ্ছা—মুন্সী মহাম্মদ বিরচিত।
১৫৫ নং মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীট্ হইতে প্রকাশিত।

৮। সখীসোণা—মহম্মদ কোরবান আলি বিরচিত।
১৩৮ নং মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট্ হইতে প্রকাশিত।

৯। যামিনীভান—মহাম্মদ খাতের মরহুম বিরচিত।
১৫৫।১ নং মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীট্ হইতে প্রকাশিত।

১০। ইন্দ্রসভা—মুন্সী আমানত মরহুম কর্ত্তৃক বিবচিত।
৩৩৭ নং চিৎপুর রোড হইতে প্রকাশিত।

১১। শীত বসন্তের পুঁথি—মুন্সী গোলাম কাদের বিরচিত।
১৫৫।১ নং মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীট্ হইতে প্রকাশিত।

১২। সাপের মন্তর—মীর খোররম আলী বিরচিত,
১৫৫।১ নং মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীট্ হইতে প্রকাশিত।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, যে সকল রূপকথা বাঙ্গালার পল্লীর নিজস্ব তাহা হিন্দু রমণীর ন্যায় মুসলমান রমণীরাও রক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ কি চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বহুসংখ্যক হিন্দু ও বৌদ্ধ ইসলাম-ধর্ম্ম পরিগ্রহ করে। কিন্তু এই সকল কাহিনী ত্রয়োদশ কি চতুর্দ্দশ শতাব্দীর নহে, ইহারা বহু প্রাচীন। শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার মহাশয় ইহার অনেকগুলি সঙ্কলন করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যের প্রভূত কল্যাণসাধন করিয়াছেন। তিনি মালঞ্চমালার গল্পটি একটি একশত বৎসরের প্রাচীন স্ত্রীলোকের মুখে শুনিয়া যথাযথভাবে এমন কি স্থানে স্থানে ফোণ দ্বারা রেকর্ড করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন! তাঁহার বাহাদুরী এই যে তিনি প্রাচীন গল্পগুলিকে নিজের বিদ্যা বুদ্ধি দ্বারা অলঙ্কৃত করিতে চেষ্টা করেন নাই, তিনি স্বয়ং কবি ও সুলেখক, সুতরাং তাঁহার পক্ষে এ লোভ সম্বরণ করা সহজ হয় নাই। প্রাচীন গল্প যে কোন লেখক সঙ্কলন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তিনিই তাহাতে বিদ্যা ফলাইতে যাইয়া ঐতিহাসিক তথ্য ও গল্পের মৌলিক সৌন্দর্য্য ও মূল্য বিনষ্ট করিয়াছেন। এ কথা সত্য যে ষোড়শ শতাব্দীর কবি ফকির-রাম কবিভূষণের হস্তে প্রাচীন সখীসোণার গল্প এবং কাঙ্গাল হরিনাথের হস্তে "শীত বসন্ত"—রূপান্তরিত হইয়াও সঙ্কলয়িতাগণের কবিত্বপ্রভাবে কতকটা নূতন শ্রী ধারণ করিয়াছে। কিন্তু দক্ষিণাবাবুর স্থান ইহাদিগের অপেক্ষা অনেক উচ্চে, কারণ তিনি প্রাচীন যুগের একটা অধ্যায়কে যেন মুকুরে প্রতিফলিত করিয়া দেখাইয়াছেন, তিনি এই সকল রূপকথার মধ্যে আপনাকে এরূপ ভাবে ডুবাইয়া রাখিয়াছেন—যে তাঁহার প্রতিলিপিতে মৌলিক জিনিষটিই প্রতিফলিত হইয়াছে।

একথা অবশ্য স্বীকার্য্য নহে যে তাঁহার সঙ্কলিত এই গল্পগুলি ৯ম কি ১০ম শতাব্দীর রচনাকে অবিকৃতভাবে দেখাইতেছে; ভাষা কালক্রমে অবশ্যই রূপান্তরিত হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু বঙ্গীয় পল্লীর অবরোধ-রুদ্ধা মহিলাগণের ভাষার পরিবর্ত্তন পুরাকালে অল্পই হইত। বাহিরের প্রভাব, বাহিরের আলো বাতাস সেই নিভৃত নিকেতনে অল্পই ঢুকিতে পারিত। সুতরাং বাণিজ্যকেন্দ্রে ও নগরাদিতে ভাষার যেরূপ দ্রুত পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে,—এই সকল মহিলা-কথিত রূপকথায় ভাষার তাদৃশ রূপান্তর ঘটিতে পারে নাই। এইজন্যই ঠাকুরদাদার ঝুলির যখন প্রথম সংস্করণ বাহির হইয়াছিল, তখন সমালোচক মহলে রব উঠিয়াছিল যে "ভাষা দুর্ব্বোধ্য, এ সকল প্রাদেশিক বাক্যাবলির অর্থ কে করিবে?" ইত্যাদি। বাক্যাবলী শুধু প্রাদেশিক নহে, সুপ্রাচীনও বটে। ঠাকুরদাদার ঝুলির প্রথম সংস্করণ পাঠ করিতে যাইয়া পাঠককে বন্ধুর ভাষা-পথের পদে পদে উছট্ খাইয়া হাঁটিতে হইবে। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে সমালোচকগণের তাড়া খাইয়া দক্ষিণাবাবু পরবর্ত্তী সংস্করণগুলিতে ঠাকুরদাদার ঝুলির ভাষা কতকটা সহজ করিয়াছেন। তাহাতে জিনিষের আদত মূল্য কতকটা কমিয়া গিয়াছে, যদিচ গল্প-ভুক্ সামান্যশিক্ষিত পাঠকবর্গের পক্ষে অনেকটা সুবিধা হইয়াছে।

কিন্তু এই সকল প্রাচীন গল্প সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে আমরা বঙ্গীয় মুসলমানগণের গাথা ও মন্ত্র-তন্ত্র হইতে ভাষা ও ভাবের দুই একটি নমুনা দেখাইব। যথা সাপের মন্ত্রে—

"হস্ত সারম্ গলা সারম্ আর সারম্ মুখ।
পেট পিট চরণ সারম্ আর সারম্ বুক।
পেট পিঠ চরণ সাতি মনসার ঘরে।
লক্ষ লক্ষ বাণ অমুকের কি করিতে পারে।
কাঙরের কামিক্ষি দেবী দিয়া গেল বর।
বালির বিন্দ রাজা বলে অমুক হৈলা অমর।"

উদ্ধৃত অংশের মধ্যে প্রাচীন কতকগুলি শব্দ আছে। 'কাঙর' কামরূপ কথার অপভ্রংশ। কামাখ্যা তীর্থ হইতে প্রাচীন মন্ত্র-তন্ত্রের স্রোত এক সময়ে এদেশে বহিয়া আসিয়াছিল। "কাঙুর" শব্দের সহিত ধর্ম্মমঙ্গল পাঠকগণ সুপরিচিত। বালী উত্তরপাড়ায় কোন্ অতীত যুগে বিন্দ নামক রাজা সর্পাঘাতের চিকিৎসা ও মন্ত্র তন্ত্র দ্বারা যশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন তাহা বলিতে পারি না—কিন্তু এই উল্লেখ যে কোন প্রাচীন প্রবাদের উপর দাঁড়াইয়া—তাহা সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

দক্ষিণাবাবুর সঙ্কলিত পুস্তকগুলির মধ্যে ঠাকুরদাদার ঝুলিই বিশেষ প্রশংসনীয় ও উল্লেখযোগ্য। এই ঝুলিতে "মধুমালা" "পুষ্পমালা" "কাঞ্চনমালা" "মালঞ্চমালা" ও "শঙ্খমালা" এই পাঁচটি রূপকথা আছে। যেরূপ মণিগণের মধ্যে কৌস্তুভ শ্রেষ্ঠ,—এই গল্পপঞ্চকের মধ্যে সেইরূপ মালঞ্চমালা শ্রেষ্ঠ। প্রত্যেকটি গল্পেই বঙ্গীয় পল্লী-লক্ষ্মীর পদাঙ্ক চিহ্ন পড়িয়া আছে; বাঙ্গালী রমণীর হৃদয়ের অফুরন্ত স্নেহ-সুধা তাঁহাদের অটল চরিত্র বল এবং দুশ্চর তপস্যা, তাঁহাদের নবীন প্রেমের ত্যাগশীল সহিষ্ণুতা, লজ্জাশীলতা ও স্থৈর্য্য প্রত্যেক গল্পের মধ্যে আত্মগরিমায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। বাঙ্গালী হৃদয়ে যে কি মধুর কবিত্বের নির্ঝর বহিত, তাহাদের অফুরন্ত চেষ্টার ভিতর প্রেমের কথা কিরূপ সিন্দুর-রাগের উজ্জ্বলতা ললাটে পরিয়া শোভা পাইত—তাহা এই গল্পগুলিতে যেরূপ পাওয়া যায়, বোধ হয় এই সাহিত্যের কোথাও তাহার তুলনা নাই—ইহারা বঙ্গসাহিত্যের কিরীট। পৌরাণিক যুগের সাহিত্যের মত ইহাদের মধ্যে রূপ বর্ণনার বাহুল্য নাই,—আধুনিক সাহিত্যের মত ইহাতে প্রেমের কথা মুখে প্রকাশ করিবার চেষ্টা নাই। রমণীগণের প্রত্যেক কথায় নারীজনোচিত সংযম দৃষ্ট হয়,—তাহাদের প্রত্যেক উদ্যমের, প্রতিটি ত্যাগের ভিতর পল্লী-লক্ষ্মীর প্রেম অফুরন্ত সুধা বিতরণ করিতেছে—কিন্তু অযথা মুখরতা দ্বারা সেই প্রেম-কাহিনী বৃথা স্ফীত হইয়া পড়ে নাই। সাহিত্যিক লিপিকুশলতা এই সকল গল্পে অত্যন্ত আশ্চর্য্যরূপ দৃষ্ট হয়। রচয়িতা বিশেষণ পদ প্রায়ই ব্যবহার করেন নাই, তিনি নিজে কোনো কথা কহিয়া পাঠকের রুচি বা মানসিক ভাবকে কোনদিকে প্রবর্ত্তিত করিতে আদৌ চেষ্টা করেন না,—শুধু ঘটনার পর ঘটনা করিয়া গিয়াছেন—তাহাতেই চরিত্রগুলি এরূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে যে কোন সমাসের ঘটা, রূপবর্ণনার আতিশয্য বা লেখকের বক্তৃতায় তাহা হইতে পারিত না। মালঞ্চমালা যখন মালিনীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন সে দেশে কোন বিদ্যালয়

আছে কিনা যাহাতে বালক চন্দ্রমাণিককে তিনি পাঠাইতে পারেন, মালিনী বলিতেছে—"রাজার বাড়ী পণ্ডিত কত পড়ুয়া পড়ায়, কুঁজো আছে, মুজো আছে, গেঁজো আছে, দুই ঠ্যাং ন্যাংরা আছে, আবার রাজার রাজপুত্তুর আছে, দিন রাত হিলিমিলি কিলিমিলি কাকহাটী না বকহাটী"। এরূপ অল্প কথায় পাঠশালার চিত্র কোথায় কি দেখিয়াছেন ? এই কথাটি মনে মনে রাখিতে হইবে, গল্পের শ্রোতা শিশুমণ্ডলী, তাহাদিগের কৌতুক বজায় রাখিতে হইবে, তাহাদের সুকুমার মুখ কথায় কথায় হাসিচ্ছটায় দীপ্ত করিতে হইবে—গল্পের সূত্র সর্ব্বদা সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াছে। যখন মালঞ্চমালা তাহার আশ্রয়দাতা বাঘকে বলিল, শিশু বড় হইতেছে তাহার পড়া শুনার দরকার—এ সময়ে জঙ্গলে পড়িয়া থাকিলে চলিবে কিরূপে ? তখন বাঘ বলিতেছে—"তা লেখাপড়া শিখাও। কত পণ্ডিত আছে, সাঝ সকালে ঘোরে, হোক্কা হুয়া করে, বল একটা ধরে এনে দেই।" এই সকল কথায় ছেলেরা হাসিয়া খুন হইত। পৌরাণিক যুগের কথায় কথায় সাবিত্রী, সত্যবান, দ্রৌপদী ও সত্যভামার কথা—শপথ করিতে হইলে ইন্দ্র চন্দ্র বরুণকে সাক্ষী করিতে হয়। কিন্তু পুষ্পমালার নিকট কোটালের পুত্র শপথ করিতেছে পৃথিবীকে সাক্ষী মানিয়া, কারণ "পৃথিবী পবিত্র—এখানে ফুল জন্মে। কি সুন্দর কথা, ফুলের মত পবিত্রতা কোন্ ইন্দ্র বা চন্দ্রের কলঙ্কিত জীবনে পাওয়া যাইবে ? মালঞ্চমালাকে তাঁহার স্বামী বড় হইবার পর এক দিনও দেখেন নাই, কিন্তু যেদিন স্বামী ঘোড়ায় চড়িয়া পরীক্ষা দিতে চলিলেন—সে বড় বিষম পরীক্ষা, প্রাণদণ্ডের সম্ভাবনা আছে। সেদিন মালঞ্চ তাহাকে দেখা দিবার লোভসংবরণ করিতে পারিলেন না, "সেই সময়ে মালঞ্চ, সোয়ামীর হাতে ঘোড়ার রাশ তুলে দিতে গিয়া সোয়ামীর মুখের দিকে চাহিলেন, জুতার ধূলা ঝেড়ে দিতে গিয়া সোয়ামীর পায়ের ধূলা নিলেন।" এই রমণী যে প্রেমের কত তপস্যা করিয়া সংযম রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা না জানিলে সোয়ামীর মুখের দিকে চাওয়া ও পায়ের ধূলা নেওয়ার মূল্য পাঠক কিরূপে বুঝিবে ? জীবন দান করিয়া দৈববলে জীবন পুনঃলাভ করিয়া যাহাকে কত কষ্টে মানুষ করিয়াছিলেন, সেই স্বামী যেদিন রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া পর হইয়া গেলেন,—যাঁহার জন্য প্রতি পদে তিনি জীবন সমর্পণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন, তিনি যখন তাহার পরিচয়টিও পাইলেন না, তখন অশ্রু ভারাক্রান্ত চক্ষু এই সহিষ্ণুতার দেবীমূর্ত্তিকে আমার রাজ-দম্পতির বাসর গৃহে নীরবে প্রবেশ করিতে দেখিতে পাই। রাজ দম্পতীকে দেখিয়া মালঞ্চ প্রার্থনা করিলেন—

"সুখে থাইকো, সুখে থাইকো রে রাজ পুত্র
সুখে থাইকো রে রাজ কন্যা
যদি সতীর মুখের কথা সুপ্রভাতে ফলে রে।
বাসরের বাতি যেন সাত পুরুষে নেহালে,
রাজ-ছত্র যেন চৌদ্দ-পুরুষের মাথায় ছত্র ধরে।

জল থল বন বৃক্ষ যেন সজাগ হইয়া থেকো রে।
চখের পাতা পড়তে যেন উঠে রে আইসো।
রাজ মন্দিরের চূড়া যেন অজয় হইয়া থেকো রে
চন্দ্র সূর্য্য যেন রে সুমঙ্গলে হাসে।
আমার শ্বশুরের ঘর, আমার সোয়ামীর পীড়ি
অক্ষয় করে রেখো তুমি পরমেশ্বর।
রাজ কন্যার আয়ত যেন হাতে গায়ে ক্ষয়ে রে
তুমি আমায় দেও এই বর।
চৌদ্দ ভরা পূর্ণ কর আমার শ্বশুরের সংসার
ওরে আমি জল মাটী হইয়া থাকিমোরে
আমি ভুঞ্জিমো কত সুখ।
ওরে আমি পশু-পক্ষী হইয়া থাকিমোরে
আমি ভুঞ্জিমোরে কতই সুখ।"

অথচ যে শ্বশুরের রাজ-মন্দিরের ও সংসারের বিজয় প্রার্থনা করিয়া তিনি এই গীতি গাহিতেছেন, সেই শ্বশুর অশ্রুতপূর্ব্ব অত্যাচার করিয়া তাঁহাকে সেই রাজমন্দির হইতে তাড়াইয়া দিয়াছেন এবং যে সতিনীর আয়ত ভিক্ষা করিয়া তিনি ভগবানের নিকট কাঁদিতেছেন, তিনি তাঁহার জন্য একটুকু স্থান রাজ-গৃহে রাখেন নাই।

বহু কষ্ট ও নির্য্যাতনের পর রাজ-শ্বশুর মালঞ্চের মহিমা বুঝিতে পারিলেন, তখন রাজ-প্রাসাদে নহবৎ বাজিয়া উঠিল। মালঞ্চের অভ্যর্থনার জন্য পুষ্প-তোরণ নির্ম্মিত হইল। চন্দ্রমাণিক তাঁহাকে আদরে গ্রহণ করিলেন, কিন্তু মালঞ্চ নিজ হস্তে মালা গাঁথিয়া রাজকন্যাকে পরাইলেন এবং স্বয়ং তাঁহাকে পাটরাণীর পদে অভিষিক্ত করিলেন। কারণ তিনি ভোগ করিতে সংসারে আসেন নাই, ত্যাগ করিতে আসিয়াছিলেন—তাই প্রজারা তাহাকে পাটরাণী হইতে উচ্চতর আসন দিয়াছিল। "মালঞ্চ কাকীকে (রাজ-কন্যাকে) করিলেন পাটরাণী; রাজ্যে মালঞ্চ হইলেন ঠাকুরাণী।"

বৌদ্ধ হিন্দু-ধর্ম্মে নারীর যতরূপ আদর্শ গুণ বর্ণিত হইয়াছে, মালঞ্চ সেই গুণরাশির সমন্বয়। এই উচ্চ কল্পনা নানারূপ অপ্রাকৃত ঘটনার মধ্যে প্রকৃত নারী মূর্ত্তিকে দেখাইতেছে। দাম্পত্য-ভাবের সঙ্গে মাতৃ-ভাবের যে বিভিন্নতার রেখা, তাহা এই গল্পে যেরূপ সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়াছে—বোধ হয় জগতের সাহিত্যে তাহার তুলনা নাই। অসীম কথা-সমুদ্রের মধ্যে মালঞ্চ যেন পদ্মাসনা লক্ষ্মী। এই পাঁচটি গল্পের মত গল্প কোথাও আছে বলিয়া জানি না;—ইহারা শিশুর আমোদের উৎস, যুবকের প্রেম-পিপাসার অমৃত এবং বৃদ্ধের শাস্ত্র, ইহা মূর্খ ও পণ্ডিত উভয়েরই তুল্যরূপ উপভোগ্য। অতি সহজে

আমরা নদীর জল পান করিতেছি কিন্তু তাহা গিরিশিখর হইতে আসিয়াছে। অতি সহজে যে আলোর প্রভাবে আমরা পথ দেখিয়া যাইতেছি তাহা সর্ব্ব প্রধান জ্যোতিষ্কের,—সহজপ্রাপ্ত জিনিষ যে কত বড়, তাহা আমরা অনেক সময় ভুলিয়া যাই। যাঁহারা বেদ-বেদান্ত হইতে ধর্ম্মকে গ্রহণ করিয়া তাহা সাধারণের আয়ত্তাধীন ও সুখবোধ্য করিয়াছিলেন—এই সকল গল্প তাঁহাদের দান—এইগুলি অবজ্ঞার জিনিষ নহে—বাজারের অল্পমূল্যের মাদুর নহে—পারস্যের গালিচার ন্যায় মহার্ঘ এবং সূক্ষ্ম কলা-শিল্পের পরিচায়ক।

শঙ্খমালার গল্প হইতে যে কতদিকে কতরূপ কবিত্ব ফুটিয়া আছে তাহা দেখাইবার স্থান আমাদের নাই। ননদীর হস্তে বহু বিড়ম্বনা সহ্য করিয়া শঙ্খমালা বলিতেছেন—

"ঠাকুর ঝি কি জন্য এমন কর রে ঠাকুর ঝি
ও সাধুর বহিন আমি কি দোষ করিলাম
আজ তোমার কাছে।
একই খেলা খেলে ছিলাম ঠাকুর ঝি গো
তোমার মালা আমি পরাইয়া ছিলাম যে ঠাকুর ঝি
দাড়িম্বের গাছে রে।
আমি তুমি জল আনিতে গিয়াছিলাম
যে ঠাকুর ঝি সাধু-সরোবরের জলে
একই দুধের বাটীতে ঠাকুর ঝি তুমি আমি
খাইলাম যে তোমার দাদার পরসাদরে।
একই আঁচল গায়ে দিয়া ঠাকুর ঝি আমরা
কইলাম মনের কথা মনের সাধ রে।
একই বিছানে শুয়ে যে ঠাকুর ঝি
তোমার আমার নিশির রাতি গেছে রে ঠাকুর ঝি
আজ আমারে এ তুমি কেমন দেখা দিলা রে
সাধুর বহিন এ কেমন বেশে।"

এই কাতরোক্তি দুঃখ-সহিষ্ণু বঙ্গীয় গৃহ-লক্ষ্মীর চিরন্তন ক্ষমার পরিচায়ক। বহু বৎসরের পর স্বামী রাজ-প্রাসাদে আসিয়াছেন। শঙ্খমালা যে সেখানে আছেন সাধু তাহা জানেন না, কিন্তু শঙ্খ বহু যত্নে সাধুর জন্য পরিপাটী করিয়া অন্ন-ব্যঞ্জন রাঁধিয়াছেন। সাধুর পরিবেশন তিনিই করিতেছেন কিন্তু অবগুণ্ঠনবতীকে সাধু দেখেন নাই। তথাপি অন্ন-ব্যঞ্জন আস্বাদ করিয়া সাধুর চক্ষু জলে ভরিয়া আসিতেছে—"যে রন্ধন খেয়েছি আমি বার বৎসর আগে। আজ কেন জিভে আমার সেই রন্ধন লাগে।"

সহসা পরিবেশনকারিণীর দুইটি হস্তের উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল, তিনি আর নিজেকে সামলাইতে পারিলেন না, বলিয়া উঠিলেন :—"কে দাও ব্যঞ্জন, কে দাও ভাত। সাধুর ভিটায় যেন দেখিয়াছিলাম সেই দুখানি হাত।" এই কথায় দাসী বাঁদীরা হাসিয়া উঠিল, সাধু লজ্জায় মুখ অবনত করিলেন। কিন্তু বাতাস কৌতুক করিয়া শঙ্খমালার সীঁথার অবগুণ্ঠন এই সময়ে একটু সরাইয়া দিল। সাধু তাঁহার কপালখানি দেখিয়া আবার আত্মহারা হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"সেই কপাল সেই টিপ। সাধুর ভিটায় সোণার দীপ।" শঙ্খের ধৈর্য্যের বাঁধ ছুটিয়া গেল; তিনি আর রহিতে পারিলেন না, সাধুর পায়ের কাছের মাটী তাঁহার কপালের সিন্দুরের রং দিয়া রাঙ্গাইয়া দিলেন। এই প্রণাম বহু কষ্টের পর মিলনের শুভ চিহ্ন-স্বরূপ হইল।

এই সকল গল্পে অনেক গীত আছে; তাহার দুই একটির নমুনা আমরা দিয়াছি। কিন্তু পাঠক যাহা গদ্যের মত পড়িয়া যাইবেন তাহার অনেকাংশও কতকগুলি মেয়েলী ছড়ার সমষ্টি। পাঠক পড়িবার সময় সেগুলি যে কবিতার অংশ তাহা একেবারেই মনে করিবেন না; কিন্তু তলাইয়া দেখিলেই এই সকল ছড়া ধরা পড়িবে। সম্ভবতঃ এ সকল গল্প মেয়েরাই রচনা করিয়াছিলেন, এত ছড়া কাটিয়া কথা কওয়া পুরুষের অসাধ্য। গীতগুলি বাদে এক শঙ্খমালার গল্পেই আমরা ২০৩টি ছড়া বা কবিতার চরণ পাইয়াছি। ডাঃ ওয়াসবারণ হফকিনস্ দেখাইয়াছেন—ব্যাসের সঙ্কলিত মহাভারতে বেদ ও উপনিষদের শত শত চরণার্দ্ধ বিদ্যমান। পূর্ব্ববর্ত্তী মেয়েলী ছড়াগুলি পরবর্ত্তী যুগের মেয়েরা মুখে মুখে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন; সুতরাং এই সকল গল্পে যে কত যুগের বহুদর্শিতা ও স্ত্রীসুলভ প্রবাদ স্থান পাইয়াছে, তাহা কে নির্ণয় করিবে! আমরা এক শঙ্খমালার গল্প হইতে এই এই সকল চরণার্দ্ধ তুলিয়া দিতেছি। পাঠক দেখিবেন এই গল্পগুলি কিরূপ আশ্চর্য্য চাতুর্য্যের সঙ্গে প্রাচীন ছড়া ও প্রবাদ-বচন রক্ষা করিয়া আসিয়াছে।

অপরাপর বঙ্গীয় গল্পের অনেকগুলি বহু প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে। গ্রীস সঙ্কলি[illegible] য়ুরোপ প্রচলিত প্রাচীন গল্পগুলির সঙ্গে ইহাদের অনেকগুলির আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য আছে। যত দূ[illegible] প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে আমাদের দেশ হইতেই সেই গল্পগুলি বিদেশে গিয়াছে এরূপ অনুমান হয় এ সম্বন্ধে আমরা Folk Literature of Bengal নামক পুস্তকে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছি

শঙ্খমালার গল্পের গদ্যভাগে ছড়ার মিশ্রণ।

১। মূল ধন উবে, দিনে দিনে ডুবে। ২। শঙ্খমা মানিক, দিনে দিনে থানিক। ৩। আগে ছিল শঙ্খ মাণি[illegible] সমুদ্রের ধার। গালি মন্দ খাইয়া সে জলের সেপার। ৪। ধন রত্ন কড়ি, না বিয়ালেই বুড়ি। ৫। ধন র[illegible] কড়ি, পাখা পেলেই উড়ি। ৬। পদ্ম ভাঙ্গে ক্ষীর খায়, নাক ডাকাইয়া ঘুম যায়। ৭। দিন হেলে, রাত ত টলে

৮। রাজপুত্র হাসিয়া উড়ান, গোঠে গোঠে ধনুকের বাণ ফুরাণ। ৯। চোখের মণি, দুঃখের খনি। ১০। মা চোখ ভরিয়া দেখিলেন, চোখ ভরিয়া গিলিলেন। ১১। ওরে পুত্র আজ কয়ে বুঝাই তোরে, তুই না বাণিজ্যে গেলে ও যে তোর বংশের লক্ষ্মী ছাড়ে। ১২। ঢেকি বেনে তুষ খান, তুষ কেটে ভূষি খান। ১৩। এক রাজার বেটা মোহন-লাল। তার সঙ্গে চলে ভেড়ার পাল। সেই রাজার বেটা পক্ষী মারে। এক এক তীরে ষোলশ গণ্ডা পক্ষী ঝুরে পড়ে। ১৪। রাজার বেটা মোহন কুমার, ভেড়া চড়াও সায়েরের পাড়। রাজার বেটা তুমি পক্ষী মার। সদাগরের বেটা শঙ্খমণি—তার কথা কি বলতে পার॥ ১৫। তুমি জেলের বেটা নওরে সাধু জাল বেয়ে না খাবি রে। সওদাগরের পুত্র তুমি রে সাধু, তুমি বণিজ করিতে যাবি রে।" ১৬। মাঝি মাঝি কর্ণধার। তুমি নুন খেয়েছ কার? ১৭। সে সওদাগরও নাই, দিন আনি দিন খাই, ঘর গৃহস্থালী হাল বাই। ১৮। নাতিপুতি কে বা আছে, কে বা দেয় বাতি। কার ভরা কার ঘাটে বা উঠে কে দেয় বেসাতি॥ ১৯। এই কপালে ঘাট অঘাট, অঘাট যে সেই হ'ল ঘাট। ২০। আছে কি নাই, ঢেকি কি ছাই বলতে পারে শেওয়া কাঁদায়। থা' কি অথা, বলতে পারে পদ্মের পাতা। ২১। ভোগ দিবে রাগ দিবে। যদি নৌকা জাগে ত জাগ দিবে। ২২। এক পা হাঁটেন, এক পা না হাঁটেন। ২৩। বেছে বেছে সার দিলেন। তিল সিন্দুরের আঁক দিলেন॥ ২৪। এক কড়ি কয়িষারে উনো, পুত্র পঙ্ক কড়ি কর্‌বি দুনো। খয় খয়াতি, ছয় ছয়াতি, কাহন নিস বান গুণে। ২৫। ঘাটের ভরা ঘাটে বুঝাবি বান তুফান দিয়া পাড়ি। ওরে মুখের আগুন ছেড়ে রে বানের মাথার মণি কাড়ি। ২৬। সওদাগর আইল মা তোর ঘাটে। আতাল পাতাল হইয়া বৈস তোর জোড় আসনের পাটে॥ জোড় পূজা তোর কালীর সাগর, আমার চৌদ্দ ডিঙ্গা মধুকর, সারি দেনা দহের কূলে সওদাগরের হাঠে। ২৭। গহিন জলে নিশ্বাস কাটে। কালী সাগর ফেটে উঠে॥ ২৮। রাগ রঙ্গে তেল দিল আর দিল সিন্দুর কাঙ্কন। কালী কালী বলিয়ে কর্ণধার ডিঙ্গা কয়িল বন্দন। ২৯। ঝালর মোতি, প্রদীপ বাতী। হাল বৈঠা সাজ সঞ্জাত। ৩০। না নড়ে বাতাস না নড়ে দিক, উজান ভাটির বাতাস ঠিক। সেই বাতাস পবন। তখন নায়ের গমন। ৩১। ওরে পাল কামলা আসে পাটহ মজুর। গায় গব্য নিয়ারে চৌদ্দ ডিঙ্গা করে পুর॥ ৩২। নূতন পালের দড়ি, হালের মাথায় কড়ি। ৩৩। দহের জলে ঢেউ খেলে না খেলে। কমল পাতের জল হেলে কি না হেলে॥ ৩৪। চোখের জলের মালা গাথিয়ারে শক্তি পরে আপন গলায়। বছর পরে সেই স্বামী দর্শন দিয়া পলায়। ৩৫। লক্ষ ফোঁটা চক্ষের জলে পতি একেক শঙ্খরে পিয়াইলাম। শত আট শঙ্খ যে স্বামী আমি এই মালা বসি গাঁথিলাম। আমি বুকে করিয়া রাখিলাম পতি তোমার নামের নিদর্শন। এহি শঙ্খের মালা পতি আজি নাও দাসীর দর্শন। ৩৬। মা আলপনা থুইয়া কাঁদেন, বোন আলপনা দেয় হাসে। মা চৌদ্দ ডিঙ্গা বরণ করেন হাত কাঁপে, বোন চৌদ্দ ডিঙ্গা বরণ করেন হাত নাচে। ৩৭। উড়ে পুড়ে ধুলা যে ধুলাতে পড়ে। কুলের বউ কুলনারী, আপনা যদি রাখে তো কে মারে॥ ৩৮। এতো গোলার জিনিষ নয় যে গোলায় ছেঁদে রাখিব। বাণিয়ার নয় যে সিন্দুর কৌটায় ভরিয়া রাখিব। মজুষের ছেলে আমি কেমন রাখিব। ৩৯। ফুট্‌লো কি ছুট্‌লো? নায় পবনে লুট্‌লো। ৪০। পালে পালে দিল টান, পবনের বেটা হনুমান। ৪১। জানি কি জানি, মানি কি মানি। ভাতে দানা দুধে ছানা। ৪৩। ঘুমের আদ্ধি, ঘুমের সান্ধি। ৪৪। দশের কথা, বেদের পাতা। ৪৫। এক বছর রাখিলাম রে ভাত কাপড় দিয়া। ভাত কাপড়ের দুঃখ হইল রে রাখিলাম সঙ্গ দিয়া। ৪৬। প্যাঁক প্যাঁক ডাক ছাড়ে, রাজহংস পাখা নাড়ে। ছয় মাসের পথ দণ্ডে গেল যেন পুষ্পকের রথ। ৪৭। শুন শুন শক্তি সুন্দর আমি এলাম রাতে প্রহরে। কবাট খুলে দেও গো শক্তি

আসি আমি আপন ঘরে। ৪৮। সত্যের সন্ধি, ঘর বন্দী। ৪৯। না ছুইও কবাট রে আমার যাবৎ আছে রাতি। পতির আজ্ঞা জাগিরে রাতি আমি জ্বেলে মোমের বাতি। ৫০। মাথার কেশে সাপ গর্জ্জে দুইও চোখে খারু খড়্গা যে ঘুরাইয়া শক্তি উঠে দিল হাঁক। ৫১। পতির অঙ্গ শক্ত, পতির গায়ে রক্ত। ৫২। খড়্গা হাতে মোমের বাতি জ্বলে সারা রাতি। বাতি যদি না থাকিত বধ করিতাম পতি। ৫৩। পতি যে আইলে পতি কহে যেও মায়েরে। পতি যে আইলে পতি কহে যেও বোনেরে। ৫৪। উঠ উঠ মাল্লা মাঝি কত নিদ্রা যাও। বাণিজ্যের ভরা আমার উঠে ছাড় নাও। ৫৫। ঝিকিমিকি দেখে সাধুর বোন পক্ষীরা ছাড়ে রা। আঙ্গিনায় ছড়া দেয় না কেন বৌ কুজি আস্তে তুলে গা॥ ৫৬। ইতল বিতল। চেতন চিতল। ৫৭। দুই কাকলে হাতে কাঁকন, ননদের গলার কাঁসর বাঁজন। ৫৮। ঘর ব্যস্ত, পাড়া ব্যস্ত। ৫৯। বুকের পাটা না মুড়ো ঝাঁটা। ৬০। আহা ছি ছি কোথায় যাই, কার মাথা চিবিয়া খাই। ৬১। শঙ্খ যে বহিয়া গেল বাতাসের কথা বাতাসেই মিশিল। ৬২। সাধু মুন খায় পান্তা খায়। বাসি ব্যঞ্জনের সোয়াদ স্থায়॥ ৬৩। ননদী না যমুনা, যমকেও অত ডরাই না। ৬৪। অভাগীর বিটি অভাগীর মা। তোর বউয়ের কীর্ত্তি দেখে যা॥ ৬৫। কোন জলে ডুবি, কোন্ কোনে থুবি। কিসের আগুন খর কুটায় ঢাকবি॥ ৬৬। এক চায় আর পায়। ৬৭। তিন ঝাকর ঝাকনা, তিন থাকর থাকনা। ৬৮। যা যা ঘর ছেড়ে বনের ডালে, বার খেতে তের আইলে। ৬৯। তোমার মালা যে আমি পরাইয়া ছিলাম ঠাকুর ঝি দাড়িম্বের গাছে। আমি তুমি জল আনতে গিয়াছিলাম সাধু সরোবরের জলেরে। একই দুধের বাটীতে ঠাকুর ঝি তুমি আমি খাইলাম দাদার প্রসাদ। একই আঁচল গায়ে দিয়া ঠাকুর ঝি আমরা কইলাম মনের কথা মনের সাধ। ঠাকুর ঝি একই বিছানায় শুয়ে যে তোমার আমার নিশির রাত গেছে। আজ আমারে তুমি এ কেমন দেখা দিলে, সাধুর বহিন, এ কেমন বেশে। ৭০। বুক খান, না পাষান খান। ৭১। আমি বুঝিলাম এত দিনে। আকাশ বাতাস বৈরি হ'ল আমায় কপাল গুণে। ৭২। ছয় মাসের পথ উজান আসি যে আমার ভাঙ্গিল বাসর। হায় বুঝি মা কহিল্লা মা বোনেরে গো রাতের পোহাইতে পহর। ৭৩। তোমার কুলের পদ্ম ফুল আমি কুল নারী, যা বল তাই করি। ৭৪। আবার দহ, না সহ। ৭৫। পোড়া মুখ পোড়, বনে গিয়া পড়। ৭৬। খ্যাংরার দাগে মাস কেটে উঠে, ও অভাগী ঘরের ঘুঁটে। ৭৭। বাঁশ বনে আঁচর গেল, কাঁটা বনে বিচর গেল। ৭৮। তিন পা যাইতে হোঁচট খান, মটক ফেলতে বেলা বাড়ান। ৭৯। পালানের গাছ হেলে পড়িল, তাল সুপারি ভেঙ্গে পড়িল॥ ৮০। কোন বা জন্মে আমি মায়ের দুধ দাঁতে করে কাটিলাম, কোন বা জন্মে কার ঝিয়ারীর গায়ে আমি ক্ষার খৈল দিলাম। ৮১। পুত গেল বাণিজ্যে, বৌ গেল আন রাজ্যে। ৮২। তালু কণ্ঠা শুকায় ছাতু ভিজাইতে জলে শুকায়। ৮৩। মা খিদের সময় খাইতে পারেন না, নাইবার সময় নাইতে পারেন না। ৮৪। মেয়ে পাত কাটেন হাট করেন, কুজ নাড়িয়া নাড়িয়া ভাত বাড়েন। ৮৫। মা যে উপবাসী; তার কথা ভাবুক গিয়ে পাড়া পড়শী। ৮৬। সাত গোষ্টি ঝার দিয়াছেন, কুজি আমার কিসে নাচেন। ৮৭। নীলমাণিক যে জন্ম নিবে তোমার সাধুর ঘরে, না মর মর সাধুর বউ নীলমাণিক তোমার উদরে। ৮৮। বাড়ন্তটুকু ঝরে, পড়ন্তটুকু পড়ে। ৮৯। মায় আনে মাংস আনে, জল ভেঙ্গে নল আনে। ৯০। এক নল ভাঙ্গে শক্তি এক নল খায়। আর এক নল হাতে নিয়ে শক্তি রাত্রি যে কাটায়। ৯১। পেঁচার কোটরে, পেঁচা রব করে। ৯২। কত দিনের অনাহার, দীন দুবলা গায়ের ভার। ৯৩। পথও পান না, রথও পান না। ৯৪। হাতে আমার নল সতীর কোলে অনল। ৯৫। বাঘ মহিষের রাজ্যে থাকি, মনের আগুন মনে রাখি। রাতের বাতাস ছাড়ে, মশাল হাতে নিয়া কাটুরিয়া মৌচাকে খোঁচা মারে।

বনে কাট কাটে, তার মৌ লোটে। ৯৮। কত জন্ম তপস্যা হোল ! কোন ছলে বা দেখা গেল। ৯৯। তোমার বনে কাট কাটি। সংসারের কামাই খাটি॥ ১০০। পাখীর গানে সুর উঠল, গাছের পাতার ভোর উঠল। ১০১। সাত মশাল জ্বালিয়া মাগো তোমার মশা মক্ষী খেদাইমো। যত মধু খাইতে পার গো মা আমি ঝরা ভরিয়া দিমো। ১০২। পাতা পাতা শালের পাতা। বাঁশের বজ্জর তালের পাতা। ১০৩। সাত পরতে ছাউনি দিলাম। আলোকলতার বাঁধন দিলাম। ১০৪। কুঁড়ে বান্ধম কুঁড়ে বান্ধম আমি মা জননীর বরে। সোণার যাদু যেন এই কুঁড়েতে হাসিয়া খেলা করে। ১০৫। চৌকাঠের উপর গঙ্গাজল, ধূমোর ধূমায় দিক পাগল। ১০৬। দুয়ারে দুয়ারে দাঁড়ায়। সকল বেনেতে ভাঁড়ায়। ১০৭। কোন বেনে বা দারুচিনি দিতে দরমুচ বাহির করে, কোন কোন বেনে কাহনের বস্তু বেঁচে শিক্কার দরে। কোনহ বেনে খাণ্ডারা পাথর ঝাঁপিতে ভরিয়া থোয়। মহা মাণিক্য সাহা মাণিক্য কোরে লোকরে বিকোয়। ১০৮। বেলা পড়ে বেলা উজায়। গাছের পাতা মর্ম্মরিয়া শুকায়। ১০৯। ময়ুর ময়ূরী পাখা ছাড়িল। শালিক শারী ধূলি সিনান করিল॥ ১১০। পূবে পশ্চিমে যায়, কাখের কলসী নামায়। ১১১। পদ্মের নালে পদ্ম নাই, পাতার ডাঁটে পাতা নাই। মরাল আসে নাই, দল শেওয়ালা ঠাঁই ঠাঁই। ১১৩। পাড় পদ্মাগ্নী কুড়ে, চার কোণ ঘুরে। ১১৪। ছালা বলে, পরণ ছালা খোলে গায়, অঙ্গের আভায় বন জন্তু মূর্চ্ছা যায়। ১১৫। যেন মুক্তার ঝিনুক থান, সোণার কদলীর মোচা থান। ১১৬। নড়ে না হরিণী চরে না, ঝ'রে ঝ'রে পদ্মের দল পড়ে না। ১১৭। ভয় নাই ভয় নাই বনে তোমার দেখতে পাই। ১১৮। তুমি কার ঝিয়ারী কার বৌ, কার চাকের ভরা মৌ ১১৯। হাতী দেখে নড়ে নাই, বাঘ দেখে সরে নাই। ১২০। সেঁচ করে না সঞ্চয় কার না, আপন ঘর কন্নায় মন উঠে না। ১২১। কাঠুরে বনে আসে বনে বেড়ায়, নিত্য নয়া কুটির বানায়। ১২২। সাপের হাঁচি বেদেয় বুঝি। ১২৩। যদি পা'স সতীনের না, কলে বলে পার হয়ে লাথি মেরে যা। ১২৪। বন কুড়নীর বাঁধ, একর ঘরের বাঁদ। ১২৫। ও কাঠুরাণী মাথার নিক, যা ভাবলি তাই ঠিক। ১২৬। চাঁদের নিছন হাতে পাবি। সতীন যে সত্তুরের সত্তুর তার মাথা চিবিয়ে খাবি॥ ১২৭। তিন আঁটি সরু কাঠি। চাল দিব আঠার মুঠি। ১২৮। হাড়ী যেন তবে। সরল মেন পুবে। ১২৯ কুল ছিল কাল কেশর কুল হল নুড়ি, চিতার কাঠায় মাজিয়া দিয়া আড়াইকে দেড় বুড়ি। ১৩০। দাঁত নড়ে থর থর, তা বেয়ে পড়ে তাম্বুলের রস। ১৩১। কাঠুরাণীর হাতের ফাঁকি, দাঁই বুড়ির মাথার ঝাকি। ১৩২। সন্ধ্যার বাতি দেখ্‌বো। রাতখানি থাক্‌বো। ১৩৩। নীল মাণিক জন্ম নিল পূর্ণ চাঁদের কোলে, পশু পক্ষী ছুটে আসে বনের কাঠ বিড়ালে। ১৩৪। চাঁদের কোলে চাঁদ শুয়ে পড়েছে সারা বন ভেঙ্গে পড়েছে। ১৩৫। এ যে সাত স্বর্গের নিছনি কপালে জ্বলে টীকা। কোন বা রাজার আলোক নড়ি কপাল জোরা লিখা॥ ১৩৬। এক পাতা শিথানে থুইলরে এক পাতা ছোয়াইল পায়ে। আর এক পাতা নিয়েরে স্বপন ঢাকিল নীল মাণিকের গায়ে। ১৩৭। এত এত মোহরের থান আঙ্গিনায় হৈল তল। ভাল ডাকিনী দাইএর দেখ কলিজা ভরা খল। সেই সময় বন দিয়ারে সাতাইশ চোর যায়, মঙ্গল বাতি জ্বালাইয়া শক্তি বার বৎসর ঘুমায়। ১৩৯। কোঁচড় কোঁচড় মোহর কুড়ায়, আর কুঁড়ের ঝাপে কাণ ঠেকায়। ১৪০। পা টিপি পা টিপি কান নাড়ে। কার বাছারে নদীর ধারে॥ ১৪১। মায়ে যে ইহার পাগল হবে, ধরণী কি ভুর সহিবে। ১৪২। কত স্বপন হাসে, কত স্বপন ভাষে। ১৪৩। শক্তির নিশ্বাসে কাঁপে বন, বাহির হইল বাঘিনী অরণের অঙ্গন। ১৪৪। এক যে আগুনের শিখ, সপ্তদিক। ১৪৫। আমি কোন বা জন্মে কচিলা বাছুরের মুখের দুধ কাড়িলাম রে। আমি কোন বা পক্ষীর ডিম সাপ হইয়া খাইলাম রে। (কচিলা=কচি)। ১৪৬। দেও দেবতা স্তম্ভিত, দিক পৃথিবী কম্পিত। ১৪৭। শূন্য আকাশ জল

বাতাস। ১৪৮। আমার মাথার মাণিক ভাসাইয়া দিলি, আমার বুকের মাণিক খড়াইয়া নিলি॥ পুত হোলগো পুত হোল রাজার রাজ্য আলো হোল। ১৫০। যা নাই রাজ ভাণ্ডারে—তাই দেখি ধুলার ঘরে। ১৫১। আগে ছিল যে সমুদ্র ক্ষীরে সরে এখন হল সমুদ্র নুন পাথরে। ১৫২। গঙ্গার জল সিনান করবে শক্তি দুঃখের গেল দিন। উঠিয়া তুমি ঠেসরে শক্তি সমুদ্রের পুলিন॥ ১৫৩। চন্দন দেখিতে সাধু দেখে দরশনে, শ' অক্ষর লেখা আছে সেহিরে চন্দনে। "শ" অক্ষর পড়িয়া সাধু শক্তি নৈল মনে, ওরে সোণার হাতের আঁখর দেখিয়া সাধু হৈল অচেতনে॥ ১৫৪। বন দেবতার ছলা, মায়ের মন খানি উতলা। ১৫০। বৈল ছেড়েছে আমের গাছে মায়ের আমার তারি তলে বাসা। শালের পাতা কুঁড়ে বাঁধিলাম আমি কাঠের বদলে আশা॥ ১৫৬। চৌদ্দ পালের ঘুন্টি তুলি নদ উজার নদী উজার। যদি হয় পথের চুল ভাটি তৈলে সমুদ্রে যায়॥ ১৫৭। হার চন্দনের শোভা আরো রত্ন পাটের শাড়ী। বৃক্ষের তলে আলো করে কার বা নব নারী। গায়ে কাটা (মস্তকে ভাটা। ১৫৯। এক দিন দেখিলাম বন কুড়ুনী পরণে দেখিলাম ছালা, আজ এসেছেন শাড়ীর ঘেরণ গলায় দুলিয়া মালা। ১৬০। বাঁদি দাসী রাণীর রাণী, আমি হৈলাম চৌধুরাণী। ১৬১। দাসী বাদীর ঝাঁক, মৌমাছির চাক্। ১৬২। দাই বুড়ী খুন খুনে। পড়ে থাকে ঘরের কোণে। ১৬৩। কটা মাথা কার ঘাড়ে, রাজার ঘাটে ডঙ্কা মারে। বেটা বড় মর্দানা, কয়টা ঘাড়ে গর্দানা। ১৬৫। যত বেসাতি আটক দাও, সাধুকে ফাটক দাও। ১৬৬। দিক দিশা হাঁপিয়া উঠে, গায়ের ঘামে ঝরণা ছুটে। ১৬৭। রাজার যদি নাই সুখ, সকলেরই তাতে দুঃখ। ১৬৮। গা জুড়ে ঘুম এল, চোখ ভরে জল এলো। ঢোক্ গেলে, দিক্ তোলে। ১৭০। আল ডিঙ্গাইয়া কে খায় খাস, মায়ের কথায় প্রত্যয় চাস্। ১৭১। জন্ম হল গহন বনে, আজ বসেছিল সিংহাসনে। ১৭২। কাকের বাসায় কুলির ছা, জাত স্বভাবে করে বা। ১৭৩। একি কথা একি ভুল, কার মাথায় কটা চুল। ১৭৪। পথে পায় জননী, সে জননীত ডাইনি। ১৭৫। কাঁপিস না ঝাপিস না, দুধ যেন ঠিকরে না। ১৭৬। সিঙ্গি মাছের ঝোল চড়ায়। কালো জিরা আর মশলা বেটে খায়। ১৭৭। হাড়ি ভাঙ্গে মরা ভাঙ্গে, সারা রাত্রি বসে জাগে। ১৭৮। নীল আছেন সিংহাসনে, কি হয় কে জানে। ১৭৯। না চুল পাঁচড়, না পড়নে ভাল কাপড়। ১৮০। দেব আছে ধর্ম্ম আছে। সত্য সূর্য্য সাক্ষী আছে। ১৮১। পাতাটি পড়ে না, কুটাটুকু নড়ে না। ১৮২। পূর্ণ চাঁদের কিনিক জোছনা চাঁদ পাখীকে পাইল। ১৮২। সভা হৈ হৈ, ডঙ্কা রৈ রৈ। ১৮৪। ছিলাম আমি রাণী এখন হইলাম পথ বেড়ানী। ১৮৫। আকাশের কথা দেবের বারতা। ১৮৬। সূর্য্য কিরণ হাসে, নদীর হাওয়া আসে। ১৮৭। জল জোলসের ঘিরে সোণার পাগড়ি শিরে। ১৮৮। সাজ পরণ ছেঁচড়ে, আপন গা হেঁচড়ে। ১৮৯। নদীর ঘাটে চৌদ্দ তরী চৌদ্দ নিশানে উড়ে। শঙ্খ সাধুর নাম লেখা সোণার আখরে। ১৯০। চন্দ্রসূর্য্য যদি সাক্ষী, সাক্ষী যদি বনের পাখী। ১৯১। যে রন্ধন পেয়েছি আমি বার সৎসর আগে। আজ কেন জিভে আমার সেই রন্ধন লাগে। ১৯২। বার বাটী তের ব্যঞ্জন সেই রন্ধন খাই। বার বার বৎসরেও তো সে রন্ধন ভুলি নাই। ১৯৩। সাধু জল খেতে ভাত খায়। পলকে ভাত ব্যঞ্জন সাপুর সুপুর ফুরায়। ১৯৪। যে দাও ব্যঞ্জন যে দাও ভাত, সাধুর ভিটায় যেন দেখেছিলাম সেই দুই খানি হাত। ১৯৫। সেই কপালে সেই টিপ, সাধুর ভিটায় সোণার দীপ। ১৯৬। এর বাড়ী খান, কচিৎ দু এক কড়ি পান। ১৯৭। কুজের উপরে তেল মাখে, আয়নায় আরশীতে মুখ দেখে। ১৯৮। বনে বনে বেড়ানী, ছিলাম কাঠুরাণী, হলাম রাজরাণী,। ১৯৯। দাই কাঠুরাণী মরে গেল। শিয়াল কুকুরে টেনে নিল। ২০০। গান বাজনা, সাজ সাজনা। ২০১। আপন মুখে অন্ন ছোয়ান নাই, তবু বংশ চেয়ে ধন খোয়ান নাই। ২০২। তুল না হয় মুল না হয়। ২০৩। বক্ ঠেঙ্গী পায়ে, কুজ সুন্দরী গায়ে। ২০৪। কেশ চলে শক্তির বেশ ঢলে, দিন প্রভাতে শক্তির ঘরে মোমবাতি জ্বলে।

(৩) ডাক ও খনার বচন

এই সকল বচন রচনার সময় বৌদ্ধ-প্রভাব বঙ্গদেশ হইতে উৎপাটিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। ইহাতে পুষ্করিণীখনন, বর্ত্মনির্ম্মাণ, বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি সাধারণের উপকারজনক ধর্ম্ম যে অবশ্য-পালনীয়, তাহা অনেকবার নির্দ্ধারিত হইয়াছে ; (৬) কিন্তু একটিবারও হরি কি অন্য দেবতার নাম লইবার সূত্র গৃহস্থকে পালন করিতে আহ্বান করা হয় নাই। ভাষাব জটিলতায় এই সব বচন মাণিকচাঁদের গান হইতেও অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়। খনার বচনের প্রচলন অত্যন্ত অধিক, এই জন্য কালক্রমে তাহাদের ভাষা ক্রমশঃ সহজ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ডাকের বচন ততদুর প্রচারিত হয় নাই, এই জন্য সেগুলি ভাষার প্রাচীনতা অনেকাংশে রক্ষা করিয়াছে। নিম্নলিখিত বচনগুলির ভাষা খুব প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। (৭)

(৬) "ধর্ম্ম করিতে যবে জানি।
পোখরি দিয়া রাখিব পানী॥
গাছ রুইলে বড় কর্ম্ম।
মণ্ডপ দিলে বড় ধর্ম্ম॥"
যে দেয় ভাত শালা পানী শালা।
সে না যায় যমের বাড়ী॥
স্বর্ণ ভূমি কন্যা দান।
বলে ডাক স্বর্গে স্থান॥

বৌদ্ধ-ধর্ম্মের সম্পূর্ণ অবনতির সময় উহা নাস্তিকতায় পরিণত হইয়াছিল। অনেক গ্রন্থে বৌদ্ধ ও নাস্তিক একার্থ বাচকরূপে ব্যবহৃত দেখা যায়। 'বিদ্বোন্মদতরঙ্গিণী' নামক সংস্কৃত পুস্তকে বৌদ্ধগণের যে সকল যুক্তি অবতারিত হইয়াছে তাহা চার্ব্বাকের মতাবলম্বী। ডাকের বচনে তদ্রূপ সূত্রও প্রচারিত দেখা যায়,—

"ভাল দ্রব্য যখন পাব।
কালিকারে তুলিয়া না থোব॥"
দধি দুগ্ধ করিয়া ভোগ।
ঔষধ দিয়া খণ্ডাব রোগ॥
বলে ডাক এই সংসার।
আপনা মইলে কিসের আর॥"

ঈশ্বর-প্রসঙ্গে যে "ঈশ্বরের স্ত্রী সনে করে পরিহাস" তাহার নিন্দা ডাক করিয়াছেন। ঈশ্বরের স্ত্রী কে? গুরুপত্নী নন্ ত? 'ঈশ্বর' শিবের এক নাম সুতরাং ঈশ্বরের স্ত্রী 'ভবানী'কে বুঝাইতে পারে।

(৭) বেণীমাধব দের সংস্করণ, ২৯৫ সাল।

(১) বুন্দা বুঝিয়া এড়িব লুণ্ড।
আগল হৈলে নিবারিব তুণ্ড॥

(২) আদি অন্ত ভুঞ্জসি।
ইষ্ট দেবতা যেহ পূজসি॥
মরণের যদি ডর বাসসি।
অসম্ভব কভু না খারসি॥

(৩) ডাঙ্গা লিড়ান বান্ধন আলি।
তাতে দিও নানা শালী॥

(৪) ভাষা বোল পাতে লেখি।
বাটাহুব বোল পড়ি সাখি॥
মধ্যস্থে যবে সমাধে স্থায়।
বলে ডাক বড় সুখ পায়॥
মধ্যস্থে যবে হেমাতি বুঝে।
বলে ডাক নরকে পচে॥

ডাক ও খনার বচন সম্বন্ধে মন্তব্য।

ডাক নামক জনৈক গোপ 'ডাকের বচন' প্রণয়ন করিয়াছেন বলিয়া কথিত আছে। যে বংশে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের লীলাবতার হইয়াছিল, সেই বংশে বঙ্গের সক্রেতীস্—ডাকের জন্ম কল্পনা করা কিছু অনুচিত হয় নাই, তবে মিহিরের পত্নী উজ্জয়িনীর ভাষা ছাড়িয়া বাঙ্গালায় নীতি ও জ্যোতিযতত্ত্ব সঙ্কলন করিতেছেন, এ কল্পনার দৌড় আর একটুকু বেশী। ডাক ও খনা দুর্ভেদ্য অন্ধকার-জাল হইতে জ্ঞান-রশ্মি বিকীরণ করিতেছেন। তাঁহাদের জীবনের উদয় অস্ত পর্ব্বতপ্রমাণ কল্পনার আড়ালে পড়িয়াছে। আমরা সেগুলির কিছুই প্রত্যয় করিতে পারিলাম না। কল্পনা-প্রিয় পাঠকগণ বটতলার সারসংগ্রহ হইতে তাঁহাদের সন্তোষার্থ বিবিধ সদনুষ্ঠানের আয়োজন খুঁজিয়া বাহির করিবেন। সম্প্রতি আসামীয় সাহিত্যের বুরুঞ্জী লেখক উক্ত প্রদেশের "লোহি ডাঙ্গরা" নামক স্থান ডাকের বাসস্থান বলিয়া দাবী করিয়াছেন। এই গ্রামের বর্ত্তমান নাম "লোহু"। ডাক শব্দ সম্ভবতঃ ডাকিনী শব্দের পুংলিঙ্গ এবং ব্যক্তি বিশেষের নাম নাও হইতে পারে। "চলিত কথা" অর্থে ডাকের বচন ব্যবহৃত হইতে পারে। বঙ্গীয় ডাকের বচনের কোন কোন স্থানে উল্লিখিত আছে ডাক গোপ জাতীয়, কিন্তু আসামীর ডাক কুম্ভকার।

বোধ হয় বঙ্গভাষা স্ফুরণের এইগুলি প্রাক্-চেষ্টা। ভাষা ও ভাব দৃষ্টে বোধ হয়, ৮০০—১২০০ খৃঃ অব্দের মধ্যে এই সকল বচন রচিত হইয়াছিল, যুগে যুগে ভাষার সংস্কার হওয়াতে সেগুলি বর্ত্তমান

সহাজাকারে পরিণত হইয়াছে। উহারা একজাতির সম্পত্তি; হয়ত প্রাচীনকালে দেশের প্রত্যেক ব্যক্তিই অজ্ঞাতসারে উহাদের রচনার সাহায্য করিয়াছে। কোন ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা এ সমস্ত বচন রচিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। (৮) কালিদাস ও গোপালভাঁড় যেমন বাঙ্গালার পাড়াগাঁয়ের সমস্ত রসিকতা একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছেন, বঙ্গদেশের জ্ঞানেও সেইরূপ সেকালে ডাক ও খনা-নামধেয় প্রকৃত কিম্বা কল্পিত ব্যক্তিদ্বয় একাধিকার স্থাপন করিয়াছিলেন।

এই সব বচনে কবিত্ব কিছুই নাই, উহারা কঙ্কাল-সার সত্য, ভাষা উহাদিগকে সাজাইয়া বাহির করে নাই, সুতরাং সাহিত্য-সেবীদিগের প্রীতিকর হইবে কি না জানি না। অনাড়ম্বরে অতি সংক্ষেপে কথাগুলি প্রচারিত হইয়াছে। বহু পুস্তক খুঁজিলে যে জ্ঞান লাভ হয়, ঐ সব বচনের ছ'ছত্রে তাহা আছে;—উহারা এতদুর সত্য যে, রেখা-গণিত কি অঙ্ক-গণিতের প্রশ্নের মত কষিয়া দেখ,—ফলে মিলিয়া যাইবে।

খনা ও ডাকের বচনে প্রভেদ।

খনা ও ডাকের বচন দুইরূপ সামগ্রী। খনা কৃষক ও গ্রহাচার্য্যের নজির। ডাকের বচনে জ্যোতিষ ও ক্ষেত্র-তত্ত্বের কথা আছে সত্য, কিন্তু তাহাতে মানব-চরিত্রের ব্যাখ্যা বেশী। আমরা নিম্নে কতকটি উদ্ধৃত করিতেছি; বাঙ্গালী পাঠক, আপনার হামাগুড়ির সঙ্গে যে পাঠ অভ্যাস করিয়াছিলেন, এগুলি তাহার পুনরাবৃত্তিমাত্র, কিছুই নূতন নহে।

(১) খাটে খাটায় লাভের গাঁতি।
তার অর্দ্ধেক কাঁধে ছাতি॥
ঘরে ব'সে পুছে বাত।
তার ভাগ্যে হাভাত॥ (৯) খনা।

(২) খনা ডেকে বোলে যান।
রোদে ধান ছায়ায় পান॥

(২) দাতার নারিকেল, বখিলের বাঁশ।
কমে না বাড়ে না বারমাস॥ খনা।

(৪) দিনে রোদ, রাতে জল।
তাতে বাড়ে ধানের বল॥
কাতিকের উনজলে।
খনা বলে দুন ফলে॥

(৮) ডাক অর্থে প্রচলিত বাক্যও হইতে পারে। "এখনও ডাকের কথায় বলে" প্রভৃতি কথায় কোন কোন স্থানে ডাক অর্থ প্রচলিত বাক্যরূপে ব্যবহৃত হয়।

(৯) "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ" তুলনা করুন।

(৫) ঘরে আখা বাইরে রাঁধে।
অল্প কেশ ফুলাইয়া বাঁধে॥
ঘন ঘন চায় উলটি ঘাড়।
ডাক বলে এ নারী ঘর উজাড়॥

(৬) নিয়ড় পোখরি দূরে যায়।
পথিক দেখিয়ে আউড়ে চায়॥
পর সম্ভাষে বাটে থিকে।
ডাক বলে এ নারী ঘরে না টিকে॥

(৭) রাঁধে বাড়ে গায় না লাগে কাতি।
অতিথি দেখিয়া মরে লাজে।
তবু তার পূজার সাজে॥
সুশীলা শুদ্ধ বংশে উৎপত্তি।
মিঠা বোল স্বামীতে ভকতি॥
রৌদ্রে কাঁটা কুঁটায় রাঁধে।
খড়কাট বর্ষাকে বাঁধে॥
কাখে কলসী পানীকে যায়।
হেটমুণ্ডে কাকহো না চায়॥
যেন যায় তেন আইসে।
বলে ডাক গৃহিণী সেই সে॥

বঙ্গভাষার মুখবন্ধেই এইরূপ সারগর্ভ কথার সূচনা হইয়াছিল, ইহা আমাদের সৌভাগ্যের কথা। ঘরের বউ ও কৃষকগণ এই সব চরণ কণ্ঠস্থ করিয়াছে বলিয়া উহাদিগকে অবজ্ঞা করিও না। প্রতি বনে বন-কুসুম, প্রতি মেঘের গায়ে উজ্জ্বল তারা, তাহারা ত কত সুলভ! কিন্তু তাহাদের মত সুন্দর কি?

বচনগুলিতে গৃহস্থালী-জ্ঞান।

এই সব বচন পড়িতে পড়িতে আমাদের আর একটি কথা মনে হয়। এখন আমাদের ভিক্ষা করিতে হইলেও বিলাত হইতে ঝুলি কিনিয়া আনিতে হইবে। কিন্তু যখন ঐ সব বচন রচিত হইয়াছিল, তখন বাঙ্গালী ভালরূপ গৃহস্থালী জানিত ও পরমুখাপেক্ষী ছিল না। কৃষক সারা জীবন পরিশ্রম করিয়া, রৌদ্র বৃষ্টি সহ্য করিয়া যে সত্যের আভাস পাইয়াছিল সেই জ্ঞান এ সব বচনে প্রচুর আছে। কৃষক জানিত, জ্যৈষ্ঠে খরা ও আষাঢ়ে ধারা হইলে শস্য ধরায় আটে না। আষাঢ় মাস ভরিয়া দক্ষিণা বাতাস বহিলে সে বৎসর বন্যা হয়। ফাল্গুন মাসে বৃষ্টি হইলে চিনা কাওন দ্বিগুণ হয়। "ধান্যের থোড় উন্মিলে এক মাস,

ফুলিলে অর্থাৎ গর্ভে শীষ জন্মিলে ২০ দিন, ঘোড়ামুখো অর্থাৎ শীর্ষভরে অবনত হইলে ১৩ দিন মাত্র পরেই কাটিবার উপযুক্ত হয়। অগ্রহায়ণে কাটিলে পূর্ণ ফসল হয়, পৌষে কাটিলে স্থানে স্থানে ফসল, মাঘে কাটিলে অল্পমাত্র ফসল এবং ফাল্গুনে কাটিলে কৃষকের কোনরূপ ফসল হয় না।" (১০) এগুলি তাহাদের পুস্তক শিক্ষার ফল নহে, তাহারা হাল কাঁধে করিয়া প্রকৃতির নিকট এই শিক্ষা পাইয়াছিল। বড় বড় অধ্যাপকও ইহার অতিরিক্ত তাহাদিগকে কিছু শিখাইতে পারিতেন না। এখনও বঙ্গের কৃষক এই সব তত্ত্ব জানে, কিন্তু পূর্ব্বে ঘরে ঘরে সকলেই ইহা জানিত। আমরা শুধু জুলিয়েটের বিরহ ও ওথেলোর সন্দেহবিষয়ে প্রাজ্ঞ হইতেছি ও পোপোকেটিপেটল্ কোথায় তাহা মানচিত্রে দেখাইতে শিখিয়াছি, কিন্তু আমরা এতদুর স্বাবলম্বনশূন্য হইয়া পড়িয়াছি যে, ভূমি এবং তদুৎপন্ন শস্যাদি সংক্রান্ত অতি সাধারণ কথাগুলি শিক্ষা করিতে ভুলিয়া গিয়াছি এবং গৃহস্থালীর বুদ্ধিটুকু একবারেই লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। এই দুর্দ্দিনে তাই এই সব বচনগুলি বড় প্রিয় বোধ হয়।

জ্যোতিষে অচলা ভক্তি।

কিন্তু এই সব বচনের অপর একটা দিক্ দেখিবার আছে। দৃষ্ট হইবে, বাঙ্গালী গৃহস্থালী করিতেছিল সত্য, কিন্তু টিকৃটিকির ভয়ে, হাঁচির ভয়ে, আকার ভয়ে, বাঁকার ভয়ে, কুঁজোর ভয়ে স্বীয় কুটীরে থাকিয়া জড়সড় হইয়াছিল। পা বাড়াইতে, হাঁ করিতে বঙ্গীয় বীর পাঁজির দোহাই দিত; তাহারা কাকমুখে জ্যোতিষের বার্ত্তা শুনিয়া কার্য্যের ফলাফল নিরূপণ করিত। এই অপূর্ব্ব শব্দার্থের কিঞ্চিৎ দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইল।

শব্দ ফল	শব্দ ফল
ক ক—কল্যাণলাভ।	কৌলো কৌলো—নিষ্ফল বা ক্ষতি।
ক: কঃ—রাজোপদ্রব।	কোয়ং কোয়ং—রাজা বা প্রভু বিনাশ।
করকং করকং—বন্ধুজনের সহিত সাক্ষাৎ।	ক্রেং ক্রেং ক্রেং—দ্রব্যলাভ।
কেতংকেতং—রত্নহানি।	কঃকুকুং কঃকুকুং—শবদর্শন ইত্যাদি।
করকো করকো—কলহ।	জ্যোতিষরত্নাকর, ৪৪৫ পৃঃ।

জ্যোতিষ শাস্ত্র বিজ্ঞানরূপে অধীত হইতেছিল না,—সংসারক্লিষ্টের হস্তে পড়িয়া এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল। যে জাতি এরূপ ভীরু তাহাদের জীবনে স্বাধীন চিন্তার স্ফূর্ত্তি কিরূপে থাকিবে? এইরূপ জ্যোতিষে ভক্তি জাতিয় প্রতিভা বিকাশের প্রতিবন্ধক। তাই ঐ সব বচনে একদিকে বাঙ্গালীর অন্তর্দৃষ্টি দেখিয়া সুখী হই, অন্যদিকে তাহাদিগের জড়তা দেখিয়া দুঃখিত হই।

কিন্তু শঙ্কর-প্রণোদিত হিন্দুধর্ম্মের ঢেউ বঙ্গে প্রবেশ করিল—অনড় টলিল; যাহা নড়ে না, তাহা

(১০) খনার বচন, জ্যোতিষরত্নাকর।

নড়িতে শিখিলে দৌড়ায়। যে বঙ্গদেশের প্রতিভা কুসংস্কারে ও জড়তায় মলিন ও নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছিল, তাহা কয়েক শতাব্দীর মধ্যে খাঁড়া ধরিয়া বহুযুগ-সঞ্চিত কুসংস্কারের স্তূপ ছেদন করিতে দাঁড়াইল। আমরা পরবর্ত্তী অধ্যায়গুলিতে সেই প্রতিভার ক্রমিক বিকাশ দেখাইব।

আমরা 'বৌদ্ধ যুগের' রচনায় যে সব অপ্রচলিত শব্দ পাইয়াছি, নিম্নে তাহার তালিকা দিলাম। (১১)

অপ্রচলিত শব্দার্থ।

শব্দ		অর্থ		পুস্তকের নাম।
অগ্র	...	অর্ঘ্য	...	শূ. পু।
অকইবের	...	পণ্ডিতের	...	ঐ
অন্যান্য অন্তিক্ষ	...	অনন্যচিত্ত	...	ঐ
অস্‌স্‌	...	অশ্ব	...	ঐ
অহন্যেক	...	অনেক	...	ঐ
অনুহিত	...	অনুষ্ঠিত	...	ঐ

(১১) এই সব শব্দের সকল অর্থই যে ঠিক হইল তাহা বলিতে পারি না। কোন কোন শব্দ কেবল স্থলবিশেষে একবার পাইয়াছি, সেই স্থলে যে অর্থে তাহা ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া ধারণা হইয়াছে তাহাই দিয়াছি। একই শব্দের ব্যবহার অনেক স্থলে না লক্ষ্য করিলে তাহার প্রকৃত অর্থ বোধ হয় না। ইহার কোন কোন শব্দ সম্পূর্ণ প্রাদেশিক, তাহা বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল বলিয়া বোধ হয় না। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের শব্দার্থ-বোধ-সৌকর্য্যার্থ কোন অভিধান রচিত হয় নাই, কিন্তু তাহার রচনা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় বাঙ্গালা চলিত ও অপ্রচলিত শব্দের অভিধান প্রণয়ন বিষয়ে জনৈক কৃতবিদ্য সাহেবই সর্ব্বপ্রথম হস্তক্ষেপ করেন। স্যার্ গ্রেভিস্ সি হফটন্ মহোদয়ের বাঙ্গালা অভিধান ১৮৩৩ খৃঃ অব্দে লণ্ডন হইতে প্রকাশিত হয়, এই পুস্তক নিতান্ত অসম্পূর্ণ হইলেও এই শ্রেণীর অভিধান বাঙ্গালায় আর বিরচিত হয় নাই। আমি এই পুস্তকে সেই বিষয়ের কিঞ্চিৎ অবতারণা করিলাম মাত্র। এস্থলে বলা উচিত শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় 'পঁহু' ও 'নিছনি' শব্দের অর্থ লইয়া 'সাধনা' পত্রিকায় এবং শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রাচীন অপ্রচলিত শব্দার্থের কিঞ্চিৎ চর্চ্চা করিয়াছেন। ৺জগবন্ধু ভদ্র মহাশয় তৎকৃত বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সংস্করণে কতকগুলি হিন্দী শব্দার্থের তালিকা দিয়াছিলেন, ও তাহাই মূলতঃ অবলম্বন করিয়া ৺অনাথকৃষ্ণ দেব মহাশয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় বিদ্যাপতির পদসমূহের দুরূহ শব্দের একটি বিস্তৃত অর্থ-তালিকা প্রকাশিত করিয়াছিলেন। পণ্ডিত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় তৎসম্পাদিত চৈতন্য ভাগবতের টীকায় এবং শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় তৎসম্পাদিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের টীকায় এ সম্বন্ধে কিছু শ্রম স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় তাঁহার কৃষ্ণকীর্ত্তনের টীকায় এতৎ সম্বন্ধে যে পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন কোন প্রশংসাই তাঁহার পক্ষে অতিশয়োক্তি নহে।

শব্দ		অর্থ		পুস্তকের নাম।
আইদ্	...	আদি	...	শূ, পূ।
আকুড়ি	...	আকড়্সী	...	ঐ
তাঁড়ুল	...	তণ্ডুল	...	ঐ
আপাবন	...	বিশেষ পবিত্র	...	ঐ
আফুলা	...	অপক্ক	...	ঐ
আরসা	...	রসহীন	...	ঐ
আমলো	...	ধান্যভেদ	...	ঐ
আলম্ব	...	নিশান	...	ঐ
আসারে	...	ধান্যভেদ	...	ঐ
আসআঙ্গ	...	ধান্যভেদ	...	ঐ
উজুরোলা	...	উচ্চ শব্দ	...	ঐ
উড়াশালী	...	ধান্যভেদ	...	ঐ
ককচি	...	ধান্যভেদ	...	ঐ
কনকচুর	...	ধান্যভেদ	...	ঐ
কন্নি	...	লেখক	...	ঐ
কাঁঙদ	...	ধান্যভেদ	...	ঐ
কামদ	...	ধান্যভেদ	...	ঐ
কামিনা / কামিন্যা	...	কর্ম্মকার	...	ঐ
কালাকার্ত্তিক	...	ধান্যভেদ	...	ঐ
কিআলা	...	কেয়াফুল	...	ঐ
কিলেস	...	ক্লেশ	...	ঐ
কিসান	...	কৃষাণ	...	শূ, পূ।
কুসুমমালী	...	ধান্যভেদ	....	ঐ
কেওদা	...	কেঁদো	...	ঐ
খচরা	...	শূন্যগামী	...	ঐ
খীরকম্বা	...	ধান্যভেদ	...	ঐ

শব্দ		অর্থ		পুস্তকের নাম।
খুদ্দ	...	ক্ষুদ্র	...	শূ, পু।
খেজুরছড়ি	...	ধান্যভেদ	...	ঐ
খেমরাঅ	...	ধান্যভেদ	...	ঐ
খোঁটা	...	কীলক	...	ঐ
গতি	...	সেবক	...	ঐ
গামারি	...	গান্তারী বৃক্ষ	...	ঐ
গারস্তর	...	গৃহস্থের	...	ঐ
গুজুরা	...	ধান্যভেদ	...	ঐ
গোঁতমপলাল	...	ধান্যভেদ	...	ঐ
গোপালভোগ	..	ধান্যভেদ	...	ঐ
চন্দ্রহাস	...	অস্ত্রভেদ	...	ঐ
চানক	...	চাঁদোয়া	...	ঐ
ছিছরা	...	ধান্যভেদ	...	ঐ
ছিহথ	...	শ্রীহস্ত	...	ঐ
জগদাল	...	জগদ্দল, ভারী পাথর	...	ঐ
জিন্তা	...	জিহ্বা	..	ঐ
জোলি	...	নির্ভাজ ধান্য	...	ঐ
ঝিঙ্গাশাল	...	ধান্যভেদ	..	ঐ
ঝিসিকানি	...	বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি	...	ঐ
ডকবুস	...	ডাঙ্গস	...	ঐ
ডহর	...	জলাভূমি	...	ঐ
ডাড়ুকা	...	শৃঙ্খলবিশেষ	...	ঐ
তরাজু	...	পাল্লা	...	ঐ
তাঁউল	...	তণ্ডুল	...	ঐ
তামাক	...	তাম্রনির্ম্মিত পুষ্পপাত্র	...	ঐ
তেঠঙ্গা	...	ত্রিভঙ্গ	...	ঐ
তোজনা	...	ধান্যবিশেষ	...	ঐ

শব্দ		অর্থ		পুস্তকের নাম।
ত্রিরুচ	...	ত্রিমুখ	...	শূ, পু।
দম্বদার	...	দোর্দ্দমাদার	...	ঐ
দাইআ	...	দা দিয়া কর্ত্তন করিয়া	...	ঐ
দুআপর	...	দ্বাপর	...	ঐ
দুদুরাজ	...	দুধরাজ	...	ঐ
দেউল্ল্যা (১২)	...	পূজাকারক	...	ঐ
দেহারা	...	মঠ	...	ঐ
ধিরকালি	...	বাদ্যবিশেষ	...	ঐ
ধুন্ধুকার	...	শূন্যাকার	...	ঐ
নিছনি	..	ঝাড়ন	...	ঐ
নেতর	...	বস্ত্র	...	ঐ
পর্ব্বতজিরা	...	ধান্যবিশেষ	...	ঐ
পাকানা	...	জড়িত	...	ঐ
পাটএ	...	মঞ্চে	...	ঐ
পাটসালে	...	রাজসভায়	...	ঐ
পাড়ন	...	পাটাতন	...	ঐ
কেফেরি	...	ধান্যবিশেষ	...	ঐ
বারমতি	...	বারদিনব্যাপী ধর্ম্মোৎসব		ঐ
বিহরাম	...	বিশ্রাম	...	ঐ
বিহানে	...	প্রাতঃকালে	...	ঐ
ভাদোলী	...	ধান্যভেদ	...	ঐ
বেসাতি	...	হাটে বিক্রয়ের দ্রব্যাদি		ঐ
বেলাল	...	বিল্ব	...	ঐ

(১২) বর্ত্তমান 'দেউলিয়া' শব্দ এই শব্দ হইতে উদ্ভূত। সর্ব্বস্বান্ত হইয়া সম্ভবতঃ লোকে দেব-মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করিত।

শব্দ		অর্থ		পুস্তকের নাম।
ভেক	...	বেশ	...	শূ, পু।
মইপাল	...	মহীপাল, ধান্যভেদ	...	ঐ
মনুহর	...	মনোহর	...	ঐ
মহীপাল	...	ধান্যভেদ	...	ঐ
সালুক	...	কুমুদকন্দ	...	ঐ
সাঁঝা	...	সন্ধ্যায় আলোকদান	...	ঐ
সনাখড়কি	...	ধান্যভেদ	...	ঐ
সালছাটি	...	ধান্যভেদ	...	ঐ
সীতাসালী	...	ধান্যভেদ	...	ঐ
সীফল	...	শ্রীফল	...	ঐ
হাতিপাঞ্জর	...	ধান্যভেদ	...	ঐ
হুকুলি	...	ধানের গোছা	...	ঐ
হুতার	...	অগ্নির	...	ঐ
মুক্তাহার	...	ধান্যবিশেষ	...	ঐ
মোথ	...	মোক্ষ	...	ঐ
মৌকলস	...	ধান্যবিশেষ	...	ঐ
লাউসালী	...	ধান্যভেদ	...	ঐ
লালকামিনী	...	ধান্যভেদ	...	ঐ
লিঙ্গা	...	বাদ্যযন্ত্র বিশেষ	...	ঐ
বম্ভগাঁঠি	...	ব্রহ্মগ্রন্থি	...	ঐ
বরঙ্গ	...	বাদ্যযন্ত্রবিশেষ	...	ঐ
বাঅন	...	বামন	...	ঐ
বাঁঝা	...	বন্ধ্যা	...	ঐ
বিকৃথ	...	বৃক্ষ	...	ঐ
বাম্ভন	...	ব্রাহ্মণ	...	ঐ
বাঁসমতী	...	ধান্যভেদ	...	ঐ
বোআলি	...	ধান্যবিশেষ	...	ঐ

শব্দ		অর্থ		পুস্তকের নাম।
সইতর	...	সঙ্গের	...	শূ, পূ।
অক	...	উহাঁকে	...	মা, চ, গা।
অগর	...	অগুরু চন্দন	...	শূ, পূ।
অচুম্বিতের	...	আশ্চর্য্যের	...	মা, চ, গা।
অফিন্না	...	আফুলা	...	ঐ
অবুধ	...	বুদ্ধিশূন্য	...	ডাক।
আউঢাউ	...	আইঢাই	...	মা, চ, গা।
আউ	...	পরমায়ু	...	ঐ
আউল	...	সিদ্ধ ব্যক্তি	...	ঐ
আউড়ে	...	বক্রভাবে	...	ঐ
আও	...	রব	..	ঐ
আধার (১৩)	...	খাদ্য	...	ডাক।
আপহর	...	পাহারা	...	ঐ
আপ্ত	...	আপন	...	মা, চ, গা।
আছিল	...	উপস্থিত	...	ঐ
আইল পাতার	...	এলোমেলো	...	ঐ
আরিব্বল	...	আয়ু	...	ঐ
আসা নড়ি	...	হাতের লাঠি	...	ঐ
একতন যেকতন	...	যে কোন প্রকারে	...	ঐ
একলা	...	এক	...	ঐ
এলায়	...	এখন	...	ঐ
উকা	...	উল্কা-মশাল	...	ডাক
উলী	...	কুশল	...	খনা
কা	...	কাক	...	ঐ
কাউ	...	কাক	...	ঐ

(১৩) আধার শব্দ পূর্ব্বে মনুষ্যের খাদ্যও বুঝাইত ; এখন ইহার অর্থ সীমাবদ্ধ হইয়া শুধু পক্ষীর খাদ্য মাত্র বুঝায়।

শব্দ	অর্থ	পুস্তকের নাম।
কাউশিবার ...	তাগাদা করিতে	মা, চ, গা।
কাতি ...	কালী; কার্ত্তিক মাসে	ঐ
কাঞ্জী ...	ছোট	ঐ
কোনটি	কোথায় ...	ঐ
কোটেকার ...	কোথাকার ...	ঐ
কুশলানী ...	মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ...	ডাক।
কৈতর (১৪) ...	পায়রা ...	মা, চ, গা।
খপরা ..	কুটীর ...	ঐ
খোচা ...	তৃণ পল্লব ..	মা, চ, গা।
গাভূর (১৫) ...	যুবক, বলশালী ...	ডাক।
গাবুরালী (১৬) ...	যৌবন ...	মা, চ, গা।
গিরি ...	গৃহী ...	ঐ
গোবিন ...	গভীর ...	ঐ
গোঁধলা ...	গোময় ...	ডাক।
ভরজুয়ান ...	পূর্ণ যৌবন ...	মা, চ, গা।
চতুরা ...	চতুষ্কোণ অঙ্গন ...	ঐ
চাম্বর ...	চামর ...	ঐ

(১৪) এখনও পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত।

(১৫) বিক্রমপুর অঞ্চলে এখনও চলিত।

(১৬) গ্রীয়ার্সন্ 'গাবুরাণী' অর্থ করিয়াছেন "Bride hood"—এসিয়াটিক্ সোসাইটির জার্ন্যাল্ ১৮৭৮, প্রথম সংখ্যা, ৩য় খণ্ড, ২১৩ পৃঃ দেখ। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে কোন কোন স্থলে গাভুর, গাভুরাণী. এই উভয়বিধ রূপই প্রচলিত আছে ও ইহার অর্থ যৌবন বুঝায়। পাঠক এই পুস্তকের ৭৩ পৃষ্ঠার উদ্ধৃত স্থলে 'গাবুরাণী' শব্দ দেখিবেন, তাহাতে যৌবন অর্থই সঙ্গত দৃষ্ট হইবে। এই শব্দটীর অর্থ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত গ্রীয়ার্সন সাহেব আমাকে লিখিয়াছেন,—With reference to the word "Gaburani" about which I worte to you the other day, I have since found out that the word "Gabur" is very common in Chittagong, It means "young", also "a boy" hence "a servant", The word "Gaburani" therefore, means "youthfulness." and has the same meaning as "yauvana." It has nothing to do with the Sanskrit "Garva,"

শব্দ		অর্থ		পুস্তকের নাম।
চরিচর	..	উপায়	...	ডাক।
ছামুর	...	সম্মুখের	...	মা, চ, গা।
ছুছু	...	শূন্য	...	ঐ
জীউ	...	জীবন	...	ঐ
জ্ঞান্তা	...	জ্ঞাতি	...	ঐ
ঝোলাঙ্গা	...	ঝুলি	...	ঐ
ডাঙ্গ (১৭)	...	কাটি		মা, চ, গা।
ডারিয়া	...	নিক্ষেপ করিয়া	...	ঐ
ডাঙ্গাইবার	...	প্রহার করিতে	...	ঐ
ডাম্বাডোল	...	বহুজনতার শব্দ	...	ঐ
ঢেবা ডোরা	...	ঢোলের দ্বারা ঘোষণা		ঐ
ঢলমল	...	ঝলমল	...	ঐ
তেতকে	...	তত	...	ঐ
তৈল পাটের খাড়া	...	যে খাড়াকে তৈল নিষেকে শাণিত করা হয়		ঐ
দায় (১৮)	...	ডাক	...	ঐ
দোয়াদশ	... ...	করঙ্ক	...	ঐ
দামরা	..	ঢোল	...	ঐ
দোন	...	দুই	...	ঐ
থবীরা	...	স্থবির	...	ডাক।
ধরেক	...	ধরিও	...	ঐ

(১৭) হফ্‌টন কৃত অভিধানে, ডাঙ্গ শব্দ সংস্কৃত দন্ত শব্দ হইতে উদ্ভূত, এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে।

(১৮) এই 'দায়' শব্দ পূর্ব্বে নানা অর্থে ব্যবহৃত হইত। মাণিকচাঁদের গানে আছে,—

"যেন মতে কলাই বেচি রাজাকে দেখিল,
ঘরর শ্যামক আইল বাপ দায় দিয়া।"

রাজার রূপে মুগ্ধ হইয়া ঘরের স্বামীকে বাপ বলিয়া আসিল। অনেক পরে চৈতন্য ভাগবতে পাইতেছি, "অন্যের কি দায় বিষ্ণুদ্রোহী যে যবন" অর্থাৎ অন্যের কথা দূরে থাকুক ইত্যাদি।

শব্দ		অর্থ		পুস্তকের নাম।
ধওল	...	ধবল	...	মা, চ, গা।
নঠ	...	নষ্ট	...	ডাক।
নিন্দ	...	নিদ্রা	...	মা, চ, গা।
নিতে	...	বিনা	...	মা, চ, গা।
নেওয়া	...	প্রলেপ	...	ঐ
নেয়াই	...	ন্যায়	...	ঐ
পইতায়	...	প্রত্যয় করে	...	ঐ
পোখরি	...	পুষ্করিণী	...	খনা।
পাহাড়	...	পার	...	ডাক।
পাকেয়া	...	ঘুরাইয়া	...	মা, চ, গা।
বাবন	...	ব্রাহ্মণ	...	ঐ
বারুণ	...	ঝাঁটা	...	ঐ
বাদে	...	জন্য	...	ঐ
বেন্নামুখ	...	মুখ ফিরাইয়া	..	ঐ
বুন্দা	...	বৃষ্টি-বিন্দু	...	ঐ
ভুসঙ্গ	...	ভস্ম	...	ঐ
বেআলি	...	অনৈক্য	...	ডাক।
মাও	...	মাতা	...	মা, চ, গা।
মধুকর (১৯)	...	নৌকা বিশেষ	...	ঐ
মাল্লি	...	পথ	...	ঐ
মাড়াল	...	পথ	...	ঐ
মিঠ	...	মিষ্ট	...	ঐ
মুর্চ্ছল	...	বাদ্য-যন্ত্র বিশেষ	...	ঐ

(১৯) "মধুকর" নৌকা বিশেষের নাম। পদ্মাপুরাণে নৌকার অনেকগুলি নাম দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে 'মধুকর' নৌক শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণিত দেখা যায়; স্বয়ং সদাগর 'মধুকরে' যাইতেন। বিক্রমপুরবাসীদের মুখে শুনিয়াছি, এখনও 'মধু অর্থে একরূপ নৌকাকে বুঝায়।

শব্দ		অর্থ		পুস্তকের নাম।
যেটে	...	যে স্থানে	...	মা, চ, গা।
যেত্‌কে	...	যত	...	ঐ
যোগ্যবান	...	যোগ্য	...	ঐ
যেনমত	...	যখন মাত্র	...	ঐ
লহড় (লড়)	...	দৌড়	...	ঐ
সয়ল (২০)	...	সকল	...	শূ, পু।
সমাধে	...	বোঝে	...	ডাক।
সাধে	...	সংগ্রহ করে লয়	...	মা, চ, গা।
সানে	...	ইঙ্গিত	...	ঐ
সরুয়া	...	সরু	...	ঐ
সাঁও	...	সাপ	...	ঐ
সেঁওয়ালী	...	সন্ধ্যাকালীয়	...	ঐ
হীন	...	শূন্য, বিয়োগ	...	খনা।

সংস্কৃতের প্রভাব হীনতা।

এই সময়ের ভাষায় সংস্কৃতের প্রভাব একেবারেই দৃষ্ট হয় না, তাহা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। মাণিকচাঁদের গানে রাজা ভাল হইলে তাঁহাকে 'সতী' এবং দুষ্ট হইলে তাঁহাকে 'অসতী' বলা হইয়াছে। খনা শনিকে 'ভানুতনুজা' আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। বহু-পূর্ব্ব-রচিত মেয়েলী ছড়ায় 'গুণবতী ভাই' শুনিয়াছিলাম, সেও বুঝি এই যুগের রচনা হইবে। মাণিকচাঁদের গানে ক্রিয়ার গুরু লঘু ভাব এখনকার প্রচলিত ভাব হইতে স্বতন্ত্ররূপ ছিল। 'যাইস না ধর্ম্মি রাজা পরদেশক লাগিয়া।' (মা, চ গা, ২৯২ শ্লোক) প্রভৃতি পদে সম্মানীয় পাত্রে লঘু ক্রিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে; অথচ ভৃত্য নেঙ্গাকে রাণী বলিতেছেন, কেন! কেন নেঙ্গা আইলেন কি কারণ' (৪৯ শ্লোক) মাণিকচাঁদরাজা তাঁহার প্রহারক যমদূতের প্রতি জিজ্ঞাসু হইয়াছে, 'কে মারেন আমারে বিস্তর করিয়া' (৭২ শ্লোক)। কোন স্থানে আধুনিকমতে নিতান্ত বিরুদ্ধভাবাপন্ন 'তুমি চাহিলেন দুধ' (৩০০ শ্লোক) প্রভৃতি রচনা দৃষ্ট হয়।

(২০) "একল রামাই পণ্ডিত সয়ল অবধান।"

এই সময়ে রাজারা সোণার খাটে বসিয়া রূপার খাটে পদ স্থাপন (৩০৭ শ্লোক) ও স্বর্ণ থালে ৫০ ব্যঞ্জনসহ অন্ন আহার (৪৬৭ শ্লোক) করিলেও নিত্য জীবনযাত্রা-ঘটিত দ্রব্যে খুব উচ্চ অঙ্গের বিলাসের ভাব প্রদর্শন করিতেন বলিয়া বোধ হয় না। 'ইন্দ্রকম্বল' (৫৫৫ শ্লোক) 'দণ্ডপাখা' (২১৪ শ্লোক) ও 'পাটের সাড়ী' (৫৮০ শ্লোক) বিলাসের দ্রব্য মধ্যে গণ্য ছিল। পরবর্ত্তী এক অধ্যায়ে দৃষ্ট হইবে কৃত্তিবাস পণ্ডিত গৌড়েশ্বরের নিকট একখানা 'পাটের পাছড়া' পাইয়াই ধন্য হইতেছেন। কিন্তু কবিকঙ্কণ 'মেঘ ডম্বুর কাপড়' ও 'জগন্নাথী থান' নামক একরূপ বস্ত্রের কথা গর্ব্বের সহিত উল্লেখ করিতেছেন। (২১) চৈতন্য প্রভুর সময় তিন টাকা মূল্যের ভোট-কম্বলই মহার্ঘ বলিয়া গণ্য হইতেছে (চ, চ মধ্যমখণ্ড, ২০প)। সে সব এ সময়েও অনেক পরে খাদ্যের মধ্যে "ইন্দ্রমিঠা" (২২৫ শ্লোক মা চ গা) নামক একরূপ মিষ্ট দ্রব্য উপাদেয় ছিল ও 'বংশহরির গুয়া' (২৫৭ শ্লোক) খাইয়া মুখ শুদ্ধি করা হইত। 'বংশহরির গুয়া খাইয়া' দন্ত শুভ্র হইয়াছে বলিয়া গোপীচাঁদ স্ত্রীর মুখের প্রশংসা করিতেছেন।

সামাজিক অবস্থা।

মাণিকচাঁদের গানে এবং ডাক ও খনার বচনে দৃষ্ট হয়, ব্রাহ্মণ ভদ্রলোকগণও কৃষি-ব্যবসা করিতেন এবং স্ত্রীলোকগণ পর্য্যন্ত অক্ষক্রীড়াসক্ত ছিলেন। স্ত্রীলোকগণের অক্ষক্রীড়াসক্তি কবি-কঙ্কণের সময়েও বিদ্যমান ছিল।

সন্তান জন্মিলে সাতদিন পরে 'সাদিনা,' দশদিন পরে 'দশা, এবং ত্রিশদিন পরে 'ত্রিশা' নামক উৎসব করা হইত।

শূন্যপুরাণ প্রভৃতি প্রাচীন পুস্তকে দৃষ্ট হয়, এই শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমি নানা প্রকার ধান্যের ভাণ্ডার-স্বরূপ ছিল। কৃষকগণ তাহাদিগকে আদর করিয়া নানাবিধ প্রিয় নামে অভিহিত করিত। সেই "মহীপাল", "লালকামিনী", "মৌকলস", "খেজুরছড়া", "রাজগড়", "মুক্তাহার", "মাধবলতা", "সোনাখড়কি" প্রভৃতি অসংখ্য নামধেয় ধান্যের কথা এখন আর আমরা জানি না। বঙ্গের আদরের সামগ্রী মহীপালধান্য, এখন মহী-পালন করিবার ভার ছাড়িয়া দিয়াছে!

---

(২১) রাজার জন্য সাধু "নিল জগন্নাথী থান দশ জোড়া।" ক, ক, চ।
সাধুর স্ত্রী "বাছিয়া পরিল মেঘডম্বুর কাপড়।" ঐ

পঞ্চম অধ্যায়

১। ধর্ম্মকলহে ভাষার শ্রীবৃদ্ধি

২। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ লক্ষণ

ধর্ম্মকলহ।

বঙ্গে হিন্দুধর্ম্মের উত্থানে নানা মতাবলম্বী অধ্যাপকগণ স্বীয় স্বীয় মত প্রচারে নিয়োজিত হইলেন। ইঁহাদের তর্ক-যুদ্ধ অতীব কৌতুহল-উদ্দীপক। গৌড়বাসী প্রাচীন পণ্ডিত চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য্য এই কলহ ব্যাপারের একখানা চিত্রপট রাখিয়া গিয়াছেন; সে চিত্রখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে—তাহার নাম "বিদ্যোন্মাদতরঙ্গিণী"। (১)

বঙ্গসাহিত্যে শিব, পদ্মা, চণ্ডী ও শীতলা।

হিন্দুধর্ম্মের অভ্যুত্থানকালে বোধ হয় শৈবধর্ম্মই সর্ব্বপ্রথম মস্তক উত্তোলন করে। শৈবধর্ম্ম-কীর্ত্তনোপলক্ষে ভাষার কোন বৃহৎ কাব্য রচিত না হইলেও "ধান ভানতে শিবের গীত" প্রভৃতি প্রবাদ বাক্যের দ্বারা অনুমান হয়, শৈবমতের অধ্যাপকগণ সে বিষয়ে একেবারে নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। চট্টগ্রামের প্রাচীন 'মৃগলুব্ধ' পুঁথিতে (২) শিবমাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে; এইরূপ দুএকখানা প্রাচীন পুঁথিই শৈবধর্ম্মের ভগ্ন-কীর্ত্তিস্বরূপ বর্ত্তমান আছে। উহারা ক্ষুদ্র-কলেবর হইলেও সেগুলি জঙ্গলে কুড়াইয়া পাইয়া আমরা সাদরে রক্ষা করিয়াছি।

---

(১) প্রায় ৬০ বৎসর অতীত হইল শোভাবাজারের স্বর্গীয় রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর নিজকৃত একটি ইংরাজী অনুবাদসহ এই গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়াছিলেন।

(২) ১৫০ বৎসরের প্রাচীন হস্তলিখিত পুস্তকে গ্রন্থকার রতিদেব সম্বন্ধে এই বিবরণ পাওয়া যায়।

"পিতা গোপীনাথ বন্দম মাতা বসুমতী।
জন্মস্থান সুন্দদণ্ডী চক্রশালা খ্যাতি॥
জ্যেষ্ঠ দুই ভ্রাতা বন্দম রাম নারায়ণ।
ধরণী লোটায়ে বন্দম যত গুরুজন॥
অন্নপূর্ণা শাশুড়ী যে শ্বশুর শঙ্কর।
মন্ত্রদাতা দয়াশীল মোক্ষদা ঠাকুর॥
গোপীনাথ দেব সুত রতিদেব গায়।
মৃগলুব্ধ পুঁথি এহি হর গৌরীর পায়॥"

এই পুস্তকে শিবচতুর্দ্দশীব্রতের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন উপলক্ষে এক ব্যাধের বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে।

যদিও শিবের গান বলিয়া কোন স্বতন্ত্র বৃহদাকার ছড়া বা পালা পাওয়া যায় নাই, কিন্তু প্রাচীন সমস্ত মনসা-মঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল প্রভৃতি পুঁথিতেই শিবের আখ্যায়িকা অতি বিস্তৃতভাবে দেওয়া হইয়াছে,—এতদ্দারা শিবের গানই যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন তাহাই প্রতীয়মান হয়,—এই গানকেই অবতরণিকা করিয়া অপরাপর দেব-দেবীর প্রসঙ্গ বিরচিত হইত। সম্প্রতি গোরক্ষ বিজয়ের একটি প্রাচীন পালা আমার হস্তগত হইয়াছে,—শিবের প্রসঙ্গ তাহারও মুখবন্ধ। এই সকল গানে শিব কৃষকরূপে, ভাঙ্গড়রূপে কখনও বা নানারূপ তন্ত্রের গুরুরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। বঙ্গীয় কৃষকেরা তাঁহাকে কৃষকরূপে অধিকাংশ স্থলে সাজাইয়াছেন। বাঙ্গালী তাঁহার দেবতাকে সর্ব্বদাই তাঁহার ঘরের লোক বানাইয়া হৃদয়ের অতি সন্নিহিত করিয়া পূজার অর্ঘ্য দান করিয়াছেন।

শূন্যপুরাণ এবং রামেশ্বর ও কবিচন্দ্র প্রণীত শিবায়ন গ্রন্থে শিব সম্বন্ধে এক একটী এরূপ অধ্যায় আছে যে, তাহা প্রাচীনতম শিবগীতের নিদর্শন বলিয়া গ্রহণ করিতে আমরা কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করি নাই। তাহাতে শিব বৃদ্ধ কৃষকবেশে কুবেরের নিকট কিছু ধান্য মূলধন গ্রহণ করিয়া ক্ষেত্র কর্ষণ ব্যাপারে নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার সঙ্গী ভীমভৃত্য তাঁহার নির্দ্দেশে হলকর্ষণ করিয়া ক্ষেত্র চৌরস করিয়া চষিতেছে। শিবঠাকুর ক্ষেত্রের মশা এবং জোঁক ধ্বংস করিবার জন্য বিবিধ অনুষ্ঠান করিতেছেন। এই প্রসঙ্গে কৃষিতত্ত্ব সম্বন্ধে নানা প্রকার তত্ত্ব অবতারিত হইয়াছে। 'ধান ভান্‌তে শিবের গীত'—এই প্রচলিত কথার সার্থকতা এই অধ্যায়ে পাওয়া যায়। শিবের সঙ্গে বাগ্‌দিনীরূপিণী ভগবতীর শ্লীলতাহীন রসসন্দর্ভও প্রাচীন শিবগীতের অংশ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। পৌরাণিক শিবের সঙ্গে এই কৃষকরূপী কামিনীলুব্ধ শিবের কোন সম্বন্ধ নাই।

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টিসাধনে পদ্মাবতী ও চণ্ডীই বিশেষরূপে সাহায্য করিয়াছেন। সংস্কৃতের বচন স্পর্শমণি-তুল্য, তাহার প্রভাবে লোষ্ট্রও দেবত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে; এই জন্য ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে মনসাদেবীর-মাহাত্ম্য সংক্ষেপে কীর্ত্তিত হইয়া এবং বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে (৩) কালকেতু ও শালবাহন প্রভৃতির উল্লেখ দ্বারা বঙ্গীয় পদ্মপুরাণ ও চণ্ডী কাব্যের ভিত্তি দৃঢ় করা হইয়াছিল।

লৌকিক দেবতাদের প্রভাব শৈবধর্ম্মের প্রতি আক্রমণ।

শৈবধর্ম্মের উপর এই সকল পৌরাণিক ও লৌকিক ধর্ম্মতরঙ্গ উপর্য্যুপরি আঘাত করিয়াছে। শিবোপাসক ধনপতি সদাগর 'ডাকিনী দেবতা' চণ্ডীর ঘট পদ-প্রহারে ভগ্ন করিয়া 'মেয়ে দেব'-সেবিকা খুল্লনাকে ভৎর্সনা করিয়াছিলেন, (৪) বিষহরিদেবীকে শিবোপাসক চাঁদ সদাগর শুধু রক্ত চক্ষু দেখাইয়া

(৩) "ত্বং কালকেতুবরদা ছলগোধিকাসি।
যা ত্বং শুভাভবসি মঙ্গলচণ্ডিকাখ্যা॥" ইত্যাদি।

(৪) ধনপতির সিংহলযাত্রা, ক, ক, চ।

ক্ষান্ত হন নাই, হেঁতালের বাড়ি দিয়া কক্ষদেশ ভগ্ন করিয়া দিয়াছিলেন। (৫) শিবোপাসক চন্দ্রকেতু রাজাও শীতলাদেবীর প্রতি সেইরূপ তীব্র অবজ্ঞাসূচক উদ্ধত ভাব দেখাইয়াছিলেন। (৬) কিন্তু বঙ্গীয় কাব্যগুলিতে চণ্ডী ও মনসাকে স্বীয় স্বীয় উপাসক ভক্তগণের জন্য যেরূপ কার্য্যতৎপর দর্শন করি, সে তুলনায় শিবঠাকুরকে নিতান্তই নিশ্চেষ্ট বলিয়া মনে হয়। খুল্লনার বিপদে, শ্রীমন্তের খেদে, লাউ-সেনের দুঃখে চণ্ডীর হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। স্বীয় পূজা প্রচারের জন্য চণ্ডী ও বিষহরির দিনে শান্তি ও রাত্রে নিদ্রা ঘটে নাই। সুন্দর দেবীর প্রসাদে কাব্য অপেক্ষা চৌর্য্যেও কম কৃতিত্ব লাভ করেন নাই। বিষহরিদেবীকে পূজা করিয়া বিপুলা (বেহুলা) কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন তাহা কেনা জানে? ভক্তের স্মরণমাত্র ইঁহারা কখনও সাশ্রুনেত্র, কখনও খড়্গহস্ত। কিন্তু প্রায়শঃ ইঁহারা সামান্য মানবীর ন্যায় রাগ, হিংসা ও দুঃখের পরিচয় দিয়াছেন। দু'এক স্থলে শুধু বর্ণনাগুণে চণ্ডী-দেবী মহত্তর প্রভাব দেখাইয়াছেন। মুকুন্দরাম ক্রুদ্ধ চণ্ডীর বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন, তাহা গাম্ভীর্য্যে মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর একখানি সমুন্নত প্রতিলিপি। সমস্ত দেবগণের তেজোরাশিসমুদ্ভূতা চণ্ডীকে বরুণ পাশ, যম কালদণ্ড, ইন্দ্র বজ্র, শিব শূল, ব্রহ্মা কমণ্ডলু, বিষ্ণু চক্র, সূর্য্য রশ্মি ও লোকপালগণ তাঁহাদের স্বীয় স্বীয় প্রহরণ উপহার দিয়া প্রণত হইতেছেন। ত্রিলোকের এই ভীতিকর শক্তিপুঞ্জ একত্র সংগ্রহ করিয়া সংহার-রূপিণী সিংহের উপর দাঁড়াইলেন। ইজিপ্টের পিরামিড কি ব্যাবিলনের প্রস্তরগৃহ যাঁহারা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাঁহারা ভিন্ন এ বিগ্রহ গঠন করিবে কে?

কিন্তু চণ্ডী ও পদ্মাবতীর উদ্যমশীলতা মহাদেবে দৃষ্ট হয় না। চাঁদসদাগরের সাতখানা 'মধুকর ডিঙ্গা' খান খান হইয়া সমুদ্রে পড়িল? চাঁদবেণে 'শিব শিব' বলিয়া সপ্তবার ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল, (৭)

---

(৫) "হেঁতালের বাড়ি দিলগো আগো তাতে ব্যথা পাইলাম বড়।
জালুয়া মণ্টপে গিয়া কাঁকালী কৈলাম দড়॥" বিজয়গুপ্তের পদ্মপুরাণ।

(৬) "জন্মেও না ছাড়িব মহেশ ঠাকুর।
শুন রে অজ্ঞান বুড়ি এথা হৈতে দূর॥"

তৎপর শীতলাদেবী যখন তাঁহার রাজ্যে মহামারী উপস্থিত করিলেন, তখনও নির্ভীক চন্দ্রকেতু বলিয়াছিলেন—

"রাজা বলে শীতলা করেছে যদি বাদ।
কদাচিৎ আমি তার না লব প্রসাদ॥"

দৈবকীনন্দনের শীতলামঙ্গল। সাহিত্যপরিষৎপত্রিকা, ১৩০৫ সন, ১ম সংখ্যা, ৩৯ পৃঃ।

(৭) "ভেলায় চাপিয়া সাধু পাইল গিয়া তড়।
শিব শিব বলি সাতবার করে গড়॥" কেতকাদাস।

পুনশ্চ,—"যা করেন শিব শূল, এবার পাইলে কুল,
মনসায় বধিব পরাণে।" কেতকাদাস।

কিন্তু শিবঠাকুর নিশ্চেষ্ট, নির্ম্মম। ধনপতির অশ্রু মোচন করিতেও তিনি হস্ত উত্তোলন করেন নাই!

শিবের নিশ্চেষ্টতা!

সুতরাং বিষহরি দেবী ও চণ্ডীর প্রতিপত্তি যে বঙ্গদেশে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? চৈতন্যভাগবতে দেখা যায়, উক্ত দেবতাদ্বয়ের পূজা বিশেষ অর্থকরী ও সম্মানিত ব্যবসায় ছিল। (৮)

শৈবধর্ম্মের শেষ কথা "শিবোঽহং"। জীব মাত্রই পাশমুক্ত হইলে শিব হইতে পারেন। শিব গুণাতীত, আনন্দস্বরূপ। ইঁহার নিকট কামনা করা বৃথা। ভগবানের পৃথক সত্ত্বা এবং সগুণ ভাব উন্নত শৈবগণ দ্বৈতবাদীদের ন্যায় প্রত্যক্ষ করেন না; সুতরাং লৌকিক কাব্যসমূহে শিবের এই নিশ্চেষ্টতা কেন হইল, তাহা অনায়াসেই বুঝা যাইতে পারে। এদিকে জনসাধারণ "শিবোঽহং" বাক্য উচ্চারণ করিতে কখনও সাহস করে নাই। ভগবানকে পিতৃরূপে এবং মাতৃরূপে তাহারা প্রত্যক্ষ করিতে চায়। বোধ হয় শক্তি-আরাধনা এইজন্য তাহাদিগকে অধিকতর আকর্ষণ করিয়াছিল। ভগবতী মাতৃরূপে শ্রীমন্তকে বা সুন্দরকে মশানে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া বসিয়াছেন, কিংবা বিষহরি-দেবী বেহুলাকে তাঁহার মৃত স্বামী ফিরাইয়া দিতেছেন,—এই সচেষ্ট দয়ার ভাব এবং গুণবত্তার পরিচয় তাঁহাদিগকে নববলসম্পন্ন করিয়াছিল। বিশেষতঃ, যখন মুসলমানগণ প্রত্যক্ষ ঈশ্বরে জলন্ত বিশ্বাসের পরিচয় দিতেছিল, তখন তাহারা নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা লইয়া নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে নাই। মুসলমান-বিজয়ের পর এইজন্য শাক্ত এবং বৈষ্ণবধর্ম্ম বিশেষরূপে পুষ্টিলাভ করিয়াছিল।

এস্থলে বলা উচিত, ভারতচন্দ্র শৈব ও শাক্তের যে কলহ বর্ণনা করিয়াছেন ও দাশরথি যাহার আভাস

পরবর্ত্তী সাহিত্যে বিভিন্ন মতের একতা।

দিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের সময়ের সামগ্রী নহে; তাঁহারা অতীত ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা অঙ্কিত করিয়াছেন মাত্র। ভারতচন্দ্র উক্ত কলহ বর্ণনা করিতে যাইয়া নানা মতের সামঞ্জস্যের চিত্রই অঙ্কিত করিয়াছেন; তদ্দ্বারাই দৃষ্ট হয়, শৈব, শক্তি প্রভৃতি সম্প্রদায় সে সময় পরস্পরের বিরোধ ভুলিয়া সকলেই যে এক পথের পথিক, এই সত্য ধারণা করিতে সমর্থ হইয়াছিল, সুতরাং তাহারা ধর্ম্ম-বিদ্বেষের সীমা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছিল।

শৈব শাক্তের কলহ ভিন্ন এক সম্প্রদায়েও নানারূপ মতভেদ ও তজ্জনিত বিদ্বেষ বর্ত্তমান ছিল।

সাম্প্রদায়িক বিরোধে ভাষার পুষ্টি ও শাস্ত্রচর্চ্চার বহুল বিস্তার।

এখনও এক এক সম্প্রদায় হইতে কতরূপ বিরুদ্ধ-সূত্র প্রচারিত হইয়া ধর্ম্ম-বিশ্বাসের ইতিহাস জটিল করিতেছে। বিদ্বোন্মাদতরঙ্গিণীতে রামোপাসক ও শ্যামোপাসকের দ্বন্দ্ব বর্ণিত আছে, বটতলার কৃত্তিবাসী রামায়ণে সেইরূপ একটি কলহের অল্প মাত্রায় আভাস আছে,—

(৮) "দেখ এই চণ্ডী বিষহরিরে পূজিয়া।
কেনা ঘরে খায় পরে বসনপরিয়া॥ চৈ, ভা, আদি।

এতেক মন্ত্রণা করি বিনতানন্দন।
পাখাতে করিল ঘর অদ্ভুত রচন ॥
ভকতবৎসল রাম তাহার ভিতরে।
দাণ্ডাইলা ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম রূপ ধরে ॥
ধনুক ত্যজিয়া বাঁশী ধরিলেন করে।
হনুমান দেখে তবে ভাবিছে অন্তরে ॥
হনু বলে প্রাণপণে করি প্রভু-হিত।
পক্ষীর সঙ্গেতে এত কিসের পীরিত ॥
দেখিলেন হনুমান মহাযোগে বসি।
ধনু খসাইয়া পক্ষী করে দিল বাঁশী ॥
হনুমান বলে পক্ষী এত অহঙ্কার।
ধনু খসাইয়া বাঁশী দিল আরবার ॥
যদি ভৃত্য হই মন থাকে শ্রীচরণে।
লইব ইহার শোধ তোর বিদ্যমানে ॥
বাঁশী খসাইয়া দিব ধনুঃশর করে।
লইব ইহার শোধ কৃষ্ণ-অবতারে ॥"

কৃত্তিবাসী রামায়ণ, লঙ্কাকাণ্ড।

"ভিক্ষা করি মহাপ্রভু তারে প্রশ্ন কৈল।
কহ বিপ্র এই তোমার কোন্ দশা হৈল ॥
পূর্ব্বে তুমি নিরন্তর লৈতে রামনাম।
এবে কেন নিরন্তর লও কৃষ্ণনাম ॥
বিপ্র বলে এই তোমার দর্শনপ্রভাবে।
তোমা দেখি গেল মোর আজন্ম স্বভাবে ॥
বাল্যাবধি রামনাম গ্রহণ আমার।
তোমা দেখি কৃষ্ণনাম আইল এইবার ॥
সেই হতে কৃষ্ণনাম জিহ্বাগ্রে বসিল।
কৃষ্ণনাম স্ফুরে রামনাম দূরে গেল ॥"

চৈ, চ, মধ্যমখণ্ড, ৯ম পঃ।

এইরূপ বিভিন্ন উপাসকগণ তাঁহাদের মতানুযায়ী শাস্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন ও অনুরূপ গ্রন্থ ভাষায় বিরচিত করিয়া বঙ্গের ঘরে ঘরে ধর্ম্মতত্ত্ব পৌঁছাইতে যত্নপর হইয়াছিলেন। আমরা অগ্নিপুরাণ,

বায়ুপুরাণ, কালিকাপুরাণ, গড়ুর পুরাণ, এইরূপ প্রায় তাবৎ পুরাণেরই অতি প্রাচীন বঙ্গানুবাদ দেখিয়াছি। ধর্ম্মভিন্ন কোন জাতি বড় হয় নাই, ধর্ম্মভিন্ন সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই।

প্রাচীন শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম লইয়া দেশময় ভাবের বন্যা ছুটিল। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মে জীব-হনন ব্যাপার একান্তরূপে নিষিদ্ধ হওয়াতে ভারতবর্ষে যুদ্ধস্পৃহা ক্রমে হ্রাস পাইতে লাগিল। হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়ে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু বৌদ্ধভাব হিন্দুধর্ম্মের একাঙ্গীভূত হইয়া হিন্দুসমাজকে সাংসারিক উন্নতিবিষয়ে নিশ্চেষ্ট ও জিঘাংসাবৃত্তি বিরোধী করিয়া তুলিল। মায়াবাদে একান্তরূপে আশ্রয়পরায়ণ, বিষয়বিমুখ হিন্দুর শিথিল মুষ্টি হইতে পার্থিবসুখসম্ভোগে ব্রতী রণপটু মুসলমানগণ অতি সহজে তাঁহাদের দেশ অধিকার করিয়া লইতে সমর্থ হইল। অবশ্য শেষ সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম * যে আকার ধারণ করিয়াছিল, তাহা উন্মুলিত হওয়াতে ভারতবর্ষকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় নাই, সেই ধর্ম্ম ও ভারতের স্বাধীনতা লুপ্ত হইয়াছে ; কিন্তু গৃহে গৃহে, প্রতি গৃহীর হৃদয়ে হৃদয়ে শ্রীরামচন্দ্র, সীতা ও সাবিত্রী-মূর্ত্তি অঙ্কিত হইল—আমাদের এই লাভ। কৃষ্ণভক্তিতে দেশ

---

* বৌদ্ধধর্ম্ম শেষ সময়ে নাস্তিকতাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। বিদ্বোন্মাদতরঙ্গিণীতে বৌদ্ধদিগের যুক্তি এই প্রকার বর্ণিত আছে ;—

(১) "ন স্বর্গো নৈব জন্মান্তদপি ন নরকো নাপ্যধর্ম্মো ন ধর্ম্মঃ কর্ত্তা নৈবাস্য কশ্চিৎ প্রভবতি জগতো নৈব ভর্ত্তা ন হর্ত্তা। প্রত্যক্ষাণ্যন্নমানং ন সকলফলভুগ্ দেহভিন্নোঽস্তি কশ্চিন্মিথ্যাভূতে সমস্তেঽপ্যনুভবতি জনঃ সর্ব্বমেতদ্বিমোহাৎ।"

অর্থ,—স্বর্গ নাই, জন্মান্তর নাই, নরক নাই, অধর্ম্ম নাই, ধর্ম্ম নাই, এই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা কেহ নাই, সংহারকর্ত্তা নাই, প্রত্যক্ষ ভিন্ন প্রমাণ নাই। দেহ ভিন্ন পাপ পুণ্যাদি সমস্ত কর্ম্মের ফলভোগী কোন আত্মাদি নাই। এই মিথ্যাভূত অখিল সংসারে জীবগণ মোহবশতঃ এই সকল অনুভব করিয়া আসিতেছে।

(২) "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ পাপমাত্মপ্রপীড়নম্
অপরাধীনতা মুক্তিঃ স্বর্গোঽভিলষিতাশনম্॥
স্বদারপরদারেষু যথেচ্ছং বিহরেৎ সদা।
গুরুশিষ্যপ্রণালীঞ্চ ত্যজেৎ স্বহিতমাচরন্॥"

অর্থ,—অহিংসাই পরম ধর্ম্ম, আত্ম পীড়নই পাপ, পরাধীন না হওয়াই মুক্তি, অভিলষিত দ্রব্য ভোজনই স্বর্গ। নিজ পত্নীতে ও পরদারে সততই যথেচ্ছ বিহার করিবে ; আপনার হিতজনক আচরণ করিয়া গুরুশিষ্যপ্রণালী ত্যাগ করিবে।

(৩) "কা সৃষ্টৌ পরিবেদনা যদি পুনঃ পিত্রোরপত্যোদ্ভবঃ।
কুম্ভাস্তাঃ প্রভবন্তি সন্ততমমী তত্তৎকুলালাদিতঃ॥"

অর্থ,—যখন মাতা পিতা হইতে পুত্র উৎপন্ন হইতেছে, আর সেই সেই কুম্ভকারাদি কর্ত্তৃক যখন নিরন্তর ঘটাদি উৎপাদিত হইতেছে, তখন সৃষ্টির জন্য ভাবনা কি আছে। অর্থাৎ সৃষ্টি কিরূপে হয়, তাহাতো চক্ষুর সম্মুখেই দেখিতেছ, একজন পৃথক্ সৃষ্টি-কর্ত্তা স্বীকার করার প্রয়োজন কি ?

ডুবিয়া গেল। বৌদ্ধধর্ম্মের অবসানে নর-হৃদয়ে নবভাব অঙ্কুরিত হইল, তাই আমরা শ্রীচৈতন্যদেবকে পাইয়াছি। আমরা ধর্ম্মজগতে ক্ষতিগ্রস্ত নহি। ভারতবর্ষ অন্যদিকে লাভালাভের গণনা করে না। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে শাস্ত্রের দোহাই ভিন্ন অন্য কথা নাই। পুরুষদিগের ত কথাই নাই, স্ত্রীলোক-গণও প্রতি কথায় শাস্ত্রের নজির দেখাইতেন। ফুল্লরা ছদ্মবেশিনী চণ্ডীকে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য শাস্ত্রীয় প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেছেন (ক, ক, চ), লহনা দ্বেষপরবশ হইয়া খুল্লনাকে স্বামীর গৃহে যাইতে নিষেধ করিলে খুল্লনা কতকগুলি শাস্ত্রের নজির দেখাইয়া সপত্নীর তর্ককুহক দূর করিতেছে। (ক, ক, চ), বিপুলাকে যখন তাঁহার ভ্রাতা স্বামীর শবত্যাগ করিতে বলিতেছে, তখন বিপুলা তদ্-বিরুদ্ধে শাস্ত্রীয় নজিরসহ অকাট্য প্রমাণ দেখাইতেছে (হস্তলিখিত পদ্মপুরাণ) কর্ণসেন যখন রঞ্জাদেবীকে সন্তান না হওয়ার কষ্ট বিস্মৃত হইতে অনুনয় করিতেছেন, তখন তাঁহার স্ত্রী শাস্ত্রের প্রমাণ উদ্ধরণে পরাঙ্মুখ হন নাই (ঘনরাম প্রণীত ধর্ম্মমঙ্গল, ৪র্থ সর্গ)।

এইরূপ অসংখ্য স্থলে দেখা যাইবে, শাস্ত্রচর্চ্চা সমাজের নিম্নতম স্তর, এমন কি, মহিলাগণের মধ্যেও প্রসারিত হইয়াছিল। নিরক্ষর কালকেতু ব্যাধ কংসনদের জলপান করিয়া দুঃখভারাক্রান্ত-হৃদয়ে ভাগবতের কথা উল্লেখ করিতেছে, উহা কবির অস্বাভাবিক বর্ণনা হয় নাই। প্রাচীন সামাজিক জীবনের ভিত্তিভূমি শাস্ত্র, এবং প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের ভিত্তিভূমি সংস্কৃত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

কিন্তু ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম পূর্ব্বের ন্যায় সর্ব্বত্রই ব্রাহ্মণকে শীর্ষস্থানে স্থাপন করিয়া উত্থিত হয় নাই। যদিও

পুনরুত্থানের ব্রাহ্মণেতর জাতির উন্নতি।

ভাষাগ্রন্থগুলিতে অজস্র ব্রাহ্মণ-স্তব দৃষ্ট হয়* যাঁহারা নব হিন্দুধর্ম্মের নেতা হইলেন, তাঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন না। কবীর জোলাজাতি,

---

* "যাঁর ক্রোধে যদুকুল হইল নির্ব্বংশ।
যাঁর ক্রোধে নষ্ট হয় সগরের বংশ॥
যাঁর ক্রোধে কলঙ্কী হইল কলানিধি।
যাঁর ক্রোধে লবণ হইল সলিলধি॥
যাঁর ক্রোধে অনল হইল সর্ব্বভক্ষ।
যাঁর ক্রোধে ভগাঙ্গ হইল সহস্রাক্ষ।" কাশীদাস।

ব্রাহ্মণের ক্রোধ এইরূপ!

পরীক্ষিৎ রাজা বলিতেছেন ;—

"এই পোকা তক্ষক হউক এইক্ষণ।
দংশুক আমারে রহুক ব্রাহ্মণ-বচন॥"

ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তি এতদূর।

রাইদাস চর্ম্মকার, দাদূপন্থীপ্রবর্ত্তক প্রসিদ্ধ দাদূ ধুনরী, পীপা রাজপুত, ধনা জাট এবং সেনপন্থীপ্রবর্ত্তক সেন * নাপিত ও তুকারাম শূদ্র ছিলেন। চৈতন্য সম্প্রদায়ের অধিকাংশই ব্রাহ্মণেতর এবং তন্মধ্যে কেহ কেহ নিকৃষ্ট জাতীয় ছিলেন। † ব্রাহ্মণের ব্রহ্মনিষ্ঠা সমস্ত হিন্দুজাতি হরণ করিয়া লইয়াছিল, তাই চর্ম্মকারও ধর্ম্ম-নেতা বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। প্রবাদ এই, মিস্ প্যারিঙ্টন্ স্বীয় কুটীরের দিকে আটলাণ্টিক মহাসাগরকে অগ্রসর দেখিয়া সম্মার্জ্জনী হস্তে তাহার গতি রোধ করিতে দাঁড়াইয়াছিলেন, সেইরূপ সমাজের গোঁড়াগণও এই ধর্ম্মপ্রবাহে সর্ব্বশ্রেণীর মধ্যে শাস্ত্রজ্ঞান-বিস্তারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহারা শাস্ত্রানুবাদকারীদিগকে গালি দিয়া বলিয়াছিলেন,—"কৃত্তিবেসে, কাশীদেসে, আর বামুন ঘেঁষে, এই তিন সর্ব্বনেশে"," ‡ এবং সংস্কৃতে এই ভাবসূচক শ্লোক রচনা করিয়া ভাষা-সাহিত্য-অঙ্কুরে নষ্ট করিতে চেষ্টিত ছিলেন, "অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানি চ। ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।" কিন্তু তথাপি এই শাস্ত্রানুবাদ ও শিক্ষার স্রোত প্রতিরুদ্ধ হয় নাই।

রাজসভার বঙ্গভাষার আদর।

পূর্ব্বে এক অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, এই সমস্ত প্রাচীন কাব্যের প্রায় সমস্তই গানের পালা ছিল। বঙ্গের বৈভবশালী ব্যক্তিগণ এই সব গানের আদর করিতেন; প্রত্যেক রাজসভাতেই সভা-কবি নিযুক্ত থাকিতেন; তিনি স্বীয় পৃষ্ঠপোষক উৎসাহ-দাতার ধর্ম্মবিশ্বাসানুকূল কাব্য রচনা করিতেন। আমরা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে দেখাইতে চেষ্টা করিব, গৌড়েশ্বরগণ বঙ্গসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধনার্থ অনুবাদ-গ্রন্থগুলি প্রণয়নে শাস্ত্রজ্ঞ কবিদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। চণ্ডীকাব্য, অন্নদামঙ্গল ও শিবসংকীর্ত্তন-রচকগণও তদ্রূপ উৎসাহ লাভ করিয়াই কাব্যরচনায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

কিন্তু স্ববিক্রমে যাহা দাঁড়ায়, তাহার তুলনা নাই। বিষহরি ও চণ্ডীপূজার ন্যায় বৈষ্ণবগণের

---

* সেন পূর্ব্বে বন্ধগড়ের (গন্দোয়ানার অন্তঃপাতী) রাজাদিগের কুলনাপিত ছিলেন। শেষে ধর্ম্মজগতে তাঁহার প্রতিপত্তি এতদূর বৃদ্ধি হয় যে, তিনি ও তাঁহার পুত্রপৌত্রাদি সন্তানেরা উক্ত রাজবংশের কুলগুরু হইয়া অতিশয় খ্যাতি ও প্রভুত্ব লাভ করিয়াছিলেন —তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, দ্বিতীয় ভাগ, ৭৫ সংখ্যা, ১৭৭০ শক, ১৭৯ পৃষ্ঠা দেখ।

† প্রসিদ্ধ 'কড়চা' লেখক (পদকর্ত্তা নহেন) গোবিন্দ দাস কামার ছিলেন।

"বর্দ্ধমান কাঞ্চননগরে মোর ধাম ॥
শ্যামদাস পিতৃনাম, গোবিন্দ মোর নাম ॥
অস্ত্র হাতা বেড়ি গড়ি জাতিতে কামার।
মাধবী নামেতে হয় জননী আমার ॥"—কড়চা।

‡ Mahamahopadhyaya Hara Prosad Shastri's pamphlet on Old Bengali Literature, P. 13.

কীর্ত্তন ও ভজন অর্থপ্রদ কি সম্মানাস্পদ ছিল না। (১) নিম্ন শ্রেণীর সমাজই নবভাবের প্রশস্ত কার্য্যক্ষেত্র। যে ভট্টাচার্য্যের দল রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহাদেরই পূর্ব্বপুরুষগণ চৈতন্যপ্রভুর প্রবর্ত্তিত নবধর্ম্মের প্রতিকূলে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন! চণ্ডীদাস জীবনে সৌভাগ্যশালী ছিলেন না, ঢক্কানাদে তাঁহার কলঙ্ক প্রচারিত হইয়াছিল এবং তিনি সমাজচ্যুত হইয়াছিলেন। (২) মহাপ্রভুর অনুচরগণও নানারূপ উৎপীড়ন ও নিন্দা সহ্য করিয়াছিলেন, (৩) তথাপি তাঁহারাই প্রকৃতরূপে বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিয়াছেন। সংস্কৃতের দাসত্ব হেতু বঙ্গসাহিত্য মুকুল-অবস্থায়ই শুষ্ক হইত, ইহার পৃথক্ অস্তিত্ব থাকিত না; কিন্তু বৈষ্ণবগণ ইহার ভিত্তি দৃঢ় করিয়া সজীব করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত বঙ্গভাষা

বৈষ্ণবগণের শ্রেষ্ঠত্ব।

---

(১) চৈতন্য শ্রীধরকে প্রভু বলিতেছেন,—

"লক্ষ্মীকান্ত সেবন করিয়া কেন তুমি।
অন্ন বস্ত্রে দুঃখ পাও কহ দেখি শুনি॥"

এবং লাভজনক বিষহরি ও চণ্ডীপূজা অবলম্বনের উপদেশ দিতেছেন।—চৈ, ভা আদি।

(২) "দুঃখের কথা কৈতে গেলে প্রাণ কাঁদি উঠে।
মুখ ফুটে বল্‌তে নারি মরি বুক ফেটে॥
ঢাক পিটিয়ে অপবাদ গ্রামে গ্রামে দেয় হে।
চক্ষে না দেখিয়ে মিছে কলঙ্ক রটায় হে॥"

বিষ্ণুপ্রিয়া-পত্রিকা, ৪০৬ গৌরাঙ্গাব্দ, ১৬ই মাঘ।

(৩) "কেহ বলে এগুলার হইল কি বাই।
কেহ বলে রাত্রে নিদ্রা যাইতে না পাই॥
কেহ বলে গোসাঞি রুষিবে এই ডাকে।
এগুলার সর্ব্বনাশ হৈবে এই পাকে॥
কেহ বলে জ্ঞানযোগ এড়িয়া বিচার।
পরম ঊদ্ধত'পানা কোন ব্যবহার॥
মনে মনে বলিবে কি পুণ্য নাহি হয়।
বড় করি ডাকিলে কি পুণ্য উপজয়॥"

ভট্টাচার্য্যগণ সর্ব্বদাই চৈতন্যপ্রভুকে বিদ্বেষ করিতেন; তাঁহারা পণ্ডিত হইয়াও প্রভুর মাহাত্ম্য বুঝিতে পারেন নাই, বৃন্দাবন দাস তাই আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন;—

"মুরারি গুপ্তের দাস যে প্রসাদ পাইল।
সেই নদীয়ার ভট্টাচার্য্য না দেখিল॥—" চৈ. ভা, মধ্যমখণ্ড।

শিক্ষাভিমানীর উপেক্ষার বস্তু ছিল। কিন্তু যে দিন (১৫৩৭ শকে) সংস্কৃতভাষায় অসাধারণ পণ্ডিত, অশীতিপর বৃদ্ধ কৃষ্ণদাস কবিরাজ নয় বৎসরের চেষ্টায় চৈতন্যচরিতামৃতের ন্যায় অপূর্ব্ব দর্শনাত্মক ইতিহাস রচনা করেন, সেই দিন বঙ্গভাষার এক যুগ। আবার যে দিন শ্রীনিবাস আচার্য্যের পৌত্র রাধামোহন ঠাকুর বাঙ্গালা 'পদামৃতসমুদ্রের' সংস্কৃত টীকা প্রণয়ন করেন, বঙ্গভাষার সেই আর-এক যুগ। দেবভাষা বঙ্গভাষার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন, ইহা হইতে সেই যুগে এভাষার আর অধিক গৌরবের কথা কি হইতে পারিত?

২। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ লক্ষণ।

ইংরেজী ও বাঙ্গলা সাহিত্য।

যাঁহারা টেন, ডাউডন পড়িয়া বঙ্গভাষার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহারা একটি বিষয় মনে রাখিবেন; বিলাতী লিলি আর দেশী পদ্মে, জেসিমাইন আর জুঁইএ একটা প্রভেদ আছে; ইংরেজী ও বাঙ্গালী চরিত্রে সেইরূপ একটা প্রভেদ আছে, জাতীয় সাহিত্যেও সেই প্রভেদের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে।

চৈতন্যপ্রভুকে শাস্ত্রের বচন দ্বারা পরাভূত করিবার আশায়, এই মহাত্মাগণ তন্ত্ররত্নাকরে কতকগুলি শ্লোক যোজনা করিয়া দিয়াছিলেন। তাহাতে আছে "বটুক ভৈরব একদা ভগবান্ গণদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ত্রিপুরাসুর হত হইলে, তাহার আসুর তেজ নষ্ট হইয়াছিল, কি কোনরূপে বিদ্যমান ছিল?"

গণদেব উত্তর করিলেন,—

"স এব ত্রিপুরোদৈত্যো নিহতঃ শূলপাণিনা।
কৃপয়া পরয়াবিষ্ট আত্মানমকরোত্রিধা
শিবধর্ম্মবিনাশায় লোকানাং মোহহেতবে।
হিংসার্থং শিবভক্তানামুপায়ান সৃজন্নহন॥
অংশেনাত্মেন গৌরাখ্যঃ শচীগর্ভে বভূব সঃ।
নিত্যানন্দোদ্বিতীয়েন প্রাদুরাসীন্মহাবলঃ॥
অদ্বৈতাখ্যস্তৃতীয়েন ভাগেন দনুজাধিপঃ।
প্রাপ্তে কলিযুগে ঘোরে বিজহার মহীতলে॥
ততো দুরাত্মা ত্রিপুরঃ শরীরৈস্ত্রিভিরাসুরৈঃ।
উপপ্লবায় লোকানাং নারীভাবমুপাদিশৎ॥"

ইহার সারার্থ এই, "ত্রিপুরাসুর মহাদেবের দ্বারা নিহত হইয়া শিবধর্ম্মনাশের জন্য গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত এই তিনরূপে আবির্ভূত হইলেন, পরে নারীভাবে ভজনের উপদেশ দিয়া লোকসমূহকে মোহভাবে বশীভূত করিলেন।" ইহার পর এই ভাবের আরও অনেক নিন্দাবাদ আছে।

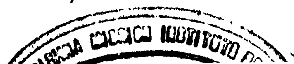
ইংরেজী কবি চসার যে গীতি গাহিয়াছেন, স্পেন্সার তাহা স্পর্শ করেন নাই; আবার ক্যাণ্টার-বারিটেলস্ কি ফেয়ারিকুইনের সৌন্দর্য্যের ছায়াপাত প্যারাডাইস্‌লষ্টে লক্ষিত হয় না। এইরূপে জন ওয়েবেষ্টার, ফোর্ড, বেনজনসন, চ্যাটারটন্, স্কট, শেলি প্রভৃতি কবিগণ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আদর্শে কাব্য রচনা করিয়াছেন; একজনের রাগিণীর সঙ্গে অন্যের রাগিণী জড়িত হইয়া যায় নাই। উদীয়মান স্বাধীন জাতির ব্যক্তিগত স্বাবলম্বন একটি বিশেষ লক্ষণ।

ইংরেজ কবির স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা।

কিন্তু বাঙ্গালী কবিগণ পূর্ব্ববর্ত্তী কোন কবির পথ না দেখিয়া প্রায়ই অগ্রসর হয়েন নাই। অনুবাদ-গ্রন্থের আদি লেখক কৃত্তিবাস, সঞ্জয় কি মালাধর বসু হইতে পারেন, কিন্তু মৌলিক গ্রন্থগুলির তাবৎই পূর্ব্ববর্ত্তী কবির চেষ্টার পরে পুনশ্চ সেই চেষ্টার বিকাশ। আদি-কবি বলিয়া কাহাকেও নিশ্চিতরূপে চিহ্নিত করা যায় না; এক কবির পূর্ব্বে আর এক কবি, তৎপূর্ব্বে অন্য এক জন, এই ভাবে একই কাব্যের রচনায় যুগ-ব্যাপী চেষ্টার বিকাশ দেখা যায়। আদি-কবি একজন মানিয়া লইলেও তিনি কল্পনাবলে গল্পের উৎপত্তি করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না, সম্ভবতঃ তিনি লোক পরম্পরা-শ্রুত আখ্যানটি গীতে পরিণত করিয়াছেন। চণ্ডীকাব্যের আদি-লেখক কে, আমরা জানি না। চৈতন্যভাগবতকার মঙ্গলচণ্ডীর গীতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন; আমরা দ্বিজ জনার্দ্দন নামক কবির অতি প্রাচীন এবং সংক্ষিপ্ত চণ্ডীর উপাখ্যান পাইয়াছি। বোধ হয় এইরূপ কোন মাল মসলা লইয়া মাধবাচার্য্য কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, মাধবাচার্য্যের উদ্যম মুকুন্দরাম পূর্ণ করিয়াছেন। তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের তপস্যার বলে নিজে অমর বর লাভ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের যশঃ হরণ করিয়াছেন। কবিকঙ্কণের পর লালা জয়নারায়ণ আবার সেই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। আমরা কাণা হরিদত্ত, নারায়ণদেব বিজয়গুপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়া শতাধিক মনসাদেবীর গীতি-লেখক পাইয়াছি। সর্ব্বপ্রথম বিদ্যাসুন্দর বাঙ্গালায় রচনা করেন কবি কঙ্ক, তিনি চৈতন্যপ্রভুর সমকালবর্ত্তী। তৎপর কৃষ্ণরাম বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন, পরে রামপ্রসাদ এবং তাঁহার পরে ভারতচন্দ্র সেই উপাখ্যানটি উৎকৃষ্ট কাব্যে পরিণত করেন। ভারতচন্দ্রের পর প্রাণরাম নামক এক কবি তাঁহার দৃঢ় যশের দুর্গ বিজয় করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি প্রতিমা গড়িতে পারেন নাই, ভেক গড়িয়াছিলেন।

বাঙ্গালী কবির অনুকরণ-প্রিয়তা ও তদ্দৃষ্টান্ত।

দক্ষিণরায়ের উপাখ্যানের প্রথম কবি মাধবাচার্য্য, দ্বিতীয় কবি নিমতানিবাসী কৃষ্ণরাম। মৃগলুব্ধ রতিদেব দ্বারা বিরচিত হওয়ার পর, পুনশ্চ রঘুরাম রায় কবি সেই প্রসঙ্গে কাব্য রচনা করেন। ধর্ম্ম-মঙ্গলের কবি অনেক পাওয়া যাইতেছে, যথা,—ময়ূর ভট্ট, মাণিক গাঙ্গুলী, সহদেব চক্রবর্ত্তী খেলারাম, রূপরাম, ঘনরাম, শ্যামপণ্ডিত প্রভৃতি। অনুবাদ গ্রন্থগুলিতেও এইরূপ বিবিধ হস্তের ক্রিয়া দৃষ্ট হয়। সঞ্জয়ের পর কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকরনন্দী, নিত্যানন্দ ঘোষ ও পরে কাশীদাস প্রভৃতি আরও বিবিধ



কবি মহাভারতের অনুবাদ প্রণয়ন করেন। রামায়ণের কবি অসংখ্য, কিন্তু কৃত্তিবাসের আদি-গৌরব কেহই বিনষ্ট করিতে পারেন নাই। গুণরাজ খাঁর পথ অনুসরণ করিয়া মাধবাচার্য্য ও লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস প্রভৃতি অনেক কবিই ভাগবতের অনুবাদ রচনা করেন! এইরূপ সমস্ত কবির নাম উল্লেখ করিতে গেলে বঙ্গীয় প্রায় সমুদায় প্রাচীন কবির কথাই বলিতে হয়। পরবর্ত্তী কবি প্রায় সব স্থলেই পূর্ব্ববর্ত্তী কবির রচনার খুঁৎ বাহির করিয়া কাব্য রচনা আরম্ভ করেন। আমরা 'ভেলুয়া সুন্দরী' কাব্য ও কৃষ্ণরামের 'রায়মঙ্গলে' ভূমিকা হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া উদাহরণ দেখাইতেছি,—

"পুস্তকের কথা এই কর অবগতি।
যেরূপে রচিল এই ভেলুয়ার পুঁথি॥
ভগ্নীসুত নাম এক তজম্মুল আলি।
আছিল আমার যেন সবাকারে বলি॥
অল্পবুদ্ধি শিশু-মতি ছিল শিশুজ্ঞান।
না ছিল পণ্ডিত গুণী না ছিল বিদ্বান॥
লোকমুখে ভেলুয়ার গীত কথা শুনি।
রচিল পুস্তক প্রায় সেই সে কাহিনী॥
আপনার শিশুবুদ্ধি শক্তি যত ছিল।
অল্পমাত্র সেইরূপে পুস্তক রচিল॥
না ছিল পুস্তকে সেই পদের মিলন।
ভাটের কাহিনীরূপে আছিল গাঁথন॥
... ...
একদিন আছি আমি বসি নিজ স্থান।
হেনকালে বন্ধুগণ আসি বিদ্যমান॥
কহিল আমাকে সবে করিয়া মান্যতা।
ভেলুয়ার খণ্ডকাব্য রচিবার কথা॥
আদি অন্ত ভেলুয়ার যতেক কাহিনী।
বিরচিয়া কহ' মিত্র আমি সব শুনি॥
গীতরূপে গায় সবে শুনিতে দুষ্কর।
না হয় সংযুক্ত কথা না মিলে অক্ষর॥
আর যে রচিল খণ্ড অল্প বাক্য তার।
স্পষ্টরূপে নাই তাতে সমস্ত প্রচার॥
... ...

অলঙ্ঘ্য তা সব বাক্য ধরি আমি শিরে।
'ভেলুয়া' নামেতে এই রচিল পুস্তক।"——
হামিদুল্লা প্রণীত "ভেলুয়া সুন্দরী।"

"শুনহ সকল লোক অপূর্ব্ব কথন।
যেমতে হইল এই কবিতা রচন॥
খাসপুর পরগণা নাম মনোহর।
বড়িস্যা তথায় একতপ্পা বিশ্বাশ্বর॥
তথায় গেলাম ভাদ্রমাস সোমবারে।
নিশিতে শুইলাম গোয়ালের গোলাঘরে॥
রজনীর শেষে এই দেখিলাম স্বপন।
বাঘ পীঠে আরোহণ এক মহাজন॥
করে ধনুঃশর চারু সেই মহাকায়।
পরিচয় দিল মোরে দক্ষিণের রায়॥
পাঁচালী প্রবন্ধে কর মঙ্গল আমার।
আঠার ভাটীর মধ্যে হইবে প্রচার॥
পূর্ব্বেতে করিল গীত মাধব আচার্য্য।
না লাগে আমার মনে, তাহে নাহি কার্য্য॥
চাষা ভুলাইয়া সেই গীত হইল ভাষা।
মসান নাহিক তাহে, সাধু খেলে পাশা।"
কৃষ্ণরাম প্রণীত "রায় মঙ্গল"।

মনসামঙ্গল লেখক বিজয়গুপ্ত ও উক্ত মঙ্গল লেখকগণের অগ্রবর্ত্তী কাণা হরিদত্তের গানের অনেক দোষের উল্লেখ করিয়া স্বীয় কাব্যরচনার সমর্থন করিয়াছেন।

এই পুচ্ছগ্রাহিতা বাঙ্গালার জাতীয় জীবনের সূত্র। নূতন পথে লেখনী প্রবর্ত্তিত করিবার অধিকার আছে, প্রাচীন কবিগণ, বোধ হয়, একথা স্বীকার করিতেন না। তাই তাঁহার কল্পনার পুষ্পকরথারোহী হইয়া মেঘ হইতে নূতন নূতন হাঁড়ি কি ডোনা কুলিয়া সংগ্রহ করিয়া বেড়ান নাই। ধর্ম্মের বন্ধনীর মধ্যে আবদ্ধগতি কল্পনা অন্য জগতের পুষ্পপল্লব লক্ষ্যে ধাবিত হইতে পারে নাই। একথা প্রশংসনীয় হউক, কিন্তু যখন বিদ্যাসুন্দরের মত কাব্যকেও বিল্বপত্র ও তুলসীদল দ্বারা শোধন করিয়া লওয়ার চেষ্টা দেখিতে পাই, তখন ধর্ম্মের গণ্ডী অনেকদূর প্রসারিত হইয়াছিল, একথা অবশ্যই মানিতে হইবে।

বাঙ্গালা প্রাচীন কাব্যের এখনও ভালরূপ খোঁজ হয় নাই। আমরা যাঁহাদিগকে আদিকবির যশোমাল্য দিতেছি, তাঁহারাই আদি কি না, ঠিক বলা যায় না, ইহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। প্রত্নতত্ত্ববিৎগণের দ্বারা এই প্রাচীন ক্ষেত্র আবাদ হইলে তাঁহাদের চেষ্টা ও গবেষণার হলাগ্রভাগে নূতন কবির কঙ্কাল প্রকাশ পাওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র হইবে না।

কাব্যের অংশ রচনায় অনুকরণ-বাহুল্য।

বড় নদীতে যে নিয়ম, ক্ষুদ্র জল-রেখায়ও তাহাই; সৌর-জগতে যে নিয়ম, গৃহশীর্ষস্থ অলাবুলতার চক্রের সেই নিয়ম দৃষ্ট হয়; কেবল বড় বড় কাব্যগুলিতে নহে, কাব্যের অংশগুলিতেও সেই অনুকরণবৃত্তির পরিচয় লক্ষিত হয়। একটি উৎকৃষ্ট ভাব পাইয়া কবিকে প্রশংসা করার পথ নাই, কোন্ কবি সেই ভাবের আদিপ্রণেতা, সে প্রশ্ন সহজে মীমাংসিত হইবার নহে। আমরা প্রতি চণ্ডীকাব্যের ফুল্লরা ও খুল্লনার 'বারমাস্যা' পাইয়াছি। এতদ্ব্যতীত বিজয়গুপ্তের 'পদ্মপুরাণে' পদ্মাবতীর 'বারমাস্যা', পদকল্পতরুতে বিষ্ণুপ্রিয়ার 'বারমাস্যা' (১৭৮৩ পদ), বিদ্যাসুন্দরগুলিতে বিদ্যার 'বারমাস্যা', সৈয়দ আলওয়াল কবির পদ্মাবতীতে নাগমতীর 'বারমাস্যা', "মুরারি ওঝার নাতি" শ্রীধর প্রণীত রাধার 'বারামাস্যা', সেখ কমরালী বিরচিত রাধার 'বারমাস্যা', সেক জালাল প্রণীত সখীর 'বারমাস্যা' * এইরূপ রাশি রাশি 'বারমাস্যার' সঙ্গে প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের ঘাটে পথে সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছি। যেখানে একটী সুন্দর ভাব পাওয়া গিয়াছে, তৎপরেই উহা উপর্য্যুপরি কবিগণের চেষ্টায় তন্তুসার হইয়াছে। কবিবল্লভের "না পুড়িও মোর অঙ্গ না ভাসাও জলে। মরিলে রাখিও বাঁধি তমালের ডালে॥ কবহুঁ সে পিয়া যদি আসে বৃন্দাবনে। পরাণ পারব হাম পিয়া দরশনে॥" এই কবিতার ভাবটি রাধামোহন ঠাকুর,—"এ সখি কর তহু পর উপকার। ইহ বৃন্দাবনে দেহ উপেখব, মৃত তনু রখেবি হামার। কবহুঁ শ্যাম তনু পরিমল পাওব, তবহুঁ মনোরথ পুর।" (পদকল্পতরু, ৪৬ পদ) যদুনন্দন দাস,—"উত্তর কালে এক করিহ সহায়। এই বৃন্দাবনে যেন মোর তনু রয়। তমালের কাঁধে মোর ভুজলতা দিয়া। নিশ্চয় করিযা তুমি রাখিও বাঁধিয়া॥ কৃষ্ণ কভু দেখিলেই পুরিবেক আশ।" (পদকল্পতরু ১৮৬ পদ) নরহরি,—"করিহ উত্তরকালে ক্রিয়া। রাখিহ তমালে তনু যতনে বাঁধিয়া। লেহ এ ললিতা মণিহার। অনুখণ গলায় পরিহ আপনার। রপিনু মল্লিকা নিজ করে। গাঁথিয়া ফুলের মালা পরাইহ তারে॥ তোমরা কুশলে সব রৈয়ো। এই বনে বারেক আসিতে তারে কৈয়ো॥ নরহরি কৈয়ো এই কাম। সে সময় কাণে শুনাইও তার নাম।" (সাহিত্যপত্রিকা ৩য় ভাগ, ষষ্ঠ সংখ্যা, ১২৯৯)" কৃষ্ণকমল,—"দেহ দাহন ক'র না দহন দাহে। ভাসা'ওনা তাহা যমুনা প্রবাহে। আমার শ্যামবিরহে পোড়া তনু, আমার শ্রীকৃষ্ণ-বিলাসের দেহ—সব সহচরী, দুটি বাহু ধরি, বাঁধিও তমালের ডালে। যদি এই বৃন্দাবন স্মরণ করি, আসে গো আমার প্রাণের হরি, বঁধুর শ্রীঅঙ্গসমীর পরশে শরীর জুড়াইব সেই কালে।" কবিশেখর,—"কহিও কানুরে সই কহিও কানুরে,

* শেষোক্ত তিনটি "বারমাস্যা" বঙ্গসাহিত্যে প্রথিতনামা শ্রীযুক্ত আব্দুল করিম সাহেবের নিকট সংগৃহীত আছে।

একবার পিয়া যেন আইসে ব্রজপুরে। নিকুঞ্জে রাখিনু এই মোর হিয়ার হার, পিয়া যেন গলায় পরয়ে একবার।" (প, ক, ত, ১৬৭৯ পদ, সতীশ বাবুর সংস্করণ, ১২১৪ পৃষ্ঠা।) অজ্ঞাত আর একজন কবি,—"সখি প্রাণ যদি দেহ ছাড়ে, না দহ বহ্নিতে মোরে, ভাসায়ো না যমুনা সলিলে। তুলসীদাম বিছাইয়ে, চন্দন তাহে লেপিয়ে, লিখিয়ো তাহায় হরির নাম; বাঁধিয়া রেখো সখি তমালের ডালে" (সাহিত্য", মাঘ, ১৩০২, ৬০৬ পৃষ্ঠা।) এবং ত্রিপুরার প্রাচীন এক কবি,—'আমি ম'লে এই করিও, না পোড়ায়ো না ভাসায়ো" ইত্যাদি পদে নকল করিয়াছেন। জয়দেবের,—"হৃদি বিসলতা হারো নায়ং ভুজঙ্গম নায়কঃ।" ইত্যাদি শ্লোক হইতে বিদ্যাপতি,—"হাম নহু শঙ্কর হু বরনারী," ও বামবসু "হর নই হে আমি যুবতী। কেনে জ্বালাতে এলে রতিপতি॥ করো না আমার দুর্গতি। বিচ্ছেদে লাবণ্য হয়েছে বিবর্ণ, ধরেছি শঙ্করের আকৃতি॥ ক্ষীণ দেখে অঙ্গ, আজ অনঙ্গ, একি রঙ্গ হে তোমার। হর ভ্রমে শরাঘাত, কেন করিতেছ বার বার॥ ছিন্ন ভিন্ন বেশ, দেখে কও মহেশ, চেননা পুরুষ প্রকৃতি। কণ্ঠে কালকূট নহে, দেখ পরেছি নীলরতন। অরুণ লোচন, ক'রে পতি বিরহে রোদন। এ অঙ্গ আমার, ধূলায় ধূসর, মাখি নাই বিভূতি।" (বিদ্যাপতি, ৺জগবন্ধু ভদ্রের সংস্করণ, ১৫৫—১৫৬ পৃঃ।) গানের ভাব অনুকরণ করিয়াছেন। অপর একটি সংস্কৃত শ্লোক হইতে কবি-শেখর,—'নিজ কর পল্লব দেহ না পরশই শঙ্কিত পঙ্কজ ভানে। মুকুরতলে নিজ মুখ হেরি সুন্দরী শশী বলি হেরই গগনে॥" (পদকল্পতরু, ১৮৭১ পদ) চুরি করিয়াছেন; চোরের উপর বাটপাড় কৃষ্ণকমল উহা হইতে "প্যারি হেরি নিজ ঝরে, নখর নিকরে, ভেবে শশী করে আবরণ করে" (দিব্যোন্মাদ) ইত্যাদি গানটি প্রস্তুত করিয়াছেন। চণ্ডীদাসের—"এখন কোকিল আসিয়া করুক গান, ভ্রমর ধরুক তাহার তান, মলয় পবন বহুক মন্দ গগনে উদয় হউক চন্দ।" (রমণীমোহন মল্লিকের সংস্করণ, ২২২।) পৃষ্ঠা পরে বিদ্যাপতির "সোহি কোকিল অব লাখ ডাকউ, লাখ উদয় কক চন্দা। পাঁচবাণ অব লাখ বাণ হউ, মলয় পবন বহু মন্দা॥" এবং পরে মাধবাচার্য্যের চণ্ডীতে—"আজি মোর মন্দিরে আওবে কালা, কি করিবে চাঁদ পবন অলি কোকিলা। (মা, চ ২৪৬ পৃঃ) প্রভৃতি পাওয়া যাইতেছে। ইহা ইংরেজীর Parallel passage অর্থাৎ অনুরূপ রচনা নহে, ইহা সাহিত্যের ঘরে দিন-দুপরে ডাকাতি।

আমরা এই প্রবন্ধাংশে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, কতকগুলি ধর্ম্মপ্রসঙ্গের সীমাবন্ধনীতে বঙ্গীয় কবিগণের প্রতিভা আবদ্ধ ছিল। যে পর্য্যন্ত কোন একখানি কাব্যের সম্পূর্ণ বিকাশ না হইয়াছে, সে পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন যুগের কবিগণ ক্রমান্বয়ে চেষ্টা করিয়া তাহা প্রস্ফুট করিয়াছেন। সম্পূর্ণ কাব্য এবং কাব্যান্তর্গত বিচ্ছিন্ন ভাবরাশি উভয়ই এইরূপ ক্রমে ক্রমে বিকাশ পাইয়াছে। কিন্তু বিকাশই সর্ব্বত্র প্রকৃতির নিয়ম নহে। উদ্যানের কতকগুলি ফুল ফোটে, আবার কোন কোনটি কোরকেই শুষ্ক হয়। সেইরূপ কবিকঙ্কণ চণ্ডী, কেতকা দাস ও ক্ষেমানন্দের মনসার ভাসান, ঘনরামের শ্রীধর্ম্মমঙ্গল প্রভৃতি সম্পূর্ণ কাব্যগুলির পার্শ্বে সত্যনারায়ণের পাঁচালী, শনির পাঁচালী, ধান্য পূর্ণিমা, ব্রতগীতি প্রভৃতি অসংখ্য খণ্ডকাব্য দৃষ্ট হয়, সে গুলিতে উদ্গম আছে, বিকাশ নাই। আকরে খাঁটি স্বর্ণের পার্শ্বে, ঈষৎস্বর্ণে পরিণত ধাতুখণ্ড যেরূপ দেখায়, চণ্ডীকাব্য, পদ্মপুরাণ প্রভৃতির পার্শ্বে এইগুলি সেইরূপ দেখায়।

কাব্যগুলির সম্পর্কে এই অনুকরণবৃত্তি নিন্দনীয় কি প্রশংসনীয় ঠিক বলিতে পারি না। তবে বোধ হয় ক্রমে ক্রমে গঠিত প্রাচীন বঙ্গীয় প্রত্যেক কাব্যেই নিপুণতা ও অভিনিবেশযুক্ত সৌন্দর্য্য অধিক লক্ষিত হয়। দোষ এই, এই সকল কাব্যে স্বাধীনতার বায়ু বহে নাই, কল্পনার উন্মাদকর স্বপ্ন কিম্বা উদ্দাম ও সহজ স্ফূর্ত্তিময়ী চিন্তার আবেশ নাই। কাব্যগুলির প্রায় সমস্ত পুরুষচরিত্রই সমাজের কঠিন নিয়মের বশবর্ত্তী, বিপদের সময় স্বীয় চেষ্টা ব্যবহারে অনিচ্ছুক—অলৌকিক দৈব-শক্তির উপর অনুচিত বিশ্বাসপরায়ণ। যে জাতির শাসনে দাসত্ব, চিন্তায় দাসত্ব, সমাজে দাসত্ব, তাহাদের সাহিত্যে অন্যরূপ হইবে কেন? আমরা যাহা, তাহা ভুলিব কিরূপে? স্বপ্রকৃতি হইতে তাহা মুছিয়া ফেলিব কিরূপে?

অনুকরণের দোষ ও গুণ।

কিন্তু সদ্যঃ প্রস্ফুটিত পুষ্পবাসের ন্যায় বৈষ্ণব-গীতি-রাশি, একটি স্বাধীন মুগ্ধকর ভাব-জাত। সেই ভাবের নাম প্রেম। 'লম্বোদর', 'নাভি সুগভীর', ও 'আজানুলম্বিত বাহু'র ন্যায় রাশি রাশি সংস্কৃতের আবর্জ্জনা বঙ্গসাহিত্য কলুষিত করিয়াছিল। সদ্যোজাত এই ভাবটি অপ্রকৃত উপমা রাশির স্থলে "শীতের ওঢ়নী পিয়া, গিরিষীর বা, বরষার ছত্র পিয়া, দরিয়ার না।" (বিদ্যাপতি) প্রভৃতি পরিচিত তুলনামূলক কথা জাগাইয়া দিল। জয়দেব শ্রীহরিকে দিয়া যে দিন "দেহিপদপল্লবমুদারং" গাওয়াইয়াছিলেন, সেদিন সমাজ-সংস্কারে প্রাণ-হারা যন্ত্র-প্রায় মানুষ দাঁতে জিভ কাটিয়া একটি দৈবঘটনা দ্বারা তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছিল; কিন্তু বলরাম দাস যে দিন "নিদঁ যায় চাঁদবদন শ্যাম অঙ্গে দিয়া পা" (পদকল্পতরু ১১০০ পদ) ও কৃষ্ণকমল "অতুল রাতুল কিবা চরণ দুখানি, আল্‌তা পরাত বঁধু কতই বাখানি" (দিব্যোন্মাদ) রচনা করিয়াছিলেন, সেদিন আর ব্যাখ্যার প্রয়োজন ছিল না। জাতীয় জীবনে প্রেম ফিরিয়া আসিয়াছিল। তাই বলিতেছিলাম, এই অধীনত্ব-গন্ধী প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে বৈষ্ণব-পদে স্বাধীনতার বায়ু খেলা করিতেছে।

বৈষ্ণবগীতির স্বাধীনভাব।

সম্প্রতি পূর্ব্ববঙ্গের পল্লীগাথা প্রকাশের পর আমাদের এই অধ্যায় লিখিত ধারণার অনেকটা পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থানে যে সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে, তৎসম্বন্ধেই ঐ মন্তব্য প্রযুজ্য। মঙ্গল গানগুলি পূজামণ্ডপের জন্যই রচিত হইত। চণ্ডীদেবী, মনসাদেবী, ধর্ম্মঠাকুর প্রভৃতি দেবতাদিগের উৎসব উপলক্ষে এই সকল মঙ্গলগান-রচনার প্রয়োজন হইত, সুতরাং কবিগণ উপর্য্যুপরি একই বিষয় লইয়া কাব্য প্রণয়ন করিতেন। ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত কাব্যের বিষয়ই ভিন্ন ভিন্ন। আমরা একটি মাত্র মহুয়া, একটি মাত্র মলুয়া একটি মাত্র চন্দ্রাবতী পাইতেছি এবং প্রত্যেকটি পালা গান এক একটি পৃথক বিষয় লইয়া লিখিত, দেখিতেছি। একথা নিশ্চয় যে ব্রাহ্মণ্য প্রভাব বঙ্গ সাহিত্যের গণ্ডী কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে সীমাবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল। পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্যে প্রচুর পরিমাণে স্বাধীনতার খেলা দৃষ্ট হয়।

পল্লী-গীতিকাগুলির মধ্যে 'শ্যামরায়', 'আঁধাবঁধু' ও 'বোঁপার পাঠ' ত্রয়োদশ-চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বিরচিত হইয়াছিল, বলিয়া অনুমান হয়। কাজলরেখা, কাঞ্চনমালা ও মালঞ্চমালা তাহারও অনেক পূর্ব্বের রচনা। এই সকল সুপ্রাচীন পল্লীগাথায় গুপ্তযুগের আদর্শ পাওয়া যায়। নায়ক-নায়িকার পূর্ব্বরাগ, তাঁহাদের স্বর্গীয় ত্যাগ স্বীকার, সমাজের স্বাধীনতা ও উদার-বৃত্তি এবং নায়কদের দেশ-বিদেশে পর্য্যটন, অদম্য সাহস ও বিপদকে অবাধে বরণ করিয়া লওয়া—বাণিজ্যের জন্য সমুদ্র-পথে নিঃশঙ্কভাবে যাতায়াত ও তান্ত্রিক অনুষ্ঠান—এ সমস্তই গুপ্তযুগকে স্মরণ করাইয়া দেয়। এই সাহিত্যে ব্রাহ্মণ্য প্রভাব ও জাতি-ভেদের কড়াকড়ি নিয়ম আদৌ নাই, আছে—আত্মনির্ভর ও কর্ম্মশীলতা ; অনেকটা বৌদ্ধ-ভাব এই সাহিত্যে দৃষ্ট হয়। পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণ্যপ্রভাবান্বিত সাহিত্যের মূলনীতি হইল—আচার ও ব্রাহ্মণ্যজয় ঘোষণা। ইহাতে রামায়ণ, মহাভারতকে নূতন ছাঁচে ঢালিয়া লওয়া হইল,—কালিদাসের কবিত্ব আড়ালে পড়িল এবং মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যকে নূতন টীকার সাহায্যে দাঁড় করাইয়া সমাজ সংগঠন করিতে কল্লুকভট্ট ও রঘুনন্দন উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেলেন। সুতরাং এ যুগের সাহিত্য ব্রাহ্মণ্য অনুশাসনে কতকটা কবিত্বসম্পদ হারাইয়া ফেলিল। এই শাসনের অতল জল হইতে মনুষ্যত্বের প্রকৃত দাবী উদ্ধার করিবার জন্য বৈষ্ণবেরা যে "বেদ-বিধি-বর্হিভূত" ধর্ম্মপ্রচার করিলেন—তাহা লুপ্ত গৌরব যুগটিকে পুনরায় উজ্জ্বল করিয়া দেখাইল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

গৌড়ীয় যুগ

অথবা

শ্রীচৈতন্য-পূর্ব্ব সাহিত্য

১। 'পঞ্চগৌড়।'
২। অনুবাদ-শাখা।
৩। লৌকিক ধর্ম্ম-শাখা।
৪। পদাবলী শাখা।
৫। কাব্যেতিহাসের সূত্রপাত শাখা।

পঞ্চগৌড়

মুসলমান-বিজয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বপর্য্যন্ত ও বিন্ধ্যপর্ব্বতের উত্তরবর্ত্তী ও প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের পশ্চিমস্থিত বৃহৎ ভূভাগ—সারস্বত, কান্যকুব্জ, গৌড়, মিথিলা ও উৎকল এই পঞ্চ ভাগে বিভক্ত ছিল; এই পঞ্চবিভাগের সাধারণ নাম ছিল, 'পঞ্চগৌড়'।' এই নাম গৌড়দেশেরই প্রভাব-ব্যঞ্জক, বস্তুতঃ গৌড়দেশ অতি প্রাচীন রাজ্য। * পূর্ব্বোক্ত পঞ্চরাজ্য ভিন্ন ভিন্ন রাজাদিগের শাসনাধীন ছিল, কিন্তু সমধিক পরাক্রান্ত রাজা, সেক্‌সন্‌দিগের 'বৃটওয়াল্ডার' ন্যায় গর্ব্বপূর্ণ 'পঞ্চগৌড়েশ্বর' উপাধি গ্রহণ করিতেন। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে হিউনসাঙ শিলাদিত্য মহারাজকে এই 'পঞ্চ গৌড়েশ্বর' উপাধিবিশিষ্ট দর্শন করিয়া যান। † গৌড়দেশীয় রাজগণ অনেকবার

---

* গৌড়ের রাজধানী ৭৩৯ খৃঃ পূঃ অব্দে স্থাপিত হয়। ইহাকেই বোধ হয় টলেমি 'গঙ্গারিজিয়া' সংজ্ঞায় বাচ্য করিয়াছেন। উক্ত সময়ে এই দেশ করতোয়া ও গঙ্গা দ্বারা বিভক্ত হইয়া পশ্চিমাংশ গৌড় ও পূর্ব্বাংশ বঙ্গদেশ বলিয়া খ্যাত ছিল। একরাজার শাসনাধীন থাকা হেতু এই দুই অংশ কালে 'গৌড়দেশ'—এই সাধারণ নামে অভিহিত হইত। মোগল রাজাদিগের সময় গৌড় ও বঙ্গদেশ 'বাঙ্গালা' নাম গ্রহণ করে। Major Ronnel's Map of Hindoostan দেখ।

† বিল (Beal) সাহেব-কৃত হিউনসাঙের ভ্রমণবৃত্তান্তের অনুবাদে 'পঞ্চগৌড়েশ্বর শব্দের স্থলে "Lord of the Five Indies" দৃষ্ট হয়।

এই গর্ব্বিত উপাধি লাভ করিয়াছিলেন ; খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে কিরণসুবর্ণের রাজা শশাঙ্ক-গুপ্ত কান্যকুব্জাধিপতি রাজ্যবর্দ্ধনকে যুদ্ধে জয় করিয়া নিহত করেন। বৌদ্ধরাজাদিগের মধ্যে গোপাল, দেবপাল ও জয়পাল সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত জয় করেন। ইঁহারা এতদুর ক্ষমতাশালী ছিলেন যে, পঞ্জিকায় কলি-যুগের রাজচক্রবর্ত্তীদিগের মধ্যে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে সঙ্গে ইঁহাদের নামও উল্লিখিত দেখা যায়। বলা বাহুল্য ইঁহারাই 'পঞ্চ গৌড়েশ্বর' উপাধির প্রকৃতরূপে বাচ্য ছিলেন। এই গৌড়েশ্বরগণের উৎসাহই বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধির প্রথম কারণ। বঙ্গভাষার প্রাচীন গীতিসমূহে 'পঞ্চ গৌড়েশ্বর' সংজ্ঞা অনেক স্থলে প্রযুক্ত হইয়াছে ; কিন্তু বোধ হয়, কালক্রমে কবি ও স্তুতি-জীবিগণের দ্বারা এই উপাধির অর্থচ্যুতি ঘটিয়াছিল।

কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ব্রাহ্মণগণ প্রথমতঃ ভাষা-গ্রন্থ প্রচারের বিরোধী ছিলেন। কৃত্তিবাস ও কাশীদাসকে ইঁহারা 'সর্ব্বনেশে' উপাধিপ্রদান করিয়াছিলেন এবং অষ্টাদশ পুরাণ অনু-বাদকগণের জন্য ইঁহারা রৌরব নামক নরকে স্থান নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন। এদিকে গৌড়েশ্বর-গণের সভায় সংস্কৃত পুরাণ পাঠ ও 'ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলনকোমলমলয়সমীরে'-র ন্যায় পদাবলী প্রতিনিয়ত প্রতিধ্বনিত হইত। সেখানে 'তৈলাধার পাত্র' কিংবা 'পাত্রাধার তৈল' প্রভৃতি ন্যায়ের কূট মীমাংসিত হইত ; এবং নৈষধাদি কাব্যের অলঙ্কার-রহস্য ও দর্শনের সূক্ষ্মগ্রন্থি মোচনের জন্য বুদ্ধি-জীবিগণ সর্ব্বদা তৎপর থাকিতেন। এই সমৃদ্ধ সভাগৃহে বঙ্গভাষা কি প্রকারে প্রবেশ লাভ করিল ? ব্রাহ্মণগণ ইহাকে কিরূপ ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় তাঁহারা কি কারণে এই ভাষার প্রতি সদয় হইয়া উঠিলেন ?

আমাদের বিশ্বাস, মুসলমান কর্ত্তৃক বঙ্গবিজয়ই বঙ্গভাষার এই সৌভাগ্যের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

মুসলমানগণ ইরাণ, তুরাণ প্রভৃতি যে স্থান হইতেই আসুন্ না কেন, এদেশে আসিয়া সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গালী হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা হিন্দুপ্রজামণ্ডলী পরিবৃত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। মস-জিদের পার্শ্বে দেবমন্দিরের ঘণ্টা বাজিতে লাগিল ; মহরম, ঈদ্, সবেরাৎ প্রভৃতির পার্শ্বে দুর্গোৎসব, রাস, দোলোৎসব, প্রভৃতি চলিতে লাগিল। রামায়ণ ও মহাভারতের অপূর্ব্ব প্রভাব মুসলমান সম্রাটগণ লক্ষ্য করিলেন। এদিকে দীর্ঘকাল এদেশে বাস-নিবন্ধন বাঙ্গালা তাঁহাদের একরূপ মাতৃভাষা হইয়া পড়িল। হিন্দুদিগের ধর্ম্ম আচার, ব্যবহার প্রভৃতি জানিবার জন্য তাঁহাদের পরম কৌতুহল হইল।

গৌড়ের সম্রাটগণের প্রবর্ত্তনায় হিন্দুশাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদ আরম্ভ হইল। গৌড়েশ্বর নসির খাঁ ১৩২৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন ; তাঁহার রাজ্যকাল ৪০ বৎসর ব্যাপক ছিল। এই মহাত্মা মহাভারতের

একখানি অনুবাদ সঙ্কলন করাইয়াছিলেন। সেই মহাভারতখানি এখনও প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই; কিন্তু পরাগল খাঁর আদেশে অনূদিত পরবর্ত্তী মহাভারতে তাহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়।* কবি বিদ্যাপতিও এই নসির শাহ † এবং গৌড়েশ্বর 'প্রভু গিয়াসউদ্দিন সুলতানে'র প্রশংসা করিয়াছেন। নসির খাঁ যে প্রেমবিষয়ক সঙ্গীতের অনুরাগী ছিলেন, বিদ্যাপতির পদে তাহার আভাস আছে। † কৃত্তিবাসের রামায়ণ গৌড়েশ্বরের আদেশে সঙ্কলিত হইয়াছিল। এই গৌড়েশ্বর সম্ভবতঃ রাজা গণেশ ছিলেন; কিন্তু ভাষায় শাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদ করিবার যে প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল, তাহা মুসলমান্ সম্রাটগণের দৃষ্টান্তানুযায়ী। কৃত্তিবাস যে গৌড়েশ্বরের সভা বর্ণন করিয়াছিলেন, তাহা বিশেষরূপে মুসলমান-প্রভাব'চিহ্নিত ছিল; অমাত্যের খাঁ উপাধিতেই তাহা দৃষ্ট হয়। মুসলমান সম্রাটই কুলীন-গ্রামবাসী মালাধর বসুকে ভাগবতের অনুবাদ রচনায় নিযুক্ত করেন এবং উক্ত কবি ভাগবতের দশম ও একাদশ অধ্যায় সুচারুরূপে অনুবাদ করিলে তাঁহাকে 'গুণরাজ খাঁ' উপাধি প্রদান করেন। সম্রাট হুসেন সাহের প্রশংসা-সূচক অনেক কবিতা বাঙ্গালা প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের কাব্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ‡ হুসেন শাহের প্রধান সেনাপতি পরাগল খাঁ পূর্ব্ববঙ্গ বিজয় করিতে প্রেরিত হন। ইনি চট্টগ্রামে আসিয়া মগদিগকে দমন করেন এবং চট্টগ্রাম জেলায় একখানি গ্রাম পত্তন করিয়া তাহাতে বসবাস করেন। এই গ্রামের নাম পরাগলপুর। পরাগলপুরে খাঁ সাহেবের বংশধরগণ এখনও বর্ত্তমান আছেন। পরাগল খাঁর আদেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বর নামক কবি স্ত্রী-পর্ব্ব পর্য্যন্ত সমগ্র মহাভারতের অনুবাদ রচনা করেন। পরাগল খাঁর পুত্র ছুটিখাঁর আদেশে শ্রীকর নন্দী নামক জনৈক কবি অশ্বমেধ-পর্ব্বের অনুবাদ সঙ্কলন করেন। এই পুস্তকে ছুটিখাঁর প্রতাপ সম্বন্ধে লিখিত আছে,—

"ত্রিপুর নৃপতি যার ভয়ে এড়ে দেশ।
পর্ব্বত গহ্বরে গিয়া করিল প্রবেশ।"

---

* "শ্রীযুক্ত নায়ক সে যে নসরত খান।
রচাইল পাঞ্চালী যে গুণের নিদান"—কবীন্দ্র পরমেশ্বর।

† "সে যে নসিরা সাহ জানে। যারে হানিল মদন বাণে॥
চিরঞ্জীব রহু পঞ্চ গৌড়েশ্বর কবি বিদ্যাপতি ভণে।"

‡ (১) কবীন্দ্র পরমেশ্বর ইঁহাকে 'কৃষ্ণের অবতার' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

(২) চৈতন্য চরিতামৃতে উল্লিখিত আছে, ইনি চৈতন্যের একজন ভক্ত হইয়াছিলেন।

(৩) "সনাতন হুসেন সাহ নৃপতি তিলক"—বিজয়গুপ্ত।

(৪) 'সাহ হুসন, জগতভূষণ, সেহ এহি রস জানে। পঞ্চ গৌড়েশ্বর, ভোগ পুরন্দর, ভণে যশোরাজ খানে॥

এই সকল অনুবাদপুস্তক পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, রাজকার্য্যাবসানে মুসলমান সম্রাটগণ পাত্রমিত্র পরিবেষ্টিত হইয়া হিন্দুশাস্ত্রের বঙ্গানুবাদ শুনিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। কবি আলওয়াল আরাকান-রাজের প্রধান অমাত্য মাগনঠাকুরের আদেশে তাঁহার বিখ্যাত পদ্মাবতী কাব্যের অনুবাদ রচনা করেন। মাগনঠাকুর নাম দেখিয়া জাতি ভুল করিবার আশঙ্কা আছে, সুতরাং বলা উচিত, মাগনঠাকুর মুসলমান ছিলেন। সোলেমান নামক অপর জনৈক মুসলমান বড়লোকের আদেশে একখানি পার্শী গল্পপুস্তকের বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ প্রণয়ন করেন; দৌলত কাজি নামক অপর একজন কবি পূর্ব্বোক্তভাবের আশ্রয় লাভ করিয়া 'লোর চন্দ্রাণি' নামক কাব্য রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। এরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

সুতরাং মুসলমান সম্রাট ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের কৌতুহল নিবৃত্তির জন্যই রাজদ্বারে দীনাহীনা বঙ্গভাষার প্রথম আহ্বান পড়িয়াছিল। গৌড়েশ্বরগণ যে ভাষাকে উৎসাহ প্রদান করিলেন, হিন্দুরাজগণ তাহাকে অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। সম্রাটগণের দৃষ্টান্ত পল্লীর জমিদারগণ পর্য্যন্ত অনুসরণ করিতে লাগিলেন। বাঙ্গালাভাষা এইভাবে হিন্দুরাজসভায় প্রতিপত্তি লাভ করিল। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ অনন্যগতি হইয়া ইহার পরিচর্য্যায় লাগিয়া গেলেন।

সুতরাং আমরা জগদানন্দের সঙ্গে কবি ষষ্ঠীবরের, * রঘুনাথদেবের সঙ্গে মুকুন্দরামের, যশোমন্ত সিংহের সঙ্গে শিবসংকীর্ত্তন-লেখক রামেশ্বরের, † বিশারদের সঙ্গে অনন্তরামের ‡, কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের, মাগনঠাকুরের সঙ্গে কবি আলওয়ালের § ও রাজা জয়চন্দ্রের সঙ্গে ভবানী দাসের ¶ অন্যান্য বহুসংখ্যক কবি ও তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকগণের নাম একত্র পাইয়াছি। রাজমালায়

---

* "অমৃত লহরী ছন্দ, পুণ্য ভারতের বন্ধ, কৃষ্ণের চরিত্র শেষ পর্ব্বে।
শ্রীযুত জগদানন্দে, অহর্নিশ হরি বন্দে, কবি ষষ্ঠীবর কহে সর্ব্বে॥"—
সঞ্জয় বে, গ, পুঁথি, ৭৮৯ পাত্র।

† "যশোমন্ত, সবগুণবন্ত, তস্য পোষ্য রামেশ্বর, তদাশ্রয়ে করি ঘর, বিরচিল শিবসংকীর্ত্তন।"—রামেশ্বরের শিবসংকীর্ত্তন।

‡ "বিশারদ পদে সেই রেণু অভিপ্রায়। পদবন্ধে রচিলেক প্রথম অধ্যায়॥"—
অনন্তরামকৃত ক্রিয়াযোগসার, হস্তলিখিত পুঁথি।

§ বিরহ মত্তমাতঙ্গ বহুল বাহিনী সঙ্গ, হরি দরশনে, অঙ্গ পরশনে, সসৈন্য হইল ভঙ্গ। অতি রসিক সুজন, রূপ জিনি পঞ্চবাণ, শ্রীযুত মাগন, আরতি কারণ, হীন আলাওলে ভণে।—পদ্মাবতী, ২০৪ পৃঃ।

¶ "কহেন ভবানী দাস, শ্রীরামের পদে আশ, জয়চন্দ্র রাজার বচনে।" লক্ষ্মণদিগ্বিজয়, রজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংস্করণ, (২৮৫ নং অপার চিৎপুর রোড) ১২২ পৃঃ।

দৃষ্ট হয়, ত্রিপুরাধিপতি মহারাজ (২য়) ধর্ম্মমাণিক্য মহাভারতের বঙ্গানুবাদ করাইয়াছিলেন। গজদ সুবর্ণজড়িত হইলে যে শোভা হয়, ধন ও জ্ঞান মর্য্যাদার এই যোগ তাহা অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট হইয়াছে

আমরা আশা করি, পাঠকগণ এখন বুঝিতে পারিলেন, আমরা কেন এই অধ্যায় 'গৌড়ীয় যু সংজ্ঞায় অভিহিত করিলাম। পঞ্চগৌড় এবং পঞ্চগৌড়েশ্বরের উল্লেখ প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের সর্ব্বত্র পরিদৃষ্ট হয়। মালাধর বসু ভাগবতের অনুবাদের ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—'নির্গুণ অধম মুক্রি. নাহি কে গ্রাম। গৌড়েশ্বর দিল নাম গুণরাজ খান॥' পরাগলী মহাভারতে—'নৃপতি হুসেন সাহ হয় মহামতি। গৌড়েতে যার পরম সুখ্যাতি॥" (কবীন্দ্র বে, গ, পুঁথি, ১ম পত্র)। উক্ত মহাভারতে—'প্রিয়পাত্র তাহান বিখ্য ছুটি খান। পঞ্চম গৌড়েতে যার নামের বাখান॥' (কবীন্দ্র বে, গ, ২২৭ পত্র)। মাধবাচার্য্যের চণ্ডীকাব্যে- 'পঞ্চগৌড় নামে দেশ পৃথিবীর সার। একাব্বর নামে রাজা অর্জ্জুন অবতার॥ (মাধবাচার্য্যের চণ্ডী চট্টগ্রামের সংস্ক ৮ পৃষ্ঠা) ও অন্যান্য নানা পুস্তকে পঞ্চ গৌড়ের গৌরব কীর্ত্তিত দেখিতে পাইতেছি। কৃত্তিবাস আ বিবরণে লিখিয়াছেন,—'পঞ্চ গৌড় চাপিয়া যে গৌড়েশ্বর রাজা। গৌড়েশ্বর পূজা কৈলে গুণের হয় পূজা॥' গৌড়েশ্ব গণের উৎসাহে যে ভাষার মুখবন্ধ হইয়াছিল, তাহা' গৌড়ীয় সাধু-ভাষা' আখ্যায় পরিচিত হইয়াছিল

২। অনুবাদ-শাখা—(ক) কৃত্তিবাস।

ভাষার ভিত্তি দৃঢ় করিতে প্রথমতঃ অনুবাদ গ্রন্থেই আবশ্যক। গৌড়েশ্বরগণের উৎসা বঙ্গভাষার আদিকালে রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত গ্রন্থের অনুবাদ রচিত হইয়াছিল। কৃত্তিবা রামায়ণের যে সকল প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, এবং যাহাদের কোন কোন পুঁ উপর নির্ভর করিয়া শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় কৃত্তিবাসী উত্তরাকাণ্ড সম্পাদন করিয়াছে তাহাদের তারিখ ১০০ বৎসর পিছাইয়া দেওয়া দরকার। কারণ সে গুলিতে যে অব্দ দেও হইয়াছে, তাহার কোন কোনটি শকাব্দ বলিয়া অভিহিত হইলেও তাহা শকাব্দ নহে, মল্লাব্দ। মল্লাব্দ হইতে শকাব্দ একশত বৎসরের প্রাচীন। এই সকল পুঁথির অধিকাংশই বাঁকুড়া পাত্রসা নিবাসী রামকুমার দত্ত সংগ্রহ করিয়াছে, এবং সেই সকল পুথির তারিখ পর্য্যালোচনা করি দেখিতে পাইতেছি, সে গুলি মল্লাব্দ। সুতরাং হীরেন্দ্রবাবু যে পুঁথি ৩০০ বৎসরের প্রাচীন ম করিয়াছিলেন, তাহার বয়ঃক্রম ২০০ বৎসর মাত্র এবং এই জন্য সাহিত্য-পরিষৎ সম্পাদি উত্তরাকাণ্ডকে খুব প্রাচীন নজির বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডটি খুব সম্ভব কৃত্তিবাস লেখেন নাই ; অন্ততঃ কৃত্তিবা বর্ণনার সহিত কবিচন্দ্রের রচনা তাহাতে মিশিয়া গিয়াছে। আমরা অতি প্রাচীন পুঁথিতে "অঙ্গ রায়বার" শীর্ষক কবিতাটিতে কবিচন্দ্রের ভণিতা পাইয়াছি, তরণীসেনের যুদ্ধের পালাটিও কবিচন্দ্রে ভণিতায় পাওয়া গিয়াছে।

কৃত্তিবাস শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন, তিনি রামায়ণ অনুবাদ করিতে যাইয়া বাল্মীকির গণ্ডী কেন অতিক্রম করিবেন, একথার উত্তর দেওয়া সহজ নহে। ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট, নোয়াখালী প্রভৃতি স্থান হইতে যে সমস্ত 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ' পাইতেছি, তাহাতে বীরবাহু, তরণীসেন প্রভৃতির যুদ্ধ, রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রীরামচন্দ্রের স্তব, ও শ্রীরামের চণ্ডীপূজা, এই সমস্ত মূলগ্রন্থবহির্ভূত বিষয় দৃষ্টি হয় না। সে অনুবাদগুলি কতকাংশে বাল্মীকির প্রতিভা-বজ্রবিদ্ধ পথে বঙ্গীয় কবির সূত্র নিষ্ক্রমণ বলিয়া ব্যাখ্যাত হইতে পারে। ইহাদের কোন্‌গুলি বিশ্বাসযোগ্য? কৃত্তিবাসী রামায়ণ যে পূর্ব্ববঙ্গে পৌঁছিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বটতলার রামায়ণের সঙ্গে পূর্ব্ববঙ্গে প্রাপ্ত পুঁথির ভাব ও ভাষা অনেক স্থলে ছত্রে ছত্রে ঐক্য হইতেছে; আমরা 'ভূমিতে পড়িয়া রাজা করে ছটফট। শীঘ্র করি রঘুনাথ গেলেন নিকট।' (পরিষদের পুঁথি) ও "বরিষা গোঙাই গেল শরৎ প্রবেশ। রাম বলেন না হইল সীতার উদ্দেশ॥" (পরিষদের পুঁথি, ৯৬ পত্র) প্রভৃতি অনেক স্থলেই বহু ছত্র পর্য্যন্ত অনুসরণ করিয়া দেখিয়াছি, সেই সব পুঁথিতে ও বটতলার মুদ্রিত রামায়ণে একই কবির হস্তচিহ্ন অনুভব করা যায়। "খুল্লতাত পড়িল দুই তিন সহোদর। রুষিল অতিকা বীর যমের দোসর॥" (পরিষদের পুঁথি, ২২৭ পত্র) * এই দুই ছত্রও প্রায় একরূপ। কিন্তু বটতলার পুস্তকে এই দুই ছত্রের পরে "চিন্তা করি মনে মনে বলিছে তখন। শ্রীচরণে স্থান দেও কৌশল্যানন্দন॥ রাবণ-সন্তান বলি দয়া না করিবে। দয়াময় রামনামে কলঙ্ক রহিবে॥" আছে, এইরূপ রাক্ষসী বৈষ্ণবী ভক্তির খোঁজ পূর্ব্ববঙ্গের হস্তলিখিত পুস্তকে পাওয়া যায় না। এরূপ হইল কেন? সুমধুর তরণীসেনের বধোপাখ্যান, রাম 'কমল-আঁখির' কমলাক্ষ দ্বারা হারানো নীলোৎপলের স্থল পূর্ণ করিয়া চণ্ডী-পূজার উদ্যোগ প্রভৃতি বিচিত্র কাহিনী পূর্ব্ববঙ্গের পুঁথিগুলিতে পরিত্যক্ত হইল কেন? আমার মনে একটি গভীর সন্দেহ আছে। শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টিসাধনে নানারূপে সাহায্য করিয়াছে। বৈষ্ণবগণ রাক্ষসদিগের দ্বারা শ্রীরামের স্তবগান করাইয়াছেন, খেদ মিটাইতে শাক্তগণ শ্রীরামকে দিয়া চণ্ডীপূজা করাইয়াছেন; এই দুই দলের চেষ্টায় মূল অনুবাদ বর্ত্তমান আকারে পরিণত হইয়াছে। ইহাকে ঠিক বিকৃত বলা যায় না। বীরবাহুর সম্বন্ধে—"ধরণী লুটায়ে রহে যুড়ি দুই কর। অকিঞ্চনে কর দয়া রাম রঘুবর॥" এইরূপ উক্তি পড়িয়া ভূপতিত কৌপীন-

রামায়ণে শাক্ত ও বৈষ্ণবের প্রভাব।

* পরিষদের জন্য আমি যে পুস্তক ত্রিপুরা হইতে খরিদ করিয়া দিয়াছি, সে রামায়ণখানা খুব প্রামাণিক বলিয়া গণ্য হইতে পারে না; উহা নিম্ন শ্রেণীর লোকের হাতের লেখা এবং অনেক স্থল পাঠবিকৃতিপূর্ণ। কিন্তু এস্থলে যে সব মত লিপিবদ্ধ করিলাম, তাহা শুধু পরিষদের গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া নহে, পূর্ব্ববঙ্গে যে ১২।১৪ খানা রামায়ণের হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথি পাইয়াছি, তাহার সমস্তই আমার লক্ষ্য। আলোচনার সুবিধার জন্য পরিষদের পুঁথির উল্লেখ করিলাম।

সার শিখাযুক্ত বৈষ্ণবের কথাই মনে পড়ে, নতুবা রাক্ষসের পক্ষে এরূপ দৈন্য কল্পনা করিবার কোন সুযোগ কবিগুরু বাল্মীকি দেন নাই। শুধু রামলক্ষ্মণের প্রতি এই ভক্তি নহে, বীরবাহু "প্রণমিল ভক্তবৃন্দ যত কপিগণে।" এই কপিগণ যে চৈতন্ত-প্রভুর পারিষদবর্গের ন্যায় স্পষ্টরূপে গুণচূড়া, ললিতা রূপমঞ্জরী প্রভৃতির অবতার বলিয়া অঙ্গীকৃত হন নাই, ইহাই যথেষ্ট। তৎপরে রাবণের মুখে "জন্মিয়া ভারতভূমে আমি দুরাচার। করেছি পাতক বহু সংখ্যা নাহি তার। অপরাধ মার্জ্জনা করহ দয়াময়। কুড়ি হস্ত যুড়ি রাবণ একদৃষ্টে রয়।" রামের নিকট এই মিনতি পড়িলে অমুতপ্ত জগাই, মাধাই এবং নরোজী, চৈতন্য-প্রভুর নিকট যে স্তুতি পাঠ করিয়াছিল, তাহাই মনে হওয়া স্বাভাবিক। লেখক সেই অভ্যস্ত বৈষ্ণবোচিত বিনয় রাবণের মুখে প্রচার করিতে যাইয়া এতদূর আত্ম-বিস্মৃত হইয়াছেন যে, রাবণের লঙ্কা ভুলিয়া তাহাকে ভারতভূমে জন্মগ্রহণ করাইয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন। কিন্তু বোধ হয় তরণীসেনের উপরই বৈষ্ণবপ্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পড়িয়াছে, তিনি রীতিমত বৈরাগী সাজিয়া যুদ্ধে গমন করিতে-ছেন। গঙ্গা-মৃত্তিকার হরেকৃষ্ণ ছাপ ঈষৎ রূপান্তরিত হইয়া তাঁহার অঙ্গ-শোভা সম্পাদন করিয়াছে, "অঙ্গে লেখা রামনাম রথের চারি পাশে। তরণীর ভক্তি দেখি কপিগণ হাসে।" হাসিবার ত কথাই, এবম্বিধ হরি-সংকীর্ত্তনের যাত্রী পথ ভুলিয়া খোলের পরিবর্ত্তে ধনুক ধরিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে কেন আসিলেন, তাহাতে কপিগণ কেন হাস্যসম্বরণ করিতে পারিবেন? তৎপর তরণীর রাম শরীরে বিশ্বরূপ দর্শন; এইখানেই বঙ্গীয় রামায়ণ ভাগবতের আকার ধারণ করিয়াছে। এই রামায়ণে রাম লক্ষ্মণ ত নিত্যানন্দ ও চৈতন্য-প্রভু সাজিয়া কেবল ভক্তের অশ্রুজল লক্ষ্য করিতেছেন এবং সেই উচ্ছ্বাসে নিজেরাও কাঁদিয়া বিভোর হইতেছেন; কখনও সমাগত যুদ্ধার্থীর ভক্তি দেখিয়া বলিতেছেন,— "রাম বলেন ভক্ত জানহ নিশ্চয়। আশীর্ব্বাদ করি যেন বাঞ্ছা পূর্ণ হয়॥" কিন্তু ভক্ত ছাড়িবার পাত্র নহেন, —"ক্ষুদ্র পুরী লঙ্কা দিয়া ভাণ্ডিবে আমারে। না পারিবে কদাচন এই দুরাচারে॥ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড গোঁসাই তোমার শরীরে।" বলিয়া ভক্ত প্রবল ভক্তির উচ্ছ্বাসে গোস্বামীমহাশয়ের বর প্রত্যাখ্যান করিতেছেন। এই সব পড়িয়া রাম ও রাবণের ভীষণ যুদ্ধস্থলকে গৈরিক-রেণু-রঞ্জিন সংকীর্ত্তন-ভূমি বলিয়া ভুল হয় এবং তথাকার দামামা-রোল খোল বাদ্যের মৃদুতা গ্রহণ করে। যাহা হউক, রামায়ণ এইরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া বাঙ্গালীর ঘরের উপযোগী হইয়াছিল সন্দেহ নাই—সেই ঘরে মরিচাধরা তলোয়ার অপেক্ষা নয়নাশ্রুই বেশী প্রভাবশীল অস্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, চক্ষুজল এতদ্দেশের একটি প্রধান শক্তি, বাঙ্গালীর যুদ্ধক্ষেত্রে সেই শক্তির প্রয়োগ দেখিয়া উপহাস করিবার কোন কারণ নাই। রামায়ণ উক্তরূপে পরিবর্ত্তিত হইলেও ইহা ঠিক বিকৃতি বলিয়া আমরা অগ্রাহ্য করিতে পারি না। যদিও রাক্ষস বীরবাহুর শ্রীরামচন্দ্রকে "রাক্ষস বিনাশকারী ভুবনমোহন" বলাতে রাক্ষসী বীর্য্যবত্তার বিরুদ্ধভাব দৃষ্ট হয়, তথাপি বোধ হয় এই রচনা তাৎকালিক বঙ্গীয় জীবনের মূল নীতি উল্লঙ্ঘন করে নাই। বৈষ্ণবী-নীতি

বঙ্গের সমাজের অভ্যন্তরে কার্য্যকরী হইয়াছিল; এই বৈষ্ণবী-নীতি দ্বারাই রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদ সম্পূর্ণরূপে শাসিত। এ সমস্ত রচনা পরবর্ত্তী যোজনা কি না, বলিতে পারি না, কিন্তু ইহা বঙ্গীয় প্রকৃতির বিরুদ্ধ হয় নাই, বরং সম্পূর্ণ অনুকূল হইয়াছে, এই জন্য যোজনা হইলেও উহা বিকৃতি নহে। ত্রিপুরা, নোয়াখালি ইত্যাদি স্থানের লোকগণ যে মূলগ্রন্থ জাল করিয়াছে, বোধ হয় না। সে সব দেশে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর, চৈতন্যচরিতামৃত ইত্যাদি গ্রন্থ পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে বিশেষ কোনরূপ বিকৃতি দৃষ্ট হয় না; শুধু 'লাফ' স্থলে 'ফাল', 'মা' স্থলে 'মাও' প্রভৃতি পূর্ব্ববঙ্গের শব্দগুলির দিকে অনুকূলতা দৃষ্ট হয়; পরিবর্ত্তন শুধু শব্দের, কিন্তু বিষয়গত পরিবর্ত্তন ত দেখা যায় না। তবে এক কৃত্তিবাস পূর্ব্ব ও পশ্চিমে দুই রূপে উপস্থিত হইলেন কেন? যদি প্রকৃত পক্ষেই পূর্ব্বোক্ত উপাখ্যানগুলি প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, তবে কি সে অংশগুলি এখন রামায়ণ হইতে কর্ত্তন করিতে পারি? তরণীর কাটামুণ্ড 'রাম রাম' বলিয়া শ্রীরামের পদস্পর্শ করিয়াছিল, এই ভক্তির কথাই আমাদের প্রিয়; আমরা রাক্ষসী বিভীষিকা হইতে রাক্ষসী বৈষ্ণবভাবের বেশী পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছি, সেগুলি ছাড়িয়া দিলে বঙ্গীয় রামায়ণে কি পড়িব? আমরা একখানি অতি প্রাচীন হস্তলিখিত কৃত্তিবাসী রামায়ণে এইরূপ সূচনা পাইয়াছি,—এই রচনাতে কবি গুরু বাল্মীকির বীণার ধ্বনি ফিরিয়া শুনিতেছি।

"বাল্মীকি বলিলা গোসাঞি তুমি অন্তর্য্যামি।
তোমা ঠাঞি কিছু কথা জিজ্ঞাসিব আমি ॥
কোন মহাপুরুষ হয় সংসারের সার।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ধর্ম্ম অবতার ॥
সংসারের সাধু প্রিয় জগতের হিত।
যার ক্রোধে দেবগণ শতেক বেভিত ॥
সর্ব্ব সুলক্ষণ যার হয় অধিষ্ঠান।
হিংসার ঈষৎ নাই, চন্দ্র সূর্য্যের সমান ॥
ইন্দ্র যম বায়ু বরুণ সেই বলবান।
ত্রিভুবনে নাই কেহ তাহার সমান।"

ইত্যাদি,—বে, গ, পুঁথি, ৪ পত্র।

কৃত্তিবাস ও বাল্মীকি।

বিক্রমপুর হইতে প্রাপ্ত একখানা প্রাচীন পুঁথির ভূমিকাও এইরূপ দৃষ্ট হয়, ইহা অনেকটা মূল্যের অনুযায়ী। যাহা হউক, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট, নোয়াখালি প্রভৃতি স্থলের কতিপয় হস্তলিখিত পুঁথির উপর নির্ভর করিয়া আমরা রামায়ণসম্বন্ধে জটিল সমস্যার মীমাংসা করিতে সাহসী নহি। ঐ সকল উপাখ্যান বাদ দিলে অবশিষ্ট যে অংশ থাকে, তাহাও রামায়ণের ঠিক অনুবাদ বলা যায় না। ফটোগ্রাফে যেমন প্রকৃতির চিত্রালেখ্য স্বল্পায়তনে অথচ

যথার্থরূপে প্রতিবিম্বিত হয়, কৃত্তিবাসী-মুকুরে বাল্মীকির রামায়ণ সেইরূপ প্রতিবিম্বিত হয় নাই ; মূল পাঠ করিলে দেখা যায়, শ্রীরামচন্দ্র দেবতা নহেন,—দেবোপম ; মানুষী শক্তি ও বীর্য্যবত্তার আতিশয্যে তাঁহাকে ক্ষণে ক্ষণে দেব বলিয়া ভ্রম হয়, এই মাত্র। কৃত্তিবাসী রামায়ণের রাম ভক্তের আরাধ্য অবতার, তুলসীচন্দনে লিপ্ত বিগ্রহ। তিনি কোমল করপল্লবের ইঙ্গিতে সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার করিতে পারেন, তিনি বংশীধারীর ভ্রাতা, প্রেমাশ্রুপূর্ণ-চক্ষু ; ভক্তের চক্ষে জল দেখিলে যোজিত শরটি তূণীরে রাখিয়া কাঁদিয়া ফেলেন। মূলে আছে, কৌশল্যা বনগত পুত্রকে স্মরণ করিয়া সুমন্ত্রের নিকট বলিতেছেন,—'রাম পুষ্পবৎ কোমল উপাধানে শির রক্ষা করিয়া নিদ্রা সুখ উপভোগ করিত এখন স্বীয় বজ্রবৎ কঠিন ভুজে শির রক্ষা করিয়া কিরূপে শয়ন করিবে ?' রামের চিত্র পাছে কঠোর হয় এই ভয়ে কৃত্তিবাস বজ্রবৎ কঠিন ভুজের কথা উল্লেখ করেন নাই। কি ভীরু! প্রকৃতই যদি রামের ভুজ কোমল কিশলয়োপম হইত, ও "চাঁপা নাগেশ্বর দিয়া রামের চূড়া বাঁধা"* থাকিত, তবে কি রাবণবধ হইত, না এখনকার ঐতিহাসিকদিগের মতানুসারে, আর্য্য-ভুজবলে দাক্ষিণাত্য বিজয় হইত! শৌর্য্যই পুরুষের সৌন্দর্য্য, কমনীয়তা নহে। মূল রামায়ণে রামের ভয়াবহ মূর্ত্তি দেখিয়া মারীচ রাক্ষস বলিয়াছিল,—"বৃক্ষে বৃক্ষে আমি করাল রামমূর্ত্তি দর্শন করি, ধনুষ্পাণি রামমূর্ত্তি ছায়ার ন্যায় কাননের সর্ব্বত্র দর্শন করিয়া নির্জ্জনে চমকিত হইত।" যখন গদ্গদনাদী গোদাবরীতীরে কদম্ব, অশোক, কর্ণিকার বৃক্ষকে শোকরক্তেক্ষণ বিরহী শ্রীরামচন্দ্র বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর পাইলেন না, পথে রক্তবিন্দু ও রাক্ষসের পদাঙ্ক দর্শন করিয়া রাক্ষস কর্তৃক সীতাবধ আশঙ্কা করিলেন, তখন বিরাট ধনুতে জরা আরোপণ করিয়া জরা, ব্যাধি কি মৃত্যুর ন্যায় করাল-বেশে প্রকৃতিকে সংহার করিতে সমুদ্যত হইলেন, ত্রিপুরান্তক হরের ন্যায় কিংবা যুগান্তকারী কালের ন্যায় শ্রীরামচন্দ্রের সেই চিত্র অতি ভীষণ। সেই অসম্বদ্ধ প্রলোপক্তিতে রামের মনোহর চিত্র ভীষণতাশ্রিত অপূর্ব্বরূপ গ্রহণ করিয়াছে। তাঁহার ক্রোধে ভাবী রাক্ষস-সংহারের ছায়া পড়িয়াছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণে এই সকল ছবির যথাযথ প্রতিকৃতি উঠে নাই। যে আনন্দে প্রকৃতির মাধুরী মূলে প্রতিবিম্বিত, পদ্মসম্পীড়িত পম্পাবারি, রাত্রিজাগরণ-ক্লান্তা প্রভাতকালে শ্লথচরণা রমণীর ন্যায় বর্ষাক্ষয়ে নদীর ধীর মন্থরগতি, শৃঙ্গধারী ককুদ্মানের ন্যায় বালেন্দুশীর্ষ মেঘ মণ্ডল হস্তিকর্তৃক পদ্মবনে উপগীত শ্লোক, এবং বিচিত্র প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী কৃত্তিবাসী অনুবাদে প্রতিবিম্বিত হয় নাই। কিন্তু রাম ও লক্ষ্মণের সৌহার্দ্দ্য, কৌশল্যার শোক, সীতার (ক্ষাত্রেয় তেজ, ব্রহ্মচর্য্য নহে) গৃহস্থবধূর ন্যায় ব্রীড়াবনত মাধুরী,—বোধ হয় মূলাপেক্ষা অনুবাদে আরও সুন্দর হইয়াছে ; এতদ্ব্যতীত যদি পশ্চিম-বঙ্গ-প্রচলিত রামায়ণের পাঠই ঠিক হইয়া থাকে, তবে একটি অভিনব বস্তু

---

* লঙ্কাকাণ্ড, বিদ্যুৎজিহ্বা কর্তৃক মায়ামুণ্ড নির্ম্মাণ দেখ।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে পাই,—তাহা রামচন্দ্রের বৈষ্ণবীয় কোমলতা—ভক্তের জন্য করুণা। ইহার ছায়া রামায়ণে, কিন্তু পূর্ণতা বৈষ্ণব পদাবলীতে।

বাঙ্গালীর নিজ ভাব দ্বারা ঈষৎ পরিবর্ত্তিত ও নবরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে 'রামায়ণ' বঙ্গীয় গৃহস্থের এত আদরের বস্তু হইয়াছে। মিতব্যয়ী বণিক্ ক্ষুদ্র দীপাধারটি অকাতরে তৈল-পূর্ণ করিয়া যে গীতি অর্দ্ধরাত্র জাগিয়া পাঠ করে, তাহা এখনও আমাদের হৃদয় স্পর্শ করিয়া কোমল করে; সেই গীতি আমাদের শৈশবের স্মৃতির সঙ্গে জড়িত। তাহার অপরিস্ফুট মাধুর্য্য শুধু শৈশবের কথা নহে, কত যুগ যুগান্তরের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

পাঠ বিকৃতির সম্বন্ধে আলোচনা।

ইদানীং কৃত্তিবাসী রামায়ণের পাঠবিকৃতির দোষে দোষী সাব্যস্ত করিয়া জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের শ্মশানের উপর উৎপীড়ন হইতেছে। কিন্তু যাঁহারা উক্ত তর্কালঙ্কারের বিরোধী, তাঁহাদের নিকট এই বক্তব্য, যদি তাঁহারা প্রাচীন বঙ্গীয় পুঁথির আলোচনা করিয়া থাকেন, তবে দেখিবেন, পুস্তকের হস্তলিপি যত প্রাচীন, ভাষাও সেই অনুসারে জটিল ও প্রাচীন; পরবর্ত্তী পুঁথিগুলির ভাষা ক্রমশঃ সহজ দৃষ্ট হয়।* এক জয়গোপালের উপর ক্রুদ্ধ হইলে কি হইবে? কত জয়গোপাল বঙ্গীয় রামায়ণের বিকৃতিসাধনে সহায়তা করিয়াছেন, তাহার অবধি নাই। প্রাচীন অপ্রচলিতশব্দবহুল একখানি পুঁথি উদ্ধার করিয়া চালাইতে চেষ্টা করিলে দেশীয় আপামর সাধারণ পড়িবে কি? প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের প্রীতি অর্থকরী নহে।

আমার বিবেচনায় বঙ্গীয় পুঁথিগুলির এইরূপ পরিবর্ত্তন সর্ব্বাংশেই পরিতাপের বিষয় হয় নাই। এইরূপ যুগে যুগে সময় উপযোগী ভাবে ভাষার একটু একটু সংস্কার হওয়াতেই ৫০০ বৎসরের অধিক কালের রচিত রামায়ণ এখন পর্য্যন্ত এদেশে এতদূর প্রচলিত আছে। ইংরেজী চসারের গীতি কয় জনে পড়ে?

কিন্তু মূল রামায়ণ নানা কারণেই উদ্ধার করা আবশ্যক। আধুনিক শব্দের মনোহারিত্বে অভ্যস্ত বহুসংখ্যক লোকের শ্রুতি মূল-রামায়ণ শ্রবণে সুখী হইবে কি না বলা যায় না। তথাপি আমাদের সাহিত্যের আদি-গৌরব কৃত্তিবাসকে সমুচিতরূপে প্রতিষ্ঠিত দেখিবার বাসনা কাহার না হয়?

আমরা যে সব রচনা কৃত্তিবাসের লিখিত বলিয়া প্রাচীন কবির কবিত্ব-গৌরবের বড়াই করিয়া থাকি, সেই প্রশংসার পুষ্প ও বিল্বপত্র হয়ত এই জয়গোপাল কি পূর্ব্ববর্ত্তী কোন জয়গোপালের মস্তকে পড়িতেছে, কৃত্তিবাস হয়ত তাহা পাইলেন না। দৃষ্টান্ত স্থলে বলা যাইতে পারে,—সুবিখ্যাত নিম্নলিখিত পদগুলি আমরা কোনও হস্তলিখিত পুঁথিতে পাই নাই,—

* "Every one who has gone into the work of editing ancient songs in Bengali has felt this difficulty, later MSS. always giving a smoothed-down-version of the ancient dialects."—Mahamahopadhyaya Hara Prasad Shastri's Pamphlet on Old Bengali Litearature, P. 3

"গোদাবরী নীরে আছে কমল কানন।
তথা কি কমলমুখী করেন ভ্রমণ ॥
পদ্মালয়া পদ্মমুখী সীতারে পাইয়া।
রাখিলেন বুঝি পদ্মবনে লুকাইয়া ॥
চিরদিন পিপাসিত করিয়া প্রয়াস।
চন্দ্রকলা ভ্রমে রাহু করিলা কি গ্রাস ॥
রাজ্যচ্যুত যগুপি হয়েছি আমি বটে।
রাজলক্ষ্মী আমার ছিলেন সন্নিকটে ॥
আমার সে রাজলক্ষ্মী হারালাম বনে।
কৈকেয়ীর মনোভীষ্ট সিদ্ধ এক দিনে ॥"

কবির অন্যান্য রচনা

রামায়ণ ভিন্ন 'যোগাত্মার বন্দনা', 'শিবরামের যুদ্ধ', 'রুক্মাঙ্গদ রাজার একাদশী' প্রভৃতি অপর কয়েকখানি ক্ষুদ্র পুঁথিতে কৃত্তিবাসের ভণিতা দৃষ্ট হয়। আমরা "The Bengali Ramayanas" * নামক পুস্তকে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, বাল্মীকির পূর্ব্বেও ভারতবর্ষে রামায়ণ আখ্যান প্রচলিত ছিল; রামায়ণ-গাথা উত্তর ভারতে যে আকারে প্রচলিত ছিল, তাহাতে সম্ভবতঃ রাবণের সঙ্গে সেই উপাখ্যানের কোন সংস্রবই ছিল না; এবং ইহাও প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি, যে দাক্ষিণাত্যের বহু গাথায় দ্রাবীড় জাতীয় বীর রাবণ নায়করূপে পরিকীর্ত্তিত ছিলেন। "লঙ্কেশ্বর সূত্রে" তিনি বুদ্ধের সঙ্গে অনেক তর্ক বিতর্ক করিয়া অবশেষে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, এরূপ বর্ণিত আছে। জৈন-রামায়ণে দৃষ্ট হয়, ইনি যোগ-সাধনায় এরূপ কৃতিত্ব লাভ করেন, যে পঞ্চ-ভূত ইঁহার আয়ত্বাধীন হয় এবং ইনি ইন্দ্রিয়বিজয়ী মহা-পুরুষরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। সম্ভবতঃ বাল্মীকির পূর্ব্বেই উত্তর ভারতের রাম-গীতি এবং দাক্ষিণাত্যের রাবণ গাথা একত্র করা হয়। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্ম-গুরুকে হিন্দুগণ দস্যুরূপে অঙ্কন করিয়া যে মিশ্র-গাথার উদ্ভব করেন—বাল্মীকির প্রতিভা-মন্ত্র তাহার উপর রামায়ণরূপ বিশাল অট্টালিকার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। এ সম্বন্ধে আমি "The Bengali Ramayanas" পুস্তকে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়াছি। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বাল্মীকি-পূর্ব্ব রামায়ণ-উপাখ্যানের অন্তগামী স্মৃতি এই বাঙ্গালা রামায়ণগুলিতে কিছু কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে সকল প্রবাদ ও গাথা সমস্ত ভারতময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল,—যাহা বৃদ্ধ বাল্মীকির শুক্লকেশ ছাপাইয়া ও প্রাচীনত্বের দাবী করিতেছে, তাহাদের চিহ্ন এই বাঙ্গালা রামায়ণে পাওয়া যায়। রাবণ ও হনুমান সংক্রান্ত বর্ণনাগুলিতেই সেগুলি বিশেষরূপে বিদ্যমান। এই স্থানে তাহার পুনরায় অবতারণা

* এই পুস্তক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

করিয়া আমরা এই পুস্তক অতিরিক্ত মাত্রায় ভারাক্রান্ত করিব না। আর একটি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ১১শ ও ১২শ শতাব্দীতে য়ুরোপে প্রচলিত অনেক আখ্যানের সঙ্গে বাঙ্গালা রামায়ণোক্ত কোন কোন কাহিনীর অদ্ভুত সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইতেছে। গ্যালিক দেবতা বা অপদেবতা Balorএর সঙ্গে ভস্মলোচনের আশ্চর্য্য ঐক্য দৃষ্ট হয়। Balorএর একটি চক্ষুর দৃষ্টির এরূপ মারাত্মক গুণ ছিল, যে তাহা যাহার উপর ক্ষেপন করিত তাহাই ভস্ম হইয়া যাইত। সে সর্ব্বদা সেই চক্ষু চস্‌মা পরিয়া ঢাকিয়া রাখিত এবং যুদ্ধক্ষেত্রে সেই চস্‌মা খুলিয়া ফেলিয়া শত্রুর দিকে চাহিত। (১) ভস্মলোচনও যে তাহার মারাত্মক চক্ষু চর্ম্মের ঠুলি দিয়া ঢাকিয়া রাখিত ও রণক্ষেত্রে আসিয়া ঠুলি খুলিয়া শত্রুগণের দিকে তাকাইত, তাহা বঙ্গীয় রামায়ণের পাঠকগণ অবশ্যই জ্ঞাত আছেন। সেই গ্যালিক উপাখ্যানগুলিতে King Luddএর রাজ্যের একটি তস্করের কথা আছে। সে ঠিক মহীরাবণের মত মন্ত্রবলে সমস্ত লোককে নিদ্রাভিভূত করিতে পারিত। (২) এই ভস্মলোচন বা মহীরাবণের বৃত্তান্ত কোন সংস্কৃত পুস্তকে আছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। য়ুরোপ ও ভারতবর্ষের মধ্যে এই উপাখ্যান মালা সম্বন্ধে আদান প্রদান কার্য্য কবে হইয়াছিল এবং ইহাদের কোনটির জন্য য়ুরোপ ভারতবর্ষের নিকট ঋণী এবং কোনটি ভারতবর্ষ য়ুরোপ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে আমরা এই পুস্তকের ৬৩ পৃষ্ঠায় সামান্যভাবে উল্লেখ করিয়াছি।

আমরা এখন কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণটি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। এই আত্মবিবরণটি প্রথমতঃ ৺হারাধন দত্ত ভক্তনিধি একখানি সুপ্রাচীন পুঁথি হইতে নকল করিয়া আমাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তৎপর সাহিত্য পরিষৎ-সংগৃহীত একখানি পুঁথিতেও আমরা ইহা পাইয়াছিলাম। হারাধন দত্তের পুঁথিখানি অতি প্রাচীন ১৫০১ খৃষ্টাব্দে লিখিত। তাহা রায় বাহাদুর যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় অনুসন্ধানপূর্ব্বক প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন :—

কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণ

পূর্ব্বেতে আছিল বেদানুজ (৩) মহারাজা
তাঁহার পাত্র আছিল নারসিংহ ওঝা। (৪)

---

(১) Celtic Myth aud Legend by Charles Squire ৪৯ পৃষ্ঠা।

(২) ঐ ৩৪৯ পৃষ্ঠা।

(৩) আমার বোধ হয় "বেদানুজ" পাঠ ঠিক নহে! "পূর্ব্বেতে আছিল যে দঁনুজ মহারাজা" ইহাই আদত পাঠ। যে'কে "বে" ভ্রম করিয়া গোলযোগের উৎপত্তি হইয়াছে, বস্তুতঃ দনুজ মহারাজাই সেই সময়ে বিদ্যমান ছিলেন, বেদানুজ নামক কোন রাজার অস্তিত্ব জানা যায় না।

(৪) নৃসিংহ ওঝা আদিত্য হইতে অধস্তন ৪র্থ পুরুষ। ইঁহার পরবর্ত্তী যে সমস্ত নাম পাওয়া যায়, তাহার সকল গুলিরই কুলজী গ্রন্থের সঙ্গে ঐক্য দৃষ্ট হয়।

বঙ্গদেশে প্রমাদ হৈল সকলে অস্থির।
বঙ্গদেশ ছাড়ি ওঝা আইলা গঙ্গাতীর॥
সুখভোগ ইচ্ছায় বিহরে গঙ্গাকূলে।
বসতি করিতে স্থান খুঁজে খুঁজে বুলে॥
গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিগে চায়।
রাত্রিকাল হইল ওঝা শুতিল তথায়॥
পুহাইতে আছে যখন দণ্ডেক রজনী।
আচম্বিতে শুনিলেন কুকুরের ধ্বনি॥
কুকুরের ধ্বনি শুনি চারিদিকে চায়।
হেনকালে আকাশ-বাণী শুনিবারে পায়॥
মালীজাতি ছিল পূর্ব্বে মালঞ্চ এথানা।
ফুলিয়া * বলিয়া কৈল তাহার ঘোষণা॥
গ্রামরত্ন ফুলিয়া জগতে বাখানি।
দক্ষিণে পশ্চিমে বহে গঙ্গা তরঙ্গিণী॥
ফুলিয়া চাপিয়া হৈল তাঁহার বসতি।
ধন ধান্যে পুত্র পৌত্র বাড়য় সন্ততি॥
গর্ভেশ্বর নামে পুত্র হৈল মহাশয়।
মুরারি, সূর্য্য, গোবিন্দ, তাহার তনয়॥
জ্ঞানেতে কুলেতে ছিল মুরারি ভূষিত।
সাত পুত্র হৈল তার সংসারে বিদিত॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র হৈল তার নাম যে ভৈরব।
রাজার সভায় তার অধিক গৌরব॥
মহাপুরুষ মুরারি জগতে বাখানি।
ধর্ম্মচর্চ্চায় রত মহান্ত যে মানী॥
মদ-রহিত ওঝা সুন্দর মূরতি।
মার্কণ্ড ব্যাস সম শাস্ত্রে অবগতি॥
সুশীল-ভগবান তথি বনমালী।
প্রথম বিভা কৈল ওঝা কুলেতে গাঙ্গুলী॥
দেশ যে সমস্ত ব্রাহ্মণের অধিকার।
বঙ্গভাগে ভুঞ্জে তিঁহ সুখের সংসার॥

---

* নদীয়া জেলার অন্তর্গত রাণাঘাট ষ্টেশন হইতে ৭ মাইল পশ্চিম দক্ষিণে ফুলিয়া গ্রাম অবস্থিত।

কুলে শীলে ঠাকুরালে গোসাঞি প্রসাদে।
মুরারি ওঝার পুত্র সব বাড়য়ে সম্পদে॥
মাতার পতিব্রতার যশ জগতে বাখানি।
ছয় সহোদর হৈল এক যে ভগিনী॥
সংসারে সানন্দ সতত কৃত্তিবাস।
ভাই মৃত্যুঞ্জয় করে বড় উপবাস॥
সহোদর শান্তি মাধব সর্ব্বলোকে ঘুষি।
শ্রীধর * ভাই তার নিত্য উপবাসী॥
বলভদ্র চতুর্ভুজ নামেতে ভাস্কর।
আর এক বহিন হৈল সতাই উদর॥
মালিনী নামেতে মাতা, বাপ বনমালী।
ছয় ভাই উপজিলাম সংসারে গুণশালী॥
আপনার জন্মকথা কহিব যে পাছে।
মুখটি বংশের কথা আরো কৈতে আছে॥
সূর্য্য পণ্ডিতের পুত্র হৈলা নাম বিভাকর।
সর্ব্বত্র জিনিয়া পণ্ডিত বাপের সোসর॥
সূর্য্যপুত্র নিশাপতি বড় ঠাকুরাল।
সহস্র সংখ্যক লোক দ্বারেতে যাহার॥
রাজা গৌড়েশ্বর দিল প্রসাদী এক ঘোড়া।
পাত্র মিত্র সকলে দিলেন খাষা জোড়া॥
গোবিন্দ, জয় আদিত্য ঠাকুর বসুন্ধর।
বিদ্যাপতি রুদ্র ওঝা তাঁহার কোঙর॥
ভৈরব সুত গজপতি বড় ঠাকুরাল।
বারাণসী পর্য্যন্ত কীর্ত্তি ঘোষয়ে যাঁহার॥
মুখটি বংশের পদ্ম শাস্ত্রে অবতার।
ব্রাহ্মণ সজ্জনে শিখে যাঁহার আচার॥
কুলে, শীলে, ঠাকুরালে ব্রহ্মচর্য্য গুণে।
মুখটি বংশের যশ জগতে বাখানে॥

---

* মুরারী ওঝার নাতি শ্রীধরকৃত রাধার 'বারমাস্যা' নামক একটি কবিতা সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে। ১১০ পৃষ্ঠায় তাহার উল্লেখ করা গিয়াছে।

আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ (?) মাঘমাস।
তথিমধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস ॥
শুভক্ষণে গর্ভ হইতে পড়িনু ভূতলে।
উত্তম বস্ত্র দিয়া পিতা আমা নৈল কোলে ॥
দক্ষিণ যাইতে পিতামহের উল্লাস।
কৃত্তিবাস বলি নাম করিলা প্রকাশ ॥
এগার নিবড়ে * যখন বারতে প্রবেশ।
হেনকালে পড়িতে গেলাম উত্তর দেশ ॥
বৃহস্পতিবারের উষা পোহালে শুক্রবার।
পাঠের নিমিত্ত গেলাম বড়গঙ্গাপার ॥ †
তথায় করিলাম আমি বিদ্যার উদ্ধার।
যথা যথা যাই তথা বিদ্যার বিচার ॥
সরস্বতী অধিষ্ঠান আমার শরীরে।
নানা ছন্দে নানা ভাষা আপনা হৈতে স্ফুরে ॥
বিদ্যা সাঙ্গ করিতে প্রথমে হৈল মন।
গুরুকে দক্ষিণা দিয়া ঘরকে গমন ॥
ব্যাস বশিষ্ঠ যেন বাল্মীকি চ্যবন।
হেন গুরুর ঠাঞি আমার বিদ্যা সমাপন।
ব্রহ্মার সদৃশ গুরু বড় উম্মাকার। (‡)
হেন গুরুর ঠাঞি আমার বিদ্যার উদ্ধার ॥

---

* নিবড়ে, অতীত হইলে।

† বড়গঙ্গা যশোহরে ; "পূর্ব্ব সীমা ধুল্যাপুর বড়গঙ্গার পার"—অন্নদামঙ্গল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৭১৭ নং পুথিতে এই কয়েকটি ছত্র পাওয়া যায়—

"ছোটর বন্দো বড়র বন্দো বড় গঙ্গার পার।
যথা তথা করিয়া বেড়ান বিদ্যার উদ্ধার ॥
রাড়া মধৈ বন্দিনু আচার্য্য চূড়ামণি।
জার ঠাই কিত্তিবাস পড়িলা আপনি ॥

'রাড়ার মধ্যে, অর্থ রাঢের মধ্যে, সুতরাং দেখা যাইতেছে, কৃত্তিবাস "আচার্য্য চূড়ামণি" নামক অপর একজন অধ্যাপকের নিকটও পাঠ করিয়াছিলেন।

(‡) উম্মাকার—তেজস্বী।

গুরুর স্থানে মেলানি (১) লইলাম মঙ্গলবার দিবসে।
গুরু প্রশংসিলা মোরে অশেষ বিশেষে॥
রাজপণ্ডিত হব মনে আশা করে।
পঞ্চ শ্লোক ভেটিলাম (২) রাজা গৌড়েশ্বরে॥
দ্বারী হস্তে শ্লোক দিয়া রাজাকে জানালাম।
রাজাজ্ঞা অপেক্ষা করি দ্বারেতে রহিলাম॥
সপ্তঘটি বেলা যখন দেয়ালে পড়ে কাটি।
শীঘ্র ধাই আইল দ্বারী হাতে সুবর্ণ লাঠি॥
কার নাম ফুলিয়ার মুখটি কৃত্তিবাস।
রাজার আদেশ হইল করহ সম্ভাষ॥
নয় দেউড়ী পার হয়ে গেলাম দরবারে।
সিংহ সম দেখি রাজা সিংহাসনোপরে॥
রাজার ডাহিণে আছে পাত্র জগদানন্দ।
তার পাছে বসিয়াছে ব্রাহ্মণ সুনন্দ॥
বামেতে কেদার খাঁ ডাহিণে নারায়ণ।
পাত্র মিত্র সহ রাজা পরিহাসে মন॥
গন্ধর্ব্ব রায় বসে আছে গন্ধর্ব্ব অবতার।
রাজসভা পূজিত তিঁহ গৌরব অপার॥
তিন পাত্র দাঁড়াইয়া আছে রাজার পাশে।
পাত্র মিত্র লয়ে রাজা করে পরিহাসে॥
ডাহিণে কেদার রায় বামেতে তরণী।
সুন্দর শ্রীবৎস আদি ধর্ম্মাদিকারিণী॥
মুকুন্দ রাজার পণ্ডিত প্রধান সুন্দর।
জগদানন্দ রায় মহা পাত্রের কোঙর॥
রাজার সভাখান যেন দেব অবতার।
দেখিয়া আমার চিত্তে লাগে চমৎকার॥
পাত্রেতে বেষ্টিত রাজা আছে বড় সুখে।
অনেক লোক দাণ্ডাইয়া রাজার সম্মুখে॥

---

(১) মেলানি—বিদায়।
(২) ভেট (উপহার) দিলাম, পাঠাইলাম।

চারিদিকে নাট্যগীত সর্ব্বলোক হাসে।
চারিদিগে ধাওয়াধাই রাজার আবাস ॥ *
আঙ্গিনায় পড়িয়াছে রাঙ্গা মাজুরি।
তার উপর পড়িয়াছে নেতের পাছুড়ি ॥
পাটের চাঁদোয়া শোভে মাথার উপর।
মাঘমাসে খরা † পোহায় রাজা গৌড়েশ্বর ॥
দাণ্ডাইমু গিয়া আমি রাজ-বিগুমানে।
নিকটে যাইতে রাজা দিল হাত সানে ॥ ‡
রাজ আদেশ কৈল পাত্র ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
রাজার সম্মুখে আনি গেলাম সত্বরে ॥
রাজার ঠাঁই দাঁড়াইলাম হাত চারি অন্তরে।
সাত শ্লোক পড়িলাম শুনে গৌড়েশ্বরে ॥
পঞ্চদেব অধিষ্ঠান আমার শরীরে।
সরস্বতী প্রসাদে শ্লোক মুখ হৈতে স্ফুরে ॥
নানা ছন্দে শ্লোক আনি পড়িমু সভায়।
শ্লোক শুনি গৌড়েশ্বর আমা পানে চায় ॥
নানা মতে নানা শ্লোক পড়িলাম রসাল।
খুষি হৈয়া মহারাজ দিলা পুষ্পমাল ॥
কেদার খাঁ শিরে ঢালে চন্দনের ছড়া।
রাজা গৌড়েশ্বর দিল পাটের পাছড়া ॥ §
রাজা গৌড়েশ্বর বলে কিবা দিব দান।
পাত্র মিত্র বলে রাজা যা হয় বিধান ॥
পঞ্চগৌড় চাপিয়া গৌড়েশ্বর রাজা।

---

* আওয়ার গৃহ, অনেক স্থলেই এই অর্থে ব্যবহৃত হইত, যথা, "তার মধ্যে দেখ পদ্মাবতীর আওাস। সমীর সঞ্চার নাহি পক্ষীর প্রকাশ।"—অলওয়াল-কৃত পদ্মাবতী।

† খরা,—রৌদ্র, যথা,—খনা, —"জ্যৈষ্ঠে খরা, আষাঢ়ে ধারা, শস্যের ভার না সহে ধরা।"

‡ সানে—সঙ্কেত, 'সখীসব দেখাইয়া অঙ্গুলীর সানে,'—রাজেন্দ্র দাসের শকুন্তলা।

§ পাটের পাছড়া পট্টবস্ত্র। 'পাটের পাছড়া' শব্দ প্রাচীন সাহিত্যে অনেক স্থলেই পাওয়া যায়,—"বিনে বান্দি নাহি পিন্দে পাটের পাছড়া"—মা, চ, গা, ১০ শ্লোক।

"পাটের পাছড়া পৃষ্ঠে ঘন উড়ে যায়।
ধড়ার অাঁচল লুটি পাএ পড়ি যায় ॥—শ্রীকৃষ্ণবিজয়।

গৌড়েশ্বর পূজা কৈলে গুণের হয় পূজা ॥
পাত্র মিত্র সবে বলে শুন দ্বিজরাজে।
যাহা ইচ্ছা হয় তাহা চাহ মহারাজে ॥
কারো কিছু নাই লই করি পরিহার।
যথা যাই তথায় গৌরব মাত্র সার ॥
যত যত মহাপণ্ডিত আছয়ে সংসারে।
আমার কবিতা কেহ নিন্দিতে না পারে ॥
সন্তুষ্ট হইয়া রাজা দিলেন সন্তোক।
রামায়ণ রচিতে করিলা অনুরোধ ॥
প্রসাদ পাইয়া বারি হইলাম সত্বরে।
অপূর্ব্ব জ্ঞানে ধায় লোক আমা দেখিবারে ॥
চন্দনে ভূষিত আমি লোক আনন্দিত।
সব বলে ধন্য ধন্য ফুলিয়া পণ্ডিত ॥
মুনি মধ্যে বাখানি বাল্মীকি মহামুনি।
পণ্ডিতের মধ্যে কৃত্তিবাস গুণী ॥
বাপ মায়ের আশীর্ব্বাদে, গুরু আজ্ঞা দান।
রাজাজ্ঞায় রচি গীত সপ্তকাণ্ড গান ॥
সাতকাণ্ড কথা হয় দেবের সৃজিত।
লোক বুঝাবার তরে কৃত্তিবাস পণ্ডিত ॥
রঘুবংশের কীর্ত্তি কেবা বর্ণিবারে পারে।
কৃত্তিবাস রচে গীত সরস্বতীর বরে ॥ *

কৃত্তিবাস "আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘ মাস"—এই ভাবে স্বীয় জন্মের তারিখের উল্লেখ করিয়াছিলেন। রায় বাহাদুর যোগেশচন্দ্র "পূর্ণ মাঘ মাস" অর্থ মাঘ সংক্রান্তি ধরিয়া, রবিবার শ্রীপঞ্চমী ও মাঘ সংক্রান্তি এই তিনের যোগে "১৪৩২ খৃঃ ২৯শে মাঘ" প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং তাহা হইতে জ্যোতিষিক সূক্ষ্ম গণনা করিয়া "এগার নিবড়ে যখন বারতে প্রবেশ" এই ছত্র অবলম্বন পূর্ব্বক ১৩৩৫ (১৪৪৩ খৃঃ) শকের ৪ঠা ফাল্গুন বৃহস্পতিবার তারিখটি কৃত্তিবাসের বিদ্যারম্ভ কাল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তিনি প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে এই দিন উত্তর গমন ("হেনকালে পড়িতে গেলাম উত্তর দেশ") ও বিদ্যারম্ভ—উভয়ের পক্ষেই সুপ্রশস্ত। †

* বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রথম সংস্করণে কৃত্তিবাসের এই আত্মবিবরণটি সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল।

† সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা ১৩২০ বাং ৪র্থ খণ্ড।

কিন্তু এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে ঘোরতর সন্দেহের বিষয় এই যে পাঠটি প্রকৃত পক্ষে "পূর্ণ মাঘ মাস" নহে—অপিচ উহা "পুণ্য মাঘ মাস" হওয়ারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। প্রথমতঃ "পূর্ণ মাঘ মাস" কথার একটা পরিষ্কার অর্থ হয় না। উহা যে কোন কালে "মাঘ সংক্রান্তি" বুঝাইয়াছে এরূপ কোন অভিধানে বলে না—এবং বঙ্গ সাহিত্যে সেরূপ প্রয়োগও দুর্লভ। দ্বিতীয়তঃ যাঁহারা বঙ্গীয় প্রাচীন পুঁথি ঘাঁটিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে পুঁথিতে অনেক সময়েই "ণ্য" "র্ণ" মত লিখিত হইত। বিশেষতঃ "পুণ্য মাঘ মাস" কথাটির পল্লীদেশে এরূপ প্রচলন আছে যে, এই কথায়ই কৃত্তিবাস ব্যবহার করিয়াছিলেন বলিয়া আমাদের ধারণা।

জ্যোতিষিক গণনার ভিত্তিভূমি এই ভাবে চূর্ণ হইয়া গেলে, আমাদের অপর কোন প্রমাণের উপর কৃত্তিবাসের জন্মের সময় গড়িয়া তুলিতে হইবে। উদ্ধৃত আত্ম-কথায় সেরূপ প্রমাণ কি আছে দেখা যাউক। শ্রীযুক্ত এইচ, ষ্ট্যাপলটন সাহেব এবং আমি এতৎসম্বন্ধে অনেক বাদানুবাদের পর যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তাহা এখানে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতেছি। পাঠকগণ ঢাকা রিভিউ পত্রিকায় (Vol. II, No. 12 p. 448) সেই বাদানুবাদের কতক দেখিতে পাইবেন। ষ্ট্যাপলটন সাহেব বঙ্গীয় মুসলমান রাজগণের ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ, এবং তিনি তাঁহাদের রাজত্বকালের যে সন তারিখ দিয়াছেন, তাহা প্রামাণিক বলিয়া আমরা গ্রহণ করিয়াছি।

আর একটি কথা ভগীরথের গঙ্গা আনায়নের প্রসঙ্গে "সপ্তদ্বীপসার নবদ্বীপ" বটতলার রামায়ণের এই পাঠ দৃষ্টে কেহ কেহ মনে করেন, হয়ত এই ছত্রটি দ্বারা কবি চৈতন্যের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালার ১৭নং এবং ১৩নং পুথিদ্বয়ের ক্রমান্বয়ে ১৩ ও ৬৬ পৃষ্ঠায় দেখিলাম বটতলায় রামায়ণের ঐ ছত্রটি ঐ পুস্তকদ্বয়ে নাই, ভগীরথের প্রসঙ্গে নদীয়ার নামটি আছে মাত্র। উহাতে সপ্তদ্বীপে সার নবদ্বীপ কথা উল্লেখ নাই। শা পুরের উল্লেখও তাহাতে নেই। ভাগলপুরের 'কাহাল' নামক গ্রামের নাম, ইন্দ্রানি ও সপ্তগ্রামের উল্লেখ আছে, নবদ্বীপের নাম পাইয়া পরবর্ত্তী পুঁথিলেখকেরা নিশ্চয়ই ভক্তি প্রদর্শন জন্য ঐরূপ যোজনা করিয়াছেন।

নৃসিংহ ওঝা বঙ্গদেশব্যাপী যে ঘোর "প্রমাদের" কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহা সোনারগাঁয়ে হিন্দু-রাজত্বের ধ্বংস ও মুসলান প্রভাবের অভ্যুদয় সূচিত করিতেছে। সামসুদ্দিন ফিরোজ সা হিন্দু-স্বাধীনতা নষ্ট করিয়া ১৩০২ হইতে ১৩২২ পর্য্যন্ত পূর্ব্ববঙ্গে রাজত্ব করেন। এই সময় তুর্কী গাজি জাফর খাঁ—যিনি প্রথমতঃ হিন্দুধর্ম্মের ঘোর বিরোধী থাকিয়া শেষে আমাদের ধর্ম্মের প্রতি এতদূর অনুকূল হইয়াছিলেন যে সংস্কৃত ভাষায় গঙ্গাস্তোত্র লিখিয়া প্রসিদ্ধ হন—তিনি ২৪পরগণা অঞ্চলে রাজত্ব করিতেছিলেন—সুতরাং এই অঞ্চলের ফুলিয়া গ্রামে নৃসিংহ ওঝা বাস করিয়া নিরাপদ হইয়াছিলেন। নৃসিংহ ওঝা সম্ভবতঃ ১৩১০ খৃঃ অব্দে পূর্ব্ববঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক ফুলিয়ায় আসিয়া বাস

করেন। কৃত্তিবাস উৎসাহ হইতে অধস্তন নবম পুরুষ, বাচস্পতি মিশ্রের কারিকা হইতে জানা যায় যে উৎসাহ বল্লালের সভায় পূজিত হইয়াছিলেন। বল্লাল সেন ১১৬৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। সুতরাং দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে উৎসাহের জন্মকাল ধরিলে তিন পুরুষের ১০০ বৎসর পরিকল্পনা পূর্ব্বক আমরা চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কৃত্তিবাসের জন্ম-কাল পাইতেছি। এদিকে ১৪০৭ শকে (১৪৮৫ খৃঃ) লিখিত, ধ্রুবানন্দের মহাবংশাবলী গ্রন্থে দেখিতে পাই ১৪০২ শকে (৪৮ খৃঃ অব্দে) গঙ্গানন্দী, সদানন্দী, এবং মালাধারী মেল প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। গঙ্গানন্দ ও সদানন্দ কৃত্তিবাসের জ্ঞাতি-ভ্রাতা, কিন্তু মালাধর তাঁহার আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র। যদি কৃত্তিবাস বা তাঁহার ভ্রাতৃগণের কেহ জীবিত থাকিতেন, তবে তাহাদিগকে ছাঁটিয়া ফেলিয়া মালাধরের নামে মেল প্রবর্ত্তিত হইত না, মালাধর ইহাদের ভ্রাতুষ্পুত্র। কৃত্তিবাস গৌড়েশ্বর কর্ত্তৃক পূজিত হইয়াছিলেন এবং ধ্রুবানন্দ ইহাঁর সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন "কৃত্তিবাসঃ কবির্ধীমান্ সাম্য শান্তিজনপ্রিয়ঃ।" এতাদৃশ ব্যক্তিকে লঙ্ঘন করিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রের নামে মেল গঠিত হওয়ার সম্ভাবনা অল্প—সেকালে কোন পরিবারের সম্পর্কে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি প্রায়ই এরূপভাবে উল্লঙ্ঘিত হইতেন না। সুতরাং ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে সম্ভবতঃ কৃত্তিবাস কিম্বা তাঁহার ভ্রাতৃবর্গের কেহ জীবিত ছিলেন না। বিশেষতঃ ১৪৮৬ খৃঃ অব্দে মহাপ্রভুর জন্ম, তাঁহার বহু পূর্ব্বে অদ্বৈত ও শ্রীনিবাস জন্মগ্রহণ করেন। অদ্বৈতের জন্মকাল ১৪৩২ খৃষ্টাব্দে এবং নরহরি সম্ভবতঃ ১৪৬১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁদের সময় কৃত্তিবাস জীবিত থাকিলে তাহার উল্লেখ অবশ্যই বৈষ্ণব সাহিত্যে থাকিত। জয়ানন্দ, অগ্রবর্ত্তী কবি স্বরূপ অপবাপর কবির সঙ্গে কৃত্তিবাসেব বন্দনা করিয়াছেন। সমস্ত বৈষ্ণব সাহিত্যে ইহা ছাড়া তাঁহার সম্বন্ধে আব কোন উল্লেখ নাই। মহাপ্রভু ফুলিয়ায় গিয়াছিলেন কিন্তু তৎসম্বন্ধীয় কোন বিবরণেও ফুলিয়ার কবির কোন নাম নাই। সুতরাং এদিক হইতেও মনে হয় কৃত্তিবাস বহু পূর্ব্বে ধরাধাম হইতে অপসৃত হইয়াছিলেন। কৃত্তিবাসের রামায়ণের একখানি প্রাচীন অরণ্যকাণ্ডের পুঁথির ভণিতায় লিখিত আছে, তিনি অরণ্যকাণ্ড লিখার সময়ই রোগ জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিলেন, সুতরাং তিনি দীর্ঘায়ু হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। এই সমস্ত কারণে মনে হয় তিনি পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন।

কৃত্তিবাস যে রাজ সভার বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা হিন্দুরাজার।' রাজার সমস্ত কর্ম্মচারী ও মন্ত্রী হিন্দু, রাজা সংস্কৃত শ্লোক শুনিয়া অর্থ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এবং কবি "চন্দনের ছড়া" দ্বারা অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন। এই রাজার যে বর্ণনা আছে, তাহাতে স্পষ্টই মনে হয়, তিনি গৌড়ের প্রবল প্রতাপান্বিত সম্রাট্। "গৌড়েশ্বর" উপাধি শুধু ব্যবহারিক ভদ্রতা বা স্তাবক-কৃত প্রশংসাবাদ সূচক নহে। "নয় দেউড়ী" পার হইয়া, সুবর্ণ-যষ্টি-ধারী রাজদূত তাঁহাকে রাজ-সভায় উপস্থিত করাইল,

তথায় দ্বারী উচ্চৈঃস্বরে তাঁহার আগমন জ্ঞাপন করিল; কৃত্তিবাসকে এত্তেলা দিয়া রাজ-দ্বারে অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। সচিবগণ কবিকে জানাইয়াছিল একমাত্র গৌড়েশ্বর যাঁহাকে আদর করিবেন, তাঁহারই গুণগাথা সমস্ত প্রদেশে প্রতিষ্ঠা পাইবে। রাজার বহু সচিব, সভাপতি, ও ধর্ম্মাধিকারগণের বর্ণনা ও "সিংহ সম দেখি রাজা সিংহাসন পরে।" প্রভৃতি ছত্র পড়িয়া মনে হয়, তিনি সাধারণ জমিদার ছিলেন না, অপিচ এই সভায় অমাত্যের "খাঁ" উপাধি দেখিয়া মনে হয়, এই সভা মুসলমান-প্রভাব বর্জ্জিত ছিল না। মুসলমান বিজয়ের পরে একমাত্র রাজা গণেশ গৌড়ের সিংহাসনে আসীন হইয়াছিলেন। তিনি ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ১৩৮০ খৃষ্টাব্দে কিংবা তৎসন্নিহিত কোন কাল কৃত্তিবাসের জন্ম তারিখ ধরিয়া লইলে কবি এই কালের মধ্যে কোন সময়ে রাজ-দরবারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। যেদিক্ হইতেই আলোচনা করা যায়, কৃত্তিবাসের সময় আমাদের আনুমানিক কাল হইতে দূরবর্ত্তী হইবার সম্ভাবনা দেখিতেছি না। * এই আত্ম বিবরণে "দেশে যে সমস্ত ব্রাহ্মণের অধিকার" এবং গৌড়েশ্বরকে "মহারাজ" বলিয়া উল্লেখ দৃষ্টে ও আমাদের মনে হয়—কৃত্তিবাসের পৃষ্ঠপোষক রাজা গণেশ ভিন্ন আর কেহ নহেন।

কৃত্তিবাস যেদিন রাজার দ্বারা অভিনন্দিত হইলেন, সে দিন নগরীতে 'ধন্য' 'ধন্য' শব্দ উত্থিত হইয়াছিল, সেই ধন্যবাদের প্রতিধ্বনি এখনও লুপ্ত হয় নাই। বঙ্গসাহিত্যে সে এক শুভ মুহূর্ত্ত। তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষ উৎসাহ যেরূপ আত্মমর্য্যাদা, তেজস্বীতা এবং বৈরাগ্যের সঙ্গে রাজকীয় "স্বর্ণগাভী" দান উপেক্ষা করিয়াছিলেন, কৃত্তিবাসও সেই ভাবে গৌড়েশ্বরের দান প্রতিগ্রহ করিতে সম্মত হন নাই। তিনি গৌরব চান, পার্থিব অর্থ নগণ্য, "আমার রচনা অনিন্দ্য এই শুধু শুনিতে চাই।" সে কথা গৌড়েশ্বর হইতে আরম্ভ করিয়া এই পাঁচ শত বৎসর পর্য্যন্ত বঙ্গীয় প্রতি গৃহে গৃহে স্বীকৃত হইয়াছে; তৎসম্বন্ধে মৎ-সম্পাদিত রামায়ণের ভূমিকায় যাহা লিখিয়াছিলাম, এখানে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

"কৃত্তিবাস মুখটি বংশের অনেক প্রশংসা কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহাদের কেহ কেহ বারাণসী পর্য্যন্ত কীর্ত্তি বিস্তার করিয়াছিলেন। কেহ বা গৌড়েশ্বরের প্রসাদ-চিহ্ন ঘোটক এবং বহুমূল্য পরিচ্ছদাদি লাভ করিয়া রাজসম্মানে ভূষিত হইয়াছিলেন; কেহ বা মার্কণ্ড ও ব্যাসের ন্যায় শাস্ত্রজ্ঞ ও ঋষি-

* কেহ কেহ অনুমান করেন, কৃত্তিবাস তাহিরপুরের জমিদার কংস-নারায়ণের সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু কংস-নারায়ণের শেষে যে বংশাবলী পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে তাঁহাকে ষোড়শ শতাব্দীর পরের লোক বলিয়াই অনুমান হয়। কৃত্তিবাস বর্ণিত কয়েকটি রাজ সভাসদের সঙ্গে কংস নারায়ণের আত্মীয় কয়েক জনের নামের ঐক্য দ্বারা এইরূপ সিদ্ধান্ত করা ঠিক হইবে না। এই পুস্তকের পূর্ব্ব এক সংস্করণে আমরা এই নামের ঐক্য দৃষ্টে ভ্রমে পড়িয়াছিলাম,—কেদার খাঁকে 'কেশব খাঁ' শ্রীবৎসকে 'শ্রীকৃষ্ণ' ইত্যাদি ভাবে পাঠ পরিবর্ত্তন করিয়াও কৃত্তিবাসকে হুসেন সাহের সমকালবর্ত্তী করিতে হয়—সুতরাং এই মত আমরা গ্রহণ করিতে পারিলাম না।

তুল্য চরিত্রবান্ ছিলেন। কেহ বা সহস্রসংখ্যক অনুচর পরিবৃত হইয়া অমাত্যবন্ধুদের সঙ্গে সৌভাগ্যের তুঙ্গ শৃঙ্গে আসীন ছিলেন। যে সকল ব্যক্তির প্রসঙ্গ কবি অপূর্ব্ব স্ফূর্ত্তি সহকারে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পাঠকগণ স্বয়ং পড়িয়া দেখিবেন। কিন্তু আমরা বলিব, কৃত্তিবাসই এই মুখটি বংশের মুকুট-মণি ছিলেন; তিনি যাঁহাদের গৌরব কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার উল্লেখের গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়াছেন; তাঁহারা তাঁহার অমৃত স্পর্শে অমর হইয়াছেন, নতুবা এই পাঁচ শত বৎসব পরে কে তাঁহাদিগকে চিনিত? এমন কি যে গৌড়েশ্বরের পঞ্চ গৌড় ব্যাপক অধিকারের কথা উল্লেখ করিয়া কবি রাজকীয় অনুগ্রহে আপনাকে সম্মানিত মনে করিয়াছিলেন, কৃত্তিবাস তাঁহার সভায় পদধূলি দিয়াছিলেন বলিয়া আজ আমরা এত আগ্রহের সহিত সেই রাজা কে ছিলেন, তাহা জানিতে চাহি-তেছি; এবং তিনি যখন কবিকে দান দিতে চাহিলেন, কবি সগর্ব্বে তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন, সেই সময় পঞ্চগৌড়েশ্বরের মুকুটের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হীরকটি হইতে কবির মস্তকশোভী বাণীপ্রদত্ত নির্ম্মাল্য আমাদের চক্ষে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিয়াছিল। ধন্য কেদার খাঁ—যিনি কবির শিরে চন্দনের ছড়া ঢালিয়া বাণীর বরপুত্রকে অভিনন্দিত করিয়া সত্যই হস্ত পবিত্র কবিয়াছিলেন এবং গৌড়েশ্বর ধন্য, যিনি কবিকে রামায়ণ অনুবাদের ভার দিয়া বঙ্গদেশের শ্রেষ্ঠ হিতসাধন করিয়াছিলেন।”

(খ) অনন্ত রামায়ণ।

কৃত্তিবাসের পরে যাঁহারা রামায়ণ রচনা করেন তন্মধ্যে ‘অনন্ত রামায়ণ’ খানিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। শ্রীযুক্ত করুণানাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই পুস্তকখানি সংগ্রহ করিয়াছেন; ইহা বক্কলে লিখিত, অবস্থা অতি জীর্ণ শীর্ণ, পশ্চাতের কয়েকখানি পত্র নষ্ট হইয়াছে, সুতরাং সময় নির্দ্ধারণের উপায় নাই; বক্কলে লিখিত ও “দেখিতে অতি প্রাচীন” ইহাই এই পুস্তকের প্রাচীনত্বের প্রমাণ, ইহা ছাড়া আর একটি বিশেষ প্রমাণ ভাষা। শেষোক্ত বিষয়ে অনুমান বড় নিরাপদ নহে, অন্য প্রমাণাভাবেই গ্রন্থের ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সময় নিরূপণের চেষ্টা দেখিতে হয়, কিন্তু নিতান্ত মফঃস্বলের ভাষা এখনও প্রাচীন শব্দপরম্পরায় এরূপ জটিল রহিয়া গিয়াছে যে, বর্ত্তমান সময়েও যদি বঙ্গের কোন সীমান্ত পল্লীর প্রচলিত ভাষা লিখিত আকারে উপস্থিত হয়, তবে অদ্ভুত গবেষণার সাহায্যে আমরা তাহা প্রাকৃতিক যুগে কি বৌদ্ধাধিকারে লইয়া পৌঁছাইতে পারি। তবে অন্যান্য প্রমাণের অভাব হইলে ভাষা-পরীক্ষা ভিন্ন, সময় নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে গত্যন্তর নাই; অনন্ত-রামায়ণের ভাষা অত্যন্ত জটিল ও প্রাচীন, ইহা সকলেরই স্বীকার করিতে হইবে, কত প্রাচীন সে সম্বন্ধে মতভেদ হইতে পারে, এই পর্য্যন্ত; আমরা ইহা ন্যূন পক্ষে ৪০০ শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করি। গ্রন্থকারের বাসস্থান কি তৎসংক্রান্ত অন্য কোন বিষয়ের বিবরণই

অবলম্বিত পুঁথিখানিতে প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। কতকগুলি শব্দ দৃষ্টে একবার বোধ হয়, গ্রন্থকার শ্রীহট্ট কিম্বা তৎসন্নিহিত কোন জনপদের অধিবাসী ; 'চ' স্থলে 'ছ' ব্যবহারের জন্য আমরা চিরকাল শ্রীহট্টবাসী বন্ধুগণের সহিত আমোদ করিয়া আসিয়াছি, এই পুঁথিতে 'চরণ', 'বচন' স্থলে 'বছন', 'চাস' (চাহিস) স্থলে 'ছাষ', প্রভৃতি রূপ প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। অন্যান্য শব্দও শ্রীহট্ট প্রচলিত ভাষার সহিত সান্নিকট্যের পরিচয় দেয় ; তবে এ কথাও একবার মনে উদয় হয়, যে কবি না হইয়া গ্রন্থ-লেখকও শব্দের এবম্বিধ রূপান্তর করিয়া থাকিতে পারেন ;—প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে তদ্রূপ বিকৃতির উদাহরণও আমরা বিলক্ষণ পাইয়াছি।

এদিকে হিন্দী শব্দের সঙ্গেও এই পুঁথির ভাষার বিলক্ষণ নৈকট্য দৃষ্ট হয়, সুতরাং শ্রীহট্ট না হইয়া বঙ্গের পশ্চিমোত্তর প্রান্ত হইতে এই কবির উদ্ভব হওয়া বিচিত্র হইবে না। আমরা এই পুস্তকের প্রণেতাকে বঙ্গের পূর্ব্বোত্তর কি পশ্চিমোত্তর সীমান্ত স্থিত কোন পল্লীর অধিবাসী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। দুঃখের বিষয়, শ্রীযুক্ত করুণানাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই পুঁথি কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা একেবারে উল্লেখ করেন নাই।

অনন্তরামায়ণের ভাষা জটিল ও বন্ধুর, শুধু কাব্যামোদী পাঠক দু এক পৃষ্ঠা পাঠান্তেই ক্লান্ত হইয়া সুললিত বটতলার কৃত্তিবাসী আশ্রয় করিয়া নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ গ্রহণ করিবেন, "এই বুলি মকমকে কান্দে রঘু রাই।"—(রঘুবায় ইহা বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন) প্রভৃতি-রূপ রামবিলাপ পড়িতে ভেকের মকমকি স্মরণে পাঠক হাস্য না করিলেই রসের মর্য্যাদা অনেক পরিমাণে রক্ষিত হইবে। তবে বন্ধুর দুরারোহ স্থল ভ্রমণেরও একরূপ আকর্ষণ আছে তাহা না হইলে আগ্রার তাজমহল ও কলিকাতার ইডেন গার্ডেনের সুন্দর সুপ্রশস্ত পথ থাকিতে গোমুখীর উৎপত্তিস্থল

---

* সম্প্রতি পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, এই অনন্ত আসাম-বাসী। ইনি 'অনন্ত কন্দলী' নামে আসামবাসিগণের নিকট পরিচিত। ইঁহার রচিত রামায়ণের অংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের এণ্ট্রান্স পরীক্ষার জন্য পাঠ্যপুস্তকে উদ্ধৃত আছে। সুতরাং 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' হইতে ইঁহাকে বাদ দেওয়ার জন্য আমাদিগের নিকট অনুরোধ আসিয়াছে। কিন্তু যে যুগের ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস আমি লিখিতেছি, তখন আসামীভাষা বঙ্গভাষা হইতে পৃথক ছিল না। আজ যদি ত্রিপুরায় কিংবা শ্রীহট্টে তদ্দেশীয় প্রাদেশিক ভাষার আধিপত্য হয়, তবে সঞ্জয়, শ্রীকরনন্দী প্রভৃতি লেখকগণকে কখনই কি বঙ্গসাহিত্য হইতে বাদ দিতে পারি? অথচ, প্রাদেশিকত্ব ধরিলে তাঁহাদের রচনাও অনন্ত রামায়ণ হইতে কম দুরূহ নহে। আসামের প্রাচীন কবিগণের বিষয় আমরা সম্পূর্ণ জ্ঞাত নহি। তাঁহাদের বিবরণ পাইলে আমরা এ পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছি। আসামে অতি অল্প দিন হইল বঙ্গাক্ষর এবং বঙ্গভাষার গৌরব নষ্ট হইয়াছে। কিন্তু আসামের ভাষাকে আমরা বঙ্গভাষার প্রাদেশিকভেদ ভিন্ন স্বতন্ত্র ভাষা বলিয়া স্বীকার করি না।

কবি অনন্তের অপর নাম রাম সরস্বতী ; ইনি কামরূপবাসী ব্রাহ্মণ ছিলেন। আমরা অনন্ত কন্দলীকে এই পুস্তকে স্থান দিলেও আসামের গৌরবের দাবী করিতেছি না। চট্টগ্রামে কবি পরমেশ্বরকে আমরা যেরূপে আত্মসাৎ করিয়াছি—অনন্তকেও সেইভাবে দাবী করিব। তিনি যে ভাষায় বহী লিখিয়াছিলেন, তাহা বঙ্গদেশের পূর্ব্বসীমান্তের ভাষা, তিনি আসামবাসী কিন্তু বঙ্গভাষা-ভাষী, অর্থাৎ তাঁহার সময়ে আসাম-প্রচলিত লিখিত ভাষার সঙ্গে তৎকালীন বঙ্গীয় কবিদের ভাষার তেমন কোন পার্থক্য নাই।

দেখিবার জন্য বৈজ্ঞানিক পরিব্রাজকগণ কষ্ট স্বীকার করেন কেন এবং আর্টিক সমুদ্র সমুত্তীর্ণ হইয়া বরফের রাজ্য খুঁজিবার জন্য এ্যান্ড্রির মত লোক ক্ষিপ্তবৎ প্রাণ উৎসর্গ করিতে চান কেন ? সেইরূপ প্রাণান্ত উদ্যমের একটা স্থায়ী পুরস্কার, ও তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট একটি সুবিমল আত্মতৃপ্তি আছে ; এই সব প্রাচীন পুঁথি পাঠের উৎকট ধৈর্য্যেরও তদ্রূপ এক আকর্ষণ আছে এবং এ পথেও লোক জীবনোৎসর্গ না করিতেছে এমন নয়।

অনন্ত নামক কোন কবি এই পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়া স্বাক্ষর (ভণিতা) দেওয়ার সময় নিজেকে "মূর্খ"—"মহামূঢ়" প্রভৃতিরূপে বর্ণনা দ্বারা সৌজন্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। একটি স্থলে আসামের ধর্ম্ম-নেতা শঙ্করের কথাও ভণিতার পূর্ব্বে দৃষ্ট হয়, যথা "জয় জয় শ্রীমন্ত শঙ্কর পূর্ণকাম। কীর্ত্তনের ছন্দোবিরচিল গুণ নাম।"—যে স্থলে অপরাপর পুঁথিতে 'ধুয়া' শব্দ প্রযুক্ত দৃষ্ট হয়, সে স্থলে, অনন্ত "ঘোষা" শব্দ ও শ্রোতৃবর্গের স্থলে 'সভাসদ্' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

অনন্তরামায়ণ মূলতঃ বাল্মীকির পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া রচিত হইলেও ইহাতে আধ্যাত্মরামায়ণ ও মহানাটকেরও ছায়া পড়িয়াছে, স্বীকার করিতে হইবে, এবং কবি যতই কেন নিজের অবনতিসূচক ব্যাখ্যা দ্বারা মূর্খত্বের ভাণ করুন না, আমরা বলিতে বাধ্য, তিনি নিজে সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন। কোন অনর্থক বাগাড়ম্বরে তৎকৃত রামায়ণ স্ফীত হইয়া উঠে নাই, রূপবর্ণনার আতিশয্য দ্বারা তিনি চরিত্রগুলিকে নিবিড় করিয়া তুলেন নাই। অনুবাদ মূলানুযায়ী হইয়াছে, তবে মূল কতকটা সংক্ষিপ্ত হইয়াছে ; সংস্কৃতের বহ্বায়তনত্ব হইতে অব্যাহতি দিয়া তিনি অনুবাদটি সরস রাখিয়াছেন, ইহা তাঁহার বাহাদুরী বটে। অনন্তরামায়ণ জটিল দুরূহশব্দবহুল, কিন্তু সংক্ষিপ্ত ও কবিত্বপূর্ণ। ভাষার বন্ধুরতাহেতু সে কবিত্ব সহসা আবিষ্কৃত না হইলেও একটু ভাবিয়া পড়িলে পুঁথিখানি বেশ ভাল বোধ হইবে। অনন্তরামায়ণের অদ্ভুত ভাষাময়ী কাহিনীর একটু অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"কাহার ঝিয়ারি তুমি কাহার ঘরণী। কিবা নাম তোমার কহিবে সুলক্ষণি ॥ জনকনন্দিনি মঞি নাম মোর সীতা। দশরথ-পুত্র শ্রীরামবিবাহিতা ॥ পিতৃবাক্য শুনি রাম বনে আসিলন্ত। লক্ষ্মণে সহিতে মৃগ মারিবে গৈচন্ত ॥ আসি লভ ফুল জলো পূজিবা চরণ। ক্ষণেক বিলম্ব করিয়োক মহাজন ॥ উদবিগ্ন মনে সিতা বোলে খর করি। তপসি নহিকো ম'য়ি জানিবা সুন্দরি ॥ জগত রাবণ জাক শুনি আছ কর্ণে। যাহার সদৃষ বড়া নাহি তৃভুবনে ॥ হেনয়ো রাবণ আজি ভৈলোঁ তব পাশ। রামক তেজিয়া বান্ধে কর মোতে আধ ॥ যত পাটেশ্বরী মোর সব তোর দাসী। জোহি খোজ সেহি দিবো থাকিবে উপাসি ॥ মানুষ রামকে বান্ধে দূরে পরিহর। মঁঞি সমে যুগে যুগে রাজ্য ভোগ কর ॥ হেন সুনি ক্রোধে সিতা বলিলন্ত বাণি। দুর গুচা পাপিষ্ঠ অধম লঘুপ্রাণি ॥ নিকোঁট গোটর তোর এত মান সাষ। ছুকর ডাকুলি হুঁয়া গঙ্গা স্নানে যায ॥ রাঘবর ভার্য্যাতে তোঁহোর ভৈল মন। তিখাল খান্তাত জিহ্বা ঘষস দুর্য্যন ॥ হাতে তুলি কালকুট গিলিবাক ছাস। সপুত্র বান্ধবে পাপি হৈবি সর্ব্বনাষ ॥ আনো বহুতর বাক্য বুলিলন্ত আই। সংক্ষেপ পদত খিক দিবেসু জুআই ॥ আরণ্যকাণ্ড। কবি যখন নিজেই বলিতেছেন, রামায়ণ সংক্ষেপে অনুবাদিত হইল, তখন উদ্ধৃত অংশে "তীব্রাং শুঃ শিশিরাশুংশ্চ তস্মাৎ সম্পশ্যতে দিবি। নিষ্কম্প

স্তবরো নদাশ্চ স্তিমিতোদকাঃ ॥" প্রভৃতি রাবণোক্ত তেজঃপুঞ্জ কথাগুলি না পাইয়া আমাদের দুঃখিত হইবার কারণ নাই,—"কালকূটবিষং পীত্বা স্বস্তিমান্ গন্তুমিচ্ছসি," ও জিহ্বয়া লেঢ়ি চ ক্ষুরম" প্রভৃতি অংশ কবির গ্রাম্যভাষায় সংস্কৃতের ছন্দলালিত্য ও শব্দঝঙ্কারচ্যুত হইয়া স্থান পাইয়াছে। কবি সংক্ষেপ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু বাল্মীকিও বশিষ্ঠের পথেই চলিয়াছেন। অনন্তরামায়ণ, পরাগলী মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ আমাদের চক্ষে ধন্য। এই সকল কবিই বাঙ্গালা ভাষায় গঠন করিয়াছেন। কৃষকগণের প্রাকৃতকে সংস্কৃত শব্দের সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিবার প্রথম চেষ্টা ইঁহারাই করিয়াছেন। ইঁহাদের রচনার দৈন্য আমাদের চক্ষে প্রবল ভাষানুরাগের ঐশ্বর্য্য উজ্জ্বল করিয়া দেখাইতেছে। ইঁহারা বন্ধুর ক্ষেত্রকে হলকর্ষণে সমতল করিয়াছিলেন, এজন্যই আজ এই ক্ষেত্র নবশষ্প ও পুষ্পে হরিৎপ্রভা মণ্ডিত হইয়াছে।

অনুবাদশাখা (গ)।

সঞ্জয়, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, এবং শ্রীকরণনন্দী।

৪৫০ শত বৎসরের অধিক হইল রামায়ণের প্রথম অনুবাদ রচিত হইয়াছিল, আর ৩০০ বৎসরের কিছু অধিক হইল কাশীদাস মহাভারত অনুবাদ করেন, মধ্যবর্ত্তী দেড় শত বৎসরের মধ্যে অন্য কেহ মহাভারত প্রসঙ্গে হস্তক্ষেপ করেন নাই, এরূপ অনুমান করা বোধ হয় সঙ্গত নহে, এই বিশ্বাসে মহাভারতের লুপ্ত অনুবাদ উদ্ধার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হই। সুখের বিষয়, পূর্ব্ব বঙ্গ হইতে অনেকগুলি প্রাচীন মহাভারতের পুঁথি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি। এই আবিষ্কারের গুরুত্ব পাঠকগণ নির্ণয় করিবেন; শুধু অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তাহা এখন সম্যক্‌রূপে প্রমাণিত দেখিয়া আমাদের যে তৃপ্তিলাভ হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। বহুসংখ্যক অনুবাদ-রচকগণের মধ্যে সঞ্জয়, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, নিত্যানন্দ ঘোষ, রামেশ্বর নন্দী প্রভৃতি কবির রচিত মহাভারতগুলি সম্পূর্ণ পাওয়া গিয়াছে। নক্ষত্ররাজির ন্যায় অসংখ্য মহাভারতের অংশরচকগণের নাম এস্থলে উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। অনুমান ও কল্পনার দুরবীক্ষণযোগে এই সকল কবিনক্ষত্রগণ এ সময় হইতে কত দূরে অবস্থিত, সে প্রশ্নেরও এস্থলে উত্তর দিতে চেষ্টা করিব না।

মহাভারতের অনুবাদ-রচকগণ।

কবীন্দ্র রচিত মহাভারত হুসেন সাহার সময় লিখিত হয়, সুতরাং ৪০০ বৎসর পূর্ব্বের অনুবাদ পাওয়া গেল। এই মহাভারতের বিবরণ পরে দেওয়া যাইবে। কবীন্দ্র পরমেশ্বর তাঁহার মহাভারতে উল্লেখ করিয়াছেন;—শ্রীযুত নায়ক সে যে নসরত খান। রচাইল পাঞ্চালী যে গুণের নিদান।" বে, গ, পুঁথি, ৮৮ পত্র। সুতরাং কবীন্দ্র রচিত মহা-

বিবিধ অনুবাদের সাদৃশ্য।

ভারতাপেক্ষাও প্রাচীন লুপ্ত মহাভারতের খোঁজ পাওয়া গিয়াছে। সম্প্রতি "বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত" নামক যে গ্রন্থখানি সাহিত্যপরিষৎ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা কবীন্দ্ররচিত মহাভারতের সঙ্গে এত বেশী মিলিয়া যাইতেছে যে, কবীন্দ্রের গ্রন্থের আলোচনার পর তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। 'বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত'-অভিধেয় গ্রন্থখানির ব্যাপার ছাড়া ও সঞ্জয়রচিত মহাভারত, নিত্যানন্দ ঘোষের মহাভারত, কাশীদাসী মহাভারত প্রভৃতি অনেকগুলি মহাভারতের বহু স্থানে ভাষাগত আশ্চর্য্য প্রকারের সাদৃশ্য দেখিয়া মনে হয়, একখানি আদর্শ প্রাচীন গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া পরবর্ত্তী ভারতানুবাদগুলি রচিত হইয়াছিল। কিন্তু সেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ভারতানুবাদক কবি কে? কোনো আধ্যাত্মিক শক্তিসঞ্চারে মৃত কবিগণের প্রেতাত্মাদিগকে উপস্থিত করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে এ প্রশ্নের উত্তর জানা ভিন্ন এ বিষয়ের খাঁটি সত্য অবধারণের দ্বিতীয় পন্থা নাই; তবে আর একটি অনুমানও আমাদের নিকট অত্যন্ত সমীচীন বোধ হয়, মাগধ ভাটগণ প্রাচীনকাল হইতে রাজন্যবর্গের স্তুতিপ্রসঙ্গে পুরাণোক্ত উপাখ্যানগুলি গাহিয়া ফিরিতেন। এখন শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলের ভাটগণ সাময়িক প্রসঙ্গগুলির সঙ্গে সঙ্গে পৌরাণিক উপাখ্যানগুলি গাহিয়া থাকেন, প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যেও মাগধ ভাটের কথা অনেক স্থলেই উল্লিখিত আছে। ইঁহারা রামায়ণ ও মহাভারতের উপাখ্যান ভিন্ন ভিন্ন দেশে গাহিয়া বেড়াইতেন। যাঁহারা মহাভারতের অনুবাদ রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহারা সম্ভবতঃ প্রচলিত উপাখ্যানগুলি হইতে বিশেষ সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, এজন্যই ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিরচিত ভিন্ন ভিন্ন সময়ের কবিগণের রচিত অনুবাদে ভাষাগত এইরূপ আশ্চর্য্য সাদৃশ্য পরিদৃষ্ট হইতেছে।

সঞ্জয়-কৃত মহাভারত।

কবীন্দ্র-রচিত মহাভারত হইতে আর একখানি অতি প্রাচীন মহাভারত পাওয়া গিয়াছে, তাহা সঞ্জয়-রচিত। ইহার ঐতিহাসিক কোন তত্ত্ব পাওয়া গেল না; কিন্তু এই পুস্তক নানা কারণে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া বোধ হইতেছে। কবীন্দ্র রচিত প্রাচীন পুঁথি যেখানেই পাওয়া যাইতেছে, তৎসঙ্গে মূল-পুঁথির হস্তলিপি অপেক্ষা প্রাচীন হস্তাক্ষর যুক্ত দুই চারিখানা সঞ্জয় ভারতের পৃষ্ঠাও সংলগ্ন দেখা গিয়াছে, সুতরাং সঞ্জয়ের মহাভারতের পরে কবীন্দ্রের অনুবাদ প্রচলিত হইয়াছিল, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। কবীন্দ্র-রচিত ভারতের প্রচার অপেক্ষা সঞ্জয়ের ভারতের প্রচার অনেক বেশী; সঞ্জয়-রচিত মহাভারত বিক্রমপুর, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, ফরিদপুর, রাজসাহী প্রভৃতি সর্ব্বস্থলেই পাওয়া যাইতেছে, সুতরাং এই গ্রন্থের প্রচার একরূপ সমস্ত পূর্ব্ব-বঙ্গময় বলা যাইতে পারে। সঞ্জয়-রচিত ভারতের ভাব ও ভাষার বিকাশ কবীন্দ্রের ভারতে দৃষ্ট হয়; যযাতি ও দেবযানির মিলন-বর্ণনা আমরা উভয় কবির কাব্য হইতে উদ্ধৃত করিয়া ইহা প্রতিপন্ন করিব;—

"ফলিত পুষ্পিত বন বসন্ত সময়।
সদাএ সুগন্ধী বায়ু মন্দ মন্দ বয়॥
বিচিত্র যে অলঙ্কার বিচিত্র ভূষণে।
কন্যা সব নানা রঙ্গ করে সেই বনে॥
কেহ মিষ্ট ফল খাএ, কেহ মধু পিএ।
শর্ম্মিষ্ঠা যে দেবযানি চরণ সেবিএ॥"

—সঞ্জয়, বে, গ, ১১ পত্র।*

"একদিন দেবযানি, হৃদয়ে হরিষ গুণি
শর্ম্মিষ্ঠা লইয়া রাজ-সুতা।
ঋতুরাজ মধুমাস, ক্রীড়াখণ্ডে অভিলাষ,
চলি আইল পুষ্পবন যথা॥
নানা পুষ্প বিকাশিত, গন্ধে বন আমোদিত,
কুসুমে নমিত হৈছে ডাল।
কোকিলের মধুর ধ্বনি, শুনিতে বিদরে প্রাণী,
ভ্রমর করয়ে কোলাহল॥
সানন্দিত বন দেখি, মিলয়া সকল সখি,
ক্রীড়া তাতে করয় হরিষে।
মলয় সুধীর বাও, ধীরে ধীরে বহে যাও,
প্রাণ মোহিত পুষ্পবাসে॥
হেন সময় যযাতি, বিধাতা নির্ব্বন্ধ গতি,
মৃগয়া কারণে সেই বনে।
ভ্রমিয়া কাননে চাএ, মৃগ কোথা নাহি পাএ,
কন্যা সব দেখি বিস্ময়ানে॥
তার মধ্যে এই কন্যা, রূপে গুণে অতি ধন্যা,
জিনি রূপে রম্ভা উর্ব্বশী।

---

* বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের জন্য যে হস্তলিখিত সঞ্জয়ের পুঁথী খরিদ করা হইয়াছে তাহার শেষ পত্র এইরূপ ;—

"এই অষ্টাদশ ভারত পুস্তক, শ্রীগোবিন্দরাম রায়ের একোন পত্র অঙ্ক সাতশত উননব্বই সমাপ্ত হইয়াছে। স্বঅক্ষরমিদং শ্রীঅনন্তরাম শর্ম্মণঃর ইহারদক্ষিণা জন্মাবধি সামান্যতাক্রমে অন্নপত্রে প্রতিপাল্য হৈয়া সশ্রদ্ধাহ হইয়া পুস্তক লিখিয়া দিলাম। নগদ দক্ষিণাহ পাইলাম তার পর রোজকারহ বৎসর ব্যাপিয়া পাইবার আজ্ঞা হইল। শুভমস্তু শকাব্দা ১৬৩৬ সন ১১২৪ তারিখ ২৫শে কার্ত্তিক রোজ বৃহস্পতিবার দিবা দ্বিতীয় প্রহর গতে সমাপ্ত। মোকাম শ্রীসুলগ্রাম লেখকের নিজগ্রাম।"

অধরে বাঁধুলি জ্যোতি, দশন মুকুতা পাতি,
বদন জলয়ে যেন শশী।
নয়ন কটাক্ষ শরে, মুনি জন মন হরে,
ভ্রূযুগে কাম ধনু ধারা।
চারিভিতে সহচরী, বসি আছে সারি সারি,
রোহিণী বেষ্টিত যেন তারা॥
শয়ন করিয়া আছে, রতিকাম অভিলাষে,
বিচিত্র পাতিয়া নানা ফুল।
শর্ম্মিষ্ঠা চাপে পাও, কোন সখি করে বাও
কোন সখী যোগায় তাম্বুল॥"

—কবীন্দ্র, হস্তলিখিত পুঁথি।

এইরূপ অনেক স্থলেই কবীন্দ্র সঞ্জয়ের তুলি ধরিয়া চিত্রগুলি বিকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীহরি যে স্থলে স্বপ্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইয়া রোষক্ষিপ্ত গজেন্দ্রবৎ ভীষ্মকে বধ করিতে সমরক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছিলেন,—কবীন্দ্রের বর্ণনা সে স্থলে বড় সুন্দর, কিন্তু সঞ্জয়-ভারতে এই প্রসঙ্গ এবং অন্যান্য সুন্দর আখ্যানের একবারে উদয় হয় নাই। সঞ্জয়-রচিত ভারতের বনপর্ব্ব ৪ পত্রে, অনুশাসন পর্ব্ব ৩ পত্রে, মহাপ্রস্থানিক পর্ব্ব ৩ পত্রে ও সৌপ্তিক পর্ব্ব ৫ পত্রে সম্পূর্ণ; সুতরাং প্রায় স্থলেই বৃত্তান্ত অতি সংক্ষিপ্ত। মহাভারত-প্রসঙ্গ যখন দেশে নূতন সামগ্রী ছিল, এইরূপ সংক্ষিপ্ত বর্ণনা সেই সময়েরই উপযোগী বলিয়া বোধ হয়। খাঁটি কৃত্তিবাসী রামায়ণের ন্যায় খাঁটি সঞ্জয়ের মহাভারত অতি দুর্লভ। আমি একখানি মাত্র স্বর্গীয় অক্রূরচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট দেখিয়াছিলাম।

সঞ্জয়-রচিত মহাভারত কাব্যের স্কন্ধে কত কবি শাখা-কাব্যের উৎপত্তি করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। শকুন্তলা-উপাখ্যানটি রাজেন্দ্রদাস কবি উৎকৃষ্ট খণ্ড-কাব্যে পরিণত করিয়া সঞ্জয়-ভারতের অন্তর্বর্ত্তী করিয়া দিয়াছেন; গঙ্গাদাস সেন অশ্বমেধপর্ব্বটি সংযুক্ত করিয়াছেন; গোপীনাথ কবি দ্রোণপর্ব্ব সংলগ্ন করিয়াছেন। তাঁহাদের বাক্য-বিন্যাস উৎকৃষ্ট, রচনার নিপুণতা উৎকৃষ্ট, ভাব নব-যুগের প্রভা-ধারী; কিন্তু সঞ্জয়ের রচনা অনাড়ম্বর সংক্ষিপ্ত ও সরল। অথচ এই সমস্ত উপকরণ-রাশি গ্রাস করিয়া সঞ্জয়-কৃত মহাভারত 'তালের বড়ার' ন্যায় নামমাত্র তালের কীর্ত্তিই ঘোষণা করিতেছে। কোন কোন পুঁথির অধিকাংশই অপরাপর কবির লিখিত, অথচ গ্রন্থের নাম 'সঞ্জয়-কৃত' মহাভারত। নারায়ণদেব ও বিজয়গুপ্তের পদ্মপুরাণের অবস্থাও এইরূপ।

এই সংক্ষিপ্ত সরল বর্ণনাযুক্ত মহাভারতটির প্রতিপত্তি এত বেশী হইল কেন? কবি ষষ্ঠীবরের

তৎপুত্র গঙ্গাদাস সেনের, এবং রাজচন্দ্র দাসের উজ্জ্বল পংক্তি নিচয়ের যশঃ সঞ্জয়-নামের আড়ালে পড়িল কেন ? বোধ হয় ইহা প্রাচীনতম কীর্ত্তি, এই জন্য।

আমরা সঞ্জয়-রচিত ভারতের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে আর একটী বিশেষ প্রমাণ দেখিতেছি,—যে স্থলেই সঞ্জয়ের ভণিতা, সেই স্থলেই লোক বুঝাইতে সঞ্জয় ভারত অনুবাদ করিয়াছেন, একথা লিখিত হইয়াছে! মহাভারত অতি কঠিন, সঞ্জয় লোকহিতসংকল্পে তাহা বাঙ্গালা ভাষায় প্রচার করিতেছেন, প্রতিপত্রে এই কথা দৃষ্ট হয় ; * "অতি অন্ধকার যে মহাভারত সাগর। পাঞ্চালী সঞ্জয় তাক করিল উজ্জ্বল।" (বে, গ, পুঁথি, ৪৭২ পত্র) প্রভৃতি কথা পাঠ করিলে মনে হয়, মহাভারতরূপ মহাভাণ্ডার বহুকাল পর্য্যন্ত সংস্কৃতানভিজ্ঞের নিকট অনধিগম্য ছিল, সঞ্জয়ই প্রথম অনুবাদ দ্বারা তাহা সাধারণ্যে প্রচারিত করেন।

কৃত্তিবাস ভিন্ন অন্য কোন কবির ভণিতায় বারংবার এইরূপ কথা দৃষ্ট হয় না। মহাভারতের পূর্ব্ববর্ত্তী অনুবাদ থাকিলে এরূপ লেখা স্বাভাবিক হইত না।

সঞ্জয়ের পরিচয়।

এই সঞ্জয় কে ? তাঁহার কোন বিশেষ পরিচয় নাই। একবার ভাবিয়াছিলাম বিদুর-পুত্র সঞ্জয়কেই কি আমরা কাব্যপ্রণেতা বলিয়া ভুল করিতেছি ? ধৃতরাষ্ট্রের নিকট সঞ্জয় যুদ্ধ-বর্ণনা করিতেছেন, এ কথা মহাভারত মাত্রেই থাকিবেক। এই সঞ্জয় কি সেই সঞ্জয় ? এই ভ্রম পাছে পাঠকের হয়, এই জন্য সঞ্জয়-কবি নিজেই সতর্ক হইয়াছেন, তিনি লিখিয়াছেন,—

"ভারতের পুণ্য কথা নানা রসময়।
সঞ্জয় কহিল কথা রচিল সঞ্জয়॥"
—বে, গ, পুঁথি, ৫৭৭ পত্র।
"সঞ্জয় কহিল কথা, রচিল সঞ্জয়॥" ৫৮৭ পত্র।
"সঞ্জয়ের কথা শুনি, সঞ্জয়ের কথা পুনি,
শুনিলে আপদ হৈলে তরি।" ৫৩৬ পৃঃ।
"প্রথম দিনের রণ ভীষ্মপর্ব্বে পোথা।
সঞ্জয় রচিয়া কহে সঞ্জয়ের কথা॥" ২৩৩ পৃঃ।

সুতরাং সঞ্জয় পৌরাণিক ভূত নহেন, একালেরই মানুষ ; তাঁহার পরিচয়স্থলে বেঙ্গল-গবর্ণমেণ্ট লাইব্রেরীর জন্য আমি যে পুঁথি খরিদ করিয়াছি, তন্মধ্যে এই দু'টি ছত্র পাওয়া যায়,—"ভরদ্বাজ উত্ত বংশেতে যে জন্ম। সঞ্জয়ে ভারত কথা কহিলেক মর্ম্ম॥" ৪৩৬ পত্র। যে বংশে শ্রীহর্ষ, কৃত্তিবাস ও ভারত

* বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের পুঁথির ১৫৯, ১৭০, ১৮২, ৪৪৬, ৫০২, ৫০৫ ৫২৫ প্রভৃতি পত্র দেখুন।

চন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন, সঞ্জয় কি স্বভাবজাত কবিত্ব-সম্পন্ন সেই প্রসিদ্ধ বংশের একজন? অতি প্রাচীন ভরদ্বাজ বংশীয় এক ঘর বৈদ্য এখনও বিক্রমপুরের বিদ্যমান। ইনি হয় ত সেই কুলই উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, কারণ তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন, এরূপ উক্তি কোথাও নাই। কেহ বলিতেছেন সঞ্জয় শ্রীহট্ট দেশের ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সঞ্জয়ের কবিত্ব।

সঞ্জয়কৃত মহাভারতের প্রাচীন রচনায় লিপিনৈপুণ্য সুলভ নহে। গ্রাম্য-ভাষা ও প্রাচীন বিভক্তির জটিলতা অনেক স্থলেই বিরক্তিকর, তাহা আদ্যন্ত পাঠ করিবার ধৈর্য্য শুধু অসামান্য সহিষ্ণু পাঠকেরই থাকিতে পারে; কিন্তু সেই ভাষা পড়িতে পড়িতে কতকটা অভ্যস্ত হইয়া গেলে পাঠক কাব্যের প্রকৃত রসাস্বাদ করিতে পারিবেন; গ্রাম্য সরল সৌন্দর্য্যে অনুবাদটি উপাদেয় হইয়াছে, বাঙ্গালী তখনও একান্ত মৃদু ও কুসুম-সুকুমার হইয়া পড়েন নাই, তাই বীরত্বের কাহিনীগুলিতেও মূলের উদ্দীপনার যথাযথ প্রতিধ্বনি জাগিয়াছে। অমার্জ্জিত ভাষার মধ্যেও সংক্ষুব্ধ চিত্তের ক্রোধ ও অপমান প্রভৃতি রসের প্রবাহ কতকটা বাধ বাধ হইয়াও যেন কবির উত্তেজনার প্রখরতার পরিচয় দিতেছে। আমরা নিম্নে দুইটি অংশ উদ্ধৃত করিলাম।

দ্রৌপদীর অপমান।

রাজার আদেশ পাই, দুঃশাসন গেল ধাই,
সভাতে আনিল একেশ্বরী।
একবস্ত্র রজস্বলা, দ্রুপদ-নন্দিনী বালা,
রাহুএ যেন চন্দ্র নিল হরি॥
মন্দ বোলে সভাজন, ধর্ম্মশাস্ত্র অকারণ,
উচিত না বোলে কোন জনা।
কাঁদয়ে সুন্দরী রামা, রূপ গুণে অনুপমা,
নয়নে বহয়ে জলকণা॥
আপনে হারিল পতি, মোহোর যে কোন গতি
উত্তর না দেও সভাজন॥
দ্রৌপদীর বাক্য শুনি, সভাসদে কাণাকাণি,
অন্যে অন্যে মুখ নিরীক্ষণ॥
তাহা দেখি কম্পয়ে যে বীর বৃকোদর।
বজ্রসম গদা হস্তে কম্পে থর থর॥
থাউক সেবিয়া ধর্ম্ম যুধিষ্ঠির রাজা।
কুরুবল মারি আজি আঁজি যমে করোঁ পূজা॥

কোথায় আছরে ধর্ম্ম কেবা তাহা জানে।
কোন ধর্ম্ম সেবি রাজ্য পাইল দুর্য্যোধনে ॥
কিবা যে অধর্ম্মে আমি হারি পাশা খেরি।
কিবা অধর্ম্মে আনে দ্রৌপদীর কেশ ধরি ॥
কোন অধর্ম্মে বিবস্ত্রা করয়ে রজস্বলা।
কোন অধর্ম্মে সভাতে কাঁদয়ে সুন্দরী বালা।
এই দুঃখে ভীমসেন কম্পয়ে দ্বিগুণ।
অন্তরেতে মহাকোপ কম্পয়ে অর্জ্জুন
নকুল সহদেব কম্পয়ে শরীর।
হাতে ধরি নিবারণ করে যুধিষ্ঠির ॥
যত অপরাধ মোর ক্ষম ভ্রাতৃ সব।
আপন অধর্ম্ম হইতে মজিবে কৌরব ॥
চক্ষু পাকায় ভীম যেন কাল যম।
বন্ধনে থাকিয়া যেন সর্পের বিক্রম ॥

—সঞ্জয়ে বে, গ, পুঁথি, ১১৫।

কর্ণের যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন।

"তবে কর্ণ কটকের রঙ্গ বাড়াইতে।
একে একে সমাইরে লাগিল পুছিতে ॥
কে আজি অর্জ্জুনে দেখাইতে পারে।
রত্নের শকট ভরি দিমু আজি তারে ॥
বৎসের সহিত দিমু ধেনু একশত।
যে আজি অর্জ্জুনে দেখাইয়া দিব মোত ॥
লেজ কালা ধোপ ঘোড়া বহে যেই রথ।
তাক দেই অর্জ্জুনের যে দেখায় মোত ॥
ছত্র হস্তি দিমু শকট ভরিয়া সোণা।
তাক দিমু অর্জ্জুনক দেখায় যেই জনা ॥
শ্যাম তরুণী গীত বাদ্যে যে পণ্ডিতা।
একশত সুন্দরী সুবর্ণ অলঙ্কৃতা ॥
তাক দেই যে লোকে দেখায় অর্জ্জুন।
শতে শতে ঘোড়া রথ হস্তি যে সুবর্ণ ॥

সবৎসা তরুণী ধেনু সুবর্ণ ভূষণ।
তাক দেঁহো যে আমারে দেখায় অর্জ্জুন॥
শুভ্র ঘোড়া পঞ্চশত, গ্রাম একশত।
তাহা দেঁহো যেই অর্জ্জুন দেখাএ মোত॥
কাম্বোজিয়া ঘোড়া বহে সোণার রথখান।
তাক দেই অর্জ্জুন দেখাএ আগুয়ান॥
ছত্র শত হস্তি যে সুবর্ণ বিভূষিত।
সাগর তীরেতে জন্ম বীর্য্যে সুসারিত॥
ছৌদ্দগ্রাম দেই তাক অতি সুরচিত
নিকটে জীবন যেই নির্ভয় সতত।
এক রাজা এক গ্রাম জুয়াএ ভুঞ্জিতে।
মগধের এক শত দাসী দেই তাতে।"*

শল্যের উত্তর

"কোপ বাড়িবার শল্য বলে আর বার।
ফুটিলে অর্জ্জুন বাণ না গর্জ্জিবে আর।
সুহৃদ নাহিক কর্ণ তোমা কেহ দেখে।
অগ্নিতে পতঙ্গ নরে তারে কেবা রাখে॥

---

* এই অংশ পড়িয়া এ্যাকিলিসের ক্রোধ নিবৃত্তির জন্য এগামেমননের চেষ্টা মনে পড়ে,—

"Ten weighty talents of the purest gold,
And twice ten vases of refulgent mould ;
Seven sacred tripods whose unsullied frame,
Yet knows no office nor has felt the flame ;
Twelve steeds unmatched in fleetness and in force.
Aad still victorious in the dusty course ;
Seven lovely captives of the Sesbian line,
Skilled in each art. unmatched in form divine,
All these, to buy his friendship, shall be paid" &c.

—Illiad, Book IX (pope's Translation,)

অজ্ঞান মায়ের কোলে থাকিতে ছাওয়ালে।
চন্দ্র ধরিবারে হাত বাড়াএ কুতুহলে॥
সেইমত কর্ণ তুমি বোলরে দারুণ।
রথ হৈতে পড়িবারে চাহসি অর্জ্জুন॥
চোকা ধার ত্রিশূলেতে ঘষ কেন গাও।
হরিণের ছায়ে যেন সিংহর বোলাও॥
মৃত মাংস খাইয়া শৃগাল বড় স্থূল।
সিংহেরে ডাকএ সেই হইতে নির্ম্মূল॥
সূতপুত্র হৈয়া রাজপুত্রে ডাক কেনে।
মশা হৈয়া মত্ত হস্তি ডাক যুদ্ধে জেনে॥
গর্ত্তের কাল সাপ খোকাও কাটি দিয়া।
সিংহকে ডাকহ তুমি শৃগাল হইয়া॥
সর্প যেন খাইয়া যায় মারিতে গরুড়ক।
সেইমত চাহ তুমি মারিতে অর্জ্জুনক॥
চন্দ্র উদয় যেন সাগর অন্তর।
বিনি নৌকাএ পার হৈতে চাহসি বর্ব্বর॥
সেইমত কর্ণ তোমার বুঝিল যে মন।
মেঘ মধ্যে শুনি যেন ভেকের গর্জ্জন॥"

—সঞ্জয়, বে, গ, পুঁথি, ৪১৭ পত্র।

কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দী

১৪৯৪ খৃঃ অব্দ হইতে ১৫২৫ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত সম্রাট্ হুসেন সাহ গৌড়দেশ শাসন করেন। চৈতন্য-চরিতামৃতে উল্লিখিত আছে, হুসেন সাহ প্রথমে সুবুদ্ধি রায় নামক জনৈক হিন্দু জমিদারের ভৃত্য ছিলেন। একদা পুষ্করিণী-খনন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া অমনোযোগী হওয়াতে সুবুদ্ধি রায় তাঁহাকে বেত্রাঘাত করেন। হুসেন সাহ উচ্চ-বংশজাত ছিলেন, তিনি রাজসরকারে প্রবিষ্ট হইয়া ক্রমে উজিরী পদ প্রাপ্ত হইলেন এবং শেষে ১৪৯৪ খৃঃ অব্দে সম্রাট্ মুজাফর সাহ নিহত হইলে, গৌড়ের সম্রাট্রূপে প্রতিষ্ঠিত হন। মুসলমানী ইতিহাসে এ কথা বিস্তারিতভাবে লেখা নাই বলিয়া কেহ কেহ এ বৃত্তান্ত অমূলক মনে করেন।

সম্রাট্ হুসেন সাহ।

বৈষ্ণব-গ্রন্থকার সেই সময়ের লোক, তিনি কল্পনা হইতে এই গল্পের উদ্ভব করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না ; বরং ইতিহাস আলোচনায় এ কথা প্রামাণিক বলিয়াই বোধ হয়। *

যদিও প্রথমতঃ হুসেন সাহ উড়িষ্যার দেব দেবী ভগ্ন করিয়াছিলেন, † তিনি পরে হিন্দুগণের প্রতি বিশেষ সদয় ও উদার ভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। চৈতন্যচরিতামৃত ও চৈতন্যভাগবতে দৃষ্ট হয়, তিনি চৈতন্য-প্রভুকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। এ কথা অনেকটা বাদ দিয়া বিশ্বাস করিতে গেলেও মানিতে হইবে, তিনি চৈতন্য-প্রভুকে শ্রদ্ধা করিতেন। হুসেন সাহের সময় কামরূপ বিজিত হয়, চট্টগ্রামে মগগণ পরাস্ত হয়, ত্রিপুরেশ্বরও মুসলমান-ভয়ে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। পৃথিবীর যে কোন সম্রাট্ বহু রাজ্য জয় করিয়া দীর্ঘকাল শান্তিতে রাজত্ব উপভোগ করিয়াছেন, তাঁহারই অসিবল হইতে প্রীতিবল বেশী প্রয়োগ করিতে হইয়াছে। যে গুণে আকবর ভারত ইতিহাসের কণ্ঠে কণ্ঠহার হইয়া রহিয়াছেন, সেই গুণে হুসেনসাহ বঙ্গের ইতিহাসের উজ্জ্বল রত্ন বলিয়া গণ্য হইবেন। একাব্বরী মোহরের ন্যায় হুসেনী মোহরও লোকপ্রীতির কল্পিত মূল্যে মূল্যবান্। রাজকৃষ্ণ বাবু বাঙ্গালার ইতিহাসে লিখিয়াছেন,—

"হুসেন সাহার রাজত্বকালে এতদ্দেশীয় ধনিগণ স্বর্ণপাত্র ব্যবহার করিতেন, এবং যিনি নিমন্ত্রিত সভায় যত স্বর্ণপাত্র দেখাইতে পারিতেন, তিনি তত মর্য্যাদা পাইতেন। গৌড় বা পাণ্ডুয়া প্রভৃতি স্থানে যে সকল সম্পূর্ণ বা ভগ্ন অট্টালিকা পরিলক্ষিত হয়, তদ্দারাও বাঙ্গালার ঐশ্বর্য্যের ও তাৎকালিক শিল্প-নৈপুণ্যের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায় ; বাস্তবিক তখন এদেশে স্থাপত্যবিদ্যার আশ্চর্য্যরূপ উন্নতি হইয়াছিল, এবং গৌড়ে যেখানে সেখানে মৃত্তিকা খনন করিলে যেরূপ রাশি রাশি ইষ্টক দৃষ্ট হয়, তাহাতে অনুমান হয় যে, নগরবাসী বহুসংখ্যক ব্যক্তি ইষ্টক-নির্ম্মিত গৃহে বাস করিত, দেশে অনেক হিন্দু ভূম্যাধিকারী ছিলেন এবং তাঁহাদের ক্ষমতাও বিস্তর ছিল।"

হুসেন সাহ বঙ্গ-সাহিত্যের উৎসাহ-বর্দ্ধক ছিলেন ; যে সভায় রূপ সনাতন ও পুরন্দর খাঁ সভাসদ ছিলেন, সে সভায় হিন্দু মুসলমান একত্র হইয়া হিন্দুশাস্ত্রের আলোচনা করিতেন ; বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে হুসেন সাহের প্রশংসা বর্ণিত হইয়াছে, পদাবলীতেও হুসেন সাহের নামের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা—"শ্রীযুত হুসন, জগত ভূষণ, সোহ এরস জান। পঞ্চ গৌড়েশ্বর, ভোগ পুরন্দর, ভণে যশরাজ খান।" ‡ পরাগলী মহাভারত ও ছুটি খাঁর অশ্বমেধ-পর্ব্বে পত্রেপত্রে হুসেন সাহের প্রশংসা ও গুণবর্ণনা দৃষ্ট হয়।

---

* "It is however certain, that on his first arrival in Bengal, he was for some time in a very humble position."

—Stewart's History of Bengal, P. 71.

† "যে হুসেন সাহ সর্ব্ব উড়িষ্যার দেশে।
দেবমূর্ত্তি ভাঙ্গিলেক দেউলবিশেষে।"—চৈ, ভা, অন্ত খণ্ড।

‡ সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা, ১৩০৬ সন, ১ম সংখ্যা, ৮ পৃঃ।

এই রাজসভা হইতে দুইজন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা মগীরাজের সৈন্যদিগকে চট্টগ্রাম হইতে দূর করিতে প্রেরিত হইয়াছিলেন; একজন স্বয়ং রাজকুমার—ভাবী সম্রাট্ নসরত সাহ, অপর—সেনাপতি পরাগল খাঁ।

পরাগল খাঁ।

ফণী নদীর (আধুনিক ফেণী) তীরে চট্টগ্রাম জোরওয়ারগঞ্জ থানার অধীন 'পরাগলপুর' এখনও বর্ত্তমান, 'পরাগলী দীঘি' অতি বৃহৎ; এখনও তাহার জল ব্যবহৃত হয়। পরাগল খাঁর প্রাসাদাবলী এখন রাশীকৃত ভগ্ন ইষ্টক স্তূপে পরিণত। ইহারা কেহই সেই মগী-সৈন্য-জয়ী সেনাপতির কাহিনী লোকস্মৃতিতে আনিতে পারে নাই, কিন্তু একখানি তুলট কাগজে লিখিত কীটদংষ্ট্রাবিদ্ধ লূতাতন্তু-জড়িত প্রাচীন পুঁথি লুপ্ত-স্মৃতির উদ্ধার করিয়াছে; সে পুঁথিখানি—

'পরাগলী ভারত।'

অথবা

কবীন্দ্র পরমেশ্বর বিরচিত

মহাভারত *

তাহার ভূমিকা এইরূপ;—

"নৃপতি হসেন সাহ হএ মহামতি।
পঞ্চম গৌড়েতে যার পরম সুখ্যাতি॥
অস্ত্র শস্ত্রে সুপণ্ডিত মহিমা অপার।
কলিকালে হৈব যেন কৃষ্ণ অবতার॥
নৃপতি হুসেন সাহ গৌড়ের ঈশ্বর।
তান হক সেনাপতি হওন্ত লস্কর॥
লস্কর পরাগল খান মহামতি।
সুবর্ণ বসন পাইল অশ্ব বায়ুগতি॥
লস্করী বিষয় পাই আইবন্ত চলিয়া।
চটিগ্রামে চলি গেল হরষিত হৈয়া॥
পুত্র পৌত্রে রাজ্য করে খান মহামতি।
পুরাণ শুনন্ত নীতি হরষিত মতি।
—কবীন্দ্র বে, গ, পুঁথি, ১ পত্র

* কবীন্দ্র-রচিত ভারতের ১৬৪৬ শকের হাতের লেখা পুঁথি ক্রয় করিয়া বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের লাইব্রেরীতে দিয়াছি। তাহা ছাড়া আরও দুইখানি পুঁথি পাইয়াছি, তাহার একখানি ২০০ শত, আর একখানি প্রায় ২৫০ বৎসরের প্রাচীন।

পরাগল খাঁর পিতার নাম রাস্তি খাঁ ও পুত্রের নাম ছুটি খাঁ, এই পুঁথিতেই তাঁহাদের উল্লেখ আছে। কবীন্দ্র স্বীয় অনুগ্রাহক খাঁ মহাশয়ের গুণ প্রতি পত্রে বর্ণনা করিয়াছেন, সময়ে সময়ে উচ্ছ্বলিত কৃতজ্ঞতা-রসে পয়ারের বাঁধ ছুটিয়া গিয়াছে, পদ কোথায় দাঁড়াইয়াছে দেখুন ;—

"ক্ষৌণী কল্পতরু শ্রীমান্ দীন দুর্গতি বারণ
পুণ্যকীর্ত্তি গুণাম্বাদী পরাগল খান।" বে, গ, পুঁথি, ৮৮ পত্র ॥

কোন কোন স্থলে "শ্রীযুত পরাগল পদ্মিনী-ভাস্কর।" এইরূপ পদ দৃষ্ট হয়।

পরাগলী মহাভারত প্রায় ১৭০০০ শ্লোকে পূর্ণ। এ পুস্তকখানা উদ্ধার করা একান্ত আবশ্যক ; শুনিয়াছি, পরাগল খাঁর বংশ এখনও বর্ত্তমান এবং তাঁহারা অবস্থাপন্ন লোক ; ইহা প্রথমতঃ তাঁহাদেরই কার্য্য।

পরাগলী ভারত।

চট্টগ্রামের প্রাচীন ভাষা স্থলে স্থলে এত জটিল যে, অর্থ পরিগ্রহ করা যায় না ; সহজ স্থল বাছিয়া কবীন্দ্রের কবিত্বের নমুনা দেখাইতেছি।

দ্রৌপদীর বিরাট নগরে আগমন

"তার পাছে দ্রৌপদী সৈরিন্ধ্রীরূপ ধরি।
অধিক মলিন বস্ত্রে গেলা একেশ্বরী ॥
দূর হৈতে যায় যেন ত্রাসিত হরিণী।
নগরের নারী সব পুছন্ত কাহিনী ॥
দ্রৌপদী বোলেন্ত সৈরিন্ধ্রী মোর নাম।
দ্রৌপদীর পরিচর্য্যা কৈলু অনুপাম ॥
অন্তঃপুর নারী যত উত্তর না পাইল।
সুদেষ্ণা দেবীএ তাকে সাদরে পুঁছিল ॥
সত্য কহ আহ্মাতে (*) কপট পরিহরি।
কি নাম তোহ্মার কহ কাহার বরনারী ॥
দুই উরু গুরু তোর অতি সুবলিত।
নাভি গম্ভীর তোমার বাক্য সুললিত ॥
দশন ডালিম্ব বিজ্জুলি নয়ন।
রাজার মহিষী যেন সব সুলক্ষণ ॥
কিবা গন্ধর্ব্বের তুহ্মি হয়সি বনিতা।
নাগকন্যা তুহ্মি কিবা নগরদেবতা ॥

* "আমি' স্থানে 'আহ্মি' ও 'তুমি' স্থানে 'তুহ্মি' পূর্ব্ববঙ্গের প্রাচীন সমস্ত পুঁথিতেই দৃষ্ট হয়। সঞ্জয়-রচিত ভারতের প্রাচীন পুঁথিগুলিতেও তাহাই হয়। শুধু বেঙ্গল গবর্ণমেন্টের কপিতে 'আমি' 'তুমি' রূপ পাইয়াছি।

বিদ্যাধরী কিবা তুহ্মি কিন্নরী রোহিণী।
অনুসূয়া কিবা তুহ্মি উর্ব্বশী মানিনী॥
ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী কিবা বরুণের নারী।
তোমারূপ দেখি আহ্মি লইতে না পারি॥
সুদেষ্ণার বচন যে শুনিআ তৎপর।
সেইখানে দ্রৌপদীও দিলেন্ত উত্তর॥
আহ্মি দেবকন্যা নহি গন্ধর্ব্বের নারী।
সহজে সৈরন্ধ্রী আহ্মি কেশকর্ম্ম করি॥
মালিনী মোহোর নাম দ্রৌপদী ধরিল।
তোহ্মাকে সেবিতে মোর হৃদয় বাঞ্ছিল॥
তেকারণে আঁইলু হেথা বিরাট নগর।
সত্য কথা কৈল এহি তোহ্মার গোচর॥
সুদেষ্ণাএ বোলেন্ত শুনহ বরনারী।
মাথে করি তোহ্মারে রাখিতে আহ্মি পারি॥
নারী সব তোহ্মা দেখি পাসরিতে নারে।
কেমত পুরুষ আছে ধৈর্য্য রাখিবারে॥
রাজাএ দেখিলে তোহ্মা মজিবেক মন।
বল করি ধরিতে রাখিবে কোন জন॥
আপন কণ্টক আহ্মি আপনে রোপিব।
মৃত্যুএ ধরিলে যেন বৃক্ষ আরোহিব॥
কর্কটীর গর্ভ যেন মৃত্যুর কারণ।
তেনমত দেখি আহ্মি তোহ্মারে ধারণ॥" *

—কবীন্দ্র, বে, গ, পুঁথি ৫৭ পত্র।

---

* কবীন্দ্র সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন, তিনি স্থানে স্থানে মূলের অক্ষরে অক্ষরে অনুবাদ করিয়াছেন। সেকালের অনুবাদ-গ্রন্থের পক্ষে ইহা কম গৌরবের কথা নহে। স্থানাভাবে সংস্কৃত উদ্ধৃত করিয়া বিশেষরূপে তুলনা করিতে পারিব না। দ্রৌপদীর বিরাট নগরে আগমনের অল্প কতকাংশ উদ্ধৃত করিতেছি, ইহা জৈমিনি ভারত হইতে নহে, মূল ব্যাসের মহাভারত হইতে উদ্ধৃত হইল, পাঠক মিলাইয়া দেখিবেন।—

সুদেষ্ণোবাচ।

"মূর্দ্ধ্নি ত্বাং বাসয়েয়ং বৈ সংশয়ো মে ন বিদ্যতে।
ন চেদিচ্ছতি রাজা ত্বাং গচ্ছেৎ সর্ব্বেন চেতসা॥

শ্রীহরির রূপ বর্ণন।

"পরিধান পীতবাস কুসুম বসন।
নবমেঘ শ্যাম অঙ্গ কমললোচন॥
মেঘের বিদ্যুত' তুল্য হসিত মুখেত।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম এ চারি করেত॥
শিরেতে বান্ধিছে চূড়া মালতী মালাএ।
দেখিয়া মোহন বেশ পাপ দূরে যাএ॥"—৪৪ পত্র।

ভীষ্ম পর্ব্বে—যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের ক্রোধ।

"দেখহ সাত্যকি মুঞি চক্র লইনু হাতে।
ভীষ্ম দ্রোণ কাটিয়া পাড়িমু রথ হৈতে॥
ধৃতরাষ্ট্র পুত্র সব করিমু সংহার।
যুধিষ্ঠির নৃপতিক দিমু রাজ্যভার॥
এ বলিয়া সাত্যকিরে করি সম্বোধন।
হস্তেত লইল চক্র দেব জনার্দ্দন॥
সূর্য্যের সমান জ্যোতি সহস্র বজ্রসম।
চারিপাশে ক্ষুর তেজ যেন কাল যম॥
রথ হৈতে লাফ দিয়া চক্র লৈয়া হাতে।
ভীষ্মক মারিতে জাএ দেব জগন্নাথে॥

স্ত্রিয়ো রাজকুলে যাশ্চ যাশ্চেমা মম বেশ্মনি।
প্রসক্তাস্তাং নিরীক্ষন্তে পুমাংসং কং ন মোহয়েঃ॥
বৃক্ষাংশ্চাবস্থিতান্ পশ্য যইমে মম বেশ্মনি।
তেঽপি তাং স সন্নমন্তীব মাং সং কং ন মোহয়েঃ॥
রাজা বিরাটঃ সুশ্রোণি দৃষ্ট্বা বপুরমানুষম্।
বিহায় মাং বরারোহে ত্বাং গচ্ছেৎ সর্ব্বেন চেতসা॥
অধ্যারোহেদ্ যথা বৃক্ষানবধায়ৈবাত্মনো নরঃ।
বাজবেশ্মনি তে শুভে অহিতং স্যাত্তথা মম॥
যথাচকর্কটকী গর্ভমাধত্তে মৃত্যুমাত্মনঃ।
তথা বিধমহং মন্যে বাসস্তব শুচিস্মিতে॥"

কৃষ্ণ অঙ্গে পীতবাস শোভিছে তখন।
বিদ্যুৎ সহিত যেন আকাশে শোভে ঘন ॥
দেখিয়া সকল লোক বলিল তখন।
কৌরবের ক্ষয় আজি দেখিএ লক্ষণ ॥
পদভরে কৃষ্ণের কম্পিত বসুমতী।
গজেন্দ্র ধরিতে যেন জাএ মৃগপতি ॥
সম্ভ্রম না করে ভীষ্ম হাতে ধনুঃশর।
নির্ভয়ে বোলেন্ত তবে সংগ্রা ভিতর ॥
শ্রীযুক্ত পরাগল খান পদ্মিনী-ভাস্কর।
কবীন্দ্র কহন্ত কথা সুনন্ত লস্কর ॥"—১০৫ পত্র।

পরাগল খাঁর মৃত্যুর পরে তৎপুত্র ছুটি খাঁকে সম্রাট্ হুসেন সাহ সেনাপতির পদে বরণ করেন। ছুটি খাঁর গৌরব বর্ণনা করিয়া কবীন্দ্র লিখিয়াছেন,—

টি খাঁ।

"তনয় যে ছুটি খান পরম উজ্জ্বল।
কবীন্দ্র পরমেশ্বর রচিল সকল ॥" বে, গ, পুঁথি, ৮৮ পত্র

ছুটি খাঁ ও পিতার দৃষ্টান্তানুসারে শ্রীকরণ নন্দীকে অশ্বমেধপর্ব্বের অনুবাদ করিতে আদেশ করেন; এই কবির কল্পনা বৃক্ষবাহিনী লতার ন্যায় আকাশ ছুঁইতে ইচ্ছুক। ইনি স্বীয় প্রভুর মনস্তুষ্টি কিরূপে করিতে হয়, বিশেষরূপে জানিতেন। কল্পনার তৈলাধার মুক্ত করিয়া ইনি ছুটি খাঁর পদসেবা করিয়াছেন। আমরা সাহিত্যপত্রিকায় * যাহা উদ্ধৃত করিয়াছিলাম, সেই অংশ পুনঃ এস্থলেও উদ্ধৃত করিতেছি,—

"নসরত সাহ তাত ‡ অতি মহারাজা।
রামবৎ নিত্য পালে সব প্রজা ॥
নৃপতি হুসেন সাহ হএ ক্ষিতিপতি।
সামদানদণ্ডভেদে পালে বসুমতী ॥

---

* সাহিত্য, অগ্রহায়ণ ১৩০১।

‡ নসরত সাহ চট্টগ্রামে আসিয়াছিলেন, তাই তাঁহার পিতা অপেক্ষা তিনি সে দেশে বেশী পরিচিত ছিলেন এবং সেই জন্য কবি, পুত্রের নামে পিতার পরিচয় দিতেছেন। নসরত সাহ বঙ্গসাহিত্যের উৎসাহবর্দ্ধক ছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে; আমরা বৈষ্ণব পদাবলীতেও নসরত সাহেব উল্লেখ দেখিতে পাই—"সে যে নসিরা সাহ জানে, যারে হানিল মদন বাণে।" (সাধন, শ্রাবণ ১৩০ পৃঃ (২৭২)।

তান এ সেনাপতি লস্কর ছুটি খান।
ত্রিপুরার উপরে করিল সন্নিধান ॥
চাটিগ্রাম নগরের নিকট উত্তরে।
চন্দ্রশেখর পর্ব্বত কন্দরে ॥
চারলোল গিরি তার পৈত্রিক বসতি।
বিধিএ নির্ম্মিল তাঁক কি কহিব অতি ॥
চারিবর্ণ বসে লোক সেনা সন্নিহিত।
নানাগুণে প্রজা সব বসয়ে তথাত ॥
ফণী নামে নদীএ বেষ্টিত চারিধার।
পূর্ব্বদিগে মহাগিরি পার নাহি তার ॥
লস্কর পরাগল খানের তনয়।
সমরে নির্ভএ ছুটি খান মহাশয় ॥
আজানুলম্বিত বাহু কমল লোচন।
বিলাস হৃদয়ে মত্ত গজেন্দ্র-গমন ॥
চতুঃষষ্টি কলা বসতি গুণের নিধি।
পৃথিবী বিখ্যাত সে যে নির্ম্মাইল বিধি ॥
দাতা বলি কর্ণ সম অপার মহিমা।
শৌর্য্যে বীর্য্যে গাম্ভীর্য্যে নাহিক উপমা ॥
তাহান যত গুণ শুনিয়া নৃপতি।
সম্বাদিয়া আনিলেক কুতূহল মতি ॥
নৃপতি অগ্রেত তার বহুল সম্মান।
ঘোটক প্রসাদ পাইল ছুটি খান ॥
লস্করী বিষয় পাইয়া মহামতি।
সামদানদণ্ডভেদে পালে বসুমতী ॥
ত্রিপুর নৃপতি যার ডরে এড়ে দেশ।
পর্ব্বত গহ্বরে গিয়া করিল প্রবেশ।
গজ বাজি কর দিয়া করিল সম্মান।
মহাবন মধ্যে তাঁর পুরীর নির্ম্মাণ ॥
অদ্যাপি ভয় না দিল মহামতি।
তথাপি আতঙ্কে বৈসে ত্রিপুর নৃপতি ॥
আপনে নৃপতি সন্তপিয়া বিশেষ।
সুখে বসে লস্কর আপনার দেশে ॥

দিনে দিনে বাড়ে তার রাজসম্মান।
যাবত পৃথিবী থাকে সন্ততি তাহান॥
পণ্ডিতে পণ্ডিতে সভাখণ্ড মহামতি।
একদিন বসিলেক বান্ধব সংহতি॥
শুনন্ত ভারত তবে অতি পুণ্য কথা।
মহামুনি জৈমিনি কহিল সংহিতা॥
অশ্বমেধ কথা শুনি প্রসন্ন হৃদয়।
সভাখণ্ডে আদেশিল খান মহাশয়॥
দেশী ভাষায় এহি কথা রচিল পয়ার।
সঞ্চারৌক কীর্ত্তি মোর জগত সংসার॥
তাহান আদেশ মাল্য মস্তকে ধরিয়া।
শ্রীকরণ নন্দী কহিলেক পয়ার রচিয়া॥

ত্রিপুরেশ্বরের বিরুদ্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, সে গুলি ছুটি খাঁর পদে পুষ্পবিল্বদলে অর্চ্চনা। ইতিহাসজ্ঞ মাত্রেই স্বীকার করিবেন, ইহা ঝুঁটা ফলের অঞ্জলি; সে সময়ে ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ ধন্যমাণিক্য ও তাঁহার সেনাপতি মহাবীর চয়চাগ রণক্ষেত্রে মুসলমানগণকে দেখাইয়াছিলেন—ত্রিপুরপাহাড়ের তীব্র বায়ু তাহারা সহ্য করিতে অশক্ত। তথাপি আমরা কবির কল্পনাকে ধন্যবাদ দিব। সত্য হইতে মিথ্যার ছবিই কবির তুলিতে সুন্দর হয়, চার্ল্‌স্‌ সেকেণ্ডের নিকট একবার এক কবি এ কথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

শ্রীকরণ নন্দীর কবিত্ব।

নন্দী কবির কবিত্ব ঈষৎ ব্যঙ্গ মিশ্রিত হইয়া মধ্যে মধ্যে বেশ কৌতুকপ্রদ হইয়াছে, আমরা ভীম ও কৃষ্ণের উত্তর-প্রত্যুত্তর উদ্ধৃত করিতেছি। ভীম যুবনাশ্বের পুরী হইতে অশ্ব আনয়নের জন্য মনোনীত হইলে শ্রীকৃষ্ণ এ প্রস্তাব অনুমোদন করেন নাই। অনেকগুলি যুক্তির মধ্যে এই একটি,—

"বহু ভক্ষ হএ ভীম স্থূল কলেবর।
হিড়িম্বা রাক্ষসী ভার্য্যা যাহার সহচর॥"

ভীমের উত্তর।

"কৃষ্ণের বচনে ভীম রুষিয়া বলিল।
মোকে মন্দ বল কৃষ্ণ নিজ না দেখিল॥

তোহ্মার উদরে যত বসে ত্রিভুবন।
আহ্মার উদরে কত অন্ন ব্যঞ্জন॥
সংসার উপালম্ভ সব খাইলা তুহ্মি।
তাহা হৈতে বহু ভয়ংকর বোলে আহ্মি॥
ভল্লুক কুমারী তোমার ঘরে জাম্ববতী।
তাহা হৈতে অধিক বোল হিড়িম্বা যুবতী॥
তুহ্মি নারীজিৎ মা হও আহ্মি নারীজিৎ।
আপন না দেখিয়া মোক বল বিপরীত॥"

ভাষার জটিলতা হেতু উদ্ধৃত ছত্রগুলিতে তোৎলার রাগ মনে পড়ে। কাশীদাস এস্থল মসৃণ করিয়াছেন, কিন্তু ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণত্ব হ্রাস হইয়াছে।

একখানা প্রাচীন পরাগলী ভারতে আমরা একস্থলে এইরূপ ভণিতা পাইয়াছি।—

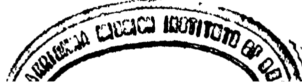
"কহে কবি গঙ্গানন্দী, লেখক শ্রীকরণ নন্দী।" এই গঙ্গানন্দী আবার কে? শ্রীকরণ নন্দীই বা এস্থলে কবির আসন হইতে লেখকের আসনে নামিলেন কেন? হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথির আলোচনায় নানারূপ জটিল প্রশ্নের উদয় হয়, অতীতের অন্ধকারে কল্পনার আলেয়া ভিন্ন অনেক সময়েই পথ আবিষ্কারের অন্য উপায় দেখা যায় না।

জৈমিনি-ভারত।

সঞ্জয়, কবীন্দ্র, শ্রীকরণ নন্দী ও পরবর্ত্তী অনুবাদকারিগণের প্রায় সকলেই জৈমিনি-সংহিতা * দৃষ্টে অনুবাদ সঙ্কলন করিয়াছেন, এরূপ লিখিয়াছেন। ব্যাসের সঙ্গে ইঁহাদের সম্পর্ক অতি অল্প, মধ্যে মধ্যে দোহাই আছে[১] এই পর্য্যন্ত। ...ঙ্গের মৃদু-সমীর-স্পর্শ-সুখে কি ব্যাস ঋষি নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলেন? জৈমিনির প্রতি সকলের ...ক্ষ্য হইল কেন?

পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানকারী, জৈমিনী তাঁহাদের অগ্রণী; তাঁহারই শিষ্য ভট্টপাদ, রাজা সুধন্বার সভায় বৌদ্ধকুল বিজয় করেন। শঙ্কর ইঁহাদের পরবর্ত্তী। জৈমিনি ভারত-গ্রন্থ সংক্ষিপ্ত করেন। মহাভারত শাস্ত্রকারদিগের মতে দুস্তর ভব-সাগর পার হইবার একমাত্র সেতু, কিন্তু ব্যাসকৃত এই সেতু প্রায় ভবসমুদ্রের ন্যায় দুর্গম; তাই জৈমিনি সহজ পথের আবিষ্কার করিয়া ভবার্ণবের বিপন্ন পথিকদিগকে ত্রাণ করিলেন। জৈমিনি-ভারত দেশময় প্রচলিত হইয়াছিল;

১। জৈমিনি ভারতের কেবল অশ্বমেধ পর্ব্ব পাওয়া গিয়াছে, এখনকার ঐতিহাসিকগণের মতে জৈমিনি শুধু অশ্বমেধ পর্ব্বেরই অনুবাদ করিয়াছিলেম। ভারতীয় প্রাচীন পুঁথির অনুসন্ধান শেষ না হইলে, এই মত অকাট্য সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।



অনেক বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথিতে জৈমিনি-ভারতের উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা চণ্ডীকাব্যে শ্রীমন্তের বিদ্যারম্ভে,—

"জৈমিনি-ভারত স্তুত, তবে পড়ে মেঘদুত,
নৈষধে কুমারসম্ভবে।"

অনুবাদ-শাখা—(গ) মালাধর বসু।

মালাধর বসু

কুলীনগ্রামের বসুবংশ বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। গ্রামখানি দুর্গ-সংরক্ষিত ছিল; এই পথের যাত্রিগণ বসু মহাশয়দিগের নিকট হইতে 'ডুরি' প্রাপ্ত না হইলে জগন্নাথ-তীর্থে যাইতে পারিতেন না। মালাধর বসু ও হুসেন সাহের মন্ত্রী গোপীনাথ বসু (উপাধি পুরন্দর খাঁ) এক সময়ের লোক। * বসু-পরিবারে বৈষ্ণব-ধর্ম্মে বিশেষ আস্থাবান্ ছিলেন; মালাধর বসুর পৌত্র বসু রামানন্দের নাম বৈষ্ণব সমাজে সুপরিচিত।

মালাধর বসু আদি বসু হইতে অধস্তন ২৪শ পুরুষ; ইঁহার পিতার নাম ভগীরথ বসু ও মাতার নাম ইন্দুমতী দাসী।

মালাধর বসু গৌড়েশ্বর সামসুদ্দিন ইউসফ্ সাহ হইতে 'গুণরাজ খাঁ' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। সেকালের উপাধিগুলি কিছু অদ্ভুত রকমের ছিল। 'পুরন্দর খাঁ,' 'গুণরাজ খাঁ' এই সমস্ত রাজ-দত্ত খেতাব। আমরা একখানি প্রাচীন কৃত্তিবাসী রামায়ণে কৃত্তিবাসকে 'কবিত্ব-ভূষণ' উপাধিবিশিষ্ট দেখিয়াছি। এই 'কবিত্ব-ভূষণ' রাজ-দত্ত উপাধি অথবা পুঁথিলেখকের

---

* মালাধর বসু গোপীনাথ বসুর জ্ঞাতি ভ্রাতা ছিলেন। পীতাম্বর দাসের 'রসমঞ্জরী' নামক পুস্তকের একটি পদ দৃষ্টে কেহ কেহ অনুমান করেন, গোপীনাথ বসু 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' নামক একখানি পুস্তক রচনা করেন। ভণিতার অংশটি এইরূপ :—"শ্রীযুত হুসন, জগতভূষণ, সোহ এ রস জান। পঞ্চ গৌড়েশ্বর, ভোগ পুরন্দর, ভণে যশরাজ খান।" প্রাচীন তাম্রফলক ইত্যাদিতে ভোগ শব্দ সচিব অর্থে ব্যবহৃত দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাহা হইলেও পুরন্দর এবং যশোরাজ খান যে এক ব্যক্তি তাহা প্রমাণিত হইতেছে না; অপিচ পঞ্চ গৌড়েশ্বর ভোগে ইন্দ্রতুল্য, এরূপ অর্থ করিলে 'পুরন্দর' শব্দকে আর মনুষ্যবিশেষের সংজ্ঞারূপে গণ্য না করিলেও চলে। যাহা হউক সামান্য একটি পদের সন্দেহাত্মক ভণিতার উপর নির্ভর করিয়া আমরা এ বিষয়ে কোন মত প্রকাশ করিতে পারিলাম না। মালাধর বসু আদিশূর-আনীত দশরথ বসুবংশীয়। বংশাবলী নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১। দশরথবংশীয় কৃষ্ণ বসু, (বল্লালসেনের সমসাময়িক), ২। ভবনাথ, ৩। হংস, ৪। মুক্তি, ৫। দামোদর, ৬। অনন্ত, ৭। গুণাকর, ৮। শ্রীপতি, ৯। যজ্ঞেশ্বর, ১০। ভগীরথ, ১১। মালাধর বসু (গুণরাজ খাঁ)। মালাধরের ঊর্দ্ধতন ৫ম পুরুষ গুণাকরের জ্যেষ্ঠপুত্র লক্ষ্মণ হইতে পুরন্দর খাঁ অধস্তন পঞ্চম স্থানীয়।

প্রশংসাপত্র, স্থির করিতে পারিলাম না ; যাহা হউক, 'গুণরাজ' উপাধি সে সময় দেশে প্রচলিত ছিল ; আমরা ষষ্ঠীবর কবিকেও 'গুণরাজ' উপাধিযুক্ত পাইয়াছি। অধ্যাপকগণ দক্ষিণাপ্রাপ্ত হইয়া কাণাকেও 'কমলাক্ষ' নাম দিতে পারেন, কিন্তু গৌড়ের সম্রাট্ নিগুর্ণকে 'গুণরাজ' উপাধি দেন নাই ; বৈষ্ণবোচিত বিনয় সহকারে মালাধর নিজকে 'নিগুর্ণ' 'অধম' প্রভৃতি সংজ্ঞায় পরিচিত করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণবিজয়

১৩৯৫ শকে (১৪৭৩ খৃঃ) মালাধর বসু ভাগবতের বঙ্গানুবাদে প্রবৃত্ত হন ও সাতবৎসরে দশম ও একাদশ স্কন্ধের অনুবাদ সমাধা করেন। * এই অনুবাদ-গ্রন্থের নাম 'শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়,' কোন কোন প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথিতে 'গোবিন্দবিজয়' নাম দৃষ্ট হয় ; শেষ স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগ বর্ণিত হইয়াছে, এইজন্যই বোধ হয় 'শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়' নাম দেওয়া হইয়াছে, প্রাচীনকালে 'মৃত্যু,' বা 'যাত্রা' এই দুই অর্থে 'বিজয়' শব্দ ব্যবহৃত হইত। ভগবতী যে দিন পৃথিবী হইতে কৈলাস গমন করেন সেই দিন 'বিজয়ার দিন' নামে পরিচিত।

মূল ও অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ের কবি সংস্কৃতশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। মূল গ্রন্থের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় মিলাইয়া দেখিলে অনুমিত হইবে, মালাধর বসু শুধু কথকদিগের মুখে শুনিয়া ভাগবত প্রণয়ন করেন নাই, তিনি স্বয়ং ভাগবত টিকা টিপ্পনীর সহিত বিশেষ ভাবে পাঠ করিয়া ছিলেন। সেকালে ঠিক অক্ষরে অক্ষরে মিলাইয়া অনুবাদ করার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল না ; 'শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়'ও সেরূপ অনুবাদ নহে, তবে মূলের সঙ্গে কতকটা ভাষাগত সংশ্রব না আছে এমন নহে ; নিম্নে উদাহরণরূপে দুইটি অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

মূল হইতে অনুবাদিত ঃ—

(১) "কোন্ সময় বনেতে প্রথম ভোজন করিবার মানসে প্রত্যূষে হরি গাত্রোত্থান করিলেন, এবং বৎসপালক বয়স্যদিগকে প্রবোধিত করিয়া মনোহর শৃঙ্গ-ধ্বনি করিতে করিতে বৎস সকলকে অগ্রে করিয়া নির্গত হইলেন।

কতিপয় বালক বংশী বাদ্য করিতে করিতে, কতকগুলি শৃঙ্গ বাজাইতে বাজাইতে, কতিপয় অর্ভক ভৃঙ্গসহ গান করিতে করিতে, অন্য বালকেরা কোকিল-সঙ্গে কলরব করিতে করিতে খেলা করিতে লাগিল। অপর শিশুরা পক্ষী-দিগের ছায়ায় ধাবন, হংসদিগের সহিত গমন, বক-সঙ্গে উপবেশন ও ময়ূর-সহ নৃত্যে প্রবৃত্ত হইল। আর কোন কোন বালক বানরশিশুদিগকে আকর্ষণ করিতে লাগিল।"—শ্রীমদ্ভাগবত। ১০ স্কন্ধ, ১২শ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় † ঃ—

"প্রভাতে ভোজন করি শিঙ্গা বাজাইয়া।
পিছে পিছে চলে যত বাছুর চালাইয়া॥

---

* "তেরশ পঁচানই শকে গ্রন্থ আরম্ভন।
চতুর্দ্দশ দুই শকে হৈল সমাপন॥"—শ্রীকৃষ্ণবিজয়।

† মুদ্রিত শ্রীকৃষ্ণবিজয় আমার নিকট আপাততঃ নাই। পূর্ব্ববঙ্গে প্রাপ্ত প্রায় ২০০ বৎসরের হস্তলিখিত পুঁথি হইতে এই অংশ এবং পরবর্ত্তী অংশগুলি উদ্ধৃত হইল।

একত্র হইল সব যমুনার তীরে।
নানামতে ক্রীড়া করি যায় দামোদরে ॥
কথাতে কোকিল পক্ষিগণে নাদ করে।
তার সঙ্গে নাদ করে দেব গদাধরে ॥
কথাতে মর্কটশিশু লাফ দেহি রঙ্গে।
সেই মতে যায় কৃষ্ণ বালকের সঙ্গে ॥
কথাতে ময়ুর পক্ষী মধু নাদ করে।
সেই মত নৃত্য করে দেব দামোদরে ॥
কথা কথা পক্ষীএ আকাশে উড়ি যাই।
তার ছায়া সঙ্গে নাচে রামকান্নাই ॥
কথা বা সুগন্ধি পুষ্প তুলিয়া মুরারি।
কত হৃদে মস্তকে শ্রবণে কেশে পরি ॥"

মূল হইতে অনুবাদিত ঃ—

(২) "কোন কোন গোপাঙ্গনা গো দহন করিতেছিল, তাহারা দোহন বিসর্জ্জন পুর্ব্বক সমুৎসুক হইয়া গমন করিল। অন্যান্য গোপী অন্ন পাকানন্তর মহানসে রাখিয়া স্থালীস্থ জল নিঃসারণ করিতেছিল, সমুদায় ক্বাথ-নির্গম প্রতীক্ষা করিতে পারিল না। অপরা গোপী গোধুম কণান্ন রন্ধন করিতেছিল, পক অন্ন না নাবাইয়াই চলিল। কোন কোন গোপী গৃহে অন্নাদি পরিবেশন করিতেছিল, কেহ কেহ শিশুদিগকে দুগ্ধ পান করাইতেছিল, অন্য কয়েক জন পতিশুশ্রূষায় রত ছিল, তাহারা তত্তৎ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া গেল। অন্য গোপাঙ্গনাগণ ভোজন করিতেছিল, গীত শুনিবামাত্র আহার ত্যাগ করিয়া চলিল।" ১০ স্কন্ধ ২৯ অঃ।

শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ে,—

"সবার হৃদয়ে কানু প্রবেশ করিয়া।
বেণুদ্বারে গোপীচিত্ত আনিল হরিয়া ॥
ছাওয়ালের স্তন পান করে কোন জন।
নিজপতি সঙ্গে কেহ করেছে শয়ন ॥
গাভী দোহায়েন্ত কেহ দুগ্ধ আবর্ত্তনে।
গুরুজন সমাধান করে কোহ্ন জনে ॥
ভোজন করএ কেহ করে আচমন।
রন্ধনের উদ্যোগ করয়ে কোহ্ন জন ॥
কার্য্য হেতু কেহ কারে ডাকিবার যায়।
তৈল দেহি কোহ্ন জন গুরুজন পায় ॥

কেহ কেহ পরিবার জনেরে প্রবোধে।
কেহ ছিল কার কার্য্য অনুরোধে॥
হেনহি সময়ে বেণু শুনিল শ্রবণে।
চলিল গোপিকা সব যে ছিল যেমনে॥"

এই সকল অংশ আমরা বাছিয়া উঠাই নাই; মূলের সঙ্গে ইহার মোটামুটি বেশ ঐক্য আছে, কেবল রাধিকার প্রসঙ্গ ভাগবত বহির্ভূত।

রাধা প্রথমতঃ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ ও আর কয়েকখানি সংস্কৃতগ্রন্থ আশ্রয় করিয়া শুভ দিনে আর্য্যাধর্ম্মের দেব-মণ্ডপে প্রবেশ লাভ করিয়াছিলেন; চির শ্রদ্ধেয় দেবদেবীগণ প্রকৃতির এই আভরণ-হীনা সৌন্দর্য্য প্রতিমার আড়ালে পড়িয়া গেলেন; সদ্য চ্যুত-অনাঘ্রাত মালতী-পুষ্পের ন্যায় এই দেবীকে পাইয়া কবি ও ভক্ত আনন্দিত হইল। চিরারাধ্যা দুর্গা ও কালীর উদ্দেশে আহৃত পুষ্পমালা শ্রীরাধিকার কণ্ঠে দোলাইয়া দিল। বঙ্গদেশে কুসুম-সিংহাসনে, ফুল্ল পঙ্কজ ও চন্দনার্দ্র তুলসী-দলে সজ্জিত হইয়া শ্রীরাধিকা অধিষ্ঠিত হইলেন; প্রাচীন বঙ্গীয় সাহিত্যের সার সৌন্দর্য্য তাঁহারই চরণ-কমলের সুরভিমাখা। রাই কানু নাম বঙ্গ-সাহিত্য হইতে বাদ দিলে, এই দেশের অতীত ও ভাবী শত সহস্র উৎকৃষ্ট গীতি কবিতার শিরে বজ্রাঘাত করা হয়! এই দেশে সেই সব সঙ্গীতের তুল্য মনোহারী কিছু হয় নাই। যদিও রাধার নাম ভাগবতে নাই, তথাপি কোন কোন পুরাণে (ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত পুরাণ ছাড়াও রাধার উল্লেখ আছে। রাধা-তন্ত্র, রাধা-চক্র প্রভৃতি সংজ্ঞা ও তদ্বিষয়ক প্রাচীন পুঁথি দুর্ল্লভ নহে। কাহারো কাহারো মতে সৌরমণ্ডলীর আবর্ত্তন হইতে রাধাকৃষ্ণলীলার পরিকল্পনা হইয়াছে;—সূর্য্যকে লইয়া গ্রহ উপগ্রহগণ আকাশ-পথে যে ভাবে পরিভ্রমণ করেন বলিয়া প্রাচীন-কালে বিশ্বাস ছিল, তাহা হইতেই 'সৌরযাত্রা' এবং পরিশেষে 'কৃষ্ণযাত্রা' কল্পিত হইয়াছে। সূর্য্য-দেব রাধা, অনুরাধা, চিত্রা, বিশাখা প্রভৃতি গ্রহগণের সঙ্গে মিলিত হইতেন। এই মিলনই শেষে "রাস" সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া আধ্যাত্মিক অর্থবাচক হইয়াছে। বৈদিক সাহিত্যে বিষ্ণু অর্থ সূর্য্য। কালক্রমে সূর্য্যের পূজা ও তৎসম্বন্ধীয় লীলা বিষ্ণুতে (কৃষ্ণে) আরোপ করা হইয়াছিল। কৃষ্ণ এই সূত্রে রাধা, অনুরাধা, চিত্রা, বিশাখা প্রভৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হইয়াছিলেন। প্রাকৃত পিঙ্গল প্রভৃতি বহু প্রাচীন গ্রন্থে রাধার নাম পাওয়া যাইতেছে। বস্তুত রাধা সংস্কৃত সাহিত্যে বিশেষ ভাবে স্বীকৃত না হইলেও লৌকিক সাহিত্যে তাঁহার স্থান অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ-কীর্ত্তন ও মালাধরের শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ে আমরা বঙ্গসাহিত্যে রাধা-কৃষ্ণের লীলার নানারূপ গ্রাম্য-আখ্যায়িকা প্রাপ্ত হইতেছি।

দানলীলা অধ্যায়ে কবি মালাধর বসু সেই নূতন সৌন্দর্য্যের রেখাপাত করিয়াছেন। ভাগবতের

গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে দেবতা ভাবিয়া পূজা করিতেছে, তাঁহাদের প্রেম শ্রীকৃষ্ণের দেবশক্তিতে বিশ্বাসের সঙ্গে জড়িত, সুতরাং তাহা কতকাংশে বিস্ময়ের উচ্ছ্বাস ; কিন্তু তুল্য জ্ঞান না হইলে বাহু জড়াইয়া আলিঙ্গন করা যায় না, হাত বাড়াইয়া ফুল্ল ফুলটি পদে রাখিয়া আসা যায় মাত্র। ভক্তের মত ভক্ত হইলে, দেবতা ও ভক্তের আসন একস্থানে, কারণ ভক্ত ভিন্ন দেবতা কাষ্ঠ-পুত্তলি মাত্র, চকোর এবং চন্দ্রে প্রকৃত প্রেম হয় না : চণ্ডীদাস বলিয়াছিলেন—

"কি ছার চকোর চাঁদ—দুহুঁ সম নহে।"

ভাগবতে অসম্পূর্ণ অংশ মালাধর বসু এই স্থলে পূরণ করিয়াছেন। দানলীলা ও পার-খণ্ডে রাধিকা ও গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে কৌতুক করিতে ও তাঁহাকে মানভরে গালি দিতে শিখিয়াছে ; এখানে শ্রীকৃষ্ণ পীতধড়া-পরিহিত বংশীধারী প্রস্তরমূর্ত্তি নহেন ; তিনি প্রেমিকশিরোমণি, চতুর-চূড়ামণি। ভাগবতেব শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে প্রেমদান করিয়া অনুগৃহীত করেন ; শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ের নায়ক প্রেম দিয়া যেরূপ অনুগৃহীত করেন, প্রেম পাইয়াও সেইরূপ অনুগৃহীত হন।

দক্ষিণা পবনে নৌকা টলমল করিতেছে, তখন—

"কি হৈল কি হৈল বলি কাঁদে গোপনারী।"

এবং "কাঁধে কেরয়াল করি হাসয়ে মুরারি।"—শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়।

ইহার পরে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে এ সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিতে বলিতেছেন ; এবং তজ্জন্য যে সকল উৎকোচ দিবেন তাহার ফর্দ্দ এইরূপ ঃ—

"কেহ বলে পরাইমু পীত বসন।
চরণে নূপুর দিমু বলে কোহ্ন জন॥
কেহ বলে বনমালা গাঁথি দিমু গলে।
মণিময় হার দিমু কোহ্ন সখী বলে॥
কটিতে কঙ্কণ দিমু বলে কোহ্ন জন।
কেহ বলে পরাইমু অমূল্য রতন॥
শীতল বাতাস করিমু অঙ্গ জুড়ায়।
কেহ বলে সুগন্ধি চন্দন দিমু গাএ॥
কেঁহ বলে চূড়া বানাইমু নানা ফুলে।
মকর কুণ্ডল পরাইমু শ্রুতিমূলে॥
কেহ বলে রসিক সুজন বড় কাণ।
কর্পূর তাম্বুল সমে জোগাইব পান॥"

—শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ এ সব কিছুই চান না। গোপীগণের ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারও আশা উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে—তিনি বলিলেন—"প্রথম মাগিএ আমি যৌবনের দান।" রাধিকা ক্রুদ্ধা, তিনি এ প্রস্তাবে নিজকে বড় অপমানিত মনে করিলেন, তখন হাসিয়া হাসিয়া,—

"কানুবলে সত্য কহি বিনোদিনী রাই।
নবীন কাণ্ডারী আমি নৌকা নাহি বাই।"—শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়।

এইখানে প্রাণের খেলা,—মাধুর্য্যের এক নব পন্থা যাহা পদকর্ত্তারা সম্পূর্ণ প্রকাশ করিয়াছেন। ভালবাসার মাহাত্ম্যে আরাধ্য ও আরাধকের এই গূঢ় চিত্তসংযোগ শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ে অভিনব বস্তু। তাই কাব্যের এই স্থানের মৌলিক রসধারায় অনুবাদের কৃত্রিমতা নাই; ভালবাসার শাস্ত্র ভাগবতের পর শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে আর একটুকু অগ্রসর হইয়াছিল, স্বীকার করিতে হইবে। এই দানলীলা ও পার খণ্ড মৌলিক সামগ্রী, ইহা সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায় না; কিন্তু প্রাদেশিক ভাষার কোন্ উৎস হইতে ইহা প্রবহমান হইয়া বঙ্গ সাহিত্যে অমৃত-স্রোত ঢালিয়া দিয়াছে তাহা অনুসন্ধানের বিষয়। শ্রীচৈতন্যদেব যে সমস্ত ভাষাগ্রন্থ পাঠ ও কীর্ত্তন করিয়া সুখী হইতেন, শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় তাহাদের অন্যতম।

——*——

(৩) লৌকিক ধর্ম্ম-শাখা।

(ক)—লৌকিক ধর্ম্মের উৎপত্তি।

(খ)—'শিবের ছড়া।'

(গ)—চাঁদ সদাগর, বেহুলা ও মনসা দেবী।

(ঘ)—কাণা হরিদত্ত, বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব ও কবি জনার্দ্দন প্রভৃতি।

লৌকিক ধর্ম্মের দেবতা।

মনসা, মঙ্গলচণ্ডী, ষষ্ঠী, সত্যনারায়ণ, দক্ষিণের রায়—ইঁহারা বাঙ্গালীর ঘরের দেবতা। ইঁহাদের শাস্ত্র বঙ্গভাষাতেই লিখিত; বঙ্গীয় গৃহস্থবধূগণই ইঁহাদের পূজার উৎকৃষ্ট পুরোহিত। ইঁহাদের ছড়া-পাঁচালী মুখস্থ করা এক সময় গৃহস্থবধূগণের অবশ্য কর্ত্তব্যের মধ্যে গণিত ছিল; ইঁহারা কেহ সপ্তাহান্তে. কেহ মাসান্তে খাঁটি বাঙ্গালীর ঘরে

রচনার এই অংশ বিশেষ পরিবর্ত্তন না করিয়া স্বীয় গ্রন্থে স্থান দিয়াছেন। আমরা সেই অংশ হইতে অল্প একটা অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

„ক্ষেতে বসি কৃষাণে ঈষাণ বলে ভাল।
চারিদণ্ডে চৌদিগ চৌরস করে চাল॥
আড়ি তুলে ধারে ধারে ধরাইল ধান।
হাটু গাড়ি ঈশানেতে আরম্ভে নিড়ান॥
বারটি বারঠে চেকুড়াব ঝড়াউড়ি।
গুলামুখি পাতি মারে পুতে যার মুড়ি॥
দল দূর্ব্বা সোলা শ্যামা ত্রিশিরা কেশুর।
গড় গড় নানা খড় উপাড়ে প্রচুর॥
খর খর খুজিয়া খড়ের ভঙ্গে বাড়।
কুলি করি খাইল ধান্তের ধরে ঝাড়॥
কিতাযুড়ে ভিতা বেড়ে মাঝে গিয়া রয়।
উলট পালট করে বার পাঁচ ছয়॥
এইরূপে সেই কিতা সারে চট পট।
কিতা নিড়াইয়া ভীম চলে সট সট॥
বাদ নাহি বাঘ যেন বসি থাকে বুড়া।
সার্দ্ধ যামে সারে উঠে শত শত কুড়া॥"

উদ্ধৃত অংশের সঙ্গে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে লিখিত শূন্যপুরাণের * নিম্নোদ্ধৃত অংশটী মিলাইয়া পাঠ করুন ঃ—

"জখন আছেন গোসাঞি হঞা দিগম্বর।
ঘরে ঘরে ভিখা মাগিআ বুলেন ঈসর॥
রজনী পরভাতে ভিক্‌খার লাগি জাই।
কুথাএ পাই কুথাএ ন পাই॥
হরু‌কী বএড়া তাহে করি দিনপাত।
কত হরস গোসাঞি ভিক্‌খাএ ভাত॥

* রামাই পণ্ডিত সম্ভবত একাদশ শতাব্দীতে শূন্য পুরাণ রচনা করিয়াছিলেন। প্রকাশিত পুস্তকের ভাষা অনেকাংশেই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

আহ্মর বচনে গোসাঞি তুহ্মি চসবাস।
কখন অন্ন হএ গোসাঞি কখন উপবাস॥
পুখরী কাঁদাএ লইব ভুম খানি।
আরসা হইলে.জেন ছিচএ দিব পানি॥
আর সব কিসান কাঁদিব মাথে হাত দিআ।
পরম ইচ্ছাএ ধান্ন আনিব দাইআ॥
ঘরে ধান্ন থাকিলেক পরভু সুখে অন্ন খাব।
অন্নর বিহনে পরভু কত দুখ পাব॥
কাপাস চসহ পভু পরিব কাপড়।
কতনা পরিব গোঁসাই কেওদা বাঘর ছড়॥
তিল সরিসা চাষ কর গোঁসাই বলি তব পাএ
কত না মাখিব গোসাঞি বিভুতিগুলা গাএ।
মুগ বাটলা আর চসিহ ইখু চাস।
তবে হরেক গোঁসাই পঞ্চামতর আস॥
সকল চাস চস পরভু আর রুইও কলা।
সকল দব্ব পাই যেন ধর্ম্ম পূজার বেলা॥
এতেক সুবিধা হর মনেতে ভাবিল।
মন পবন দুই হেলএ সিজন করিল॥
সুনার জে লাঙ্গল কৈল রূপার জে ফাল।
আগে পিছু লাঙ্গলেত এ তিন গোজাল॥
আস জোতি পাস জোতি আওদর বড় চিন্তা।
দুদিকে দুসলি দিআ জুআলে কৈল বিন্ধা॥
সকল সাজ হৈল পরভুর আর সাজ চাই!
গটা দশ কুআ দিআ সাজাইল মই॥
তাবর দুভিতে চাই দুগাছি সর্লি দড়ি।
চাস চসিতে চাই সুনার পাচন বাড়ি॥
মাঘ মাসে গোঁসাই পিথিব মঙ্গলিল।
জতগুলি ভুম পরভু সকলি চসিল॥”

বাগ্দিনীর পালা নামক যে অমার্জ্জিত প্রেমচিত্র পরবর্ত্তী শিবায়ণ সমূহে স্থান পাইয়াছে, তাহাও আমরা সুপ্রাচীন শিবের গানের অংশ বলিয়া মনে করি।

একটি সুপ্রাচীন শিবের গানে আমরা এই পদগুলি পাইয়াছি ঃ—

"ভাঙ খাইবে ধুতুরা খাইবে খাইবে ভাঙ্গের গুড়া।
পিরথিমি মজলে শিব না হইবে বুড়া॥
ভাঙ্গ খাইবে ধুতরা খাইবে খাইবে শতাবরি (?)
দিবারাত্রি থাকবে তুইন কুচনীয়ার বাড়ী॥
ষোলশ কুচনীর মধ্যে একলা ভুলানাথ।
আপেক্ষা না মিট্‌বে তব কামিণীর স'াত॥
শ্মশানে মশানে থাকবে মাখবে ভস্ম ছালি।
সগলে ডাকবে তবে পাগলা শিব বুলি॥
ভুত পেরেতের লগে একত্রে কর্‌বে বাস।
অঘোর সাগরে পইড়া থাকবে বারমাস॥
বলদের কান্ধে উঠবে পিন্‌বে বাখের ছাল।
কুচনীর পাড়াতে থাক্যা কাটাইও কাল।"

একটি প্রাচীন গোরক্ষ বিজয়ের গীতে আমরা শিবের এই বিবরণটি পাইয়াছি। শস্য-শ্যামলা, উর্ব্বরা বঙ্গভূমির কৃষিকুলের দেবতাকে কৃষাণেরা যেরূপ কল্পনা করিয়াছিল—তাহা এইরূপ। এই চিত্রে প্রদত্ত শিবের নৈতিক চরিত্র, কৃষিতত্ত্বের জ্ঞান, এবং নেশা-খাওয়াব কাহিনী—সমস্তই কৃষক শ্রেণীর দেবতার যোগ্য। ইহাই প্রাচীন শিবের ছড়া। তথাপি এই রুচি-গর্হিত অমার্জ্জিত গানের মধ্যেও শিবের "আনন্দ ময়"ত্বের যে আভা পড়িয়াছে—ভোলানাথের সর্ব্ববিষয়ে উদাসীনতার মাঝে মাঝে যে আলেখ্য দেওয়া হইয়াছে—তাহাতে দেব ভাবের কতকটা ইঙ্গিত আছে। তাহাই পরবর্ত্তী শিবসাহিত্যে বিশেষরূপে পুষ্টিলাভ করিয়াছিল।

লৌকিক ধর্ম্মশাখা।

(গ) চাঁদ সদাগর ও বেহুলা।

মনসা দেবীর পূজা উপলক্ষে চাঁদ সদাগরের চরিত্র বঙ্গীয় প্রাচীন সাহিত্যে পুরুষকারের জীবন্ত আদর্শ। মনসা দেবীর ক্রোধে ছয় পুত্র বিনষ্ট হইল, মহাজ্ঞান' লুপ্ত হইল, 'সপ্তডিঙ্গা মধুকর' অমূল্য সম্পত্তি লইয়া জলমগ্ন হইল, কিন্তু এই উপর্য্যুপরি বিপদরাশি দ্বারা বিধ্বস্ত হইয়াও চাঁদ সদাগর ভ্রূক্ষেপহীন। পুত্রশোকোন্মত্তা সনকার মর্ম্মভেদী ক্রন্দনে তাঁহার গৃহের পাষাণ প্রাচীরগুলিও বুঝি দ্বিধা হইতেছিল, কিন্তু সদাগরের বজ্রাদপি সুকঠিন পণ ভঙ্গ

চাঁদের চরিত্র।

হয় নাই। মনসাদেবীর ক্রোধে তাহার গৃহ অরণ্যে পরিণত হইয়াছিল, কিন্তু ভ্রুকুটি-কুটিল ললাটে চাঁদ শত উৎপীড়ন ও কষ্ট নীরবে সহ্য করিয়াছে, পরাজয় বা আত্মসমর্পণের কথা মনেও স্থান দেয় নাই। তাহার দুঃখবজ্রখিন্ন বীরোচিত উন্নত মস্তকে ক্ষাত্রতেজ আগ্নেয় লিপিতে অঙ্কিত রহিয়াছে, উহা প্যারাডাইস্ লষ্টের দেবদ্রোহীর কথা মনে উদ্রেক করে, এ ধনুর্ভঙ্গ পণের উদাহরণ জগতের ইতিহাসে বিরল। চাঁদের নৌকা সমুদ্রবক্ষে ঝটিকা তাড়িত, জলমগ্ন হইতে উদ্যত; বিপদের মূল মনসাদেবী। এই শত্রু তর্জ্জনী হেলন দ্বারা মেঘ হইতে তাহাকে ব্যঙ্গ করিতেছেন; চাঁদ এ বিপদেও হেঁতালের লাঠিগাছি ছাড়ে নাই:—

> "এত যদি বলে পদ্মা রথে করি ভর।
> হেঁতালের বাড়ি স্কন্ধে কাঁপে থর থর॥
> মনেতে ভাবিছ কাণি অন্তরীক্ষে রৈয়া।
> সাহস যতপি থাকে কহ আগু হৈয়া॥
> মোর মন্দ করি যদি সারিবার পার।
> তবে কেন কাণা আঁখির ঔষধ না কর॥" বিজয় গুপ্ত।

পদ্মাবতী নামের সংস্রব-ত্যাগ।

চাঁদ সমুদ্রে পড়িয়া লোণাজলে প্রায় সংজ্ঞাহীন হইল। এই অবস্থায় পদ্মা কয়েকটি পদ্ম ফুল ফেলাইয়া দিলেন; তাঁহাকে মারিতে পদ্মার ইচ্ছা নাই, চাঁদ মরিলে পূজা প্রচলিত হয় না। চাঁদ সেই অন্ধকার রাত্রির ঈষৎ বিদ্যুতালোকে মুমূর্ষু অবস্থায় পদ্মফুলের স্তূপ দেখিয়া আশ্রয় বোধে হাত বাড়াইল; কিন্তু পদ্ম স্পর্শে পদ্মাবতীর নাম সংস্রব স্মরণ করিয়া ঘৃণায় হাত ফিরাইল, লোণা জলে মরিতে ডুব দিল।

অনাহারে বিড়ম্বনা।

তিন দিন উপবাসের পর চাঁদ বন্ধুগৃহে খাইতে বসিয়াছে; নানাবিধ উপাদেয় সামগ্রীর সঙ্গে অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত। ক্ষুধার্ত্ত চাঁদ গণ্ডুষ করিয়া খাওয়া আরম্ভ করিবে, এমন সময় বন্ধু চাঁদকে মনসার সহিত বাদে ক্ষান্ত দিতে উপদেশ দিলেন। "বর্ব্বর ভাড়ায়ে খাও কাণি" বলিয়া ক্রোধোন্মত্ত চাঁদ অন্ন ব্যঞ্জনে পদাঘাত করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইল, ও নদীর পারে বসিয়া কদলীর পরিত্যক্ত ছোবড়া খাইয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিল।

লখীন্দরের মৃত্যুজনিত শোক।

ছয় পুত্রের শোকে জর্জ্জরিত চাঁদ শেষ পুত্র লখীন্দরকে লাভ করিয়া যেন হাতে স্বর্গ পাইল, কিন্তু লোহের বাসরে মনসাদেবীর সর্প লখীন্দরকে দংশন করিল। বিবাহ শয্যা মৃত্যু-শয্যায় পরিণত হইল। সনকা শোকে ক্ষিপ্ত, গভীর ক্রোধে ও বিষাদে চাঁদের ললাটে মেঘবৎ ছায়া পড়িয়াছে; তবুও চাঁদ কাঁদিল না, মনসাকে বধ করিতে হেঁতাল কাঁধে তুলিয়া লইল।

কিন্তু পদ্ম-পুরাণের শেষ অঙ্কে পরাভব। সে পরাভবও চাঁদের ন্যায় বীরের উপযুক্ত। মনসাদেবী ইতিপূর্ব্বে কতবার ইঙ্গিতে জানাইয়াছেন, একবার এক মুষ্টি ফুল তাঁহার পদে ফেলিয়া দিলেই তিনি পুত্রগুলি বাঁচাইয়া দিবেন, 'সপ্ত ডিঙ্গা মধুকর' জল হইতে তুলিয়া দিবেন। কিন্তু চাঁদ বীর লুব্ধ হইয়া অবনতি স্বীকার করে নাই। এই শাল্মলীতরু কিসে নত হইল? বেহুলার স্নেহ চাঁদবেণে রোধ করিতে পারিল না; সনকার মর্ম্মভেদী ক্রন্দন সে উপেক্ষা করিয়াছে, কিন্তু বেহুলা রমণী হইয়াও তাহারই মত এক জন। সে ছয় মাস স্বামীর গলিত শব বক্ষে করিয়া ভেলায় ভাসিয়াছে; সে কত প্রলোভন দলন করিয়া স্থলকুম্ভীর ও জলকুম্ভীরের লেলিহান জিহ্বা ও মুক্ত দশন হইতে একাগ্রতার বলে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া কঠোর তপস্যায় স্বগণবর্গকে বাঁচাইয়া আনিয়াছে; চাঁদ কোন্ প্রাণে এমন পুত্র-বধূকে বহু-কৃচ্ছ-অর্জ্জিত স্বগণসহ মৃত্যুর দ্বারে ফিরিয়া যাইতে বলিবে?

চাঁদের পরাভব।

এখানে বিধাতা নীলোৎপলপত্রে শমীতরুচ্ছেদন করিলেন,—স্নেহে বশীভূত ততোধিক গুণে চমৎকৃত চাঁদ পদ্মপুরাণের শেষ অঙ্কে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বাম হস্তে বিষহরির পদে অঞ্জলি দিলেন। যে হস্ত শিবের পদে অঞ্জলিদানে নিযুক্ত, 'চেঙ্গমুড়ি কাণী' সে হস্তের অঞ্জলি প্রত্যাশা করিতে পারেন নাই। এ অঞ্জলি একদিকে যেমন বিষহরির নিকট গর্ব্বিত সদাগরের পরাজয় বলিয়া গণ্য, তেমনই অন্যদিকে ইহা পতিব্রতা সতী সাধ্বী পুত্রবধূর শিরে আশীর্ব্বাদ-স্বরূপ; ইহা গুণীর নিকট গুণীর অবনতি; গুণশীলা পুত্রবধূকে চাঁদবেণে কষ্ট দিতে পারেন নাই। মনসাদেবী যখন চাঁদসদাগরের হাতে হেঁতালের লাঠিগাছি দেখিয়া পূজামণ্ডপে নামিতে সাহস হন নাই, তখন বেহুলা বিনয় করিয়া শ্বশুরের হাত হইতে লাঠিগাছি ফেলিয়া দিলেন। বেহুলার সেই বিনয় মধুর গঞ্জনা কোকিলকুজনের ন্যায় মিষ্ট;—

বেহুলার জয়।

"যদি মোর পূজা করিবে চাঁদ বেণে।
হেঁতালের বাড়িগাছি আগে ফেল টেনে॥
একথা শুনিয়া হৈল চাঁদবেণের হাস।
হেঁতালের বাড়িতে আর নাহি কর ত্রাস॥
বেহুলা বিনয় করে আসিয়া শ্বশুরে।
হেঁতালের বাড়ি তুমি টেনে ফেল দূরে॥"

ক্ষেমানন্দ।

বেহুলা।

এস্থলে আমরা সংক্ষেপে বেহুলা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিব। বেহুলা রূপে গুণে অতুল্যা; তথাপি ভাগ্যদোষে বেহুলা বিবাহের রাত্রেই স্বামি হীনা হইল। স্বামী রাত্রে ক্ষুধায় অন্ন চাহিয়াছিলেন, সতী নেতের আঁচল চিরিয়া অগ্নি জ্বালিয়া, নারিকেল দ্বারা উনন প্রস্তুত করিয়া ভাত রাঁধিয়াছিল; একটি একটি করিয়া কৌশলক্রমে তিনটি সাপকে বন্দী করিয়াছিল, কিন্তু বিধিলিপি নির্ম্মম, অখণ্ডনীয়। ঈষৎ নিদ্রাবশে বেহুলার চক্ষুপুট মুদিত হইয়া আসিয়াছে, কালসর্প এমন সময় লখীন্দরকে দংশন করিল; লখীন্দর ডাকিয়া বলিল,—

বেহুলা বাসর-গৃহে।

"জাগ ওহে বেহুলা সায়বেণের ঝি।
তোরে পাইল কাল নিদ্রা মোরে খাইল কি?"

কেতন দাস।

বেহুলার কালনিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল, চমকিত হইয়া যখন স্বামিকে খুঁজিতে হাত বাড়াইল, তখন আর স্বামী জীবিত নাই, শবস্পর্শে শিহরিত হইয়া বেহুলা কাঁদিয়া উঠিল; সেই ক্রন্দনে শাশুড়ী সনকা ছুটিয়া আসিল ও বেহুলার ক্রোড়ে মৃত পুত্রকে দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বেহুলাকে গালি দিয়া বলিল,—

স্বামীর শব ক্রোড়ে বেহুলাসতী

"সনকা কাঁদিয়া দেয় বেহুলাকে গালি।
সিঁতার সিন্দুরে তোর না পড়িল কালী॥
পরিধান বস্ত্রে তোর না পড়িল মলি।
পায়ের আলতা তোর না পড়িল ধূলি॥
খণ্ড কপালিনী বেহুলা চিরুণী দাঁতী।
বিভা দিনে খাইলি পতি না পোহাতে রাতি॥"

ক্ষেমানন্দ।

কিন্তু বেহুলা সে গালি শুনে নাই; স্বামী রাত্রে আলিঙ্গন চাহিয়াছিলেন, লজ্জিতা নববধূ লজ্জায় তাহাতে স্বীকৃতা হয় নাই; সেই কথা স্মরণ করিয়া তাহার বক্ষঃ বিদীর্ণ ও নয়ন অশ্রুপ্লাবিত হইতেছিল। তারপর আর এক দৃশ্য। বেহুলা কলার মান্দাসে স্বামীর শব ক্রোড়ে করিয়া ভাসিতেছে। বেহুলা এই স্থলে নিরুপমা সুন্দরী! যে শাশুড়ী গালি দিয়াছিলেন, তিনি সাধিতেছেন,—

নিরপরাধিনীর অপরাধ।

"সনকা কাঁদিয়া বলে আলো অভাগিনী।
এ তিন ভুবন মাঝে কোথাও না শুনি॥
বালিকা যুবতী বৃদ্ধা যার পতি মরে।
বিধবা হইয়া সেই থাকে নিজ ঘরে॥
কিসের কারণে তুমি জলেতে ভাসিবে।
প্রতীত কাহার বোলে কান্তে জিয়াইবে॥"

কেতকা দাস।

একখানি পদ্মাপুরাণে আছে, সনকা কাঁদিয়া বলিতেছেন, "আমার প্রাণের বেহুলা ফিরিয়া ঘরে এস, আমি তোমার মুখ দেখিয়া লখিন্দরের শোক ভুলিব।"

তাহার ভ্রাতৃগণ কাঁদিতে কাঁদিতে তাহাকে ফিরাইতে চেষ্টা করিতেছেন,—

"হরি সাধু বলে ভগ্নি মোর বাক্য ধর।
সমুদ্রের কুলে তুমি লখিন্দরে পোড়॥
এই ক্ষণে চল বেহুলা মুক্ত সাহের বাড়ী।
খনি বদলে দিব কাঁচা পাটের শাড়ী।
শঙ্খ বদলে দিব সুবর্ণের চুড়ি।
সিন্দুর বদলে দিব ফাউগের গুড়ি॥"

বিজয় গুপ্ত।

কিন্তু বেহুলা স্বামীর প্রার্থিত আলিঙ্গন প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিয়াছে, আলিঙ্গন-বদ্ধা লতিকা আর তাহার আশ্রয়-তরু ছাড়িবে না; শব ক্রমে গলিত হইল,—

"দেখিয়া বেহুলা কাঁদে পায়ে বড় শোক।
ধরিয়া মড়ার গায় হানে এক জোঁক॥
ছাড়াইতে নাহি ছাড়ে মাংসেতে লুকায়।
মরি হরি বেহুলার কি হবে উপায়॥
*　　*　　*　　*
"অবিরত নেত্র জল নিবারিতে নারি।
নোয়াদার ঘাটে ভাসে বেহুলা সুন্দরী॥"

কেতকা দাস।

এই দুঃখের অবস্থায় একদিকে জলজন্তুগণ শব কাড়িয়া খাইতে আসিয়াছে, অপরদিকে,—

"পথের পথিক যত পথ বাইয়া যায়।
বেহুলার রূপ দেখি ঘন ঘন চায়॥
ত্রিজগৎমোহিনী কেন মড়া লৈয়ে কোলে।
কলার মান্দাসে ভাসে ঢেউর হিল্লোলে॥"

কেতকা দাস॥

কত লোক তাঁহাকে লাভ করিতে হাত বাড়াইতেছে,—সতীত্বের জোরে, কপালের সিন্দূরের জোরে বেহুলা চলিতেছেন, তাঁহাকে কে স্পর্শ করিবে? একজন বৈদ্য অশিষ্টপ্রস্তাব করিয়া শব বাঁচাইয়া দিবে বলিয়া আশা দিয়াছিল, বেহুলা তাহার মুখে ছাই দিয়া ভেলা ভাসাইয়া চলিয়া গেলেন। গোদা, ধনা, মনা তাঁহার লোভে সাঁতার দিয়াছিল, বেহুলা দৈববরে তাহাদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন; কিন্তু জলমগ্ন লম্পট-ত্রয়ের জন্য করুণার অশ্রুবিন্দু রাখিয়া গেলেন। সুখে দুঃখে বেহুলার চরিত্রে কখনও স্নেহ, মমতা দয়া প্রভৃতি উৎকৃষ্টভাব লুপ্ত হয় নাই, সর্ব্বদা আরও প্রস্ফুট হইয়াছে। শবের পার্শ্বে বসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে নৈশ আঁধারে সতী-লক্ষ্মী ভাসিয়া যাইতেছেন; মেঘপুঞ্জ ঘিরিয়া আসিয়াছে, আশার ক্ষীণ আলো নিবু নিবু, এ সময়ে শৃগালের বিকট ধ্বনি,—

বেহুলার সতীত্ব

"যতেক শৃগাল; হয়ে এক পাল
একত্রে বেহুলারে ডাকে।
মড়া ফেলাইয়া, যাহ না ফিরিয়া
প্রাণ পাই তোর পাকে॥" কেতকা দাস।

কিন্তু শৃগালগুলিকে সতী প্রবোধ দিয়া যাইতেছেন, এ শব তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় স্বামীর—ইহা তিনি দিতে পারেন না, ইহাতে তিনি জীবন প্রতিষ্ঠা করিবেন, নতুবা প্রাণ দিবেন,তখন,—

"এত কথা শুনি, যত শৃগালিনী,
এ পড়ে উহার গায়।
অপূর্ব্ব কাহিনী কভু নাহি শুনি,
মড়া নাকি প্রাণ পায়॥"

কিন্তু

"শৃগাল কথনে, বেহুলার মনে,
কিছু নাই অভিমান।"

কেতকা দাস।

আধারে ব্যাঘ্র গলিত শব খাইতে মুখ ব্যাদন করিল, বেহুলা বলিলেন ;—"অভাগিনী বেহুলার সহা কেবা আছে। আগেতে আমারে খাও, প্রভুরে খাইও পাছে॥" বিজয় গুপ্ত।

নৃত্যগীতে অনুরাগ পদ্মিনী রমণীর লক্ষণ বলিয়া বর্ণিত আছে। ছোটবেলা বেহুলা নাচিতে গাহিতে শিখিয়াছিল, তাহার নৃত্য দেখিয়া তাহার মাতা অমলা মুগ্ধ হইতেন। পুনরায় এই দুঃখের সময় হাস্যমুখে বেহুলা দেবসভায় নাচিয়া গাহিয়া স্বামীর ও তাহার ভ্রাতৃগণের জীবন পুরস্কার লইয়া ফিরিয়া আসিল। এই দীর্ঘ দুঃখ কথার অবসানে কবিগণ বেহুলার যে কৌতুহলদীপ্ত সুপ্রফুল্ল চিত্রখানি আঁকিয়াছেন, তাহার মাধুর্য্যের মধ্যেও দুঃখমিশ্র একটু সকরুণ ভাব জড়িত আছে ; সেই মলিন অথচ মধুর সৌন্দর্য আমাদিগের মর্ম্ম স্পর্শ করে। বেহুলা স্বামীকে লইয়া ডোম সাজিয়া পিত্রালয়ে গেলেন ; সেখানে রঙ্গচ্ছলে যে করুণ কান্না ও পুনর্মিলনের শোক-মন্দ আনন্দধারা প্রবাহিত হইল, তাহা সেই রঙ্গ ও কৌতুকখেলার মধ্যেও সাধ্বীর কষ্টসহিষ্ণু দৈন্য এবং পরিম্লান মাধুরীতে এক অপরূপ আত্মসমর্পণের শোকগাথা চির-অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে।

কৌতুকে করুণ রস।

কবি স্বচক্ষে সতী দেখিয়া সতী আঁকিয়াছেন। স্বামিবিয়োগের পর সাধ্বী হিন্দু-মহিলা উচ্ছ্বসিত অশ্রু নিরোধ করিয়াছেন, কিন্তু ললাটের সিন্দূরবিন্দু মুছিয়া ফেলেন নাই সতীত্বের প্রতিমা স্বামীর সঙ্গে পুড়িয়া ছাই হইয়াছেন ; এই আগুনে কষিত সতীত্ব যিনি প্রত্যক্ষ না করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে বেহুলাচিত্র অঙ্কন করা অসম্ভব। প্রেম ও সৌন্দর্য্য রমণীচরিত্রে শ্রেষ্ঠ ভূষণ, যুগে যুগে নানা দেশীয় কবিগণ তদ্দ্বারা আদর্শ-রমণী-সৃষ্টি করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। কিন্তু যেখানে প্রেমের অর্থ আত্মসমর্পণ ও স্বীয় সত্বার সম্পূর্ণ বিলয় এবং সৌন্দর্য্যের অর্থ চরিত্রমাহাত্ম্য, সেই স্থানেই আদর্শ সর্ব্বকালের উপযোগী হয় ; তদ্রূপ রমণী-চরিত্র সাহিত্য বড় বিরল। বেহুলা-চরিত্র আঁকিতে কোন কবিগুরু বাল্মীকি লেখনী ধারণ করেন নাই গ্রাম্য কবিগণ বংশদণ্ডাগ্রে, ব্লটিং কাগজের অভাব বালিকা দ্বারা পূর্ণ করিয়া তুলট-কাগজের উপর বেহুলা সতীর রেখাপাত করিয়াছেন ; তথাপি উহা একটি আদর্শ সাধ্বীর চিত্র হইয়াছে। আমাদের দেশে রমণীগণের কষ্টের সীমা নাই। দৈনন্দিন গার্হস্থ্য জীবনে পরার্থ আত্মোৎসর্গ, উপবাস, ব্রতাদির কঠোরতা ও স্বামীর জন্য প্রাণত্যাগ—এই নানাবিধ সৎগুণের প্রতিভা যেন আপনা আপনি সমাজ হইতে সাহিত্যে প্রতিবিম্বিত হইয়া বেহুলার ন্যায় আদর্শ চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছে, ইহাতে কবিগণের সাহিত্যদর্পণ পড়িতে হয় নাই। সাহিত্যদর্পণের সূত্র এরূপ উচ্চ রমণীচরিত্র আয়ত্ত করিতে পারে না; এবং লেখা পড়ার হিসাবে নিতান্ত নগণ্য গ্রাম্য কবিকে পণ্ডিতের ব্যবস্থা শুনিয়া লিখিতে হইলে তাঁহার আর লেখা চলিত না। অকৃত্রিমতাই এই সকল কবির প্রতিভা, প্রকৃতি যেন স্বয়ং ইহাদের

বেহুলা, ঘরের ছবি।

হাতে তুলিকা দিয়া তাহাদের নিজ গৃহ দেখাইয়াছিলেন, তাহারা নিজ বাড়ী-ঘরের ছবি আঁকিতে যাইয়া অজ্ঞাতসারে বিশ্ব-চিত্রভাণ্ডারে এক অমূল্য আলেখ্য উপহার দিয়াছে। বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির পয়ার ও লাচাড়ীছন্দরূপ কয়লার খনিতে অনেকগুলি হীরককণা আমরা খুঁজিয়া পাইয়াছি। সাহিত্যিক আবর্জ্জনা ঘুচাইয়া বাহিরে আনিতে পারিলে উহারা জগতের আদর-দৃষ্টিতে পড়িয়া স্বীয় মূল্য লাভ করিবার সুবিধা পাইবে। (১)

(ঘ)—কাণা হরিদত্ত, বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব ও কবি জনার্দ্দন প্রভৃতি।

মনসাদেবীর গীত প্রথমতঃ কাণা হরিদত্ত নামক জনৈক কবি রচনা করেন, কিন্তু দেবী তাহাতে সন্তুষ্ট হন নাই, তাই তিনি বরিশাল জেলার ফুল্লশ্রী গ্রামনিবাসী বিজয়-গুপ্তকে স্বপ্নে কাব্য রচনা করিতে নিযুক্ত করেন—

কাণা হরিদত্ত ও বিজয় গুপ্ত

"মূর্খে রচিল গীত না জানে মাহাত্ম্য।
প্রথমে রচিল গীত কাণা হরিদত্ত॥
হরিদত্তের যত গীত লুপ্ত হৈল কালে।
যোড়া গাঁথা নাহি কিছু ভাবে মোরে ছলে॥
কথার সঙ্গতি নাই নাহিক সুস্বর।
এক গাইতে আর গায় নাহি মিত্রাক্ষর॥
গীতে মতি না দেয় কেহ মিছা লাফফাল।
দেখিয়া শুনিয়া মোর উপজে বেতাল॥"

বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ।

বিজয়গুপ্ত লিখিয়াছেন, কাণা হরিদত্তের গীত তাঁহার সময়ে একরূপ লুপ্ত হইয়াছিল। বিজয়গুপ্ত পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে হুসেনসাহার রাজত্বকালে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার সময়ে যে গীতি বহুকাল প্রচলিত থাকিয়া লুপ্ত হইয়াছিল, তাহা অন্ততঃ দুই তিন শত বৎসর পূর্ব্বে বিরচিত হওয়ার

---

(১) বেহুলার চরিত্র সম্বন্ধে ৺রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন।

"স্ফীত গলিত কীটাকুলিত পূতিগন্ধি মৃতপতিকে ক্রোড়ে লইয়া নির্ব্বিকার চিত্তে ও নির্ভয় মনে বেহুলার মান্দাসে যাত্রা ভাবিতে গেলে সীতা, সাবিত্রী দময়ন্তী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সতীগণের পতিনিমিত্তক সেই সেই ক্লেশ-ভোগও সামান্য বলিয়া বোধ হয় এবং বেহুলাকে পতিব্রতার পতাকা বলিয়া গণ্য করিতে ইচ্ছা হয়।":

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, প্রথম সংস্করণ, ১১৮ পৃঃ॥

সম্ভাবনা। সুতরাং কাণা হরিদত্ত মুসলমান কর্ত্তৃক বঙ্গ বিজয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁহার মনসা-মঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন, আমরা এরূপ অনুমান করিতে পারি। সংপ্রতি মৈমনসিংহ জেলার অন্তর্গত দিঘপাইৎ গ্রামে একখানি প্রাচীন মনসা-মঙ্গল কাব্য হইতে হরিদত্তের ভণিতাযুক্ত একটী কবিতা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই হরিদত্ত পূর্ব্ববঙ্গের কবি ছিলেন বলিয়া আমাদের ধারণা। সুলেখক শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার কর্ত্তৃক হরিদত্তের এই পুঁথিখানির উদ্ধার হইয়াছে। আমরা নিম্নে কবিতাটি উদ্ধৃত করিলাম।

"পদ্মার সর্প সজ্জা।"

"দুই হাতের সঙ্খ হইল গরল সঙ্খিনী।
কেশের জাত কৈল এ কালনাগিনী॥
সুতলিয়া নাগে কৈল গলার সুতলি।
দেবি বিচিত্র নাগে কৈল হ্রিদয়ে কাঁচুলী॥
সিন্দুরিয়া নাগে কৈল সিত্যের সিন্দুর।
কাজুলিয়া কৈল দেবীর কাজল প্রচুর॥
পত্তনাগে কৈল দেবির সুন্দর কিংকিণী।
বেতনাগে দিয়া কৈলা কাকালি কাঁচুলী॥
কণক নাগে কৈল কণের চাকি বলি।
বিঘতিয়া নাগে দেবির পায়ের পাশুলি॥
হেমন্ত বসন্ত নাগে পৃষ্ঠের খোপনা।
সর্ব্বাঙ্গে নিকলে জার অগ্নি কণা কণা॥
অমৃত নয়ান এড়ি বিষ-নয়ানে চায়
চন্দ্রসূর্য্য দুই তারা আড়ে লুকায়॥"

হরিদত্তের গীতি মনসাদেবীর মনঃপূত হয় নাই, বিজয়গুপ্তের স্বপ্ন-বৃত্তান্ত পড়িয়া আমরা ইহা জানিতে পারিয়াছি। হরিদত্তের গানে মিত্রাক্ষর ছিল না, তাহাতে কথার সঙ্গতি কিম্বা যতি প্রভৃতির কোনও আড়ম্বর ছিল না। সংস্কৃতে সুপণ্ডিত বিজয়গুপ্ত-কৃত হরিদত্তের এই দোষারোপ পড়িয়া আমাদের মনে হয়, হরিদত্তের গীতিকা একটি পালা গান (ballad) ছিল, উহাতে সংস্কৃত শব্দ ও ছন্দের প্রাচুর্য্য না থাকিলেও উহা যে পল্লীরসধারার নির্ঝর স্বরূপ ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। সম্ভবতঃ একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বা দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে হরিদত্ত বিদ্যমান ছিলেন। হিন্দু রাজত্বের শেষ সময়ে—যখন গৌড়দেশের উৎসব, সাহিত্য, এবং আমোদ প্রমোদ সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল,—সেই সময় সম্ভবতঃ হরিদত্ত তাঁহার কাব্য লিখিয়াছিলেন। তাঁহার কাব্যের

প্রভাব আমরা মনসা দেবীর কোন কোন হিন্দী কাব্যেও আবিষ্কার করিয়াছি। ভাগলপুরের এক প্রাচীন কবি "বাঙ্গাল ছন্দ" নাম নাম দিয়া তন্নিম্নে যে কবিতাটি দিয়াছেন, তাহা হরিদত্তের একটি রচনার হিন্দী অনুবাদ।

বিজয়গুপ্তকে দেবীর অনুরোধে পড়িয়া ভাসান-গান রচনায় ব্রতী হইতে হইয়াছিল; আমরা বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে গ্রন্থরচনার সময় উল্লিখিত পাইয়াছি। বিজয়গুপ্ত সম্বন্ধে যে কিছু ঐতিহাসিক তত্ত্ব সুলভ, তাহা নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিনিচয়ের অন্তর্গত আছে,—

"হেনমতে স্বপ্ন কথা কহি উপদেশ।
নাগরথে চড়ি দেবী গেল নিজ দেশ॥
স্বপ্ন দেখি বিজয়গুপ্তের দূরে গেল নিদ্রে।
হরি হরি নারায়ণে স্মরিয়া গোবিন্দে॥
প্রভাত সময়ে কাক প্রকাশে দশ দিশা।
স্নান করি বিজয়গুপ্ত পুজিল মনসা॥
হরি নারায়ণে স্মরি নির্ম্মল কৈল চিত।
রচিতে আরম্ভ কৈল মনসার গীত॥
যেইমতে পদ্মাবতী করিলে সম্বিধান।
সেইমতে করে সব গীতের নির্ম্মাণ॥
ঋতু শশী বেদ শশী পরিমিত শক। (১)
সনাতন হুসেন সাহ নৃপতি তিলক॥
উত্তরে অর্জ্জুন রাজা প্রতাপেতে যম।
মুল্লুক ফতেয়াবাদ বাঙ্গরোড়া তক সীম॥
পশ্চিমে ঘাঘরা নদী পূর্ব্বে ঘণ্টেশ্বর। (২)
মধ্যে ফুলশ্রী গ্রাম পণ্ডিত নগর॥

---

(১) প্রাচীন হস্তলিখিত অনেক পুঁথিতেই এই শক দৃষ্ট হয়। মুদ্রিত সংস্করণগুলির "ছায়া শূন্য বেদ শশী পরিমিত শক" ভুল। ষ্ট্যাপলটন সাহেব ফুল্লশ্রীর সন্নিহিত গৈলা গ্রামে প্রাচীন পুঁথিতে এই পাঠ দেখিয়াছেন। "ঋতু শশী বেদ শশী" ১৪১৬ শক ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দ। ১৪৯৩ খৃষ্টাব্দে হুসেন সাহ রাজা হন। যখন মনসামঙ্গল রচিত হয়, তখন চৈতন্য-প্রভুর বয়স ৯ বৎসর মাত্র।

(২) এই ঘাঘর নদীটী বর্ত্তমানে ফরিদপুর জেলার অধীন কোটালীপাড়া গ্রামের পশ্চিম-দক্ষিণ-সীমান্তে স্বল্পকায়া স্রোতস্বিনীর আকারে বর্ত্তমান আছে। কোটালীপাড়া ফুল্লশ্রী হইতে প্রায় ১২ মাইল পশ্চিমে। ঘণ্টেশ্বর নদীটী অধুনা গৌরনদী থানার পূর্ব্বদিকে ভিন্ন নামে পরিচিত। বিজয়গুপ্তের জন্মভূমি ফুল্লশ্রী গ্রামের পরিসর পূর্ব্বে প্রায় সাড়ে চারি

চারি বেদধারী তথা ব্রাহ্মণ সকল।
বৈদ্য জাতি বৈসে তথা শাস্ত্রেতে কুশল॥
কায়স্থ জাতি বৈসে তথা লিখিতে প্রচুর।
আর যত জাতি নিজ শাস্ত্রেতে চতুর॥
স্থানগুণে যেই জন্মে সেই গুণময়।
হেন ফুল্লশ্রী গ্রামে নিবসে বিজয়॥" (১)
বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ।

অন্য এক স্থলে—

"সনাতন তনয় রুক্মিণী গর্ভজাত।
সেই বিজয়গুপ্তে রাখ তব পদ সাত॥"

প্রথমাংশ বিজয়গুপ্তের নিজের রচনা কি না সে বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে, কারণ ঐ অংশের অব্যবহিত পরেই এই দুই পংক্তি পাওয়া যায়,—

"গায়ক হৈয়া তাল ধরে জন্মে নানা জাতি।
বিজয়গুপ্তে বলিয়া ভাই গীতে দেও মতি॥"

ইহা গুপ্ত কবির কাব্য-গায়কের বন্দনা—মূলের অন্তর্গত নহে।

প্রক্ষিপ্ত রচনা।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রাচীন কবিগণের স্বরূপ আবিষ্কার করা সহজ কর্ম্ম নহে। বিজয়গুপ্তের ছদ্মবেশে 'জয়গোপালগণ' ঐতিহাসিক মরীচিকা উৎপাদন করিতেছেন। সেই গাঢ়ভ্রম-সমুদ্র হইতে রত্ন উঠাইতে যাইয়া অনেক সময় শঙ্খ লইয়া ফিরিতে হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী কাব্যগুলির ন্যায় বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণেও নানা হস্তস্পর্শে নানা তুলির বর্ণক্ষেপে পরিশোধিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ডুবন্ত দিবালোক এবং উদিত নক্ষত্রালোক যেরূপ সান্ধ্যগগনে মিশিয়া যায়, প্রাচীনকালের ভিন্ন ভিন্ন যুগের কবিগণের লেখাও সেইরূপ মিশিয়া গিয়াছে; বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে প্রকাশ্যভাবে অন্যান্য কবির ভণিতারও অভাব নাই।

বর্গ মাইল ছিল। ইদানীং এই গ্রাম গৈলাগ্রামের অন্তর্গত ক্ষুদ্র পল্লীস্থানীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিজয়গুপ্তের বাসভূমি ও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মনসাদেবীর মন্দির ও দীঘি অদ্যাপি ফুল্লশ্রী গ্রামে বর্ত্তমান আছে। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মনসাদেবী জাগ্রত দেবতারূপে স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দের নিকট এখনও বিশেষভাবে অর্চ্চিত হইয়া আসিতেছেন।

(১) বিজয়গুপ্ত স্বীয় জন্মভূমির পরিচয় প্রসঙ্গে যে সব কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য।

বিজয়গুপ্তের কবিতা কথায় কথায় ব্যঙ্গের দিকে ধাবিত হয়, সেই ব্যঙ্গেই তাঁহার কবিতা বেশ ফুটিয়া উঠে। এই নগ্নপদ, উত্তরীয়-সার, ঔষধের-পুটলি-কক্ষ 'বেজ মহাশয়' সেকালের একজন বিশিষ্ট রসিক লোক ছিলেন, সন্দেহ নাই। সেকালের রসিকতা এখন ভাঁড়ামি আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু বিজয়গুপ্ত ভাঁড় ছিলেন না। নিম্নে তাঁহার রচনার কিছু নমুনা দিতেছি,—

বিজয় কবির রসিকতা।

পদ্মার বিবাহ সম্বন্ধে শিব দুর্গার আলাপ।

"জামাই এনেছি পুণ্যবান, কন্যা করিব দান
বিবাহের সজ্জা কর ঘরে।
এনেছি মুনির সুত, রূপে গুণে অদ্ভুত,
কন্যা সমর্পিব তার তরে॥
হাসি বলে চণ্ডি আই, তোমার মুখে লজ্জা নাই,
কিবা সজ্জা আছে তোমার ঘরে।
এয়ো এসে মঙ্গল গাইতে, তারা চাবে পান খাইতে,
আর চাবে তৈল সিন্দূরে॥
হাসি বলে শূলপাণি, এয়ো ভাণ্ডাইতে জানি,
মধ্যে দাঁড়াব নেংটা হয়ে।
দেখিয়া আমার ঠান, এয়োর উড়িবে প্রাণ,
লাজে সবে যাবে পলাইয়ে॥
আছুক পানের কাজ, এয়োগণ পাবে লাজ,
পান গুয়া দিবে কোন জনে।
বিজয়গুপ্তেতে কয়, এরূপ উচিত নয়,
ঘরে গিয়ে কর সম্বিধানে॥"
বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ

শিবের অদর্শনে চণ্ডিকার রাগ।

"ভাল ভাঁড়াইয়া শিব পলাইয়া গেল দূর।
এবার তোমার লাগ পাইলে দর্প করিতাম চুর॥
আঁচলে আঁচলে গিট বাঁধি এক ঠাঁই।
রাখিতে নারিনু তবু পাগল শিবাই।

কপট চরিত্র তোমার খলের সঙ্গে ঢঙ্গ।
যাবার কালে লাগ পাইলে দেখাইতাম রঙ্গ ॥
পাপ কপাল ফলে স্বামী পাইলাম ভাল।
ভাঙ্গ ধুতুরা খায় পরিধান ব্যাঘ্রছাল ॥
প্রেতের সনে শ্মশানে থাকে মাথায় ধরে নারী।
সবে বলে পাগল পাগল কত সৈতে পারি ॥
নিন্দে ভাবিতে প্রাণে বড় লাজ লাগে।
চড়ে বেড়ায় দুষ্ট বলদে তারে খাউক বাঘে ॥
আগুন লাগুক কান্ধের ঝুলি ত্রিশূল লউক চোরে।
গঙ্গার সাপ গরুড়ে খাউক যেমন জ্বালাল মোরে ॥
ছিঁড়িয়া পড়ুক হাড়ের মালা, প'ড়ে ভাঙ্গুক লাউ।
কপালের তিলক চন্দ্র তারে গিলুক রাউ।"

বিজয়গুপ্ত।

বঙ্গীয় প্রাচীন কাব্যগুলির কয়েকটীর নির্দ্দিষ্ট ভাব কিরূপে এক কাব্য হইতে অন্য কাব্যে অপহৃত হইয়া বিকাশ পাইয়াছে, তাহা বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে লক্ষিত হইবে; আমরা ভারতচন্দ্রের—

"জয় জয় অন্নপূর্ণা বলিয়া।
নাচেন শঙ্কর ভাবে ঢলিয়া ॥
হরিষে অবশ অলস অঙ্গে।
নাচেন শঙ্কর রঙ্গ তরঙ্গে।"

ইত্যাদি পড়িয়া ভারতচন্দ্রের ছন্দ-গৌরবের কতই সুখ্যাতি করিয়াছি। এইরূপ ছন্দে ভারতচন্দ্রের বহু পূর্ব্বে কবি বিজয়গুপ্ত শিব-নৃত্য বর্ণনা করিয়াছিলেন,—

"জগত মোহন শিবের দাস।
সঙ্গে নাচে শিবের ভূত পিশাচ ॥
রঙ্গে নেহারিয়া গৌরীর মুখ।
নাচেরে মহাদেব মনেতে কৌতুক ॥
হাসিতে খেলিতে রঙ্গে।
নন্দী মহাকাল বাজায় মৃদঙ্গে ॥
বিশাই নাচে রে হাতেতে বাদ্য বাজে।
হাতেতে তালি দিয়া রে মুখেতে গীত গাহে ॥

বিকট দশনে ভ্রুকুটি ভাল সাজে।
ডুম ডুম বলিয়া শিবের ডম্বুর বাজে॥
বিজয়গুপ্ত মধুস্বরে সরস গায়।
পদ্মার চরিত্রে সবে ধন্দ হয়॥"

হ্যামিল্টনের বাড়ীর মুক্তার মালা ছড়া হাতে লইয়া উক্ত কোম্পানীকে কতই প্রশংসা করিয়া থাকি, কিন্তু যে ডুবারি প্রাণের আশা ছাড়িয়া মুক্তার লোভে অতলে ডুব দিয়াছিল, তাহার কথাটা কাহার মনে উদয় হয়? বহু চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি, যে উদ্ভাবন করে তাহার অপেক্ষা যে পারিপাট্য সাধন করে, এই পৃথিবীতে তাহারই আদর অধিক।

বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে আরও অনেক স্থল আছে, যাহা পড়িতে যাইয়া পরবর্ত্তী প্রাচীন বড় বড় কবিগণকে মনে হইয়াছে। সে সকল কবিগণ যাঁহাদের কথা লইয়া বড় হইয়াছেন, তাঁহারা অতীতের বিরাট ছায়ার পাশে পড়িয়া রহিয়াছেন, কে তাঁহাদিগের খোঁজ করে? প্রশংসা, সম্পদ, যশঃ সমস্তই ভাগ্যাধীন; সংসারক্ষেত্রের ন্যায় সাহিত্যক্ষেত্রও প্রতিভা অপেক্ষা ভাগ্যেরই মাহাত্ম্য-জ্ঞাপক, পরে এই কথা আরও পরিস্ফুট হইবে।

বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে বঙ্গদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ধর্ম্ম-তথ্যের খনি। ইহার ভাষা প্রাচীন ও কতকটা অমার্জ্জিত হইলেও, এই কাব্যের পত্রে পত্রে পল্লী-প্রাণের করুণ সাড়া পাওয়া যায়। পূর্ব্ববঙ্গের—বিশেষ বরিশাল, নোয়াখালী, ত্রিপুরা প্রভৃতি অঞ্চলে ঘরে ঘরে এই পুস্তক পঠিত হইয়া থাকে। বেহুলার অমানুষী কষ্ট-সহিষ্ণুতার মর্ম্মভেদী কাহিনীতে পল্লীবাসিনীগণের প্রাণ নিরবধি কাঁদিয়া উঠে এবং তাঁহাদের হৃদয়ে বেহুলা-সতীর মূর্ত্তি উজ্জ্বল মহিমায় চিরকালের জন্য অঙ্কিত হইয়া যায়। পাঁচশত বৎসর যাবৎ বিজয়গুপ্ত বাঙ্গালীর চিত্ত-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত আছেন। ইহা সামান্য গৌরবের কথা নহে। তাঁহার রচনায় মেকী কিছুই ছিল না। খাঁটি বাঙ্গালী প্রাণের আকাঙ্ক্ষা তিনি মিটাইতে পারিয়াছিলেন, এই জন্য তিনি এত আদর পাইয়াছেন।

নারায়ণদেব।

নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণ।

সম্ভবতঃ বিজয়গুপ্তের সমকালেই নারায়ণদেব তাঁহার পদ্মাপুরাণ রচনা করেন। ইনি ত্রিপুরা ও ময়মনসিংহের সংযোগস্থলে জোয়ানসাহী পরগণায় কায়স্থকুলে জন্ম-গ্রহণ করেন। দয়ালচন্দ্র ঘোষ নামক জনৈক শিক্ষিত লেখক ইঁহার জীবন বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতেছিলেন ও 'ভারতী' পত্রিকায় (১২৯০ সন, কার্ত্তিক) তাহা প্রকাশ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, কিন্তু সহসা তাঁহার মৃত্যু হওয়াতে তিনি এ কার্য্য শেষ করিয়া যাইতে

পারেন নাই। তিনি নারায়ণদেবকে পদ্মাপুরাণের আদি লেখক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—ইহা তাঁহার সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা।

এই কবির ২০০ শত বৎসরের প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি আমার নিকট আছে—কিছু মাত্র সংশোধন না করিয়া যেরূপে পাইলাম, সেইরূপই একটি স্থান উদ্ধৃত করিতেছি—

বেহুলা ও তাহার ভ্রাতা নারায়ণীর কথোপকথন।

"নারায়ণী শুনি বোলে বিপুলা বচন।
কি কারণে কৈলা ভইন (১) অশক্য কথন॥
বিষম সায়স (২) ভইন কৈলা কি কারণ।
দেবতা মনিষ্য কোথা হইছে দরশন॥
আজ্ঞা দেহ ভইন মরা পুড়িবারে।
একেশ্বর কেমনে যাইবা দেবঘরে॥
কেমতে ছাড়িয়া দিমু সাগর ভিতর।
কথাতে পাইবা তুমি দেবর নগর॥
অগোরি (৩) চন্দন কাট্টে (৪) লখাই পুড়িমু।
লক্ষিন্দর কর্ম্ম (৫) ভইন এইখানে করিমু॥
নেউটিআ চল ভইন আপনার ঘরে।
একেশ্বর কেমতে যাইব দেবঘরে॥
মৎস্য মাংস এড়ি ভইন যত উপহার।
সর্ব্ব দর্ব্ব দিমু আমি তুমি খাইবার॥
সংখ সিন্দুর মাত্র না পড়িবা তুমি।
নানা অলংকার তোম্মা দিমু আমি॥
মাএ জিজ্ঞাসিলে আমি কি দিব উত্তর।
বিপুলা রাখিআ আইলা জলের উপর॥
বিপুলা রাখিতে সাধু করএ ক্রন্দন।
বিপুলাও বোলে কিছু প্রবোধ বচন॥
জীআইতে আইল প্রভু যাইমু পলাইআ
কেমতে মুখেত জল দিবাম তুলিয়া॥

---

(১) ভইন—ভগিনী। (২) সায়স—সাহস। (৩) অগোরি—অগুরু। (৪) কাট্টে—কাষ্ঠে। (৫) কর্ম্ম—শবদাহাদি।

অসতী হইব মনিষ্য লোকেত প্রচার।
কি কারণে এতেক জে রাখিমু থাথার ॥
গোত্র জ্ঞাতি আছে চম্পক নগর।
তারা কি বলিব আমি কি দিব উত্তর।
বিপুলা শুনিআ বাক্য নিষ্ঠুর বচন।
সকরুণ ভাসে সাধু করএ ক্রন্দন ॥
সুকবি নারায়ণদেবের সরস পাঁচালী।
নারায়ণি করুণা সুন একটি লাচাড়ি ॥

কাঁদে নারায়ণি সাধু কহএ বিপুলা চওআ।
প্রাণে না সর দুঃখ না দিমু এড়িয়া ॥
অবুদ্ধিয়া সদাগর বুদ্ধি অতি ছার।
জিয়তা ভাসাইআ দিছে সইতে মরার ॥
বিষম সাগরে ঢেউ তোলপার করে।
জলেতে পড়িলে খাইব মৎস্য মকরে ॥
মাএ জিজ্ঞাসিলে আমি কি দিব উত্তর।
কি কথা কহিব আমি উজানী নগর ॥
বিপুলা রাখিতে সাধু করএ ক্রন্দন।
নারায়ণদেবে কহে মনসা চরণ ॥
বিস্তর যতন করি রাখিতে না পারিয়া।
চিত্তে ক্ষেমা দিয়া যায় ভেরুআ ভাসাইআ।
ভাইত বিদায় করি বিপুলা সুন্দরী।
ছড়াইয়া জাএ তরে ভুরাখান মেলি ॥
নৈক্ষত্র সঞ্চারে যেন ভুরার চলন।
সম্মুখে বাঘের বাঁকে দিলা দরশন ॥

নারায়ণদেব ও বিজয়গুপ্ত।

এই পুস্তকের হস্তলিপিতে সংস্কৃত জ্ঞানের পরিচয় নাই, লেখক যেভাবে কথা কহিতেন, সেই ভাবেই শব্দগুলি লিখিয়া গিয়াছেন—ইহাতে রচনার পারিপাট্য না থাকিলেও স্বাভাবিকত্ব আছে। বিজয়গুপ্তের লেখা অপেক্ষাকৃত মার্জ্জিত দেখিয়া নারায়ণদেবকে অগ্রবর্ত্তী কবি মনে করা সঙ্গত হইবে না। বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণের বটতলার ছাপা দেখিয়া অংশগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে, আর নারায়ণদেবের পুঁথিখানা গত ২০৯ বৎসর যাবৎ কোনওরূপ হাওয়ায়

বাহির হয় নাই; এই সময়ের মধ্যে কীটগণ অবশ্যই কিছু নষ্ট করিয়াছেন, কিন্তু 'জয়গোপালগণ' সেরূপ সুবিধা পান নাই। *

মনসার গীতি সম্বন্ধে আর একটি কথা বলিয়া উপসংহার করিব। ত্রিপুরা জেলায় একটি চম্পক-নগর আছে, পূর্ব্বাঞ্চলের লোকের বিশ্বাস, সেই স্থলেই লখীন্দরের কাণ্ডকারখানাটা হইয়াছিল। লখীন্দরের লোহার বাসরের ভিটাও তথায় দুষ্প্রাপ্য নহে। এদিকে বর্দ্ধমানের ১৬ ক্রোশ পশ্চিমে চম্পক নগর ও তন্নিকটে বেহুলা-নদী প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। আসাম ভ্রমণ-প্রণেতা উদাসীন সত্যশ্রবা নির্দ্দেশ করেন, ধুবড়ীই চাঁদসদাগরের নিবাসভূমি। উত্তর বঙ্গের লোকেরা বলেন, বগুড়ার নিকটবর্ত্তী মহাস্থানে চাঁদ সদাগর ও লখীন্দরের বাড়ী ছিল। কেহ কেহ দার্জ্জিলিংএর নিকটবর্ত্তী রনিৎ নদীর তীরে চাঁদ সদাগরের বাড়ী নির্দ্দেশ করেন। আবার দিনাজপুর জেলায় কান্তনগরের নিকটবর্ত্তী সনকা গ্রামে চাঁদ সদাগরের বাড়ীর ভগ্নস্তূপ কেহ কেহ দেখিয়াছেন বলিয়া অঙ্গীকার করেন। ভূগোল শিক্ষার্থীর একটু গোলে পড়িবারই কথা। চাঁদবেণে এখন বঙ্গসাহিত্যের একটি সজীব মূর্ত্তি; ইনি চণ্ডীকাব্যে ধনপতি সদাগরের বাড়ীতে পুষ্পমাল্য পাইতেছেন, জয়নারায়ণের চণ্ডীতে ইঁহার সহিত জনৈক কাব্যোক্ত নায়কের দীর্ঘকালব্যাপী আলাপ বর্ণিত আছে ও ত্রিবেণীর পারে তাঁহার বাটীর একটা জমকালো বর্ণনা আছে। পালা গানগুলিতে বহুস্থানে চাঁদসদাগরের উল্লেখ আছে। বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে তিনি মনসার গীতি ছাড়িয়াও এদিক সেদিক হইতে উঁকি মারিতেছেন; সুতরাং চাঁদসদাগরের ন্যায় প্রয়োজনীয় ব্যক্তির নিবাস-ভূমি জানা পাঠকের নিতান্ত আবশ্যক।

চাঁদসদাগরের নিবাসভূমি।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের বিশ্বাস চাঁদবেণের গল্পটি আগাগোড়া কল্পনামূলক। পাঠক শনির পাঁচালী কি সত্যনারায়ণের পাঁচালী দেখিয়াছেন, চাঁদবেণের কথার আরম্ভও ঠিক সেইরূপ ছিল। এক এক জন করিয়া কবিগণ ঘটনা ও কাব্য বর্ণিত চরিত্র বাড়াইয়াছেন, এবং এই অলৌকিক কাহিনীর উপর এমনই একটি কল্পনার ইন্দ্রজাল বিস্তার করিয়াছেন, যে তাহা সত্যের আকার ধারণ

---

* ২৮৫ নং অপার চিৎপুর রোড, বেণীমাধব দে এণ্ড কোম্পানির ছাপা নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণ দ্বিজ বংশীদাস ও কবিবল্লভের দ্বারা সম্পূর্ণরূপ নূতন ভাবে রচিত বলিয়া বোধ হয়। উহার সঙ্গে মূল গ্রন্থের ঐক্য নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। উহার পত্রে পত্রে ভণিতা এইরূপ;—

(১) "দ্বিজবংশীদাসে গায় পদ্মার চরণ।
ভবসিন্ধু তরিবারে বোলে নারায়ণ॥"

(৩) "নারায়ণদেবে কয়, সুকবি বল্লভে হয়," ইত্যাদি।

করিয়া আমাদের বিভ্রম জন্মাইতেছে। কাব্যবর্ণিত ঘটনাগুলি অনুধাবন করিলে এ বিষয়ে সন্দেহ থাকিবে না। মনসাদেবীর সঙ্গে বিবাদে চাঁদসদাগরের দুর্গতিগুলিতে কিছুমাত্র সত্য থাকিতে পারে না। স্বর্গে যাইয়া নাচিয়া গাহিয়া স্বামীর জীবন লাভ করার কথাও পৃথিবীবাসিগণ না দেখিয়া বিশ্বাস করিবে কিরূপে? উপাখ্যানের ভিত্তিস্বরূপ দুইটি মূল ঘটনাই কল্পনার ইষ্টকে গাঁথিয়া উঠান হইয়াছে। সত্যের উপর মধ্যে মধ্যে কল্পনার একটুকু প্রলেপ দিয়া কাব্য প্রস্তুত হয়; যথা,—পলাশীর যুদ্ধ কাব্য। কিন্তু এ কাব্য তাহা নহে। কিন্তু চাঁদসদাগরের উপাখ্যানের এইটুকু সত্যমূলক বলিয়া স্বীকার করিতে আমাদের আপত্তি নাই যে, যাঁহারা শৈবধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া লৌকিক ধর্ম্মপ্রচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন, চাঁদসদাগর তাঁহাদের এক দলের নেতা ছিলেন ও শেষে তিনি মনসাদেবীর পূজা অনুমোদন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বহু পল্লীগীতিকা ও রূপকথায় চাঁদ বেনের উল্লেখ আছে, যে সকল বণিক সমুদ্রপথে যাতায়াত করিয়া দেশ-বিদেশে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, চাঁদসদাগর যে তাঁহাদের একজন অগ্রণী ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। হয়তঃ খৃষ্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে তিনি বিদ্যমান ছিলেন; তখন বাঙ্গলার বাণিজ্য জগৎব্যাপক প্রসারতা লাভ করিয়াছিল এবং আর্য্য-ধর্ম্মের সঙ্গে লৌকিক ধর্ম্মগুলির একটা সংঘর্ষ ও বোঝাপাড়া হইতেছিল। এই উপলক্ষে নানারূপ উপগল্প চাঁদসদাগরের নামে প্রচলিত হইয়াছিল।

মনসার সেবকের সংখ্যা যতই বাড়ীতে লাগিল, ততই চাঁদসদাগর ও বেহুলার প্রতিবিম্ব গাঢ়তর হইয়া সজীব চিত্রের ন্যায় সুস্পষ্ট ভাবে দাঁড়াইল। এই বঙ্গদেশে প্রাচীন ভগ্ন কীর্ত্তির অভাব নাই, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন স্থলের ইষ্টকস্তূপ বিশেষে চাঁদবেণের ভূতের সুবৃহৎ বাসাবাড়ী নির্দ্ধারিত হইল; বর্দ্ধমান ও ত্রিপুরার চম্পকনগরদ্বয়, নেতাধোপানীর ঘাট প্রভৃতি নাম এখন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে বসিয়াছে। চাঁদের এই সৌভাগ্য সত্যনারায়ণের পাঁচালীর নায়কের হইতে পারে নাই। চাঁদ সদাগর নামে কোন প্রথিতনামা বণিক বঙ্গদেশে এক সময় বৈশ্যকুলের অগ্রণী ছিলেন, এবং তাঁহার পুত্রবধূ বেহুলা সতী-শিরোমণি ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সেই উজানী নগর, গাঙ্গুর ও চম্পানগর কোথায় ছিল, কে বলিবে? বঙ্গদেশের বহুস্থান হইতে তাঁহাদের স্মৃতিজড়িত স্থানগুলির উপর দাবী পড়িয়াছে—এই দাবী কোন্ ঐতিহাসিক বিচার করিয়া সত্য নির্ণয় করিবেন?

কবি জনার্দ্দন প্রভৃতি।

মঙ্গলচণ্ডীর ক্ষুদ্র ছড়াও ক্রমে বড় কাব্য হইয়া পড়িয়াছে; মাধবাচার্য্যের চণ্ডীর (১৫৭৯ খৃঃ) পূর্ব্বেও মঙ্গলচণ্ডীর গীতি ছিল; চৈতন্যপ্রভুর পূর্ব্বেও মঙ্গলচণ্ডীর ছড়া গাহিয়া গাহকগণ রাত্রি জাগরণ করিত।

"মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে।
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জনে॥" চৈ, ভা, আদি।

সেই গীতি কিরূপ ছিল, ঠিক জানি না। আমরা দ্বিজ জনার্দ্দনের একটি চণ্ডী পাইয়াছি—উহা কাব্য নহে, ব্রত কথা। হস্তলিপি প্রায় ২৫০ শত বৎসরের প্রাচীন। এইরূপ কোন চণ্ডীর গীতিকে অবলম্বন করিয়া মাধবাচার্য্য তাঁহার কাব্য-গঠন ও চরিত্রগুলির রেখাপাত করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। ছোট ছোট ঢেউ কিরূপে বড় বড় তরঙ্গ হইয়া দাঁড়ায় অস্পষ্ট রেখার ক্ষীণ ছবি কিরূপে ক্রমে সম্যক্ বিকশিত, বড় ও সুস্পষ্ট হইয়া উঠে—জনার্দ্দন, মাধবাচার্য্য ও কবিকঙ্কণের চণ্ডী ক্রমান্বয়ে তুলনা করিলে তাহা অনুমিত হইবে। কাব্য-জগতের এই ক্রমিক বিকাশের দৃশ্য, ছায়াবাজির ছায়াগুলির ক্রমশঃ বিশাল, সুস্পষ্ট ও বিচিত্র-বর্ণ বিশিষ্ট অবয়বে পরিণতির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। জনার্দ্দন কবির কালকেতু ও শ্রীমন্তের উপাখ্যান হইতে দুইটি অংশ উদ্ধৃত করিলাম।

জনার্দ্দনের চণ্ডী।

১ম অংশ।

"নিত্য নিত্য সেই ব্যাধ আনন্দিত হইয়া।
পরিবার পালে সে যে মৃগাদি মারিয়া॥
ধনুকে যুড়িয়া বাণ লগুড় কাঁধেতে।
সর্ব্ব মৃগ ধাইয়া গেল বিন্ধ্যগিরিতে॥
ব্যাধ দেখি মৃগ পলাইল ত্রাসে।
পাছে ধাএ ব্যাধ মৃগ মারিবার আশে॥
বৃদ্ধ বরাহক আদি যত মৃগগণ।
মঙ্গলচণ্ডীর পদে লইল শরণ॥
ব্যাধেরে দেখিয়া দেবী উপায় চিন্তিল।
দুর্গতি-নাশিনী দেবী সদয় হইল॥
সুবর্ণগোধিকারূপ ধরিয়া পার্ব্বতী।
ব্যাধ পথ জুড়িয়া রহিল ভগবতী॥
মৃগয়া না পাইয়া ব্যাধ হইল চিন্তিত।
সুবর্ণগোধিকা পথে দেখে আচম্বিত॥
সুবর্ণগোধিকা পাইয়া হরষিত মনে।
ধনুর অগ্রে তুলি লইল তখনে॥

মনে মনে ভাবি ব্যাধ ধীরে ধীরে হাঁটে।
সত্বর গমনে গেল বাড়ীর নিকটে॥
হর্ষিত মনে ব্যাধ গদ গদ বাণী।
উচ্চস্বরে পুনঃ পুনঃ ডাকিল গেহিনী॥
যেন মতে গৃহে নিয়া থুইল গোধিকা
পরম সুন্দরী রূপ ধরিল চণ্ডিকা।
দিব্যরূপ দেখি তান ব্যাধ কালকেতু।
গৃহিনীর মুখ চাহি বোলে কোন হেতু॥
মঙ্গলচণ্ডিকা বোলে শুন ব্যাধবর।
তুষ্ট হয়ে দেখা দিল তোমার গোচর॥
সম্প্রতি হইল ব্যাধ তোমার শুভযোগ।
পঞ্চশত স্বর্ণাঙ্গুরী কর উপভোগ॥
আজু হোতে ব্যাধ তুমি না যাইবা বন।
মৃগ না মারিবা এহি শুনহ বচন॥
অল্প দ্রব্য আঙ্গুরী দিলা যে আমারে।
ইহা খাইয়া কি করিব বল তার পরে॥
মঙ্গলচণ্ডিকা দেবী হইলা সদয়।
স্বর্ণ ভাণ্ডদ্বয় তাকে দিলেক নিশ্চয়॥
চণ্ডিকা প্রসাদে ব্যাধ কৃতার্থ হইল।
তার পর ভগবতী অন্তর্দ্ধান হৈল॥
ধন পাইছে হেন রাজাএ শুনিয়া।
শীঘ্র করি কালকেতু বন্দী কৈল নিয়া॥
বন্ধনে পীড়িত হইয়া ব্যাধ মহাজন।
কাঁদিয়া মঙ্গলচণ্ডী করিলা স্মরণ॥" ইত্যাদি।

এইরূপ কোন সংক্ষিপ্ত গীতি হয়তঃ চণ্ডীকাব্যের ভিত্তি ভূমি।

এস্থলে গুজরাট যাইয়া রাজ্যাদি স্থাপনের কথা ও কলিঙ্গাধিপতির সহিত যুদ্ধ বর্ণনা নাই। গুজরাটের সঙ্গে বঙ্গদেশে একটা সম্বন্ধ বহুকাল পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল, এবং বাঙ্গালী গুজরাটে যাইয়া একটা উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, মৎপ্রণীত 'বৃহৎবঙ্গ' গ্রন্থে তাহা বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হইয়াছে। কালকেতু গুটরাটে রাজ্য স্থাপনের সঙ্গে পূর্ব্বোক্ত কোন ঘটনার কিছু সংশ্রব আছে কিনা তাহা বিবেচ্য। ক্ষুদ্র গীতিটি কাব্যে পরিণত করিবার সময় কবিগণ নিজ হস্তে একটি মানচিত্র আঁকিয়া লইয়াছেন; পদ্মা-পুরাণের ঘটনার কেন্দ্রভূমিও এইরূপেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই

লিখিত হইয়াছে ; ভারতচন্দ্র বর্দ্ধমানের উপর বিদ্যাসুন্দরের কেলেঙ্কারী চাপাইয়া তাঁহার প্রতি অত্যাচারের প্রতিশোধ লইয়াছিলেন ; মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন ;—

"বর্দ্ধমান-রাজ যে ভারতচন্দ্রের উপর অত্যাচার করিয়াছিলেন, সে কথা লোকে ভুলিয়া গিয়াছে। কিন্তু বিদ্যাসুন্দরের ঘটনা যে নিশ্চয়ই বর্দ্ধমানে ঘটিয়াছিল, এ ধারণা অনেকেরই আছে এবং এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া পূজ্যপাদ রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় মালিনীর বাটী অন্বেষণার্থ বর্দ্ধমান সহরে অনেক দিন ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং সেই সুড়ঙ্গ দিয়া এখনও রাজবাটী যাওয়া যায় কি না, দেখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। *

২য় অংশ।

"অনুগত জনে দয়া করে গিরিসুতা
চলহ খুল্লনা গৃহে সাধুর দুহিতা॥
ব্রতের বিধান সর্ব্ব ব্রতীএ কহিল।
প্রণাম করিয়া তবে খুল্লনা চলিল॥
হারাইয়াছিল ছাগল পথে পাইল তারে।
গৃহে আসি খুল্লনা যে বিবিধ প্রকারে।
চণ্ডীকার পূজা করে ভক্তি অনুসারে॥
মঙ্গলচণ্ডীর বরে বাড়িল উন্নতি।
ব্রত হতে সুখী হৈল খুল্লনা যুবতী॥
দিব্য বস্ত্র অলঙ্কারে সাধুএ তুষিল।
কতকাল পরে কন্যা গর্ভবতী হৈল॥
খুল্লনার গর্ভ ছয় মাস হৈল যবে।
বাণিজ্যেরে চলে ধনপতি সাধু তবে॥
স্বামীর অগ্রেত গিয়া করিল ভকতি।
বাণিজ্য করিতে সাধু হইলেক মতি॥
ছয়মাস গর্ভ মোর জানাইল তোমারে।
জানিবার পত্রে হর্ষে দিলেক কুমারে॥
হীরা মণি মাণিক্য আর নানা দ্রব্য যতে।
হরষিত ভরে ডিঙ্গা যত লয় চিতে॥
ডিঙ্গাতে অর্থ ভরি সাধুর নন্দনে।
খুল্লনা আসিতে আজ্ঞা করিল তথনে॥

* সাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ, ১৩০০ সন।

মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত করিতে কারণ।
অর্ঘ্য আনিতে বিলম্ব হইল তখন॥
বিলম্ব দেখিয়া তবে সাধু মহাজন।
চণ্ডিকার ঘটে পদ ক্ষেপিল তখন
*   *   *   *   •
মঙ্গলচণ্ডীর বরে খুল্লনা যুবতী।
পুত্র প্রসবিল তথা নাম শ্রীপতি॥
দিনে দিনে বাড়ে কুমার চন্দ্রের সমান।
শুভক্ষণ করিয়া কাঠি কৈল দান॥
লিখিতে কহিল কুমার ছাত্র সব স্থান।
আমারে লিখায়ে দেহ এই খড়ি খান॥
হাসিয়া সকল ছাত্র বুলিলেক বাণী।
জারজ কুমার তুমি কে দিবে কাঠিনী॥
অসন্তোষ ভাবি তবে সাধুর কুমার।
হেঁট মাথা করি গৃহে গেল আপনার॥
বিষাদ ভাবিয়া তবে সাধুর নন্দন।
মাথাএ বসন দিয়া, করিল শয়ন॥
অন্ন জল না খাইল সাধুর নন্দন।
ম্লান হৈয়া নিশ্বাস ছাড়য়ে ঘন ঘন॥
মাতা বিমাতায় বুঝি পুত্রের লক্ষণ।
সাধু দিছে যেই পত্র দিলেক তখন॥

শেষ শ্লোকের ক্ষুদ্র 'বিমাতা' শব্দটি হইতে লহনা-চরিত্রের সূত্রপাত; শ্রীমন্তের বিদ্যালয়ে মর্ম্মাহত হইবার কথাটি এখানে যেরূপ আছে, মাধবাচার্য্যও প্রায় সেইরূপই রাখিয়াছেন, কবিকঙ্কণ সে স্থানটি ভাঙ্গিয়া গড়িয়াছেন!

রতিদেব ও অপরাপর কবি।

রতিদেবকৃত মৃগলব্ধ পুঁথির কথা একবার উল্লেখ করিয়াছি *—উহা শৈব ধর্ম্মের ভগ্ন ধ্বজা। আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, ব্রাহ্মণ্য-প্রভাব-চিহ্নিত সাহিত্যে শিব কোন স্থলেই বড় উচ্চস্থান অধিকার করিতে পারেন নাই। যেখানেই তিনি দেখা দিয়াছেন, সেইখানেই ভবানীর ভ্রূকুটি-ভঙ্গীতে অতি কৃপাযোগ্যভাবে নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িতেছেন।

* ৯৭ পৃষ্ঠা দেখ।

'মৃগলব্ধ' গীতি শৈব-ধর্ম্মের প্রাবল্য সময়ে লিখিত; উক্ত ধর্ম্ম শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের আড়ালে পড়িয়া যাওয়াতে শিব-গীতির আর বিকাশ হইতে পারে নাই।

শনির পাঁচালী, ষষ্ঠীর পাঁচালী, সূর্য্যের পাঁচালী, লক্ষ্মীর পাঁচালী প্রভৃতি অতি আদিসময়েও বিদ্যমান ছিল। আমরা উহাদের কিছু কিছু নিদর্শন পাইয়াছি।

শীতলা মঙ্গল।

শীতলা পূজার আদি খুঁজতেও আমরা শাস্ত্রের সাহায্য অবলম্বন করিতে পারি। প্রাচীন শাস্ত্রের যে কোনও স্থলে যে কোন দেবতার সামান্য মাত্র উল্লেখ দৃষ্ট হয়, লৌকিক ভীতি ও দুঃখ বিমোচনের অনুরোধে পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণগণ সেই সামান্য উল্লেখকে ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়া দেশীয় সংস্কারোপযোগী দেবপ্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। অথর্ব্ববেদের "তক্মন্" শব্দের অর্থ "শীতলা" বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন, অপর কোন লেখক বৈদিক শাস্ত্রোক্ত, "অপ্‌দেবী"কে শীতলাদেবীর আদি মূর্ত্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বেদের এই আভাস পুরাণকারদের হস্তে ক্রমে বিকাশ পাইয়া শীতলা-দেবীর বর্ত্তমান রূপ কল্পিত হইয়াছে। স্কন্দপুরাণ ও পিচ্ছিলাতন্ত্রে শীতলার বিবরণ আছে এবং কাশীতে দশাশ্বমেধ ঘাটের উপর শীতলা দেবীর একখানি প্রাচীন মন্দির এখনও দৃষ্ট হয়। বর্ত্তমান সময়ে শীতলাদেবীর পুরোহিতগণ অনেক স্থলেই ডোমজাতীয় দেখা যায়। ইহাতে আর একটি অনু-মান করিবার অনুকূল যুক্তি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। বৌদ্ধশাস্ত্রে হারিতীদেবীর পূজার ব্যবস্থা আছে। এতদ্দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাবল্যের সময় ডোমপুরোহিতগণ হারিতী পূজা করিতেন, এই হারিতী ও শীতলা উভয়েই ব্রণনাশিনী দেবী। হিন্দুশাস্ত্রে শীতলাদেবীর যে সুন্দর মূর্ত্তি বর্ণিত আছে, শীতলাপণ্ডিত ডোমবর্গের প্রদর্শিত মূর্ত্তি সেরূপ নহে। এ সম্বন্ধে সুলেখক স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফি মহাশয় লিখিয়া-ছিলেন, "শীতলা পণ্ডিতগণের শীতলা করচরণহীনা, সিন্দুরলিপ্তাঙ্গী, শঙ্খ বা ধাতুখচিত-ব্রণচিহ্নাঙ্কিতা মুখমণ্ডল-মাত্রাবশিষ্টা প্রতিমা মাত্র। ইহাকে বরং বৌদ্ধভাবের দেবতা বলা যায়। এই শীতলার মুখে যে ধাতু বা শঙ্খনির্ম্মিত রুইতনের ফোঁটার ন্যায় বা পেরেকের মাথার ন্যায় টোপতোলা বসন্ত-চিহ্ন লাগান থাকে, তাহার সহিত শাস্ত্রী মহাশয়ের উল্লিখিত ধর্ম্মঠাকুরের গাত্রে প্রোথিত পিতলের টোপতোলা পেরেক চিহ্নের যেন সাদৃশ্য আছে বলিয়া বোধ হয়।" ডোমপুরোহিতের পূজার অধিকারই এ সম্বন্ধে বৌদ্ধ সংস্রবের অকাট্য প্রমাণ।

এই শীতলাদেবী সম্বন্ধেও অনেকগুলি পালা প্রাচীনকালে বঙ্গভাষায় রচিত হইয়াছিল। সেই সকল গীতির নিতান্ত প্রাচীন নিদর্শন এখনও পাওয়া যায় নাই। তবে দুই তিন শত বৎসর পূর্ব্বে

নিত্যানন্দ চক্রবর্ত্তী, * দৈবকীনন্দন কবিবল্লভ, † কৃষ্ণনাথ, রামপ্রসাদ, শঙ্করাচার্য্য ও রঘুনাথ দত্ত যে সকল পালা লিখিয়াছিলেন তাহার অনেকগুলি সংগৃহীত হইয়াছে।

বিবিধ।

এই সকল পুস্তক ছাড়া অন্যান্য দেবতাদের যে সব পাঁচালী পাওয়া গিয়াছে, তাহার কোনটী তেমন প্রাচীন নহে। তবে তাহারা যে তত্তৎবিষয়ের প্রাচীনতর কবিতা অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই। ১৬৮৭ খৃঃ অঃ নিমতানিবাসী কৃষ্ণরাম 'ষষ্ঠীমঙ্গল" রচনা করেন। ইহাতে একটী উপাখ্যান অবলম্বনে যথারীতি ষষ্ঠীদেবীর মাহাত্ম্য প্রচারিত করা হইয়াছে। এই পুস্তকের এক স্থানে সপ্তগ্রামের তদানীন্তন প্রভাব সম্বন্ধে এই কয়েকটী ছত্র পাওয়া গিয়াছে,—

'রাঢ় গৌড়ে দেখিলাম কলিঙ্গ কপাল।
গয়া পৈইরাগ কাশী নিষধ নেপাল॥
একে একে ভ্রমণ করিলাম দেশ দেশ।
দেখিলুঁ দেবীর পূজা অশেষ বিশেষ।
সপ্তগ্রাম ধরণীতে নাহি তার তুল।
চালে চালে বৈসে লোকে ভাগীরথীর কুল।
নিরবধি যজ্ঞদান পুণ্যবান লোক।
অকাল মরণ নাই নাহি দুঃখ শোক॥
শক্রজিৎ রাজার নাম তার অধিকারে।
বেভারে এ জত গুণ কে কহিতে পারে॥"

কমলামঙ্গল বা লক্ষ্মীচরিত্র।

লক্ষ্মীদেবী স্থানবিশেষে গজলক্ষ্মী নামে পূজিতা। অতি প্রাচীনকালের লক্ষ্মীর যে সমস্ত বিগ্রহ এবং প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তরে অঙ্কিত দেখা যায়, তন্মধ্যে দুই পার্শ্বে দুটী হস্তি সমন্বিতা হইয়া শুণ্ডধৃত কুম্ভজলে

* নিত্যানন্দ মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কাশীযোড়ার জমিদার রাজেন্দ্রনারায়ণের সভাসদ্ ছিলেন।

† ইঁহার বৃদ্ধ প্রপিতামহের নাম পুরুষোত্তম, প্রপিতামহের নাম শ্রীচৈতন্য, পিতামহের নাম শ্যাম এবং পিতার নাম গোপাল। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষ প্রথমতঃ বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত হস্তিনা নগরে (হাতিমা), তৎপরে কিছুদিন মান্দারণে এবং অবশেষে বৈদ্যপুরে আসিয়া বাস করেন। দৈবকী নন্দন দেবীর রূপ-বর্ণনায় লিখিয়াছেন—

"বাম হাতে হেল্যা মুণ্ড উলুকবাহন।"

এবং ইহা ছাড়া সৃষ্টি প্রকরণের তিনি যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহার সঙ্গে শূন্য পুরাণের ব্যাখ্যার নানা প্রকার সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়।

তিনি অভিষিক্তা হইতেছেন, এইরূপ দৃষ্ট হয়। বাল্মীকি-রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডে লক্ষ্মীর এই প্রকার স্বর্ণময়ী মূর্ত্তির বর্ণনা আছে। গজশুণ্ডধৃত কুম্ভজলে অভিষিক্ত হওয়ার দরুণই বোধ হয় এই গজলক্ষ্মী নাম হইয়া থাকিবে। শিবানন্দ কর-রচিত 'লক্ষ্মীচরিত্র'ই এই শ্রেণীর প্রাপ্ত কাব্যাবলীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। এই কবির উপাধি গুণরাজ খাঁ ছিল। ইহা ছাড়া মাধবাচার্য্য এবং পরশুরাম কৃত "লক্ষ্মীচরিত্র" প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। কবি জগমোহন-কৃত "লক্ষ্মীমঙ্গল"ই বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। ইহাতে দুর্ব্বাসার শাপে ইন্দ্রের লক্ষ্মীভ্রষ্ট হওয়ার বিবরণ এবং অপরাপর প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের ভাব ও ভাষা কবিত্বময়। জগমোহনের পর রণজিৎরামদাস ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে একখানি 'কমলাচরিত্র' প্রকাশ করেন।

গঙ্গামঙ্গল।

মাধবাচার্য্যের "গঙ্গামঙ্গল"ই প্রসিদ্ধ। এতদ্ব্যতীত দ্বিজ গৌরাঙ্গ, দ্বিজ কমলাকান্ত প্রভৃতি অনেক কবির "গঙ্গামঙ্গল" প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

সূর্য্যের পাঁচালী।

সূর্য্যের পাঁচালীকারদিগের মধ্যে দ্বিজ কালিদাস, দ্বিজ রামজীবন বিদ্যাভূষণ—এই দুই জনের গ্রন্থই অধিকতর প্রচলিত। রামজীবন ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার আদিত্য চরিত বা সূর্য্যের পাঁচালী রচনা করেন। এই পাঁচালীতে হাড়িজাতির প্রতি যে নিগ্রহের কথা বর্ণিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা সৌর-উপাসক ও বৌদ্ধগণের সঙ্গে সংঘর্ষ অনেকে কল্পনা করিয়া থাকেন।

সূর্য্যের যে প্রাচীন ছড়াটি বঙ্গসাহিত্য পরিচয়ের প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে বঙ্গীয় গৃহের নববিবাহিতা বালিকাকন্যার ভর-পূর চিত্ত-ব্যথা অতি করুণ ভাষায় অভিব্যক্ত হইয়াছে। বালিকা অষ্টমবর্ষে গৌরী সাজিয়া স্বামীগৃহে যাইতেছে। এদিকে তাহার বিরহে মাতাপিতা কাঁদিয়া কাটিয়া অস্থির হইতেছেন। বালিকা নৌকায় শুইয়া সাশ্রুচক্ষে সেই করুণ কান্না শুনিতেছে এবং মাঝিকে ধীরে ধীরে নৌকা বাহিতে বলিতেছে, যেন সে মায়ের কান্না বেশীক্ষণ শুনিতে পায়। কিন্তু নৌকা এখন অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে, আর সে কান্নার সুর শোনা যায় না। সূর্য্য তাঁহার বালিকা বধূকে কত আদরে সান্ত্বনা দিতেছেন, কিন্তু সে শোক ভুলিতে পারিতেছে না। সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছে "তোমার দেশে গেলে আমি কাপড় কোথায় পাইব?" সূর্য্য বলিতেছেন "তোমার জন্য আমি নগরে নগরে তাঁতি বসাইব, তাহারা তোমার জন্য কতরূপ শাড়ী তৈরী করিবে।" "আমি তোমার সঙ্গে যাইব, শাঁখা কোথায় পাইব?" "আমি তোমার জন্য আমার নগরে অনেক শাঁখারী

বসাইব।” “আমি তোমার দেশে ভাত কোথায় পাইব?” “তোমার জন্য দিন রাত কৃষাণেরা হল বাহিয়া নানারূপ ধান জন্মাইবে।” কিন্তু বালিকা বধূর এই গুলিই চূড়ান্ত প্রশ্ন নহে। যে কথাটি বলিতে তাহার বুক দুরু দুরু কাঁপিয়া উঠিতেছে, চোখে জল উথলিয়া উঠিতেছে সেই কথাটি সে কম্পিত ওষ্ঠাধরে, গদ্গদকণ্ঠে শেষে বলিয়া ফেলিল। “তোমার দেশে যাব আমি মা বলিব কারে?” হৃদয়ের নিভৃত স্থানের ব্যথাটি ব্যক্ত করিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল। সূর্য্য তখন আদরে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, “আমার যে মা আছে মা বলিবে তারে।”—এই বাৎসল্য মধুর চিত্রের পরিণতি বঙ্গদেশের মর্ম্মস্পর্শী পরবর্ত্তী আগমনী গানে।



(৪) পদাবলী শাখা।

ক। পদাবলী সাহিত্য।

খ। চণ্ডীদাস এবং রামী।

গ। বিদ্যাপতি!

ক। পদাবলী সাহিত্য।

বঙ্গদেশে প্রেমের অবতার হইয়াছিল, বাঙ্গালী কবি প্রেম-বর্ণনায় অদ্বিতীয়। বৈষ্ণব কবিগণ প্রেমের যে নিষ্কাম মাধুর্য্য বর্ণন করিয়াছেন, তাহা প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে পবিত্রতার সুধাধারা প্রবাহিত করিয়া দিয়াছে।

পদাবলী সাহিত্য।

পদাবলী সাহিত্য প্রেমের রাজ্য, নয়নজলের রাজ্য। পূর্ব্বরাগ, উক্তি, প্রত্যুক্তি, প্রথম মিলন, সম্ভোগ, অভিসার, কারণমান, নির্হেতু মান, প্রেম-বৈচিত্র, দানলীলা, নৌকাবিলাস, বাসন্তীলীলা, বিরহ, পুনর্মিলন, প্রেমের এই বহু বিভাগের পর্য্যায়ে পর্য্যায়ে কেবল কোমল অশ্রুর উৎস; ইহাতে স্বার্থের আহুতি, অধিকারের বিলোপ; বাঞ্ছিতের দেহ স্পর্শ করিতে, দেখিয়া চক্ষু জুড়াইতে, তজ্জাত অপূর্ব্ব পরিমল আঘ্রাণ করিতে, মধুগন্ধে অন্ধ অলির ন্যায় স্বর্গীয় প্রেমিক কবিগণ কাঁদিয়া বেড়াইয়াছিলেন, পদাবলী সাহিত্য তাঁহাদের অশ্রুর ইতিহাস।

বৈষ্ণব পদাবলীর কেন্দ্রভূত এক স্বর্গীয় উপাদান আছে, উহা মানবীয় প্রেমগীত গাহিতে গাহিতে যেন সহসা সুর চড়াইয়া কি এক অজ্ঞাত সুন্দর রাগিণী ধরিয়াছে, তাহা ভক্ত ও সাধকের কর্ণে পৌছিতে সমর্থ হইয়াছে। বৈষ্ণব কবিতা নদীর

আধ্যাত্মিকত্ব।

মোহানার সহিত তুলিত হইতে পারে, এই গীতি কুলু কুলু স্বরে মানব জগতের সুখ দুঃখের কথা

গাহিতে গাহিতে এমন একটা জায়গায় আসিয়া পৌঁছায়, যেখানে সমস্ত সীমার বাঁধ চলিয়া যায়। সীমাবদ্ধ দুই পারের মধ্যে চলিয়া এমন স্থানে উপস্থিত হয়, যাহা একবারে অসীম।

সহৃদয় ভিন্নদেশীয় লেখকগণও পদাবলী পড়িতে পড়িতে তদন্তর্নিহিত মধুময় আধ্যাত্মিকতত্ব উপভোগ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। পণ্ডিত গ্রীয়ার্সন্ মহোদয় বিদ্যাপতির কবিতা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—"কিন্তু মৈথিল ভাষায় অতুল্য পদাবলী রচনার জন্যই তাঁহার শ্রেষ্ঠ গৌরব; সে সমস্ত পদে শ্রীরাধিকার কৃষ্ণ-প্রেম-বর্ণনার রূপক দ্বারা পরমাত্মার প্রতি জীবাত্মার ভালবাসা সম্বন্ধই বিজ্ঞাপিত হইয়াছে!" * ঈশ্বরের প্রতি প্রেম-প্রদর্শন জন্য রাধার রূপক অবলম্বনীয় হইল কেন, এ জটিল সমস্যার উত্তর দিতে আমরা সমর্থ নহি। তবে বোধ হয় পাঠকগণ পদাবলীবর্ণিত রাধিকার ভাবগুলির সঙ্গে চৈতন্যলীলার অতি নিকট সাদৃশ্য দেখিতে পাইবেন, এবং তদ্দ্বারা পদাবলী যে ধর্ম্ম-সাহিত্যের অন্তর্গত করিতে পারা যায়, তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন। ধর্ম্মের এই রূপক সম্বন্ধে আমরা পণ্ডিত নিউম্যান সাহেবের এইরূপ বিষয়ে একটি মতের উল্লেখ করিয়া এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব ;—"যদি তোমার আত্মা উচ্চ ধর্ম্মরাজ্যের পবিত্রতায় প্রবেশ করিতে অভিলাষী হয়, তবে তাহাকে রমণী-বেশে যাইতে হইবে। মনুষ্য সমাজে তোমার যতই পুরুষকারের গর্ব্ব থাকুক না কেন, এস্থলে আত্মার রমণী সাজা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। †

খ। চণ্ডীদাস ও রামী

চণ্ডীদাসের নান্নুর।

চণ্ডীদাস সম্ভবতঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে ‡ নান্নুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কেন্দুবিল্ব ও বিস্ফী হইতে নান্নুর শ্রেষ্ঠ তীর্থ; চণ্ডীদাসের নিবাসভূমি পবিত্র নান্নুর পল্লী এখনও আছে,—পাগল চণ্ডীর স্বর্গীয় অশ্রুসিক্ত পবিত্র বাশুলী-দেবীর মন্দির এখনও আছে। সেই ক্ষুদ্র পল্লীতে প্রেমের যে অপূর্ব্ব স্ফূর্ত্তি ও প্রতিভা প্রকাশ পাইয়াছিল, এজগতে তাহার তুলনা নাই; প্রেমিকের নিকট নান্নুর-পল্লী দ্বিতীয় বৃন্দাবন তুল্য সুদৃশ্য।

---

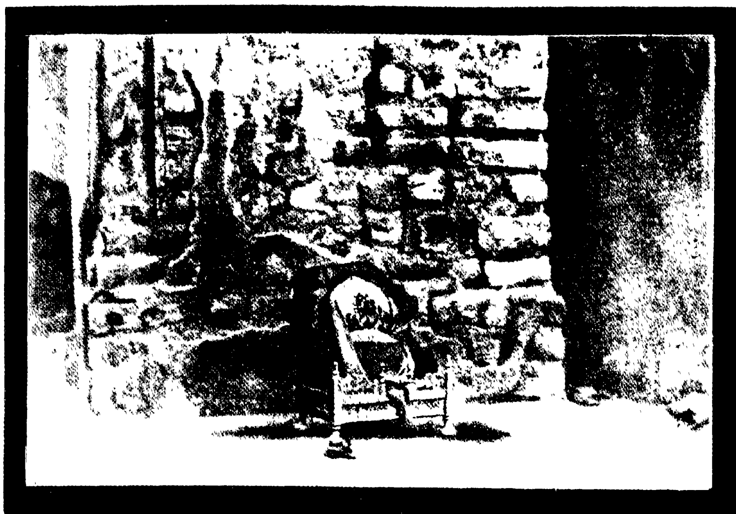
* "But his (Bidyapaty's) chief glory consists in his matchless sonnets (Padas) in the Maithili dlalect dealing aliegorically with the relations of the soul to Cod under the form of love which Radha bore to Krishna, These were adopted and recited enthnsiastically by the celebrated reformer Chaitanya."

Modern Vernacular Literature of Hindustan by Grierson.

† "If thy soul is to go on into higher spiritual blessedness it must become a *womon* ; yes however manly thou mayst be among men."—Newman.

‡ "বিধুর নিকট নেত্র পক্ষ পঞ্চবাণ। নবহু নবহু রস, ইহ পরিমাণ।"

এই পদটি কালবাচক নহে, পদের সংখ্যাবাচক। তিনি ১৩২৫টি নূতন নূতন রসের গান রচনা করিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ ইহাই ইহার অর্থ।



বাশুলী দেবী। ১৯৩ পৃঃ



চণ্ডীদাসের ভিটি (দক্ষিণ-পূর্ব্ব দৃশ্য।) ১৯২ পৃঃ

কিন্তু পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গীতি লেখকের স্মৃতি বহন করিতে সেই স্থানে স্থানে কোন সমাধিস্তম্ভ নাই—এ আক্ষেপ আমাদের ইংরেজী শিক্ষার দরুণ হয়; নতুবা আমাদের দেশের লোকে অন্যরূপে স্মৃতি রক্ষা করিতে অভ্যস্ত ছিল—সমাধি-স্তম্ভ এদেশের সামগ্রী নহে; তাহারা ঘরে ঘরে মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করিত, প্রতিদিন প্রাতে উঠিয়া পুণ্যশ্লোক মহাজনগণের নাম ভক্তিভরে উচ্চারণ করিত ও শিশুগণকে বলিতে শিখাইত।)

পাঠক ক্ষমা করিবেন, চণ্ডীদাসের কবিতা আমার আশৈশব সুখ, দুঃখ ও বহু অশ্রুর উৎস স্বরূপ, হৃদয়ের প্রগাঢ় উচ্ছ্বাসে তাঁহার কবিতার যথাযথ আলোচনা সম্ভবপর হইবে কিনা বুঝিতে পারি না। আর একটি বক্তব্য এই,—চণ্ডীদাসের কবিতার মোহিনী শক্তিতে আকৃষ্ট না হইলে হয়তঃ আমি প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য আলোচনা করিতাম না। আমি বহু বৎসর যাবত চণ্ডীদাসের গান গায়ত্রিমন্ত্রের ন্যায় প্রায় একরূপ জপ করিয়া আসিয়াছি; এই মহাকবি আমার যতটা অন্তরঙ্গ, আমার দারা পুত্রস্বগণের কেহ তদপেক্ষা অন্তরঙ্গ নহেন; তিনি আমাকে যতটা আনন্দ দিয়াছেন, পৃথিবীতে আর কেহ ততোধিক আনন্দ দেন নাই। এই দীর্ঘ অর্দ্ধ শতাব্দীর পরিচয়ে আমি তাঁহার সুরটা চিনিয়াছি; এতদিন ধরিয়া যদি কাহারও কথা দিনরাত্রি শোনা যায়, তবে তাহার সুরটা চেনা খুবই স্বাভাবিক।—আমি ভাষা বিচার করিয়া কে খাঁটি চণ্ডীদাস, কে দীন চণ্ডীদাস, কে বড়ু চণ্ডীদাস, কে দ্বিজ চণ্ডীদাস, কে বাশুলি সেবক চণ্ডীদাস, কে তরণীরমণ চণ্ডীদাস—এই চণ্ডীদাস ব্যূহের সমস্যা ভেদ করিতে যাইব না; আমার নিকট চণ্ডীদাস এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাই। কয়েক বৎসর গত হইল একজন আমাকে কতকগুলি অজ্ঞাত-পদ আনিয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে যেগুলি চণ্ডীদাসের পদ তাহা আমার তখন অজ্ঞাত থাকিলেও আমি দুই একটি ছত্র শুনিয়া ঠিক ধরিয়া দিয়া পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম, আমার একটিও ভুল, হয় নাই।

(প্রায় পাঁচ শত বৎসরের কবি এই চণ্ডীদাস।—শুধু চৈতন্য-চরিতামৃত নহে, বহুগ্রন্থে ও বহু মহাজনকৃত পদে কাল সম্বন্ধে ইঙ্গিত আছে। মহাপ্রভু চণ্ডীদাসের পদ সর্ব্বদা কীর্ত্তন করিতেন; মহাপ্রভুর পূর্ব্বেই চণ্ডীদাস প্রভুর তিরোধান হইয়াছিল, সুতরাং তিনি যে অন্ততঃ পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন, তাহা নিশ্চয় রূপে বলা যাইতে পারে। তাঁহার সহিত বিদ্যাপতির দেখা শোনা হইয়াছিল ইহাও বহু মহাজনের পদে উল্লিখিত হইয়াছে—(পদ কল্পতরুর ৫।২৪০৯, ১।২৪১০, ২।২৪১১, ৩।২৪১২, ৪।২৪১৩, ৫।২৪১৪, ৬।২৪১৫ পদ দ্রষ্টব্য।০) সুতরাং এই কথা অবিশ্বাস করিবার কোন হেতু নাই। বিদ্যাপতি অতি দীর্ঘায়ু ছিলেন, তাঁহার জীবনের অনেক ঘটনার তারিখ পাওয়া গিয়াছে।—পূর্ব্বোক্ত দুইটি প্রধান যুক্তিতে প্রমাণিত হয় যে চণ্ডীদাস ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন; তিনি বাশুলি মন্দিরে, সুবর্ণমণ্ডিত স্তম্ভের অন্তরালে প্রাতঃসূর্য্যের আলোকে

এক সোনার পুতুলীকে দেখিয়াছিলেন, সেই শুভ দৃষ্টিতে তাঁহার সমস্ত হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল; তিনি বাশুলির নিকট ধন্না দিয়া পড়িয়াছিলেন, "আমি বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ বংশে জন্মিয়াছি আমি কত তপস্যা দ্বারা তোমার পূজা করিয়া থাকি, আমার একি হইল, তোমা অপেক্ষা রামী আমার নিকট সত্য হইল? আমি পতিত হইয়াছি, আমি কি করিব বলিয়া দাও।" বাশুলীর আদেশ তিনি শুনিলেন, "তুমি ইন্দ্রিয়জিৎ হইয়া এই নারীকে ভালবাস, ইনি তোমার হৃদয়কে যে পবিত্রতা দিবেন, ব্রহ্মা বিষ্ণু কিংবা আমিও তোমাকে তাহা দিতে পারিব না।" তাহাই হইল, জয়দেবী ভাব ইতিপূর্ব্বে তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছিল, রামীর প্রেমের দীক্ষা তাঁহাকে সম্পূর্ণ নূতন পথ দেখাইল।

যাঁহারা বলেন এই প্রেমকাহিনী সর্ব্বৈব মিথ্যা সহজিয়ারা ইহা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাদের যুক্তি কথনও সমর্থিত হইবে না; একটি একটি করিয়া তাহার কয়েকটি কারণ দেখাইতেছি:—

সত্য বটে সহজিয়ারা তাঁহাদের নরনারীর প্রেমের আদর্শ সমাজে চালাইবার জন্য বৈষ্ণবদিগের যত সাধু—প্রত্যেককে কিশোরী-পূজক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছে, এমন কি তাহারা মহাপ্রভুকেও বাদ দেয় নাই। উগ্র সন্ন্যাসের অবতার রূপ, সনাতন, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, এমন কি কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা মীরাবাঈকেও তাহারা তাহাদের স্বীয় দলভুক্ত করিতে চাহিয়াছে; কিন্তু খাঁটী জিনিষ থাকিলেই মেকী থাকে; শুধু মেকী চলে না। সহজিয়াদের পূর্ব্বেই "রসিক ভক্ত" নামক এক শ্রেণীর নারীপূজক কিশোরী-সাধনা করিতেন; বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণের মধ্যে এই সাধনা পরিপুষ্ট হইয়াছিল। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে অতীশ দীপঙ্করের নিকট তিব্বত-রাজা লাঃ লামা ইয়েস্রি যে দূতগণ পাঠান, তাহারা তাঁহাকে বলেন, নীলবস্ত্র পরিহিত এক দল ভিক্ষু স্ত্রীলোক লইয়া ব্যভিচার করিয়া তাঁহার রাজ্যের লোকের মতিগতি ফিরাইয়া দিতেছে; তাহারা নরনারীর মিলনকেই ধর্ম্ম বলিয়া চালাইতেছে।"

এই দল বঙ্গদেশে আসিয়া বিশেষরূপ প্রতিষ্ঠা পাইয়াছিল; বিশেষ পূর্ব্ববঙ্গে ঘরে ঘরে ইহারা যোগিনী, বজ্রযোগিনী প্রভৃতি উপাধি ধারণ করিয়া তাহাদের মত প্রচার করিত। সাধারণ ভাষায় ইহাদিগকে 'দোয়াসিনী' বলিত। 'দোয়াসিনী'গণ মন্ত্রতন্ত্র দ্বারা রোগ আরোগ্য করিত এবং শঙ্খের কুণ্ডল কাণে পরিত। চণ্ডীদাসের পদে এই যোগিনী ও দোয়াসিনীগণের অনেক স্থলে উল্লেখ আছে।

চণ্ডীদাস সম্বন্ধে প্রবাদ অবিশ্বাসের কোন কারণ নাই

রসিক ভক্তের মধ্যে কয়েকজন বৈষ্ণবগুরুর নামে এই নারী সেবা সহজিয়ারা মিথ্যামিথ্যি আরোপ করিয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। মহাপ্রভু এবং তৎশিষ্যদের সম্বন্ধে এই মিথ্যাবাদ সহজিয়াদের গণ্ডী বহির্ভূত; কেহই বিশ্বাস করেন নাই। কিন্তু যেখানে দেখিব, চারিদিকের লোকে একই কথা কহিতেছে, তখন তাহা অপ্রত্যয় করিবার কোন কারণ নাই।

নান্নুরবাসীদের মধ্যে রামীর প্রেম সম্বন্ধে বহু কাহিনী প্রচলিত আছে, তাহা সহজিয়ারা সৃষ্টি করে নাই, সেখানে রামীর ভিটা আছে। হয়তঃ গ্রামেও চণ্ডীদাস সম্বন্ধে কতকগুলি প্রবাদ কথা আছে; মানুষ অচল মহীরুহ নহে, নানাস্থানেই সে গমনাগমন করিতে পারে ও বাড়ীঘরও নানাস্থানে তৈরী করিতে পারে। কিন্তু যে দেশে চণ্ডীদাসের লীলাভূমি সেই দেশের ব্যাপক জনশ্রুতি কখনও মিথ্যা বলা যাইতে পারে না। বঙ্গের এই সকল নিভৃত পল্লী বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল না, সেখানে ঘন ঘন লোকবাসের পরিবর্ত্তন হইত না। শত শত বৎসর যাবৎ একই বংশ, একই পরিবার এক ভিটায় বাস করিত। পিতা পিতামহের নিকট এবং পুত্র পিতার নিকট গ্রাম সম্বন্ধে যে সকল কথা শুনিত—তাহার অধিকাংশই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। নহ্যমূলাঃজনশ্রুতিঃ। ১৪।১৫ পুরুষের মধ্যে স্বীয় গ্রাম সম্বন্ধে প্রবাদগুলি ও তৎসংশ্লিষ্ট ভিটার প্রমাণের মধ্যে অপ্রত্যয় করিবার কি কারণ থাকিতে পারে?

সুচিরাগত সংস্কার ও ভিটার প্রমাণ

দ্বিতীয়তঃ রামীর অনেক কবিতা পাওয়া গিয়াছে। চণ্ডীদাস লিখিত রামী সম্বন্ধে পদাবলীও সর্ব্বত্র শ্রুত হয়। চণ্ডীদাসের মৃত্যু সম্বন্ধে রামীর কবিতা ২০০।২৫০ বৎসরের একখানি পুঁথির পাতায় পাওয়া গিয়াছে, তাহা পরে উদ্ধৃত হইবে। সাহিত্যপরিষদের পুঁথিশালায় ২৩৭৫ নং আর একখানি প্রাচীন পুঁথিতেও ঐ কবিতাটি পাওয়া গিয়াছে। এই সকল পুঁথি আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে,—নান্নুরের এ সম্বন্ধে প্রাচীন জনশ্রুতির কথা আমরা স্থানান্তরে উল্লেখ করিয়াছিলাম। সেই জনশ্রুতি ও কবিতাগুলির কথা প্রায় একই রূপের। মহাজন কৃত বহু পদে রামীর সঙ্গে চণ্ডীদাসের প্রেমের উল্লেখ আছে।

প্রাচীন পুঁথির প্রমাণ

তৃতীয়তঃ শুধু বৈষ্ণব সাহিত্যে নহে; বৈষ্ণবগণ্ডীর বাহিরেও রামীর সঙ্গে চণ্ডীদাসের প্রেমের উল্লেখ পাইতেছি পূর্ব্ববঙ্গগীতিকার ৪র্থ ভাগ, দ্বিতীয় খণ্ডে আধা বঁধু গীতিকা দ্রষ্টব্য।

বৈষ্ণব সাহিত্যের বাহিরের প্রমাণ

মহাপ্রভুর অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে নরহরি সরকার তাঁহার চণ্ডীদাস-বন্দনায় রামী-চণ্ডীদাসের প্রেমের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এতগুলি প্রবাদ গ্রন্থোক্ত প্রমাণ, স্থান নির্দ্দেশ, বঙ্গদেশময় সর্ব্বশ্রেণীর মধ্যে ব্যাপক জনশ্রুতি এ সমস্তই কি সহজিয়ারা সৃষ্টি করিয়াছেন? কই মহাপ্রভু ও তাঁহার পার্শ্বচরগণের সম্বন্ধে সহজিয়ারা যে অপবাদ দিয়াছে, তাহা তো কেহই বিশ্বাস করেন নাই, তজ্জন্য সহজিয়ারা সর্ব্বত্র তিরস্কৃত হইয়া আসিতেছে। মোট কথা, খাঁটী ও মেকী সহজেই ধরা পড়ে। বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের সঙ্গে চিন্তার প্রেম সত্যঘটনামূলক, ও জয়দেবের সঙ্গে পদ্মাবতীর প্রেমও তাহাই। মালিনীর

চণ্ডীদাসের নিকটতম কালের কবি নরহরির প্রমাণ

সঙ্গে দ্বাদশ গোপালের অন্যতম অভিরামের প্রেমও তাহাই। এই সকল প্রেম-কথা সর্ব্বত্র প্রচারিত এবং ইহা কেহ অবিশ্বাস করে নাই।

চণ্ডীদাস তাঁহার যে অতুলনীয় ভাষায় রামীর সঙ্গে তাঁহার প্রথম পরিচয়ের বর্ণনা দিয়াছেন, সে ভাষা অন্যের অনায়ত্ত। তৎকৃত সহজিয়া পদের কতকগুলি এমন সুন্দর ও কবিত্বপূর্ণ, যে তাঁহার মত গীতি-কবিতার গুরুই লিখিতে পারিতেন। সহজিয়ারা কতকগুলি পদ তাঁহার ভণিতা দিয়া চালাইয়াছিল সত্য,—কিন্তু সেই সকল পদ বিচার করিলে সহজেই জাল বলিয়া ধরা পড়িবে।

চণ্ডীদাসের সহজিয়া মত

বঙ্গের কবিরা—বিশেষ বৈষ্ণব কবিরা অনেক সময় দৈন্য বুঝাইতে "দাস" "দীন" "দীন হীন" প্রভৃতি উপাধি ভণিতার ব্যবহার করিয়াছেন, এইরূপ বিভিন্ন ভণিতা দেখিলেই যে কবি স্বতন্ত্র, এরূপ ত্রস্ত সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত নহে। অনেক সময় গায়কগণও ইচ্ছানুসারে কবির ঐ ভাবের উপাধি ভণিতায় বসাইয়া দিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্থলে পদকল্পতরুর ১।২১ পদে "দীন বল রামদাস", ১৬৭ পদে দীন গোবিন্দ দাস" ১।৩০০ পদে "দীন হীন দাস" ৩৯।২০৫০ পদে "দীন হীন রামানন্দ দাস", ১৩।১৬৮ পদে "পাপী রাধামোহন দাস" ২।১৪৮৩ পদে "দীন কৃষ্ণ দাস" ৩৩।২১১৫ "হীন রামানন্দ" ৩৯।২০৫০ "দীন হীন রামানন্দ দাস" ৪৯।২০৬১ দুর্ম্মতি বৈষ্ণবদাস, ৩৭।২১১৭ "দীন নরোত্তম দাস" ৫।২১৪১ "দুঃখিয়া শেখরদাস" ৫।২১৫১ "দুঃখিয়া শেখর দাস" ৭।২১৪৩ "পাপিয়া শেখর দাস" ১২।২৩১৩ "দীন হীন হরিদাস", ৩৯।২২০৬ "পামর মাধব দাস", ১৬।২২২৯ "দীন হীন ঘোষ" (মাধব ঘোষ) ৭।২২৯০ "দীন ঘনশ্যাম দাস", ২।২৩১৩ "দীন হীন হরিদাস" ১।২৩১১ "দীন কৃষ্ণদাস", ২।২৯৩৫ "অকিঞ্চন বল্লভদাস" ৫।২৯৩৮ "পতিত রাধামাধব" প্রভৃতি বহু পদে দৈন্যব্যঞ্জক উপাধির বৃষ্টি দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ কোন একটি স্থানে "দীন চণ্ডীদাস" পাইয়া অনুরূপ বহু পদে শুধু চণ্ডীদাসের ভণিতা থাকা সত্ত্বেও তাহা তথা-কথিত "দীন চণ্ডীদাসের" বলিয়া চালাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। আদত কথা শুধু "দীন চণ্ডীদাস" ভণিতায় পাইলে যে এক পৃথক চণ্ডীদাস দাঁড় করাইতে হইবে—তাহা আমরা স্বীকার করি না।

দীন চণ্ডীদাস।

সর্ব্বত্রই যে একমাত্র চণ্ডীদাসই পদ লিখিয়াছেন, তন্নামের অন্য কেহ লেখেন নাই—ইহা হলপ করিয়া কেহ বলিতে পারিবেন না। তবে আমার বিশ্বাস পদকল্পতরুতে যে সকল পদ চণ্ডীদাসের নামে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার সকলগুলি খাঁটি। তৎসংকলইতা বহু পরিশ্রম করিয়া তাঁহার "কল্পতরু"র উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন,—তিনি স্বয়ং বৈষ্ণব ছিলেন এবং যেখানে যেখানে একই নামের ভিন্ন ভিন্ন কবির পদ পাইয়াছেন, তাহা বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন। তাঁহার

এই বহুশ্রমজাত বিরাট অধ্যবসায় প্রসূত মহাগ্রন্থকে অগ্রাহ্য করিয়া আমরা পল্লবগ্রাহী বৈজ্ঞানিকের "অনুমান খণ্ড" বিশ্বাস করিব না। গোবিন্দ দাস ও গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর পদ এই ভাবে বৈষ্ণব দাস স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছেন। অপর কয়েকটি কবি সম্বন্ধেও এইরূপ সাবধানতা অবলম্বিত হইয়াছে। 'দীন চণ্ডীদাস' যদি সত্যই ভিন্ন ব্যক্তি হইয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে দাঁড় করাইতে বহু প্রমাণ সংগ্রহ করিতে হইবে। অনুমানের উপর নির্ভর করিলে আদৌ চলিবে না।

ভাষার কথা যুগে যুগে বাঙ্গলা প্রাচীন পুঁথির ভাষা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তজ্জন্য চণ্ডীদাস কবিকঙ্কন, কৃত্তিবাস প্রভৃতি কবির পুস্তক এখনও চাষা ও মুদিরা পর্য্যন্ত বুঝিতে পারে। এরূপ এই ব্যাপক রস-জ্ঞান ভাষা রূপান্তরিত-না হইলে কখনই সম্ভবপর হইত না। হরিদ্বারের গঙ্গার গৈরিকবর্ণ ও কাঁকর ত্রিবেণীতে পাওয়া যায় না—তাই বলিয়া গঙ্গা ভিন্ন হইয়া যান নাই। 'শ্যাম' ছিল না 'কানু' ছিল, তাহা লইয়া মারামারি কাটাকাটি করিয়া কি লাভ? স্বীকার করিতেছি ভাষা কতকটা তফাৎ হইয়াছে, কিন্তু চণ্ডীদাসের অতুলনীয় হৃদয়ের স্পন্দন বহু পদে এখনও পাওয়া যায়। শবচ্ছেদ করিয়া মাতৃঅঙ্গের কোথায় কোন্ স্নায়ু ও অস্থি আছে, তাহা যে সকল ডাক্তার পরীক্ষা করিতে চান, আমি সেই সকল ডাক্তারের পর্য্যায়ভুক্ত হইতে চাহিনা; আমি চাই মাতার বাৎসল্য রসটি, উহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট ও একমাত্র লক্ষ্য—কোন লণ্ডনের ডাক্তার আমাকে কি বলিতে পারেন, মাতার কোন্ অস্থিতে, কোন্ স্নায়ু বা শিরায় সেই বাৎসল্য রসটি থাকে?

চণ্ডীদাসের একটি সুর আছে, আমি পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। সেই সুরটি আমি চিনি, তাঁহার কতকগুলি মুদ্রালক্ষণ আছে—যেমন একটি কথা দুইবার বা বারংবার করিয়া বলা,—যাহাকে ইংরেজীতে refrain বলে। "একথা কহিবে সই একথা কহিবে। অবলা এরূপ তপঃ করিয়াছে কবে।" "কি মোহিনী জান বন্ধু কি মোহিনী জান অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন।" "তোমারে বুঝাই বঁধু তোমারে বুঝাই,—ডাকিয়া শুধায় মোরে হেন কেহ নাই।" "এই ভয় উঠে মনে, এই ভয় উঠে—না জানি কানুর প্রেম তিলে যেন টুটে।" তাঁহার নিকটতম পরবর্ত্তী কবি নরহরি এই সুরের অনুকরণ করিয়া লিখিয়াছেন—"কহিও কানুরে সই কহিও কানুরে, একবার পিয়া যেন আইসে ব্রজপুরে।' (এই পদটি আবার নরহরির পরে রায় শেখর কতকটা রূপান্তরিত করিয়াছেন)।

চণ্ডীদাসের পদে "অবলা" শব্দটির বড়ই প্রাচুর্য্য, "হাম সে সরলা, অবলা অখলা ভাল মন্দ নাহি জানি। বিরলে বসিয়া পটেতে লিখিয়া বিশাখা দেখাল আনি।" "শুনহে চিকন কালা, কি বলিব আর চরণে তোমার অবলার যত জ্বালা। "অবলার যত দুঃখ, প্রাণনাথ, সব থাকে মনে মনে"। "একথা কহিবে সই একথা কহিবে। অবলা এতেক তপ করিয়াছে কবে।" প্রভৃতি শত শত পদে এই "অবলা" শব্দটী আছে। অবশ্য বহু কবির পদে অবলা শব্দটি এবং পদাংশের দুইবার অনুবৃত্তি আছে, কিন্তু চণ্ডীদাসের পদে ইহার অত্যধিক প্রাচুর্য্য।

চণ্ডীদাসের ত্রিপদীগুলির একটা বৈশিষ্ট্য আছে। অপরাপর কবিরা সাধারণতঃ অষ্ট অক্ষরের, কখনও কখনও ষড় অক্ষরের অর্দ্ধছত্রের সহিত পূর্ব্বোক্তরূপ আর একটি অর্দ্ধছত্র যোজনা করেন, তৎসঙ্গে কবিতাটির অর্দ্ধছত্রের মিল থাকে। কিন্তু চণ্ডীদাস অনেকস্থলেই গোড়ায় একটিমাত্র অর্দ্ধছত্র দিয়া আরম্ভ করিয়া তাহা কবিতার ৪র্থ অর্দ্ধছত্রের সঙ্গে মিলাইয়া দেন, যথা—"(সখি) কি আর বলিব তোরে, অল্প বয়সে পিরীতি করিয়া রহিতে না দিলে ঘরে।" "সই এত কি সহে পরাণে। কি বোল বলিয়া, গেল ননদিনী, শুনিলি আপন কাণে।" "(বঁধু) কি আর বলিব আমি—(আমার) মরণে জীবনে জনমে জনমে প্রাণ বঁধু হইও তুমি।" "(রাধার) কি হ'ল অন্তর ব্যথা, সে যে বসিয়া একলে, থাকয়ে বিরলে না শুনে কাহার কথা।" "শুনহে চিকণ কালা, বলিব কি আর, চরণে তোমার অবলার যত জ্বালা।" "(বঁধু) তুমি সে আমার প্রাণ দেহ মন আদি, তোমারে স'পেছি, কুল শীল জাত—মান।" "সই কে বলে পীরিতি ভাল, হাসিতে হাসিতে পীরিতি করিয়া কাঁদিয়া জীবন গেল।" "সখি কেবা শুনাইল শ্যাম নাম, কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো আকুল করিল মোর প্রাণ"। কখনও কখনও প্রথমটা ঠিক প্রচলিত ত্রিপদীর মতই আরব্ধ হয়, তার পর দ্বিতীয় কবিতার প্রারম্ভে হঠাৎ ঐরূপ আর একটি অর্দ্ধছত্র প্রদত্ত হয়, "কাল কুসুম করে, পরশ না করি ডরে, এ বড় মনের মন ব্যথা, যেখানে সেখানে যাই, সকল লোকের ঠাঁই, কাণাকাণি শুনি সেই কথা। সই লোকে বলে কানু পরিবাদ। কালার ভ্রমেতে হাম, জলদ না হেরি গো ত্যজিয়াছি কাজলের সাধ"। "(সে যে) সদাই চঞ্চল, বসন অঞ্চল সম্বরণ নাহি করে বসি থাকি থাকি, উঠয়ে চমকি ভূষণ খসিয়া পড়ে। রাই এমন কেন বা হৈল" ইহাই চণ্ডীদাসের সেই সুরটি, যাহার সঙ্গে আমি পরিচিত। চণ্ডীদাসের এইরূপ শত শত পদ আছে, এখানে তাহা উদ্ধৃত করিবার অবকাশ নাই, পদকল্পতরুর ৬।১৭৩৪ পদটির সবটা এই ভাবের অর্দ্ধছত্র দিয়া আরম্ভ। "সই কহবি কানুর পায়, সে সুখ সায়র দৈবে শুকাইল, তিয়াসে পরাণ যায়। সই ধরবি কানুর কর, আপনা বলিয়া বোল না তেজবি মাগিয়া লইবি বর। সখি যতেক মনের সাধ, শয়নে স্বপনে করিনু ভাবনে বিহি সে করল বাদ। সখি হাম সে অবলা, তায় বিরহে আগুন, দহয়ে দ্বিগুণ সহন নাহিক যায়। সখি বুঝিয়া কানুর মন, যেমন করিলে আইসে সেজন দ্বিজ চণ্ডীদাস ভন।" এই চণ্ডীদাসের সুর ; কবির করুণ ও মিষ্ট সুরে ভ্রম হওয়ার অবকাশ নাই।

চণ্ডীদাস হৃদয়ের যে মর্ম্ম কথাটি কহিয়াছেন, প্রেমকে যে উচ্চ স্থানে দাঁড় করাইয়াছেন, উপমা ও উৎপ্রেক্ষা রাজ্যের গণ্ডী ছাড়িয়া প্রেমের যে স্বরূপ আবিষ্কার করিয়াছেন—বঙ্গীয় গীতি কবিতায় সেরূপ আর কেহ করিতে পারেন নাই। গালাগালি দিতে যাইয়া তিনি বলিয়াছেন "এ হেন বঁধুরে মোর যেজন ভাঙ্গায়, হাম নারী অবলার বধ লাগে তায়"। অভিশাপ দিয়াছেন "আমার হৃদয় যেরূপ হইয়াছে তেমতি হউক সে" ইহা হইতে বড় অভিশাপ আর তাঁহার নাই। বিষ দিয়া মার, অগ্নিতে দগ্ধ কর—কিছুতেই তত কষ্ট দিতে পারিবে না, কানু প্রেমে তিনি যত কষ্ট পাইয়াছেন। তিনি যে কষ্ট পাইতেছেন সেই প্রেমের কষ্ট চূড়ান্ত কষ্ট,—"আমার মত যেন সে হয়" এই উপমা-উৎপ্রেক্ষা বিহীন, একটি কথা তাঁহার সমস্ত হৃদয়ের গভীরতম ভাব-জ্ঞাপক। যখন কৃষ্ণকে তাহার মনের কষ্ট

বুঝাইতে চাহিতেছেন, তখনও বলিতেছেন—আর জন্মে যেন তুমি আমার মত হও, নতুবা এ দুঃখ বুঝিতে পারিবে না, মরিয়া যেন আমি শ্রীনন্দনন্দন হই,—তোমাকে ভালবাসিয়া যেন ছাড়িয়া যাই, তখন বুঝিবে "পীরিতি কেমন জ্বালা"। অন্য কোন কষ্ট দুঃখের কথা বলিলে তাহার প্রাণের ব্যথা বুঝাইতে পারিতেন না, তাঁহার দুঃখ যেরূপ অপার, কানু প্রেমের আনন্দও সেইরূপ অপার। "সখির সহিতে, জলেরে যাইতে, সেকথা কহিবার নয়। যমুনার জল, করে ঝলমল, তাহে কি পরাণ রয়"। চণ্ডীদাসের অনেক কথাই মনের ভিতর থাকে,—অতি অল্প কথায় তিনি ভাবরাজ্যের ইঙ্গিত দিয়া যান,—সমস্ত কথা বলেন না, পাঠককে তাহা পূরণ করিতে হয়। যখন সখীর সহিত রাধা জল আনিতে যান, তখন আনন্দে শরীর এলাইয়া পড়ে "সে কথা কহিবার নয়"। যমুনার জল কেন ঝলমল করে?—যমুনার কূলে নীপ তরুর ডালে শিখি পুচ্ছ মাথায় কৃষ্ণ বসিয়া থাকেন, তাহার প্রতিবিম্ব পড়াতে জল ঝলমল করে, রাই উর্দ্ধদিকে লজ্জায় চাহিতে পারেন না—তিনি সেই কথা বলিতেছেন। পরবর্ত্তী অনেক কবি তাহা বিশদ করিয়া বলিয়াছেন; একজন লিখিয়াছেন "ঢেউ দিও না জলে বলে কিশোরী, দরশনে দাগা দিলে হবে পাতকী"। কেন উর্দ্ধদিকে চাহিয়া কৃষ্ণকে দেখিতে পারেন না, সে কথা আর এক কবি লিখিয়াছেন:—"দাদা বলাই সঙ্গে ছিল" সুতরাং পরবর্ত্তী সমজ্দার কবিরা চণ্ডীদাসের স্বল্পাক্ষরা কবিতার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তিনি শুধু "সে কথা বলিবার নয়" এবং 'যমুনার জল, করে ঝলমল" লিখিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন।

চণ্ডীদাসের অনেক পদে যে সর্ব্বোচ্চ প্রেমের ইঙ্গিত আছে, তাহাতে পার্থিব প্রেম অপার্থিবের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে, তাহার বিস্তৃত বিবৃতি দেওয়া এখানে অসম্ভব। তিনি প্রেম সম্বন্ধে একটি সার কথা বলিয়াছেন—"চণ্ডীদাস কহে, শুন বিনোদিনী, পীরিতি না কহে কথা। পীরিতি লাগিয়া পরাণ ছাড়িলে পীরিতি মিলয়ে তথা।"

যখন জাতীয় কোন বহু কৃচ্ছপূর্ণ তপস্যার ফলে ভাব রাজ্যের রাজা অবতীর্ণ হইবেন, তাহার পূর্ব্বেই তাঁহার আগমনী চারিদিক হইতে ধ্বনিত হয়। রাজা রাজ্য হইতে স্বতন্ত্র নহেন, রাজ্যের ভাবরাশি তাঁহার মধ্যে স্বতই প্রকাশ পায়। বুদ্ধদেবের পূর্ব্বে উপনিষদে ও নানা দর্শনে যে সকল কথা ফুটিয়া উঠিয়াছিল, বুদ্ধ সেই সকল ভাবের প্রতীক স্বরূপ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ভল্টেয়ার ও রুশো যে সকল মত প্রচার করিয়াছিলেন, তাহারই প্রতীক স্বরূপ নেপোলিয়নের আবির্ভাব। চৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বেই জয়দেব মেঘদর্শনে রাধিকার আনন্দ ও কৃষ্ণভ্রম বর্ণনা করিয়াছিলেন, মাধবেন্দ্রপুরী মেঘদর্শনে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন; কিন্তু চণ্ডীদাসের মধ্যে মহাপ্রভুর লীলার আভাষ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পাওয়া যায়—ইহা তাঁহার আগমনী গান; যেরূপ প্রভাত হইবার পূর্ব্বে উষাসুন্দরী সোণার শাড়ী পরিয়া দিগ্বলয়ে দেখা দেন এবং সূর্য্যোদয়ের আভাষ ইঙ্গিতে ব্যক্ত করেন, চণ্ডীদাসের

গীতি সেইরূপ চৈতন্যের আগমন সূচনা করিয়াছিল। পল্লব-গ্রাহীরা সেই সকল পদ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া আধ্যাত্মিক জগতের গূঢ়তত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞতা প্রকাশ করেন মাত্র।

নান্নুর বীরভূম জেলার অন্তর্গত—শাকুলিপুর থানার অধীন, সিউড়ী হইতে পূর্ব্বাংশে ১২ ক্রোশ; বীরভূম জেলায় অনেকগুলি মুনির তপোবন আছে; বক্কেশ্বর আদি উষ্ণ-প্রস্রবণ, ময়ূরাক্ষী, অজয়, সাল, হিংলা, দ্বারিকা প্রভৃতি নদ নদী পাহাড়ের সঙ্গে ক্রীড়া করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। বীরভূমের বেলফুল বড় মনোজ্ঞ, বসোরার গোলাপ তাহাদের সৌন্দর্য্য, অবয়ব ও সুরভির নিকট লজ্জা পাইবে। স্বভাবের সুরম্য নিকেতন বীরভূমি—জয়দেব ও চণ্ডীদাসের জন্মভূমি। তাঁহাদের হৃদয়ও সেই বেল-ফুলগুলির ন্যায় সুন্দর ছিল, তাঁহাদের কাব্যে সেই সুন্দর হৃদয়ের অমর প্রতিবিম্ব রহিয়া গিয়াছে।

চণ্ডীদাসের জীবনী।

চণ্ডীদাসের পিতা 'বাশুলীদেবী"র পূজক ছিলেন, * তজ্জন্যই বোধ হয় পুত্রের নাম 'চণ্ডীদাস' রাখা হইয়াছিল। এখনও নান্নুর গ্রামে বাশুলীদেবী অধিষ্ঠিত আছেন ও তাঁহার পূজা নিয়মিতরূপে নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। চণ্ডীদাসের পিতার মৃত্যুর পর তিনিও উক্ত দেবীর পূজক নিযুক্ত হন। উক্ত দেব-মন্দিরের সেবিকা রামমণি (নরহরির মতে তারা ধুবনী) † কবির হৃদয়ে অপূর্ব্ব প্রেম জাগাইয়া দিয়াছিল। এই সম্বন্ধে নানাবিধ গল্প আছে। যাহা ঐতিহাসিক ভিত্তিতে দাঁড়াইতে না পারিবে, এরূপ অসার গল্প লিখিয়া পাঠকগণের মধ্যে এল্যানাস্কারে ন্যায় ভাবুক শ্রেণীর মনোরঞ্জন করিতে প্রবৃত্তি নাই। বিদ্যাপতির সম্বন্ধেও এইরূপ অনেক গল্প পাঠ করা গিয়াছে।

সম্প্রতি চণ্ডীদাসের কতকগুলি নূতন কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে, ‡ তাহাতে তাঁহার নিজ বিবরণ কিছু পাওয়া গিয়াছে। রজকিনীর কলঙ্কহেতু চণ্ডীদাস সমাজচ্যুত অবস্থায় ছিলেন; একদা তাঁহার জ্ঞাতিবর্গ তাঁহাকে বলিলেন, "শুন শুন চণ্ডীদাস। তোমার লাগিয়া আমারা সকল ক্রিয়াকাণ্ডে সর্ব্বনাশ॥ তোমার পিরীতে আমরা পতিত, নকুল ডাকিয়া বলে। ঘরে ঘরে সব কুটুম্ব ভোজন করিঞা উঠাব কুলে॥" কবির এ বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ ছিল না, তবে তাঁহার ভ্রাতা নকুল নিতান্ত ইচ্ছুক ও অগ্রসর হইয়া কবিকে জাতিতে তুলিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নকুল ঠাকুরের গ্রামে খুব বেশী প্রতিপত্তি ছিল;

---

* ১৩৮০ সালের ১০ই পৌষের 'সোমপ্রকাশে' জনৈক পত্র-প্রেরক লিখিয়াছেন—"চণ্ডীদাসের ১৩২৯ শকে জন্ম ও ১৩৯৯ শকে মৃত্যু হয়, ইঁহার পিতার নাম দুর্গাদাস বাগচি, ইঁহারা বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন।" লেখক কবির কোষ্ঠী কিরূপে সংগ্রহ করিলেন, তাহা জিজ্ঞাস্য।

† ৺জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয়ের সংস্করণে চণ্ডীদাসের যে জীবনী প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে ইহার নাম "রামতারা" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে (৪৫ পৃঃ)। এই নামই বোধ হয় ঠিক, তাহা হইলে নরহরির 'তারা ধুবনী' বুঝিতে কোনও গোল হয় না।

‡ সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা, ৫ম ভাগ, ৩য় সংখ্যা ১৭৩ পৃঃ (১৩০৫ সন)।

তিনি ব্রাহ্মণগণের দ্বারে দ্বারে চণ্ডীদাসের জন্য বিনয় অনুনয় করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ গ্রাম্যবাসিগণ চণ্ডীদাসকে "নীচ প্রেমে উন্মাদ।" বলিয়া এবং "পুত্র পরিবার, আছয়ে সংসার, তাহারা সম্মতি নহে।" ইত্যাদিরূপ আপত্তি করিয়া আহারের নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিলেন, কিন্তু তাঁহারা শেষে নকুল ঠাকুরের সৌজন্যে মুগ্ধ হইয়া "তুমি একজন, বট মহাজন, সকল করিতে পার" ইত্যাদি আদরবাক্যে তাঁহাকে আপ্যায়িত করিয়া নিমন্ত্রণ-গ্রহণ-সূচক পান দান করিলেন।

এ দিকে এ কথা শুনিয়া রামী—"নয়নের জলে, কান্দিয়া বিকল, মনে বোধ দিতে নারে।" এবং "গৃহকে জাইঞা, পালঙ্ক পাড়িয়া, শয়ন করিল তায়। কান্দিয়া মুছিছে, নিশ্বাস রাখিছে, পৃথিবী ভিজিয়া যায়।" কিন্তু তাহাতেও শান্তি নাই, আবার উঠিয়া রামী বকুলতলায় দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। ইতিমধ্যে ব্রাহ্মণ-ভোজনের আয়োজন হইয়াছে। 'সীতামিস্ত্রী', 'আলফা' প্রভৃতি নানারূপ মিষ্ট দ্রব্য যখন ভোজনস্থলে আনীত এবং ব্রাহ্মণগণ গণ্ডূষ করিয়া ভোজনে প্রবৃত্ত হইবেন, তখন রজকিনী সেই স্থানে উপস্থিত হইল এবং যখন "দ্বিজগণ ডাকে, ব্যঞ্জন আনিতে, ধোবিনী তখন ধায়।" এই বর্ণনা দ্বারা যে অনর্থোৎপাত সূচিত হইয়াছিল, তাহার শেষাঙ্ক আর জানা গেল না, ইহার পরে পুঁথির অংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এ সম্বন্ধে একটি অলৌকিক গল্পের প্রবাদ আছে, তাহা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন।

চণ্ডীদাসের রাধিকা।

চণ্ডীদাসের বর্ণিত রাধিকাকে প্রথম যখন তিনি দেখাইতেছেন, তখনই উন্মাদিনীর বেশ; প্রেম-সরোবরে তিনি শতদলের ন্যায় ফুটিয়া রহিয়াছেন। স্বীয় নিবিড় কৃষ্ণকুন্তল আহ্লাদে একবার খুলিতেছেন, একবার দেখিতেছেন,—তাহার মধ্যে কৃষ্ণরূপের মাধুরীটি আছে; করযোড়ে মেঘপানে তাকাইতেছেন, নয়নের তারা চলিতেছে না,—মেঘের সৌন্দর্য্যে ডুবিয়া পড়িতেছে,—কারণ কৃষ্ণের বর্ণ মেঘের ন্যায়; একদৃষ্টে তিনি ময়ুর ময়ূরীর কণ্ঠ দেখিতেছেন, সেখানেও চক্ষু কৃষ্ণরূপের অনুসন্ধান করিতেছে,—নব পরিচয় এইরূপ। তাহার পর প্রেমের বিহ্বলতা; কত বিনয়, কত অনুনয়, মধুমাখা ক্রোধ, সেই ক্রোধে কাঠিন্যমাত্র নাই, ফুলদলে সেই ক্রোধের সৃষ্টি,—মানের পরই মানভঙ্গ, গালি দিয়া,—আঘাত করিবার চেষ্টা করিয়া নিজে আঘাত পাইয়া আসা,—কত কাতর অশ্রুর সম্পাত, কত দুঃখের নিবেদন, কত কাতরোক্তি। প্রেম করিয়া লোক কত দুঃখী হয়,—বন্দরে যাইয়া যেন ডিঙ্গা মিলে না, সুরধুনী-তীর হইতে যেন শুষ্ককণ্ঠে ফিরিয়া আসিতে হয়,—সেই দুঃখ চণ্ডীদাসের কবিতায় ছত্রে ছত্রে। তথাপি সেই কষ্টের মধ্যেই কষ্ট বহন করিবার যোগ্য উপকরণ আছে,—কষ্টের মধ্যেই কষ্টের ঔষধ সুখ আছে।

"যথা তথা যাই আমি যতদূর পাই।
চাঁদ মুখের মধুর হাসে তিলেক জুড়াই॥"

সেই চাঁদ মুখের কথা বলা যায় না। বলিতে গেলে সুখে দুঃখে, সুধা বিষে, হৃদয় আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। তাঁহার অশ্রুতে সুখ দুঃখ জড়িত,—প্রভাত পদ্মের ন্যায় দু'টি চক্ষু আলো পাইয়া উন্মীলিত হয়, কিন্তু নৈশ-শিশির-ভারাক্রান্ত হইয়া মলিন হইয়া পড়ে,—কোন্‌টি পুলকাশ্রু, কোন্‌টি শোকাশ্রু, কোন্‌টি প্রাতঃশিশির, কোন্‌টি নৈশ-হিম-কণা—তাহা নিশ্চয় বলা যায় না।

"গুরুজন আগে, দাঁড়াইতে নারি,
সদা ছল ছল আঁখি।
পুলকে আকুল, দিক নেহারিতে,
সব শ্যামময় দেখি॥
দাঁড়াই যদি সখীগণ সঙ্গে।
পুলকে পুরয় তনু শ্যাম পরসঙ্গে॥
পুলক ঢাকিতে নানা করি পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার॥"

তাঁহার প্রসঙ্গে কাঁদিয়া ফেলেন, বড় সুখ হয়,—সে নাম শুনিতে বড় সুখ হয়, চক্ষে আপনিই জল পড়ে; আবার এই সুখ পাছে অপর কেহ দেখে,—পৃথিবী ত সুখের বাদী, গভীর সুখ পৃথিবী বুঝে না,—তাই নানাপ্রকারে সেই পুলক ঢাকিতে চেষ্টা করিয়াও তাহা রোধ করা যায় না। এই সুখের মধ্যেও বিষাদের ছায়া আছে, না হইলে সুখ অপূর্ব্ব-সুখ হইত না; না ভাঙ্গাইতেই ভাঙ্গাইবার ভয়;—

"এ হেন বঁধুরে মোর যে জন ভাঙ্গায়।
হাম নারী অবলার বধ লাগে তায়॥"

ভালবাসার দুঃখের প্রতিশোধ—অভিমান; কিন্তু তাহা আত্মবঞ্চনামাত্র—

"এক কর্ণ বলে আমি কৃষ্ণনাম শুনব।
আর এক কর্ণ বলে আমি বধির হইয়া রব—ও নাম শুনব না॥"

এক পা ছুটিতে চায়, অপর পা চলিতে যাইয়া থামে। চণ্ডীদাসের রাধার মান করিবারও সাধ্য নাই; দশ ইন্দ্রিয় মুগ্ধ, মন মান করিবে কিরূপে? স্বীয় শরাসন মন্ত্রমুগ্ধ, শর নিক্ষেপ করা অসাধ্য,—

"যত নিবারিয়ে তায় নিবার না যায়।
আন পথে ধাই তবু কানু পথে ধায়॥
এ ছার রসনা মোর হইল কি বাম।
যাঁর নাম নাহি লব লয় তাঁর নাম॥
এ ছার নাসিকা মুঞি কত করু বন্ধ।
তবু ত দারুণ নাসা পায় শ্যাম গন্ধ॥

সে কথা না শুনিব করি অনুমান।
পরসঙ্গে শুনিতে আপনি যায় কাণ।
ধিক রহুঁ এ ছার ইন্দ্রিয় আদি সব।
সদা যে কালিয়া কাণু হয় অনুভব।"

ইহা অপূর্ব্ব তন্ময়ত্ব।

আমরা চণ্ডীদাসের কবিতা বেশী উঠাইব না। যে পাঠক প্রেমিক, তিনি হৃদয়-নিভৃতে সেই পদকুসুমগুলি তুলিয়া অশ্রুসিক্ত করিয়া সুখী হউন। মিষ্ট দ্রব্যের যেরূপ স্বাদ ভিন্ন অন্য প্রমাণ নাই, এই গীতগুলির উৎকর্ষের পাঠ ভিন্ন অন্য প্রমাণ হইতে পারে না।

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি।

আর একটি কথা কেহ কেহ বলেন, বিদ্যাপতির যশে চণ্ডীদাসের যশ কিছু ঢাকা পড়িয়াছে। তাহা হওয়া বিচিত্র নহে। কালিদাসের যশে ভবভূতি ঢাকা পড়িয়াছেন, ভারতচন্দ্রের যশে কবিকঙ্কণ ঢাকা পড়িয়াছেন, কতক দিনের জন্য পোপের যশে সেক্ষপীয়র ঢাকা পড়িয়াছিলেন। চারু চিত্রপটখানা দেখিয়া সকলেই বিমুগ্ধ হয়,—কিন্তু মানসসৌন্দর্য্য ও গরিমা সেরূপ সহজে আয়ত্ত হইবার বিষয় নহে।

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির ন্যায় শিক্ষিত ছিলেন না,—ইহাই সাধারণ মত। লেখা পড়া পুষ্পের ন্যায়, ফল জন্মিলে পুষ্পের বিলয় হয়; শাস্ত্র ভাব কি ভক্তির নিকট পৌঁছাইতে চেষ্টা করে? যিনি নিজে ভাবুক বা ভক্ত, তিনি শাস্ত্রের মুকুরে প্রতিবিম্বিত প্রকৃতির মূর্ত্তির প্রতি কেনই বা লক্ষ্য করিবেন;—প্রকৃতির সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির ন্যায় উপমা প্রয়োগ করেন নাই,—সুন্দরের স্বভাব-ভঙ্গীই অলঙ্কার হইতে বেশী আকর্ষক; উপমা কবির একটি শ্রেষ্ঠ গুণ বলিয়া বর্ণিত আছে সত্য,—কিন্তু যিনি ভাবটি নিজের তুলিতে আঁকিতে পারেন না, তিনি উপমার অঙ্গুলি-সঙ্কেতে গৌণবস্তু দ্বারা মুখ্যবস্তুর আভাস দিতে চেষ্টা করেন। তাই উপমার রূপ বর্ণনা অপেক্ষা জীবন আঁকিয়া রূপ বর্ণনা উৎকৃষ্ট। এই হিসাবে কালিদাস হইতে সেক্ষপীয়র শ্রেষ্ঠ,—বিদ্যাপতি হইতে চণ্ডীদাস শ্রেষ্ঠ। কিন্তু চণ্ডীদাস যে প্রবীণ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন—তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

চণ্ডীদাসের আধ্যাত্মিক ভাব।

"বদন ছাড়িতে নাহি পারে।"

"জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো।"

চণ্ডীদাসের গীতিসমূহের ভিতর একটু আধ্যাত্মিকতা আছে, তাহা এত স্পষ্ট যে অস্বীকার করা যায় না:—সাধারণ প্রেম দ্বারা উঁহার সর্ব্বত্র ব্যাখ্যা করা সুকঠিন হয়; পূর্ব্বরাগের প্রথমই কৃষ্ণনাম মাহাত্ম্য-প্রচার—নাম মধুময়, তাহা নাম শুনিয়া অনুরাগের দৃষ্টান্ত মানুষী-ভালবাসার সাহিত্যে বিরল, কিন্তু এই নামজপের দৃষ্টান্ত সাধারণ সাহিত্যে একেবারে দুষ্প্রাপ্য,

—ভগবানের নাম জপ করিতে করিতে ভক্তচিত্ত আপনা ভুলিয়া যায়, এই দৈহিক বন্ধন যেন তখন থাকিয়াও থাকে না,—ইন্দ্রিয়-প্রশমিত মনে নামের মধুভরা মোহ সর্ব্বদা শিথিল ও অবসন্ন করিয়া ফেলে। এই পূর্ব্বরাগ সাংসারিক প্রেমের পূর্ব্বরাগের উন্নততম আদর্শ, এইরূপ একটা কষ্ট-ব্যাখ্যা দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু ভগবৎ প্রেমের স্বরূপ বলিয়া ব্যাখ্যা করা সহজ হয়। তারপর রাধিকার "বিরতি আহারে, রাঙ্গাবাস পরে, যেমন যোগিনী পারা।" নীল নিচোলপরিহিতা রাধিকা-মূর্ত্তিই বৈষ্ণব সাহিত্যে সুলভ, কিন্তু রাঙ্গাবাস-(গেরুয়া) পরা রাধিকা এখানে সন্ন্যাসীনির মত। তাঁহার পরিধান গেরুয়া এবং আহারে বিরতি (উপবাস আচরণ) ও মেঘ দেখিলেই কৃষ্ণভ্রমে করজোড়ে সকাতর অনুনয়, একদৃষ্টে ময়ুর ময়ূরীর কণ্ঠ দেখিয়া বর্ণমাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া পড়া, এ সকল বৈষ্ণব সাধুভক্তগণের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। "যে করে কানুর নাম তার ধরে পায়। পায় ধরি কান্দে সে চিকুর গড়ি যায়। সোণার পুত্তলি যেন ভূতলে লুটায়।" এই স্বর্ণ-পুত্তলি প্রেমিকের নয়ন পুত্তলি কোন সুন্দরীর ছবি বলিয়া মনে করিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। যিনি ধূলিময় প্রাঙ্গণভূমিতে ইতর জাতির মুখেও হরিনাম শুনিলে অবলুণ্ঠিত হইয়া তাহার পদে পড়িতেন, সেই স্বর্ণ পুত্তলি গৌরহরির ছবিরই পূর্ব্বাভাস যেন এই পদে সূচিত হইতেছে। "সতী বা অসতী, তোমাতে বিদিত, ভাল মন্দ নাহি জানি। কহে চণ্ডীদাস, পাপ পুণ্য মম, তোমার চরণ মানি।" পদটি "ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন, যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি"—প্রভৃতির ন্যায় নীতি জ্ঞানের অত্যূর্দ্ধে স্থিত ভগবানের প্রতি একান্ত নির্ভরের ভাবের অভিব্যক্তি বলিয়াই মনে হয়।

চণ্ডীদাসের মানুষী প্রেম, ক্ষণে ক্ষণে এক উন্নত অমানুষিক প্রেম-রাজ্যের সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উপন্যাস কি কাব্যের সাধারণ আদানপ্রদানময় প্রেমভাব তত ঊর্দ্ধে উঠিতে পারিয়াছে বলিয়া আমরা জানি না। রামীর কথা কহিতে যাইয়াও চণ্ডীদাস মানুষী-প্রেমের সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া আশ্চর্য্যরূপে পবিত্রতার সহিত ধর্ম্মজগতের কথা কহিয়াছেন; "কামগন্ধ নাহি তায়"—কথাটি বহু পরিচিত; তাহা ছাড়া "তুমি হও পিতৃ মাতৃ", "তুমি বেদমাতা গায়ত্রী, "তুমি সে মন্ত্র, তুমি সে তন্ত্র, তুমি উপাসনা রস" এসব কথা ধর্ম্মবেদী হইতে উচ্চারিত স্তোত্রের মত শুনায়। ধোপানীর পায় যে পুষ্পাঞ্জলি—যে আদর ও শ্রদ্ধা পড়িয়াছে, তাহা যেন কোন অজানিত স্বর্গলোকে অলক্ষিতভাবে পৌছিয়া চিরপবিত্র হইয়া রহিয়াছে। চণ্ডীদাসের সরল কথাগুলি সর্ব্বত্রই মর্ম্মস্পর্শী। "বদন থাকিতে, না পারি বলিতে, তেঞি সে অবোলা নাম"—পদে তিনি "অবলা" শব্দটিকে "অবোলা"রূপে ব্যবহার করিয়া নারীজাতির মূকত্বের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন—অর্থ, যে মুখ থাকিতে কথা বলিতে পারে না—সেইতো "অবোলা"। চণ্ডীদাসের বাণী সহজ, সরল ও সুন্দর। বিদ্যাপতির পূর্ব্বরাগের "ক্ষণে ক্ষণে নয়ন কোণে অনুসরই। ক্ষণে ক্ষণে বসনধূলি তনু ভরই।" প্রভৃতি বর্ণনায় উদ্ভিন্নযৌবনা রাধিকার



वीर गम्भीर

রূপ যেন উছলিয়া পড়িতেছে, কিন্তু সেই পূর্ব্বরাগের অবস্থা চিত্রিত করিয়া চণ্ডীদাস যে ধ্যানপরায়ণা রাধিকার মূর্ত্তিটি দেখাইয়াছেন, তাহার সাশ্রুনেত্র আমাদিগকে স্বর্গীয় প্রেমের স্বপ্ন দেখাইয়া অনুসরণ করে, এবং চৈতন্য প্রভুর দুটি সজল চক্ষুর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। সেই মূর্ত্তি ভাষার পুষ্প-পল্লবের বহু উর্দ্ধে নির্ম্মল অধ্যাত্মরাজ্য স্পর্শ করিয়া অমর হইয়া রহিয়াছে। সে স্থানে সাহিত্যিক সৌন্দর্য্যের আড়ম্বর নাই। কিন্তু তাহা প্রেমের নিজের স্থান। এখানে শব্দের ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা শব্দের অল্পতাই ইঙ্গিতে বেশী কার্য্যকরী হয়। প্রকৃত প্রেমিক বড় স্বল্পভাষী, এখানে উচ্চ ভাবের শোভা অবগতির জন্যই যেন ভাষার শোভা তনু ত্যাগ করে এবং বাহ্য সৌন্দর্য্যের বাহুল্য না থাকিলেও মন্ত্রপূতঃ কোটি হৃদয়ের অন্তঃপুর উদ্ঘাটিত করিয়া দেখায়। চণ্ডীদাসের প্রেমগীতিতে 'নায়িকা রাধিকা' অপেক্ষা 'রাধাভাবে'রই উৎকৃষ্ট অভিব্যক্তি হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

চণ্ডীদাসের ভাব সম্মিলনের পদাবলী স্তোত্ররূপে পাঠ করা যায়। ততোধিক প্রশংসা করিলেও বোধ হয় অন্যায় হইবে না, সেগুলির মত প্রেমের সুগভীর মন্ত্র ধর্ম্মপুস্তকেও বিরল। "বঁধু কি আর বলিব আমি"—প্রভৃতি গান শুধু বৈষ্ণবদের কণ্ঠে নহে, ঈষৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া সুশ্রাব্য মনোহরসাহী রাগিণীতে ব্রাহ্মগায়কের কণ্ঠেও ধ্বনিত হইয়া থাকে। আমরা আর একটি পদ উদ্ধৃত করিয়া চণ্ডীদাসের প্রসঙ্গ শেষ করিব:—

ভাব-সম্মিলন।

"বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ।
দেহ মন আদি, তোঁহারে স'পেছি, কুল শীল জাতি মান॥
অখিলের নাথ, তুমি হে কালিয়া, যোগীর আরাধ্য ধন।
গোপ গোয়ালিনী, হাম অতি হীনা, না জানি ভজন পূজন॥
পিরীতি রসেতে, ঢালি তনু মন, দিয়াছি তোমার পায়।
তুমি মোর গতি, তুমি মোর পতি, মন নাহি আন ভায়॥
কলঙ্কী বলিয়া, ডাকে সব লোকে, তাহাতে নাহিক দুখ।
বঁধু তোমার লাগিয়া, কলঙ্কের হার, গলায় পরিতে সুখ॥
সতী বা অসতী, তোমাতে বিদিত, ভাল মন্দ নাহি জানি।
কহে চণ্ডীদাস, পাপ পুণ্য মম তোমার চরণ মানি॥"

চণ্ডীদাসের সময় সম্বন্ধে আমরা এই মাত্র প্রমাণ পাইতেছি যে মহাপ্রভু বা তাঁহার সমকালবর্ত্তী কেহই তাঁহাকে দর্শন করেন নাই, অথচ তাঁহারা সকলেই তাঁহার গীতে মুগ্ধ ছিলেন। নরহরি সরকার (যিনি মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বেই রাধাকৃষ্ণবিষয়ক কবিতা লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন) লিখিয়াছেন যে চণ্ডীদাসের গান তাঁহার সময় ভুবনব্যাপী হইয়াছিল, ইহাতে অনুমান হয়, সেই সকল গান এতদূর খ্যাতিলাভ করিতে অন্ততঃ শতাব্দীকাল লাগিয়াছিল। নরহরি ১৪৩৫

বা তৎসন্নিহিত কোন সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির মিলন হইয়াছিল, বিদ্যাপতির জন্মকাল সম্ভবতঃ ১৩৫৮ খৃঃ অব্দ। এই সকল প্রমাণ দ্বারা চণ্ডীদাসের সময় সম্বন্ধে একটা অনুমান করা যায়।

চণ্ডীদাস সম্বন্ধে সম্প্রতি অনেক নূতন তথ্যের আবিষ্কার হইয়াছে, তাহা ক্রমে লিখিতেছি, কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে এক প্রধান আবিষ্কার—"কৃষ্ণ-কীর্ত্তন।" এই আবিষ্কারের গুরুত্ব এত বেশী যে চণ্ডীদাস সম্বন্ধে আমরা যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহা ফিরিয়া লিখিতে হইতেছে। কেহ কেহ "কৃষ্ণ কীর্ত্তনে"র প্রামাণিকতা সম্বন্ধে আপত্তি করিয়া প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, কেহ বা এই পুস্তকের মোহিনীতে এত দূর আকৃষ্ট হইয়াছেন—যে প্রচলিত চণ্ডীদাসী পদগুলিকে জাল মনে করিয়া কৃষ্ণকীর্ত্তনই কবির একমাত্র খাঁটি লেখা বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইতেছেন। দুইদলের গোঁড়ামির ভিড় ঠেলিয়া সত্য উদ্ধার করিতে হইবে।

আপত্তিকারকের একজন বলিতেছেন, চণ্ডীদাসের রচনা পূর্ব্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গ, কামরূপ, বীরভূম প্রভৃতি সমস্ত অঞ্চল ঘুরিয়া কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের বিকৃত ভাষায় পরিণত হইয়াছে। চণ্ডীদাসের কতক কতক পদ ভাঙ্গিয়া অনন্তনামক গায়ক এই কাব্যখানি রচনা করিয়া আসাম হইতে চালাইয়াছেন। স্বকোপল-কল্পিত অনুমানের উপর একটা অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া তিনি বৈজ্ঞানিক উপায়ে তথ্য নিরূপণের চেষ্টার একটা ভাণ করিতেছেন মাত্র—তিনি কি কোথায়ও পাইয়াছেন, অনন্তনামক একজন "গায়ক" ছিল এবং আসামে তার বাড়ী ছিল? যদিও আসামীর প্রাচীন ভাষার সঙ্গে কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের ভাষার কতকটা ঐক্য আছে, সেইরূপ ঐক্য উত্তর-বঙ্গ, পূর্ব্ব-বঙ্গ, বীরভূম প্রভৃতি জেলার ভাষার সঙ্গেও ইহার পরিদৃষ্ট হইবে। যেরূপ কথার প্রয়োগ দেখিয়া কবিকে কেহ আসামবাসী বলিয়া মনে করিতে পারেন—সেরূপ প্রয়োগ যখন তুল্যপরিমাণেই অপরাপর অঞ্চলের ভাষায়ও পাওয়া যায়, তখন বলা উচিত, কবি বঙ্গদেশের সমস্ত অঞ্চল ঘুরিয়া সেই সেই দেশের ভাষার তিল তিল গ্রহণ করিয়া এই কৃষ্ণ-কীর্ত্তনরূপ তিলোত্তমা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

একথা নিশ্চিত যে, চণ্ডীদাস চতুর্দ্দশ শতাব্দীর লোক। এই চতুর্দ্দশ শতাব্দীর ঠিক যথাযথ ভাষা যদি কেহ লিপিবদ্ধ করিতেন, তবে সেই ভাষায় বঙ্গ দেশীয় অপরাপর প্রদেশের প্রাচীন কথিতরূপ যে আধুনিক সময় হইতে অনেক বেশী পাওয়া যাইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। ৬০০ শত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গ, আসাম, উৎকল ও মিথিলার ভাষা-গর্ত ঐক্য অনেকটা বেশী ছিল, সেই ঐক্য দেখিয়া চমকিয়া যাইবার কারণ নাই, বরং সেই ঐক্যের নিদর্শন পাওয়া যাওয়াতেই পুঁথিখানি প্রামাণিক বলিয়া মনে হইবে।

বর্ত্তমান কালে প্রচলিত চণ্ডীদাসের গান, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীদাসের মহাভারত প্রভৃতি রচনা কি কেহ অবিকৃত মনে করেন? গানের ভাষা ও ফুলের মালা কেহ বাসি ব্যবহার করে

য়, উহা নিত্যই নূতন। গায়কের কণ্ঠে প্রাচীন পদের ভাষা নিত্যই নূতন হইয়া যাইতেছে, ইহাই এ দেশের রীতি; কিন্তু তাহাতে কবির কৃতিত্ব হ্রাস পায় না, "করত্তি"র স্থানে "করে" "আহ্মির" স্থানে "আমি" "তোহ্মার" স্থানে "তোমার" প্রভৃতিরূপ পরিবর্ত্তন সামান্য বেশ-পরিবর্ত্তন মাত্র। বিগ্রহ নব-কলেবর ও নব অঙ্গরাগে পৃথক দেবতা হইয়া যান না। অন্য যে সকল পদ ও কবিতা চণ্ডীদাসের নামে চলিয়া আসিয়াছে, তাহার নূতন অঙ্গরাগ হইয়াছে মাত্র, কবিকে আমরা হারাইয়া ফেলি নাই, নববস্ত্র পরাইয়া বাহির করিয়াছি মাত্র।

ইহার প্রমাণ যদি কেহ চান—তবে হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথির মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখুন। এক শত বৎসরের প্রাচীন চণ্ডীদাসের পুঁথির ভাষা হইতে দ্বিশত বৎসরের পুঁথির ভাষা কত প্রাচীন এবং শেষোক্ত পুঁথির ভাষার সহিত পূর্ব্ববঙ্গ, আসাম ও উত্তর-বঙ্গের পল্লী-ভাষার সাদৃশ্য কত বেশী!

এখন আমরা "চণ্ডীদাস" রচিত কৃষ্ণ-কীর্ত্তন নামে একখানি পুস্তক পাইয়াছি। সেই পুঁথিখানি যে অতি প্রাচীন অক্ষরে লিখিত তাহাতে সন্দেহ নাই। পুঁথিখানি আমি দেখিয়াছি, এ পর্য্যন্ত ৭।৮ হাজার বাঙ্গালা পুঁথি আমি দেখিয়াছি—তন্মধ্যে এরূপ প্রাচীন পুস্তক অতি অল্পই দেখা গিয়াছে। এই পুস্তকখানির অক্ষর দেখিয়া কোন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়াছেন, ইহার হস্তলিপি ১৩৮৫ খৃঃ অব্দের নিকটবর্ত্তী সময়ের, বরং তাহারও পূর্ব্বের, কিছুতেই তৎপরবর্ত্তী নহে। যিনি পুঁথিখানি দেখেন নাই, তিনি যদি শত শত অনুমানের বলে উহা উড়াইয়া দিতে চান, তবে তাঁহার কল্পনাশক্তির প্রশংসা ভিন্ন আমরা তাঁহার আর কোন দাবী স্বীকার করিতে পারিব না। চণ্ডীদাসের একখানি প্রাচীন পুঁথি, (যাহার হস্তলিপি বিশেষজ্ঞের মত চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পরে নহে) শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। উহার হস্তলিপি দুই কি ততোধিক লোকের হওয়াতে কিছু যায় আসে না। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, এক শতাব্দীর পুঁথির অংশবিশেষ একই কাগজে পরবর্ত্তী শতাব্দীর লোক নকল করিয়াছেন। এরূপ নকল সচরাচর অতি অল্পকালের মধ্যেই হইয়া থাকে।

কৃষ্ণকীর্ত্তনে আরও জানা যাইতেছে যে, চণ্ডীদাসের নাম অনন্ত, তিনি 'বড়ু' উপাধি ব্যবহার করিতেন, এবং বাশুলী দেবীর আজ্ঞায় পদরচনা করিতেন। চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদেই বহু পূর্ব্বে তাঁহার 'অনন্ত' নাম পাওয়া গিয়াছিল, তাঁহার 'বড়ু' উপাধি ও বাশুলীর আদেশসম্বন্ধে পাঠকবর্গের সকলেই অবশ্য অবগত আছেন। সুতরাং কবি চণ্ডীদাস ও কৃষ্ণকীর্ত্তনের রচয়িতা যে অভিন্ন ব্যক্তি, তৎসম্বন্ধে আমাদের সংশয় নাই। চণ্ডীদাসের পদগুলি যে ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা কৃষ্ণ-কীর্ত্তন-ধৃত এবং কবির প্রচলিত পদের পাঠ পাশাপাশি রাখিয়া দেখিলেই টের পাওয়া যাইবে, যথা :—

"দেখিলোঁ প্রথম নিশী   সপন সুন তোঁ বসী
সব কথা কহিআঁরো তোহ্মারে হে।
বসিআঁ কদমতলে   সে কৃষ্ণ করিল কোলে
চুম্বিল বদন আহ্মারে হে॥
এ মোর নিফল জীবন এ বাড়ায়িল।
সে কৃষ্ণ আনিআঁ দেহ মোরে হে॥
লেপিআঁ তনু চন্দনে   বুলিআঁ তবেঁ বচনে
আড় বাঁশী বাএ মধুরে।
চাহিল মোরে সুরতী   না দিলোঁ মো আন্নুমতী
দেখিলোঁ মো দুঅজ পহরে॥
তিঅজ পহর নিশী   মোঝেঁ কাহ্নাঞিঁর কোলে বসী
নেহানিলোঁ তাহার বদনে।
ঈসত বদন করি   মন মোর নিল হরী
বেআকুলী ভৈয়িলোঁ মদনে॥
চউঠ পহরে কাহ্ন   করিল অধর পান
মোর ভৈল রতিরস আশে।
দারুণ কোকিল নাদে   ভাঙ্গিল অহ্মার নিন্দে
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥"

কৃষ্ণকীর্ত্তন ৩৩৪ পৃঃ।

"প্রথম প্রহর নিশি   সুস্বপণ দেখি বসি
সব কথা কহিয়ে তোমারে।
বসিয়া কদম্বতলে   সে কানু করেছে কোলে
চুম্ব দিয়া বদন উপরে॥
অঙ্গে দিয়া চন্দন   বলে মধুর বচন
আর বায় বাঁশী সুমধুরে।
চাহিলেন সুরতি   নাহি দিল পাপমতি
দেখিল কৃষ্ণ দোজি প্রহরে।
তৃতীয় প্রহরে নিশি   মুই কৃষ্ণ কোলে বসি
নেহারিনু সে চাঁদ বদনে।
ঈষৎ হাসন করি   প্রাণ মোর নিল হরি
বিয়াকুল হইল মদনে॥

চতুর্থ প্রহরে কান, করিল অধর পান
মোর ভেল রতি আশোয়াসে।
দারুণ কোকিল নাদে ভাঙ্গিল আমার নিদে
রস গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥"
সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণ ১০১—২ পৃঃ

ভাষার সামান্য প্রভেদ ঘটিয়াছে, এই প্রভেদ না থকিলে আমরা কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের লিপির প্রাচীনতা, অন্য প্রমাণ থাকা সত্বেও, স্বীকার করিতে দ্বিধা বোধ করিতাম। এই একটি মাত্র পদই যে চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদের অনুরূপ, তাহা নহে। বিস্তর-পদে চণ্ডীদাসের পরিচিত সুর আমাদের কর্ণে বাজিয়া উঠিতেছে। সাহিত্য-পরিষদের চণ্ডীদাসের সংস্করণের পরিশিষ্টের ১০ পৃষ্ঠায় "মাকড়ের হাতে নারীকল। খাইতে সাধ, ভাঙ্গিতে নাহি বল।" এবং কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের ৭২ পৃষ্ঠায় "মাকড়ের হাতে যেহ্ন ঝুনা নারিকেল" প্রায় একরূপ। এতদ্ব্যতীত কৃষ্ণকীর্ত্তনের বহুছত্রে আমাদের চণ্ডীদাসের পরিচিত পদ মনে পড়ে যথা—

(১) "সোনা ভাঙ্গিলে আছে উপাএ, জুড়িএ আগুন তাপে।
পুরুষ নেহা ভাঙ্গিলে জুড়িএ কাহার বাপে॥ ৩৮৭ পৃঃ

(২) যে কাহ্নু লাগিআঁ মো আন না চাহিলোঁ
না মানিলোঁ লঘু গুরু জনে।
হেন মনে পড়িহাসে আহ্মা উপেখিআঁ রোষে
আন লআঁ বঞ্চে বৃন্দাবনে॥ ৩৪৪ পৃঃ

(৩) যে ডালে করোঁ মো ভরে
সে ডাল ভাঙ্গিআঁ পড়ে ৩৭২ পৃঃ

(৪) একে দহ দহ ঘসির আগুন,
আরে কে না জালে ফুকে।
জিড়ি আলিঙ্গন দিতে না পাইলোঁ
এ শাল থাকিল বুকে॥ ৩৪৯ পৃঃ

(৫) তোহ্মে জবে যোগী হৈলা সকল তেজিআঁ॥
থাকিব যোগিনী হআঁ তোহাঁক সেবিআঁ॥ ৩৬২ পৃঃ

(৬) সাগর সঙ্গম জলে।
তেজিবোঁ মো কলেবরে॥" ৩৬৮ পৃঃ

কৃষ্ণকীর্ত্তনের এইরূপ বহু স্থানে আমাদের চির-পরিচিত কবির পদের প্রতিধ্বনি কাণে বাজিয়া উঠে। এখন আমরা কৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রমাণিকতার বিরুদ্ধে সর্ব্বপ্রধান যুক্তির অবতারণা করিব।

চণ্ডীদাসকে আমরা এ পর্য্যন্ত যাহা মনে করিয়া আসিয়াছি, কৃষ্ণকীর্ত্তনে সেই ধারণা কতকটা ক্ষুন্ন হইবার কথা। তিনি প্রেমের যে উচ্চ গ্রামে সুর বাঁধিয়াছেন,—কৃষ্ণকীর্ত্তন যে তাহার অনেক নিম্নে! এ পাড়াগেঁয়ে কৃষক-কবির অকপট লালসার কথায় সে আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্য কোথায়? এ যে গ্রাম্য ব্যভিচারী প্রেমের শীলতাশূন্য আবর্জ্জনা; এখানে সে ব্যোমস্পর্শী পবিত্রতা কোথায়? চণ্ডীদাস বলিতে আমরা যে পবিত্রতা ও যুথিকাশুভ্র নির্ম্মলতা বুঝি, এখানে তাহা নাই। এ যে একান্ত স্থূল, একান্ত বিসদৃশ চিত্র-পট, আঁধারে ছিল—ভাল ছিল, চণ্ডীদাসকে যে এই কীর্ত্তন হেয়, অশ্রদ্ধেয় করিয়া দিল; তাঁহার পদাবলীর সঙ্গে এক পংক্তিতে কৃষ্ণকীর্ত্তন রাখা যায় না। তাহা হইলে যে ব্রহ্মচণ্ডাল যোগ হয়।

দ্বাদশ হইতে চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বঙ্গ ও উড়িষ্যার এক অতিশয় নৈতিক দুর্গতির দিন উপস্থিত হইয়াছিল। জয়দেবের গীত-গোবিন্দের আধ্যাত্মিকতা যাহাই থাকুক না কেন, তাঁহার রুচি প্রত্যেক পাঠকের চক্ষে পড়িবে; জীবনেও পদ্মাবতী নাম্নী এক "সেবাদাসী" তাঁহার সঙ্গিনী ছিলেন, সেক-শুভোদয় গ্রন্থে আভাস পাওয়া যায় যে, পদ্মাবতী লক্ষ্মণসেনের সভায় নৃত্য করিতেন। বনমালী দাসের জয়দেব-চরিতে স্পষ্ট লিখিত আছে, এই রমণী পুরীর মন্দিরে সমর্পিতা হইয়াছিলেন। পদ্মাবতী চরণ চারণ চক্রবর্ত্তী" পদেও দৃষ্ট হয়, ইনি নৃত্য করিতেন এবং জয়দেব তাহার তাল রক্ষা করিতেন। এই জন্যই জয়দেব "নবরসিকে"র একজন, বিবাহিত পত্নী দ্বারা সে উপাধি লাভ ঘটিত না। দ্বাদশ শতাব্দীর তাম্রশাসনগুলিতে এই ভাবের পর-রমণীর প্রতি আসক্তির জয়-গীতিকা ঘোষিত হইয়াছে। লক্ষ্মণসেন কলিঙ্গ-রমণীগণের প্রেম লাভ করিয়াছিলেন, এজন্য এক তাম্রশাসনের কবি তাঁহাকে প্রশংসা পত্র দিয়াছেন, ধোয়ীকবির পবনদূতে তিনি এই ভাবের দ্বিতীয় একখানি প্রশংসাপত্র পাইয়াছেন। এই যুগের তাম্রশাসনগুলিতে হর পার্ব্বতী বন্দনায়, তাঁহাদের হাব-ভাব ও পরস্পরের আলিঙ্গন বদ্ধ প্রেম-লীলা যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে—তাহা শীলতার অভাব ও রুচির বিকার সূচনা করিতেছে। সাহিত্য পরিষদে চিত্রশালায় হরপার্ব্বতীর সেই সময়কার একখানি বীভৎস প্রস্তরমূর্ত্তি আছে। পুরী ও কোণার্ক মন্দিরের গাত্রে ক্ষোদিত মূর্ত্তি সমূহের দিকে চাহিতে চক্ষু লজ্জায় অবনত হইয়া পড়ে। দ্বাদশ শতাব্দীতে তন্ত্রাদির বিশেষ অনুশীলনের ফলে স্ত্রীপুরুষের মধ্যে শীলতা ও সংযম অনেকটা হ্রাস পাইয়াছিল।

রাজসভায় যে ভাব-বিকার উপস্থিত হয়, সমাজের নিম্নস্তরে তাহা যখন আসিয়া পৌঁছায়,—তখন তাহা অতি বিকট হয়। সুতরাং দ্বাদশ শতাব্দীর পরে বঙ্গদেশের জনসাধারণের মধ্যে অতি ঘোর রুচিবিকার দেখা গিয়াছিল। আমার ধারণা যে, সেনবংশের পতনের পর কামরূপ ও মিথিলা এই দুই কেন্দ্র হইতে রুচির ধারা সমস্ত বঙ্গদেশে আসিয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

সেই সময় হইতে আগত এক শ্রেণীর গান আমরা রংপুর, কুচবিহার ও দিনাজপুর প্রভৃতি অঞ্চলে পাইতেছি,—তাহার নাম কৃষ্ণ-ধামালী ; ইহা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, এক শ্রেণীর নাম "আসল" ও অপর শ্রেণীর নাম "শুকুল" (শুক্ল)। "আসল" ধামালী গ্রামের বাহিরে গীত হইয়া থাকে,—তাহা এত অশ্রাব্য যে গ্রামের ভিতরে তাহা গাহিবার প্রথা নাই। এই কৃষ্ণ-ধামালীই যে বঙ্গদেশের জনসাধারণের রাধা-কৃষ্ণ প্রেমের কাহিনী শুনিবার তৃষ্ণা একসময়ে মিটাইয়া দিত, তাহাতে সন্দেহ নাই —প্রাচীন রাজবংশী জাতি এবং যোগীরা বাঙ্গালা দেশের নানা স্থানে সেই প্রাচীন গীতিকা এখনও রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন।

"আসল কৃষ্ণ ধামালী" সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার নাই। কিন্তু শুক্লা ধামালীকে সুন্দর করিয়া, সাধু-ভাষায় প্রবর্ত্তিত করিয়া, কবিত্ব-মণ্ডিত করিয়া চণ্ডীদাস কৃষ্ণ-কীর্ত্তন লিখিয়াছিলেন। যদি কৃষ্ণ-কীর্ত্তন না পাইতাম, তবে বুঝিতাম না গীত-গোবিন্দ ও কৃষ্ণ-ধামালীর পরেই হঠাৎ চণ্ডীদাসের অভ্যুদয় কি করিয়া হইয়াছিল। শ্রেষ্ঠ কবি যে যুগে জন্মগ্রহণ করেন, তাহার প্রভাব হইতে তিনি মুক্ত হইতে পারেন না। তিনি বর্ত্তমান যুগের কবি এবং ভবিষ্যৎ যুগের নির্দ্দেশক। তিনি স্বীয় যুগকে আঁকিতে যাইয়া হঠাৎ দিব্য সংজ্ঞা বলে ভাবী যুগের ছায়াপাত করেন। চণ্ডীদাস যে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার প্রভাব এড়াইবেন কিরূপে ? তিনি সে যুগের বাঙ্গালাভাষার অমার্জ্জিত রূপ, রুচি ও ইঙ্গিতকে তাহার রচনায় ব্যক্ত করিতে যাইয়া সহসা সুপ্তোত্থিতের ন্যায় ভাবী প্রেম-সাধনার যুগের আলো দেখিয়াছিলেন, সেই আলো তাহার লালসার মাথায় বজ্রাঘাত করিয়াছিল, এবং সেই আলোকপাতে "তাঁহার রাধা-বিরহ" অভিনব সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হইয়াছিল। "জন্মখণ্ড," "তাম্বূল-খণ্ড", "দানখণ্ড" "বৃন্দাবনখণ্ড"—গাহিতে গাহিতে তিনি বাগ্দেবীর কৃপায় নূতন মন্ত্র শিখিয়া ফেলিলেন। সেই মন্ত্রের মোহিনীতে "রাধা-বিরহ" আশ্চর্য্যরূপ উপাদেয় হইয়া উঠিল। এখন রামীর দুর্ল্লভ-প্রেম সেই মন্ত্রের প্রেরণা দিয়াছিল কি না তাহা ভাবিবার বিষয়।

শুধু তাহাই নহে, আমরা বারংবার জানিয়াছি যে চণ্ডীদাস বিজ্ঞ ও পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার ভ্রাতা নকুল আমাদিগকে তাহা বলিয়াছেন। নরহরি সরকার চণ্ডীদাস বন্দনায় তাঁহাকে "পরম পণ্ডিত" ও "সংগীতে গন্ধর্ব্ব" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদে সেই পাণ্ডিত্যের নিদর্শন আমরা বিশেষ কিছু পাই নাই। কৃষ্ণকীর্ত্তনে আমরা তদুচিত সুন্দর সুন্দর সংস্কৃত শ্লোক (১২৫টি) পাইতেছি, তৎকৃত গীত-গোবিন্দ ও ভাগবতের অনুবাদ পাইতেছি। সুতরাং একদিকে আমরা কৃষ্ণকীর্ত্তনে যেরূপ গ্রাম্যভাব ও ভাষার পরিচয় পাইতেছি, অপরদিকে সেইরূপ পাণ্ডিত্যের বিশেষ নিদর্শনও পাইতেছি। সেই যুগের 'কু' 'সু' বলিতে যাহা বুঝায় তাহা সেই যুগের কবির নিকট আমাদের প্রত্যাশা করাই উচিত। নতুবা গীত গোবিন্দ ও কৃষ্ণ-ধামালীর সঙ্গে

কবিবরের যোগ বুঝিতাম না। তাঁহাকে আকাশের উচ্চস্তরে গান করিতে দেখিতাম কিন্তু যে পুষ্পকরথে আরোহণ করিয়া তিনি বিমানবিহারী হইয়াছিলেন তাহার সন্ধান না পাইয়া চির-বিস্ময়েই থাকিয়া যাইতাম। চণ্ডীদাসকে এখন আমরা কৃষ্ণকীর্ত্তনের গুণে বুঝিতে পারিতেছি। ধরাতল হইতে উত্থিত হইয়া তিনি কিরূপে ধরাতলের উপরে উঠিয়াছিলেন, তাঁহার মস্তক কিরূপে গৌরবের তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ স্পর্শ করিয়াছিল—তাহা এখন পরিষ্কাররূপে দেখিতে পাইতেছি। ক্ষীণ পঙ্কিল স্রোত গায়ে ধূলি কাদা মাখিয়া পল্লীপথে যাইতে যাইতে সহসা কিরূপে সমুদ্রের মোহনায় যাইয়া ভিন্নরূপ ধারণ করে, তাহা দেখিতে পাইতেছি; পাড়াগাঁয়ের পথ দিয়া আসিয়াছে বলিয়া সে এখন আর পাড়াগাঁয়ের কেহ নহে। সে এখন অনন্তের অঙ্গ। কবি পুঁথিগত বিদ্যা লাভ করিয়া জয়দেব প্রভৃতি পূর্ব্ববর্ত্তীকবিগণের গণ্ডী ত্যাগ করিয়া গেলেন। তিনি তখন বলিলেন, "তোমাদের শাস্ত্রে বলে সূর্য্য পদ্মিনীর নায়ক, কিন্তু হিমে যখন পদ্মিনী শুকাইয়া মরে, তখন সূর্য্য সুখে থাকেন, এ কেমন ধারা প্রেম?" "তোমাদের শাস্ত্রে বলে ফুলের বঁধু ভ্রমর, কিন্তু 'না আসিলে ভ্রমর আপনি না যায় ফুল?' এ কেমন ধারা প্রেমের আদর্শ?" "শাস্ত্রে বলে, চাঁদ ও চকোর প্রণয়ী, দুইজনের পদ-মর্য্যাদা এক নহে, এরূপ অসম যুগলের মধ্যে কি প্রেম হয়?" শ্লোকে আছে জ্ঞান শাস্ত্র হইতে উৎপন্ন হয় কিন্তু জ্ঞান জন্মিলে শাস্ত্র ঝরিয়া পড়ে, যেমন ফল হওয়ার হেতু ফুল কিন্তু ফল হইলে ফুল ঝরিয়া পড়িয়া যায়। তাঁহার হৃদয়ে প্রেম জন্মিবার পরে তিনি একদিকে যেরূপ পল্লী কবির ভাব ছাড়াইয়া উঠিয়াছিলেন; পাণ্ডিত্য হইতেও তেমনি মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। প্রেম যে কত বড় জিনিস তাহা তিনি যেরূপ বুঝিয়াছিলেন অন্য কোন কবি সেরূপ বুঝিয়াছিলেন বলিয়া আমরা জানি না।

"ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছয়ে যে জন কেহ না জানয়ে তারে। প্রেমের প্রকৃতি যে জন জানয়ে সেই সে চিনয়ে তারে॥"

এই প্রেম-সাধনাই ভগবদ্ভক্তির মূলে। প্রেম অখণ্ড;—জননীর স্নেহ, জনকের আদর, পত্নীর প্রেম,—সমস্তই একই ভাবের স্ফূর্ত্তি, ইহাদের উপর বিভিন্ন নামের শিল মোহর দিয়া—ইহাদিগকে পৃথক করা প্রেম-বিজ্ঞানের অনুমোদিত নহে, এই বুঝাইবার জন্যই যেন তিনি রামীকে "পিতৃমাতৃ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। প্রণয়ী কোন কারণেই স্বীয় ভালবাসার বস্তুকে ত্যাগ করিতে পারেন না। প্রণয় করিয়া ভাঙ্গায় যে। সাধন অঙ্গ না পায় সে।" প্রেম-পাত্র যাহাই করুক না, সে কোন অবস্থায়ই ত্যাজ্য নহে। এইরূপ কথা আর কেহ বলিয়াছেন বলিয়া জানি না। তিনি মানুষ হইতে বড় দেবতা কল্পনা করিতে পারেন নাই। এইজন্য বলিয়াছেন:—"শুন হে মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ বড়, তাহার উপরে নাই।" তিনি লিখিয়াছেন—শত শত বাশুলী তাঁহাকে যে প্রেম শিখাইতে পারিতেন না, ব্রহ্মা স্বয়ং আসিয়া যে জ্ঞান দিতে পারিতেন না,—রামী তাঁহাকে তাহা দিয়াছে। বাশুলী-পূজকের মুখের উক্তি কি নির্ভীক, কি সত্য!

যদিও কৃষ্ণকীর্ত্তনের রুচি গর্হিত, ভাব গ্রাম্যতা দোষ দুষ্ট, তথাপি এই পুস্তক যিনি বিশেষ অনুধাবন করিয়া পাঠ করিবেন, তাঁহার চক্ষে পাড়াগাঁয়ের অমার্জ্জিত কিন্তু অকপট সৌন্দর্য্য উদ্ঘাটিত হইবে,—আদর্শের খর্ব্বতা তাঁহাকে সেই গ্রাম্য-রস-উপভোগ হইতে বঞ্চিত করিবে না। যে পদটি পুনঃ পুনঃ উদ্ধৃত হইয়াছে, আমরা কৃষ্ণকীর্ত্তনের মণিহারে সেই কৌস্তভটি এখানে দেখাইবার সুযোগ পরিত্যাগ করিব না। পৃথিবীর সমস্ত গীতি কবিতার করুণা ও মর্ম্মস্পর্শী ব্যাকুলতায় যেন ইহার সৃষ্টি; ঠিক এই পদের অনুরূপ পদ চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদে আছে, "কি লাগিয়া ডাকরে বাঁশী আর কিবা চাও। বাকি আছে প্রাণ আমার তাহা লৈয়া যাও।" প্রভৃতি পদের সঙ্গে মিলাইয়া কৃষ্ণকীর্ত্তনের এই শ্রেষ্ঠ পদটি পাঠ করুন।

"কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কূলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে॥
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদে মো আউলাইলোঁ রান্ধন॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা।
দাসী হঞাঁ তার পাএ নিশিবোঁ আপনা॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি চিত্তের হরিষে।
তার পাএ বড়ায়ি মোঁ কৈলোঁ কোন দোষে॥
আঝর ঝরএ মোর নয়নের পাণী।
বাঁশীর শবদেঁ বড়ায়ি হারায়িলোঁ পরাণী॥

সেই বংশীধর আনন্দস্বরূপ, তিনি নিজের আনন্দে গান করিতেছেন তাঁহার সেই বাঁশীর স্বরে আমার কুল মান তাঁহার পদে বিকাইয়া দিয়াছি। আমার সাধ হইতেছে তাঁহার পদে নিজকে নিছিয়া ফেলিয়া দাসী হইয়া থাকি। সেই সুর শুনিয়া চোখের জল দিনরাত্রি পড়িতেছে। বড়াই, তুমি বল তিনি কে, আমি তাঁর পদে কি অপরাধ করিয়াছি যে তিনি আমাকে মধুর আহ্বানে যেন চুলের মুঠি ধরিয়া গৃহ হইতে পথে বাহির করিতেছেন?

কৃষ্ণকীর্ত্তনের পুঁথিখানি যে বিশেষ প্রামাণিক তাহার একটি নিদর্শন এই যে বহু প্রাচীন কাল হইতে ইহা বিষ্ণুপুর রাজ লাইব্রেরীতে রক্ষিত ছিল। ইহা সকলেই জানেন যে বিষ্ণুপুর বৈষ্ণবদের একটা বড় কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। বহু বৈষ্ণব পণ্ডিত সেই রাজসভায় থাকিতেন, তাঁহারা কোন জাল বৈষ্ণব-পুঁথি সেই লাইব্রেরীতে কখনই স্থান দিতে সম্মত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে করা যায় না। চণ্ডীদাসের সম-সাময়িক হস্ত-লিপি মনে করিয়াই সম্ভবতঃ বীর হাম্বীর কি তৎপরবর্ত্তী কোন রাজা উহা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। চণ্ডীদাসের সময় হইতে দুই শত বৎসরের মধ্যে কবির কীর্ত্তি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে কোন ভুল ধারণা থাকিবার সম্ভাবনা ছিল না।

চণ্ডীদাসের অপরাপর পদের তুলনায় যদি এই কৃষ্ণ-কীর্ত্তন সাধারণতঃ হীন বলিয়াও প্রতিপন্ন হয়, তাহাতেও উহা অবিশ্বাস্য বলিবার কোন কারণ নাই। যে হোমারের অমর কীর্ত্তি ইলিয়ডের যশঃ-প্রভায় সমস্ত য়ুরোপ আলোকিত, তিনি বাল্যকালে ভেকের গল্প লিখিয়াছিলেন। যিনি চাইল্ড হেরল্ড ও ডন জুয়ান লিখিয়া স্কটের যশঃ-প্রভা স্বীয় প্রতিভা-চন্দ্রের নিকট শুক্রতারার মত মলিন করিয়া দিয়াছিলেন, তিনি বাল্যে "আলস্যের অবসর" (Hours of Idleness) কাব্য লিখিয়া সমালোচকের কষাঘাত খাইয়াছিলেন। স্বয়ং রাম-প্রসাদ, যাঁহার ধর্ম্ম-সংগীত হরিদ্বারের গঙ্গার ন্যায় পবিত্র, বাল্যে বিদ্যাসুন্দরের পঙ্কে ডুবিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বাল্যে যে প্রেমিক-যুগল সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র কাব্য লিখিয়াছিলেন, তাহা ও বিষবৃক্ষ একই হস্তের দান বলিয়া কাহার মনে হইবে ?

কেহ কেহ কৃষ্ণ-কীর্ত্তনকে খাঁটি বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার আগ্রহে তাহার সমস্ত প্রচলিত পদগুলি জাল বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। প্রচলিত পদের মধ্যে কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের পদ বেশী পাওয়া যায় না, সুতরাং কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের বাহিরে চণ্ডীদাসের পদ বলিয়া যাহা কিছু পাওয়া গিয়াছে তাহা অবিশ্বাস্য, রামীর সঙ্গে তাঁহার প্রেম উপকথা, উহাতে কোন সত্য নাই,—এই ভাবের উক্তি হইতে বিস্ময়কর যুক্তি আর কি হইতে পারে ? ভারতবর্ষের মানচিত্রে যদি কামস্কট্‌কা না থাকে, তবে কামস্কট্‌কার অস্তিত্ব স্বীকার করা অসম্ভব, এ যুক্তি কতকটা সেইরূপ। নরহরি সরকার সম্ভবতঃ ১৪৬৫ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তিনি চণ্ডীদাসের ধুবনীর প্রেমকাহিনীর উল্লেখ করিয়াছেন। চৈতন্যপ্রভুর সময়ে চণ্ডীদাসের পদ সমস্ত বঙ্গদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, কারণ তিনি উহা দিনরাত্র শুনিতেন; নরহরি সরকার স্বয়ং লিখিয়াছেন তাঁহার সময়ে অর্থাৎ চৈতন্যের শৈশবাবস্থায় এই সমস্ত গান বিশ্বব্যাপক হইয়াছিল। সেই সময় হইতেই বৈষ্ণবেরা এই সকল পদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন ৪৫০ বৎসরের নজির পাওয়া গেল। চৈতন্যদেব প্রমুখ সকলেই কি চণ্ডীদাসের জাল কবিতা শুনিয়া অভ্যস্ত ছিলেন ? কারণ চৈতন্য-প্রভুর প্রিয় গানগুলিই পরবর্ত্তী বৈষ্ণব সংগ্রহ গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। এই গুলিকে এখন "জাল" বলা হইতেছে। যাঁহারা বলেন চণ্ডীদাস একাধিক ছিলেন, তাঁহাদের কথা বরং কতকটা সত্য হইতে পারে।

চণ্ডীদাসের মৃত্যুসম্বন্ধে আমরা বহুপূর্ব্বে বীরভূম জেলায় প্রচলিত একটি প্রবাদের উল্লেখ করিয়াছিলাম, তাহা শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের ভূমিকায় উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। প্রবাদটি এই,—

"নান্নুরে বাশুলীমন্দিরের নিকটে যে ভগ্নগৃহের চিহ্নাদি সহ স্তূপ পড়িয়া আছে, সেখানে নাট্যশালা ছিল। স্থানীয় প্রবাদ এই যে চণ্ডীদাস তাঁহার ভুবনবিজয়ী কীর্ত্তনের দল সহ সেই নাট্যশালায়ই সমাহিত হন। সে প্রবাদ বড় শোকাবহ। সন্নিকটবর্ত্তী পরগণার নবাব তাঁহার প্রাসাদে চণ্ডীদাসকে আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান; দুর্ভাগ্যক্রমে চণ্ডীদাসের ভক্তিপ্রেমের বিজয়-মন্ত্র, তাঁহার অপূর্ব্ব পদাবলী

যখন তাঁহার কণ্ঠে নিনাদিত হইতে লাগিল, তখন সেই উন্মাদনায় নবাব সাহেবের বেগম একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন; তিনি চণ্ডীদাসের গান শুনিতে ছদ্মবেশে পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিতেন। নবাব কোন ক্রমেই বেগম সাহেবাকে শাসন করিতে পারিলেন না। চণ্ডীদাসের সুর সত্যই তাঁহার কাণের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করিয়াছিল, সেই মর্ম্ম-প্রবেশী সংগীত তাঁহার লজ্জা ভয় দূর করিয়া দিয়াছিল।

নবাবের ক্রোধ জাগিয়া উঠিল। একদিন যখন নান্নুরের নাট্যশালা চণ্ডীদাসের কীর্ত্তনানন্দে মুখরিত হইতেছিল, তখন সহসা সেই প্রেম স্নিগ্ধ নিকেতন নবাব-সৈন্যের কামানের শব্দে কাঁপিয়া উঠিল। কামানের গোলায় নাট্যশালা পড়িয়া গেল। বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি—মর্ত্ত্যধামে স্বর্গের গায়ক তাঁহার দল সহ বিদীর্ণ মন্দিরের নীচে জীবন্ত সমাধিপ্রাপ্ত হইলেন।"

কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভূমিকা ২৭ পৃঃ।

সুখের বিষয় চণ্ডীদাসের মৃত্যু সম্বন্ধে প্রায় দুই শত বৎসরের প্রাচীন হস্তলিপি সম্বলিত একটি প্রমাণ বসন্তবাবু সম্প্রতি আবিষ্কার করিয়াছেন। তাহা রামীর রচিত একটি গীতিকা কবিতাটি সাহিত্যপরিষদের পুস্তকাগারে আছে এবং উহা মৎকথিত উক্তপ্রবাদকে অনেকাংশে সমর্থন করিতেছে। এই পদটি আমরা রামীর রচনার উদাহরণ স্বরূপ অন্যত্র উদ্ধৃত করিলাম। ইহাতে জানা যায় চণ্ডীদাস গৌড়ের নবাবের রাজসভায় গান গাহিতে অনুরুদ্ধ হইয়া তথায় গমন করেন। সেই গানে বেগম মুগ্ধ হইয়া যান এবং চণ্ডীদাসের গুণের অনুরাগিনী হন। নবাবের নিকট তিনি নির্ভীকভাবে এই কথা স্বীকার করেন। নবাবের আদেশে চণ্ডীদাস হস্তীপৃষ্ঠে আবদ্ধ হইয়া দারুণ কষাঘাতে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার আত্মীয় বন্ধুবর্গের সমক্ষে এইরূপ কষাঘাত করিয়া তাঁহার প্রাণহননের দণ্ডাজ্ঞা ছিল; সুতরাং রামী ও বেগম সকলেই কবির এই শোচনীয় পরিণাম দেখিয়াছিলেন। চণ্ডীদাস মৃত্যুকালে সমস্ত শারীরিক যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও রামীর দিকে দুইটি নিশ্চল চক্ষুর দৃষ্টি আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন। বেগম এই দৃশ্য দর্শন করিয়া মূর্চ্ছিতা হন। সেই মূর্চ্ছা তাঁহার ভঙ্গ হইল না। বেগমের মৃত্যুতে রামীর হৃদয় শ্রদ্ধাতে পূর্ণ হইয়া উঠিল, এবং তিনি মৃতদেহের পদযুগল স্পর্শ করিয়া শোক প্রকাশ করিলেন।

এই অপূর্ব্ব শোক-গীতিকা হইতে ইহাও জানা যায় যে চণ্ডীদাসও বেগমের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিলেন। রামী অনুযোগ দিয়া বলিতেছে, "বাশুলী তোমায় শুধু আমাকে ভালবাসিতে বলিয়াছিলেন, তুমি তাহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে কেন।"

বোধ হয় ক্রুদ্ধ নবাব কর্ত্তৃক প্রবাদোক্ত বাশুলী মন্দির ধ্বংস পরে সাধিত হইয়াছিল।

একটি দেশব্যাপী জনশ্রুতি যখন দুই শত বৎসরের প্রাচীন হস্তলিপিসম্বলিত প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হইতেছে, তখন তাহা আমরা ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধা দেখিতেছি না।

রাণী বাদ্‌সাহকে বলিয়াছিলেন—"যাঁহার সুস্বরে ভুবন মুগ্ধ—যিনি প্রেমের মূর্ত্তিমান বিগ্রহস্বরূপ, তাঁহাকে সামান্য মানুষ মনে করিও না, তাঁহাকে বিনষ্ট করিলে পৃথিবীতে এ লজ্জা রাখিতে পারিবে না।" রামী বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি রাজ-পাটে বসিয়াও প্রেমের আস্বাদ পায় নাই, তাহার জীবন নিরর্থক।" কবির এই দুই প্রেমিকার কণ্ঠের ধিক্কার বাণী আজ সমস্ত বাঙ্গালী জাতি গৌড়ের বাদশাহের প্রতি প্রয়োগ করিবেন এবং বাঙ্গালার ইতিহাস-লক্ষ্মী যদি সেই সম্রাটের নামটি একবার বলিয়া দেন, তবে আমরা তাঁহার নামাঙ্কিত মুদ্রা পঞ্চগব্যে শোধন করিয়া গৃহে স্থান দিব।

রামীর পদ।

প্রাচীন একখানি পদসংগ্রহ-পুস্তকে চণ্ডীদাসের প্রীতি ও কবিত্বের মূল প্রস্রবণস্বরূপ রজকিনী রামীর পদপ্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। রামীর ভণিতাযুক্ত পদ আমরা চণ্ডীদাস-রচিত বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না, কিন্তু নিম্নোদ্ধৃত দুইটি পদের সারল্য ও সরসতা চণ্ডীদাস কবিরই যোগ্য বটে।

(১) "কোথা যাও ওহে, প্রাণ-বঁধু মোর, দাসীরে উপেক্ষা করি।
না দেখিয়া মুখ, ফাটে মোরবুক, ধৈরজ ধরিতে নারি॥
বাল্যকাল হতে, এ দেহ সঁপিনু, মনে আন নাহি জানি।
কি দোষ পাইয়া, মথুরা যাইবে, বল হে সে কথা শুনি॥
তোমার এ সারথি, ক্রুর অতিশয়, বোধ বিচার নাই।
বোধ থাকিলে, দুঃখ-সিন্ধু-নীরে, অবলা ভাসাইতে নাই॥
পিরীতি জ্বালিয়া, যদিবা যাইবা, কবে বা আসিবে নাথ।
রামীর বচন, করহ শ্রবণ, দাসীরে করহ সাথ॥"

(২) "তুমি দিবাভাগে, লীলা অনুরাগে, ভ্রম সদা বনে বনে।
তাহে তব মুখ, না দেখিয়া দুঃখ, পাই বহু ক্ষণে ক্ষণে॥
ত্রুটি সমকাল, মানি সুজঞ্জাল, যুগ তুল্য হয় জ্ঞান।
তোমার বিরহে, মন স্থির নহে, ব্যাকুলিত হয় প্রাণ॥
কুটিল কুন্তল, কত সুনির্ম্মল, শ্রীমুখমণ্ডলশোভা।
হেরি হয় মনে, এ দুই নয়নে, নিমেষ দিয়াছে কেবা।
যাহে সর্ব্বক্ষণ, হয় দরশন, নিবারণ সেহ করে।
ওহে প্রাণাধিক, কি কব অধিক, দোষ দিয়ে বিধাতারে॥
তুমি সে আমার, আমি সে তোমার, সুহৃৎ কে আছে আর।
খেদে রামী কয়, চণ্ডীদাস বিনা জগৎ দেখি আঁধার॥"

রামীর পদ দুইটীর মধ্যে আমরা একটুকু আধ্যাত্মিকত্ব খুঁজিয়া বাহির করিব,—প্রথম পদে "মথুরা যাইবে" পদটির অর্থ "সমাজে উঠা" ও "তোমার সারথি ক্রুর অতিশয়" পদে অক্রুরের নামে নকুল-ঠাকুরের হৃদয়হীনতার উপর রোষ প্রকাশ পাইয়াছে। দিবাভাগে রামী চণ্ডীদাসের প্রীতিপ্রফুল্ল মুখখানি দেখিবার সুবিধা পাইতেন না, দ্বিতীয় পদটিতে তজ্জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু এই দুইটি পদ রামীর বিরচিত কি না সে সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ হইতে পারি নাই। দ্বিতীয় পদটীতে চক্ষের নিমেষ থাকার সম্বন্ধে যে আক্ষেপ করা হইয়াছে, তাহা চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি বিবিধ পুস্তকে বর্ণিত চক্ষুসম্বন্ধে আক্ষেপোক্তির একটী প্রতিধ্বনির মত শুনায়। সুতরাং এই রচনা চণ্ডীদাসের বহু পরবর্ত্তী বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু চৈতন্যচরিতামৃত-ধৃত পদটির ভাব হয়তঃ বহু পূর্ব্ব হইতে বাঙ্গলার পল্লী-গাথায় বিদ্যমান ছিল। রামী ধোপানীকে বঙ্গদেশের সর্ব্বপ্রথম স্ত্রী-কবি বলিয়া গ্রহণ করার পূর্ব্বে কতকটা আলোচনার প্রয়োজন] (১)

(৩) চণ্ডীদাসের মৃত্যু।

কাঁহা গেয়ো বন্ধু চণ্ডিদাস।

চাতকি পিয়াসীগণ   না পাইআ বরিসণ

নআমের সাগরে পিয়াস॥

কি করিল রাজা গৌড়েশ্বর।

না জানিঞা প্রেম লেহ   বেথাই ধরিস দেহ

বধ কৈলে প্রাণের দোসর॥

যেমে বা সভাতে কৈলে গান।

স্বর্গ মর্ত্ত (২) পাতালপুর   আবির্ভূত পশু নর

রাজিনীর না রহিল মান॥

গান শুনি পাচ্ছ্যার (৩) বেগম

রাজারে কহে জানিঞা মরম॥

রাণি মনঃ কথা রাখিতে নারিল।

চণ্ডিদাস সঙ্গে প্রিত   করিতে হইল চিত

তার প্রিতে আপন খুয়াল্যা॥

---

(১) কিন্তু চণ্ডীদাসের মৃত্যুর কাহিনীর সুপ্রাচীন পাণ্ডুলিপিতে রামীর ভণিতা পাইয়া আমাদের মনে হইয়াছে এই পদ দু'টীও তাঁহারই রচনা।

(২) মর্ত্ত—মর্ত্ত্য। (৩) পাচ্ছ্যার—পাৎসাহের।

রাজা কহে মন্ত্রিরে ডাকিয়া।
তরাণিত হস্থি আনি পিঠে পেলি (১) বান্ধ টানি
পিষ্ঠ খুদে বৈরী ছাড় গিয়া। (২)
আমি অনাথিনী নারী মাধবির ডালে ধরি
উচ্চস্বরে ডাকি প্রাণনাথ।
হস্থি চলে অতি জোরে ভালন্তে (৩) না দেখি তোরে
মাথাএ পড়িল বজ্রাঘাত॥
রাণি কহে ছাড়িয়া না যায়। (৪)
কহিতে কহিতে প্রাণ আর দেহ সমাধান
দুঁহ প্রাণ একত্রে মীলায়॥১॥
সুন প্রিয় রজকিনি আসকে হারালঙ প্রাণী
এবার তরাবে তুমি মোরে।
বেগম সহিত লেহ হা নাথ থুয়ালে দেহ
প্রাণে মাল্য (৫) এ রাজা গুঁয়ারে (৬)।
আসকে লভিত প্রাণ তখনি করিলে গান
কেমনে জানিব হেন হবে।
বৈরি শত ডংসে (৭) গায় চেতন পাইএ তায়
তোমারে ডাকিএ আস্তাভাবে।
এই করি আস মনে উদ্ধারিবে পতিত জনে
তবে সে দুর্লভ মানি প্রীত।
নতুবা ফুরাল্য দায় বৈরি চোটে প্রাণ জায়
কে আর করিবে মোর হীত
কান্দি কহে চণ্ডিদাস দস দসার আস
পুন্‌ কর রজক কুমারি।
নহিলে একলা জাই সঙ্গে মোর কেহ নাই
কাছে রান্ত তবে প্রাণে মরি॥২॥

---

(১) পেলি—ফেলি। (২) পৃষ্ঠদেশ বিদীর্ণ করিয়া শত্রুকে বধ কর। (৩) ভালন্তে—ভাল করিয়া। (৪) জায়—যেও। (৫) মাল্য—মরিল। (৬) গুঁয়ারে—নিষ্ঠুর। (৭) ডংসে—দংশে।

সুন বন্ধু চণ্ডিদাস দুখিনিরে সঙ্গে করি লেহ ।ধ্রু।

চঞ্চল সভাব তোর চিত্ত

সভাতে গাইলে গীত

মনের মরম করি সার।

অনুরাগে কি না করিলে ফুৎকার।

পাতি হাট বসাত্যে না দিলে।

আসক আনলে পড়াইলে ॥

বৈরি কাটে তোমার গায়।

তুমি সে আনন্দ বাস তায় ॥

মোর অঙ্গ সব ক্ষেতি হৈল।

রুধিরে বসন ভিজ্যা গেল ॥

পরসিত এ জনার মন।

কতেক করাছ কদর্থন (১) ॥

রামি কহে যদি সঙ্গে নিবে।

তুরিতে পরাণ তেজ তবে ।৩।

সুন প্রাননাথ চণ্ডিদাস তার নির্ব্বন্ধন।

দৈবের কর্ম্মফাঁস না যায় খণ্ডন ॥

ছাড়ি পরিবার মোর সঙ্গ কর

সভারে কহিলে সত্য।

বাহুলি বচন না কৈলে সওরণ

তাহাতে মজ্যাল্যে চিত্ত ॥

আমা মুখ চাঞা গজপিষ্টে সুঞ্যা

রয়্যাছ বন্ধন পাকে।

রাজা গৌড়েশ্বর দুষ্ট কলেবর

কেহ না বুঝাল তাকে।

নাথ আমি সে রজকবালা।

আমার বচন না সুনে রাজন

বুঝিল কৃষ্ণের লীলা।

দুষ্ট কলেবর হইল জর্জ্জর

দারুণ সকার ঘাতে।

---

(১) কদর্থন—কষ্ট।

এ দুখ দেখিয়া বিদরএ হিয়া
অভাগিরে লেহ সাথে॥
কহেন রামিণী শুন গুনমনি
জানিলাও তোমার রীতি।
বাশুলি বচন, করিলে লংঘন
দুনহ রসিক পতি॥৯॥
পাছে র বেগম কয়।
সুন মহিনাথ মহাশয়॥
তুমি অবলার বচন রাখ।
রসিক মণ্ডল দেখ॥
আমি সে অবলা নারি।
তোমারে কহিএ বিনয় করি॥
জোড় করে কহে রামি।
সুন নৃপ চূড়ামণি।
সুন রসের স্বরূপ সে
কেন বিনাস করহ তাহার দে।
সে সামান্ত মানুস নহে।
রতি স্থিতি তার দেহে।
জাহার সুস্বর গানে।
বিন্ধিল আমার প্রাণে॥
কেন কৈলে এমন কাজ।
ভুবনে রাখিলে লাজ
রাজা হে জবন জাতি।
কি জানে রসের গতি।
চণ্ডিদাস করি ধ্যান।
বেগম তেজিল প্রাণ।
সুনি শ্রস্তা (১) ধবিনি (২) ধায়
পড়িল বেগম পায়॥৫॥

একখানি পাতা। উপকরণ—তুলোট কাগজ। আকার, ১৫$\frac{১}{২}$×৫ ইঞ্চি। প্রতি পৃষ্ঠায় ১১ পংক্তি, অক্ষর প্রাচীন। সাহিত্য-পরিষৎ পুস্তকাগারে রক্ষিত।

(১) শ্রস্তা—ত্রস্তভাবে। (২) ধবিনী—ধুবসী, রজক কন্যা।

গৌড়ের এই সম্রাট কে? আমার মনে হয়, রাজা গণেশের পুত্র যদু (জালালুদ্দিন) ই চণ্ডীদাস হত্যার কুপ্রতিষ্ঠার দাবী করিতেছেন। তিনি স্বধর্ম্মত্যাগী ও স্বজাতি দ্রোহী। বিশেষ তাঁহার অন্দর মহলে অনেক হিন্দু বেগম ছিলেন, তাঁহারা যদিওবা স্বামীর সঙ্গে ধর্ম্মত্যাগ করিয়া থাকেন, রাধাকৃষ্ণের লীলা বিষয়ক সংগীতের অনুরাগিণী হওয়া তাঁহাদের মধ্যে কোন একটিরই হওয়া স্বাভাবিক। অন্ততঃ খাঁটি মুসলমান রমণী হইতে তাঁহাদেরই হিন্দুগানের সমজদার হওয়ার অধিকতর সম্ভাবনা। জালালুদ্দিনের রাজত্বকালও চণ্ডীদাসের সমসাময়িক।

গ। বিদ্যাপতিঠাকুর।

মৈথিলী কবি বিদ্যাপতিঠাকুর ব্রাহ্মণবংশীয় ছিলেন। ইঁহাদের গাঞি 'বিষয়িবারবিস্ফী', সুতরাং বিদ্যাপতিঠাকুরের পূর্ণ নামটি একটুকু অদ্ভুত ও জাঁকালো রকমের—'বিষয়ীবারবিস্ফী বিদ্যাপতিঠাকুর' মহারাজ শিবসিংহের সভাসদ পণ্ডিত এবং চণ্ডীদাস ঠাকুরের সমসাময়িক কবি ছিলেন। শুভ বসন্তকালে গঙ্গাতীরে এই দুই কবির সম্মিলন হইয়াছিল, তদুপলক্ষে অনেক বৈষ্ণব কবি পদ লিখিয়া গিয়াছেন।

বিদ্যাপতির পরিচয়।

মহারাজ শিবসিংহ বিদ্যাপতিঠাকুরকে 'বিস্ফী' নামক গ্রামখানি প্রদান করিয়াছিলেন। এই গ্রাম মিথিলা সীতামারি মহকুমার অধীন জারৈল পরগণার মধ্যে কমলা নদীর তীরে অবস্থিত। এখন আর তদ্বংশীয়েরা কেহ সেখানে নাই, চারি পুরুষ ধরিয়া তাঁহারা সৌরাটি নামক অপর একখানি গ্রামে বাস করিতেছেন। কবির বংশধর বনমালী ও বদরীনাথ এখন বিদ্যমান আছেন।

বিদ্যাপতির পূর্ব্বপুরুষগণ সকলেই বিদ্বান্ ও যশস্বী ছিলেন। মহারাজ গণেশ্বরের পরম সুহৃৎ গণপতিঠাকুর তৎপ্রণীত প্রশংসিত গ্রন্থ "গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী"র ফল মৃত সুহৃদের পারত্রিক মঙ্গলের জন্য উৎসর্গ করেন। এই গণপতিঠাকুর * বিদ্যাপতির পিতা। কবির

পূর্ব্বপুরুষগণের খ্যাতি

---

* "জনমদাতা মোর, গণপতি ঠাকুর
মৈথিলী দেশে কর' বাস।
পঞ্চ গৌড়াধিপ শিবসিংহ ভূপ,
কৃপা করি লেউ নিজ পাশ॥
বিসফি গ্রাম দান করল মুঝে,
রহতহি রাজ সন্নিধান।
লছিমা চরণ ধ্যানে, কবিতা নিকশয়ে,
বিদ্যাপতি ইহ ভাণ॥"

পদসমুদ্র।

পিতামহ জয়দত্ত সংস্কৃত শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ও পরম ধার্ম্মিক ছিলেন, এজন্য তিনি 'যোগীশ্বর' আখ্যা প্রাপ্ত হন। জয়দত্তের পিতা বীরেশ্বর স্বীয় পাণ্ডিত্যগুণে মিথিলারাজ কামেশ্বরের নিকট হইতে বিশেষ বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন। এই বীরেশ্বরপ্রণীত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'বীরেশ্বরপদ্ধতি' অনুসারে মিথিলার ব্রাহ্মণেরা আজিও তাঁহাদের 'দশকর্ম্ম' করিয়া থাকেন। বিদ্যাপতির খুল্লপিতামহ চণ্ডেশ্বর মহারাজ হরিসিংহদেবের মন্ত্রী ছিলেন। চণ্ডেশ্বর ধর্ম্মশাস্ত্রে সাতখানি রত্নাকরকর্ত্তা এবং তাঁহার উপাধি ছিল "মহামত্তক সান্ধিবিগ্রহিক"। এই বংশের আর একটি গৌরব এই যে, বিদ্যাপতির ঊর্দ্ধতন ষষ্ঠ স্থানীয় পূর্ব্বপুরুষ ধর্ম্মাদিত্য (কাব্যবিশারদ মহাশয়ের মতে কর্ম্মাদিত্য) হইতেই সকলেই রাজমন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়।

কবীর গ্রন্থাবলী।

মহারাজ শিবসিংহের আদেশে বিদ্যাপতি সংস্কৃতে 'পুরুষ-পরীক্ষা' নামক পুস্তক রচনা করেন। এই গ্রন্থে তিনি শিবসিংহকে পরমশৈব এবং কৃষ্ণবর্ণ দেহবিশিষ্ট বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইঁহার পূর্ণ নাম 'রূপনারায়ণপদাঙ্কিত মহারাজা শিবসিংহ।' রাজ্ঞী বিশ্বাসদেবীর আজ্ঞাক্রমে তিনি 'শৈবসর্ব্বস্বহার' ও 'গঙ্গাবাক্যাবলী' নামক দুইখানি সংস্কৃত পুস্তক রচনা করেন। মহারাজ কীর্ত্তিকসিংহের আদেশে তৎকর্ত্তৃক 'কীর্ত্তিলতা' গ্রন্থ বিরচিত হয়। তাঁহার সর্ব্বশেষ সংস্কৃত গ্রন্থ 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী' ভৈরবসিংহ মহারাজের (হরিনারায়ণ) রাজত্ব সময়ে যুবরাজ রামভদ্রের (রূপনারায়ণ) উৎসাহে বিরচিত হয়।* পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থগুলি ছাড়া তিনি 'দানবাক্যাবলী' ও 'বিভাগসার' নামক দুইখানি স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ মহারাজ শিবসিংহ হইতে বিদ্যাপতি 'কবিকণ্ঠহার' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। †

কলি সম্বন্ধে তর্ক।

বিদ্যাপতির বিস্ফী গ্রাম প্রাপ্তিজ্ঞাপক তাম্রলিপি ও মিথিলার রাজপঞ্জীর তারিখ সমন্বয় করিতে গেলে নানারূপ গোলযোগে পড়িতে হয়। ভূমিদানপত্রের কাল ১৪০০ খৃঃ (২৯৩ ল-সং)। রাজপঞ্জী হিসাবে শিবসিংহের সিংহাসন প্রাপ্তির সময় ১৪৪৬ খৃঃ। সুতরাং শিবসিংহকে রাজা হওয়ার ৪৬ বৎসর পূর্ব্বে ভূমিদান করিতে হয়,

---

* দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণীর ভূমিকায় "বস্তি" স্থলে "অস্তি" পাঠ ধরিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন উক্ত পুস্তক নরসিংহদেবের রাজত্বকালে রচিত হইয়াছিল।

† "ভণহি বিদ্যাপতি কবিকণ্ঠহার।
কোটি হুঁন ঘটব দিবস অভিসার।"

Grierson's Maithil Songs, A. S. J Extra No. 193.

কেহ কেহ বলেন তাঁহার উপাধি 'কবিরঞ্জন' ছিল,—"চণ্ডীদাস কবিরঞ্জনে মিলল" ও "পুছত চণ্ডীদাস কবিরঞ্জনে" প্রভৃতি পদ দৃষ্টে সেরূপও বোধ হয়।



মথুরা যাত্রা

অথচ ভূমিদানপত্রে তিনি "দিগ্বিজয়ী মহারাজাধিরাজ' বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। ভূমিদানকালে বিদ্যাপতির বয়স ২০ বৎসর মাত্র কল্পনা করিতে হয়,—তদূর্দ্ধ বয়স স্থির করিলে বিদ্যাপতির জীবনী ১২৫ বৎসরেও অনেক বেশী হইয়া পড়ে। ২০ বৎসর বয়স্ক বালক, ভূমিদান-পত্রে 'মহাপণ্ডিত' এবং 'নবজয়দেব' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন, দেখা যায়। এরূপ নবযুবককে বিশিষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিয়া মহারাজ শিবসিংহ তাঁহাকে একখানি বড় গ্রাম দান করিবেন—ইহাও একটি অদ্ভুত অনুমান। ২০ বৎসর বয়সে (১৪০০ খৃঃ) কবি বিদ্যাপতি 'মহাপণ্ডিত' উপাধি এবং বিস্ফী গ্রাম দান পাইয়াছিলেন, মানিয়া লইলেও ১২৭ বৎসর বয়ঃক্রমে (ভৈরব সিংহের রাজত্ব ১৫০৬-১৫২৭ খৃঃ) তাঁহাকে 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী' লিখিতে হয়। আর কাব্যবিশারদ মহাশয়ের মতানুসারে ঐ পুস্তক নরসিংহদেবের রাজত্বকালে লিখিত হইয়াছিল, স্বীকার করিলেও কবিকে অন্যূন ৯৬ বৎসর বয়সে 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী' প্রণয়ন করিতে হয়। বিদ্যাপতির কবিতায় শেষোক্ত রাজার নাম দেখিলেই তাঁহার রাজত্বকালে বিদ্যাপতি লিখিয়াছিলেন এরূপ অনুমান করিবারও যথেষ্ট কারণ নাই, যেহেতু রাজা হইবার বহু পূর্ব্বে নরসিংহদেব যুবরাজ অবস্থায় কবির সহিত সৌহার্দ্দ্য-সূত্রে আবদ্ধ থাকিতে পারেন। এরূপ বৃদ্ধ বয়সে কাব্য লিখিবার সামর্থ কচিৎ দৃষ্ট হয়; বিস্ফী গ্রাম দানকালে কবির অন্যূন ২০ বৎসর বয়স এবং 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী' রচনার সময়ে তাঁহার অন্যূন ৯৬ বৎসর বয়স্ক—দুই কষ্টকল্পিত "অন্যূনের" সাহায্যেও এই জটিল প্রশ্নের বিশ্বাসযোগ্য উত্তর প্রাপ্ত হওয়া গেল না।

ভূমিদানপত্রের সঙ্গে রাজসভার পঞ্জীর ঐক্য স্থাপন করিতে ইচ্ছুক লেখকগণ ইতিহাসের ছিন্ন পৃষ্ঠায় এইরূপ কয়েকটি বড় রকমের তালি দিয়াছেন।

এখন ভূমিদানপত্র ও রাজপঞ্জী ইহাদের কোনটি কিংবা উভয়ই অবিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হইতেছে। ভূমিদানপত্র সম্বন্ধে বহুদিন হইল শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় লিখিয়াছিলেন :—

ভূমিদানপত্রের সত্যতা।

"এই সনন্দে যে কেবল লক্ষ্মণাব্দের উল্লেখ আছে এমন নহে, সনন্দের অন্তভাগে আরও ৩টী অব্দ লিখিত হইয়াছে, যথা—সন (হিজরি) ৮০০। সম্বৎ ১৪৫৫। শাকে ১৩২১। আমরা প্রাচীন হিন্দু রাজাগণের অনেকগুলি সনন্দ দর্শন করিয়াছি। কিন্তু এরূপ ৪টী অব্দ কোনও সনন্দে ব্যবহৃত দেখি নাই। প্রাচীন নির্ম্মল হিন্দুহৃদয় এতদূর সতর্ক ছিল না। সনন্দের সময়াবধারণ কালে কতদূর কষ্ট ভোগ করিতে হয়, তাহা পুরাতত্ত্ববিদ্ পাঠকগণ বিশেষরূপে জ্ঞাত আছেন। কারণ কোন সনন্দে একাধিক অব্দ লিখিত হয় নাই এবং সেই অব্দ যে কোন রাজার প্রচলিত তাহা প্রায় স্থিররূপে লেখা হয় নাই, কিন্তু এ সনন্দে স্পষ্টাক্ষরে লক্ষ্মণাব্দ, হিজরি সন, বিক্রমসম্বৎ, শালিবাহন শকাব্দ অত্যন্ত সতর্কতার সহিত উল্লিখিত দৃষ্ট হয়। এবম্প্রকার নানা কারণে এই সনন্দের সত্যতা সম্বন্ধে আমাদের বিলক্ষণ সন্দেহ হইয়াছে।" *

* ভারতী ১২৮৯, আশ্বিন।

অল্পদিন গত হইল শ্রীযুক্ত গ্রিয়ার্সন্ সাহেব ভূমিদানপত্রখানি জাল প্রতিপন্ন করিয়া এশিয়াটিক্ সোসাইটিতে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন, তাঁহার যুক্তি অকাট্য বলিয়া মনে হয়। তিনি বলেন, এই ভূমিদানপত্রে যে সন প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা আকবর এতদ্দেশে প্রচলিত করেন। আইন-আকবরী প্রভৃতি পুস্তকে তাহা নির্দ্দিষ্ট আছে এবং এ কথা সর্ব্ববাদিসম্মত। ভূমিদানপত্রের তারিখ আকবরের অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী, অথচ তাহাতে সেই অব্দ প্রদত্ত হইয়াছে, ইহাতে এই তাম্রলিপির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ দৃঢ়বদ্ধ হইতেছে। দ্বিতীয়তঃ তাম্রলিপির অক্ষর;—উহা দেবনাগর, কিন্তু তৎসাময়িক বহুবিধ পুস্তক ও তাম্রশাসনে যে অক্ষর ব্যবহৃত হইতে দেখা গিয়াছে, তাহা মৈথিল। সে সময়ের লিপিমালার প্রতি অভিনিবেশ করিলে, তাম্রলিপিব্যবহৃত অক্ষর যে সে সময়ের নহে, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে, তাম্রশাসনখানি জাল, কিন্তু উহা এক হিসাবে জাল নহে। আকবরের সময় সমস্ত রাজ্যের জরিপ হয়; রাজা টোডরমল্লই তাহার অনুষ্ঠাতা, উহা সকলেই অবগত আছেন। বিদ্যাপতির বংশধরগণ যে ভূমিদান পত্রের বলে বিস্ফী গ্রাম অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা হয়ত কালক্রমে হারাইয়া গিয়াছিল; কিন্তু তাঁহাদের নিকট যে একটি নকল ছিল, সেই নকল দৃষ্টে নূতন তাম্রলিপি প্রস্তুত করা হইয়া থাকিবে এবং আকবর প্রবর্ত্তিত সনটি তন্মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বিস্ফী গ্রাম তিনি পাইয়াছিলেন, ইহা তৎকৃত পদেই জানা গিয়াছে—শুধু রাজকর্ম্মচারিগণের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার জন্য বিদ্যাপতির বংশধরগণ মূলের নকল হইতে একটি কৃত্রিম তাম্রশাসন প্রস্তুত করা আবশ্যক বোধ করিয়াছিলেন। ইহাও একটি অনুমান মাত্র, তবে আমাদের নিকট এ অনুমানটি সঙ্গত বোধ হইতেছে।

রাজপঞ্জীতে শিবসিংহের সিংহাসন আরোহণ-কাল ১৪৪৬ খৃঃ অব্দ, ইহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে; কিন্তু বিদ্যাপতির নিজকৃত একটি মৈথিল পদ নিম্নে দেওয়া যাইতেছে, তদ্দৃষ্টে দেখা যায়, শিবসিংহ ১৪০০ খৃঃ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন;—

রাজপঞ্জী।

"অনল রন্ধ্র কর লক্খণ ণরবই সক সমুদ্দ কর অগিনি সসী।
চৈত্ত কারি ছঠি জেঠা মিলিঅো বার বেহপ্পই জাউলসী॥
দেবসিংহ জং পুহমী ছড্ডই অদ্ধাসন সুররাঅ সরু।
দুহু সুরতান নিদৈ অব সোঅউ তপনহীন জগ ভরু॥
দেখহুও পৃথিমীকে রাজা পৌরুস মাঁঝ পুন্ন বলিও।
সতবলে গঙ্গা মিলিতকলেবর দেবসিংহ সুরপুর চলিও॥
একদিস জবন সকল দল চলিও একদিস সৌ জমরাঅ চরু।
দুহুএ দলটি মনোরথ পূরও গরুএ দাপ সিবসিংহ করু॥

সুরতরুকুসুম ঘাল দিস পূরেও দুন্দুহি সুন্দর সাধ ধর।
বীরছত্র দেখনকো কারণ সুরগণ সোভেঁ গগন ভর॥
আরম্ভীঅ অন্তেট্টি মহামখ রাজসূঅ অশ্বমেধ জহাঁ।
পণ্ডিত ঘর আচার বখানিঅ যাচককাঁ ঘর দান কহাঁ॥
বিজ্জাবই কইবর এহ গাবএ মানব মন আনন্দ ভও।
সিংহাসন সিবসিংহ বইট্‌ঠো উছবৈ বিসরি গও॥"*

হে নগরবাসিগণ! তোমাদের পূর্ব্বে রাজা দেবসিংহ এই ২৯৩ লক্ষ্মণাব্দে চৈত্র মাসে কৃষ্ণপক্ষে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে বৃহস্পতিবারে স্বর্গে দেবরাজের সিংহাসনার্দ্ধভাগী হইয়াছেন। রাজ্য রাজশূন্য হয় নাই, তাঁহার পুত্র শিবসিংহ রাজা হইয়াছেন; শিবসিংহ বাহুবলে বলীয়ান্। তিনি সম্মুখাগত যবনদিগকে তৃণের মত তুচ্ছ ভাবিয়া জননী জাহ্নবীর অমৃতধাম অঙ্কে পিতার দেহ ভস্মীভূত করিয়া কটাক্ষমাত্রে যবনরাজ সৈন্যগণকে পরাভূত করিয়াছেন। তাহার পর যবনরাজ, তাঁহার সঙ্গে অগণিত সৈন্য; তোমাদের নূতন রাজা অকুতোভয়; ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। তোমরা অনুপস্থিত ছিলে,—দেখ নাই; আকাশে সারি গাঁথিয়া দেবতাগণ দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে যবনরাজ পলায়ন করিল। স্বর্গে কতই না দুন্দুভি বাজিল। শিবসিংহের মাথার উপর কতই না সুরতরুকুসুম পড়িতে লাগিল। বিদ্যাপতি কবি কহিতেছেন, সেই শিবসিংহ এখন তোমাদের রাজা হইয়াছেন; তোমরা নির্ভয়ে বাস কর।

রাজপঞ্জীর নির্দ্দিষ্ট কাল গ্রহণ করা সম্বন্ধে আমাদের আরও নানারূপ আপত্তি আছে।

আর দুইটী প্রমাণ।

এখন বিদ্যাপতি সম্বন্ধে আর দুইটি প্রমাণ বাকী। মিথিলার তদানীন্তন রাজধানী গজরথপুরে শিবসিংহের সভাসদ্ বিদ্যাপতি ঠাকুরের আদেশে একখানি সংস্কৃত পুঁথি (কাব্যপ্রকাশের টীকা) দেবশর্ম্মা নামক জনৈক বিপ্র নকল করিয়াছিলেন, তাহার উপসংহার এইরূপ:—

"সমস্তবিরুদাবলীবিরাজমান মহারাজাধিরাজ শ্রীমৎশিবসিংহদেব সম্ভুজ্যমানতীরভুক্তৌ শ্রীগজরথপুরনগরে সপ্রক্রিয় সদুপাধ্যায় ঠাকুর শ্রীবিদ্যাপতীনামাজ্ঞয়া গৌয়ালসং শ্রীদেবশর্ম্ম বলিয়াসসং শ্রীপ্রভাকরাভ্যাং লিখিতৈষা পুস্তীতি ল সং ২৯১ কার্ত্তিক বদি ১০।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই পুস্তকখানি সংগ্রহ করিয়া বিদ্যাপতির কাল-সমস্যায় একটি নূতন আলো প্রদান করিয়াছেন। এই পুঁথি ১৩৯৮ খৃঃ অব্দে লিখিত হয়। কবি-রচিত "লিখনাবলী" নামক সংস্কৃত পুস্তকে ২৯৯ ল সং অথবা ১৩৩০ শকের উল্লেখ বারংবার পাওয়া যায়; এই গ্রন্থ কবির পরিণত বয়সের লেখা বলিয়া মনে হয়; তাহা হইলে ঐ শকে অর্থাৎ ১৪০৮ খৃঃ অব্দে কবি প্রৌঢ় বয়সে উপনীত হইয়াছিলেন। বিদ্যাপতি ঠাকুর দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছিলেন,

* পরিষৎপত্রিকা, ১৩০৭, ১ম সংখ্যা, ৩২ পৃঃ।

কিন্তু তাঁহার জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ আমরা যথাযথ ভাবে নির্দ্দেশ করিতে পারিলাম না। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং সম্ভবতঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে তাঁহার জীবন শেষ হয়, এ পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে।

পূর্ব্বোক্ত প্রমাণগুলি বিচার করিয়া আমরা কবির জীবনকালসম্বন্ধে একটা মোটামুটি সিদ্ধান্ত করিব।

প্রথমতঃ কবির আদেশে দেবশর্ম্মা কর্ত্তৃক লিখিত কাব্যপ্রকাশের টীকার নকল। ইহা ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে লিখিত। এই সময়ে কবির বয়স আনুমানিক ৪০ বৎসর ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। কারণ বিদ্যাপতি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিবার পূর্ব্বে আদেশ করিয়া কাহারও দ্বারা পুঁথি নকল করাইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না, ইহা অবশ্য একটি অনুমানমাত্র।

দ্বিতীয়তঃ তৎরচিত সংস্কৃত লিখনাবলীতে ১৪০৮ খৃষ্টাব্দের উল্লেখ।

তৃতীয় প্রমাণ কবির স্বহস্ত-লিখিত ভাগবত, উহা ১৪০০ খৃষ্টাব্দের লেখা।

চতুর্থ প্রমাণ তাঁহার পদাবলীতে নসির সাহার উল্লেখ। নসির সাহ ১৪২৬ হইতে ১৪৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। রাজপঞ্জীর সন তারিখ সম্বন্ধে অনেক গোল আছে। ভূমি দানপত্রের ১৪০০ খৃষ্টাব্দের সঙ্গে পূর্ব্বোক্ত তারিখ গুলির সমন্বয় করা যায়। সুতরাং যদি বলা যায়, কবি ১৩৫৮ কিংবা তদ্রূপ কোন সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা সত্য হইতে বহুদূরবর্ত্তী হইবে না। পূর্ব্বোক্ত সকলগুলি প্রমাণ দ্বারাই আমাদের আনুমানিক সময় সমর্থিত হইতেছে।

খাস মিথিলায়ও বিদ্যাপতির খাঁটি রচনা উদ্ধার করা অসম্ভব। * মিথিলার পাঠ ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও বিকৃত, বঙ্গদেশের প্রচলিত পাঠও বিকৃত, সুতরাং কেহ কেহ বলেন, বিদ্যাপতির উপর বাঙ্গালী ও মৈথিলীদিগের দাবী তুল্যরূপ। মিথিলা বাঙ্গালার পঞ্চ বিভাগের এক বিভাগ ছিল এবং মিথিলার রাজসভায় লক্ষ্মণাব্দ প্রচলিত ছিল, ইত্যাদি কারণ দেখাইয়া কোন কোন লেখক আবার বিদ্যাপতিকে বাঙ্গালীকবি বলিয়াই স্থির করিতে চাহেন। পাঠ-বিকৃতি সমস্ত প্রাচীন কবির রচনাতেই দৃষ্ট হয় এবং এক দেশ অন্য দেশের অধীন থাকিতে পারে, এজন্য কবির স্বদেশবাসীদিগকে বঞ্চনা করিতে যাওয়া অনুচিত। বিদ্যাপতির সমাধিস্তম্ভ উঠিতে বিস্ফীতেই উঠিবে, মৈথিলিগণই তাঁহাকে লইয়া গর্ব্ব করিবেন। তবে আমাদের একটা ভালবাসার আধিপত্য আছে; বঙ্গদেশের বহুদিনের অশ্রু, সুখ ও প্রেমের কথার সঙ্গে তাঁহার পদাবলী

কবির উপর বাঙ্গালীর দাবী।

---

* সম্প্রতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল হইতে বিদ্যাপতির পদাবলীর যে প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা অনেকাংশে অবিকৃত বলিয়া বোধ হয়। ঐ পুঁথি সাহিত্য-পরিষদ্ প্রকাশ করিতেছেন।

জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। ধীরে ধীরে আমরা বাঙ্গালীর ধুতি চাদর পরাইয়া মিথিলার বড় পাগড়ি খুলিয়া ফেলিয়া তাঁহাকে আমাদের করিয়া লইয়াছি, সেইরূপে তিনি আমাদেরই থাকিবেন। আমরা আসলের পার্শ্বে একটি নকল বিদ্যাপতি দাঁড় করিয়াছি; জগতে এই প্রথমবার নকলটী আসলের মতই সুন্দর হইয়াছে। আমরা পদকল্পতরু প্রভৃতি পুস্তক হইতে তাঁহাকে আর বাদ দিতে পারি না। এ শুধু ভালবাসার বলপ্রয়োগ; ঐতিহাসিক এ আব্দার নাও মান্য করিতে পারেন।

মিথিলার ঋণ।

আমাদের অনেকগুলি প্রথম শ্রেণীর কবি বিদ্যাপতির শিষ্য। মিথিলার শিষ্যত্ব আমাদের নূতন কথা নহে। মিথিলার রাজর্ষি জনক, যাজ্ঞবল্ক্য, গার্গী, মৈত্রেয়ী, গৌতম, কপিল—সমস্ত ভারতবর্ষের গুরুস্থানীয়। মিথিলারাজ ইক্ষাকুর চারি পুত্র বিমাতার চক্রান্তে তাড়িত হইয়া কপিলবস্তুতে নবরাজ্য স্থাপন করেন, বুদ্ধদেব সেই বংশোদ্ভব। নবদ্বীপের অজেয় টোল মিথিলার শিষ্য কাণাশিরোমণি দ্বারা অধিষ্ঠিত। 'বৃজ্জি' প্রাচীন মিথিলার এক ক্ষত্রিয় বংশের শাখা। কেহ কেহ বলেন ব্রজবুলি এই বৃজ্জিদের ভাষা, এসম্বন্ধে মতান্তর আছে। মিথিলার পণ্ডিতগণ "এক বাংগালী, দোসর তোতরাহ" * বলিয়া যদি আমাদিগকে একটু গালি দেন, তাহা সহ্য করা আমাদের অনুচিত হইবে না।

বিদ্যাপতি ও অদ্বৈতাচার্য্য।

আমরা ঈশাননাগরকৃত অদ্বৈতপ্রকাশে দেখিতে পাই, বিদ্যাপতি এবং অদ্বৈতপ্রভুর দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তখন বিদ্যাপতি বয়োবৃদ্ধ ছিলেন সন্দেহ নাই। অদ্বৈত ১৪৩৪ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন, এবং বর্ণিত সাক্ষাৎকারের সময় তাঁহার বয়স ২০।২১ বৎসর ছিল, সুতরাং ১৪৫৫ কিম্বা তৎসন্নিহিত কোন সময়ে এই দেখা শুনা হইয়াছিল। উক্ত বিবরণে জানা যায়, বিদ্যাপতি অতি সুশ্রী পুরুষ ছিলেন, ও তাঁহার পদরচনার সঙ্গে গান করিবার শক্তি ও রাগরাগিণ্যাদির উৎকৃষ্ট জ্ঞান ছিল।

বিদ্যাপতির ধর্ম্ম বিশ্বাস কি ছিল, জানা যায় নাই। তিনি 'দুর্গা-ভক্তি-তরঙ্গিণী' লিখিয়াছিলেন ও শৈবধর্ম্মাবলম্বী শিবসিংহ রাজার প্রিয় সভাসদ্ ছিলেন। বিস্ফীতে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শিব এখনও আছেন। কিন্তু তাঁহার স্বহস্ত-লিখিত ভাগবতখানি তাঁহার বৈষ্ণবধর্ম্মে প্রীতির সাক্ষী,—তাঁহার রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় পদাবলী ভক্তির সরস উৎস। একটি শিব-বন্দনায় তিনি লিখিয়াছেন, "হরি উৎকৃষ্ট চাঁপা ফুলের অঞ্জলি গ্রহণ করেন, শিব তুমি সামান্য ধুতুরা ফুলেই প্রীত হও।" তিনি বাহিরে যাহাই থাকুন, তাঁহার হৃদয়টি বৈষ্ণব-ধর্ম্মের অনুকূলে ছিল, একথা বোধ হয় দ্বিধাশূন্য হইয়া বলা যাইতে পারে।

* বিদ্যাপতি, কাব্যবিশারদ মহাশয়ের সংস্করণ, উপক্রমণিকা ৸০।

বিদ্যাপতির কবিত্ব-শক্তি ঈশ্বরপ্রদত্ত। তিনি ভগবৎকৃপার সঙ্গে স্বীয় পাণ্ডিত্য ও শিক্ষার যোগ করিয়াছিলেন। সৌন্দর্য্য উপভোগের জন্য স্বভাব-দত্ত তীক্ষ্ণ চক্ষু ও অলঙ্কারশাস্ত্রের জ্ঞান উভয়ই ব্যবহার করিতেন। একটি সুন্দর চিত্র দেখিলে পৃথিবীর নানা রূপের ছবি স্পষ্টভাবে মনে উদয় হইত—তাই তাঁহার উপমাগুলি এত সুন্দর। নায়িকার সুন্দর চোখ দু'টি তিনি কত উপমায় ব্যক্ত করিয়াছেন,দেখুন,—(১) কজ্জল-শোভিত সজলার্দ্র চক্ষু ঈষদ্ রক্তাভ হইয়াছে,—পদ্মদলে যেন ঈষদ্ সিন্দুরের লেপ পড়িয়াছে (২), চক্ষুর তারা যেন স্থির ভৃঙ্গের ন্যায়—মধুতে বিভোর হইয়া উড়িতে পারিতেছে না (৩), কজ্জলযুক্ত চোখের বঙ্কিম চাহনিতে কৃষ্ণতারকা এক কোণে সরিয়া পড়িয়াছে, যেন মধুমত্ত ভ্রমরকে পবন ইন্দীবর হইতে ঠেলিয়া ফেলিতেছে।

বিদ্যাপতির উপমা।

এইরূপে উপমার সংখ্যা নাই; উপমা ভিন্ন কথা নাই। পৃথিবীর সুন্দর পদার্থগুলি পৃথক্ হইলেও তাহাদের মধ্যে একটা অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে। চাঁপাফুলের ঘ্রাণেও বেহাগ-রাগিণীর কথা মনে পড়িতে পারে। এই সম্বন্ধ নির্ণয় করা বিজ্ঞানের সাধ্যাতীত, কিন্তু কবি তাহা ধরিয়া ফেলেন। জগতের এই লতাপুষ্পপল্লব ও নরনারীচিত্র এক তুলির আলেখ্য। সেই একত্বের গন্ধ অনুভব করিতে মনের একটা শক্তি আছে, চক্ষু কর্ণের ন্যায় তাহার নাম নাই, সেই শক্তি উপমাযোজনায় ব্যক্ত হয়। বিদ্যাপতির এই ইন্দ্রিয় অতি তীক্ষ্ণ ছিল। বৈদ্য যেরূপ সতত উপেক্ষিত তৃণপল্লব হইতে উৎকৃষ্ট ঔষধ আবিষ্কার করেন, বিদ্যাপতিও সেইরূপ এই পৃথিবীর অতি সচরাচর দৃশ্য হইতে উৎকৃষ্ট সৌন্দর্য্যের আবিষ্কার করিয়াছেন। উপমার যশে ভারতবর্ষে মাত্র কালিদাসেরই একাধিপত্য, যদি দ্বিতীয় একজনকে কিছু ভাগ দিতে আপত্তি না থাকে, তবে বোধ হয় বিদ্যাপতির নাম করা অসঙ্গত হইবে না। বিদ্যাপতির দ্বিতীয় শক্তি—সৌন্দর্য্যের একটী পরিষ্কার চিত্র আঁকিয়া দেওয়া। বিদ্যাপতির বর্ণিত রাধিকা,—কতকগুলি চিত্রপটের সমষ্টি। বয়ঃসন্ধির ছবিখানি এইরূপ,—

---

(১) "নীরে নিরঞ্জন লোচন রাতা।
সিন্দুরে মণ্ডিত জনু পঙ্কজপাতা॥"

(২) "লোচন জনু থির ভৃঙ্গ আকার।
মধু মাতল কিয়ে উড়ই না পার॥"

(৩) "চঞ্চল লোচনে বঙ্ক নেহারনি
অঞ্জন শোভন তায়।
জনু ইন্দীবর পবনে ঠেলল
অলি ভরে উলটায়॥"

রাধা কখনও (বালিকা-সুলভ) উচ্চহাস্য হাসিয়া ফেলেন, কখনও (নবাগত যৌবনের ভাবে) তাঁহার ওষ্ঠপ্রান্তে ঈষৎ হাসি খেলা করে। কখনও চমকিত হইয়া পাদ-বিক্ষেপ করেন, কখনও তাঁহার গতি (যুবতীর ন্যায়) মৃদুমন্দ ; ফুলধনুর পাঠশালায় ইনি নূতন শিক্ষার্থী ; নিজের শরীরের প্রতি আনত দৃষ্টি করিয়া কখনও বিভোর হইয়া তাহাই দেখেন, কখনও বা তাহা বস্ত্রে ঢাকিয়া রাখেন। প্রেম-বিষয়ক কথা শুনিলে চক্ষু মৃত্তিকার দিকে নত করিয়া একাগ্র-কর্ণে তাহাই শুনিতে থাকেন ; কেহ তাহা লক্ষ্য করিয়া প্রচার করিলে কান্না ও হাসি মিশাইয়া গালি দেন। মুকুর সম্মুখে রাখিয়া কেশ-বিন্যাসাদির সময় সখীগণকে চুপে চুপে প্রেমসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন এবং হৃদয়ে প্রেমের ভাব উপস্থিত হইলে চক্ষু মুদিত করেন। রসের কথা শুনিলে সঙ্গীতমুগ্ধা হরিণীর ন্যায় সেই দিকে আকৃষ্ট হন। *

আর একখানি ছবি লজ্জার ;—

একদিন একখানা ছোট কাপড় পরিয়া আলুথালু ভাবে বসিয়া আছি। অলক্ষ্যে কৃষ্ণ (কমলনয়ন) গৃহে প্রবেশ করিলেন। শরীর একদিক্ ঢাকিতে অন্যদিক্ মুক্ত হইয়া পড়ে। লজ্জায় ইচ্ছা হইল, ধরণী ফাটিয়া যাউক, তাহাতে প্রবিষ্ট হই, * * * কি বলিব সখি, আমার জীবন যৌবনে ধিক, আজ আমার মুক্ত অঙ্গ শ্রীহরি দেখিতে পাইলেন। †

---

* "ক্ষণে ক্ষণে দশন ছটাছট হাস।
ক্ষণে ক্ষণে অধর আগে করু বাস॥
চৌঙকি চলয়ে ক্ষণে ক্ষণে চলু মন্দ।
মনমথ পাঠ পহিল অনুবন্ধ॥"
"হৃদয়জ মুকুল হেরি থোর থোর।
ক্ষণে আঁচর দেই ক্ষণে হোয় ভোর॥"
"কেলি রভস যব শুনে।
আনত হেরি ততহি দেই কাণে॥
ইথে যদি কোই করয়ে পরচারি।
কাঁদন মাখি হাসি দেই গারি॥"
"মুকুর লেই যব করত সিঙ্গার।
সখিরে পুছই কৈছে···বিহার॥"
"শুনিতে রসের কথা থাপরে চিত।
যৈসে কুরঙ্গিণী শুনই সঙ্গীত॥"

† "একলি আছিনু ঘরে হীন পরিধান।
অলখিতে আওল কমল-নয়ান॥
এদিকে ঝাঁপিতে তনু ওদিকে উদাস।
ধরণী পশিয়ে যদি পাঙ পরকাশ॥

* * * *

এই লেখাগুলি তুলিতে আঁকা ছবির মত। সুন্দরীর নানা ভঙ্গীর ছবি দেখিয়া কবি আলো চিত্র তুলিয়াছেন। তুলির আঁকা বর্ণ মুছিয়া যায়, কিন্তু লেখনীর আঁকা ছবি মোছে না; তাই ৫০০ শত বৎসর পরেও এই নারী চিত্রগুলি সদ্য প্রস্ফুট মালতীর ন্যায় স্পষ্ট রহিয়াছে। এই রাধা জয়দেবের রাধার ন্যায়—শরীরের ভাগ অধিক, হৃদয়ের ভাগ অল্প। কিন্তু বিরহে পৌঁছিয়া কবি ভক্তি ও প্রেমের গীতি গাহিয়াছেন, তথা হইতে কবি অলঙ্কারশাস্ত্রের সহিত সম্বন্ধবিচ্যুত হইয়া পরম ভাগবত হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার ফ্রেমে-বাঁধা আট-সাঁট নায়িকার চিত্রপটখানা সহসা জীবনের চাঞ্চল্য দেখাইল। তাঁহার উপমা ও কবিতার সৌন্দর্য্য চক্ষের জলে ভিজিয়া নব লাবণ্য ধারণ করিল। বিরহ ও বিরহানন্তর মিলন বর্ণনায় বিদ্যাপতি বৈষ্ণব-কবিদিগের অগ্রগণ্য। কেহ কেহ বলেন, চণ্ডীদাসের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর তাঁর কবিতায় এই অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল। (১)

বিরহ।

শ্রীহরি মথুরায় যাইবেন শুনিয়া রাধা ম্রীয়মানা, কৃষ্ণ আসিলে তাঁহার হাত দু'খানি সযত্নে মস্তকে ধারণ করিয়া রাধা যেন না বলিয়াই বুঝাইলেন, "আমার মস্তকে হাত দিয়া বল, যাইবে না।" কৃষ্ণ সেইরূপ শপথই করিলেন, রাধা তাহাই বেদবাক্যের মত বিশ্বাস করিলেন। বিদ্যাপতি-বর্ণিত রাধিকা বড় সরলা, বড় অনভিজ্ঞা। কৃষ্ণ চলিয়া গিয়াছেন, রাধার শুষ্ক ও শীর্ণ কুসুমকান্তি ভূতলে লুটাইতেছে, সখীগণ কৃষ্ণ আসিবেন বলিয়া আশ্বাস দিতেছে, মুমূর্ষু রাধিকা কাতরে বলিতেছেন,—

চন্দ্রকরে নলিনীলতা শুকাইয়া গেল, বসন্ত ঋতু আসিলেই বা কি হইবে? তপনতাপে অঙ্কুর জ্বলিয়া গেলে, বর্ষার জলে কি করিবে? হরি হরি, একি দৈব দুঃখ! সিন্ধুতীরে যদি কণ্ঠ শুকায়, তবে আর পিপাসা কে দূর করিবে? আমার কর্ম্মদোষ ভিন্ন চন্দনতরু সৌরভ-বিচ্যুত হইবে কেন? চন্দ্রকর হইতে অগ্নিকণা লাভ করিব কেন এবং চিন্তামণি

ধিক যাউক জীবন যৌবন লাজ।
আজু মোর অঙ্গ দেখল ব্রজরাজ।"

রুচির অনুরোধে আমরা অনুবাদের অনেক স্থল একটু একটু কোমল করিয়াছি। তজ্জন্য আমরা পাঠক মহাশয়ের নিকট ক্ষমা চাই। নিখুঁত সুরুচিসম্পন্ন রচনা বিদ্যাপতির পূর্ব্বরাগ, সম্ভোগ-মিলন, মান, প্রেম বৈচিত্র্য প্রভৃতি অধ্যায়ে একরূপ দুষ্প্রাপ্য।

(১) ইঁহাদের মিলন সম্বন্ধীয় যে কয়েকটি প্রাচীন পদ আছে, তন্মধ্যে 'রূপনারায়ণ' নামক সঙ্গীর উল্লেখ আছে। ইনি যে শিবসিংহ তাহা নিশ্চয়রূপে কিছুতেই বলা যায় না। এই উপাধি বা নামে একমাত্র শিবসিংহই পরিচিত ছিলেন না।

স্বগুণহারা হইবে কেন? আমি শ্রাবণ মাসের মেঘ হইতে জলকণা পাইলাম না, এবং কল্পলতিকা আমার পক্ষে বন্ধ্যা হইল। *

কৃষ্ণের প্রতি চিরবিশ্বাসময়ী মুগ্ধার মৃত্যু-যাতনাও আমাদিগকে অনুরাগ-মাধুর্য্যে মোহিত করে। সে বিরহ-কথা মর্ম্মান্তিক হইলেও তাহা বিশ্বাস-মধুর, এবং মৃত্যুর বিভীষিকা হরণ করে। "শ্রবণহি শ্যামনাম করু গান। জপইতে নিকসউ কঠিন পরাণ॥" প্রভৃতি কেমন মিষ্ট! সেই চিরশ্রুত নারায়ণং তনু-ত্যাগে" চরণার্দ্ধ মুমূর্ষু ভক্তের কর্ণে অমৃত বর্ষণ করে, ইহাও কি তাহারই কবিত্বময় রূপান্তর নহে?

এই দুঃখের পরিসমাপ্তি সুখে। বিরহের দুঃখের পর মিলনের সুখ বর্ণনায় বিদ্যাপতির গীতির ন্যায় গাঢ় প্রেমের উক্তি পদ্য-সাহিত্যে অল্পই আছে। রাধিকা চন্দ্রকিরণে কোকিলের কুহুস্বরে পাগলিনী হইয়াছিলেন—এখন বলিতেছেন—সেই কোকিল এখন লক্ষ ডাক ডাকুক, লক্ষ চাঁদ উদিত হউক, পাঁচটি ফুলবাণের স্থলে লক্ষ ফুলবাণ নিক্ষিপ্ত হউক। †

কৃষ্ণ আসিবেন—প্রাণবঁধুকে প্রণাম করিবেন, রাধা এই সুখের আশায় মুগ্ধা।

"হিম কর-কিরণে নলিনী যদি জারব
কি করবি মাধবী-মাসে॥
অঙ্কুর, তপন তাপে যদি জারব
কি করব বারিদ-মেহে।"
"হরি হরি কো ইহ দৈব দুরাশা।
সিন্ধু নিকটে, যদি কণ্ঠ সুখায়ব
কো দূর করব পিয়াসা॥
চন্দন তরু যব সৌরভ ছোড়ব
শশধর বরিখব আগি।
চিন্তামণি যব নিজগুণ ছোড়ব
কি মোর করম অভাগি॥
শ্রাবণ মাহ ঘন বিন্দু না বরিখব
সুরতরু বাঁঝকি ছান্দে।"
সোহি কোকিল অব লাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচবাণ অব লাখ বাণ হউ
মলয় পবন বহু মন্দা॥"

"কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর॥"

প্রভৃতি পদ আবৃত্তি করিয়া মহাপ্রভু উন্মত্তবৎ এক প্রহর কাল নৃত্য করিয়াছিলেন। "জনম অবধি" পদ বহুবার উদ্ধৃত হইয়াছে, এখানে আর উঠাইব না। ছবি-অঙ্কন-নিপুণ, প্রেমাহ্লাদ বর্ণনায় কৃতার্থ, উপমা ও পরিহাস রসিকতায় সিদ্ধহস্ত বিদ্যাপতি অনেকগুলি স্বাভাবিক গুণ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সাধারণ পাঠক তাঁহার মনোমুগ্ধকর উপমা দৃষ্টে প্রীত হইবেন, এবং তদপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর পাঠক তাঁহার প্রেমের বিহ্বলতা ও গাঢ়তা উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে প্রেমিক ও ভক্ত বলিয়া প্রণাম করিবেন। কিন্তু সরল মর্ম্মের কথা—যাহাতে প্রাণ উদ্‌গ্রীব হইয়া সাড়া দেয় এবং যাহার অবিসম্বাদিত দাবী চোখের জলের উপর—সেরূপ কথা বিদ্যাপতি হইতে চণ্ডীদাস বেশী কহিয়াছেন।

চণ্ডীদাসের শ্রেষ্ঠত্ব।

তিনি উচ্চ-শিক্ষিত হইয়াও শিক্ষার আড়ম্বর ত্যাগ করিয়াছিলেন। তদীয় গীতি-কবিতার সরস অক্ষরে কণ্টকাকীর্ণ কুসুমের ন্যায় সুধা ও বিষ-মিশ্রিত প্রেমের কথা একত্র গ্রথিত রহিয়াছে। কাব্যক্ষেত্রে চণ্ডীদাসপ্রভু কর্ম্মক্ষেত্রে চৈতন্য প্রভুর ন্যায় অন্য এক প্রেমাবতার। বিদ্যাপতির কবিতা টীকা-টিপ্পনী দিয়া ব্যাখ্যা করা যায়, কিন্তু চণ্ডীদাসের পদ যিনি নিজে আস্বাদ করিতে না পারিবেন, তাঁহার নিকট অপরাপর বৈষ্ণব পদের সঙ্গে সেগুলি একই মূল্যে বিকাইবে, তাদৃশ পাঠক সম্বন্ধে বিদ্যাপতির কথায় বলা যাইতে পারে,—

"কাচ কাঞ্চন না জানয়ে মূল।
গুঞ্জা রতন করই সমতুল॥
যো কিছু কভু নাহি কলা রস জান।
নীর ক্ষীর দুহুঁ করই সমান॥"

সম্প্রতি বিদ্যাপতি সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্নসমাধানের সময় হইয়াছে, আমরা এ সম্বন্ধে আর উদাসীন থাকিতে পারি না।

কয়েকবৎসর পূর্ব্বে একটা ধারণা হইয়াছিল, যে সংস্করণে কবির ভণিতাযুক্ত অথবা প্রবাদ বা অনুমান মূলক কবির পদ বেশী থাকিবে—এক কথায় যে সংস্করণ যত বৃহদাকৃতি হইবে—ততই তাহা উৎকৃষ্ট হইবে।

কোন সম্পাদক বিদ্যাপতির পদসংখ্যা ২০।৩০টি দিলেন, জগদ্বন্ধু ভদ্রের পর গ্রীয়ারসন এবং তৎপর সারদা মিত্র পদসংখ্যা বাড়াইয়া দিলেন, তার পর অক্ষয় সরকার মহাশয় আরও কিছু উপকরণ বাড়াইয়া নৈবেদ্য সজ্জা করিলেন। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের পরে নগেন্দ্র গুপ্ত মহাশয় অতিকায় এক সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। বিদ্যাপতি এবার সত্যের ক্ষেত্র হইতে অনুমানের

রাজ্যে পা' দিয়া স্বীয় এলাকা অসম্ভব রূপ বাড়াইয়া ফেলিয়াছেন। কথিত আছে বিদ্যাপতির এক উপাধি ছিল, কবিশেখর, অপর এক উপাধি ছিল কবিবল্লভ, তিনি কবিদের শ্রেষ্ঠ, সুতরাং কবিভূষণ প্রভৃতি উপাধিও তাঁহারই যোগ্য। কে কখন তাঁহাকে এই সকল উপাধি বা ইহাদের কোন একটি দিয়াছিলেন,—তাহার ঠিকানা নাই। সম্পাদকগণ এই সমস্ত বিভিন্ন ভণিতার পদ দু' হাতে কুড়াইয়া তাঁহাদের সংস্করণ ভর্ত্তি করিতে লাগিলেন—ভণিতাহীন বহু পদ তাঁহারা শুধু তাঁহাদের বিমানবিহারী অনুমানের উপর জোর দিয়া বিদ্যাপতির পদান্তবর্ত্তী করিয়া লইলেন। এই সকল পদে যদি দুই একটি পদে ব্রজবুলীর ছিটা ফোঁটা তাঁহারা পান, তবে তো কথাই নাই—তাহা হইলে সোণায়—সোহাগা মিলিয়া যায়,—বিদ্যাপতির পদ বলিয়া চালাইতে তাঁহাদের আর দ্বিধা মাত্র থাকে না।

যেন বঙ্গদেশে কবিবল্লভ, নৃপবল্লভ, কবিশেখর প্রভৃতি উপাধি আর কাহারও ছিল না, যেন বঙ্গীয় বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে বাঙ্গালী কেহ কোন দিন যৈছে, তৈছে, যবঁহু, কঁবহু আর কেহ কোন দিন কেহ লিখেন নাই।

এই ভাবে বহু বাঙ্গালীর কবির পদ গ্রাস করিয়া বর্ত্তমান বিদ্যাপতির সংস্করণগুলি বৃহদাকৃতি ধারণ করিয়াছে। অনেক কবির উৎকৃষ্ট পদগুলি বিদ্যাপতির কাব্যসংগ্রহে স্থান পাইয়াছে। কিন্তু বিদ্যাপতি এত বড় কবি যে তাঁহার এই ধারকরা সৌন্দর্য্য পরিবার কোনই দরকার নাই, অথচ বঙ্গের অনেক কবি তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ পদের ন্যায়সঙ্গত দাবী সম্পাদকগণের খামখেয়ালীতে হারাইয়া ফেলিতেছেন।

দৃষ্টান্তস্থলে বলা যাইতে পারে, "জনম অবধি হাম্ রূপ নেহারিনু—নয়ন না তিরপিত ভেল" পদটি কখনও বিদ্যাপতির নহে, উহা বাঙ্গালী "কবিবল্লভ" নামে কোন কবির। নগেনবাবু আমাকে জানাইয়াছিলেন, উহা মিথিলায় পাওয়া যায় নাই। তথাপি কি ভাবিয়া তিনি উহা তাঁহার পদসংগ্রহের শেষে স্থান দিয়াছেন, তিনিই জানেন। বহু পদ খাস বাঙ্গলার, বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত, অথচ বিদ্যাপতির ভণিতায় চলিতেছে, যথা "মরিব মরিব সখি, নিশ্চয় মরিব, কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়া যাব।" বাঙ্গলার পল্লীর অলি গলিতে শত শত গানে এই পদটির ভাব বিদ্যমান থাকিয়া উহা যে বাঙ্গলার নিজস্ব তাহা প্রমাণ করিয়া দিতেছে।

এই বাজে পদগুলি বাদ দিয়া একটি খাঁটি বিদ্যাপতির পদসংগ্রহ প্রকাশ করিবার প্রয়োজন হইয়াছে।

বাঙ্গালীরা বিদ্যাপতির পদগুলিকে বাঙ্গলা ভাষার পরিচ্ছদ পরাইয়া বিদ্যাপতির যে নবকলেবরের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা আমরা কখনই বাদ দিতে পারি না। বৈষ্ণব মহাজনেরা উহা করাইয়াছেন, উহাকে ভক্তিগঙ্গায় স্নাত করাইয়া বিদ্যাপতিকে তাঁহারা যে স্বর্গীয় জ্যোতিঃ প্রদান করিয়াছেন, তাহা পাণ্ডিত্যের পল্লবগ্রাহিতা দেখাইতে যাইয়া আমরা মূঢ়তা বশতঃ পরিহার করিতে পারি না।

কীর্ত্তনের আসবে দেখিতে পাইবেন, বৈষ্ণবগায়কেরা বিদ্যাপতির পদে কিরূপ অপূর্ব্ব ভাবের আখর দিয়া তাহা আধ্যাত্মিক গৌরবে গরীয়াণ করিয়া থাকেন। মহাপ্রভুর কৃপা-কটাক্ষ পাতে বিদ্যাপতির রূপে স্বর্গীয়চ্ছটার প্রভা পড়িয়াছে। দৃষ্টান্ত স্থলে একটি ভণিতার উল্লেখ করিতে পারি ঃ—"ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর নারী। সুজনক কুদিন দিবস দুই চারি।" বাঙ্গালী কীর্ত্তনীয়ারা শেষ ছত্রে যে আখর দেন, তাহার অর্থ এই :—যেজন কৃষ্ণপদে নিজকে সমর্পণ করিয়াছে—তাহার দুঃখ দীর্ঘস্থায়ী হইতেই পারেনা। "সুজন" শব্দকে কৃষ্ণভক্তের আসনে আসীন করাইয়া তাঁহারা পদটি ভক্তিরসাত্মক করিয়াছেন, শত শত পদে এই ভাবের আখর পড়িয়াছে।

৫। সামাজিক ইতিহাস বা কুলজী-সাহিত্য।

বিশ্বকোষ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের যত্নে বঙ্গীয় বিবিধ সমাজের বহুসংখ্যক কুলজীগ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। বঙ্গদেশের সামাজিক জীবনের আখ্যায়িকা এই সকল পুস্তকে বিস্তারিতরূপে বিবৃত হইয়াছে। যাঁহারা বঙ্গীয় সমাজের পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের নিকট এই উপকরণরাশি বিশেষরূপে মূল্যবান্। বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবনতির সময় এদেশে স্বেচ্ছাচারিতা ও ব্যভীচার প্রভৃতি দ্বারা সমাজ একান্তরূপে শিথিল ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল। বামাচারী বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণ যে সমস্ত অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহা নীতি ও ধর্ম্মবিধ্বংসী। এই সময় ভৈরবীচক্র প্রভৃতি দ্বারা পুরুষ ও রমণীগণ নৈতিক আদর্শ হইতে একান্তরূপ স্খলিত হইয়াছিলেন। অপর পক্ষে তান্ত্রিকগণের খাদ্যাখাদ্যের কিছুমাত্র বিচার ছিল না। তাঁহারা গলিত শবের মাংস, মলমূত্রাদি পর্য্যন্ত কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া ভক্ষণ করিতেন। বঙ্গদেশের ঘরে ঘরে এই প্রকার তান্ত্রিক দীক্ষা প্রচারিত হইয়া সমাজকে বীভৎস করিয়া তুলিয়াছিল। হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানে সর্ব্ববিষয়ে এতদ্রূপ স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল। ব্যভীচারের সংশোধনার্থ যে সংস্কারকার্য্য আরব্ধ হইল, তাহাতে 'আচার'ই শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিল। হিন্দুসমাজে এখন খাদ্যাখাদ্যের যে আঁটা আঁটি ও নিত্য-নৈমিত্তিক নিয়মের প্রতি যে একাগ্রনিষ্ঠা দৃষ্ট হয়, তাহা বৌদ্ধ-যুগের স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিক্রিয়া। এখন আচার অনেকটা প্রাণশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এক সময়ে শিথিল সমাজে শৃঙ্খলা-স্থাপন জন্য আচার বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। বিদ্যা, যশঃ ধর্ম্ম প্রভৃতি সর্ব্ববিধ গুণের অগ্রে বল্লাল সেন এই আচারের স্থান দিয়াছিলেন। কৌলীন্যের ইহাই প্রথম লক্ষণ। লক্ষ্মণ সেনের সময় কৌলীন্য বংশগত হইল। বংশমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য কুলীনগণ যেরূপ স্বার্থত্যাগ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা বীরোচিত। মার্কেণ্ডেয় চণ্ডীর অনুবাদক রূপনারায়ণ ঘোষের পূর্ব্বপুরুষ জগন্নাথ ও বাণীনাথ নামক ভ্রাতৃদ্বয়কে মাণিকগঞ্জের অন্তঃপাতী আমডালা নিবাসী করবংশীয় কোন জমিদার

কায়স্থ পদ্মার গর্ভে লইয়া গিয়া তাঁহাদিগের নিকট তাঁহার দুই কন্যার বিবাহের প্রস্তাব করেন ; এবং তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত না হইলে তাঁহাদিগকে পদ্মাগর্ভে নিক্ষেপ করিবেন, এই অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। জ্যেষ্ঠ বাণীনাথ পদ্মাগর্ভে প্রাণত্যাগ করিয়া স্বীয় কৌলিন্য গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখেন। জগন্নাথ প্রাণের ভয়ে জমিদারকন্যার পাণিগ্রহণ করিতে স্বীকৃত হ'ন। কোন এক পরাক্রান্ত জমিদারের-কন্যাকে বিবাহ করার দরুণ মনের কষ্টে একটি কুলীন বৈদ্য প্রাণত্যাগ করেন, এরূপ কুলজীগ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। অথচ, পূর্ব্বোক্ত প্রকারের বিবাহ-বন্ধন দ্বারা কোনও কুলীন ব্যক্তির জাতিচ্যুত হওয়ার আশঙ্কা ছিল না। কুলগৌরবের সামান্য হানি হইত, কিন্তু সেই ভয়ে প্রাণত্যাগ করিতেও তাঁহারা কুণ্ঠিত ছিলেন না ; কিছুতেই উক্তরূপ বিবাহে সম্মত হইতেন না। বৈদ্য গণবংশীয় এক ব্যক্তি চৌষট্টিখানা গ্রাম উপঢৌকন পাইয়া দাসড়ার দত্তকন্যার পাণিগ্রহণে সম্মত হ'ন এবং সেনহাটী নিবাসী অপর এক কুলীন বৈদ্যসম্বন্ধে এরূপ উল্লিখিত আছে যে, একটী জমিদার তাঁহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে বহুবৎসর দরবার করিয়াছিলেন। কথিত আছে, উক্ত জমিদার এই উদ্দেশ্যে যখন প্রথম সেনহাটীতে পদার্পণ করেন, তখন কতকগুলি অশ্বত্থ গাছের চারা রোপণ করিয়াছিলেন, সেইগুলি সুবৃহৎ হইয়া যে সময়ের মধ্যে বহু লোককে ছায়া ও আশ্রয় দেওয়ার যোগ্য হইয়াছিল, তত দিনের চেষ্টায় কুলীন বৈদ্য ঐ জমিদারের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপনে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে নিকষ কুলীনগণ যেরূপ সমস্ত বিপদ ও লোভ উপেক্ষা করিয়া কুলগৌরব অটুট রাখিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। অথচ, কুলীনগণ সাধারণতঃ অর্থ-সম্পদশূন্য ছিলেন। নানা প্রকার কষ্ট ও দারিদ্র্য যাতনা সহ্য করিয়াও তাঁহারা যে ত্যাগের দৃষ্টান্ত প্রদান করিয়াছেন, তাহা সচরাচর দৃষ্ট হয় না। আদর্শ যতই সামান্য হউক না, যাহা মনুষ্য-চরিত্রকে ত্যাগের গৌরবে মহিমান্বিত করিয়া তুলিতে পারে, যদ্দ্বারা আত্ম-মর্য্যাদা বোধ উদ্বোধিত হয়, তাহাই সম্মানার্হ। এই হিসাবে বংশগত কৌলীন্য একান্তপক্ষে নিষ্ফল হয় নাই। মুসলমান-দিগের বিলাসলোলুপ দৃষ্টি হইতে সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য হিন্দু নেতৃগণকে বিশেষ ব্যস্ত হইতে হইয়াছে। ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের কুলজীগ্রন্থে সেই সব বিপদের আভাস আছে। পারিবারিক কলঙ্ক অত্যন্ত ঘৃণ্য মনে করিয়াও হিন্দুসমাজ কিরূপ উদারভাবে অনিচ্ছাকৃত ত্রুটিসমূহ উপেক্ষা-পূর্ব্বক সমাজবন্ধনকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার পরিচয় পাইলে আমাদিগের লজ্জিত হওয়ার কোন কারণই থাকিবে না। কুলজীগ্রন্থের কতক কতক বল্লাল সেনের সময় হইতেই রচিত হইতে আরব্ধ হইয়াছিল। কিন্তু বঙ্গীয় কুলজীগ্রন্থের অনেকগুলি বিগত ৪০০ বৎসরের মধ্যে রচিত হইয়াছে, ইহাদের অধিকাংশই বাঙ্গালা। সংস্কৃত কুলজীগ্রন্থ ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যজাতির মধ্যেই বেশী। সেগুলির এস্থলে নাম করিলাম না। অসংখ্য কুলজী পুস্তকের মধ্যে আমরা নিম্নে কতকগুলির নাম দিতেছি ঃ—

(১) দেবীবর ঘটককৃত মেলবন্ধ।
(২) ঐ কৃত প্রকৃতিপটল নির্ণয়।
(৩) বাচস্পতি মিশ্র-প্রণীত কুলার্ণব।
(৪) দনুজারি মিশ্রকৃত মেলরহস্য।
(৫) পরিহর কবীন্দ্র-রচিত দশতন্ত্র প্রকাশ।
(৬) মেলপ্রকৃতি নির্ণয়।
(৭) মেলমালা।
(৮) মেলচন্দ্রিকা।
(৯) মেলপ্রকাশ।
(১০) দোষাবলী।
(১১) কুলতত্ব প্রকাশিকা।
(১২) কুলসার।
(১৩) নীলকণ্ঠ ভট্টকৃত পিরালীকারিকা।
(১৪) নলুপঞ্চনের-কৃত গোষ্ঠী কথা।
(১৫) ঐ কৃত কারিকা।
(১৬) রাঢ়ী ও সমাজ নির্ণয়।
(১৭) রামদেব আচার্য্য-কৃত কুলপঞ্জী।
(১৮) কুলানন্দকৃত রাঢ়ী ও গ্রহ বিপ্রকারিকা।
(১৯) কুলানন্দ কৃত গ্রহবিপ্রবিচার।
(২০) শুকদেব-কৃত ঢাকুর।
(২১) ঘটকবিশারদ কান্তিরাম-প্রণীত কুলপঞ্জী।
(২২) মালাধর ঘটকরচিত দক্ষিণরাঢ়ীয় কারিকা।
(২৩) ঘটককেশরী বিরচিত কারিকা।
(২৪) ঘটকচূড়ামণি-কৃত কারিকা।
(২৫) ঘটকবাচস্পতি-প্রণীত কুলপঞ্জিকা।
(২৬) সার্ব্বভৌম-কৃত ঢাকুরি।
(২৭) শম্ভুবিদ্যানিধি প্রণীত ঢাকুরি।
(২৮) কাশীনাথ বসু-কৃত ঢাকুরি।
(২৯) মাধব ঘটক-বিরচিত ঢাকুরি।
(৩০) নন্দরাম মিশ্র-কৃত ঢাকুরি।
(৩১) রাধামোহন সরস্বতী-কৃত ঢাকুরি।

(৩২) দ্বিজ রামানন্দ-রচিত মল্লিক-বংশ কারিকা।
(৩৩) দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলসর্ব্বস্ব।
(৩৪) একজাই কারিকা।
(৩৫) বঙ্গকুলজী সারসংগ্রহ।
(৩৬) দ্বিজ বাচস্পতির বঙ্গজকুলজী।
(৩৭) দ্বিজ রামানন্দ-কৃত বঙ্গজ ঢাকুরি।
(৩৮) রামনারায়ণ বসু প্রণীত মৌলিক ঢাকুরি।
(৩৯) কাশীরাম দাস-কৃত বারেন্দ্র কায়স্থ ঢাকুরি।
(৪০) যদুনন্দনের বারেন্দ্র ঢাকুরি।
(৪১) তিলকরাম-বিরচিত গন্ধবণিক কুলজী।
(৪২) পরশুরাম-কৃত গন্ধবণিক কুলজী।
(৪৩) দ্বিজ পরশুরাম-রচিত তাম্বুল বণিকের কুলজী।
(৪৪) মাধব-কৃত তন্তুবায় কুলজী।
(৪৫) কিঙ্করদাস-প্রণীত সদ্ধর্ম্মাচার কথা।
(৪৬) মণিমাধব-কৃত সদ্গোপ-কুলাচার।
(৪৭) রামেশ্বর দত্তের তিলি পঞ্জিকা।
(৪৮) মঙ্গল-কৃত সুবর্ণ-বণিক কারিকা।
(৪৯) শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর-প্রণীত ত্রিপুরারাজমালা।

এই সকল কুলজী পুস্তক পাঠে বিবিধ তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। ইহাতে শুধু সামাজিক কথা নহে, প্রসঙ্গক্রমে নানা ঐতিহাসিক রহস্যেরও ভেদ করা হইয়াছে। আমরা কুলজীপ্রসঙ্গ ইহার পরে আর উল্লেখ করিব না। সুবিখ্যাত কুলাচার্য্য নলুপঞ্চানন বঙ্গীয় সেন-রাজাদিগের জাতি-তত্ত্বের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, এ স্থলে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। সেন-রাজাদিগের তাম্রশাসনে তাঁহারা আপনাদিগকে ব্রহ্মক্ষত্রিয় বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। এতদ্‌সম্বন্ধে নলুপঞ্চাননের অভিপ্রায় জ্ঞাত হইলে পাঠক ঐতিহাসিক সত্য সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। এই অংশটী শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয়ের সম্বন্ধনির্ণয় নামক পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে উদ্ধৃত হইল।

"এক দিন রাজা জিজ্ঞাসিল পঞ্চগোত্রীয়ে।
মহাবংশ কুলীন আর সিদ্ধ শ্রোত্রিয়ে॥
কহ সভাসদ আছ যতেক পণ্ডিত।
কি হেতু ত্যজিলে বৈদ্যে ছিলে পুরোহিত॥
উত্তরিল মহেশাদি যতেক সুকৃতী।

নিত্য যাজে রত নহি নৈমিত্তিকে ব্রতী ॥
অজ্ঞ হল দশকর্ম্মা শ্রাদ্ধে পিণ্ডভোজী।
দ্বিজের স্থণ্ডিলে ঋত্বিক নহি শূদ্রযাজী ॥
আদিশূর রাজা বৈদ্য, বৈশ্য তার জাতি।
এক ছত্রী রাজা ছিল ক্ষত্রবৎ ভাতি ॥
ইন্দ্রদ্যুম্ন বৌদ্ধ রাজা জগন্নাথে কীর্ত্তি।
সাম্যবাদী তবু বলায় ক্ষত্রিয় বৃত্তি ॥
রাজা হলে রাজন্যগণ ভাবে অন্যথা।
পতিত কাম্বোজাদি গৌড়ে ক্ষত্র যথা ॥
ভূপাল অনঙ্গপাল আর মহীপাল।
জাতিভ্রষ্ট ক্ষত্র নহে রাজন্য প্রবল ॥
তারাও বিভা করিত তিন জাতির মেয়ে।
ব্রাহ্মণ পুরোধা সাত সতী দেখ চেয়ে ॥
তাই তারা ক্রিয়াকাণ্ডে বেদজ্ঞান হীন।
যাজক পিণ্ডভোজী প্রথাত অপ্রাচীন ॥
বল্লাল কয় যবে পদ্মিনী জাতিহীনা।
লক্ষ্মণ কহে দ্বিজে এ প্রথাত দেখি না ॥
তাই বল্লাল ত্যজে কুপুত্র বলি সুতে।
লক্ষ্মণ ত্যজে পৈতা বৈদ্যকুল রক্ষিতে ॥
ইথে উভয় পক্ষের বৈদ্য পতিত ব্রাত্য।
ক্রমশঃ বৃষলে গণ্য অত্রত্য তত্রত্য ॥

* * * *

ভূমিপ হইলে সবার ইচ্ছা হয় ক্ষত্র
গৌরব-হেতু "রাজন্য" বলায় যত্র তত্র।
সবারি অভিলাষ সে উচ্চ হয় নিজে।
দেবত্ব পেলেও ইচ্ছা ব্রহ্মত্বে বিরাজে ॥

* * * * *

বৈদ্যরাজা আদিশূর ক্ষত্রিয় আচার।
বেদে ব্রহ্মবৎ কার্য্যে মাতৃ ব্যবহার ॥"

(৫৮—৮৯ পৃঃ)

উপরের তালিকায় আমরা 'রাজমালা'র নাম উল্লেখ করিয়াছি।

শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর।

ত্রিপুরার মহারাজা ধর্ম্মমাণিক্যের সময় (১৪০৭-১৪৩৯ খৃঃ) রাজমালা বঙ্গীয় পদ্যে লিখিত হইতে আরম্ভ হয়। ত্রিপুরার মহারাজগণ বঙ্গভাষার কিরূপ উৎসাহবর্দ্ধক ছিলেন, তাহার এক প্রমাণ এই যে, প্রায় ৫০০ বৎসর গত হইল রাজসভায় বঙ্গভাষা গৃহীত হইয়াছিল। এসিয়াটিক্ সোসাইটির জার্ন্যালে একবার এই রাজমালার সারাংশ উদ্ধৃত হইয়াছিল। বাঙ্গালা রাজমালা অনেক দিন পর্য্যন্ত একেবারে লুপ্ত করিবার চেষ্টা চলিয়াছিল, সম্প্রতি আমরা একখানি প্রাচীন রাজমালা পুঁথি দেখিতে পাইয়াছি। শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের ত্রিপুরার ইতিবৃত্তে উক্ত পুঁথি হইতে অনেক স্থল উদ্ধৃত হইয়াছে। আমরা গ্রন্থোৎপত্তির বিচরণটী নিম্নে প্রদান করিলাম :—

শ্রীধর্ম্মমাণিক্য দেব ত্রৈপুর সন্ততি।
রাজ্যবংশ বিস্তারিছে রাজমালা পুঁথী॥
পুস্তক শুনিলে ভুপে পূর্ব্ব রাজকথা।
ততঃপর নৃপচার্য্যা না হইয়াছে গাথা॥
অতএব কহি আমি শুন সেনাপতি।
পয়ারে লিখাহ তুমি রাজমালা পুঁথী॥
শুন শুন বলি বাণ চতুর নারায়ণ।
রাজবংশের কথা কিছু কহত অখন॥
প্রজাকে পালন করে পুত্রের সমান।
ভেদ দণ্ড সাম দান নীতিতে প্রধান॥
সভাসদ আছে যত ব্রাহ্মণ-কুমার।
বাণেশ্বর শুক্রেশ্বর বিদ্যাতে অপার॥
ইন্দ্রের সভাতে যেন বৃহস্পতি গণি।
সেইমত দ্বিজগণ হয় মহামানী॥
দুর্লভেন্দ্র নামে ছিল চণ্ডাই প্রধান।
পূর্ব্বকথা জানে সেই অতি সাবধান॥
রাজার সভাতে হয় শাস্ত্রের কথন।
নানা শাস্ত্র আলাপন করে দ্বিজগণ॥
সিংহাসনে একদিন বসিয়া নৃপতি।
বংশ-কথা জিজ্ঞাসিল সভাসদ্ প্রতি॥
শুক্রেশ্বর বাণেশ্বর দুই দ্বিজবর।

চণ্ডাই সহিত করি দিলেন উত্তর ॥
নানা তন্ত্র প্রমাণ করিয়া তিন জন।
রাজারে কহিল তিনে বংশের কথন ॥
রাজমালিকা আর যোগিনীমালিকা।
বারুণ্য কালির্ণয় আর লক্ষণমালিকা ॥
হরগৌরীসম্বাদ আছিল ভস্মাচলে।
নবখণ্ড পৃথিবী কহিছে কুতূহলে ॥
এ চারি তন্ত্রেতে আছে রাজার নির্ণয়।
রাজাতে কহিল কথা তিন মহাশয় ॥"

ইতি দুর্য্যখণ্ড, প্রথম অধ্যায়।

সংক্ষিপ্ত রাজমালা।

বঙ্গদেশের অন্যান্য রাজগণও যদি এই পথ অনুসরণ করিয়া স্বীয় বংশের ইতিহাস সঙ্কলনে যত্নপর হইতেন, তবে বঙ্গের প্রাচীন ইতিহাস প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের কল্পনার একটি বৃহৎ ক্রীড়াকাননে পরিণত হইত না। যে সময় রাজমালা রচিত হইতে আরম্ভ হয়, সেই সময় বংশাবলী স্বল্পায়তনে দেখাইবার জন্য একটি সংক্ষিপ্ত রাজমালাও প্রস্তুত হইয়াছিল—আমরা তাহা হইতেও কিছু উদ্ধৃত করিতেছি,—

"যযাতি রাজার পুত্র দুর্য্য যার নাম।
তান বংশে দৈত্য রাজা চন্দ্র বংশ সার ॥
তাহান তনয়ে রাজা ত্রিপুর নাম ধর্ম্মে।
তস্য পত্নী গর্ভে ত্রিলোচন রাজা জন্মে ॥
তাহান তনয় হৈল দক্ষিণ ভূপতি।
তস্য পুত্র তৈদক্ষিণ রাজা চারুমতি ॥
তস্য পুত্র সুদক্ষিণ ছিল মহীপাল।
তান পুত্র হয় দক্ষিণ নৃপতি বিশাল ॥
তস্য পুত্র ধর্ম্মতর রাজ-নীতি অতি।
তান পুত্র ধর্ম্মপাল হৈল নরপতি ॥
তস্য পুত্র সুধর্ম্ম ছিলেন মহারাজা।
তান সুত তরঙ্গ সুখে পালে প্রজা ॥
তস্য পুত্র দেবাঙ্গদ হইল মতিমান।
তান পুত্র নরাঙ্গিত নৃপতি আখ্যান ॥"

এই মন্তব্য প্রকাশিত হওয়ার পবে প্রাচীন রাজমালা ত্রিপুর রাজার ব্যয়ে সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্গদেশের ইহা সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ও উপাদেয় ইতিহাস। যদিও ত্রিপুর রাজ্যের কথাই এই পুস্তকের মুখ্য বিষয়, তথাপি ইহাতে প্রাসঙ্গিকভাবে আর্য্যাবর্ত্তের—বিশেষ বঙ্গদেশের বহু দেশের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহা প্রাচীন হিন্দু-রাজ্যের রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি নানা ঐতিহাসিক তথ্যের খনিবিশেষ। এমন একখানি পুস্তকের বিষয় অনেক বাঙ্গালীই বিদিত নহেন, ইহা বড়ই আক্ষেপের কথা। কহ্লনের রাজ-তরঙ্গিণী হইতে বাঙ্গলা রাজমালার ঐতিহাতিক গুরুত্ব বেশী ছাড়া কম নহে। আমাদের ভাষা রত্নপ্রসূ, কিন্তু আমরা এখন ভ্রমর-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া কবিত্ব-কুসুম খুঁজিয়া বেড়াইতেছি। যাহা সারবান ও স্থায়ী সাহিত্যের অন্তর্গত হওয়ার যোগ্য তাহা বাদ দিয়া যাইতেছি। এইজন্য রাজমালা পর্য্যপ্ত ঐতিহাসিক উপকরণ লইয়া আঁধারে কাঁদিতেছে, কে ইহার খোঁজ লইবে?

আমরা যে কবিগণকে গৌড়ীয় যুগ অথবা শ্রীচৈতন্য-পূর্ব্ব-সাহিত্যের অন্তর্গত করিলাম, তাঁহাদের কেহ কেহ শ্রীচৈতন্যের সমকালিক হইয়া পড়িলেন। চৈতন্য প্রভুর পূর্ব্বে সাহিত্যর যে নানাবিধ উদ্যম হইতেছিল, আমরা এই অধ্যায়ে তাহার আরম্ভ ও ক্রম-বিকাশ নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের পরিশিষ্ট।

আমরা ষষ্ঠ অধ্যায়ে নিম্নলিখিত কবিগণ সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম। এ স্থলে তাঁহাদের কবি-তালিকা, আনুমানিক কাল ও গ্রন্থাবলীর সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি:—

নাম	সময়	রচিত গ্রন্থের নাম।
১। রমাই পণ্ডিত—	রাজা ধর্ম্মপালের সময়।	খৃঃ একাদশ শতাব্দী। (নগেন্দ্র বাবুর মতে)
২। কাণা হরিদত্ত—	সম্ভবতঃ ত্রয়োদশ শতাব্দী।	মনসা দেবীর ভাসান।
৩। চণ্ডীদাস—	খৃঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতে	পদাবলী।
৪। বিদ্যাপতি—	ঐ	১। পদাবলী। ২। পুরুষ পরীক্ষা। ৩। শৈবসর্ব্বস্ব সার। ৪। দানবাক্যাবলী। ৫। বিবাদ-সার। ৬। গয়া পত্তন। ৭। গঙ্গাবাক্যাবলী। ৮। দুর্গা-ভক্তিতরঙ্গিনী। কীর্ত্তিলতা। ১০। রুক্মিণী স্বয়ম্বর। পদাবলী ব্যতীত সব পুস্তক-গুলিই সংস্কৃতে রচিত।

৫।	কৃত্তিবাস—	জন্ম চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগ	১। রামায়ণ। ২। শিবরামের যুদ্ধ। ৩। যোগাস্তার বন্দনা। ৪। রুক্মাঙ্গদ-রাজার একাদশী।
৬।	সঞ্জয়—	সম্ভবতঃ কৃত্তিবাসের সমকালে।	মহাভারত।
৭।	মালাধর বসু— (গুণরাজ খাঁ)	গ্রন্থরচনা কাল ১৪৭৩—১৪৮০ খৃঃ। চতুর্দ্দশ শতাব্দী।	১। শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়। ২। লক্ষ্মী-চরিত্র।
৮।	নারায়ণদেব—	হুসেন সাহের সময়।	পদ্মাপুরাণ।
৯।	বিজয় গুপ্ত—	ঐ	ঐ
১০।	দ্বিজ জনার্দ্দন	ঐ	মঙ্গলচণ্ডীর উপাখ্যান।
১১।	রতিদেব—		মৃগলুব্ধ।
১২।	শুক্রেশ্বর এবং বাণেশ্বর পণ্ডিত—	১৪০৭—১৭০০ খৃঃ।	রাজমালা
১৩।	কবীন্দ্র পরমেশ্বর—	হুসেন সাহের সময়।	মহাভারত।
১৪।	শ্রীকরণ-নন্দী—	ঐ	অশ্বমেধ পর্ব্ব।
১৫।	দ্বিজ অনন্ত—	সম্ভবতঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে	রামায়ণ।
১৬।	———	পঞ্চদশ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ।	কুলজীগ্রন্থ সমূহ।

এই কবিগণের মধ্যে কবীন্দ্রপরমেশ্বর ও শ্রীকরণ-নন্দীর অনুবাদিত মহাভারত পরোক্ষভাবে সম্রাট্ হুসেন সাহেরই উৎসাহের ফল। বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ ও বহুসংখ্যক বৈষ্ণবগ্রন্থে হুসেনসাহের যশঃ ও কীর্ত্তি বর্ণিত আছে। তিনি প্রথমতঃ হিন্দু-বিদ্বেষী হইয়াও শেষে উদারতা দেখাইয়াছিলেন এবং বঙ্গভাষার উৎসাহবর্দ্ধক বলিয়া গণ্য ছিলেন। এই সম্রাটের নামানুসারে গৌড়ীয় যুগের মধ্যে এক খণ্ডযুগ চিহ্নিত করিয়া তাহাকে "হুসেনী সাহিত্যের কাল" আখ্যা দান করা অনুচিত হইবে না। উপরে উদ্ধৃত ১৫ জন কবির মধ্যে বিদ্যাপতি মিথিলাস্থ বিস্ফীর, চণ্ডীদাস বীরভূমান্তর্গত নান্নুরের ও মালাধর বসু কুলীনগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। অবশিষ্ট কবিগণের অধিকাংশ পূর্ব্ববঙ্গের কবি। ইঁহাদের মধ্যে বিজয়গুপ্ত বরিশাল—ফুল্লশ্রীগ্রামের, নারায়ণ-দেব ময়মনসিংহের, রাজমালালেখকদ্বয় ত্রিপুরার এবং কবীন্দ্র-পরমেশ্বর, শ্রীকরণ-নন্দী ও রতিদেব চট্টগ্রামের অধিবাসী। বঙ্গদেশের প্রত্যেক প্রদেশেই ভাষাকাব্য রচিত হইয়াছিল, কোন প্রদেশই একেবারে প্রতিভাশূন্য মরু ছিল না। অরণ্য-কুসুম ও গ্রাম্যকবিতা সর্ব্বত্রই প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সম্বন্ধে যথাযথ অনুসন্ধান হয় নাই, হইলে

হুসেনী সাহিত্য।

কবিগণের বাসস্থান।

বহুকালের আবদ্ধ ধূসরবর্ণ তুলট কাগজের সমাধিক্ষেত্র হইতে আমরা প্রাচীন কবিগণের আর কতগুলি কঙ্কাল উত্তোলন করিতে পারিব, কে বলিতে পারে?

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, হিন্দুধর্ম্মের উত্থানের নানাবিধ চেষ্টাই বঙ্গভাষা বিকাশের প্রথম এবং প্রধান কারণ। যে সে পুস্তক লিখিলেই তাহা সাধারণ কর্ত্তৃক গৃহীত হইত না। শুধু পুস্তকের বিষয় ধর্ম্মপ্রসঙ্গের অন্তর্গত হওয়া প্রয়োজনীয় ছিল এমন নহে, প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত লেখক না হইলে কেহ শুধু প্রতিভা কি স্বকীয় মনস্বিতার বলে দাঁড়াইতে পারিতেন না! এইজন্য প্রাচীন বঙ্গীয় লেখকগণের অনেককেই প্রত্যাদেশের ভাণ করিয়া কাব্য লিখিতে হইত। দেবাদেশে কাব্য-রচনায় হাত দিয়াছেন, একথা ঘোষণা করা সাহিত্যের ব্যবসাদারী ছিল। সমাজের শাসনের প্রতিভা স্বীয় শক্তিতে দাঁড়াইতে সাহসী হইত না। কৃত্তিবাস লিখিয়াছিলেন,—"কৃত্তিবাস রচে গীত সরস্বতীর বরে"—তাঁহার সঙ্গে দল বাঁধিয়া বহুসংখ্যক লেখক 'স্বপ্ন' কি 'বরের' দোহাই দিয়ে কাব্যের মুখপাত আরম্ভ করিয়াছেন। 'কায়স্থ কুলেতে জন্ম কুলীন গ্রামে বাস। স্বপ্নে আদেশ দিলেন প্রভু ব্যাস॥"—মালাধর বসু লিখিয়াছেন। 'বিজয় গুপ্ত রচে গীত মনসার বরে।'—ইঁহার স্বপ্নের কথা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। 'পাঁচালী সঞ্জয় রচিল দেববলে।'—বে, গ, পুঁথি ৪৫১ পত্র) সঞ্জয় লিখিয়াছেন। পরবর্ত্তী সময়ে কবি-কঙ্কণের "চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে" পদ সকলেই জানেন। কবি কৃষ্ণরাম স্বপ্নে ব্যাঘ্রের দেবতা দক্ষিণের রায়ের মারফৎ যে আদেশ পাইয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইঁহার স্বপ্ন-বৃত্তান্ত শুনিলে পাঠকের সর্ব্বাঙ্গ শিহরিত ও বাধ্য হইয়া কাব্যখানিকে ভাল বলিতে হয়। স্বপ্নে কবির নিকট আদেশ এই,—"তোমার কবিতা যার মনে নাহি লাগে। সবংশে তাহারে তবে সংহারিবে বাঘে।" কিন্তু এই স্বপ্নময় কবিতাকাননে ভারতচন্দ্রের স্থান সকলের উপরে। ভগবতী মজুমদারের নিকট ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছেন,—

> "জ্ঞানবান হবে সেই আমার কৃপায়।
> এই গীতি রচিবার স্বপ্ন কব তায়॥
> কৃষ্ণচন্দ্র আমার আজ্ঞার অনুসারে।
> রায়গুণাকর নাম দিবেক তাহারে॥
> সেই এই অষ্টমঙ্গলার অনুসারে।
> অষ্টাহ মঙ্গল প্রকাশিবেক সংসারে॥
> ডিউসাই নীলমণি কণ্ঠআভরণ।
> এই মঙ্গলের হবে প্রথম গায়ন॥"

দেবীর অপার লীলাগুণে কাব্যের উৎপত্তি, বিকাশ ও গায়েন কর্ত্তৃক কীর্ত্তন,—সমস্তই স্বপ্ন-নিয়ন্ত্রিত।

পূর্ব্বোক্ত কবিগণের মধ্যে হয়ত কেহ প্রকৃতই স্বপ্ন দেখিয়া থাকিবেন। কিন্তু তস্করের দলে পড়িয়া সত্যভাষী সারসপক্ষীটিকেও যেরূপ কুসঙ্গহেতু বন্দী হইয়া শাস্তি পাইতে হইয়াছিল, ইঁহাদের মধ্যে সত্যবাদী কবির উপরও সেরূপ ব্যবস্থা হইতে পারে।

বৈষ্ণব কবিগণের সততা।

কিন্তু বৈষ্ণবগণ প্রাচীন সংস্কারগুলি দলন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রতিভা সত্যের সরল পথ আবিষ্কার করিয়া স্বাধীনতার মুক্তরাজ্যে বিহার করিয়াছিল। তাঁহারা যাহা লিখিয়াছেন, তাহা বিনয়মাখা; প্রত্যাদেশের ঝুঁটা গিল্টি তাঁহারা দেখান নাই। ঐ সব আদেশগর্ব্বিত লেখকগণের সঙ্গে সাক্ষাতের পর নরোত্তম দাসের,—'শ্রীগুরু বৈষ্ণব পদ হৃদয়েতে ধরি। চৈতন্তের হাটে নিত্য ঝাড়ুগিরি করি॥" বৃন্দাবন দাসের,—'শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ জান। বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥' কিংবা কৃষ্ণদাস কবিরাজের,—'মূর্খ নীচ ক্ষুদ্র মুঞি বিষয়লালস। বৈষ্ণবাজ্ঞা বলি করি এতেক সহস॥' প্রভৃতি পড়িয়া দেখুন; সরল ও বিনয়নম্র কথাগুলি পুষ্পমালার ন্যায় আপনিই সুরভিময়।

পঞ্চগৌড় ও বঙ্গদেশ।

পঞ্চগৌড়ের বিষয় ইতিপূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। এই পঞ্চগৌড়ের মধ্যে মিথিলাই বঙ্গদেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক। মিথিলার ভাষা 'ব্রজবুলি' বাঙ্গালা সাহিত্যের একটি অধ্যায় অধিকার করিয়া আছে; মিথিলার সংস্কৃত টোল নবদ্বীপের শিক্ষাগুরু;—এ সকল কথা ষষ্ঠ অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে। মৈথিল অক্ষর (তিরুটে অক্ষর) বঙ্গদেশে গৃহীত হইয়াছিল।* মিথিলার পরে কান্যকুব্জ বঙ্গদেশের শিক্ষা প্রদানে সহায়তা করিয়াছে। কনোজ বঙ্গদেশকে পঞ্চব্রাহ্মণ ও পঞ্চকায়স্থরূপ সুবর্ণমুষ্টি দান করেন; কিন্তু এইখানেই এ ঋণের শেষ নহে। 'পাঞ্চালী' নামক গীত পঞ্চালেই (কনোজে) উদ্ভূত হওয়া সম্ভব; এই 'পঞ্চালী গীতের আদর্শ লইয়া বঙ্গভাষার প্রথম গীতগুলি রচিত হইয়াছিল। সারস্বত প্রদেশের শকাব্দা বঙ্গদেশে গৃহীত হয়। এইরূপে দেখা যায়, আর্য্যজাতির এই পঞ্চশাখা পূর্ব্বে পরস্পরের সন্নিকটবর্ত্তী ছিল। ইহাদের সমস্তটির ইতিহাস না জানিলে একশাখার উৎকৃষ্ট ইতিহাস লেখা সম্ভব নহে। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য আলোচনা করিলে হিন্দুস্থানী, মৈথিলী, ও উড়িয়া প্রভৃতি ভাষার অনেক শব্দের ঐক্য দৃষ্ট হয়। এই প্রাদেশিক ভাষাগুলির একটি অপরটি হইতে উদ্ভূত হয় নাই—কিন্তু একজাতির ভিন্ন ভিন্ন পঞ্চ শাখা, সে সময়ে পরস্পরের অধিকতর নিকটবর্ত্তী ছিল, এইজন্য এই সাদৃশ্য।

পঞ্চশাখার ঘনিষ্ঠতা।

---

* ত্রিহুতের অক্ষরের একটী বিশেষ ভাব এই যে, 'ব' এর নীচে সর্ব্বত্রই শূন্য আছে, (See Grierson's Maithil Grammar, J A. S Extra no. 1880)। আমরা প্রাচীন অনেকগুলি হস্তলিখিত পুঁথিতে 'ব' এর নীচে শূন্য এবং পেটকাটা 'ব' পাইয়াছি।"

আমি প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের 'ব্রজ-বলি' চিহ্নিত অধ্যায়ের কথা বলিতেছি না। 'ব্রজ-বুলি' মৈথিল ভাষা ও বাঙ্গালার মিশ্রণে এক নূতন সৃষ্ট ভাষা—উহা মনুষ্যের উক্তি নহে, লেখনীর উক্তি। বঙ্গসাহিত্যে ব্রজবুলিচিহ্নিত অংশ বাদ দিলেও খাঁটি বাঙ্গালা যে সব পুস্তক আছে, তাহাতে হিন্দী, মৈথিলী প্রভৃতি ভাষায় সঙ্গে সেকেলে বাঙ্গালার অধিকতর নৈকট্য দৃষ্ট হয়। নিম্নে কতকগুলি শব্দের উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে :—

বঙ্গভাষার সঙ্গে হিন্দী ও মৈথিলের মিশ্রণ।

যেত্‌কে, তেত্‌কে, তুম্বা, বড়ুয়া (বড়), পাইতায় (প্রত্যয় করে) সুবোধিয়া সকয়া, পোখেরি, বাবন (ব্রাহ্মণ), দোন, ডাবিয়া, (মা, চ গা,); সাসিয়াল, বাউরী, সতাই, শিবাই বড়ি (বড়), টুট, পাকনা, ফাগু, সোয়াস্তি (বিজয়গুপ্ত); বহিন, শুতিল, এড়া (কৃত্তিবাস) আরব—(আওর) আর, কয়িলোহু—করিলাম, ভৈল—হইল, বড়া—বড়, হুঁয়া—হ'য়ে, বহু‍ঁতর—অনেক, হুয়োক—হউক, আবে—এখন, হুইনুই—হই কি না, পালটায় কিরে, কিসক—কেন, তাহাই—তাই, ন জীবো—বাঁচিব না পিন্ধই—পরিধান করে। (অনন্ত রামায়ণ); কঁরো, কৈলু, দোঁহা আঁইলু, শকুনিয়া করিলেন্ত, যায়, পড়িলেন্ত, আইবেন্ত ইত্যাদি; মোহর, (আমার), চাহসি, কহসি, ইত্যাদি, নিয়ড়ে কাহা (কোথায়), তুমি সব, বাও (বাতাস), বোলাও, এহি, বিহা, চিহ্নি (চেনা), নিদ, কেহ্নে. পাকায় (সঞ্জয়, কবীন্দ্র, শ্রীকরণ-নন্দী প্রভৃতি); ইহা ছাড়া 'পরদেশক লাগিয়া' 'জলক লাগিয়া, (মা, চ গা); 'ঘরকে গমন' (কৃত্তিবাস); 'কাঁহে কেরবাল' (শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়) 'করে বীর বেণেরে জোহার' (ক, ক, চ,) প্রভৃতি পদও হিন্দীর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। †

পরিচ্ছদে সাদৃশ্য।

শুধু ভাষার ঐক্য নহে, পরিচ্ছদাদিতেও উত্তর-পশ্চিমের ভ্রাতাদের সঙ্গে তখন অধিকতর নৈকট ছিল। বিজয়গুপ্তের বর্ণিত সিংহলরাজ চাঁদসদাগরের নিকট পট্টব পাইয়া তাহা বাঙ্গালীভাবে পরিতে শিখিতেছেন,—"একখান কাচিয়া পিে আর একখান মাথায় বান্ধে, আর একখান দিল সর্ব্বগায়।" মা মরিয়াছেন, খেতুরি রাজাকে বলিতেছে "কার জন্যে পাগড়ি রাখিছ মস্তকের উপর"—মাণিকচাঁদের গান (৩৫২ শ্লোক) এই সকল বর্ণনায় মালকোঁচ

---

† উদ্ধৃত শব্দগুলির মধ্যে শুতিল' শব্দ এখনও মৈথিল ভাষার প্রচলিত আছে (See Grierson's Mait Grammar, J. A. S Extra No. 1880)। করন্ত, বোলন্ত প্রভৃতি উড়িয়া ভাষার ব্যবহৃত হয়; 'শকুনি প্রভৃতি শব্দ হিন্দীর অনুরূপ। এস্থলে বলা যাইতে পারে, সম্ভবতঃ খোট্টার মুখে বঙ্গাধিপের নাম 'লক্ষ্মণিয়া' শুনিয়া অ ফাজল যে নাম লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে 'লক্ষ্মণের' নাম ব্যাকরণের সাহায্যে সৃষ্ট হইয়া বঙ্গ-ইতিহাসে প্রচ হইয়াছে। "আবে" শব্দ হিন্দী 'অব' শব্দের মত। এখনও পূর্ব্ববঙ্গের নিম্নশ্রেণীর লোকগণ কোন কোন স্থানে 'এ (এখন) শব্দ ব্যবহার করে। আমরা উদ্ধৃত শব্দ সংগ্রহে চণ্ডীদাস কি কোন 'ব্রজবুলি' অধিকৃত লেখকের সা গ্রহণ করে নাই।

মারা পাগড়ি মাথায় ঠিক খোট্টার ছবিটি জাগিয়া উঠিতেছে। 'লম্বোদর', 'নাভি সুগভীর' প্রভৃতি বর্ণনায় বোধ হয় খোট্টাদের মত বাঙ্গালীরাও উন্মুক্ত উদর ও নাভি দেখাইয়া প্রশংসিত হইতেন। এইরূপ বস্ত্রপরিহিত স্বামীর পার্শ্বে কাঁচলিআঁটা রমণীই শোভা পায়, প্রত্যুত বাঙ্গালী নারীর পরিচ্ছদও খোট্টার দোকানে ক্রীত।—স্ত্রীলোকের কাঁচুলি পরার রীতি কৃত্তিবাস, গুণরাজ খাঁ, বিজয়গুপ্ত ও বৃন্দাবন দাস হইতে আরম্ভ করিয়া কবিকঙ্কণ প্রভৃতি অনেক কবিই বর্ণন করিয়াছেন। কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজার সময়ও এই রীতি একেবারে পরিত্যক্ত হয় নাই ;—"রাজ্ঞী ও রাজবধূ এবং রাজকন্যারা কার্পাস বা কৌষেয়শাটী পরিতেন, কিন্তু প্রায় মস্তক শুভ কর্ম্মোপলক্ষে পশ্চিমোত্তর দেশীয় সম্ভ্রান্ত মহিলাগণের ন্যায় কাঁচুলি, ঘাগরা ও ওড়না পরিধান করিতেন।" (ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত ৩৫ পৃঃ)। আমরা বৈষ্ণব কবির পদেও পাইয়াছি "নীল ওড়নার মাঝে মুখ শোভা করে। সোণার কমল বলি দংশিবে ভ্রমরে ॥" (পঃ কঃ, ত, ১৩৭৭ পদ)। এতদ্ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ে,—"কটিতটে ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা ভাল সাজে। রতন মঞ্জরী রাঙ্গা চরণেতে রাজে ॥" নীবিবন্ধের উল্লেখও অনেক প্রাচীন কাব্যেই পাওয়া যায়! এই সব নরনারীগণ যে দু'একটী হিন্দী শব্দ ব্যবহার করিবেন কিম্বা ব্রজবুলির ন্যায় অদ্ভুত পদার্থের সৃষ্টি করিয়া পদ্য লিখিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি আছে?

উড়িষ্যা মান্দ্রাজ এবং উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের কোন কোন দেশের অধিবাসীর ন্যায় বাঙ্গালী পুরুষগণও পূর্ব্বে দীর্ঘকেশ রক্ষা করিতেন। তাঁহারা দীর্ঘ কেশ বাঁধিয়া রাখিতেন, এবং কখনও তদ্দ্বারা বেণী গ্রথিত করিতেন; রাধার সখীগণ শ্যামচাঁদকে বলিতেছেন;— "আজি কেন পিঠে দোলে বেণী।" (চণ্ডীদাস)। শ্রীচৈতন্যদেবের কেশমুণ্ডনের সময় শিষ্যগণ বিলাপ করিতেছে,—"কেহ বলে না দেখিয়া সে কেশ বন্ধন। কিমতে রহিবে এই পাপিষ্ঠ জীবন। কেহ বলে সে সুন্দর কেশে আরবার। আমলকী দিয়া কিবা করিব সংস্কার॥" (চৈ, ভা, মধ্যখণ্ড)। "পলায় রামের সৈন্য নাহি বান্ধে কেশ।" (কৃত্তিবাস)। "পরম সুন্দর লখাইর দীর্ঘ মাথার চুল। জ্ঞাতিগণ ধরি নিল গাঙ্গুড়ির কুল॥" (বিজয়-গুপ্ত)।

শুধু ভাষা ও পরিচ্ছদাদিতে নহে, আহারে ব্যবহারেও সেই নিকট-সম্বন্ধ প্রতীয়মান হইবে।

আহারে ব্যবহারে ঐক্য।

ভারতচন্দ্র মহাদেবের মুখে প্রচার করিয়াছেন,—"দুধ কুসুম্ভায় আজি হয়েছে বাসনা।" বঙ্গবাসীর সংস্করণের বিস্তৃত টীকায় এই 'কুসুম্ভা'র অর্থ লেখা হইয়াছে, 'একরূপ সামগ্রী'। এখন বাঙ্গালীর 'কুসুম্ভা' অর্থ জ্ঞাত হওয়ার সুবিধা নাই, কিন্তু রাজপুতনা এবং তন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশ সমূহে এই 'কুসুম্ভা' ভক্ষণ এখনও একটি বিশেষ উপাদেয় ব্যাপার; উহা অহিফেনের দ্বারা প্রস্তুত হয় এবং কুসুম্ভাভক্ষণের জন্য নিমন্ত্রণ একটি উৎসবরূপে গণ্য হইয়া থাকে। এইরূপ প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের নানা দিক্ হইতে উত্তরপশ্চিমদেশবাসীদিগের সঙ্গে আমাদের

নিকট সম্বন্ধের সাক্ষ্য পাওয়া যায়। খোট্টা, মৈথিল, উড়িয়া, বাঙ্গালী এক বৃক্ষের ভিন্ন ভিন্ন শাখা, ক্রমে শাখাগুলি ব্যবধান হইয়া পড়িয়াছে। ভাষা ও সাহিত্যের মানচিত্রে এই ক্রমদূরবর্ত্তিতার চিত্র চিত্রিত আছে, তদৃষ্টে লুপ্তপ্রায় সম্বন্ধের স্মৃতি জাগরিত হয় এবং জাতীয় ঐক্যের বন্ধন দৃঢ়ীভূত হয়।

বঙ্গদেশে সমাগত আর্য্যজাতির শাখা আবার দুই উপশাখায় বিভক্ত হইল। পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গের ভাষা এখন যত দূরবর্ত্তী, পূর্ব্বে ততদূর ছিল না। পূর্ব্বের এক অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, 'করিমু' ও করিবু', এই দুইরূপ ক্রিয়ার ব্যবহারই প্রাচীন সাহিত্যে দৃষ্ট হয়; ডাকের বচনে 'করিবু' ক্রিয়া পাওয়া গিয়াছে; মাণিক-চাঁদের গানেও সেরূপ ক্রিয়া অনেক স্থলেই দৃষ্ট হয়,—"ফুল গোঠেকে দেখিয়া ফুল না পাড়িবু। পাখী গোঠেকে দেখিয়া ডিমা না মারিবু। পরের স্ত্রী দেখিয়া হাস্য না করিবু॥" (৫৬৩ শ্লোক)। "তুমি হবু বটবৃক্ষ, আমি তোমার লতা। রাঙ্গা চরণ বেড়িয়া লবু পলায়ে যাবু কোথা॥" (১৭৫ শ্লোক)। পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যে 'করিমু' প্রভৃতি ক্রিয়ার বহুল প্রয়োগ নষ্ট হয়,—

পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গের ক্রিয়াপদ।

"যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তয়িমু নাম সংকীর্ত্তন। ভক্তি দিয়া নাচায়িমু এ তিন ভুবন॥ আপনি করিমু ভক্তি অঙ্গীকার। আপনি আচারি ভক্তি শিখামু সবায়॥" চৈ, চ, আদি; ৩য় পরিচ্ছেদ।

চণ্ডীদাস এবং গুণরাজ খাঁও এইরূপ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। এই দুইরূপ ক্রিয়াই পূর্ব্বকালে প্রচলিত ছিল। কিন্তু বোধ হয়, কালে 'করিমু' হইতে 'করিবু' ক্রিয়ার পক্ষে পশ্চিমবঙ্গের রুচি অধিকতর অনুকূল হইল, 'করিব' (কর্ত্ত) 'খাব', 'যাব', ইত্যাদির প্রচলন হইল। পূর্ব্ববঙ্গে 'করিমু', 'করুম' ইত্যাদি রূপ গৃহীত হইয়া প্রচলিত হইল; কিন্তু উক্ত প্রদেশের নিতান্ত মফস্বলে 'করিবাম', 'খাইবাম' ইত্যাদিরূপও লক্ষিত হয়। নারায়ণদেবের পদ্মপুরাণের উদ্ধৃতাংশে সেইরূপ ক্রিয়ার প্রয়োগ দৃষ্ট হইবে। পশ্চিম বঙ্গেও যে এতকালে সেইরূপ ক্রিয়ার ব্যবহার ছিল, তাহার আভাস আছে। 'করিবাঙ', 'যাইবাঙ', 'বলিবাঙ', প্রভৃতি শব্দ চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যভাগবত প্রভৃতি পুস্তকে প্রায়ই দৃষ্ট হয়। কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ পশ্চিমবঙ্গের লেখক; উক্ত গ্রন্থকারকৃত 'মনসা-দেবীর ভাসান' হইতে দুইটি ছত্র উঠাইতেছি,—

"মনসা বলেন আমি দিবাম এই বর। সাত ডিঙ্গার ধন হবে চৌদ্দ ডিঙ্গা ভর॥" কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দের ভাসান, অপার চিৎপুর রোড, ২৮৫ সংখ্যক ভবনে বিদ্যারত্নযন্ত্রে মুদ্রিত, পৃঃ ৪৫।

পূর্ব্ববঙ্গ প্রচলিত 'আছিল' শব্দ পশ্চিম বঙ্গের অনেক পুঁথিতেই পাওয়া যায়। সুতরাং এই ক্রিয়াপদগুলি পূর্ব্বকালে বঙ্গের দুই অংশেই কতক পরিমাণে প্রচলিত ছিল; কালক্রমে কিছু কিছু রূপান্তরিত হইয়া শব্দগুলি এক এক আকারে এক এক দেশে বদ্ধমূল হইয়াছে।

করসি, করেন্ত, বোলেন্ত, ইত্যাদি ক্রিয়া পূর্ব্ববঙ্গে প্রাচীন সাহিত্যে অনেক স্থলেই; দৃষ্ট হয়

পশ্চিম বঙ্গের প্রাচীন পুঁথিগুলিতেও সেরূপ ক্রিয়া একেবারে দুষ্প্রাপ্য নহে। আমরা শ্রীকৃষ্ণবিজয় হইতে 'পিবন্তি', চৈতন্যচরিতামৃত হইতে 'যান্তি' ও ডাকের বচন হইতে 'খায়াসি', 'পুজসি' প্রভৃতি ক্রিয়ার উদাহরণ দিয়াছি। (২৬, ৮২ পৃষ্ঠা। অন্যান্য শব্দের আলোচনা করিলে দেখা যায়, পূর্ব্ববঙ্গের বহুসংখ্যক শব্দই কতক পরিমাণে প্রাচীনরূপ রক্ষা করিয়াছে। প্রাকৃতের 'ও'—(তো)-প্রিয়তা পূর্ব্ববঙ্গের প্রাচীন পুঁথিগুলিতে দৃষ্ট হয় ; যথা :—

শব্দ	...	পূর্ব্ববঙ্গের পুঁথিতে প্রাপ্ত রূপ।			শব্দ		পূর্ব্ববঙ্গের পুঁথিতে প্রাপ্ত রূপ।		
মা	...	(মাতা)	...	মাও।	গাঁ	...	(গ্রাম)	...	গাঁও।
পা	...	(পদ)	...	পাও।	ছা	...	(ছানা)	...	ছাও।
ঘা	...	(ঘাত)	...	ঘাও।	দা	...	...	...	দাও।
না	...	(নৌকা)	...	নাও।	ভাব	...	...	...	ভাও।
রা	...	(রব)	...	রাও।	বা	...	(বাত)	...	বাও।
গা	...	(গাত্র)	...	গাও।	তা	...	(তাপ)	...	তাও।

এই সব শব্দের কোন কোনটি পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীন পুঁথিতেও পাওয়া যায়, যথা—
"নাট গীতি হুখে যাও, রূপার দোলায় ফেলায় পাও।" (খনা)।

প্রাচীন সাহিত্যপাঠে পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের—এই দুই উপশাখার বর্ত্তমান সময়াপেক্ষা অধিকতর নিকট-সম্বন্ধের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। এই ক্রমিক দূরবর্ত্তিতা যদি আরও বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তবে কালে আমরা সম্পূর্ণ পৃথক্ জাতির ন্যায় হইয়া দাঁড়াইতে পারি। পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গে বিবাহবন্ধনাদি দ্বারা একজাতীয়তা ও একভাষা রক্ষিত থাকা সম্ভব, কিন্তু অন্যান্য দেশের সঙ্গে সেরূপ সামাজিক বন্ধন রহিত হইয়া যাওয়াতে আশঙ্কার কারণ না আছে, এমত নহে। এই বিচ্ছিন্নতাগ্রস্ত জাতীয় জীবনের একমাত্র আশা– সংস্কৃত শাস্ত্রের অনুশীলন। সেই শাস্ত্র হস্তে লইয়া উড়িয়া, খোট্টা, মৈথিল,—পঞ্চগৌড় ছাড়িয়া—পঞ্চদ্রাবিড়ের সঙ্গেও আমরা একতা-সূত্রে বদ্ধ হইতে পারি। পূর্ব্ব-পুরুষদিগের প্রসঙ্গে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন জাগরিত হয়,—বহু এক হইয়া যায়।

কালে পৃথক জাতিতে পরিণতির সম্ভাবনা।

'বৌদ্ধ যুগ'-অধ্যায়ের রচনায় সংস্কৃতের-প্রভাবচিহ্ন নাই। বর্ত্তমান অধ্যায়ের সাহিত্য অনেকটা মার্জ্জিত ও সংস্কৃতানুযায়ী বিশুদ্ধতা লাভে প্রয়াসী। মাণিকচাঁদের গানে বর্ণিত পুরুষ ও স্ত্রীলোকের যে কয়েকটি নাম পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের অধিকাংশই সংস্কৃতের সংস্রব-রহিত, যথা—অদুনা, পদুনা, খেতুরি ; নেঙ্গা, ময়নামতী। চণ্ডীদাস—শ্যামলা, বিমলা, মঙ্গলা, ও অবলা, শ্রীরাধার সখী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, এ সকল নাম সংস্কৃতের মত। কিন্তু বিজয়গুপ্তের পদ্মপুরাণে সংস্কৃত ও অসংস্কৃত নাম উভয়ই পাওয়া

বৌদ্ধ-যুগান্তে ক্রমশঃ সংস্কৃত-প্রভাবের বিস্তৃতি।

যায়,—লখীন্দরের বিবাহবাসরে এয়োগণের কতকগুলি নাম সংস্কৃত-ভাবাপন্ন, যথা—কমলা, বিমলা ভানুমতী, রোহিণী, রমণী, তারাবতী, সুনন্দা, সুভদ্রা, রতি তিলোত্তমা, সরস্বতী, চন্দ্ররেখা, কৌশল্যা, কুমারী, বামা, চন্দ্রপ্রভা, দুর্লভা, অনুপমা, রত্নমালা, জাহ্নবী, চন্দ্রকলা, রঙ্গিনী, মলয়মালা, জয়মালা, বিজয়া, ভবানী, শিবানী, মাধবী, মালতী, বগুলা, সরলা। কিন্তু তখনও সংস্কৃতের প্রভাব বিলুপ্ত হয় নাই; অন্যান্য এয়োগণের নাম ও গুণরাশি উভয়ই হাস্যোদ্দীপক—উদ্ধৃতাংশের মধ্যে মধ্যে দুই একটী সংস্কৃত নাম আছে,—"একজন এয়ো আইল তার নাম রাধা। ঘরে আছে স্বামী তার যেন পোষা গাধা॥ আর এক এয়ো আইল তার নাম রাই। মস্তকে আছয়ে তার চুল গাছ দুই; আর এক এয়ো আইল তার নাম সরু। গোয়ালঘরে ধোঁয়া দিতে খোঁপা খাইল গোরু॥ আর এক এয়ো আইল তার নাম কুই। দুই গালে ধরে তার ক্ষুদ মণ দুই॥ আর এক এয়ো আইল তার নাম শশী। মুখে নাই দন্ত গোটা ওষ্ঠে দিছে মিশি॥ আর এক এয়ো আইল তার নাম আই। দুই গাল চওড়া চওড়া নাকের উদ্দেশ নাই॥ আর এক এয়ো আইল তার নাম চুয়া। ঘর হৈতে বাহিরিতে শিরে ধরে টুয়া॥" (বিজয়গুপ্ত)। বেহুলা, লখাই, নেড়া, সমাইওঝা, সায়বেণে, ফুল্লরা, খুল্লনা—এসব নামও সংস্কৃতের মত নহে। 'বেহুলা' বিপুলার অপভ্রংশ হইতে পারে, কারণ প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথিতে বেহুলার স্থলে 'বিপুলা পাওয়া যায়; কিন্তু অন্যনামগুলি সংস্কৃতভাবাপন্ন বলিয়া বোধ হয় না; পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় ফুল্লরা, খুল্লনা প্রভৃতি শব্দও সংস্কৃতসূত্রদ্বারা ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। * পাণ্ডিত্য-বলে অপরাজিতাকেও পারিজাত ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে—এইভাবের ব্যাখ্যায় কল্পনাসুন্দরীকে বিলক্ষণ কষ্ট স্বীকার করিতে হয় সন্দেহ নাই। কুলজিগ্রন্থগুলি অনুসন্ধান করিলে দৃষ্ট হইবে, ১৯।২০ পুরুষপূর্ব্বে অধিকাংশ নামই অসংস্কৃত ছিল। এখনও বহুসংখ্যক প্রাচীন গ্রামের নামের সঙ্গে সংস্কৃত শব্দের অনুমাত্রও সাদৃশ্য দৃষ্ট হয় না। সেগুলি বৌদ্ধাধিকার ও প্রাকৃতিক যুগের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। পল্লীকথা-সাহিত্যে বৌদ্ধযুগে প্রচলিত 'আয় বেণে' 'সায় বেণে' 'মন্ত বেণে' প্রভৃতি নাম পাওয়া যায়। এই অধ্যায়বর্ণিত সাহিত্যে সংস্কৃতের দিকে ক্রমশঃ রুচির অনুকূলতা লক্ষিত হয়। অনুবাদ-গ্রন্থ ও সংস্কৃতের অনুশীলন দ্বারা প্রাকৃতের আবর্জ্জনা মার্জ্জিত হওয়ার চেষ্টা আরম্ভ হইল; কিন্তু তখনও বঙ্গগৃহের মনোমোহিনীগণের নাম 'দুই', 'রাই', 'কুই', 'আই', প্রদত্ত হইত। এখন সংস্কৃতের পূর্ণ আধিপত্যের কালে কোন ললনার এবম্বিধ নামকরণ হইলে, তাঁহার বিবাহ হওয়া ও বিবাহান্তে সুরুচি-সম্পন্ন স্বামীর নিকট পত্র লেখা উভয়ই অসুবিধাজনক হইবে। কবিকঙ্কণের সময় ভাষা অনেক পরিমাণে মার্জ্জিত হইয়াছে, এয়োগণের নাম সমস্তই সংস্কৃতাত্মক—এবং বৈষ্ণবাধিকারের প্রভাবব্যঞ্জক; যথা—বিমলা চাঁপা, কমলা ভারতী, পার্ব্বতী, সুবর্ণরেখা, লক্ষ্মী, পদ্মাবতী, বল্লভা, দুর্লভা, রম্ভা, সুভদ্রা, যমুনা, চরিত্রা, তুলসী, শচী, রাণী, সুলোচনা, হীরা, তারা, সরস্বতী, মদন-মঞ্জরী, চিত্ররেখা, সুধা, রাধা, দয়া, মন্দোদরী, কৌশল্যা, বিজয়া, গৌরী, সুমিত্রা, যশোদা, রোহিণী, কাদম্বরী।

* বঙ্গভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব ১০৭ পৃঃ।

এই অধ্যায়ের আলোচিত পুস্তকগুলিতে আমরা নানারূপ শব্দ পাইয়াছি, তাহাদের কতকগুলি প্রচলিত নাই, কতকগুলি ভিন্নার্থ পরিগ্রহ করিয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়োক্ত শব্দগুলিরও কতক এই যুগের সাহিত্যে পাওয়া গিয়াছে, সেগুলি বাদ দিয়া অপরাপর দুরূহ শব্দার্থের তালিকা দেওয়া হইতেছে। *

প্রচলিত শব্দার্থ।

বিজয় গুপ্তের পদ্মপুরাণে—ভোল—বিভোর (অতিকামে হৈয়া ভোল। শ্রীফল গাছ দিল কোল।); আসোয়াস্থ—অসুস্থ; অগল—দক্ষ, অগ্রসর; শাসিয়াল—তেজস্বী (শাসিয়াল ঘর তুমি বিবাদে আগল); চোপা—মুখ; উদাসিনী—অনাথা (শিবের কুমারী আমি উদাসিনী নহি); নবগুণ—নবগুণ, উপবীত; (দন্ত-ভ্রূকুটী করে নবগুণ ভুলি ধরে); সম্বিধান—অবধান, মনোসংযোগ; খিটে—খুঁটিয়া তোলা; ছামনিতে—সম্মুখে; রড়ি—রড়, ধাই—মাতা; মাই—মাতা; অধান্তর—চেষ্টা, শ্রম, বিপদ (বহু অধান্তর সেই পুষ্পের কারণ); মেলানি—বিদায়; গোহারি—কাতর প্রার্থনা; বাহুড়িয়া—ফিরিয়া, পাকনা—পক; পাঁচে—চিন্তা করে; আচাভুয়া—নির্ব্বোধ; ঠান—ভাব; সহিলা ও সইলা—সঙ্কীত †; ভাণ্ডালে—ভাঁড়ালে; পরিপাটী—কারিগরী (কার সাধ্য বুঝিতে পারে দেবের পরিপাটী); টনক—শক্ত (টনক করি ধরি মুখে দিল এক মুঠ); সোসর—তুল্য; তেলেঙ্গা—হৃষ্টপুষ্ট; অবস্থা—কষ্ট; (সম্ভাবনা—সম্পত্তি) (সম্ভাবনা কেবল বলদ); সুশীত—শ্রীযুত; সানে—ইঙ্গিতে (হাতসানে বলে সবে মিনিটেক রহ); তিতা—আর্দ্র। ‡ কৃত্তিবাসী রামায়ণে,—সন্তোক—যৌতুক, নিবড়ে—অতীতে, ভোকে—ক্ষুধায় লোহ—অশ্রু, ওর—সীমা, রড়—দৌড়। কোঙর—পুত্র। সঞ্জয়কৃত মহাভারতে,—আহ্মি—আমি, তুহ্মি—তুমি, মোহর—আমার, সমাইয়ে—সকলকে, আগুয়ান—অগ্রসর, সুসারিত—শ্রেষ্ঠ, যুরায়—যোগ্য হয়, কেনি—কেন, পুনি—পুন, বিনি—বিনে, খেরি—খেলা, হনে—হইতে, আপু—আপন। অনন্ত রামায়ণে—তযু—তোমার খেলা—রাখিল, আবর (হিন্দী—আওর)—আর, আরে—এখন, জাঞ—যাব, পুতাই—পুত্র, পোরে,—পুত্রে ("গলাগলি করি কাঁদে তিন বাপে পোয়ে" অশস্ত) এতিক্ষণে—এতক্ষণে, বুঢ়া—প্রাচীন (দ্রব্যাদি বোধক, যথা, "বুঢ়া ধনু ভাঙ্গিলেক") তেবে—তখন, তঁতো—তার পর, তেতিক্ষণে—তখন, করিলহোঁ—করিলাম, পুনু—পুনঃ, কাটিবোহোঁ—কাটিব, কাটয়োক—কাটা মিলি—হরে ("বড় দুঃখ মিলি গেল"), তাইক—তাহাকে, সোমাইল,—প্রবেশ করিল, বাহুড়িল—ফিরিল ওকাইলা—হাঁকাইল, লগতে—সঙ্গে উলটাইল—ফিরাইল ("রাজাক গৃহে লাগে উলটাইল") কন্দিয়োক লৈলা—কাঁদিতে লাগিল, তেহ—

---

* আমরা উদ্ধৃত শব্দের অধিকাংশই ষষ্ঠ অধ্যায়-বর্ণিত অনেক কাব্যেই পাইয়াছি। একাধিকবার তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন হেতু কেবল এক কবির নাম নির্দ্দেশ করিলাম।

† বোধ হয় এই সহিলা ও সইলা হইতে 'সল্লা' (পরামর্শ) শব্দ আসিয়াছে।

‡ চৈতন্য ভাগবতেও তিতা' শব্দ আর্দ্র অর্থে ব্যবহৃত পাইয়াছি, যথা ;—স্নানান্তে "তিতা বস্ত্র এড়িলেন শ্রীশচীনন্দন।" (মধ্যম খণ্ড)। আরও কয়েক স্থলে এরূপ পাওয়া গিয়াছে। এই "তিতা"র ক্রিয়া হইতে 'তিতিল' (সিক্ত হইল) সচরাচরই দৃষ্ট হয়। সুতরাং 'তিতা' শব্দের সংস্রব লক্ষিত হয় না, উহা 'সিক্ত' শব্দের অপভ্রংশের ন্যায় বোধ হয়। কিন্তু চণ্ডীদাসের "তিতা কৈল দেহ মোর ননদীবচনে"...পদে 'তিতা' শব্দ তিক্তের অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

তেমন ("তঞি হাক আশাকর মঞি তেহ নাহৌ" ("ছুকর—শূকর, আই—নারী, গেড়ি পারন্ত—ডাকিতে লাগিল হুই মুই—হয় নয়, এতিখন—এখন, নাহা—নাথ. ("হাহা রাম রমণ মোহর নিজ নাহা") নবণূ—ননীর, সুগ্রিঞো—সুগ্রীব। মক্‌মকি—উচ্চস্বরে ("এহি বুলি মকমকি কাঁদে রঘুরাই"),— পিম্পয়া—পিপীলিকা, পিন্ধই—পরিধান করে, জুবহিল—জানাইল। কবীন্দ্র ও শ্রীকরণ-নন্দীর অনুবাদে—সম্ভ্রম—ভয়। এই সম্ভ্রম ও সম্ভ্রান্ত শব্দ মর্য্যাদা-ব্যঞ্জক হইয়াছে, কিন্তু পূর্ব্বে ইহাদের অর্থ "ভয়" ছিল; (যথা—"সম্ভ্রম না করে ভীষ্ম হাতে ধনুঃশর)"—সংস্কৃত রামায়ণেও সম্ভ্রান্ত শব্দ ভীত অর্থে প্রযুক্ত দৃষ্ট হয়, যথা,—"সম্ভ্রান্ত হৃদয়ো রামঃ ইত্যাদি (বঙ্গবাসী সংস্করণ, অরণ্য কাণ্ডম ৯৫ পৃঃ), সম্বিধান—মনোযোগ, সমে—সহিত ("গুণ সমে কাটি পড়ে হাতের কোদণ্ড"—শ্রীকর নন্দী), পাড়িমু—ফেলাইব ("ভীষ্ম দ্রোণ কাটিয়া পাড়িমু রথ হৈতে'—কবীন্দ্র), উপালন্ত—উপর। নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণে,—খাথার—অপযশ, একেশ্বর—একাকী, কথা—কোথার, এড়িয়া—ত্যাগ করিয়া। চণ্ডীদাসের পদাবলীতে—* চেট্যোনেট্যো—অল্প বয়স্ক বউগণ, টীট †—ধূর্ত্ত অথলা—সরলা, উতরোল... উৎকণ্ঠিত, ভালে—ভাগ্যে ("ভালে সে নাগরী, হয়েছে পাগলী"), আরদ্র—হরিদ্রা, বড়ু—ব্রাহ্মণপুত্র (কিন্তু বটু শব্দের অপভ্রংশ হইলে ছাত্র), দে—দেহ. টাগ···জঙ্ঘা, আকুতে—আগ্রহে, লেহ—স্নেহ, ওদন—অন্ন, গতাগতি—যাতায়াত, পরিবাদ···নিন্দা। "চিকুর ফুরিছে বসন খসিছে" প্রভৃতি শব্দের "ফুরিছে" (স্ফুরিছে হইতে উদ্ভুত) শব্দ হইতে 'ফুলিছে' শব্দ আসিয়াছে। রাঢ়দেশপ্রচলিত শ্রীকৃষ্ণ বিজয় রেঢ়ো-শব্দ-বহুল; ক্ষীরোদ বাবু সাহিত্য-পত্রিকায় যে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, (সাহিত্য; ৪র্থ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা) তাহাতে সছ (বোধ হয় আরোগ্য), নাকাড়ে—শব্দে, আউদর—এলোথেলো, পোকান—পুর,—প্রভৃতি শব্দ পাওয়া যায়; সম্ভবতঃ এগুলি কবি নিজে ব্যবহার করিয়াছিলেন, কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের হস্তলিখিত ২৫০ বৎসরের প্রাচীন শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ের পুঁথিতে ঐ সব শব্দ নাই। পশ্চিম বঙ্গের প্রাচীন লেখকগণকে পূর্ব্ব-বঙ্গের লোকগণ নিজেদের সুবিধার জন্য কতকটা বাঙ্গালা করিয়া লইয়াছিলেম, কিন্তু মিথিলার বিদ্যাপতি বঙ্গদেশে যতদূর পরিবর্ত্তিত হইয়াছেন, উঁহারা ততদূর হন নাই।

পূর্ব্বোক্ত শব্দগুলি ছাড়া,—কাঠিনী—খড়ি, সমাধান—সেবা, ঘুলে—অনুসন্ধান করে, সাবহিতে—সাবধানে, সারি—নিন্দাবাদ—প্রভৃতি শব্দ পাওয়া যায়। বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে 'বাপু' শব্দ সর্ব্বত্রেই সন্তান কর্ত্তৃক পিতার প্রতি ব্যবহৃত হইয়াছে; যথা, (শিবের প্রতি পদ্মা)—"পদ্মা বলে বাপু তুমি সংসারের

---

* এস্থলে হিন্দী ভাবাপন্ন শব্দ উদ্ধৃত হইল না।

† এই 'টীট' শব্দ গোবিন্দদাসের পদে (প, ক, ত,—৬২৫ নং), বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে, বিদ্যাপতির পদাবলীতে (জগবন্ধু বাবুর সংস্করণ, ৭৭ পৃঃ), কবি আলওয়ালকৃত পদ্মাবতীতে ("কোথাতে নাহিক দেখি হেম যো টিট"—৯৬ পৃঃ) ও অন্যান্য পুস্তকে পাইয়াছি; বোধ হয় এই শব্দ হইতে 'টীটকারি', 'টিটপনা' ও 'টেটন' প্রভৃ শব্দের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। কিন্তু বটতলায় পদকল্পতরুতে এবং বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কোন কোন সংস্করণে 'টী শব্দ স্থলে 'টাট' প্রদত্ত হইয়াছে।

সার। ঝির অপমান বাপু না দেখ একবার॥" ধন্বন্তরির প্রতি শিষ্যগণ,—"শিষ্যসব বলে বাপু এ কোন বিধান। কার হাতে পাইলা বাপু হেন অপমান॥" বেহুলা পিতার প্রতি—"বেহুলা বলেন বাপু শুন নিবেদন। স্বপ্ন দেখিয়া আমি করেছি রোদন॥" এখনকার রাজনৈতিক উপহাসে লক্ষ্য 'বাবু' বোধ হয় এই 'বাপু' শব্দেরই অপভ্রংশ হইবে। ত্রিপুরা জেলার উজানচর নামক স্থানে 'মা'—কে 'মাইঞা' বলিয়া থাকে, আমরা এই অধ্যায়ে 'মাই' শব্দ পাইয়াছি; এই 'মাই' ও 'মাইঞা' হইতে বোধ হয় কন্যা-বোধক 'মেয়ে' শব্দ আগত হইয়াছে 'বাপু' ও 'মেয়ে' শব্দ একই কারণে অপত্যার্থে পরিণত হইয়াছে; পূর্ব্বে উহারা পিতৃমাতৃবোধক ছিল। 'লোকগুটি', 'বানগোটা' প্রভৃতি রূপ 'গুটি' ও 'গোটা' অনেক স্থলেই দৃষ্ট হয়,—'লোকটি', 'বানটা' বোধ হয় এই ভাবে উৎপন্ন, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

বিভক্তি।

বিভক্তি সম্বন্ধে এই প্রাচীন সাহিত্যের অরণ্য হইতে সাধারণ নিয়মের মত কোন পরিষ্কার সূত্র উদ্ধার করা বড়ই দুরূহ। এখনও বঙ্গদেশে নানা প্রদেশে নানারূপ বিভক্তি কথায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু লিখিত রচনার জন্য একমাত্র নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কিন্তু আলোচ্য সময়ে প্রাদেশিক বিভিন্নতা লোপ ও ভাষার একীকরণ জন্য কোন সাধারণ সূত্র নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। নানারূপ অসম উপাদান হইতে সাধারণ সূত্র সঙ্কলন করা ব্যাকরণের কাজ,—বঙ্গভাষার ব্যাকরণ ইংরেজাধিকারে সঙ্কলিত হইয়াছে। সুতরাং এই সময়ের বহু পরেও বিভিন্নরূপ বিভক্তি ও ক্রিয়া প্রচলিত ছিল। আমরা এই অধ্যায়ে—

"আমি" স্থলে,…আহ্মি, মুঞি, মুই, আমিহ, মো; "তুমি" স্থলে,…তুহ্মি, তুঁহ, তঁঞি; "আমার" স্থলে,…আহ্মা, আহ্মার, মোহোর, মোহর, মোর; "তোমার" স্থলে…তোহ্ম, তোহ্মার, তয়ু, তোহার, তোঁহর, তোর; "আমাকে" স্থলে,…আহ্মাতে, মোত, আমাক, আহ্মারে, মোহারে, মোরে; "তোমাকে" স্থলে. তোমাক, তোহ্মারে, তোহ্মা, তোত, তোঁহারে, তোরে; "সে" বা "তিনি" স্থলে,…তিঁহ; "তাহাকে" স্থলে,…তাক, তাতে, তায়, তাইক; "তাঁহার" স্থলে তান্ধ, তান, তাহান, তার; "তাহা" স্থলে…তেহ; "কাহাকেও" স্থলে…কাকহো, প্রভৃতিরূপ সর্ব্বনামের প্রয়োগ পাইয়াছি—এই সমস্ত জটিল রূপের মধ্যে মধ্যে আধুনিক ভাবের কোন কোন প্রয়োগ না আছে, এমন নহে। কোন কোন প্রাচীন পুঁথিতে আধুনিক ভাবের ব্যবহারও সমধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। বিভক্তি সম্বন্ধে সর্ব্বনামের পূর্ব্বোক্ত রূপান্তর ভিন্ন, পুষ্করিণী হনে (ও হস্তে)—পুষ্করিণী হইতে, বিষ্ণুক উদ্দেশে…বিষ্ণুর উদ্দেশে, ভক্তিএ…ভক্তি সহ, তীরক পাইলা…তীর পাইলা, প্রাণত (প্রাণাৎ)…প্রাণাপেক্ষা, পিতৃত্তো মাতৃত্তো…পিতামাতা হইতে ("পিতৃত্তো মাতৃত্তো করি তোত অনুরাগ"…অনন্ত রামায়ণ), কালিকারে… কালিকার জন্য, বর্ষাকে…বর্ষার জন্য, দ্রোণকে চাহিয়া…দ্রোণের দিকে চাহিয়া, বিধিএ নির্ম্মিল…বিধি নির্ম্মাণ করিল, প্রণাম করিল মেনকাতে…মেনকাকে প্রণাম করিল, ভূমিএ…ভূমিতে, বাণিজ্যেরে চলে…বাণিজ্যে চলে, এই ভাবের প্রয়োগ পূর্ব্ববঙ্গের প্রাচীন পুঁথিগুলিতে পাইয়াছি; 'কে' স্থলে 'ক' সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়, যথা—

"সর্প যেন ধাইয়া যায় মারিতে গরুড়ক। সেই মত চাহ তুমি মারিতে অর্জ্জুনক॥"

বহুবচন 'সব', 'গণ' ও 'আদি' শব্দ দ্বারা গঠিত হইত—তুমি সব, আমি সব, রাক্ষসেরগণ, মৃগাদি প্রভৃতি বহুবচন-বোধক-শব্দ ও তাহাদের পরবর্ত্তী রূপান্তরের বিষয় পূর্ব্বে এক অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছি; পশ্চিম বঙ্গের পুস্তকগুলিতে,—ঘরকে গমন, পাণিকে ধায়, জলকে গেনু, কাঁধে কেরবাল, শুনে গৌড়েশ্বরে (শুনে গৌড়েশ্বর), প্রভৃতিরূপ পাওয়া যায়।

ক্রিয়া। ক্রিয়া সম্বন্ধে উত্তম পুরুষে দেঁহো, কঁরো, তেজিম, নোহোঁ (নই), দেখঞ, লভিলো, বন্দম, করম, করিবু, পাইলুঁ, দিমু, করিমু,—মধ্যম পুরুষে, কহসি, দিয়েঁাক, করিয়েঁাক, আসিয়েঁাক, করিহ,—এবং প্রথম পুরুষের পরে—হব ("নিঁদের স্বপনে রাজা হব" (হবে) দরশন" মা, চ, গা)। পইতায়, আইবন্ত, ভেলন্ত, করেন্ত ইত্যাদি রূপ অনেক প্রাচীন পুঁথিতে পাওয়া যায়। ক্রিয়ার কর্ত্তা নির্দ্ধারণ করিতে শুধু অর্থই পথপ্রদর্শক। এই অধ্যায়ের উদ্ধৃত রচনা হইতে পাঠক নমুনা খুঁজিয়া লইবেন। কোন কোন পুস্তকে নিতান্ত প্রাকৃতক্রিয়াও দৃষ্ট হয়; যথা,—'মনে হয় চাঁদের ছয় পুত্র থাম'—(বিজয়গুপ্ত) তৎপর করিস, খায়ন্তি, পিবন্তিও উভয় প্রদেশের রচনায় অনেক পাওয়া গিয়াছে। তৎসম্বন্ধে পূর্ব্বে একবার লিখিত হইয়াছে। বঙ্গভাষায় 'হের' ক্রিয়া এখন দেখা অর্থেই ব্যবহৃত হয়; কিন্তু পূর্ব্বকালে বোধ হয় হের অর্থ ছিল—'এখানে'; 'হের দেখ' এই দুই শব্দ অনেক স্থলেই একত্র ব্যবহৃত হইতে দৃষ্ট হয়। ত্রিপুরার নিম্ন-শ্রেণীর লোকের মুখে "এ্যার" অর্থ "এইখানেই" শুনিয়াছি; এই দুই শব্দ 'অত্র' শব্দের সঙ্গে কোনও রূপে সংশ্লিষ্ট হইতে পারে। বঙ্গভাষার প্রাচীন সাহিত্যের ব্যাকরণ ও অভিধান সঙ্কলন করা গুরুতর ব্যাপার, ক্ষুদ্রশক্তি অনুসারে আমি ইতস্ততঃ কিঞ্চিৎ ইঙ্গিত দ্বারা সাহায্য করিতে সমর্থ হইলেই নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিব।

কাব্য গীত হইত। এই অধ্যায় বর্ণিত পুস্তকগুলি গীত হইত। মনসাদেবীর ভাসান, মঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতি পুস্তকের অষ্টাহ ব্যাপক গান হইত। অষ্টমঙ্গলা অর্থাৎ শেষপালায় গ্রন্থকার আত্মবিবরণ প্রদান করিতেন। এই পুস্তকগুলির সমস্তটিতেই বিবিধ রাগ রাগিণীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। প্রসিদ্ধ ইংরেজী সাহিত্যবেত্তা, সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞ ৺উমাচরণ দাস মহাশয়ের সাহায্যে শ্রীযুক্ত জগবন্ধু ভদ্র মহাশয়, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সর্ব্বপ্রথম যে সংস্করণ প্রণয়ন করেন, তাহাতে উক্ত দুই কবির গানগুলির রাগ রাগিণী উৎকৃষ্টভাবে আলোচিত হইয়াছে। তাঁহাদের মতে "উভয়ের (বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের) রাগ রাগিণীর সংখ্যা (সাধারণগুলির একবারমাত্র ধরিয়া মোট ৪০টি দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে ৩১টি বিশুদ্ধ, ৯টি বিমিশ্র।" (৮৩ পৃঃ)। ৺ কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহাশয় লিখিয়াছেন,—"পদাবলীর সুরতাল সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। একজন যে পদ 'ধানশ্রী'তে গেয় লিখিয়াছেন আর

* বিদ্যাপতি, কাব্যবিশারদ মহাশয়ের সংস্করণ পৃঃ ১৮০।

একজন সেই পদই 'বসন্ত রাগে' গেয় স্থির করিয়াছেন। আবার অন্য পুঁথিতে সেই পদেই 'কল্যাণী রাগ' নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই সকল গান সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে, পূর্ব্বকালে 'ধানশ্রী', 'শ্রীরাগ', 'নট-নারায়ণ', 'গুর্জ্জরী' প্রভৃতি ওস্তাদি ধরণের রাগরাগিণীতে সঙ্গীতের অনুশীলন হইত; এখন জাতীয় রুচি মৃদুতার অনুকূলে—ভৈরবী, ঝিঝিট প্রভৃতি মধুর রাগিণীর দিকে হেলিয়া পড়িয়াছে। এই বিষয়েও পূর্ব্বে উত্তর-পশ্চিমের লোকের সঙ্গে আমাদের বেশী নৈকট্য ছিল।

পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের কথিত ভাষায় যে প্রভেদ দৃষ্ট হয়,তাহা শুধু প্রাদেশিক ভাষার উচ্চারণের প্রভেদ জনিত নহে। আমার মনে হয় আদিমকালে আর্য্যগণের দুই ভিন্ন শাখা এই দুই প্রদেশে বাস করিয়াছিলেন; এজন্য উঁহাদের কথার ধরণ ও ভঙ্গীতেও বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনায় তাহা কতকটা অপ্রাসঙ্গিক হইলেও ভাষাতত্ত্বের পর্য্যালোচনায় প্রয়োজনীয় হইতে পারে, এই হিসাবে আমরা তৎসম্বন্ধে কিছু ইঙ্গিত দিয়া যাইতেছি।

(১) লাগে—এই কথাটি পশ্চিমবঙ্গে 'কষ্ট দেওয়ার' অর্থেও মাঝে মাঝে ব্যবহৃত হইয়া থাকে কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের কোথায়ও সেরূপ ব্যবহার নাই। "বড্ড্ লাগছে"—এ কথার অর্থ—"বড় কষ্ট পাচ্ছি" কিন্তু খাস পূর্ব্ববঙ্গের লোক এ কথার এই অর্থ বুঝিবেন না। তার পর পশ্চিমবঙ্গের লোকেরা যেখানে বলিবেন "খেতে হয়, যেতে হয়" পূর্ব্ববঙ্গের লোকেরা সেখানে "খাওন লাগে, যাওন লাগে" এইরূপ কথা ব্যবহার করেন। কখনও কখনও পূর্ব্ববঙ্গের লোকেরা যেখানে "তোমার লাগে (সঙ্গে) যাব" বলেন, সেখানে পশ্চিম বঙ্গ "তোমার সাথে যাব" বলেন। "লগের" এই অর্থ তাঁহারা স্বীকার করেন না। পূর্ব্ববঙ্গে যেখানে "তুমি কি দেখ না?" প্রচলিত, পশ্চিম বঙ্গে সেখানে "তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না" র প্রচলন। এই ভাবে পূর্ব্ববঙ্গের "সে হাসল", "সে কাঁদল" "সে খাইল" ইত্যাদির স্থলে পশ্চিমবঙ্গে প্রায়ই "সে হেসে ফেল্ল" "সে কেঁদে ফেল্ল" "সে খেয়ে ফেল্ল" ইত্যাদিরূপ ব্যবহার দৃষ্ট হয়। এই "ফেল্ল" কথাটা পশ্চিমবঙ্গের একটা রীতি—ইহা পূর্ব্ববঙ্গে এভাবে কথিত ভাষায় প্রায়ই দৃষ্ট হয় না।

পূর্ব্ববঙ্গের "আমি তো খামু, না বা খাব না" "আমি তো বলিনা" প্রভৃতির স্থলে পশ্চিমবঙ্গে প্রায়ই "আমি তো খেতে যাচ্ছি না," "আমি তো চল্‌তে যাচ্ছি না" প্রভৃতি রূপ প্রচলন। 'ফেলা' ক্রিয়াটা পশ্চিম বঙ্গের যেরূপ একটা রীতি, 'যাওয়া' ক্রিয়াটাও সেইরূপ রীতি। ক্রিয়াপদের এই পুচ্ছটি পূর্ব্ববঙ্গে নাই। তার পর আরও নানারূপ বিশেষ রীতির বিভিন্নতা আছে—যথা পূর্ব্ববঙ্গ যেখানে বলিবে "চোখ খাবি।" পশ্চিমবঙ্গ সেস্থলে বলিবে—"চোখের মাথা খাবি।"

'ফেলা' 'যাওয়া'র মত আরও ক্রিয়াপদের পুচ্ছ দেওয়া পশ্চিমের রীতি, যথা পূর্ব্ববঙ্গের "আমি তোমারে দেখুম, বা দেখব" স্থলে পশ্চিমবঙ্গ বলিবে "আমি তোমাকে দেখে নেব।"

পূর্ব্ববঙ্গে "দৌড়িয়ে যাওয়া"—পশ্চিম বঙ্গে "ছুটে যাওয়া" পূর্ব্ববঙ্গে যেখানে বলবে "ওকে ডাক", "ওকে ছাড়" "ওটা ফেল" পশ্চিমবঙ্গ বলিবে "ওকে ডেকে দাও" "ওকে ছেড়ে দাও" "ওটা ফেলে দাও।" মোটের মাথায় পশ্চিমবঙ্গে ক্রিয়ার প্রায়ই একটা পুচ্ছ দেওয়ার রীতি আছে যাহা, পূর্ব্ববঙ্গে আদৌ নাই। বিশেষ বিশেষ কথার রীতি এই দুই প্রদেশে প্রচলিত আছে—যথা পূর্ব্ব বঙ্গে "মেলা কল্ল" স্থলে পশ্চিমবঙ্গ বলিবে "রওনা হ'ল।"

কতকগুলি শব্দ পূর্ব্ববঙ্গের নিজস্ব, যথা আচপনিশাল—(আঁস্তা কুড়)—(আচমন শালার অপভ্রংশ কি ?) পশ্চিমবঙ্গের হেঁসেল (রান্নাঘর) পূর্ব্ববঙ্গের ছিটাল (অপবিত্র স্থান) পূর্ব্ববঙ্গের বেজকন্যা (বৈদ্য ও ব্রাহ্মণ কন্যা, বেজ শব্দ অর্থ বৈদ্য), পূর্ব্ববঙ্গের আহিস্তিনী (অভাগিনী)

পূর্ব্ববঙ্গে অনেক স্থলে নাম শব্দের উত্তরে বহুবচনের চিহ্ন 'আ'কার দৃষ্ট হয় যথা 'বুকা' (বক্ষ, লাউ প্রভৃতি ফলের সম্বন্ধে ব্যবহৃত), কাগা (কাক) রাতা (রক্ত), মুখা (মুখ—কুমারেরা যে মুখের ছাঁচ তৈরী করে তাহাকে 'মুখা' বলে।) চান্দা—(চাঁদ) রাঙ্গা (লাল)।

পয়ারের ব্যতিক্রম।

চণ্ডীদাসের ভণিতা-যুক্ত রাধা ও কৃষ্ণের লীলাবর্ণনার কয়েক ছত্র আমরা প্রাচীন হস্তলিখিত বহির স্তূপ হইতে পাইয়াছিলাম। দুর্ভাগ্যবশতঃ দুই দিন পরেই তাহা হারাইয়া যায়। 'কৃষ্ণকীর্ত্তন' নামক যে পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, ঐ দুই পত্র সম্ভবতঃ তাহারই অংশ। এই অধ্যায়ের রচনা পয়ারের নিয়ম দ্বারা ব্যাখ্যা করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা। আমরা—ক্ষৌণী কল্পতরু শ্রীমান দীন দুর্গতি বারণ।' (কবীন্দ্র) এবং "তথাপিহ বেদনা না জানিয়া। সত্বরে গিয়া পার্থেরে ধরিল দুই করে সাপটিয়া" (শ্রীকরণ নন্দীর অশ্বমেধ)। এইরূপ পদ অনেক স্থলেই পাইয়াছি।

ব্রজবুলি।

চণ্ডীদাসের রচনার অনেক স্থলেই ব্রজবুলির মিশ্রণ দৃষ্ট হয়। এই 'ব্রজবুলি' পবিত্র ব্রজভূমির ভাষা নহে। এ সম্বন্ধে এখনও অনেকের ভুল ধারণা আছে। 'ব্রজবুলি' সম্ভবতঃ প্রাচীন মাগধী প্রাকৃত কবিতার অনুকরণ। চণ্ডীদাসের রচনার 'ব্রজবুলির' অনুকরণে শব্দসম্প্রসারণক্রিয়া অনেক স্থলে লক্ষিত হয়, যথা—ধরম, করম, পরকার, পরসঙ্গ, স্বতন্তর, পরতাপ ভরমে, সিনান, বজর, সরবস।

রমণীগণের পরিচ্ছদাদি।

পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের রমণীগণের পরিচ্ছেদ একরূপ ছিল বলিয়া বোধ হয় না। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে কণ্ঠে সুবর্ণের হার, কর্ণে কুণ্ডল, নাসায় গজমতি, হস্তে বলয়, কঙ্কণ, কটিতটে ক্ষুদ্রঘণ্টী, পদে মঞ্জীর প্রভৃতি কতক পরিমাণে পরিচিত অলঙ্কারে উল্লেখ দেখিতে পাই। চণ্ডীদাস মল্লতাড়ল (খোট্টা রমণীরা এখনও পদে পরিয়া থাকেন) একরূপ ভূষণের নাম করিয়াছেন। পূর্ব্ববঙ্গের লেখক বিজয় গুপ্ত, হস্তে সুবর্ণ বাউটি, সুবর্ণ ঘাগরা ও শিলমণি কাচ, কণ্ঠে হাসলী, কর্ণে সোণার মদন কড়ি, পিতলের খাড়ু ও লোটন খোঁপা

নামক একরূপ খোঁপার উল্লেখ করিয়াছেন। সদয় অভিভাবকগণ বালবিধবাদিগকে পট্টবস্ত্র ও (শঙ্খস্থলে) সুবর্ণের চুড়ি পরিতে দিতেন, কোন কোন বালবিধবা সিন্দুরের পরিবর্ত্তে আবিরের ফোঁটা কপালে পরিতেন।

ভাষা ও সামাজিক জীবনের আদিস্তর ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অঙ্কিত হয় না; ইতিহাস কতকদূর লইয়া যাইয়া অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া বিদায় হয়। কিন্তু প্রকৃতি হইতে এই গুপ্ততত্ত্ব খুঁজিয়া বাহির করা যায়। প্রকৃতিতে বটবৃক্ষ ও বটবীজ উভয়ই সুলভ। পাহাড়ের পাষাণবক্ষস্থ ক্ষীণ-যজ্ঞসূত্রের ন্যায় স্বচ্ছ জল রেখা ও শ্যামল তটান্তবাহী স্ফীত গঙ্গাধারা, উভয় দৃশ্যই প্রকৃতির মানচিত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়। আদি, উদ্যম ও বিকাশ দেখাইয়া থাকেন। বাঙ্গালা ভাষা ও সমাজের আদি খুঁজিতে বঙ্গের নিতান্ত মফঃস্বলে পল্লীগ্রামের ছবিখানি দেখিয়া আসুন। মদনকড়ি, মল্লতাড়ল প্রভৃতি যে সকল গহনা আমরা নামে মাত্র অবগত আছি, যে সকল দুরূহ অপ্রচলিত শব্দ লইয়া আমরা নানা মত প্রকাশ করিতেছি, কোন অজ্ঞাত পল্লীর কৃষকবধূ হয়ত এখনও সেই গহনাগুলি পরিয়া, সেই সকল দুরূহ শব্দ-পরম্পরায় মনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেছে; আমরা আঁধারে তীরক্ষেপ করিয়া বিদ্যাবুদ্ধি দেখাইতেছি মাত্র।

সামাজিক আদিম অবস্থার নিদর্শন।

পূর্ব্বকালে বাঙ্গালীরা ডিঙ্গা সাজাইয়া সমুদ্রে যাতায়াত করিত। কোন দীর্ঘ যাত্রার প্রাক্কালে স্ত্রীর সন্তান হওয়ার সূচনা লক্ষ্য করিলে, তাহাকে একখানি মঞ্জুরীপত্র দিয়া যাইত। সমুদ্রে গমনাগমনের জন্য, বোধ হয় পূর্ব্ববঙ্গের নাবিকগণ সমুদ্রপথ বিশেষ দক্ষ ছিল। কবিকঙ্কণ, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ ইঁহারা সকলেই সমুদ্রের পথে 'বাঙ্গাল মাঝি' দিগকে লক্ষ্য করিয়া পরিহাস করিয়াছেন। এখনও এদেশের জাহাজের সারেং ও খালাসিগণের অধিকাংশই পূর্ব্ববঙ্গের লোক। মাঝিদিগের তত্ত্বধায়ক 'গাবুর' নিযুক্ত থাকিত; ইহারা 'সারি' গাহিয়া মাঝিদিগকে কার্য্যে আকৃষ্ট রাখিত ও মাঝিরা কার্য্যে শ্লথ হইলে তাহাদিগকে 'ডাঙ্গা' দিয়া প্রহার করিত। ডিঙ্গাগুলির মধ্যে বাণিজ্যের উপযুক্ত নানাবিধ দ্রব্য থাকিত ও কোন কোন খানিতে হাট মিলিত। ("তার পিছে চলে ডিঙ্গা নাম চন্দ্রপাট। যাহার উপরে চাঁদ মিলায়েছে হাট॥" —বিজয় গুপ্ত)। এক বাণিজ্য-ব্যাপারে বিলক্ষণ লাভ ছিল,—"মূলার বদলে দিল গজদন্ত।" (বিজয় গুপ্ত), কিম্বা "শুক্তার বদলে মুক্তা দিল ভেড়ার বদলে ঘোড়া॥" (ক, ক, চ)—প্রভৃতির মধ্যে কবি-কল্পনার অতিরঞ্জন থাকিলেও সমুদ্র বাহিয়া ভিন্ন দেশে বাণিজ্য দ্রব্য লইয়া যাইতে পারিলে বিলক্ষণ উপার্জ্জন হইত। আশঙ্কা—নৌকা জলমগ্ন হওয়ার। সমুদ্রে ঢেউ উঠিলে নাবিকগণ তৈল নিক্ষেপ করিয়া ঢেউ নিবারণ করিত; ঝাঁকে ঝাঁকে জোঁক উঠিয়া ডিঙ্গা আক্রমণ করিলে, তাহারা "ক্ষারচূণ" ছড়াইয়া ফেলিত; শঙ্খ উঠিয়া ডিঙ্গার গতি প্রতিরোধ করিলে মৎস্য-মাংস কাটিয়া দিত, গন্ধে

বাঙ্গালীর সমুদ্র-যাত্রা।

শঙ্খগুলি পলাইয়া যাইত। এই সব বর্ণনায় কতদুর সত্য আছে, তাহার বিচারক আমরা নহি। তবে বোধ হয়, গল্প শুনিয়া, কবি অনেক কথা লিখিয়াছিলেন ;—যে ইংলণ্ড বাণিজ্যের জন্য এত প্রসিদ্ধ, ৩০০ শত বৎসর পূর্ব্বে সেই ইংলণ্ডের অনেক শিক্ষিত লোকেরাও সমুদ্রের অপরপারে কবন্ধাকার মনুষ্য ও এথিয়োপাগী নামক জীবের অস্তিত্ব বিশ্বাস করিত, সেই সময়ে ইংরেজদিগের শ্রেষ্ঠ কবি এ কথা বিশ্বাস করিয়াছিলেন।

বাণিজ্যজাত দ্রব্য লইয়া কবিগণ অনেক আমোদ-জনক ঘটনার অবতারণা করিয়াছেন। সিংহলের রাজা নারিকেল দেখিয়া ভয় পাইতেছেন, ও সেবককে তাহা প্রথম খাইতে আদেশ করায়, সে চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইয়া স্ত্রী পুত্রের নিকট বিদায় লইতেছে। তাম্বুলরঞ্জিত অধর দৃষ্টে সিংহলীগণ অনুমান করিতেছে,—"কোতয়ালের মুখ দেখি বলে সর্ব্ব লোকে। অস্ত্র ঠাঁই এড়ি তোমার মুখ ধরে জোঁকে॥" (বিজয় গুপ্ত)।

সরিষাতে যাঁহারা তালফলের অবয়ব দেখাইতে পারেন, এই সব কবিগণের কল্পনার অণুবীক্ষণে প্রতিবিম্বিত চিত্রপট হইতে আমরা সমুদ্রবাহী ডিঙ্গাগুলির অবয়ব ও অন্যান্য তথ্য উদ্ধার করিতে পারিলাম না।

এই সময়ে বঙ্গে শিল্প-জাত দ্রব্যের উন্নতি খুব বেশী হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। উৎকৃষ্ট 'ঢাকাই' শাড়ী—এই সময়ের আরও ২০০ বৎসর পরের সামগ্রী। 'পাটের পাছড়া' সম্বন্ধে পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গে পাটের পাছড়াকে পাটের 'খনি' বলিত ; গায়েন একখানা পাটের 'খনি' পাইলেই কৃতার্থ হইতেন।—"বিজয় গুপ্ত বলে গায়েন গুণমণি। মনসা জম্মিলরে গায়েনে দেও খনি॥" এই খনির মধ্যে বিশেষ নিপুণতা কিছুই ছিল না, ইহার একমাত্র গৌরব, খুব শক্ত হইত। সিংহল-রাজ বঙ্গদেশের 'খনি' হস্তে লইয়া প্রশংসা করিতেছেন,—"মোর দেশে এক জাতি জন কত আছে তাঁতি, বুনিতে অনেক দিন লাগে। কেবল ধীরের কাম বস্ত্র বড় অনুপম, প্রাণ শক্তি টানিলে না ভাঙ্গে।" বিজয় গুপ্ত। স্ত্রীলোকগণের কাঁচুলী নির্ম্মাণে অপেক্ষাকৃত অধিকতর শিল্পনৈপুণ্য প্রদর্শিত হইত। কাঁচুলীতে সমস্ত দেব দেবীর মূর্ত্তি সূতায় আঁকিয়া উঠান হইত। এই অধ্যায়-বর্ণিত পুস্তকগুলিতে এবং পরবর্ত্তী সময়ে কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে আমরা কাঁচুলীর সুদীর্ঘ বর্ণনা পড়িয়াছি।

শিল্পজাত দ্রব্যাদি।

ভাস্কর ও স্থপতিবিদ্যার অবনতি হইতেছিল, তাহার প্রমাণ এই, যাহা কিছু সুন্দররূপে গঠিত ও সুচারুরূপে অঙ্কিত তাহাতেই বিশ্বকর্ম্মার কৃতিত্ব কল্পিত হইত, সুতরাং মনুষ্য সমাজে তাহার অনুশীলন হইতেছিল বলিয়া বোধ হয় না। লখীন্দরের লৌহের বাসর, ধনপতির নৌকা ইত্যাদি সমস্তই বিশ্বকর্ম্মার দ্বারা গঠিত।

ভাস্কর ও স্থপতি বিদ্যার অবনতি।

এই সময়ের কাব্যাদিতে বদল দ্বারা বাণিজ্য নির্ব্বাহ হওয়ার প্রথা দৃষ্ট হয়। কিন্তু সাধারণতঃ বাজারে বট, বুড়ি, কাহন প্রভৃতি সংখ্যক 'কড়ি দ্বারা' দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় হইত। মাটিকাটা ও কোন দ্রব্য ওজন করিবার জন্য 'পুরুষ' (১) এক রূপ মাপ ছিল, উহা এখনকার গজ কাটির ন্যায় হইবে। যাহা সেকালে কড়ি দ্বারা হইয়াছে, এখন তাহা তাম্র ও রজত ভিন্ন পাওয়া যায় না। রৌপ্যের স্থলে স্বর্ণ প্রবর্ত্তিত হইলে কড়ির জিনিষ আমরা সোণা দিয়া কিনিব।

বিনিময় মূল্য।

আমরা এখন বঙ্গ-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অধ্যায়ের সন্নিকটবর্ত্তী হইতেছি। এই অধ্যায়ে আমরা চাঁদের চরিত্রে ক্ষত্রিয়োচিত দৃঢ়তা দেখাইয়াছি, কিন্তু বঙ্গদেশের মৃদু আবহাওয়ায় শালতরুর বীজ বপন করিলে তাহাতে কুসুমলতার উৎপত্তি না হইলেই সৌভাগ্য! এই চাঁদের চরিত্র বিজয়গুপ্ত প্রভৃতি প্রাচীন লেখকগণের তুলিতে যেরূপ অঙ্কিত হইয়াছিল, পরবর্ত্তী কবিগণ তাহা রক্ষা করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের হস্তে চাঁদবেণে একটি হাস্যরসের সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহার দৃঢ়তার মহত্ব কবিগণ অনুভব করেন নাই, কষ্টে ফেলিয়া বালকের ন্যায় হাতে তালি দিয়া তামাসা দেখিয়াছেন। কালকেতুকে বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দরাম ভীমের ন্যায় শারীরিক শক্তিসম্পন্ন কল্পনা করিয়াও বীরত্বের জগতে একটি মোমের পুতুলের ন্যায় সুকোমল করিয়া ফেলিয়াছেন। বীরত্বের উপকরণ এই ক্ষেত্রে আশানুরূপ সুফল উৎপত্তি করে না। বাঙ্গালী উত্তরপশ্চিম হইতে আর্য্যতেজ অবশ্যই আনিয়াছিল। পঞ্চগৌড়েশ্বরগণের মহিমান্বিত রাজশ্রী ও সিংহবাহু কর্ত্তৃক সিংহলবিজয় প্রভৃতি অস্বীকার করিবার বিষয় নহে; কিন্তু সেই বিক্রম ক্রমে সুকুমারভাবে বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছিল,—মালকোঁচা, ফুলকোঁচা এবং শূল—ফুল হইয়া গিয়াছিল;—ইহা এদেশের গুণ; ফোর্ট উইলিয়মের এদেশে থাকা নিরাপদ নহে, কালে কুঞ্জ-কুটীরত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে! বাঙ্গালা রামায়ণ ও মহাভারতে সীতা বিলাপ, তরণী ও সুধন্বার ভক্তিকাহিনী অভাবনীয় সুধা ঢালিয়া দিয়াছে; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্য ও অর্জ্জুনের গাণ্ডীব পুষ্পমালায় আবৃত হইয়া পড়িয়াছে।

বাঙ্গালীর বীরত্বের অভাব।

তথাপি এককালে বাঙ্গলার রাজা সমুদ্রসেন যে পাণ্ডবদের সঙ্গে দুর্দ্ধর্ষ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সমুদ্রগুপ্ত যে বঙ্গরাজকে পরাভূত করিতে যাইয়া বিশেষরূপ বিধ্বস্ত হইয়াছিলেন, বাঙ্গলার পালরাজারা যে বীর্য্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও দিক্‌বিজয়ী হইয়াছিলেন, মুষ্টিমেয় বাঙ্গালী সৈন্য কাশ্মীরে যাইয়া পরিহাস কেশবের মন্দিরে অপূর্ব্ব বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, যাহা কহ্লণ কবি উচ্ছ্বসিত ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা কল্পনার সৃষ্টি নহে।

---

(১) "মাটি খানি কাটি ফেলে এক যে পুরুষ"—বিজয়-গুপ্ত।

"পুরুষ সাতেক মোর হারালো কাসন্দ।"—ক, ক, চ।

মাণিকচাঁদের গান হইতে দৃষ্ট হয়, প্রেমের কথা বঙ্গদেশে ব্যর্থ হয় নাই। চণ্ডীদাসের গীতি প্রেমের সরস এবং নির্ভীক উক্তি। যে সমাজে ব্রাহ্মণ ও তদিতরবর্ণের অধিকার স্বর্ণ ও লৌহের ভিন্ন ভিন্ন রেখায় নির্দ্দেশিত, সেই সমাজের ক্ষুদ্র একজন পূজক ব্রাহ্মণ—"শুন রজকিনী রামি। ও দুটি চরণ, শীতল দেখিয়া, শরণ লইলাম আমি॥ তুমি রজকিনী, আমার রমণী, তুমি হও পিতৃ মাতৃ। ত্রিসন্ধ্যা যাজন, তোমার ভজন, তুমি বেদ মাতা গায়ত্রী॥" —এইরূপ বন্দনাদ্বারা আশ্চর্য্য নির্ভীকতা দেখাইয়াছেন; একথা লিখিতে তিনি সমাজের ভয় পান নাই; কারণ প্রেমের বলে পিপীলিকা মত্ত হস্তীকে দলন করিতে পারে। এ কথা লিখিতে তিনি লজ্জিত হন নাই—কারণ এ প্রেমে 'কামগন্ধ নাই'—ইহা তাঁহার "উপাসনারস",—ইন্দ্রিয়-লিপ্সার ঊর্দ্ধে; ইহা স্বীকার করিয়া ব্রাহ্মণ গৌরবান্বিত হইয়াছেন,—তিনি লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়া পড়েন নাই।

বাঙ্গালী প্রেমিক।

এই প্রেম তুলনা ও উপমা রাজ্যের উপরে। চণ্ডীদাস পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের উপমাগুলির গিল্টি দেখিয়া ভুলেন নাই—"ভানু কমলে বলি সেহ হেন নহে। হিমে কমল মরে ভানু সুখে রহে॥ চাতক জলদ কহি সে নহে তুলনা। সময় নহিলে সে না দেয় এক কণা॥ কুসুমে মধুপে কহি সেহ নহে তুল। না আইলে ভ্রমর আপনি না যায় ফুল॥ কি ছার চকোর চাঁদ দুহু সম নহে। ত্রিভুবনে হেন নাহি চণ্ডীদাস কহে॥" উপমায় ইহা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ইহার তুল্য আছে, স্বীকার করিতে হয়।

এই প্রেমের পটখানি উজ্জ্বল করা জাতীয় জীবনের ব্রত হইয়া উঠিল। যাহা চণ্ডীদাসের ভাষায় অত্যন্ত গভীরভাবে ব্যক্ত হইয়াছিল, তাহা সাধনার ধন করিয়া জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত করিতে শত শত বৈষ্ণব অগ্রসর হইলেন। প্রাতঃ-শিশির-সিক্ত প্রকৃতির সজল-পট ভানুকরে যেরূপ শুষ্ক হইয়া স্থায়ী প্রভা প্রাপ্ত হয়, এই অশ্রুসিক্ত পদাবলী অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হইয়া আরও গাঢ় সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছে। যাঁহার জীবন্ত লীলায় এই সকল গীতি সার্থক হইয়াছে,—তিনি নরহরি, বাসুদেব প্রভৃতি কবিগণের বন্দনার পুষ্প-পল্লবযুক্ত স্বর্ণ-ফ্রেমে বাঁধা একখানি দেবমূর্ত্তির ন্যায় আমাদের নিকট উদিত হইয়াছেন; উৎকৃষ্ট তুলিকার-অঙ্কিত ধ্রুব, প্রহ্লাদ হইতে আমরা সেই ভক্তির ছবিখানি ঊর্দ্ধে স্থাপন করিয়াছি। বঙ্গভাষায় রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত অনুবাদিত হইয়াছিল, তথাপি ভাষা গ্রন্থ-লেখকগণ নিজেরাও ইহাকে অগ্রাহ্য করিতেন,—"সহজে পাঁচালী গীত নানা দোষময়"—বিজয়গুপ্ত লিখিয়াছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ কবীন্দ্র তাঁহার অনুবাদ পুস্তকে দেন নাই, কারণ—"পাঁচালীতে উপযুক্ত নহে যোগ্য বাদ।"

কিন্তু পরবর্ত্তী অধ্যায়ের সাহিত্য শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাব মহিমান্বিত; পাঁচালী-গীত তখন শাস্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

সপ্তম অধ্যায়।

শ্রীচৈতন্য-সাহিত্য বা নবদ্বীপের ১ম যুগ।

১। শ্রীচৈতন্যদেব ও এই যুগের সাহিত্য।

২। শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী।

৩। পদাবলী-শাখা।

৪। চরিত-শাখা।

(১)

চণ্ডীদাসের দুইটি গীতি এইরূপ ;—

(ক) আজু কেগো মুরলী বাজায়।
এত কভু নহে শ্যাম রায়॥
ইঁহার গৌর বরণে করে আলো।
চূড়াটি বাঁধিয়া কেবা দিল॥
* * * *
চণ্ডীদাস মনে মনে হাসে।
এরূপ হইবে কোন্ দেশে॥

(খ) কাল কুসুম করে, পরশ না করি ডরে,
এ বড় মনের মনোব্যথা।
যেখানে সেখানে যাই, সকল লোকের ঠাঁই,
কাণাকাণি শুনি এই কথা॥
* * * *
সই লোকে বলে কালা পরিবাদ।
কালার ভরমে হাম, জলদে না হেরি গো,
ত্যজিয়াছি কাজলের সাধ॥
চণ্ডীদাস ইথে কহে, সদাই অনন্ত দহে,
পাশরিলে না যায় পাশরা।

দেখিতে দেখিতে হরে, তনু মন চুরি করে
না চিনিয়ে কালা কিম্বা গোরা ॥

প্রথম পদটি পদকল্পলতিকায় বড় সুন্দরভাবে নিবিষ্ট হইয়াছে। রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের পীতবস্ত্র পরিয়া বাঁশী হস্তে দাঁড়াইয়াছেন, চণ্ডীদাস রাধিকার গৌরবরণের কথাই বলিয়াছেন; কিন্তু প্রথম গীতির—"এরূপ হইবে কোন দেশে?" ও দ্বিতীয় গীতির—"না চিনিয়ে কালা কিম্বা গোরা"—এই দুইটি ছত্র পড়িয়া স্বপ্নের কথার ন্যায় একটা অলীক ভাব মনে হইয়াছিল,—যেন, ভাবী ঘটনা যেরূপ সম্মুখে ছায়াপাত করে, পরম সুন্দর চৈতন্য-দেবও তেমনি তাঁহার রূপের ছায়া প্রায় শতাব্দী পূর্ব্বে প্রেমিক-কবির মনে প্রক্ষেপ করিয়াছিলেন। সেই রূপের পূর্ব্বাভাষ পাইয়া আহ্লাদে চণ্ডীদাস উষার প্রাক্কালে পক্ষীর ন্যায় অস্পষ্ট কাকলি দ্বারা তাঁহার আগমনী গান করিয়াছিলেন।

প্রেমের অবতার চৈতন্য।

এরূপ হইবে কোন দেশে?"—প্রেম পৃথিবীতে একবার মাত্র রূপ গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা; বঙ্গদেশে তখন চণ্ডীদাস জীবিত ছিলেন না। চণ্ডীদাস আর বিদ্যাপতির মিলন হইয়াছিল, চৈতন্য-প্রভু আর রামানন্দরায়ের মিলন হইয়াছিল, কিন্তু চণ্ডীদাস আর চৈতন্য-প্রভুর মিলন হইলে তাহা তদপেক্ষা অপূর্ব্ব হইত। গীতির প্রেমোন্মাদ ও জীবনের প্রেমোন্মাদ—গোলাপের সুঘ্রাণ ও পদ্মের সুঘ্রাণ মিশিয়া যাইত। চণ্ডীদাসের বর্ণিত পূর্ব্বরাগ, রাধিকার ব্যাকুল বিরহ, মধুর প্রেম ও দিব্যোন্মাদ—গৌরহরি স্বজীবনে দেখাইয়াছেন; যদি গৌরহরি না জন্মিতেন, তবে শ্রীরাধার—"জলদ নেহারি নয়নে ঝরু লোর", কৃষ্ণ-অঙ্গভ্রমে কুসুমলতা আলিঙ্গন, একদৃষ্টে ময়ুর ময়ুরীর কণ্ঠ নিরীক্ষণ ও নব পরিচয়ের সুমধুর ভাবাবেশ কবির কল্পনা হইয়া যাইত। ভাবের উচ্ছ্বাসজাত এই ভ্রমময় আত্ম-বিস্মৃতি আজ শুষ্কযুগে কবিকল্পনা বলিয়া উপেক্ষিত হইত। কিন্তু গৌরহরি শ্রীমদ্ভাগবত ও বৈষ্ণব-গীতি সমূহের সত্যতা প্রমাণিত করিয়াছেন,—দেখাইয়াছেন, এই বিরাট শাস্ত্র ভক্তির ভিত্তিতে, নয়নের অশ্রুতে, চিত্তের প্রীতিতে দণ্ডায়মান। এই শাস্ত্রের শোভা-স্বরূপ পূর্ব্বারাগ, বিরহ, সম্ভোগ, মিলন ইত্যাদি যে সব লীলারসের ধারা ছুটিয়াছে, তাহা কল্পিত নহে, আস্বাদযোগ্য ও আস্বাদিত হইয়াছে; প্রেমের আশ্চর্য্য স্ফূর্ত্তিতে শ্রীগৌরের দেহ কদম্বপ্রায় হইয়াছে, সমুদ্র-ঢেউ যমুনা-লহরী হইয়াছে, চটক পর্ব্বত গোবর্দ্ধন হইয়াছে ও পৃথিবী কৃষ্ণময় হইয়াছে। এই অপূর্ব্ব ভক্তি ও প্রেমের উপকরণ দিয়া শ্রীমতী রাধিকাসুন্দরী সৃষ্ট;—তিনি 'আয়েসা' কি 'কুন্দনন্দিনী' নহেন, তাঁহার বিরহের এক কণিকা কষ্ট বহন করিতে পারে, তাঁহার সুখের এক লহরী ধারণ করিতে পারে, এরূপ নারীচিত্র পৃথিবীর কাব্যোদ্যানে নাই।

এই অধ্যায়ের চরিতশাখা পদাবলী দ্বারা বুঝিতে হইবে, পদাবলী চরিতশাখা দ্বারা বুঝিতে হইবে, এবং উভয়েই গৌরহরির লীলারস দ্বারা বুঝিতে হইবে; তাহা কিরূপ, দেখাতেই চেষ্টা করিব—চণ্ডীদাস রাধার অজ্ঞান অবস্থা বর্ণন করিয়া লিখিয়াছেন;—"তুলাখানি দিল নাসিকা মাঝে। তবে সে বুঝিল শোয়াস আছে॥ সার্ব্বভৌমের গৃহে যখন চৈতন্যপ্রভু অজ্ঞান তখন, "সূক্ষ্ম তুলা আনি নাসা অগ্রেতে ধরিল। ঈষৎ চলয়ে তুলা দেখি ধৈর্য্য হল॥" (চৈ, চ, মধ্যখণ্ড ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ);—শ্রীরাধিকা তমাল দেখিয়া "বিজনে আলিঙ্গই তরুণ তমাল," (প, ক, ত ৩৯ শ্লোক) ও মেঘ দেখিয়া—"চাহে মেঘ পানে, না চলে নয়নের তারা," (চণ্ডীদাস), কৃষ্ণ ভ্রমে উন্মাদিনী হইয়াছেন; শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনও সেইরূপ ভ্রমময়—"চটক পর্ব্বত দেখি গোবর্দ্ধন ভ্রমে, ধাঞা চলে আর্ত্তনাদ করিয়া ক্রন্দনে॥" "যাহা নদী দেখে তাহা মানয়ে কালিন্দী। মহাপ্রেম বশে নাশে প্রভু পড়ে কাঁদি॥" চৈ, চ, মধ্যম খণ্ড ১৭ পরিচ্ছেদ)।—"তমালের বৃক্ষ এক সম্মুখে দেখিয়া। কৃষ্ণ বলি ধেয়ে গিয়ে ধরে জড়াইয়া॥"—(গোবিন্দদাসের কড়চা)। "বন দেখি ভ্রম করে এই বৃন্দাবন।" (চৈ, চ, ১৭ পঃ)। এরূপ অসংখ্য স্থল আছে। শ্রীরাধিকাকে চেতন করিবার জন্য বলা হইত,—"উঠ উঠ রাধে বিনোদিনী, দেখ কৃষ্ণ গুণমণি॥"—(দিব্যোন্মাদ) চৈতন্যদেবের প্রতিও সেই ব্যবস্থা, "কখন বা হয় প্রভু আনন্দে মূর্চ্ছিত। কর্ণমূলে সবে হরি বলে অতি ভীত॥" (চৈ, ভা, মধ্যখণ্ড)। রাধিকা কৃষ্ণ নাম শুনিলে বক্তার পদে বিক্রীত হইতেন, "অকথন বেয়াধি এ কহা নাহি যায়। যে করে কানুর নাম ধরে তার পায়॥ পায় ধরি কাঁদে সে চিকুর গড়ি যায়। সোণার পুতলী যেন ভূতলে লোটায়॥"—(চণ্ডীদাস)। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এইরূপ কতবার কৃষ্ণনাম শুনিয়া বক্তার পদে ধরিয়াছেন, আলিঙ্গন করিয়াছেন, "কৃষ্ণ অনুরাগে সদা আকুল হৃদয়। শুনিলে কৃষ্ণের নাম অশ্রুধারা বয়॥ যদি কেহ রাধা বলি উচ্চ শব্দ করে। অমনি অশ্রুর ধারা ঝর ঝর করে॥ প্রাণ কৃষ্ণ বলি যদি দৈবে কেহ ডাকে। ধেয়ে গিয়ে আলিঙ্গন করেন তাহাকে॥"—(গোবিন্দদাসের কড়চা)। শ্রীরাধিকা—"পুছয়ে কানুর কথা ছল ছল আঁখি। কোথায় দেখিলা শ্যাম কহ দেখি সখি॥"—(চণ্ডীদাস) চৈতন্য দেবও—'গদাধরে দেখি প্রভু করয়ে জিজ্ঞাস। কোথা হরি আছেন শ্যামল পীতবাস॥ সে আর্ত্তি দেখিতে সর্ব্ব হৃদয় বিদরে। কি বলিব প্রভুর বচন নাহি স্ফুরে॥ সম্ভ্রমে বলিল গদাধর মহাশয়। নিরবধি আছেন হরি তোমার হৃদয়॥ হৃদয়ে আছেন হরি বচন শুনিয়া। আপন হৃদয় প্রভু চিরে নখ দিয়া॥'—(চৈ, ভা, মধ্যমখণ্ড। কৃষ্ণ-প্রেম-মগ্না রাধিকা ভূপৃষ্ঠে নখাঙ্কন করিয়া কৃষ্ণনাম লিখিয়া সুখী হইতেন,—"ভরমে তোমার নাম ক্ষিতি-তলে লিখি।"—(চণ্ডীদাস)। চৈতন্যদেবও,—"ক্ষণে পৃথিবীতে লেখে ত্রিভঙ্গ আকৃতি। চাহিয়া রোদন করে ভাসে সব ক্ষিতি॥—(চৈ, ভা, মধ্য) রাধিকার হাসি দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ বিভোর,—"হাস, হাস, নয়ন জুড়াক চন্দ্রমুখি। এ বোল বলিতে পিয়ার ছল ছল আঁখি॥ চৈতন্যদেব রত্নগর্ভের মুখে ভাগবত পাঠ শুনিয়া,—"বোল বোল বলে বিশ্বম্ভর। গড়াগড়ি যায় প্রভু ধরণী উপর॥ বোল বোল বলে প্রভু, পড়ে দ্বিজবর। উঠিল সমুদ্র কৃষ্ণ-সুখ মনোহর॥ লোচনের জল হ'ল পৃথিবী সিক্তিত। অশ্রু কম্প পুলকাদি ভাবের উদিত॥"—(চৈ, ভা, মধ্যম খণ্ড)। গোরার সন্ন্যাস নবদ্বীপের ইতিহাসে বিয়োগান্ত

পদাবলীর সঙ্গে সম্পর্ক।

নাট্য-রসের সৃষ্টি করিয়াছে—শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়ার সকরুণ ক্রন্দনরাশি পদকর্ত্তৃগণের মাথুর কীর্ত্তিত যশোদা ও রাধিকার শোকোচ্ছ্বাসে জীবন্ত দুঃখাশ্রু ও মর্ম্মবেদনার স্রোত ঢালিয়া দিয়াছে।

প্রস্ফুট কদম্ব-পুষ্পের ন্যায় প্রেম-রোমাঞ্চিত দেহ, শিশির-ফুল্ল পদ্মদলের ন্যায় প্রেমাশ্রুপূর্ণ চক্ষু—এই ছবিখানি শ্রীচৈতন্যদেবের। ইঁহার প্রেমের অনন্ত আনন্দের কথঞ্চিৎ চণ্ডীদাসের পদে পাওয়া যায়, অপরাপর কবিগণ তটস্থ দর্শকের ন্যায় উঁহাকে দূর হইতে দেখিয়া গীতি রচনা করিয়াছেন। পদকল্পতরু প্রভৃতি পুস্তক চৈতন্যদেবের অলৌকিক প্রেমের আভাস দিতে চেষ্টিত। তাঁহার লীলা-কাহিনী যাঁহারা জ্ঞাত নহেন, তাঁহারা পাছে এণ্ড্রোমেকি জুলিয়েট্‌, ডাইডোর সঙ্গে বৈষ্ণব কবি-অঙ্কিত রাধিকাকে একস্থলে দাঁড় করান, এই ভয়ে এতগুলি দৃষ্টান্ত খুঁজিয়াছি। বৈষ্ণব-পদাবলী, উপন্যাস বা ইন্দ্রজালের ন্যায় অলীক বোধ হইতে পারে, কিন্তু উহা খাঁটি সত্য; ভক্তের চক্ষে মেঘে কৃষ্ণ-ভ্রম হইয়াছে, তাহার পর "কোন মেঘ দেখে রাই এমন হলি।" প্রভৃতি কথার উদ্ভব হইয়াছে। কেবল চৈতন্যদেব নহেন, এই দলে আরও ভক্ত ছিলেন, যাঁহাদের কথা স্বপ্নের ন্যায় অলীক বোধ হয়; "মাধবেন্দ্রপুরীর কথা অকথ্য কথন। মেঘদরশন মাত্র হয় অচেতন।" (চৈ ভা.)।

বৈষ্ণবপদাবলীর সত্যতা।

এই অধ্যায়ের গ্রন্থরাশি যাঁহার নির্ম্মল অশ্রুবিন্দু-নিঃসৃত প্রেমদ্বারা উজ্জ্বল হইয়া অবর্ণনীয় সুন্দর ভাব পরিগ্রহ করিয়াছে, দীনা বঙ্গভাষা যাঁহার পবিত্রস্পর্শে গঙ্গাধারার নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাঁহার সঙ্গে পদাবলী সাহিত্যের সম্পর্ক নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিলাম। এস্থলে সংক্ষেপে তাঁহার জীবনী বর্ণনা করিব।

শ্রীচৈতন্যদেব।

যে নবদ্বীপ একদা পলায়নপর হিন্দু রাজার একখানি মলিন আলেখ্য দ্বারা ইতিহাসের পৃষ্ঠা কলঙ্কিত করিয়াছিল, খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে সেই নবদ্বীপ তিনটি শ্রেষ্ঠ পুরুষের চিত্রপট উপহার দিয়া স্বীয় ঐতিহাসিক ত্রুটি উৎকৃষ্টভাবে সংশোধন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ইঁহারা রঘুনাথ শিরোমণি, স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ও শ্রীচৈতন্যদেব। প্রথম দুই জন শাস্ত্রচর্চ্চাকারীদিগের মধ্যে 'রাজা' উপাধি পাইবার যোগ্য; শেষোক্ত জনও অল্পবয়সে সর্ব্বশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি শুষ্কপত্রের ন্যায় সেই শিক্ষা ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া সদ্য-বিকশিত উৎকৃষ্ট মনুষ্যত্ব বা দেবত্ব দেখাইয়াছিলেন। প্রথম দুইজনের সমকক্ষ আছে; কিন্তু তৃতীয় জন তুলনারহিত, মানবজাতির তপস্যার ফলস্বরূপ।

নবদ্বীপের তিনটি রত্ন।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে রাজধানী নবদ্বীপ একটি বিরাট পাঠশালায় পরিণত হইয়াছিল; মল্লযুদ্ধের দিনগতে তথায় তর্কযুদ্ধই প্রশংসা অর্জ্জনের পন্থা বলিয়া নির্ণীত হইয়াছিল। এই সময়ে নবদ্বীপের পরিসর অতিশয় বৃহৎ ছিল। আতোপুর, শিমলিয়া, মাজিতাগ্রাম, বামণপোখেরা, হাটডাঙ্গা, চাঁপাহাট, রাতুপুর, বিদ্যানগর, 'মাউগাছি, রাহুপুর, বেলপোখেরা, মায়াপুর প্রভৃতি বহুসংখ্যক পল্লী ইহার অন্তর্গত ছিল; নরহরির অতিরঞ্জিত বর্ণনায় ইহার বসতি অষ্টক্রোশব্যাপক বলিয়া উল্লিখিত আছে। (১) উক্ত পল্লীসমূহ ব্যতীত গন্ধবণিকপাড়া, তাঁতিপাড়া, শাঁখারিপাড়া, মালাকারপাড়া প্রভৃতি পাড়ার নাম চৈতন্যভাগবতে উল্লিখিত দেখিতে পাই।

১৫শ শতাব্দীর নবদ্বীপ।

নবদ্বীপে ন্যায়ের টোল তখন হিন্দুস্থানে অদ্বিতীয়; দর্শন, কাব্য, অলঙ্কার প্রভৃতি শাস্ত্রেরও সে স্থানে বিশেষরূপ চর্চ্চা হইতেছিল। এসকল সত্ত্বেও নবদ্বীপবাসী স্বল্প-সংখ্যক লোকের কিছু বাসনা অপূর্ণ থাকিয়া যাইত। মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরি ও ষষ্ঠীর-পূজা, যোগীপাল, ভোগীপাল, মহীপালের গীত, এবং পশুরক্ত ও মদ্য দ্বারা আর্দ্র যজ্ঞস্থলী দেখিয়া তাঁহারা আক্ষেপ করিতেন। হরিভক্তিহীন নবদ্বীপের অর্থ ও বিদ্যাসমৃদ্ধি তাঁহাদের নিকট সিন্দুরহীন রমণীললাটের ন্যায় বৃথা মনে হইত। তাঁহারা পৃথিবীতে ভক্তির অভাব দেখিয়া ব্যথিতচিত্তে অশ্রুপাত করিতেন। এই ভক্তবৃন্দের মধ্যে অদ্বৈতাচার্য্য অগ্রগণ্য। প্রবাদ আছে, ইঁহাদের অভাব পূরণ কবিতে চৈতন্যদেব অবতীর্ণ হন।

বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তখন এই কয়েকটি বৈষ্ণব আবির্ভূত হন,—ইঁহারা চারিদিকে ভক্তির অপূর্ব্ব কথা প্রচার করিতেন, কিন্তু এক সময়ে নবদ্বীপে ইঁহাদের সকলের মিলন হইয়াছিল। শ্রীহট্টে—শ্রীরাম পণ্ডিত, শ্রীবাস, শ্রীচন্দ্রশেখর দেব ও মুরারি গুপ্ত। চট্টগ্রামে—পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি ও শ্রীচৈতন্যবল্লভ দত্ত। বুড়নে—হরিদাস ও রাঢ়দেশে একচক্রা গ্রামে—শ্রীনিত্যানন্দ। ইঁহারা দীপশলাকা; কিন্তু চৈতন্যদেব দীপ। চৈতন্যদেব আবির্ভূত না হইলে ইঁহারা জ্বলিতে পারিতেন কি না, কে বলিবে?

নবদ্বীপে বৈষ্ণব-সম্মিলন।

শ্রীচৈতন্যের জীবনে অনেক অদ্ভুত ঘটনা বর্ণিত আছে। এক দিনে আম্রবীজবপন ও তাহা হইতে বৃক্ষ ও ফলোদ্গম, স্পর্শমাত্র কুষ্ঠরোগীর আরোগ্যলাভ, সুদর্শনচক্রকে আহ্বানমাত্র আকাশ হইতে উক্ত চক্রের আবির্ভাব, ষড়্‌ভুজপ্রকাশ ইত্যাদি। এ সব সত্য কি মিথ্যা, সে সম্বন্ধে কোনও মত প্রকাশ করিতে আমি সাহসী নহি। এই সকল প্রকৃত হইলেই বা ইহাদের কি মূল্য তাহা বুঝিতে পারি না। তাঁহার জীবনে যে সমস্ত অলৌকিক ঘটনা আবোপিত হইয়াছে, তন্মধ্যে তাঁহার নয়নাশ্রুর ন্যায় কোনটিই অলৌকিক নহে।

অলৌকিক লীলা।

(১) ভক্তি রত্নাকর দ্বাদশ তরঙ্গ।

যে প্রেমে তাঁহার শরীর কদম্বকোরকের ন্যায় কণ্টকিত হইয়াছে ও অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষুপুট হইতে অজস্র অশ্রুবিন্দুপাত হইয়াছে, সেই প্রেমের ন্যায় তাঁহার জীবনে কিছুই অপূর্ব্ব কি মনোহর হয় নাই চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি পুস্তকে তাঁহার আলেখ্য এই ভাবে লিখিত আছে,—

জন্ম ও শৈশব।

চৈতন্যদেব ১৪০৭ শকে (১৪৮৬ খৃঃ ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে) সন্ধ্যা * ৬৷৭ ঘটিকার সময় ফাল্গুনী পূর্ণিমায় নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা জগন্নাথ মিশ্র সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন। ইনি পাশ্চাত্য বৈদিক, বাড়ী শ্রীহট্ট;—নবদ্বীপে পড়িতে আসিয়াছিলেন, জগন্নাথ মিশ্রের পূর্ব্বপুরুষ উড়িষ্যার অন্তর্গত যাজপুর হইতে রাজা ভ্রমরের ভয়ে শ্রীহট্টে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। জগন্নাথ মিশ্র সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার স্বহস্তলিখিত একখানি সংস্কৃত মহাভারতের আদিপর্ব্ব আমরা নবদ্বীপবাসী ৺অজিতনাথ ন্যায়রত্ন মহামহোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট দেখিয়াছিলাম। ইহাতে বর্ণাশুদ্ধিমাত্র নাই—অক্ষরগুলি গোটা গোটা, অতি সুন্দর। চৈতন্যের জন্মিবার ১৭ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৩৯০ শকে এই পুঁথিখানি লিখিত হইয়াছিল। এই পুস্তক এখন স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্রগণের নিকট আছে।† নবদ্বীপে পাঠ সমাপনান্তে ইনি নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর গুণবতী কন্যা শচীদেবীকে বিবাহ করেন। গোবিন্দদাসের করচায় শচীদেবী সম্পর্কে এই ছত্রটি পাওয়া যায়। "শান্তমূর্ত্তি শচীদেবী অতি খর্ব্ব কায়।" শচীর গর্ভে ৭ কন্যা ও ২ পুত্র জন্মে। সব কয়টী কন্যারই অল্পবয়সে মৃত্যু হয়। ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রমে শাস্ত্রচর্চ্চায় বিব্রত যুবক বিশ্বরূপ বিরহারূপ জটিল প্রশ্ন দ্বারা ব্যতিব্যস্ত হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সুতরাং জগন্নাথ মিশ্র নিজে সুপণ্ডিত হইয়াও দ্বিতীয় পুত্র নিমাইএর পড়াশুনা বন্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার যুক্তি এইরূপ,—"এহি যদি সর্ব্বশাস্ত্রে হবে গুণবান্। ছাড়িয়া সংসার সুখ করিবে পয়ান॥ অতএব ইহার পড়িয়া কার্য্য নাই। মুর্খ হৈয়া ঘরে মোর থাকুক নিমাঞি॥"—(চৈ, ভা, আদি)।

জন্ম ও বংশ-পরিচয়।

শৈশবে জগন্নাথ মিশ্রের এই দ্বিতীয় বালকটী নবদ্বীপে বড় শান্ত শিষ্ট বলিয়া পরিচিত হন নাই। ইনি গঙ্গা-স্নানকারী ভক্তিমান্ ব্রাহ্মণগণের উপর বিশেষ উৎপীড়ন করিতেন। অভিযোগগুলি এইরূপ,—একজন বলিতেছেন,—"সন্ধ্যা করি জলেতে নামিয়া। ডুব দিয়া লৈয়া যায় চরণ ধরিয়া॥"—(চৈ, ভা, আদি)। "কেহ বলে মোর শিব-লিঙ্গ করে চুরি। কেহ বলে মোর লয়ে পলায় উত্তরী॥"—(চৈ, ভা, আদি)।

শৈশবে উচ্ছৃঙ্খলতা।

---

* জ্যোতিষিক গণনায় এই সময়টা ঠিক হয় কিনা বলিতে পারি না। ১৪০৭ শকে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণের অব্যবহিত পরেই তাঁহার জন্ম হয়, এই রাত্রে চন্দ্রগ্রহণের সময় দ্রষ্টব্য।

† লাট কারমাইকেল সাহেব ঐ পুস্তকখানি মাথায় ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়াছিলেন, স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায়ের নিকট আমি শুনিয়াছি।

গঙ্গার ঘাটে বালিকাগণের মাথায় ওকড়ার বীচি ফেলিয়া দিতেন, দীর্ঘ কৃষ্ণ কেশজালের দুর্ভেদ্য ব্যূহ ভেদ করিয়া উক্ত বীচির নির্গমকালে অনেক গাছি নষ্ট না হইয়া যাইত না। শিশু চৈতন্যপ্রভু দেখিতেন ; এই সকল অভিযোগকারিণী বালিকাদের মধ্যে কাহারও নালিস গুরুতর রকমের ছিল। "কেহ বলে মোরে চাহে বিভা করিবারে।"—চৈ, ভা, আদি)। (১) প্রভুর বয়স তখন পঞ্চবর্ষমাত্র, ইহা স্মরণ করিলে অভিযোগের গুরুত্ব অনেকটা হ্রাস হইবে, সন্দেহ নাই। একদিন নিমাই রন্ধনের বর্জ্জিত হাঁড়ির উপর বসিয়া পাগলামির এক নব অবয়ব প্রকটিত করিলেন ; মাতা কর্ত্তৃক ভর্ৎসিত হইলে শিশু উত্তর করিলেন,—"প্রভু বলে মোরে তোরা না দিস্ পড়িতে। ভদ্রাভদ্র মূর্খ বিপ্র জানিব কি মতে॥ মূর্খ আমি না জানি যে ভাল মন্দ স্থান। সর্ব্বত্র আমার এক অদ্বিতীয় স্থান॥" (চৈ ভা আদি)। এই উত্তরের সবটুকু খাঁটি সত্য কিম্বা ইহার মধ্যে লেখকগণের কিছু মুন্সীয়ানা আছে, ঠিক বলিতে পারি না। যেহেতু এই ক্ষুদ্র উত্তরটুকুতে ভেদজ্ঞান শূন্য সার্ব্বভৌম দার্শনিক তথ্যের আভাষ আছে। যেরূপ ভাবেই হউক, শিশুর সুখকর উপদ্রব হইতে গ্রামবাসীদিগকে মুক্তি দেওয়া একসময়ে নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিত। তখন মাতাপিতা বাধ্য হইয়া তাঁহাকে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে পড়িতে পাঠাইয়া দিলেন। গঙ্গাদাস, বিষ্ণুদাস ও সুদর্শন আমরা চৈতন্যপ্রভুর বাল্য ও কৈশোরের এই তিন অধ্যাপকের নাম পাইয়াছি।

নিমাই ছাত্র ও নিমাই অধ্যাপক।

"কি মাধুরী করি প্রভু ক, খ, গ, ঘ বলে।" বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন। নিমাইএর পড়া শুনার ইতিহাস প্রকৃতই বড় মধুর। যে একাগ্রতায় শচীর পাগল ছেলে পাগলামি করিয়াছে, সেই একাগ্রতায় শচীর দুরন্ত ছেলে পড়া শুনা লইয়া পাগল হইল।

পাঠে একাগ্রতা।

"কিবা স্নানে কি ভোজনে কিবা পর্য্যটনে। নাহিক প্রভুর আর চেষ্টা শাস্ত্র বিনে।" "আপনি করেন প্রভু সূত্রের টিপ্পনী। ভুলিয়া পুস্তক রসে সর্ব্বে দেবমণি॥" "না ছাড়েন শ্রীহস্তে পুস্তক একক্ষণে॥" "পুঁথি ছাড়িয়া নিমাঞি না জানে কোন কর্ম্ম। বিদ্যারস ইহার হয়েছে সর্ব্ব ধর্ম্ম॥" "একবার যে সূত্র পড়িয়া প্রভু যায়। আরবার উলটিয়া সবারে ঠেকায়॥"—(চৈ, ভা, আদি)।

এইরূপ একাগ্রতার বলে নিমাই শীঘ্রই ব্যাকরণশাস্ত্রে অদ্বিতীয় হইয়া উঠিলেন। কিন্তু নিমাই এখনও সেই পাগল ছেলে ; সে পাগলামির লীলারস বড় মধুর—উহা তাহার উদ্দাম ও স্ফূর্ত্তিপূর্ণ প্রকৃতির সহজ খেলা...উহা নির্ম্মল জল-স্রোতের ন্যায় আনন্দদায়ী, তাহাতে সরলতা বিম্বিত। নব-যুবক তাঁহাব তীক্ষ্ণ প্রতিভা ও শিক্ষার ধনু লইয়া বড় বড় অধ্যাপকদিগের পাঠশালা লক্ষ্যে তীর নিক্ষেপ

পাণ্ডিত্য ও টোলের অধ্যাপকতা।

(১) এই সব কাহিনীতে ভাগবতের সঙ্গে মিল রাখিবার কিছু কিছু চেষ্টা আছে, এজন্য ইহাদের ঐতিহাসিকত্বে আমরা খুব বিশ্বাসপরায়ণ হইতে পারি নাই ; বালিকাগণ নানারূপ অভিযোগ করিয়া শেষে বলিতেছে,—
"পূর্ব্বে শুনিলাম যেন নন্দের কুমার। সেইমত তোমার পুত্রের ব্যবহার॥"—চৈ, ভা, আদি।

করিতে লাগিলেন। মুরারিগুপ্ত বয়সে অনেক বড়, তাঁহাকে তর্কে হারাইয়া নিমাই বলিতেছেন ;—

"প্রভু কহে বৈদ্য তুমি ইহা কেন পড়। লতা পাতা নিয়া গিয়া রোগী দৃঢ় কর॥ ব্যাকরণ শাস্ত্র এই বিষম অবধি। কফ পিত্ত অজীর্ণ ব্যবস্থা নাহি ইথি॥"—(চৈ, ভা আদি)।

গদাধর পণ্ডিতকে পথে পাইয়া,—

"হাসি দুই হাত প্রভু রাখিয়া ধরিলা। ন্যায় পড় তুমি আমা যাও প্রবোধিয়া॥ জিজ্ঞাসহ গদাধর বলিল বচন। প্রভু কহে বল দেখি মুক্তির লক্ষণ॥"—(চৈ, ভা, আদি)।

এইরূপে তিনি পথিকদিগকে পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়া পরাভবব্যঞ্জক হাস্য ও শ্লেষ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। নদীয়ার বড় বড় পণ্ডিত এই তরুণ যুবকের পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা দেখিয়া প্রীতি ও বিস্মিত হইলেন। নিমাই যে টোল স্থাপন করিলেন, তাহাতে অসংখ্য ছাত্র পড়িতে আসিল। তাঁহার অপূর্ব্ব সুন্দর মূর্ত্তি, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্য সেই টোলের গৌরব অশেষরূপে বাড়াইয়া দিল। কিন্তু তখন তাঁহার বয়ঃক্রম অনতিক্রান্ত বিংশ বর্ষ মাত্র।

দিগ্বিজয়ী জয়।

কেশবকাশ্মীর নামক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলীকে তর্ক-যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধির গৌরবে নবদ্বীপবাসিগণ ভীত হইলেন ; কিন্তু তরুণ নিমাই হাস্যমুখে গঙ্গাতীরে তাঁহার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে বলা মাত্র তিনি গঙ্গার সেই সময়ের শোভা বর্ণন করিয়া একটি স্তোত্র রচনা করিলেন ; শ্লোকগুলির সুন্দর উপমা, সহজ ভাব, শ্রোতৃবর্গের মন মুগ্ধ করিল ; কিন্তু নিমাই সেই শ্লোকগুলির প্রত্যেকটি হইতে অলঙ্কারের দোষ বাহির করিয়া দিগ্বিজয়ীর অখণ্ড অভিমান স্ফীত মুখমণ্ডল খর্ব্ব ও মলিন করিয়া দিলেন। তাঁহার প্রথম ছত্রেব 'ভবানী-ভর্ত্তৃ' শব্দে বিরুদ্ধমতি দোষ,' 'বিভবতি' শব্দের পরে 'ক্রমভঙ্গদোষ,' 'শ্রীলক্ষ্মী' শব্দে 'পুনরুক্তবদাভাস,' ইত্যাদি। যিনি ব্যাকরণের ব্যুৎপত্তিতে অসাধারণরূপ কৃতী, তিনি অলঙ্কারশাস্ত্রের সূক্ষ্মতত্ত্বও অবগত ছিলেন, একথা দিগ্বিজয়ী কখনও মনে ভাবেন নাই। তাই দম্ভ-ভরে বলিয়াছিলেন ;—

"ব্যাকরণী তুমি নাহি পড় অলঙ্কার। তুমি কি জানিবে এই কবিত্বের সার॥"—(চৈ, চ, আদি)।

কিন্তু এবার তাঁহার স্পর্দ্ধা বৃথা হইল। প্রভু যখন তাঁহার রত্নমুষ্টির ন্যায় কবিতাটিকে শ্রোতৃমণ্ডলীর সমক্ষে ভস্মমুষ্টির মত প্রতিপন্ন করিলেন, তখন দিগ্বিজয়ী তাঁহার অহঙ্কারের পুচ্ছ গুণ্ঠিত করিয়া কোন্ পথে পলায়নপর হইলেন, কেহ তাঁহাকে আর দেখিতে পাইল না।

এই তরুণবয়সে প্রবীণশিক্ষাপ্রাপ্ত পণ্ডিতটির দুরন্তপনার কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। শ্রীহট্টীয়াগণকে দেখিলে নিমাই ব্যঙ্গ করিতেন; তিনি খাঁটি নদেবাসীর সন্তান হইলে শ্রীহট্টবাসীদের ততদূর দুঃখ হইত না। ময়ূরের পুচ্ছ শরীরে সংলগ্ন করিলেই ময়ূর উপাধি পাওয়া যায় না, শ্রীহট্টবাসিগণের এই জন্য একটু ন্যায্য কষ্ট হইত,—

ব্যঙ্গ-প্রিয়তা।

"শ্রীহট্টীয়াগণ বলে হয় হয় হয়। তুমি কোন্ দেশী তাহা কহ মহাশয়॥ পিতা মাতা আদি করি তাবৎ তোমার। বল দেখি শ্রীহট্টে জন্ম না হয় কাহার॥"—(চৈ, ভা, আদি)।

কিন্তু রহস্যপ্রিয় ক্ষুদ্র পণ্ডিতটি এসব যুক্তি শুনিতে প্রস্তুত নহেন। "তাবৎ শ্রীহট্টীয়ারে চালেন ঠাকুর। যাবৎ তাহার ক্রোধ না হয় প্রচুর॥ মহাক্রোধে কেহ লই যায় খেদাড়িয়া। লাগালি না পায় যায় তর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া॥" (চৈ, ভা, আদি)।

ধর্ম্ম না থাকিলে হিন্দুস্থানে রূপ বৃথা,—বিদ্যা বৃথা। সকলেই নিমাইকে ধর্ম্মবিষয়ে উপদেশ দিতে যাইত। রহস্যের স্রোতে ধর্ম্মকথা ভাসাইয়া দিয়া নিমাই হাসিতেন। ঈশ্বরপুরী পরমবৈষ্ণব, তাঁহাকে ধর্ম্মে মতি লওয়াইতে নিত্য নিত্য কত শ্লোক পাঠ করিতেন, কিন্তু নিমাই তাঁহার শ্লোক হইতে ব্যাকরণের দোষ বাহির করিতে নিপুণ ছিলেন। "প্রভু কহে এ ধাতু আত্মনেপদী নয়॥" ব্যাকরণের অতলগর্ভে ধর্ম্মের কথাগুলির গঙ্গাপ্রাপ্তি হইত। কিন্তু তাঁহার বাহিরের এই রহস্য-প্রিয়তা প্রকৃত ধর্ম্মহীনতার পরিচায়ক ছিল না। তিনি ব্যঙ্গ করিয়াও শ্রীধর এবং গদাধরকে দেখিলে মনে মনে আহ্লাদিত হইতেন এবং ঈশ্বরপুরীকে দেখিলে পাগল হইয়া যাইতেন।

ধর্ম্মহীনতা শুধু ভাণ।

এই যুবকের হৃদয় শরদভ্রের ন্যায় নির্ম্মল ও শরৎ শেফালিকার ন্যায় পবিত্র ছিল; ইঁহার চাপল্য—স্বচ্ছ, উদ্দাম প্রকৃতির হর্ষময় রসপূর্ণ খেলা,—তাহা সকলের প্রীতি উৎপাদন করিত। এই নির্ম্মল ও পবিত্র প্রাকৃতিক উপাদানে সরল ভক্তি কিরূপ কার্য্যকরী হইয়াছিল, তাহা আমরা পরে দেখাইতেছি।

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য।

নিমাইপণ্ডিত পূর্ব্ববঙ্গ পর্য্যটন করিতে গেলেন। ইহার পূর্ব্বেই তিনি বঙ্গের সর্ব্বত্র একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত ছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গের পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহাকে যথেষ্ট আদরের সহিত অর্চ্চনা করিয়া বলিলেন,—"উদ্দেশে আমরা সবে তোমার টিপ্পনী। লই, পড়ি, পড়াই শুনহ দ্বিজমণি।"—(চৈ, ভা, আদি)। ইহা দ্বারা জানা যায়, নিমাইপণ্ডিতের টীকা বঙ্গদেশের টোলগুলিতে প্রচলিত হইয়াছিল। (১) তিনি পূর্ব্ববঙ্গের কোন্ কোন্ স্থল ভ্রমণ

পূর্ব্ববঙ্গে ভ্রমণ।

(১) চৈতন্যপ্রভু ব্যাকরণের টীকার কথা অনেক স্থলেই পাওয়া যায়, যথা—"দিনে দিনে ব্যাকরণে হৈল্যা চমৎকার।

করিয়াছিলেন, তাহা এ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই। চৈতন্ত ভাগবতকার উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি পদ্মা-নদীর তীর পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। প্রেম বিলাস প্রভৃতি পুস্তক-বর্ণিত পূর্ব্ববঙ্গ ভ্রমণকাহিনী বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয় না।

স্ত্রী বিয়োগ ও পুনঃ পরিণয়।

নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিয়া চৈতন্যদেব সঙ্গিগণের নিকট পূর্ব্ববঙ্গের ভাষার অনুকরণ করিয়া হাস্য-পরিহাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু একটি প্রফুল্ল পুতুলের ন্যায় যখন জননীদেবীর চরণে প্রণত হইলেন, তখন প্রত্যাগত কুমারের মুখ দেখিয়া শচী-ঠাকুরাণী কাঁদিয়া ফেলিলেন। নিমাই জানিতে পারিলেন, সর্পদংশনে তাঁহার স্ত্রী লক্ষ্মীদেবীর মৃত্যু হইয়াছে। নবীন পণ্ডিত মাতাকে প্রবোধ দিলেন বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর পাণিগ্রহণ করিয়া সেই প্রবোধ সম্পূর্ণ করিলেন; কিন্তু নিজে, বোধ হয়, প্রবোধ পান নাই। (১) পিতৃপিণ্ডপ্রদানার্থ গয়াযাত্রা করিলেন; এবার তাঁহার চিত্ত শোকে আকুল হইয়াছিল, তীর্থস্থানে যাইয়া ঈশ্বরপুরীর ভক্তির উচ্ছ্বাস দর্শনে নিমাই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। ভক্তিময় ঈশ্বরপুরীর মূর্ত্তি তাঁহার চক্ষে একখানি দেবতার ছবির ন্যায় অপূর্ব্ব বোধ হইল; ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান কুমারহট্ট গয়া হইতেও শ্রেষ্ঠ তীর্থ বলিয়া বোধ হইল;—

গয়া গমন ও ভক্তির উচ্ছ্বাস।

"প্রভু বলে কুমারহট্টের নমস্কার। শ্রীঈশ্বরপুরী যে গ্রামে অবতার॥ * * * ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান এ মৃত্তিকা আমার জীবন ধন প্রাণ॥"—(চৈ, ভা, আদি)।—বলিয়া নিমাই সাশ্রুনেত্রে কুমারহট্টের ধূলিরেণু দুর্লভ সামগ্রীর ন্যায় উত্তরীয়-অঞ্চলে বাঁধিতে লাগিলেন।

ইহার পর আর এক দৃশ্য,—সে দৃশ্য চিত্রে অঙ্কিত হওয়ার উপযুক্ত। স্ত্রীবিয়োগকাতর শিক্ষা-ভিমানী যুবক গয়ায় অঞ্জলি দিতে দাঁড়াইয়াছেন; যে চরণ হইতে ভগবতী গঙ্গা নিঃসৃত, যে চরণে

ব্যাকরণের করয় টিপ্পনী আপনার॥"—(ভক্তিরত্নাকর ১২ তরঙ্গ)। "বিদ্যাসাগর উপাধিক নিমাঞি পণ্ডিত। 'বিদ্যা-সাগর নামে টীকা যাহার রচিত॥"—(অদ্বৈতপ্রকাশ, ১৩৪ পৃঃ)।

(১) চৈতন্যদেব লক্ষ্মীদেবীকে গঙ্গার ঘাটে প্রায়ই দেখিতেন এবং এই উপলক্ষে চারি চোখের মিলন হইত। ফুলধনুর অব্যর্থ সন্ধানে এইভাবে উভয়ের মনে ভালবাসা জন্মিয়াছিল। তখন বিবাহ দেওয়া শচীদেবীর অভিপ্রেত ছিল না। কিন্তু চৈতন্যদেব মাতার অনিচ্ছায় দুঃখিত হইয়া বিরক্তি প্রকাশ করেন। পুত্রের আগ্রহ দেখিয়া শচীদেবী স্বীকৃত হন। লক্ষ্মীর অপঘাত মৃত্যুই চৈতন্যদেবের সংসার বৈরাগ্যের অন্যতম কারণ। কিন্তু চৈতন্যদেবের বিষ্ণু প্রিয়াকে বিবাহ করার ইচ্ছা ছিল না। বরঞ্চ তিনি বিবাহের প্রস্তাবটি প্রথমতঃ ভাঙ্গাইয়া দিয়াছিলেন; বিষ্ণু প্রিয়াদেবীর প্রতি তাঁহার কোন অনুরাগ জন্মিয়াছিল, তাহার প্রমাণাভাব। বরং তাঁহাকে যখন শচীদেবী পুত্রের নিকট লইয়া আসিতেন—তখন "দৃষ্টিপাত করিয়াও প্রভু নাহি চায়" বৃন্দাবন দাসোক্ত এই সকল উক্তিই সত্য বলিয়া মনে হয়। লোচনদাস প্রভৃতি কবিগণের বর্ণনা অতিরঞ্জিত।

বলি দলিত, যে চরণরেণু ধারণ করিতে শুক সন্ন্যাসী, নারদ বৈরাগী, যোগেশ্বরগণ তপোরত—সেই চরণ দেখিতে দেখিতে নিমাই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সঙ্গিগণের যত্নে মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল, তখন অজস্র নয়নাশ্রু ফুল্লারবিন্দগুচ্ছের ন্যায় সেই শ্রীচরণ উদ্দেশে বর্ষিত হইতেছিল, কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি পথ দেখিতে পান নাই, বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে সঙ্গিগণকে বলিলেন,—"তোমরা গৃহে ফিরিয়া যাও, আমি আর সংসারে যাইব না; আমি প্রাণেশ্বরকে দেখিতে মথুরায় চলিলাম।"

এই অপূর্ব্ব ভক্তি-উচ্ছ্বসিত পূর্ব্বরাগের আবেশময় যুবককে সঙ্গিগণ নানা উপায়ে প্রত্যাবর্ত্তিত করিলেন। গৃহে আসিয়া নিমাই সেই পাদপদ্মের কথা বলিতে পারেন নাই,—বলিতে যাইয়া ভাবাবেগে কথা রুদ্ধ হইয়াছে; 'কি দেখিয়াছি' বলিতে উদ্যত হইয়া একবার শ্রীমান্ পণ্ডিত, আবার গদাধরের কণ্ঠ জড়াইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার ভাষায় ব্যক্ত হয় নাই—তাঁহার মুক্তাদামসম উজ্জ্বল অশ্রুজলে ব্যক্ত হইয়াছিল।

এই প্রেমোন্মত্ত বালককে শচীদেবী পুত্রবধূর রূপ দ্বারা বাঁধিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন,—
"লক্ষ্মীরে আনিয়া প্রভুর নিকটে বসায়। দৃষ্টিপাত করিয়াও প্রভু নাহি চায়॥ কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ বলে অনুক্ষণ। দিবানিশি শ্লোক পড়ি করয় ক্রন্দন॥"—চৈ, ভা. আদি।

মন্ত্রগ্রহণ, সন্ন্যাস ও ভক্তি-মাধুর্য্য।

ইহার পর কাঁটোয়ার কেশব ভারতীর নিকট মন্ত্রগ্রহণ, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম গ্রহণ ও সন্ন্যাস অবলম্বন অচিরে সম্পন্ন হইল; তখন তাঁহার বয়স ২৪ বৎসর মাত্র (১৫০৯ খৃঃ)।

গয়া গমন অবধি তাঁহার ইতিহাস স্বতন্ত্ররূপ। এরূপ অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যজড়িত ছবি ইতিহাসের পটে যুগ যুগান্তর পরে একবার প্রকটিত হইয়া থাকে। বক্তৃতার গুণ নহে,—রূপ দেখাইয়া চৈতন্য-দেব পৃথিবী মোহিত করিলেন;—শিশিরস্নিগ্ধকুসুমসৌরভ বক্তৃতা দ্বারা উপলব্ধি করাইতে হয় না। চৈতন্যদেব স্বীয় ভক্তিময় অশ্রুসিক্ত মূর্ত্তিখানি দ্বারে দ্বারে দেখাইয়াছেন, যে দেখিয়াছে সেই ভুলিয়াছে; সত্যবাই, লক্ষ্মীবাই—বেশ্যাদ্বয় তাঁহাকে প্রতারিত করিতে যাইয়া কাঁদিয়া পদে শরণ লইয়াছে। ভীলপন্থ, নারোজী প্রভৃতি দস্যুগণ তাঁহার রূপে আকৃষ্ট হইয়া কাঁদিয়া পায় ধরিয়াছে। হরিনাম করিতে করিতে তাঁহার অঙ্গ পুলকিত ও চক্ষু মুদ্রিত হইয়াছে, তখন সেই চক্ষু ফাটিয়া অতি মনোহর মুক্তাদাম পতিত হইয়াছে। তমালকে জড়াইয়া কাঁদিয়াছেন; কদম্ব বৃক্ষ দেখিয়া অজ্ঞান হইয়াছেন; বিষ্ণুর উদ্দেশে প্রদত্ত ভোগের অন্ন খাইতে চক্ষু জলে আর্দ্র হইয়াছে ও এক একটী অন্ন অমৃত জ্ঞানে খাইয়া পাগল হইয়াছেন। বেঙ্কট নগরের নিকট এক বৃক্ষতলে তিন দিন তিন রাত্রি পাগলের মত হরি বলিয়া কাঁদিয়া ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়াছিলেন; এই সময়ের মধ্যে আহার, নিদ্রা, বাহ্যজ্ঞান কিছুই

ছিল না। যে ব্যক্তি তাঁহার প্রতি বিদ্বেষযুক্ত ভাব লইয়া দাঁড়াইয়াছে, সেও তাঁহার অপূর্ব্ব গৌর কান্তিতে দৈবপ্রতিভার বিদ্যুৎলহরী, অশ্রুসিক্ত মুখখানিতে আশ্চর্য্য ভক্তির প্রভা দেখিয়া কাঁদিয়া 'হরি বোল' বলিয়াছে। সত্যই যমুনাভ্রমে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছিলেন; পুণানগরে এক ব্রাহ্মণ বলিয়াছিল—"তোমার হরি ঐ পুষ্করিণীতে আছেন।" তখন চৈতন্য জলে ঝাঁপ দিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই মূর্ত্তি ধ্রুব-প্রহ্লাদের প্রতিচ্ছায়া।

তাঁহার প্রতি লোকানুরাগ।

এই অপূর্ব্ব মনুষ্যটিকে দেখিয়া জাতীয় জীবনে যে বিস্ময় ও প্রেম জন্মিয়াছিল,—তাহা অলৌকিক উচ্ছ্বাসময়। শ্রীবাস অঙ্গনে সারারাত্রি চৈতন্যদেব সঙ্গিগণ সহ হরিনাম-কীর্ত্তনে উন্মত্ত ছিলেন, নিশি কিরূপে ভোর হইল তাহা তাঁহারা জানেন নাই। এই অপূর্ব্ব সম্মিলনের সুখ উপভোগের বস্তু, ভাষায় ব্যক্ত হওয়ার যোগ্য নহে,—"চমকিত হইয়া সবে চারিদিকে চায়। নিশি পোহাইল বলি কাঁদে উভরায়॥ কোটী পুত্রশোকেও এত দুঃখ নহে। যে দুঃখে বৈষ্ণব সব অরুণেরে চাহে॥"—চৈ, ভা, মধ্য খণ্ড। অদ্বৈত গোঁসাই বলিয়াছিলেন,—"শিরে বজ্র পড়ে যদি পুত্র মরি যায়। তবুও প্রভুর নিন্দা সহন না যায়॥" লোকবৃন্দের ভক্তি এতদূর হইয়াছিল,—"যাঁহা যাঁহা প্রভুর চরণ পড়য় চলিতে। সে মৃত্তিকা লয় লোকে গর্ত্ত হয় পথে॥"—চৈ, চ মধ্য ১ম পঃ। চিরসঙ্গী গোবিন্দ-ভৃত্য পুরীতে চৈতন্যদেবের নিকট হইতে পত্র লইয়া শান্তিপুর যাইতে আদিষ্ট হইলে, দুদিনের বিচ্ছেদ ভাবিয়াই ব্যাকুল হইয়াছিল। "এই বাক্য শুনি মোর চক্ষে বারি বহে। প্রভুর বিরহবাণ প্রাণে নাহি সহে॥"—(কড়চা)। হরিদর্শনেচ্ছু অশ্রুপূর্ণ চক্ষুর্দ্বয়ের দৃষ্টি যেদিকে পড়িয়াছে, সেইদিকে কুসুমগুচ্ছ বিক্ষিপ্ত হইয়াছে,—"বিশাল নয়নে যেই দিকে যবে চায়। সেইদিকে নীলপদ্ম বরষিয়া যায়॥"—(গোবিন্দ দাসের কড়চা) পরবর্ত্তী প্রসিদ্ধ কবি গোবিন্দদাস—"যঁহি যঁহি তরল বিলোচন পড়ই। তঁহি তঁহি নীল উৎপল ভরই॥"—পদে এই মূর্ত্তির আবেশময় প্রতিবিম্ব দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ণনাগুলিতে কিছুমাত্র অতিরঞ্জন নাই। আমরা অলৌকিক শক্তির স্ফূরণ দেখি নাই; যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা উপমা ও অলঙ্কার ভিন্ন কথা কহিতে পারেন নাই, তাই পৃথিবীর ধর্ম্মকাব্যগুলি রূপকথার ন্যায় বোধ হয়।

বাঙ্গালী নবদ্বীপের ছেলেটি রূপে গুণে এখনও মোহিত রহিয়াছে, এখনও সেই স্মৃতিতে সদ্যো-জাত প্রিয় বালকের মুখচুম্বন করিয়া তাহাকে 'নবদ্বীপচন্দ্র', 'নগরবাসী', 'নদেবাসী', প্রভৃতি নাম দিয়া ৪০০ বৎসর পূর্ব্বের শিশুটির প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা জানাইয়া থাকে।

তাঁহার জীবনে ধর্ম্মনীতি।

পৌরুষ ও বিনয়।

ফুলের মৃদুতা মেয়েলী গুণ; "মহামুভবের চিত্তের স্বভাব এই হয়। পুষ্পসম কোমল কঠিনবজ্রময়॥"—কৃষ্ণদাস কবিরাজের কণ্ঠে ভবভূতির বক্তির প্রতিধ্বনি। (১) পৌরুষ ভিন্ন পুরুষ হয় না, পুষ্পভারাবনত ব্রততীজড়িত দেবদারুর ন্যায় মহাপুরুষগণ নানা-কোমল-গুণ-বেষ্টিত হইয়া স্বীয় চরিত্রের অনমনীয়ত্ব সুদৃঢ়ভাবে স্থাপন করেন। চৈতন্যদেবের চরিত্রে কোমলত্ব ও পৌরুষ মিশিয়া গিয়াছিল। একদিক্ হইতে সেই চরিত্রের ভক্তি, প্রেম ও বিনয় ফুল্ল পুষ্পের ন্যায় মনোহর দেখায়, অন্যদিক্ হইতে সে চরিত্রের দৃঢ়ত্ব বিস্ময় উৎপাদন করে। একদিকে পাহাড়ের ন্যায় ঋজু বিরাট, অন্যদিকে অলিগুঞ্জরিত ফুলময়। কিন্তু তাঁহার বিনয়ও প্রকৃত বীররসে পুষ্ট—ইহার মৃদুতায়ও দৃঢ়তা আছে; গঙ্গার ঘাটে তিনি লোক পরিচর্য্যায় নিযুক্ত;—"তোমা সব সেবিলে সে কৃষ্ণভক্তি পাই। এত বলি কার পায় ধরে সেই ঠাঞি॥ নিঙ্গাড়য়ে বস্ত্র কার করিয়া যতনে। ধুতি বস্ত্র তুলি কার দেন ত আপনে॥ কুশ গঙ্গা মৃত্তিকা কাহার দেন করে। সাজি বহি কোন দিন চলে কার ঘরে॥"—(চৈ, ভা, মধ্য)। তিনি ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ; ব্রাহ্মণগণ শূদ্রজাতির উপর পরিচর্য্যার ভার দিয়া অনেক দিন হস্তের পুণ্য ভুলিয়া গিয়াছিলেন,—তাই এ বিনয় বীরের যোগ্য।

তাঁহার কঠোর বৈরাগ্য।

কিন্তু এই মৃদু পুষ্প-সম ব্যক্তিও কোন কোন সময় বজ্রবৎ কাঠিন্য দেখাইতেন। তাঁহার নির্ম্মল প্রীতিতে যদি কেহ বিলাসের পঙ্ক মিশাইতে যাইত, তখন এই মধুর প্রেমবিগলিত ছবি একটি উজ্জ্বল বজ্রময় মূর্ত্তিতে পরিণত হইত। জগদানন্দ একটি তুলার বালিশ তাঁহার জন্য রাখিয়াছিলেন, তজ্জন্য "জগদানন্দ চাহে আমায় বিষয় ভুঞ্জাইতে" বলিয়া তিনি তাহাকে অশেষরূপ ভৎর্সনা করিয়া ছিলেন। এক ব্যক্তি এক হাঁড়ি সুগন্ধি তৈল তাঁহাকে উপঢৌকন দিয়াছিল, প্রভুর বিরাগ দেখিয়া জগদানন্দকে তাহা আঙ্গিনায় ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইয়াছিল। গোবিন্দঘোষ প্রভুর মুখশুদ্ধির জন্য একার্দ্ধ হরিতকী দিয়া অপরার্দ্ধ পরদিবসের জন্য রাখিয়া দিয়াছিলেন। তাহার সঞ্চয়বুদ্ধি আছে, এই বলিয়া তিনি তাহাকে বৈরাগ্য-ধর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিলেন। তাহার শত অনুনয় বিনয় বিফল হইল। ছোট হরিদাস শিখি মাহিতির ভগিনী মাধবীর নিকট ভিক্ষা চাহিয়াছিল, "প্রভু কহে সন্ন্যাসী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ। দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন॥"—(চৈ, চ, অন্ত্যখণ্ড)। চৈতন্য তাহার মুখ আর দেখেন নাই। সনাতন মহাধনী, তিন টাকা মূল্যের একখানা ভোটকম্বল গায় দিয়া আসিয়াছিলেন, কৌপিনসার চৈতন্যদেব নবীন সন্ন্যাসীর সঙ্গে নানাপ্রকার সদালাপ করিতে লাগিলেন, কিন্তু "ভোট কম্বলের পানে প্রভু চাহে বার বার" সুতরাং সনাতনকে ভোটকম্বল ত্যাগ

---

(১) "বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনী কুসুমাদপি।" উত্তরচরিত।

করিতে হইল। সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার সংকল্প যেদিন মুখ হইতে বহির্গত হইল, সেদিন সমস্ত নবদ্বীপবাসী শোকোন্মত্তভাবে স্নেহের বাহুদ্বারা তাঁহাকে জড়াইয়া রাখিতে চাহিল। তাঁহার শোকক্ষিপ্ত মাতা দ্বাদশ দিন উপবাস করিলেন, "দ্বাদশ উপাসে আইকরিলা ভোজন" (চৈ, ভা, মধ্য)। নির্ম্মম সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ করিতে যাওয়ার সময় শত শত লোক তাঁহার সঙ্গে যাইতে পাগল-প্রায়, কাহারও অশ্রুজল লক্ষ্য না করিয়া একমাত্র ভৃত্যসঙ্গে চৈতন্য চলিয়া গেলেন। রামানন্দ-রায়ের বাড়ীতে বিষ্ণু মন্দির পরিষ্কার করিতে বহুবিধ লোক নিযুক্ত; কিন্তু শেষে দেখা গেল, উপবাস-ক্ষীণ কৃষ্ণবিরহে শীর্ণদেহ চৈতন্যের আহৃত বোঝাই সর্ব্বাপেক্ষা বড়। এই কষ্টসহিষ্ণু কৌপীনধারী, সত্যবাক্য, বিষয়নিস্পৃহ ব্রাহ্মণবালক সেই প্রাচীন ঋষিগণেরই বংশধর, যুগে যুগে সেই ব্রহ্মনিষ্ঠাপূর্ণ ঋষি-বংশোদ্ভব মহাজনগণ প্রেম, ভক্তি ও জ্ঞান শিখাইবার জন্য এই ভাবে হিন্দুসমাজে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

সোঽহং।

এরূপ হয়, যখন আরাধ্য ও আরাধ্যকে প্রভেদ থাকে না; ভাগবতে তদবস্থায় গোপীগণ নিজকে শ্রীকৃষ্ণ ভ্রম করিতেছেন; গোপীগণ,—"সকলেই কৃষ্ণাত্মিকা হইয়া পরস্পর 'আমিইএই কৃষ্ণ', এই প্রকার কহিতে লাগিলেন" (ভাগবত ১১শ স্কন্ধ, ৩০ অঃ ৩ শ্লোক)। জয়দেবও রাধার এই অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন, "মধুরবলোকিতমমণ্ডনলীলা। মধুরিপুরহমিতি ভাবনশীলা।" বিদ্যাপতির গীতেও সেই কথার পুনরুক্তি আছে "অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে সুন্দরী ভেল মাধাই॥" ইহাই যোগীর "সোঽহং", খ্রীষ্টের "আমি এবং আমার পিতা এক।" এইরূপ মুহূর্ত্ত চৈতন্য-দেবের জীবনেও হইত বলিয়া বর্ণিত আছে। যদি ফুল্লপদ্মে ভ্রমর পতিত হইলে হর্ষ-উচ্ছ্বসিত পদ্ম স্বীয় দল মুদিত করিয়া ভ্রমরকে সম্ভোগ করে, তখন অন্তঃপ্রবিষ্ট ভ্রমরযুক্ত পদ্মটি যেরূপ পূর্ণ আনন্দের চিত্র হইয়া দাঁড়ায়, চৈতন্যপ্রভুও সেইরূপ যাঁহাকে খুঁজিতেন, তাঁহাকে সময়ে সময়ে হৃদয়ে পাইয়া মুদিত হইতেন, তখন তাঁহার ছবি অমানুষী প্রফুল্লভাব ধারণ করিয়াছে—বাঞ্ছিতের আলিঙ্গনে তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া তখন "মুঞি সেই মুঞি সেই কহি কহি হাসে।"—(চৈ. ভা, মধ্য)। সেই সময় তাঁহার মূর্ত্তি সাধারণ মনুষ্য হইতে স্বতন্ত্র হইত, তখন তাঁহার শরীরের দিব্যপ্রভা দর্শনে বৃদ্ধ অদ্বৈতাচার্য্যও তুলসী-চন্দন দ্বারা তাঁহাকে পূজা করিয়াছেন, এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। (১)

---

(১) মহাপুরুষদের প্রতি নানারূপ অলৌকিক লীলা প্রয়োগ করা সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালের আচরিত রীতি। চৈতন্য-দেব সর্ব্বদাই অতি সতর্কভাবে এই প্রকার অতিভক্তি পরায়ণ পরিকরদের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতেন। যাঁহারা তাঁহাকে ভগবান বলিতেন, তিনি তাঁহাদিগকে কোন উৎসাহই দিতেন না, বরং গঞ্জনা করিতেন। এই জন্য পুরী ও দাক্ষিণাত্য-লীলার অলৌকিকত্বের আরোপ অতি অল্প, কিন্তু নবদ্বীপ হইতে চলিয়া গেলে তাঁহার শাসনাভাবে সেখানে নানারূপ অলৌকিক কাহিনী বিনা বাধায় জন্মিয়া প্রশ্রয়প্রাপ্ত হইয়াছিল। মুরারিগুপ্ত ও বৃন্দাবন দাসের উক্তি ঐতিহাসিককে অতি সতর্কতার সহিত গ্রহণ করিতে হইবে।

কিন্তু ঐ ভাব অল্পকালব্যাপক; তদবসানে চৈতন্যদেবের বাহ্যজ্ঞান হইয়াছে, তখন তাঁহাকে যে ঈশ্বর সম্বোধন করিয়াছে, তাহার উপর বিরক্ত হইয়াছেন। দাক্ষিণাত্য হইতে উড়িষ্যায় প্রত্যাগত হইলে বাসুদেব সার্ব্বভৌম গললগ্নীকৃতবাস ও কৃতাঞ্জলি হইয়া ঈশ্বরভাবে তাঁহার বন্দনা পাঠ আরম্ভ করিলেন, কিন্তু চৈতন্যদেব তাহাতে ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইলেন, "প্রভু কহে সার্ব্বভৌম আর কথা কহ। আতাল পাতাল কথা কেন বা বলহ।"—(গোবিন্দের কড়চা)। রামানন্দ রায় তাঁহাকে 'ঈশ্বর' বলাতে চৈতন্যদেব সবিনয়ে উত্তর করিলেন, "প্রভু কহে আমি মানুষ আশ্রমে সন্ন্যাসী। কায়মনোবাক্যে ব্যবহারে ভয় বাসি। শুক্ল বস্ত্রে মসী বিন্দু যৈছে না লুকায়। সন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্র সর্ব্বলোকে গায়। * * * পূর্ণ যৈছে দুগ্ধের কলস। সুরাবিন্দুপাতে কেহ না করে পরশ।"—(চৈ চ, অন্ত্যখণ্ড)। এক গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ বিষ্ণুমন্দিরে তাঁহার পাদোদক পান করিয়াছিল, প্রভুর অসন্তোষহেতু সেই ব্রাহ্মণকে অর্দ্ধচন্দ্র দ্বারা বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হইল। চণ্ডীপুরে ঈশ্বরভারতী তাঁহাকে 'শ্রীকৃষ্ণ' বলিয়া সম্বোধন করাতে তিনি বিরক্ত হইয়াছিলেন। শ্রীবাস-অঙ্গনে হরির নাম সংকীর্ত্তন না করিয়া 'চৈতন্যজয়' বলিয়া সংকীর্ত্তন আরম্ভ করায় তিনি বিরক্ত হইয়া তাহা নিবারিত করিয়া দিলেন। বাহুল্য ভয়ে আর উদাহরণ দিব না, এরূপ অনেক স্থলেই পাওয়া যাইবে। তাঁহার মত বিনয়ী জগতে দুর্লভ, তিনি অহঙ্কারীকে বিনয় দ্বারা পরাজয় করিয়াছেন; বাসুদেব সার্ব্বভৌমের সঙ্গে প্রথম দর্শনের পর বৃদ্ধ অধ্যাপক চৈতন্যদেবকে অল্প বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করার জন্য ভৎ'সনা করিলেন এবং প্রমাণ করিয়া দেখাইলেন এ বয়সে তাঁহার সন্ন্যাস গ্রহণের অধিকার নাই; তদুত্তরে—"প্রভু কহে শুন সার্ব্বভৌম মহাশয়। সন্ন্যাসী আমারে নাহি জানিও নিশ্চয়। কৃষ্ণের বিরহে মুঞি বিক্ষিপ্ত হইয়া। বাহির হইনু শিখা সূত্র মুড়াইয়া। সন্ন্যাসী করিয়া জ্ঞান ছাড় মোর প্রতি। কৃপা কর যেন মোর কৃষ্ণে হয় মতি।"—চৈ, ভা, মধ্য)। তুঙ্গভদ্রবাসী ঢুণ্ডিরামতীর্থ তাহার সঙ্গে বিচার করিতে চাহিলে চৈতন্যদেব—"মুরখ সন্ন্যাসী মুই কিছু নাহি জানি" বলিয়া তাঁহাকে 'জয়পত্র' লিখিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। চণ্ডীপুরে ঈশ্বরভারতীকে এবং রামেশ্বর তীর্থে এক যোগী পণ্ডিতকেও তিনি এইরূপ উত্তর দিয়াছিলেন; কিন্তু এই সব পণ্ডিতগণ সকলেই তাঁহার সুধাকণ্ঠে হরির নাম শুনিয়া, তাঁহার ব্যাকুল উন্মত্ততা দেখিয়া করজোড়ে তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। আর যেখানে তিনি ইচ্ছাক্রমে তর্কে প্রবৃত্ত হইতেন, সেখানে অবলীলাক্রমে সমস্ত দর্শন ও ন্যায়ের যুক্তি খণ্ড খণ্ড করিয়া সর্ব্বশেষ উন্মত্তবৎ হরিনামের মাহাত্ম্য কহিতে কহিতে উপদেশ শেষ করিতেন, তখন কদম্বকোরকের ন্যায় অঙ্গ পুলকিত হইত ও হরিনাম বলিতে বলিতে কাঁদিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িতেন; বড় বড় পণ্ডিত তাঁহার অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞান, প্রতিভা ও যুক্তির প্রবল মুখে যখন তৃণের ন্যায় ভাসিয়া যাইতে উদ্যত, তখন সহসা বিস্ময়-বিস্ফারিতনেত্রে তাঁহারা অভিনব সৌন্দর্য্যজড়িত ভক্তিময় এই দেবরূপ দেখিয়া পরাজয় স্বীকার করিয়া

ঈশ্বরত্ব আরোপে বিরক্তি ও বিনয়।

কৃতার্থ হইতেন, লজ্জা বোধ করিতেন না। চৈতন্যদেব ২৪ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ১৮ বৎসর নীলাচলে (উড়িষ্যায়) বাস করেন, ৬ বৎসর দাক্ষিণাত্য, বৃন্দাবন, গৌড় প্রভৃতি স্থানে গমনাগমনে ব্যয় করেন। ৪৮ বৎসর বয়ঃক্রমে (১৫৩৩ খৃঃ) আষাঢ়ের শুক্ল পক্ষীয় সপ্তমী তিথিতে, রবিবার দিনে তাঁহার অপূর্ব্ব লীলার অবসান হয়।

লীলাবসান।

অদ্য ৪০০ বৎসর পরে পাশ্চাত্য শিক্ষার অভিমান ও স্পর্দ্ধা সহকারে অগ্রসর নবযুবক সমাজে যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করিতে নিজেকে অসমর্থ ও হীনবল মনে করিতেছেন, সেই সময়ের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ-তনয় সমাজের মস্তকে ও চরণে—ব্রাহ্মণে ও চণ্ডালে সেই সমবেদনাসূচক প্রীতি জাগাইয়া দিয়াছিলেন। প্রেমের অভয় পতাকা উড্ডীন করিয়া "চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ" বলিয়া বেড়াইয়াছিলেন। ইতরজাতির উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিলে সামাজিক খর্ব্বতা হউক কিন্তু হরিভক্তির হানি হয় না,—এ কথা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন। সপ্তগ্রামবাসী সম্ভ্রান্ত কায়স্থ কালিদাস হাড়ির উচ্ছিষ্ট খাইয়াছিলেন—মহাপ্রভু তাহাতে প্রীত হইয়াছিলেন। চৈতন্য ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—জাতিভেদের অসারতা দেখাইবার জন্য তিনি হীন শূদ্র রামরায়কে দিয়া শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। তদীয় অনুচর ভক্তকবিগণ নিজেদের ব্রাহ্মণ্য অভিমান লুপ্ত করিয়া শুধু 'দাস বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া গিয়াছেন এবং ঈশান নামক ব্রাহ্মণ নিজের উপবীত ছিঁড়িয়া ফেলিয়া তাঁহাদের সেবার অধিকারী হইয়াছিলেন। "আমার ও আমার সেবকদের কোন জাতি নাই" এই কথা তিনি অটল নির্ভীকতার সহিত প্রচার করিয়াছিলেন। একথা চৈতন্য ভাগবতে দৃঢ়ভাবে উল্লিখিত আছে। তাঁহার শত শত ভক্ত অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। বঙ্গদেশের প্রধান পণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌম, কাশীর বিদ্বান মণ্ডলীর অগ্রণী প্রবোধানন্দ সরস্বতী, দাক্ষিণাত্যের পণ্ডিত-কুলভূষণ ঈশ্বর ভারতী প্রভৃতি মহারথীদিগকে পরাজয় করিয়া তিনি তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য-প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার ভাববিহ্বলতা ও ভগবৎপ্রেম নারী জনোচিত উচ্ছ্বাস অথবা অজ্ঞের মত্ততা বলিয়া কেহ উড়াইয়া দিতে পারেন নাই। ষোড়শ শতাব্দী ছিল ভারতের শাস্ত্র চর্চ্চার যুগ—এই যুগে প্রতিষ্ঠা পাইতে হইলে শাস্ত্রজ্ঞান অতি প্রয়োজনীয় ছিল। কিন্তু তিনি দেখিয়াছিলেন, "ফলস্যকারণং পুষ্পং ফলাৎ পুষ্পং বিনশ্যতি। জ্ঞানস্য কারণং শাস্ত্রং জ্ঞানাৎ শাস্ত্রং প্রণশ্যতি।" শাস্ত্র ভগবৎভক্তির সহায়, এজন্য শাস্ত্রের দরকার। ভগবৎভক্তি জন্মিলে শাস্ত্রের কোন দরকার থাকে না, ফলের জন্যই পুষ্পের দরকার, ফল হইলে পুষ্প আপনা আপনি ঝরিয়া পড়ে। "মুচি যদি ভক্তিসহ ডাকে কৃষ্ণধনে। কোটী নমস্কার করি তাহার চরণে।"—(গোবিন্দের কড়চা) ইঁহাও চৈতন্য প্রভুর উক্তি। দেবরূপী মনুষ্য মনুষ্যজাতির সম্মান বুঝিয়াছিলেন এবং শ্রেণীবিশেষে সমস্ত মনুষ্যজাতির প্রাপ্য

সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃত্ব।

মর্য্যাদা সীমাবদ্ধ নহে, একথা বিনয়সহকারে কিন্তু অটল বীরত্বের সহিত প্রচার করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু বহু ভাষাবিৎ ছিলেন; তিনি উড়িষ্যার দেশে দীর্ঘকাল বাস করিয়া উড়িয়া ভাষা বিশেষরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন। "জগন্নাথ পরিমুণ্ডাছ" প্রভৃতি পদগানে তাহার প্রমাণ পাইতেছি। তিনি তামিল ভাষায় বক্তৃতা করিতে পারিতেন "কভু বা তামিল বুলি বলে গোরা রায়" যখন তিনি তেলিগু এবং মালয়ালম-ভাষী লোকদিগের দেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন তিনি সেই সেই দেশের ভাষায় কথা বলিতে পারিতেন। "একজন লোক আসি কাইমাই করি। কি বলিল আমি তাহা বুঝিতে না পারি। তার বাক্য বুলি সব প্রভু সমুঝিয়া। কাই মাই করি তারে দিলেন বুঝাইয়া॥" (কড়চা)। এই সকল ভাষা তিনি কোন অপ্রাকৃত শক্তি দ্বারা অর্জ্জন করেন নাই। গোবিন্দদাস ইহার একটা সরল ব্যাখ্যা দিয়াছেন। "এই দেশে (দাক্ষিণাত্যে) ভ্রমি দীর্ঘকাল। সকলের ভাষা বুঝে শচীর দুলাল।"—গৌরপদ তরঙ্গিনীর একটি পদে পাওয়া যায়, মহাপ্রভু বাল্যকালে সংস্কৃতের সঙ্গে পালি এবং প্রাকৃত পিঙ্গল পড়িয়াছিলেন।

জীবনী লেখার সূত্রপাত ও বিকাশ।

রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পৌরাণিক ব্যক্তিগণ ব্যতীত আধুনিক কালের মনুষ্যগণেরও জীবনচরিত লিপিবদ্ধ হইতে পারে, ইহা সে সময় হিন্দুসমাজের বিশ্বাসের কথা ছিল না। পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় লোকবৃন্দ ব্রাহ্মণ-মুখ-নিঃসৃত শ্লোক বলা অভ্যাস করিয়াছিল, কিন্তু নিজের নৈসর্গিক বুলি ভুলিয়া গিয়াছিল। চৈতন্যদেবের প্রভাবে শ্লোকপরম্পরানিয়ন্ত্রিত যন্ত্রবৎ মনুষ্য-জীবনে এক অভিনব প্রাণশক্তির সঞ্চার হয়; পুরুষোচিত সরলতা ও উদ্যম সহকারে মনুষ্যচরিত্র পুনরায় গঠিত হয়, তাই জীবন-চরিত-সাহিত্য এই সময়ে বঙ্গভাষার এক নূতন অধ্যায় উন্মুক্ত করিয়া দেয়। নরহরির ন্যায় কত ব্রাহ্মণ অসংখ্য প্রণিপাত সহকারে নরোত্তমের ন্যায় কায়স্থের জীবন-আখ্যান বর্ণন করিয়া ধন্য হইয়াছেন; ইহা বঙ্গ-সমাজের নব সামগ্রী। সাহিত্য মুকুরে প্রতিবিম্বিত তাৎকালিক সমাজে চৈতন্যদেবের চরিত্রের এক অদ্বিতীয় সৌন্দর্য্যের রশ্মিপাত দৃষ্ট হয়। সাহিত্য এবং সমাজের উন্নতির কথা ছাড়িয়া দিলেও দেখা যাইবে, তিনি ধর্ম্মজগতে চিরকালের জন্য এক অপূর্ব্ব দ্রব্য রাখিয়া গিয়াছেন,—যাহার অফুরন্ত সুধা যুগ-যুগান্তরের জন্য হিন্দুর উপভোগার্থ সঞ্চিত থাকিবে, উহা তাঁহার চিরস্মারক নাম-মাহাত্ম্য প্রচার, কলিযুগের নব গায়ত্রী—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।

উৎকলকবি সদানন্দ চৈতন্যপ্রভুকে "হরিনামমূর্ত্তি" আখ্যা প্রদান করিয়াছেন,—কেমন সংক্ষিপ্ত অথচ সুন্দর নাম! প্রকৃতই তিনি হরিনামের মূর্ত্তিমান বিগ্রহ ছিলেন।

পদাবলী সাহিত্য।

আমরা পুনর্ব্বার পদাবলী সাহিত্য সম্বন্ধে প্রবন্ধের অবতারণা করিতেছি। বলা নিষ্প্রয়োজন, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস ব্যতীত সকল পদকর্ত্তাই চৈতন্যপ্রভুর সমকালিক অথবা পরবর্ত্তী। আমরা পদকল্পতরু, রসমঞ্জরী, গীতচিন্তামণি, পদকল্পলতিকা প্রভৃতি সংগ্রহপুস্তক অবলম্বন করিয়া পদকর্ত্তাদিগের একটী বর্ণানুক্রমিক তালিকা নিম্নে প্রদান করিতেছি,—

নাম।	পদসংখ্যা।
১। অনন্ত দাস	৪৭
২। আচার্য্য	২
৩। আকবর এবং আক্‌বর সাহ আলি	২
৪। আত্মারাম দাস	৯
৫। আনন্দ দাস	৩
৬। উদ্ধব দাস	১১০
৭। কবির	১
৮। কবিরঞ্জন	৯
৯। কমরালী	১
১০। কানাই দাস	৪
১১। কানু দাস	১৪
১২। কামদেব	১
১৩। কালীকিশোর	১৭৯
১৪। কৃষ্ণকান্ত দাস	২৯
১৫। কৃষ্ণদাস	২২
১৬। কৃষ্ণপ্রমোদ	২
১৭। কৃষ্ণপ্রসাদ	৫
১৮। গতিগোবিন্দ	১
১৯। গদাধর	৩
২০। গিরিধর	১
২১। গুপ্ত দাস	১
২২। গোকুলানন্দ	১
২৩। গোকুল দাস	১
২৪। গোপাল দাস	৬

নাম।				পদসংখ্যা।
২৫। গোপাল ভট্ট	...	...	...	২
২৬। গোপীকান্ত	...	...	...	১
২৭। গোপীরমণ	...	...	...	১
২৮। গোবর্দ্ধন দাস	...	...	...	১৭
২৯। গোবিন্দ দাস	...	...	...	৪৫৮
৩০। গোবিন্দ ঘোষ	...	...	...	১২
৩১। গৌরমোহন	...	...	...	২
৩২। গৌরদাস	...	...	...	২
৩৩। গৌরসুন্দর দাস	...	...	...	৩
৩৪। গৌরীদাস	...	...	...	২
৩৫। ঘনরামদাস	...	...	...	১৪
৩৬। ঘনশ্যাম দাস	...	...	...	৩১
৩৭। চণ্ডীদাস	...	...	...	প্রায় ১০০
৩৮। চন্দ্রশেখর	...	...	...	৩
৩৯। চম্পতি ঠাকুর	...	...	...	১৩
৪০। চূড়ামণি দাস	...	...	...	৯
৪১। চৈতন্য দাস	...	...	...	১৫
৪২। জগদানন্দ দাস	...	...	...	৫
৪৩। জগন্নাথ দাস	...	...	...	৯
৪৪। জগমোহন দাস	...	...	...	২
৪৫। জয়কৃষ্ণ দাস	...	...	...	১
৪৬। জ্ঞানদাস	...	...	...	১২৪
৪৭। জ্ঞানহরি দাস	...	...	...	২
৪৮। তুলসীদাস	...	...	...	১
৪৯। ধরণীদাস	...	...	...	১
৫০। দলপতি	...	...	...	১
৫১। দীন ঘোষ	...	...	...	১
৫২। দীনহীন দাস	...	...	...	৩
৫৩। দুঃখিনী	...	...	...	২
৫৪। দুঃখীকৃষ্ণ দাস	...	...	...	৪
৫৫। দৈবকীনন্দন দাস	...	...	...	৪

নাম।	পদসংখ্যা।
৫৬। নটবর	১
৫৭। নন্দন দাস	১
৫৮। নন্দ (দ্বিজ)	১
৫৯। নরসিংহ দাস	১
৬০। নরহরি দাস	১
৬১। নরোত্তম দাস	৬১
৬২। নবকান্ত দাস	১
৬৩। নবচন্দ্র দাস	২
৬৪। নরনারায়ণ ভূপতি	১
৬৫। নয়নানন্দ দাস	২২
৬৬। নসির মামুদ	১
৬৭। নৃপতিসিংহ	১
৬৮। নৃসিংহ দেব	৪
৬৯। পরমানন্দ দাস	১২
৭০। পরমেশ্বর দাস	১
৭১। পীতাম্বর দাস	২
৭২। পুরুষোত্তম	৯
৭৩। প্রতাপনারায়ণ	১
৭৪। প্রমোদ দাস	৫
৭৫। প্রসাদ দাস	১
৭৬। প্রেমদাস	৩১
৭৭। প্রেমানন্দ দাস	৫
৭৮। ফকির হবিব	১
৭৯। ফত্তন	১
৮০। বলদেব *	১
৮১। বলরাম দাস *	১৩১
৮২। বলাই দাস *	৩
৮৩। বসন্ত দাস	২৬
৮৪। বংশীবদন	৩৮

* চিহ্নিত নামগুলি 'ব', অবশিষ্ট অন্তঃস্থ 'ব' এর অন্তর্গত।

নাম।	পদসংখ্যা।
৮৫। বসন্তরায়	৩৩
৮৬। বাসুদেব ঘোষ	১৩৪
৮৭। বিজয়ানন্দ দাস	১
৮৮। বিদ্যাপতি †	৮০০
৮৯। বিন্দুদাস	৪
৯০। বিপ্রদাস	৬
৯১। বিপ্রদাস ঘোষ	১৩১
৯২। বিশ্বম্ভর দাস	২
৯৩। বীরচন্দ্র কর	১
৯৪। বীরনারায়ণ	২
৯৫। বীরবল্লভ দাস	১
৯৬। বীর হাম্বীর	২
৯৭। বৃন্দাবনদাস	৩০
৯৮। বৈষ্ণবদাস	২৭
৯৯। ব্রজানন্দ	১
১০০। ভূপতিনাথ	৭
১০১। ভুবন দাস	২
১০২। মথুর দাস	১
১০৩। মধুসূদন	৫
১০৪। মহেশ বসু	১
১০৫। মনোহর দাস	৬
১০৬। মাধব ঘোষ	৯
১০৭। মাধব দাস	৩৫
১০৮। মাধবাচার্য্য	৫
১০৯। মাধবী দাস	১৭
১১০। মাধো	৩
১১১। মুরারি গুপ্ত	৫

† শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় বিদ্যাপতির পদের যে বিপুল সংগ্রহ করিতেছেন, তাহাতে মিথিলা ও বাঙ্গালা উভয় স্থান হইতে প্রায় ৮০০ পদ সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু ঐ সংগ্রহে রায়শেখর, কবিবল্লভ প্রভৃতি বহু কবির পদ তিনি বিদ্যাপতির নামে চালাইয়াছেন।

নাম।	পদসংখ্যা।
১১২। মুরারি দাস	১
১১৩। মোহন দাস	২৭
১১৪। মোহিনী দাস	৪
১১৫। যদুনন্দন	৯৪
১১৬। যদুনাথ দাস	১৭
১১৭। যদুপতি	১
১১৮। যশোরাজখান	১
১১৯। যাদবেন্দ্র	৩
১২০। রঘুনাথ	৩
১২১। রসময় দাস	২
১২২। রসময়ী দাসী	১
১২৩। রসিক দাস	৩
১২৪। রামকান্ত	১
১২৫। রামচন্দ্র দাস	৪
১২৬। রামদাস	২
১২৭। রাম রায়	১
১২৮। রামী	৪
১২৯। রাধাসিংহ ভূপতি	৪
১৩০। রাধাবল্লভ	২৯
১৩১। রাধামাধব	১
১৩২। রাধামোহন	১৭৫
১৩৩। রামানন্দ	১৫
১৩৪। রামানন্দ দাস	১
১৩৫। রামানন্দ বসু	৯
১৩৬। রূপনারায়ণ	৩
১৩৭। লক্ষ্মীকান্ত দাস	১
১৩৮। লোচন দাস	৩০
১৩৯। শঙ্কর দাস	৪
১৪০। শচীনন্দন দাস	৩
১৪১। শশিশেখর	৩
১৪২। শ্যামচাঁদ দাস	১

নাম।		পদসংখ্যা
১৫৫।	সিংহভূতি	৭
১৫৬।	সুন্দর পাল	২
১৫৭।	সুবল	১
১৫৮।	সেখ জালাল	১
১৫৯।	সেখ ভিক	১
১৬০।	সেখলাল	১
১৬১।	সৈয়দমর্ত্তুজা	১
১৬২।	হরিদাস	৭
১৬৩।	হরিবল্লভ	৪
১৬৪।	হরেকৃষ্ণ দাস	২
১৬৫।	হরেরাম দাস	১
১৪৩।	শ্যামদাস	৩
১৪৪।	শ্যামানন্দ	৭
১৪৫।	শিবরায়	১
১৪৬।	শিবরাম দাস	২৫
১৪৭।	শিবাই দাস	৭
১৪৮।	শিবানন্দ	৪
১৪৯।	শিবাসহচরী	১
১৫০।	শ্রীনিবাস	৩
১৫১।	শ্রীনিবাসাচার্য্য	২
১৫২।	শেখর রায়	১৭৬
১৫৩।	সদানন্দ	১
১৫৪।	সালবেগ *	১

এস্থলে আমরা প্রসিদ্ধ কয়েকজন পদকর্ত্তা সম্বন্ধে কিছু কিছু বিবরণ দিতেছি। প্রথমতঃ চণ্ডীদাস সম্বন্ধে নূতন কিছু তথ্য পাওয়া গিয়াছে, তাহার উল্লেখ করিব।

কীর্ণাহারে কিঙ্কিন নামে এক হিন্দু রাজা ছিলেন। তথায় কাছারা-ডাঙ্গা নামে একটি স্থান

* ইহার পরে আমার ছাত্র শ্রীমান যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ আরও প্রায় ১৪ জন নূতন পদকর্ত্তার পদ আবিষ্কার করিয়াছেন। পল্লীতে পল্লীতে আরও বহু মহাজনের পদ অপ্রকাশিতভাবে আছে। এই তালিকা আর দীর্ঘ করিবার প্রয়োজন নাই।

আছে, এখানে রাজার দরবার গৃহ ছিল। যেখানে রাজার শস্ত্রশালা ছিল তাহার নাম এখন জাজডিহি। জ্ঞান-চন্দ্রিকা নামে একটী স্থান আছে, এখানে রাজার সভাপণ্ডিত বাস করিতেন। প্রবাদ চণ্ডীদাস এই রাজার সভাপণ্ডিত বা সভাকবি ছিলেন। রাজার স্ত্রীর নাম ছিল দুর্গাবতী। কিলগির খাঁ নামক এক পাঠান এই রাজাকে হত্যা করেন। রাণী দুর্গাবতী অত্যাচারের আশঙ্কায় অদূরবর্ত্তী মহেশপুর ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী স্থানে গিয়া বাস করেন। এই স্থানের নাম এখন রাণীপাড়া, ইহার নিকটে এখন শ্যালদহরা নামে এক শ্মশান আছে। কীর্ণাহারে যেখানে কিলগির খাঁর রাজপ্রাসাদ ছিল, সেই স্থান এখন পাঠান-ডাঙ্গা নামে খ্যাত। কাহারও কাহারও মতে চণ্ডীদাসের গান শুনিয়া ইহার বেগম চণ্ডীদাসের প্রতি অনুরক্ত হইলে ইনি চণ্ডীদাসকে হত্যা করেন। কিলগির খাঁর সিপাহীরা আক্রমণ করিতে আসিলে অকস্মাৎ নাটমন্দির পতনে চণ্ডীদাসের মৃত্যু হয়। ক্রুদ্ধ সিপাহিগণ কীর্ণাহার হইতে নান্নুরে আসিয়া বাসুলীর মন্দির ও চণ্ডীদাসের কুটীর ধ্বংস করেন। কিন্তু যখন রামীর পদে স্পষ্টই উল্লিখিত আছে যে গৌড়েশ্বর গান শুনিবার জন্য তাঁহাকে আহ্বান করিয়া লইয়া যান, তখন আমরা এই জনশ্রুতি গ্রাহ্য করিতে প্রস্তুত নহি।

চণ্ডীদাস সম্বন্ধে আরও নূতন কথা।

নান্নুরের পাশ দিয়া পূর্ব্বে অজয় নদ অথবা তাহার একটী শাখা প্রবাহিত হইত। প্রাচীনগণ এখনো তাহার চিহ্ন দেখাইয়া থাকেন। সেকালে ঐ অজয় অথবা তাহার শাখা নদীর তীরবর্ত্তী একটী স্থান বাণিজ্যের জন্য খুব খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। এখনও সেই সমৃদ্ধ পল্লীর 'বন্দর' নাম এই অতীত কাহিনীর স্মৃতি বহন করিতেছে।

নান্নুরে নলরাজার বাড়ী ছিল এইরূপ প্রবাদ আছে। রাজবাটীর ধ্বংসস্তূপের নিকটে নলগড়্যে, টিগড়্যে, তেলগড়্যে নামে তলদেশ পর্য্যন্ত বাঁধানো তিনটী পুকুর আছে। এই স্তূপের উপরে বর্ষার জলে মাটী ধুইয়া গেলে অনেকেই স্বর্ণ মুদ্রাদি পাইয়াছে। এইরূপে একটী স্বর্ণ মুদ্রা মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য পাইয়াছিলেন, ইনি বিশালাক্ষী দেবীর সেবাইৎ ছিলেন। এই মুদ্রায় নরবালাদিত্যের নাম খোদিত আছে। নরসিংহ গুপ্ত বালাদিত্য খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর লোক। গ্রামের পশ্চিমে এক প্রকাণ্ড দীঘি আছে, তাহার নাম সাতরায়ের দীঘি। নলবংশীয় রাজা সাতরায়কে পরাস্ত ও নিহত করিয়া কিম্বিমের পূর্ব্বপুরুষ কীর্ণাহার অঞ্চল দখল করেন। কেহ কেহ বলেন রাজার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া সাত রাণী ঐ দীঘির জলে ডুবিয়া মরিয়াছিলেন।

আমাদের প্রদত্ত কবি তালিকা সম্পূর্ণ নহে। কাষ্ঠ-মলাটে আবদ্ধ আরও বিস্তর কবিতা অজ্ঞাত অবস্থায় আছে, তাহাদের একটা সদ্গতি হইলে অনেক লুপ্ত কবির পদ পাওয়া যাইবে, এরূপ আশা করা যায়। ইহা ছাড়া প্রদত্ত তালিকায় এক কবির নামে স্থানে স্থানে ২, ৩ কি

ততোধিক কবির পদ পরিচিত হইয়াছে,—নিম্নলিখিত "গোবিন্দগণ" বিখ্যাত পদ কর্ত্তা গোবিন্দ দাসের নামের আড়ালে পড়িয়া যাইতে পারেন *; দাসশব্দের সাধারণতন্ত্র স্বাতন্ত্র্যসূচক উপাধিগুলি লুপ্ত হওয়াতে পদদ্বারা তাঁহাদের পরিচয়ের পথ রুদ্ধ হইয়াছে,—

বিভিন্ন গোবিন্দ দাস।

(১) গোবিন্দানন্দ চক্রবর্ত্তী—ইনি চৈতন্যের অনুচর ও নবদ্বীপবাসী। (২) শ্রীনিবাস আচার্য্যের পুত্র মালিহাটী-নিবাসী গোবিন্দ আচার্য্য। ইনি "গতিগোবিন্দ" নামে পরিচিত; ("জয় জয় শ্রীগতিগোবিন্দ রসময়। জয় তছু ভকত সমাজ॥" পদকল্পতরু। (৩) গিরীশ্বরদত্তের পুত্র গোবিন্দদত্ত। (৪) কুলীনগ্রামবাসী গোবিন্দ ঘোষ; ইনি মধ্যে মধ্যে 'দাস' উপাধি গ্রহণ না করিয়া 'ঘোষ' সংজ্ঞা দ্বারাও ভণিতা দিয়াছেন; ("গোবিন্দ, মাধব, বাসুদেব তিন ভাই যা সবার কীর্ত্তনে নাচে চৈতন্য গোসাঞি॥"—(চৈ. চ.)। (৫) কাশীশ্বর ব্রহ্মচারীর শিষ্য উৎকলবাসী গোবিন্দ। (৬) প্রসিদ্ধ কড়চা-লেখক গোবিন্দ কর্ম্মকার। (৭) গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী, নিবাস বোরাকুলি—মুরশিদাবাদ, শ্রীনিবাস শিষ্য। ইহা ছাড়া মৈথিল কবি গোবিন্দদাসের কথাও আমরা শুনিয়াছি। †

বলরামদাস ৪.৫টী স্বতন্ত্র ব্যক্তির নাম বলিয়া বোধ হয়। (১) মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য হইতে আগমনের সময় পুরীতে এক বলরামদাসকে শিঙ্গা বাজাইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে দেখা যায়। (রামশিঙ্গা বাজাইতে বড়ই পণ্ডিত। বলরাম দাস আসে হয়ে পুলকিত॥ গোবিন্দের কড়চা)। বৈষ্ণব বন্দনায় তিনজন বলরামের নাম উল্লিখিত আছে। (২) "সংগীতকারক বন্দ্যো বলরামদাস। নিত্যানন্দধর্ম্মে যার সুদৃঢ় বিশ্বাস॥" (৩) "কানাইখুটিয়া বন্দ্যো বিশ্বের প্রচার। জগন্নাথ বলরাম দুই পুত্র যার॥" ‡ বৈষ্ণব বন্দনা। (৪) "বন্দ্যো উড়িয়া বলরামদাস মহাশয়।

বিভিন্ন বলরাম দাস এবং অপরাপর কবি।

* পূর্ব্বকালে প্রায় প্রত্যেক বৈষ্ণবই পদ রচনা করিতেন; সুতরাং ইঁহারা সকলেই পদকর্ত্তা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ না করিলেও পদকর্ত্তা ছিলেন বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে।

† ইহার সৌভাগ্য যে, ইনি বর্ত্তমান দ্বারবঙ্গাধিপের পূর্ব্বপুরুষ। সুপ্রসিদ্ধ বঙ্গীয় গোবিন্দ দাস কবির শ্রেষ্ঠ পদ গুলি মৈথিল কবি গোবিন্দ দাসের উপরে আরোপ করিয়া তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ কবির সিংহাসন দিতে পারিলে বর্ত্তমান রাজবংশের অনুগ্রহ লাভ করার কল্পনা মনে উদিত হওয়া সহজ। যে বঙ্গীয় সুপ্রসিদ্ধ গোবিন্দ দাসের পদের গৌরব 'ভক্তমাল,' 'নরোত্তম চরিত,' 'ভক্তিরত্নাকর,' 'প্রেমবিলাস,' প্রভৃতি বহুবিধ বৈষ্ণব ঐতিহাসিকগ্রন্থে বিবৃত রহিয়াছে এবং যাঁহার নির্ম্মল যশোভাতি সমস্ত বৈষ্ণব পদসংগ্রহ গ্রন্থ সমুদ্ভাসিত করিয়া রাখিয়াছে, সেই মহাকবির যশ ক্ষুণ্ণ করিয়া মৈথিল রাজবংশীয় কবিকে মিথ্যা গৌরবে উজ্জ্বল করিবার চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে এই মেকী চলিবে না। বঙ্গীয় পদ-সংগ্রহ সমূহে এক বিদ্যাপতি ভিন্ন অন্য কোন মৈথিল কবির পদ দেওয়া হয় নাই। মহাপ্রভু স্বয়ং বিদ্যাপতির পদ গান করিতেন, এইজন্য বাঙ্গালী সংগ্রাহক তাঁহার পদগুলিকে বিশেষ গৌরব দিয়া পদকল্পতরুতে স্থান দিয়াছেন। বাহিরের অন্য কোন কবির পদ তিনি গ্রহণ করেন নাই। বৈষ্ণব পদসাহিত্যের বিশেষজ্ঞ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম, এ মহাশয় অশেষ পাণ্ডিত্যের সহিত এই মেকী ধরিয়া দিয়াছেন।

‡ কেহ কেহ বলেন, এই বলরাম মানুষ নহেন। "জগন্নাথ বলরাম" তাহার জীবিকা সংস্থান করিয়াছেন ও তিনি তাহাদিগকে বাৎসল্য ভাবে সেবা করিতেন বলিয়া "দুই পুত্র" কহা হইয়াছে।

জগন্নাথ, বলরাম বস যার হয়॥" (৫) প্রেমবিলাসরচক নিত্যানন্দ দাসও "বলরাম" নামে পরিচিত। (৬) নরোত্তম-বিলাসে 'পূজারি বলরাম' নামধেয় নরোত্তম ঠাকুরের একজন শিষ্য দেখা যায়। (৭) উক্ত পুস্তকে 'বলরাম কবিরাজ' নামক অপর একটী 'বিজ্ঞ ব্যক্তি'র উল্লেখ আছে। (৮) পদকল্পতরু ভূমিকায়—"কবিনৃপবংশজ ভুবনবিদিতযশ জয় ঘনশ্যাম বলরাম" পাওয়া যায়। (৯) অদ্বৈতাচার্য্যের এক পুত্রের নাম বলরাম ছিল। (১০) প্রেমবিলাসে রামচন্দ্র কবিরাজের শিষ্য "কবিপতি বলরাম" নামে আর একজন বলরামকে পাওয়া যায়, এবং উক্ত পুস্তকেই (১১) শ্রীনিবাস শাখায় অপর এক বলরামের নাম আছে। এই বলরাম সম্প্রদায়ের ১১ জনই ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া বোধ হয় না। সম্প্রতি শিশির বাবু স্বীয়কৃত সুন্দর সুন্দর পদে 'বলরাম দাস' ভণিতা দেওয়াতে এই বলরাম সমস্যা কালে আরও জটিল হইবে বলিয়া বোধ হয়।

(১) যদুনন্দন চক্রবর্ত্তী * যদুনন্দন দাস উভয়েই পদকর্ত্তা সুলেখক। চক্রবর্ত্তী অনেক স্থলে 'দাস' সংজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছেন, ইঁহার বাড়ী কাঁটোয়া, ইনি গদাধরের শিষ্য ও চৈতন্য প্রভুর চরিতলেখক। "যদুনন্দনের চেষ্টা পরম আশ্চর্য্য।—দীনপ্রতি চেষ্টা যৈছে না করিলে নয়। বৈষ্ণব মণ্ডলে যার প্রশংসাতিশয়॥ যে রচিল গৌরাঙ্গের অদ্ভুত চরিত। দ্রবে দাক পাষাণাদি শুনি যার গীত॥—ভক্তিরত্নাকর।

(১) শ্রীখণ্ড নিবাসী নরহরি সরকার চৈতন্য প্রভুর পার্ষচর ও বৈষ্ণব সমাজে একজন পরিচিত পদকর্ত্তা। (২) জগন্নাথ চক্রবর্ত্তীর পুত্র নরহরি চক্রবর্ত্তী প্রসিদ্ধ চরিত-লেখক, ইনিও একজন পদকর্ত্তা—ইঁহার দ্বিতীয় নাম ঘনশ্যাম।

এইরূপ অনেক স্থলেই বহুবিধ নাম পাওয়া যায়, অথচ এক নাম দ্বারাই পদকর্ত্তা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। এ বিষয়ে যাঁহারা তত্ত্বানুসন্ধানে নিযুক্ত, তাঁহারা সুবিচার দ্বারা মৃত কবিগণের আত্মার সম্যক্ তৃপ্তি সাধন করিতে পারিবেন কি না, সন্দেহ স্থল। সুতরাং প্রদত্ত কবি-তালিকা বিশুদ্ধ নহে; উহা এখনও পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই; লুপ্ত কবিগণের উদ্ধারকার্য্য শেষ হইতে বিলম্ব আছে।

শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার তালিকায় চণ্ডীদাসের পদ সংখ্যা ১১০ নির্দ্দেশ করিয়াছেন; শ্রীযুক্ত রমণী-মোহন মল্লিক মহাশয়ের সংস্করণে চণ্ডীদাসের ১০৬ পদ প্রদত্ত হইয়াছে। "বীরভূম" সম্পাদক স্বর্গীয় নীলরতন মুখোপাধ্যায়, বি, এ, ও 'বঙ্গীয় সাহিত্য সেবক' সঙ্কলয়িতা শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয়ের চেষ্টায় চণ্ডীদাসের আরও অনেকগুলি নূতন পদ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই নূতন পদগুলি লইয়া চণ্ডীদাসের পদসংখ্যা ৯০০ হইবে। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় চণ্ডীদাসের ২০।২৫টি নূতন পদ পাইয়াছেন, তন্মধ্যে চৈতন্য-চরিতামৃত ধৃত "হা হা প্রাণপ্রিয় সখি কিনা হৈল মোরে। কানু প্রেম বিষে মোর তনু মন জারে" ইত্যাদি পদটি ১১১২ সালের লেখা একটি পাতড়ায় চণ্ডীদাসের ভণিতা যুক্তভাবে পাওয়া গিয়াছে। পাতড়াখানি মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট আমরা দেখিয়াছি।

---

* যদুনন্দন চক্রবর্ত্তী স্ত্রীর নাম ছিল লক্ষ্মী, ইঁহার দুই কন্যা শ্রীমতী নারায়ণী দেবীকে নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র বীরচন্দ্র বিবাহ করেন।

বৈষ্ণবযুগের রচিত-শাখা-সাহিত্য অতি সুবিস্তার। বড় বড় মহাজনগণের জীবন বর্ণনায় প্রাসঙ্গিক নানা কবির কথাই উল্লিখিত হইয়াছে; এই ঐতিহাসিক অরণ্যে প্রবেশ করিয়া প্রকৃততত্ত্ব সংগ্রহ করা অতি কঠিন কার্য্য। শুধু 'দাস' শব্দের বাহুল্য দ্বারা পরিচয়ের পথ দুর্গম হইয়াছে, এমন নহে, কেহ কেহ বিদ্যাপতিকে "বিদ্যাবল্লভ" লিখিয়াছেন।* শ্যামানন্দ পুরী নিজেকে "দুঃখিনী" ও শিবানন্দ আপনাকে "শিবসহচরী" নামে ভণিতা দিয়াছেন।† সুতরাং স্ত্রীলোকের নাম পাইলেই আমরা স্ত্রীলোকশ্রেণীভুক্ত করিয়া পদকর্ত্তারূপে পরিচয় দিতে সাহসী নহি। রসময়ী দাসী, মাধবী দাসী ও রামীর ভণিতাযুক্ত পদগুলি স্ত্রীলোকের পদ বলিয়া আপাততঃ গ্রহণ করা গেল। আমরা তালিকাটিতে ১১ জন মুসলমান কবির নাম ও পদের উল্লেখ করিয়াছি।‡

তালিকার ভ্রম সম্ভাবনা।

স্ত্রীকবি ও মুসলমান কবিগণ।

পদকর্ত্তৃগণের জীবন-চরিত সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যায় নাই; বড় বড় কবিগণের জীবনের অতি যৎকিঞ্চিৎ বিবরণই পাওয়া যায়; কবিগণের সুন্দর পদগুলি আছে, ফুল ঝরিয়া পড়িলে সে যেমন শাখার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখে না, কবিতার সঙ্গে কবির সম্পর্কও সেই ভাবে এদেশে উপেক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। কে দিয়া গেল আমরা তাহার খোঁজ খবর লইতে কখনও উৎসাহী হই নাই। যে জিনিষ পাওয়া গেল তাহাই শুধু দেশ-লক্ষ্মী কুড়াইয়া অঞ্চলে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন।

লুপ্ত জীবনী।

এই যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদকর্ত্তা গোবিন্দ কবিরাজ চৈতন্য-সহচর পরম ভাগবত চিরঞ্জীব সেনের পুত্র ও শ্রীখণ্ডের প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক এবং কবি দামোদরের দৌহিত্র। চিরঞ্জীব সেন শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকারের শিষ্য, তাঁহার বাড়ী কুমারনগর ছিল; কিন্তু তিনি দামোদরের কন্যা সুনন্দাকে বিবাহ করিয়া শ্রীখণ্ডে আসিয়া বাস করেন। উত্তরকালে তাঁহার পুত্রদ্বয় কুমারনগরে পৈত্রিক বাসস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন, কিন্তু উক্ত স্থানের বৈষ্ণবদ্বেষী শাক্তগণ দ্বারা উৎপীড়িত হওয়াতে পদ্মাপারস্থিত তেলিয়া-বুধরী গ্রামে বাড়ী করেন।

গোবিন্দ দাসের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্র কবিরাজ নরোত্তম ঠাকুরের সুহৃদ্ ও স্বয়ং প্রসিদ্ধ সংস্কৃত-কবি ছিলেন। রামচন্দ্রের বাঙ্গালা পদ পদকল্পলতিকায় আছে, কিন্তু তিনি বাঙ্গালা ভাষায় প্রসিদ্ধি-লাভের উপযোগী কোন গ্রন্থ লিখিয়াছেন বলিয়া আমরা প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাই নাই। তাঁহার 'স্মরণ-দর্পণ' বিশেষ উল্লেখযোগ্য পুস্তক নহে; শুনিয়াছি 'বঙ্গজয়' নামক মহাপ্রভুর পূর্ব্ববঙ্গভ্রমণ সম্বন্ধে

---

* গীতিচিন্তামণি দেখুন।

† পদকল্পলতিকা দেখুন।

‡ প্রদত্ত তালিকায় ৩, ৭, ৯, ৬৯, ৭৮, ৭৯, ১৫৪, ১৫৮, ১৫৯, ১৬০, ১৬১, সংখ্যায় নাম দেখুন

তাঁহার একখানি বড় ঐতিহাসিক পদ্যগ্রন্থ আছে, আমরা তাহা পাই নাই। যাহা হউক রামচন্দ্র কবিরাজ তাঁহার সাময়িক বৈষ্ণব-সমাজের ভূষণ ছিলেন, কিন্তু ভাষা কবিতার স্বাভাবিক পথ অবলম্বন করাতে, তৎকনিষ্ঠ গোবিন্দ কবিরাজের খ্যাতি অতীত ও বর্ত্তমান ব্যাপক হইয়া রহিয়াছে। তিনি স্বীয় কবিতার সরস মাধুরী বিতরণ করিয়া বঙ্গীয় যুবকগণের চিরসুহৃদ্‌রূপে বিরাজ করিতেছেন, কিন্তু তদপেক্ষা পণ্ডিত রামচন্দ্র কবিরাজ বাঙ্গালা লেখার চেষ্টা না করাতে, তাঁহার স্মৃতি এখন প্রাচীন ইতিহাসের অচিহ্নিত পত্রে বিলীনপ্রায়।

প্রেমবিলাস, ভক্তিরত্নাকর নরোত্তমবিলাস, সারাবলী, অনুরাগবল্লী প্রভৃতি বহুবিধ পুস্তকে গোবিন্দ কবিরাজ সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক বিবরণ আছে; দুঃখের বিষয়, ঐ সকল বিবরণে তাঁহার জীবনের কতিপয় স্থূল ঘটনা মাত্র অবগত হওয়া যায়। তাঁহার কবিতা হইতেই তাঁহার হৃদয়ের সুকুমারত্ব, ভাব-প্রবণতা ও অন্তর্জ্জীবনের চিত্র ধারণা করিয়া লইতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত পুস্তকগুলিতে তিনি খেতুরীর মহোৎসবে, তেলিয়া-বুধরীতে ও বৃন্দাবনে কখনও বা পথিক, কখনও বা পাচকের তত্ত্বাবধায়ক আবার কখনও প্রশংসিত কবিরূপে সহসা দর্শন দিয়া নিবিড় জনতার অরণ্যে অদৃশ্য হইয়া যাইতেছেন; ইতিহাস ক্ষুদ্র আলো প্রক্ষেপে তাঁহার অস্পষ্ট মূর্ত্তি দেখাইয়া তৎসম্বন্ধে নির্ব্বাণ পাইতেছে, আমরা তাঁহার ধারাবাহিক চরিত জানি না।

এরূপ কথিত আছে, তিনি ৪০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শাক্ত ছিলেন, তৎপর গ্রহণীরোগে আক্রান্ত হইয়া বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত হইতে আদিষ্ট হন; তদনুসারে অনুমান ১৫৭৭ খৃঃ অব্দে শ্রীনিবাস আচার্য্যের নিকট মন্ত্রগ্রহণ করেন। ইহার পর তিনি আরও ৩৬ বৎসর জীবিত ছিলেন। তিনি এই অবশিষ্ট জীবন, বৈষ্ণবসমাজের প্রীতি ও সম্মান সহকারে অতিবাহিত করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। উভয় ভ্রাতাই 'কবিরাজ' উপাধিলাভ করিয়াছিলেন, গোবিন্দদাসের পদসমূহ কাঁচাগড়িয়ানিবাসী চৈতন্য-সহচর দ্বিজ হরিদাসের পুত্র সুগায়ক ও পদকর্ত্তা গোকুলদাস এবং শ্রীদাস দ্বারা বৈষ্ণবমণ্ডলীতে সর্ব্বদা গীত হইত এবং গীতগুলিতে মুগ্ধ হইয়া বীরচন্দ্রপ্রভু ও জীব গোস্বামী প্রভৃতি বৈষ্ণবসমাজের আচার্য্য-গণ কবিকে ক্রোড় দিতেন। শেষ বয়সে কবিকে বুধরীগ্রামে স্বীয় পদসংগ্রহকার্য্যে ব্যস্ত দেখা যায়,

"নির্জ্জনে বসিয়া নিজ পদরত্নগণে। করেন একত্র অতি উল্লসিত মনে॥"—(ভক্তিরত্নাকর ১৪ তরঙ্গ)।

১৫৩৭ খৃঃ * অব্দে শ্রীখণ্ডে গোবিন্দদাসের জন্ম ও ১৬১২ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্রের নাম দিব্যসিংহ। ভাষায় রচিত পদ ছাড়া তিনি সংস্কৃতে "সঙ্গীতমাধব" নামক নাটক ও 'কর্ণামৃত' নামক কাব্য রচনা করেন। ভক্তিরত্নাকরে "সঙ্গীতমাধবে"র অনেক শ্লোক উদ্ধৃত দেখা

* শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরীর মতে ১৫২৫ খৃঃ (সাহিত্য ১২৯৯, আশ্বিন)।

শ্রীযুক্ত মুরারিলাল অধিকারী মহাশয়ের মতে গোবিন্দ দাসের জন্ম ১৫২৭ খৃঃ এবং মৃত্যু ১৬১২ খৃঃ অব্দ।

যায়। এস্থলে আর একটী কথা বলা উচিত, বিদ্যাপতির কয়েকটি পদে গোবিন্দদাসের ভণিতা দৃষ্ট হয়। * শ্রীনিবাস আচার্য্যের পৌত্র রাধামোহন ঠাকুর পদামৃতসমুদ্রের স্বকৃত টিকার ইহার একটির সম্বন্ধে এই ব্যাখ্যা দিয়াছেন ;—

"বিদ্যাপতিকৃতত্রিচরণগীতং লব্ধা শ্রীগোবিন্দকবিরাজেন চরণৈকং কৃত্বা পূর্ণং কৃতং।"

গোবিন্দদাস যশোরাধিপতি প্রতাপাদিত্যের বিশেষ বন্ধু ছিলেন ; তিনি এই ইতিহাস-বিশ্রুত রাজেশ্বরের নাম তাঁহার কোন কোন ভণিতায় উল্লেখ করিয়াছেন।

বলরাম দাস।

পূর্ব্বে এক পত্রে ১১ বার বলরামদাসের উল্লেখ করিয়াছি। ইঁহারা প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যক্তি নহেন। পদকর্ত্তা বলরাম দাস উক্ত ১১ স্থলের অন্ততঃ ৪টির উদ্দিষ্ট কবি বলিয়া বোধ হয়। প্রেম-বিলাসের লেখক নিত্যানন্দের অপর নাম বলরাম দাস। ইনি শ্রীখণ্ডের কবিরাজ বংশীয়, বৈদ্যজাতীয় কবি। পদকল্পতরুর কবি বন্দনায় পদকর্ত্তা বলরাম দাসকে "কবিনৃপবংশজ" (কবিরাজ) বলা হইয়াছে। বলরাম দাস গোবিন্দ দাসের ভাগিনেয় ছিলেন। গোবিন্দ দাস কৃত সংগীতমাধবে তদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্র "কবিনৃপতি" নামে উল্লিখিত হইয়াছেন। সুতরাং "কবিনৃপজ বংশজ জয় ঘনশ্যাম, বলরাম।" পদকল্পতরুধৃত এই পদের উদ্দিষ্ট কবি বিখ্যাত বলরাম দাস। "বলরাম কবিরাজ" নরোত্তমবিলাস প্রভৃতি পুস্তকে উল্লিখিত হইয়াছেন, ইনিই বৈষ্ণববন্দনায় "সঙ্গীত কারক" ও "নিত্যানন্দশাখাভুক্ত" বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। প্রেমবিলাস-রচক বলরামদাসও বৈদ্য এবং স্পষ্টতঃই নিত্যানন্দশাখাভুক্ত। সুতরাং পদকর্ত্তা বলরামদাস ও প্রেমবিলাস-রচক অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া বোধ হইতেছে। † বলরাম দাসের পিতার নাম আত্মারাম দাস ও মাতার নাম সৌদামিনী। পদকল্পতরু প্রভৃতি সংগ্রহপুস্তক আত্মারাম দাস কৃত কয়েকটি পদ পাওয়া যায়। প্রেম বিলাস-রচক বলরাম (নিত্যানন্দ নাম ধারী) এবং পদকর্ত্তা বিখ্যাত বলরাম দাস,

* এক কবির পদের সঙ্গে অন্য কবির ভণিতা দেওয়ার পদ্ধতি আরও অনেক স্থলে দেখা যায়, যথা—"শ্রীগোবিন্দদাস কহয় মতিমন্ত। ভুলল যাহে দ্বিজরাজ বসন্ত॥" "রামদাসের পহু সুন্দর রসবর গৌরীদাস নাহি জানে। অখিল লোক যত ইহ রসে উনমত জ্ঞানদাস গুণগানে॥"—(পদকল্পলতিকা)।

† "গৌরভূষণ শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী মহাশয় অনুমান করেন, ইঁহারা দুইজন এক ব্যক্তি নহেন। কারণ বলরামের পদ প্রাঞ্জল প্রেমবিলাসের রচনা কুটিল। নরহরির নরোত্তমবিলাস ও ভক্তিরত্নাকরের ভাষা সাদা সিধা গদ্যের ন্যায়, কিন্তু তৎকৃত পদগুলি কবিত্বময়, বৃন্দাবনদাসের পদ ও ভাগবতের রচনা এক কবির লেখার মত শুনায় না। আমরা এ সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় গৌরভূষণ মহাশয়ের মত গ্রহণ করিতে পারিলাম না।"—এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণের পাদটীকায় আমরা উপরি উক্ত কথাগুলি লিখিয়াছিলাম কিন্তু সম্প্রতি অচ্যুতবাবু আমাদিগকে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য প্রকাশ হইবার পূর্ব্বেই আমার এই মতের পরিবর্ত্তন হয়। তৎপূর্ব্বেই আমি নব্যভারত ১৪শ খণ্ড ৮ম সংখ্যায় (তোমার মতানুযায়ী) পদকর্ত্তা বলরামকেই প্রেমবিলাস-প্রণেতা বলিয়াই জানি।"

একব্যক্তি কিনা—তৎসম্বন্ধে কাহারও কাহারও কিছু সন্দেহ আছে। কিন্তু পদকর্ত্তা বলরাম যে সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ-বংশীয় এবং তিনি যে কবি গোবিন্দদাসের ভাগিনেয় ছিলেন, তৎসম্বন্ধে কোন দ্বিধা নাই। পদকল্পতরুর প্রমাণ আমরা অগ্রাহ্য করিতে পারি না। তাহা ছাড়াও এ সম্বন্ধে বহু প্রমাণ আছে—বৈদ্যহিতৈষিণী পত্রিকায় তাহা বিস্তারিত ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু আধুনিক কোন ব্রাহ্মণবংশ কবি বলরাম দাসকে দাবী করিতেছেন।

জ্ঞানদাস।

জ্ঞানদাস সম্বন্ধে অতি অল্প বিবরণই পাওয়া যায়; বীরভূম জেলার একচক্রাগ্রামে (মল্লারপুর ষ্টেশনের নিকট) নিত্যানন্দ প্রভুর পিতৃগৃহ ছিল; সিউড়ির বিশ ক্রোশ পূর্ব্বে ও বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়ার ১০ মাইল পশ্চিমে কাঁদড়া গ্রাম; তথায় ব্রাহ্মণ বংশে ১৫৩০ খৃঃ অব্দে জ্ঞানদাস জন্মগ্রহণ করেন; ইনি নিত্যানন্দশাখাভুক্ত; খেতুরীর উৎসবে ইনি উপস্থিত ছিলেন দেখা যায়, সুতরাং ইনি গোবিন্দ দাস, বলরাম দাস প্রভৃতির সমকালিক কবি। কাঁদড়া গ্রামে জ্ঞানদাসের একটি মঠ এখনও আছে, পৌষ মাসের পুর্ণিমায় সেখানে প্রতিবৎসর মহোৎসব এবং সেইসঙ্গে তিন দিন ব্যাপিয়া মেলা হয়।

যদুনন্দন দাস ও যদুনন্দন চক্রবর্ত্তী

গদাধরের শিষ্য যদুনন্দন চক্রবর্ত্তীর কথা ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে; ইনি সুকবি ছিলেন। ইঁহার রচিত 'রাধাকৃষ্ণ-লীলা-কদম্ব পুস্তকের শ্লোকসংখ্যা ৬০০০। কিন্তু মালিহাটি বৈদ্যবংশ কবি যদুনন্দন দাস (জন্ম ১৫৩৭ খৃঃ) তাহা অপেক্ষা বেশী যশস্বী। পদকল্পতরুর বন্দনায় ইঁহার সম্বন্ধে লিখিত আছে,—"প্রভুসুতাচরণসরোরুহ মধুকর জয় যদুনন্দন দাস।" প্রভু অর্থে শ্রীনিবাস আচার্য্য। যদুনন্দন, শ্রীনিবাস-কন্যা হেমলতার আদেশে ১৬০৭ খৃঃ অব্দে ঐতিহাসিক 'কর্ণানন্দ' গ্রন্থ রচনা করেন। গোবিন্দ-লীলামৃতের অনেক স্থলেও ইতি "শ্রীল হেমলতার" গুণ বর্ণনা করিয়াছেন; ইনি শ্রীনিবাস আচার্য্যের পৌত্র সুবলচন্দ্রের মন্ত্রশিষ্য, যদুনন্দন 'কর্ণানন্দ' নামক ঐতিহাসিক পদ্যগ্রন্থ, কৃষ্ণদাস কবিরাজের গোবিন্দলীলামৃত' ও রূপগোস্বামীর 'বিদগ্ধমাধব' নাটকের পয়ারানুবাদ সঙ্কলিত করেন। কিন্তু পদকর্ত্তা বলিয়াই ইঁহার যশ স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। পুরুষোত্তমের গুরুদত্ত নাম 'প্রেমদাস'; ইনি

প্রেমদাস।

নবদ্বীপের কুলিয়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন; ইঁহার পিতার নাম গঙ্গাদাস; ইনি গোবিন্দদেবের, মন্দিরের (বৃন্দাবনে) পূজারি ছিলেন। ১৭১২ খৃঃ অব্দে ইনি বংশীশিক্ষা' গ্রন্থ রচনা করেন, তৎপরে কর্ণপুরের 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটকের বঙ্গানুবাদ প্রণয়ন করেন। পদকর্ত্তা গৌরীদাস পণ্ডিত নিত্যানন্দের শ্বশুর প্রসিদ্ধ সূর্য্যদাস সরখেলের *

* ইঁহার দুই কন্যা বসুধা ও জাহ্নবীদেবীকে নিত্যানন্দ প্রভু বিবাহ করেন।

ভ্রাতা; গৌরীদাসের বাড়ী শান্তিপুরের নিকট অম্বিকাগ্রামে; ইনি চৈতন্য-দেবের অনুচর ছিলেন, কথিত আছে চৈতন্যদেবের স্বহস্ত-লিখিত গীতাগ্রন্থখানি ইহার নিকট রক্ষিত ছিল। ইনি নিম্বকাষ্ঠে চৈতন্যবিগ্রহ গঠন করিয়া অম্বিকা গ্রামে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ ভক্ত সদ্গোপকুলভূষণ শ্যামানন্দ, নবদ্বীপভ্রমণকালে ইহাকে উক্ত বিগ্রহপূজায় নিযুক্ত দেখিয়াছিলেন।

গৌরীদাস।

রায় বসন্ত।

রায় বসন্ত নরোত্তমঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য। শেষ বয়সে ইনি বৃন্দাবনবাসী হইয়াছিলেন এবং জীবগোস্বামীর পত্র লইয়া গৌড়ে একবার শ্রীনিবাস আচার্য্যের নিকট আসিয়াছিলেন। ভক্তিরত্নাকরে উল্লিখিত আছে, "হেনই সময় বিজ্ঞ শ্রীবসন্ত রায়। পত্রী লৈয়া আইল তেহোঁ আচার্য্যসভায়।" (১৪ তরঙ্গ)। এই বিজ্ঞ ব্যক্তিকেই বোধ হয় নরহরি পুনর্ব্বার নরোত্তম-বিলাসে বন্দনা করিয়া লিখিয়াছেন, জয় জয় মহাকবি শ্রীবসন্ত রায়। সদা মত্ত রাধা কৃষ্ণ চৈতন্য লীলায়।"—১২ বিলাস। সুতরাং ইঁহাকেই পদকর্ত্তা 'দ্বিজবসন্তরায়' বলিয়া বোধ হয়; যশোহরনিবাসী কায়স্থ "রায়বসন্তের" নাম ইদানীং প্রবন্ধাদিতে পাইয়া থাকি, কিন্তু কোনও প্রাচীন পুস্তকে উক্ত পদকর্ত্তা সম্বন্ধে প্রমাণ আমাদের হস্তগত হয় নাই। একটি প্রাচীন পদে দৃষ্ট হয়, গোবিন্দদাসকবি মহারাজ প্রতাপাদিত্যের গুণ কীর্ত্তন করিতেছেন, কিন্তু রায়বসন্তের পদে প্রতাপাদিত্য কিম্বা যশোহরের কোন উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার (১৪৭৮—১৫৪০ খৃঃ অব্দ) মহাপ্রভুর একজন অনুচর ছিলেন; ইনি নীলাচলে চৈতন্যদেবের অতি অনুরক্ত সঙ্গী ছিলেন; কথিত আছে, নরহরি চির-কৌমারব্রত পালন করেন। নরহরি সরকার প্রসিদ্ধ লোচনদাসের গুরু ও 'চৈতন্যমঙ্গল' রচনার উপদেষ্টা ছিলেন। একটি সংস্কৃত বন্দনায় জানা যায়, নরহরির বর্ণ বিশুদ্ধ গৌর ও তাঁহার পিতার নাম নারায়ণ ছিল। নরহরি গৌরলীলার পদরচনার প্রবর্ত্তক বলিয়া বৈষ্ণব-সমাজে আদৃত। ইঁহার পথ অনুসরণ করিয়া বাসুদেব ঘোষ যশস্বী হইয়াছেন। নরহরি সরকার ১৫৪০ খৃঃ অব্দে গুপ্ত হন।

নরহরি সরকার।

বসু রামানন্দ।

বসু রামানন্দ কুলীনগ্রামের প্রসিদ্ধ মালাধর বসুর পৌত্র। ইনি দ্বারকা নগরী হইতে নীলাচল পর্য্যন্ত মহাপ্রভুর সঙ্গে পর্য্যটন করিয়াছিলেন। কথিত আছে, মহাপ্রভু ইঁহাকে মিত্র সম্বোধন করিতেন। সুপ্রসিদ্ধ রায় রামানন্দ উড়িষ্যার প্রতাপরুদ্রের একজন উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী ছিলেন; ইনি বিখ্যাত 'জগন্নাথ-বল্লভ' নামক নাটক রচনা করেন, চৈতন্যদেব ইঁহার দর্শনেচ্ছায় নিজে বিদ্যানগরে গিয়াছিলেন। ইনি রসিক ভক্তগণের শ্রেষ্ঠ বলিয়া বৈষ্ণবসমাজে প্রসিদ্ধ। ১৫৩৪ খৃঃ অব্দের মাঘমাসে রায় রামানন্দের তিরোধান হয়।

রায় রামানন্দ।

ঘনশ্যাম।

নরহরি চক্রবর্ত্তী পদকর্ত্তা ঘনশ্যাম নামে পরিচিত, কিন্তু "কবিনৃপজ ভুবন-বিদিতযশ জয় ঘনশ্যাম বলরাম। পদকল্পতরুর

এই শ্লোক দ্বারা জানা যায়, ঘনশ্যাম নামে অপর একজন পদকর্ত্তা কবিরাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি গোবিন্দ কবিরাজের পৌত্র ও দিব্যসিংহের পুত্র।

পীতাম্বর দাস যে রসমঞ্জরী সঙ্কলন করেন, তন্মধ্যে তাঁহার কয়েকটি পদ সন্নিবিষ্ট আছে। শ্রীচৈতন্যপ্রভু যে সময় নীলাচলে ছিলেন, তখন চক্রপাণি ও মহানন্দ নামে দুই ভাই তাঁহার নিকট রঘুনন্দনের শিষ্য বলিয়া পরিচয় দেন। চক্রপাণি চৌধুরীর পুত্র রামানন্দ, তৎপুত্র গঙ্গারাম এবং তাঁহার দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ গোবিন্দলীলামৃত অনুবাদকারক মদনরায়চৌধুরী ও দ্বিতীয় ব্যক্তি রসকল্পবল্লী-প্রণেতা রামগোপাল। **রামগোপালের** রসকল্পবল্লী পাওয়া গিয়াছে, উহা ১৭৪৩ খৃঃ অব্দে বিরচিত হয়, এবং ইহার কিছু পরে রামগোপালের পুত্র **পীতাম্বর দাস** "রসমঞ্জরী" সঙ্কলন করেন। রসমঞ্জরীতে বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস প্রভৃতি পদকর্ত্তৃগণের পদই অধিকাংশ। সঙ্কলিত পদাবলী দৃষ্টে বোধ হয়, পীতাম্বরের রসবোধ ও পদ মনোনীত করিবার বিলক্ষণ শক্তি ছিল। তাঁহার স্বকৃত পদগুলিতে বেশ সুন্দর। দুঃখের বিষয়, তিনি তাঁহার পিতা গোপাল দাসের (রামগোপাল দাসের) পদ কিছু বেশী পরিমাণে উদ্ধৃত করিয়াছেন; ইহা পিতৃভক্তির পরিচায়ক, কিন্তু সাহিত্য-সেবীর পক্ষে সঙ্গত কার্য্য নহে। আরও একটি দুঃখের বিষয় এই যে, চণ্ডীদাসের দুইটী পদ (যথা, "ভাল হৈল আরে বঁধু আইলা সকালে" ইত্যাদি ও "চিকুর ফুরিছে, বসন খসিছে" ইত্যাদি) তিনি পিতার ভণিতা দিয়া প্রচারিত করিয়াছেন। *

জগদানন্দ,—জাতিতে বৈদ্য, ইনি মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গভক্ত খণ্ডবাসী মুকুন্দের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতামহের নাম পুরমানন্দ এবং পিতার নাম নিত্যানন্দ। সর্ব্বানন্দ, কৃষ্ণানন্দ ও সচ্চিদানন্দ নামক জগদানন্দের তিন সহোদর ছিলেন। জগদানন্দের পিতা শ্রীখণ্ড ত্যাগ করিয়া আগরডিহি দক্ষিণখণ্ডে বাস করেন এবং জগদানন্দও তাঁহার ভ্রাতৃবর্গের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হইয়া বীরভূমের অন্তর্গত দুবরাজপুর থানার অধীন জোফলাই গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। অপরাপর বৈষ্ণবভক্তের ন্যায় ইঁহার জীবন সম্বন্ধেও অনেক অলৌকিক কাহিনী বর্ণিত আছে। জগদানন্দ-পদাবলীপ্রকাশক ৺কালিদাস নাথ মহাশয় তাহা বিস্তৃতরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

১৭০৪ (১৭৮২ খৃঃ) শকে জগদানন্দ স্বর্গগত হন। এতদুপলক্ষে তাঁহার নিবাসস্থান জোফলাই গ্রামে এখনও বৎসর বৎসর একটি মহোৎসব হইয়া থাকে। বৈষ্ণবদাসের পদকল্পতরুতে জগদানন্দের অল্পসংখ্যক কয়েকটি পদ সন্নিবিষ্ট আছে।

যাঁহারা শুধু ললিতশব্দকেই কবিতার প্রাণ মনে করিয়া অনেকস্থলে অর্থশূন্য কাকলির সৃষ্টি

---

* সাহিত্যপরিষদ্ হইতে প্রকাশিত পুস্তক দেখুন।

করিয়াছেন, জগদানন্দ সেই শ্রেণীর কবি-সম্প্রদায়ের মধ্যে উচ্চ স্থান অধিকার করিবেন, সন্দেহ নাই। হৃদয়ের অন্তঃপুরে যে কবিতার নিভৃত স্থান এ কবিতা সে শ্রেণীর নহে ;—শুধু ললিত শব্দপ্রহেলিকায় শ্রুতিকে অব্যক্ত সুখদান করাই, এ ভাবের কবিতার চরম লক্ষ্য ; কিন্তু যমক অলঙ্কার ও 'ম'-কার, 'ল'-কারের নিবিড় সমাবেশেই যে সর্ব্বদা শ্রুতিসুখকর পদ হইতে পারে, জগদানন্দের পদ পড়িয়া আমরা তাহা বুঝি নাই। বহুতন্ত্রীতে অনভ্যস্ত স্পর্শজনিত উচ্ছৃঙ্খল ধ্বনির ন্যায় জগদানন্দের পদরাশি শ্রুতিকে সুখদান না করিয়া অনেক স্থলে পীড়ন করে। কিন্তু একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, এই কবি স্থানে স্থানে জয়দেবের মত সুন্দর শব্দ গ্রন্থনে সমর্থ হইয়াছেন।

আমরা জগদানন্দের সম্বন্ধে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা বিশেষ প্রয়োজন মনে করি। এই কবি ভাবী কবিগণের সাহায্যার্থ একটি যমক-অলঙ্কারের ধারা রচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন ; তদ্দ্বারা অনুমান হয় যে, জগদানন্দ আকাশের তারা কি বনের ফুল দেখিয়া অতি অনায়াসে কবিত্বমন্ত্রে দীক্ষিত হন নাই। তিনি শ্রমে গলদ্ঘর্ম্ম হইয়া কবিতা রচনা শিক্ষা করিয়াছিলেন, এবং তদ্বিষয়ক একটি প্রণালী লিপিবদ্ধ করিয়া ভাবী কবিগণের জন্য পন্থা নিরূপণের প্রয়াসী হইয়াছিলেন। "জগদানন্দের খসড়া" ললিত শব্দের বিপণি বলিয়া উল্লেখ করা যায়, পাঠক খসড়াখানি পাঠ করিলে জগদানন্দের কবিতার গুহ্যতত্ত্ব অবগত হইবেন। ইহা প্রাচীন রীতি অনুসারে বঙ্গীয় ভাষায় অলঙ্কার-শাস্ত্র সঙ্কলনের প্রথম ও শেষ চেষ্টা। আমরা জগদানন্দের স্বহস্ত লিখিত খসড়া হইতে কিছু প্রতিলিপির ছবি পাঠকগণকে উপহার দিতেছি।

বংশীবদনের পিতা ছকড়ি চট্টোপাধ্যায় পাটুলীনিবাসী ছিলেন, কিন্তু মহাপ্রভুর আদেশে নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন। ১৪০৬ শকে (১৪৯৪ খৃঃ অব্দ) চৈত্র মাসে পূর্ণিমা-দিনে বংশীবদন ভূমিষ্ঠ হন। তিনি বিল্বগ্রামে শ্রীগৌরাঙ্গ মূর্ত্তি ও নবদ্বীপে 'প্রাণবল্লভ' নামে এক বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার দুই পুত্র, চৈতন্য ও নিত্যানন্দ। পদাবলী ব্যতীত বংশীবদন 'দীপান্বিতা' নামক এক খানি ক্ষুদ্র কাব্য প্রণয়ন করেন।

বংশীবদনের পৌত্র (চৈতন্য দাসের পুত্র) **রামচন্দ্র** একজন বিখ্যাত পদকর্ত্তা। ইনি ১৪৫৬ শকে (১৫৩৪ খৃঃ) জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫০৫ শকে (১৫৮৩ খৃঃ) মাঘ মাসের কৃষ্ণতৃতীয়াতিথিতে অপ্রকট হন। রামচন্দ্র জাহ্নবীদেবীর শিষ্য ছিলেন ; ইনি খড়দহের সন্নিকটস্থ রাধানগরে বাস করেন। রাধানগরের নিকট বাঘনাপাড়ায়ও ইঁহার আর এক বাটী ছিল। রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা **শচী-নন্দন দাস** একজন পদকর্ত্তা। তিনি 'গৌরাঙ্গবিজয়' নামক কাব্য প্রণয়ন করেন। বংশীবদনের বংশধর মহামহোপাধ্যায় ভাগবতকুমার শাস্ত্রী এম, এ এখন বঙ্গীয় সুধীসমাজের মুখ উজ্জ্বল করিয়া আছেন।

পরমেশ্বরী দাস—ইনি খেতুরীর মহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন। ইঁহার বাড়ী কাউগ্রাম, ইনি জাতিতে বৈদ্য; ইনি জাহ্নবী ঠাকুরাণীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন; এবং তাঁহার আদেশে 'তড়া আটপুর' যাইয়া শ্রীরাধাগোপীনাথ বিগ্রহ প্রকাশ করেন। সম্প্রতি সেই বিগ্রহের নাম 'শ্যামসুন্দর' হইয়াছে। ইনি কিছু-দিন 'গরলগাঁছা' গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। ইঁহার সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক প্রবাদ প্রচলিত আছে।

বৈষ্ণবাচারদর্পণমতে **যদুনাথ আচার্য্যের** পূর্ব্বনিবাস ছিল শ্রীহট্ট, বুরুঙ্গা গ্রামে; ইনি রত্নগর্ভ আচার্য্যের পুত্র। ইঁহার উপাধি ছিল 'কবিচন্দ্র'। ইনি নিত্যানন্দশাখাভুক্ত। বৃন্দা-বনদাস লিখিয়াছেন:—

"যদুনাথ কবিচন্দ্র প্রেম রসময়। নিরবধি নিত্যানন্দ যাঁহাকে সদয়॥"

প্রসাদ দাস—বিষ্ণুপুরস্থ করুণাময় দাসের (মজুমদার) পুত্র ও শ্রীনিবাসের শিষ্য; ইঁহার উপাধি ছিল 'কবিপতি'।

উদ্ধব দাস—অপর নাম কৃষ্ণকান্ত; ইনি পদকল্পতরু-সঙ্কলয়িতা বৈষ্ণব দাসের বন্ধু ছিলেন; বাড়ী টেঞা (বৈদ্যপুর)।

রাধাবল্লভ দাস—শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য, কাঞ্চনগড়িয়া গ্রামবাসী সুধাকর মণ্ডল ও তৎপত্নী শ্যামাপ্রিয়ার পুত্র। রাধাবল্লভ রঘুনাথ গোস্বামী কৃত 'বিলাপকুসুমাঞ্জলি'র বাঙ্গালা অনুবাদ করেন।

শশীশেখর ও চন্দ্রশেখর—শশীশেখরের সহোদর ভ্রাতা চন্দ্রশেখর। দুই জনই প্রসিদ্ধ কবি। বর্ত্তমান কীর্ত্তন গানগুলি দুই ভ্রাতার পদাবলী দ্বারাই বিশেষরূপে পুষ্ট। ইঁহাদের পিতার নাম গোবিন্দদাস ঠাকুর। ইঁহারা কাঁদড়ার বিখ্যাত 'মঙ্গল' বংশীয় ব্রাহ্মণ কুল অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। মঙ্গল ঠাকুর ছিলেন গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য, জ্ঞানদাসের সমসাময়িক। মুলুকের বিখ্যাত পদকর্ত্তা বিশ্বম্ভর ঠাকুর ছিলেন শশীশেখরের শিষ্য এবং তাঁহারই পদে জানা যায় যে শশীশেখর চন্দ্রশেখরের সহোদর ছিলেন। বিশ্বম্ভর শশীশেখরের বন্দনা লিখিয়া তাঁহার পদাবলীর মুখবন্ধ করিয়াছেন। ইহারা বৈষ্ণব দাসের (পদকল্পতরু সঙ্কলয়িতা) কিছু পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। আজকাল কীর্ত্তনীয়ারা শশীশেখরের পদাবলীই বিশেষ ঘটা করিয়া গাহিয়া থাকেন। সম্ভবতঃ ইঁহাদের একজনই "রায় শেখর" উপাধিতে পদ রচনা করিতেন।

পরমানন্দ সেন—বাড়ী কাঁচড়াপাড়া গ্রাম, জাতিতে বৈদ্য। ইনি মহাপ্রভুর প্রিয় পার্শ্ব-চর শিবানন্দ সেনের পুত্র ১৫২৪ খৃষ্টাব্দে পরমানন্দের জন্ম হয়। মহাপ্রভু ইঁহাকে 'কবি কর্ণপুর' উপাধি দিয়াছিলেন। ইনি ১৪৯৪ শকে (১৫৭২ খৃঃ) সুবিখ্যাত 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটকও তাহার চারি বৎসর পরে 'গৌর গণোদ্দেশদীপিকা' প্রণয়ন করেন; ইহা ছাড়া 'আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ,' 'কেশবাষ্টক' 'চৈতন্যচরিত কাব্য' প্রভৃতি বহুসংখ্যক সংস্কৃত পুস্তক রচনা করেন।

বাসুদেব, মাধব ও গোবিন্দানন্দ—ইঁহারা তিন সহোদর, পূর্ব্ব নিবাস কুমারহট্ট। কেহ কেহ বলেন শ্রীহট্টের বুড়ন গ্রামে মাতুলালয়ে বাসুঘোষ জন্মগ্রহণ করেন। এই তিন ভ্রাতা শেষে নবদ্বীপে-আসিয়া বাস করেন। গৌরাঙ্গ সম্বন্ধীয় পদাবলী-রচকগণের মধ্যে বাসুঘোষ শীর্ষস্থানীয়। তিন ভ্রাতাই বিখ্যাত 'কীর্ত্তনিয়া' ও মহাপ্রভুর অনুরক্ত অনুচর ছিলেন। সুবিখ্যাত নবদ্বীপবাসী কীর্ত্তন গায়ক গৌরদাসের মতে ইহারা সদ্গোপ জাতীয় ছিলেন।

ধনঞ্জয় দাস—বর্দ্ধমান ছাঁচড়া-পাঁচড়া গ্রামে বাড়ী। চৈতন্য ভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃতে ইনি পণ্ডিত ও নিত্যানন্দপ্রিয় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

গোকুল দাস—৪ জন। (১) জাজী গ্রামবাসী প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনিয়া। (২) কাঞ্চনগড়িয়া বাসী শ্রীদাসঠাকুরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গোকুল দাস, শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য। (৩) বীরহাম্বীরের সমসাময়িক, বনবিষ্ণুপুরবাসী গোকুলদাস মহান্ত। (৪) 'কবীন্দ্র' উপাধিধারী পঞ্চকোট সেরগড়বাসী গোকুল। (ভঃ রঃ)।

রায়শেখর—বিখ্যাত পদকর্ত্তা। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত পরাণ গ্রামে ইঁহার নিবাস ছিল। কাঁটোয়ার যদুনাথ দাসের "সংগ্রহ-তোষিণী" হইতে জানা যায় 'দুর্গাদাসী' নামে ইহার এক সাধন-পাত্রী ছিল। ইনি প্রায় মহাপ্রভুর সমসাময়িক কবি। ইঁহার রচিত "দণ্ডাত্মিকা পদাবলী" 'বৈষ্ণব' সমাজের একখানি বিশেষ আদরের পুস্তক।

আনন্দ দাস—জগদীশপণ্ডিতের শাখায় এক আনন্দদাসের নাম পাওয়া যায়, ইনি "জগদীশচরিত্রবিজয়" গ্রন্থ প্রণেতা।

কানুরাম—ইনি শ্যামানন্দের শাখাশিষ্য; ইঁহার গুরু দামোদর পণ্ডিত।

কৃষ্ণদাস—পদকর্ত্তাদিগের মধ্যে কৃষ্ণদাসের সংখ্যা অনেক। প্রসিদ্ধ কৃষ্ণদাস কবিরাজের পরিচয় পরে প্রদান করিব। অম্বিকা নিবাসী গৌরীদাসের ভ্রাতা কৃষ্ণদাসও একজন পদকর্ত্তা ছিলেন।

কৃষ্ণপ্রসাদ—"শ্রীগতিপ্রভুর শিষ্য প্রধান তনয়। শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঠাকুর গম্ভীর হৃদয়।" শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ শ্রীনিবাস আচার্য্যের পৌত্র ছিলেন। **গতিগোবিন্দ**—শ্রীনিবাস আচার্য্যের পুত্র। ইঁহার রচিত "বীররত্নাবলী" নামক একখানি বাঙ্গালা গ্রন্থ আছে। **গোকুলানন্দ সেন**—জাতিতে বৈদ্য, নিবাস টেঞা-বৈদ্যপুর, ইঁহার নামান্তর বৈষ্ণব দাস। ইনিই প্রসিদ্ধ পদকল্পতরু সঙ্কলয়িতা, খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে জীবিত ছিলেন। **গোপাল দাস**—শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য। কর্ণানন্দে উল্লিখিত আছে যে, ইনি একজন উৎকৃষ্ট কীর্ত্তনীয়া ছিলেন। বাড়ী বুঁদইপাড়া। **গোপাল ভট্ট গোস্বামী**—(১৫০০ হইতে ১৫৮৭ খৃঃ) ইনি মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ ছিলেন, বাড়ী কাবেরীতীরস্থ শ্রীরঙ্গক্ষেত্র (দাক্ষিণাত্য), ইনি পরিশেষে বৃন্দাবনবাসী হইয়াছিলেন।

গোপীরমণ চক্রবর্ত্তী—শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য, বাড়ী বুধরী। গোবর্দ্ধন দাস দামোদরের শিষ্য। রসিকমঙ্গল নামক গ্রন্থে ইঁহার কথার উল্লেখ আছে। **চম্পতি রায়**—রাধামোহন ঠাকুর পদামৃতসমুদ্রের টীকায় লিখিয়াছেন "চম্পতিনাম দাক্ষিণাত্য-শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যভক্তসমাজ কশ্চিৎ আসীৎ স এব' গীতকর্ত্তা" **দৈবকীনন্দন**—ইনি শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। বৈষ্ণবনিন্দা প্রভৃতিই ইঁহার কার্য্য ছিল। দৈবকীনন্দন কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত হইয়া মহাপ্রভুর শরণাগত হইলে, পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ 'বৈষ্ণববন্দনা' রচনা করিতে আদিষ্ট হন। ইনিও "বৈষ্ণববন্দনা" গ্রন্থ রচনা করিয়া মহাব্যাধি হইতে মুক্তি লাভ করেন এইরূপ জনশ্রুতি।

নরসিংহ দেব—"নরোত্তমের স্বগণ নরসিংহ মহাশয়। দূরদেশ পক্কপল্লী যার রাজ্য হয়॥" প্রেম-বিলাসে—"কমললসিত চরণ মধু পাওয়ে সেই সুজান, রাজা নরসিংহ রূপনারায়ণ গোবিন্দদাস অনুমান॥" **নয়নানন্দ**—গদাধর পণ্ডিতের ভ্রাতা বাণীনাথের পুত্র, চরিতামৃতে ইঁহার উল্লেখ আছে। **প্রসাদ দাস**—বিষ্ণুপুরবাসী করুণাময় দাসের পুত্র, ইঁহাদের কৌলিক উপাধি মজুমদার। আচার্য্য প্রভুর সমকালিক, উপাধি—কবিপতি। **মাধো**—নীলাচলের লোক, শ্যামানন্দের শিষ্য রসিকানন্দের শিষ্য। (রসিকমঙ্গল গ্রন্থ, ১৪ পৃষ্ঠা)। **রসিকানন্দ**।—নীলাচলের অচ্যুতানন্দের পুত্র শ্যামানন্দের শিষ্য। জন্ম ১৫৯০ খৃঃ। **রাধাবল্লভ**—সুধাকরমণ্ডলের পুত্র, আচার্য্য প্রভুর শিষ্য! **হরিবল্লভ**—প্রসিদ্ধ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর নামান্তর। কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে, তাঁহার গুরু কৃষ্ণচরণের নামান্তর, হরিবল্লভ তাঁহার গুরুর নামেই পদের ভণিতা দেন। যাহা হউক, ঐ ভণিতাযুক্ত পদে যে চক্রবর্ত্তীমহাশয়কৃত, তাহা সর্ব্বসম্মত। তিনি 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি' নামে একখানি পদ-গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। চক্রবর্ত্তী-কৃত ২৩ খানি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রচলিত আছে। ১৭০৪ খৃঃ অব্দে তিনি "সারার্থদর্শিনী" নামে ভাগবতের টীকা রচনা করেন, ইহাই তাঁহার সর্ব্বপ্রথম ও শেষ কীর্ত্তি। এই সকল পদকর্ত্তা ছাড়া বনবিষ্ণুপুরের প্রসিদ্ধ রাজা **বীরহাম্বীর** * ও নীলাচলবাসী শিখিমাহিতীর ভগিনী প্রসিদ্ধ ৩॥০ রসিকভক্তের অর্দ্ধজন—**মাধবীর**—পদও পাওয়া গিয়াছে। আমরা সম্প্রতি তরণীরমণ নামক একজন কবির একটি সুবৃহৎ পদ-সংগ্রহ পাইয়াছি। তন্মধ্যে তাঁহার রচিত অনেক পদ পাওয়া গিয়াছে। তরণীরমণের চণ্ডীদাস সম্বন্ধে একখানি পুস্তক আছে। তাহাতে চণ্ডীদাস ও তদ্বন্ধু জনৈক রাজা (সম্ভবতঃ কীর্ণহারের কিঙ্কিন নামক নৃপতি) সম্বন্ধে অনেক তথ্য বিবৃত আছে। এই পুঁথিখানি বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত আছে ইহাতে সহজিয়া মতের ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

---

* ভক্তিরত্নাকরে ইঁহার দুইটি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। ইনি বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণের পর 'হরিচরণ' আখ্যা গ্রহণ করেন।

তরণীরমণ মহাপ্রভুর প্রায় সমকালবর্ত্তী। যদুনাথ দাসের সংগ্রহ তোষিণীতে ইঁহার একটি পদ উদ্ধৃত আছে।

এ স্থলে বলা উচিত, যাঁহারা বড় বড় গ্রন্থ লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, অথবা যাঁহাদের রচিত পদাপেক্ষা ভক্তিরসময় জীবনই বেশী সুরভিময়, যথা—**কৃষ্ণদাস কবিরাজ, বৃন্দাবন দাস, ত্রিলোচন দাস ও নরহরি চক্রবর্ত্তী** প্রভৃতি গ্রন্থকার ও **শ্রীনিবাস আচার্য্য, নরোত্তম দাস** ও **শ্যামানন্দ** প্রভৃতি বৈষ্ণব মহাজন,—তাঁহাদের প্রসঙ্গ পরে প্রদত্ত হইবে।

এই যুগের পদকর্ত্তৃগণ চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি হইতে নিম্নে স্থান পাইবার যোগ্য, কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে অনেক উৎকৃষ্ট কবি আছেন। এই দলে নরহরি, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, বলরামদাস, রায়শেখর, ঘনশ্যাম, রায়বসন্ত, যদুনন্দন, বংশীবদন এবং বাসুঘোষ শ্রেষ্ঠ। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কবিতায় প্রেম ভিন্ন অন্য ভাব নাই, কিন্তু গোবিন্দদাস প্রভৃতির পদে প্রেমের সঙ্গে ভক্তি মিশ্রিত হইয়াছে। ভক্তির সঙ্গে নির্ম্মলতা প্রবিষ্ট হয়, কিন্তু গাঢ়তার হ্রাস হয়; প্রেমেতে অঙ্কিত-মূর্ত্তি আলিঙ্গন করিলে প্রাণ জুড়ায়, ভক্তিতে অঙ্কিত মূর্ত্তির পদ স্পর্শ করিতে পারিলে কৃতার্থ জ্ঞান হয়, সুতরাং প্রেম অপেক্ষা ভক্তিতে উদ্দিষ্ট ছবি একটু দূরে স্থাপিত হয়। ভক্ত তাঁহার আরাধ্যকে না পাইলে আবার তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হয়, প্রেমিকার মত তাঁহার রাগ ও মান করিবার শক্তি নাই—কিন্তু আত্মসমর্পণের ইচ্ছা আছে। নিম্নোদ্ধৃত পদটিতে প্রেম অপেক্ষা তপস্যার কথা বেশী আছে ঃ—

"যাঁহা পঁহু অরুণ চরণে চলি যাত। তাঁহা তাঁহা ধরণী হইএ মঝু গাত॥ যো সরোবরে পঁহু নিতি নিতি নাহ। হাম ভরি সলিল হোই তথি মাহ॥ যো দরপণে পঁহু নিজ মুখ চাহ। মঝু অঙ্গ জ্যোতি হোই তথি মাহ॥ যো বীজনে পঁহু বীজই গাত। মঝু অঙ্গ তাহি হোই মৃদুবাত। যাঁহা পঁহু ভরমই জলধর শ্যাম। মঝু অঙ্গ গগন হোই তছু ঠাম॥ গোবিন্দদাস কহ কাঞ্চন গোরি। সো মরকত তনু তোহে কিএ ছোড়ি॥"

বৈষ্ণব কবির প্রেম।

বৈষ্ণবকবিগণের প্রেম পণ্যদ্রব্য নহে। দানই এ প্রেমের ধর্ম্ম, দানই এ প্রেমের সুখ; প্রতিদান চাহিয়া এ বিপণিতে কেহ প্রবেশাধিকার পায় না। ফুলের সুরভি বিনা মূল্যে বিতরিত হয়; চাঁদের জ্যোৎস্না, মলয় সমীরণ ক্রয় বিক্রয়ের সামগ্রী নহে, প্রাতঃসূর্য্যরশ্মি শীতকালে কত মধুর, কিন্তু শাল বনাতের মত তাহার মূল্য নাই; বনের কুন্দ, যূথি, যাতি, গৃহসুন্দরীগণ হইতে কম মধুর নহে, কিন্তু উহাদের পণে বিক্রয় হয় না; এ প্রেমও তেমনই অমূল্য। স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় প্রেমিক এ প্রেম-ভরে উন্মত্তভাবে যাহা খুঁজিয়া বেড়ায়, তাহা প্রতিদান নহে,—

"মো যদি সিনাই আগিলা ঘাটে আর ঘাটে পিয়া নায়। মোর অঙ্গের জল, পরশ লাগিয়া, বাহু পশারিয়া রয়॥ বসনে বসন লাগিবে বলিয়া, একই রজকে দেয়। আমার নামের একটি আখর, পাইলে হরিষে লেয়॥ ছায়ায় ছায়ায়

লাগিবে বলিয়া, ফিরয় কতই পাকে। আমার অঙ্গের বাতাস যেদিকে সে দিন সে মুখে থাকে॥ মনের কাকুতি বেকত করিতে কত না সন্ধান জানে। পায়ের সেবক রায়শেখর কিছু জানে অনুমানে॥"

এই অপূর্ব্ব ব্রতের এই অপূর্ব্ব কথা। পঞ্চদশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে প্রেম ও সৌন্দর্য্যপূজার পূর্ণ-প্রভাব দেখা দিয়াছিল। বিরল-দ্রুম নগর-রাজিতে বসন্তের সৌষ্ঠব এখন বিকাশ পায় না। এখন বসন্ত বনে আসে—কোকিলের জন্য, রক্ত-কিশলয়ের জন্য, বনকুরঙ্গ ও কুরঙ্গীর জন্য; মনুষ্য-সমাজে এখন বিজ্ঞানের নীরস শীত-বায়ু কবিত্বের ফুল-পল্লব সংহার করিয়া সত্যের অস্থিপঞ্জর দেখাইতেছে; এখনকার প্রেমের কবিতা পঞ্চদশ-শতাব্দীর স্মৃতিমাত্রে পর্য্যবসিত; সেরূপ মধুর কথা এখন আর লিখিত হইবে না,—সেই স্বপ্নময়ী চিত্রলেখা বিজ্ঞানের শীতল নীহারিকাজড়িত হইয়া এখন চির-অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই পুষ্পতরুপল্লবগুচ্ছমণ্ডিত পৃথিবী পূর্ব্বেও যেরূপ, এখনও অবশ্য সেইরূপ সুন্দর আছে—কিন্তু আমরা ইহাকে সুন্দর দেখিতে ভুলিয়া গিয়াছি। বৈষ্ণব পদাবলী বুঝিতে হইলে বঙ্গের পল্লী গীতিকাগুলি ভাল করিয়া পড়া উচিত। বাঙ্গলার পল্লীতে পল্লীতে প্রেমের যে সর্ব্বস্বপণ তপস্যা চলিতেছিল, তাহাতে বাঙ্গালার নর-নারী প্রেমের এক অপূর্ব্ব আদর্শ আয়ত্ব করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই পল্লী-গীতিকাগুলি স্পষ্ট করিয়া দেখাইবে, নর-নারীর ইন্দ্রিয়াতীত,—প্রাণ দেওয়া প্রেম কিরূপে ধীরে ধীরে বৈষ্ণব স্বর্গের উপাদান যোগাইতেছিল। চণ্ডীদাসের প্রসিদ্ধ পদ—"এ ঘোর যামিনীমেঘের ঘটা, কেমনে আইলা বাটে" এর সঙ্গে গীতিকার "ধোপার পাট" মিলাইয়া পড়ুন, দেখিবেন পল্লী-গীতিকাটি যেন এই গানের একটি ভাষ্য। প্রেমের জন্য বঙ্গের নর-নারী যে কি উৎকট তপস্যা করিয়াছিল, তাহা পল্লী-গীতিকায় সোনার অক্ষরে লেখা হইয়াছে; আর এক ধাপ উঁচুতে উঠিয়া বৈষ্ণবেরা রাই কানুর প্রেম আয়ত্ব করিয়াছিলেন, বৈষ্ণব ধর্ম্ম যুগব্যাপী জাতীয় তপস্যার ফল। চণ্ডীদাস বলিয়াছিলেন; "ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছয়ে যে জন কেহ না চিনয়ে তারে, প্রেমের আরতি যেজন জানয়ে, সেই সে বুঝিতে পারে।" তিনি ভগবৎ প্রেম আস্বাদন করার পক্ষে নর-নারীর প্রেম অপরিহার্য্য মনে করিয়াছিলেন, আর এক ধাপ উপরে উঠিয়া চৈতন্যদেব বলিলেন "প্রেম প্রেম করে লোকে প্রেম জানে কিবা, প্রেম করা কি হয় রমণীর সেবা, অভেদ পুরুষ নারী যখন জানিবে, তখন প্রেমের তত্ব হৃদয়ে ফুটিবে।" তিনি দিন রাত্রি চণ্ডীসের গান গাহিতেন, কিন্তু বুঝিয়াছিলেন উহা যে রাজ্যের কথা সে ঊর্দ্ধরাজ্য সাধারণের জন্য নহে। এইজন্যই তিনি নর-নারীর প্রেম দ্বারা ভগবৎ প্রেম পাওয়া যায়—একথা সামাজিক লোকের পক্ষে নিষেধ করিয়াছিলেন এবং "বহিরঙ্গ সঙ্গে নাম সংকীর্ত্তনের" নিরাপদ পথ প্রদর্শন প্রচার করিয়া "অন্তরঙ্গ সহ" রস আস্বাদন করিতেন।

পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রেম-সাহিত্য।

বৈষ্ণবপদাবলী আনন্দলোকের কথা—সেই প্রেমে যে ক্রোধ তাহার উপাদান আনন্দ—তাহাতে

divorce সূচনা করে না। চণ্ডীদাস লিখিয়াছেন, "প্রণয় করিয়া ভাঙ্গয়ে যে, সাধন অঙ্গ পায় না সে"—ইঁহাদের রাজ্যে প্রাণ দিয়া আর ফিরাইয়া নেওয়ার উপায় নাই। ইঁহাদের বর্ণিত মান ক্রোধের অভিব্যক্তি নহে, সোনা দিয়া ফুলই গড় বা অস্ত্রই গড়—উহাদের একমাত্র উপাদান সোনা। সেইরূপ এই প্রেমের মিলন, মাথুর, মান, প্রভৃতি যাহাই লিখিত হইয়াছে—তাহা সমস্তই আনন্দলোকের কথা। সে প্রেমের ঝগড়া-বিবাদ, বাদবিসম্বাদের নিষ্পত্তি স্থান অপর কোন বিচারালয় নহে। কৃষ্ণ বিরহে রাই প্রাণত্যাগ করিতেছেন, কৃষ্ণের নিষ্ঠুরতার অবধি নাই। বৃন্দা বলিল, "দাসখৎ দেখাইয়া তাঁহাকে বাঁধিয়া আনিব।" মুমূর্ষ-রাধিকা ভীতা হইয়া বলিলেন, "বেঁধ না তার কোমল করে। ভর্ৎসনা কোর না তারে, মনে যেন নাহি পায় দুঃখ। যখন তারে মন্দ কবে, চন্দ্রমুখ মলিন হবে, তাই ভেবে ফাটে মোর বুক (কৃষ্ণকমল)।" যখন রাধা দুর্জ্জয় মানিনী, তখনও "এক পদ কৃষ্ণপদে যাইবার চায়, আর পদ পদে পদে বারণ করে তায়। এক কর্ণ বলে আমি কৃষ্ণ নাম শুনব, আর কর্ণ বলে আমি বধির হয়ে রব।" যখন কৃষ্ণের নাম বলিবেন না, স্থির করিয়াছেন তখনও "এ ছার বিধাতা মোর হইল কি বাম। যার নাম নাহি লব লয় তার নাম (চণ্ডীদাস)।"—এই প্রেমের সবখানি খাঁটি সোনা দিয়া গড়া। ইহা সেই আনন্দ-লোকের কথা—উপনিষৎ যাহা আভাযে মাত্র ব্যক্ত করিয়াছেন। অন্যান্য কবিরা কৃষ্ণপ্রেমরূপ দুর্লভ দ্রব্যের জন্য করজোড়ে প্রার্থনা করিতেছেন, কিন্তু বৈষ্ণব-কবির রাধা, প্রধানতঃ চণ্ডীদাস-অঙ্কিত রাধা, পুনঃ পুনঃ ঘর করিতে চাহিয়াও ঘর করিতে পারিতেছেন না। প্রেম বন্যার মত আসিয়া তার ঘর ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে, তখন তিনি কাঁদিয়া বলিতেছেন, "হে আনন্দময় তুমি কেন বাঁশী বাজাইতেছ, আমার এত সাধের সাজান সংসার তুমি কেন ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছ। আমি তোমার পায়ে কি অপরাধ করিয়াছি, আমি রন্ধন-শালায় যাইয়া বাঁশী শুনিয়া রান্না গোলমাল করিয়া ফেলিতেছি" (কৃষ্ণ-কীর্ত্তন) কত নিবারণ করিতে চাই—কিন্তু চিত্ত সংযম করিতে পারি না। "কত নিবারিয়ে তবু নিবার না যায়।" এই ভাবের বন্যায় পড়িয়া চৈতন্যদেব ক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন।

মাথুরের এক একটি পদ একটি রত্ন ভাণ্ডার। কৃষ্ণ কতই না আদর করিতেন, তিনি রাধিকার হাতে মুরলীটি ফেলিয়া দিয়া তাহার পায়ের ধূলি লইবার জন্য ব্যগ্র হইতেন; * রাধার মুখে হাসি দেখিলে চোখ ছল ছল হইত, † 'আবার হাস' বলিয়া প্রার্থনা করিতেন। রাধিকার বর্ণ গৌর—এই জন্য স্বয়ং পীতবাস পরিতেন, ‡ রাধার একটি নিশ্বাস পড়িলে, চমকিয়া উঠিতেন।

* "লহ লহ লহ রাই সাধের মুরলী পরশিতে চাই তব চরণের ধূলি।" জ্ঞানদাস

† "হাস হাস নয়ন জুড়াক চন্দ্রমুখী এ বোল বলিতে পিয়ার ছল ছল আঁখি।" চণ্ডীদাস

‡ "পীত বসন মোর তব অনুরাগে পরাণ চমকে যদি ছাড়য়ে নিশ্বাসে।"—জ্ঞানদাস

বিদায়ের মুহূর্ত্তে করুণভাবে, বারংবার 'যাই' 'যাই' বলিতেন, তখন কত আলিঙ্গন, কত নিবিড় স্নেহ,—এক পা চলিয়া গিয়া ফিরিয়া রাধিকার মুখ দেখিয়া কাতর হইয়া পড়িতেন।" * "বঁধু আপন শ্রীকরে কুসুম নিকরে তুলিয়া" আনিতেন, এবং নিজ হস্তে ফুলশয্যা রচনা করিতেন। সোনার চিরুণী দিয়া সোনার পুতলীর চুল বাঁধিয়া দিতেন, "আচরি চিকুর বানাইত বেণী! সে বেণী সম্বরি, বাঁধিত কবরী—মালতীর মালা পরাইত।" "কত সাজে সাজাইত—মুখপানে চেয়ে র'ত, বঁধুর বিধুবদন ভেসে যেত নয়নের জল পুঞ্জে।" (কৃষ্ণকমল)

যে কৃষ্ণ এরূপ আদর দেখাইতেন, তিনি এতটা নির্ম্মম হইয়াছেন,—রাধিকা তাঁহার অভাবে মৃত্যুর সন্নিহিত তাহাও তিনি উপেক্ষা করিতেছেন। দূতি যাইতেছে—কিন্তু রাধিকা জানেন, কৃষ্ণ আসা পর্য্যন্ত তিনি বাঁচিবেন না, তিনি দূতিকে বলিতেছেন—

"কহিও কানুরে সই কহিও কানুরে
একবার পিয়া যেন আইসে ব্রজপুরে,
নিকুঞ্জেও রহিল আমার এই হিয়ার হেমহার
পিয়া যেন গলায় পরয় একবার।
যতনে মল্লিকা আমি রোপিনু নিজ করে।
গাঁথিয়া ফুলের মালা পরাইও তারে।
তরু শাখে রইল মোর সাধের শারীশুকে,
পিয়া যেন সব কথা শুনে তাদের মুখে,
তোমরা আমার যত প্রিয় নর্ম্ম সখী,
আমার সঙ্গিনী সভে আমার দুঃখের দুখী
শ্রীদাম সুদাম আদি যত তার সখা।
তা সভার সনে তার হবে পুনঃ দেখা
দুঃখিনী আছয়ে তার মাতা যশোমতী,
আসিতে যাইতে তার নাহিক শকতি।
পিয়া যেন তারে আসি দেয় দরশন
কহিও কানুর পায় মোর নিবেদন।

যে হেম-হার রাধার শত শত অশ্রু বিন্দুতে অভিষিক্ত সেই হার যেন কৃষ্ণ একবার গলায় পরেন; কৃষ্ণকে মালা পরাইবার জন্য তিনি অতি যত্নে মল্লিকার চারা রোপন করিয়াছিলেন,

---

* "আমি যাই, যাই, বলে তিন বোল,
কত না চুম্বন দেয় কত দেয় কোল,
পদ আধ যায় পিয়া চায় পালটিয়া
বয়ান নিরখে কত কাতর হইয়া।" চণ্ডীদাস

সে সৌভাগ্য তাঁহার হইল না, তোরা তাঁহাকে একবার মল্লিকা ফুলের মালা পরাইয়া দেখিস,—সখীকে বলিতেছেন। আমি কি কষ্ট পাইয়া মরিলাম, তাহা তিনি শারীশুকের মুখে শুনিবেন,—সেই কথা বলিতে যাইয়া নির্ব্বাক পক্ষীর মুখেও ভাষা ফুটিবে। যশোমতির সঙ্গে যেন আসিয়া দেখা করেন,—বলিতে বলিতে বীণার শেষ ধ্বনির মত রাধার কণ্ঠ থামিয়া গেল।

যে বৃন্দা রাই কানুর মিলনের দৃশ্য শতবার দেখিয়াছেন, রাধার মুখের হাসি মিলন জাত স্বর্গীয় আনন্দ শতবার কুঞ্জলতার আড়াল হইতে দেখিয়া স্বয়ং হাসিয়াছেন তিনি মুমূর্ষু রাধার এই শেষ কাতরোক্তি—

"শুনিয়া আকুল দূতি চলে মধু পুরে
কি কহিবে সে সব বচন নাহি ফুরে।"

একটি মাত্র "আকুল" কথায় দূতির হৃদয়ে অসীম ব্যথা বুঝাইতেছে। এই পদটি শ্রীখণ্ডের নরহরি লিখিয়াছিলেন, রায় শেখর কতকটা পরিবর্ত্তিত ও রূপান্তরিত করিয়া পুনরায় পদটি লিখিয়াছেন।

বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস।

পদকর্ত্তৃগণের মধ্যে গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির অনুসরণ করিয়াছেন, তাঁহার রচিত পদে বিদ্যাপতির রস-পূর্ণ উচ্ছ্বাসে অপ্রস্ফুট প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে; মৈথিল কবির পদে অনুভবের গাঢ়তা ও উদ্দীপনাশক্তি বেশী, কিন্তু গোবিন্দের পদে স্বার্থ-ত্যাগ ও পবিত্রতা অধিক, কবিত্বের হিসাবে গোবিন্দ বিদ্যাপতি হইতে নিম্নে দাঁড়াইবেন, কিন্তু বহু নিম্নে নহে। বিদ্যাপতি যেরূপ গোবিন্দদাসের আদর্শ, চণ্ডীদাস সেইরূপ জ্ঞানদাসের আদর্শ; জ্ঞানদাসের কতকগুলি পদ চণ্ডীদাসের চরণ-ভাঙ্গা; তাহা মধুর এবং মূলের প্রতিধ্বনির মত শুনায়। জ্ঞানদাসবর্ণিত নায়কের প্রেম-বিকাশ-চেষ্টা নানা বিচিত্র বর্ণপাতে সুন্দর এবং সেই সৌন্দর্য্য সততই নির্ম্মল অশ্রুজলে উজ্জ্বল হইয়াছে। বলরামদাস কাহাকেও আদর্শ করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না, চণ্ডীদাসের ন্যায় ইহার কবিতা স্বভাবেরই প্রতিবিম্ব, চণ্ডীদাসের ন্যায় ইনিও সরল বক্তা, কিন্তু ততদূর গভীর নহেন। তাঁহার পদ খাঁটি বাঙ্গলা কথায় রচিত, বাঙ্গালীর ঘরের পার্শ্বের বাগানের ফুলের ন্যায় চির-পরিচিত সৌন্দর্য্য ও সুরভির সমষ্টি। গোবিন্দদাস ও জ্ঞানদাসে, জ্ঞানদাস ও বলরামদাসে পার্থক্য আছে; যে ক্রমে এই আলোচনা লিখিতে হইল—এ পার্থক্য সেই ক্রমে, কিন্তু তাহা তিল প্রমাণ।

জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস।

বলরামদাস ও চণ্ডীদাস।

বৈষ্ণব কবিগণের পদ প্রথম সংগ্রহ করেন, বাবা আউল মনোহরদাস; হুগলী জেলার বদনগঞ্জে ইঁহার সমাধি আছে; কথিত আছে ইনি জ্ঞানদাসের বন্ধু ছিলেন ও যোগবলে অতি দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়াছিলেন; ইঁহার রচিত সংগ্রহের নাম পদ-সমুদ্র। * খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর

* পদসমুদ্র স্বর্গীয় পণ্ডিত হারাধন দত্ত ভক্তনিধি মহাশয়ের নিকট ছিল; কলিকাতায় কোন দোকানদার ২০০০৲ টাকা মূল্যে এই গ্রন্থস্বত্ব খরিদ করিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু ভক্তিনিধি মহাশয় তাহা দেন নাই; বৃদ্ধবয়সে তিনি এই পুস্তক

শেষে এই সংগ্রহ সঙ্কলিত হয়। ইহার পদ-সংখ্যা ১৫০০০; বোধ হয় পদসমুদ্রের অব্যবহিত পরেই শ্রীনিবাস আচার্য্যের পৌত্র রাধামোহন ঠাকুর পদামৃতসমুদ্র সঙ্কলন করেন। তিনি ইহার যে "মহাভাবানুসারিণী" নামক সংস্কৃত টিপ্পনী দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার শিক্ষা এবং অন্তর্দৃষ্টির বিলক্ষণ পরিচয় আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাধামোহন ঠাকুরের শিষ্য বৈষ্ণব দাস পদকল্পতরু প্রণয়ন করেন। পদকল্প-লতিকা গৌরীমোহনদাসকৃত; গীতিচিন্তামণি হরিবল্লভকৃত; গীতচন্দ্রোদয় নরহরিচক্রবর্ত্তীকৃত, প্রসাদদাসকৃত পদচিন্তামণিমালা, রসমঞ্জরী পীতাম্বরদাসকৃত; ইহা ছাড়া লীলাসমুদ্র, পদার্ণবসারাবলী, গীতকল্পতরু, প্রভৃতি বহুবিধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সংগ্রহ গ্রন্থ আছে।

পদাবলী সংগ্রহ।

পদ-সমুদ্র অতি বিরাট গ্রন্থ—রিচার্ডসনের সিলেক্সনের ন্যায়। ছাপা হইলে উহা বড় বড় পুস্তকাগারে শোভা পাইতে পারে। রাধামোহনঠাকুরের সংগ্রহপুস্তকের অনেকাংশ তিনি স্বকৃত পদ দ্বারা পূর্ণ করিয়াছেন, কতকগুলি বাঙ্গালা পদ ও ব্রজবুলির সংস্কৃত টীকা এই পুস্তকে প্রদত্ত হইয়াছে। গৌরমোহন দাসের সঙ্কলন দৃষ্টে বোধ হয়, ভাল ভাল পদ মনোনীত করিবার শক্তি ইঁহার বেশ ছিল, পদ-সন্নিবেশও বড় সুন্দর হইয়াছে। কিন্তু সংগ্রহকারকের দৃষ্টি প্রগাঢ় ভাবাপেক্ষা সুললিত শব্দবিশিষ্ট পদগুলির উপর বেশী এবং পুস্তকখানা বড় ক্ষুদ্র; মাত্র ৩৫১ পদে সম্পূর্ণ। মোটের উপর বৈষ্ণবদাসের সংগৃহীত পদ-কল্পতরুই ব্যবহার পক্ষে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ইহার পদসংখ্যা ৩১০১; পদামৃতসমুদ্র ইহা হইতে অনেক ছোট পুস্তক, অথচ সংগ্রাহক তন্মধ্যে ৪০০টিরও অধিক স্বকৃত পদ দিয়াছেন। বৈষ্ণবদাস স্বীয় বিরাট সংগ্রহে মাত্র ২৭টি স্বকৃত পদ দিয়াছেন, সে কয়েকটি পদও বন্দনাসূচক, সুতরাং সংগ্রহগ্রন্থে অপরিহার্য্য। বৈষ্ণবদাস এই সংগ্রহ সঙ্কলন করিতে যে পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা প্রবীণ ব্যক্তির উপযুক্ত। পদকল্পতরু ৪ শাখায় বিভক্ত; প্রথম শাখায় ১১ পল্লব, মোট পদসংখ্যা ২৬৫। দ্বিতীয় শাখায় ২৪ পল্লব, মোট পদসংখ্যা ৩৫১। তৃতীয় শাখায় ৩১ পল্লব, মোট পদসংখ্যা ৯৬৫; চতুর্থ শাখায় ৩৬ পল্লব, মোট পদসংখ্যা ১৫২০। ইহার কোন্ পল্লবে কত পদ তাহাও পুস্তকের শেষভাগে নির্দ্দিষ্ট আছে। প্রকাশিত পদকল্পতরু অসম্পূর্ণ বলিয়া বোধ হয়; বৈষ্ণবদাস তৎকৃত সূচীপত্রে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ৪র্থ শাখায় ২৫ পল্লবে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, কিন্তু গ্রন্থ মধ্যে উক্ত পল্লবটি বর্জ্জিত হইয়াছে; এরূপ আরও কয়েক স্থল স্পষ্টতঃই অসম্পূর্ণ দেখা যায়। সূচীনির্দ্দিষ্ট

পদ-সমুদ্র, পদামৃত, পদকল্প-লতিকা ও পদকল্পতরু।

নিজের তত্ত্বাবধানে ছাপাইয়া পাত্রবিশেষে বিতরণ করিবেন, ইহাই তাঁহার সঙ্কল্প ছিল; কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি তাঁহার উদ্দেশ্য চরিতার্থ করিয়া যাইতে পারেন নাই। এ সম্বন্ধে আরও একটু বক্তব্য আছে, আমার শ্রদ্ধাস্পদ কয়েক জন সাহিত্যিক বন্ধু এই পুস্তকের অস্তিত্বে সন্দিহান হইয়াছেন;—সে সকল কথা এখানে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন।

৩১০১ পদের মধ্যে মুদ্রিত পুস্তকে মাত্র ৩০৩০টি পদ দৃষ্ট হয়। যে অংশটুকু ঐতিহাসিক, হিন্দুস্থান-বাসিগণের তাহা লুপ্ত করিবার একটা বিশেষ শক্তি আছে। পদকল্পতরুর আদ্যন্তই সুন্দর সুন্দর পদপূর্ণ নহে। হোমরের রচনায়ও মধ্যে মধ্যে তন্দ্রালসতা দৃষ্ট হয়—এটি একটি প্রবাদ বাক্য। বৈষ্ণব কবিগণের পদগুলিও সর্ব্বত্রই প্রতিভাপ্রদীপ্ত নহে, অনেক স্থল পুনরাবৃত্তি-দোষ-দুষ্ট; কিন্তু পদকল্পতরুর প্রতিপত্রেই এমন দুএকটি ছত্র বা পদ আছে, যাহা পড়িলে বোধ হয়, কবি বাগ্দেবীর লেখনী কাড়িয়া লইয়া তাহা লিখিয়াছেন। পাঠক সেই সকল পদে প্রেমের নানারূপ লীলাসরস চিত্রলেখা দেখিয়া মুগ্ধ হইবেন।

পদবিন্যাস রীতি।

বিদেশীয় ভাবাপন্ন পাঠক, বর্ণমালানুক্রমে পদগুলি সন্নিবিষ্ট হয় নাই দেখিয়া বিরক্ত হইতে পারেন। পূর্ব্বে লিখিয়াছি, এই পদাবলীসাহিত্য ভালবাসার বিজ্ঞান। ভালবাসা-রহস্যের এরূপ গূঢ়ভেদ আর কোন দেশের সাহিত্যে নাই। লতা যে ক্রম এবং কৌশলে তরুকে জড়াইয়া বশীভূত করে, এই বিজ্ঞানে সেই ক্রম লিখিত হইয়াছে। প্রেমের নানা লীলা হইতে অলঙ্কারশাস্ত্রের সূত্র রচিত হইয়াছে। অলঙ্কারগ্রন্থে ৩৬০ রূপ নায়িকা-ভেদ বর্ণিত আছে; এই ভেদপ্রকাশসূত্রে এক একটি চিত্রনির্দ্দেশক রেখাপাত করা হইয়াছে, সেই রেখার উপর কবিগণ তুলি দ্বারা সজীব বর্ণ ফলাইয়াছেন। এই সূত্রগুলি অন্যান্য বৈজ্ঞানিক সূত্রের ন্যায় কঠোর নহে, যুবকগণ তৎপাঠে আনন্দ অনুভব করিবেন সন্দেহ নাই; যথা,—নায়িকা স্বীয় সৌন্দর্য্য-দর্পে মানিনী হইয়া কর্ণোৎপল দ্বারা নায়ককে তাড়না করিতেছে, এই চিত্রখানি প্রগল্ভার; তমালকুঞ্জে অধীরা নায়িকা প্রণয়ী-সঙ্গ অপেক্ষায় পত্রকম্পনে আশান্বিত হইয়া ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছে, এই চিত্রের নাম বাসক-সজ্জা; এই অপেক্ষা যখন আক্ষেপে পরিণতি হইতেছে, তখন বিপ্রলব্ধা; মানিনী—খণ্ডিতায় বিষাদ ও রোষ-স্ফীতা, প্রোষিত-ভর্তৃকাভাব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এখানে মান ও ক্রোধ অশ্রুজলে মগ্ন; এখানে নায়িকার মূর্ত্তি বড়ই সুন্দর, কারণ—"যা কান্তায়াঃ মুখে চিরায় বিরহে সা মাধুরী মাধুরী।" এইরূপ আরও অনেক সূত্র আছে।

বঙ্গীয় পদসমূহে এই সকল লীলাময় ভাব ভক্তি-বিধৃত হইয়া স্বর্গীয় ভালবাসার উপাদান হইয়াছে, তাহাদের ঊর্দ্ধোন্মুখ গতি ও নিষ্কাম আবেগ বিলাসকলা হইতে স্বতন্ত্র।

সংগ্রহ-নৈপুণ্যের দৃষ্টান্ত।

বলা নিষ্প্রয়োজন, সংগৃহীত পদগুলি পূর্ব্বোক্ত সূত্রানুসারে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। আমরা এস্থলে পদকল্প-লতিকা হইতে সংগ্রহনৈপুণ্যের কিছু নমুনা দিতেছি; পাঠক দেখিবেন, সংগ্রাহক নানা কবির পদ নানাস্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া কেমন সুন্দরভাবে যোজনা করিয়াছেন,—বিন্যাস-কৌশলে একখানি সম্যক্‌ভাবের চিত্র কেমন পরিস্ফুট হইয়াছে, নানা কবির তুলি দ্বারা যেন একই বর্ণ ফলিত হইয়াছে;—

মুরলী শিক্ষা।

কামোদ। বহুদিনের সাধ আছে হরি। বাজাইব মোহন মুরলী॥ তুমি লহ মোর নীল সাড়ী। তব পীত ধড়া দেহ পরি॥ তুমি লহ মোর গজমতি। মোরে দেহ তোমার মালতী॥ ঝাঁপা খোঁপা লহ খসাইয়া। মোরে দেহ চূড়াটি বাঁধিয়া॥ তুমি লহ সিন্দুর কপালে। তোমার চন্দন দেহ ভালে॥ তুমি লহ কঙ্কণ কেউরি। তোর তাড় বালা দেহ পরি॥ তুমি লহ মোর আভরণ। মোরে দেহ তোমারি ভূষণ! শুন মোর এই নিবেদন। শুনি হরষিত বৃন্দাবন॥১॥

কানেড়া। মুরলী করাও উপদেশ। যে রন্ধ্রে যে ধ্বনি উঠে জানহ বিশেষ॥ কোন্ রন্ধ্রে বাজে বাঁশী অতি অনুপাম। কোন্ রন্ধ্রে রাধা বলি লয় আমার নাম॥ কোন্ রন্ধ্রে বাজে বাঁশী সুললিত ধ্বনি। কোন্ রন্ধ্রে কেক শব্দে নাচে ময়ুরিণী। কোন্ রন্ধ্রে রসালে ফুটয় পারিজাত। কোন্ রন্ধ্রে কদম্ব ফুটেছে প্রাণনাথ॥ কোন্ রন্ধ্রে ষড় ঋতু হয় এক কালে। কোন্ রন্ধ্রে নিধুবন হয় ফুল ফলে। কোন্ রন্ধ্রে কোকিল পঞ্চম স্বরে গায়। একে একে শিখাইয়া দেহ শ্যাম রায়॥ জ্ঞানদাস কহে হাসি হাসি। 'রাধা মোর' বলি বাজিবেক বাঁশী॥২॥

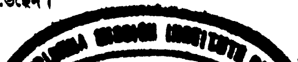
কামোদ। কৌতুকে মুরলী শিখে রসবতী রাধা। মদনমোহন মনোমোহিনীর সাধা॥ প্রেমরঙ্গে শ্যাম-অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া। মুরলী পুরয় রাই ত্রিভঙ্গ হইয়া॥ বিনা তন্ত্রে বিনা মন্ত্রে কত ফুক দেই। বাজে বা না বাজে বাঁশী পিয়া-মুখ চাই॥ রাধার অধরে বেণু ধরে বনমালী। পাণি পঙ্কজ ধরি লোলয় অঙ্গুলি॥ কানু কোলে কলাবতী কেলির বিলাসে। দুহুকরূপ দেখি শিবানন্দ ভাষে॥৩॥

বেহাগ। আজু কে গো মুরলী বাজায়। এত কভু নহে শ্যাম রায়॥ ইহার গৌরবরণে করে আলো। চূড়াটি বাঁধিয়া কেবা দিল॥ তাঁহার ইন্দ্রনীলকান্ত তনু। তত নহে নন্দসুত কানু। ইহার রূপ দেখি নবীন আকৃতি। নটবর বেশ পাইল কতি॥ বনমালা গলে দোলে ভাল। এনা বেশ কোন্ দেশে ছিল॥ কে বানাইল হেনরূপ খানি। ইহার বামে দেখি চিকণ বরণী। নীল উয়লী নীলমণি। হবে বুঝি ইহার সুন্দরী। সখীগণ করে ঠারাঠারি॥ কুঞ্জে ছিল কানু কমলিনী। কোথা গেল কিছুই না জানি॥ আজু কেনে দেখ বিপরীত। হবে বুঝি দোহার চরিত॥ চণ্ডীদাস মনে মনে হাসে। এরূপ হইবে কোন্ দেশে॥৪॥*

পদের অতল রত্নাকর হইতে নানা যুগের ভিন্ন ভিন্ন নামাঙ্কিত এই চারিটি রত্নের উদ্ধার করিয়া এরূপ সুন্দর সমন্বয় করাতে সংগ্রাহক একটি উৎকৃষ্ট মণিকারের সম্মান পাইবার যোগ্য।

---

* প্রথম পদে (বৃন্দাবন-কৃত রাধিকা) হরির নিকট বেশ পরিবর্ত্তন ও বংশীবাদনের অনুমতি চাহিয়াছেন, দ্বিতীয় পদে (জ্ঞানদাস কৃত) বেশ পরিবর্ত্তন সম্পূর্ণ, কিন্তু রাধিকা বাঁশী বাজাইতে পারেন নাই. এজন্ত তদুপদেশ চাহিয়াছেন, তৃতীয় পদে (শিবানন্দ কৃত) কৃষ্ণ রাধাকে বাঁশী বাজাইতে শিক্ষা দিতেছেন। ৪র্থ পদে (চণ্ডীদাসকৃত) রাই কানু ও কানু রাই সাজিয়াছেন, তখন বেশ পরিবর্ত্তন সম্পূর্ণ—রাধা সুললিত স্বরে বাঁশীতে ঝঙ্কার দিতেছেন, এবং সখীগণ চিনিতে না পারিয়া "আজু কে গো মুরলী বাজায়" প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করিতেছেন।



পদাবলী-সাহিত্য হইতে আমরা বিদায় গ্রহণ করিতেছি। বঙ্গদেশের ভক্তির অবতার চৈতন্যদেবের জীবন একটি গীতির ন্যায়; এদেশের গীতি-কবিতাই উৎকৃষ্ট কবিতা; যে জাতি উদ্যমপূর্ণ, উন্নতিপথে ধাবিত, তাঁহাদের মধ্যে পুরুষকারের চিত্র জীবন্ত; সে দেশে নরনারী-জীবন নাটকীয় চরিত্রের গূঢ় সৌন্দর্য্য ও মহত্ত্বে ব্যক্ত হয় হয়, রামায়ণে ও মহাভারতে একদা হিন্দুর সেইরূপ চরিত্র প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল। কিন্তু অবস্থার ক্রীড়াশীলচক্রে পতিত, ছিন্ন ভিন্ন জাতির অশ্রুই সম্বল; সেই অশ্রু কখনও দুঃখজ্ঞাপক হইয়া মর্ম্মস্পর্শী হয়, কখনও বা ভক্তির উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইয়া গীতি-কবিতার মৃদু উপাদানের মধ্যেও এরূপ মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য্য ছায়া দেখাইতে পারে, যাহাতে সেই দুঃখে দয়া করার অধিকার হয় না,—সে দুঃখ গৌরবের বিষয় হয়।

বঙ্গীয় গীতি কবিতার শ্রেষ্ঠত্ব।

এই গীতিকবিতাগুলি আমরা জগতের সর্ব্বত্র সাহিত্য প্রদর্শনীতে লইয়া দেখাইতে পারি;—আত্মগরিমার রাজ্যের অধিবাসীবৃন্দকে আত্মবিসর্জ্জনের কথা শুনাইয়া মুগ্ধ করিতে পারি।

চরিত-শাখা।

(ক) গোবিন্দদাসের কড়চা। *

(খ) জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল।

(গ) চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যমঙ্গল, চৈতন্যচরিতামৃত।

(ঘ) ভক্তিরত্নাকর, নরোত্তমবিলাস, প্রেমবিলাস প্রভৃতি।

(ক) গোবিন্দদাসের কড়চা।

মহাপ্রভুর মহিমান্বিত আদর্শ হইতে বঙ্গসাহিত্যে জীবন-রচিত লেখার প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। মনুষ্যের নৈসর্গিক চরিত্র এক সময়ে শাস্ত্রীয় যবনিকার পশ্চাতে পড়িয়া উপেক্ষিত ছিল। তাই চৈতন্যদেবের পূর্ব্বে শাস্ত্রীয় অনুবাদ ও শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম ভিন্ন অন্য কিছুর অবতারণা হয় নাই। মহাপ্রভু নিজের জীবন দেখাইয়া বুঝাইলেন, মনুষ্যলীলার

রচিত-রচনাপ্রবর্ত্তক।

* গোবিন্দদাসের কড়চার প্রমাণিকতা সম্বন্ধে কতিপয় স্বার্থান্ধ ব্যক্তি এবং সংস্কারান্ধ পণ্ডিত একটা বৃথা হৈ চৈ তুলিয়াছিলেন। মৎসম্পাদিত কড়চার নূতন সংস্করণ (যাহা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে) তাহাতে বিস্তারিত

সৌন্দর্য্য-পাতেই শাস্ত্র উজ্জ্বল হয় ও মনুষ্য শাস্ত্র হইতে মহত্তর। পুস্তকে যে সকল ভাব ও চরিত্রের কথা বর্ণিত হয়, মহাজনগণের জীবনে তাহা জীবন্তভাবে ক্রিয়া করে।

চরিত-সাহিত্যের সূত্রপাত হইল; বঙ্গদেশীয়গণ পৌরাণিক চরিত্রগুলির দেবদত্ত অমানুষী শক্তির বিষয় অবগত হইয়া মনুষ্য-সুলভগুণের প্রতি অবহেলা করিতে শিখিয়াছিল; দয়া, ভক্তি সরলতা প্রভৃতি গুণই প্রকৃত পূজনীয়; অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অমানুষী বিরাটতত্ত্ব বা বহুলতত্ত্ব প্রকৃত শোভা কিংবা মহত্ত্ব দান করিতে পারে না—একথা বাঙ্গালী জনসাধারণ তখনও ভাল করিয়া বুঝে নাই; তাই চৈতন্যদেবের ভক্তের মধ্যে অনেকে তাঁহার চরিত্রে অলৌকিক বর্ণপাত করিয়াছেন; তাঁহাদের মধ্যে অনেকে উচ্চশিক্ষিত ছিলেন, সুতরাং শাস্ত্রীয় প্রমাণসহ চৈতন্যদেবের জীবনের অতিমানুষিক প্রভাব প্রতিপন্ন করিতে অক্ষম হন নাই। * সে সময়ে ধর্ম্মপ্রচারের জন্য সেরূপ করা আবশ্যক ছিল। কারণ অজ্ঞ এবং অশিক্ষিতগণ অলৌকিক লীলার দ্বারাই বেশী আকৃষ্ট হইয়া থাকে। চৈতন্যদেবের জীবন সম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গিগণের কেহ কেহ কড়চা বা নোট রাখিয়া গিয়াছিলেন, সেই নোট ও জনশ্রুতি অবলম্বনে এবং তাঁহার কোন কোন সঙ্গীর কথিত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বৃন্দাবনদাস চৈতন্যভাগবতের ন্যায় উৎকৃষ্ট ঐতিহাসিক গ্রন্থ ও পরে কৃষ্ণদাস চরিতামৃতের ন্যায় অপূর্ব্ব ভক্তিমিশ্র দর্শনাত্মক চরিতাখ্যান প্রণয়ন করেন। নোটগুলিকে সাবেকী বাঙ্গালায় "কড়চা" বলিত;

মনুষ্যত্বের প্রতি উপেক্ষা।

চৈতন্যজীবনী।

ভাবে প্রতিপক্ষীয় দলের ভ্রম নিরাসন করা হইয়াছে। সেই সুদীর্ঘ ভূমিকা পাঠ করিয়া বহু গোস্বামী ও পণ্ডিত আমাকে চিঠি লিখিয়া জানাইয়াছেন যে এই অমূল্য পুস্তকখানির সম্বন্ধে তাঁহাদের সমস্ত দ্বিধা দূর হইয়া গিয়াছে। বৈষ্ণব সাহিত্যে অদ্বিতীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম, এ, শ্রীযুক্ত গৌরভূষণ অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম, এ, শান্তিপুর নিবাসী ভূতপূর্ব্ব স্কুল-ইনেস্পেকটর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল, রঙ্গপুরের গবর্ণমেণ্ট উকীল শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিতবর মনোমোহন চক্রবর্ত্তী এবং গোস্বামী শ্রীযুক্ত মুরারিলাল অধিকারী প্রভৃতি বহু মহোদয় এই পুস্তকের পক্ষপাতী।

* ১০০ বৎসর হইল, কবি প্রেমানন্দদাস চৈতন্যদেবের অবতার সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় যে সকল প্রমাণ উদ্ধার করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত প্রমাণসহ কবির স্বহস্তলিখিত কাগজখানি আমি পাইয়াছি; তাহার কতকাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—বামনপুরাণে ব্যাসং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্—"অহমেব কচিৎব্রহ্ম সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ। হরিভক্তিং গ্রাহয়িষ্যে কলৌ পাপহতান্নরান্।" বায়ুপুরাণে—"দিবিজাভুবিজায়ধ্বং জায়ধ্বং ভক্তিরূপিণঃ। কলৌ সংকীর্ত্তনারম্ভে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ।" মৎস্যপুরাণে,—"শুদ্ধগৌরঃ সুদীর্ঘাঙ্গো গঙ্গাতীরসমুদ্ভবঃ। দয়ালুঃ কীর্ত্তনগ্রাহী ভবিষ্যামি কলিযুগে।" এইরূপে গরুড়পুরাণ, কূর্ম্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, দেবীপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, বাল্মীকিপুরাণ নৃসিংহপুরাণ বৃহৎযামল প্রভৃতি অনেক পুরাণের নাম করিয়া শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে; এসব প্রেমানন্দদাস উদ্ধৃত করিয়াছেন, পূর্ব্বোক্ত পুরাণগুলির নব সংস্করণে সেগুলি খুঁজিয়া না পাইলে পাঠক আমাকে দায়ী করিবেন না।

ইহাদের মধ্যে গোবিন্দদাসের ও মুরারিগুপ্তের কড়চা বিশেষ প্রসিদ্ধ, কিন্তু দ্বিতীয়খানি সংস্কৃতে লিখিত, সুতরাং এ পুস্তকে উল্লেখযোগ্য নহে।

গোবিন্দের কড়চার প্রামাণিকতা।

কড়চা-লেখকগণের মধ্যে গোবিন্দদাস একজন। ইনি উচ্চ-শিক্ষিত ছিলেন না; যে দুই বৎসরের বৃত্তান্ত লইয়া ইনি পুস্তকখানি লিখিয়াছেন, সে দুই বৎসর ইনি দিবারাত্রি মহাপ্রভুর পরিচর্য্যা করিয়াছেন, কখনও সঙ্গ-বিচ্যুত হন নাই। তাঁহার লেখায় এমন একটু সারল্যমাখা সত্য-প্রিয়তা আছে, যাহাতে কড়চাখানা ফটোগ্রাফের ন্যায় সুন্দর ও বিশুদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। মনুষ্য-বর্ণিত ইতিহাস কখনও পূর্ণ ও অবিসংবাদিত ভাবে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না, তবে গোবিন্দের কড়চা অনেকাংশে প্রামাণিক ঐতিহাসিক-গ্রন্থ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

করচায় চৈতন্যের চরিত্র।

এই পুস্তকের রচনা নানাবিধ গুণান্বিত। যাঁহার চরণতলে উপবিষ্ট হইয়া ভক্তি ও বিস্ময়-উচ্ছ্বসিত, অশ্রুসিক্ত অনুচর এই উপাখ্যান বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহার এরূপ প্রেম-মধুর চিত্র-লেখা আর কোনও পুস্তকে লিখিত হয় নাই। বৃন্দাবনদাস ও কৃষ্ণদাসকবিরাজ মহাপ্রভুকে দেখেন নাই; জনশ্রুতি, ভক্তগণের বর্ণিত বৃত্তান্ত ও কড়চাগুলির সাহায্যে তাঁহার মহিমান্বিত চরিত উপলব্ধি করিয়াছেন, কিন্তু গোবিন্দ তাঁহার রূপ অনুক্ষণ দর্শন করিয়াছেন ও সেই রূপমাধুরী অনুক্ষণ ধ্যান করিয়াছেন। জয়ানন্দ মহাপ্রভুকে দেখিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার রচিত চরিতাখ্যানও গোবিন্দের কড়চার ন্যায় চাক্ষুষ ঘটনার ইতিহাস নহে। গোবিন্দ যে ছবিখানা দেখিতে পাইতেন, তাহা পাণ্ডিত্যের প্রভাবে কৃত্রিম বা রূপান্তরিত হয় নাই। অশিক্ষিত সরল ভৃত্য প্রভুর খড়ম দুইখানা স্কন্ধে করিয়া কিছু প্রসাদ ভক্ষণের লালসায় সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেন; তিনি বাগ্দেবীর বরে চির-যশস্বী হইয়া ব্যাস ও বাল্মীকির লেখনীর উত্তরাধিকারী হইবেন, এইরূপ কোন অহঙ্কারের ভাব তাঁহার রচনার আবেগপূর্ণ সারল্য পরাভূত করিতে পারে নাই। আমরা নানা কারণে এই পুস্তকখানি চৈতন্যদেবের সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া অনুমান করি। *

* আমার এইরূপ উক্তিতে কোন কোন বিশিষ্ট বৈষ্ণব পুস্তকখানির উপর অত্যন্ত বিদ্বেষ্ট হইয়াছেন। তাঁহাদের নিকট "চৈতন্য চরিতামৃত" প্রভৃতি গ্রন্থ বেদের তুল্য; সেই পুস্তকের উপর একটা মূর্খ কর্ম্মকার রচিত কড়চা স্থান পাইবে, ইহা আমাদের সহ্য হয় নাই। একজন সুপণ্ডিত বৈষ্ণব আমাকে স্পষ্ট বলিয়াছেন, যে আমি চৈতন্য-চরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ সম্বন্ধে যদি কটাক্ষপাত না করি, তবে তিনি ও কড়চার প্রতিকুলতা করিবেন না। কিন্তু তাঁহাদের এটা ভুল যে চৈতন্য চরিতামৃতাদি গ্রন্থ আমার নিকট শ্রদ্ধা পায় নাই। শুধু ঐতিহাসিক অংশে আমি কড়চাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছি। অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য, অপূর্ব্ব ভক্তি, অপূর্ব্ব লিপিকলায় চৈতন্য চরিতামৃত আমাদের মাথার মণি—এই সমস্ত গুণে তাহার সমকক্ষতা করিবার যোগ্য পুস্তক বাঙ্গালায় হয় নাই।

১৫০৮ খৃষ্টাব্দে বৰ্দ্ধমানস্থ কাঞ্চননগরবাসী শ্যামদাস কর্ম্মকারের পুত্র গোবিন্দকর্ম্মকার স্ত্রীকর্ত্তৃক 'মূর্খ,' 'নিগুর্ণ' প্রভৃতি দুর্ব্বাক্যে তিরস্কৃত হইয়া অভিমানে গৃহত্যাগী হন। পরবর্ষের মাঘ মাসের প্রথমার্দ্ধে চৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, সুতরাং সন্ন্যাস গ্রহণের কিঞ্চিদধিক একবৎসর পূর্ব্বে গোবিন্দ চৈতন্যপ্রভুকে প্রথম দর্শন করেন, তখন প্রভু স্নানার্থ গঙ্গাতীরে; গোবিন্দ দেখা মাত্র মুগ্ধ হইলেন :—

গোবিন্দের পরিচয়।

"কটিতে গামছা বাঁধা অপূর্ব্ব দর্শন। সঙ্গে এক অবধূত প্রসন্ন-বদন। * * * অবশেষে আইলা তথি অদ্বৈত গোঁসাই। এমন তেজস্বী মুই কভু দেখি নাই। পক কেশ পক দাড়ী বড় মোহনিয়া। দাড়ী পড়িয়াছে তার হৃদয় ছাড়িয়া॥ * * * আশ্চর্য্য প্রভুর রূপ হেরিতে লাগিনু। রূপের ছটায় মুঞি মোহিত হইনু॥ * * * ঘাটে বসি এই লীলা হেরিনু নয়নে। কি জানি কেমন ভাব উপজিল মনে॥ কদম্বকুসুম সম অঙ্গ কাঁটা দিল। থরথরি সব অঙ্গ কাঁপিতে লাগিল॥ ঘামিয়া উঠিল দেহ তিতিল বসন। ইচ্ছা অশ্রুজলে মুঞি পাখালি চরণ॥"

প্রভুর দর্শনেই গোবিন্দ পূর্ব্বরাগের ভাবাবেশ অনুভব করিলেন। গোবিন্দ যখন যাহা দেখিয়াছেন, তাহা দেখিতে দেখিতে নোট করিয়া গিয়াছেন, তাহার অনেক কথায় নূতন নূতন চিত্র লক্ষিত হয়;—চৈতন্যপ্রভুর বাড়ী সম্বন্ধে :—

"গঙ্গার উপরে বাড়ী অতি মনোহর। পাঁচখানা বড় ঘর দেখিতে সুন্দর॥ * * * শান্তমূর্ত্তি শচীদেবী অতি খর্ব্বকায়। নিমাই নিমাই বলি সদা ফুকরায়॥ বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী হন প্রভুর ঘরণী। প্রভুর সেবায় ব্যস্ত দিবস রজনী॥ লজ্জাবতী বিনয়িনী মৃদু মৃদু ভাষ। মুই হইলাম গিয়া চরণের দাস॥"

গোবিন্দের কড়চা হইতে আমরা চৈতন্যদেবের একটি সংক্ষিপ্ত ভ্রমণবৃত্তান্ত সঙ্কলন করিয়া নিম্নে প্রদান করিলাম। পাদটীকায় আমরা স্থানগুলি সম্বন্ধে মন্তব্য দিয়া যাইতেছি।

কণ্টকনগর (কাঁটোয়া) হইতে বৰ্দ্ধমান; কাঞ্চননগরে গোবিন্দের স্ত্রী তাহাকে ফিরাইয়া লইতে আসে; দামোদর নদ পার হইয়া কাশীমিত্রের বাটীতে অবস্থান; তথা হইতে হাজিপুরে, হাজিপুর হইতে মেদিনীপুরে; এস্থলে কেশব-সামন্ত নামক ধনী ব্যক্তি মহাপ্রভুকে কটূক্তি করে; মেদিনীপুর হইতে নারায়ণগড়ে, তৎপরে জলেশ্বরে, সুবর্ণরেখা পার হইয়া হরিহরপুরে, হরিহরপুর হইতে বালেশ্বরে, সেস্থান হইতে নীলগড়ে, বৈতরণী নদী পার হইয়া মহানদীর তীরে গোপীনাথদেব ও সাক্ষী-গোপাল দর্শন, নিংরাজের (লিঙ্গ-রাজের) মন্দির দর্শন, ইহার পর আঠারনালায় জগন্নাথের মন্দিরের ধ্বজ দর্শনে চৈতন্যপ্রভুর উন্মত্তা-বস্থা, পুরীগমন। তিন মাস কাল পুরীতে অবস্থানের পর ১৫১০ খৃষ্টাব্দের ৭ই বৈশাখ চৈতন্যপ্রভু দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণে বহির্গত হন। পুরী হইতে গোদাবরীতীরে রামানন্দ রায়ের সঙ্গে দেখা করেন। (১)

চৈতন্যের ভ্রমণ।

(১) চৈতন্যচরিতামৃতেও লিখিত আছে, চৈতন্যদেব গোদাবরীতীরে রামানন্দ রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন; রামানন্দের বাড়ী বিদ্যানগর গোদাবরী হইতে অনেক উত্তরে; রাজকার্য্যোপলক্ষে রামানন্দের গোদাবরীতে থাকা সম্ভব। পুরী হইতে

তথা হইতে ত্রিমন্দনগর (১) গমন করিয়া তুঙ্গভদ্রবাসী ঢুণ্ডীরামতীর্থকে ভক্তিপথে প্রবর্ত্তিত করেন। ত্রিমন্দ হইতে সিদ্ধবটেশ্বরে গমন করেন, (২) এই স্থানে তীর্থরাম নামক ধনী সত্যবাই ও লক্ষ্মীবাই নামক বেশ্যাদ্বয় দ্বারা চৈতন্যপ্রভুকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করেন, পরে তাঁহার প্রভাবে নিজেই সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ৭ দিন বটেশ্বরে থাকিয়া ২০ মাইল ব্যাপক এক জঙ্গল অতিক্রম করেন, তৎপরে মুন্নানগরে (৩) গমন, মুন্না হইতে বেঙ্কটনগরে; (৪) শেষোক্ত স্থানে তিন দিন থাকিয়া বগুলাবনে পন্থ-ভিল নামক দস্যুকে ভক্তিদান করেন, তৎপরে এক বৃক্ষতলে তিন দিবস হরিনাম করিতে করিতে উন্মত্তাবস্থায় কর্ত্তন, তৎপরে গিরীশ্বরে দুই দিবস যাপন, গিরীশ্বর হইতে ত্রিপদীনগরে, (৫) তথা হইতে পানানরসিংহদর্শন, বিষ্ণুকাঞ্চীতে (৬) গমন এবং তথা হইতে কালতীর্থ ও সন্ধিতীর্থে প্রবেশ—তৎপরে চাইপল্লীনগরে (৭) সেস্থান হইতে নাগরনগরে (৮) ও নাগর হইতে তাঞ্জোরে (৯) গমন করেন, তাহা

গোদাবরীর অনেক দক্ষিণে। এই দুইএর মধ্যে কোন্ কোন্ দেশ চৈতন্যদেব অতিক্রম করেন। কড়চায় তাহা নির্দ্দিষ্ট নাই। গোদাবরীর কোন শাখা তখন উত্তরদিকে প্রবাহিত ছিল কি না জানা যায় নাই।

(১) 'ত্রিমন্দ' শিশির বাবুর অমিয়নিমাইচরিতে 'ত্রিদম' বলিয়া উল্লিখিত আছে। কিন্তু চৈতন্যচরিতামৃত, ভক্তিরত্নাকর ও চৈতন্যভাগবতে উহা 'ত্রিমল্ল' বলিয়া অভিহিত; বেঙ্কটভট্ট ও ত্রিমল্লভট্ট দুই সহোদরের নাম অনেক বৈষ্ণব গ্রন্থেই পাওয়া যায়, বেঙ্কট ও ত্রিমল্ল দুইটি নিকটবর্ত্তী স্থানের নামানুসারেই ভ্রাতৃদ্বয় উত্তমরূপে অভিহিত হইয়া থাকেন; "ত্রিমল্ল"ই প্রকৃত নাম বলিয়া বোধ হয়; উহা হায়দরাবাদ নগরের নিকটস্থ আধুনিক "ত্রিমল্লঘেরী" বলিয়া বোধ হয়।

(২) সিদ্ধবটেশ্বর ('সিদ্ধবটেশ্বরম্') কডপ্পানগরের নিকটবর্ত্তী ও পান্নার নদীর তীরস্থ।

(৩) মুন্নানগরের নাম পোষ্টাল গাইডে পাইলাম না; বড় ভাল মানচিত্রে মুন্না নামক নদী মান্দ্রাজের নিকট দৃষ্ট হয়; এই নদীর তীরে মুন্নাগ্রাম অবস্থিত ছিল (হয়ত এখনও আছে) বলিয়া বোধ হয়।

(৪) বেঙ্কটনগর পাওয়া গেল না; বোম্বের নিকট এক বেঙ্কটনগর আছে, কিন্তু ইহা সে "বেঙ্কট" কখনই হওয়া সম্ভব নহে; এক নামের অনেকগুলি স্থান সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়, এই কড়চা-নির্দ্দিষ্ট ত্রিপাত্রনগর ও নাগরনগর আমরা দুই দুই পৃথক স্থানে পাইয়াছি; বেঙ্কটনগর ও মুন্নানগর সিদ্ধবটেশ্বর ও ত্রিপদী নগরদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী কোন স্থলে অবস্থিত থাকা সম্ভব; এই দুই স্থানের মধ্যে ব্যবধান প্রায় ৬০ মাইল। গিরীশ্বরও ত্রিপদীনগরের নিকটবর্ত্তী বলিয়া বর্ণিত আছে।

(৫) ত্রিপদীশ্বর হইতে চৈতন্যদেবের ভ্রমণের রেখা অতি শুদ্ধরূপে অনুসরণ করা যায়; পুরী হইতে ত্রিপদীনগর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ প্রদেশের মধ্যে কোন কোন স্থান পাওয়া গেল না, এবং অন্যান্য স্থান সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্যে একেবারে শুদ্ধ বলিয়া প্রচার করিতে সাহস হয় না, কিন্তু ত্রিপদী হইতে চৈতন্যদেবের পরবর্ত্তী পর্য্যটনের সঙ্গে বর্ত্তমান মানচিত্রের রেখায় রেখায় মিল দৃষ্ট হয়। ত্রিপদীনগর মান্দ্রাজ হইতে ৯০ মাইল উত্তর পশ্চিমে।

(৬) পানানরসিংহ প্রভৃতি ছোট ছোট স্থান দর্শন করিয়া চৈতন্য "বিষ্ণুকাঞ্চীপুরে" গমন করেন; ইহা আধুনিক "কাঞ্জিভরম" (কাঞ্চীপুরম্); কাঞ্জিভরম্ ত্রিপদী হইতে প্রায় ৪৭ মাইল দক্ষিণে।

(৭) ত্রিচাইপল্লী হইতে চাইপল্লী (আধুনিক ত্রিচিনপল্লী) প্রায় ১২৫ মাইল দক্ষিণে।

(৮) ত্রিচাইপল্লী হইতে নাগর-নগর ১৪৫ মাইল পূর্ব্বে ও সমুদ্রের উপকূলে অবস্থিত। বোম্বের উপকূলে তুঙ্গনদীর তীরবর্ত্তী এক নাগর-নগর (বেদনুরের সমীপবর্ত্তী) আছে, ইহা সেই স্থান নহে।

(৯) তাঞ্জোর,—নাগর হইতে ১৪ মাইল দক্ষিণে।



গৌরাঙ্গ প্রভু ও পারিষদবর্গ

(কুঞ্জঘাটা রাজবাটীর তৈলচিত্রের প্রতিলিপি)   ৩০৯ পৃঃ

হইতে চণ্ডালু পর্ব্বত পার হইয়া পদ্মকোটে, (১) তার পর ত্রিপাত্র নগরে, (২) সেই স্থান হইতে ৩০০ মাইল ব্যাপক এক জঙ্গল অতিক্রম করেন। ইহাতে একপক্ষ ব্যয়িত হয়। জঙ্গল পার হইয়া রঙ্গধামে (৩) নৃসিংহ মূর্ত্তি দর্শন করেন, রঙ্গধাম হইতে রামনাথনগরে (৪) ও রামনাথ হইতে রামেশ্বরে গমন করেন। তথা হইতে মাধ্বীকবনে প্রবেশ করেন ও তাম্রপর্ণী পার হইয়া কন্যাকুমারীতে উপস্থিত হন। কন্যাকুমারী হইতে "ত্রিবঙ্কু" (৫) দেশে প্রবেশ করেন; এই দেশ পর্ব্বতবেষ্টিত ও ইহার তদানীন্তন রাজরা রুদ্রপতি অতি ধর্ম্মনিষ্ঠ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ত্রিবঙ্কু হইতে পয়োষ্ণী (৬) নগরে, তথা হইতে মৎস্যতীর্থ, কাচাড়, ভদ্রানদী, নাগপঞ্চনদী অতিক্রম করিয়া চিতোলে (৭) গমন করেন। চিতোল হইতে চণ্ডপুর, গুর্জ্জরীনগর, (৮) ও পরে পূর্ণনগরে (৯) প্রবেশ করেন, পূর্ণনগর তখন 'দাক্ষিণাত্যের নবদ্বীপ' অর্থাৎ শাস্ত্রালোচনার কেন্দ্র স্থান ছিল। পূর্ণনগর হইতে পাটননগরে, তথা হইতে জেজুরী-নগরে গমন করেন; এই স্থলে খাণ্ডবাদেবের পরিচারিকা অভাগিনী মুরারীদিগের বিবরণ দেওয়া আছে। তৎপরে চোরানন্দী বনে নারোজী নামক ব্রাহ্মণ-দস্যুকে সন্ন্যাসগ্রহণে প্রবর্ত্তিত করেন; মূলানদী পার হইয়া নাসিকে, নাসিক হইতে ত্রিম্বক ও দমননগর (১০) এবং তাপ্তীনদী অতিক্রম করিয়া ভঁরোচ নগরে প্রবেশ; ভঁরোচ (১১) হইতে বরদা,

---

(১) পদ্মকোট—তাঞ্জোর হইতে ২৫ মাইল দক্ষিণ।

(২) ত্রিপাট—পদ্মকোট হইতে প্রায় ২২ মাইল দক্ষিণ; পদ্মকোট হইতে প্রায় ১২৫ মাইল উত্তরে আরকটের নিকট অপর এক 'ত্রিপাত্র' নগর আছে, ইহা সেটি নহে।

(৩) রঙ্গধাম,—ইহা আধুনিক শ্রীরঙ্গম্, ত্রিপাদের দক্ষিণপশ্চিমে। কিন্তু রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁহার ইংরাজী ভাষায় লিখিত বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে এই স্থানকে শ্রীরঙ্গপটম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন (৭৬ পৃষ্ঠা); কিন্তু, শ্রীরঙ্গপটম ত্রিপাত্র হইতে প্রায় ৩২২ মাইল উত্তরে; পরবর্ত্তী স্থানগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলে শ্রীরঙ্গকেই রঙ্গধাম বলিয়া স্পষ্ট বোধ হয়।

(৪) রামনাথ—সমুদ্রের উপকূলে রামেশ্বরের অতি নিকটে।

(৫) ত্রিবঙ্কু—ত্রিবাঙ্কুর।

(৬) পয়োষ্ণী—আধুনিক পনানি।

(৭) চিতোল—বোধ হয় আধুনিক চিত্রলদুর্গ, ইহা মহীশূরের উত্তর সীমান্তে।

(৮) গুর্জ্জরী—গুজরাত নহে, ইহা হায়দ্রাবাদ রাজ্যের নিকটে।

(৯) পূর্ণ—পূণা; এখনও তন্নিকটবর্ত্তী নদীর নাম পূর্ণ রহিয়াছে।

(১০) নাসিক—নাসিক, ত্রিম্বক (বোধ হয় আধুনিক ত্রিম্বক), দমননগরে পরস্পরের সন্নিকটবর্ত্তী।

এই দুই স্থানের মধ্যে কালতীর্থ, সন্ধিতীর্থ, পক্ষতীর্থ প্রভৃতি স্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সব তীর্থ এখন জাগ্রত অবস্থায় কি না বলা যায় না।

(১১) ভরোচ—তাপ্তী নদীর নিকট আধুনিক মানচিত্রে ব্রোচ নগর।

তথায় নারোজীর মৃত্যু, আহম্মদাবাদের ঐশ্বর্য্যবর্ণন ; শুভ্রামতী নদী অতিক্রম করেন, (১) এস্থলে কুলীনগ্রামবাসী রামানন্দ ও গোবিন্দচরণের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় এবং তাঁহারা চৈতন্যদেবের সঙ্গী হন। ঘোগা নামক গ্রামে (২) গমন, বারমুখী বেশ্যার উদ্ধার ; জাফরাবাদ পরে সোমনাথ গমন। সোমনাথের পরে জুনাগড়ে, গুনার পাহাড় অতিক্রম, ১লা আশ্বিন দ্বারকায় গমন, ১৬ই আশ্বিন দ্বারকা হইতে নর্ম্মদাতীরে দোহাদনগরে, তথা হইতে কুক্ষি, আমঝোড়া, মন্দুরা, দেওঘর (বৈদ্যনাথ নহে), চণ্ডীপুর, রায়পুর, বিদ্যানগর, রত্নপুর গমন ও মহানদী পার হইয়া স্বর্ণগড়ে প্রবেশ, তথা হইতে সম্বলপুর, দাসপাল নগর ও আলালনাথে আগমন—এই স্থান হইতে পুরীতে উপস্থিত হন। (৩)

কড়চায় বর্ণিত চৈতন্য-চরিত্র।

এই কড়চার মধ্যে পাঠক ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক নানা তত্ত্ব পাইবেন। ইহাকে 'নোট' সংজ্ঞা দেওয়া উচিত নহে। কড়চা কাব্য বা ইতিহাসের রেখাপাত মাত্র। ইহা একখানা বিস্তৃত চরিতাখ্যান। উৎকৃষ্ট শিল্পী কর্ম্মকার বহুমূল্য-মণিখচিত স্বর্ণময় দেব-বিগ্রহ নির্ম্মাণ করিলে যতদুর সুন্দর হইতে পারে, গোবিন্দকর্ম্মকারের লেখনী-নির্ম্মিত চৈতন্যমূর্ত্তি তাহা হইতেও সুন্দর হইয়াছে। সিদ্ধবটেশ্বরে তীর্থরাম নামক ধনী ব্যক্তি চৈতন্যদেবকে পরীক্ষা করিতে যাইয়া নিজে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, স্থলটি উদ্ধৃত করিতেছি।—

"হেনকালে আইলা সেথা তীর্থ ধনবান্। দুইজন বেশ্যা সঙ্গে আইলা দেখিতে। সন্ন্যাসীর জারিভুরি পরীক্ষা করিতে॥ সত্যবাই লক্ষ্মীবাই নামে বেশ্যাদ্বয়। প্রভুর নিকটে আসি কত কথা কয়॥ ধনীর শিক্ষায় সেই বেশ্যা দুই জন। প্রভুরে বুঝিতে বহু করে আয়োজন॥ তীর্থরাম মনে মনে নানা কথা বলে। সন্ন্যাসীর তেজ এবে হরে লব ছলে॥ কত রঙ্গ করে লক্ষ্মী সত্যবালা হাসে। সত্যবালা হাসিমুখে বসে প্রভু পাশে॥ কাঁচলি খুলিয়া সত্য দেখা-

(১) আহম্মদাবাদ নগর ও শুভ্রামতী নদী—মানচিত্র দেখুন।

(২) ঘোগা—পোষ্টাল গাইড দেখুন।

(৩) সোমনাথ হইতে সমস্ত স্থানই মানচিত্রের সঙ্গে মিলিয়া যায় ; রামানন্দ রায়ের বাড়ী বিদ্যানগর রায়পুর ও রত্নপুরের মধ্যে অবস্থিত থাকা সম্ভব। রায়পুর ও রত্নপুর ভারতবর্ষের যে কোন মানচিত্রে পাওয়া যাইবে ; উহারা সেণ্ট্রাল প্রভিন্সের অন্তর্বর্ত্তী ; স্বর্ণগড়ের এখনকার নাম রায়গড়। গোবিন্দের স্থান নির্দ্দেশগুলি এরূপ বিশুদ্ধ যে মানচিত্র অনুসরণ করিতে করিতে তাঁহাকে স্বতঃই সাধুবাদ দিতে প্রবৃত্তি হয় ; এই বৃত্তান্তে নিশ্চিতরূপে জানা যাইতেছে, চৈতন্যদেব পুরী হইতে পূর্ব্ব উপকূলের সমস্ত দক্ষিণাংশ ক্রমে পরিভ্রমণ করিয়া পশ্চিম উপকূলে-ক্রমে গুজরাট পর্য্যন্ত দর্শন করেন, গুজরাট হইতে নর্ম্মদা ও বিন্ধ্যাগিরির সমসূত্রপথে প্রায় এক সরলরেখায় পুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ১৫১০ খৃষ্টাব্দের ৭ই বৈশাখ তিনি দাক্ষিণত্য অভিমুখে রওনা হন ও ১৫১১ খৃষ্টাব্দের ৩রা মাঘ পুরীতে প্রত্যাগমন করেন ; সুতরাং এই ভ্রমণকার্য্য ১ বৎসর ৮ মাস ২৬ দিনে নির্ব্বাহিত হইয়াছিল।

ইলা স্তন। সত্যের করিলা প্রভু মাতৃ সম্বোধন॥ থরথরি কাঁপে সত্য প্রভুর বচনে। ইহা দেখি লক্ষ্মী বড় ভয় পায় মনে। কিছুই বিকার নাই প্রভুর মনেতে। ধেঁয়ে গিয়া সত্যবালা পড়ে চরণেতে॥ কেন অপরাধী কর আমারে জননী। এইমাত্র বলি প্রভু পড়িলা ধরণী॥ খসিল জটার ভার ধূলায় ধূসর। অনুরাগে থরথর কাঁপে কলেবর॥ সব এলোথেলো হলো প্রভুর আমার। কোথা লক্ষ্মী কোথা সত্য নাহি দেখি আর॥ নাচিতে লাগিল প্রভু বলি হরি হরি। রোমাঞ্চিত কলেবর অশ্রু দরদরি। গিয়াছে কৌপীন খুলি কোথা বহির্ব্বাস। উলঙ্গ হইয়া নাচে ঘন বহে শ্বাস॥ আছাড়িয়া পড়ে নাহি মানে কাঁটা গোঁচা। ছিঁড়ে গেল কণ্ঠ হৈতে মালিকার গোছা॥ না খাইয়া অস্থিচর্ম্ম হইয়াছে সার। ক্ষীণ অঙ্গে বহিতেছে শোণিতের ধার॥ হরিনামে মত্ত হয়ে নাচে গোরারায়। অঙ্গ হতে অদ্ভুত তেজ বাহিরায়॥ ইহা দেখি সেই ধনী মনে চমকিল। চরণতলেতে পড়ি আশ্রয় লইল॥ চরণে দলেন তারে নাহি বাহ্যজ্ঞান। হরি বলে বাহু তুলে নাচে আগুয়ান॥ সত্যরে বাহুতে ছাঁদি বলে বল হরি। হরি বল প্রাণেশ্বর মুকুন্দ মুরারি। কোথা প্রভু কোথায় বা মুকুন্দ মুরারি। অজ্ঞান হইল সবে এই ভাব হেরি॥ হরি নামে মত্ত প্রভু নাহি বাহ্যজ্ঞান। গাড়িভাঙ্গি পড়িতেছে আকুল-পরাণ॥ মুখে লালা অঙ্গে ধূলা নাহিক বসন। কণ্টকিত কলেবর মুদিত নয়ন॥ ভাব দেখি শত বৌদ্ধ বলে হরি হরি। শুনিয়া গোরার চক্ষে বহে অশ্রুবারি॥ পিচকিরি সম অশ্রু বহিতে লাগিল। ইহা দেখি তীর্থরাম কাঁদিয়া উঠিল॥ বড়ই পাষণ্ড মুই বলে তীর্থরাম। কৃপা করি দেহ মোরে প্রভু হরিনাম॥ তীর্থরাম পাষণ্ডেরে করি আলিঙ্গন। প্রভু বলে তীর্থরাম তুমি সাধুজন॥ পবিত্র হইনু, আমি পরশে তোমার। তুমি ত প্রধান ভক্ত কহে বারেবার॥"

এই মন্ত্রে নরোজী, ভীলপন্থি দস্যুদ্বয় ও বারমুখী বেশ্যা পরাজয় স্বীকার করিয়াছিল। যে গ্রামে চৈতন্যদেব গমন করিয়াছেন, সে গ্রামের লোক তাঁহাকে ভুলিতে পারে নাই,—গুর্জ্জরীনগরে তাঁহার প্রেমময় মূর্ত্তির এইরূপ একটি প্রতিচ্ছায়া প্রদত্ত হইয়াছে,—

"এত বলি কৃষ্ণ হে বলিয়া ডাক দিল। সে স্থান অমনি যেন বৈকুণ্ঠ হইল॥ অনুকূল বায়ু তবে বহিতে লাগিল। দলে দলে গ্রাম্যলোক আসি দেখা দিল। ছুটিল পদ্মের গন্ধ বিমোহিত করি। অজ্ঞান হইয়া নাম করে গৌরহরি॥ প্রভুর মুখের পানে সবার নয়ন। ঝর ঝর করি অশ্রু পড়ে অনুক্ষণ॥ বড় বড় মহারাষ্ট্রী আসি দলে দলে। শুনিতে লাগিল নাম মিলিয়া সকলে। পশ্চাৎভাগেতে মুই দেখি তাকাইয়া। শত শত কুলবধূ আছে দাঁড়াইয়া॥ নারীগণ অশ্রুজল মুছিছে আঁচলে। ভক্তিভরে হরি নাম শুনিছে সকলে॥ অসংখ্য বৈষ্ণব শৈব সন্ন্যাসী জুটিয়া। হরিনাম শুনিতেছে নয়ন মুদিয়া॥"

ভক্তির পূর্ণ আবেগের সময় এই মনুষ্য দেবটির শরীরে একরূপ আশ্চর্য্য প্রতিভা প্রকাশ পাইত; অনুচর গোবিন্দও সেইরূপ ভীত হইয়া দর্শন করিতেন,—

"কি কব প্রেমের কথা কহিতে ডরাই। এমন আশ্চর্য্য ভাব কভু দেখি নাই॥ কৃষ্ণ হে বলিয়া ডাকে কথায় কথায়। পাগলের ন্যায় কভু ইতি উতি চায়॥ কি জানি কাহারে ডাকে আকাশে চাহিয়া। কখন চমকি উঠে কি যেন দেখিয়া॥ উপবাসে কেটে যায় দুই এক দিন। অন্ন না খাইয়া দেহ হইয়াছে ক্ষীণ। একদিন গুহা মধ্যে পঞ্চবটী বনে। ভিক্ষা হ'তে এসে মুই দেখি সঙ্গোপনে॥ নিথর নিঃশব্দ সেই জনশূন্য বন। মাঝে মাঝে বাস করে দুই চারি জন॥ ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে বনের ভিতর। চক্ষু মুদি কি ভাবিছে গৌরাঙ্গ-সুন্দর॥ অঙ্গ হৈতে বাহির হইছে তেজ রাশি। ধ্যান করিতেছে মোর নবীন সন্ন্যাসী॥ এই ভাব হেরি মোর ধাঁধিল নয়ন।"

বাঙ্গালী এই জলপ্লাবিত শস্যশ্যামল প্রদেশে খড়ের ঘরে কোনওরূপে দীর্ঘজীবনটি কাটাইয়া দেয়; উত্তরে হিমাদ্রি, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে বিন্ধ্য,—নিকটবর্ত্তী প্রকৃতির এই মহান্ আলেখ্য বাঙ্গালীকে মাতৃভূমির ক্রোড় হইতে বড় ভুলাইয়া লইয়া যাইতে পারে নাই। এদেশের উর্ব্বর ক্ষেত্ররাশি অকাতরে শস্যদান করিত, উদর স্বচ্ছন্দে পূর্ণ করিয়া বঙ্গবীরগণ বাড়ীর চতুঃসীমানায় ভ্রমণ ও নিয়মিতরূপে রজনীপাত করিতেন। রণক্ষেত্রে যাইতে সিপাহীর যে আগ্রহ—পাঠশালা কিম্বা তদ্রূপ নিকটবর্ত্তী অন্য কোন কর্ম্মশালা হইতে বাঙ্গালীর স্বমন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তনের তদ্রূপই আগ্রহ,—ইহা তাঁহার ঐতিহাসিক দুর্নাম। দুই গৃহ-প্রিয় বাঙ্গালীর বাহিরে যাইয়া স্বভাবের শোভা দেখিতে বড় কৌতুহলী হয় নাই। বাইরণ, স্কট কি ওয়ার্ড সোয়ার্থের রচনায়, কোথাও ক্লিটামনাসের উজ্জ্বল ও ভীতিকর চিত্র, বজ্রনাদি-ঝণার শব্দে প্রতিশব্দিত জাঙ্‌ফে ও আপিনাইনের তুষারধবল উদাসকান্তি, কোথাও লকলেমন্, লক্‌কেট্রিন্ প্রভৃতি পাহাড়বেষ্টিত তড়াগের সুন্দর ও বিস্ময়কর কান্তি কোথাও টিন্‌টারণ্ সন্নিহিত মৃদু নীলোজ্জ্বল সলিলের গতির বর্ণনায় যে অভিনব মহত্ত্ব মিশ্র সৌন্দর্য্যের আভা পড়িয়াছে, বঙ্গদেশের ঈষৎ উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিমে তাহা হইতে শতগুণ শোভা ও মহিমান্বিতা প্রকৃতির মূর্ত্তি; কিন্তু গৃহস্থ বাঙ্গালী ভ্রমণকার্য্যে নিতান্তই অপারগ ছিল, তাই প্রাচীন সাহিত্যে ভেরাণ্ডার থাম ও জবাপুষ্প অপেক্ষা কোন উৎকৃষ্ট প্রাকৃতিক চিত্রের অঙ্কন প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। কিন্তু গোবিন্দের প্রকৃতিবর্ণনায় বঙ্গীয় প্রাচীন-সাহিত্যে দুর্লভ রূপের প্রভা পড়িয়াছে; ঘরের নিরুদ্ধ-বায়ু-সেবনাভ্যস্ত বাঙ্গালী ঘরের বাহির হইয়া প্রকৃতির নব নব চিত্র দর্শন করিয়াছেন, তাই তাঁহার লেখায় এক প্রফুল্ল নব সৌন্দর্য্যের বায়ু প্রবাহিত হইয়া চিত্রগুলি স্ফূর্ত্তিশালী ও জীবন্ত করিয়াছে:—নীলগিরি বর্ণনাটি আধুনিক কবির রচনার ন্যায় সরল ও সুন্দরভাবে গ্রথিত:—

প্রকৃতি বর্ণনা।

"কিবা শোভা পায় আহা নীলগিরিরাজে। ধ্যানমগ্ন যেন মহাপুরুষ বিরাজে। কত শত গুহা তার নিম্নে শোভা পায়। আশ্চর্য্য তাহার ভাব শোভিছে চূড়ায়॥ বড় বড় বৃক্ষ তার শির আরোহিয়া। চামর ব্যঞ্জন করে বাতাসে দুলিয়া॥ ঝর ঝর শব্দে পড়ে ঝরণার জল। তাহা দেখি বাড়িল মনের কুতূহল॥ পর্ব্বতের নিম্নদেতে ঘুরিয়া বেড়াই। নবীন নবীন শোভা দেখিবার পাই॥ কত শত লতা বৃক্ষ করিয়া বেষ্টন। আদরেতে দেখাইছে দম্পতি বন্ধন॥ ময়ুর বসিয়া ডালে কেকারব করে। নানাজাতি পক্ষী গায় সুমধুর স্বরে॥ নানাবিধ ফুল ফুটে করিয়াছে আলা। প্রকৃতির গলে যেন দুলিতেছে মালা॥ রজনীতে কত লতা ধগ্‌ধগি জ্বলে। গাছে গাছে জোনাকি জ্বলিছে দলে দলে॥ ক্ষুদ্র এক নদী বহে ঝুরু ঝুরু স্বরে। তার ধারে বসি প্রভু সন্ধ্যাপূজা করে॥"

কিন্তু স্থানে স্থানে গম্ভীরতর ভাবোদ্দীপক বর্ণনা আছে, কন্যাকুমারীর চিত্রে,—

"তাম্রপর্ণী পার হয়ে সমুদ্রের ধারে। প্রভু কন্যাকুমারী চলিল দেখিবারে॥ কেবল সিন্ধুর শব্দ শুনিবার পাই। পর্ব্বত

কানন দেশ নাহি সেই ঠাঁই ॥ হুঁ হুঁ শব্দে সমুদ্র ডাকিছে নিরন্তর। কি কব অধিক সেথা সকলি সুন্দর॥ দেখিবার কিছু তথাপি শোভন। সেথানে সৌন্দর্য্য দেখে শুদ্ধ যার মন॥"

সেখানে দেখিবার কিছুই নাই,—কিন্তু জাগতিক সমস্ত দ্রব্যের সমাধির ন্যায় সেই বিশাল অনন্ত ক্ষেত্রের অনুভবনীয় শোভা ধারণা করিতে শুদ্ধচিত্তের প্রয়োজন।

কবির চিত্তে প্রকৃতি অলক্ষিতভাবে একটি অস্পষ্ট, নিগূঢ় উচ্চভাব বিম্বিত করিয়া দিয়াছিল।

গোবিন্দের কড়চার আর এক গুণ, ইহাতে সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার মালিন্য নাই; এই অনাবিল রচনা সর্ব্বত্র সুরুচিসঙ্গত ও নির্ম্মল। পরবর্ত্তী লেখকগণের বৈষ্ণবীর বিনয়ও, স্থলে স্থলে সাম্প্রদায়িকতার মিশ্রণে দুষ্ট হইয়াছে; কিন্তু যাঁহার নাম করিয়া সম্প্রদায় সৃষ্ট হইয়াছিল, তিনি নিজে অসংশ্লিষ্ট ও অসাম্প্রদায়িক ছিলেন; তাঁহার প্রিয় অনুচরের লেখায়ও অসাম্প্রদায়িক উদারতার প্রীতিপ্রফুল্লভাব শ্রেণী-নির্ব্বিশেষে সকলের মনোরঞ্জন করিবে। চৈতন্যপ্রভু যেখানে যে দেবতা দেখিয়াছেন, তাহাই নির্ব্বিচারে তাঁহাকে ভগবানের স্মৃতি উদ্রেক করিয়া দিয়াছে। পরবর্ত্তী সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবগণ তাঁহার এই জগৎপূজ্য পবিত্রচরিত্রকে একদর্শি-সংকীর্ণতায় সংক্ষুব্ধ করিয়া শাক্ত-বৈষ্ণবের কোলাহলময় দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন, এই বিদ্বেষপ্রণোদিত সাম্প্রদায়িকধর্ম্মে তাঁহার অণুমাত্রও অনুমোদন ছিল না; নারায়ণগড়ে তিনি "ধলেশ্বর" শিব দর্শনে—"হর হর বলি প্রভু উচ্চ রব করি। আছাড় খাইয়া পড়ে ধরণী উপরি॥" জলেশ্বরের 'বিলেশ্বর' শিব দর্শনেও তাঁহার ভাবোচ্ছ্বাস হইয়াছিল। বেঙ্কটনগরের নিকট "গিরিশ্বর" শিব দর্শন করিতে অনুরাগী হইয়া তিনি দীর্ঘপথ পর্য্যটন করিয়াছিলেন। পাটস গ্রামের নিকট "ভোলেশ্বর" শিব দর্শনে "প্রভুর প্রেম উপজিল। জোড় হস্তে স্তব স্তুতি বহুত করিল॥ অজ্ঞান হইয়া গোরা পড়িয়া ধরায়। উলটি পালটি কত গড়াগড়ি যায়॥" এবং সোমনাথদর্শনে তাঁহার যে ব্যাকুলতা হইয়াছিল, তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। ত্রিম্বকের নিকট রামের চরণচিহ্ন বিদ্যমান ছিল বলিয়া কথিত আছে, "চরণের চিহ্ন প্রভু করিয়া পরশ। গাঢ়তর প্রেমভরে হইলা অবশ॥ অবশেষে মোর কণ্ঠ আঁকড়ি ধরিয়া। কোথা মোর রাম বলি উঠিলা কান্দিয়া॥" পঞ্চবটী বনে যাইয়া তিনি 'গণেশ' বিগ্রহ দেখিতে ব্যাকুল হইয়াছিলেন! পদ্মকোট তীর্থে দেবী অষ্টভুজা ভগবতী দেখিবার জন্য গমন করেন এবং—"সেখানেই প্রভু গিয়া করিল প্রণতি।" দমননগরের নিকট সুরথপ্রতিষ্ঠিত অষ্টভুজা শক্তিমূর্ত্তি দেখি প্রভু ধরণী লুটায়" ও সেই মূর্ত্তি "দেখিয়া নয়নে। তিন দিন বাস করে প্রভু সেই স্থানে।" এইরূপ বহুবিধ স্থলেই তাঁহার উদার ভক্তিমূলক ধর্ম্ম দৃষ্ট হইবে। "না করিব অন্য দেব নিন্দন বন্দন"—এই কথায় চৈতন্যদেবের স্বাক্ষর কোথায়? তিনি ত শ্রীকৃষ্ণ-সেবক, শিবসেবক, রামসেবক, অষ্টভুজাসেবক, গণেশসেবক, কিম্বা এ সকলের কাহারও সেবক নহেন;—এ সমস্ত বিগ্রহ, চিহ্নস্বরূপ যাঁহার কথা আভাসে জ্ঞাপন করিতেছে, তিনি তাঁহারই প্রকৃত

চৈতন্যপ্রভুর অসাম্প্রদায়িক ভাব।

সেবক। যে কথা তাঁহার বিরহমথিত হৃদয়ে অশ্রুর অক্ষরে চিরলিখিত ছিল, সেই অন্তঃপ্রবাহিত চিরনির্ম্মল ঈশ্বরকণা—যে স্থানে লোকভক্তির চিহ্নিত স্থান,—তীর্থভূমি, সেই স্থানে কিংবা সর্ব্বত্রই উদ্রিক্ত হইয়াছে। এবং একথা নিশ্চয় যে, শ্রেণীবিশেষকে বিশেষরূপে আপ্যায়িত করিতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন নাই।

গোবিন্দের চরিত্র।

গোবিন্দের সরলতা ও আড়ম্বরশূন্যতা কড়চার সর্ব্বত্রই বিশেষরূপে দ্রষ্টব্য; সামান্য ঘটনাগুলি নিপুণ কবির স্পষ্ট ও সংযত বর্ণনায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। তাহার নিজ সম্বন্ধীয় বর্ণনাগুলি এতদূর অকৃত্রিম ও অভিমানশূন্য যে, সময় সময় তাঁহার চরিত্রকে তিনি অন'হুত ভাবে নিজেই উপহাসযোগ্য করিয়া তুলিয়াছেন; কোথাও একটা 'পরেটা ফল' একটা 'লাড্ডু' ও গুড়সংযুক্ত 'তক্রাম্ল' দেখিয়া খাইবার প্রবৃত্তি হইয়াছে, সেই প্রবৃত্তিকে তিনি নৈতিক চক্ষে দেখিয়া অতিরঞ্জিত অপরাধের শ্রেণীতে গণ্য করিয়াছেন। নিজে অবশ্য স্বচরিত্রকে একটু সভ্যভব্য ও সুমার্জ্জিত করিয়া বর্ণনা করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা তিনি আদৌ করেন নাই। চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসের সময় গোবিন্দও সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি যতই কেন ক্ষুদ্র হউন না, এই বিষম সংসার কারাগৃহের শৃঙ্খল তাঁহার পক্ষেও বলবৎ শক্তিশালী ছিল, সন্দেহ নাই। সোণার শৃঙ্খল মায়া, লৌহের শৃঙ্খল। স্বর্ণমত মনোরম লৌহ মত দৃঢ়।" ইহা ছেদন করা তাঁহার পক্ষে সহজ কার্য্য ছিল না; কিন্তু তিনি তৎসম্বন্ধে একটি কথাও বলা প্রয়োজনীয় মনে করেন নাই; অনেক কবিই এতদুপলক্ষে বৈষ্ণবোচিত বিনয়ের ছদ্মবেশে আত্মবিজৃম্ভণ করিতে ছাড়িতেন না। গোবিন্দের মুখে এই সন্ন্যাসের কথা বহুদিন পরে অপর এক প্রসঙ্গে অজ্ঞাতসারে প্রকাশিত হইয়াছিল,—কাঞ্চননগরে পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তনের কথা শুনিয়া তিনি এই বলিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন, "প্রভুর সন্ন্যাসকাল ধরেছি কৌপীন। অহঙ্কার ত্যজিয়া হয়েছি অতি দীন॥ আর ত বাসনা নাই সংসার করিতে।" তাঁহার স্ত্রী যখন মর্ম্মভেদী দুঃখের কথা বলিয়া তাঁহাকে গৃহে ফিরাইতে চাহিয়াছিল, তখন সংসার আবার সুন্দর ও করুণ আহ্বানে তাঁহাকে শৃঙ্খল পরাইতে আসিয়াছে, এই ভয়ে ভীত হইয়া গোবিন্দ ঈশ্বরের শরণ লইয়াছিলেন,—"শুনিয়া তাহার কথা মাথা হেট করি। মনে মনে বলিতে লাগিনু হরি হরি॥ হরি শরণেতে কাটে যতেক বন্ধন। তেকারণে মনে করি হরির চরণ॥"

তাঁহার প্রভুভক্তি।

মিষ্টান্নব্যবসায়ী মিষ্টের স্বাদ ভুলিয়া যায়, কিন্তু তথাপি মিষ্টদ্রব্য লইয়া নাড়াচাড়া না করিয়া থাকিতে পারে না, উহা তাহার জীবিকা ও মুখ্যচিন্তা। চৈতন্যদেবের ভক্তির উচ্ছ্বাস, যাহা দেখিয়া সমস্ত লোক অশ্রুসিক্তি হইয়াছে, যে ভক্তির উচ্ছ্বাস দেখিয়া গোবিন্দ প্রথম দিন বলিয়াছেন,—"ইচ্ছা অশ্রুজলে মুছি পাখালি চরণ॥" সর্ব্বদা সাহচর্য্য-হেতু সেই ভক্তিবিহ্বলতায় গোবিন্দ একান্তরূপ অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন; তাঁহার সম্মুখে এক

প্রবল ভক্তিবন্যায় ধরিত্রী টলমল করিতেছিল, কিন্তু তিনি সর্ব্বদা সে দৃশ্যে উচ্ছ্বসিত হইয়াছেন, এ কথা বলেন নাই। কিন্তু কোন কোন মুহূর্ত্তে স্বর্গীয় ভাবে তাঁহার হৃদয় অভিভূত হইয়া না পড়িয়াছে এমন নহে। অগস্ত্যকুণ্ডতীরে একদিন চৈতন্যপ্রভুর উদ্দামভক্তি দর্শনে গোবিন্দ এই দুইটি ছত্র লিখিয়াছেন—"প্রভুর মুখেতে নাম শুনিয়াছি কত। আজি কিন্তু দেহ মোর হৈল পুলকিত।" নিত্য দেবলীলা দেখিতে দেখিতে তিনি লীলারসের নিত্য নূতন আস্বাদ ভুলিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু তজ্জন্য তাঁহার অন্তর্নিহিত প্রকৃত ভক্তির হ্রাস হয় নাই, যেমন গঙ্গাতীরবাসী লোক মফঃস্বলের লোকের ন্যায় গঙ্গাদর্শনে হঠাৎ আনন্দ বোধ করে না, অথচ গঙ্গাতীর ছাড়িয়া অন্যত্র থাকিতেও পারে না। দুইদিনের জন্য প্রভুসঙ্গবিচ্যুত হওয়ার আক্ষেপে গোবিন্দ "মোর চক্ষে শত ধারা বহিতে লাগিল।"—এইরূপ কাতরতা দেখাইয়াছেন।

গোবিন্দের নৈতিক জীবনটি বড় নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ ছিল, তাহা বাক্যপল্লব পরম্পরায় তিনি নিজে কীর্ত্তন করেন নাই, কিন্তু সহসা দুই একটি বাক্য তাঁহার সমগ্র চরিত্রের উপর এক পবিত্র মধুর আলোকপাত করিয়া দিয়াছে। চৈতন্যদেব দস্যু তস্কর প্রভৃতির নিকট গিয়াছেন, গোবিন্দ বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁহার পশ্চাদগামী হইয়াছেন। চৈতন্য প্রভুর কোন অভিপ্রায়ে তিনি ইঙ্গিতেও বাধা দেন নাই, কিন্তু যেদিন প্রভু মুরারী বেশ্যাদিগের নিকট যাইতে উদ্যত, সেদিন গোবিন্দ একটু আপত্তি করিয়াছিলেন:—"মুহি বলি সে স্থানেতে গিয়া কাজ নাই। না শুনিল মোর বাণী চৈতন্য গোঁসাই।" এই একমাত্র আপত্তি তাঁহার নৈতিক সাবধানতার বিশেষরূপ অভিব্যক্তি বলিয়া গ্রহণ করা যায়।

তাঁহার নৈতিক বিশুদ্ধতা।

গোবিন্দ যে স্থলে চৈতন্যদেবের রূপের বর্ণনা করিতে গিয়াছেন, সেস্থলে তাঁহার হৃদয়ের গাঢ় ভক্তিপ্রণোদিত কবিত্ব উদ্রিক্ত হইয়াছে:—"যদ্যপি দাঁড়ায় প্রভু অন্ধকার ঘরে। শরীরের প্রভায় আঁধার নাশ করে॥" এ সব কথায় একটু কল্পনা না আছে এমন নহে—ইহা স্বাভাবিক; কিন্তু দৈনন্দিন ঘটনা তিনি কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত করেন নাই, সেরূপ অতিরঞ্জন সত্যনিষ্ঠ, বিষয়স্পৃহ ভক্তির অবতার চৈতন্যদেবের অনুচরের অনুপযুক্ত হইত। মহারাষ্ট্র ও তন্নিকটবর্ত্তী অপরাপর দেশীয় লোকের কথা গোবিন্দ বুঝিতে পারেন নাই। বগুলাবনে—"একজন লোক আসি কাইমাই করি। কি বলিল আমি সব বুঝিতে না পারি॥ তার বাক্য বুলি সব প্রভু সমঝিয়া। কাইমাই বলি তারে দিলেন বুঝাইয়া॥" এস্থলে পাঠকের মনে হইতে পারে চৈতন্যপ্রভু স্বর্গীয় শক্তিপ্রভাবে পৃথিবীর যাবতীয় ভাষা বুঝিতে পারিতেন, কিন্তু গোবিন্দ সেরূপ অলৌকিক কল্পনা করিবার আদৌ সুবিধা দেন নাই, কিছু পরেই লিখিয়াছেন:—"এই দেশে ভ্রমি দীর্ঘকাল। সকলের ভাষা বুঝে শচীর দুলাল॥"

তাঁহার সত্যপ্রিয়তা।

চৈতন্য প্রভুর স্বর্গীয় ভক্তিপ্রভাবের আশ্চর্য্য মোহিনীশক্তিতে দস্যু, তস্কর, বেশ্যা উদ্ধার পাই-

য়াছে; যেখানে সে ভক্তির বন্যা প্রবাহিত হইয়াছে, সেস্থান তীর্থধামের তুল্য পবিত্র হইয়াছে; পাষণ্ড-নাস্তিকের মন ফিরিয়া গিয়াছে; কিন্তু দুই এক স্থলে বিষয়বুদ্ধিদুষ্ট, অর্থযৌবনস্পর্দ্ধিত ব্যক্তি সে প্রভাবে ধরা পড়ে নাই। নরসমাজে এমন দুই একজন আছে, সম্যক্ অভিব্যক্ত সাধু-জীবনের সৌন্দর্য্য যাহাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে,—ভগবান্ পশুকে পুষ্পশোভা ও পুষ্পগন্ধ উপভোগ করিতে শক্তি দেন নাই। হাজিপুরে কেশবসামন্ত চৈতন্যপ্রভুকে কটূক্তি করিয়াছিল, কিন্তু চৈতন্যপ্রভু তাহাকে ভক্তি দিতে পারেন নাই। তাঁহার চেষ্টা সেস্থলে বিফল হইয়াছিল, গোবিন্দ তাহা ইঙ্গিতে ব্যক্ত করিয়াছেন, কেশবসামন্তের ব্যবহার দেখিয়া চৈতন্যপ্রভু হাজিপুর ত্যাগ করিলেন:— "নারায়ণগড় পানে চল মোরা যাই। সেই থানে গেলে যদি কোন সুখ পাই॥" এইরূপ ভাবের কথা চৈতন্যপ্রভু সম্বন্ধে অন্য কোন পুস্তকে আছে বলিয়া আমরা জানি না। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও আমরা পুনরায় বলিতেছি, এই সত্যভাষী সেবকের লেখনীতে চৈতন্যদেবের প্রকৃতসৌন্দর্য্য যেরূপ প্রস্ফুট হইয়াছে, অন্যত্র তাহা বিরল।

বহুদিনের কৃচ্ছ্র-সাধনে কৃশশরীর, সমস্ত দাক্ষিণাত্য পর্য্যটনে, উপবাসে ও ভক্তিবিহ্বলতায় ব্যাকুল চৈতন্যদেবের পরিমৃদিত কমলনিভ সুক্ষীণ অথচ মনোহর দেহ-যষ্টিতে ছিন্ন বহির্বাস ও পরিক্ষিপ্ত ধূলিরেণু বিরাজ করিতেছিল এবং তাহা যুগপৎ কারুণ্য ও ভালবাসার পরিক্লিষ্ট লাবণ্যে হেমন্তের পদ্মের শ্রী ধারণ করিয়াছিল,—'ছিন্ন এক বহির্বাস পাগলের বেশ। সদা উনমত্ত প্রভু কৃষ্ণেতে আবেশ॥ সব অঙ্গে ধূলি মাখা মুদিত নয়ন।' এই শ্রীমূর্ত্তি দর্শনলোলুপ সমস্ত বঙ্গদেশ—নবদ্বীপ ও উড়িষ্যার পণ্ডিত ভক্তমণ্ডলী—চিরবিরহক্ষিন্ন হইয়া ব্যাকুলভাবে প্রতীক্ষা করিতেছিল, প্রভু ত তাহাদিগকে স্মরণ করেন নাই, তাহারা প্রভুদর্শন ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্যে জীবন ধারণ করে নাই। এই সুদীর্ঘ দুই বৎসরের মধ্যে চৈতন্য একদিন মাত্র প্রলাপে নরহরির নাম করিয়াছিলেন,—"কখন বলেন এস প্রাণ নরহরি। কৃষ্ণনাম শুণ তোরে আলিঙ্গন করি॥" তাহারা ত দিবারাত্র গৌরনাম লইয়া কাঁদিতেছিল, সঙ্গে যাইতে অনুমতি পায় নাই, কিন্তু সেই স্বর্গীয়সঙ্গের স্মৃতিসুখে তাহারা পার্থিব কষ্ট ভুলিয়াছিল। তিনি দুই বৎসর পরে আসিতেছেন, এই সংবাদ চকিতে বঙ্গদেশময় পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, সেই অসম্ভব সুখাস্বাদন-প্রত্যাশায় প্রত্যেক ভক্তের হৃদয় বিহ্বল হইল; চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণমিলনের পূর্ব্বাভাসমুগ্ধা রাধিকার এই অবস্থা বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন,—"চিকুর ফুরিছে, বসন খসিছে, পুলক যৌবন ভার। বাম অঙ্গ আঁখি সঘনে নাচিছে, দুলিছে হিয়ার হার॥" এই শুভলক্ষণাক্রান্ত মুহূর্ত্ত দীর্ঘকালের পরে ভক্তগণের জীবনে ফিরিয়া আসিল। প্রভুকে তাহারা যে সমারোহপূর্ণ আনন্দোৎসবের সঙ্গে অভ্যর্থনা করিল, তাহা এক অদ্ভুতপূর্ব্ব সুখের চিত্রপটের ন্যায় গোবিন্দদাস আঁকিয়া দেখাইয়াছেন, আমরা সেই অংশটুকু উদ্ধৃত করিলাম:—

পুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন।

"আলালনাথের কাছে প্রভু যবে আসে। গদাধর মুরারি ছুটিয়া আইল পাশে॥ খঞ্জন আচার্য্য আসে গাঢ় অনুরাগে। খোঁড়া বটে তবু আইসে সকলের আগে॥ সার্ব্বভৌম আসে দুই ডঙ্কা বাজাইয়া। নরহরি দেখা দেয় নিশান লইয়া॥ হরিদাস, রামদাস আর কৃষ্ণদাস। ব্যগ্র হইয়া আসে সবে ঘন বহে শ্বাস॥ জগন্নাথ দাস আর দেবকীনন্দন। ছোট হরিদাস আর গায়ক লক্ষ্মণ॥ বিষ্ণুদাস পুরীদাস আর দামোদর। নারায়ণতীর্থ আর দাস গিরিধর॥ গিরি পুরী সরস্বতী অসংখ্য ব্রাহ্মণ। প্রভুরে দেখিতে সবে করে আগমন॥ রামশিঙ্গা বাজাইতে বড়ই পণ্ডিত। বলরামদাস আসে হৈয়া পুলকিত॥ শত শত পণ্ডিত গোঁসাই দেখা দিল। আনন্দে আমার চিত্ত নাচিতে লাগিল॥ কেহ নাচে, কেহ হাসে, কেহ গান গায়॥ এক মুখে সে আনন্দ কহনে না যায়॥ হাজার হাজার লোক প্রভুকে ঘেরিয়া। নাম আরম্ভিলা সবে আনন্দে মাতিয়া॥ মুরারি মুকুন্দে প্রভু কোল দিতে গেলা। হাঁটুর নিকটে গুপ্ত ঢলিয়া পড়িলা॥ সিদ্ধ কৃষ্ণদাস আসি প্রণাম করিল। হাত ধরি তুলি তারে প্রভু আলিঙ্গিল। একত্রে মিলিয়া আর আর ভক্তগণে। প্রভুকে লইতে সবে করে আগমনে॥ মাদল বাজায় যত বৈষ্ণবের দল। আনন্দে করয়ে প্রভুর আঁখি ছল ছল॥ কীর্ত্তন করয়ে যত বৈষ্ণব মিলিয়া। মাথা ঢুলাইয়া নাচে গোরা বিনোদিয়া। খঞ্জনে দেখিয়া প্রভু দিয়া হরি বোল। দুই বাহু পাশরিয়া দিলা তারে কোল॥ নাচিতে লাগিলা গোরা বাহু পশারিয়া। সার্ব্বভৌম-পদতলে পড়িল লুটিয়া॥ হাত জুড়ি সার্ব্বভৌম কহিতে লাগিল। তোমার বিরহ বাণ হৃদয়ে বিন্ধিল॥ বড় মূঢ় বলি তব বিরহ সহিয়া। এত দিন আছি মুহি পরাণ ধরিয়া॥···শ্বেত নীল বিচিত্র পতাকা শত শত। গুড়ু গুড়ু শব্দ করি ডঙ্কা বাজে কত॥ কেহ নাচে কেহ গায় আনন্দে মাতিয়া। একদৃষ্টে কত লোক রহিল চাহিয়া॥ হেলিতে দুলিতে যায় শচীর দুলাল। মধুর মৃদঙ্গ বাজে শুনিতে রসাল॥ হস্ত তুলি নাচিতে লাগিল গদাধর। রঘুনাথ দাস নাচে আর দামোদর॥ প্রভু পুছে রঘুনাথে আদর করিয়া। বড়ই আনন্দ পাই তোমারে দেখিয়া॥ রঘুনাথে কোল দিতে যান গোরা রায়। রঘুনাথ পদতলে পড়িয়া লুটায়। মাঘের তৃতীয় দিনে মোর গোরা রায়॥ সাঙ্গোপাঙ্গ সহ মিলি পুরীতে পৌঁছায়॥ অপরাহ্নে মহাপ্রভু পুরীতে পৌঁছিলা। কোটি কোটি লোক তথা আসি ঝাঁকি দিলা॥ ধূলাপায় প্রভু বহু লোক করি সাথ। হেরিলেন মন্দিরে প্রবেশি জগন্নাথ॥ এক দৃষ্টে মহাবিষ্ণু দেখিতে দেখিতে। দর দর প্রেম-অশ্রু লাগিল বহিতে॥ একেবারে জ্ঞানশূন্য হয়ে গোরা রায়। অমনি আছাড় খাইয়া পড়িল ধরায়॥ ＊＊＊ ধন্য হইলাম আজি এই কথা বলি। আনন্দে সকলে নাচে দিয়া করতালি॥ ＊＊ বড় পটু রামদাস ভেরী বাজাইতে। এই জন্য নিত্য আসে কীর্ত্তনের ভিতে॥ বড় ভক্ত রামদাস প্রেম অনুরাগে। ভেরী বাজাইয়া চলে কীর্ত্তনের আগে॥ আনন্দে প্রতাপরুদ্র ছাড়ি রাজপাট। মিশ্রের ভবনে আসি নিত্য দেখে নাট॥"

গোবিন্দদাসের কড়চায় চৈতন্যদেবের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় উপদেশগুলির মনোহারিত্ব নষ্ট হইয়াছে; অশিক্ষিত ভৃত্য হইতে আমরা তাহা প্রত্যাশা করিতে পারি না। যে উপদেশ শ্রবণে শত শত লোক মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সে উপদেশ গোবিন্দের লেখনীতে ভালরূপ ফোটে নাই। রামানন্দরায়ের সঙ্গে আলাপ ও দাক্ষিণাত্যের বড় বড় পণ্ডিতের সঙ্গে চৈতন্যপ্রভুর বিচার উচ্চ শিক্ষার অভাবে গোবিন্দ লিপিবদ্ধ করিতে পারেন নাই; কৃষ্ণদাস কবিরাজের মত কোন বিজ্ঞব্যক্তি সেই সব স্থলে উপস্থিত থাকিলে উপযুক্ত বিবরণ পাওয়া যাইত।

কড়চায় দোষ।

গোবিন্দদাসের কড়চা পড়িয়া মনে হয়, সেকালেও "অস্ত্রহাতা বেড়ি গড়া" অপেক্ষা কর্ম্মকার-শ্রেণীর মধ্যেও কেহ কেহ উৎকৃষ্টতর ব্যবসায়ের জন্য যোগ্যতা দেখাইতেছেন; সমাজের অস্থায়ী সীমাবন্ধনী কোন কালেই মানব-প্রকৃতির প্রকৃতসীমাবন্ধনী বলিয়া গণ্য হয় নাই। *

নিম্ন শ্রেণীতে শিক্ষা-বিস্তার।

(খ) জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল।

কবি জয়ানন্দ বর্দ্ধমানস্থ আমাইপুরা গ্রাম (বৈষ্ণবাচারদর্পণমতে অম্বিকা) নিবাসী সুবুদ্ধিমিশ্রের পুত্র। চৈতন্য চরিতামৃত, বৈষ্ণবাচারদর্পণ প্রভৃতি পুস্তকে চৈতন্যশাখায় সুবুদ্ধিমিশ্রের নাম উল্লিখিত আছে। কবি যে বংশে জন্মগ্রহণ করেন, সেই বংশের নাম স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের দ্বারা ইতিহাসে উজ্জ্বল রহিয়াছে। কবি—"খুড়া জেঠা পাষণ্ড চৈতন্য অল্প ভক্তি"—বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার আত্মীয়বর্গের মধ্যে বাণীনাথ মিশ্র, মহানন্দ-বিদ্যাভূষণ, ইন্দ্রিয়ানন্দ কবীন্দ্র, বৈষ্ণব মিশ্র এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামানন্দমিশ্রের কথা গর্ব্বের সহিত উল্লেখ করিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই সদ্বিদ্বান্ ও ধার্ম্মিক ছিলেন। সেকালে যিনি যত বেশী

কবির পরিচয়।

* জয়ানন্দকৃত চৈতন্যমঙ্গলের কয়েকখানি প্রাচীন পুঁথি সম্প্রতি সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে মহাপ্রভুর সঙ্গে গোবিন্দ-কর্ম্মকারের পুরীতে যাওয়ার বিষয় উল্লিখিত আছে। সুতরাং যাঁহারা বলিয়াছিলেন গোবিন্দ কর্ম্মকার জাতীয় ছিলেন না, তিনি কায়স্থ ছিলেন, এবং এই মত প্রচার করিয়া প্রকাশিত গোবিন্দদাসের কড়চায় ৫০ পৃষ্ঠা জাল বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন, তাঁহাদের যুক্তি নিতান্ত হীনবল হইয়া পড়িয়াছে। গোবিন্দদাসের কড়চাপ্রকাশক শ্রীযুক্ত জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয় আমাদের নিকট যাহা বলিয়াছেন,—তাহাতে কড়চার আদ্যন্ত খাঁটি জিনিষ বলিয়া আমাদের দৃঢ় ধারণা হইয়াছে। বিরুদ্ধবাদী মহোদয়গণ উক্ত ৫০ পৃষ্ঠা জাল প্রতিপন্ন করিতে যাইয়া যে সকল যুক্তি প্রচার করিয়াছিলেন, এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণের টীকায় (১৯২ পৃঃ) তাহা বিস্তারিত ভাবে খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। জয়ানন্দের পুঁথিতে গোবিন্দ স্পষ্টরূপে কর্ম্মকার বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন,—ইহা আবিষ্কৃত হওয়ার পর আমাদের বিশ্বাস নিঃসংশয়রূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে, সুতরাং সেই সকল যুক্তিতর্কের পুনশ্চ অবতারণা করা প্রয়োজনীয় মনে করিও না। তবে কড়চার ভাষা দৃষ্টে বোধ হয়, কোন কোন স্থলে শব্দাদির সংশোধন হইয়া থাকিবে—কিন্তু নিখুঁত প্রাচীনরচনা এখন কোন পুস্তকেরই নাই;—নকলকারিগণ সকল পুঁথিরই এক আধটু সংশোধন করিয়াছেন, তজ্জন্য এই প্রাচীন-তত্ত্ববহুল উৎকৃষ্ট প্রামাণিক পুস্তক খানিকে আমরা উড়াইয়া দিতে পারি না। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় লিখিয়াছেন, "গোবিন্দদাসের কড়চা নামক যে চৈতন্যজীবনী প্রচলিত আছে তাহা উক্ত গোবিন্দ কর্ম্মকারের রচিত।" (পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩০৪, তৃতীয় সংখ্যা)। এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয় আমার নিকট চিঠিতে লিখিয়াছেন—"গোবিন্দদাসের কড়চায় ৫০ পৃষ্ঠা ব্যাপক জাল বলিয়া আমিও বোধ করি না। কেননা কবি জয়ানন্দও গোবিন্দকে কায়স্থ বলেন নাই, কর্ম্মকারই বলিয়াছেন।" এই গোবিন্দের উল্লেখ বলরাম দাস তৎকৃত একটি পদে করিয়াছেন, গৌরপদতরঙ্গিণী ৪০৪ পৃঃ।

উপবাস করিতে পারিতেন, তিনি সমাজে ততদূর আদরণীয় হইতেন। কৃত্তিবাস—"ভাই মৃত্যুঞ্জয় করে ষড় উপবাস।"—বলিয়া ভ্রাতার উপবাসের বড়াই করিয়াছেন, জয়ানন্দও—'বাণীনাথ মিশ্র ষট্ রাত্রি উপবাসী" —সগর্ব্বে প্রচার করিতে ক্রটী করেন নাই। জয়ানন্দ মাতামহগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। কবির মাতার নাম ছিল রোদনী; তাঁহার ছেলে হইয়া বাঁচিত না, এজন্য জয়ানন্দের নাম রাখা হইয়াছিল 'গুইঞা'। চৈতন্যদেব নীলাচল হইতে বৰ্দ্ধমান ফিরিয়া যাইতে আমাইপুরা গ্রামে শিষ্য সুবুদ্ধি মিশ্রের বাড়ীতে উপস্থিত হন, এবং আমাদের কবির 'গুইঞা' নাম ঘুচাইয়া জয়ানন্দ নাম রাখিয়া যান। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল আবিষ্কৰ্ত্তা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের মতে ১৫১১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫১৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে জয়ানন্দ জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার মন্ত্রগুরু ছিলেন অভিরাম গোস্বামী। নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র ও গদাধর পণ্ডিতের আজ্ঞায় তিনি চৈতন্যমঙ্গল রচনা করেন।

জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গল একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ। কতকগুলি বিষয়ে বৈষ্ণব ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁহার মত প্রচলিত মত হইতে স্বতন্ত্র। প্রচলিত মত জগন্নাথ মিশ্রের পূর্ব্বনিবাসস্থান শ্রীহট্টস্থ ঢাকা দক্ষিণ গ্রাম, কিন্তু আনন্দের মতে উহা শ্রীহট্টস্থ জয়পুর গ্রাম। প্রচলিত মত, হরিদাসঠাকুরের জন্মস্থান বুড়নগ্রাম ("বুড়ন গ্রামেতে অবতীর্ণ হরিদাস"—চৈ, ভা, আদি)। কিন্তু জয়ানন্দের মতে, স্বর্ণনদীতীরস্থ ভাটকলাগাছি গ্রাম। এতদ্ভিন্ন জয়ানন্দ অনেকগুলি অজ্ঞাতপূর্ব্ব ঐতিহাসিকতত্ত্ব উদ্ঘাটন করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে আমরা জানিতে পাই, চৈতন্যদেবের পূর্ব্বপুরুষ উড়িষ্যার অন্তর্গত যাজপুর গ্রামে বাস করিতেন। মহারাজ কপিলেন্দ্রদেবের (ইঁহার উপাধি ছিল রাজা ভ্রমর) ভয়ে তিনি পলাইয়া শ্রীহট্টে আগমন-পূর্ব্বক বাস করেন। চৈতন্যদেবের তিরোধান সম্বন্ধে জয়ানন্দ প্রকৃত তত্ত্ব জ্ঞাপন করিয়াছেন। আষাঢ় মাসে একদা কীৰ্ত্তন করিতে করিতে চৈতন্যদেবের পদ ইষ্টকবিদ্ধ হয়; দুই এক দিনের মধ্যেই বেদনা অত্যন্ত বাড়িয়া যায়, শুক্লপক্ষীয় পঞ্চমীতিথিতে তিনি শয্যাশায়ী হন এবং সপ্তমীতিথিতে ইহলোক ত্যাগ করেন। চৈতন্যদেবের তিরোধানসংক্রান্ত নানারূপ অলৌকিক গল্পে সত্য কাহিনী কুহকাচ্ছন্ন হইয়াছিল,—জয়ানন্দের লেখায় সেই ঘনীভূত তিমিররাশি এখন অন্তর্হিত হইবে। চৈতন্য-দেবের জন্মের অব্যবহিত পূর্ব্বে নবদ্বীপে নানারূপ বিপ্লব উপস্থিত হয়, সে সকল বৃত্তান্ত এই পুস্তক ভিন্ন অন্য কোন প্রাচীন পুস্তকে পাওয়া যায় নাই। নিম্নে সেই প্রসঙ্গের কতক অংশ উদ্ধৃত হইল:—

চৈতন্য-মঙ্গলের ঐতিহাসিক গুরুত্ব।

"আর এক পুত্র হৈলে বিশ্বরূপ নাম। দুর্ভিক্ষ জন্মিল বড় নবদ্বীপ গ্রাম॥ নিরবধি ডাকাচুরি অরিষ্ট দেখিঞা নানাদেশে সর্ব্বলোক গেল পলাইঞা॥ তবে জগন্নাথ মিশ্র দেখিয়া কৌতুকে। বিশ্বরূপ দশকর্ম্ম করি একে একে॥ আচম্বিতে নবদ্বীপে হৈল রাজভয়। ব্রাহ্মণ ধরিঞা রাজা জাতি প্রাণ লয়॥ নবদ্বীপে শঙ্খধ্বনি শুনে যার ঘরে। ধন প্রাণ লয়ে তার জাতি নাশ

করে ॥ কপালে তিলক দেখে যজ্ঞসূত্র কান্ধে। ঘর দ্বার লোটে তার সেই পাশে বান্ধে ॥ দেউলে দেহরা ভাঙ্গে উপাড়ে তুলসী। প্রাণভয়ে স্থির নহে নবদ্বীপবাসী ॥ গঙ্গাস্নান বিরোধিল হাট্ ঘাট যত। অশ্বত্থ পনস বৃক্ষ কাটে শত শত ॥ পিরল্যা গ্রামেতে বৈসে যতেক যবন। উচ্ছন্ন করিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ ॥ ব্রাহ্মণে যবনে বাদ যুগে যুগে আছে। বিষম পিরল্যা গ্রাম নবদ্বীপের কাছে ॥ গৌড়েশ্বর বিদ্যমানে দিল মিথ্যাবাদ। নবদ্বীপ বিপ্র তোমার করিব প্রমাদ। গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হব হেন আছে। নিশ্চিন্তে না থাকিও প্রমাদ হব পাছে ॥ নবদ্বীপে ব্রাহ্মণ অবশ্য হব রাজা। গন্ধর্ব্বে লিখন আছে ধনুর্দ্ধর প্রজা ॥ এই মিথ্যো কথা রাজার মনেতে লাগিল। নদীয়া উচ্ছন্ন কর রাজা আজ্ঞা দিল। বিশারদসুত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য। স্ববংশে উৎকল গেলা ছাড়ি গৌড়রাজ্য ॥ উৎকলে প্রতাপরুদ্র ধনুর্দ্ধর রাজা। রত্ন সিংহাসনে সার্ব্বভৌমে কৈল পূজা ॥ তার ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতি গৌড়ে বসি। বিশারদ নিবাস করিল বারাণসী ॥"

কিন্তু ইহার পর গৌড়েশ্বর নবদ্বীপের প্রতি প্রসন্ন হন, তাঁহার প্রাসাদে ভগ্ন প্রাচীর, দেবমন্দির প্রভৃতির পুনঃসংস্কার হইল। কিন্তু পিরল্যা গ্রামে বসিয়া মুসলমানগণ যে সব ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছিলেন, তাঁহারা জাতিচ্যুত অবস্থায়ই রহিয়া গেলেন। "পানি পিয়ে শেষে জাতি বিচার" আর বৃথা। এই ভাবে নবদ্বীপের দুর্গতির মোচন হইলে চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করেন।

পদকল্পতরু ১৭৮৩ সংখ্যক পদে লোচনদাসের ভণিতাযুক্ত বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর যে বারমাস্যা দৃষ্ট হয়, তাহা জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গলের প্রাচীন পুঁথিতেও পাওয়া যাইতেছে; শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়কে উহা বলাতে তিনি পরিষৎ পত্রিকায় * নানারূপ যুক্তির অবতারণা করিয়া উক্ত কবিতাটী জয়ানন্দের খাতায়ই লেখা সাব্যস্ত করিয়াছেন। আমরা কিন্তু উক্ত পদটীর মধ্যে যেন লোচনদাসের রচনার সুমধুর ঝাঁজ পাইয়াছিলাম; যাহা হউক, উহা জয়ানন্দের রচিত বলিয়া পাঠ করিলে সাহিত্য-সেবীর পক্ষে রসাস্বাদের কোন বৈষম্য ঘটিবে না।

বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা।

সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কে প্রাচীন লেখকগণ কোনরূপ আভাস দিতে এতই কৃপণতা করিয়া গিয়াছেন যে, দৈবক্রমে কোন লেখক যদি এ সম্বন্ধে আমাদিগকে মুষ্টিমেয় তত্ত্বও ভিক্ষা দিয়া গিয়া থাকেন, আমরা তাহাতেই নিরতিশয় পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারি না। জয়ানন্দ নিম্নলিখিত সামান্য বিবরণটী প্রদান করিয়া আমাদিগের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন;—

চৈতন্য অনন্তরূপ অনন্তাবতার। অনন্ত কবীন্দ্র গায় মহিমা জাহার ॥ শ্রীভাগবত কৈল ব্যাস মহাশয়। গুণরাজ খান কৈল শ্রীকৃষ্ণ বিজয় ॥ জয়দেব বিদ্যাপতি আর চণ্ডীদাস। শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র তাঁরা করিল প্রকাশ ॥ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ব্যাস অবতার। চৈতন্যচরিত্র আগে করিল প্রচার ॥ চৈতন্য সহস্র নাম শ্লোক প্রবন্ধে ॥ সার্ব্বভৌম রচনা করিল প্রেমানন্দে ॥

---

* ৪র্থ সংখ্যা, ১৩০৪ সন।

শ্রীপরমানন্দপুরী গোসাঞি মহাশয়ে। সংক্ষেপ করিল তিহ গোবিন্দবিজয়ে॥ আদিখণ্ড মধ্যখণ্ড শেষখণ্ড করি। শ্রীবৃন্দাবনদাস রচিল সর্ব্বোপরি॥ গৌরীদাস পণ্ডিতের কবিত্ব সুশ্রেণী। সঙ্গীত প্রবন্ধে তার পদে পদে ধ্বনি॥ সংক্ষেপে করিলেন তিঁহ পরমানন্দ গুপ্ত। গৌরাঙ্গ-বিজয় গীত শুনিতে অদ্ভুত॥ গোপালবসু করিলেন সঙ্গীত প্রবন্ধে। চৈতন্যমঙ্গল তাঁর চামর বিচ্ছন্দে॥ ইবে শব্দ চামর সঙ্গীত বাদ্যরসে। জয়ানন্দ চৈতন্যমঙ্গল গাএ শেষে॥"

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে নানারূপ ঐতিহাসিকতত্ত্বের নিরবচ্ছিন্ন বর্ণনায় কবিত্বশক্তির ভালরূপ বিকাশ পাইতে পারে নাই, কিন্তু এই সমস্ত চরিতাখ্যানগুলিকে কাব্যের মানদণ্ডে পরিমাণ করা বোধ হয় সমীচীন হইবে না।

জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গলে কড়চা-লেখক গোবিন্দদাস যে কর্ম্মকার ছিলেন, তাহার স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে, একথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

কবির অন্যান্য রচনা।

চৈতন্যমঙ্গল ছাড়া জয়ানন্দ-বিরচিত 'ধ্রুব-চরিত্র' ও 'প্রহ্লাদ-চরিত্র' নামক দুইখানি ছোট কাব্যোপখ্যান পাওয়া গিয়াছে।

(গ) বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত।

বৈষ্ণব সমাজের স্বাতন্ত্র্য।

পরবর্ত্তী চরিত সাহিত্য চৈতন্যদেবের তিরোধানের পরে রচিত। তখন নিম্বকাষ্ঠে গৌরীদাস পণ্ডিত চৈতন্যবিগ্রহ প্রস্তুত করিয়াছেন ও তাঁহাকে সাক্ষাৎ বিষ্ণু প্রতিপন্ন করিয়া পণ্ডিতগণ শ্লোক রচনায় নিযুক্ত হইয়াছেন। ভক্তির যে একটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায় বিশাল হিন্দুসমাজের মধ্যে ধীরে ধীরে নির্ম্মিত হইয়া উহার ক্রোড়ে লুক্কায়িত ছিল, তাহা তখন উক্ত সমাজের সীমা অতিক্রম করিয়া স্বীয় স্বাতন্ত্র্য স্থাপন করিয়াছে। এই বিচ্ছিন্ন নব-উপাদানবিশিষ্ট সম্প্রদায়টির উপর হিন্দুসমাজের বিদ্বেষতরঙ্গ নিয়ত আঘাত করিতেছিল; আত্ম-রক্ষণশীল ক্ষুদ্র সম্প্রদায়টির সুন্দর বিনয়ধর্ম্ম অবিরত সেই কটু লবণাম্বুস্পর্শে ক্রমে ক্রমে একটু কলুষিত হইল।

বৃন্দাবনদাসের পরিচয়।

১৫৩৫ খৃঃ অব্দের বৈশাখ মাসে শ্রীনিবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণীর পুত্র বৃন্দাবনদাস নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন; তাহা হইলে চৈতন্য প্রভুর তিরোধানের দুই বৎসর পূর্ব্বে বৃন্দাবনদাসের আবির্ভাব হয়; তিনি মহাপ্রভুকে দেখেন নাই বলিয়া বারংবার আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন,—"হইল পাপিষ্ঠ জন্ম না হৈল তখন"—(চৈ, ভা, আদি, ১০অঃ ও মধ্য ১ম ও ৮ম অঃ)। বৃন্দাবনদাস দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন, এবং এই দীর্ঘ জীবন তিনি বৈষ্ণবসমাজে পরম আদরে অতিবাহিত করেন, খেতুরির উৎসব উপলক্ষে 'বিজ্ঞবর' বৃন্দাবনদাস উপস্থিত ছিলেন। ১৫৭৩ খৃঃ অব্দে অর্থাৎ মহাপ্রভুর তিরোধানের ৪০ বৎসর পরে 'চৈতন্যভাগবত' ও 'নিত্যানন্দবংশ-

মালা' রচনা করেন।* তিনি নিত্যানন্দের পরম ভক্ত শিষ্য ছিলেন, তাঁহার রচিত দুই পুস্তকেই বিদ্বেষীর প্রতি তীব্র কটাক্ষযুক্ত রোষদীপ্তভাষায় নিত্যানন্দবন্দনা পাওয়া যায়। বর্দ্ধমান জেলায় দেমুড়গ্রামে (মন্ত্রেশ্বর থানা) বৃন্দাবনদাস একটি মন্দির ও বিগ্রহ স্থাপন করেন, উহা 'দেমুড় শ্রীপাঠ' নামে এখনও পরিচিত।

চৈতন্যভাগবতকে শ্রীমদ্ভাগবতের ছাঁচে ফেলিয়া গড়া হইয়াছে। শিশু চৈতন্যপ্রভু অতিথি ব্রাহ্মণের উৎসর্গ করা অন্নাদি উচ্ছিষ্ট করিয়া দিতেছেন,—তাঁহাকে পরক্ষণে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী রূপ দেখাইয়া বিমুগ্ধ করিতেছেন, কখনও শচীমাতাকে বিশ্বরূপ দেখাইতেছেন—তাঁহার পদাঙ্কে ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন ধরা পড়িতেছে—এই কথাগুলি ভাগবতের পুনরাবৃত্তিমাত্র। অতিক্রান্ত শৈশবে চৈতন্যদেব বিদ্যামুগ্ধ যুবক, পরে ভক্তির উজ্জ্বল দেবমূর্ত্তি। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ রাজনীতির ক্ষেত্রে অবতার,—সুতরাং উভয় চরিত্রে ঐক্য অতি অল্প। তথাপি বৃন্দাবনদাস সততই চৈতন্যদেবকে ভাগবতের লীলাদ্বারা আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। চৈতন্যলীলা হইতে শ্রীকৃষ্ণলীলাই তাঁহার কল্পনায় স্পষ্টতররূপে মুদ্রিত ছিল, তাই তিনি শিষ্য-বেষ্টিত চৈতন্যদেবকে—"সনকাদি শিষ্যগণ-বেষ্টিত বদরিকাশ্রমে আসীন"—নারায়ণের সঙ্গে উপমা দিয়াছেন এবং দিগ্বিজয়ীর পরাজয় উপলক্ষে "হৈহয়, বাণ, নহুষ, নরক, রাবণ" প্রভৃতির প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া কল্পিত ঐক্যের কেশ প্রমাণ সূত্র যথাসম্ভব সূক্ষ্মভাবে অনুসরণ করিয়াছেন ও চৈতন্যলীলার সঙ্গে কৃষ্ণলীলার রেখায় রেখায় মিল রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

চৈতন্য ভাগবতে শ্রীমদ্ভাগবতের অনুকরণ।

আধুনিক ইতিহাসের অনেকগুলিই দর্শনের ছাঁচে ঢালা; গুইজো, বাকল্, ফ্রিজওয়েল ইতিহাস হইতে সূত্র সঙ্কলন করার চেষ্টা করিয়াছেন। ঘটনার তালিকা দিলেই ইতিহাস হয় না, কিন্তু জড় জগতের নিয়মগুলির ন্যায় রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্ম্মজীবন হইতেও নিয়ম সঙ্কলন করা ইতিহাসের একটা বিশেষ কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। এই প্রথা সর্ব্বত্রই উৎকৃষ্ট ও নিরাপদ কি না, বলা যায় না; এই ভাবে অনেক লেখক স্বীয় মনঃকল্পিত সূত্রের বর্ণে ঘটনারাশি বিবর্ণ করিয়া ফেলিতে পারেন। বড় বড় লেখকের সম্বন্ধেও এ আশঙ্কা না আছে এমন নহে, কিন্তু তাঁহাদের ঐন্দ্রজালিক লেখার গুণে মিথ্যা-সুন্দরীও অনেক সময়ে সত্যের পোষাকে আসিয়া প্রতারণা করিয়া যায়। বৃন্দাবনদাস

ইতিহাসে বৈজ্ঞানিক প্রণালী।

* এই সকল তারিখ সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দিগ্ধ হইতে পারি নাই। ৺রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মতে ১৫৪৮ খৃঃ অব্দে চৈতন্যভাগবত রচিত হয়। শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী তৎপ্রণীত বঙ্গরত্নে (দ্বিতীয় ভাগ) লিখিয়াছেন চৈতন্যভাগবত ১৫৭৫ খৃঃ অব্দে প্রণীত হয়।

গীতার—"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত"—আদি শ্লোক ও ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের যুগাবতার সম্বন্ধে অপর একটী শ্লোককে সূত্ররূপে ব্যবহার করিয়া চৈতন্য-প্রভুর অবতারের প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়াছেন। সাঙ্গোপাঙ্গের আবির্ভাব ও যুগ-প্রয়োজন বেশ সুন্দরভাবে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। চৈতন্যভাগবতের সুন্দর প্রারম্ভটির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি,—

"কারো জন্ম নবদ্বীপে কারো চাটিগ্রামে। কেহ রাঢ়ে উড্রদেশে শ্রীহট্টে পশ্চিমে॥ নানা স্থানে অবতীর্ণ হইল ভক্তগণ। নবদ্বীপে আসি হইল সবার মিলন॥ নবদ্বীপে হইল প্রভুর অবতার। অতএব নবদ্বীপে মিলন সভার॥ নবদ্বীপ সম গ্রাম ত্রিভুবনে নাঞি। যাঁহা অবতীর্ণ হৈল চৈতন্য গোসাঞি॥ সর্ব্ব বৈষ্ণবের জন্ম নবদ্বীপ গ্রামে। কোন মহাপ্রিয় দাস জন্ম অন্যস্থানে॥ শ্রীবাস পণ্ডিত আর শ্রীরামপণ্ডিত। শ্রীচন্দ্রশেখর দেব ত্রৈলোক্যপূজিত॥ ভবরোগবৈদ্য শ্রীমুরারি নাম যার। শ্রীহট্টে এসব বৈষ্ণবের অবতার॥ পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি বৈষ্ণবপ্রধান। চৈতন্যবল্লভদত্ত বাসুদেব নাম॥ চাটিগ্রামে হৈল ইহা সবার পরকাশ। বূঢ়নে হইলা অবতীর্ণ হরিদাস॥ রাঢ়মাঝে একচাকা নামে আছে গ্রাম। যথা অবতীর্ণ নিত্যানন্দ ভগবান॥ * * * নানা স্থানে অবতীর্ণ হৈল ভক্তগণ। নবদ্বীপে আসি সবে হইল মিলন॥ নবদ্বীপ সম গ্রাম ত্রিভুবনে নাঞি। যথা অবতীর্ণ হৈলা চৈতন্য গোসাঞি॥ অবতরিবেন প্রভু জানিয়া বিধাতা। সকল সম্পূর্ণ করি থুইলেন তথা॥ নবদ্বীপের সম্পত্তি কে বর্ণিবার পারে। এক গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে॥ ত্রিবিধ বৈসে একজাতি লক্ষ লক্ষ। সরস্বতী দৃষ্টিপাতে সবে মহাদক্ষ॥ সবে মহাঅধ্যাপক করি গর্ব্ব ধরে। বালকেহো ভট্টাচার্য্য সনে কক্ষা করে॥ নানাদেশ হৈতে লোক নবদ্বীপে যায়। নবদ্বীপ পড়িলে সে বিদ্যারস পায়। অতএব পড়ুয়ার নাহি সমুচ্চয়। লক্ষ কোটি অধ্যাপক নাহিক নির্ণয়॥ রমাদৃষ্টিপাতে সর্ব্বলোক সুখে বসে। ব্যর্থকাল যায় মাত্র ব্যবহার রসে॥ কৃষ্ণনাম ভক্তিশূন্য সকল সংসার। প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য আচার॥ ধর্ম্ম কর্ম্ম লোক সব এই মাত্র জানে। মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে॥ দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোনজন। পুত্তলি করয় কেহ দিয়া বহুধন। ধন নষ্ট করে পুত্র কন্যার বিভায়ে। এইমত জগতের ব্যর্থকাল যায়ে॥ যে বা ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী মিশ্র সব। তাহারাও না জানয়ে গ্রন্থ অনুভব। শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম্ম করে। শ্রোতার সহিত যমপাশে বান্ধি মরে। না বাখানে যুগধর্ম্ম কৃষ্ণের কীর্ত্তন। দোষ বহি কারো গুণ না করে কথন॥ যেবা সব বিরক্ত তপস্বী অভিমান। তা সভার মুখেহ নাহিক হরিধ্বনি। অতি বড় সুকৃতি যে স্নানের সময়। গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ নাম উচ্চরয়॥ গীতা ভাগবত যে জনাতে পড়ায়। ভক্তির বাখান নাই তাহার জিহ্বায়॥ বলিলেও কেহো নাহি লয় কৃষ্ণ নাম। নিরবধি বিদ্যা কুল করেন ব্যাখ্যান॥ * * * সকল সংসার মত্ত ব্যবহার রসে। কৃষ্ণপূজা কৃষ্ণভক্তি নহি কারো বাসে॥ বাশুলী পূজয়ে কেহো নানা উপহারে। মদ্য মাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে॥ নিরবধি নৃত্য গীত বাদ্য কোলাহলে। না শুনে কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গলে॥ কৃষ্ণশূন্য মণ্ডলে দেহের নাহি সুখ। বিশেষ অদ্বৈত মনে পায় বড় দুঃখ॥ * * * সর্ব্ব নবদ্বীপে ভ্রমে ভাগবতগণ। কোথাহ না শুনে ভক্তিযোগের কথন॥ কেহ দুঃখে চায় নিজ শরীর এড়িতে। কেহ কৃষ্ণ বলি শ্বাস ছাড়য়ে কাঁদিতে॥ অন্ন ভালমতে কার না রুচয়ে মুখে। জগতের ব্যবহার দেখি পায় দুঃখে॥ ছাড়িলেন ভক্তগণ সব উপভোগ। অবতারিবারে প্রভু করিলা উদ্যোগ॥" *

উদ্ধৃত স্থলটি সূত্রাংশে ও ঐতিহাসিক অংশে মন্দ হয় নাই। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি,

* চৈতন্যভাগবত, শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় সম্পাদিত, আদিখণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়, ১৬—১৯ পৃঃ।

সূত্রের পশ্চাতে ধাবিত হওয়া সর্ব্বদা নিরাপদ্ নহে। বৃন্দাবনদাস মধ্যে মধ্যে ভাগবতের সূত্র লইয়া এত বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন যে, তাঁহার চৈতন্যপ্রভুর স্বরূপ দেখার অবকাশ হয় নাই।

চৈতন্যভাগবতে যে অলৌকিক বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে, সেগুলি বৃন্দাবনদাসের উদ্ভাবন শক্তির উপর চাপাইয়া দেওয়া উচিত নহে। তিনি যেরূপ শুনিয়াছেন, সম্ভবতঃ সেই ভাবে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নিজের জন্ম এক অলৌকিক গল্পে জড়িত, সুতরাং অলৌকিকত্বে বিশ্বাস কতকটা তাঁহার প্রকৃতিগত হইয়া পড়িয়াছিল। ঘটনা বিশ্বাস করা বা পরিহার করা পাঠকের ইচ্ছাধীন, কিন্তু আমরা লেখককে কল্পনাশীল অথবা কপট বলিতে অধিকারী নহি।

অলৌকিকত্বে বিশ্বাস।

বৃন্দাবনদাস অবৈষ্ণব সমাজকে লক্ষ্য করিয়া যে কটূক্তি করিয়াছেন, তজ্জন্য সমালোচকগণ এক-বাক্যে তাঁহাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছেন। রুচি সকল সময় একরূপ থাকে না; সে কালের কটূক্তি পল্লীগ্রামের কৃষকের নাতিসূক্ষ্ম হলের ন্যায় অমার্জ্জিত অপভাষার কথায় প্রকাশ পাইত। সভ্যতার দোকানে অন্যান্য অস্ত্রের ন্যায় বিদ্বেষসূচক কথাগুলিও মার্জ্জিত এবং তীক্ষ্ণ করা হইয়াছে; কটূক্তি করিবার জন্য এই সব তীক্ষ্ণ অস্ত্র বৃন্দাবনদাসের আয়ত্ত ছিল না, সুতরাং তিনি রাগের বশে অসংযতবাক্ দুর্দ্দান্ত একটি শিশুর ন্যায় খোলাখুলি ইতর ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু বৃন্দাবনদাসের সেই অসহিষ্ণু ও উগ্র রচনায় আমরা এক পক্ষের ক্রোধ চিত্রিত দেখিতেছি মাত্র; উদ্দিষ্ট ব্যক্তিগণ এখন সম্পূর্ণভাবে যবনিকার পশ্চাৎভাগে, তথাপি বৈষ্ণব-সাহিত্য হইতে তাঁহাদের ভীষণ বিদ্বেষের কিছু কিছু পরিচয় না পাওয়া যায়, এমন নহে; চৈতন্যভাগবতে ইহাদের উপহাস ও বিদ্বেষের কথা অনেক স্থলে উল্লিখিত আছে। ভক্তিরত্নাকরে দেখিতে পাই, সংকীর্ত্তনকারিগণ এক রাত্রেই মরিয়া যায়, এজন্য বৈষ্ণবদ্বেষী সম্প্রদায় কালীমন্দিরে যাইয়া মানসিক করিতেছে ও নরোত্তমদাসের শবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া করতালি দিয়া ব্যঙ্গ করিতেছে। ইহারা চৈতন্যদাসের দারিদ্র্য ও পুত্রহীনতা বিষ্ণুভক্তির ফল বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছিল এবং "ইন্দ্রনমালা বলয়িত বাহু। পরধনহরণে সাক্ষাৎ রাহু। * * ভজনে বীর। কীর্ত্তনে পতনে মল্লশরীর।" প্রভৃতি তীব্র নিন্দাযুক্ত শ্লোক রচনা করিয়াছিল। ইহা ছাড়াও বৃন্দাবনদাসের ক্রোধের গুরুতর কারণ বর্ত্তমান ছিল বলিয়া বোধ হয়। সম্ভবতঃ তাঁহার জন্ম লইয়া ইতরভাবের পরিহাস চলিতেছিল! চৈতন্যভাগবতে এক স্থলে তাহার আভাস আছে,—"চৈতন্যের অবশেষ পাত্র নারায়ণী। যারে আজ্ঞা করে ঠাকুর চৈতন্য। সেই আসি অবিলম্বে হয় উপসন্ন। এসব বচনে যার নাহিক প্রতীত। সত্য অধঃপাত তার জানিহ নিশ্চিত।"—চৈ, ভা, মধ্য। বৈষ্ণবগণ বিনয়ের আদর্শ; "মৃদুনি কুসুমাদপি" তাঁহাদেরই জীবনে প্রমাণিত। সমুচিত উত্তেজনার কারণ না থাকিলে তাঁহাদের বিনয় ভঙ্গ হয় নাই। পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্মসম্প্রদায় প্রথম

ক্রোধের কারণ।



অদ্বৈত হরিদাস

উত্থমকালে অত্যধিক নিপীড়ন নিবন্ধন অবশেষে মানবজাতির জন্য অঙ্গীকৃত প্রীতি-ফুল ভাঙ্গিয়া শূল প্রস্তুত করিয়াছেন; মানুষ-রক্তে পৃথিবী রঞ্জিত হইয়াছে। বৈষ্ণবগণ অত্যাচার সহ্য করিয়া যদি লেখনীমুখে মাত্র কিঞ্চিৎ ক্রোধের পরিচয় দিয়া থাকেন, তাহা অমার্জ্জনীয় নহে।

বৃন্দাবনদাস ৩৮ বৎসর বয়সে ভাগবত রচনা করেন। এই বয়সে তাঁহার বিরাট ঘটনা রাশি আয়ত্ত করিয়া নিয়ন্ত্রিত করার ক্ষমতা জন্মিয়াছিল; তাঁহার রচনায় তরুণ বয়সোচিত কিছু কিছু দোষ আছে সত্য, কিন্তু নানা কারণে আমরা চৈতন্য ভাগবতকে বঙ্গ-ভাষার একখানা শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলিয়া মনে করি। বঙ্গদেশের যে কোন বিষয় লইয়া প্রাচীন ইতিহাস রচনার প্রয়োজন হইবে, চৈতন্য-ভাগবত হইতে ন্যূনাধিক পরিমাণে তজ্জন্য উপকরণ সংগ্রহ করা আবশ্যক হইবে। চৈতন্যভাগবতের মূল বিষয় বর্ণনা হইতেও প্রাসঙ্গিক আলোচনা বেশী প্রয়োজনীয়। প্রসঙ্গক্রমে ইতস্ততঃ নানা বিষয় সম্বন্ধে এমন কি বৈষ্ণবদ্বেষী সমাজ সম্বন্ধেও যে সব কথা উল্লিখিত আছে, তাহা কুড়াইয়া লইলে বঙ্গদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও লৌকিক ইতিহাসের এক এক খানা মূল্যবান পৃষ্ঠা সংগৃহীত হইবে। ভক্তিমান পাঠক বিনয়সহকারে চৈতন্যভাগবত পুনঃ পুনঃ পাঠ করিলে নয়নাশ্রুর মধ্য দিয়া ইহার এক সুন্দর রূপ দেখিতে পাইবেন; কঠোর এবং অমার্জ্জিত ভাষার উত্তেজনার মধ্যে মধ্যে চৈতন্যপ্রভুর যে মূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছে, তাহার বর্ণক্ষেপ প্রবীণ চিত্রকরের উপযুক্ত,—তাহা প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় স্থায়ী ও ছবির ন্যায় উজ্জ্বল; দৃষ্টান্তস্থলে, আমাদের অনুরোধ—চৈতন্যপ্রভুর গয়াগমন ও প্রত্যাগমনের বৃত্তান্তটি বারংবার পাঠ করুন।

চৈতন্য ভাগবতের ঐতি-হাসিক মূল্য।

চৈতন্যভাগবত তিন খণ্ডে বিভক্ত। আদিখণ্ডে গৌরপ্রভুর গয়াগমন পর্য্যন্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। মধ্যখণ্ডে প্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণ পর্য্যন্ত ও অন্ত্যখণ্ডে শেষলীলা বর্ণিত হইয়াছে। আদিখণ্ড পঞ্চদশ অধ্যায়ে, মধ্যমখণ্ড ষড়্‌বিংশ অধ্যায়ে ও শেষখণ্ড মাত্র অষ্টম অধ্যায়ে পরিসমাপ্ত। শেষখণ্ডের এই অসম্পূর্ণতা পরসময়ে অন্য একজন শ্রেষ্ঠ লেখককে চৈতন্য-জীবন-বর্ণনায় প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল। চৈতন্য-প্রভুর দিব্যোন্মাদ অবস্থা কৃষ্ণদাস কবিরাজের নিপুণ লেখনীতে দর্শনাত্মক সৌন্দর্য্যে জড়িত হইয়াছে, আমরা যথাসময়ে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিব। চৈতন্যভাগবত বৈষ্ণবসমাজের বিশেষ আদরের দ্রব্য, এ আদর ভেকধারী বৈষ্ণব অপাত্রে প্রয়োগ করেন নাই; কৃষ্ণদাস কবিরাজ স্বয়ং সর্ব্বদা বৃন্দাবনদাসকে 'চৈতন্যলীলার ব্যাস' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 'চৈতন্যভাগবত' ও 'নিত্যানন্দ-বংশমালা' ব্যতীত বৃন্দাবনদাস বহুসংখ্যক পদ রচনা করেন, সেগুলি পদকল্পতরু প্রভৃতি সংগ্রহপুস্তকে পাওয়া যায়।

(ঘ) লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল।

লোচনদাস ১৪৪৫ শকে (১৫২৩ খৃঃ অব্দে) বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন; ইঁহার পূর্ণ নাম ত্রিলোচন দাস; বাড়ী কোগ্রাম, বর্দ্ধমানের ১৫ ক্রোশ উত্তরে,—গুস্করা ষ্টেসন হইতে ৫ ক্রোশ দূরে। দুর্লভসার ও চৈতন্যমঙ্গলের ভূমিকায় তিনি এইরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছেন :—

কবির পরিচয়।

"বৈদ্যকুলে জন্ম মোর কোগ্রামে বাস। মাতা সতী শুদ্ধমতি সদানন্দী তাঁর নাম। যাঁহার উদরে জন্মি করি কৃষ্ণ নাম॥ কমলাকর দাস মোর পিতা জন্মদাতা। শ্রীনরহরিদাস মোর প্রেমভক্তিদাতা॥ মাতৃকুল পিতৃকুল হয় এক গ্রামে। ধন্য মাতামহী সে অভয়াদেবী নামে॥ মাতামহের নাম শ্রীপুরুষোত্তম গুপ্ত। সর্ব্ব তীর্থ পূত তিঁহ তপস্যায় তৃপ্ত॥ মাতৃকুলে পিতৃকুলে আমি একমাত্র। সহোদর নাই মোর মাতামহের পুত্র॥ যথা যাই তথাই দুলিল করে মোরে। দুলিল দেখিয়া কেহ পড়াইতে নারে॥ মারিয়া ধরিয়া মোরে শিখাল আখর। ধন্য সে পুরুষোত্তম চরিত তাহার॥"

চৈতন্যমঙ্গল ব্যতীত লোচনদাস 'দুর্লভ সার' এবং 'আনন্দলতিকা' নামক আর দুইখানি বড় গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। চৈতন্যমঙ্গলই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। কথিত আছে যে তিনি ১৫৭৫ খৃঃ অব্দে তাঁহার গুরু নরহরি সরকারের আদেশে এই গ্রন্থ রচনা করেন, তখন তাঁহার বয়স ৫২ বৎসর। যিনি "আহ্লাদে ছেলে" বলিয়া সম্ভবতঃ বিশেষ প্রহার সহ্য করিয়া বাল্যাতিক্রান্তে অক্ষর চিনিয়াছিলেন, তিনি প্রৌঢ় বয়সে চৈতন্যমঙ্গল রচনা করিয়া বুঝাইয়াছিলেন, কোনও কোনও পুষ্প ফুটিতে দীর্ঘ সময় লাগিলেও তাহা সুরভিতে ন্যূন নহে। বৈষ্ণবসমাজে এ পুস্তকখানি বিশেষ আদৃত, কিন্তু চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃতের ন্যায় প্রামাণিক বলিয়া গণ্য নহে।

চৈতন্য মঙ্গল।

কথিত আছে, কোন ঘটনাবশতঃ লোচনদাস তাঁহার স্ত্রীর সহিত দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করেন, এ সম্বন্ধে গৌরভূষণ অচ্যুতচরণ চৌধুরী মহাশয় বলেন,—"গৌরভক্তগণের প্রভাব এই রূপই। ইন্দ্রিয় তাঁহাদের কাছে দন্তোৎপাটিত সর্পের ন্যায় খেলার বস্তু; দেখিতে সুন্দর, কিন্তু দংশনের ক্ষমতা রহিত।"

চৈতন্যভাগবত প্রথমতঃ 'চৈতন্যমঙ্গল' নামেই অভিহিত ছিল, কৃষ্ণদাস চৈতন্য ভাগবতকে 'চৈতন্যমঙ্গল' নামেই উল্লেখ করিয়াছেন। কথিত আছে, লোচনদাসের গ্রন্থের নাম 'চৈতন্যমঙ্গল' রাখাতে বৃন্দাবনদাসের সঙ্গে তাঁহার বিরোধ ঘটে; বৃন্দাবনদাসের মাতা নারায়ণীদেবী বৃন্দাবনদাসের পুস্তকের নামের 'মঙ্গল' শব্দ উঠাইয়া তৎস্থলে 'ভাগবত' করেন; এইভাবে দুই কবির বিবাদের মীমাংসা হয়। চৈতন্যমঙ্গলে "বৃন্দাবনদাস বন্দিব এক চিতে, জগৎ মোহিত যার ভাগবত-গীতে"—এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়। সুতরাং উক্তপ্রবাদ কতদূর সত্য, বলিতে পারি না। কিন্তু আমরা অন্য সূত্রে জানিতে

ভাগবত ও মঙ্গল নাম লইয়া বিরোধ।



উদ্ধারণ দত্তের প্রতিমূর্ত্তি।

৩২৬ ঃপৃ

পারিয়াছি, ভাগবতের সঙ্গে ঐক্য রাখিয়া বই লেখার দরুণ বৃন্দাবনের গোস্বামীরা উহার নাম "চৈতন্যভাগবত" দিয়াছিলেন।

কল্পিত ঘটনা।

চৈতন্য-প্রভুর তিরোধানের পর তাঁহার জীবন সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক উপাখ্যান প্রচলিত হইয়াছিল। বৃন্দাবনদাস লেখনী দ্বারা ঘটনারাশি আয়ত্ত করিতে জানিতেন; তাঁহার বর্ণিত ঘটনার সুবিস্তার সমতটক্ষেত্রে মধ্যে মধ্যে অলৌকিক গল্পের উপলখণ্ড বাছিয়া ফেলিয়া পাঠক সত্যের পথ পরিষ্কার রাখিতে পারেন। কিন্তু লোচনদাসের পুস্তক অন্যরূপ। চৈতন্য-প্রভু সম্বন্ধে অলৌকিক গল্পগুলি তাঁহার কল্পনার চক্ষু হরিদ্রাভ করিয়া দিয়াছিল, তিনি ঘটনা, প্রকৃতবর্ণে ফলাইতে পারেন নাই; তাঁহার পুস্তক হইতে গল্পাংশ ছাঁকিয়া ফেলিয়া নির্ম্মল সত্যাংশ গ্রহণ করা একরূপ অসম্ভব। তাঁহার পুস্তক ইতিহাসের মলাট দেওয়া খাঁটি কল্পনার দ্রব্য।

অবতারবাদের ব্যাখ্যা।

বৃন্দাবনদাস যুগাবতারের আবশ্যকতা কেমন সুন্দরভাবে দেখাইয়া চৈতন্যদেবের আবির্ভাব নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা আমরা দেখাইয়াছি। কিন্তু লোচনদাস গোলোকধামে রুক্মিণী ও শ্রীকৃষ্ণের কল্পিত কথোপকথন অবলম্বন করিয়া চৈতন্যদেবের আবির্ভাব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। চৈতন্যমঙ্গলের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত কেবল দেব-লীলা; মানুষী মহিমার শ্রেষ্ঠত্বই যে প্রকৃত দেবত্ব, লোচনদাস তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। চৈতন্যমঙ্গলে উপাখ্যানরাশির নিবিড় মেঘরাশি ভেদ করিয়া কচিৎ চৈতন্যদেবের নির্ম্মল দেব-হাস্য-টুকুর বিকাশ হয়, কিন্তু তাহা পরক্ষণে দৈব ঘটনার আঁধারে লীন হইয়া যায়। সে ছবির প্রতি ভালবাসা আকৃষ্ট হওয়া মাত্র অলৌকিক ঘটনারাশির নিবিড় অরণ্যে মন বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, এবং পথহারা পান্থের ন্যায় একটু স্বাভাবিক পথে বহির্গত হইবার জন্য অবকাশ চায়।

প্রামাণ্য নহে।

চৈতন্যজীবন সম্বন্ধে চৈতন্যমঙ্গলকে আমরা প্রামাণ্যগ্রন্থ মনে করি না এবং বৈষ্ণবসমাজও সদ্বিবেচনার সহিতই ইহার স্থান চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃতের নিম্নে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। চৈতন্যচরিতামৃত-লেখক বহুবার শ্রদ্ধার সহিত চৈতন্যভাগবতের উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু চৈতন্যমঙ্গলের সেরূপ করেন নাই। ভক্তিরত্নাকরে নরহরিচক্রবর্ত্তী চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃত হইতে বহুসংখ্যক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, কিন্তু চৈতন্যমঙ্গলের উল্লেখ করেন নাই।

লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলের ঐতিহাসিক মূল্য সামান্য হইলেও, অন্যদিক্ দিয়া ইহার গৌরব আছে। ৩০০ বৎসর কাল যাহা লুপ্ত হয় নাই, সে সামগ্রীর অবশ্যই আয়ুবল স্বীকার করিতে হইবে। চৈতন্যমঙ্গলের রচনা বড় সুন্দর। লোচনদাসের লেখনী ইতিহাস লিখিতে অগ্রসর

হইয়াছিল, কিন্তু তাহার গতি কবিত্বের পুষ্পপল্লবে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহা সত্যের পথে ধাবিত হইয়া করুণ ও আদিরসের কুঞ্জে পড়িয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে;

কবিত্ব।

বৃন্দাবনদাসের সাদাসিধা রচনায় কিংবা কৃষ্ণদাস কবিরাজের নানাভাষা-মিশ্রিত জটিল লেখায় কবিত্বের সুরভি নাই। এই দুই পুস্তক ইতিহাসের নিবিড় বন, প্রত্নতত্ত্ববিৎ ও বৈষ্ণব ভিন্ন অপর কেহ ধৈর্য্যসহ এই ঘোর অরণ্য-পর্য্যটনশ্রম স্বীকার করিবেন না, কিন্তু লোচনের চৈতন্যমঙ্গলের অনেক স্থলে কবিত্বের সৌন্দর্য্য আছে; ইতিহাসের রেখাঙ্কিত প্রস্তরখণ্ডের নিষ্ফল খোঁজে পাঠক বিরক্ত হইলে পথে পথে কল্পনাবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাধবী ও কুন্দকুসুম কথঞ্চিৎ পরিমাণে তাঁহার শ্রম অপনোদনে সাহায্য করিবে। চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসগ্রহণসংবাদে শোক-বিধুরা বিষ্ণু-প্রিয়ার রূপ এইভাবে অঙ্কিত হইয়াছে;—

"চরণ কমল পাশে, নিশ্বাস ছাড়িয়া বৈসে, নেহারয়ে কাতর নয়ানে। হিয়ার উপরে থুইয়া, বান্ধে ভুজ-লতা দিয়া, প্রিয় প্রাণনাথের চরণে॥ দুনয়নে বহে নীর, ভিজিল হিয়ার চীর, বুকে বহিয়া পড়ে ধার। চেতন পাইয়া চিতে, উঠে প্রভু আচম্বিতে, বিষ্ণুপ্রিয়া পুছে আরবার॥ মোর প্রাণপ্রিয়া তুমি, কাঁদ কি কারণে জানি, কহ কহ ইহার উত্তর। থুইয়া হিয়ার পরে, চিবুক দক্ষিণ করে, পুছে বাণী মধুর অক্ষর॥ কাঁদে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া, শুনিতে বিদরে হিয়া, পুছিতে না কহে কিছু বাণী। অন্তরে দগধে প্রাণ, দেহে নাই সম্বিধান, নয়নে ঝরয়ে মাত্র পানি॥ পুনঃ পুনঃ পুছে প্রভু, সম্বরিতে নারে তবু, কাঁদে মাত্র চরণ ধরিয়া। প্রভু সর্ব্ব কলা জানে, কহে বিষ্ণুপ্রিয়া স্থানে, অঙ্গবাসে বদন মুছিয়া॥ নানারূপে কথাভাব, কহিয়া বাড়ায় ভাব, যে কথায় পাষাণ মুঞ্জরে। প্রভুর ব্যগ্রতা দেখি, বিষ্ণুপ্রিয়া চাঁদমুখী, কহে কিছু গদ গদ স্বরে॥ শুন শুন প্রাণনাথ, মোর শিরে দেহ হাত, সন্ন্যাস করিবে নাকি তুমি। লোকমুখে শুনি ইহা, বিদরিয়া যায় হিয়া, আগুনেতে প্রবেশিব আমি॥ তো লাগি জীবন ধন, এ রূপ যৌবন, বেশ লীলা রসকলা। তুমি যদি ছাড়ি যাবে, কি কাজ এ ছার জীবে, হিয়া পোড়ে যেন বিষ জ্বালা। আমা হেন ভাগ্যবতী, নাহি হেন যুবতী, তুমি হেন মোর প্রাণনাথ। বড় আশা ছিল মনে, এ নব যৌবনে, প্রাণনাথ দিব তোমা হাতে॥ ধিক রহু মোর দেহে, এক নিবেদন তোহে, কেমনে হাঁটিয়া যাবে পথে। গহন কণ্টক বনে, কোথা যাবে কার সনে, কেবা তব যাবে সাথে॥ শিরীষকুসুম যেন, সুকোমল চরণ তেন পরশিতে মনে লাগে ভয়। ভূমেতে দাঁড়াও যবে, প্রাণে মোর লয় তবে, হেলিয়া পড়এ পাছে গাএ॥ অরণ্য কণ্টক বনে, কোথা যাবে কোন স্থানে, কেমনে হাঁটিবে রাঙ্গা পায়। সুধময় মুখ ইন্দু, তাহে ঘর্ম্ম বিন্দু বিন্দু, অল্প আয়াসে মাত্র দেখি। বরিষা বাদল ধারা, ক্ষণে জল ক্ষণে খরা, সন্ন্যাস করনে বড় দুঃখী॥ তোমার চরণ বিনি, আর কিছু নাহি জানি, আমারে ফেলাহ কার ঠাঁই॥ * * * কি কহিব মুই ছার, আমি তোমার সংসার, সন্ন্যাস করিবে মোর তরে। তোমার নিছনি লইয়া, মরি যাব বিষ খাইয়া, সুখে তুমি বঞ্চ এই ঘরে॥"—চৈ, ম, হস্তলিখিত পুঁথি।—যে কথার যাদুমন্ত্রে পাষাণ জাগিয়া উঠে ও মঞ্জুরিত হয়, চৈতন্যের সেই বাক্‌ছলা ও বিষ্ণুপ্রিয়ার শোক অপনোদন করিতে পারে নাই। "তুমি সংসার ত্যাগ করিবে," সংসার অর্থ তো স্ত্রী, আমার জন্য বাড়ী ঘর কেন ছাড়িবে? "তোমায় নিছনি লৈয়া মরি যাব বিষ খাইয়া—সুখে তুমি বঞ্চ এই ঘরে।" চৈতন্য মঙ্গলের এই সকল গান করুণ রসের নির্ঝর। বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসের প্রাক্কালে এই দাম্পত্য-লীলা শ্রুতি

সুখকর হইলেও সর্ব্বৈব মিথ্যা। সন্ন্যাসের পূর্ব্ব রাত্রে তিনি বিষ্ণুপ্রিয়ার ঘরে ছিলেন না, তখন তিনি মহাভাবাবিষ্ট, প্রেমোন্মাদ—বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রেম তখন তাঁহার মনের গণ্ডীর বহু দূরে।

কোগ্রামের নিকটবর্ত্তী কাঁকড়া গ্রামের (গুস্করা ষ্টেশনের নিকট) বিখ্যাত চৈতন্যমঙ্গলগায়ক প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে লোচনের স্বহস্তলিখিত চৈতন্যমঙ্গল আছে। প্রাণকৃষ্ণ বলেন, "লোচনের আঁখর উঠানযোড়া কএর মত।" লোচন যে প্রস্তরখণ্ডের উপর বসিয়া চৈতন্যমঙ্গল লিখেন, তাহা এখনও আছে।

লোচনের হস্তলিপি।

চৈতন্যমঙ্গলও তিন খণ্ডে বিভক্ত, কিন্তু ইহা চৈতন্যভাগবত হইতে অনেক ছোট, চৈতন্যভাগবতের অর্দ্ধাংশের তুল্য হইবে। লোচনদাস ১৫৮৯ খৃঃ অব্দে ৬৬ বৎসর বয়সে তিরোহিত হন। চৈতন্যমঙ্গল ভিন্ন ইঁহার 'দুর্ল্লভসার' নামক অপর একখানি পুস্তক আছে; তাহাতে দেহতত্ত্ব সম্বন্ধে সহজিয়া ধরণের অনেক কথা আছে। এতদ্ব্যতীত লোচনদাস বহুসংখ্যক সুমিষ্ট পদ রচনা করেন।

অন্যান্য রচনা।

এস্থলে বলা আবশ্যক, বটতলার ছাপা চৈতন্যমঙ্গল নিতান্ত অসম্পূর্ণ; উহাতে আত্মপরিচয়টি নাই, এবং তদ্ভিন্ন অন্যান্য কতকগুলি স্থানও বর্জ্জিত হইয়াছে। মহাপ্রভুর তিরোধান সম্বন্ধে হস্ত-লিখিত পুস্তকে এই বিবরণটি পাওয়া যায়, তাহা বটতলার ছাপা পুস্তকে নাই। বঙ্গবাসীর সংস্করণেও আছে।

মুদ্রিত চৈতন্যমঙ্গল অসম্পূর্ণ।

"বৃন্দাবন কথা কহে ব্যথিত অন্তরে। সম্ভ্রমে উঠিয়া প্রভু জগন্নাথ দেখিবারে॥ ক্রমে ক্রমে গিয়া উত্তরিলা সিংহ দ্বারে সঙ্গে নিজ জন যত তেমনি চলিল। সত্বরে চলিয়া গেল মন্দির ভিতরে॥ নিরখে বদন প্রভু, দেখিতে না পায়। সেইখানে মনে প্রভু চিন্তিলা উপায়॥ তখনে দুয়ারে নিজ লাগিলা কপাট। সত্বরে চলিয়া গেল অন্তরে উচাট॥ আষাঢ় মাসের তিথি সপ্তমী দিবসে। নিবেদন করে প্রভু ছাড়িয়া নিশ্বাসে॥ সত্য ত্রেতা দ্বাপর সে কলিযুগ আর। বিশেষতঃ কলিযুগে সংকীর্ত্তন সার॥ কৃপা কর জগন্নাথ পতিতপাবন। কলিযুগ আইল এই দেহত শরণ॥ এ বোল বলিয়া সেই ত্রিজগতরায়। বাহু ভিড়ি আলিঙ্গন তুলিল হিয়ায়॥ তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে। জগন্নাথে লীন প্রভু হইলা আপনে॥ গুঞ্জা-বাড়ীতে ছিল পাণ্ডা যে ব্রাহ্মণ। দেখিয়া সে কি কি বলি আইল তখন। বিপ্রে দেখি ভক্ত কহে শুনহ পড়িছা॥ ঘুচাহ কপাট প্রভু দেখি বড় ইচ্ছা॥ ভক্তআর্ত্তি দেখি পড়িছা কহয় তখন। গুঞ্জা বাড়ীর মধ্যে প্রভুর হৈল অদর্শন॥ সাক্ষাৎ দেখিল গৌর প্রভুর মিলন। নিশ্চয় করিয়া কহি শুন সর্ব্বজন॥ এ বোল শুনিয়া ভক্ত করে হাহাকার। শ্রীমুখ চন্দ্রিমা প্রভুর না দেখিব আর॥"

এই বিবরণের সঙ্গে ভক্তিরত্নাকরে প্রদত্ত বিবরণের ঐক্য নাই।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য-চরিতামৃত।

চৈতন্য-চরিতামৃত-রচক কৃষ্ণদাস কবিরাজ সম্ভবতঃ ১৫১৭ খৃঃ অব্দে বর্দ্ধমান জেলার ঝামটপুর গ্রামে বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন।* তাঁহার পিতা ভগীরথ সামান্য চিকিৎসা ব্যবসায় দ্বারা পরিবার ভরণপোষণ করিতেন; কৃষ্ণদাসের যখন ৬ বৎসর বয়ঃক্রম তখন তাঁহার পিতার কাল হয়, কৃষ্ণদাসের কনিষ্ঠ শ্যামদাস তখন ৪ বৎসরের শিশু। এই দুই শিশুপুত্র লইয়া মাতা সুনন্দার বড় ভাবিতে হয় নাই, তিনিও স্বামীর মৃত্যুর কিছুদিন পরেই কালগ্রাসে পতিত হন। কৃষ্ণদাস ও শ্যামদাস তাঁহাদের পিসিমাতার গৃহে পালিত হন।

কৃষ্ণদাসের পরিচয়।

কৃষ্ণদাস শৈশব হইতেই কষ্টে অভ্যস্ত; কিন্তু একদিন ব্যতীত কষ্ট তাঁহাকে কখনই অভিভূত করিতে পারে নাই, সে দিন—জীবনের শেষ দিন; সে বড় শোচনীয় কথা, পরে বলিব। বালক কৃষ্ণদাস লিখিতে পড়িতে শিখিলেন, কিছু সংস্কৃত পড়িলেন। জীবনে ভাগ্যের হাসিমুখ দেখেন নাই; প্রকৃতি তাঁহাকে বিমাতার চক্ষে দেখিয়াছিলেন, ধাত্রীক্রোড়ে পালিত শিশুর ন্যায় তিনি প্রকৃতির অনাবৃত আঙ্গিনায় উপেক্ষিত ছিলেন; কিন্তু সংযত-চিত্ত কৃষ্ণদাস সংসারের ভোগ-সুখ তাচ্ছিল্যের সহিত উপেক্ষা করিলেন; তিনি দারপরিগ্রহ করেন নাই।

একদিন নিত্যানন্দপ্রভুর সুবিখ্যাত ভৃত্য 'মীনকেতন' রামদাস ঝামটপুরে আগমন করেন; আজন্মদুঃখী কৃষ্ণদাস বৈষ্ণবপ্রভাবে মুগ্ধ হইলেন, ইহসংসার হইতে এক উৎকৃষ্ট সংসারের চিত্র তাঁহার চক্ষে পড়িল; শ্যামদাসের চপল বাগ্বিতণ্ডায় যখন একটু ক্ষুব্ধ হইয়া চিন্তা করিতেছিলেন তখন নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহাকে বৃন্দাবন যাইতে স্বপ্নাদেশ করিলেন; নিঃসম্বল কৃষ্ণদাস ভিক্ষাবৃত্তিদ্বারা পাথেয় নির্ব্বাহ করিয়া তথায় উপনীত হন। যমুনার মৃদু তরঙ্গ-নাদিত নীপতরুবহুল সিকতাভূমি, শ্যামতমালাবৃতকুঞ্জ বৈষ্ণবের চিত্তে নানা উৎসে ভক্তির কথা সঞ্চারিত করে। কৃষ্ণদাস সংসারে প্রবেশ করেন নাই, তাঁহার চিত্ত নির্ম্মল,—শুভ্রপুষ্পসম; সুতরাং যখন তিনি সনাতন, রূপ, জীব, রঘুনাথদাস, গোপালভট্ট প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যের নিকট ভাগবতাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন, তখন সেই নির্ম্মল চিত্তে ভক্তির কথা অতি সরসভাবে চিরদিনের জন্য অঙ্কিত হইয়া গেল। এই সময়ে তিনি সংস্কৃতে "গোবিন্দলীলামৃত" ও কৃষ্ণকর্ণামৃতের টিপ্পনী" প্রণয়ন করেন। তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য কৃষ্ণকর্ণামৃতের টীকায় ও কবিত্বশক্তি গোবিন্দলীলামৃতে বৈষ্ণবসমাজে বিদিত

---

* মুকুন্দদেব গোস্বামী নামক কৃষ্ণদাস কবিরাজের একজন শিষ্য তৎকৃত "আনন্দ রত্নাবলী" নামক পুস্তকে কৃষ্ণদাস সম্বন্ধে নানারূপ বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। বিবর্ত্তবিলাস-প্রণেতা চৈতন্যচরিতামৃতের অলৌকিকত্ব প্রতিপন্ন করিতে যে সমস্ত আখ্যান লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—তাহা আমরা পরিত্যাগ করিলাম।

হয়। ইহা ছাড়া তিনি বাঙ্গালা ভাষায় "অদ্বৈতসূত্রকড়চা," "স্বরূপবর্ণন," "রাগময়ীকণা" প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক রচনা করেন বলিয়া বৈষ্ণব-সমাজে প্রসিদ্ধি আছে।

বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণ "চৈতন্যভাগবত" রীতিমত প্রত্যহ সায়ংকালে একত্র হইয়া পাঠ করিতেন; কিন্তু উঁহাতে চৈতন্য-প্রভুর অন্তলীলা বিশেষরূপে বর্ণিত না থাকায় বৃন্দাবনবাসী কাশীশ্বর গোঁসাঞি, ভূগর্ভ গোঁসাঞি, চৈতন্যদাস, কুমুদানন্দ চক্রবর্ত্তী, কৃষ্ণদাস ও শিবানন্দ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণদাস কবিরাজকে চৈতন্যদেবের শেষ জীবন বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিতে অনুরোধ করেন,—তখন কৃষ্ণদাস কবিরাজ শুভ্রকেশমণ্ডিত অশীতিপর বৃদ্ধ; ধীরে ধীরে কালের অবশিষ্ট স্বল্পসংখ্যক সোপানাবলি অতিক্রম করিয়া মৃত্যুর সন্নিহিত হইতেছিলেন; এ বিষম অনুরোধ প্রাপ্ত হইয়া তিনি একটু গোলে পড়িলেন; পূজক আসিয়া গোবিন্দজীর আদেশমাল্য হস্তে আনিয়া দিয়া গেল, তখন সেই অনুরোধ আদেশের শক্তি লাভ করিল, তিনি আর এড়াইতে পারিলেন না।

চৈতন্য-চরিতামৃত-রচনা-আরম্ভ।

কিন্তু দৃষ্টিশক্তি হারা হইয়াছে, লিখিতে বারংবার হস্ত কম্পিত হয়, বৃদ্ধ এই গুরুতর ব্যাপার সমাধা করিয়া যাইতে পারিবেন, এ বিশ্বাস তাঁহার মনে স্থির থাকে না। বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত, মুরারি গুপ্ত ও স্বরূপ দামোদরের কড়চা এবং কবিকর্ণপূরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক মূলতঃ অবলম্বন করিয়া এবং শ্রীদাস, লোকনাথ গোস্বামী, গোপালভট্ট, রঘুনাথদাস প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণের নিকট মৌখিক বৃত্তান্ত অবগত হইয়া প্রবল ও অমানুষী অধ্যবসায়ে ১৬১৫ খৃঃ অব্দে (নয় বৎসরের চেষ্টায়) কৃষ্ণদাস চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ সম্পূর্ণ করেন।*

রচনা শেষ।

চৈতন্যচরিতামৃতে চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যমঙ্গলসুলভ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের চিহ্ন নাই; বৃন্দাবনের শীতল বায়ু ও নির্ম্মল আকাশের নীচে ভক্তির অবতার চৈতন্যমূর্ত্তি কৃষ্ণদাসের চিত্তে যেরূপ নির্ম্মল ও সুন্দরভাবে মুদ্রিত হইয়াছিল, চৈতন্যচরিতামৃতে তাহার সুন্দর প্রতিলিপি উঠিয়াছে। গৌড়দেশে শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব ক্রমশঃ গাঢ় বিদ্বেষে পরিণত হইতেছিল ও উভয় পক্ষের ক্রোধোন্মত্ত যুবকগণ লেখনী ও জিহ্বার তীব্রতা দ্বারা পরস্পরকে তাড়না করিতেছিলেন; সুদূর বৃন্দাবনতীর্থে এই দলাদলির কলুষিত বায়ু বহে নাই ও

গ্রন্থ-সমালোচনা।

* "শাকে সিন্ধ্বগ্নিবাণেন্দৌ শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনান্তরে
সূর্য্যে হ্‌সিতপঞ্চম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ॥

এই শ্লোকটি চরিতামৃতের অনেকগুলি প্রাচীন ও প্রামাণ্য পুঁথিতে পাওয়া গিয়াছে। আমরা "অগ্নি"কে "তিন" শব্দের অর্থে ধরিয়া লইয়াছি, কেহ কেহ অগ্নির অর্থ "সাত" মনে করেন তাহা হইলে ১৫৭৭ শকাব্দা হয়।

অশীতিপর বৃদ্ধ সেই প্রসঙ্গ অবগত থাকিলেও সেই সব চাপল্যে যোগ দিতে প্রবৃত্তি বোধ করেন নাই। বৃদ্ধের হৃদয়টি শিশুর ন্যায় সুকুমার ও বিনয়মাখা ; আমরা কোন বিষয়ে পুস্তক লিখিলে তদ্বিষয়ে পূর্ব্ববর্ত্তী পুস্তকের দোষ গাহিয়া মুখবন্ধ করিয়া থাকি, কিন্তু চৈতন্যচরিতামৃত কোন কোন বিষয়ে চৈতন্যভাগবত হইতে অনেক উৎকৃষ্ট হইলেও কৃষ্ণদাস পত্রে পত্রে নারায়ণীপুত্র বৃন্দাবনের প্রশংসা করিয়াছেন, সেই প্রশংসোক্তি পড়িয়া আমরা তাঁহার নিজের বিনয়েরই অধিক প্রশংসা করিয়াছি। চৈতন্যপ্রভুর জীবন সম্বন্ধে ঐতিহাসিক গুরুত্ব-হিসাবে গোবিন্দদাসের কড়চার পরে চৈতন্যচরিতামৃতই শ্রেষ্ঠ প্রামাণিক গ্রন্থ ; কিন্তু গভীর পাণ্ডিত্য ও প্রবীণতাগুণে এই পুস্তক পূর্ব্ববর্ত্তী সকল পুস্তক হইতেই শ্রেষ্ঠ। চৈতন্যভাগবতের ন্যায় ইহাতে ঘটনার তত ঘন সন্নিবেশ নাই ; বর্ণিত ঘটনাগুলির মধ্যে মধ্যে অবকাশ আছে,—কিন্তু সেই অবকাশ ছবির চাল-চিত্রের ন্যায় মূল আলেখ্যটির সৌন্দর্য্য গাঢ়ভাবে স্পষ্ট করিয়াছে। বৈষ্ণবোচিত সুন্দর বিনয়, ভক্তির ব্যাখ্যা, স্বচ্ছন্দে সংযত লেখনী দ্বারা বহুবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে সার সঙ্কলন ও প্রেমকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সুসম্বদ্ধ করার নৈপুণ্য,—এই বহুগুণসমন্বিত হইয়া চৈতন্যচরিতামৃত এক উন্নত প্রাকৃতিক দৃশ্যপটে প্রতিভাত ক্ষুদ্র লতাগুল্মপুষ্প হইতে বৃহৎ বনস্পতি বিচিত্র সমাবেশযুক্ত বৈভব প্রকটিত করিতেছে।

কেবল অন্ত্যলীলায় নহে, আদি ও মধ্যলীলার যে যে স্থান বৃন্দাবনদাস ভাল করিয়া লিখিতে পারেন নাই, কৃষ্ণদাস কবিরাজ সেই সব স্থল বিচক্ষণভাবে পূরণ করিয়াছেন। দিগ্বিজয়ী ও রামানন্দ রায়ের সঙ্গে বিচার বর্ণনায় চরিতামৃতে পাণ্ডিত্যের একশেষ প্রদর্শিত হইয়াছে। পুস্তকখানি বহুসংখ্যক সংস্কৃত শ্লোকে পূর্ণ, ইহার অনেক শ্লোক তাঁহার নিজের রচিত, আর অনেকগুলি নানাবিধ সংস্কৃত পুস্তক হইতে প্রমাণরূপে উদ্ধৃত।*

* চৈতন্যচরিতামৃতে কোন্ কোন্ সংস্কৃতগ্রন্থ হইতে প্রমাণ স্বরূপ শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধুভদ্র মহাশয় বর্ণমালানুক্রমে তাহার একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন, (অনুসন্ধান ; ১৩০১ সাল, ৮ম সংখ্যা।) তাহা এই ;—

(১) অভিজ্ঞান শকুন্তলা, (২) অমরকোষ, (৩) আদিপুরাণ, (৪) উত্তরচরিত, (৫) উজ্জ্বল-নীলমণি, (৬) একাদশী তত্ত্ব, (৭) কাব্য প্রকাশ, (৮) কূর্ম্মপুরাণ, (৯) কৃষ্ণকর্ণামৃত, (১০) কৃষ্ণসন্দর্ভ, (১১) ক্রমসন্দর্ভ, (১২) গরুড়পুরাণ, (১৩) গীত-গোবিন্দ, (১৪) গোবিন্দলীলামৃত, (১৫) গৌতমীয়তন্ত্র, (১৬) চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, (১৭) জগন্নাথবল্লভ নাটক (১৮) দানকেলি কৌমুদী, (১৯) নাটক চন্দ্রিকা, (২০) নারদ পঞ্চরাত্র, (২১) নৃসিংহপুরাণ, (২২) পঞ্চদশী (২৩) পদ্মপুরাণ, (২৪) পদ্যাবলী, (২৫) পাণিনিসূত্র (২৬) বরাহপুরাণ, (২৭) বিদগ্ধমাধব, (২৮) বিশ্বপ্রকাশ, (২৯) বিষ্ণুপুরাণ, (৩০) বীর-চরিত, (৩১) বৃহৎগৌতমীয়তন্ত্র, (৩২) বৃহন্নারদীয়পুরাণ, (৩৩) বেদান্তদর্শন, (৩৪) বৈষ্ণবতোষিণী, (৩৫) ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, (৩৬) ব্রহ্মসংহিতা, (৩৭) ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, (৩৮) ভক্তিলহরী, (৩৯) ভক্তিসন্দর্ভ, (৪০) ভগবদ্গীতা, (৪১) ভাগবতপুরাণ, (৪২) ভাগবতসন্দর্ভ, (৪৩) ভাবার্থ-দীপিকা, (৪৪) ভারতী, (৪৫) মলমাসতত্ত্ব, (৪৬) মনুসংহিতা,(৪৭) মহাভারত, (৪৮)

এই পুস্তকে মোট শ্লোক সংখ্যা ১২০৫১, তন্মধ্যে আদিখণ্ডে, ১৭ পরিচ্ছেদ, শ্লোকসংখ্যা ২৫০০; মধ্যে ২৫ পরিচ্ছেদ, শ্লোকসংখ্যা ৬০৫১; ও অন্ত্যে ২০ পরিচ্ছেদ, শ্লোকসংখ্যা ৬৫০০। অন্ত্যখণ্ডে মহাপ্রভুর যে সকল ভাব বর্ণিত হইয়াছে, তাহা নিগূঢ় ভক্তিরসাত্মক। আমরা গোবিন্দদাসের কড়চায় চৈতন্যপ্রভুর উদ্দাম পূর্ব্বরাগের প্রেমাবেশের লক্ষণ দেখিয়াছি, তখন তাঁহার ভাবের পূর্ণ আবেশ একক্ষণে হইয়াছে, পরক্ষণে তিনি সুস্থ হইয়াছেন; তাঁহার মনুষ্যত্ব ও দেবত্বের মধ্যে পরিষ্কার একটি ব্যবচ্ছেদরেখা অনুভব করা যায়, কিন্তু চরিতামৃতের শেষখণ্ডে তাঁহার ভাবোন্মত্ততা ক্বচিৎ মাত্র ভঙ্গ হইয়াছে; তাঁহার জীবনে পূর্ব্বে যে ভাব মেঘান্তরিত আলোর রেখার ন্যায় মধ্যে মধ্যে দীপ্তি প্রকাশ করিত, সেইভাব শেষে জীবনব্যাপক হইয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণভাবে অধিকার করিয়াছে; জাগরণ স্বপ্নে, জ্ঞান ভ্রান্তিতে তখন মিশিয়া গিয়াছে। এই ভাব-বিহ্বলতার ক্রমবিকাশ কৃষ্ণদাস অন্ত্যখণ্ডে আঁকিয়াছেন। চৈতন্যপ্রভু কখনও বিরহে জগন্নাথ-মন্দিরের গম্ভীরায় সারারাত্রি মস্তক ঘর্ষণ করিয়া শোণিত-সিক্ত মৃতকল্প হইয়া রহিয়াছেন, কখনও সমুদ্র সৈকতে তাঁহার শিথিল অস্থি বিশিষ্ট প্রেমের শেষ দশার কঙ্কালসার মূর্ত্তিটি উঠাইয়া লোকবৃন্দ কর্ণমূলে হরিনাম বলিয়া চৈতন্য সঞ্চার করিতেছে; কখনও প্রভু জয়দেবের গান শুনিয়া উন্মত্তভাবে গায়িকারমণীকে আলিঙ্গন করিতে কণ্টকবিদ্ধ পদে ছুটিতেছেন,—স্ত্রী পুরুষে ভেদ-জ্ঞান তখন বিলুপ্ত হইয়াছে; রাত্রিকালে বহুবিধ লোক তাঁহাকে প্রহরীরূপে রক্ষা করিতেছে, তাহাদের ঈষৎ তন্দ্রাবেশ হইলে পাগলের ন্যায় জঙ্গলে ছুটিয়া অজ্ঞান হইয়া রহিয়াছেন; শরীর বিশীর্ণ, চর্ম্মসার,—"চর্ম্মমাত্র উপরে সন্ধি আছে দীর্ঘ হৈয়া। দুঃখিত হইলা সবে প্রভুরে দেখিয়া॥"—(চৈ, চ, অন্ত্য)। তাঁহার জাগরণ ও স্বপ্ন একইরূপ, "একদিন মহাপ্রভু করেছে শয়ন। কৃষ্ণরাসলীলা হয় দেখিলা স্বপন॥"—(চৈ, চ, অন্ত্য)। জাগরণেও ত নিত্য তাহাই দর্শন।

মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলা।

যদিও চৈতন্যচরিতামৃতে মহাপ্রভুর তিরোধানটি বর্ণিত হয় নাই, কিন্তু এই ভক্তিবিহ্বলতার ক্রমবৃদ্ধিজনিত দেহতাচ্ছিল্যে পরিণামের ছায়াপাত করা হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

শেষ সময়েও 'মা' বলিয়া মধ্যে মধ্যে মনে হইত; আমাদিগের ধর্ম্মের কথা যেমন কোনও শুভক্ষণে ছায়ার ন্যায় মনে উদয় হইয়া লীন হয়, সেইরূপ ইহসংসারের কথা ক্বচিৎ ছায়ার ন্যায় চৈতন্যপ্রভুরও স্মৃতিপথে উদিত হইয়া বিলয় প্রাপ্ত হইত। জগদানন্দকে তিনি বৎসর বৎসর নদীয়া পাঠাইতেন, একবার মায়ের উদ্দেশ্যে বলিয়াছিলেন,—

ইহসংসারের স্মৃতি।

যামুনাচার্য্যকৃতালকমন্দারস্তোত্র, (৪৯) রঘুবংশ, (৫০) রামায়ণ, (৫১) রূপগোস্বামীর কড়চা, (৫২) লঘুভাগবতামৃত, (৫৩) ললিতমাধব, (৫৪) সংক্ষেপভাগবতামৃত, (৫৫) সাহিত্যদর্পণ, (৫৬) স্তবমালা, (৫৭) স্বরূপ গোস্বামীর কড়চা, (৫৮) শাশ্বততন্ত্র, (৫৯) হরিভক্তিবিলাস, (৬০) হরিভক্তিসুধোদয়।

"তোমার সেবা ছাড়ি আমি করিলুঁ সন্ন্যাস। বাউল হইয়া আমি কৈল ধর্ম্মনাশ॥ এই অপরাধ তুমি না লইহ আমার। তোমার অধীন আমি পুত্র সে তোমার॥"—(চৈ, চ, অন্ত্য)।

চৈতন্যচরিতামৃতের ভাষা নির্দ্দোষ নহে ; কবিরাজঠাকুর সংস্কৃতে সুদক্ষ থাকিলেও বাঙ্গালায় বড় নিপুণ ছিলেন না। বিশেষ, বৃন্দাবনে দীর্ঘকাল থাকাতে তাঁহার বাঙ্গালা-ভাষায় বৃন্দাবনী এরূপ মিশিয়া গিয়াছিল যে একজন উত্তর-পশ্চিমপ্রদেশের লোক কয়েক বর্ষ বাঙ্গালা-মুলুকে থাকিলে যেরূপ বাঙ্গালা কহে, কৃষ্ণদাস কবিরাজের ভাষাটিও মধ্যে মধ্যে সেইরূপ হইয়াছে। এই পুস্তক সংস্কৃত, বৃন্দাবনী ও বাঙ্গালা, এই তিনরূপ পদার্থের রাসায়নিক সংযোগে প্রস্তুত। কিন্তু গ্রন্থের সর্ব্বত্রই ভাষা একরূপ নহে, মধ্যে মধ্যে পরিষ্কার বাঙ্গালাও পাওয়া যায়। ভাষা সম্বন্ধে পরিশিষ্টে আমরা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিব। চরিতামৃত পরিপক্ক লেখনীর রচনা, উহা সর্ব্বত্রই সুমিষ্ট না হউক, মনের ভাব জ্ঞাপন করিতে উৎকৃষ্টরূপ উপযোগী।

রচনার দোষ।

৮৫ বর্ষ বয়সে ১৬১৫ খৃঃ অব্দে পুস্তক সমাধা করিয়া কবিরাজ এই কয়েকটি কথা লিখেন,—

"আমি লিখি ইহা মিথ্যা করি অনুমান। আমার শরীর কাষ্ঠপুত্তলী সমান॥ বৃদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধ বধির। হস্ত হালে মনোবুদ্ধি নহে রহে স্থির। নানা রোগগ্রস্ত চলিতে বসিতে না পারি। পঞ্চরোগ পীড়া ব্যাকুল রাত্রি দিন মরি॥"

রচনার বিনয়।

কৃত্তিবাস, কাশীরামদাস প্রভৃতি লেখকগণ তাঁহাদের পুস্তকপাঠ ভবসিন্ধু পার হইবার একমাত্র সেতু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, "কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্" ইত্যাদি ভাবের ভণিতাপাঠে অভ্যস্ত বাঙ্গালী পাঠক বৈষ্ণবাগ্রগণ্য কৃষ্ণদাসের ভণিতার বিনয়ের নূতন আদর্শ পাইবেন, সন্দেহ নাই,—

"চৈতন্যচরিতামৃত যেইজন শুনে।
তাঁহার চরণ ধুঞা করোঁ মুঞি পানে॥"—(চৈ, চ, অন্ত্য)।

কৃষ্ণদাস বৈষ্ণব-ধর্ম্ম বুঝিয়াছিলেন, তাহা জীবনে অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সংসারের নানা বিচিত্র উপদ্রব সহ্য করিয়া, রৌদ্র বৃষ্টি অকাতরে মাথায় বহিয়া যে দৃঢ় চরিত্রের বিকাশ পাইয়াছিল, সে চরিত্রের শেষফল এই যে চরিতামৃত রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা ভবধামের অমৃত বলিয়া এখনও অনেকে উপভোগ করেন ; পণ্ডিত হারাধন দত্ত ভক্তনিধি মহাশয় লিখিয়াছেন,—
"যে দিন এই পুস্তক পাঠ না হয় সেই দিনই বিফল। *

এই পুস্তক লেখার পর তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য সাধিত হইল—এ কথা মনে উদয়

* নব্যভারত, ভাদ্র ১৩০০ ; ২৭৫ পৃঃ।

হইয়াছিল ; এখন তিনি নিশ্চিন্ত মনে প্রাণত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিলেন। জীবগোস্বামী প্রভৃতি আচার্য্যগণ এই পুস্তক অনুমোদন করিলে কবিরাজের স্বহস্ত-লিখিত পুঁথি গৌড়ে প্রেরিত হয় ; কিন্তু পথে বনবিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাম্বীরের নিযুক্ত দস্যুগণ পুস্তক লুণ্ঠন করে। এই পুস্তকের প্রচার চিন্তা করিয়া কৃষ্ণদাস মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছিলেন, সহসা বনবিষ্ণুপুর হইতে বৃন্দাবনে লোক আসিয়া এই শোকাবহ সংবাদ জ্ঞাত করাইল। অবস্থার কোন আঘাতে যে কৃষ্ণদাস ব্যথিত হন নাই, আজ তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠব্রতের ফল—মহাপ্রভুর সেবায় উৎসর্গীকৃত মহাপরিশ্রমের বস্তু অপহৃত হইয়াছে শুনিয়া কৃষ্ণদাস জীবন বহন করিতে পারিলেন না। জীবনপণে যে পুস্তক লিখিয়াছিলেন তাহার শোকে জীবন ত্যাগ করিলেন,—"রঘুনাথ কবিরাজ শুনিলা দুজনে। আছাড় খাইয়া কাঁদে লোটাইয়া ভূমে॥ বৃদ্ধকালে কবিরাজ না পারে উঠিতে। অন্তর্দ্ধান করিলেন দুঃখের সহিতে॥"—প্রেমবিলাস। এই উপলক্ষে পণ্ডিত হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয় লিখিয়াছেন,—"কবিরাজের অন্তর্দ্ধানের কথা লেখা উচিত নহে এবং আমাদের তাহা লিখিতে নাই, লিখিতে গেলে বুকে ফাটে।" * মতান্তরে এই বিষয়ের ভিন্নরূপ উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কর্ণানন্দে লিখিত আছে যে, পুস্তক অপহরণের সংবাদ পাওয়া মাত্রই তাঁহার মৃত্যু ঘটে নাই, তিনি সংবাদে মর্ম্মাহত হইয়া পীড়িত হইয়া পড়েন এবং ঘটনার কয়েক দিবস অন্তে প্রাণ ত্যাগ করেন। যাহা হউক এই দুই বিবরণেই দৃষ্ট হয়, অতি বৃদ্ধ বয়সে গ্রন্থ নষ্ট হওয়ার শোক তিনি বহন করিতে পারেন নাই।

পুস্তক লুণ্ঠন ও কবিরাজের মৃত্যু।

চরিতামৃতের ভাবী দেশব্যাপী যশের বিষয় কবিরাজ জানিয়া মরিতে পারেন নাই—শেষে দেশ-বিখ্যাত পণ্ডিত বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী এই পুস্তকের সংস্কৃত টিপ্পনী প্রণয়ন করেন, বৈষ্ণবসমাজে এখনও এ পুস্তক রীতিমত পূজিত হইয়া থাকে। কবিরাজ ইহার একটু পূর্ব্বাভাস জানিয়া মরিলে আমাদের দুঃখ হইত না ;—তিনি উপযুক্ত বয়সেই ত প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। কবিরাজ প্রেমধর্ম্ম এবং আরাধ্য ও আরাধকের সম্বন্ধবিষয়ে যে সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়াছেন,—তাহার দুইটি অংশ উদ্ধৃত হইল ;—

রচনার নমুনা।

(১) "কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ। লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপ বিলক্ষণ॥ আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম। কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তার প্রেম নাম॥ কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল। কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্য মাত্র প্রেম ত প্রবল॥ লোকধর্ম্ম দেহধর্ম্ম বেদধর্ম্ম কর্ম্ম। লজ্জা ধৈর্য্য দেহসুখ আত্মসুখ মর্ম্ম॥ দুস্ত্যজ্য আর্য্যপথ নিজ পরিজন। স্বজন করিব যত তাড়ন ভর্ৎসন। সর্ব্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন। কৃষ্ণসুখহেতু করে প্রেম সেবন॥ ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণ

* নব্যভারত, ভাদ্র, ১৩০০, ২৭৫ পৃঃ। ভক্তিরত্নাকরের সঙ্গে এই বৃত্তান্তের অনৈক্য।

দৃঢ় অনুরাগ। স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে যেন নাহি কোন দাগ॥ অতএব কাম প্রেমে বহুত অন্তর। কাম অন্ধ তমঃ প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর॥"—(চৈ, চ, আদি)।

(খ) "মোর রূপে আপ্যায়িত করে ত্রিভুবন। রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন॥ মোর গীত বংশীস্বরে আকর্ষে ত্রিভুবন। রাধার বচনে হরে আমার শ্রবণ॥ যদ্যপি আমার গন্ধে জগৎ সুগন্ধ। মোর চিত্ত প্রাণ হরে রাধাঅঙ্গগন্ধ॥ যদ্যপি আমার রসে জগত সরস। রাধার অধররসে আমা করে বশ॥ যদ্যপি আমার স্পর্শ কোটীন্দু শীতল। রাধিকার স্পর্শে আমা করে সুশীতল॥ এইমত জগতের সুখ আমা হেতু। রাধিকার রূপ গুণ আমার জীবাতু॥ এইমত অনুভব আমার প্রতীত। বিচারি দেখিয়ে যদি সব বিপরীত॥ রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন। আমার দর্শনে রাধা সুখে আগেয়ান॥ পরস্পর বেণুগীতে হরয়ে চেতন। মোর ভ্রমে তমালেরে করে আলিঙ্গন॥ কৃষ্ণআলিঙ্গন পাইনু জনম সফলে। এই সুখে মগ্ন রহে বৃক্ষ করি কোলে॥ অনুকূল বাতে যদি পায় মোর গন্ধ। উড়িয়া পড়িতে চাহে প্রেমে হয়ে অন্ধ। তাম্বুল চর্ব্বিত যবে করে আস্বাদনে। আনন্দ-সমুদ্রে ডুবে কিছুই না জানে॥ আমার সঙ্গমে রাধা পায় যে আনন্দ। শতমুখে বলি তবু না পাই তার অন্ত॥"—(চৈ, চ, আদি)।

চৈতন্যপ্রভুর বৃন্দাবন দর্শন বর্ণনায় প্রাচীন লেখক নবীন কবির স্ফূর্ত্তি দেখাইয়াছেন। তাঁহার পরিণত ইতিহাসের স্বচ্ছ ছায়ায় সেই দৃশ্যটি অতি সুন্দরভাবে বিম্বিত হইয়াছে; দেবদর্শকের পদার্পণে বৃন্দাবন দেবোদ্যানের ন্যায় সুন্দর হইয়া উঠিল,—"প্রভু দেখি বৃন্দাবনের বৃক্ষ লতাগণ। অঙ্কুর, পুলক মধু, অশ্রু বরিষণ॥ ফুল ফল ভরি ডাল পড়ে প্রভু পায়। বন্ধু দেখি বন্ধু যেন ভেট লৈয়া যায়॥" উন্মত্ত ভক্তির আবেশে,—"প্রতি বৃক্ষ লতা প্রভু করে আলিঙ্গন। পুষ্পাদি ধ্যানে করেন কৃষ্ণে সমর্পণ॥" তখন তাঁহার অশ্রুবিন্দু তরুপুষ্পপল্লবের শিশিরবিন্দুর সহিত জড়িত হইয়া গেল; তাঁহার কণ্ঠের ব্যাকুল "কৃষ্ণ" ধ্বনি বিহগকুল আকাশে প্রতিধ্বনিত করিল;—"শুক শারিকা প্রভুর হাতে উড়ে পড়ে। প্রভুকে শুনায়ে কৃষ্ণের গুণ শ্লোক পড়ে॥"

তুলিতে আঁকিতে পারিলে এখানে একটি উজ্জ্বল চিত্র সমাবেশের সুযোগ ছিল। রামানন্দরায়ের প্রসঙ্গে "পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গে ভেল। অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল। সো নহ রমণ হম নহ রমণী॥" প্রভৃতি সুশ্রাব্যপদ আমরা 'চৈতন্যচরিতামৃতে'ই দেখিতে পাই। এই পদটি রায় রামানন্দ কৃত।

পূর্ব্বে উল্লিখিত পুস্তকগুলি ছাড়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ "রসভক্তিলহরী" * নামক একখানা ক্ষুদ্র পুস্তক বাঙ্গালায় রচনা করেন, ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন নায়িকার লক্ষণ বর্ণিত আছে। †

* এই পুস্তকের হস্ত লিখিত একখানা প্রাচীন পুঁথি আমার নিকট আছে, অন্য কোথাও আছে বলিয়া জানি না।

† ভক্ত দিগ্‌দর্শনী'র তালিকা মতে কৃষ্ণদাস কবিরাজের জন্ম ১৪১৮ শক (১৪৯৬ খৃঃ অঃ) এবং মৃত্যু ১৫০৪ শকের (১৫৮২ খৃঃ অঃ) চান্দ্রাশ্বিন শুক্লাদ্বাদশী।

নরহরি চক্রবর্ত্তীর ভক্তিরত্নাকর, নরোত্তম বিলাস ও নিত্যানন্দদাসের প্রেম-বিলাস প্রভৃতি।

পরবর্ত্তী চরিতসাহিত্যে চৈতন্যপ্রভুর পারিষদগণ ও অন্যান্য বৈষ্ণবাচার্য্যগণের বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। চৈতন্যপ্রভুর সমস্ত জীবনচরিতগুলিতেই প্রসঙ্গক্রমে নিত্যানন্দপ্রভুর বিষয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইতিপূর্ব্বে আমরা বৃন্দাবনদাসের "নিত্যানন্দ-বংশাবলী"র কথা উল্লেখ করিয়াছি। প্রেমবিলাস প্রণেতা নিত্যানন্দ দাস রচিত প্রভু নিত্যানন্দ সম্বন্ধে একখানি দীর্ঘজীবন চরিতছিল, প্রেম-বিলাসে বারংবার এই পুস্তকের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। হয়তঃ নিত্যানন্দ বংশীয় লোকদের কাহারও দ্বারায় এই পুস্তক নষ্ট করিয়া ফেলা হইয়াছে। নিত্যানন্দ প্রভুর পিতামহের নাম সুন্দরামল্লবাঁড়ুরী, পিতার নাম হড়াইওঝা ও মাতার নাম পদ্মাবতী—বাসস্থান বীরভূম জেলাস্থ একচক্রাগ্রাম, তিনি ১৪৭৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। নিত্যানন্দ অম্বিকাগ্রামের নিকট শালিগ্রামনিবাসী সূর্য্যদাস সরখেলের দুই কন্যা বসুধা ও জাহ্নবীদেবীকে বিবাহ করেন; জাহ্নবীদেবীর নাম বৈষ্ণবসাহিত্যে সুপরিচিত। জাহ্নবীদেবী দ্বারা নিত্যানন্দের গঙ্গা নামে কন্যা ও বীরভদ্র নামক পুত্র লাভ হয়; ভগীরথ আচার্য্যের পুত্র মাধবাচার্য্য (মহাপ্রভুর পড়ুয়া) গঙ্গাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। *

নিত্যানন্দ।

অদ্বৈত আচার্য্যের পিতামহের নাম নৃসিংহ, † পিতার নাম কুবেরপণ্ডিত, মাতার নাম নাভাদেবী ও পত্নীর নাম সীতাদেবী;—আদিম বাসস্থান শ্রীহট্টান্তর্গত নবগ্রাম, পরে শান্তিপুরে বসতি স্থাপন করেন। ইনি ১৪৩৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। শ্যামদাস-প্রণীত "অদ্বৈতমঙ্গলে," ঈশাননাগর প্রণীত "অদ্বৈতপ্রকাশে" ও লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস প্রণীত "অদ্বৈতের বাল্যলীলা-সূত্রে" প্রভৃতি পুস্তকে ইঁহার সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে, পরন্তু সমস্ত বৈষ্ণব-সাহিত্য হইতেই নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্য্যের সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অদ্বৈতাচার্য্য।

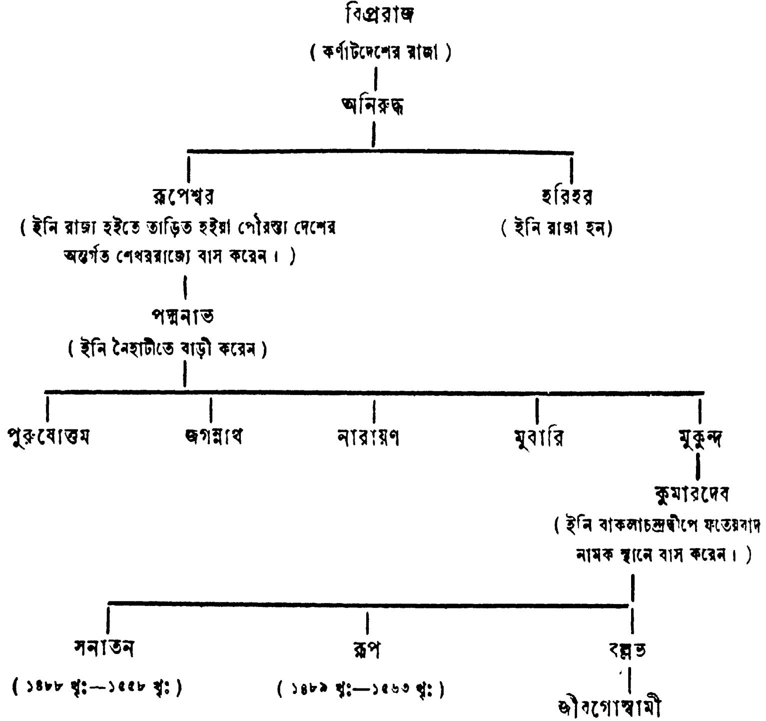
রূপসনাতন বৈষ্ণবাচার্য্যগণের অগ্রগণ্য ও মহাপ্রভুর পরমভক্ত পার্শ্বচর। ইঁহারা কর্ণাটাধিপ বিপ্ররাজের বংশোদ্ভূত। পর পৃষ্ঠায় বংশাবলী প্রদান করিতেছি;—

রূপসনাতন।

* নিত্যানন্দ প্রভুর বংশাবলী লইয়া সম্প্রতি অদ্ভুত অদ্ভুত মত প্রচারিত হইতেছে। গঙ্গাবংশীয় জনৈক পণ্ডিত আমাকে নানা প্রমাণ দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে বীরভদ্র গোস্বামী নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র নহেন, এমন কি জাহ্নবী দেবী তাঁহার মতে পুরুষ। তিনি নায়িকা ভাবে নিত্যানন্দ প্রভুর সেবা করিতেন। এই সকল মত প্রথমতঃ আমি পাগলের প্রলাপ বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু পণ্ডিতটি যেরূপ যুক্তি ও প্রমাণের বহর উপস্থিত করিয়াছেন তাহাতে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে নিত্যানন্দ প্রভুর বংশাবলীতে বিলক্ষণ গোলযোগ আছে।

† "নৃসিংহ সন্ততি বলি লোকে যারে গায়॥ সেই নরসিংহ নাড়িয়াল বলি খ্যাতি। সিদ্ধশ্রোত্রিয়াখ্য আর ওঝার সন্ততি॥ যাহার মন্ত্রণাবলে শ্রীগণেশ রাজা। গৌড়ীয় বাদসাহ মারি গৌড়ে হ'ল রাজা॥"—ঈশান নাগর কৃত

রূপ, সনাতন ও জীবগোস্বামী বহুবিধ সংস্কৃতগ্রন্থ প্রণয়ন করেন ; ইঁহারা একদিকে শুদ্ধাচারী বৈষ্ণব, অপরদিকে প্রতিভাপন্ন কবি বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু দুঃখের বিষয় সমস্ত গ্রন্থই সংস্কৃতে রচনা করাতে ইঁহারা আমাদের প্রসঙ্গ-বহির্ভূত হইয়াছেন। *



অদ্বৈত প্রকাশ। এই "নাড়িয়াল" বংশোদ্ভুত বলিয়াই মহাপ্রভু অদ্বৈতাচার্য্যকে কখনও "নাড়াবুড়া" কিম্বা শুধু 'নাড়া' বলিয়া আহ্বান করিতেন।

* সনাতন গোস্বামী দিক্‌প্রদর্শনী' নামক 'হরিভক্তিবিলাসের' টীকা, শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের বৈষ্ণবতোষিণী, নামক টীকা, 'লীলাস্তব' ও 'টীকাসহ দুইখণ্ড ভাগবতামৃত' প্রণয়ন করেন। রূপগোস্বামী 'হংসদূত', 'উদ্ধবসন্দেশ', 'কৃষ্ণজন্মতিথি', 'গণোদ্দেশদীপিকা', 'স্তবমালা', 'বিদগ্ধমাধব', 'ললিতমাধব', 'দানকেলি কৌমুদী', 'আনন্দমহোদধি', 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'. উজ্জ্বল নীলমণি', 'প্রযুক্তাখ্যাত চন্দ্রিকা' 'মথুরামহিমা', 'পদ্যাবলী', 'নাটক-চন্দ্রিকা, 'লঘুভাগবতামৃত', "গোবিন্দবিরুদাবলী, প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। জীব গোস্বামীর 'হরিনামামৃতব্যাকরণ', সূত্রমালিকা', 'কৃষ্ণার্চ্চনদীপিকা', 'গোপালবিরুদাবলী', 'মাধবমহোৎসব', সঙ্কল্পকল্পবৃক্ষ' ভাবার্থসূচকচম্পূ' প্রভৃতি ২৫ খানা সংস্কৃত-গ্রন্থ বৈষ্ণবসমাজে সুবিদিত। ইঁহাদিগের বিশেষ বিবরণ 'ভক্তিরত্নাকরে'র প্রথম তরঙ্গে প্রদত্ত হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ব্যতীত বেঙ্কটভট্টের পুত্র গোপালভট্ট, মাধবমিশ্রের পুত্র গদাধর (১৪৮৬ খৃঃ—১৫১৪ খৃঃ), সপ্তগ্রামবাসী গোবর্দ্ধনদাসের পুত্র রঘুনাথদাস, (১৪৯৮ খৃঃ জন্ম), শিবানন্দ সেনের পুত্র কবিকর্ণপুর ('চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটক'-প্রণেতা) প্রভৃতি মহাপ্রভুর পার্শ্বচরগণের বৃত্তান্ত অনেক পুস্তকেই পাওয়া যায়।

অন্যান্য ভক্তগণ।

ত্রিবেণীর প্রসিদ্ধ ভক্ত উদ্ধরণ দত্তের বৃত্তান্ত অনেক প্রাচীন পুঁথিতেই উল্লিখিত দৃষ্ট হয়; পদ-সমুদ্রের একটি পদে তাঁহার এইরূপ পরিচয় আছে;—"শ্রীকরনন্দন, দত্ত উদ্ধরণ, ভদ্রাবতী গর্ভজাত। ত্রিবেণীতে বাস, নিতাইর দাস, শ্রীগৌরাঙ্গপদাশ্রিত॥ শাণ্ডিল্যপ্রবর, শ্রেষ্ঠ শান্ত ধীর, সুবর্ণবণিক্ খ্যাতি। রাধাকৃষ্ণ-পদ, ধ্যায় নিরন্তর, বৈশ্যকুলেতে উৎপত্তি। বিষয় বাণিজ্য, সাংসারিক কার্য্য, সর্ব্ব পরিত্যাগ করি। পুত্র শ্রীনিবাসে, রাখিয়া আবাসে হইলা বিবেকাচারী॥ নীলাচলপুরে, প্রভু মিলিবারে সদা ইতি উতি ধায়। আশাঝুলি লয়ে, ভিখারী হইয়ে, প্রসাদ মাগিয়া খায়॥ প্রভুভক্তগণ, পাই নিজ জন, রাখিয়া যতন করি। এ দাসমুকুন্দ, দেখিয়া আনন্দ দত্তের দৈন্যতা হেরি॥" *

বৈষ্ণবসমাজে নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাচার্য্য ও গদাধরদাস একসময়ে যে সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী সময়ে শ্রীনিবাস আচার্য্য, নরোত্তম ঠাকুর ও শ্যামানন্দও সেইরূপ শ্রদ্ধাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। এমন কি বৈষ্ণবসমাজে শ্রীনিবাস ও নরোত্তম মহাপ্রভুর দ্বিতীয় অবতার বলিয়া আদৃত। ইঁহাদের জীবন বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিতে বহুসংখ্যক গ্রন্থকার লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। এই বিরাট অধ্যবসায়চিহ্নিত কীর্ত্তির প্রান্তে দাঁড়াইয়া আমাদিগকে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। বটতলার কর্ম্মঠতা ও উদ্যম এই সাহিত্যের অতি নগণ্য অংশমাত্র এপর্য্যন্ত মুদ্রিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। কীট অগ্নি প্রভৃতির উপদ্রবে বৎসর বৎসর এই প্রাচীন কীর্ত্তিরাশি লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার উপযুক্ত কোন আয়োজন এখন পর্য্যন্তও হয় নাই।

শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ।

শ্রীনিবাসের পিতা গঙ্গাধর চক্রবর্ত্তীর নিবাস গঙ্গাতীরস্থ চাখন্দি গ্রামে। গঙ্গাধর শেষে চৈতন্য-দাস নাম গ্রহণ করেন। শ্রীনিবাসের মাতার নাম লক্ষ্মীপ্রিয়া ও মাতুলালয় জাজি গ্রামে। নরোত্তমদাস পদ্মানদীর তীরস্থ গোপালপুরের কায়স্থ রাজা কৃষ্ণনন্দদত্তের পুত্র, মাতার নাম নারায়ণী, ইনি বৃন্দাবনবাসী লোকনাথগোস্বামীর নিকট দীক্ষা প্রাপ্ত হন। নরোত্তম রাজপুত্র হইয়াও রঘুনাথ দাসের ন্যায় সংসারত্যাগী হন; তাহার জ্যেষ্ঠতাতজ ভ্রাতা সন্তোষদত্ত (পুরুষোত্তমদত্তের পুত্র) তৎস্থলে রাজা হন। এই সন্তোষদত্তই খেতুরীর ষড়্‌বিগ্রহস্থাপন উপলক্ষে প্রসিদ্ধ উৎসব করিয়া সমস্ত বৈষ্ণবমণ্ডলী একত্র করেন।

* ৺হারাধনদত্তের মতে উদ্ধারণদত্ত ১৪৮১ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

শ্যামানন্দ, দণ্ডেশ্বর গ্রামবাসী কৃষ্ণমণ্ডল নামক এক সদ্গোপের পুত্র, মাতার নাম দুরিকা। বাল্যকালে ইঁহাকে সকলে 'দুঃখী' বলিয়া ডাকিত, তৎপর ইনি 'কৃষ্ণদাস' ও বৃন্দাবনে বাস-কালে 'শ্যামানন্দ' আখ্যা প্রাপ্ত হন। ইঁহার দীক্ষাগুরুর নাম হৃদয়চৈতন্য। 'শ্যামানন্দ প্রকাশ' ও 'অভিরামলীলা গ্রন্থে' তাঁহার সম্বন্ধে অনেক বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইঁহার পিতা শ্রীকৃষ্ণমণ্ডল পূর্ব্বে গৌড়দেশবাসী ছিলেন; তৎপর উৎকল দেশে যাইয়া দণ্ডকেশ্বরের অন্তর্গত ধারেন্দা বাহাদুর-গ্রামে নিবাস-স্থাপন করেন। শ্যামানন্দ শেষজীবনে উৎকলে নৃসিংহপুরে অবস্থানপূর্ব্বক বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচার-কার্য্যে ব্রতী হন। ইঁহার শিষ্যগণের মধ্যে রসিকানন্দ ও মুরারিই প্রধান। ইঁহাদের চেষ্টায় উৎকলবাসী অসংখ্য নরনারী বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হন। বর্ত্তমান ময়ূরভঞ্জাধিপতি এবং উড়িষ্যার বহুসংখ্যক প্রসিদ্ধ পরিবার রসিকানন্দবংশীয়গণের শিষ্য।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভমধ্যে এই তিন জন প্রেমবীর বৈষ্ণব-সমাজে প্রাদুর্ভূত হন। ইঁহাদের মধ্যে একমাত্র শ্রীনিবাস ব্রাহ্মণ ছিলেন, নরোত্তমদাস কায়স্থ হইলেও বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কবি বসন্তরায় ও গঙ্গা-নারায়ণ চক্রবর্ত্তী সংস্কৃতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ছদ্মবেশী গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী পক্কপল্লীর রাজা নৃসিংহের সমস্ত সভাপণ্ডিতকে বিচারে পরাস্ত করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করেন। সেই সব পণ্ডিতগণ যে রাশীকৃত সংস্কৃতগ্রন্থ বহুসংখ্যক বাহকের স্কন্ধে চাপাইয়া তর্কযুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তদ্দ্বারা ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতে সমর্থ হন নাই; সুতরাং বিচারজয়ী ব্রাহ্মণটি যে কায়স্থ-প্রবরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া নিজকে সম্মানিত মনে করিয়াছিলেন, সদলে পক্কপল্লীরাজকেও তাঁহারই আশ্রয় লইতে হইয়াছিল।

এই সাধু ভাগবতগণের জীবন বর্ণন করিতে যে সকল লেখক অগ্রসর হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে ভাগবতের টীকাকার,—প্রসিদ্ধ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তীর শিষ্য, জগন্নাথচক্রবর্ত্তীর পুত্র, গঙ্গাতীরবাসী নরহরি-চক্রবর্ত্তীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। নরহরিচক্রবর্ত্তীর ভক্তিরত্নাকর রত্নাকর সদৃশই বিরাট এবং রত্নাকরের গর্ভে যেরূপ নানা মূল্যবান ও মূল্যহীন দ্রব্য ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকে, এই পুস্তকেও সেইরূপ নানা মূল্যবান্ ও মূল্যহীন কথার একত্র সমাবেশ হওয়াতে ইহার সার উদ্ধারে বিশেষ অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিতে হইবে, সন্দেহ নাই। সমস্ত পুঁথি আলোড়ন না করিলে ইহা হইতে কোন প্রয়োজনীয় বিষয় জানার উপায় নাই; ভক্তিরত্নাকর পাঠারম্ভ ও নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ একইরূপ ব্যাপার।

ভক্তিরত্নাকর।

এই বৈষ্ণব ইতিহাস-সাহিত্য সম্বন্ধে এস্থলে প্রাসঙ্গিক একটি কথা বলা আবশ্যক। য়ুরোপে ইতিহাস লিখিতে হইলে, স্বাধীনতার জন্য বড় রকমের যুদ্ধ বিগ্রহ, লেখনীর মূল লক্ষ্য হয়। বক্তৃতা-

মালা-উত্তেজিত জনসাধারণের চেষ্টায় শাসনের কঠিন বেলাভূমি ভঙ্গ করা, কিম্বা নবদেশ আবিষ্কার চিন্তায় প্রশান্তসাগরের শান্তি ভাঙ্গিয়া বর্ব্বরের পত্রাচ্ছন্ন কুটীরে লগুড়াঘাত পূর্ব্বক তাহাকে গুলির শব্দে চমৎকৃত করিয়া টিকি ধরিয়া টানা-হেঁচড়া করা প্রভৃতি বিষয় গ্রন্থের প্রতিপাদ্য হয়। কতকগুলি যষ্টি মুষ্টির শব্দ ও গুলি বারুদের ঘনীভূত ধূম্রপটলে গ্রন্থপত্র যেন বিড়ম্বিত হইয়া পড়ে। ধর্ম্মের ইতিহাসও রাজনৈতিক ব্যাপারেই যেন এক নব সংস্করণ। উহাতেও অকথ্য অত্যাচার ও নর শোণিতলিপ্সার অভিনয়ই দৃষ্ট হয়।

যুরোপের ইতিহাস।

কিন্তু বৈষ্ণবেতিহাসের লক্ষ্য অন্যরূপ। মুণ্ডিতমস্তক, ভূলুণ্ঠিত, তুলসী-মাল্যবিরাজিত বৈরাগীই এই সব গ্রন্থের নায়ক। খোলবাদ্যের উৎকর্ষ সম্বন্ধে লেখকগণ যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, বোধ হয় য়ুরোপীয় লেখকগণ ব্লুচার কি করটেজের যুদ্ধনীতিরও ততদূর প্রশংসা করিবেন না। কীর্ত্তনের কথা বলিতে গদ্গদভাবে লেখকগণ পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা জুড়িয়া বর্ণনা করিয়াছেন—তাহা পাঠকের ধৈর্য্যের একরূপ অগ্নিপরীক্ষা। বর্ণিত গ্রন্থ সকলের নায়কগণ "অশ্রুকম্পস্বেদাদিভূষিত" ('ভক্তিরত্নাকর' ৩য় অধ্যায়ে) হইলেই তাঁহারা লেখকের চক্ষে দেবরূপী হইয়া দাঁড়ান। পাঠক অনুমান করিবেন না, আমি বিদ্রূপ করিতেছি। ভক্তির রাজ্যের স্বাদ বাহিরের লোক পায় না, এই সম্বন্ধে কবির উক্তি—"অরসিকে তু রসস্য নিবেদনং শিরসি মা লিখ মা লিখ।" আমার বক্তব্য এই যে, বৈষ্ণবগণের নিকট এই সব পুস্তক এবং তদ্বর্ণিত প্রশংসাপূর্ণ বিষয়গুলি অমূল্য, বাহিরের লোক অনধিকারী, তাঁহারা ততদূর স্বাদ পাইবেন না। কিন্তু ইতিহাস-লেখক ও প্রত্নতত্ত্ববিৎ এই সব গ্রন্থের কীট ঝাড়িয়া ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস দ্বারা ক্ষুদ্র অক্ষর বড় করিয়া—লুপ্ত কথা যথাসাধ্য উদ্ধার করিয়া অগ্রসর হইলে অনেক লাভজনক উপকরণ পাইতে পারিবেন, নানাদিক্ হইতে নানাপ্রকার ঐতিহাসিক চিত্র পরিস্ফুট ও উজ্জ্বল হইয়া দাঁড়াইবে।

বৈষ্ণবের লক্ষ্য।

'ভক্তিরত্নাকরে' মোট পঞ্চদশ তরঙ্গ। প্রথম তরঙ্গে জীবগোস্বামীর পূর্ব্বপুরুষগণের বিষয়, গোস্বামিগণের গ্রন্থ বর্ণন, ও শ্রীনিবাস আচার্য্যের বৃত্তান্ত, দ্বিতীয় তরঙ্গে শ্রীনিবাসের পিতা চৈতন্যদাসের কথা; তৃতীয় এবং চতুর্থ তরঙ্গে শ্রীনিবাসের শ্রীক্ষেত্রে, গৌড়ে ও বৃন্দাবনে গমন বৃত্তান্ত; পঞ্চম ও ষষ্ঠ তরঙ্গে শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও রাঘবপণ্ডিতের ব্রজবিহার, রাগরাগিণী ও নায়িকাভেদ বর্ণন ও শ্রীনিবাস, শ্যামানন্দ প্রভৃতির গোস্বামিগণকৃত গ্রন্থ লইয়া গৌড়াভিমুখে যাত্রা; সপ্তম তরঙ্গে বনবিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাম্বির কর্ত্তৃক গ্রন্থচুরি ও পরিশেষে বীরহাম্বিরের বৈষ্ণবধর্ম্মগ্রহণ; অষ্টমে শ্রীনিবাসের রামচন্দ্রকে শিষ্য করা; নবমে কাঁচাগড়িয়া ও শ্রীখেতুরি গ্রামের মহোৎসবের কথা; দশমে ও একাদশে জাহ্নবীদেবীর তীর্থাদি-দর্শন-

ভক্তিরত্নাকরের সূচি।

বৃত্তান্ত; দ্বাদশে শ্রীনিবাসের নবদ্বীপ গমন ও ঈশানকর্ত্তৃক নবদ্বীপ-বৃত্তান্ত বর্ণন; ত্রয়োদশে আচার্য্য-মহাশয়ের দ্বিতীয় পরিণয় ও চতুর্দ্দশে বেরাকুলী গ্রামের সংকীর্ত্তন; পঞ্চদশতরঙ্গে শ্যামানন্দকর্ত্তৃক উড়িষ্যায় বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার লিখিত হইয়াছে। পঞ্চম অধ্যায়ে গ্রন্থকর্ত্তা রাগরাগিণী সম্বন্ধে সুদীর্ঘ শাস্ত্রীয় গবেষণা ও নায়কনায়িকাভেদ এবং প্রেমের লক্ষণ বিচার দ্বারা যে পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছেন, তাহাতে তিনি চিরদিনই শিক্ষিত সমাজের পূজা পাইবেন। তিনি বৃন্দাবন ও নবদ্বীপের যে সুবৃহৎ ও পরিষ্কার মানচিত্র আঁকিয়াছেন, তাহাতে কালের পৃষ্ঠায় এই দুই স্থানের ভৌগলিক তত্ত্ব চিরদিন অঙ্কিত থাকিবে। ম্যাণ্ডিভাইলের অঙ্কিত জেরুজেলেম এবং হিউনসঙ্গএর অঙ্কিত কুশীনগর হইতেও নরহরির নবদ্বীপ ও বৃন্দাবন চিত্র অধিকতর উজ্জ্বল হইয়ছে।

ভাষাগ্রন্থের আদর।

'ভক্তিরত্নাকরে' বরাহপুরাণ, পদ্মপুরাণ, আদিপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, সৌরপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত, লঘুতোষিণী, গোবিন্দবিরুদাবলী, গৌরগণোদ্দেশদীপিকা, সাধনদীপিকা, নবপদ্য, গোপালচম্পু, লঘুভাগবত, চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক, ব্রজবিলাস, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, মুরারিগুপ্তকৃত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিত, উজ্জ্বলনীলমণি, গোবর্দ্ধনাশ্রয়, হরিভক্তিবিলাস, স্তবমালা, সঙ্গীতমাধব, বৈষ্ণবতোষিণী, শ্যামানন্দশতক, মথুরাখণ্ড প্রভৃতি বহুবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। সংস্কৃতশ্লোক প্রমাণস্বরূপ ব্যবহার করা পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক, কিন্তু উহা এদেশের চিরাগত প্রথানুযায়ী। নরহরি শুধু প্রথানুগামী নহেন, একটি নূতন প্রথার প্রবর্ত্তক। 'ভক্তিরত্নাকরে' চৈতন্যচরিতামৃত ও চৈতন্যভাগবত হইতে অনেক শ্লোক প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত হইয়াছে—ইহা দ্বারা নরহরিই সর্ব্বপ্রথম ভাষাগ্রন্থকে সংস্কৃতের ন্যায় সম্মানিত করিয়াছেন। ভক্তিরত্নাকরে' গোবিন্দদাস, নরোত্তম দাস, রায়বসন্ত প্রভৃতি বহুবিধ পদকর্ত্তার পদ সাময়িকপ্রসঙ্গ সৌষ্ঠবার্থ উদ্ধৃত হইয়াছে—তিনি নিজেও অনেকগুলি স্বীয় পদ তন্মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, তাঁহাদের কোন কোনটির ভণিতায় স্বীয় অপর নাম 'ঘনশ্যাম' ব্যবহার করিয়াছেন। এই পুস্তক ব্যতীত নরহরি

নরহরির অপরাপর রচনা।

প্রক্রিয়া পদ্ধতি, গৌরচরিতচিন্তামণি, গীতচন্দ্রোদয়, ছন্দঃসমুদ্র, শ্রীনিবাস-চরিত, ও নরোত্তম-বিলাস রচনা করেন। এই অপরিসীম কর্ম্মঠতা ও পাণ্ডিত্যের কীর্ত্তি বৈষ্ণব সাহিত্যে চিরদিনই সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবে। নরহরি ইতিহাসের দৃঢ়মন্দির পদাবলীর কোমল লতিকা দ্বারা বেষ্টন করিয়া পাষাণে কুসুম-সৌরভ প্রদান করিয়াছেন। নরোত্তম-

নরোত্তম-বিলাস।

বিলাস বোধ হয় তাঁহার শেষ গ্রন্থ; এই পুস্তকে ১২ বিলাসে নরোত্তমদাসের চরিত বর্ণিত হইয়াছে! ভক্তিরত্নাকর হইতে ইহা আকারে অনেক ক্ষুদ্র হইলেও ইহাতে নরহরির পরিণতশক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাতে শাস্ত্রজ্ঞান দেখাইবার ততদূর তীব্র আগ্রহ নাই, কিন্তু উপকরণরাশি শৃঙ্খলাবদ্ধ করিবার শক্তি ভক্তিরত্নাকর হইতেও অধিক লক্ষিত হয়।

সন্তোষদত্ত খেতুরীতে ছয়টি বিগ্রহ স্থাপন উপলক্ষে যে মহাসমারোহজনক উৎসব করেন, তাহাতে তাৎকালিক সমস্ত বৈষ্ণবমণ্ডলী আহূত হন। এই ঘটনাটি বৈষ্ণবসাহিত্যের অনেক পুস্তকেই বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই উৎসব, অতীত ইতিহাসে দুনিরীক্ষ্য ও অচিহ্নিত রাজ্যের একটি পথপ্রদর্শক আলোকস্তম্ভস্বরূপ। ইহার প্রভাবে আমরা সমাগত অসংখ্য বৈষ্ণবের মধ্যে পরিচিত কয়েক জন শ্রেষ্ঠ লেখককে অনুসরণ করিতে পারি। ইঁহারা ছায়ার ন্যায় ত্বরিতগতিতে আমাদের দৃষ্টি হইতে অপসৃত হইলেও সেই ক্ষণিক সাক্ষাৎকারের সুযোগ পাইয়া আমরা তাঁহাদের উত্তরীয়বস্ত্রে ১৫০৪ শক অঙ্কিত করিয়া দিয়াছি। এই উৎসব উপলক্ষে অনেক বৈষ্ণবলেখকের সময় নিরূপিত হইয়াছে।

খেতুরীর উৎসব।

নরহরির ইতিহাসের রচনা-প্রণালী অতি সরল,—গদ্যের ন্যায়; গদ্য লেখার প্রথা প্রচলিত থাকিলে ইনি বোধ হয় পদ্যচ্ছন্দে ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিতেন না। রচনার নমুনা এইরূপ,—

রচনার নমুনা।

"আচার্য্য অধৈর্য্য বাহে ধৈর্য্য প্রকাশিয়া। নরোত্তমে কৈলা স্থির যত্নে প্রবোধিয়া॥ প্রসাদী পাকান্ন সব লৈয়া থরে থরে। অতি শীঘ্র গেলেন সবার বাসাঘরে॥ সকল মহান্ত প্রতি কহে বারে বার। কালি এ খেতুরি গ্রাম হবে অন্ধকার॥ পদ্মাবতী পার হৈয়া পদ্মাবতী তীরে। করিবেন স্নান সবে প্রসন্ন অন্তরে॥ তথা ভুঞ্জিবেন এই প্রসাদী পাকান্ন। বুধরি গ্রামেতে গিয়া হইবে মধ্যাহ্ন। আগে যাইবেন গোবিন্দাদি কথোজন। সেই সঙ্গে পাককর্ত্তা করিবে গমন। রামচন্দ্রাদি এসঙ্গে যাইবেন তথা। বুধরি হইতে তাঁরা আসিবেন এথা।"—নরোত্তমবিলাস।

এই আড়ম্বরবিহীন লেখক যখন পদ রচনা করিয়াছেন, তখন তাঁহার লেখনী হইতে যেন অতি মুগ্ধকর পুষ্পবাস নিঃসৃত হইয়াছে; তাঁহার পদসমূহ সর্ব্বত্র সুপরিচিত। "গৌরচরিতচিন্তামণি" খানি নানামধুরালাপসম্বলিত রাগিণীতে পরিব্যক্ত একটি গানের ন্যায়; নিম্নে একটি স্থল উদ্ধৃত হইল;—

গৌরচরিতচিন্তামণি।

"নিশি গত শশিদরপ দূরে। অতিশয় দুঃখে চকোর ফিরে॥ পতিবিড়ম্বনলজ্জিত মনে। লুকাইল তারা গগনবনে॥ নদীয়ার লোক জাগিল ত্বরা। তেঁই বলি শেজ তেজহ গোরা॥ মোরে না প্রত্যয় করহ যদি। তবে পুছহ নরহরির প্রতি॥ * * * ময়ুর ময়ূরী পৃথক আছে॥ কেহা না আইসে কাহারো কাছে। বিরস হইয়া রৈয়াছে গাছে। তুমি না দেখিলে না নাচে তারা। ভ্রমর ভ্রমরী রুচির কুঞ্জে। ভুলি না বৈসয়ে কুসুম পুঞ্জে॥ কারে শুনাইব বলি না গুঞ্জে। ফিরয়ে বিপিনে ব্যাকুলপারা॥—২য় কিরণ।

প্রেমবিলাসরচক নিত্যানন্দদাসের কথা ৩২৪ পৃষ্ঠায় একবার উল্লেখ করিয়াছি; ইঁহার অপর নাম বলরামদাস,—ইনি শ্রীখণ্ডনিবাসী আত্মারামদাসের পুত্র, বৈদ্যবংশসম্ভূত ও ইঁহার মাতার নাম সৌদামিনী। ইনি পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান।

প্রেমবিলাস এবং অপরাপর পুস্তক।

প্রেমবিলাস ২০ অধ্যায়ে সমাপ্ত। ইঁহাতে শ্রীনিবাস ও শ্যামানন্দের কথাই মূলতঃ বর্ণিত হইয়াছে। প্রায় ৩৫০ বৎসর হইল, নিত্যানন্দদাস প্রেমবিলাস রচনা করেন। ইঁহার রচনা জটিল। ভক্তিরত্নাকর হইতে একটি স্থান উদ্ধৃত করিতেছি :—

প্রভুদত্ত শেষ নিদর্শন।

"দুই মহাশয়ের গুণ যে লিখিত আছে। পশ্চাতে লিখিব তাহা থাকি তার পাছে॥ এবে লিখি যে হইল বিরহ বেদনা; দেখিয়া কি প্রাণ ধরে দীন হীন জনা॥ সনাতনের দশা দেখি রূপে চমৎকার। তুমি এমন হৈলে মরণ হইবে সবার॥ প্রভুর দ্বিতীয় দেহ তুমি মহাশয়। তোমারে ব্যাকুল দেখি কার বাহ্য হয়॥ নানা যত্ন করি রূপে চেতন করাইল। দারুণ বিরহকম্প দ্বিগুণ বাড়িল॥ সেদিন হইতে সনাতন অস্থির হইল। গৌরাঙ্গবিরহব্যাধি দ্বিগুণ বাড়িল॥ চিন্তিত হইলা পাছে দেখি সনাতন। শূন্য পাছে গোবিন্দ করেন বৃন্দাবন॥ সম্বিত পাইয়া রূপ আসন লইয়া। ভট্টের নিকটে যান গৌরব করিয়া॥ দুই ভাই দুই দ্রব্য যত্ন করি বুকে। ভট্টের বাসাকে গেলা পাইয়া বড় সুখে॥ দিলেন আসন ডোর দণ্ডবৎ করি। পত্র পড়ি শুনাইলা পত্রের মাধুরী॥ পত্রের গৌরব শুনি মূর্চ্ছিত হইলা। আসন বুকে করি ভট্ট কাঁদিতে লাগিলা॥ যত্ন করি শ্রীপদ করেন কিছু স্থির। সনাতন দেখি ভট্ট হইলেন ধীর॥ সনাতন কহে ভট্ট শুন গোসাঞি। কথার কালে বসিবা আসনে দোষ নাঞি॥ প্রভুর আসনে আমি কেমনে বসিব। আজ্ঞা করিয়াছেন প্রভু কেমনে উপেক্ষিব॥ প্রভু আজ্ঞা বলবতী শ্রীরূপ কহিলা। গলে ডোর করি ভট্ট কাঁদিতে লাগিলা॥"

ইহার পূর্ব্বে যদুনন্দনদাসের 'কর্ণানন্দ' নামক গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছি,—ইহা আকারে চৈতন্য-চরিতামৃতের অর্দ্ধেক হইবে। কর্ণানন্দ সপ্ত অধ্যায়ে বিভক্ত; এই পুস্তকে শ্রীনিবাস আচার্য্য ও তাঁহার শিষ্যবর্গের কথা সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার রচনা সম্বন্ধে গ্রন্থকার নিজে এই লিখিয়াছেন,—

"বুধইপাড়াতে রহি শ্রীমতী * নিকটে। সদাই আনন্দে ভাসি জাহ্নবীর তটে॥ পঞ্চদশশত আর বৎসর উনত্রিশে। † বৈশাখ মাসেতে আর পূর্ণিমা দিবসে॥ নিজপ্রভুপাদপদ্ম মস্তকে ধরিয়া॥ সমাপ্ত করিল গ্রন্থ শুন মন দিয়া॥"

প্রেমদাসের (অপর নাম পুরুষোত্তম) "বংশী-শিক্ষার" নামও ৩২৪ পৃষ্ঠায় আমরা একবার উল্লেখ করিয়া গিয়াছি। "বংশীশিক্ষা"—আকারে যদুনন্দনদাসের 'কর্ণানন্দের' তুল্যই হইবে। মহাপ্রভুর গৃহত্যাগ ও সন্ন্যাস এবং গৌরাঙ্গপার্ষদ বংশীঠাকুরের জন্মাদি ও তাঁহার শিক্ষাপ্রসঙ্গবর্ণনই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। প্রেমদাস ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার উপাধি "সিদ্ধান্তবাগীশ" ছিল। ইনি "বংশী-শিক্ষা" ও স্বকৃত "চৈতন্যচন্দ্রোদয়" নাটকের অনুবাদ সম্বন্ধে এই পরিচয় দিয়াছেন,—

* শ্রীনিবাসাচার্য্যের কন্যা হেমলতা ঠাকুরাণী।

† ১৫২৯ শক অর্থাৎ ১৬০৭ খৃষ্টাব্দে।

"শকাদিত্য ষোলশত চৌত্রিশ শকেতে। * শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক সুখেতে॥ লৌকিক ভাষাতে মুঞি করিনু লিখনে। ষোলশত অষ্টত্রিংশ শকের গণনে॥ † শ্রীশ্রীবংশীশিক্ষা গ্রন্থ করিনু বর্ণন। নিজ পরিচয় তবে শুন ভক্তগণ॥"—বংশীশিক্ষা।

ঈশাননাগরের অদ্বৈতপ্রকাশ আমরা ঐতিহাসিক ভাবে বিশেষ প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া মনে করিতে পারি না, ইহাতে ঈশাননাগর নিতান্ত অতি-প্রাকৃত কথায় আস্থা স্থাপন করিয়া স্বর্গ ও পৃথিবী একটি কল্পনার সূত্রে জড়াইয়া ফেলিয়াছেন। অদ্বৈতপ্রভু স্বয়ং মহাদেবভাবে ক্ষীরোদসমুদ্রতীরে তপস্যায় মগ্ন, শ্রীহরি গৌরাবতারের কথা অঙ্গীকার করিয়া শূলপাণিকে অদ্বৈতরূপে পূর্ব্বেই মর্ত্ত্যধামে অবতীর্ণ হইতে বলিতেছেন, মুখ-বন্ধটি এরূপ। তৎপর গৌরাঙ্গ জন্মগ্রহণ করিয়াই এই অদ্বৈতরূপী মহাদেবটিকে চিনিতে পারিলেন। সেই সদ্যোজাত শিশু স্বর্গ মর্ত্ত্যের নানা কথার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন, ঈশাননাগর সেই কথা-বার্ত্তার সমস্তই লিপিবদ্ধ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন।

অদ্বৈত প্রকাশ।

এই সমস্ত অমানুষীতত্ত্ব প্রাচীন বৈষ্ণব সাহিত্যের সর্ব্বত্রেই সুলভ; কিন্তু পুঁথির অধিকাংশই যদি তদ্দ্বারা পূর্ণ করা হয়, তবে পাঠ করিবার ধৈর্য্য রাখা কঠিন হইয়া পড়ে। ঈশাননাগর নিজে যাহা দেখিয়াছিলেন সেই অংশের যদি পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিতেন, তবে গ্রন্থখানি উপাদেয় হইতে পারিত, —তাঁহার বর্ণনাশক্তি বেশ ছিল,—লেখা সহজ, সুন্দর ও তন্মধ্যে কবিত্বের একেবারে স্ফুরণ না ছিল, এমন নহে। তিনি শ্রুত কথার উপর এবম্বিধ প্রাণঢালা আস্থা স্থাপন না করিলে ভাল হইত;—যেটুকু নিজে দেখিয়াছেন, সেই প্রসঙ্গগুলি বেশ সরস হইয়াছে। গ্রন্থশেষে নিজের কথা, বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর অবস্থা, শান্তিপুরে গৌরাঙ্গমিলন, এ সকল আখ্যান উপাদেয় হইয়াছে, স্থানে স্থানে করুণ-রসের প্রবাহ উচ্ছলিত হইয়াছে। এখানে এ কথাও বলা আবশ্যক,—প্রাচীন পুঁথি কোনখানিই একেবারে মূল্যহীন নহে,—অদ্বৈতপ্রকাশেও কতক পরিমাণে ঐতিহাসিক তত্ত্ব পাওয়া গিয়াছে। মহা-প্রভুর জন্মের ঠিক ৫২ বৎসর পূর্ব্বে অদ্বৈত আবির্ভূত হন,—("অহে বিভু আজি দ্বিপঞ্চাশ বর্ষ হৈল। তুয়া লাগি ধরাধামে এ দাস আসিল॥") তাঁহার জীবন অতি দীর্ঘ হইয়াছিল, ১২৫ বৎসর এই ঘোর কলিযুগে কাল্পনিক আয়ু বলিয়া বোধ হয়,—কিন্তু আমরা ঈশাননাগরকে এ বিষয়ে অবিশ্বাস করি নাই।—"সওয়া শত বর্ষ প্রভু রহি ধরাধামে। অনন্ত অর্ব্বুদ লীলা কৈলা যথাক্রমে॥"—অবশ্য "অনন্ত অর্ব্বুদ লীলা" সম্বন্ধে আপত্তি হইতে পারে,—কিন্তু প্রভুবর্গের খাওয়া, দাওয়া, শোওয়া, এ সমস্তই

* ১৬৩৪ শক অর্থাৎ ১৭১২ খৃষ্টাব্দ।

† ১৬৩৮ শক অর্থাৎ ১৭১৬ খৃষ্টাব্দ।

যখন ভক্তগণ লীলা সংজ্ঞায় অভিহিত করেন, তখন এ আপত্তিকর কোন কারণ নাই। অদ্বৈত ১৪৩৩ খৃঃ অঃ জন্মগ্রহণ করেন ও ১৫৫৭ খৃঃ অব্দে তিরোহিত হন, এই পুস্তক হইতে ইহা জানা গেল। কয়েকজন পণ্ডিত সন্দিহান হইয়া এই তারিখগুলি সম্বন্ধে সম্প্রতি যে সকল আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের বিশ্বাস কতকটা টলিয়াছে। অদ্বৈত প্রকাশ হইতে জানা যাইতেছে, অদ্বৈতপ্রভুর পূর্ব্বপুরুষ নারসিংহ নাড়িয়াল গৌড়ের হিন্দু সম্রাট রাজা গণেশের মন্ত্রী ছিলেন।—"সেই নারসিংহ নাড়িয়াল বলি খ্যাতি। সিদ্ধশ্রোত্রিয়াখ্য আর ওঝার সন্ততি॥ যাহার মন্ত্রণা বলে শ্রীগণেশ রাজা। গৌড়ীয় বাদসাহ মারি গৌড়ে হৈল রাজা॥" এই নাড়িয়াল বংশোদ্ভূত বলিয়াই মহাপ্রভু অদ্বৈতকে "নাড়া বুড়া" কিম্বা শুধু "নাড়া" বলিয়া আহ্বান করিতেন, এ সকল কথা আমরা পূর্ব্বেই লিপিবদ্ধ করিয়াছি। ইতিপূর্ব্বে বিদ্যাপতিপ্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে,অদ্বৈতপ্রভুর সঙ্গে কবি বিদ্যাপতির দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছিল, এ কথা অদ্বৈতপ্রকাশ ভিন্ন অন্য কোন পুস্তকে পাওয়া যায় নাই। অদ্বৈত-প্রভুর নাম ছিল কমলাক্ষ-আচার্য্য, ও তাঁহার উপাধি ছিল "বেদ পঞ্চানন"। মহাপ্রভু অদ্বৈতের নিকট কতক দিন পড়িয়াছিলেন ও 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। তাহা হইলে চৈতন্য-দেবের পূর্ণনাম এইরূপ পাওয়া গেল,—"শ্রীবিশ্বম্ভর মিশ্র বিদ্যাসাগর"—এই উপাধিবিশিষ্ট নামটি কৌতুকাবহ। অদ্বৈতপ্রকাশে চৈতন্যদেবের তিরোধানের পরে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর যে অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাও একটি নবাবিষ্কৃত ঐতিহাসিক চিত্রপট। সেই চিত্র শোকে সকরুণ, ব্রত উদ্‌যাপনে পবিত্র ও কঠোর পাতিব্রত্যে মহিমান্বিত,—এই চিত্রের বিষ্ণুপ্রিয়া-মূর্ত্তি সর্ব্বতোভাবে মহাপ্রভুর সহধর্ম্মিণীর উপযুক্ত,—ঈশাননাগর চাক্ষুষ যাহা দেখিয়াছেন, তাহা লিখিয়া এস্থলে করুণার প্রস্রবণ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

এস্থলে ঈশাননাগরের একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। ঈশান ব্রাহ্মণ ছিলেন, ১৪৯২ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন,—তাঁহার পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহার বিধবা মাতা অদ্বৈতপ্রভুর পরিবারে আশ্রয় গ্রহণ করেন, তদবধি ঈশান সেইখানে। ঈশান ৭০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে অদ্বৈত-রমণী সীতাদেবীর আদেশে বিবাহ করেন। ৭০ বৎসর পর্য্যন্ত তিনি বিবাহ করেন নাই, পবিত্র কৌমারব্রত ধারণ করিয়াছিলেন ইহাতে তাঁহার জীবনের বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হইবে। শান্তিপুরে এক দিন তিনি মহাপ্রভুর পা ধোয়াইয়া দিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, মহাপ্রভু তাঁহাকে ব্রাহ্মণ জানিয়া বারণ করেন। তখন ঈশান উপবীত ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিলেন,—ঈশান ধর্ম্ম-জগতে সত্যই একটি বলবান্ পুরুষ ছিলেন, স্বীকার করিতে হইবে।

কেহ কেহ বলেন, ঈশান পদ্মাতীরস্থ তেওথা গ্রামে বিবাহ করেন। 'অদ্বৈতপ্রকাশ' তাঁহার বৃদ্ধ বয়সের রচনা, ১৫৬০ খৃঃ অব্দে এই পুস্তক সম্পূর্ণ হয়। তিনি বৃদ্ধকালে শ্রীহট্টস্থ লাউড় নগরে যাইয়া

ধর্ম্ম প্রচার করিতে আদিষ্ট হন,—লাউড়-রাজ্য নষ্ট হইবার পরে তাঁহার বংশধরগণ গোয়ালন্দের নিকট ঝাঁকপাল গ্রামে বসতি স্থাপন করেন।

অদ্বৈতপ্রভুর পুত্র অচ্যুত-শিষ্য হরিচরণদাস একখানি 'অদ্বৈতজীবনী' প্রণয়ন করেন। শ্রীহট্টস্থ নবগ্রামবাসী বিজয়পুরী 'গ্রামসম্পর্কে অদ্বৈতপ্রভুর মাতা' নাভাদেবীর মাতুল ছিলেন! হরিচরণদাস অনেক কথাই তাঁহার নিকট শুনিয়া এই জীবনী প্রণয়ন করিয়াছেন। এই পুস্তক ২৩ "সংখ্যায়" (অধ্যায়ে) বিভক্ত। ইহাতে জানা যায়, অদ্বৈতপ্রভুর ৬ জন জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিলেন; তাঁহাদের নাম,—

হরিচরণদাসের অদ্বৈত-মঙ্গল।

১। লক্ষ্মীকান্ত, ২। শ্রীকান্ত, ৩। শ্রীহরিহরানন্দ, ৪। সদাশিব, ৫। কুশল, ৬। কীর্ত্তিচন্দ্র। আরও জানা যায়, অদ্বৈতপ্রভু মাঘমাসের সপ্তমীতিথিতে জন্মগ্রহণ করেন, উহা অবশ্য ১৪৩৩ খৃঃ অব্দে হইবে। শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বসু মহাশয় এই পুস্তক সম্বন্ধে ১৩০৩ সালের মাঘ মাসের পরিষৎ-পত্রিকায় একটি বিস্তারিত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

নরহরিদাস (শ্রীখণ্ডের প্রসিদ্ধ নরহরি সরকার নহেন) বন্দনাসূচক একটি পদে লিখিয়াছেন, "জয় জয় নরহরি শ্রীখণ্ডনিবাসী। যার প্রাণসর্ব্বস্ব শ্রীগৌর গুণরাশি।" নিজের পরিচয়স্থলে শুধু "অতি অকিঞ্চন", "মহামূর্খ" প্রভৃতি সংজ্ঞা গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণবোচিত বিনয় দেখাইয়াছেন। বন্দনার পদগুলির মধ্যে একটি কৃষ্ণদাস কবিরাজের উদ্দেশ্যে লিখিত হইয়াছে। সুতরাং গ্রন্থকার কৃষ্ণদাস কবিরাজের পরবর্ত্তী এইমাত্র জানা যাইতেছে।

নরহরিদাসের অদ্বৈত-বিলাস।

এই পুস্তকে অদ্বৈত সম্বন্ধে বিশেষ কোন তত্ত্ব খুঁজিয়া পাই নাই, অদ্বৈতের জন্ম, তাঁহার শৈশবের হামাগুড়ি ও কথা বলিতে শিক্ষা সম্বন্ধে দীর্ঘ বর্ণনা আছে। অর্থাৎ যে সকল ঘটনা সকল শিশু সম্বন্ধেই বর্ণিত হইতে পারিত, অদ্বৈতসম্বন্ধেও সেই প্রসঙ্গগুলি আড়ম্বরের সহিত লিখিত হইয়াছে। কিন্তু এতদ্বর্ণিত প্রসঙ্গগুলি দ্বারা প্রাচীন ইতিহাসের কোন নূতন পৃষ্ঠা উজ্জ্বল হইয়া উঠে নাই। আমরা যে পুস্তকখানি পাইয়াছি, তাহা খণ্ডিত,—মাত্র ১৫ পত্র। রচনা বেশ প্রাঞ্জল ও মধুর; একটুকু নমুনা উদ্ধার করিতেছি:—"নদীয়া-বেষ্টিত গঙ্গা বহে সুনির্ম্মল। অপূর্ব্ব তরঙ্গ দুগ্ধ জিনি শ্বেত জল॥ স্রোতজল পরিপূর্ণ শোভার অবধি। বুঝি কুন্দমালা নবদ্বীপে দিল বিধি॥ ঝলমল করে গঙ্গাতট মনোরম। শত শত ঘাটশ্রেণী অতি অনুপম॥ নানা জাতি বৃক্ষ শোভা করে সারি সারি। বিবিধ প্রকার লতা সর্ব্ব-চিত্তহারী॥ স্থানে স্থানে নানা জাতি পুষ্পের কানন। তাহে মহামত্ত হৈয়া ভ্রমে ভৃঙ্গগণ॥ নানা পক্ষী শব্দ করে অতি মনোহর। মৃগ আদি পশু তথা ফিরে নিরন্তর॥" -পরিষদের পুঁথি, ৫।৬ পত্র।

অদ্বৈতের দুই স্ত্রী—শ্রী ও সীতা। সীতা ঠাকুরাণীর প্রভাব সেই সময়ের বৈষ্ণবসমাজের উপর

বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হয়। অনেক সাধু বৈষ্ণব সীতাঠাকুরাণীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়া ধন্য হন। লোকনাথ দাস 'সীতা-চরিত্রে' সুচরিত্রা রমণীর জীবন বর্ণনা করিয়াছেন। 'সীতা-চরিত্র' বিশেষ বড় পুস্তক নহে, ইহা দশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। রচনা সহজ ও সুন্দর, কিন্তু অলৌকিক ঘটনাপূর্ণ, ঐতিহাসিকের নিকট এই পুস্তক বিশেষ সমাদৃত হইবে কি না সন্দেহ। শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি মহাশয় অনুমান করেন, 'সীতাচরিত্র' লেখক লোকনাথদাস এবং প্রসিদ্ধ ভক্ত ব্রজবাসী লোকনাথ অভিন্ন ব্যক্তি। বৈষ্ণব জগতের গুরু স্থানে সমাসীন, মহাপ্রভুতে তদ্গতপ্রাণ, যশোহর তালগড়ি গ্রামবাসী পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তীর একমাত্র পুত্র লোকনাথ গোস্বামী সম্পূর্ণ বিষয়নিস্পৃহ বৈষ্ণব, উদাসীন ও ভক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ। তিনি কৃষ্ণদাস কবিরাজকে 'চৈতন্য চরিতামৃতে' তাঁহার নাম উল্লেখ করিতে নিষেধ করেন,—কোনওরূপে খ্যাতি লাভে তাঁহার ইচ্ছা ছিল না, তিনি যে 'সীতাচরিত' লিখিয়াছেন, তাহার কোন উল্লেখ বৈষ্ণবগ্রন্থে পাওয়া যায় নাই। তাঁহার ন্যায় বৈষ্ণবাগ্রগণ্যের রচিত কোন পুস্তক থাকিলে, বৈষ্ণবসমাজে তাহার বহুল প্রচার থাকিত; অন্ততঃ পরবর্ত্তী বৈষ্ণবগ্রন্থসমূহের অনেকখানিতে তাহার উল্লেখ দৃষ্ট হইত। সীতা-চরিত্রে চৈতন্যচরিতামৃতের উল্লেখ পাওয়া যায়। শেষোক্ত গ্রন্থ রচিত হওয়ার পর লোকনাথ গোস্বামী 'সীতা-চরিত্র' লেখা আরম্ভ করিলে, তৎকালে তাঁহার বয়ঃক্রম অন্যূন শত বৎসর হইবার কথা।* নানা কারণে ভক্তপ্রবর লোকনাথ গোস্বামী 'সীতাচরিত্র' লিখিয়াছিলেন বলিয়া আমাদের ধারণা হয় না। 'সীতাচরিত্রে' দুএকটি নূতন কথা পাওয়া গিয়াছে; মহাপ্রভুর তিরোধানের পরেও শচীদেবী জীবিত ছিলেন, নন্দিনী ও জঙ্গলী নামক সীতা ঠাকুরাণীর দুই শিষ্য ছিলেন, তাঁহাদের অনেক আশ্চর্য্য শক্তির কথা, জাম্বুবায়ের প্রসঙ্গ প্রভৃতি বিষয় এই পুস্তকে প্রাসাঙ্গিকভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

লোকনাথদাসের সীতা চরিত্র।

উড়িষ্যাবাসী গোপীবল্লভদাস বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় শকাব্দ পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে "রসিক-মঙ্গল" নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। প্রসিদ্ধ শ্যামানন্দের প্রধান শিষ্য রাজা অচ্যুতানন্দের পুত্র রসিক মুরারির চরিত্রই এই পুস্তকের বর্ণনীয় বিষয়। গ্রন্থকার রসিক মুরারির শিষ্য ছিলেন। তিনি নিজ পিতামাতা প্রভৃতির কথা গ্রন্থে লিখিয়াছেন, তাহা এই;—

রসিক-মঙ্গল।

"চরণে লোটায় বন্দো রসময় পিতা। তবে ত বন্দিনু মাতাজিউ পতিব্রতা। পতিপত্নী দোঁহে আর পুত্র পাঁচ জন। রসিকচরণে সবে পশিয়ে৷ শরণ॥ খুল্লতাত বন্দিনু বংশীমধুরা দাস। আগ্ন শ্যামানন্দীতে যাহার প্রকাশ॥ গোপকুলে

* ১৪৩২ শকে বৃন্দাবনে তিনি আগমন করেন, মহাপ্রভু তাঁহাকে তথায় কঠোর ব্রত অবলম্বনে নিযুক্ত করেন, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম কখনই ২৫ বৎসরের ন্যূন হওয়া সম্ভাবিত নহে,—১৫০৩ শকে চৈতন্যচরিতামৃত রচিত হয়, তাহার পরে সীতা চরিত রচিত হইলে প্রায় একশত বৎসরের হিসাব পাওয়া যাইতেছে।

মো সবার হইল উৎপত্তি। শ্যামানন্দ পদদ্বন্দ্ব কুল শীল জাতি॥ গোপীজনবল্লভ হরিচরণ দাস। মাধব রসিকানন্দ কিশোরের দাস॥ জাতি ধন প্রাণ যার অচ্যুতানন্দ। শ্রীরসময় নন্দন ভাই পঙ্কজন॥ বল্লভের সুত রাধাবল্লভ বিখ্যাত। রসিকেন্দ্র চূড়ামণি যার পিতা-মাতা॥ সগোষ্ঠী সহিত তারা রসিক কিঙ্করে। রসিক সঙ্গেতে তারা সতত বিহরে॥"

গ্রন্থ-খানি ৪ ভাগে ১৬ লহরীতে পূর্ণ। আকারে লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গলের' তুল্য হইবে।

রসিকানন্দের জন্ম (১৫১২ শক) ১৫৯০ খৃঃ অব্দে। গ্রন্থকার স্বীয় গুরু রসিকের সমকালিক। গ্রন্থরচনার তারিখ পাওয়া যায় নাই। 'রসিক মঙ্গল' কলিকাতা সংস্কৃত প্রেস্ ডিপজিটরি হইতে কতক দিন হইল প্রকাশিত হইয়াছে।

মনঃসন্তোষিণী এবং অপরাপর পুস্তক।

প্রায় ২০০ শত বৎসর হইল, মহাপ্রভুর পিতামহ উপেন্দ্রমিশ্র বংশোদ্ভব জগজ্জীবনমিশ্র "মনঃ-সন্তোষিণী" নামক একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রণয়ন করেন; ইহাতে মহাপ্রভুর শ্রীহট্টভ্রমণবৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে। জগজ্জীবনমিশ্রের বাড়ী শ্রীহট্টের ঢাকাদক্ষিণগ্রামে, অর্থাৎ যেখানে উপেন্দ্রমিশ্রের বাড়ী ছিল। জগজ্জীবন-মিশ্র মহাপ্রভুর পিতা জগন্নাথমিশ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পরমানন্দমিশ্র হইতে ৮ম পর্য্যায়ে উৎপন্ন। এই সকল পুস্তক ছাড়া 'মহাপ্রসাদ বৈভব', 'চৈতন্যগণোদ্দেশ', 'বৈষ্ণবাচারদর্পণ' প্রভৃতি পুস্তকও চরিত-শাখার অন্তর্গত। আরও রাশি রাশি পুস্তক রহিয়া গেল, তাহাদিগের নামোল্লেখ করিতে আমাদের শক্তি ও সময় নাই। এই নিবিড় জঙ্গলে প্রবেশ করিলে ধৈর্য্যহারা ও পথহারা হইতে হয়। যদিও এই পুস্তক-সমূহের অনেকগুলিকেই কাল প্রতিবৎসর কীট ও অগ্নির মুখে উপহার দিতেছেন এবং তাহাদের একঘেয়ে মৃদঙ্গ বাদ্যের ন্যায় বর্ণনা শুনিতে শুনিতে বিরক্ত হইয়া আমরাও কালের ধ্বংস ক্রীড়ায় কিছুমাত্র আপত্তি প্রকাশ করিতে প্রবৃত্তি বোধ করি না—তথাপি বৈষ্ণব-ধর্ম্মের যে মহতী শক্তিতে এই সুপ্রসার সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, যে অধ্যবসায়-সিন্ধু হইতে অবিরত এইরূপ সাহিত্যিক শক্তির প্রবল তরঙ্গ ও বুদ্‌বুদ উত্থিত হইয়াছে, সামাজিক জীবনে সেই বিরাট আন্দোলন ও কর্ম্মঠতার ব্যাপার দেখিলে মনে হয় না বঙ্গদেশীয়গণ শবের ন্যায় নিশ্চেষ্ট অবস্থায় পড়িয়া ছিল, বিদেশী শাসনকর্ত্তৃগণের ভেরীধ্বনিতে এইমাত্র তাহারা হাই তুলিয়া জাগিয়া বসিয়াছে!

৭ম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট।

সপ্তম অধ্যায়ে বৈষ্ণব-সাহিত্যের ব্যাখ্যা ও অনুবাদসংক্রান্ত পুস্তকের আলোচনা করা হয় নাই, —স্থলে স্থলে উল্লেখ মাত্র করিয়াছি। অনুবাদ ও ব্যাখ্যা বিষয়ক পুস্তকও বিস্তর; স্বতন্ত্র অধ্যায়ভাগ করিয়া ব্যাখ্যাশাখা ও অনুবাদশাখার আলোচনা করিতে গেলে, গ্রন্থের পরিসর বড় বাড়িয়া যাইবে; তাই অধ্যায়ভাগে সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু না বলিয়া এস্থলে সংক্ষেপে তাহাদিগের উল্লেখ করিয়া যাইতেছি।

অনুবাদ গ্রন্থাবলী।

আগরদাসের শিষ্য নাভাজী রচিত হিন্দী "ভক্তমাল" শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য কৃষ্ণদাস বাবাজী অনুবাদ করেন। ভক্তমালে বহুসংখ্যক বৈষ্ণব মহাজনগণের জীবন বর্ণিত হইয়াছে। আদত হিন্দী ভক্তমালগ্রন্থ নাভাজীর শিষ্য প্রিয়দাস স্বকৃত টীকা দ্বারা বিস্তারিত করিয়াছেন; কৃষ্ণদাস তন্মধ্যে আরও বহুসংখ্যক বৈষ্ণবের জীবনী প্রদান করিয়া এবং প্রিয়দাসের টীকার বিস্তার করিয়া গ্রন্থকলেবর দ্বিগুণ পরিমাণে বাড়াইয়াছেন; তিনি নিজে ভাল হিন্দী জানিতেন না; সুতরাং এই গ্রন্থ রচনা করিতে তাঁহার বিশেষ শ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছিল; তিনি নিজেই তাহা লিখিয়াছেন;—

ভক্তমাল।

"গ্রন্থ হয় ব্রজভাষা সব বুঝি নহি। যেহেতু গৌড়ীয় বাক্যে শ্রেণীমত কহি। রচনা পুর্ব্বক কহিবারে নাহি জানি। যথাশক্তি করযোড়ে মিলাইয়া ভণি॥ উপহাস কেহ নাহি করিহ ইহাতে। বৈষ্ণবের গুণগান করি যেতেমতে॥ অতএব টীকার অর্থ বুদ্ধি সাম্যমতে। রচিয়া কহিব মাত্র মন বুঝাইতে। যথা যথা প্রিয়দাস সংক্ষেতে অতি। বনিলা না প্রবেশের সাধারণ মতি॥ সেই সেই কোন কোন স্থানে কিছু কিছু। বিস্তার করিয়া কহি তার পিছু পিছু॥"—ভক্তমালগ্রন্থ।

ভক্তমালের বঙ্গীয় অনুবাদের আকার চৈতন্যভাগবতের তুল্য।

পূর্ব্বের এক অধ্যায়ে গুণরাজ খাঁ সঙ্কলিত ভাগবতের ১০ম ও ১১শ স্কন্ধের অনুবাদ বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। বিষ্ণুপুরীঠাকুর ভাগবতকে আশ্রয় করিয়া 'রত্নাবলী' নামক একখানি সংস্কৃতকাব্য প্রণয়ন করেন। অদ্বৈতপ্রভুর সমকালিক "লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস" এই রত্নাবলীর একখানি বাঙ্গালা অনুবাদ রচনা করেন। আমরা অনুবাদপুস্তকের মুখবন্ধ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি;—

ভক্তি-রত্নাবলীর অনুবাদ।

"শ্রীকৃষ্ণপুরী ঠাকুর ভকত সন্ন্যাসী। জীব-নিস্তারিলা কৃষ্ণ ভকতি প্রকাশি॥ বিচারি বিচারি ভাগবত পয়োনিধি॥ বিষ্ণুভক্তিরত্নাবলী প্রকাশিলা নিধি॥ প্রতি অধ্যায় বিচারিয়া দ্বাদশ স্কন্ধ। সার শ্লোক উদ্ধারিয়া করিলা প্রবন্ধ॥

নানান প্রকার শ্লোক ব্যাখ্যা করি সাধু। তথাপি জীবের তরে সিঞ্চিলেক মধু॥ অষ্টাদশ সহস্র শ্লোক ভাগবত। তা হইতে উদ্ধার করিলা শ্লোক চারিশত॥ বিষ্ণুপুরী ঠাকুর রচিল রত্নাবলী। কৃষ্ণদাস গাইলেক অদ্ভুত পাঁচালী।"*

অনুবাদপুস্তকে কবিত্ব প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিলে মূলের ভাব বজায় থাকে না, আবার একবারে কবিত্ববিহীন হইলেও অনুবাদ কিংশুকের ন্যায় পরিত্যাজ্য হয়, সুতরাং ভাল একখানি অনুবাদ রচনা করা বড় বিষম ব্যাপার। কৃষ্ণদাসের হাতে অনুবাদটি মন্দ হয় নাই, সেকেলে ভাষায় যতদূর কুলাইয়াছিল, কৃষ্ণদাস ততদূর মার্জ্জিত রচনার আদর্শ দেখাইয়াছেন, স্বীকার করিতে হইবে; যথা :—

ভ্রমর রময়ে যেন কমলের মাঝে। মোর মন তেন রমৌক তোমা পদাম্বুজে॥ যেই পুষ্প থাকয়ে কণ্টক অভ্যন্তরে। তাহাতে প্রবেশিয়া কি ভ্রমরা নাহি চরে॥ সহস্র বিপদ মোর থাকুক সর্ব্বক্ষণ। তোমা পদ-কমল চিন্তয় যদি মন॥ সুবর্ণ মুকুট থাকে সেহ যেন ভার। যেই শিরে কৃষ্ণপদ না কৈল নমস্কার॥ জগন্নাথ মূর্ত্তি যেই না কৈল নিরীক্ষণ। ময়ূরের পুচ্ছ তার দুইটি নয়ন॥"

এখন "লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস" কে, তৎসম্বন্ধে কিছু লিখিতেছি। শ্রীহট্টে লাউড় নামে একটি স্থান আছে। ৪৫০ বৎসরের অধিক হইল সেখানে দিব্যসিংহ নামক এক জন হিন্দু রাজা ছিলেন। অদ্বৈতপ্রভুর পিতা কুবের পণ্ডিত ইঁহার মন্ত্রী; পরে কুবের গঙ্গাবাস হেতু সপরিবারে শান্তিপুরে আগমন করেন, ইহারও পরে যখন অদ্বৈত ভক্তিতত্ত্ব প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হন, দিব্যসিংহ তখন অতি বৃদ্ধ, তিনি পুত্রের উপর রাজ্যভার দিয়া শান্তিপুরে বাস করেন। তাঁহারই বৈষ্ণবাবস্থার নাম কৃষ্ণদাস। পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, কৃষ্ণদাস অদ্বৈতের 'বাল্যলীলা' বর্ণনা করেন, অদ্বৈতশিষ্য ঈশাননাগর স্বীয় "অদ্বৈতপ্রকাশে" উক্ত পুস্তকে উল্লেখ করিয়াছেন যথা,—"লাউড়িয়া কৃষ্ণদাসের বাল্যলীলা সূত্র। যে গ্রন্থ পড়িলে হয় ভুবন পবিত্র॥"

মহাপ্রভুর শ্যালক মাধব মিশ্র কর্ত্তৃক একখানি ভাগবতানুবাদ প্রণীত হয়। ইহা ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের একটি সরল ও সুন্দর বঙ্গানুবাদ। এই পুস্তকখানির নাম 'কৃষ্ণমঙ্গল' ও ইহা মহাপ্রভুর পদে উৎসর্গ করা যায়; মাধব মহাপ্রভুর টোলের ছাত্র ছিলেন। 'প্রেমবিলাসে' ইঁহার পরিচয় এই ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে;—

দ্বিজমাধবের 'কৃষ্ণমঙ্গল'।

"দুর্গাদাস মিশ্র সর্ব্ব গুণের আকর। বৈদিক ব্রাহ্মণ বাস নদীয়া নগর॥ তাঁহার পত্নীর হয় শ্রীবিজয়া নাম। প্রসবিলা দুই পুত্র অতি গুণধাম॥ জ্যেষ্ঠ সনাতন হয় কনিষ্ঠ কালিদাস। পরমপণ্ডিত সর্ব্বগুণের আবাস॥ সনাতন পত্নীর নাম হয় মহামায়া। এক কন্যা প্রসবিলা নাম বিষ্ণুপ্রিয়া॥ আর এক পুত্র হৈল অতি গুণধাম। শ্রীযাদব তার হয় আখ্যান॥ কালিদাস মিশ্র পত্নী বিধুমুখী নাম। প্রসবিলা পুত্ররত্ন সর্ব্বগুণধাম॥ * * * * শ্রীমৎভাগবতের শ্রীদশম স্কন্ধ।

* এই গ্রন্থের প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি ত্রিপুরেশ্বরের সেক্রেটরী বৈষ্ণব চূড়ামণি স্বর্গীয় রাধারমণ ঘোষ বি, এ মহাশয়ের নিকট ছিল, তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে দেখিতে দিয়াছিলেন।

গীতবর্ণনাতে তিঁহো করি নানা ছন্দ॥ রাখিল গ্রন্থের নাম শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল। শ্রীচৈতন্যপদে তাহা সমর্পণ কৈল॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তারে কৈল অনুগ্রহ। সর্ব্ব ভক্তগণ তারে করিলেক স্নেহ॥"—বিলাস।

অন্যত্র প্রেমবিলাসে—

"শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীদশম স্কন্ধ।
রচিলা মাধব দ্বিজ করি নানা ছন্দ॥

মাধম মিশ্রের "শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল" ব্যতীত "প্রেমরত্নাকর" নামক আর একখানি (সংস্কৃত) কাব্য আমরা দেখিয়াছি। পরবর্ত্তী সময়ে ভাগবতেরও আরও কয়েক খানি অনুবাদ সঙ্কলিত হইয়াছিল, তদ্বিবরণ আমরা পরে লিপিবদ্ধ করিব।

অপর কয়েকখানি অনুবাদ ও ব্যাখ্যাপুস্তক।

যদুনন্দন দাস কৃত "গোবিন্দলীলামৃতের" বঙ্গানুবাদ সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ স্বীয় 'গোবিন্দলীলামৃত'খানি পরিণত পাণ্ডিত্যে ও কবিত্বে সাজাইয়াছেন—যদুনাথ দাসের অনুবাদটিতে মূলের সৌন্দর্য্য বেশ রক্ষা পাইয়াছে। এই পুস্তকে শ্রীমতী রাধা ও তাঁহার সখীগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মধুর লীলা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। অনুবাদপুস্তক আকারে চৈতন্যমঙ্গলের তুল্য হইবে। ইহা ছাড়া যদুনন্দন দাস রূপগোস্বামীর 'বিদগ্ধমাধব' ও বিল্বমঙ্গলঠাকুরের 'কৃষ্ণকর্ণামৃতের' অনুবাদ করেন। প্রেমদাসকৃত চৈতন্য-চন্দ্রোদয়ের অনুবাদ, সনাতন চক্রবর্ত্তীর ভাগবতের অনুবাদ ও রসময় এবং গিরিধরের গীতগোবিন্দের অনুবাদ এইস্থলে উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত গ্রন্থদ্বয় সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব।

ব্যাখ্যা-শাখায় ঠাকুর নরোত্তমদাসের 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা', 'সাধনভক্তিচন্দ্রিকা', 'হাটপত্তন', ও 'প্রার্থনা' প্রভৃতি পুস্তকই সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। 'বিবর্ত্ত-বিলাসের' গ্রন্থকার নিজকে কৃষ্ণদাস কবিরাজের জনৈক শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, ইহাতে গোপীভাবে ভজন সম্বন্ধে অনেক গুপ্ত তত্ত্ব লিখিত হইয়াছে—ইহা কোন শঠ বৈষ্ণবের লেখা। বৈষ্ণব সমাজ বিবেচনা করেন, 'কর্ত্তাভজাদলের' কোনও লেখক এই ঘৃণিত কীর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়া বৈষ্ণবসমাজের স্কন্ধে কলঙ্ক চাপাইয়াছেন। কৃষ্ণদাস-বিরচিত 'পাষণ্ডদলন' ও রামচন্দ্র কবিরাজপ্রণীত 'স্মরণদর্পণ' এই শাখার অন্তর্গত। এইস্থলে বৃন্দাবনদাসের 'গোপিকামোহন' কাব্যের উল্লেখ করা আবশ্যক। যে বৃন্দাবন 'চৈতন্য-ভাগবত' রচনা করিয়া চিরযশস্বী, তাঁহার লেখনী-প্রসূত 'গোপিকামোহন' কাব্য ক্ষুদ্র হইলেও বৈষ্ণবসমাজের বিশেষ আদরের সামগ্রী হইবে, সন্দেহ নাই। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ ও গোপিকাদের সম্বন্ধ এবং লীলাদি বর্ণিত হইয়াছে। ইহার বহু প্রাচীন হস্তলিখিত একখানা পুঁথি আমার নিকট আছে।

আমরা আর পুস্তকের নাম করা আবশ্যক মনে করি না; এখনও এক্ষেত্রে প্রত্নতত্ত্বের আলো প্রবেশ করে নাই। ভবিষ্যতে আরও অনেক বড় গ্রন্থ আবিষ্কৃত হওয়া আশ্চর্য্য নহে। যে সমস্ত পুস্তকের উল্লেখ করিয়াছি, তদ্দ্বারাই যথেষ্টরূপে সাহিত্যের রুচি ও গতি নির্ণীত হইবে। সমুদ্রে ভ্রমণকারী যেরূপ প্রত্যহ লবণাম্বুর একইরূপ নীল বৃত্ত প্রত্যক্ষ করিয়া অগ্রসর হন, আমরাও সেইরূপ চৈতন্যভাগবতাদি গ্রন্থ হইতে আরম্ভ করিয়া যাহা কিছু ক্রমে পাইয়াছি, তাহাতে ন্যূনাধিক পরিমাণে একই আদর্শ ও একই ভাবের বিকাশ দেখিয়া অগ্রসর হইয়াছি; নরহরি সরকার এবং তৎপথাবলম্বী লেখকগণ যে গাথা গাহিয়াছেন, তাহার প্রতিধ্বনি ক্রমে ক্ষীণতর হইয়া কোন্ কীটভুক্ত পুঁথির শেষ পংক্তিতে পর্য্যবসিত হইয়াছে কে বলিবে?

একই ভাবের বিকাশ।

এই যুগের সাহিত্য হিন্দী-উপকরণে বিশেষরূপ পুষ্ট। এখন যেরূপ ইংরেজীভাষার রাজত্ব, বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রভাবকালে তখন ছিল বৃন্দাবনীভাষার রাজত্ব। বৃন্দাবন এখনও বড় তীর্থ বলিয়া গণ্য, কিন্তু তখন বঙ্গের শিক্ষিত-সমাজ ইহাকে ধরাতলে স্বর্গ বলিয়া গণ্য করিতেন,—শ্যামকুণ্ড কি রাধাকুণ্ড দর্শনার্থ তাঁহাদের যে উৎসাহ-পূর্ণ আগ্রহ ছিল, বিলাত যাইতে শিক্ষিতগণের তেমন ঐকান্তিক আগ্রহ নাই। এখন যেরূপ আমরা বাঙ্গালা কথার মধ্যে চারি আনা ইংরেজী মিশাইয়া বিদ্যা দেখাইয়া থাকি, তখন সেইরূপ বৈষ্ণবর্গের বাঙ্গালাকথা চারি আনা বৃন্দাবনীয় মিশ্রণে সিদ্ধ হইত। কোন কাব্য কি ইতিহাসে যে স্থলে কথা-বার্ত্তা বর্ণিত হয়, সেইস্থলে গ্রন্থকর্ত্তা প্রচলিত ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন। চৈতন্যচরিতামৃত, নরোত্তমবিলাস প্রভৃতি পুস্তকে দৃষ্ট হইবে, যে স্থলে কথাবার্ত্তার উল্লেখ, সেই খানেই বৃন্দাবনী ভাষার সমধিক ছড়াছড়ি হইয়াছে; যথা—

হিন্দী প্রভাব।

"প্রয়াগ পর্য্যন্ত দুহেঁ তোমা সঙ্গে যাব। তোমার চরণসঙ্গ পুনঃ কাঁহা পাব॥ ম্লেচ্ছদেশ কেহ কাঁহা করয়ে উৎপাত। ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত কহিতে না জানেন বাত॥"—চৈ, চ, মধ্য ১৮ পৃঃ।

"হইলু উদ্বিগ্ন বৃন্দাবিপিন দেখিতে। তাঁহা না হইল, গেলু অদ্বৈত গৃহেতে। সবে মহাদুঃখী হৈল আমার সন্ন্যাসে। সভা প্রবোধিলুঁ রহি অদ্বৈতের বাসে। সভা মনোবৃত্তি জানি নীলাচলে গেঁলু। তাঁহা কথোদিন রহি দক্ষিণ গমিলুঁ॥"
—নরোত্তম বিলাস।

এইরূপ বহুসংখ্যক উদাহরণ প্রদর্শিত হইতে পারে; বৃন্দাবনীবুলি বাঙ্গালীর স্বভাববুলি না হইলেও ইহা তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিলেন।

বিদ্যাপতির মৈথিলপদের অনুকরণে যাঁহারা পদরচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে গোবিন্দদাস সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সাহিত্যের প্রথম স্ফূরণে কবির শুধু ভাব প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য হয়। প্রথম যুগের কবিগণ

ভাষার প্রতি লক্ষ্য করেন না, কোনও রূপে ভাবটি প্রকাশিত হইলেই তাঁহাদের লক্ষ্য সার্থক হয়। ভাবের সম্পূর্ণ বিকাশ হইলে, পরবর্ত্তী কবিগণ ভাষাটিকে সাজাইতে চেষ্টা করেন; ভাব যুগের অবসানে সাহিত্যে ভাষা-যুগ প্রবর্ত্তিত হয়; তখন মানুষের দৃষ্টি প্রকৃতির নগ্ন শোভা হইতে অপসারিত হইয়া অলঙ্কার শাস্ত্রের কৃত্রিম পুষ্পপল্লবের পশ্চাতে ধাবিত হয়। গোবিন্দদাসের ভাষায় বঙ্গমৈথিল-গীতের চরম বিকাশ, এমন কি বিদ্যাপতির ভাবপ্রধান পদও গোবিন্দের পদের ন্যায় মসৃণ নহে। গোবিন্দদাসের (১) "কেবল কান্ত কথা, কহি কাঁদয়ে—কাম কলঙ্কিনী গোরী।" (২) "মুকুলিত মল্লী, মধুর মধু মাধুরী, মালতী মঞ্জুল মাল॥" (২) ও নব জলধর অঙ্গ। ইহ থির বিজুরীতরঙ্গ॥ ও বর মরকতঠাম। ইহ কাঞ্চন দশ বাণ॥ ও তনু তরুণতমাল। ইহ হেমযুথি-রসাল॥ ও নব পদমুনি সাজ। ইহ মত্ত মধুকররাজ॥ ও মুখ চাঁদ উজোর। ইহ দিঠি লুবধ চকোর॥ অরুণ নিবড়ে পুন চন্দ। গোবিন্দদাস রহ ধন্দ॥" প্রভৃতি পদ পড়িয়া প্রথমেই কর্ণ মুগ্ধ হয়, ভাব ও অর্থের কথা পরে মনে উদয় হয়।

বঙ্গ মৈথিলের পূর্ণ বিকাশ।

গোবিন্দদাস বঙ্গসাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত বিদেশী ব্রজবুলির চরম উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন। তৎপরে শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলেও বঙ্গ-মৈথিলের প্রতিধ্বনি হইয়াছিল, কিন্তু তাহা ক্ষীণতর;—

সত্যরাম কবি।

"কাঁহেকো শোচ কর মন পামর। রাম ভজ, তুহু রহনা দিনা। ইষ্ট কুটম্বক ছোড়দে আশ, এসংসার অসার, এক উহ নাম বিনা॥ যো কীট পতঙ্গক, আহার যোগাওত, পালক গ্যায় উহি একজনা। কবি সত্য কহে, মন থির রহো, যিনি দিহাঁ দন্ত, সো দেগা চিনা॥"—(সত্যরাম কবি)। একযুগব্যাপী চেষ্টার বিকাশের পর বঙ্গমৈথিল-সাহিত্যের উপর পটক্ষেপ হইয়াছে। ভানু সিংহ সেদিন আবার একটুকু সল্‌তা জ্বালাইয়া সেই কক্ষটি উজ্জ্বল করিয়াছিলেন।

কিন্তু পদাবলীতে মৈথিল অনুকরণ যত সুন্দর হইয়াছে, কাব্য কি ইতিহাসে বৃন্দাবনী ভাষা ততদূর মিষ্ট হয় নাই। চৈতন্যভাগবতকার বঙ্গদেশেই জীবন যাপন করিয়াছেন, ও তাঁহার সময়ে বৃন্দাবনী বাঙ্গলার সঙ্গে গাঢ়ভাবে মিশে নাই, তাঁহার রচনায় তাই অনেক পরিমাণে খাঁটি বাঙ্গলার আদর্শ পাওয়া যায়; কিন্তু তাঁহার রচনার মধ্যে মধ্যে বৃন্দাবনীসুরের আভাস একেবারে না পাওয়া যায় এমন নহে; যথা:—"সে নৈবেদ্য যদি খাইবার পাও। তবে মুঞি সুস্থ হই হাঁটিয়া বেড়াও॥"—চৈ, ভা, আদি।

হিন্দীপ্রভাবে ইতিহাসের ভাষার দুর্গতি।

বৈষ্ণব সমাজের কথিত বাঙ্গালা তখন বৃন্দাবনী-ভাষা-মিশ্রিত হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহারা মুখে যাহা বলিতেন, লেখনীতেও তাহাই ব্যবহার করিয়াছেন। চৈতন্যচরিতামৃত এসম্বন্ধে দৃষ্টান্তস্থলীয়। দীর্ঘকাল বৃন্দাবনে থাকাতে কবিরাজগোস্বামীর বাঙ্গালা বৃন্দাবনী দ্বারা এরূপ অধিকৃত হইয়াছিল

যে, তাঁহার রচনায় খাঁটি দেশী কথা অতি অল্প স্থলেই ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহা ছাড়া তাঁহার সংস্কৃতে পাণ্ডিত্যও সহজ বাঙ্গালা-রচনার অন্তরায় হইয়াছিল। একদিকে 'গুহ্যাতিগুহ্য', 'বাহ্যাবতরণ', 'মহদনুভব' প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দ ও অন্যদিকে 'যবহুঁ,' 'কবহুঁ,' 'যৈছে,' 'তৈছে,' 'তিঁহ,' প্রভৃতি বৃন্দাবনীবুলি তাঁহার বাক্যে নিবিড়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাদের দীর্ঘ ও ঘনসন্নিবিষ্ট ব্যূহের মধ্যে বঙ্গভাষার কোমল প্রাণ পীড়িত হইয়া রহিয়াছে। বাঙ্গালা, হিন্দী, সংস্কৃত, এমন কি উর্দ্দু কথা পর্য্যন্ত কৃষ্ণদাস অবাধে ব্যবহার করিয়াছেন, ভাষায় এই সাধারণতন্ত্রের হট্টগোলে বাঙ্গালীর সুর চেনা সুকঠিন। চৈতন্যচরিতামৃতকে বাঙ্গালাগ্রন্থ' উপাধি দিতে আমাদিগকে বহুতর সংস্কৃত ও প্রাকৃত শ্লোক, অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ, বৃন্দাবনী—'যৈছে,' 'তৈছে,' ও উর্দ্দু—'নানা,' 'মামু,' 'চাচা,' পথ হইতে পরিষ্কার করিতে হয় এবং সেইভাবে অতিকষ্টে বাঙ্গালা গ্রন্থটির জাতি রক্ষা করিতে পারা যায়। নিম্নে কবিরাজগোস্বামীর বহুরূপী রচনার কিছু কিছু নমুনা দিতেছি,—

(১) "বিবিধাঙ্গ সাধন ভক্তি বহু বিস্তার। সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু সাধনাঙ্গ তার॥ গুরু পদাশ্রয় দীক্ষা গুরুর সেবন। সধর্ম্ম শিক্ষা পৃচ্ছা সাধুমার্গানুগমন॥ কৃষ্ণপ্রীতে ভোগ ত্যাগ কৃষ্ণতীর্থে বাস। যাবৎ নির্ব্বাহ প্রতিগ্রহ একাদশ্যুপবাস॥ ধাত্র্যশ্বথ গোবিন্দ বৈষ্ণব পূজন। সেবানামপরাধধি দূরে পূজন॥"—চৈ, চ, মধ্য, ১২ পৃঃ।

(২) কহে তাঁহা কৈছে রহে রূপ সনাতন। কৈছে করে বৈরাগ্য কৈছে ভোজন॥ কৈছে অষ্ট প্রহর করেন শ্রীকৃষ্ণ ভজন। তবে প্রশংশিয়া কহে সেই ভক্তগণ॥ অনিকেতন দুঁহে রহে যত বৃক্ষগণ। একৈক বৃক্ষের তলে একৈক রাত্রি শয়ন॥ কঁরোয়া মাত্র সম্বল কাঁথা ছিঁড়া বর্হিবাস। কৃষ্ণ কথা কৃষ্ণ নাম নর্ত্তন উল্লাস॥—মধ্য ১৯ পৃঃ।

(৩) "ইবে তুমি শান্ত হৈলে আমি মিলিলাম। ভাগ্য মোর তুমি হেন অতিথি পাইলাম॥ গ্রামসম্বন্ধে চক্রবর্ত্তী হয় আমার চাচা। দেহ সম্বন্ধ হৈতে গ্রাম সম্বন্ধ সাঁচা॥ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী হয় তোমার নানা। সে সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা॥"—আদি ৭ পঃ।

বৃন্দাবনীভাষার প্রভাব কালে লুপ্ত হইল; কৃত্রিম ভাষা ব্যবহার করিয়া কবি কতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারেন গোবিন্দদাস তাহা দেখাইয়াছেন,—কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও তদনুচর বৈষ্ণব লেখকগণের তিরোধানের পর বৃন্দাবনী ভাষা কেহ ব্যবহার করেন নাই,—কিন্তু হিন্দীর অধিকার অস্তেও বঙ্গ-সাহিত্য-ক্ষেত্রে অন্য ত্রিবিধ শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা রহিয়া গেল, তাহা এই—

(১) উর্দ্দু,—আমরা প্রাচীন বৈষ্ণব সাহিত্যেও কতকগুলি উর্দ্দু শব্দের ব্যবহার দেখিয়াছি। উর্দ্দু নবাবী আমলের ভাষা, ইহার প্রভাব বঙ্গসাহিত্যে অবশ্যই কিছু আসিয়াছিল, কিন্তু রামেশ্বরী সত্যপীরোপাখ্যান এবং ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি কোন কোন কাব্যে উর্দ্দু প্রভাব অনেক পরিমাণে লক্ষিত হইলেও তাৎকালিক বঙ্গভাষায় সংস্কৃতানুবর্ত্তিতার কোনও বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। এখনও ইংরেজের মুলুকে দু'একজন কবি—

বঙ্গভাষার বিবিধ রূপ।

"বুট পরি, ছুট করি, যাবে ভাই যাও। হোটেলে কাটলেট সুখে পাবে যদি খাও। এলবার্ট ফ্যাসানে কেশ ফিরাবে ফিরাও।" (দীনেশচন্দ্র বসু-রচিত 'কবিকাহিনী'।) প্রভৃতি পদে বিদেশী ভাষার শরণ লইলেও মাইকেল প্রভৃতি কবিগণের গুরুগম্ভীর সংস্কৃতের ধ্বনিতে সেই সব ক্ষীণ ম্লেচ্ছস্বর ডুবিয়া গিয়াছে।

(২) খাঁটি বাঙ্গালা—ইহা কথিতভাষা, "মুখরুচি কত শুচি করিয়াছে শোভা।" কিংবা "ইন্দুকুন্দতুষার-সঙ্কাশা" প্রভৃতি কথা ঠিক কথিত-ভাষা নহে। ইহাদিগকে বাঙ্গালা বলিতে কোন আপত্তি নাই, কিন্তু এরূপ রচনা পোষাকী বাঙ্গালা। কথিত বাঙ্গালার প্রভাব মুকুন্দরাম প্রভৃতি কবির রচনায় বিশেষ-রূপে দৃষ্ট হয়। যে চিত্রকর প্রকৃতির আলোকচিত্র তুলিবেন, তিনি পৃথিবী ও স্বর্গ কেবল পুষ্প দিয়া ভরিয়া ফেলিতে পারেন না, তাঁহাকে শুষ্ক গুল্ম ও কুৎসিত গলিত পত্রেরও প্রতিচ্ছায়া উঠাইতে হইবে। খাঁটি বাঙ্গালী কবি এই জন্য কথিত অপভাষা খুঁটিয়া ফেলিয়া কেবল ললিতলবঙ্গ-লতার মত মিষ্ট মিষ্ট কথার খোঁজ করিবেন না। মুকুন্দরাম ভিন্ন প্রায় সমস্ত কবিই ন্যূনাধিক পরিমাণে সংস্কৃত শব্দ দ্বারা কাব্য পুষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, আমরা তাহা পরে দেখাইব।

(৩) সংস্কৃত। বৃন্দাবনদাসের রচনার মধ্যেও "স্বানুভাবানন্দে"র ন্যায় দুই একটি বড় সংস্কৃত কথা দৃষ্ট হয়। ইতিপূর্ব্বে বাঙ্গালা কবি মনের উক্তি সম্বলিত গান রচনা করিতেন। ভাষাগ্রন্থগুলি সাধারণ লোকের মনোরঞ্জনার্থে গানের পালারূপে রচিত হইত ; সংস্কৃতে ও পার্শীতে অন্যবিধ গুরুতর বিষয় সম্বন্ধীয় রচনার কাজ চলিত। কিন্তু বৈষ্ণবগণ বঙ্গভাষাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষাসমূহের সঙ্গে সমকক্ষতা করিবার উপযোগী শক্তি প্রদান করিলেন। বৈষ্ণব লেখকগণ বিদ্বেষী পাষণ্ডীর গর্ব্ব খর্ব্ব করিতে যাইয়া শাস্ত্র আলোড়ন করিয়া বাঙ্গালায় দর্শন ও ন্যায়ের সমস্ত তত্ত্ব সুগম করিলেন। বিরুদ্ধ-পক্ষীয়গণের বিপরীতমুখী উদ্যম চলিল, তাঁহারা নানাবিধ তন্ত্রাদি অনুবাদ করিয়া বৈষ্ণবগণের প্রতি-পক্ষতা দেখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই উভয় পক্ষের শাস্ত্রচর্চ্চাহেতু বঙ্গভাষা সংস্কৃতের ভিত্তির উপর সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অভিনব নাট্যশালার ন্যায়, পাতঞ্জলদর্শনের উচ্চতত্ত্ব হইতে কালিদাস ও জয়দেবের সুন্দর শব্দলালিত্যের বিচিত্র শোভা দেখাইল। কিন্তু বাঙ্গালা রচনায় সংস্কৃত মিশ্রিত করিতে যাইয়া প্রথম উদ্যমেই বঙ্গীয় লেখকগণ কৃতকার্য্য হন নাই। চৈতন্যচরিতামৃতের "স্বধর্ম্ম এলভাক পুমান প্রভু উত্তর দিল।"—অন্ত, ২য় পঃ :—"কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা করিতে সমর্থ॥"—অন্ত, ৯ পঃ। ও 'দেহকান্ত্যা হয় তিঁহ অকৃষ্ণ বরণ।"—আদি, ১ পঃ। প্রভৃতি স্থল দুর্ব্বোধ্য ও শ্রুতিটুক্ হইয়াছে ; এমন কি অনেক পরে রামপ্রসাদও এ বিষয়ে অতি শোচনীয় অযোগ্যতা দেখাইয়াছেন, তাহা যথাসময়ে লিখিব।

উর্দ্দু, কথিত বা খাঁটি বাঙ্গালা ও সংস্কৃতানুযায়ী বাঙ্গালা—প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে এই ত্রিবিধ শক্তির প্রভাব দৃষ্ট হয় ; এই ত্রিশক্তির কোন না কোনটি বিশেষভাবে অবলম্বন করিয়া প্রাচীন কবিগণ কাব্য রচনা করিয়াছেন, তাহা অতঃপর দৃষ্ট হইবে।

এই অধ্যায়ের অন্তর্গত বাঙ্গালা গ্রন্থের অপ্রচলিত শব্দগুলির অর্থসমেত তালিকা দিতেছি, ইহাদের কতকগুলি ভিন্নার্থ গ্রহণ করিয়াছে। নানা পুস্তকেই এই সব শব্দ পাওয়া যায়, আমরা পাঠকের আলোচনা সুবিধার্থ পূর্ব্বের স্থায় গ্রন্থবিশেষের নাম উল্লেখ করিলাম।

অপ্রচলিত শব্দের তালিকা।

চৈতন্যভাগবতে,—দৃঢ়—প্রমাণ ("ভক্তের পূজা আমা হৈতে বড় সেই প্রভু বেদে ভাগবতে কৈলা দৃঢ়" আদি)। ঠাকুরাল—প্রস্তাব; ছিঁড়ে—ছিঁড়ে; সমুচ্চয়—সংখ্যা; বহি—ব্যতীত; বিরক্ত—উদাসীন; এই শব্দ প্রাচীন সাহিত্যের কোথাও "ত্যক্ত" অর্থে ব্যবহৃত দেখিতে পাই নাই—ইহার অর্থ সংসার-অনুরাগশূন্য ছিল, এখন ইহা অর্থদুষ্ট হইয়াছে। উপস্থান—উপস্থিতি; পরিহার—প্রার্থনা; উপস্কার—মার্জ্জন, পরিস্কার; সম্ভার—আয়োজন; আর্য্য—রাগান্বিত ("বিপ্র বলে মিশ্র তুমি বড় দেখি আর্য্য")॥ কিন্তু স্থলে স্থলে ইহার অর্থ "পূজ্য" দেখা যায়,—যথা—"বৈষ্ণবের গুরু তিন জগতের আর্য্য।"—(চৈ, ম)। উপসন্ন—উপস্থিত; পরতেক—প্রত্যক্ষ; বাহ্য—বাহ্যজ্ঞান, জুয়ায়—যোগ্য হয়; নিছনি—হল অর্থ যাহা মুছিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়, এই শব্দ স্থলে "নির্ম্মঞ্ছন" শব্দও মধ্যে মধ্যে পাওয়া যায়, যথা "যাবক রঞ্জিত চরণ তলে, জীউ, নিরমঞ্ছন গোবিন্দদাস।"—(প, ক, ত ১০৭১ পদ)। বিশ্বম্ভর নির্ম্মঞ্ছন করে আয়োগণ"—(লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল, আদি)। চেষ্টা—এই শব্দ অনেক স্থলেই "ভক্তির আবেগ" অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কদর্থেন—ঠাট্টা করেন; দৃঢ়—সুস্থ (লতা পাতা নিয়া রোগী দৃঢ় কর" চৈ, ভা, আদি); কোনভিতে—কোনদিকে; রায়—রবে; এনে—এখন; সাধস্—সার্থক; ভাবক—ক্ষণস্থায়ী ভাবযুক্ত (Emotional),—"বেদান্ত পঠন ধ্যান সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম। তাহা ছাড়ি কর কেন ভাবকের কর্ম্ম॥"—(চৈ, চ)। কাকু—কাকুতি; ব্যবসায়—ব্যবহার—"এইরূপ প্রভুর কোমল ব্যবসায়"—আদি। 'প্রাকৃত' এই এই শব্দ সংস্কৃতের ন্যায় অনেক স্থলেই 'ইতর' ও 'সাধারণ' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে,—"প্রাকৃত লোকের প্রায় বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর। লোক শিক্ষা দেখাইতে ধরিলেন জ্বর।"—আদি; অন্যত্র চৈতন্যমঙ্গলে—"প্রাকৃত লোকের প্রায় হাসে বিশ্বম্ভর" চৈতন্য-ভাগবতে—"প্রাকৃত শব্দেও যেবা বলিবেক আই। আই শব্দ প্রভাবে তাহার দুঃখ নাই॥"—(মধ্য)। প্রাকৃত শব্দের এইরূপ অর্থ সংস্কৃতের অনুরূপ, যথা—রামায়ণে 'কিং মামসদৃশং বাক্যমীদৃশং শ্রোত্রদারুণম্। রূক্ষং শ্রাবয়সে বীর প্রাকৃতঃ প্রাকৃতামিব॥"—লঙ্কা ১১৮ম সঃ। বিমরিষ—বিমর্ষ; উদার—চিন্তাযুক্ত। প্রচণ্ড শব্দ এখন ভীতিজনক দ্রব্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু চৈতন্যভাগবতে "প্রচণ্ড অনুগ্রহ" প্রভৃতি ভাবের ব্যবহার পাওয়া যায়। সম্পত্তি—সমৃদ্ধি ('নবদ্বীপ সম্পত্তি কে বর্ণিবার পারে।"—আদি); লঙ্ঘন—দংশন; চালেন—ঠকাইয়া দেন; কতি—কোথা। ওঝা শব্দ গৌরব-জনক অর্থেই সর্ব্বদা ব্যবহৃত দৃষ্ট হয়—ইহা উপাধ্যায় শব্দের অপভ্রংশ ও পূর্ব্বে মূল শব্দের অর্থেই ব্যবহৃত হইত। আত্মসাৎ—এই শব্দ এখন অর্থদুষ্ট হইয়া পড়িয়াছে,—কিন্তু বৈষ্ণব সাহিত্যে সর্ব্বদাই ইহা ভাল অর্থে ব্যবহৃত হইত; যথা—"ভক্তি দিয়া জীবে প্রভু কর আত্মসাৎ।" আথরিয়া—উৎকৃষ্ট হাতের লেখা যাহার এবং যাঁহারা কীর্ত্তনগানের মধ্যে পদের গূঢ় ভাব ব্যক্ত করিবার জন্য উপপদ সংযোগ করেন। চৈতন্য-চরিতামৃতে,—হাতসানি—হস্তসঙ্কেত, লঘু—ক্ষুদ্র (যথা "লঘু পদচিহ্ন"); পাতনা—তুষ; ওলাহন—ভৎর্সনা; ভদ্রকর—ক্ষৌরকার্য্য সমাধা কর ("ভদ্রকর ছাড় এই মলিন বসন।"); তরজা—কূটসমস্যা। নরোত্তমবিলাসে,—উমড়য়ে—কষ্ট পায়; সঙ্গোপন—মৃত্যু; হাতসানে—হস্তসঙ্কেতে, সমাধিয়া—বিবেচনা করিয়া, সমীহিত—ইচ্ছা। পদকল্পতরুতে,—রাতা—রক্তবর্ণ; "রাতা উৎপল, অধরযুগল"—২২ পদ; "নীরে নিরঞ্জন লোচন রাতা"—২৮৯ পদ

"মেঘগণ দেখে রাতা" ১৮০৪ পদ, কবিকঙ্কণেও এই শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়, (যথা "কার সঙ্গে বিবাদ করি চক্ষু করি রাতা") বাউল উন্মত্ত, বৈরাগী; পিছলিতে ফিরাইতে ("পিছলিতে করি সাধ না পিছলে আঁখি" চণ্ডীদাস)। তিলাঞ্জলি এই শব্দ এখন ""জলাঞ্জলি" যে স্থলে প্রযুক্ত হয়, সেই স্থলে ব্যবহৃত হইত। বুলে ভ্রমণ করে, "সকল ফুলে ভ্রমর বুলে, কে তার আপন পর। চণ্ডীদাস কহে কানুর পীরিতি কেবল দুঃখের ঘর।" ৯১৪ পদ। চৈতন্যমঙ্গলে,—প্রেমা—প্রেম; সিনেহ—স্নেহ; মহু—মধু; উচাট—উদ্বিগ্ন; তোকানি মোকানি—জনরব। পীরিতি শব্দ পূর্ব্বে 'প্রীতি' অর্থে ব্যবহৃত হইত, যথা—"পিতৃশূন্য পুত্রে মোর পীরিতি করিবে।" উমতি—উন্মত্ত; সানাসানি—ইঙ্গিত; নিবড়িল—সমাপ্ত করিল; বহুয়ারী—বউ ("মোর ঘরে ছিল এই ঘরের ঈশ্বরী। আজি হৈতে তোর দাসী কোণের বহুয়ারী"); সায়—সাজ; বেদিনী—ব্যথিত (Sympathiser); আর্ত্তি—কাতরতা; আউটিয়া—আলোড়ন করিয়া। ভক্তি-রত্নাকরে,—তাড়স্ক—করভূষণ; দাদুর—ভেক; টোটা—বাগান; সম্বাহন—সেবা; না ভায়—ভাল লাগে না; ওট—ওষ্ঠ ("বাঁধুলী জিনিয়া রাঙ্গা ওটখানি হাস'; এই "ওট" শব্দের অর্থ ৺ রামনারণ বিদ্যারত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন, "অট্ট অট্ট হাস"—ভক্তিরত্নাকর ৮৩৭ পৃঃ দেখুন)। মরঙ্ক—মৃগাঙ্ক।

বঙ্গভাষায় এই সময় নানা ছন্দ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। পদকল্পতরু প্রভৃতি পুস্তকে কবিতাকে একটি পুষ্পিতা লতার ন্যায় নানাছন্দে প্রবাহিত হইয়া সৌন্দর্য্যজাল বিস্তার করিতে দেখা যায়; স্বয়ং ভারতচন্দ্রও বঙ্গীয় ছন্দের মূলধন বেশী বাড়াইতে পারেন নাই; নিম্নলিখিত পদের সুন্দর ছন্দটি দেখুন;—"ধনি রাঙ্গিণী রাই। বিলসহি হরি সঙ্গে রস অবগাহই। হরি সুন্দর মুখে। তাম্বুল দেই চুম্বই নিজ সুখে। ধনি রঙ্গিণী ভোর। ভুলল গৌরবে কানু করি কোর। দুহুঁ দুহুঁ গুণ গায়। একই মুরলীরন্ধ্রে দুজনে বাজায়। কেহ কেহ কহে মৃদুভাষ। নারীপরশে অবশ পীতবাস। কেহ কাড়ি লয় বেণু। রাস রসে আজ ভুলল কানু।"—(পঃ কঃ ১৩১১ পদ)। ত্রিপদী ছন্দের প্রথম দ্বিচরণার্দ্ধে মিল রাখা সর্ব্বদা প্রয়োজন ছিল না; যথা;—"আমার অঙ্গের, বরণ লাগিয়া, পীতবাস পরে শ্যাম। প্রাণের অধিক, করের মুরলী, লইতে আমার নাম। আমার অঙ্গের, বরণ সৌরভ, যখন যে দিকে পায়। বাহু পসারিয়া, বাউল হইয়া, তখন সে দিকে ধায়।"—(জ্ঞানদাস)। পদগুলি সর্ব্বদাই গীত হইত, সুতরাং কোন অক্ষর নিয়মের বশীভূত ছিল না। কোন কোন স্থলে পদ অপরিমিতরূপ দীর্ঘ হইয়াছে, যথা;—"জয় জয় দেব কবি নৃপতি শিরোমণি বিদ্যাপতি রসধাম। জয় জয় চণ্ডীদাস রসশেখর অখিল ভুবনে অনুপাম।" (পঃ কঃ (পঃ কঃ, ১৫)। ছন্দসম্বন্ধে আমরা পরে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিব।

ছন্দঃ।

বঙ্গভাষার ব্যাকরণ না থাকাতে বিভক্তি অনেকটা ইচ্ছাধীন ছিল। পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায় হইতে এই অধ্যায়ে সে বিষয়ে কোনরূপ উন্নতি লক্ষিত হয় না। এই অধ্যায়েও "কাশীরে গমন," "বৈকুণ্ঠকে গমন," "মাতাতে পাঠান" (মাতাকে পাঠান), "মোহর" (আমার), "তাতে" (তাহাতে), "ইথি" (ইহাতে), প্রভৃতি নানাবিধ অনিয়মিত বিভক্তি দেখা যায়। "চণ্ডালাদিক," "পাককর্ত্তাদি", প্রভৃতির বহুল ব্যবহার দৃষ্টে "দিগ" ও "দিগের" প্রাগলক্ষণবিশেষরূপে পাওয়া যাইতেছে।

বিভক্তি।



মহিষ মর্দ্দিনী

সামাজিক অবস্থা লক্ষ্য করিলে এই যুগে এক বিরাট পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। ব্রাহ্মণের পদরজঃ-সেবী, জাতিভেদের সুদৃঢ়দুর্গে আশ্রিত সমাজ অপরিবর্ত্তনীয় নিত্যকর্ম্মের নিয়মে শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল, নূতনভাবের তীব্র আলাতে সেই শৃঙ্খল অপহৃত হইলে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র এক শ্রেণীভুক্ত হইয়া গেল—নব সৃষ্টির কোলে ক্ষণকালের জন্য প্রাচীন সৃষ্টি নিমজ্জিত হইল; প্রাচীন সমাজ স্বীয় দুর্দ্দান্ত শিশুটির ভয়ে পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া কিছুকাল স্তম্ভিত হইয়াছিল; কিন্তু ক্রমে স্খলিত পদ পুনরপি স্থির করিয়া স্বীয় অদম্য বালকটিকে শাসন করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইল। এই যুগে মৃদঙ্গের ধ্বনি ও হরিবোলের আনন্দ একদিকে আকাশ প্রতিধ্বনিত করিয়া উত্থিত হইতেছে, অপরদিকে এই আনন্দবিদ্বেষী দল বিদ্রূপ করিয়া বেড়াইতেছে;—

সামাজিক অবস্থা, শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব

"শুনিলেই কীর্ত্তন করয়ে পরিহাস। কেহ বলে যত পেট ভরিবার আশ। কেহ বলে জ্ঞানযোগ এড়িয়া বিচার। পরম উদ্ধতপনা কোন ব্যবহার। কেহ বলে কতরূপ পড়িল ভাগবত। নাচিব কাঁদিব হেন না দেখিল পথ। ধীরে ধীরে বলিলে কি পুণ্য নহে। নাচিলে গাহিলে ডাক ছাড়িলে কি হয়ে।" চৈ, ভা, আদি।

এই দলের কোন কোন অগ্রসর ব্যক্তি কালী মন্দিরে যাইয়া স্বীয় দুষ্ট অভিপ্রায়ের মঞ্জুরী চাহিতেছে;—"এত কহি হাসি হাসি পাষণ্ডীর গণ। চণ্ডীর মন্দিরে গিয়া করে আস্ফালন। প্রণমিয়ে চণ্ডীরে কহয়ে বারেবার। অল্পরাত্র এ গুলিয়ে করিবে সংহার।"—(ভক্তিরত্নাকর)। বৈষ্ণবগণও ইহাদিগের ঋণ সুদ সহিত পরিশোধ করিতে ত্রুটি করেন নাই,—লোচন বলে আমার নিতাই যেবা নাহি মানে। অনল জ্বালিয়া দিব তার মাঝ মুখ পানে।" অন্যত্র "এত পরিহারে যে পাপী নিন্দা করে। তবে লাথি মারি তার মাথার উপরে। —চৈ, ভা। বৈষ্ণবদিগের মধ্যে যাঁহারা বিশেষ গোঁড়া, তাঁহারা দোয়াতের কালিকে 'সেহাই', হাঁড়ীর কালীকে 'ভুষা', ও জবা ফুলকে 'ওড় ফুল' বলিতেন। কালিপূজার মধ্যে কোনরূপে সংশ্লিষ্ট থাকা ইঁহারা নিতান্ত পাপ কার্য্য মনে করিতেন। শ্রীবাসের বাড়ীতে গোপাল নামক এক ব্রাহ্মণ বিদ্রূপ করিয়া রাত্রিকালে,—"কলার পাত উপরে থুইল ওড়ফুল। হরিদ্রা সিন্দুর রক্তচন্দন তণ্ডুল।"—চৈ, চ, ম। কালীপূজার এই আয়োজন দেখিয়া শ্রীবাস মান্যগণ্য লোকদিগকে প্রাতে ডাকিয়া দেখাইলেন—"সবারে কহে শ্রীবাস হাসিয়া হাসিয়া। নিত্যরাত্রে করি আমি ভবানী-পূজন। আমার মহিমা দেখ ব্রাহ্মণ সজ্জন। তবে সব শিষ্ট লোক করে হাহাকার। ঐছে কর্ম্ম হেথা কৈল কোন দুরাচার।"—(চৈ, চ, ম)। এই অপরাধে সেই রসিক ব্রাহ্মণটির কুষ্ঠরোগ হইয়াছিল বলিয়া চৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত আছে।

এই সকল ব্যাপার প্রশংসনীয় না হইলেও একটি সান্ত্বনার কথা এই দেখা যায় যে, জাতীয় জীবনের নিরুদ্ধ শক্তি জড়তার বাঁধ ভাঙ্গিয়া কার্য্য-তৎপরতা দেখাইতেছিল।

অবতার-বাদ কেবল চৈতন্য সম্প্রদায়ে আবদ্ধ ছিল না; লৌকিক বিশ্বাসের সুবিধা পাইয়া

চৈতন্যদেবের পশ্চাতে বঙ্গদেশে কয়েকটি নকল চৈতন্যদেব দাঁড়াইয়াছিলেন। বৃন্দাবনদাস ক্রোধের সহিত জানাইতেছেন, পূর্ব্ববঙ্গে এক দুরাত্মা আপনাকে রামের অবতার বলিয়া প্রচার করিতেছিল ; ভক্তিরত্নাকরে এই স্থলের ব্যাখ্যায় নরহরি চক্রবর্ত্তী বলেন, এই ব্যক্তির নাম 'কবীন্দ্র' ছিল। কিন্তু বৃন্দাবনদাস রাঢ়দেশস্থ অপর একজন অবতারের প্রসঙ্গ বলিতেই ক্রোধে বিশেষ ক্ষিপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাকে প্রথম "ব্রহ্মদৈত্য" প্রভৃতি নানারূপ অশিষ্ট সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়া উপসংহারে লিখিয়াছেন,—"সে পাপিষ্ঠ আপনারে বোলায় গোপাল। অতএব তারে সবে বলেন শেয়াল।" এই স্থলের ব্যাখ্যায় নরহরি চক্রবর্ত্তী উদ্দিষ্ট ব্যক্তিটিকে বিপ্র-কুলজাত ও "মল্লিক" খ্যাতিবিশিষ্ট বলিয়া জানাইয়াছেন এবং বৃন্দাবন দাসের স্বর অনুকরণ করিয়া তাঁহার প্রতি "রাক্ষস", "পাপিষ্ঠ" প্রভৃতি অসংযত-ভাষা বর্ষণ করিতেও ত্রুটি করেন নাই। *

অবতার-বাদ।

---

* বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় গৌরগণ চন্দ্রিকানামক পুস্তকে ইহাদের বিবরণ বিস্তারিত ভাবে দিয়াছেন ; যথা,—

"চৈতন্যদেবে জগদীশবুদ্ধীন
কেচিজ্জনান্ বীক্ষ্যচ রাঢ়বঙ্গে।
স্বস্তেশ্বরত্বং পরিবোধয়ন্তো
ধৃত্বেশবেশং ব্যচরন্ বিমূঢ়াঃ ॥
তেষান্তু কশ্চিদ্দ্বিজবাসুদেবো
গোপালদেবঃ পশুপাঙ্গজোঽহং।
এবং হি মিথ্যাপরিতূঃ প্রলাপী
শৃগালসংজ্ঞাং সমবাপ রাঢ়ে ॥
শ্রীবিষ্ণুদাসা রঘুনন্দনোঽহং
বৈকুণ্ঠধাম্নঃ সমিতঃ কপীন্দ্রাঃ।
ভক্তা মমেতি ছলনাপরাধা-
ত্ত্যক্তঃ কপীন্দ্রীতি সমাখ্যায়াখ্যৈঃ ॥
উদ্ধারার্থং ক্ষিতিনিবসতাং শ্রীলনারায়ণোঽহং
সংপ্রাপ্তোঽস্মি ব্রজবনভুবো মূর্দ্ধি চূড়াং নিধায়।
মন্দং হুস্তম্মিতি চ কথয়ন্ ব্রাহ্মণো মাধব্যাখ্য-
শ্চূড়াধারী স্থিতি জনগণৈঃ কীর্ত্ত্যতে বঙ্গদেশে ॥
কৃষ্ণলীলাং প্রকুর্ব্বাণঃ কামুকঃ শূদ্রযাজকঃ।
দেবলোঽসৌ পরিত্যক্তশ্চৈতন্যেনেতি বিশ্রুতঃ ॥

চৈতন্যদেবের পরেও বৈষ্ণবসমাজে ভক্তিময় বৈরাগ্যের স্বাভাবিক ক্রিয়া কতক পরিমাণে দৃষ্ট হয়, কিন্তু ক্রমশঃ মহোৎসব ব্যাপারাদির আধিক্যে তাঁহাদের নানারূপ বিলাসবৃত্তির উদ্রেক হয়। এস্থলে অবশ্য কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতে হইবে, মাংসের স্বাদ ত্যাগ করিয়া তৎস্থলে পূরণ করিতে প্রয়াসী বৈষ্ণবগণ নানাবিধ মিষ্টদ্রব্য ও উপাদেয় শাকশব্জী দ্বারা বাঙ্গালীর আহারীয় সামগ্রীর তালিকা খুব প্রশংসনীয়ভাবে বাড়াইয়া ফেলেন। ইঁহাদিগের নাম সম্পূর্ণরূপে উল্লেখ করা দুরূহ; পাঠক চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যখণ্ডের ৩ ও ১৫ পরিচ্ছেদে, অন্ত্যখণ্ডের ১০ পরিচ্ছেদে এবং পদকল্পতরুর ২৪৮৮ সংখ্যক পদে এবং জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে প্রদত্ত খাদ্যতালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন। এই বিষয়ে আমাদের এই একটি আক্ষেপ যে, একদিন রঘুনাথদাস ভূনিক্ষিপ্ত পচা প্রসাদান্নকণার এক মুষ্টি খাইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন এবং চৈতন্যপ্রভু তাহা "খাসাবস্তু" বলিয়া গ্রহণ করিতেন, বৈষ্ণবসমাজের সেই এক নিবৃত্তির দিন ছিল—ক্রমে ক্রমে সেই গৌরবজনক বৈরাগ্য সমাজ হইতে তিরোহিত হইয়াছিল। বৈষ্ণব সমাজ যতই বড় হইতে লাগিল, ততই সাধারণমনুষ্যসুলভ দুর্ব্বলতা ও পাপ তাহাতে প্রবিষ্ট হইল;—সামাজিক আয়তন বৃদ্ধির ইহা অবশ্যম্ভাবী ফল বলিতে হইবে। কিন্তু চৈতন্যদেবের পরেও ইঁহাদের মধ্যে অনেক খাঁটি লোক জন্মিয়াছিলেন। নরোত্তমদাস দ্বিতীয় বুদ্ধের ন্যায় রাজবৈভব ত্যাগ করিয়া বৈরাগী হইয়াছিলেন, তাঁহার প্রভাবে হরিশ্চন্দ্র রায় ও চাঁদরায় প্রভৃতি দস্যুগণ পর্য্যন্ত সাধুবৈষ্ণব হইয়াছিল। শ্রীনিবাস আচার্য্যের প্রেম-বিহ্বলতা, নৈসর্গিক-শক্তি ও শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য তাঁহার জীবনের প্রথমভাগকে কেমন উজ্জ্বলশ্রী প্রদান করিয়াছে! একদিনের চিত্র ভুলিবার কথা নহে;—গোস্বামিগণ-কৃত গ্রন্থগুলি হারাইয়া শ্রীনিবাস পাগলের ন্যায় বীরহাম্বিরের সভায় প্রবেশ করিয়াছেন, শোকে বিহ্বল শ্রীনিবাসের অন্য জ্ঞান নাই, বজ্রাহতের ন্যায় তিনি নিস্পন্দ; সভায় ব্যাসাচার্য্য ভাগবত পাঠ করিতেছিলেন,—দেবরূপী দর্শকের অপূর্ব্ব অবয়ব দর্শনে ভক্তিভরে বীরহাম্বীর প্রণত হইলেন—সভাস্থলীতে তাড়িৎপ্রবাহের ন্যায় এক আশ্চর্য্য প্রভাব বিস্তারিত হইল; তাঁহার আগমনের কারণ কি প্রশ্ন হইল—কিন্তু অসহ্য দুঃখ-কাতর শ্রীনিবাস উত্তর করিলেন, "ভাগবত পাঠ

বৈষ্ণবসমাজের অধগতি।

শ্রীনিবাসের প্রথম জীবন।

অতিভব্যাদয়োঽপ্যন্যে পরিত্যক্তাস্তু বৈষ্ণবৈঃ।
তেষাং সঙ্গো ন কর্ত্তব্যঃ সঙ্গাদ্ধর্ম্মো বিনশ্যতি॥
আলাপৎ গাত্রসংস্পর্শান্নিঃশ্বাসৎ সহ ভোজনাৎ।
সঙ্করন্তীহ পাপানি তৈলবিন্দুমিবাম্ভসি॥"

সাঙ্গ না হওয়া পর্য্যন্ত অন্য কোন প্রসঙ্গ উত্থাপন বাঞ্ছনীয় নহে।" সেই দুঃখের সময়েও ভক্তি-পূরিত চিত্তে দাঁড়াইয়া তিনি ভাগবতপাঠ শুনিতে লাগিলেন। যেন পাহাড়ের বক্ষে অগ্নির স্রোত বহিতেছিল কিন্তু সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তি ঋজু হিমাচ্ছন্ন শৃঙ্গ অন্তর্দাহের কিছুমাত্র চিহ্ন প্রকাশ করিল না! কি সুন্দর ভাগবত-ভক্তি! কি সুন্দর সভাসৌষ্ঠবকারী উজ্জ্বল বিনয়! শ্রীনিবাসআচার্য্য অনুরুদ্ধ হইয়া ভাগবত পড়িতে লাগিলেন। শোকাকুল স্বরে, ভক্তিমাখা কণ্ঠের আবেগে অসাধারণ পাণ্ডিত্য সহকারে শ্রীনিবাস যখন ভাগবত ব্যাখ্যা করিলেন, তখন বীরহাম্বীর, ব্যাসাচার্য্য প্রভৃতি সকলে তাঁহার পদে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। অশ্রুজলে সভামণ্ডপ প্লাবিত হইল, বিশুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির অপূর্ব্ব উচ্ছ্বাসে বনবিষ্ণুপুর স্বর্গপুর হইয়া উঠিল।

শেষ-জীবন।

কিন্তু বৈষ্ণবসমাজের এই উচ্চ ভাব পরে রক্ষিত হয় নাই, ক্রমশঃ এই কীর্ত্তি স্বীয় উন্নত গৌরবচ্যুত হইয়া শ্রীভ্রষ্ট হইল। পরে স্বয়ং শ্রীনিবাসের দেবমূর্ত্তিখানিতেও যেন সাংসারিকতার আবিলতা প্রবেশ করিয়াছিল। তিনি বীরহাম্বীরের দানে ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছিলেন ও পরিণত বয়সে এক স্ত্রী বর্ত্তমানে শুধু অনুরোধরক্ষার্থ দ্বিতীয়বার পরিণয় করিলেন। নরহরি চক্রবর্ত্তীর উৎসাহসূচক বর্ণনা সেই স্থলে আমাদের কর্ণে বাজিয়াছে। তিনি শ্রীনিবাসের দ্বিতীয় পরিণয় উপলক্ষে লিখিয়াছেন—"গোষ্ঠীসহ রাজার উল্লাস অতিশয়। আচার্য্য বিবাহে বহু অর্থ কৈল ব্যয়। সর্ব্বলোক ধন্য ধন্য কহে বারেবার॥—(ভঃ রঃ)।

কিন্তু বৈষ্ণবসমাজে তখনও এরূপ ভক্ত ছিলেন, যাঁহারা তাঁহার এই সকল ব্যবহার অনুমোদন করেন নাই, যথা—প্রেমবিলাসে, গোপালভট্টের সঙ্গে মনোহরদাসের কথোপকথন,—

"বিষ্ণুপুর মোর ঘর হয় বার ক্রোশ। রাজার রাজ্যে বাস করি হইয়া সন্তোষ। আচার্য্যের সেবক রাজা বীরহাম্বীর। ব্যাসাচার্য্যাদি আমাত্য পরম সুধীর। সেই গ্রামে আচার্য্য প্রভু বাস করিয়াছে। গ্রাম ভূমি বৃত্তি আদি রাজা যা দিয়াছে॥ এই ত ফাল্গুন মাসে বিবাহ করিলা। অত্যন্ত যোগ্যতা তার যতেক কহিলা। মৌন হয়ে ভট্ট কিছু না বলিলা আর। "স্খলৎপাদ স্খলৎপাদ" কহে বারেবার॥"

ইহার কিছু পূর্ব্বে গোপাল ভট্ট, লোকনাথ প্রভৃতি আচার্য্যগণ কৃষ্ণদাস কবিরাজকে তাঁহাদের জীবনচরিত লিখিতে নিষেধ করিয়াছেন, ইঁহাদের সাংসারিকতা ও গৌরবস্পৃহা একেবারেই ছিল না। বৃন্দাবনের আদর্শ বঙ্গের পল্লীতে কতকটা ম্লান হইলেও ইহাঁদের জীবনে ভক্তিপ্রেমের অসামান্য লীলাখেলা পরিদৃষ্ট হইত। নতুবা ইহাঁদের চেষ্টায় বড় বড় দুস্যু তস্কর উদ্ধার পাইল কিরূপে? রাজপুত্র নরোত্তম ত চির ফকির রহিয়া গেলেন।

যাঁহারা ভক্তির রাজ্যে দেবতা ছিলেন, পরবর্ত্তী সময়ে তাঁহাদিগের দেহেও যেন সাংসারিক সুখের মৃদু বায়ু বহিতে লাগিল। নরোত্তমবিলাসে দেখা যায়, জাহ্নবীদেবী ভোজনান্তে "উষ্ণজলে" স্নান

করিতেন, এক ব্রাহ্মণী পরিচারিকা "অতি সূক্ষ্মবস্ত্রে" তাঁহার অঙ্গ সাবধানে মোছাইয়া দিত, অপর এক পরিচাকিা বস্ত্র লইয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। (সপ্তম বিলাস)। জাহ্নবী দেবী প্রেমও ভক্তিরাজ্যের সাম্রাজ্ঞী ছিলেন, তাঁহার এই সাংসারিক জীবনের সুখস্পৃহার আমরা বিশেষ নিন্দা করিতে পারি না। তিনি পতিত পাবন নিত্যানন্দ প্রভুর রমণী, তাঁহাকে সেবা করিয়া পুণ্য অর্জ্জন করিবার জন্য বহু শিষ্যের ইচ্ছা হওয়া স্বাভাবিক—এবং তিনি হয়ত তাহা এড়াইতে পারিতেন না। বৈষ্ণবসমাজের সেই প্রেমের কঠোর দেবব্রত পরে আর রক্ষিত হয় নাই। শেষে বৈষ্ণবগণ মহাপ্রভুর সাঙ্গোপাঙ্গদিগকে শ্রীকৃষ্ণসঙ্গিনীগণের নূতন অবতার কল্পনা করিয়া পুস্তক লিখিলেন, গদাধর রাধিকা, রূপ, সনাতন-রূপমঞ্জরী ও লবঙ্গ মঞ্জরী, এবং কবিকর্ণপুব গুণচূড়াসখীর অবতাররূপে ব্যাখ্যাত হইলেন; এইরূপে অন্যান্য প্রত্যেক ভক্তগণকেই পূর্ব্বাবতারের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া পবিত্র করা হইল। মুরারিগুপ্ত হনুমান ও পুরন্দর অঙ্গদের অবতার বলিয়া স্বীকৃত হইলেন এবং এক লেখক চাক্ষুষ ঘটনা বলিয়া এই অঙ্গীকার করিয়াছেন যে, "পুরন্দর পণ্ডিত বন্দ্যো অঙ্গদ বিক্রম। সপরিবারে লাঙ্গুল যার দেখিল ব্রাহ্মণ॥" (বৈষ্ণব বন্দনা)।

সাংসারিক সুখ-তৃষ্ণা ও বৈষ্ণব-ধর্ম্মের নানারূপ বিকৃতি।

বৈষ্ণব ধর্ম্মের ভক্তির প্রভাব ক্রমে হ্রাস হওয়াতে, এবং জীবনের আদর্শ ক্রমে খর্ব্ব হওয়াতে—ভক্তগণ এইরূপে পৌরাণিক ভূত হইয়া পড়িলেন ও ধর্ম্মটিকে সংসারিক নানারূপ সুখে চরিতার্থ করিবার উপযোগী করিয়া অধ্যাপকবৃন্দ 'সহজিয়া' প্রভৃতি মতানুসারে ইহার ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন। চৈতন্যপ্রভুর এত নির্ম্মল ও উন্মাদকর প্রেমধর্ম্ম ধীরে ধীরে বিলাস ও কুসংস্কারের কুক্ষিগত হইল।

অপর এক চিত্র।

সমাজের অপরদিকে নরহত্যা ইত্যাদি ব্যভিচার চলিতেছিল। নরোত্তমবিলাসের এই লোমহর্ষণ অংশটি দেখুন—"করয়ে কুক্রিয়া যত কে কহিতে পারে। ছাগ মেষ মহিষ শোণিত ঘর দ্বারে॥ কেহ কেহ মানুষের কাটা মুণ্ড লৈয়া। খড়্গা করে করয় নর্ত্তন মত্ত হৈয়া॥ সে সময় যদি কেহ সেই পথে যায়। হইলেও বিপ্র তার হাত না এড়ায়॥ সবে স্ত্রী লম্পট জাতি বিচার রহিত। মদ্য মাংস বিনে না ভুঞ্জয়ে কদাচিৎ॥" (সপ্তম বিলাস)। পরন্তু জগাই মাধাই প্রভৃতির বৃত্তান্তে জানা যায়, তাহারা ব্রাহ্মণ হইয়া সর্ব্বদা মদ্য এবং গোমাংস ভক্ষণ করিত *, কিন্তু এরূপ বোধ হয় না যে, তাহারা তজ্জন্য জাতি চ্যুত অবস্থায় ছিল।

---

* "ব্রাহ্মণ হইয়া মদ্য গোমাংস ভক্ষণ।
ডাকা চুরি পরগৃহ দাহ সর্ব্বক্ষণ॥"—চৈ, ভা, মধ্য, ১৩ অঃ।

এই কালে বাঙ্গালী খাইয়া পরিয়া বেশ সুখী ছিল; গৃহজাত দ্রব্যেই দৈনিক অভাবগুলি একরূপ সুন্দরভাবে পূর্ণ হইত, বাজারের ব্যয় কিছুই ছিল না বলিলেই চলে। মাধবাচার্য্যের চণ্ডীতে কালকেতুর বিবাহের যে একটা ফর্দ্দ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে নিম্নশ্রেণীর বিবাহে যে ব্যয় হইত, তাহার একটা মোটামুটি ওজন পাওয়া যায়। ধর্ম্মকেতু ১৩ গণ্ডা কড়া (আড়াই পয়সার কিছু বেশী) লইয়া বাজারে গেল, ব্যয় এইরূপ,—

বাজারের ব্যয়।

দুইখানি ধড়া (বোধ হয় নেংটি, ধড়া, ধটা হইতে ধুতি শব্দ আসিয়াছে)—	⌄৫
পান	⌄১
খয়ের	⌄১
চূণ	⌄৷৷ কড়া
মেটে সিন্দূর	⌄১
খুঞা (একরূপ বস্ত্র)	⌄৪৷৷
মোট	⌄১৩

ইহা কবির কল্পিত হিসাব বলিয়া বোধ হয় না। ভদ্রলোকের বিবাহের ব্যয়েরও আর একখানি ফর্দ্দ দেখাইতেছি। চৈতন্যপ্রভুর প্রথম বিবাহ অতি সামান্যরূপে নির্ব্বাহিত হইয়াছে,—তাহাতে শ্বশুরালয় হইতে তিনি পঞ্চহরীতকী মাত্র উপঢৌকন পাইয়াছেন; কিন্তু তাঁহার দ্বিতীয় বারের বিবাহকে বৃন্দাবনদাস একটা প্রকাণ্ড উৎসব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কথিত আছে, এই এক বিবাহের ব্যয়ে পাঁচ বিবাহ সুনির্ব্বাহ হইতে পারিত। চৈতন্যভাগবতের বর্ণনা এরূপ,—"বুদ্ধিমন্ত খান বলে শুন সর্ব্ব ভাই। বামনিয়া মত কিছু এ বিবাহে নাই॥ এ বিবাহ পণ্ডিতের করাইব হেন। রাজকুমারের মত লোক দেখে যেন॥" বিবাহের আয়োজনের মধ্যে দেখা যায়, গৃহ "আলিপনা" দ্বারা রঞ্জিত হইল ও আঙ্গিনার মধ্যস্থলে বড় বড় কয়েকটি কদলী বৃক্ষ রোপিত হইল। এই বিবাহ উপলক্ষে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণমণ্ডলী নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন; কিন্তু আহার করার কথা ছিল না;—এ নিমন্ত্রণ "গুয়াপান" গ্রহণের। গুয়াপান ও মাল্য চন্দন সমাগত ব্রাহ্মণমণ্ডলীর মধ্যে বিতরিত হইল, কিন্তু "ইতিমধ্যে লোভিষ্ঠ অনেক জন আছে। একবার লৈয়া পুনঃ আর বেশ কাছে॥ আর বার আসি মহা লোকের গহলে। চন্দন গুবাক মালা নিয়া যায় ছলে॥ সবেই আনন্দে মত্ত কে কাহারে চিনে॥ প্রভুও হাসিয়া আজ্ঞা করিলা আপনে॥ সবারে তাম্বুল মালা দেহ তিনবার। চিন্তা নাহি ব্যয় কর যে ইচ্ছা যাহার॥" এই গুবাক ও মাল্যচন্দন বিতরণ উপলক্ষে বৃন্দাবনদাস আরও লিখিয়াছেন যে সমাগত ব্যক্তিবৃন্দ যাহা লইয়া গিয়াছেন তাহা দূরে থাকুক, ভূমিতলে যে পরিমাণে গুবাক ও মাল্য পড়িয়াছিল,—"সেই যদি প্রাকৃতলোকের ঘরে হয়। তাহাতেই ভাল পাঁচ বিয়া

নির্ব্বাহ হয়॥" উপসংহারে "সকল লোকের চিত্তে হইল উল্লাস। সবে বলে ধন্য ধন্য অধিবাস॥ লক্ষেশ্বর দেখিয়াছি এই নবদ্বীপে। হেন অধিবাস নাহি করে কার বাপে॥ এমত চন্দন মাল্য দিব্য গুয়াপান। অকাতরে কেহ কভু নাহি করে দান॥"—(চৈ, ভা, আদি)।

ভরসা করি, এখনকার কৃপণ ধনিগণ এই প্রাচীন নজিরের বলে ব্যয়-সংক্ষেপ করিতে সমর্থ হইবেন। কিন্তু ব্রাহ্মণদের বিবাহের এই ব্যয়ের স্বল্পতা দেখিয়া কেহ মনে করিবেন না, যে সকল শ্রেণীর লোকেরাই বিবাহে এইরূপ ব্যয় করিত। বেণেদের বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি ব্যাপার মহাসমারোহের সহিত সম্পাদিত হইত। মনসাদেবীর ভাসান সমূহে লক্ষীন্দরের বিবাহের যে বর্ণনা আছে, তাহাতে দেখা যায় সোনা রূপার অসংখ্য খট্টা শোভা যাত্রা করিয়া বাহির হইত। বিদ্যুৎ বাজিকরদের বিস্ময়কর নিপুণতা, বরযাত্রীদের সাজসজ্জা ও মণি মাণিক্যের ঘটা তৎকালের বণিক-সমাজের ঐশ্বর্য্যের পরিচায়ক। কিন্তু ব্রাহ্মণেরা এই সকল বিলাস ও সমারোহ হইতে দুরে থকিয়া স্বীয় ধর্ম্মজীবনের আদর্শ রক্ষা করিতেন।

অসঙ্গত উপাধি।

সে কালে মানুষের নামের সঙ্গে প্রায়ই একটা অসঙ্গত উপাধি লগ্ন থাকিত। এখনও মধ্যে মধ্যে গ্রামদেশে তাহা না থাকে এমন নহে, কিন্তু সে কালে লেখকগণ প্রকাশ্য ভাবে তাহা পুস্তকে ব্যবহার করিতেন, "খোলাবেচা শ্রীধর" "কাঠকাটা জগন্নাথ", প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা "খঞ্জভগবান, "কালাকৃষ্ণদাস", "ভুঁড়ে শ্যামদাস", "নির্লোম গঙ্গাদাস" প্রভৃতি প্রশংসা পত্রযুক্ত নামের উল্লেখ পাইয়াছি। শিশু এখন প্রথম পুস্তকেই এই নীতি মুখস্থ করিয়া থাকে "কাণাকে কাণা বলিও না।" তখনকার গ্রন্থকারগণ বোধ হয় এই নীতি মানিতেন না।

শাসন প্রণালী।

শাসনাদি সম্বন্ধে দৃষ্ট হয়, সাধারণ বিচারের ভার কাজির উপর ছিল—কাজির নীচে 'শিকদার'ও শিকদারের অধীন 'দেওয়ান' ছিল; কোটালের দায়িত্বই বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ছিল, পুলিস দারোগার কার্য্য ছাড়া রাজ্যের নূতন সমস্ত সংবাদের রিপোর্ট কোটালের দিতে হইত। হিন্দুরাজগণ পুলিসদারোগার কাজ "নিশাপতি" দিগের দ্বারা করাইতেন; এই "নিশাপতি" ও 'কোটাল' একই রূপ কর্ম্মচারী বলিয়া বোধ হয়। যুদ্ধ-বিগ্রহাদির সময় এক রাজ্য হইতে অপর রাজ্যে লোক যাতায়াত করিতে পারিত না; নিষিদ্ধ পথে ত্রিশূল পুঁতিয়া পথিকদিগকে সতর্ক করা হইত। রাজাদিগের আদেশ-সম্বলিত "ডুরি" লইয়া পথিকগণ যাতায়াত করিতে পারিতেন। এই "ডুরি" একরূপ পাসপোর্টের ন্যায় ছিল। রাজগণ দস্যুবৃত্তি করিতেন, বীরহাম্বীর এইরূপ একজন দস্যুদলপতি ছিলেন; আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরও বহুসংখ্যক দস্যুপতির নাম পাইয়াছি। ইহাদিগের মধ্যে অনেকেই ব্রাহ্মণ। হরিশ্চন্দ্ররায়,

চাঁদরায় নারোজী প্রভৃতি দস্যুগণ ব্রাহ্মণ ছিলেন। প্রতি গ্রামে রাজা একজন "মণ্ডল" নিযুক্ত করিতেন; এই "মণ্ডল" গ্রামের একরূপ শাসনকর্ত্তা ছিলেন।

আমরা মৈথিলবঙ্গ-অধ্যায় শেষ করিবার পূর্ব্বে নিম্নে দুরূহ শব্দার্থবোধক একটি তালিকা দিতেছি;—

দুরূহ শব্দের তালিকা।

অতএ—অতএব, অথর—অস্থির, অবক—এইক্ষণ, অনুসঙ্গ—ইঙ্গিত, অলখিতে—অলক্ষ্যভাবে, অরু—রক্তবর্ণ, আন—অন্য, আঁতর—অন্তর, উয়ল—উদিত হইল, উকি—অগ্নি, উঘার—ব্যক্ত, উমড়ি—উথলিয়া, ওখদ—ঔষধ, খেলা, গাগরি—ক্ষুদ্র কলস, গারি—গালি, গীম—গ্রীবা, গোয়ান—জ্ঞান, গোরী—গৌরী, সুন্দরী, গোঙার—লম্পট, চোর; ("হামি অবুঝ নারী তুহুঁ", গোঙার" বিদ্যাপতি)—অমূল্য রতন সাথে, গোঙারের ভয় পথে, লাগি পাইলে লইবে কাড়িয়া॥"—(প, ক,)। চকেবা—চক্রবকে, চকুরী—চকট, চোরাবলি—চুরি করিলে, ছটাছটি—প্রকাণ্ড, ছাতিয়া—বক্ষ। জনু—যেন, জয়তুর—জয়ঢাক জীউ—জীবন, জীক—যাহার, তোড়ল—ভাঙ্গিয়া ফেলিল, তোর—তোমাকে, দুগুলি—দুইযোড়া, দিঠি—দৃষ্টি, দউ—দুই, ধড়ে—দেহে,—দোতিক—দুতীর, .ম্মিল—খোঁপা, নিঙাড়িতে—নিষ্পীড়ন করিতে, নিয়ড়—নিকট, নুকি—লুকায়িত থাকা, পদুমিনী—পদ্মিনী, পতিয়ায়—প্রত্যয় করে, পুরুখ—পুরুষ, পসারল—বিস্তৃত করিল, ফুয়ল—উন্মুক্ত, ফুলায়ল—প্রস্ফুট করিল, বরিখন্তিয়া—বর্ষণ করে, বাউর—বাউল, বালি—বালিকা, বিছুরি—বিস্মৃত হওয়া, বিহি—বিধাতা, বেসালি—দুগ্ধ জ্বাল দেওয়ার পাত্র, ভাঙ—ভ্রূ, ভাব, ভাগি—ভাগ্য, ভাখী—ভাষা, ভিয়াইল—পাক করিল, ভোখিল—ক্ষুধার্ত্ত, মরু—আমার, শিঙ্গার—বেশ-ভূষা, শুতিয়া—শুইয়া, শেজ—শয্যা, সামাইল—প্রবেশ করিল, সঞে—সঙ্গে, সিহালা—শৈবাল.—সিনান স্নান।

এখন দেখা যাউক, বাঙ্গালা ভাষার উপর হিন্দী কোন স্থায়ী চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে কি না; হিন্দী শব্দ সমূহের মৃচ্ছকটিকাদি নাটকের প্রাকৃতের মত অনেকটা সংপ্রসারণ ক্রিয়া দৃষ্ট হইয়া থাকে; যথা, হর্ষ—হরিষ, মগ্ন—মগন, নির্ম্মাণ—নিরমাণ গর্জ্জন—গরজন, নির্ম্মল—নিরমল, জন্ম—জনম, নির্দ্দয়—নিরদয়, রত্ন রতন, যত্ন যতন, প্রকাশ পরকাশ, দর্শন দরশন, বরিয়া ইত্যাদি। এই কোমল শব্দগুলি বাঙ্গালা কথায় ব্যবহৃত হয় না, কেবল পদ্যরচনায় দৃষ্ট হয়। বৈষ্ণবযুগের কবিতায় এই ভাবের কোমল শব্দ বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়, কিন্তু পরবর্ত্তী সাহিত্যে সাহিত্যে ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিয়াছে। বাঙ্গালাভাষা যে ভাবে রূপান্তরিত হইতেছে, এই সম্প্রসারণ ক্রিয়া সেই পরিবর্ত্তনের অনুকূল নহে, এজন্য এই প্রথা হিন্দী-প্রভাবের শেষ চিহ্ন বলিয়া বোধ হয়। দ্বিতীয়তঃ, হিন্দী ভাষার অনুনাসিক শব্দের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক, যাঁহা, তাঁহা, কবহুঁ, যবহুঁ, প্রভৃতি অসংখ্য শব্দের উপর চন্দ্রবিন্দু দিতে হয়; ঐ সমুদয় শব্দ যে সকল সংস্কৃতশব্দের রূপান্তর, তাহাতে এরূপ কিছুই নাই, যদ্দ্বারা এই চন্দ্রবিন্দু সমর্থিত হইতে পারে। চন্দ্রবিন্দু, 'ঞ' এবং 'ঙ' হিন্দিভাষা হইতে আসিয়া বৈষ্ণবযুগের

ভাষায় হিন্দী প্রভাবের স্থায়ী চিহ্ন।

রচনায় গাঢ় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। * এখনও বঙ্গভাষায় আঁখি, কুঁড়ে কুঁজ, কাঁক, পুঁথি ইত্যাদি শব্দের অনুনাসিক উচ্চারণ রহিয়া গিয়াছে, অথচ অক্ষি, কুটীর, কক্ষ, পুস্তক ইত্যাদি শব্দের রূপান্তরে চন্দ্রবিন্দু কিরূপে সমাগত হইবে, ভাবিয়া পাওয়া যায় না। ইহাও হিন্দী প্রভাবের শেষ চিহ্ন বলিয়া বোধ হয়।

বৈষ্ণবগণ "শ্রী" শব্দের পক্ষপাতী ছিলেন, পরবর্ত্তী বৈষ্ণবসাহিত্যে (ভক্তিরত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থে) 'শ্রীকেশ,' 'শ্রীদর্শন,' শ্রীহস্ত 'শ্রীললাট' 'শ্রীপ্রসাদ' প্রভৃতির অবধি নাই; সেই সব পুস্তকে ক্ষুদ্র শ্রেণীবদ্ধ অক্ষরগুলির মধ্যে প্রায়ই পতাকাধারী সেনাপতির ন্যায় "শ্রী" গুলি বড় সুন্দর দেখায়। বৈষ্ণবগণের দ্বারা "মহোৎসব," "দশা" "লুট" (হরির লুট) প্রভৃতি শব্দের অর্থ সীমাবদ্ধ হইয়াছে। "বাঁকা" শব্দ বঙ্কিম শব্দের অপভ্রংশ, ইহা এখন "উৎকৃষ্ট" অর্থে ব্যবহৃত হয়; শ্রীকৃষ্ণের বঙ্কিমত্ব হেতু এই শব্দ গৌরবাত্মক হইয়া থাকিবে।

শিরোমুণ্ডন।

এই স্থলে বৈরাগিগণের শিরোমুণ্ডন সম্বন্ধে একটি কথা বলা আবশ্যক। চৈতন্যভাগবত ইত্যাদি পুস্তকে দেখা যায়, মহাপ্রভুর শিরোমুণ্ডনের সময় শিষ্যগণ নানারূপ বিলাপ করিতেছে। সামান্য কেশচ্ছেদ উপলক্ষে এত বেশী আক্ষেপ কোন কোন পাঠকের নিকট বিরক্তিকর বোধ হইতে পারে। এবিষয়টি আমরা প্রাচীনকালের মানদণ্ড দ্বারাই মাত্র বিচার করিতে পারি। সে সময় বঙ্গের বহুসংখ্যক শিক্ষিত যুবক সংসারত্যাগী হইতেন; এখনকার শিক্ষা আমাদিগকে সংসার সম্বন্ধে অভিজ্ঞ করে, তখনকার শিক্ষা সংসার ত্যাগ করিতে শিখাইত। বহুসংখ্যক পিতামাতার স্নেহের হৃদয় ভগ্ন করিয়া, প্রফুল্লতার দীপটী চিরদিনের জন্য নিবাইয়া যুবকগণ সন্ন্যাস গ্রহণ করিতেন, একবার শিরোমুণ্ডন করিয়া সন্ন্যাস লইলে তিনি আর সমাজে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন না। যুবকগণ সে সময় দীর্ঘকেশ রাখিয়া আমলকী দ্বারা তাহা ধৌত করিয়া পুষ্পাভরণে সজ্জিত করিতেন। এহেন কেশচ্ছেদ অর্থে তখন চিরদিনের জন্য, পিতা, মাতা ও বন্ধু-বান্ধবের আশাচ্ছেদ বুঝাইত, এই জন্য চৈতন্যপ্রভুর শিরোমুণ্ডন উপলক্ষে এত দীর্ঘ আক্ষেপোক্তির কথা দৃষ্ট হয়। এই সন্ন্যাস-গ্রহণ তখন গৃহস্থের একটি সাধারণ আতঙ্কের কারণ ছিল, এখনও পূর্ব্ববঙ্গে বালকগণ পিতামাতার বর্ত্তমানে কুশাসনে বসিতে পায় না, কিন্তু ইহা প্রাচীন ভয়ের শেষ চিহ্ন, বস্তুতঃ ভয়ের আর কোন কারণ নাই। রমণীগণ বিধবা হইলে তাঁহাদের কপালের সিন্দুর মোছা ও শাঁখা ভাঙ্গা যত কষ্টের কারণ হয়, তখন যুবকগণের কেশচ্ছেদও সেইরূপ একটি শোকাবহ

* "The same was the case in Bengali, four hundred years ago and the Chaitanya Charitamrita aflords innumeroble instances of its use in words like যাইঞা, খাইয়া for the modern যাইয়া খাইঞা &c."
—Indo Aryans Vol., II.. P, 320

ব্যাপার ছিল। আমরা বৌদ্ধ-হিন্দুযুগ অধ্যায়ন্তর্গত গোবিন্দচন্দ্রের গানেও গোবিন্দচন্দ্রের সন্ন্যাসোপলক্ষে তাঁহার কেশচ্ছেদ ব্যাপারে একান্ত শোকাকুলা রাণীবর্গের মুখে "কার বোলে মহারাজা মুড়াইল কেশ" প্রভৃতি কাতরোক্তি শুনিয়াছি।

বৌদ্ধযুগের নিদর্শন।

বৌদ্ধযুগের কিছু কিছু চিহ্ন বৈষ্ণবযুগের ভাষায় পাওয়া যায়। হরিদাসকে প্রলুব্ধ করিয়া বর্ণনোপলক্ষে "মায়ামোহিত" শব্দ পাওয়া গিয়াছে, উহা বুদ্ধদেবের প্রলোভনের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। গোফা শব্দ বৌদ্ধদিগের, উহাও চৈতন্যভাগবত, গোবিন্দদাসের কড়চা প্রভৃতি পুস্তকে অনেক স্থলে পাওয়া যায়। আর একটি শব্দ "পাষণ্ডী"; ইহা বৌদ্ধগণ অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রতি ব্যবহার করিতেন, হিন্দুর "ম্লেচ্ছ," মুসলমানের "কাফের", খ্রীষ্টানের "infidel" যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, বৌদ্ধগণও "পাষণ্ডী" শব্দ সেই অর্থেই প্রয়োগ করিতেন,—যথা—অশোকের আদেশ-লিপিতে,—"দেবানম্ পিয়ো পিয়দশি রাজা সবত ইচ্ছতি' সবে পাষণ্ড বংসেয়ু সবে তে সয়মঞ্চ ভাবসুদ্ধিন্ চ ইচ্ছতি।" (দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী) (অশোকের নামান্তর) রাজা এই ইচ্ছা করেন যে, পাষণ্ড (বৌদ্ধধর্ম্মে আস্থাশূন্য ব্যক্তিগণও) যেন সর্ব্বত্র নিরাপদে বাস করেন। বৈষ্ণবগণ এই শব্দ বৌদ্ধদিগের নিকট হইতে ধার করিয়া বিধর্ম্মীদিগের প্রতি প্রয়োগ করিতেন।

সুবুদ্ধি রায়।

বৈষ্ণব অধ্যায়ে প্রসঙ্গতঃ এখানে আমরা "সুবুদ্ধিরায়" সম্বন্ধে একটা কথা বলিব। "সুবুদ্ধিরায়" "গৌড়ের অধিকারী" বলিয়া মুদ্রিত চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যখণ্ডের ২৫ অধ্যায়ে উল্লিখিত দেখা যায়, এইজন্য ঐতিহাসিক রাজ্যে এই অজ্ঞাত "গৌড়াধিপ" মহাশয়ের জন্যে তদন্ত হয়। কিন্তু ঐতিহাসিকগণ ইহার কোনও খোঁজ পান নাই; আমার নিকট দুইশত বৎসরের অধিক প্রাচীন যে হস্তলিখিত চৈতন্যচরিতামৃত আছে তাহাতে—"পূর্ব্বে যবে সুবুদ্ধিরায় গৌড় অধিকারী" স্থলে—'পূর্ব্বে যবে সুবুদ্ধিরায় ছিল অধিকারী" এই পাঠ দৃষ্ট হয়; কিন্তু যখন বীরহাম্বীরের সভাসদ ব্যাসাচার্য্যের হস্তলিখিত চৈতন্যচরিতামৃত এমন কি কৃষ্ণদাস কবিরাজের স্বহস্ত-লিখিত চৈতন্যচরিতামৃতও রক্ষিত বলিয়া প্রচারিত হইতেছে, তখন এবিষয়টির সহজে মীমাংসা হইতে পারে।

সাহিত্যে নবযুগ।

আমরা এখন "সংস্কারযুগের" সন্নিকটবর্ত্তী হইতেছি। বৈষ্ণবযুগের অমৃতময় গীতি বঙ্গসাহিত্যের সর্ব্বাপেক্ষা গৌরব ও আদরের জিনিষ। যে দেবরূপী মানুষ বর্ত্তমানকে অতীতের কঠোর শাসন হইতে নিষ্কৃতি দিয়া ইতিহাসে উজ্জ্বল করিয়াছেন, পশুমুণ্ড ও বনফুল ছাড়িয়া নয়নাশ্রু দ্বারা দেবার্চ্চনা শিখাইয়াছেন—যাঁহার নির্ম্মল অশ্রুবিন্দুতে প্রতিভাত হইয়া এক যুগের বঙ্গসাহিত্য মণির ন্যায় সুন্দর হইয়া রহিয়াছে, সেই চৈতন্যপ্রভুর পবিত্র নামাঙ্কিত যুগ আমরা গভীর শ্রদ্ধা সহকারে এই খানে সমাপন করিতেছি।

কিন্তু গীতকবিতার যুগাবসানে বঙ্গসাহিত্যে দেশীয় পুরুষ ও স্ত্রীলোকগণের কতকগুলি খাঁটি ছবি অঙ্কিত হইয়াছিল—সেগুলি তিনশত বৎসর পূর্ব্বের। এই ছবিগুলি বড় উজ্জ্বল, বড় সুন্দর—দেখিলে প্রাচীন পর্ণকুটীরকেও সুন্দর বলিতে হইবে এবং কুটীরবাসিগণের চরিত্রের সৌন্দর্য্যে পাঠক মুগ্ধ হইয়া পড়িবেন। সংস্কার-যুগের সাহিত্যে আমরা কাব্যের নির্ম্মল মুকুরে বিম্বিত প্রাচীন সামাজিক জীবনের প্রকৃত রূপ দেখিতে পাইব।

বৌদ্ধ-যুগের অবসানে গ্রাম্য দেবতারা আসর জম্‌কাইয়া বসিলেন। বৌদ্ধ-জনসাধারণ নানারূপ অদ্ভুত অদ্ভুত নামের দেবতা পূজা করিতেন, কবিকঙ্কণ চণ্ডী, ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল প্রভৃতি বহু কাব্যে এই সকল দেবতার উল্লেখ আছে, বুড়ি, বুড় মা, কাঁকড়া বিছা প্রভৃতি দেবতা এই শ্রেণীর। ইহাদের পূজা জনসাধারণের মধ্যে বহুল পরিমাণে প্রচারিত দেখিয়া ব্রাহ্মণগণ ইহাঁদিগকে আর্য্য দেবতার এক পংক্তিতে স্থান দিলেন এবং ইহাঁদের পূজার ভার নিজেরা গ্রহণ করিলেন। ডোম, কাপালিক, হাড়ি প্রভৃতি জাতীয় পুরোহিতের হাত হইতে পূজার মন্দিরের ভার ব্রাহ্মণেরা কাড়িয়া লইলেন, এখনও শীতলা পূজার পুরোহিত ডোম পণ্ডিতেরা। বাঙ্গলা দেশে কোন কোন কালী-বাড়ির পুরোহিত হাড়িরা। এমন কি চণ্ডী পূজার কতকগুলি বিশেষ অনুষ্ঠানে এখনও হাড়িদের সাহায্য স্বীকৃত হয়। এই অদ্ভুত নামা দেবগণকে হিন্দু দেব-সমাজে পাঙ্‌ক্তেয় করিবার জন্য তাঁহাদের নাম সংস্কৃত ভাবাপন্ন করা হইল এবং তাঁহাদের সঙ্গে হিন্দু দেব দেবতার নানারূপ সম্বন্ধ পরিকল্পিত হইল। এই দেবতাদের পূজার মণ্ডপে যে সকল আমোদ-প্রমোদ অনুষ্ঠিত হইত, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দী তাহাদের মধ্যে "মঙ্গল গান" লোক মনোরঞ্জনের জন্য বঙ্গভাষায় বিরচিত হইয়া উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি-সম্পন্ন হইতে লাগিল। এই "মঙ্গল গান" কবিকঙ্কণের চণ্ডী, মাণিক রামের ধর্ম্ম-মঙ্গল, ভারতচন্দ্রের অন্নদা-মঙ্গল প্রভৃতি কাব্যে পূর্ণ পরিণতি প্রাপ্ত হইল।



অষ্টম অধ্যায়

সংস্কার-যুগ

১। লৌকিক ধর্ম্ম-শাখা

২। অনুবাদ-শাখা

সংস্কার-যুগ কেন বলি? সমাজের ইতিহাসে সর্ব্বত্রই দুইরূপ ক্রিয়া দৃষ্ট হয়। যুগে যুগে প্রতিভান্বিত পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া পুরাতন ভাঙ্গিয়া নূতনের প্রতিষ্ঠা করিয়া যান, কিন্তু প্রাচীন ভগ্ন হওয়ার জিনিষ নহে। প্রতিভাবান্ ব্যক্তি অন্তর্হিত হইলে পুনশ্চ প্রাচীন আসিয়া স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করে; নূতন ও পুরাতন কালের দ্বন্দ্বে ভাবী সমাজ গঠিত হয়। নূতন সম্প্রদায়ে অদম্য তেজ থাকে, তাহাতে প্রাচীনের আবর্জ্জনা ভাসাইয়া লইয়া যায়; সেই সঙ্গে প্রাচীনকালের মণিমুক্তা ভাসিয়া না যায়, এইজন্য রক্ষণ-শীল-সম্প্রদায় স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়ান। স্বাধীনতার চিত্র সর্ব্বত্রই বিস্ময় ও আনন্দ উৎপন্ন করে। স্বাধীনতার অগ্নিতে অতীতের মৃতদেহের সৎকার হয়, এবং বর্ত্তমানের চিত্র উজ্জ্বল হয়; কিন্তু অন্যদিকে উহার একটি গৃহস্থালী-বিরোধী উচ্ছৃঙ্খলতা থাকে, যাহার সতেজ আবর্ত্তে ভাল মন্দ একসঙ্গে মিশিয়া লুপ্ত হইবার আশঙ্কা আছে।

সংস্কার-যুগ

বৈষ্ণব-যুগে বঙ্গের চরম প্রতিভা প্রকাশিত হইয়াছিল। আমরা দেখাইয়াছি, বঙ্গসাহিত্যের নিরুদ্ধ-স্রোত চৈতন্যপ্রভুর চরণস্পর্শে নবজীবনের স্ফূর্ত্তিসহ প্রবাহিত হয়। বৈষ্ণবপদাবলী ও চরিতাখ্যানে আমরা স্বাধীনতার অপূর্ব্ব প্রভাব দেখিয়াছি।

কিন্তু প্রাচীন পদ্মাপুরাণ, চণ্ডী, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি শত শত পুস্তক বাঙ্গালাসাহিত্যে অনাদরে পড়িয়াছিল, তাহাদের কোন কোনটির উপর বৃন্দাবনদাস প্রভৃতি লেখক রোষানল বর্ষণ করিয়াছেন, কিন্তু তাহারা দগ্ধ হয় নাই। ফুল্লরার চরিত্রে খুল্লনার চরিত্রে যে স্থায়ী সৌন্দর্য্যের আভাস ছিল, তাহা বাঙ্গালী পাঠক ভুলিতে পারে নাই। যেটুকু ভাল,—জীবনে হউক, সমাজে হউক, ইতিহাসে হউক—তাহা দলিত হইয়াও লুপ্ত হয় না, পুনঃ পুনঃ তাহার অঙ্কুরোদ্গম

হয়,—তাহার সৌন্দর্য্য বারংবার ইতিহাসে প্রকটিত হয়; যাঁহারা তাহা লুপ্ত করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা তাহার সৌন্দর্য্য আরও বাড়াইয়া ফেলেন এবং তাহাকে নবশক্তিলাভ করিতে সুবিধা দেন। এই যুগে প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি আবার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। কিন্তু রক্ষণ-শীল-সম্প্রদায়ও প্রাচীনকে কতকটা নূতন ছাঁচে ঢালিয়া রক্ষা করেন; আধুনিক চিন্তার নারায়ণতৈলসংযোগে প্রাচীনকে সজীব রাখিতে হয়। রামায়ণ-মহাভারতাদির অনুবাদ, চণ্ডীকাব্য, পদ্মাপুরাণ, শিবসংকীর্ত্তন ইত্যাদি পুস্তক এই যুগে নবভাবে সংস্কৃত হইয়া পুনরায় লোকমনোরঞ্জনের উপযোগী হইয়াছিল। রামায়ণ, মহাভারত, চণ্ডী, মনসার ভাসান প্রভৃতি সমস্ত পুস্তকেরই নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এই নূতন সংস্করণময়-যুগকে আমরা—"সংস্কার যুগ" আখ্যা প্রদান করিয়াছি।

আমরা দেখাইব, কৃত্তিবাস, সঞ্জয়, কবীন্দ্রপরমেশ্বর, প্রভৃতি অনুবাদলেখকগণ ষষ্ঠীবর সেন, গঙ্গাদাস সেন, কাশীদাস রামমোহন, রঘুনন্দন প্রভৃতি পরবর্ত্তী লেখকগণের হস্তে,—দ্বিজজনার্দ্দন, বলরামকবিকঙ্কণ প্রভৃতি লেখক মাধবাচার্য্য ও মুকুন্দরাম প্রভৃতি লেখক মাধবাচার্য্য ও মুকুন্দরাম প্রভৃতি লেখকদিগের হস্তে,—এবং কাণাহরিদত্ত, বিজয়গুপ্ত, নারায়ণদেব প্রভৃতি লেখকবর্গ কেতকদাস, ক্ষেমানন্দদাস প্রভৃতি একগোষ্ঠী নূতন মনসার ভাসানরচকের হস্তে এইযুগে নব জীবন লাভ করিলেন। কিন্তু প্রাচীন লেখকগণের কীর্ত্তি নবভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া নূতন কবিগণ তাঁহাদিগের যশের সমস্ত অংশ অধিকার করিয়া লইলেন,—প্রাচীন কীটভুক্ত কাগজের নজিরে প্রকৃত মহাজনগণের ঋণের কথা জানা যাইতে পারে, কিন্তু কে তাহার খোঁজ করে?

প্রাচীন ও পরবর্ত্তী লেখকগণের সম্বন্ধ।

এই ঋণের পরিমাণ ও গুরুত্ব কত, তাহা দেখা যাক্। মাধবাচার্য্য প্রভৃতি পূর্ব্ববর্ত্তী চণ্ডীলেখকগণের নিকট মুকুন্দরাম নানাবিষয়ে ঋণী। মূল বিষয়ের ত কথাই নাই,—সমস্তই এক কথা; তাহা ছাড়া পংক্তিগুলি পর্য্যন্ত অপহৃত দেখা যায়। ভারতচন্দ্র স্বীয় নায়ক সুন্দরের মত সিঁধ কাটিয়া চুরি করিয়াছেন; তাঁহার কণ্ঠে যে যশের মুক্তামালা, তাহা তিনি ইহলোকে নিজের বলিয়াই পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, কিন্তু যেখানে ন্যায়ের উচিত তুলাদণ্ডে প্রকৃত অধিকারের ভাগ হয়, সেখানে সেই বড় মুক্তাছোড়ার একটি মুক্তাও তাঁহার থাকিবে কি না, সন্দেহ। বঙ্গসাহিত্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও দেখা যায়, কালিদাস পদ্মপুরাণ হইতে, সেক্সপীয়র হলিন্‌সিয়াড হইতে, মিল্টন ইলিয়াড প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে বিষয় এবং উপকরণ অবাধে সংগ্রহ করিয়াছেন। এই সব পরস্বাপহারক দস্যু কাব্যজগতে লব্ধযশা ও শ্রেষ্ঠ কেন? ইহার একমাত্র উত্তর—ইঁহারা প্রতিভার রাজদণ্ড লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা যাহা স্পর্শ করিয়াছেন, তাহাতেই ইঁহাদের অধিকার বর্ত্তিয়াছে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাজগণ সকলেই এক

ভাগ্যংফলতি সর্ব্বত্র।

প্রকার দস্যু। কবিকঙ্কণ, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি লেখক নানা স্থান হইতে আহৃত রত্নের উৎকৃষ্ট সমন্বয় করিয়াছেন; পৃথিবী ক্ষমতার পূজক—এজন্য ইঁহারা অপহরণ করিয়াও লোকপূজার পুষ্পচন্দন পাইতেছেন। কিন্তু যাহারা চুরি করিয়া ঢাকিতে পারে না,—যাহাদের কুৎসিত সমন্বয়ে পল্লবের সঙ্গে শাখার, ত্বকের সঙ্গে অস্থির মিল পড়ে না, সেই দুর্ভাগ্যগণের জন্যই লোকনিগ্রহের নিষ্ঠুর শাসনের ব্যবস্থা। শক্তিমান্ স্বেচ্ছাচারীর দ্বারা পাপ পুণ্যের কৃত্রিম গণ্ডী নির্দ্ধারিত হইতেছে,—কিন্তু এই সমস্ত সামাজিক উন্নতি ও অবনতির মূলে ভাগ্যদেবী দাঁড়াইয়া পাগলিনীর মত কাহারও মাথায় ছত্র ধরিতেছেন, কাহারও মাথার ছত্র কাড়িয়া লইতেছেন।

প্রতিভান্বিত কবি মন্ত্রবলে প্রাচীন ও বর্ত্তমান কালের সমস্ত সৌন্দর্য্য অপহরণ করিয়া স্বীয় কাব্য-পটে সন্নিবিষ্ট করেন; ইহাকে অপহরণ না বলিয়া আহরণ বলা উচিত, কারণ অঙ্কনপটু চিত্রকরের জন্য গত যুগের কাব্য-চিত্র ও নব-যুগের দৃশ্যাবলী তুল্যরূপই ব্যবহার্য্য ও তিনিই এবিষয়ে একমাত্র স্বত্ববান্।

১। লৌকিক-শাখা।

মাধবাচার্য্য, মুকুন্দরাম, রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য, কেতকাদাস, ক্ষেমানন্দ প্রভৃতি ও ঘনরাম।

দ্বিজজনার্দ্দনের চণ্ডী।

চণ্ডীর উপাখ্যান দ্বিজ জনার্দ্দন রচনা করিয়াছিলেন, উহা একটি ছোট খাট ব্রতকথা। চণ্ডীর ভক্তগণ এই ব্রতকথাটিকে ক্রমে বড় কাব্যে পরিণত করিলেন; কয়েক মিনিটের মধ্যে পুরোহিতঠাকুর যে ব্রতকথা সমাধা করিয়া যাইতেন, তাহা লইয়া ষোল পালা গান রচিত হইল।

বলরামের চণ্ডী।

মুকুন্দরামের পূর্ব্বে কতজন কবি এই উপাখ্যান লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছেন, ঠিক বলা যায় না। বলরাম কবিকঙ্কণের চণ্ডী মেদিনীপুর অঞ্চলে প্রচলিত ছিল, মাধবাচার্য্যের চণ্ডী ১৫৭৯ খৃঃ অব্দে প্রণীত হয়। এই চিত্রগুলি সংশোধন করিয়া মুকুন্দরাম * নূতন কাব্য প্রণয়ন করেন।

---

* মুকুন্দরাম তাঁহার হস্তলিখিত পুঁথির দীর্ঘ বন্দনাপত্রে লিখিয়াছেন—"গীতের গুরু বন্দিলাম শ্রীকবিকঙ্কণ"—ইহা দ্বারা অনুমান হয়, বলরাম-কবিকঙ্কণের চণ্ডী অবলম্বন করিয়া তিনি স্বীয় কাব্য রচনা করেন। "মেদিনীপুরের লোকদিগের সংস্কার, এই বলরাম-কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম-কবিকঙ্কণের শিক্ষা-গুরু।"—পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০২ শ্রাবণ, ১১০ পৃঃ।

সংশোধিত চিত্র সম্মুখে থাকিতে প্রথম উদ্যমের নমুনা দেখিয়া কাব্যামোদিগণ কতদূর পরিতৃপ্ত হইবেন বলা যায় না, তবে একরূপ ভাব-বিকাশের পর্য্যায় লক্ষ্য করিতে যাঁহারা ইচ্ছুক, তাঁহারা পূর্ব্ব নিদর্শনগুলি পাইলে আদর করিবেন, সন্দেহ নাই।

বলরাম-রচিত চণ্ডী আমরা দেখি নাই, কিন্তু মাধবাচার্য্যের চণ্ডী মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছি। মাধবাচার্য্য আত্ম-পরিচয়স্থলে লিখিয়াছেন;—

মাধবাচার্য্য।

"পঞ্চগৌড় নামে স্থান পৃথিবীর সার। একাব্বর নামে রাজা অর্জ্জুন অবতার। অপার প্রতাপী রাজা বুদ্ধে বৃহস্পতি। কলিযুগে রামতুল্য প্রজা পালে ক্ষিতি॥ সেই পঞ্চগৌড় মধ্যে সপ্তগ্রাম স্থল। ত্রিবেণীতে গঙ্গাদেবী ত্রিধারে বহে জল। সেই মহানদী তটবাসী পরাশর। যাগে যজ্ঞে জপে তপে শ্রেষ্ঠ দ্বিজবর॥ মর্য্যাদায় মহোদধি দানে কল্পতরু। আচারে বিচারে বুদ্ধে সম দেবগুরু। তাঁহার তনুজ আমি মাধব-আচার্য্য। ভক্তিভরে বিরচিনু দেবীর মাহাত্ম্য॥ আমার আসরে যত অশুদ্ধ গায় গান। তার দোষ ক্ষমা কর কর অবধান। শ্রুতিতালভঙ্গ অঙ্গ দোষ না নিবা আমার। তোমার চরণে মাগি এই পরিহার॥ ইন্দু বিন্দু বাণ ধাতা শক নিয়োজিত। দ্বিজ মাধবে গায় সারদা রচিত॥ সারদা চরণ-সরোজ-মধু লোভে। দ্বিজ মাধবানন্দে অলি হয়ে শোভে॥"

"ইন্দু বিন্দু বাণধাতা" অর্থ ১৫০১ শক, ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দ। কথিত আছে, মাধবাচার্য্য ময়মনসিংহ জেলার দক্ষিণে মেঘনা নদীর তীরস্থ নবীনপুর (ন্যানপুর) গ্রামে বাস স্থাপন করেন। এই স্থান এখন গোঁসাইপুর বলিয়া পরিচিত। মাধবাচার্য্যের পিতামহের নাম ধরণীধরবিশারদ, পিতার নাম পরাশর ও একমাত্র পুত্রের নাম জয়রামচন্দ্র গোস্বামী। পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত চট্টগ্রাম হইতে তাল পাতার পুঁথির আকারে এই পুস্তক বহু পূর্ব্বে প্রকাশিত করিয়াছিলেন।

মাধবাচার্য্য ও মুকুন্দরামের ক্ষমতা এক দরের নহে—মুকুন্দরামের প্রতিভা প্রথম শ্রেণীর কবির, মাধবাচার্য্য দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিগণের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হইবার যোগ্য; কিন্তু উভয় কবির প্রতিভায় কতকটা একপরিবারের লক্ষণ দৃষ্ট হয়,—যেন প্রকৃতি সুন্দরী একই হস্তে দুইটি ফুল সৃষ্টি করিয়াছেন, দুইটিতেই স্বভাব-গত অনেক সাদৃশ্য, কিন্তু একটি অন্যটি হইতে বেশী উজ্জ্বল, সুগন্ধি ও সুন্দর, তাই পথিকের চক্ষু সেইটির প্রতি মুগ্ধ হইয়া অপরটিকে উপেক্ষা করে। কিন্তু যেখানে গোলাপ নাই, সেইখানেই পক্ষপাতশূন্য দৃষ্টিতে মালতী ফুলটির রূপ উপভোগ করা সম্ভবপর। কবিকঙ্কণের সান্নিধ্যের ছায়া হইতে মাধুকবিকে নিরাপদ স্থলে রাখিয়া গুণের বিচার করা উচিত। আমরা উভয় কবিকে দেখিয়া ফেলিয়াছি; সুতরাং বোধ হয় প্রকৃত বিচারের অধিকারী নহি। মাধুকবির ফুল্লরা কবিকঙ্কণের ফুল্লরার ন্যায় লজ্জা-নতা সুন্দরী গৃহস্থবধূ নহে। এই ফুল্লরার জিহ্বা অসংযত, তাহার চরিত্রে অপরটির ন্যায় সংযমশীলতা ও স্বাভাবিক সরমের বিকাশ পায় নাই। মাধুর লহনা ও খুল্লনা ততদূর পরিষ্কার চরিত্র নহে—উহারা মুকুন্দের লহনা ও খুল্লনার রেখাপাত মাত্র। গল্পাংশে উভয় কবিরই বেশ ঐক্য আছে—মধ্যে মধ্যে মুকুন্দ

মুকুন্দ ও মাধবাচার্য্য।

স্বীয় কল্পনার কোন রম্য দৃশ্য বা মানুষ-চরিত্র জ্ঞানের কোন বিচিত্র আদর্শ দেখাইতে পূর্ব্বশ্রুত গল্পের সরলবর্ত্মের পার্শ্বে একটু তির্য্যগ্ লীলা করিয়া লইয়াছেন। উষার সিন্দূরবর্ণে প্রকৃতির পূর্ণ বিকাশ পাইবার পূর্ব্বে, শেষতারার ক্ষীণালোকে আধ-মুদিত জগৎদৃশ্যের ন্যায় মুকুন্দের চণ্ডীর পূর্ব্বে মাধুর চণ্ডী কাব্য-বিকাশের পূর্ব্বাভাষ দেখাইতেছে। মাধুর তুলিতে চণ্ডীকাব্যের যে সকল ছায়াপাত হইয়াছিল, মুকুন্দের বর্ণবিন্যাসক্রমে তাহারা সজীব সুন্দর চিত্র হইয়াছে।

মুকুন্দ স্বভাবের নিজ ঘরের কবি, মাধু তদপেক্ষা ক্ষমতায় অল্প, কিন্তু তাঁহারাও স্বভাবের প্রতি স্থির লক্ষ্য। ক্ষুদ্র ঘটনা, ক্ষুদ্র কথা, তুচ্ছ বিষয় লইয়া অনেক শ্রেষ্ঠ কবিত্ব বিকাশ পায়। কবি ব্যাধের ক্ষুদ্র কুটীর বর্ণনা করিবেন, এস্থলে লেখনীর ছেঁড়াকাঁথা, মাংসের পসরা ও ভেরাণ্ডার থামই বর্ণনীয় বিষয়। এখানে কবির 'নবনীত-কোমল', 'নখরুচি-কিংশুক-জাল' প্রভৃতি কেতাবতী উৎপ্রেক্ষা ব্যবহার করিবার একেবারেই সুবিধা নাই। মাধু যে কার্য্য হাতে লইয়াছিলেন, তাহার যোগ্য ক্ষমতা তাহার বেশ ছিল,—"দুলি পেলি খেলী এয়ো আইল ব্যাধ ঘরে। মৃগ চর্ম্মপরিধান, দুর্গন্ধ শরীরে॥"

স্বাভাবিকত্ব।

প্রভৃতি বর্ণনায় দেখা যায়, মাধু ভেরাণ্ডার থাম ধরিয়া ব্যাধের ঘরে উঁকি মারিয়া নিজে এই সকল চিত্র দেখিয়াছেন; সেখানে ব্যাধরূপসীগণের অর্দ্ধাবৃত অঙ্গের দুর্গন্ধ সহ্য করিয়াও ভদ্রকবি তাহাদের গ্রাম্যরূপের ফটো তুলিয়া লইয়াছেন,—তাহা মার্জ্জিত করিয়া সুন্দর করিতে যান নাই; বাঙ্গালা প্রাচীন কবিগণের মধ্যে খগরাজ ও তিলফুলের হাত হইতে যাঁহারা নায়ক নায়িকার নগ্ন নিভারণ রূপটি রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের নৈসর্গিক-শক্তির বিশেষ প্রশংসা করিতে হইবে। কোন কোন সময় মাধুকবি বর্ণনা-প্রসঙ্গে নিঃসহায়ভাবে প্রকৃতির হাতে যাইয়া পড়িয়াছেন, কাব্যের মর্য্যাদা ভুলিয়া বালকের ন্যায় একটি বিড়ালের গতি পর্য্যন্ত অনুসরণ করিয়া তৃপ্তি বোধ করিয়াছেন, তাঁহার এই অসংযত ক্রীড়ার এমন একটু স্বাভাবিকত্ব আছে, যাহাতে শিশুর পোকা ধরিবার যত্ন মনে পড়ে,—নিম্নের অংশটি "আপ পিজ্জিয়ের" গল্পের মত,—

"খুল্লনায় বলে দিদি মুড়া খাও তুমি। তবে এক লক্ষ টাকা পাইব যে আমি॥ ঠেলাঠেলি ফেলাফেলি কেহ নাহি খায়। মাচার তলে থাকি বিড়াল আড় চোখে চায়॥ ধীরে ধীরে আড়ে আড়ে গেল পাতের কাছে। মুড়া লইয়া বিড়াল গেল বাড়ীর পাছে। অনেক যতন করি পুষিনু বিড়াল। হেন বিড়াল মুড়া লৈয়া কার বাড়ী গেল॥ হাউ হাউ চিই চিই করিতে করিতে। এবাড়ী হইতে বিড়াল ও বাড়ী যাইতে॥ মুড়া গেল পড়ি কোথাকার পথেতে॥"

কবির রূপ বর্ণনায়ও সর্ব্বত্র সেই স্বভাবের খেলা—কালকেতু-ব্যাধের শৈশবের মূর্ত্তিটি এইরূপ—"তবে বাড়ে বীরবর, জিনি মত্ত করিবর, গজশুণ্ড জিনি কর বাড়ে। যতেক আখেটি সুত, তারা সব পরাভূত, খেলায় জিনিতে কেহ নারে॥ বাটুল বাঁশ লয়ে করে, পশু পক্ষী চাপি ধরে, কাহার ঘরেতে নাহি যায়। কুঞ্চিত করিয়া আঁখি, থাকিয়া মারয়ে পাখী, ঘুরিয়া ঘুরিয়া পড়ে যায়॥" মুকুন্দরাম এই অভ্যাস দৃশ্যটিকে বড় এবং উজ্জ্বল করিয়া, পরিষ্কার বর্ণক্ষেপে আঁকিয়াছেন, যথা,—

"দিনে দিনে বাড়ে কালকেতু। বলে মত্ত গজপতি, রূপে নব রতিপতি, সবার লোচনসুখ হেতু। নাক মুখ চক্ষু কাণ, কুন্দে যেন নিরমাণ, দুই বাহু লোহার সাবল। রূপগুণ শীলে বাড়া, বাড়ে যেন হাতী কড়া, যেন শ্যাম চামর কুন্তল॥ বিচিত্র কপালতটী, গলায় জালের কাঁটী, করযোড়া লোহার শিকলি॥ বুক শোভে ব্যাঘ্রনখে, অঙ্গে রাঙ্গা ধূলি মাখে, কটিতটে শোভয়ে ত্রিবলী॥ দুই চক্ষু জিনি নাটা, খেলে দাণ্ডা গুলি ভাঁটা, কাণে শোভে স্ফটিক কুণ্ডল॥ পরিধান রাঙ্গা ধুতি, মস্তকে জালের দড়ী, শিশুমাঝে যেমন মণ্ডল। সহিয়া শতেক ঠেলা, যার সঙ্গে করে খেলা, তার হয় জীবন সংশয়॥ যে জন আকুড়ি করে, আছাড়ে ধরণী ধরে, ডরে কেহ নিকটে না রয়॥ সঙ্গে শিশুগণ ফিরে, শজারু তাড়িয়ে ধরে, দূরে গেলে ধরায় কুক্কুরে। বিহঙ্গ বাঁটুলে বিন্ধে, লতায় জড়িয়ে বাঁধে, স্কন্ধে ভার বীর আইসে ঘরে॥"—ক, ক, চণ্ডী।

উভয় চণ্ডীতে অনেক ছত্র পাওয়া যায়, যাহা ঠিক একরূপ; হয়ত, মুকুন্দরাম সেগুলি মাধবের চণ্ডী হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, নতুবা উভয় কবিই কোন লুপ্তকবির ভূপ্রোথিত ধনাগার লুণ্ঠন করিয়া লইয়াছেন।

মুকুন্দের কাব্যের প্রায় সমস্ত অংশই মাধুর চণ্ডী হইতে উৎকৃষ্ট; উহাতে আখ্যান বস্তুর বর্ণনা, কাব্যাংশ, ঘটনা-বৈচিত্র্য প্রভৃতি সকল গুণেরই বিশেষ উন্নতি দৃষ্ট হয়। কিন্তু মাধুর কালকেতু, মুকুন্দের কালকেতু হইতে বিক্রমশালী, মাধুর ভাঁড়ুদত্ত, কবিকঙ্কণের ভাঁড়ুদত্ত হইতে শঠতায় প্রবীণ। এই দুই চরিত্র সমালোচনার সময় আমরা মাধুর চণ্ডী হইতে সাহায্য গ্রহণ করিব।

ধুয়া

মাধু প্রকৃত বাঙ্গালী কবির ন্যায় কঠোর বিষয় হইতে কোমল বিষয় রচনায় পটু—তাঁহার রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক ধুয়াগুলি বনফুলের সৌরভময়—নিম্নে কয়েকটি উদ্ধৃত করিতেছি;

(ক) "কানাই তুমি ভাল বিনোদিয়া। নবকোটী চাঁদ ফেলাই ও মুখ নিছিয়া॥
বনে থাক বন-ফুল দিয়া গাঁথ হার। গোপ ঘরে ননী খাও গরিমা তোমার॥
মাঠে থাক ধেনু রাখ, বাঁশীতে দেও শান। গোপালের ঘরের মণি গোপালের পরাণ॥"

(খ) "কাল ভ্রমরা, যথা মধু তথা চলি যাও। আমার সংবাদ প্রাণনাথেরে জানাও॥
সে কথা কহিবে প্রভুর ঘনাইয়া কাছে। সুস্থির সম্ভ্রমে কেও লোকে শুনে পাছে॥
চরণকমলে শত জানাইও প্রণাম। অবশেষে শুনাইও রাধার নিজ নাম॥"

(গ) "আজু মোর মন্দিরে আওত কালা। কি করিবে চাঁদ পবন অলি কোকিলা॥"

(ঘ) "শিশু পশু চলি যায় অনেক সন্ধানে। কানাই কালা, বলাই দাদা চাঁদের সমানে॥"

যুদ্ধবর্ণনায় ছন্দ।

কবি মাধু যুদ্ধবর্ণনায় যে ছন্দ প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তাঁহার ১৭৩ বৎসর পরে ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গলে সেই ছন্দ অনুসরণ করিয়া যুদ্ধ বর্ণনা করিয়াছেন; কালকেতুর সঙ্গে কলিঙ্গাধিপের যুদ্ধ বর্ণনা প্রসঙ্গে—"যুঝে প্রচণ্ড ভাইয়া কোপে প্রজ্বলিত হৈয়া, মার কাট সঘনে ফুকারে। জনার্দ্দনের যত সেনা, শব্দেতে কম্পমানা, নানা অস্ত্র বরিষণ করে॥ পদাতি পদাতি

মুখে, অস্ত্র মারে ঘন ঘনে কুঞ্জরে কুঞ্জরে, চাপাচাপি। অস্ত্রবাহুনি করি, তুরগ উপরে চড়ি, বাহুতে বাহুতে কোপাকুপি॥ কোপে বলে কালদণ্ড, শুনরে ভাই প্রচণ্ড, মিছা কেন কর হটাহট। লুটিব আর পুড়িব, কালকেতুরে ধরিব নগর করিব ধূলাপাট।" প্রভৃতির পরে—"যুঝে প্রতাপ আদিত্য। ভাবিয়া অসার, ডাকে মার মার, সংসারে সব অনিত্য"—ইত্যাদি একটি প্রতিধ্বনির মত শুনায়

মাধবাচার্য্যের চণ্ডী চট্টগ্রামের পার্ব্বত্যদুর্গ আশ্রয় করিয়া নিরাপদ ছিল, কিন্তু কবিকঙ্কন এখন মুদ্রাযন্ত্রপ্রভাবে নবশক্তি লাভ করিয়া তাঁহাকে সেই নিভৃত নিকেতন হইতে তাড়াইতেছেন।

কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী।

হুসেনসাহেবের রাজত্ব বঙ্গ ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা ব্যাপক। কিন্তু সাধারণতঃ মুসলমান অধিকারে

হিন্দুর প্রতি অত্যাচার

হিন্দুর অন্নসংস্থান ক্রমে নষ্ট হইতেছিল, ও উৎপীড়নে দেশ শুদ্ধ আতঙ্ক জন্মিয়াছিল; মুসলমান আইনের একটি ধারা এইরূপ ছিল,—"যদি কোন মুসলমান দেওয়ান হিন্দুর নিকট কর আদায় করিতে উপস্থিত হন, তবে সেই হিন্দুর সম্পূর্ণ অবনতিসহকারে তাহা দিতে হইবে; অপিচ যদি মুসলমান দেওয়ান ইচ্ছা করেন যে কাফেরের মুখে থুথু প্রদান করিবেন, তবে তাহার তৎক্ষণাৎ মুখ ব্যাদন করিয়া তাহা লইতে হইবে,—ইহাতে তাহাদের ঘৃণার বিন্দুমাত্রও কারণ নাই; এই থুথুপ্রদানের কয়েকটি নিগূঢ় অর্থ স্বীকার করিতে হইবে, ইহা দ্বারা সরকারের আশ্রিত কাফেরের সম্পূর্ণ বশ্যতার পরীক্ষা হইবে, এবং একমাত্র সনাতন ইসলামধর্ম্মের গৌরব ও মিথ্যাধর্ম্মের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শিত হইবে।" * আইনের ধারা পর্য্যন্ত এইরূপ মার্জ্জিত ছিল! বঙ্গের প্রাচীন সাহিত্য খুঁজিলে মধ্যে মধ্যে মুসলমান অত্যাচারের কথা প্রসঙ্গক্রমে পাওয়া যায়। বিজয়গুপ্তের পদ্মপুরাণেও থুথুর উল্লিখিত দেখা যায়:—ব্রাহ্মণ পাইলে লাগে পরম কৌতুকে। কার পৈতা ছিঁড়ি ফেলে থুথু দেয় মুখে॥" "যাহার মস্তকে দেখে তুলসীর পাত। হাতে গলায় বাঁধি লয় কাজির সাক্ষাৎ॥ কক্ষতলে মাথা থুইয়া বজ্র মারে কিল। পাথর প্রমাণ যেন ঝড়ে পড়ে শিল। পরেরে মারিতে পরের কিবা লাগে ব্যথা। চড় চাপড় মারে আর ঘাড় গোতা॥ ব্রাহ্মণ সজ্জন তথা বৈসে অতিশয়। ঘরেতে

---

* When the Collector of the Dewan asks them (the Hindoos) to pay the tax, they shouid pay it wlth all humility and submission : and if the Collector wishes fo spit into their mouths, they should open their mouths without the slightest fear of contamination so that the Collector may do so. Tbe object of such humiliation and spitting into their mouths is to prove the obedience of the infidel subjects under protection and promote if possible the glory of tbe Islam —the true religion and to shew contempt to false religions—(Von Neor's Akbar). আকবর এই আইন রদ করেন।

গোময় না দেয় দুর্জ্জনের ভয়॥ বাছিয়া ব্রাহ্মণ পায় পৈতা যার কাঁধে। পেয়াদাগণ নাগ পাইলে হাতে গলায় বাঁধে॥" এবং—"পিরল্যা গ্রামতে বৈসে যতেক যবন। উচ্ছন্ন করিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ॥ কপালে তিলক দেখে যজ্ঞসূত্র কাঁধে। ঘর দ্বার লোটে আর লৌহপাশে বাঁধে॥"—জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল। মুকুন্দরামের অনেক স্থলের বর্ণনায়ও এইরূপ অত্যাচারের আভাস পাওয়া যায়। মুসলমানপ্রভাবের ক্রমোন্নতির পশ্চাতে দূর ভাগ্যাকাশের সীমান্তে হিন্দুর সুখ-স্বাচ্ছন্দের তারা ডুবিয়া যাইতেছিল; বঙ্গদেশে হিন্দুর দুর্ভাগ্য ও মুসলমানের সৌভাগ্যের ভাষাই প্রমাণ দিতেছে; হিন্দুর "কুঁড়ে" (কুটীর) —মুসলমানের "দালান," "এমারত"; হিন্দুর গাঁ (গ্রাম), মুসলমানের "সহর"; হিন্দুর 'শস্য' কর্ত্তিত হইয়া যখন মুসলমানের সেবায় লাগে, তখন তাহা "ফসল"; হিন্দুর "টাকা" (তঙ্কা) করগ্রাহী মুসলমানের হস্তে পৌঁছিলে "খাজানা" হয়; ক্ষুদ্র মেটে তৈলের "প্রদীপটি" মাত্র হিন্দুর; "ঝাড়", "ফানস", "দেওয়ালগিরি"—সমস্ত বিলাসের আলো মুসলমানের; হিন্দু অপরাধ করিলে "কাজি" "মেয়াদ" দেয়; ইহা ছাড়া "বাদশাহ", "ওমরাহ" হইতে "উজির", "নাজির", সামান্য "কোটাল", "পেয়াদা", "বরকন্দাজ", "নফর", পর্য্যন্ত সকলই মুসলমানীশব্দ; "জমি", "তালুক", "মুলুক" প্রভৃতি মুসলমানী শব্দ; "জমিদার", "তালুকদার"ও তাই; উপাধিগুলিও সমস্তই মুসলমানী—"জুমলদার", "মজুমদার", "হাবিলদার", সম্মানসূচক "সাহেব", প্রভুত্বসূচক "হুজুর" এই সকল কথা বঙ্গের ঘরে ঘরে প্রবেশ করিয়া হিন্দুর ভাষাকে যবনাধিকারচিহ্নিত করিয়াছিল। কিন্তু স্বভাবের 'চন্দ্র' 'সূর্য্য, 'তরু' 'ফুল' 'পল্লবে' হিন্দুর অধিকার ঘোচে নাই; পল্লীবাসী হিন্দু, নিজের ধর্ম্মটি ও প্রকৃতির মূর্ত্তিটিতে মুসলমানের ছায়া স্পর্শ করিতে দেন নাই। সংস্কৃত শব্দগুলি সেখানে নিষ্কলঙ্ক মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছে।

ভাষার সাক্ষ্য।

বঙ্গদেশের রাজনৈতিক বিপ্লব দূরপল্লীর কৃষককবিকেও গৃহসুখে বঞ্চিত করিল। মামুদ সরিফ নামক ডিহিদারকে কবি মুকুন্দরাম দুরপনেয় কালীর বর্ণে অঙ্কিত করিয়া তাঁহার অমর কাব্যের একপার্শ্বে রাখিয়া দিয়াছেন। এই ব্যক্তির অত্যাচারে প্রজাগণের দুঃখ অসহ্য হইয়া উঠিল, সরকারগণ খিল ভূমি আবাদী বলিয়া লিখিয়া লইল, তাহারা খাজানা শোধ করিতে না পারিয়া ধান, গরু বিক্রয় করিল; বাজারে জিনিষের মূল্য হ্রাস হওয়াতে টাকার দ্রব্য দশ আনায় বিক্রয় হইতে লাগিল। পোদ্দারগণ প্রত্যেক টাকায় আড়াই আনা কম দিতে আরম্ভ করিল এবং আমলাগণ এক কুড়ার মাপ খর্ব্ব করিয়া ১৫ কাঠায় বিঘা ধরিতে লাগিল। এদিকে প্রজাগণ সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পাছে প্রাণটি লইয়া পলাইয়া যায়, এইজন্য কোটাল ও জামাদারগণ পথ অবরোধ করিয়া পাহারা দিতে লাগিল।

ডিহিদার মামুদ সরিফ্।

দরিদ্র মুকুন্দ সাতপুরুষ যাবৎ চাষ-আবাদ করিয়া দামুন্যায় বাস করিতেছিলেন—এই দামুন্যা

পল্লীতে * তাঁহার কবিতার প্রথম নমুনা "শিবকীর্ত্তন" প্রসূত হয়; কিন্তু এবার এই রাষ্ট্রবিপ্লবে তিনি স্বীয় গ্রামে কোনরূপেই থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার মুনিব গোপীনাথনন্দী ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু খাজানার দাবী পূর্ণ করিতে না পারিয়া বন্দী হইলেন; কবি গম্ভীরখাঁর সহিত যুক্তি করিয়া চণ্ডীগড়ের শ্রীমন্তখাঁর সাহায্যে, শিশু পুত্র, স্ত্রী ও ভ্রাতা রামানন্দের সহিত পলাইয়া দেশত্যাগী হইলেন। "তৈল বিনা করি স্নান"—এবং "শিশু কাঁদে ওদনের তরে" প্রভৃতি দুই একটি ইঙ্গিতবাক্যে এই বিপদাপন্ন ক্ষুদ্র পরিবারটির শোচনীয় দুরবস্থা চিত্রিত হইয়া রহিয়াছে।

কবির দুরবস্থা ও স্বদেশ প্রেম।

গভীর দুঃখে কোন সময় গভীর ব্যাকুলতা জন্মে; তখন নির্ভর ও ভক্তিপূর্ণ অশ্রু চক্ষে উচ্ছলিত হয়। সংসারের অন্য অবলম্বন রহিত হইলে যিনি শেষের আশ্রয়, তাঁহারই পদে মানুষের মনের স্বভাবপ্রবৃত্তি ধাবিত হইয়া থাকে। মুকুন্দ এই সময় জলপথে যাইতেছিলেন, জলকুমুদ চয়ন করিয়া নয়নজল মিশাইয়া চণ্ডীদেবীর পদে উপহার দিলেন, স্বপ্নে চণ্ডী তাঁহাকে কাব্য লিখিতে আদেশ করিলেন; কবি এই স্বপ্নে বিশ্বাস করিয়াছিলেন, তাঁহার চণ্ডীকাব্য তাই এত সুন্দর হইয়াছে। দৈবশক্তিলাভে বিশ্বাস জন্মিলে মানুষী শক্তি বাড়িয়া যায়, ইহা কোন আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কবি তেলিগাঁ, গোড়াই নদী, তেউটা দারুকেশ্বর, আমোদরনদ, গোখরা প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া আরড়া ব্রাহ্মণ-ভূমির রাজা রঘুনাথরায়ের শরণ লইলেন। রঘুনাথরায়ের পিতার নাম বাঁকুড়া রায়—তাঁহার অনুগ্রহে কবি রাজপরিবারের শিশুগণের শিক্ষক স্বরূপ নিযুক্ত হইলেন। এই ব্রাহ্মণভূমিতে রঘুনাথ রায় তাঁহাকে দশআড়া ধান মাপিয়া প্রদান করেন, এই স্থানের অন্নজলে পুষ্ট হইয়া তিনি চণ্ডীকাব্য রচনা করেন। কিন্তু স্বদেশ-নির্ব্বাসিত কবি দামুন্যা গ্রামের চিত্রপট ভুলিতে পারেন নাই। রত্নানু-নদের নাম স্মরণ করিতে তাঁহার প্রাণে অব্যক্ত বেদনারাশি উথলিয়া উঠিয়াছে,—"গঙ্গাসম সুনির্ম্মল, তোমার চরণজল, পান কৈনু শিশুকাল হতে। সেই সে পুণ্যের ফলে, কবি হই শিশুকালে"—বলিয়া শিবচরণ নিঃসৃত রত্নানুনদের উল্লেখ করিয়াছেন। দামুন্যা গ্রামের প্রত্যেকটি পাড়া তাঁহার মনশ্চক্ষে চিত্রিত ছিল, তাহা গ্রন্থসূচনায় বর্ণনা করিতে ভুলেন নাই। হরিনন্দী, যশোবন্ত অধিকারী, উমাপতি নাগ, বৃষদত্ত, লোকনাথ মিশ্র, ধনঞ্জয়, ঈশান পণ্ডিত মহাশয় প্রভৃতি গ্রামিক সজ্জনগণের প্রসঙ্গে তাঁহার স্মৃতিমথিত ব্যাকুলতা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। স্বদেশ ছাড়িয়া গেলে পল্লীগ্রামের প্রতি ঘাট, প্রতি উদ্যান কল্পনায় এক অপরূপ মাধুর্য্য ধারণ করে, কবি স্বীয় গ্রামের দেউলটীও সকাতরে স্মরণ করিয়াছেন। "দামুন্যার লোক যত, শিবের চরণে রত"—সেই পল্লীর সকল লোকই ধার্ম্মিক, সকল দৃশ্যই সুন্দর। স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি হইতে ডিহিদার মামুদ সরিফের অত্যাচারে বিতাড়িত কবি এই

---

* বর্দ্ধমান সিমিলাবাদ পরগণার অধীন। এই গ্রাম রত্নানুনদের তীরবর্ত্তী।

ভাবে সেই পবিত্র জন্মপল্লীর প্রতি অশ্রুসংবদ্ধ, সকরুণ, বেদনাপূর্ণ অতৃপ্তকামনার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন। দামুন্যার বিবরণটি প্রবাসী পাঠক ভাবিয়া পড়িবেন এবং কবির মর্ম্মস্পর্শী কাতরতা হৃদয়ঙ্গম করিবেন।

কবি "সুপণ্ডিত ও সুকবির" আবাসভূমি বলিয়া দামুন্যাপল্লীর "সুধন্য দক্ষিণ পাড়া"রই বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন; বোধ হয়, দামুন্যার দক্ষিণপাড়াতেই ইঁহারা ৬।৭ পুরুষ পর্য্যন্ত বসবাস করিয়া থাকিবেন।

যখন কবি আরড়াতে * আসিয়া চণ্ডীকাব্য সমাধা করিয়াছিলেন, তখন মানসিংহ "গৌড়বঙ্গ উৎকলে"র রাজা হইয়া আসিয়াছিলেন; কিন্তু যখন দামুন্যা হইতে পলাইয়া আসেন, তখন অধর্ম্মী রাজা"র (হুসেন কুলিখাঁ অথবা মজফরখাঁ) হস্তে বঙ্গের শাসনভার অর্পিত ছিল। কবির স্বহস্ত লিখিত চণ্ডীর পাঠ এইরূপ—'ধন্য রাজা মানসিংহ, বিষ্ণুপদাম্বুজে ভৃঙ্গ, গৌড়বঙ্গ উৎকল অধিপ। অধর্ম্মী রাজার কালে, প্রজার পাপের ফলে, খিলাৎ পায় মামুদ সরিফ।" কবির ধন্যবাদপাত্র, প্রবল বিষ্ণু-ভক্তিপরায়ণ, রাজা মানসিংহ কখনই দ্বিতীয় ছত্রের "অধর্ম্মী রাজা" হইতে পারেন না। বিশেষ যদি মানসিংহের সময়ই কবি পলাইয়া আসিতেন, তখন তাঁহার প্রবল বিষ্ণুভক্তি সত্ত্বেও কবির পক্ষে তাঁহাকে ধন্যবাদ দেওয়া কখনই সম্ভবপর হইত না। উক্ত ছত্র কয়েকটির অর্থ এইরূপ "এখনকার রাজা মানসিংহ ধন্য; তিনি গৌড়বঙ্গ উৎকলের অধিপ, (প্রজাদিগকে সুখে রাখিয়াছেন)। কিন্তু অধর্ম্মী (মুসলমান) রাজার কালে প্রজার পাপের ফলে মামুদ সরিফ খিলাৎ পাইয়া অনেক অত্যাচার করিয়াছিল", ইত্যাদি। "শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা। সেইকালে দিলা গীত হরের বনিতা।"—অর্থাৎ ১৫৭৭ খৃঃ অব্দে, দামুন্যা হইতে পলাইয়া আসিবার পথে চণ্ডীদেবী কবিকে পুস্তকরচনার আদেশ প্রদান করেন, এই আদেশের ১১।১২ বৎসর পরে পুস্তক সমাধা করিয়া যখন কবি গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণ লিখেন, তখন রাজা মানসিংহ বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণ সমস্ত প্রাচীন কবিই গ্রন্থ সমাধা করিয়া লিখিতেন। বটতলার ছাপা পুস্তকে ইহা পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া ইহা পূর্ব্বে রচিত হয় নাই,—"এই গীতি হইল যেমনে" কথাটি দ্বারাও দৃষ্ট হয় গীতি সমাপ্ত হওয়ার পরই মুখবন্ধটি রচিত হইয়াছিল। এখনও গ্রন্থরচনা শেষ হইলে লেখকগণ ভূমিকা লিখিয়া থাকেন। ১৫৭৭ খৃঃ অব্দে

---

* এই আরড়া গ্রাম বর্ত্তমান ঘাটাল থানার অধীন ও জেলা মেদিনীপুরের অন্তঃপাতী। আরড়ার ব্রাহ্মণ রাজা রঘুনাথের বংশধরগণ এখনও ঐ স্থানের ২ ক্রোশ দূরে "সেনাপতে" গ্রামে বাস করিতেছেন; তাঁহাদের সমস্ত সম্পত্তি এখন বর্দ্ধমান রাজা দ্বারা অধিকৃত হইয়াছে। রঘুনাথরায়ের বর্ত্তমান বংশধর রামহরিদেবের অতি যৎসামান্য সম্পত্তি আছে।

কবির দামুন্যা ত্যাগ স্বীকার করিয়া তখন তাঁহার বয়স ৪০ বৎসর ধরিয়া লইলে অনুমান ১৫৩৭ খৃঃ অব্দে অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্বভাগে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।*

কবিকঙ্কণের পিতামহের নাম জগন্নাথমিশ্র, পিতার নাম হৃদয়মিশ্র। এই হৃদয়মিশ্রের উপাধি ছিল "গুণরাজ।" হৃদয়মিশ্রের পুত্রগণ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক মতভেদ আছে। কবি নিজে জানাইয়াছেন, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কবিচন্দ্র ছিলেন, কনিষ্ঠ রামানন্দের কথাও আমরা তাঁহার নিকট হইতেই জানিতে পারিয়াছি। "কবিচন্দ্র" উপাধি কি আদত নাম তৎসম্বন্ধে মতের বিভিন্নতা আছে। শিশুবোধকে যে "অযোধ্যারাম" কৃত "দাতাকর্ণ" পাওয়া যায়, সেই অযোধ্যারামই কবিকঙ্কণের জ্যেষ্ঠভ্রাতা বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। আমাদের ধারণা কবিচন্দ্রের নাম ছিল "নিধিরাম"। চণ্ডীকাব্যের হস্তলিখিত একখানি প্রাচীন পুঁথি আমার নিকট আছে, তন্মধ্যে "বন্দ মাতা সুরধুনী" শীর্ষক গঙ্গাবন্দনাটি "দ্বিজ নিধিরামের" ভণিতাযুক্ত পাইয়াছি। সম্প্রতি নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়-সংগৃহীত এক খানি গঙ্গাবন্দনার প্রাচীন পুঁথিতে "নিধিরাম" ভণিতা প্রকাশ পাইয়াছে।—(৪৩ নং পুঁথি)। মুকুন্দরামের রচিত পুস্তক তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা-কৃত গঙ্গাবন্দনাটি যোজনা করিয়া দেওয়া স্বাভাবিক। যাহা হউক এ সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা সম্ভব নহে। নিধিরাম, মুকুন্দরাম, ও রামানন্দ এই তিন নামে 'রামের' ঐক্য আছে। শিশুবোধকে 'কবিচন্দ্র' প্রণীত দাতাকর্ণ আমরা পড়িয়াছি। ইহা ছাড়া বহু সংখ্যক প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথিতে "কবিচন্দ্রের" ভণিতা দৃষ্ট হয়। সেই সকল পুস্তকের নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা যথাস্থানে প্রদান করিব। "কবিচন্দ্র" পাইলেই মুকুন্দরামের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে জড়িত করা একেবারেই যুক্তিযুক্ত নহে। বরঞ্চ সেগুলি যে মুকুন্দরামের ভ্রাতা কবিচন্দ্রের নহে, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে; পরে তাহা লিখিব।

মুকুন্দরামের পিতামহ জগন্নাথ মিশ্র "মীনমাংস" ত্যাগ করিয়া গোপাল আরাধনা করিয়াছিলেন,—কবির মাতার নাম 'দৈবকী', পুত্রের নাম 'শিবরাম', পুত্রবধূর নাম 'চিত্রলেখা', কন্যার নাম 'যশোদা' ও জামাতার নাম 'মহেশ' ছিল। এখনও কবিকঙ্কণের বংশধরগণ বর্দ্ধমানে রায়না থানার অধীন ছোটবৈনান গ্রামে বাস করিতেছেন। †

* চণ্ডীকাব্য আরম্ভের সময় কবির বয়স ৪০ বৎসরের ন্যূন ছিল বলিয়া বোধ হয় না, এই কাব্যের প্রারম্ভে কবির পুত্রবধূ, জামাতার নাম ও পৌত্রের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে।

† কবির হস্তলিখিত পুঁথি দামুন্যায় এখনও রক্ষিত আছে। তন্মধ্যে এই কয়েকটি ছত্র দৃষ্ট হয়,—"কুলে শীলে অনবদ্য, ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য, দামুন্যায় সজ্জনের স্থান। অতিশয় গুণ বাড়া, সুধন্য দক্ষিণ পাড়া, সুপণ্ডিত সুকবি সমান॥ ধন্য ধন্য কলিকালে, রত্নাম্বু নদের কূলে, অবতার করিলা শঙ্কর। ধরি চক্রাদিত্য নাম, দামুন্যা করিলা ধাম, তীর্থ কৈলা সেই সে নগর॥ বুঝিয়া তোমার তত্ত্ব, দেউল দিল বৃষদত্ত, কতকাল তথায় বিহার। কে বুঝে তোমার মায়া, সুরকুল

কবিকঙ্কণ সম্বন্ধে আর কিছু জানিবার উপায় নাই। লহনা ও খুল্লনার বিবাদ উপলক্ষে—"একজন সহিলে কোন্দল হয় দূর। বিশেষিয়া জানেন চক্রবর্ত্তী ঠাকুর।" কবি এই ভাবের একটি কুটিল ইঙ্গিত দ্বারা যেন বুঝাইয়াছেন, তাঁহার দুই স্ত্রী ছিল। কবি তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় সহ মাণিকদত্ত নামক এক অধ্যাপকের নিকট সঙ্গীত-শাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছেন, একথা আমাদিগকে জানাইয়াছেন। "পাথরকুচা"-নিবাসী গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ব্রাহ্মণভূমির রাজসভায় "চণ্ডীকাব্য" প্রথম গান করিয়াছিলেন বলিয়া কিম্বদন্তী আছে।

প্রথম শ্রেণীর চিত্রকর—দ্বিতীয় শ্রেণীর চিত্রে।

কবিকঙ্কণ প্রথম শ্রেণীর কবি, কিন্তু তিনি যে সমাজের চিত্র অঙ্কন করিয়াছিলেন, তাহা দ্বিতীয় শ্রেণীর। ষোড়শ শতাব্দীর জীবন্ত ইংরেজসমাজ আর সেই যুগের স্তিমিত সুখদুঃখের আলয় বঙ্গীয় কুটীর একরূপ দৃশ্য নহে। কিন্তু আল্লাইনশীর্ষে দ্বিযামার শশি-রশ্মি এবং পল্লীগ্রামের বর্ষাপ্রপাতসিক্ত তরুগুল্ম, এই উভয় দৃশ্যে সৌন্দর্য্যের বিশেষ পার্থক্য থাকিলেও উভয়কেই উৎকৃষ্টভাবে অঙ্কন করিতে প্রথম শ্রেণীর তুলির প্রয়োজন। সেক্সপীয়রের হাতে যে তুলি ছিল, মুকুন্দরামও সেইরূপ এক তুলি লইয়া চিত্র অঙ্কন করিয়াছিলেন, কিন্তু দৃশ্যগুলি একদরের নহে। এই দেশে ইতিহাসের মধ্য-অধ্যায়ে রাম,

---

তেয়াগিয়া, বরদান করিলা সঞ্চার॥ গঙ্গা সম সুনির্ম্মল, তোমার চরণজল, পান কৈনু শিশুকাল হোতে। সেইত পুণ্যের ফলে, কবি হই শিশুকালে, রচিলাম তোমার সঙ্গীতে॥ হরিনন্দী ভাগ্যবান্, শিবে দিল ভূমিদান, মাধব ওঝা ধামাধিকারিণী। দামুন্যার লোক যত, শিবের চরণে রত, সেই পুরী হরের ধরণী। কয়ড়ি কুলের আর যশোমন্ত অধিকার, কল্পতরু নাগ উমাপতি। অশেষ পুণ্যকন্ধ, নাগঋষি সর্ব্বানন্দ, সেই পুরী সজ্জন বসতি॥ কাঁটাদিয়া বন্দ্যঘাটী, বেদান্ত নিগম পাটী, ঈশানপণ্ডিত মহাশয়। ধন্য ধন্য পুরোবাসী, বন্দ্য সে বাঙ্গালপাশী, লোকনাথ মিশ্র ধনঞ্জয়। কাঞ্জারী কুলের আর, মহামিশ্র অলঙ্কার, শব্দকোষ কাব্যের নিদান। কয়ড়িকুলের রাজা, সুকৃতি তপন ওঝা, তস্য সুত উমাপতি নাম॥ তনয় মাধব শর্ম্মা, সুকৃতি সুকৃতকর্ম্মা, তার নয় তনয় সোদর। উদ্ধরণ পুরন্দর, নিত্যানন্দ সুরেশ্বর, বাসুদেব, মহেশ, সাগর। সর্ব্বেশ্বর অনুজাত, মহামিশ্র জগন্নাথ, একভাবে পূজিল শঙ্কর। বিশেষ পুণ্যের ধাম, সুধন্য হৃদয় নাম, কবিচন্দ্র তার বংশধর॥ অনুজ মুকুন্দ শর্ম্মা, সুকৃতি সুকৃতকর্ম্মা নানা শাস্ত্রে নিশ্চয় বিদ্বান্॥ শিবরাম বংশধর, কৃপা কর মহেশ্বর, রক্ষ পুত্র পৌত্রে ত্রিনয়ান।"—শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় বলেন, কবিকঙ্কণের শিবরাম ভিন্ন অপর এক পুত্র ছিল, তাহার নাম পঞ্চানন এবং কবির বংশ এখন তিন স্থানে বাস করিতেছেন, ১ম দামুন্যায়, ২য় বীরসিংহে ৩য় হুগলীর অন্তঃপাতী রাধাবল্লভপুরে। বিদ্যানিধি মহাশয় আরও বলেন, "কবিকঙ্কণের অধস্তন ষষ্ঠ, সপ্তম, নবম ও দশম পুরুষ অদ্যাবধি জীবিত।" —পরিষৎ পত্রিকা শ্রাবণ ১৩০২. ১১৯ পৃষ্ঠা। এ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত মহাশয়ের প্রবন্ধে প্রদত্ত হইয়াছে—অনুসন্ধান ১২৮৯ সাল মাঘ মাস, ৩১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কবিকঙ্কণের বংশধর দামুন্যা নিবাসী স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট হইতে কবির স্বহস্তলিখিত পুঁথি গ্রহণ করিয়া 'সাহিত্য পরিষৎ' একটী নকল লইয়াছিলেন। ঐ পুঁথি সাহিত্য পরিষৎ ক্রয় করিয়াছিলেন ; কিন্তু ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহা লইয়া গৃহে চলিয়া যান। সে পুঁথি এখন পাওয়া যাইতেছে না। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই

ভীষ্ম অর্জ্জুন, নল প্রভৃতি আদর্শ পুরুষগণের শ্রেণী একবারে ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সীতা, সাবিত্রী, দয়মন্তী প্রভৃতি রমণীদলের শ্রেণী কতকাংশে অবিচ্ছিন্ন রহিয়াছে! স্বামীর সঙ্গে বনগমন না করিলেও সেদিন পর্য্যন্ত বঙ্গীয় রমণীগণ হাস্যমুখে স্বামীর শ্মশানে পতঙ্গের ন্যায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। নিম্নশ্রেণীর অশিক্ষিতা ফুল্লরা, খুল্লনা ও বেহুলাকে চিনিতে বিলম্ব হইলেও তাহারা পৌরাণিক রমণীগণেরই ভগিনী এবং একবংশে লক্ষণাক্রান্ত। মুকুন্দরামের চণ্ডীতে পুরুষের পৌরুষ না থাকিলেও উৎকৃষ্ট রমণীচরিত্র বিরল নহে।

নারী চরিত্রের-শ্রেষ্ঠত্ব।

কাব্য লিখিতে লিখিতে যখন অন্তর্দৃষ্টি নির্ম্মল ও প্রতিভান্বিত হইয়াছে, তখন মুকুন্দরাম নিজে লেখনী ছাড়িয়া দিয়াছেন, চরিত্রগুলি হাস্যপরিহাস ও কথাবার্ত্তায় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে, তিনি ভণিতায় নিজের নাম সই করিয়া গ্রন্থস্বত্ব স্থির রাখিয়াছেন। এইভাবে যবনিকার পশ্চাতে যাইয়া সঙ্কেতে কার্য্য করা কতকটা প্রকৃতির নিজের কার্য্য করার ন্যায়। সাহিত্যে উৎকৃষ্ট নাটক লেখকগণ মাত্র এই গুণ দেখাইয়া থাকেন; মুরারি-শীলের সঙ্গে কালকেতুর সাক্ষাৎকারের অংশটি দেখুন।—

কাব্যে নাটকীয় কৌশল।

"বেণে বড় দুষ্টশীল, নামেতে মুরারিশীল, লেখা জোখা করে টাকা কড়ি। পাইয়া বীরের সাড়া, প্রবেশে ভিতর পাড়া, মাংসের ধারয়ে দেড় বুড়ি॥—খুড়া খুড়া ডাকে কালকেতু।—কোথা হে বণিকরাজ বিশেষ আছয়ে কাজ, আমি আইলাম সেই হেতু॥ বীরের বচন শুনি, আসিয়া বলে বেণ্যানী, আজি ঘরে নাহিক পোদ্দার। প্রভাতে তোমার খুড়া, গিয়াছে খাতক-পাড়া, কালি দিব মাংসের উধার॥ আজি—কালকেতু—যাহ ঘর।—কাষ্ঠ আন এক ভার, হাল বাকী দিব ধার মিষ্ট কিছু আনিহ বদর। শুনগো শুনগো খুড়ী, কিছু কার্য্য আছে দেরী, ভাঙ্গাইব একটি অঙ্গুরী॥ আমার জোহার খুড়ী, কালি দিহ বাকী কড়ি, অন্য বণিকের যাই বাড়ী॥—বাপা এক দণ্ড কর বিলম্বন। সহাস্য বদনে বাণী বলে বেণে নিতম্বিনী, দেখি বাপা অঙ্গুরী কেমন॥ ধনের পাইয়া আশ আসিতে বীরের পাশ, ধায় বেণে খিড়কীর পথে। মনে

পুঁথি প্রকাশ করিয়াছেন। পুঁথিখানি কবিকঙ্কণের হস্তলিখিত বলা ঠিক নহে; তবে ইহাতে কবির হস্তলিপি আছে তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই। পুঁথিখানি কবির আরাধ্যা সিংহবাহিনীর মন্দিরে তাঁহার বংশধরগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত ও পূজিত হইয়া আসিতেছে—তাঁহাদের বিশ্বাস ইহা কবিকঙ্কণের স্বহস্ত-লিখিত। সিলিমাবাদ পরগণার শাসন-কর্ত্তা বারা খাঁ কবির পুত্র শিবরামকে যে কতক বিঘা ব্রহ্মোত্তর দিয়াছিলেন—সেই দলিলখানি এই পুঁথির মধ্যে ছিল, তাহা আমরা দেখিয়াছি। পুঁথির হাতের লেখা সাজানো ও সুন্দর এবং তাহার ছত্রগুলি মাঝে মাঝে কাটিয়া কোন লেখক লাল কালীতে তাহা রূপান্তর করিয়াছেন। এই সংশোধনকারীকে আমরা স্বয়ং কবিকঙ্কণ বলিয়া মনে করি। তাঁহার হস্তলিপি সুন্দর নহে, বামুন পণ্ডিতের মত জড়ানো—পাকা লেখা। কবি ভিন্ন এই সংশোধন আর কাহারো করা সম্ভবপর নহে।

বড় কুতুহলী, কাঁধেতে কড়ির থলী হরপী তরাজু করি হাতে॥ করে বীর বেণেরে জোহার। বেণে বলে ভাই পো, এবে নাহি দেখি তো এ তোর কেমন ব্যবহার॥ খুড়া—উঠিয়া প্রভাতকালে কাননে এড়িয়া জালে, হাতে শর চারি প্রহর ভ্রমি। ফুল্লরা পসরা করে, সন্ধ্যাকালে যাই ঘরে, এই হেতু নাহি দেখ তুমি॥ খুড়া ভাঙ্গাইব একটী অঙ্গুরী।—হয়ে মোর অনুকূল, উচিত করিও মূল, তবে সে বিপদ আমি তরি॥ বীর দেয় অঙ্গুরী, বাণিয়া প্রণাম করি জোঁখে রত্ন চড়্যায়ে পড়্যান। কুঁচ দিয়া করে মান, ষোল রতি দুই ধান, শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥"

সোণা রূপা নহে বাপা এ বেড়া পিতল। ঘষিয়া মাজিয়া বাপা করেছ উজ্জ্বল॥ রতি প্রতি হইল বীর দশগণ্ডা দর। দুধানের কড়ি আর পাঁচগণ্ডা ধর॥ অষ্টপণ পঞ্চগণ্ডা অঙ্গুরীর কড়ি। মাংসের পিছিলা বাকী ধারি দেড় বুড়ি॥ একুনে হইল অষ্টপণ আড়াই বুড়ি। কিছু চালু চালু খুদ কিছু লহ কড়ি॥ কালকেতু বলে খুড়া মূল্য নাহি পাই। যেজন অঙ্গুরী দিল দিব তার ঠাঁই॥ বেণে বলে দরে বাড়াইলাম পঞ্চবট। আমা সঙ্গে সওদা করি না পাবে কপট॥ ধর্ম্মকেতু ভায়া সঙ্গে ছিল লেনা দেনা। তাহা হইতে দেখি বাপা বড়ই সেয়ানা॥ কালকেতু বলে খুড়া না কর ঝগড়া। অঙ্গুরী লইয়া আমি যাই অন্য পাড়া॥ বেণে বলে দরে বাড়াইলাম আড়াই বুড়ি চালু খুদ না লইও গণে লও কড়ি॥"

লহনার সঙ্গে খুল্লনা বিবাদ করিতেছে, কবির ইহা বর্ণনীয় বিষয়। কলহাকৃষ্টা প্রতিবেশিনী-গণ,—"চুলাচুলি দুসতিনে অঙ্গনেতে ফিরে। চাহিয়া রহিল সবে নিবারিতে নারে॥ চাহিয়া রয়েছ কেন নাকে হাত দিয়ে। উচিত কহনা কেন ভাতার পুত খেয়ে॥"—শেষের দুটি উক্তি লহনার, কিন্তু কবির তাহা বলিবার অবকাশ নাই। মূল কথা কবি বর্ণনা আরম্ভ করিয়াই ঠিক বর্ণিত ঘটনার মধ্যে প্রবেশ করেন ও সম্পূর্ণরূপে তদ্গত হইয়া পড়েন, তিনি তখন চক্ষে দেখিয়া লিখেন। ধনপতি চাঁদ-বণিক্‌কে মাল্যচন্দন দেওয়াতে নিমন্ত্রিত বণিক্‌গণ ক্রুদ্ধ হইয়াছে। তাহাদের বাক্‌বিতণ্ডা ও কলহ কবি যেন দেখিতে দেখিতে নোট করিয়া গিয়াছেন,—

"এমন বিচার সাধু করি মনে মনে। আগে জল দিল চাঁদ বেণের চরণে॥ কপালে চন্দন দিয়া মালা দিল গলে। এমন সময়ে শঙ্খদত্ত কিছু বলে॥ বণিক্-সভায় আমি আগে পাই মান। সম্পদে মাতিয়া নাহি কর অবধান॥ যেকালে বাপের কর্ম্ম কৈল ধুসদত্ত। তাহার সভায় বেণে হৈল ষোলশত। ষোলশতের আগে শঙ্খদত্ত পাইল মান। ধুসদত্ত জানে ইহা চন্দ্র মতিমান॥ ইহা শুনি ধনপতি করিল উত্তর। সেই কালে নাহি ছিল চাঁদ সদাগর॥ ধনে মানে কুলে শীলে চাঁদ নহে বাঁকা। বাহির মহলে যার সাত ঘড়াই টাকা॥ ইহা শুনি হাসি কহে নীলাম্বর দাস। ধন হেতু হয় কিবা কুলের প্রকাশ॥ ছয়বধু যার ঘরে নিবসয়ে রাঁড়। ধন হেতু চাঁদবেণে সভা মধ্যে যাঁড়॥ চাঁদ বলে তোরে জানি নীলাম্বর দাস। তোমার বাপের কিছু শুন ইতিহাস॥ হাটে হাটে তোর বাপ বেচিত আমলা। যতন করিয়া তাহা কিনিত অবলা॥ নিরন্তর হাতাহাতি বরবধূর সনে। নাহি স্নান করি বেটা বসিত ভোজনে॥ কড়ির পুটলী সে বাঁধিত তিন ঠাঁই। সভা মধ্যে কহ কথা কিছু মনে নাই॥ নীলাম্বর দাস কহে শুন রামরায়। পসরা করিলে তাতে জাতি নাহি যায়॥ কড়ির পুটলী বাঁধি জাতির ব্যাভার। আঁটো ছোপড়া খাইলে নহে কুলের খাখার॥ নীলা-ম্বর দাস রামরায়ের শ্বশুর। ধনপতি গঞ্জি কিছু বলিল প্রচুর॥ জাতিবাদ হয় যদি তবে হই বন্ধ। বনে জায়া ছাগ রাখে এ বড় কলঙ্ক॥"

আর একটি গুণ, মুকুন্দ ছবি সংসারের খাঁটিরূপ ভিন্ন অন্য কিছু কল্পনা করেন না ; তিনি মিথ্যা কল্পনার একান্ত বিরোধী। যেখানে বাধ্য হইয়া কোন দীর্ঘ রূপকথার অবতারণা করিয়াছেন, সেখানেও ইহলোকের কথা দ্বারা তাহা যথাসাধ্য সংযত ও সত্যের আভাযুক্ত করিয়া তুলিয়াছেন,—স্বপ্নের মধ্যে জীবনের রেখা আঁকিয়াছেন। পশুর সঙ্গে কালকেতুর যুদ্ধের অংশটি পাঠ করুন। কবির স্পষ্ট অঙ্গুলীসঙ্কেতে এই যুদ্ধের বর্ণনাটি আমার নিকট একটি গূঢ় ও মহিমান্বিত রাজনৈতিক বিপ্লবের কথার ন্যায় বোধ হইয়াছে। পশুগণ যুদ্ধে হারিয়া ভগবতীর নিকট কাঁদিতেছে—তাহাদের সঙ্গে চণ্ডীর কথোপকথন এইরূপ :—

খাঁটি সংসার-চিত্র

চণ্ডী—সিংহ তুমি মহাতেজা, পশু মধ্যে তুমি রাজা, তোর নখে পাষাণ বিদরে। শুনিয়া তোমার রা, কম্প হয় সর্ব্ব গা, কি কারণে ডর কর নরে॥

সিংহ—বীর ক্ষত্রি অদ্‌ভুত, দ্বিতীয় যমের দূত, সমরে হানয়ে বীর রথ। দেখিয়া বীরের ঠাম, ভয়ে তনু কম্পমান, পলাইতে নাহি পাই পথ॥

চণ্ডী—আদি ক্ষত্রি তুমি বাঘ, কে পায় তোমার লাগ, পবন জিনিতে পার জোরে। তব নখ হীরাধার, দশন বজ্রের সার, কি কারণে ভয় কর নরে॥

ব্যাঘ্র—যদি গো নিকটে পাই, ঘাড় ভাঙ্গি রক্ত খাই, কি করিতে পারি আমি দূরে। ব্যর্থ নহে তার বাণ, একে একে লয় প্রাণ, দেখি বীরে প্রাণ কাঁপে ডরে॥

চণ্ডী—পশু মধ্যে তুমি গণ্ডা, উত্তম তোমার খাণ্ডা, বিরোধ না কর কার সনে তুমি যদি মনে কর, প্রলয় করিতে পার, নরে ভয় কর কি কারণে॥

গণ্ডা—কালকেতু মহাবীর, দূর হতে মারে তীর, খড়্গো তার কি করিতে পারে। বীরের অস্ত্রের বেগে বত্রিশ দশন ভাঙ্গে, পশুগণে মহামারি করে॥

চণ্ডী—তুমি হস্তী মহাশয়, তোমার কিসের ভয়, বজ্রসম তোমার দর্শন। তব কোপে যেই পড়ে, যমপথে সেই নড়ে, কেবা ইচ্ছে তব দরশন॥

হস্তী—দুই চারি ক্রোশ হায়, তবে মোর লাগ পায়, উলটিয়া শুণ্ডে মোরে খেঁচে। মোর পিঠে মারে বাড়ি, লয়ে যায় তাড়াতাড়ি, ছাগলের মূল্য লয়ে বেচে॥" ইত্যাদি।

মনে হয় যেন, পশুযুদ্ধ উপলক্ষ করিয়া কবি মানুষীদ্বন্দ্বের কথারই আভাস দিয়াছেন,—যেন মুসলমান-প্রতাপের সমীপে হীনবল হিন্দুশক্তির বিড়ম্বনাই কবির ইঙ্গিতে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। উদ্ধৃত অংশ হইতে এবিষয়ে আরও স্পষ্টতর আভাস আছে ; ভালুক কাঁদিয়া বলিতেছে—"বনে থাকি বনে খাই জাতিতে ভালুক। নেউগী চৌধুরী নহি, না রাখি তালুক॥" হস্তী বলিতেছে,—"বড় নাম, বড় গ্রাম, বড় কলেবর। লুকাইতে স্থান নাই বীরের গোচর॥ পলাইয়া কোথা যাই, কোথা গেলে তরি। আপনার দন্ত দুটা আপনার অরি॥" ইত্যাদি।

এই কবির লেখনীর বড় চমৎকার গুণ এই যে, ইহাঁর মন্ত্রপূত স্পর্শে পশুজগতেও মানবীয়-তত্ত্বের বিকাশ পায়। কবি প্রকৃতির পুষ্প-পল্লবের বর্ণনাগুলিও মানুষী-উপমা দ্বারা সজীব ও উপভোগযোগ্য করিয়া তুলেন। এই উপমাটি দেখুন, "এক ফুলে মকরন্দ, পান করি সদানন্দ, ধায় অলি অপর কুসুমে। এক ঘরে পেয়ে মান, গ্রামযাজি দ্বিজ যান, অন্য ঘরে আপন সম্ভ্রমে॥" কবির চিত্তে মনুষ্যসমাজ এত স্পষ্ট উজ্জ্বল ও গাঢ়বর্ণে মুদ্রিত ছিল যে,—জলে, স্থলে, গুল্ম লতায় এবং ইতর জীবনসমূহের মধ্যেও তিনি সতত মানবীয় ভাবই প্রত্যক্ষ করিতেন।

মনুষ্যসমাজের ছায়া।

কিন্তু কবিকঙ্কণ সুখের কথায় বড় নহেন, দুঃখের কথায় বড়। বড় বড় উজ্জ্বল ঘটনার মধ্যে অবিরত ফল্গুনদীর ন্যায় এক অন্তর্বাহী দুঃখ-সংগীতের মর্ম্মস্পর্শী আর্ত্তধ্বনি শুনা যায়। সুশীলার বারমাস্যা হইতে ফুল্লরার বারমাস্যা হৃদয়কে গভীর তর রূপে স্পর্শ করে। নিঃশব্দ করুণরস কাব্যখানিকে বিয়োগান্ত নাটকের গূঢ়মহিমাপূর্ণ করিয়াছে—সুখবসন্তকাল বর্ণনায়াও কবির প্রেমগীতির মলয় বায়ু পরাভূত করিয়া উদরচিন্তার আক্ষেপবাণী উঠিয়াছে। নানাবিধ দুঃখের কথা তাঁহার প্রতিভার চরণ নূপুর কাড়িয়া লইয়া যেন গতি মন্থর করিয়া দিয়াছে। এই কাব্যের দুঃখ বর্ণনার করুণ চিত্রগুলির মধ্যে—বঙ্গপল্লীর নিভৃত নিকেতনে সতত আত্মসমর্পণের মঞ্জীর-নিক্বণে যেন ভক্তিগঙ্গা প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে। কবিকঙ্কণ সাড়ে তিনশত বৎসর পূর্ব্বে "মা মা" সুরে বিশ্বজননীকে যে ভাবে আহ্বান করিয়াছিলেন, সার্দ্ধশত বৎসর পরে রামপ্রসাদ সেই ধ্বনির বন্যায় বঙ্গদেশ পরিপ্লাবিত করিয়াছিলেন।

দুঃখবর্ণনায় কৃতিত্ব।

কবিকঙ্কণের পুরুষচরিত্রগুলিতে পুরুষোচিত উদ্যম ও স্বাবলম্বন বিরল,—ইহা কবির দোষ নহে, দেশের যেরূপ পুরুষসমাজ কাব্যে আমরা তাহারই একখানি ছায়া প্রত্যাশা করিতে পারি; ঘটনাগুলি অদ্ভুত, কবি খুব বড় দরের পুরুষচরিত্র গঠন করিবার উপকরণ লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছিলেন। কিন্তু চরিত্রগুলি কেমন খাটো হইয়া গিয়াছে। ধনপতির চণ্ডীর প্রতি অবজ্ঞা, নানারূপ সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পতন,—শ্রীমন্তের পিতৃভক্তি এবং বিপদের প্রতি উপেক্ষা, নানারূপ অবস্থান্তর, এগুলি কি মহামহিম নায়ক-চিত্র অঙ্কনের উপযোগী উৎকৃষ্ট উপকরণ নহে? অথচ কবি এই অবস্থাগুলি শিল্পীর মত সুকৌশলে ব্যবহার করিতে পারেন নাই,—দেবশক্তির প্রতি একান্তরূপ নির্ভরতা হেতু পুরুষচরিত্রগুলি স্বীয় শক্তির ভিত্তিতে দাঁড়াইতে পারে নাই। তাহারা অবস্থার ক্রীড়নকের মত অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে। কোন উন্নত চিন্তায় প্রণোদিত হইয়া তাহারা কোন উন্নত কার্য্যে বিব্রত হয় নাই। তাহাদের শক্তি, অদৃষ্ট ও দৈবশক্তির প্রতি অতিরিক্তমাত্র নির্ভরশীলতা হেতু স্বাধীন ভাবে উদ্বোধিত হইতে অবকাশ পাই নাই।

পুরুষে পৌরুষের অভাব।

কবিকঙ্কণের বর্ণিত ঘটনার একটা মূলকেন্দ্র নাই; উৎকৃষ্ট নাটক বা কাব্যে ছোট বড় বিচিত্র ঘটনার স্রোত ছুটিয়া যাইয়া একটি মূলকেন্দ্রে পড়িয়া মিশিয়া যায়,—সেই মূল দৃশ্যের চতুষ্পার্শ্বে নানা ঘটনা ও চরিত্রের বিকাশ পায়; বিশেষ একটি অঙ্ক নানাশৃঙ্গবেষ্টিত কাঞ্চনজঙ্ঘার ন্যায় নানা অধ্যায় সমন্বিত হইয়া সকলের উপরে স্বীয় অত্যুচ্চ আবেগের তুঙ্গ স্থান দেখাইয়া থাকে। কবিকঙ্কণের দুই একটি মূল ঘটনা ধরিতে পারা গেলেও তাহাদের সঙ্গে অন্যান্য ঘটনার সেরূপ অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক দৃষ্ট হয় না। চণ্ডীকাব্য বিশৃঙ্খল একটি প্রাকৃতিক অরণ্যানীর ন্যায় তরু, গুল্ম, পুষ্প, গুহা,—সমস্ত একত্র এক দৃশ্যপটে দেখাইতেছে; এই সৌন্দর্য্যের সাধারণ তন্ত্রে প্রত্যেক শোভাই নিরীক্ষণযোগ্য, কিন্তু বিশেষ কোন একটি অংশ অপূর্ব্ব সুদৃশ্য হয় নাই।

কাব্য কেন্দ্র-শূন্য।

কবিকঙ্কণের অন্য একবিধ গৌরব আছে। সরলা মিরেণ্ডা, স্নেহশীলা কর্ডেলিয়া, পতিপ্রাণা দেস্‌দেমনা ইঁহারা সহসা ঘটনা বিশেষের মধ্যে পড়িয়া চরিত্রের বিকাশ দেখাইয়াছেন। কিন্তু বঙ্গীয় কবির ফুল্লরা ও খুল্লনার ন্যায় বিলাতি সুন্দরীগণ সুগৃহিণী নহেন; বঙ্গের কুঁড়ে ঘরে যে দৈনন্দিন সহিষ্ণুতার পরীক্ষা হয়, নিত্য প্রাতে ঘুম ভাঙ্গিলেই আত্মোৎসর্গের যে মন্ত্র জপ করিয়া বঙ্গনারীগণের গৃহকর্ম্মে মনোনিবেশ করিতে হয়, সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া এবং সেই মন্ত্র সহিষ্ণুতার সহিত অভ্যাস করা সকল স্থলে সম্ভবপর নহে,—এই স্থানে কাব্য ও নীতি-হিসাবে মুকুন্দ কবির নির্ব্বিরোধ শ্রেষ্ঠত্ব। আমরা এখানে চণ্ডীকাব্যের উপাখ্যানভাগ সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

রমণী-চরিত্র।

কালকেতুর গল্প।

লোমশ মুনি সমুদ্রের তীরে তপস্যা করিতেছিলেন, ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বর তাঁহার নিকটে যাইয়া কহিলেন, "মুনি; আপনি শীতাতপ সহ্য করিয়া তপ করিতেছেন, একখানি কুটীর প্রস্তুত করিলে ভাল হয় না?" লোমশ উত্তরে বলিলেন, "কি হেতু বাঁধিব ঘর জীবন নশ্বর।"—(মা, চ)। নীলাম্বর প্রশ্ন করিলেন "মুনি আপনার আয়ু কত?"—

লোমশ মুনি।

উত্তর—"লোমশ বলিল শুন, ইন্দ্রের তনয়। পরিচ্ছন্ন লোম লোম দেখ সর্ব্ব গায়॥ এক ইন্দ্রপাতে এক লোম হয় ক্ষয়। সর্ব্বলোম ক্ষয় হ'লে মরণ নিশ্চয়॥" (মা, চ)। এই মহাপুরুষ তথাপি ঘর বাঁধিতে বিরত ছিলেন। ইঁহার কঠোর দার্শনিক উপেক্ষার নিকট আধুনিক সভ্যতার প্রকাণ্ডকাণ্ড কি একটা ঘোর পণ্ডশ্রম বলিয়া বোধ হইবে।

নীলাম্বর জিজ্ঞাসা করিলেন, "অমর কে?" উত্তর—"একমাত্র শিব।" সুতরাং নীলাম্বর শিব-সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন। নীলাম্বরের আহৃত পূজার ফুলগুলির মধ্যে একটি কীট ছিল, তাহার দংশন-জ্বালায় মহাদেব অস্থির হইয়া নীলাম্বরকে শাপ দিলেন—"পৃথিবীতে গিয়া জন্মগ্রহণ কর।" তাঁহার স্ত্রী ছায়াও তৎসহ গমন করিল। মর্ত্ত্য-লোকে এই দুই ব্যক্তিই কালকেতু ও ফুল্লরা। কিন্তু এই অলৌকিক অংশ মূল গল্পের কোন হানি করে নাই; পূর্ব্ব জন্মের একটি ব্যাখ্যা দেওয়া বৌদ্ধদিগের জাতকের সময় হইতে চলিয়া আসিয়াছিল; এখন আমরা মনুষ্যজীবনকে আদ্যন্তরহিত একটি বিচ্ছিন্ন প্রহেলিকার ন্যায় মনে করি, কিন্তু সেকালে কবিগণ জীবনের আদি অন্ত দেখাইয়া দিতেন।

নীলাম্বরের জন্ম-গ্রহণ।

কিন্তু সুখের বিষয়, নীলাম্বর, কালকেতু-অবতারে তাঁহার স্বর্গীয় বৈভবের কোন চিহ্ন লইয়া আসেন নাই। কালকেতুকে আমরা খাঁটি একটি ব্যাধরূপেই দেখিতেছি; শৈশবে তাহার ছিল দুর্দ্দান্ত তেজ,—সে শশারু তাড়িয়া ধরিত, শিকার দূরে গেলে কুকুর দিয়া ধরাইত, পক্ষীগুলিকে বাঁটুল ছুঁড়িয়া মারিত; কালকেতু পঞ্চবর্ষেই শিশু মাঝে যেমন মণ্ডল"—(ক, ক, চ,)। ইহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। সে কাব্যের প্রধান চরিত্র, কিন্তু মুকুন্দকবি তাহাকে বর্ণনা করিতে যাইয়া আকাশ হইতে চন্দ্র এবং স্থল হইতে বাঁধুলি কিম্বা পদ্মফুল লইয়া নাড়াচাড়া করেন নাই। তাহার "দুই বাহু লোহার সাবল"—(ক, চ,)। সে যখন ভোজন করিতে বসে, তখন কবির উৎপ্রেক্ষা এইরূপ,—"শয়ন কুৎসিৎ বীরের ভোজন বিকার। গ্রাসগুলি তোলে যেন তেআঁটিয়া তাল॥" নায়কের প্রতি এরূপ অবমাননাকর কথা বলিতে এখনকার কবিগণ কখনই স্বীকৃত হইতেন না। মুকুন্দ ব্যাধের রূপ শাস্ত্রীয় প্রভায় সংস্কার করিতে চেষ্টা করেন নাই—কবির উপর স্বভাবের বিশেষ অনুকম্পা, তিনি সততই স্বভাবকে অবলম্বন করিতে পারিয়াছেন।

বাল্যকাল।

কালকেতু একাদশবর্ষ বয়সে বিবাহ করিলেন, সোমাইওঝা ঘটকরূপে যখন সঞ্জয়ব্যাধের বাড়ীতে যাইয়া তাহার কন্যাটি দেখিতে চাহিলেন, তখন পিতা স্বীয় কন্যার মেঘ-বরণ চুল ও চাঁদবরণ মুখের প্রশংসা করেন নাই, তিনি বলিলেন "এই কন্যা রূপে গুণে নাম যে ফুল্লরা। কিনিতে বেচিতে ভাল পারয়ে পসরা॥ রন্ধন করিতে ভাল এই কন্যা জানে। বন্ধুজন মিলিয়া ইহার গুণ গানে॥" (ক, চ)। এই স্থলে আমরা ফুল্লরাকে প্রথম দেখি। শিশু কালকেতুর বর্ণনাটি আমরা ইতিপূর্ব্বে একবার উদ্ধৃত করিয়াছি। যৌবনে কালকেতু নিত্য নিত্য বনে যাইয়া শিকার করিত; ব্যাঘ্রগুলিকে লেজ মোচড়াইয়া মারিত,—"দেবীর বাহন" বলিয়া সিংহকে বধ করিত না, কিন্তু ধনুকের বাড়ি দিয়া তাহাকে এরূপ শিক্ষা দিত যে,—"তৃষ্ণায় আকুল সিংহ পান করে নীর।"

বিবাহ ও জীবনোপায়।

সারাদিন শিকার করিয়া এক ভার মৃত পশু স্কন্ধে সন্ধ্যাকালে সে গৃহে ফিরিয়া আসিত; তাহার ভোজনটি খুব বিরাট রকমের ছিল, সে হাঁড়ি হাঁড়ি ভাত, নেউলপাড়া, পুঁইশাক, কাঁকড়া প্রভৃতি খাইয়া নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিত,—"রন্ধন করেছ ভাল আর কিছু আছে?"—(ক, ক, চ)। স্বীকার করিতে হইবে, তখন ক্ষুধা ও খাদ্য উভয়ই প্রচুর ছিল।

ক্ষুধা ও খাদ্য।

এদিকে পশুগণ বিষম বিপদে পড়িয়া চণ্ডীদেবীর শরণাপন্ন হইল; তিনি বর দিলেন "কালকেতু আর তোমাদিগকে কিছু করিতে পারিবে না।"

চণ্ডীর বর।

সে দিন কালকেতু রীতিমত ধনু হস্তে বনে যাত্রা করিল; তাহার নিশ্চিন্ত অন্তঃকরণে দেবীর কৃপার পূর্ব্বাভাস নিঃশব্দ প্রফুল্লতার উদ্রেক করিতেছিল

পূর্ব্বাভাস।

"প্রভাতে পরিয়া ধড়া, শরাসনে দিয়া চড়া, খর খুর কাছে তিনবাণ। শিরে বাঁধা জাল দড়ি, কর্ণে ফটিকের করি, মহাবীর করিল প্রয়াণ॥ দেখে কালকেতু সুমঙ্গল—দক্ষিণে গো, মৃগ, দ্বিজ, বিকশিত সরসিজ, বামে শিবা ঘটপূর্ণ জল॥ চৌদিকে মঙ্গল ধ্বনি, কেহ জ্বালে হোম বহ্নি, দধি দধি ডাকে গোয়ালিনী। দেখিল রুচির তনু, বৎসের সহিত ধেনু, পুরাঙ্গনা দেয় জয়ধ্বনি॥ দূর্ব্বা ধান্য পুষ্পমালা, হীরা নীলা মতিপলা, বামভাগে বারনিতম্বিনী॥ মৃদঙ্গ মন্দিরা বায়, কেহ নাচে কেহ গায়, শুনে বীর হরি হরি ধ্বনি॥

কিন্তু সে হঠাৎ পথে স্বর্ণবর্ণ গোসাপ দেখিতে পাইল। গোসাপ যাত্রার পক্ষে শুভ্র চিহ্ন নহে; কালকেতু ক্রুদ্ধ হইয়া উহাকে ধনুর্গুণে বাঁধিয়া লইল, "যদি অন্য শিকার জোটে, তবে ইহাকে ছাড়িয়া দিব, নতুবা ইহাকেই শিকপোড়া করিয়া খাইব।"

দেবীর চক্রান্তে সেদিন ঘনঘোর কুজ্ঝটিকাতে বনপ্রদেশ আচ্ছন্ন হইল। কালকেতু সারাদিন ধনুঃশর হস্তে বনে বনে ঘুরিয়া কিছুই পাইল না। কংসনদীর তীরে কতকটুকু জল খাইয়া অবসন্ন দেহে বিশ্রাম করিতে বসিল, কিন্তু—

ব্যর্থ শিকারী।

"বিষম সম্বল চিন্তা মহাবীর লাগে। এক চক্ষে নিদ্রা যায়, এক চক্ষে জাগে॥"

ফুল্লরা শিকারের আশায় অপেক্ষা করিতেছিল, কিন্তু কালকেতুর শূন্য হস্ত দেখিয়া কাঁদিতে লাগিল। কালকেতু আপাততঃ গোসাপটাকে "ছাল উতাড়িয়া শিক-পোড়া" করিতে আদেশ করিল এবং সখীগৃহ হইতে ফুল্লরাকে কিছু ক্ষুদ ধার করিয়া আনিতে বলিল, তৎপর স্বয়ং ক্ষুণ্ণমনে বাসি মাংসের পশরা লইয়া গোলাঘাট অভিমুখে ধাবিত হইল।

গৃহের বন্দোবস্ত।

ফুল্লরা বিমলার মাতার নিকট দুই কাঠা ক্ষুদ ধার করিল, দুই সখী একস্থানে বসিয়া একদণ্ড গৃহের আলাপ করিল, শেষে ফুল্লরাসুন্দরী ধীরে ধীরে গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

এদিকে গোসাপরূপিণী চণ্ডী পরমা সুন্দরী যুবতী হইয়া কুটীরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছেন, তাঁহার রূপের প্রভায়, "ভাঙ্গা কুড়্যা ঘরখানা করে ঝলমল। কোটীচন্দ্র প্রকাশিত গগনমণ্ডল॥" বিস্মিতা ফুল্লরা প্রণাম করিয়া তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। চণ্ডী বলিলেন, তিনি সতিনীর সঙ্গে দ্বন্দ্ব করিয়া আসিয়াছেন; সেই ব্যাধ কুটীরেই তিনি থাকা স্থির করিয়াছেন। ফুল্লরা সেই ভাঙ্গা কুটীরে স্বামীর প্রেমের গর্ব্ব করিয়া সুখী ছিল; তাহার উপবাস, দারিদ্র্য সকলই সহ্য হইয়াছিল, কিন্তু অদ্য চণ্ডীর রূপ দেখিয়া আশঙ্কায় মুখ শুকাইয়া গেল;—"পেটে বিষ, মুখে মধু, জিজ্ঞাসে ফুল্লরা। ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরে গেল রন্ধনের ত্বরা॥" যতবার জিজ্ঞাসা করিল, ততবারই এক উত্তর, চণ্ডী সেই স্থানেই থাকিবেন। তখন মনের আশঙ্কা প্রচ্ছন্ন রাখিয়া, ফুল্লরা সুন্দরী, সীতা, সাবিত্রী, প্রভৃতি নানা পৌরাণিক রমণীর দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বলিতে লাগিল—"স্বামী ছাড়িয়া স্ত্রীলোকের এক দণ্ডও পরগৃহে থাকা উচিত নয়, আপনার এস্থান ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ।" সে কত নৈতিক বক্তৃতা দ্বারা চণ্ডীদেবীকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিল—"সতিনী কোন্দল করে, দ্বিগুণ বলিবে তারে, অভিমানে ঘর ছাড়বে কেনি॥ এ বিরহজ্বরে, যদি স্বামী মরে, কোন্ ঘাটে খাবে পানী॥"

চণ্ডীর স্বমূর্ত্তিগ্রহণ।

ফুল্লরার দুশ্চিন্তা ও দেবীর রহস্য।

কিন্তু দেবীর নিঃশব্দ রহস্য প্রিয়তা একটি অটল অভিসন্ধির ভাণ ধরিয়া উপায়হীনা ফুল্লরার সমস্ত অনুনয়-বিনয় ব্যর্থ করিয়া দিল। ফুল্লরা নীতিবাক্যে ফিরাইতে না পারিয়া দারিদ্র্যের ভয় দেখাইতে লাগিল—"বসিয়া চণ্ডীর পাশে কহে দুঃখবাণী। ভাঙ্গা কুড়ে ঘর তালপাতের ছাউনি॥ ভেরাণ্ডার থাম তার আছে মধ্য ঘরে। প্রথম বৈশাখ মাসে নিত্য ভাঙ্গে ঝড়ে॥"—প্রভৃতি বর্ণনা পড়িলে এই রহস্যের অভিনয়ের মধ্যেও আমাদের কান্না পায়। জ্যৈষ্ঠে—"বইচির ফল খেয়ে করি উপবাস।" "পসরা এড়িয়া জল খাইতে না পারি। দেখিতে দেখিতে চিলে করে আধসারি॥" শ্রাবণে,—"কত শত খায় জোঁক, নাহি খায় ফণী" দুঃখ কর অবধান। বৃষ্টি হৈলে কুড়ার ভাসিয়া যায় বান॥" "মাংসের পসরা লয়ে ফিরি ঘরে ঘরে। আচ্ছাদন নাহি অঙ্গে স্নান বৃষ্টি—নীরে॥" আশ্বিন মাসে,—উত্তম বসনে বেশ করয়ে বনিতা। অভাগী ফুল্লরা করে উদরের চিন্তা॥ কেহ না আদরে মাংস কেহ না আদরে। দেবীর প্রসাদমাংস সবাকার ঘরে॥" কার্ত্তিক মাসে,—"নিযুক্ত করিলা বিধি সবার কাপড়। অভাগী ফুল্লরা পরে হরিণের ছড়॥" ফুল্লরার আছে কত কর্ম্মের বিপাক। মাঘমাসে কাননে তুলিতে নাহি শাক॥" "মধুমাসে মলয় মারুত মন্দ মন্দ। মালতীএ মধুকর পিয়ে মকরন্দ॥ বনিতা পুরুষ দোঁহে পীড়িত মদনে। ফুল্লরার অঙ্গ পোড়ে উদর-দহনে॥ এই বর্ণনাগুলির মধ্যে স্থলে স্থলে চণ্ডীদেবীকে ভয় দেখাইবার প্রকাশ্য চেষ্টা আছে, "কোন্ সুখে ইচ্ছিলে হইতে ব্যাধের নারী

কাঙ্গালিনীর এই দৈনিক কষ্টসহ মূর্ত্তিখানি বঙ্গীয় কুটীরে কিরূপ সুন্দর দেখাইতেছে! ফুল্লরা নিজের ঘোর দারিদ্র্যদুঃখ লজ্জায় কাহাকেও বলিত না, কিন্তু এই রূপসী কামিনীকে উহা না জানাইলে সে ত গৃহ ছাড়ে না। ফুল্লরার নীরব পতিপ্রেমের এই সুন্দর বিকাশে আমরা প্রীত হই—কিন্তু তাহার অকারণ কাতরতায় ঈষৎ হাস্য সম্বরণ করিতে

সন্দেহে সৌন্দর্য্য।

পারি না। তথাপি দেবী যাইবেন না তাঁহার প্রচুর ধন আছে—তিনি ব্যাধকুটীরের দারিদ্র্য ঘুচাইবেন। আর তিনি ত নিজে ইচ্ছা করিয়া আসেন নাই—"এনেছে তোমার স্বামী বাঁধি নিজগুণে।" * "হয় নয় জিজ্ঞাসা করহ মহাবীরে।"

দুইটি চিত্র।

স্বামী ইঁহাকে নিজে লইয়া আসিয়াছেন, শুনিয়া উপায়হীনা অভিমানিনী ফুল্লরা মনের ভাব গোপন করিতে পারিল না।

"বিষাদ ভাবিয়া কাঁদে ফুল্লরা রূপসী। নয়নের জলেতে মলিন মুখশশী। কাঁদিতে কাঁদিতে রামা করিল গমন॥ শীঘ্রগতি গেলাঘাটে দিল দরশন॥ গদগদ বচনে চক্ষুতে বহে নীর। সবিস্ময় হইয়া জিজ্ঞাসে মহাবীর॥ শাশুড়ী ননদী নাহি নাহি তোর সতা। কার সনে দ্বন্দ্ব করি চক্ষু কল্লি রতা॥"

ফুল্লরা—"সতা সতীন নাহি প্রভু তুমি মোর সতা। ফুল্লরার এবে হৈল বিমুখ বিধাতা। কি দোষ দেখিলা মোর জাগ্রত স্বপনে। দোষ না দেখিয়া কর অভিমান কেনে॥ কি লাগিয়া প্রভু তুমি পাপে দিলা মন। আজি হৈতে হৈলা তুমি লঙ্কার রাবণ॥ আজি হৈতে বিধাতা হইল মোরে বাম। তুমি হৈলা রাবণ বিপক্ষ হৈলা রাম॥ পিপীলিকার পাখা উঠে মরিবার তরে। কাহার ষোড়শী কন্যা আনিয়াছ ঘরে। শিয়রে কলিঙ্গ রাজা বড় দুরাচার। তোমারে বধিয়া জাতি লইবে আমার।" কালকেতু—"সুব্যক্ত করিয়া রামা কহ সত্য ভাষা। মিথ্যা হৈলে চোয়াড়ে কাটিব তোর নাসা॥" ফুল্লরা—"সত্য মিথ্যা বচনে আপনি ধর্ম্মসাক্ষী। তিনি দিবসের চন্দ্র দ্বারে বসি দেখি।" একদিকে ফুল্লরার সরল প্রেমপূর্ণ ভয়, অপরদিকে কালকেতুর নির্ম্মল অমার্জ্জিত চরিত্রে বৃথা সন্দেহজনিত ক্রোধ,—দুইটি বিপরীত ভাবের উদ্দাম অভিনয় চিত্রকরযোগ্য নিপুণতার সহিত অঙ্কিত হইয়াছে।

কালকেতু গৃহে আসিয়া দেখিল "ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘর খানা করে ঝলমল। কোটি চন্দ্র বিরাজিত বদনমণ্ডল॥

দেবীর অভ্যর্থনা।

বিস্মিত হইয়া কালকেতু বলিল, এই শ্মশান সমান ব্যাধগৃহে তুমি কে? ব্যাধ হিংসক, চতুর্দ্দিকে পশুর হাড় এই ঘরে—"প্রবেশে উচিত হয় স্নান।" এখানে তুমি কেন? এখানে রাত্রিবাস করা উচিত নহে,—লোকে মন্দ কথা বলিতে পারে। তুমি চল, আমি তোমাকে বাড়ী লইয়া যাইব। কিন্তু ব্যাধের স্বতঃপ্রবৃত্ত নৈতিক সাবধানতা ছিল, সে একাকী যাইবে না—"চল বন্ধুজনপথে, ফুল্লরা চলুক সাথে, পিছে লয়ে যাব ধনুঃশর।" দেবী উত্তর দিলেন না—চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কালকেতুর রাগ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল—বড়র বহুরি তুমি, বড় লোকের ঝি। বুঝিয়া ব্যাধের ভাব তোর লাভ কি।" তথাপি চণ্ডী যান না, তখন ব্যাধ বলিল,—"চরণে ধরিয়া মাগি ছাড়গো নিলয়" এবং অবশেষে—"এত বাক্যে চণ্ডী যদি না দিলা উত্তর। ভানু সাক্ষী করি বীর যুড়িলেক শর।" কিন্তু সহসা অপূর্ব্ব পুলকে ব্যাধ মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া গেল, তাহার চক্ষু হইতে জল পড়িতে

অতি প্রাকৃত।

লাগিল—শরীর ঘন ঘন রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল—যে শর ছাড়িতে চাহিয়াছিল, তাহা ছাড়িতে পারিল না; শর ধনু হস্তে আটকিয়া গেল। তখন স্বামীর বিপদে ফুল্লরা সুন্দরী সহায় হইল,—"নিতে চাহে ফুল্লরা হাতের ধনুঃশর। ছাড়াইতে নারে রামা

* গুণের এখানে সরল অর্থ 'ধনুর্গুণ', কিন্তু ফুল্লরা তাহা বোঝে নাই।

হইল ফাঁপর।" এই সময় দেবী কৃপা করিয়া বলিলেন,"আমি চণ্ডী, তোমাকে বর দিতে আসিয়াছি।" এই স্বভাব-নির্ভীক সত্যবাদী ব্যাধ স্বীয় সামাজিক হীনতা ও অপরাধ স্মরণ করিয়া চিরবিনীত, সে চণ্ডীকে বলিতেছে,—"হিংসামতি ব্যাধ আমি অতি নীচ জাতি। কি কারণে মোর গৃহে আসিবে পার্ব্বতী।" তখন দেবী স্বীয় দশভূজামূর্ত্তি দেখাইয়া সন্দেহ ভঞ্জন করিলেন। সেই মূর্ত্তির বর্ণনাটি এস্থলে বড় সুন্দর হইয়াছে।

চণ্ডীর অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখিয়া ব্যাধ ও ফুল্লরা কাঁদিয়া পায় পড়িল। চণ্ডী কালকেতুকে একটি অঙ্গুরী উপহার দিলেন, কিন্তু—"লইতে নিষেধ করে ফুল্লরা সুন্দরী। এক অঙ্গুরীতে প্রভু হবে কোন্ কাম। সারিতে নারিবে প্রভু হইলে দুর্নাম"॥ সুতরাং চণ্ডীদেবীকে আরও সাত ঘড়া ধন দিতে হইল। এই সাত ঘড়া ধন ফুল্লরা ও কালকেতু সমস্ত বহিয়া লইতে পারিল না; তখন কালকেতু তাহার অভ্যস্ত সরলতা সহকারে একটি অনুরোধ করিল,— "এক ঘড়া ধন মা আপনি কাঁখে কর।" ক্ষীণাঙ্গী দেবী এক ঘড়া ধন নিজে কাঁখে তুলিয়া লইলেন; কিন্তু কালকেতু মূর্খ, দরিদ্র—তাহার মনে যে সমস্ত ভাব খেলা করিয়াছে, কবি তাহার কোনটিই গোপন করেন নাই—তাহার সরলতা, বর্ব্বরতা, মূর্খতা এবং চরিত্রবল এ সমস্তই ব্যাধ-নায়কেরই উপযোগী, অন্য কোন মানদণ্ডে তাহার তুলনা করিলে অন্যায় হইবে। যখন চণ্ডী ধনঘড়া লইয়া ধীরে ধীরে চলিতেছেন তখন—"মনে মনে মহাবীর করেন যুকতি। ধন ঘড়া লৈয়ে পাছে পলায় পার্ব্বতী।" এই সকল বর্ণনায় এরূপ একটি সুন্দর অকৃত্রিমতার বিকাশ আছে, যাহা প্রথম শ্রেণীর কবি ভিন্ন অন্য কেহ দেখাইতে পারে না। মুরারিশীলের নিকট অঙ্গুরী ভাঙ্গাইবার স্থলটি স্থানান্তরে উদ্ধৃত হইয়াছে। একদিকে প্রবঞ্চক মুরারির কপট-ভদ্রতা সূচক প্রশ্ন, অপরদিকে কালকেতুর সরল বন্ধুভাবের উত্তর ও নির্ভীক সত্যপ্রিয়তা তাহার বর্ব্বরতাকেও যেন প্রকৃত সুনীতির বর্ণে উজ্জ্বল করিয়াছে।

চণ্ডীর দয়া।

শঠে সরলে।

ইহার পর কালকেতু চণ্ডীর আদেশে গুজরাটের বন কাটাইয়া তথায় রাজধানী স্থাপন করিল। কিন্তু পরবর্ত্তী অংশে মুকুন্দকবি তাহার চরিত্রের দৃঢ়তা রক্ষা করিতে পারেন নাই। মুকুন্দের কালকেতু ব্যাধ, তাঁহার কালকেতু রাজা হইতে শ্রেষ্ঠ। তাঁহার কালকেতু কলিঙ্গাধিপতির সহিত যুদ্ধে হারিয়া, স্ত্রীর অনুরোধে শয়নপ্রকোষ্ঠে লুকাইয়াছিল—এ দৃশ্য দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছি। কবি বাঙ্গালী বীরকে বোধ হয় যথাদৃষ্ট তথা অঙ্কন করিয়াছেন, কিন্তু মাধবাচার্য্য কালকেতুর শেষ জীবন বেশ প্রশংসনীয় ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন; ফুল্লরা যখন স্বামীকে যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিতেছে, তখন কালকেতু বলিতেছে—"শুনিয়া যে বীরবর, কোপে কাঁপে থর থর, শুন রামা আমার উত্তর। করে লৈয়া শর গাণ্ডী, পূজিব মণ্ডলচণ্ডী বলি দিব কলিঙ্গ ঈশ্বর॥

মুকুন্দ ও মাধব।

যতেক দেখহ অশ্ব, সকল করিব ভস্ম, কুঞ্জর করিব লণ্ডভণ্ড। বলি দিব কলিঙ্গ রায়, তুষিব চণ্ডিকা মায়, আপনি ধরিব ছত্র দণ্ড॥"—(মা, আ, চ)। এবং যেখানে কালকেতু বন্দী অবস্থায় রাজসভায় প্রবেশ করিল, তখন—"রাজসভা দেখি বীর প্রণাম না করে।"—(মা, আ, চ)।

কলিঙ্গাধিপতিকে চণ্ডীদেবী স্বপ্ন আদেশ দিলেন,—"আমার ভৃত্য কালকেতু, তাহাকে আমি রাজপদ দিয়াছি, তুমি তাহাকে ছাড়িয়া দেও।" কলিঙ্গাধিপতি এই আদেশ অনুসারে কালকেতুকে মুক্তি প্রদান করিয়া স্বয়ং তাহাকে গুজরাটের সিংহাসনে দৃঢ়ভাবে সংস্থাপিত করিলেন।

ইহার পর সহসা একদিন কালকেতু নীলাম্বর হইয়া ও ফুল্লরা ছায়া হইয়া স্বর্গে গমন করিল।'

ভাঁড়ু-দত্ত।

উপাখ্যান-ভাগে একটি আবশ্যক ব্যক্তিকে বাদ দিয়া গিয়াছি। আমরা তাহাকে উপেক্ষা করিয়া যাই নাই, ভাঁড়ু-দত্তকে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করিব, এইজন্য পূর্ব্বে তৎসম্বন্ধে কিছু লিখি নাই।

ধূর্ত্ততার প্রতিমূর্ত্তি।

ভাঁড়ু শকুনিশ্রেণীর ব্যক্তি,—ধূর্ত্ততার জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি। এই চরিত্র বর্ণনায় কবিকঙ্কণ হইতে মাধবাচার্য্য বেশী ক্ষমতা দেখাইয়াছেন আমরা মাধবাচার্য্যের কাব্যকে মূলতঃ অবলম্বন করিয়া ভাঁড়ু-চরিত্র বর্ণনা করিব।

ঘরের কথা।

ভাঁড়ু-দত্তের বাড়ী গুজরাটের নিকট, বাড়ীতে লক্ষ্মীর কৃপা আঁটে না,—পরিবারের সকলেরই মধ্যে মধ্যে উপবাসী থাকিতে হয়। ভাঁড়ুদত্ত একদিন উপবাসে বঞ্চন করিয়া প্রাতে স্বীয় স্ত্রীর নিকট কিছু খাবার চাহিতেছে,—"ভাঁড়ুদত্ত বলে শুন তপনদত্তের মা। ক্ষুধার কারণে মোর পোড়ে সর্ব্ব গা॥" তপনদত্ত ভাঁড়ুর পুত্র। ভাঁড়ুর গুণবতী ভার্য্যা ক্ষুধার্ত্ত স্বামীর প্রতি হাসিয়া বলিল,—"যেন মতে কথা কহ লোকে বলে আউল। কালি গেল উপবাস আজ কোথা চাউল॥"

তখন ভাঁড়ু দুঃখিত চিত্তে—"ভাঙ্গা কড়ি ছয় বুড়ি গামছা বাঁধিয়া। ছাওয়ালের মাথে বোঝা দিলেক তুলিয়া।" ভাঙ্গা কড়ি, দিয়া কি হইবে, পাঠক সে প্রশ্নের উত্তর পরে পাইবেন।

ভাঁড়ুদত্ত বাজারে।

বাজারে উপনীত হইয়া ভাঁড়ু প্রথমে ধনাপসারীর নিকট গেল, কয়েক সের চাউল চাহিল এবং বলিল "তঙ্কা ভাঙ্গাইয়া কড়ি দিয়া যাব তোরে।" কিন্তু ধনা তাহাকে চিনিত, সে আগে কড়ি না পাইলে, চাউল দিবে না। কিন্তু ভাঁড়ুদত্ত তাহাকে নানারূপ উৎপীড়নের ভয় দেখাইল, রাজার পাইকগণ তাহাকে মান্য করে, সে তাহাদিগের সাহায্যে ধনাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবে। ধনা ভয় পাইয়া বলিল—"পরিহাস করিলাম করি বাড়াবাড়ি। চাউল নিয়া যাও তুমি নাহি দিও কড়ি।" শাক-বিক্রেতাকে নানারূপ প্রলোভন দেখাইয়া এক বোঝা শাকশব্জি যোগাড় করিল। "কালি দুই তিন ভুমি ইনাম দিব তোরে।" এইরূপ নানা ধূর্ত্ততা করিয়া সে লবণ ও তৈল

আদায় করিয়া লইল। কিন্তু গুবাক বিক্রেতার সম্মুখে প্রথমে একটু জব্দ হইল, তাহাকেও টাকা ভাঙ্গাইয়া কড়ি দেওয়ার কথা বলাতে সে বলিল—"তঙ্কা ভাঙ্গাইয়া মজুত আন গিয়া কড়ি। মজুর পাঠাইয়া গুয়া নিও তবে বাড়ী॥" তখন ভাঁড়ুদত্ত রাজদরবারে তাহার প্রতিপত্তির কথা বলিতে লাগিল;—স্বীয় গৌরবের নানা স্পর্দ্ধা করিয়া বলিল—রাজা তাহাকে গাড়ু, কম্বল ও পাটের পাছড়া উপঢৌকন দিয়াছেন; বলা নিষ্প্রয়োজন এ সকলই মিথ্যা। গুবাক্ বিক্রেতাকে ভয় দেখাইয়া বলিল,—"প্রাতঃকালে প্যাদা পাঠাইব ঘরে ঘরে। পতাকা তুলিয়া দিব গাছের উপরে॥" এই ভাবে গুবাক্, চিড়া, মিঠাই, সন্দেশ প্রভৃতি নানা দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া লইল। কিন্তু ঘোষের মা দধি বিক্রয় করিতেছিল, তাহার দধি ধরিয়া টানাটানি করাতে বৃদ্ধা তাহাকে কটুমুখে গালি দিতে লাগিল, ভাঁড়ু নানা উপায় জানে, সে তাহার কাণে কাণে বলিল,—"চোরা গরু লয়ে বুড়ি তোমার বসতি। বাদী হইয়াছে যত গ্রামের রায়তি॥" ভয়ে ঘোষের মার মুখ শুকাইয়া গেল। কিন্তু মৎস্য-বিক্রেতার কঠিন হস্ত হইতে মৎস্য-আদায় করিতে গিয়া ভাঁড়ু প্রকৃতই জব্দ হইল; সে কোনরূপেই মৎস্য দিবে না। ভাঁড়ু যত বলিল, মৎস্য-বিক্রেতা ভ্রূকুটি-কুটিল মুখে সব অগ্রাহ্য করিল, শেষে ভাঁড়ু টানাটানি আরম্ভ করাতে দুইজনে মল্লযুদ্ধ লাগিল; এই যুদ্ধে—"কচ্ছ হতে ভাঁড়ুদত্তের পড়ে কাণা কড়ি॥" "কাণা কড়ি পড়ে ভাঁড়ু বহু লজ্জা পায়। মৎস্য ছাড়িয়া তবে উঠিয়া পলায়।"

এই গেল বাজারের পালা; তার পর ভাঁড়ু কালকেতুরাজাকে প্রতারণা করিতে গিয়াছে,—

রাজ-দরবারে।

"ভেট লয়ে কাঁচকলা, পশ্চাতে ভাঁড়ুর শালা, আগে ভাঁড়ুদত্তের প্রয়াণ। ফোঁটা কাটা মহাদম্ভ, ছেঁড়া জোড় কোঁচা লম্ব, শ্রবণে কলম লম্বমান॥ প্রণাম করিয়া বীরে, ভাঁড়ু নিবেদন করে, সম্বন্ধ পাতিয়া খুড়া খুড়া। ছেঁড়া কম্বলে বসি, মুখে মন্দ মন্দ হাসি, ঘন ঘন দেয় বাহু নাড়া॥ আইনু বড় প্রীত আশে, বসিতে তোমার দেশে, আগেতে ডাকিবে ভাঁড়ুদত্তে॥ যতেক কায়স্থ দেখ, ভাঁড়ুর পশ্চাতে লেখ, কুলশীল বিচার মহত্বে॥ কহি আপনার তত্ত্ব, আমলহাঁড়ার দত্ত, তিনকুলে আমার মিলন। ঘোষ ও বসুর কন্যা, দুই নারী মোর ধন্যা, মিত্রে কৈল কন্যার গ্রহণ॥ গঙ্গার দুকুল পাশে, যতেক কায়স্থ বৈসে, মোর ঘরে করয়ে ভোজন। ঝারি বস্ত্র অলঙ্কার, দিয়ে করে ব্যবহার, কেহ নাহি করয়ে রন্ধন" ইত্যাদি।—ক, ক, চ।*

সে কালকেতুর মন্ত্রিত্ব পদ পাইতে অভিলাষী। কালকেতু তাহাতে সম্মত হইল না; তখন ভাঁড়ু গালি দিতে আরম্ভ করিল,—কালকেতুর লোকজন যাইয়া ভাঁড়ুকে খুব প্রহার করিয়া ছাড়িয়া দিল; তখন ভাঁড়ু—"পুনর্ব্বার হাটে মাংস বেচিবে ফুল্লরা" প্রভৃতি ভাবের গালি দিতে দিতে বাড়ী ফিরিয়া গেল,—

---

* ভাঁড়ুদত্তের প্রসঙ্গে এই স্থলটি মাত্র কবিকঙ্কণচণ্ডী হইতে উদ্ধৃত হইল; অন্যান্য অংশ মাধবাচার্য্যের চণ্ডী হইতে গ্রহণ করিয়াছি।

"পথে পড়া ফুল পাইয়া মাথে তুলি দিল। হাসিতে হাসিতে ভাঁড়ু বাড়ীতে চলিল। বাড়ীর নিকটে গিয়া ডাকয়ে রমণী। সত্বরে আনিয়া দেও এক ঘটি পানি। প্রভুর বচন শুনি রমণী অস্থির। ঝাড়া ঘটিতে পুরি বাহির করয়ে নীর। ভাঁড়ুরে দেখিয়া তার রমণী চিন্তয়। কেওরাজের গেলা প্রভু ধূলি কেন গায়। ভাঁড়ু এ বোলয় প্রিয়া শুনহ কর্কশা। মহাবীর সনে আজি খেলিয়াছি পাশা। ক্রমে ক্রমে মহাবীর হয় পাটী হারি। রসে অবশ হইয়া করে হুড়াহুড়ি। ধূলা ঝাড়ি বহুমতে পাইয়াছি রস। বীরের গায়েতে দিছি তার দুই দশ। কি বলিতে পারি প্রিয়া বীরের মাহাত্ম্য। যাহার পীরিতে বশ হৈল ভাঁড়ু দত্ত।"

স্ত্রীর নিকট কৈফিয়ৎ।

কিন্তু রমণীকে এই সুখকর প্রবোধ দিলেও ধূর্ত্তের হৃদয় ক্রোধে জ্বলিতেছিল; ইহার পর সে কলিঙ্গাধিপকে জানাইল যে, তাঁহার রাজ্যের নিকট একজন নীচজাতি ব্যাধ রাজ্য স্থাপন করিয়াছে এবং কৌশলে কলিঙ্গরাজকে উত্তেজিত করিয়া কালকেতুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইল। এই যুদ্ধের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি।

প্রতিহিংসা।

যখন দুই রাজার পুনঃ সন্ধি হইল, তখন উভয়ের অনুমতিক্রমে নাপিত ভাঁড়ুর মস্তক অশ্বমূত্রে ভিজাইয়া লইল এবং মধ্যে মধ্যে ক্ষুর বাম পদের তলাতে ঘষিয়া মাথাটি বেশ করিয়া মুণ্ডন করিয়া দিল। মস্তক মুণ্ডনের পর নাগরিকগণ প্রত্যেকে এক এক ঘড়া ঘোল তাহার মাথায় ঢালিয়া দিয়া গেল; ছেলেরা গীত বাঁধিয়া তাহার পাছে পাছে গান গাহিয়া চলিল; "কাল হাঁড়ি ফেল্যা মারে ফুলের বহুড়ী"—এতদবস্থায় ভাঁড়ুকে গঙ্গা পার করিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু শতবার ধৌত হইলেও অঙ্গারের মলিনত্ব ঘোচে না; গঙ্গাপার হইয়া,—

ভাঁড়ু দত্তের শাস্তি।

"লোকের সাক্ষাত ভাঁড়ু কহে মিথ্যা কথা। গঙ্গা সাগরেতে গিয়া মুড়ায়েছি মাথা। এ বলিয়া মাগি খায় নগরে নগরে।"

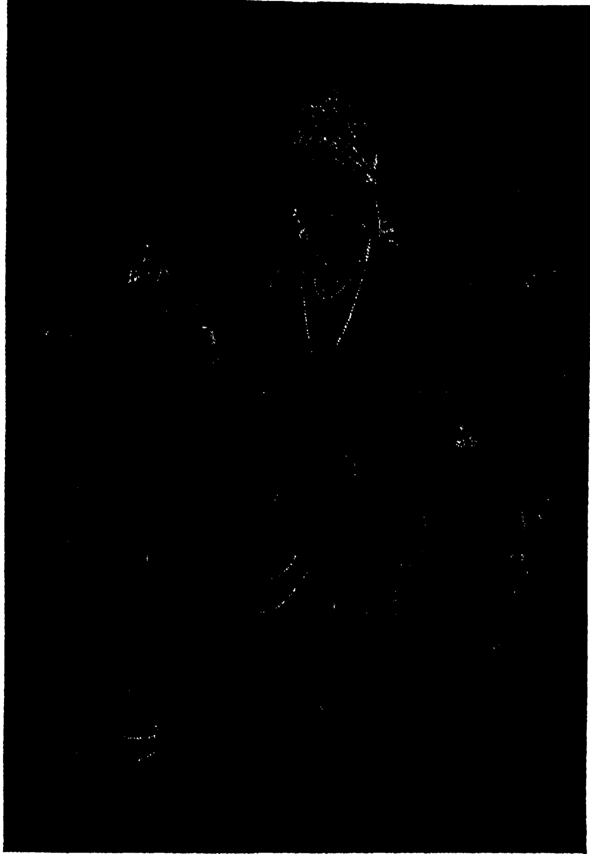
শ্রীমন্তের গল্প।

রত্নমালা অপ্সরা তালভঙ্গ দোষে লক্ষপতিবণিকের ঘরে খুল্লনা হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন।

খুল্লনার জন্ম।

একদা উজানিনগরের যুবক ধনপতি সদাগর শ্যামল প্রান্তরে ক্রীড়াচ্ছলে পায়রা উড়াইতেছিলেন; এই পায়রা খুল্লনার বস্ত্রাঞ্চলে লুকাইল; ধনপতি পায়রা চাহিতে গেলেন, খুল্লনা জানিতে পারিল, ধনপতি তাহার খুড়তুত ভগিনীর স্বামী, সুতরাং সম্বন্ধটিতে আমোদ করিবার সুযোগ ছিল; ঈষদুদ্ভিন্নযৌবনা খুল্লনা মুখখানি বিদ্রূপ-মধুর হাসিতে উদ্ভাসিত করিয়া কৌতুক করিতে করিতে চলিয়া গেল; ধনপতির মাথা ঘুরিয়া গেল, তিনি দাঁড়াইয়া খুল্লনাকে বিবাহ করিবার চিন্তা করিতে লাগিলেন।

কৌতুকে বিপদ।



জগদ্ধাত্রী

ধনপতি কুলে ও ধনে শ্রেষ্ঠ, কাব্য নাটক পড়িয়া পণ্ডিত ; সুতরাং এ বিবাহে সম্মতি পাইলাম।

লহনাকে প্রবোধ।

কিন্তু তাঁহার প্রথমা স্ত্রী লহনাসুন্দরীকে প্রবোধ না দিলে হয় না—সেও এ কথা শ্রবণমাত্র অভিমানে মাতিয়া বসিয়া আছে—কথা বলে না ;—

"লহনা লইনা বলি ডাকে সদাগর। অভিমানযুক্ত রামা না দেয় উত্তর। ইঙ্গিতে বুঝিল লহনার অভিমান। কপট সম্ভাষে সাধু লহনা বুঝান। রূপ নাশ কৈলে প্রিয়ে রন্ধনের শালে। চিন্তামণি নাশ কৈলে কাঁচের বদলে। স্নান করি আসি শিরে না দাও চিরুনী। রৌদ্র না পায় কেশ শিরে বিধে পানি। অবিরত ঐ চিন্তা অন্য নাহি গণি। রন্ধনের শালে নাশ হইল পদ্মিনী। মাসী, পিসী, মাতুলানী, ভগিনী, সতিনী। কেহ নাহি থাকেঁ ঘরে হইয়া রান্ধুনী। যুক্তি যদি দেহ মনে কহিবা প্রকাশি। রন্ধনের তরে তব করি দিব দাসী। বরিয়া বাদলেতে উননে পাড় ফুঁক। কপূর তাম্বুল বিনে রসহীন মুখ"

এই কথাগুলির মোহিনীশক্তিতে এবং একখানি পাটশাড়ী এবং চুড়ি গড়াইবার জন্য পাঁচ তোলা সোণা পাইয়া লহনা আর কোন আপত্তি করিল না।

লহনা মোটের উপর মন্দ মেয়ে নহে, তবে বুদ্ধিটি বড় স্থূল ; তাহার প্রকৃতি সরল ও সুন্দর, কিন্তু

লহনা-চরিত্র ; সপত্নী প্রেম।

কোন দুষ্ট চালাক লোকের হাতে পড়িলে নির্ব্বোধ লহনা খেলার পুতুলের ন্যায় আয়ত্ত হইয়া যায়, প্ররোচনায় সে নিতান্ত গর্হিত কর্ম্মও করিতে পারে।

বিবাহের পর ধনপতিকে রাজাজ্ঞায় প্রবাসে (গৌড়ে) যাইতে হইল, তখন দ্বাদশবর্ষীয়া খুল্লনাকে সাধু লহনার হাতে হাতে সঁপিয়া গেল। লহনা স্বামীর কথা মাথায় করিয়া খুল্লনাকে ভালবাসিতে লাগিল ; দুই দিনের মধ্যেই খুল্লনা সেই ভালবাসার আতিশয্যে অস্থির হইয়া উঠিল ;—

"সাধু গেল গৌড় পথে, লহনার হাতে হাতে, খুল্লনা করিয়া সমর্পণ। পালয়ে স্বামীর সত্য, জননী সমান নিত্য, খুল্লনারে করয়ে পালন॥ যবে ছয় দণ্ড বেলা, কুসুমে তুলিয়া মালা, নারায়ণ তৈল দিয়া গায়। যাহারা প্রাণের সখী শিরে দেয় আমলকী, তোলা জলে স্নান করায় আপনি লহনা নারী, শিরেতে ঢালয়ে বারি, পরিবার যোগায় বসন। করেতে চিরুনী ধরি, কুন্তল মার্জ্জন করি, অঙ্গে দেয় ভূষণ চন্দন॥ যবে বেলা দণ্ড দশ, হেম থালে ছয় রস, সহিত যোগায় অন্ন পান। ভুঞ্জয়ে খুল্লনা নারী, কাছে থোয় হেম ঝারি ; লহনার খুল্লনা পরাণ॥ ওদন পায়স পিঠা, পঞ্চাশ ব্যঞ্জন মিঠা, অবশেষে ক্ষীরখণ্ড কলা। পয়শে লহনা নারী, গায় দেখি ঘর্ম্ম বারি, পাখা ধরি ব্যজয়ে দুর্ব্বলা॥ অন্ন খায় লজ্জা করি, যদি বা খুল্লনা নারী, লহনা মাথার দেয় কিরা। দুসতীনে প্রেমবন্ধ দেখিয়া লাগয়ে বন্ধ সুবর্ণে জড়িত যেন হীরা॥" লহনার মত সরল চরিত্রে গরল প্রবেশ করিতে বেশী সময় লাগে না। দুর্ব্বলাদাসী নির্জ্জনে বসিয়া খানিক এই চিন্তা কারল,—"যেই ঘরে দুসতীনে না হয় কোন্দল। সে ঘরে যে দাসী সে বড় পাগল। একের করিয়া নিন্দা যায় অন্য স্থান। সে ধনী বাসিবে মোরে প্রাণের সমান॥" তৎপরে সে লহনাকে যাইয়া এই ভাবে উত্তেজিত করিল—

"শুন শুন মোর বোল শুনগো লহনা। এবে সে করিল নাশ আপনি আপনা। ঋজুমতি ঠাকুরাণী নাহি জান পাপ। দুধ

দিয়া কি কারণে পোষ কালসাপ॥ সাপিনী বাঘিনী সত্য পোষ নাহি মানে। অবশেষে এই তোমায় বধিবে পরাণে॥ কলাপী-কলাপ যিনি খুল্লনার কেশ। অর্দ্ধ পাকা কেশে তুমি কি করিবে বেশ॥ খুল্লনার মুখশশী করে ঢল ঢল মাছিতায় মলিন তোমার গণ্ডস্থল॥ * * * ক্ষীণমধ্যা খুল্লনা যেমন মধুকরী। যৌবনবিহীনা তুমি হৈলা ঘটোদরী॥ আসিবেন সাধু গৌড়ে থাকি কতদিন। খুল্লনার রূপ দেখি হবেন অধীন॥ অধিকারী হবে তুমি রন্ধনের ধামে। মোর কথা স্মরণ করিবে পরিণামে॥ নেউটিয়া আইসে ধন সুত বন্ধুজন। না নেউটে পুন দেখ জীবন যৌবন॥"

সরলে গরল।

এই উপদেশ লহনার উপর উদ্দিষ্ট কাজ করিল; সে ক্ষেপিয়া গেল;—খুল্লনাকে স্বামীর চক্ষের বিষ করিতে নানা তন্ত্র মন্ত্র ও ঔষধ খুঁজিতে লাগিল। অবশেষে এক জাল-পত্র লইয়া খুল্লনার নিকট উপস্থিত হইল; পত্রের মর্ম্ম এই—তুমি অদ্য হইতে ছাগল রাখিবে, ঢেঁকিশালে শুইয়া থাকিবে, এক বেলা আধপেটা ভাত খাইবে ও 'খুঁয়া বস্ত্র' পরিবে।

এই স্থান হইতে খুল্লনার চরিত্র পরিষ্কাররূপে বিকাশ পাইয়াছে। খুল্লনার যেরূপ পতিভক্তি, সেইরূপ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি; তাহারও একেবারে রাগ না আছে, এমন নহে। কিন্তু লহনা যেরূপ রাগে পাগল হইয়া যায়—রাগের বশীভূত হইয়া নিতান্ত একটা দুষ্কর্ম্মও করিয়া ফেলিতে পারে,—খুল্লনার চরিত্রে সেরূপ নির্ব্বোধ রাগ দৃষ্ট হয় না। জাল-পত্র লইয়া লহনা উপস্থিত হইলে, সে তাহা একেবারে অগ্রাহ্য করিল—ইহা তাহার স্বামীর লেখা নহে; আর সে এমন কি পাপ করিয়াছে, যাহাতে তাহার উপর এই কঠিন দণ্ডাজ্ঞা হইতে পারে? লহনা বলিল—তুমি আসিবার পরেই তাঁহাকে দেশ ছাড়িয়া গৌড়ে যাইতে হইয়াছে, বোধ হয় এইজন্য তিনি রাগিয়াছেন; আর তিনি নিজ হাতে চিঠি না লিখিয়া হয়ত মুহুরি দিয়া লিখাইয়াছেন। খুল্লনা বলিল—ও কথা কিছু নহে, এ পত্র জাল। তখন লহনা রাগিয়া তাহাকে মারিতে গেল। খুল্লনা রাগী ছিল না, তবে সে নিতান্ত আত্মসমর্থন না জানিত' এমন নহে—"খুল্লনার আঙ্গুলী বিধির বিপাকে। দৈবাৎ লাগিল গিয়া লহনার বুকে॥ লহনা হইল তাহে যে অগ্নিকণা। খুল্লনার দুই গালে মারে দুই ঠোনা॥" এইত ঘটনা; তবে খুল্লনার "অঙ্গুলী" যে নিতান্তই "দৈবাৎ" লহনার বুকে লাগিয়াছিল, তাহা না ও হইতে পারে। শেষে শুদ্ধ শারীরিক বলের প্রভাবে লহনারই জয় হইল, খুল্লনাসুন্দরী ভূলুণ্ঠিত হইল—"কাতরে খুল্লনা দেয় রাজার দোহাই।"

খুল্লনা বনবাসী।

এই অবস্থায় খুল্লনাকে বাধ্য হইয়া ছাগল চরাইতে চরাইতে বনে বনে যাইতে হইল; ঢেঁকিশালে শুইতে হইল ও খুঁয়ার কাপড় পরিতে হইল। ছাগল রাখার সময় স্ফুরন্তযৌবনা খুল্লনাসুন্দরী গৃহের আড়াল হইতে বনের শ্যামল প্রদেশে আসিলেন; যেখানে নানা বনফুল, সেখানে তাহাদেরই মত কামিনীর রূপ বিকাশ পাইল। তাহার ছেলি-রক্ষণের কষ্ট পড়িতে আমাদের হতভাগিনী ফুল্লরার কথা মনে পড়িয়াছে। ইহার বারমাসীতেও

চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হয়। এই দুঃখের সময় পিতা মাতা খুল্লনার কোন বিশেষ সংবাদ লয়েন নাই—"শুনিয়া খুল্লনা দুঃখে ছাড়য়ে নিশ্বাস। অবনী প্রবেশি যদি পাই অবকাশ ॥" সুন্দরীর এই দুঃখের মূর্ত্তিখানা দেখুন—

"ধীরে ধীরে যায় রামা লইয়া ছাগল। ছোট হাতে, পাত মাথে, যেমন পাগল। নানা শস্য দেখিয়া চৌদিকে ধায় ছেলি। দেখিয়া কৃষাণ সব দেয় গালাগালি ॥ শিরীষকুসুম তনু অতি অনুপাম। বসন ভিজিয়া তার গায় পড়ে ঘাম।"

কিন্তু খুল্লনা এখন বিদ্যাপতি বর্ণিত বয়ঃসন্ধির মনোহর অবস্থায়; নবযৌবনাগমে খুল্লনা এই দুঃখ ভুলিয়া বসন্তকালে বিরহে মাতিয়া গেল; বহিঃপ্রকৃতির উন্মাদকর সৌন্দর্য্যের সঙ্গে তাঁহার হৃদয়ের আবেগ এক সুরে বাজিয়া উঠিল।

মন্দ মন্দ বহে হিম দক্ষিণ পবন। অশোক কিংশুকে রামা করে আলিঙ্গন ॥ কেতকী ধাতকী ফোটে চম্পক কাঞ্চন। কুসুম পরাগে শ্লথ হৈল অলিগণ ॥ লতায় বেষ্টিত রামা দেখিয়া অশোক। খুল্লনা বলেন সই তুমি বড় লোক আমা হইতে তোমার জনম দেখি ভাল। তোমার সোহাগে সখি বন কৈলা আলো ॥" খুল্লনা ভ্রমরের নিকট করযোড়ে বলিল,—চিত্ত চমকিত, যদি গাও গীত খাও ভ্রমরীর মাথা।" কিন্তু ভ্রমরের গুন্ গুন্ গুঞ্জরণ থামিল না, তখন খুল্লনা রাগিয়া ভ্রমরকে গালি দিতেছে,—"তুই মাতোয়াল, মোরে হইলি কাল, না শুন বিনয়বাণী। ধুতুরার ফুলে, কিবা মধু পিলে, তাহা মনে নাহি গণি ॥" কোকিলের কুহুস্বরে চমকিত হইয়া খুল্লনা কাঁদিয়া বেড়াইল; প্রকৃতির তরু পল্লব, পাখী, অন্য নিরাশ্রয়া খুল্লনা সকলেরই অধীনা, কোকিলকে বলিতেছে,—"সদাগর আছে যথা, কেন নাহি যাও তথা, এই বনে ডাক অকারণ।"

বঙ্গীয় গ্রাম্যসৌন্দর্য্য এই সব স্থলে উজ্জ্বল ও উপভোগ্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে। পাঠক এই সব বর্ণনা পড়িতে পড়িতে বসন্তঋতুর নব হিল্লোল ও বনফুল-মত্ত হাওয়ার স্পর্শে সুখী হইবেন,—বাহিরের সমস্ত দুরবস্থা হাপাইয়া খুল্লনার যৌবন-সৌন্দর্য্য একটা ফুলশরের মত পাঠকের মর্ম্ম স্পর্শ করিবে।

পথশ্রান্তা খুল্লনা প্রাকৃতিক সকল শোভা দেখিতে দেখিতে ঘুমাইয়া পড়িল। চণ্ডীদেবী এইখানে খুল্লনাকে মাতৃরূপে দেখা দিয়া স্বপ্নে বলিলেন—"কত দুঃখ আছে ঝি তোমার কপালে। সর্ব্বশী ছাগল তোর খাইল শৃগালে ॥ তোমার দুঃখ দেখিয়া পাঁজরে বিঁধে ঘুণ। আজি লো লহনা তোরে করিবেক খুন।" খুল্লনা জাগিয়া দেখিল, সত্য সত্যই "সর্ব্বশী" ছাগলটি নাই,—তখন লহনার শাস্তির ভয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে বনপ্রদেশ ঘুরিয়া বেড়াইল। এই সময় পঞ্চ-কন্যা তাহাকে চণ্ডীপূজা শিখাইয়া গেল, চণ্ডী খুল্লনাকে দেখা দিলেন; অশ্রুনেত্রে চিরদুঃখিনী খুল্লনা চণ্ডীর পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল,—"জন্মে জন্মে ছেলি তুমি হও নিজ জন। তোমা হতে দেখিলাম চণ্ডীর চরণ ॥" চণ্ডী তাহাকে স্বামী পুত্রলাভের বর দিয়া চলিয়া গেলেন।

চণ্ডীদেবীর বরপ্রদান।

এতদিনে দুঃখের রাত্রি প্রভাত হইল, সে রাত্রি খুল্লনা বাড়ী যায় নাই; লহনার মনে অনুতাপ হইল, "স্বামী আমাকে হাতে হাতে সঁপিয়া দিয়াছেন, খুল্লনাকে বনের কোন পশু মারিয়া ফেলে নাই ত?" প্রভাতে যখন খুল্লনা বাড়ী ফিরিয়া আসিল,

প্রত্যাগত প্রবাসী।

তখন লহনা তাহাকে পূর্ব্বের ন্যায় আদর ও যত্ন করিতে লাগিল; ধনপতির চরিত্রবল বেশী কিছু ছিল না; সে গৌড়ে যাইয়া অসঙ্গত সুখে মত্ত হইয়া বাড়ী ভুলিয়াছিল; সেই রাত্রিতে খুল্লনাকে স্বপ্নে দেখিয়া বাড়ী যাওয়ার কথা মনে হইল। ধনপতি বাড়ী আসিলেন, তাঁহার আগমন সংবাদে লহনা স্বীয়-শিথিল সৌন্দর্য্যকে যথাসাধ্য টানিয়া বুনিয়া নূতন বেশভূষায় সজ্জিত করিতে বসিল; "গুয়াঠুটি" খোঁপা বড় সুন্দর করিয়া বাঁধিল কিন্তু—"মাছিতা বদনে দেখি দর্পণে চাপড়।" দর্পণ ভাঙ্গিলে সুন্দরীগণের মুখের মাছিতা ঘোচে কি? লহনা "মেঘ ডুম্বুর" কাপড় পরিয়া পরী সাজিয়া স্বামীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতে গেল। এদিকে সেদিন অনেক লোক সাধুর ঘরে নিমন্ত্রিত; দুর্ব্বলা দাসী বিস্তর পয়সা চুরি করিয়াও বাজার হইতে অনেক আয়োজনপত্র সংগ্রহ করিয়াছে; সাধু খুল্লনাকে রাঁধিতে বলিলেন; লহনা তাহাতে আপত্তি করিয়া বলিল,—খুল্লনা কোন কাজের মেয়ে নহে, উহাকে পাক করিতে দিলে সব নষ্ট করিয়া ফেলিবে, খুল্লনা কেবল পাশা খেলিতে জানে—'নাহি রাঁধে, নাহি বাড়ে, নাহি দেয় ফুঁক। পরের রাঁধন খেয়ে চাঁদ পানা মুখ॥" কিন্তু এই আপত্তিতে কোন ফল হইল না, খুল্লনাই রাঁধিতে গেল; দেবীর কৃপায় পাক বড় উত্তম হইল, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ ধন্য ধন্য বলিল, কিন্তু—"বাসি পান্ত ভাত ছিল সরা দুই তিন। তাহা খাইয়া লহনা কাটাইল দিন॥" সকলকে খাওয়াইয়া দেবীরূপিণী লক্ষ্মীবউ খুল্লনা লহনার নিকটে গেল,—"সম্ভ্রমে খুল্লনা আসি ধরিল চরণে। ঘুচিল কোন্দল দোঁহে বসিল ভোজনে॥"—খুল্লনা এইরূপ ক্ষমাশীল ছিল।

তার পর খুল্লনা সাধুর শয্যাগৃহে যাইবে। লহনা তাহাকে নানা যুক্তি দেখাইয়া নিবারণ করিল; কিন্তু খুল্লনা সেই সব যুক্তিপ্রবর্ত্তক অভিসন্ধি বেশ বুঝিতে পারিল, ও গল্পচ্ছলে যুক্তিগুলির অসারতা দেখাইয়া হাসিতে হাসিতে পতিগৃহে গেল।

শয্যাগৃহের অভিনয়।

শয্যাগৃহে বড় কৌতুকের অভিনয় হইয়াছিল। খুল্লনা শয্যার নীচে পলাইয়া ছিল, তখন ধনপতির মুখে অনাহূত অনেক কবিত্বের কথা নিঃসৃত হইয়াছিল,—

"কহ খট্টা কোথা মোর খুল্লনা সুন্দরী। কহ না প্রদীপ কোথা মোর সহচরী॥ সত্য করি কহ কথা মধুকরবধূ। খুল্লনার কবরীতে পান কৈলা মধু॥ চিত্রের পুত্তলী যত আছে চারিভিতে। সবে জিজ্ঞাসয়ে সদাগর এক চিত্তে॥ এতদিন একলা আছিনু পরবাসে। স্বপ্নেতে খুল্লনা নারী বৈসে মোর পাশে॥ প্রবাস ছাড়িয়া আমি আসি নিজ ঘর। কি দিয়া সুন্দরী মোরে করিলা পাগল॥

ক্রীড়াময়ী খুল্লনা ধরা দিল, স্বামীর বুকে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে লহনা যত কষ্ট দিয়াছে, তাহা বলিতে লাগিল। শুনিয়া সাধু রাগে, দুঃখে জর্জ্জরিত হইল, কিন্তু সে লহনার নিকট নিজে অপরাধী—খুল্লনাকে পাইয়া লহনার প্রতি তাহার ভালবাসার হ্রাস হইয়াছিল। আর এদিকে রাত্রি-শেষে যখন সাধু খুল্লনার ঘর হইতে বাহির হইয়াছিল, তখন ঈর্ষা ও ক্রোধের প্রতিমূর্ত্তি লহনা দ্বারে

দাঁড়াইয়াছিল। "যা'র হতে লহনার চক্ষে চক্ষে ভেট। লজ্জায় লজ্জিত সাধু মাথা কৈল হেট॥" কি অপরাধহেতু রাগ করার পরিবর্ত্তে সাধু লজ্জিত হইল, পাঠক বুঝিতে পারিয়াছেন।

ইহার পরে পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে ধনপতি নানা স্থান হইতে স্বজাতিবর্গ নিমন্ত্রণ করিয়া আনিল। এই বণিক্‌সমাজে মালা চন্দন দেওয়া লইয়া ঘোর কলহ বাধিয়া গেল, সে স্থলটি পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি; এই কলহের পরিণাম এই দাঁড়াইল, সভায় প্রশ্ন হইল, "ধনপতি খুল্লনাকে কিরূপে গৃহে রাখিয়াছেন, সে বনে বনে ছাগল চরাইত।" "শুষ্কজলে মৎস্য আর নারীর যৌবন। বনান্তরে পায় যদি রজত কাঞ্চন॥ অযত্নে পাইলে তাহা ছাড়ে কোন্ জন। দেখিলে ভুলয়ে ইথে মুনিজনার মন॥ খুল্লনা যদি সতী হয়, তবে পরীক্ষা হউক, নতুবা আমরা আপনার বাড়ী খাইব না। ইহা শুনিয়া খুল্লনার পিতা লক্ষপতি কাতরভাবে রাজার দোহাই দিলেন। তাহা শুনিয়া,—"বলে বেণে শঙ্খদত্ত, রাজবলে হয়ে মত্ত, জ্ঞাতিরে দেখাও রাজবল। জ্ঞাতি যদি অভিরোষে, গরুড়ের পাখা খসে, ইহার উচিত পাবে ফল॥" খুল্লনা যদি পরীক্ষা না দেয়, তবে ধনপতিকে এক লক্ষ টাকা দিতে হইবে, তবেই ভোজন হইতে পারে।

পিতৃশ্রাদ্ধে বিভ্রাট।

স্বয়ং ভগবান রামচন্দ্রের যে অবস্থায় বুদ্ধি টলিয়াছিল, অন্য উপায়হীন ধনপতির সেই অবস্থা। দুর্ব্বল বণিক গৃহে যাইয়া লহনাকে গালি দিতে আরম্ভ করিল। "তুমি কেন খুল্লনাকে ছেলি রাখিতে বনে পাঠাইলে?" এবং খুল্লনাকে লইয়া বলিল—"আমি লক্ষ টাকা দিব, তোমার পরীক্ষা দিবার কাজ নাই।" কিন্তু খুল্লনা সেরূপ মেয়ে নহে, সে বলিল এই লক্ষ টাকা তুমি অন্য দিবে, তৎপরে আর এক নিমন্ত্রণে আমাকে উপলক্ষ করিয়া দ্বিগুণ চাহিবে, তুমি কত দিতে পারিবে। আর এই কলঙ্ক আমি সহ্য করিতে পারিব না— "পরীক্ষা লইতে নাথ যদি কর আন। গরল ভখিয়া আমি ত্যজিব পরাণ॥"

খুল্লনার পরীক্ষা।

এইরূপে খুল্লনা সতী নিজ-চরিত্রের দৃঢ়তা দেখাইয়া প্রফুল্লমুখে সভায় পরীক্ষা দিতে দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে জলে ডুবাইতে চেষ্টা হইল,—সর্প দ্বারা দংশন করান হইল, প্রজ্বলিত লৌহদণ্ডে তাঁহাকে দগ্ধ করিতে চেষ্টা করা হইল, অবশেষে জতুগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া খুল্লনাকে তন্মধ্যে রাখিয়া আগুন দেওয়া হইল; এইবার লক্ষপতি কাঁদিয়া উঠিল এবং ধনপতি শোকে বিহ্বল হইয়া আগুনে ঝাঁপ দিতে গেল।

কিন্তু শুদ্ধ স্বর্ণের ন্যায় এই জতুগৃহ হইতে খুল্লনাসতী আরও উজ্জ্বল হইয়া বাহির হইলেন। এই-বার শত্রুগণ পরাভব মানিয়া খুল্লনাকে প্রণাম করিল।

এই ঘটনার কিছু পরে রাজভাণ্ডারে চন্দনাদি দ্রব্যের অভাব হওয়াতে রাজাজ্ঞায় ধনপতিকে সিংহল যাইতে হইল। ধনপতি "সাতডিঙ্গা" বোঝাই করিয়া দীর্ঘ প্রবাসের জন্য প্রস্তুত হইল। যাত্রার যে সময় নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, তাহা লগ্নাচার্য্য অশুভ বলিয়া নিন্দা

পুনশ্চ প্রবাসে।

করাতে,—"এমন শুনিয়া সাধু মুখ করে বাঁকা। নফরে হুকুম দিয়া মারে তারে ধাকা" খুল্লনা পতির শুভ কামনা করিয়া চণ্ডীপূজা করিতে বসিয়াছিল, সদাগর "ডাকিনী দেবতা" বলিয়া চণ্ডীর ঘটে লাথি মারিল।

সদাগর,—ইন্দ্রাণী পরগণা, ললিতপুর, ভাওসিঙের ঘাট, মেটেরি, কলিকাতা প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করিয়া চলিল, সে সময় সপ্তগ্রাম খুব প্রসিদ্ধ ছিল, বোধ হয় হুগলীর ততদূর উন্নতি হয় নাই। কবি সমুদ্রের যে মানচিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা কল্পনা ও কিম্বদন্তীর রেখায় অঙ্কিত, কিন্তু তন্মধ্যে দুএকটি ঐতিহাসিক তত্ত্ব দুর্ল্লভ নহে—"ফিরিঙ্গীর দেশখান বাহে কর্ণধারে। রাত্রিদিন বহে যায় হারমাদের ডরে॥" এই বাক্য দ্বারা বোধ হয়, দক্ষিণপূর্ব্ব উপকূলের পর্ত্তুগিজ দস্যুদিগের প্রতি কটাক্ষপাত করা হইয়াছে।

চণ্ডীর ঘটে সাধু লাথি মারিয়াছিল, অকূল সমুদ্রে পাইয়া চণ্ডী তাহার শোধ তুলিলেন; তুফানে সাত ডিঙ্গার মধ্যে ছয় ডিঙ্গা মারা গেল; একমাত্র "মধুকর ডিঙ্গা" লইয়া সাধু সিংহলে পৌছিলেন।

কমলে-কামিনী।

কিন্তু পথে কালীদহে দেবী এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখাইয়া সাধুর চক্ষু প্রতারিত করিলেন। সমুদ্রে ঘন ঘন বড় ঢেউ উঠিতেছে, অনন্ত জলরাশির বহুদূর ব্যাপিয়া এক সুন্দর পদ্মবন; তন্মধ্যে এক প্রফুল্ল পদ্মারূঢ়া পরমাসুন্দরী রমণী মূর্ত্তি; তিনি এক হস্তে হাতী ধরিয়া গ্রাস করিতেছেন। এই উজ্জ্বল, আশ্চর্য্য ও অপ্রাকৃত দৃশ্য দেখিয়া সাধু স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল; হাতীশুদ্ধ সুন্দরীর ভরে প্রফুল্ল পদ্মের ক্ষীণাঙ্গ কাঁপিতেছিল; সদাগরের সানুরাগ সহানুভূতি সেই বেপথমতী নলিনীলতার উপর, সে কৃপাপূর্ণ বিস্ময়ে বলিয়া উঠিল,—"হরি হরি নলিনী কেমনে সহে ভর॥" যাহা হউক সদাগরভিন্ন এ দৃশ্য অপর কেহ দেখে নাই। সাধু সিংহলে গেলে সিংহলরাজ তাহাকে যথেষ্ট আদর ও প্রীতি দেখাইলেন। কিন্তু সদাগরের মুখে কমলবনে কমলিনীর হস্তী গিলিবার কথা শুনিয়া কাহারও প্রত্যয় হইল না।* রাজা ও সাধুর মধ্যে অঙ্গীকার পত্রের বিনিময় হইল, এই কমলবনের দৃশ্য দেখাইতে পারিলে রাজা তাঁহাকে অর্দ্ধরাজ্য

---

* শ্রদ্ধাভাজন রবীন্দ্রনাথ এই আখ্যানটি লইয়া মুকুন্দরামের সৌন্দর্য্যকল্পনায় খুঁত বাহির করিয়াছেন। এমন অসীম সমুদ্রের শোভা; এমন সুন্দর পদ্মবন, তন্মধ্যে এমন সুন্দরী রমণীমূর্ত্তি, এক মাত্র হস্তী গ্রাস করিবার বীভৎস কল্পনায় সৌন্দর্য্যের চিত্রখানি কবি একবারে কুৎসিত করিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু চণ্ডীকাব্য ধর্ম্ম-কাব্য, এই আখ্যান বর্ণিত চণ্ডীই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য ও একান্ত আরাধ্য দেবতা। গজগ্রাসশীলা চণ্ডী দেবীর প্রসঙ্গ বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়, পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত চণ্ডীকাব্যে দেবীর এই মূর্ত্তিই বর্ণিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত পূজামণ্ডপে ভাস্করহস্তে এই ভাবের মূর্ত্তিই গঠিত হইয়া পূজিত হইত; কবি এই মূর্ত্তিকে স্বীয় তুলি দ্বারা সংস্কার করিতে অধিকারী ছিলেন না। গণেশের শুণ্ড বর্জ্জন করিয়া তাঁহার দন্তের সঙ্গে মুক্তা কি দাড়িম্ববীজের উপমা দেওয়াও যেরূপ হাস্যকর হয়, এস্থলে কবির স্বীয় কল্পনাদ্বারা দেবীর মূর্ত্তি সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত করিবার চেষ্টাও তদ্রূপই হাস্যকর হইত।

দিবেন, নতুবা সাধু যাবজ্জীবনের জন্য বন্দী হইবে। সাধু রাজাকে লইয়া কালীদহে সেই দৃশ্য আর দেখিল না—এই উপলক্ষে সাধুর নৈরাশ্যসূচক সংগীত "এ যে ছিল, কোথায় গেল, কমলদল বাসিনী। লোকলাজ ভয়ে বুঝি লুকালো শুভবদনী।" আমরা অশ্রুপূর্ণচক্ষে যাত্রায় শুনিয়াছি। সাধুর যাবজ্জীবন কারাবাসের হুকুম হইল। কারাগারে চণ্ডী স্বপ্ন দেখাইয়া ইঙ্গিতে জানাইলেন—আমার পূজা করিলে তোর এ দুর্গতি মোচন হইবে। কিন্তু সাধু উত্তরে বলিল,—"যদি বন্দীশালে মোর বাহিরায় প্রাণী। মহেশ ঠাকুর বিনে অন্য নাহি জানি।"

এদিকে বাড়ীতে খুল্লনার এক পুত্র জন্মিল। প্রসব সময়ে লহনা নিজে বাজারে যাইয়া ধাত্রী ডাকিয়া আনিল ও খুল্লনার শুশ্রূষা করিতে কোনরূপ ত্রুটী করিল না। মালাধর নামক গন্ধর্ব্ব শিবের শাপে খুল্লনার গর্ভে শ্রীমন্ত হইয়া জন্ম লইলেন। শিশুটি বড় সুন্দর—"সাত আট যায় মাস, দুই দন্ত পরকাশ।" বালক সেই অর্দ্ধোদ্গত দন্ত দেখাইয়া নানা ভাবে হাসে ও ক্রীড়া করে; পঞ্চবর্ষ বয়সে শ্রীমন্ত ভাগবত শুনিয়া সহচরগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ অনুষ্ঠিত খেলাগুলি খেলিতে লাগিল। কিন্তু শ্রীমন্ত বড় চঞ্চল। সহচর শিশুগুলি খুল্লনার নিকট নালিশ করিতেছে,—"করিয়া ক্রন্দন, বলে শিশুগণ, শুন গো শ্রীমন্তের মা। তোমার তনয়, মারয় সবায়, দেখ দেখ মারণের ঘা॥ সব শিশু মিলি, এক সঙ্গে দেখি, শ্রীমন্ত বড় দুরন্ত। দারুণ চাপড়ে, সব দন্ত নড়ে, লাঘবের নাহি অন্ত॥ ভুবন কিরণা, দুই ভাই কাণা, চক্ষে দিল বালি গুঁড়া। যদব মাধব, দুভাই নীরব, দাম্বেণে হৈল খোড়া॥ খুল্লনা ঝাড়িয়া ধূলা, দিল হাতে নাড়ু কলা, তৈল দিল সর্ব্বগায়॥" ইত্যাদি। কবি জানিতেন, ক্রীড়াশীল অশান্ত ছেলেগুলি শেষে ভাল হয়; শ্রীকৃষ্ণজীবনের অশান্তপনার মাধুর্য্য হইতে বঙ্গের গৃহে গৃহে এই বিশ্বাস দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছে। ইহার পর শ্রীমন্ত পড়িতে গেল; পিঙ্গল কৃত ছন্দের ব্যাখ্যা, মাঘ, ভারবি, জৈমিনিভারত, প্রসন্নরাঘব প্রভৃতি পুস্তকে অল্পদিনের মধ্যে তাঁহার বিশেষ অধিকার হইল।

শ্রীমন্তের জন্ম ও শৈশব।

একদিন তিনি গুরুকে জিজ্ঞাসা করিলেন;—পূতনা, অজামিল ইহারা গর্হিত আচরণ করিয়াও মুক্তি পাইল, কিন্তু শূর্পণখার মুক্তি হইল না কেন, তাহার কেবল নাক কাণই কাটা গেল! "নবধা ভক্তির মধ্যে আত্মদান বড়।" সে ত এই আত্মদান করিতে চাহিয়াছিল। গুরু উত্তরে বলিলেন, "এ সকল শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা।" কিন্তু শ্রীমন্ত এই উত্তরে সন্তুষ্ট না হইয়া গুরুর প্রতি ঈষৎ পরিহাস-সূচক বাক্য প্রয়োগ করিলেন।

গুরু ও শিষ্য।

গুরু রাগে ক্ষেপিয়া গেলেন ও শ্রীমন্তকে নিতান্ত অসঙ্গত বাক্যে গালি দিতে লাগিলেন। শ্রীমন্ত গুরুর কুব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া উচিত উত্তর দিতে বিরত হন নাই, কিন্তু তাঁহার মাতার চরিত্র সম্বন্ধে কটাক্ষপাত করাতে শ্রীমন্ত ক্রোধে দুঃখে বাড়ীতে যাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সেই দিন তরুণবয়স্ক শ্রীমন্ত পিতার অনুসন্ধানে সিংহল-যাত্রার

সিংহল-যাত্রা।

দৃঢ় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। রাজার অনুরোধ, মাতার কাতরতা কিছুতেই তাঁহাকে বিরত করিতে পারিল না। পুনরায় সাত ডিঙ্গা শ্রীমন্তকে লইয়া সিংহলাভিমুখে যাত্রা করিল।

আবার সেই নীল জলরাশির মধ্যে সেই সেই ঘটনা, কালীদহে আশ্চর্য্য কমলবন, সিংহলাধিপের নিকট যাইয়া সেই বৃত্তান্ত বলাতে সভাসদগণ ও রাজার অপ্রত্যয়; এবার এই পণ স্থির হইল—যদি শ্রীমন্ত কমলবন দেখাইতে পারেন, তবে রাজা তাঁহাকে অর্দ্ধরাজ্য ও নিজ কন্যা দিবেন, নতুবা দক্ষিণ মশানে তাঁহার শির কর্ত্তিত হইবে। শ্রীমন্ত রাজাকে লইয়া যাইয়া কমলবন দেখাইতে পারিলেন না, সুতরাং দক্ষিণ মশানে তাঁহার শিরশ্ছেদ হওয়ার উদ্যোগ হইল। স্নান করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীমন্ত জীবনের শেষে পিতা ও মাতা প্রভৃতির উদ্দেশে তর্পণ করিতে লাগিলেন; চক্ষের জলের সঙ্গে তর্পণের জল মিশিয়া গেল,—'তর্পণের জল লহ পিতা ধনপতি। মশানে রহিল প্রাণ বিড়ম্বে পার্ব্বতী॥ তর্পণের জল লহ খুল্লনা জননী। এ জনমের মত ছিরা মাগিল মেলানি॥ তর্পণের জল লহ খেলাবার ভাই। উজানী নগরে আর দেখা হবে নাই॥ তর্পণের জল লহ দুর্ব্বলা পুষিণী। তব হস্তে সমর্পণ করিনু জননী॥ তর্পণের জল লহ জননীর মা। উজানী নগরে আমি আর যাবনা॥ তর্পণের জল লহ লহনা বিমাতা। তব আশীর্ব্বাদে মোর কাটা যাবে মাথা॥ সবাকারে সমর্পেণ আপন জননী। এ জনমের নত ছিরা মাগিল মেলানি॥"

মশানে শ্রীমন্ত।

ইহার পরে নিবিষ্ট মনে শ্রীমন্ত ভগবতীর চৌত্রিশ অক্ষরা স্তব করিতে লাগিলেন। এই উপলক্ষে শ্রীমন্তের নৌকার বাঙ্গাল মাঝিগণের দুর্দ্দশা বর্ণনায় কবি বেশ পরিহাস-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন—"বাঙ্গাল কাঁদেরে হুড়ুর বাপই। কুক্ষণে আসিয়া প্রাণ বিদেশে হারাই॥ * * * আর বাঙ্গাল বলে বাই হইল অনাথ। হর্ব্বধন গেল মোর হকুতার পাত॥ আর বাঙ্গাল বলে বাই কইতে বড় লাজ। অলদি গুড়ি ব্যাসা গেল জীবনে কি কাজ॥ যুবতী যৌবনবতী ত্যজিলাম রোষে। আর বাঙ্গাল বলে দুঃখ পাই গ্রহদোষে॥ ইষ্ট মিত্র কুটুম্বের লাগে মায়া মো। আর বাঙ্গাল বলে না দেখিনু মাগু পো॥"

বাঙ্গালদের কাতরোক্তি।

বাঙ্গালগণকে লইয়া বিদ্রূপ বঙ্গসাহিত্যে এই প্রথম নহে; চৈতন্যপ্রভু এবিষয়ে প্রধান পাণ্ডা ছিলেন—চৈতন্যভাগবতাদি গ্রন্থে দেখা গিয়াছে।

ইহার পরে চণ্ডীদেবী আসিয়া শ্রীমন্তকে কোলে লইয়া বসিলেন। রাজার সৈন্যগণ চণ্ডীর ভূত-প্রেতের হাতে মার খাইয়া পলাইল; রাজা সসৈন্যে পারস্ত হইলেন। চণ্ডীর কৃপায় তিনি আশ্চর্য্য কমলবন দেখিলেন; পিতা পুত্রে মিলন

চণ্ডীর কৃপা।

* তর্পণের অংশ ও এই অংশ হস্তলিখিত পুস্তকে ঠিক এই ভাবে নাই। বটতলার পুস্তক হইতে উদ্ধৃত হইল।

হইল; শ্রীমন্ত রাজকন্যা সুশীলার পাণিগ্রহণ করিলেন। যখন পিতা পুত্র বাড়ীতে ফিরিতে ইচ্ছুক, তখন সুশীলা স্বামীকে সিংহলে আর একটি বৎসর থাকিতে প্রার্থনা করিল; এই উপলক্ষে সিংহলের বারমাসের সুখ বর্ণিত হইয়াছে, রাজকন্যা স্বামীকে সিংহলী সুখের চিত্র দেখাইয়া প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছেন,—বৈশাখে—"চন্দনাদি তৈল দিব সুশীতল বারি। সাঙালি গামছা দিব ভুষা কস্তুরি।" জ্যৈষ্ঠে—"পুষ্পশয্যা করিব দিব চাঁদোয়া টানায়ে। হাস্য পরিহাসে যাবে রজনীবাহিরে॥ আষাঢ়ে—দেখহ ঘন নাচয়ে ময়ূর। নবজলধর দৃষ্টে ডাকয়ে দাদুর॥ শুন, প্রাণনাথ তুমি শুন প্রাণনাথ। নিদাঘে শীতল বড় তরুণীর হাত॥" শ্রাবণে—"বিদেশ ত্যজিয়া লোক আইসে নারী পাশে। কেমনে কামিনী ছাড়ি যাবে পরবাসে॥" ভাদ্রে—"মশা নিবারিতে দিব পাটের মশারি। চামর বাতাস দিব হয়ে সহচরী; মধুঘরে প্রাণনাথ করাইব বাস। আর না করিহ প্রভু উজানীর আশ॥" ফাল্গুনে—"ফুটিবে পুষ্প মোর উপবনে। তথি দোলমঞ্চ আমি করিব রচনে॥ সখী মিলি গাব সবে বসন্তের গীত। আনন্দিত হয়ে গাব কৃষ্ণের চরিত।" চৈত্র মাসে—"মালতী মল্লিকা চাঁপা বিছাইব খাটে। মধুপানে গোঙাইব সদা গীত নাটে॥" কিন্তু এই সকল সুখের চিত্র মাতৃদর্শনব্যাকুল পুত্রকে প্রলুব্ধ করিতে পারিলনা। পিতা, পুত্র বাড়ী গেলেন, পথে ধনপতি জলমগ্ন ডিঙ্গাগুলি চণ্ডী-কৃপায় ফিরিয়া পাইলেন; তিনি চণ্ডী-পূজা করিতে সম্মত হইলেন।

সুশীলার বারমাস্যা।

বাড়ী আসিয়া কমলবনে আশ্চর্য্য রমণীমূর্ত্তি দেখাইয়া শ্রীমন্ত দেশীয় রাজাকেও মুগ্ধ করিলেন এবং তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিলেন।

শেষ।

যথাকালে শাপভ্রষ্ট ব্যক্তিগণ স্বর্গে ফিরিয়া গেলেন। পৃথিবীতে চণ্ডীর পূজা প্রচারিত হইল।

চণ্ডীকাব্যের পূর্ব্বভাগে শিব-বিবাহাদি বর্ণিত হইয়াছে; এই অংশ নানা কবি নূতন করিয়া গঠন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন—ভারতচন্দ্রের অনুকরণটি তন্মধ্যে বিশেষ প্রশংসা যোগ্য হইয়াছে। কিন্তু এক শ্রেণীর কবির কথার লালিত্যে কর্ণ মুগ্ধ হইয়া যায়, অপর এক শ্রেণীর ভাবের উচ্ছ্বাসে হৃদয় তৃপ্ত হয়; শুধু শব্দের মাধুর্য্য যে সকল পাঠকের নিকট কাব্যের উৎকর্ষের একমাত্র মানদণ্ড নহে, তাঁহাদের নিকট মুকুন্দরামের "কামভস্ম", "শিববিবাহ" প্রভৃতি অংশ গাঢ় রসের আকর বলিয়া বোধ হইবে; তিনি ভারতচন্দ্রের—"পতি শোকে রতি কাঁদে, বিনাইয়া নানা ছাঁদে, ভাসে চক্ষু জলের তরঙ্গে।" প্রভৃতি উচ্ছ্বলিত কামকলাপূর্ণ পদ বিন্যাস ফেলিয়া সেই প্রসঙ্গে মুকুন্দরামের রতির,—"মোর পরমায়ু লয়ে, চিরকাল থাক জিয়ে, আমি মরি তোমার বদলে।" প্রভৃতি সরল উক্তির মধ্যে প্রকৃত শোকের তীব্রত্ব বেশী অনুভব করিবেন। যাঁহারা শুধু ভাষার মিষ্টত্বের খোঁজ করেন, তাঁহারা জয়দেব ও ভারতচন্দ্র পাঠ করুন, চণ্ডীদাস ও কবিকঙ্কণের কবিতা স্বাদ করিবার অধিকার তাঁহাদের নাই।

কবির ভাবের প্রগাঢ়তা।

শিবায়ন।

শিবের গীত বঙ্গসাহিত্যে অতি প্রাচীন বিষয়। ১১শ শতাব্দীতে রচিত শূন্যপুরাণে শিবের গান আছে, ভাষায় নমুনা এইরূপ—

"যখন আছেন গোসাঞি হঞা দিগম্বর।
ঘরে ঘরে ভিখা মাগিয়া বুলেন ঈশ্বর॥
রজনী পরভাতে ভিকখার লাগি যাই।
কুথাএ পাই ভিক্ষা কুথাএ না পাই॥
হত্তুকী বএড়া তাহে করি দিনপাত।
কত হরব গোসাঞি ভিকখাও ভাত॥
আহ্মার বচনে গোসাঞি তুহ্মি কর চাষ।
কখন অর্দ্ধ হএ গোসাঞি কখন উপবাস॥
পুখরী কাঁদাএ লইব ভুমখানি।
অরসা হইলে যেন ছিচএ পানি॥
আর সব কিঁষাণ কাঁদিব মাথে হাত দিয়া।
পরম ইচ্ছাএ ধান্য আনিব দাইআ॥
ঘরে ধান্য থাকিলে পরভু সুখে অন্ন খাব।
অন্নর বিহনে পরভু কত দুঃখ পাব॥
কাপাষ চষহ পরভু পরিব কাপড়।
কত না পরিব পরভু কেওদা বাঘের ছড়॥"

এই রচনাটি জনৈক সুবিখ্যাত য়ুরোপীয় সাহিত্যিককে দেখাইয়াছিলাম। প্রাচীন বাঙ্গালার নমুনা-স্বরূপ নির্ব্বিচারে এই অংশটি দেখান হইয়াছিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয়, তিনি উদ্ধৃতাংশের অনুবাদ পড়িয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া রহিলেন, তিনি বলিলেন এমন সুন্দর কবিতা তিনি কল্পনা করিতে পারেন না; ইহা চাষার গান নহে—ইহা ভক্তের উচ্চাঙ্গের সাধনা মাত্র। সেই স্থলে অপর একটি য়ুরোপীয় সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলেন; তিনি এই কবিতার প্রশংসা করিয়া আমাকে বিস্ময়াবিষ্ট করিয়া তুলিলেন; তাঁহারা এই গীতে যে গুণের আবিষ্কার করিলেন, তাহা সংক্ষেপে লিখিতেছি, এখানে ভক্ত তাহার আরাধ্যের নিকট কিছুই চাহিতেছে না, সচরাচর প্রার্থনায় নানারূপ ভিক্ষা থাকে,—ইহাতে তাহার কিছুই নাই। পরম ভক্ত নিজের সুখ দুঃখ ভুলিয়া আরাধ্যের সুখ দুঃখের কথায় আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছে। প্রভু তুমি প্রাতে উঠিয়া ভিক্ষায় বাহির হও, কোথায়ও কিছু পাও, কোথায়ও বা কিছুই পাও না, হরতকী বা বয়ড়া ফল খাইয়া দিন কাটাইয়া দাও, প্রভু তোমার কত কষ্ট! যেদিন চারটি ভাত

পাও, সেদিন তোমার কত আনন্দ। তোমার এত দুঃখ আর দেখিতে পারি না, তুমি চাষ কর, যে ভাবে চাষ করিতে হইবে, তাহা বলিয়া দিতেছি, পুকুরের ধারে জমিটি লইবে, যেহেতু যদি জমিতে জল না থাকে তবে যেন পুকুর হইতে জল সেঁচিয়া আনিতে পার ; প্রভু ধান্য হইলে নিজের ঘরের ভাত কত সুখে খাইবে। আর একটা কথা, কত আর কেঁদো বাঘের ছাল পরিয়া থাকিবে ? কার্পাসের চাষ করিয়া তুলা বাহির-কর। তাহা হইলে কাপড় পরিতে পাইবে।"

দিগম্বর ভিখারীর দুঃখে ভক্তের মন গলিয়া গিয়াছে, নিজের সুখ দুঃখের চিন্তা বিসর্জ্জন করিয়া আরাধ্যের দুঃখে কাতর হইয়া এমন করিয়া আর কে কাঁদিয়াছে!

সুতরাং দেখা যাইতেছে এই সকল গ্রাম্য-গীতির সরল-উক্তির মধ্যে গভীর ভক্তি সঞ্চিত আছে। তাহা আস্বাদন করিবার যোগ্য পাঠক চাই।

শিবপ্রসঙ্গ।

আমরা রতিদেব ও রঘুরামরায়কৃত "মৃগলুব্ধের" কথা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। এই পুস্তক ১৬৭৪ খৃ অব্দে রচিত। কালে শিববিবাহাদি ব্যাপার স্বতন্ত্র কাব্যের বিষয় না হইয়া প্রাচীন অনেকগুলি কাব্যের অংশীভূত হইয়া পড়িয়াছিল। পদ্মপুরাণ ও চণ্ডীকাব্যগুলিতে "শিবের বিবাহ", "হরগৌরী-কোন্দল" প্রভৃতি গ্রন্থারম্ভে বর্ণিত হইতে দেখা যায় এমন কি, খাঁটি কৃত্তিবাসের রচনা বলিয়া যে উত্তরকাণ্ড রামায়ণ সাহিত্যপরিষৎ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেও শিবলীলা বর্ণিত হইয়াছে। এই শিবপ্রসঙ্গও কবিগণের উপর্য্যুপরি চেষ্টায় সুন্দররূপে বিকাশ পাইয়াছে। বৃদ্ধ ও তরুণীকে এক গৃহস্থালীর হালে জুড়িয়া দিলে যে সব দুর্গতি ঘটে, তাহা নির্ম্মল হাস্যের সহিত দর্শন করিয়া রামেশ্বর প্রভৃতি কবিগণ শিবপ্রসঙ্গ উপলক্ষে কয়েক খানি কৌতুককর চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন।

প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র একখানি শিবায়ন প্রণয়ন করেন। ইহার পরে দ্বিজ হরিহরের পুত্র শঙ্কর নামক কবিকৃত 'বৈদ্যনাথমঙ্গল' বিরচিত হয়। এই পুস্তকখানিও আকারে বৃহৎ। শিবপার্ব্বতীর ঝগড়া, শিবের চাষ-আবাদের কথা, বর্ষারম্ভে ভগবতীর বিরহ, এবং মশা, জোঁক, প্রভৃতি উৎপাতের সৃষ্টি করিয়া শিবঠাকুরকে ধান্যক্ষেত্র হইতে কৈলাসের কুঞ্জবনে আনিবার চেষ্টা, অকৃতকার্য্য হইয়া পার্ব্বতীর বাগ্দিনীবেশে শিবকে প্রতারণা করিবার চেষ্টা, বাগ্দিনীর প্রতি অনুরাগ, এবং তাহার পাণিগ্রহণের চেষ্টায় ভগবতীর ভীষণ ক্রোধ, নারদের যত্নে দম্পতীর ক্রোধশান্তি এবং মিলন, শিবের নিকট পার্ব্বতীর শঙ্খ পরিবার ইচ্ছা প্রকাশ, গৃহের অস্বচ্ছলতা নির্দ্দেশ করিয়া শিবের সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান, পার্ব্বতীর অভিমান এবং পিত্রালয়ে গমন, শাঁখারি বেশে শিবের হিমালয় যাত্রা এবং পার্ব্বতীর হস্তে শাঁখা পরান, উভয়ের পুনর্ম্মিলন প্রভৃতি প্রসঙ্গ প্রায় সমস্ত শিবায়ন বা শিবমঙ্গলে বিবৃত হইয়াছে। কাব্যাংশে শঙ্করকৃত

'বৈদ্যনাথমঙ্গল' দ্বিজ ভগীরথের 'শিবগুণ-মাহাত্ম্য' এবং রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্রের 'শিবায়ন' হীন না হইলেও, বোধ হয়, বটতলার আশ্রয়লাভ করিয়াই অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে রচিত রামেশ্বর ভট্টাচার্য্যের 'শিবায়ন'খানিই বঙ্গদেশে বিশেষ প্রচারলাভ করিয়াছে।

রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য-ভট্টনারায়ণ বংশোদ্ভূত। ইঁহার প্রপিতামহের নাম নারায়ণ, পিতামহের নাম গোবর্দ্ধন, পিতার নাম লক্ষ্মণ ও মাতার নাম রূপবতী। বরদাপরগণার অন্তর্গত যদুপুরগ্রামে রামেশ্বর ভট্টাচার্য্যের পূর্ব্বনিবাস ছিল; তিনি এই যদুপুরে বাস করার সময় "সত্যপীরের কথা" রচনা করেন; "পরে সত্যপীর বন্দী কহে কবি রাম। সাকীন বরদাবাটী যদুপুর গ্রাম॥" শেষে কবি মেদিনীপুরের অন্তর্গত কর্ণগড়ের রাজা যশোবন্ত সিংহের সভাসদ হইয়া উক্ত পরগণাস্থিত অযোধ্যাবাড় গ্রামে বাস স্থাপন করেন। যশোবন্ত সিংহের উৎসাহে তিনি "শিব-সংকীর্ত্তন" কাব্য রচনা করেন। গ্রন্থের অনেক স্থলেই যশোবন্তসিংহের যশঃ প্রচারিত হইয়াছে; সেই সকল পদে জানা যায়, যশোবন্তসিংহের পিতামহের নাম রঘুবীর, পিতার নাম রামসিংহ ও পুত্রের নাম অজিতসিংহ; যশোবন্তসিংহ ১৮৩৪ খৃঃ অব্দে ঢাকার দেওয়ানী পদ প্রাপ্ত হন। রামেশ্বর ভট্টাচার্য্যের শিবায়নের ১৭৬১ খ্রীঃ অঃ লিখিত একখানি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং শিবায়ন ঐ সময়ের পূর্ব্বেই রচিত হইয়াছিল। কবির দুই স্ত্রী ছিল, এক জনের নাম সুমিত্রা ও অপরের নাম পরমেশ্বরী; এতদ্ব্যতীত তাঁহার দুই ভ্রাতা শম্ভুরাম ও সনাতন—পার্ব্বতী, গৌরী ও সরস্বতী এই তিন ভগিনী ও দুর্গাচরণাদি ছয় ভাগিনেয়ের কথাও তিনি আমাদিগকে জানাইয়াছেন।

কাব্যবর্ণিত বিষয়।

অন্যান্য পৌরাণিক কাব্যের ন্যায় শিবসংকীর্ত্তনের দেবদেবীর বন্দন', সৃষ্টিপ্রকরণ, দক্ষযজ্ঞ প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে, এতদ্ভিন্ন ইহাতে রুক্মিণীব্রত, বাণরাজার উপাখ্যান, প্রভৃতি বিষয়ের প্রাসঙ্গিক বর্ণনা আছে। বাগ্দিনীরূপে গৌরীর শিবকে প্রতারণার স্থলটি রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় কবির স্বকপোলকল্পিত মনে করেন; কিন্তু আমরা এই গ্রন্থের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী বিজয়গুপ্তের পদ্মপুরাণে ভগবতীর ডোমিনীরূপে শিবকে প্রতারণা করিবার বিষয় পাঠ করিয়াছি। পূর্ব্বকালে পৌরাণিক বিষয়গুলি লইয়া অক্ষরজ্ঞ অনেক ব্যক্তিই কবিতা রচনা করিতেন, উপাখ্যানভাগের কোন্ অংশগুলি কোন্ কবি দ্বারা প্রথম কল্পিত হয়; তাহা খুঁজিতে যাওয়া এবং আঁধারে লোষ্ট্রনিক্ষেপ করা একইরূপ কাজ।

শিবায়নে হাস্যরস।

রামেশ্বরের রচনা অতিরিক্ত অনুপ্রাস-দোষ দুষ্ট, কিন্তু অনেক স্থলে নিবিড় অনুপ্রাস ভেদ করিয়া বেশ একটু স্বাভাবিক হাস্যরসের খেলা দৃষ্ট হয়। রামেশ্বর কোন গভীর ভাব উদ্রেক করিতে চেষ্টা করেন নাই, এজন্য তিনি কখনই খুব বড় কবি বলিয়া পরিচিত হইবেন না। কিন্তু "শিবসংকীর্ত্তনের" আদ্যন্ত কবির মার্জ্জিত মৃদুহাস্যের রশ্মিতে

সুন্দর। কার্ত্তিক, গণেশ প্রভৃতিকে লইয়া শিব আহার করিতে বসিয়াছেন—এই উপলক্ষে কবি রহস্যের কুটিল আলোতে অন্নপূর্ণা গৃহিণীর সুন্দর মূর্ত্তি দেখাইয়া লইয়াছেন—

তিন ব্যক্তি ভোক্তা একা অন্ন দেন সতী। দুটি সুতে সপ্ত পঞ্চ-মুখ পতি॥ তিন জনে একুনে বদন হ'ল বার॥ গুটি গুটি দুটি হাতে যত দিতে পার॥ তিন জনে বার মুখ পাঁচ হাতে খায়। এই দিতে এই নাই এই হাঁড়ি পানে চায়। শুক্তা খেয়ে ভোক্তা চায় হস্ত দিয়া নাকে। অন্নপূর্ণা অন্ন আন রুদ্রমূর্ত্তি ডাকে॥ গুহ গুণপতি ডাকে অন্ন আন মা। হৈমবতী বলে বাছা ধৈর্য্য হয়ে খা॥ মুষিকী মায়ের বাক্যে মৌনী হয়ে রয়। শঙ্কর শিখায়ে দেন শিখিধ্বজ কয়॥ রাক্ষস ঔরসে জন্ম রাক্ষসীর পেটে। যত পাব তত খাব ধৈর্য্য হব বটে॥ হাসিয়া অভয়া অন্ন বিতরণ করে। ঈষদুষ্ণ সূপ দিল বেসারীর পরে॥ লম্বোদর বলে শুন নগেন্দ্রের ঝি। সূপ হল সাঙ্গ আন আর আছে কি? দড়বড় দেবী এনে দিল ভাজাদশ। খেতে খেতে গিরিশ গৌরীর গান যশ। সিদ্ধিফল কোমল ধুতুরা ফল ভাজা॥ মুখে ফেলে মাথা নাড়ে দেবতার রাজা॥ * * * * দিতে দিতে গতায়াতে নাহি অবসর। শ্রমে হলো সজল কোমল কলেবর॥ ইন্দু মুখে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্মবিন্দু সাজে। মৌক্তিকের শ্রেণী যেন বিদ্যুতের মাঝে॥" অন্নদানে গৃহিণীর এ আনন্দের ছবি এখন শিল্পশিক্ষা এবং উন্নত সাহিত্যিকরসপিপাসু রমণীবর্গের নিকট ভাল বোধ হইবে কিনা জানি না। বৃদ্ধ স্বামীর লাঞ্ছনা শাঁখা পরার প্রসঙ্গে বেশ সুন্দররূপ বর্ণিত হইয়াছে; দেবী দু'গাছি শাখা চাহিয়াছিলেন; শিব তাহা দিতে অসমর্থ, নিজের বাড়ীর অবস্থা সম্বন্ধে দেবীকে অনেক কথা বলিয়া শিব কিছু শ্লেষ সহকারেব লিলেন—"বাপ বটে বড় লোক বল গিয়া তারে। জঞ্জাল ঘুচুক যাও জনকের ঘরে॥" এই কথা দ্বারা শিব দেবীকে ভয় দেখাইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু দেবী তাহার শোধ তুলিলেন,—"দণ্ডবৎ হইয়া দেবের দুটি পায়। কান্তসনে ক্রোধ করি কাত্যায়নী যায়॥ কোলে করি কার্ত্তিকেরে, হস্তে গজানন। চঞ্চল চরণে হৈলা চণ্ডীর চলন॥ গোড়াইল গিরিশ গৌরীর পাছু পাছু। শিব ডাকে শশিমুখী শুনে নাই কিছু॥ নিদান দারুণ দিব্য দিলা দেবরায়। আর গেলে অম্বিকা আমার মাথা খাও। করে কর্ণ চাপিয়া চলিল চণ্ডবতী। ভাসিল ভাইয়ের কিরা ভবানীর প্রতি॥ ধাইয়া ধূর্জ্জটি গিয়া ধরে দুটি হাতে। আড় হইয়া পশুপতি পড়িলেন পথে॥ "যাও যাও যত ভাব জানা গেল" বলি। ঠেলিয়া ঠাকুরে ঠাকুরাণী গেলা চলি॥ চমৎকার চন্দ্রচূড় চারিদিকে যায়। নিবারিতে নারিয়া নারদ পাশে যায়॥ রামেশ্বর ভাবে ঋষি দেখ বসে কি। পাথারে ফেলিয়া গেলা পর্ব্বতের ঝি॥" এই "পাথারে ফেলিয়া গেলা পর্ব্বতের ঝি॥" ছত্রে তরুণী ভার্য্যার শ্রীপাদ-পদ্মে বিক্রীত বৃদ্ধ গৃহস্থের মহাবিপদ হৃদয়ঙ্গম করিয়া আমরা একটু কৌতুক ও হাস্য উপভোগ করিয়া লইয়াছি।

রামেশ্বরের সত্যপীর

বহুদিন একত্রবাসনিবন্ধন হিন্দু ও মুসলমানগণ পরস্পরের ধর্ম্মসম্বন্ধে কতকটা উদারভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন। সত্যপীর নামক মিশ্রদেবতার পূজা সেই উদারতার ফল। হরিঠাকুর এই উপলক্ষে ফকিরী আলখাল্লা গায় পরিয়াছেন ও ঊর্দ্দু জবানে বক্তৃতা দিতেছেন;—"বিশ্বনাথ বিশ্বাসে বুঝায়ে বলে বাছা। দুনিয়ামে এসাভি আদমি রহে সাঁচা॥

ভালা বাওয়া কাহে তেরা মৃত্যুকাল কাছে। রাত দিন যৈসা তৈসা সুখ দুঃখ হোয়ে। জানা গেও বাত বাওয়া জান 'গল বাত। কাপড়াত লেও আও মেরা সাথ॥ জাওত সত্যপীর মেরা জাওত সত্যপীর। তেরা দুঃখ দূর করতওা হাম ফকির॥"

মনসাদেবীর ভাসান রচকগণ।

মনসাদেবীর সম্বন্ধে আখ্যানটির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। কাণা হরিদত্ত, নারায়ণদেব এবং বিজয়গুপ্ত প্রভৃতি আদিলেখকগণের দলে একদল নূতন কবি ভর্ত্তি হইলেন। এ পর্য্যন্ত আমরা মনসার ভাসানরচক ৬২ জন কবির নাম জানিয়াছি, তাহা নিম্নে প্রদান করিতেছি ;—

মনসার ভাসান লেখকবর্গ।
কেতকাদাস ও ক্ষেমানন্দ।

১। কাণাহরিদত্ত, ২। নারায়ণদেব, ৩। বিজয়গুপ্ত, ৪। রঘুনাথ, ৫। যদুনাথ পণ্ডিত, ৬। বলরাম দাস, ৭। জগন্নাথসেন, ৮। বংশীধর, ৯। দ্বিজবংশীদাস, ১০। বল্লভঘোষ, ১১। বিপ্র-হৃদয়, ১২। গোবিন্দদাস, ১৩। গোপীচন্দ্র, ১৪। বিপ্রজানকীনাথ, ১৫। দ্বিজবলরাম, ১৬। কেতকাদাস, ১৭। ক্ষেমানন্দ, ১৮। অমুপচন্দ্র, ১৯। রাধাকৃষ্ণ, ২০। হরিদাস, ২১। কমলনয়ন, ২২। সীতাপতি, ২৩। রামনিধি, ২৪। কবিচন্দ্রপতি, ২৫। গোলোকচন্দ্র, ২৬। কবিকর্ণপুর, ২৭। জানকীনাথ দাস, ২৮। বর্দ্ধমান দাস, ২৯। ষষ্ঠীবর সেন, ৩০। গঙ্গাদাস সেন, ৩১। রাম-বিনোদ, ৩২। আদিত্য দাস, ৩৩। কমললোচন, ৩৪। কৃষ্ণানন্দ, ৩৫। পণ্ডিত গঙ্গাদাস, ৩৬। গুণানন্দ সেন; ৪৭। জগৎবল্লভ, ৩৮। বিপ্র জগন্নাথ, ৩৯। জগমোহন মিত্র, ৪০। জয়দেব দাস, ৪১। দ্বিজজয়রাম, ৪২। নন্দলাল, ৪৩। বাণেশ্বর, ৪৪। মধুসূদন দেয়, ৪৫। বিপ্ররতি দেব, ৪৬। রতিদেব সেন, ৪৭। রামকান্ত, ৪৮। দ্বিজরসিকচন্দ্র, ৪৯। রাজা রাজসিংহ (সুসঙ্গ), ৫০। রামচন্দ্র ৫১। রামজীবন বিদ্যাভূষণ, ৫২। বিপ্ররাম দাস, ৫৩। রামদাস সেন, ৫৪। দ্বিজবনমালী ৫৫। বনমালীদাস, ৫৬। বিপ্রদাস, ৫৭। বিশ্বেশ্বর, ৫৮। বিষ্ণুপাল, ৫৯। সুকবি দাস, ৬০। সুখদাস ৬১। সুদাম দাস, ৬২। দ্বিজহরিরাম।

এই মনসার ভাসানরচকদিগের মধ্যে কেতকাদাস—ক্ষেমানন্দের ক্ষুদ্র পুস্তকখানি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। পুস্তকখানি ২৭০০ শ্লোকে পূর্ণ, ও ইহার পদসংখ্যা ৬৬ ; তন্মধ্যে ২৬টি পদ কেতকা-দাসের ভণিতাযুক্ত, অবশিষ্ট ৪০টি ক্ষেমানন্দদাসের নামাঙ্কিত। মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে, পুস্তকের প্রথমার্দ্ধের, অর্থাৎ লখীন্দরের বিবাহপালা পর্য্যন্ত অধিকাংশস্থলে কেতকাদাসের, ও শেষার্দ্ধের অধিকাংশস্থল ক্ষেমানন্দের ভণিতাযুক্ত। ক্ষেমানন্দ করুণরসে ও কেতকাদাসের হাস্যরসে পটু। কবিত্ব দেখাইয়া পাঠকবর্গকে সন্তুষ্ট করা যায়, এরূপ অংশ মনসার ভাসানে বড় বিরল;

কিন্তু গল্পের আগাগোড়া পড়িলে পাঠকের চক্ষু মধ্যে মধ্যে অশ্রুপূর্ণ হইতে পারে, এবং বেহুলা সতীর সুন্দর রূপে চিত্ত মুগ্ধ হইয়া যায়। আমরা যখন এই পুথি প্রথম পড়িয়াছিলাম, তখন মানবী বেহুলাকে দেবী বলিয়া বোধ হইয়াছিল; বেহুলার পাতিব্রত্যের কথা পড়িতে পড়িতে ভাবিয়াছিলাম—বাঁধুলী, তিল ফুল ও চতুর্দ্দশীর চাঁদ দিয়া কবিগণ সচরাচর যে সব সুন্দরী সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তাহাদের অনেকে বেহুলার বাঁদী হইবার যোগ্যা নহে। শ্রাবণমাসে বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে সর্ব্বদা ভাসান—গান উপলক্ষে নৌকা লইয়া ক্রীড়া হইত; সেই সব গানের মূল লক্ষ্য ছিল বেহুলা;—সেই গীত নানা রাগ রাগিণীতে উজ্জ্বল হইয়া পল্লী-বধূগণের হৃদয়ে হৃদয়ে বেহুলা সতীর মূর্ত্তি অঙ্কিত করিত;—আমরা এখন রেবেকা ও কসেটির রূপে মুগ্ধ হইয়া ঘরের খাঁটি সোণার মূর্ত্তিকে পূজা করিতে ভুলিয়াছি।

বেহুলা-চরিত্র।

পূর্ব্ববর্ত্তী মনসার উপাখ্যানগুলির সঙ্গে তুলনা করিলে দৃষ্ট হইবে, কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দের পুঁথিতে চাঁদসদাগরের উন্নত চরিত্র কতকটা খর্ব্ব হইয়াছে, কিন্তু বেহুলার চরিত্র যেন আরও কতকটা বিকাশ পাইয়াছে।

কবিদ্বয়ের পরিচয়।

কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ সম্ভবতঃ কায়স্থ ছিলেন, একস্থলে কেতকাদাসের ভণিতায় সমস্ত কায়স্থ-কুলের প্রতি আশীর্ব্বাদসূচক—"কেতকার বাণী, রক্ষ ঠাকুরাণী, কায়স্থ যতেক আছে।" পাওয়া গিয়াছে' অপর এক স্থলে "ব্রাহ্মণ চরণে, ক্ষেমানন্দ ভণে দেবী যারে কৃপা কৈল।"—দৃষ্ট হয়, ইহা দ্বারা কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দের কায়স্থ জাতিত্ব প্রতীয়মান হয়। অন্য দুইটি পদ-দৃষ্টে বোধ হয়, ক্ষেমানন্দ দাসের রাজীব ও অভিরাম নামক দুই পুত্র ছিল—"ক্ষেমানন্দ কহে কবি রাজীবে রাখিবে দেবী॥" বেহুলার জলপথে ভ্রমণ-উপলক্ষে বর্দ্ধমান অঞ্চলের স্থান নির্দ্দেশ যথাযথ হইয়াছে, অন্য দেশের তদ্রূপ হয় নাই, সুতরাং কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ বর্দ্ধমানবাসী ছিলেন বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। এক স্থলে "ক্ষেমানন্দ বিরচিল স্মরিয়া ব্রাহ্মণী" পদে তিনি কোন ব্রাহ্মণীর শিষ্য ছিলেন এরূপ অনুমিত হয়।

কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দের আত্মবিবরণযুক্তি নিম্নলিখিত বিবরণটী পাওয়া গিয়াছে।

"শুন ভাই পূর্ব্ব কথা, দেবী হৈলা বরদাতা,
সহায় পূর্ব্বক বিষহরী।
বলিভদ্র মহাশয়, চন্দ্রহাসের তনয়,
তাঁহার তালুকে ঘর করি॥
তাহার রাজত্ব শেষ, চলি গেল স্বর্গদেশ,
তিন পুত্রে দিয়ে অধিকার।

শ্রীযুক্ত আস্কর্ণরায়, পুত্রের অধিক তায়,
রণে বনে বিজয়ী তাহার ॥
তিন পুত্র অল্প বয় প্রসাদ গুরুমহাশয়,
তালুকের করে লেখা পড়া।
তাহার তালুকে বৈসে, প্রজা নাই চাষ চসে,
শমন নগর হইল কাঁথড়া ॥
রণে পড়ে বারা খাঁ, বিপাকে ছাড়িল গাঁ,
যুক্তি করেন জনে জন।
দিন কত ছাড়িয়া জাই, তবে সে নিস্তার পাই,
সকলের তবে ভাল জান ॥
শ্রীযুত আস্কর্ণ রাএ, অনুমতি দিল তাএ,
যুক্তি দিল পালাবার তরে।
তার যুক্তি শুনি বাণী, পলাএ অনেক প্রাণী,
বড়ই প্রমাদ হৈল পুরে ॥
মনে ভাবি সবিস্ময়, বেলা আছে দণ্ড ছয়,
সঙ্গে লয়্যা অভিরাম ভাই।
অবসান হ'ল বেলা, গ্রামের উত্তর জলা,
খড় কাটিবারে তথা যাই ॥
তথায় ছাওাল পাঁচে, খোলা দিয়ে জল সিঁচে,
মৎস্য ধরে পঙ্কেতে ভূষিত।
আমার কৌতুক বড়, ছাওাল পাচেতে জড়,
সেইখানে হইলাম উপনীত ॥

* * *

মৎস্য লইআ অভিরাম, চলিল আপন ধাম,
যত শিশু গেল নিজ পুরে।

* * *

মুচিনীর বেশ ধরি, বলেন দেবী বিষহরী,
কাপড় কিনিতে আছে টাকা।
এতেক কহিয়া মোরে, কপট চাতুরী করে,
যত্নে একাইআ দেই টাকা ॥
বেষ্টিত ভুজঙ্গ ঠাটে অবতরি বাঘ মাঠে,
দেখি মোর মুখে উঠে ধুলা।

পাইলাম মনস্তাপ, দেখিলাম অনেক সাপ,
আমারে বেঢ়িল কথোগুলা।
জেরূপ দেখিলা নেতে, মানা কৈল প্রকাশিতে,
কহিলে না হব তোর ভাল।
ওরে পুত্র ক্ষেমানন্দ কবিত্বে কর প্রবন্ধ,
আমার মঙ্গল গাইআ বোল॥"

কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ এক কবিরই নাম হওয়া আশ্চর্য্য নহে, এই মনসা মঙ্গলেরই এক স্থানে দৃষ্ট হয়, যে, মনসাদেবীর এক নাম ছিল কেতকা,—যথা—

"বনের ভিতর নাম মনসা কুমারী
কেআ পাতে জন্ম হৈল কেতকা সুন্দরী॥"

মনসাভক্ত ক্ষেমানন্দ আপনাকে সম্ভবতঃ কেতকাদাস বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন।

যে বারা খাঁ * রণে পড়িল বলিয়া কবি আক্ষেপ করিয়াছেন সেই বারা খাঁ বর্দ্ধমান সিলিমাবাদ পরগণার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি ১৬৪০ খৃঃ অঃ (১০৪৭ বাং সনে) কবিকঙ্কণের পুত্র শিবরাম ভট্টাচার্য্যকে বিশ বিঘা মৌরসী জমী প্রদান করেন। কবিকঙ্কণের বংশধর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় উক্ত দান পত্র খানি কতকদিনের জন্য আমার নিকটে রাখিয়াছেন। ১৬০০ খৃঃ অব্দের পরে বারা খাঁ যুদ্ধে নিহত হন এবং তৎপর কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল বিরচিত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। ইহা ছাড়া কেতকাদাস—ক্ষেমানন্দ সম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব আমার ছাত্র শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ মহাশয় সংগ্রহ করিয়াছেন।

যে সমস্ত মনসামঙ্গল-রচয়িতার নাম উল্লেখ করা গেল, তাঁহাদের অধিকাংশই পূর্ব্ববঙ্গবাসী। ইহাদের মধ্যে রামজীবন বিদ্যাভূষণ ১৭০৩ খৃঃ অব্দে যে মনসামঙ্গলখানি প্রণয়ন করেন, তাহার রচনা বড়ই সরল এবং মধুর।

অপরাপর মনসার ভাসান-রচকদিগের রচনা অনেক স্থলে বেশ সুন্দর হইয়াছে; সকলগুলি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইবার স্থানাভাব। মনসা গোয়ালিনী-বেশে ধন্বন্তরির নিকট বিষাক্ত দধি বিক্রয় করিতে গিয়াছেন; তাঁহার শিষ্যগণের সঙ্গে গোয়ালিনী-রূপিনী দেবীর কৌতুককর কলহটি বর্দ্ধমান দাস কবির হস্তে বেশ সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে, আমরা নিম্নে তাহার কতকাংশ উদ্ধৃত করিলাম :—

বর্দ্ধমানদাসের কবিত্ব।

* বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত পলাশডাঙ্গা গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নয়নচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আমাদিগকে জানাইতেছেন, ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের পানাগড় ষ্টেশনের দুই মাইল দক্ষিণে সিমালপুর নামক গ্রামে বারা খাঁর সমাধি আছে। চাঁদ সদাগরের নিবাস-স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ চম্পাইনগর ঐ স্থান হইতে ৫ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত।

"কেমন তোমার স্বামী, পাঠায় তোমায় একাকিনী, গোয়ালা রহিল তোমার ঘরে। দরিদ্রের মত নয় ধন আছে জ্ঞান হয়, নানাবিধ আছে অলঙ্কারে॥ এত ধন যার আছে, সে কেন বা দধি বেচে, হাটে ঘাটে মাথায় পসরা। দুষ্ট জনে লাগ পায়, দধি ঘোল করে দেয়, কথা কহিতে মুখে মারে। তোমার নাহিক ভয়, দুষ্ট জন যদি হয় কাড়ি লয় লণ্ড ভণ্ড করে॥ * * * বলিয়া এ সব বোল, মুল্য করে দধি ঘোল, শিশু সব বড়ই চতুর। বৰ্দ্ধমান দাসে কয়, খেয়ে দেখ কেমন হয়, দধি মোর টক না মধুর॥ শিশুের বচন শুনি বলে গোয়ালিনী। এ দেশে এমন বিচার আমি নাহি জানি॥ রাজা চন্দ্রধর হয় দেশে অধিকার। এই দেশে নাহি জানি এমন বিচার॥ ভিন্ন দেশী আসিয়াছি দধি বেচিবার। পথে একা পেয়ে কেন পরিহাস কর॥ আমার জাতির ধৰ্ম্ম মাথার পসার। যাহার প্রসাদে মোর ভুঞ্জে পরিবার॥ বিনা দুঃখে কাহার কড়ি হয় উৎপত্তি। আমার সকল এই ঘরের সম্পত্তি॥ খাইয়া বেড়াও তুমি কহিতে না দেও ফুক। পরেরে বলিতে কি পরের লাগে দুঃখ * * বৰ্দ্ধমান দাস কহে কীৰ্ত্তি মনসার। হাস্য করে শিশুগণ বলে আর বার। তোমার জাতির বুঝি পুরাতন কড়ি। দুনা কড়ি লাগে দিব বেচ দধি হাঁড়ি॥ যত হাঁড়ি আছে তোমার সকল কিনিব। আগে দধি খেয়ে দেখি পাছে কড়ি দিব॥ * * * পসার ভাঙ্গিয়া তোমার হাঁড়ি করি চুরি। মোর ঠাঁই দেখাও তোমার হার কেউর॥ বৰ্দ্ধমানদাসে কয় কীৰ্ত্তি মনসার। ঘনাইয়া গোয়ালিনী বলে আরবার॥ * * যে জন আমার ধন দেখিতে না পারে। বিকাউক মোর ঠাঁই কিনিব তাহারে॥ শিশুগণ বলে মোরা যেই ধন চাই। সেই ধন পাই যদি তোমাতে বিকাই॥ বৰ্দ্ধমান দাস কহে কীৰ্ত্তি মনসার। ঘনাইয়া গোয়ালিনী বলে আরবার॥

গোপবধূর প্রসঙ্গে বৈষ্ণবকবিগণের দানলীলার পদ মনে হয়। বস্তুতঃ কবিগণ প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের সৰ্ব্বত্রই এই ভাবে বৈষ্ণব প্রসঙ্গের মাদকতা সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। হস্তলিখিত পুঁথিগুলির রচনা দৃষ্টে বোধ হয় কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ প্রভৃতি মনসার ভাসান-রচকগণ ৩০০ হইতে ২০০ বৎসর পূৰ্ব্বে এই উপাখ্যানগুলি রচনা করিয়াছিলেন।

বৈষ্ণব কবির প্রভাব।

ধৰ্ম্মমঙ্গল।

বৌদ্ধধৰ্ম্ম এদেশের নিম্ন শ্রেণীর হাতে পড়িয়া যে বিকৃত ভাব ধারণ করে, ধৰ্ম্মমঙ্গল কাব্যগুলি তাহার হিন্দু সংস্করণ। রামাইপণ্ডিতের পদ্ধতিতে বৌদ্ধভাবের যে স্পষ্ট পরিচয় আছে, পরবর্ত্তী ধৰ্ম্মকাব্যগুলিতে তাহা ক্রমেই তেত্রিশ কোটি হিন্দু দেবতার উঠন্ত প্রভাবের নীচে চাপা পড়িয়াছে, কিন্তু তথাপি স্বীকাৰ্য্য যে, ধৰ্ম্মমঙ্গল কাব্যগুলি বৌদ্ধ রাজা ও সাধুগণের মহিমা কীৰ্ত্তন করিতেই প্রথম রচিত হইয়াছিল। ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণহস্তে শ্রমণগণ হৃতসৰ্ব্বস্ব ও পরাভূত হইলেন; ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধ ভিক্ষুর আসনগুলিও আয়ত্ত করিয়া ভারত-বিজয়ী যে বিরাট পূজার আয়োজন করিলেন তাহাতে বাইতি, হাড় প্রভৃতি জাতির ধৰ্ম্মযাজকত্ব রক্ষিত হইল না; ধৰ্ম্মমঙ্গল কাব্য ব্রাহ্মণগণের হাতে পড়িয়া দেবলীলা জ্ঞাপক হইল, কিন্তু তাহা

ধৰ্ম্মমঙ্গলে বৌদ্ধভাব।

সত্ত্বেও অনুসন্ধিৎসু পাঠক ইহার গোড়ায় ক্ষীণ ও পরাভূত বৌদ্ধধর্ম্মের লুক্কায়িত ছায়া আবিষ্কার করিতে পারিবেন, সন্দেহ নাই।

রামাই পণ্ডিতের পদ্ধতি, হাকন্দপুরাণ, ময়ূরভট্ট, রামচন্দ্র, মাণিক গাঙ্গুলী, খেলারাম প্রভুরাম, রূপরাম, সীতারাম, দ্বিজরামচন্দ্র, সেনপণ্ডিত, রামদাস আদক, ঘনরাম, বলদেব চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি কবির ধর্ম্মমঙ্গল আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি।

ঘনরামের পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণ।

১৫২৭ খৃঃ অব্দে খেলারাম স্বীয় ধর্ম্মমঙ্গল রচনা করেন।* ১৬০৩ খৃঃ অব্দে সীতারাম দাস নামক আর একজন কবি একখানি ধর্ম্মমঙ্গল রচনা করেন। ইনিও "গজলক্ষ্মী"র স্বপ্নাদেশে গীত রচনায় প্রবৃত্ত হন;—"শিওরে বসিল মোর গজলক্ষ্মী মা। উঠ বাছা সীতারাম গীত লেখ গা॥" সীতারাম দাস ধর্ম্ম-কাব্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আরও দুই ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিয়াছেন,—'খণ্ডকোষ' নিবাসী অযোধ্যারাম চক্রবর্ত্তী এবং নারায়ণ পণ্ডিত। শেষোক্ত ব্যক্তির আগ্রহ সমধিক দেখা যায়, তিনি আমাদের কবির স্বপ্নাদেশ-বৃত্তান্ত অবগত হইয়া 'দুয়াতি কলম মোরে দিল বানাইয়া" এবং এ হেন কবিবর যদি পরিত্যাগ করিয়া যান সেই ভয়ে "অনেক যতনে মোরে রাখিল ধরিয়া।" কেবল "গজলক্ষ্মী মা"ই কবির শিয়রে উপস্থিত হন নাই, তিনি আরও বিবিধ বিগ্রহ দর্শন করিয়াছিলেন. "ধর্ম্ম দেখা দিল জামকুড়ির বনে।" এই সকল প্রত্যাদেশের বলে কবি অনায়াসে উদরান্ন লাভ করিয়াছিলেন, এবং পর-কর্ত্তৃক প্রস্তুত লেখনী, মস্যাধার প্রভৃতি প্রয়োজনীয় উপকরণরাশি পাইয়া স্বচ্ছন্দমনে "আনন্দিত পুথি সব লিখিনু বসিয়া—" ইত্যাদি জ্ঞাপন করিয়াছেন। নিজ পূর্ব্বপুরুষের পরিচয় দিতে কবি ভুলেন নাই। "ইন্দেসার অম্বগোষ্ঠী স্থানে সর্ব্বলোকে।" ইনি বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত ইন্দাসের দক্ষিণ-রাঢ়ীয় কায়স্থ ওম্বংশে জন্মগ্রহণ করেন। আদিপুরুষ গোপীনাথ দে, তাঁহার ৩ পুত্র;—মথুরা দাস, মদন দাস ও ধর্ম্ম দাস। ধর্ম্ম দাসের ৪ পুত্র,—শ্রীহরি দাস, রাজীবলোচন দাস, দুর্য্যোধন দাস ও কুশলরাম দাস। মদনের পুত্র দেবীদাস ও দেবীদাসের পুত্র আমাদের কবি সীতারাম দাস,—সীতারামের কনিষ্ঠ পুত্রের নাম সভারাম রায়। কবির মাতামহের নাম শ্যামাদাস। ১০০৪ সালে এই পুঁথি সমাপ্ত হয়। এই সমস্ত বিবরণ দ্বারা কবি স্বীয় বংশের একটি নামমাত্র তালিকা রক্ষা করিয়াছেন,—সীতারামদাসের পুস্তকের খণ্ডিত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, সুতরাং আমরা এ সম্বন্ধে আর অধিক কিছু লিখিতে পারিলাম না।

---

* খেলারামের হস্তলিখিত পুঁথি হইতে নিম্নলিখিত পংক্তিগুলি উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

"ভুবন শকে বায়ু মাস শরের বাহন।

খেলারাম করিলেন গ্রন্থ আরম্ভন॥

ভুবন ১২, বায়ু=৪৯, শরের বাহন ধনু=কার্ত্তিক মাস,—সুতরাং ১৪৪৯ শকে পুস্তক রচিত হয়।

সীতারামের পরে দক্ষিণ-রাঢ়ীয় কৈবর্ত্তবংশোদ্ভব রামদাস আদক নামক জনৈক কবি "অনাদি-মঙ্গল" নামক একখানি ধর্ম্মকাব্য প্রণয়ন করেন। রামদাসের পিতার নাম রঘুনন্দন আদক, তাহার পূর্ব্ব নিবাস হুগলী জেলার আরামবাগ থানার অধীন হায়ৎপুর গ্রামে, পরে সেই থানার অন্তর্গত পাড়াগ্রামে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। কবি নিজ বংশের পরিচয় স্থলে লিখিয়াছেন—"ভুরস্থটে রাজা রায় প্রতাপ-নারায়ণ। দানদাতা কল্পতরু কর্ণের সমান॥ তাঁহার রাজত্বে বাস বহুদিন হোতে। পুরুষে পুরুষে চাষ চষি বিধিমতে॥"

রামদাস কৈবর্ত্তের অনাদি-মঙ্গল।

কবির ধর্ম্মমঙ্গল রচনার ভার গ্রহণ করিবার বৃত্তান্তটি বড় কৌতুকাবহ;—হায়ৎপুরে চৈতন্যসামন্ত নামক একজন দুর্দ্দান্ত তসিলদারের অত্যাচারে অল্পবয়স্ক কবি কারারুদ্ধ হন,—খাজনার টাকা শোধ না করিতে পারায় তাঁহার পিতা ঋণ গ্রহণের চেষ্টায় গ্রামান্তরে প্রস্থান করেন। সুতরাং রামদাস উপায়ান্তর না দেখিয়া দ্বারবানের নিকট অনেক কাকুতি মিনতি করাতে তাঁহার অতি গোপনে অব্যাহতি লাভ ঘটে। ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর কবি মাতুলালয়ে পলাইয়া যাইতেছিলেন, এমন সময় পাড়া বাঘনান গ্রামের পথে এক সশস্ত্র সিপাহী তাঁহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। সেকালে সৈনিক পুরুষগণ বলপূর্ব্বক বেগার ধরিয়া লইয়া যাইত। কবি কাতরচিত্তে লিখিয়াছেন,—"ক্ষুধায় তৃষ্ণায় হায় ফেটে যায় বুক। ভাগ্যহীন জনার জীবনে নাই সুখ। সম্মুখে শিপাই শোভে শমন সমান। হায় বুঝি বিদেশে বিপত্তে যায় প্রাণ॥" তৃতীয় ছত্রের "শোভে" শব্দটি সম্বন্ধে আমাদের আপত্তি আছে। যখন সিপাহী কবিকে তর্জ্জন করিয়া বলিতে লাগিল,—"মনে কর বেটা তুমি যাবে পলাইয়া। এতক্ষণ ঘুরিলাম বেগারী খুঁজিয়া॥

হে ধর্ম্ম এ দাসের পুরাও মনস্কাম।
গৌড়কাব্য প্রকাশিতে বাঞ্ছে খেলারাম॥
তোমার কৃপায় যদি গ্রন্থ পূর্ণ হয়॥"
অষ্টমঙ্গলায় দিব আত্ম-পরিচয়॥"

তাঁহার শেষ অধ্যায় (অষ্টমঙ্গলা) পাওয়া যায় নাই; সুতরাং আত্মবিবরণটী নষ্ট হইয়াছে। খেলারামের কবিতা সরল ও সরস; কিছু নমুনা এই:—

"স্থিত শৈলেশ্বর শিব বঙ্গের অঞ্চলে।
সুরম্য সরসী এক তার মাঝে জলে॥
কমল কুমুদ আদি নানা ফুলদল।
বিকাশিয়া ভূষে তার নীল উরঃস্থল॥
শুন বাছা লাউসেন বলিয়ে তোমায়।
এওজাৎ দিও, নেড়া দেউল তলায়॥

গোলাড় যাইব আমি সঙ্গে তুমি চল। এত বলি শিরে দিল ঝারি আর কম্বল॥ ছোট মোট বটে কিন্তু অতিশয় ভারি। বহিতে না পারি বোঝা বুক ফেটে মরি॥ * * * * আমার সম্মুখে যদি ফেল এই মোট দ্বিখণ্ড করিব তোরে মারি এক চোট॥" তখন ভীত কবির চক্ষে সিপাহী সাহেবের শ্রীমূর্ত্তি অবশ্যই "শোভা" পায় নাই, তাহা বলা বাহুল্য। সিপাহীর কথা শুনিয়া ত্রাসে "মুদি গেল আঁখি। কোথায় শিপাই ঘোড়া আর নাহি দেখি।" সেদিনকার সমস্ত বৃত্তান্তই বিচিত্র ঘটনাসঙ্কুল। তৎপর কবির ভয়ানক জ্বর বোধ হইল,—শুষ্ককণ্ঠে রামদাস সম্মুখস্থ "কাণাদীঘির" জলখাইতে ছুটিলেন, দীঘির দক্ষিণদিকে বাত্যান্দোলিত অমল ধবল জলের উপর সুন্দর পদ্মকুসুম ধীরে ধীরে দুলিতেছিল, কবি সাগ্রহে জলে নামিতে জল শুষ্ক হইয়া গেল। রামদাস পদে পদে এইরূপ বিপন্ন ও নিরাশা-গ্রস্ত হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন, তখন এক দিব্য পুরুষ স্বর্ণভৃঙ্গার গঙ্গোদকে পূর্ণ করিয়া কবির সন্নিহিত হইয়া বলিলেন—"ক্ষুধায় তৃষ্ণায় রাম ক্লেশ পাও তুমি। তোমার লাগিয়া জল আনিয়াছি আমি॥ এত বলি বদনে দিলেন গঙ্গাজল। আজি হোতে হোল তব জনম সফল॥ জল পানে রামদাস প্রাণ পেলে তুমি। ধর্ম্মের সঙ্গীত গাও শুনি কিছু আমি॥" রামদাস বলিলেন—"পাঠ পড়ি নাই প্রভু চঞ্চল হইয়া। গোধন রচাই মাঠে রাখাল লইয়া॥ খেলা ছলে পুজি ধর্ম্ম কর্ম্ম জ্ঞানহীন। জানি না ধর্ম্মের গীত তায় অর্ব্বাচীন॥" কিন্তু দিব্যপুরুষ নাছাড়বান্দা—"আজি হৈতে রামদাস কবিবর তুমি। ঝাড়গ্রামে কালুরায় ধর্ম্ম হই আমি॥ আসরে জুটিবে গীত আমার স্মরণে। সঙ্গীত কবিতা ভাবা ভাসিবে বদনে॥ সুছন্দ বন্ধন গীত সুশ্রাব্য সবার। শ্রীধর্ম্ম মাহাত্ম্য মর্ত্ত্যে হইবে প্রচার॥" হায়ৎপুর গ্রামে ১৬২৬ খৃষ্টাব্দে এই পুস্তক প্রথম গীত হয়। অনাদি-মঙ্গলের ভাষা সরস ও সহজ,—কবিত্বপূর্ণ ভাব ও উদ্দীপনার অভাব নাই।*

১৪৬৭ খৃঃ অব্দে মাণিক গাঙ্গুলী একখানি 'ধর্ম্মমঙ্গল' রচনা করেন। † এই ধর্ম্মমঙ্গলখানি মৎকৃত বিস্তৃত ভূমিকাসহ সাহিত্য পরিষদ্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। মাণিকরাম একজন সু কবি ছিলেন; কিন্তু সদ্‌ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া বৌদ্ধ-ধর্ম্মের বিকৃত দেবতা ধর্ম্মঠাকুরের উদ্দেশে কাব্য রচনা করার জন্য, বোধ হয় সমাজে কিছু নিগৃহীত হইয়াছিলেন, অন্ততঃ ধর্ম্মঠাকুরের প্রত্যাদেশ পাইয়া তদ্বিষয়ে তাঁহার বিশেষ আশঙ্কা হইয়াছিল। তিনি স্বপ্নে ধর্ম্মঠাকুরকে বলিয়াছিলেন-—

'জাতি যায় তবে প্রভু যদি করি গান।'

---

* এই পুস্তকখানি বর্দ্ধমান রায়না-নিবাসী শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত মহাশয় আবিষ্কার করিয়াছেন।

† পুঁথির পাঠ এই" শাকে ঋতু সঙ্গে বেদ সমুদ্র দক্ষিণে। ঋতু ৬, বেদ ৪, সমুদ্র ৭=৬৪৭ (দক্ষিণা গতি) সিন্ধু সহ যুগ পক্ষ যোগ তার সনে॥ সিন্ধু (ঋষি) ৭, যুগ ৪, পক্ষ ২=৭৪২ এই দুইটি অঙ্ক "যোগ" করিলে ১৩৮৯ হয়, তৎসঙ্গে ৭৮ যোগ করিলে ১৪৬৭ খৃঃ অঃ।

মাণিকরামের পূর্ব্বে প্রভুরাম, দ্বিজরামচন্দ্র ও শ্যামলপণ্ডিত সুবৃহৎ ধর্ম্মমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন, এবং সম্ভবতঃ ইঁহাদের সকলের পূর্ব্বে রূপরামের ধর্ম্মমঙ্গল প্রচারিত হয়। ইনি অনেকস্থলে 'আদ্য-রূপরাম' নামে পরিচিত। শ্যামল পণ্ডিতের ধর্ম্মমঙ্গল খানি বোলপুরের জনৈক অধ্যাপক মহাশয় টিকা টিপ্পনী সহ প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

এই সকল কাব্য হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে ঘনরাম চক্রবর্ত্তী তাঁহার শ্রীধর্ম্ম মঙ্গলকাব্য সমাধা করেন। ঘনরাম, ময়ূরভট্টের কথা স্বীয় কাব্যে শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করিয়াছেন।

"ময়ূরভট্ট বন্দিব সংগীতের আদি কবি" (শ্রীধর্ম্মমঙ্গল ১ম সর্গ)। কথিত আছে, রূপরামের কাব্য বড় বড় শব্দ পূর্ণ ও রচনা জটিল এবং ঘনরাম উহা পড়িয়া বলিয়াছিলেন—"শব্দ শুনে স্তব্ধ হবে গান শুনবে কি?" রূপরামের খণ্ডিত পুঁথি আমরা দেখিয়াছি।

ঘনরামের বাড়ী জেলা বর্দ্ধমানে স্থিত কইয়ড় পরগণান্তর্গত কৃষ্ণপুরগ্রাম। তাঁহার প্রপিতামহের নাম পরমানন্দ, পিতামহের নাম ধনঞ্জয়,—ধনঞ্জয়ের দুই পুত্র, শঙ্কর ও গৌরীকান্ত; গৌরীকান্ত ঘনরামের পিতা, কবির মাতার নাম সীতাদেবী; সীতাদেবীর পিতা গঙ্গাহরি কোকুসারীর রাজকুলোদ্ভুত ছিলেন। ঘনরাম ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতে কবি খুব শারীরিক শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। তৎকৃত শ্রীধর্ম্মমঙ্গল কাব্যে মল্লদিগের লড়াই ও অশ্বাদির চালনার যেরূপ জীবন্ত বর্ণনা দৃষ্ট হয়, তাহাতে কবির ব্যায়ামক্রীড়ায় বিশেষ অধিকার ছিল বলিয়া বোধ হয়। ঘনরাম শৈশবে বড় কলহ-প্রিয় ছিলেন! তাঁহার পিতা গৌরীকান্ত চক্রবর্ত্তী তাঁহাকে বর্দ্ধমানের তাৎকালিক প্রসিদ্ধ শাস্ত্রচর্চ্চার স্থান—রাম-পুরের টোলে পাঠাইয়া দেন; তথাকার হিতকর সংসর্গে কবির কলহ-প্রিয়তার অনেকটা দমন হয় এবং পড়ার প্রতি আগ্রহ বাড়িয়া যায়। শৈশবেই কবিতাদেবীর কৃপাকটাক্ষ তাঁহার উপর পতিত হইয়াছিল; গুরু তাঁহার ভাবী যশঃ অঙ্গীকার করিয়া তরুণবয়সেই তাঁহাকে "কবিরত্ন" উপাধি প্রদান করেন।

ঘনরামের জীবনী।

বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্র রায়ের আদেশে ঘনরাম শ্রীধর্ম্মমঙ্গলকাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হন—"অখিল বিখ্যাত কীর্ত্তি, মহারাজ চক্রবর্ত্তী—কীর্ত্তিচন্দ্র নরেন্দ্র প্রধান। চিন্তি তার রাজোন্নতি, কৃষ্ণপুর নিবসতি, দ্বিজ ঘনরাম রসগান।" শ্রীধর্ম্মমঙ্গল ব্যতীত ঘনরাম রচিত সত্যনারায়ণের একখানি পাঁচালী দৃষ্ট হয়, তাহাতে তাঁহার ৪ পুত্র—রামপ্রিয়, রামগোপাল, রামগোবিন্দ ও রামকৃষ্ণের নাম উল্লিখিত আছে। কয়েক বৎসর হইল, কবির বৃদ্ধ প্রপৌত্র মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহার একমাত্র পুত্র বর্ত্তমান আছেন।

তাঁহার কৃত ধর্ম্মমঙ্গলের সমালোচনা।

ঘনরামের শ্রীধর্ম্মমঙ্গল ২৪ অধ্যায়ে পরিসমাপ্ত, মোট শ্লোক-সংখ্যা ৯১৪৭। ১ম সর্গ, স্থাপন-পালা, শ্লোকসংখ্যা ২৬৭ ; ২য় সর্গ, ঢেকুরপালা, ২৩৮ শ্লোক ; ৩য় সর্গ, রঞ্জাবতীর বিবাহ পালা, ২৫৬ শ্লোক ; ৪র্থ সর্গ, হরিশ্চন্দ্র পালা ২৬০ শ্লোক ; ৫ম সর্গ, শালেভর পালা, ২৯৭ শ্লোক ; ৬ষ্ঠ সর্গ, লাউসেনের জন্মপালা, ৩১৫ শ্লোক ; ৭ম সর্গ, আখড়া পালা, ৩৫৪ শ্লোক ; ৮ম সর্গ, ফলকনির্ম্মাণপালা, ৩১৭ শ্লোক ; ৯ম সর্গ, গৌড়-যাত্রার পালা, ৪০৭ শ্লোক ; ১০ম সর্গ, কামদল বধ, ৩৫০ শ্লোক ; ১১শ সর্গ, জামাতি পালা, ৩২৭ শ্লোক ; ১২শ সর্গ, গোলাহাটপালা, ৪৯৪ শ্লোক , ১৩শ সর্গ, হস্তিবধপালা, ৫১৮ শ্লোক ; ১৪শ সর্গ, কাঙুরযাত্রা পালা, ৩৫৯ শ্লোক , ১৫শ সর্গ, কামরূপ যুদ্ধপালা, ৪১৪ শ্লোক, ১৬শ সর্গ, কানড়ার স্বয়ম্বর, ৬০৭ শ্লোক ; ১৭শ সর্গ, কানড়ার বিবাহ ৪৮৫ শ্লোক ; ১৮শ সর্গ, মায়ামুণ্ড পালা, ৪৬৫ শ্লোক ; ১৯শ সর্গ, ইছাইবধ পালা, ৫৩৫ শ্লোক ; ২০শ সর্গ, বাদল পালা, ২৮১ শ্লোক ; ২১শ সর্গ পশ্চিম উদয় আরম্ভ, ১৭৬ শ্লোক ; ২২শ সর্গ, জাগরণ পালা, ১০৩১ শ্লোক ; ২৩শ সর্গ, পশ্চিম উদয়, ৩৩০ শ্লোক ; ২৪শ সর্গ, স্বর্গারোহণ পালা, ৩৬৪ শ্লোক।

সুতরাং এই কাব্য কবির অধ্যবসায়ের এক বিরাট দৃষ্টান্ত বলিতে হইবে। ধর্ম্মরঙ্গলে লাউসেনের অপূর্ব্ব কীর্ত্তিকলাপ বর্ণিত হইয়াছে। লাউসেন কুলটাগণের হস্তে পড়িয়া ইন্দ্রিয়জয়ী ; ব্যাঘ্র, হস্তী ও ক্ষিপ্ত অশ্বের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তিনি বুঝাইয়াছেন—তাঁহার বাহুবল অমিত ; স্বীয় মাতুল মহামদের দুরভিসন্ধি নানাভাবে বিফল করিয়া বুঝাইয়াছেন, তিনি দেবানুগৃহীত ; অজেয় ইছাইঘোষকে জয় করিয়া বুঝাইয়াছেন, বিক্রমে তাঁহার সমকক্ষ নাই ; স্বীয় অঙ্গগুলির এক একটী ছেদন করিয়া দেবীর আরাধনা করিয়া বুঝাইয়াছেন—তিনি কঠোর তপস্বী। এতদ্ব্যতীত মৃত শিশুর মুখে কথা বলাইয়াছেন, স্বীয় বিনষ্ট সৈন্যদলের প্রাণদান করিয়াছেন, নানা অদ্ভুত কীর্ত্তি প্রকাশ করিয়া কলিঙ্গা ও কানড়াকে বিবাহ করিয়াছেন। কিন্তু এই রাশি রাশি ঘটনা বর্ণনা করিয়াও কবি তাঁহার নায়ককে বড় করিতে পারেন নাই ; বিচ্ছিন্ন উপকরণরাশি পড়িয়া আছে,—যে বিধি-দত্ত শক্তিগুণে সেগুলি একত্র করিয়া এক মহাবীরের চরিত্র গঠিত হইতে পারে, কবির সে শক্তি ও নৈপুণ্যের সম্পূর্ণ অভাব দৃষ্ট হয়। লাউসেনের বিপদের সময় হনূমান আসিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া দিতেছেন ; চণ্ডী আসিয়া তাঁহার শরীরেব মশক তাড়াইতেছেন, সুতরাং তাঁহার বিপদে পাঠকের শান্তিভঙ্গের কোন আশঙ্কা নাই, এবং তাঁহার জয়লাভেও পাঠক তাঁহাকে কোনরূপ প্রশংসা করিতে ইচ্ছা বোধ করিবেন না। পাঠক এই কাব্যেব আদ্যন্ত ঘুমের ঘোরে অর্দ্ধ নিমীলিত চক্ষে পড়িয়া যাইবেন, কোনস্থলে তাঁহার চক্ষুকোণে অশ্রুবিন্দু নির্গত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। *বর্ষাকালে জানালা খুলিয়া* অলসচক্ষে দৃষ্টিপাত দেখিতে একরূপ সুখ আছে, অবিরত জলের টপ্ টপ্ শব্দ, পত্রকম্পন ও বায়ু-বেগে তরুরাজির শির আন্দোলন লক্ষ্য করিতে করিতে চক্ষুদ্বয় মুদিত হইয়া আসে এবং শূন্য নিষ্ক্রিয় মনে পুরাতস কথা ও পুরাতন ছবির স্মৃতি অনাহূতভাবে জাগিয়া উঠে ; ঘনরামের শ্রীধর্ম্মমঙ্গলের একঘেয়ে বর্ণনা সেই বৃষ্টির শব্দের ন্যায়, তানপুরার মত তাহা হইতে অবিরত একরূপ ধ্বনি

উঠিতেছে। উহা পড়িতে একরূপ অলস সুখের উৎপত্তি হয়—স্থলে স্থলে কি কথা পড়িতে দূর দূরান্তরের কি কথা স্মৃতিপথে উদিত হয় এবং ঘুমঘোরে চক্ষু মুদিত হইয়া আসে। মধ্যে মধ্যে যুদ্ধের দামামাবাদ্য এই নিদ্রাপ্রবণতা ভাঙ্গিয়া ফেলে, তখন হাই তুলিয়া মন একটু বীররসে মাতিয়া যায়; নিম্নে বীররসের একটু নমুনা দিতেছি—"মার মার বলি ডাক ছাড়েন ভবানী। সেনাগণ দানাগণ সমরে নিদারুণ, দুদলে করে হানাহানি॥ রঙ্গিণী রণজয়ী দুন্দুভি বাজই, ঘন ঘোর বাজাইয়া দামা॥ রাজপুত মজবুত, যৈছন যমদূত, সমযুথ যুঝে খানসামা॥ দাদালিয়া দলবল, মহীমাঝে মাতল, মানব মহিষে দানদকে। ধর ধর বলি ঘন, ধাইল দাসগণ ধমকে ধরাধর কম্পে॥ ঝাঁকে ঝাঁকে হরিষে, শরগুলি বরিষে, আকাশে একাকার ধূম। দিশাহারা দিবসে, হত কত হুতাশে, গোলা বাজে দুড়ুম দুড়ুম॥ ঝাকতা ঝাঁকে ঝাঁকে ঝিঁকিছে হাঁকে হাঁকে, লাখে লাখে বরিষে তীর। সামালিয়া হানিতে, গজবাজি সহিতে, সমরে শিকায়ের শির॥ করিয়া তর্জ্জন, ঘোরতর গর্জ্জন, দুর্জ্জন দানাগণ সর্পে। সমরে সেনাগণ, সংহারে যৈছন, ক্ষুধিত সর্পে॥" ১৭শ সর্গ। বীরের পর বীভৎস রস—"পাতিল প্রেতের হাট পিশাচ পসারী। নরমাংস রুধিরে পসরা সারি সারি॥ ফড়া ফড়া মড়া করে ডাকিনী যোগিনী। কেহ কাটে কেহ কুটে বাঁটে খানি খানি। কেহ কিনে, কেহ বেচে, কেহ ধরে তুল। কেহ চাকে, কেহ ভকে, কেহ করে মূল॥ রচিয়া নাড়ীর ফুল কেহ গাঁথে মালা। বয়ে লয়ে কেহ কারে যোগাইছে ডালা॥ মনোরম মানুষের মাথার লয়ে ঘি। যাচিয়া যোগায় যত যোগিনীর ঝি॥ খর্পর পূরিয়া কেহ নিবারিছে ক্ষুধা। চুমুকে রুধির পিয়ে সম তার সুধা॥ কাঁচা মাস খায় কেহ ভাজা ঝোলে ঝালে। মানুষের গোটা মাথা কেহ ভরে গালে॥ দশনে চিবায় কেহ কুঞ্জরের শুঁড়া। মোয়া বলে মুখে ভরে মানুষের মুড়া॥ হাতী লয়ে হাতে কেহ উড়ায় আকাশে। লাফ দিয়ে লুফে কেহ অমনি গরাসে॥ পরিয়া নাড়ীর মালা কেহ করে নাট। মরা মাঝে মিছা শব্দ শুনি হান কাট॥ ভূত প্রেত ডাকিনী যোগিনী চণ্ড দানা॥ হাটে করে কেবল মাংসের বেচা কেনা॥ হেন হাটে হাকিম হৈল হৈমবতী। করপুটে সম্মুখে ধূমসী করে স্তুতি॥"—১৭শ সর্গ। করুণরসের বড় অভাব; তবে মধ্যে মধ্যে পাঠকের অশ্রুপাত না হইলেও দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িতে পারে, যথা,—"শিঙ্গাদার ওরে ভাই এই ছিল আমার কপালে। নিশায় নিধন রণে, পিতা মাতা বন্ধুগণে, দেখিতে না পেনু শেষকালে॥ গলার কবচ মোর, শিঙ্গাদার ধর ধর, দিহ মোর যেখানে জননী। নিশান অঙ্গুরী লয়ে, ময়ূরার হাতে দিয়ে, ক'য়ো তুমি হ'লে অনাথিনী। তারে মোর মায়ের হাতে হাতে। স'পে সমাচার বলো, অকালে অভাগা মলো, অভাগিনী রেখ সাথে সাথে॥ শুকার সুবর্ণ চড়া, বাপের ও ঢাল খাড়া, সমর্পিয়ে সমাচার বলো। রণে অকাতর হয়ে শক্রশির সংহারিয়ে, সম্মুখ সমরে শাকা মলো॥ কাণের কুণ্ডল ধর, শিঙ্গাদার তুমি পর, ছুরী শীরে ভুষ বীরগণে। শুনি শোকে শিঙ্গাদার, চক্ষে বহে জলধার, বহে লোহ শাকার নয়নে॥ কেঁদে কহে পুনর্ব্বার, অপরাধ অভাগার, খণ্ডাইতে মা বাপের পায়। প্রণতি অসংখ্যবার, দেখা নাহি হলো আর, অন্তকালে অভাগা বিদায়॥ মরমে রহিল শেল, হেন জন্ম বৃথা গেল, মুখে না বলিনু রাম নাম। ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব দেবা, জনক জননী সেবা, না করিনু বিধি হৈল বাম॥"—২২শ অধ্যায়।*

এই পুস্তকের সর্ব্বত্র কেবল শাস্ত্রের উদাহরণ। বৌদ্ধভাব শাস্ত্রোক্ত দেবদেবীর মাহাত্ম্য

* শিঙ্গাদার ও শাকা দুই ভাই, ময়ূরা শাকার স্ত্রী।

বর্ণনের অতিরিক্ত চেষ্টায় একেবারে উন্মূলিত হইয়াছে, আর তাহার পরিচয় পাওয়ার সুবিধা নাই। শাস্ত্রজ্ঞানের পুঞ্জীভূত ধূম্রপটল কবির প্রতিভাকে এরূপ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল যে স্বানুভূত জ্ঞানের কথা তিনি একটিও বলিবার অবকাশ পান নাই। একমাত্র কর্পূরের চরিত্র বাঙ্গালীর খাঁটি নকসা বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। কর্পূর,জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা লাউসেনকে খুব ভালবাসে; ব্যাঘ্র, কুম্ভীর প্রভৃতির সঙ্গে লাউসেনের যুদ্ধের পূর্ব্বে এবং অপরাপর অনেক বিপদের পূর্ব্বে সে দাদাকে যুদ্ধে লিপ্ত হইতে অনেক নিষেধ করিয়াছিল,কিন্তু সে দাদাকে যত ভালবাসে, নিজেকে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী ভাল বাসে, "আত্মার্থং পৃথিবীং ত্যজেৎ" চাণক্যের এই সুবর্ণ নীতি সে সর্ব্বত্র অনুষ্ঠান করিতে ত্রুটী করে নাই। বিপদের সময় সে দাদাকে ফেলিয়া পলাইয়া গিয়াছে, এবং যখন উঁকি মারিয়া দেখিয়াছে আর ভয় নাই, তখন নিকটে আসিয়া অনেক মিথ্যা কথা বলিয়াছে; লাউসেন যখন জামতিনগরে বন্দী, তখন কর্পূর অভ্যস্তভাবে পলাতক, লাউসেন মুক্ত হইলে কর্পূর নির্ভয়ে আসিয়া দাদার গলা জড়াইয়া মিথ্যা কথা বলিতে লাগিল—"কাঁদিয়া কর্পূর সেনে করেন জিজ্ঞাসা। কালি কোথা ছিলে ভাই হায় কিবা দশা॥ কর্পূর বলেন যবে বন্দী হ'লে ভাই। রাতারাতি গৌড় গেছিনু ধাওয়া ধাই। রাজার আদ্দাশ করি জামতি লুঠিতে। লয়ে আসি লক্ষ সেনা পথে আচম্বিতে॥ পথে শুনি বিজয়, বিদায় দিনু ভাই। লাউসেন বলে তোরে বলিহারি যাই॥"

কর্পূর।

উপসংহারে বক্তব্য, ঘনরামের শ্রীধর্ম্মমঙ্গল এত বিরাট ও এত একঘেয়ে যে সমস্ত কাব্য যিনি পড়িয়া উঠিতে পারিবেন, তাঁহার ধৈর্য্যের বিশেষ প্রশংসা করা উচিত হইবে।

ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের পর সহদেব চক্রবর্ত্তী নামক জনৈক কবি তৎসংক্রান্ত আর একখানি কাব্য রচনা করেন; সহদেব চক্রবর্ত্তী হুগলী জেলার বালিগড় পরগণাধীন রাধানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন; বাং ১১৪১ (১৭৩০ খৃঃ) সালের ৪ঠা চৈত্র, কবি কালুরায় নামক দেবতার স্বপ্নাদেশ লাভ করিয়া ধর্ম্মমঙ্গল রচনা আরম্ভ করেন। স্বপ্নাদেশ-প্রাপ্তি প্রাচীন বঙ্গীয় কবিগণের চিরাভ্যস্ত ঘটনা, লেখনীর কণ্ডুয়ন চরিতার্থ করার পক্ষে এক অদ্বিতীয় অবলম্বন, সুতরাং সহদেব কবি যখন "দয়া কৈলে কালু রায় স্বপনে শিখালে যারে গীত" বলিয়া গ্রন্থারম্ভ করিতেছেন, তখন আমরা অণুমাত্রও বিস্মিত হই নাই, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। সহদেব চক্রবর্ত্তীর ধর্ম্মমঙ্গল, ঘনরাম প্রভৃতি কবির কাব্যানুকরণ নহে, উহার বিষয় স্বতন্ত্র। নানাবিধ দেবদেবীর উপাখ্যান দ্বারা সংশোধিত করিতে চেষ্টা করিলেও কবি মূল বৌদ্ধ উপাখ্যানগুলি একেবারে পরাভূত করিতে পারেন নাই। হরপার্ব্বতীর বিবাহ কথার অতি সান্নিধ্যে কালুপা হাড়িপা, মীননাথ, গোরক্ষনাথ, চৌরঙ্গী প্রভৃতি বৌদ্ধ সাধুগণের কাহিনী স্থান পাইয়াছে। হরিশ্চন্দ্র, লুইচন্দ্র, ভূমিচন্দ্র, জাজপুরনিবাসী ব্রাহ্মণগণের 'ধর্ম্মদ্বেষ' প্রভৃতি নানা

সহদেব চক্রবর্ত্তী।

লুপ্ত বৌদ্ধ-তত্ত্বের আভাস।

প্রসঙ্গে বৌদ্ধ ধর্ম্মের রূপান্তর ও কৃত্রিম হিন্দুবেশ সূচিত হইবে ; এই পুস্তকে রামাইপণ্ডিতের পদ্ধতির কথা উল্লিখিত আছে,—"এ তিন ভুবনমাঝে, শ্রীধর্ম্মের পূজা আছে, রামাই করিল ঘর ভরা।" ধর্ম্ম সেবক ডোম-জাতির নির্য্যাতনও বৌদ্ধ প্রসঙ্গ বলিয়া চিহ্নিত করা যায়।

যাহা হউক কবি এই "ধর্ম্মদেবের" প্রচার উপলক্ষে হিন্দু দেবদেবীগণের বিবিধ কীর্ত্তিকলাপ বর্ণন করিয়াছেন। আমরা মন্দিরের ইষ্টক দ্বারা মসজিদ্ রচিত হইতে দেখিয়াছি,—এখন হিন্দুমন্দিরের উপকরণ অনুসন্ধানকালে বৌদ্ধ মঠের ভগ্নাবশেষ আবিষ্কার করিয়া কেন আশ্চর্য্যান্বিত হইব ? এমন কি জগন্নাথবিগ্রহের বৌদ্ধউপাদান এখন এক প্রকার সর্ব্ববাদিসম্মত হইয়াছে, অথচ তিনি হিন্দুর পূজ্য থাকিবেন। শ্রীধর্ম্মমঙ্গলকাব্য মূলে যাহাই থাকুক, এখন হিন্দুপুরোহিতগণের কক্ষতল হইতে এই পুঁথি স্থানান্তরিত করিবার প্রয়োজন নাই, তবে প্রত্নতত্ত্ববিৎগণ ইহা হইতে বৌদ্ধ সময়ের কোন লুপ্তপ্রায় তত্ত্ব উদ্ধার করিয়া দেখাইতে পারেন।

সহদেবের কবিত্ব।

সহদেব চক্রবর্ত্তীর ধর্ম্মমঙ্গল স্থানবিশেষ কবিত্বময় ;—গ্রাম্য ভাষা কোন কোন স্থলে মর্ম্ম স্পর্শ করিবার উপযোগিনী হইয়াছে, নিম্নে একটি ভক্তিসূচক পদ উদ্ধৃত হইল :—

"শরণ লইনু, জগৎজননী ও রাঙ্গা চরণে তোর। ভব-জলধিতে, অনুকূল হৈতে, কে আর আছয়ে মোর॥ দুগ্ধকণ্ঠ শিশু দোষ করে যবে, রোষ না করয়ে মায়। যদি বা রুষিবে পড়িয়া কান্দিব, ধরিয়া ও রাঙ্গা পায়॥ হরিহর ব্রহ্মা, যে পদ পূজয়ে, তাহে কি বলিব আমি। বিপদ সাগরে, তনয় ফুকারে, বুঝিয়া যা কর তুমি॥"

কদলীপাটনের স্ফুরন্তযৌবনা সুন্দরীগণ যখন এক সঙ্গে বিলোল কটাক্ষ সন্ধান করিয়া নানাবিধ কামকলাপূর্ণ ভঙ্গীতে মীননাথসাধুর সন্ন্যাসভঙ্গ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার প্রবোধ বাক্যগুলিতে প্রকৃত যোগজীবনের নিরত্তিসূচক শান্তি প্রকটিত হইয়াছিল। সেই অংশটি শান্ত মলয়-লহরীর মত সাংসারিক লোকের ইন্দ্রিয় ঝটিকায় বিধ্বস্ত চিত্তের উপর বহিয়া যাইবার কথা ; কিন্তু মীননাথ সুন্দরীগণের নিক্ষিপ্ত জালে মীনের ন্যায়ই আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন। তিনি যোগভগ্ন, ইন্দ্রিয়বিমূঢ় এবং পরিশেষে ইতরযোনি প্রাপ্ত হইলেন। এই অবস্থায় তাঁহার শিষ্য গোরক্ষনাথ তাঁহাকে উদ্ধার করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া কয়েকটি প্রহেলিকার মত কবিতায় তাঁহার চৈতন্য সঞ্চার করিলেন ; সেই প্রহেলিকার ভাষা গ্রাম্য, কথা অসংলগ্ন, কিন্তু উহা আমাদের নিকট বড় মধুর বলিয়া বোধ হইয়াছে,—গ্রাম্যকৃষকের ভাষা, অথচ তাহার উন্নত নীতি প্রকৃত সাধুমুখনিঃসৃত উপদেশামৃতের ন্যায় উপাদেয়। এখনও পাড়াগেঁয়ে এইরূপ দুই একটি সাধু পাওয়া যায়, তাঁহারা উচ্চশিক্ষার অভিমান মনে বহন করিয়া গৌরব করেন না, কিন্তু পর্য্যাপ্তরূপে অভ্যস্ত বহুদর্শিতা হইতে চয়িত উচ্চনীতিদ্বারা তাঁহাদের জীবন পরিশোভিত। সেই উপদেশলোভে দলে দলে লোক সাধুকে ঘেরিয়া বসিয়া পূজার ন্যায়

সম্মান প্রদর্শন করে—অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি এই দৃশ্যে 'গাঁজাখোরের প্রতিপত্তি' এবং 'অজ্ঞলোকের বিশ্বাস' ভাবিয়া স্বীয় অন্তঃসারশূন্য অভিমানাশ্রয়ে প্রীত থাকেন। গোরক্ষনাথ-কথিত সেই প্রহেলিকাটি আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম ;—ইহাতে স্ত্রীজাতির প্রতি একটু বিদ্বেষের ঝাঁজ আছে ;—কিন্তু তজ্জন্য আমাদের কবি অপেক্ষা প্রসিদ্ধ সাধু কবীরাই অধিক পরিমাণে দায়ী। প্রহেলিকাটিতে অসম্ভব সম্ভব হওয়ায় বিস্ময় ও কতকগুলি অস্পষ্ট উদ্বোধনাসূচক বাক্য আছে। কবি ভণিতায় লিখিয়াছেন, এই সকল কথা দেহতত্ত্ব বিষয়ক। মীননাথের মত জ্ঞানের গৌরীশঙ্কর, সাধনার সমুদ্র যোগী পুরুষ যে অতি তুচ্ছ রমণীগণের জালে পড়িবেন, ইহা অসম্ভব। বোধ হয় এই কথাটা বুঝাইবার জন্য সেই সকল তত্ত্ব কথার অবতারণা করা হইয়াছে।

"গুরুদেব, নিবেদি তোমার রাঙ্গা পায়।
পুতকীর দুগ্ধে, সিন্ধু উথলিল পর্ব্বত ভাসিয়া যায়॥
গুরু হে, বুঝহ আপন গুণে।
শুষ্ক কাষ্ঠ ছিল, পল্লব মুঞ্জরিল
পাষাণ বিঁধিল ঘুণে॥
হের দেখ বাঘিনী আইসে।
নেতের আঁচলে, চর্ম্মমণ্ডিত করিয়া
ঘর ঘর বাঘিনী পোষে॥
শিলা নোড়াতে কোন্দল বাঁধিল, সরিষা ধরাধরি করে।
চালের কুমুড়া গড়ায়ে পড়িল, পুঁইশাক হাসিয়া মরে॥
এ বড় বচন অদ্ভুত।
আকাট বাঁঝিয়া প্রসব হইল
ছেলে চায় পায়রার দুধ॥
অনেক যতনে নৌকা বাঁধিনু
কাকড়া ধরিল কাঁচি।
মশার লাথিতে পর্ব্বত ভাঙ্গিল,
ক্ষুদ্র পিপীলিকার হাসি॥
আগে নৌকা উড়িল, পশ্চাৎ পুড়িল,
মাঝে মাঝে উড়িল ধুলা।
সরিষা ভিজাইতে, জলবিন্দু নাই,
ডুবিল দেউল চূড়া॥
ষাঘে বলদে, হাল জুড়িনু,
কর্কট হৈল কৃষাণ।

জলের কুম্ভীর, হুড়া ঝাড়ি গেল,
মুষিকে বুনিল ধান॥
তালের গাছে শোলের পানা,
সায়চান ধরিয়া খায়।
সাগর মাঝে, কই মৎস্য মুড়লি,
পঙ্গু পলই লয়া ধায়॥
মধ্যসমুদ্রে দুয়াড়ি পাতিনু,
সাজকি পড়ে ঝাঁকে ঝাঁক।
মহিষ গণ্ডার ডরায়ে মৈল,
হরিণী পালায় লাখে লাখ॥
তৈল থাকিতে দীপ নিবাইনু,
আঁধার হইল পুরী।
সহদেব গায়, ভাবি কালুরায়,
শরীর বর্ণন চাতুরী॥"

এই হেঁয়ালিটি প্রাচীন গোরক্ষ-বিজয়ের একটি কবিতার নব সংস্করণ মাত্র।*

অনুবাদ-শাখা

ক। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপাখ্যানাদি

খ। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি

ষোড়শ শতাব্দী অনুবাদের যুগ। কবিকঙ্কণের পর বঙ্গীয় কবিপ্রতিভা যেন শতাব্দীকাল নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিল। সহসা সংস্কৃতের অতুল ঐশ্বর্য্য বঙ্গীয় লেখকবর্গের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হইল।

* সম্প্রতি ধর্ম্মমঙ্গলের আদি কবি ময়ূরভট্টের কাব্যের একটি অংশ শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম, এ মহাশয়ের দ্বারা সবিস্তার ভূমিকা সহ সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে, এই কাব্যের নাম শ্রীধর্ম্মপুরাণ। বসন্ত বাবু অনুমান করেন—প্রথম ধর্ম্ম পালের পুত্র দেব পালের সময় লাউ সেন বিদ্যমান ছিলেন। ময়নাগড়ের রাজা কর্ণ সেনের পুত্র লাউ সেনই এই সকল ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের নায়ক। ময়ূরভট্ট লাউ-সেনের পৌত্র ধর্ম্ম সেনের সময় বিদ্যমান ছিলেন, সুতরাং তিনি একাদশ শতাব্দীর লোক। লাউ সেনের পুত্রের নাম চিত্র সেন। চিত্র সেনের পুত্র ধর্ম্ম সেন স্থাপিত ধর্ম্ম-মন্দিরের পুরোহিত ছিলেন ময়ূরভট্ট। এই কাব্যে লাউ সেনের বংশাবলীটিও পাওয়া যাইতেছে :—ইঁহারা ক্ষত্রিয়, ময়নাগড়ের রাজা। কনক সেনের পুত্র, কর্ণ সেন; কর্ণ সেনের পুত্র লাউ সেন; লাউ সেনের পুত্র চিত্র সেন ও তৎপুত্র ধর্ম্ম সেন (ময়ূরভট্টের সমসাময়িক)।

তাঁহারা যে সুধাময় স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে সাহিত্য-বিপনি প্রতিধ্বনিত করিতেছিলেন—তাহা যেন কতকদিনের জন্য ক্ষান্ত হইয়া পড়িল। প্রায় এক শতাব্দীর জন্য গীতি-কবিতার উপর পটক্ষেপ হইল,—সংস্কৃত শাস্ত্র অনুদিত করিয়া ভাষা সংস্কার করা লেখকবর্গের লক্ষ্য হইল। খনার বচনে, গোপীচাঁদ ও মাণিকচাঁদের গানে আমরা সংস্কৃতের কোন চিহ্ন পাই নাই; বৈষ্ণবকবিগণের মধ্যে যিনি সকলের বড়, তিনি নিজের গান নিজের ভাষায় গাইয়াছেন; চণ্ডীদাস পক্কবিম্ব ও স্ফুরিত কদম্বের বড় ধার ধারেন নাই। অপরাপর বৈষ্ণবকবিগণের পদে মধ্যে মধ্যে সংস্কৃতের প্রভা পতিত হইয়াছে, দুই এক স্থলে বঙ্গীয় কবিতার গলে সংস্কৃতের দান সোণার হারের ন্যায় শোভা পাইয়াছে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই তাহা কবিতার পদে শৃঙ্খল স্বরূপ হইয়াছে। কবিকঙ্কণ স্বভাবের প্রতি স্থির-লক্ষ্য হইয়াও দুইএক স্থলে সংস্কৃত সাহিত্যের কিছু কিছু রত্ন আনিয়া নিজের কবিতায় যোজনা করিয়াছেন,—যথা—"অঙ্গে যদি লেপি চন্দন পঙ্ক। দহে দেহ যেন দংশে ভুজঙ্গ॥" ইহা জয়দেবের—"সরসমসৃণমপি মলয়জপঙ্কং। পশ্যতি বিষমিব বপুষি সশঙ্কং॥" পদের অনুবাদ; কিন্তু মুকুন্দরাম পথের বাহিরের দুই একটি ফুলের লোভে হাত বাড়াইলেও প্রকৃতির পাছে পাছে অনুগত ভৃত্যের ন্যায়ই চলিয়াছেন।

বাঙ্গালা কাব্যে সংস্কৃতের প্রভাব।

কবিকঙ্কণের পরে প্রকৃতি বাঙ্গালীর পর হইলেন—শাস্ত্র আপন হইল; ভাষা ভাবের অধিকার ছাড়িয়া স্বীয় স্বাতন্ত্র্য স্থাপন করিল এবং কবিগণ প্রকৃত মানুষ না দেখিয়া সংস্কৃত সাহিত্যের ছবিগুলি দেখিয়া পাগল হইলেন। সংস্কৃতের নানারূপ অদ্ভুত উপমা ও ভাব দ্বারা লেখনীগুলি ভূতাশ্রিত হইল, তাহারা সত্যযুগ হইতে আসিয়া কলিযুগের মানুষগুলির উপর অত্যাচার আরম্ভ করিল। এখন এদেশে 'আজানু-লম্বিতবাহু' অদৃশ্য; নগ্নতা আবরণের চেষ্টায় বস্ত্রের প্রসার বৃদ্ধি পাওয়াতে এখন "লম্বোদর" ও "নাভি সুগভীর" আর লোকলোচনের আনন্দদায়ক হয় না; এই জনাকীর্ণ প্রদেশ এক সময় অরণ্যময় ছিল, তখন কুরঙ্গ, মাতঙ্গের নৈসর্গিক ক্রীড়া সর্ব্বদা মানুষের প্রত্যক্ষ হইত,—তাহা ভাল বোধ হইত,—মানুষ নিজ গতিবিধি ও কটাক্ষের সঙ্গে তাহাদের হাবভাব মিলাইয়া মনে মনে প্রীত হইত, এখন সে সকল বিশাল অরণ্য কোথায়? আর কুরঙ্গীর বিলোলকটাক্ষই বা কোথায়? শীর্ণকায় হস্তীগুলি মাহুতের অঙ্কুশের ভয়ে তাহাদিগের স্বভাবগতি ভুলিয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া রুচিরও অনেক পার্থক্য ঘটিয়াছে, রামরম্ভার উপমায় মন তৃপ্ত হয় না,—সুতরাং সত্যযুগের উপমাগুলি এখন রহিত হইলে ভাল হয়। কিন্তু অতিরিক্ত মাত্রায় পুঁথিগত বিদ্যার উপর নির্ভর করার দোষে কবিগণ স্বভাবের অধিকারের বাহিরে যাইয়া পড়িলেন; উপমাগুলি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম হইয়া নরনারীর রূপ-বর্ণনা ভারাক্রান্ত করিয়া ফেলিল। এই সময় কবিগণ যে সকল সুন্দর

বাঙ্গালা কবিতার সংস্কৃতের উপমা।

ও সুন্দরীগণের চিত্র আঁকিয়াছেন, তাঁহারা অতিরিক্ত মাত্রায় শাস্ত্রীয় উপমা দ্বারা অভিভূত হইয়া অস্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে। বিদ্যা-ঠাকুরাণীর রূপ পড়িয়া তাঁহাকে রূপসী জ্ঞান করা দূরে থাকুক, বীভৎস রসের উদয় না হইলেই যথেষ্ট। বঙ্গসাহিত্যের এই রুচি নষ্ট করার পক্ষে পার্শীরও কতকটা হাত আছে, আমরা পরে তাহা সংক্ষেপে দেখাইতে চেষ্টা করিব।

যাহা হউক, ভাবের দুর্গতি হইলেও ভাষা ক্রমশঃ মার্জ্জিত হইতে চলিল। বঙ্গভাষা সংস্কৃতের অলঙ্কার ও ছন্দগুলি আয়ত্ত করিয়া হইল– কিন্তু প্রথমে এই বিষয়ে অনেক কবির চেষ্টা বড় হাস্যাস্পদ হইয়াছে,—আমরা সে সম্বন্ধে পরে লিখিব।

এই সংস্কৃতের আনুগত্য বঙ্গ-সাহিত্যের বিরাট অনুবাদচেষ্টায় বিশেষরূপে দৃষ্ট হইবে। ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে বহুসংখ্যক সংস্কৃত পুস্তক অনুবাদিত হইয়াছিল—তাহারা একরূপ নগণ্য; আমরা বহুসংখ্যক অপ্রকাশিত প্রাচীন হস্ত-লিখিত পুঁথি পাইয়াছি, কিন্তু তাহাদের সকলগুলি উল্লেখ করিতে পারিব না এবং সকলগুলিই উল্লেখযোগ্য নহে। প্রথমতঃ আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকখানি উপাখ্যান ও পুরাণের অনুবাদের উল্লেখ করিয়া পরে রামায়ণ, মহাভারত এবং ভাগবত প্রসঙ্গের আলোচনা করিব। বলা বাহুল্য এই অনুবাদগুলির অধিকাংশই খাঁটি অনুবাদ নহে। কবিগণ পুরাণ কি কাব্যাদি মূলতঃ অবলম্বন করিয়া মধ্যে মধ্যে নিজেদের কল্পনার ইন্দ্রজাল বিস্তার করিতে ত্রুটি করেন নাই।

সংস্কৃতের অনুবাদ।

১। প্রহ্লাদচরিত্র,—দ্বিজকংসারি প্রণীত; শ্লোকসংখ্যা ২২৪। হস্তলিপি (১৭০২ শক) ১৭৮০ খৃঃ অব্দ।

২। পরীক্ষিৎসংবাদ—এই পুস্তকের অধিকাংশই রামায়ণের গল্পপূর্ণ; শুকদেব পরীক্ষিৎকে রামায়ণ শুনাইতেছেন ও প্রসঙ্গক্রমে ধর্ম্মব্যাখ্যা করিতেছেন। গ্রন্থকারের নাম পাওয়া গেল না। শ্লোকসংখ্যা ৮০০; শ্রীরামধন দেবশর্ম্মার হস্তাক্ষর (১৭৩৮ শক) ১৮০৬ খৃঃ অব্দ।

৩। নৈষধ—লোকনাথ দত্ত প্রণীত। ইহাতে নলোপাখ্যানের সঙ্গে সঙ্গে রামায়ণের বিবরণ সংক্ষেপে প্রদত্ত হইয়াছে ও সর্ব্বশেষ ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার কীর্ত্তি বর্ণিত হইয়াছে; মোট শ্লোকসংখ্যা ১৪৪০; লেখক শ্রীমাঝিকাইত, হস্তলিপি (১১৭৪ সন) ১৭৬৮ খৃঃ।

৪। ইন্দ্রদ্যুম্নউপাখ্যান—দ্বিজমুকুন্দ প্রণীত; শ্লোকসংখ্যা ৬৯০; ১১৮৪ সন) ১৭৭৮ খৃঃ অব্দ।

৫। দণ্ডীপর্ব্ব—রাজারাম দত্ত প্রণীত; শ্লোকসংখ্যা ১৫০০; লেখক শ্রীরামপ্রসাদ দেঐ, হস্তলিপি (১৭০৭ শক) ১৮০৯ খৃঃ।

৬। নলদময়ন্তী—মধুসূদন নাপিত প্রণীত, শ্লোকসংখ্যা ২১২৪; লেখক শ্রীগৌরকিশোর ধর, হস্তলিপি (১৭৩১ শক) ১৮০৯ খৃঃ।

৭। হরিবংশ—দ্বিজ ভবানন্দ কর্ত্তৃক অনুবাদিত শ্লোকসংখ্যা ৩১৬৮; লেখক শ্রীভাগ্যবন্ত ধুপী, হস্তলিপি বাং ১১৮০ সন) ১৭৮৩ খৃঃ অব্দ।

৮। ক্রিয়াযোগসার—পদ্মপুরাণের একাংশের অনুবাদ। অনুবাদক শ্রীঅনন্তরামশর্ম্মা, শ্লোকসংখ্যা ১০৫০। লেখক শ্রীরাঘবেন্দ্র রাজা; হস্তলিপি (১৬৫৩ শক) ১৭৩১ খৃঃ অব্দ।

এই পুস্তকগুলি আমার নিকট কতকদিনের জন্য ছিল। ইহা ছাড়া রঘুবংশের অনুবাদ, বেতালপঞ্চবিংশতি, বায়ুপুরাণ, গরুড়পুরাণ, কালিকাপুরাণ প্রভৃতি প্রায় সকলগুলি পুরাণের অনুবাদ ও অন্যান্য ক্ষুদ্র অনেকগুলি হস্তলিখিত পুঁথি আমরা দেখিয়াছি। শ্রীযুক্ত বাবু অক্রুরচন্দ্র সেন মহাশয় রামনারায়ণ ঘোষের অতি সুন্দর নৈষধ-উপাখ্যান সুধন্বা-বধ, ধ্রুব-উপাখ্যান প্রভৃতি কতকগুলি পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছেন।

ইহাদের প্রায় সকলগুলির রচনাই একরূপ। রচনা সরল, মধ্যে মধ্যে কোমল কবিত্ব-নিক্বনে মৃদুমন্দ মুখরিত। বলা বাহুল্য, এই সব পুস্তক বঙ্গভাষায় সংস্কৃতশব্দ ও উপমারাশি বহুল পরিমাণে আমদানি করিয়াছে। এই যুগের শ্রেষ্ঠ অনুবাদলেখক কাশীদাসের রচনায় যে যে গুণ দৃষ্ট হয়, পূর্ব্বোক্ত অনুবাদ পুস্তকগুলিতে ন্যূনাধিক পরিমাণে সেই সকল গুণ লক্ষিত হইবে। এই অগণ্য পুস্তকরাশির সুশৃঙ্খল খদ্যোত-দীপ্তি নিবিড় সাহিত্য-ইতিহাসে তাৎকালিক রুচি ও ভাবের আভাস দেখাইতেছে, তাহা অনুসরণ করিতে করিতে আমরা কাশীদাসের প্রতিভার সন্নিহিত হইয়া পড়ি। পুঁথিগুলি হইতে কিছু কিছু নমুনা উদ্ধৃত করা উচিত, নিম্নে আমরা কিছু কিছু অংশ তুলিয়া দেখাইতেছি;—

অনুবাদ গ্রন্থসমালোচনা।

(১) প্রহ্লাদের স্তব—"ধ্যান করিয়া প্রহ্লাদ বলে উচ্চৈস্বরে। চন্দ্র সূর্য্য জিনিয়া যে শ্যামরূপ ধরে॥ কিরীট কুণ্ডল হার বসন সুন্দর। বিজলীমণ্ডিত যেন নব জলধর॥ পীতবাস পরিধান চরণে নূপুর। পদনখদীপ্তি কোটী চন্দ্র করে দূর॥ চতুর্ভুজ শঙ্খচক্র গদাপদ্ম করে। অঙ্গেতে কৌস্তুভমণি মহা দীপ্তি ধরে॥ "—প্রহ্লাদচরিত্র, বে, গ, পুঁথি; ৯ পত্র।

(২) পরশুরামের বর্ণনা—"হেনকালে আসিলেন পরশুরাম বীর। দৈত্য দানব জিনি নির্ভয় শরীর॥ বাম হস্তে ধরে ধনু দক্ষিণ হস্তে তোমর। পৃষ্ঠেতে বিচিত্র টোণ অতি মনোহর॥ টোণের ভিতরে বাণ জ্বলদগ্নি যেন। এক এক শর মুখে যেন কালযম॥ সুবর্ণ তনু লোচন লোহিত। অঙ্গ হৈতে তেজ ক্ষরিত॥ লম্বিত পিঙ্গল জটা পরশিছে কটি। রঘুনাথে দেখি করে হাস্য খটখটি॥"—পরীক্ষিৎ-সংবাদ, বে, গ, পুঁথি, ২৩ পত্র।

(৩) শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—"আমি ব্যাধিরূপ হৈয়া দেই দুঃখ ভোগ। আমি ঔষধ হৈয়া খণ্ডাব সেই রোগ। আমি গয়া আমি গঙ্গা আমি বারাণসী। কীট পতঙ্গ আমি, আমি দিবানিশি॥ আমি পণ্ডিতরূপ আমি মূর্খসম। আমি সে সকল করি উত্তম অধম॥ আমার নাশ নাই আমি করি নাশ। কাম ক্রোধ লোভ মোহ আমারই প্রকাশ॥"—পরীক্ষিৎসংবাদ, ১৪ পত্র। এইরূপ ভাব বাঙ্গালার পল্লীকবির রচনায় পাওয়া যায়—ইহা উন্নত অদ্বৈত-তত্ত্বের কথা; যে শুভাশুভ ব্যাখ্যা করিতে অন্যান্য ধর্ম্মে শুভ ঈশ্বরের সঙ্গে পাপ-স্রষ্টা অপর এক ঈশ্বর কল্পিত সেই শুভাশুভ বোধ আমাদের ভ্রান্তির উৎপত্তি; শুভ এবং অশুভ মায়াশ্রিত অনন্ত পুরুষের ব্যাপক মহিমার প্রসার; মূর্খ পণ্ডিত, রোগ ও ঔষধ ইঙ্গিতে একে অন্যকে দেখাইতেছে, ইহারা একই

অবয়বের দুই ভিন্ন দিক মাত্র, কিন্তু ইহাদের কোনটিই তাঁহা ছাড়া নহে। হিন্দুস্থানের পল্লীবাসিগণ পৌত্তলিক, কিন্তু উন্নত বেদান্ত ধর্ম্মের মর্ম্মগ্রাহী।

কাশীদাসকে ছাড়িয়া স্থলে স্থলে ভারতচন্দ্রের উপমাগুলির পূর্ব্ব তত্ত্বও পাওয়া যায়। সাহিত্যের রুচি অস্বাভাবিক ও অতিরঞ্জিত উপমার দিকে প্রবর্ত্তিত হইতেছিল। লোকনাথদত্তের নৈষধ ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের পূর্ব্ববর্ত্তী কাব্য; মনোনিবেশ পূর্ব্বক লোকনাথদত্তের রচনা পাঠ করিলে ইঁহাকে 'ক্ষুদ্র ভারতচন্দ্র' উপাধি দেওয়া যাইতে পারে, দময়ন্তীর রূপ বর্ণনা হইতে এই অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

লোকনাথ দত্ত।

দেখিয়া সুরঙ্গ তার ওষ্ঠাধর। অরুণ আকৃতি সূর্য্য হৈতে সমসর॥ দূরে থাকি কুসুম বাঁধুলি বিম্বফল। অপমানে বলে মোর সুরঙ্গ বিফল। দেখিয়া চিন্তিত তার দশনের কান্তি। সমুদ্রে প্রবেশ কৈল মুকুতার পাঁতি॥ তার শ্রুতি বিমল দেখিয়া মনোহর। আকাশে উড়িল লাজে গৃধিনী সকল॥ দেখিয়া সুচারু তান দিব্য কেশপাশ। চামরী বনেতে গেল হইয়া নৈরাশ॥ সীমন্ত বিচিত্র তার দেখিয়া অদ্ভুত। ঘন ঘন গগনেতে লুকায় বিদ্যুৎ॥ দেখিয়া বিচিত্র গ্রীবা অতি শোভাম্বিত। সমুদ্রেতে গেল হংস হইয়া লজ্জিত॥ কঠিন তার পীন পয়োধর। দূরে থাকি হেরিলেক সুমেরু মন্দর॥"— নৈষধ, বে, গ, পুঁথি ৩০ পত্র। কিন্তু ইহাদের সকলের পূর্ব্বে বিদ্যাপতি কবি গাহিয়া রাখিয়াছিলেন—
"কবরী ভয়ে চামরী গিরি কন্দরে মুখ ভয়ে চাঁদ আকাশ। হরিণী নয়ন ভয়ে, স্বর ভয়ে কোকিল, গতিভয়ে গজ বনবাস। ভুজভয়ে কমল মৃণাল পঙ্কে রহু। কর ভয়ে কিশলয় কাঁপে।"

কল্পনার এই অতিরঞ্জন বঙ্গসাহিত্যে কাশীদাসের পরে ক্রমেই বেশী হইতে লাগিল। এই সময়ের অন্যান্য কবির লেখায় ইতস্ততঃ উক্তরূপ নানা দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়; নলদময়ন্তীলেখক মধুসূদন নাপিত দময়ন্তীর কপালে নিবিড় কেশ রেখায় ঈষদাবৃত সুন্দর সিন্দুরের উপমা দিয়াছেন,—
রাহু জিহ্বা নাড়ে যেন চন্দ্রে গিলিবারে,"

মধুসূদননাপিতরচিত 'নলদময়ন্তী' কাব্যের নাম উল্লেখ করিয়াছি; এই নরসুন্দর কবি স্বীয় পরিচয়স্থলে বলিয়াছেন—"ব্রাহ্মণের দাস নাপিত কুলেতে উদ্ভব। যাহার কবিত্ব কীর্ত্তি লোকেতে সম্ভব॥ তাহার তনয় বাণীনাথ মহাশয়। পৃথিবী ভরিয়া যার কীর্ত্তির বিজয়॥ তাহার তনয় শিশু শ্রীমধুসূদন। শুনিয়া প্রভুর কীর্ত্তি উল্লসিত মন॥" সুতরাং দেখা যাইতেছে কবির পিতামহও কাব্য লিখিয়া লব্ধযশা হইয়াছিলেন। মধুসূদনের রচনা সরল ও হৃদয়গ্রাহী; নাপিতকবি বড় একখানা কাব্য লিখিতে লেখনী গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তাহার কৃতকার্য্যতায় কেহ বিদ্রূপ করিতে সুবিধা পাইবেনা; স্বভাববর্ণনা এইরূপ—"কতদূরে গিয়ে দেখে রম্য একস্থান। দিব্য সরোবর তথা পুষ্পের উদ্যান। তীরে, নীরে, নানা পুষ্প লতায় শোভিত। দক্ষিণা পবন তথা অতি সুললিত॥ কোকিলের ধ্বনি তথা ময়ুরের নৃত্য। ভ্রমরা নাচয়ে তথা ভ্রমরী গাহে গীত॥ পাইয়া শীতল বারি আনন্দ হৃদয়। স্নান তর্পণ কৈল সৈন্য সমুচয়। ছায়া, বারি, শীতল পবন মনোহর। নদীতীরে ভ্রমে রাজা সরস অন্তর॥ আনন্দে করয়ে কেলি যত জলচর।

নাপিত

চক্রবাক কমলে শোভিত সরোবর॥ হংসে মৃণাল তুলি যাচে হংসিনীকে। উড়ে পড়ে চকোরী চকোর ডাকে॥"
এই কবির পুঁথিতে দুই একটি স্থলে আমরা লোকনাথ দত্তের ভণিতা পাইয়াছি।

দণ্ডীকাব্যের বিষয় এই—দুর্ব্বাসার শাপে উর্ব্বশী অপ্সরা পৃথিবীতে ঘোটকী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। একদা অবন্তীর রাজা দণ্ডী শিকার করিতে যাইয়া এই অপূর্ব্ব সুন্দরী ঘোটকীটি দেখিয়া সৈন্যসামন্ত ত্যাগ পূর্ব্বক তাহার পাছে পাছে ধাবিত হন; কতকদূরে গেলে নির্জ্জনে ঘোটকী অপূর্ব্ব রমণীমূর্ত্তি ধারণ করে, রাজা তাঁহাকে বাড়ীতে লইয়া আসেন; ঘোটকী কামরূপিণী, লোকের সম্মুখে ঘোটকী হইয়া থাকিত, কিন্তু রাজার নিকট সুন্দরী রমণীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিত। নারদ ঋষি শ্রীকৃষ্ণকে যাইয়া জানান, তাঁহার অধীনস্থ অবন্তীরাজ খুব সুন্দরী একটী ঘোটকী পাইয়াছেন; শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিকট ঘোটকী চাহিয়া বসেন, উত্তরে দণ্ডী বলিয়া পাঠান, তিনি সিংহাসন এবং রাজ্য ছাড়িয়া দিতে পারেন, ঘোটকী ছাড়িতে পারিবেন না। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে দণ্ডীর যুদ্ধের উদ্যোগ হইল; দণ্ডী সহায় খুঁজিয়া স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ভ্রমণ করিলেন। বিভীষণ, বাসুকী, ইন্দ্র, যুধিষ্ঠির, দুর্য্যোধন প্রভৃতি কেহই তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের বিপক্ষে যুদ্ধে সহায়তা করিতে স্বীকৃত হইলেন না। সুতরাং ক্ষুব্ধমনে ঘোটকীপৃষ্ঠে দণ্ডী গঙ্গার জলে ডুবিয়া মরিতে গেলেন; এই গঙ্গার ঘাটে সুভদ্রাদেবী স্নান করিতে আসিয়াছিলেন, তিনি রাজার উদ্দেশ্য জানিয়া ভীমসেনের নিকট রাজার জন্য অনুরোধ করেন; ভীমসেন সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হন। তখন বড় একটা গোল বাধিয়া গেল; সুহৃদ্ বন্ধুগণ সকলে আসিয়া ভীমসেনকে নিবৃত্তি করিতে চেষ্টা করিল;—কিন্তু ভীম পাহাড়ের ন্যায় অটল; প্রদ্যুম্ন আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া ভীমকে ভয় দেখাইতে চেষ্টা করিল, দশ অবতারের এক এক অবতারের লীলা বর্ণন করিয়া প্রদ্যুম্ন বলিতে লাগিল "সেই প্রভু ঈশ্বর যে দেব ভগবান। হেন গোবিন্দেরে ভীম কর অল্প জ্ঞান।"—কিন্তু ভীম যে ভ্রূকুটী করিয়াছিল, সে ভ্রূকুটিব্রত ভঙ্গ হইল না। বিষম-যুদ্ধ বাধিল। ভীমসেনকে রক্ষা করিতে অগত্যা পাণ্ডব-কৌরব একত্র হইল,—এই সুহৃদ্ চমুপরিবৃত, অটল প্রতিজ্ঞাপরায়ণ, শরণাগত আশ্রয়কারী ভীমসেনকে শ্রীকৃষ্ণ হইতেও পূজার্হ ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলিয়া বোধ হয়—কাব্যের সহজ সুন্দর বর্ণনা রাশি এই বৃহৎ চরিত্রের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া বীর-মহিমার চালচিত্রের ন্যায় দেখাইতেছে। কতকদূর যুদ্ধ হইয়া আর যুদ্ধ হইল না; যুদ্ধের কারণ ফুরাইয়া গেল—ইতিমধ্যে বিবাদের জিনিষ ঘোটকী শাপান্তে অপ্সরা হইয়া স্বর্গে নাচিতে গিয়াছে। 'আর কেন?'—ভাবিয়া দণ্ডী শ্রীকৃষ্ণের বশ্যতা স্বীকার করিলেন।

দণ্ডী পর্ব্ব।

আমরা পূর্ব্বোক্ত কবিগণের মধ্যে কাহারও বিশেষ পরিচয় পাই নাই। সম্ভবতঃ ইঁহারা সকলেই পূর্ব্ববঙ্গের লেখক। উহাদের মধ্যে এক মাত্র অনন্তরাম দত্ত (ক্রিয়াযোগসার-প্রণেতা) নিজের

এক দীর্ঘ পারিবারিক ইতিহাস দিয়াছেন, তাহার সমস্ত অংশ উঠাইতে স্থান দেখিতেছি না। উহাতে জানা যায়, কবির নিবাস ব্রহ্মপুত্রের নিকটবর্ত্তী মেঘনা নদের পশ্চিম পারস্থিত সাহাপুর গ্রাম, কবির পিতামহের নাম কবিদুর্ল্লভ; কবি- দুর্ল্লভের তিন পুত্র, রামচন্দ্র, রাঘবেন্দ্র ও রঘুনাথ। অনন্তরাম এই রঘুনাথের পুত্র, ইঁহার মাতামহের নাম রামদাস। কবি 'বিশারদ' উপাধিবিশিষ্ট কোন লোকের শরণ লইয়া 'ক্রিয়াযোগসার' লিখিয়াছেন। এই আত্মবিবরণের পর 'ক্রিয়াযোগসার' পাঠ করিলে কি কি ফল হয়, তাহার এক লম্বা তালিকা আছে; তাহাতে বিশ্বাস করিলে ইন্দ্রের তক্ত হইতে কুবেরের ভাণ্ডার এবং মৃত্যুর পরে অক্ষয় মুক্তির উপর পাঠকের কায়েমি স্বত্ব জন্মিবে।

অনন্তরাম দত্ত।

এস্থলে আমরা প্রসিদ্ধ একজন অনুবাদ-সঙ্কলনকারীর বিষয় উল্লেখ করিব। অনুবাদ-সম্পাদক রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল; কাশীতে ইঁহার স্মৃতি-জ্ঞাপক জয়নারায়ণ কলেজ এখনও বিদ্যমান। ১০০ বৎসরের অধিক হইল ইনি কাশীবাস-কালে কাশীখণ্ডের তর্জ্জমা করিয়াছিলেন, ইহা মূলের ঠিক অনুযায়ী ও নানাবিচিত্র ছন্দ-সমাহারে সুপাঠ্য। পুস্তকের শেষে যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা এই,—

কবি জয়নারায়ণ।

"কাশীবাস করি পঞ্চগঙ্গার উপর। কাশীগুণ গান হেতু ভাবিত অন্তর॥ মনে করি কাশীখণ্ড ভাষা করি লিখি। ইহার সহায় হয় কাহারে না দেখি॥ মিত্র * শতচৌদ্দ শক পৌষ মাস যবে। আমার মানসমত যোগ হৈল তবে। 'শুক্রমণি' কুলে জন্ম পাটুলি নিবাসী। শ্রীযুক্ত নৃসিংহদেব রায়াগত কাশী॥ তার সঙ্গে জগন্নাথ মুখুয্যা আইলা। প্রথম ফাল্গুনে গ্রন্থ আরম্ভ করিলা॥ শ্রীরামপ্রসাদ বিদ্যাবাগীশ ব্রাহ্মণ। ভাঙ্গিয়া বলেন কাশীখণ্ড অনুক্ষণ॥ তাহার করেন রায় তর্জ্জমা খসড়া। মুখুয্যা করেন সদা কবিতা পাতড়া॥ রায় পুনর্ব্বার সেই পাতড়া লইয়া। পুস্তকে লিখেন তাহা সমস্ত শুধিয়া॥ এইমতে চল্লিশ লাচাড়ি হৈল যবে। বিদ্যাবাগীশের কাশী প্রাপ্তি হৈল তবে॥ ভাদ্রমাসে মুখুয্যা গেলেন নিজবাটী। বৎসর স্থগিত ছিল গ্রন্থ পরিপাটী। পরন্ত বাঙ্গালীটোলা গেলা যবে রায়। বলরাম বাচস্পতি মিলিলা তথায়॥ পচত্তরী অধ্যায় পর্য্যন্ত তার সীমা। বক্রেশ্বর পঞ্চাননে সমাপ্ত গরিমা॥ কাশী পঞ্চক্রোশী আর নগর ভ্রমণ। এ দুই অধ্যায় পঞ্চাননে সমাপন॥ পরে সম্বৎসরাবধি স্থগিত হইলা। শ্রীউমাশঙ্কর তর্কালঙ্কার মিলিলা॥ যদ্যপি নয়নদুটি দৈবযোগে অন্ধ। তথাপি তাঁহার গুণে লোকে লাগে ধন্দ॥ ইষ্ট নিষ্ঠ বাক্‌নিষ্ঠ কাঁপুরে জন্ম। পরানিষ্ট পরাঙ্মুখ বিজ্ঞমর্ম্মী মর্ম্ম॥ লোক উপকারে সদা ব্যাকুল অন্তর। গ্রন্থের সমাপ্তি হেতু হৈলেন তৎপর॥ শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার আখ্যান। তর্কালঙ্কারের পিতা সুধীর বিদ্বান॥ নিজে তার সহিত করিয়া পর্য্যটন। ছয়মাসে বহু গ্রন্থ করি সঙ্কলন॥ ঋতু মাস তিথি বার বর্ষ যাত্রা যত। পদ্যেতে আনিয়া সংস্কৃত অভিমত॥ তর্কালঙ্কারের বন্ধু বিষ্ণুরাম নাম। সিদ্ধান্ত আখ্যান অতি ধীর গুণবান্। পদ্ধতি ভাষাতে করিলেন পরিষ্কার। রায় করিলেন সর্ব্ব গ্রন্থের প্রচার॥ † ঘোষালবংশের

---

* মিত্র অর্থ ১৭।

† অপর একখানি পুঁথিতে ইহার পর এই দুইটি ছত্র পাওয়া গিয়াছে:—

"নগর বর্ণন মোর গ্রন্থের কারণ। প্রত্যক্ষ বৃত্তান্ত তাহা যথার্থ বর্ণন॥"

রাজা জয়নারায়ণ। এই খানে সমাপ্ত করিলা বিবরণ॥ তাঁহার আদেশক্রমে কিতাব করিয়া। রামতনু মুখোপাধ্যায় লইল লিখিয়া॥ সেই বহি দৃষ্টি করি নকলনবিসী। কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় চাতরা নিবাসী॥"

এই অনুবাদ সঙ্কলন করিতে অনেকগুলি পণ্ডিত খাটিয়াছিলেন, ইহা এখনকার পণ্ডিতমণ্ডলীর উপেক্ষণীয় না হইতে পারে। রাজা জয়নারায়ণের সাহায্যকারী নৃসিংহদেব একজন কবি ছিলেন, তাঁহার রচিত কয়েকটি সুন্দর শ্যামাসঙ্গীত আমরা দেখিয়াছি। নৃসিংহদেবের সন্তানগণ এখন হুগলী বাঁশবাড়িয়া গ্রামে বাস করিতেছেন। উদ্ধৃত অংশ-দৃষ্টে বোধ হয়, নৃসিংহদেব অনুবাদকার্য্যে মহারাজকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন, কিন্তু পুস্তকের সর্ব্বত্র জয়নারায়ণের ভণিতা দৃষ্ট হয়। কাশীখণ্ডের অনুবাদ ১১২০০ শ্লোকে পূর্ণ। ইহার প্রত্যেক অধ্যায়ে কত শ্লোক আছে, তাহা অধ্যায় শেষে প্রাচীনরীতি অনুসারে একটি প্রহেলিকার সঙ্কেতে জ্ঞাপন করা হইয়াছে।

নৃসিংহদেবের সাহায্য, কাশী খণ্ডের অনুবাদ।

কিন্তু পুস্তকের মূলভাগ হইতে পুস্তকশেষে যে কাশীর বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, তাহার মূল্য বেশী। রাজাবাহাদুরের লিপিকৌশল—তাঁহার সত্যপ্রিয়তা। তাৎকালিক কাশীর যে চিত্র তিনি দিয়াছেন, তাহা একশত বৎসরের যবনিকা তুলিয়া অবিকল কাশীর মূর্ত্তিটি আমাদের চক্ষে অঙ্কিত করিয়া দিতেছে;—কালে এই চিত্রের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ক্রমে আরও বৃদ্ধি পাইবে; তখন ম্যাণ্ডিভাইলের জেরুজিলাম, ব্যাসের ব্রহ্মাণ্ড-খণ্ডের প্রাচীন কাশী, হিউনসাঙের কুশীনগর এবং নরহরি চক্রবর্ত্তীর বৃন্দাবন ও নবদ্বীপের চিত্রপটের সঙ্গে কাশীর এই মানচিত্রখানি এক স্থানে রক্ষিত হইবার উপযুক্ত হইবে।

কবি গঙ্গার অর্দ্ধ গোলাকৃতি তীরের উপর বক্রভাবে স্থিত কাশীকে মহাদেবের কপালের অর্দ্ধচন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করিয়া বর্ণনা আরম্ভ করিয়াছেন। প্রথমে অসি-ঘাট, পরেশনাথের ঘাট, সাজাদার ঘাট, বৈদ্যনাথের ঘাট, নারদপাড়ের ঘাট, প্রভৃতি ৫৩টি ঘাটের এক ক্ষিপ্র বর্ণনা দিয়া লইয়াছেন, তন্মধ্যে তাহাদের আয়তন, গঠনপ্রণালী ও তৎসম্বন্ধে চলিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আমোদপূর্ণ জনশ্রুতির উল্লেখ আছে। তৎপরে পোস্তাগুলি, তাহাদের সংখ্যাও কম নহে। সূচিপত্রের সঙ্গে দুই একটি কৌতুলোদ্দীপক কথা থাকিলে তাহাদের নীরসতা ঘোচে, রাজাবাহাদুরের রচনারও ইহাই গুণ; পোস্তাগুলির মধ্যে—

কাশীর চিত্র।

"মীরের পোস্তাকে সর্ব্বপ্রধান গণিব॥ উর্দ্ধে বষ্টি হাত দীর্ঘে ত্রিশত প্রমাণ। যেমন পর্ব্বত মধ্যে সুমেরু প্রধান॥"

পোস্তাগুলির পরে "ঘাটিয়া" ব্রাহ্মণদিগের কথা; স্নানান্তে লোক সমূহের কপালে তিলক কাটিয়া দেওয়া ইত্যাদি ইহাদের কাজ। কলিকাতা গঙ্গার ঘাটে উড়িয়া মহাশয়গণ এই কাজ করিয়া থাকেন, অর্দ্ধ পয়সার তৈল খরিদ করিয়াই স্নানকারী ইহাদের "যজমান্ অ" হইয়া বসেন। তৎপরে অট্টালিকাগুলির বর্ণনা; দ্বিতল, ত্রিতল ও চৌতলের সংখ্যাই বেশী কিন্তু—"কদাচিৎ ছয়তলা সাততলা

সাজে।" শ্রীমাধব রায়ের ধারারা কাশীর সর্ব্বোচ্চ মন্দির চূড়া, ইহা ১১০ হস্ত উচ্চ, ৯০ হস্তের পর বসিবার স্থান আছে,—"সুমেরুর দুই শৃঙ্গে যেমত প্রকাশ। মনে হয় তার চূড়া ভেদিল আকাশ॥ তাঁহার উপর যদি কোন জন যায়। সেই সে কাশীর শোভা দেখিবার পায়॥" এই ধারারা দুঃখী ও নিরাশাগ্রস্তের শেষ উপায় ছিল,—তাহারা ইহার উপর হইতে পড়িয়া মরিত। রাজা বাহাদুরের কাশীবাস কালে যে সকল হতভাগ্য ব্যক্তি ইহার উপর হইতে প্রাণ দিয়াছে, তাহাদের উল্লেখ আছে; এক ব্যক্তি কোন সুন্দরীর প্রেমে মজিয়া তাহার সহিত সেই ধারার উপর উঠে, তিন দিন প্রণয়িযুগ্ম সেই স্থানে যাপন করিয়া শেষে উভয়ে পড়িয়া মরে। কিন্তু মৃত্যু ইচ্ছা করিলেই সর্ব্বদা মরা যায় না, "অন্য একজন সেই ধারারাতে চড়ি। দৈবক্রমে তথা হৈতে তরুপরে পড়ি॥ তরুডাল সহ পুনঃ হইয়া ভূমিষ্ঠ। অনায়াসে নিজ গৃহে হইল প্রবিষ্ট॥" এখন মিউনিসিপালিটি যে কার্য্য করেন, পূর্ব্বে ধর্ম্মভীরু গৃহস্থগণ তাহা সম্পন্ন করিতেন—"মহাজনটোলী মধ্যে সরাস্তাতে সর্ব্বথা। দিনকর হিমকর করহীন তথা॥ একারণ নিশাযোগে পথিকের প্রীতে। দীপ শিখা করে সবে নিজ খিড়কীতে॥"

কবি অসংশ্লিষ্ট, অথচ সর্ব্বত্র উৎসুকনেত্র পথিকের ন্যায় সরলভাবে ভালমন্দ কথার উল্লেখ করিয়া যাওয়াতে চিত্রের কোন কোন অংশ বেশ হাস্যরসোজ্জ্বল হইয়াছে—"নামা সন্ন্যাসীর কত শত মঠ। বাহ্যে উদাসীন মাত্র গৃহী অন্তঃপট॥ সদাগরী মহাজনী ব্যবসা সবার। এক এক জনার বাড়ী পর্ব্বত আকার॥" ভণ্ডপাণ্ডাদের "কাহার ঠাকুর মঠে কার ঠাকুরাণী। বাটী পরিপাটী হেরি যেন রাজধানী॥" সেই রাজধানীতে বেদীর উপর স্থিত "শ্রীবিগ্রহমূর্ত্তি যেন রাজরাজেশ্বর॥" তৎপরে নানাজাতির বর্ণনা আছে; ব্রাহ্মণদের বেদাধ্যয়ন, সামবেদ পাঠ, লোকবৃন্দের গঙ্গাতীরে আমোদ প্রমোদ—এ সব তুলিতে অঙ্কিত চিত্রের মত; এবং আখ্যায়িকার সর্ব্বত্র অতিশয় শ্রদ্ধা, বিনয় ও ধর্ম্মপ্রাণতার উৎকৃষ্ট পরিচয় আছে। কাশীর কুচাগলিতে সেই সময়ে সর্ব্বদা হত্যাকাণ্ড হইত—"এই মত প্রতি মাসে প্রায় হয় দ্বন্দ্ব। ক্ষণমাত্রে গড়াগড়ি যায় কত স্কন্ধ॥" শিল্পকারগণ কি সামগ্রী প্রস্তুত করিতে অভ্যস্ত ছিল, তাহার একটি পূর্ণ তালিকা আছে; জোলাগণ কিংখাপ, একপাটা, জামদানী, সাড়ী, শামলা, গুদড়—তাদের উপর ধনুকপাটা ও জরিমণ্ডিত বস্ত্র প্রস্তুত করিত ও "দ্বিশত পর্য্যন্ত থান মূল্যের নির্ণয়" কিন্তু "সাদাতে রেশম পাড়ি কত রঙ্গ করে। শুদ্ধ সাদা অত্যুত্তম করিতে না পারে॥" নদীয়ার কারিকরগণ পাষাণ দ্বারা অতি সুন্দর শিবলিঙ্গ প্রস্তুত করিত। তৎপর দেবমন্দিরগুলির বর্ণনা,—এ বর্ণনা উজ্জ্বল, পুঙ্খানুপুঙ্খ ও নাট্যশালার ন্যায় বিচিত্র শোভা উদ্ঘাটক; তখন অহল্যাবাইএর মন্দির নূতন প্রস্তুত হইয়াছে; পাষাণের খোদগিরি ফুল, ফল, লতা ও দক্ষিণদেশস্থ মর্ম্মরের বিশাল বৃষের কথা উল্লেখ করিয়া উপসংহারে—"কনক কলস শোভে মন্দির উপর। তিন লক্ষ ব্যয়ে যেই না হৈল কাতর॥" ইহার পরে বিষ্ণু মহাদেব মহারাষ্ট্রার মন্দির ও অপরাপর মন্দিরের বিস্তৃত উল্লেখ,—বর্ণনা এরূপ সরল, জীবন্ত ও সুন্দর—পাঠক যেন পথে দেখিতে

দেখিতে যাইবেন। কাশীবাসিনী ধর্ম্মপ্রাণা রমণীগণের বর্ণনা আছে, তাঁহাদিগের ধর্ম্মব্রতানুষ্ঠান ও গঙ্গাস্নানাদির পরে রূপবর্ণনা—"গণ্ডারের চুড়ি কারু কনকে রচিত। ঘোর ঘন মাঝে যেন তড়িত জড়িত। কি উপমা দিব যেই পিঠে দোলে বেণী। অখণ্ড কদলী দলে বিহরে নাগিনী॥" তাহাদের নোলকে—"বড় দুই মুক্ত মাঝে চুণি শোভা করে। যেমত দাড়িম্ব বীজ শুক চঞ্চু ধরে॥" কিন্তু এই বিষয় কবিকে হঠাৎ প্রলুব্ধ করিতে পারে। কবির চিত্তে যেন একটুকু অসংযম আসিয়া পড়িয়াছিল—"কারু উরঃদেশে মুক্তামালার দোলানী। হিমাচলে আন্দোলিত যেন মন্দাকিনী॥" কিন্তু সতর্ক লেখক লেখনীকে সংযত করিতে জানিতেন—"এসব দর্শনে ভক্তি মনেতে হইবে। কদাচিত অন্যভাব মনেতে নহিবে॥" ইহার পক্ষে কাশীবাসী নানা জাতির অনুষ্ঠিত ধর্ম্মোৎসব, বার মাসের নানারূপ ব্যাপারাদি বর্ণিত আছে। "তুলসী-বিবাহ" সেই সময়ে কাশীর একটি বৃহৎ উৎসব ব্যাপার ছিল—রামলীলা, দুর্গালীলা, প্রভৃতি যাত্রা সর্ব্বদা অনুষ্ঠিত হইত।

কাশীখণ্ডের পুঁথি।

কাশীখণ্ডের যে পুঁথিখানি আমার নিকট আছে, তাহা প্রেমানন্দের হস্তের লেখা। ইঁহার হাতের লেখা মুক্তার ন্যায় গোটা গোটা ও পুষ্পিতা লতার ন্যায় নানা ভঙ্গীতে ক্রীড়াশীল; এই লেখার সর্ব্বত্রই 'ব' অক্ষরটি 'র'এর মত লিখিত হইয়াছে—ইহা মিথিলার ধরণে। প্রেমানন্দের হস্তের নকল আরও কতকগুলি পুঁথি আমার নিকট আছে—কাশীখণ্ডের হস্তলিপি ১৮০৯ খৃঃ অব্দের। সর্ব্বশেষে প্রেমানন্দ নিজ রচিত দুইটি গান দিয়াছেন, তাহা বৈষ্ণবীয় মাধুর্য্য-মাখা দুর্গা বন্দনা। এই পুঁথি দেখিয়া সাহিত্য পরিষৎ কাশীখণ্ড মুদ্রিত করিয়াছেন।

কবির পরিচয়।

এস্থলে আমরা সংক্ষেপে কবি জয়নারায়ণের জীবন কাহিনী বিবৃত করিব। কবির পূর্ব্বপুরুষ গণের তালিকা নিম্নে দেওয়া যাইতেছে—১। যদুনাথ পাঠক, ২। গোপীকান্ত, ৩। রামকৃষ্ণ, ৪। রাজেন্দ্র, ৫। বিষ্ণুদেব, ৬। কন্দর্প। কন্দর্পের ৩ পুত্র,—১। কৃষ্ণচন্দ্র, ২। গোকুলচন্দ্র, ৩। রামচন্দ্র। রামচন্দ্রের অল্প বয়সেই মৃত্যু হয়। গোকুলচন্দ্রের ৫ পুত্র,—১। বৃন্দাবনচন্দ্র, ২। রামনারায়ণ, ৩। হরিনারায়ণ, ৪। লক্ষ্মীনারায়ণ ৫। গঙ্গানারায়ণ। এই পঞ্চ পুত্রের কাহারও বংশ রক্ষিত হয় নাই। কৃষ্ণচন্দ্রের একমাত্র পুত্র জয়নারায়ণ ঘোষাল। যদুনাথ পাঠক "দেশাধিপ" হইতে গোবিন্দপুর, গড়্যা, বেহালা প্রভৃতি স্থানে বিস্তর ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হন। কবি জয়নারায়ণ ঘোষালের পুত্র রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল তাঁহার পিতৃদেবের জীবনাখ্যান উৎকীর্ণ করিয়া একখানি সুবৃহৎ তাম্রফলক প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহাতে জয়নারায়ণ ঘোষালের জীবনী অতি বিশদরূপে আখ্যাত হইয়াছে। এই তাম্রফলক হইতে জানা যায়, ১১৪৯ সালে ৩রা আশ্বিন জয়নারায়ণের জন্ম হয়; তিনি অল্প বয়সেই সংস্কৃত, পার্শী, হিন্দী, ইংরাজী এবং ফরাসী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। বাং ১১৭২ সনে জয়নারায়ণ মোবারেক উদ্দৌলার অধীনে

একটি সম্মানিত পদ গ্রহণ করেন। তিনি ওয়ারেণ্‌ হেষ্টিংসের বিশেষ প্রীতি-পাত্র হইয়াছিলেন, এবং জরিপ কার্য্যে গবর্ণমেণ্টকে বিশেষরূপ সহায়তা করাতে, পদস্থ ইংরেজগণ সর্ব্বদা তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। দিল্লীর সম্রাট ইঁহাকে "মহারাজা" উপাধি দান করেন। "জয়নারায়ণ কলেজে"র কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, তদ্ব্যতীত কাশীতে দুর্গাকুণ্ডের নিকটে ইনি একটি প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে "গুরুপ্রতিমা" প্রতিষ্ঠিত করেন। "গুরু কুণ্ডের পুকুর" ও রাজা জয়-নারায়ণের ব্যয়ে খনিত। ১২০০ সনে ইনি কাশীতে "শ্রীকরুণানিধান" নামক কৃষ্ণমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। ১২২৮ সালের ২১ কার্ত্তিক ৬৯ বৎসর বয়সে রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল কাশীতে মণি-কর্ণিকার ঘাটে প্রাণত্যাগ করেন।

কাশীখণ্ডের অনুবাদ ব্যতীত, জয়নারায়ণপ্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি পাওয়া গিয়াছে:—

কবির অপরাপর গ্রন্থ।

করুণানিধান-বিলাস।

১। শঙ্করী-সঙ্গীত, ২। ব্রাহ্মণার্চ্চন-চন্দ্রিকা, ৩। জয়নারায়ণকল্পদ্রুম, ৪। করুণানিধান-বিলাস। শেষোক্ত পুস্তকে রাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণিত হইয়াছে, এই পুস্তকখানির নাম স্পষ্টতই তাঁহার প্রতিষ্ঠিত "করুণানিধান বিগ্রহের" নামানুসারে রক্ষিত হইয়াছে। এ পুস্তকখানিতেও আমার রাজকবির অত্যন্ত বিনয় ও ধর্ম্মপ্রাণতার পরিচয় পাই। রঘুনাথ ভট্ট নামক জনৈক ব্যক্তি এই পুস্তক রচনায় তাঁহাকে সাহায্য করেন,—ইহা গ্রন্থ-সূচনায় উল্লিখিত দৃষ্ট হয়। ১২২০ সালের অগ্রহায়ণ মাসে এই কাব্য রচনা আরব্ধ হয়, এবং ১২২১ সালে ইহা সমাপ্ত হয়। গ্রন্থারম্ভে কবি স্বীয় অবস্থান্তর ও ভাবান্তরের কথা উল্লেখ করিয়াছেন; নিম্নোদ্ধৃত পংক্তি নিচয়ে যে বৈরাগ্যের ঝাঁজ আছে, পরিণামে রাজার চিত্তে তাহাই বিকাশ পাইয়াছিল:—

"প্রথম বয়সে মন বিষয়েতে গেল।
মধ্যম বয়সে শেষ রোগেতে ভুগিল॥
পঞ্চাশ বিগত পরে জরায় বেরিল।
মরণের ভয় আসি অন্তরে পশিল॥

কবির একটি রচনায় আমরা আধুনিক ভূগোল বৃত্তান্তে সূচনা পাইয়া কতকটা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। যাঁহারা "ত্রিকোণ ধরাতল" "বাসুকির শির সঞ্চালনের" ক্রীড়নক বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেন, তাঁহাদের একজনের মুখে—

"দক্ষিণেতে এফরিকা সকলে জানিবে।
পূর্ব্বদিকে হিন্দুদেশ এসিয়া বলিবে॥"
"পৃষ্ঠদেশে এমেরিকা, ধরা গোলাকার।"

প্রভৃতি বর্ত্তমান মানচিত্রের বিশুদ্ধ সংবাদ পাওয়ার আশা আমরা করি নাই। তার পর ধর্ম্মসম্বন্ধে কবি হিন্দুশাস্ত্রে একান্ত অনুরাগ-পরায়ণ হইয়াও অপরাপর ধর্ম্মমতের সত্য অগ্রাহ্য করেন নাই;—তাঁহার আর একটি রচনা এইরূপ,—

"উত্তরেতে লামাগুরু নানক পশ্চিমে।
রামশরণ নাম এক হবে পূর্ব্ব ধামে॥
পুত্ররূপী অবতার হইবে পশ্চিমে।
ইষু ক্রাইষ্ট নাম তার রাখিবেক ভনে॥"

যিশুকে আমাদের অবতারগুলির তালিকার অন্তর্ভূর্ত করিবার এই যে চেষ্টা—তাহা সনাতন কাল হইতে হিন্দুধর্ম্মের অনুযায়ী এবং ইহার বিশেষত্ব।

(খ) রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতির অনুবাদ।

রামায়ণ।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে প্রক্ষিপ্ত রচনা।

আমরা কৃত্তিবাসকে বঙ্গের আদি রামায়ণ-রচক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে বিরচিত চৈতন্যমঙ্গলের মুখবন্ধে জয়ানন্দ-কবি কৃত্তিবাসের পাঁচালীর উল্লেখ করিয়াছেন। কবিকঙ্কণ ইঁহাকে বন্দনা করিয়া লিখিয়াছেন—

"করযোড়ে বন্দিলাম ঠাকুর কৃত্তিবাস। যাঁহা হৈতে রামায়ণ হইল প্রকাশ॥"

(অনুসন্ধান, ১৩০২, ২৬৫ পৃঃ) এবং পরবর্ত্তী বহু লেখক ইঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া অনুবাদ-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমরা কৃত্তিবাস সম্বন্ধে লিখিয়াছি, তাঁহার রামায়ণ সম্ভবতঃ অনেকটা মূলের অনুরূপ ছিল। আমরা খুব প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথিগুলিতে তরণীসেনবধ, বীরবাহুবধ, শ্রীরামের দুর্গাপূজা প্রভৃতি মূল-বিষয়বহির্ভূত প্রসঙ্গ পাই নাই। রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন,—"শ্রীরামচন্দ্রের ভগবতী-পূজা ও রাবণের মৃত্যুবাণ আনয়ন প্রভৃতি প্রস্তাব শ্রীরামপুর-মুদ্রিত পুস্তকে কিছুমাত্র নাই।" (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, ৮৪ পৃঃ); সুতরাং আমাদের বিশ্বাস ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইতেছে,—কৃত্তিবাস রচিত সংক্ষিপ্ত মূলানুযায়ী রামায়ণের খাতার সঙ্গে পরবর্ত্তী কবিগণ নানা পুরাণসঙ্কলিত প্রস্তাবাংশ ক্রমশঃ একত্র গাঁথিয়া দিয়াছেন *;—সর্ব্বশেষে যিনি এই সংশোধন ও যোজনাদি কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহাকে নিকটে

* ৩০০ বৎসরের প্রাচীন কৃত্তিবাসী রামায়ণের পুঁথি কয়েকখানির উত্তরাকাণ্ডে মূলবহির্ভূত অনেক প্রসঙ্গ,—যথা দক্ষযজ্ঞ প্রভৃতি, দৃষ্ট হয়। তুলসীদাসকৃত হিন্দিরামায়ণের উত্তরকাণ্ডের মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের ন্যায় ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার রহিয়াছে। বাল্মীকি-প্রণীত রামায়ণে তাহা দৃষ্ট হয় না। উত্তরকাণ্ড সম্বন্ধে প্রত্নতত্ত্ববিৎগণের মত এস্থানে বিচার্য্য নহে, কিন্তু ইহা একরূপ নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে রামায়ণের উত্তরকাণ্ড বাল্মীকি রচিত নহে, এতৎসম্বন্ধে তিনটি যুক্তি অকাট্য। সেই যুক্তি তিনটী এই:—

পাইয়া আমরা ধরিতে পারিয়াছি—তিনি জয়গোপাল তর্কালঙ্কার; কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী 'জয়গোপালগণকে' প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ অভিযুক্ত করিয়া ধৃত করিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ। সম্ভবতঃ কৃত্তিবাসের রাক্ষসগণ শ্রীরামের বন্দনাগীত গান নাই। কিছু পরে ভক্তির বন্যায় দেশ ভাসিয়া গিয়াছিল; সেই ভক্তির কয়েকটি লহরী কৃত্তিবাসী রামায়ণের অসুরগুলির প্রস্তরকঠিনহৃদয় বিধৌত করিয়া তাহাদিগের রূপ স্বাত্ত্বিকভাবের স্নিগ্ধমহিমা-সংশ্লিষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল; সুতরাং জাতীয় প্রতিভার হস্তে কৃত্তিবাসের প্রতিভা নূতনরূপে গঠিত হইয়াছিল। কোন্ কোন্ কবি কৃত্তিবাসের ছদ্মবেশে আদি-কবির অক্ষরের সঙ্গে স্বীয় অক্ষর মিলাইয়াছিলেন, তাহা নিরূপণ করা কঠিন। আমরা কাহার প্রাপ্য যশোমাল্য কাহার কণ্ঠে দোলাইতেছি, কে বলিবে? শৈশবকালে আমরা বীরবাহুর স্তুতির এই অংশ সাগ্রহে পাঠ করিয়াছি;—"গজ স্কন্ধ হইতে বীর নেহালে শ্রীরাম। কপটে মনুষ্য দেহ দুর্ব্বাদল শ্যাম॥ চাঁচর চিকুর শোভে চৌরশ কপাল। প্রসন্ন শরীর রাম পরম দয়াল॥ ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন অতি মনোহর। ভুবনমোহন রূপ শ্যামল সুন্দর॥ রামের হাতের ধনু বিচিত্র গঠন। সকল শরীরে দেখে বিষ্ণুর লক্ষণ॥ নারায়ণরূপ দেখি রাবণ কুমার। নিশ্চয় জানিল রাম বিষ্ণু অবতার॥ হাতের ধনুকবাণ ভূতলে ফেলায়ে। গজ হৈতে নামি কহে বিনয় করিয়ে॥ ধরণী লোটায়ে রহে জুড়ি দুই কর। অকিঞ্চনে কর দয়া রাম রঘুবর॥ প্রণমহ রামচন্দ্র সংসারের সার। সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় বিষ্ণু অবতার॥" কিন্তু এই বিষ্ণুভক্তির গন্ধচন্দনমাখা পুষ্পাঞ্জলী কাহার? ইহার লেখক খুব সম্ভব কৃত্তিবাস নহেন। অঙ্গদের রায়বারের উৎকৃষ্ট বিদ্রূপাত্মক পংক্তিগুলি কৃত্তিবাসের নহে,—উহা 'কবিচন্দ্র' নামধেয় কোন অজ্ঞাত মহাজনের ভণিতাযুক্ত। বটতলার রামায়ণে রামচন্দ্র সীতার জন্য যে সুললিত পদ্যে বিলাপ করিয়াছেন, তাহা

১। আদিকাণ্ডে বাল্মীকিমুনির প্রশ্নানুসারে মহর্ষি নারদ রামায়ণাখ্যানের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তন্মধ্যে উত্তরকাণ্ডবর্ণিত বিষয়গুলি উল্লিখিত হয় নাই—সেই সংক্ষিপ্ত আখ্যানটিতে লঙ্কাকাণ্ডের বিবরণ অবধি প্রাপ্ত হওয়া যায়। বলা বাহুল্য, রামায়ণের এই পূর্ব্বাভাষই বাল্মীকিপ্রণীত মহাকাব্যের মূল অবলম্বনীয় হইয়াছে।

২। লঙ্কাকাণ্ডের শেষভাগে যে ভাবে উপসংহার করা হইয়াছে, তদ্রূপ ভাবে পূর্ব্ববর্ত্তী অন্য কোন কাণ্ডের শেষ করা হয় নাই, উক্ত উপসংহারটি ভাল করিয়া পড়িলে সেই স্থানেই যে রামায়ণ শেষ করা হইয়াছিল, তাহা স্পষ্টতই পরিলক্ষিত হয়। লঙ্কাকাণ্ড অবধি যে কাব্য তাহাকেই এস্থলে "আদি কাব্য" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, পরের কাব্য "উত্তর কাব্য" নামে পরিচিত হওয়া স্বাভাবিক।

৩। যাবাদ্বীপে রামায়ণ প্রচলিত আছে, তাহার উত্তরকাণ্ড নাই; উত্তরকাণ্ড রচিত হইবার পূর্ব্বেই আর্য্যগণ সে দেশে রামায়ণ প্রচলিত করিয়াছিলেন, এতদ্দ্বারা ইহাই অনুমিত হয়। উত্তরকাণ্ড রচিত হইবার পরে তাহা স্বতন্ত্র পুস্তকরূপে গৃহীত হইয়াছে।

ইহা ছাড়া এ বিষয়ে গ্রন্থের অন্তবর্ত্তী অন্যান্য বহুসংখ্যক প্রমাণ আছে,—তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। উত্তরকাণ্ডের অনুবাদগুলিতেও একটির সঙ্গে অন্যটির মিল দৃষ্ট হয় না।

খুব সম্ভব কৃত্তিবাস সে ভাবে লিখিয়া যান নাই। ইহা শুনিয়া কোন কোন কৃত্তিবাস-ভক্ত পাঠকের দুঃখ হইতে পারে—কিন্তু কঠিন সত্যের আঘাতে জীবনের কত প্রাণ-প্রিয় ধারণা বিসর্জ্জন দিতে হয়, —এই জীবন-স্বপ্ন ভাঙ্গিবার পূর্ব্বে স্বপ্নরাজ্যের অন্তর্গত কত ছোট ছোট স্বপ্ন নিত্য নিত্য ভাঙ্গিয়া যায় ;—দুরন্ত নেংটা শিশুটির ন্যায় সত্য ক্রীড়াচ্ছলে আমাদের সুকুমার বৃত্তির ফুলগুলি লইয়া টানাহেঁচড়া করিতে ভালবাসে।

এখন দেখা যাইতেছে, বহুসংখ্যক পরবর্ত্তী কবি যুগে যুগে যুগোচিত নববস্ত্র পরাইয়া কৃত্তিবাসকে বঙ্গদেশে প্রচলিত রাখিয়াছেন,কিন্তু কৃত্তিবাসকে তাঁহারা একেবারে ঢাকিয়া ফেলিতে পারেন নাই। আদিকবির সারল্য ও কবিতার অনাড়ম্বর মাধুর্য্য বর্ত্তমান-আকারগ্রস্ত রামায়ণেরও সর্ব্বত্র লীলা করিতেছে, যাঁহারা তাঁহার পুস্তকে স্বীয় রচনা প্রক্ষিপ্ত করিয়াছেন, তাঁহারাও নিজ লেখা কৃত্তিবাসী সারল্যের ছাঁচে গড়িয়া তবে জোড়া দিতে পারিয়াছেন।

কিন্তু প্রকাশ্যভাবে কৃত্তিবাসের পরে অনেক কবি রামায়ণ রচনা করিতে দাঁড়াইয়াছিলেন। সেই সমকক্ষতা-ইচ্ছু কবিগণের কেহই আদি কবির যশঃ হরণ করিতে পারেন নাই। কেবল যাঁহারা তাঁহার কাব্যে বিন্দু বিন্দু অনুরূপ রচনা মিশাইয়া নিজের গা ঢাকা দিয়াছেন,তাঁহারা নামগোত্রশূন্য হইয়া আদি কবির বিরাট কাব্যে আশ্রয় পাইয়াছেন।

অপরাপর রামায়ণ-রচকগণ।

কৃত্তিবাসের পরে চন্দ্রাবতী নাম্নী মহিলা একখানি রামায়ণ রচনা করেন, তাঁহার মৌলিকতা ও কবিত্বের বিশেষ উল্লেখ না করিয়া আমরা থাকিতে পারি না। এই রামায়ণ খানি কতকগুলি গানের সমষ্টি ; ময়মনসিংহের স্ত্রীলোকেরা বিবাহ-বাসর, বর-অভিষেক এবং অপরাপর মঙ্গলোৎসবের সময় এই রামায়ণ গান করিয়া থাকেন। চন্দ্রাবতী রচিত মনসাদেবীর গান, রামায়ণ-গীতি, মলুয়া ও কেণারাম প্রভৃতি কবিতা সমস্ত পূর্ব্ব-ময়মনসিংহের পরিচিত নিজস্ব সম্পদ্, মাঝিদের মুখে কৃষকের সুরে তাহা নদীতটে, শস্যক্ষেত্রে ও পল্লী-কুটিরে তুল্যরূপে প্রতিধ্বনিত হইয়া আসিতেছে।

চন্দ্রাবতী প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের মধ্য-মণি স্বরূপ, ইহাঁর প্রতিভা কিরীট বিজয়-দৃপ্ত। কিন্তু তাঁহার কবিতা অদ্যাপি খনির আঁধারে মণির ন্যায় লুকাইয়া আছে। এপর্য্যন্ত এই মহিলা-কবির কাব্যের কথা কয়জনে জানেন ? শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দে ইহাঁকে আবিষ্কার করিয়াছেন, তিনি সমস্ত বাঙ্গালী-জাতির ধন্যবাদ-পাত্র। চন্দ্রাবতীর রামায়ণের অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি আমার নিকট আছে, মহিলা কবি পুস্তকখানি সম্পূর্ণ করিবার পূর্ব্বেই প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিলেন।

চন্দ্রাবতীর পিতা প্রাচীন সাহিত্যে একটি সম্মানার্হ পদ অধিকার করিয়া আছেন ; তিনি সুপরিচিত কবি বংশীদাস ; ইনি মনসাদেবীর ভাসান রচকগণের মধ্যে একজন অতি প্রধান কবি। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, হাইকোর্টের প্রধান উকিল শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বংশীদাসের

"মনসামঙ্গল" বৃহৎ ভূমিকাসহ প্রকাশ করিবার সময় বংশীদাসের কন্যা চন্দ্রাবতীর নাম জানিতেন না। বটতলার প্রকাশকগণ বংশীদাসকে বিকৃত করিয়া প্রকাশ করিয়া ছিলেন, তাহাতে ক্ষোভের বিষয় নাই। কিন্তু দ্বারকাবাবু স্বয়ং ময়মনসিংহবাসী। ময়মনসিংহের অন্তর্গত একটা বৃহৎ প্রদেশ জুড়িয়া চন্দ্রাবতীর গীতিকা বনফুলের ন্যায় ছড়াইয়া আছে, দ্বারকাবাবু একটু চেষ্টা করিলেই তাহা জানিতে পারিতেন। বংশীদাস কিশোরগঞ্জ মহকুমার অধীন পাটওয়ারী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, তৎকৃত "মনসামঙ্গল" ১৪৯৭ শকে অর্থাৎ ১৫৭৬ খৃঃ অব্দে শেষ। মনসামঙ্গলে চন্দ্রাবতী ও তাঁহার প্রণয়ী জয়চন্দ্রের অনেক কবিতা আছে। বংশী স্বীয় কন্যার সাহায্যে এই পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। মনসামঙ্গল রচনার সময় চন্দ্রাবতীর বয়ঃক্রম অন্যূন ২৫ বৎসর ধরিয়া লইলে ১৪৭২ শকে অর্থাৎ ১৫৫০ খৃঃ অব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এরূপ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। বংশীদাস,—বৃন্দাবনদাস ও লোচনদাসের সমসাময়িক কবি; এবং চন্দ্রাবতী বয়সে তরুণ হইলেও সেই সময়ে কবি-প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

চন্দ্রাবতী স্বীয় রামায়ণে বংশপরিচয় নিম্নলিখিতভাবে দিয়াছিলেন।

"ধারাস্রোতে ফুলেশ্বরী নদী বহে যায়।
বসতি যাদবানন্দ করেন তথায়॥
ভট্টাচার্য্য বংশে জন্ম অঞ্জনা ঘরণী।
বাঁশের পালায় ঘর ছনের ছাউনি॥
ঘট বসাইয়া সদা পূজে মনসায়।
কোপ করি সেই হেতু লক্ষ্মী ছেড়ে যায়॥
দ্বিজবংশী পুত্র হৈলা মনসার বরে।
ভাসান গাহিয়া যিনি বিখ্যাত সংসারে॥
ঘরে নাই ধান চালু চালে নাই ছাউনি।
আকর ভেদিয়া পড়ে উচ্ছিলার পানি॥
বাড়াতে দারিদ্র্য-জ্বালা কষ্টের কাহিনী।
তার ঘরে জন্ম লৈলা চন্দ্রা অভাগিনী॥
সদাই মনসা-পদ পূজে ভক্তিভরে।
চালু কড়ি কিছু পান মনসার-বরে॥
দূরিতে দরিদ্র দুঃখ দিলা উপদেশ।
ভাসান গাহিতে স্বপ্নে করিল আদেশ॥
মনসা দেবীরে বন্দি করি কর যোড়।
যাহার প্রসাদে হোল সর্ব্ব দুঃখ দূর॥

মায়ের চরণে মোর কোটী নমস্কার।
যাহার কারণে দেখি জগৎ সংসার ॥
শিব শিবা বন্দি গাই ফুলেশ্বরী নদী।
যার জলে তৃষ্ণা দূর করি নিরবধি ॥

*　　*　　*

বিধিমতে প্রণাম করি সকলের পায়।
পিতার আদেশে চন্দ্রা রামায়ণ গায় ॥

*　　*　　*

সুলোচনা মাতা বন্দি দ্বিজবংশী পিতা।
যার কাছে শুনিয়াছি পুরাণের কথা ॥

উদ্ধৃত কবিতার "যোড়" শব্দের সঙ্গে "দূব" শব্দেব মিল দেওয়া হইয়াছে। ইহা কবির দুষ্ট-প্রয়োগ নহে। ময়মনসিংহ প্রভৃতি অঞ্চলে এখনও "যোড়" শব্দ "যুড়" এইরূপে উচ্চারিত হইয়া থাকে।

চন্দ্রাবতীর জীবন একটি বিয়োগান্ত কাব্য। ইনি পাটওয়ারী গ্রামে যে পাঠশালায় পড়িতেন, সেই পাঠশালায় জয়চন্দ্র নামক এক ব্রাহ্মণ বালকও পড়িতেন। বাল্যাবধি ইহাঁরা পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন; ইহাঁরা পরস্পর প্রতিযোগিতা করিয়া কবিতা লিখিতেন, অতিক্রান্ত কৈশোরে বংশীদাসের অনুমতিক্রমে ইহাঁদের পরিণয় স্থিরীকৃত হয়। চপলমতি জয়চন্দ্র ইহাঁর মধ্যে অকস্মাৎ একটি মুসলমানযুবতীর প্রণয়ে পড়িয়া ইসলামধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এই সংবাদ বংশীদাসের পরিবারে বজ্রের মত পতিত হইল। মূর্ত্তিময়ী শুচি স্বরূপা চন্দ্রাবতী ইহাঁর পর আর বিবাহ করিলেন না,—যদিও এই গুণশালিনী রমণীর পাণিগ্রহণের জন্য যোগ্য বরের কোন অভাব ছিল না। জয়চন্দ্র কয়েকবৎসরের মধ্যে অনুতাপদগ্ধ হইয়া চন্দ্রাবতীর সঙ্গে দেখা করিবার জন্য একখানি পত্র লিখেন। পিতার অনুমতিক্রমে চন্দ্রাবতী সেই পত্রের ভদ্রতার সহিত উত্তর প্রদান করেন, কিন্তু জয়চন্দ্র তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকারের জন্য যে অনুমতি চাহিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন, সে অনুমতি তাঁহাকে দেওয়া হইল না। বংশীদাস কন্যার ধ্যানধারণার জন্য একটি শিবমন্দির প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন, আজন্মকুমারী চন্দ্রা ফুলেশ্বরীর তীরে সেই মন্দিরেই অনেক সময় কাটাইতেন। একদিন জয়চন্দ্র উন্মত্তের ন্যায় পাটওয়ারী গ্রামে উপস্থিত হইয়া সেই মন্দিরে প্রবেশের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু চন্দ্রা দ্বার খুলিলেন না। সেই শিবমন্দিরের প্রাঙ্গণে রক্তবর্ণ সন্ধ্যামালতী ফুটিয়াছিল, তাহা নিংড়াইয়া সেই আরক্ত রসধারা মন্দিরের গাত্রে জয়চন্দ্র একটি কবিতা লিখিয়া ফুলেশ্বরীতে আত্মবিসর্জ্জন করিলেন। চন্দ্রা সংযতব্রত ধরিয়া জীবন কাটাইয়া ছিলেন; আজন্মের সাধনার ধনকে মন্দিরে প্রবেশ করিতে দিলেন না, ফুলেশ্বরীর জলে হারাইয়া ফেলিলেন, সেই শোক অসহ্য হইল। চন্দ্রা ইহার অল্পপরেই শিবারাধনায় বসিয়া

হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়েন, এবং তৎপর তাঁহার আর চৈতন্য হইল না। স্বর্গের প্রেম ও কবিত্ব পৃথিবীর ধূলায় স্মৃতিমাত্র রাখিয়া অন্তর্হিত হইয়া গেল। শুনিয়াছি, চন্দ্রার জীর্ণ, ভগ্ন শিবমন্দির এখনও বিদ্যমান, এবং তাঁহার এই প্রেমকাহিনী সেই দেশের লোকে এখনও ভোলে নাই। শিক্ষিত-সম্প্রদায় আইভান্ হো ও রেবেকার প্রেম লইয়া যখন ব্যস্ত ছিলেন, তখনও পল্লীর অশিক্ষিত সম্প্রদায় পূর্ব্ববঙ্গে চন্দ্রা ও জয়চন্দ্রের প্রণয়-কথা লইয়া প্রমত্ত ছিল। নয়নানন্দ নামক এক কবি চন্দ্রাবতীর প্রেমবিষয়ক একটি পালাগান রচনা করিয়াছেন, তাহাতে করুণ রস ও কবিত্ব বন্যার মত ছুটিয়াছে। এই গানটি চন্দ্রাবতীর প্রায় সম সাময়িক।

মনসাদেবীর কথা ও রামায়ণ ছাড়া চন্দ্রা "মলুয়া" "কেনারাম" প্রভৃতি কয়েকটি ক্ষুদ্র কাব্য রচনা করেন, তাঁহার রচনা সরল কথায় কবিত্বময়, যেন বনফুলের হার। সারল্যই তাহাদের সৌন্দর্য্য ও কবির জীবনের দুঃখই সেগুলিতে করুণ-রসের সাফল্যের কারণ। মলুয়া কাব্যে চন্দ্রাবতী করুণ রসের অফুরন্ত সুধা ঢালিয়া দিয়াছেন।

ভক্তির মন্দাকিনী প্রবাহ কেনারামের গীতিতে। ইহা তাঁহার কল্পনার দান নহে। ইহাতে সত্য-কথা কাব্যে পরিণত হইয়াছে। যদি কোন ঐতিহাসিক কবির প্রাণ লইয়া কবির চক্ষে প্রকৃত ঘটনাগুলি দেখিতে পারেন, তবে সত্য হইতে আশ্চর্য্য কাব্য আর কি হইতে পারে ?

এই গীতিকায় আমরা বংশীদাসের জীবনের একটী অতি প্রধান ঘটনা অতি যথাযথরূপে বর্ণিত দেখিতে পাই। উত্তরকালে বংশীদাসের আসরের গায়ন হইয়াছিলেন কেণারাম, কিন্তু কেণারাম তৎপূর্ব্বে ময়মনসিংহ জেলার সর্ব্বত্র ভীতিদায়ক একটি দস্যুরূপে পরিচিত ছিল ; তাহার নাম শুনিলে গৃহস্থদের ঘুম ছুটিয়া যাইত ও শিশুরা মাতৃক্রোড়ে ঘুমাইয়া পড়িত। এই সময়ে বংশীদাসের নাম ময়মনসিংহে বিশেষ প্রচারিত ছিল, তিনি কেবল মনসামঙ্গলের কবি ছিলেন এমন নহে, তাঁহার মত মনসামঙ্গল তখন কেহ গাহিতে পারিতেন না ; সুকবি যদি সুগায়ক হন, তাহার উপর যদি তাহাব রচনায় করুণরস থাকে, তবে তাঁহার প্রভাব এড়াইবে কে ? বংশীদাসের দল ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে পূর্ব্ববঙ্গের একটা বৃহৎ জনপদে অপ্রতিহত ভাবে জয়ী থাকিয়া আসর জমাইয়া রাখিয়াছিল। সে সময়ে সেই প্রদেশ ধন-ধান্যশালী ও সমৃদ্ধ ছিল, চন্দ্রাবতী লিখিয়াছেন,—

> "বাথানে মহিষ আব পালে যত গাই।
> কত যে চরিত তার লেখা জোখা নাই॥"

কিন্তু হইলে কি হয় ? জেলায় তখন ঘোর অরাজকতা বিরাজ করিতে ছিল, আমরা চন্দ্রাবতীর রচনা হইতে উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

টাকা পয়সা রাখে লোক মাটিতে পুতিয়া।
ডাকাত কাড়িয়া লয় গামছা মোড়া দিয়া॥
ডাকাত দেশের রাজা পাতসায় না মানে।
উজাড় হইল রাজ্য কাজির শাসনে॥
দৈছত পাইয়া সবে ছাড়ে লোকালয়।
ধনে প্রাণে মরে প্রজা চন্দ্রাবতী কয়॥

দেশের যখন এই অবস্থা তখন বংশীদাস একদা স্বীয় দলের সহিত ভাসান গান করিবার জন্য দূর-প্রবাসের পথে যাইতে ছিলেন—সম্মুখে প্রকাণ্ড বন—তাহা নলখাগড়ায় পূর্ণ, উহার নাম "জালিয়া হাওর"। এই স্থানে তিনি দস্যু কেণারাম কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন এবং তাঁহাকে মনসা দেবীর ভাসান গানে দীক্ষিত করেন। এ সম্বন্ধে আমরা পরিশিষ্টে আরও আলোচনা করিব। এই ঘটনা অতি প্রাণস্পর্শী ভাষায় তদীয় কন্যা চন্দ্রাবতী বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে চন্দ্রাবতীর রামায়ণ সম্পূর্ণ নহে। ইহাতে সীতার বনবাস পর্য্যন্ত বর্ণিত আছে। বংশীদাস স্বীয় কন্যাকে নিরাশজীবনের ব্যর্থতা হইতে রক্ষা করিবার জন্য রামায়ণ রচনা করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। জয়চন্দ্রের আত্মহত্যার অব্যবহিত পরেই চন্দ্রা ইহলোক ত্যাগ করেন, এইজন্য পুস্তকখানি সমাধা করিয়া যাইতে পারেন নাই। এই রামায়ণের ভাষা সম্বন্ধে পূর্ব্বেই লিখিয়াছি,—ইহা পল্লীবাহী নদীতরঙ্গের ন্যায় গতিশালী, সতেজ ও কবিত্বময়। উত্তরকাণ্ডের একটি অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি। কৈকেয়ীর এক কন্যা ছিল, তাঁহার নাম কুকুয়া ; মাতার পথ অনুসরণ করিয়া অযোধ্যার শান্তি-ভঙ্গ করাই কুকুয়ার সংকল্প ; এই চরিত্রটি কৃত্তিবাসী রামায়ণে নাই, কাশ্মীরি রামায়ণে আছে বলিয়া গ্রীয়ারসন সাহেব আমাকে জানাইয়াছেন। তাহা ছাড়া, তির্ব্বত, মালয়, জাভা, কাম্বোজ প্রভৃতি রামায়ণেও অনুরূপ চরিত্র দৃষ্ট হয়। *

শয়ন মন্দিরে একা গো সীতা ঠাকুরাণী।
সোনার পালঙ্ক পাতা গো ফুলের বিছানি॥
চারি দিকে শোভে তার গো সুগন্ধী কমল।
সুবর্ণ ভৃঙ্গার ভরা গো সরযূর জল॥
নানা জাতি ফল আছে সুগন্ধে রসিয়া।
যাহা চায় তাহা দেয় গো সখীরা আনিয়া॥

* রামায়ণের বিচিত্র উপাদান সম্বন্ধে উল্লিখিত "Bengali Ramayans" নামক পুস্তকে এবং পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকার চতুর্থ ভাগ, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে বিস্তারিত আলোচনা আছে বাল্মীকির রামায়ণে সঙ্গে জাতক কাহিনীগুলির সম্পর্ক ও তাহাতে দেখান হইয়াছে।

ঘন ঘন হাই উঠে গো নয়ন চঞ্চল।
অল্প আবেশ অঙ্গ গো মুখে উঠে জল॥
উপকথা সীতারে শুনায় অলাপনী।
হেনকালে আসিল তথায় কুকুয়া ননদিনী॥
কুকুয়া বলিছে গো বধূ মোর বাক্য ধর।
কিরূপে বঞ্চিলা তুমি গো রাবণের ঘর॥
দেখি নাই রাক্ষস গো শুনিতে কাঁপে হিয়া।
দশ মুণ্ড রাবণ রাজা দেখাও আঁকিয়া॥
মূর্চ্ছিতা হইল সীতা গো রাবণ নাম শুনি।
কেহ গো বাতাস দেয় গো কেহ পাণি॥
সখীগণ কুকুয়ারে করিল বারণ।
অনুচিত কথা তুমি বল কি কারণ॥
রাজার আদেশ নাই বলিতে কুকথা।
তবে কেন ঠাকুরাণী গো মনে দিলে ব্যথা॥
প্রবোধ না মানে গো কুকুয়া ননদিনী।
বার বার সীতারে বোলয়ে সেই বাণী॥
সীতা বলে আমি তারে গো না দেখি কখন।
কিরূপে আঁকিব আমি গো পাপিষ্ঠ রাবণ॥
যত করি বুঝান গো কুকুয়া না ছাড়ে।
হাসিমুখে সীতারে বুঝায় বারে বারে
বিষ লতার বিষ ফল বিষ গাছের গোটা।
অন্তরে বিষের হাসি গো বাঁধাইল লেঠা॥
সীতা বলে দেখিয়াছি গো ছায়ার আকারে।
হরিয়া যখন দুষ্ট লৈয়া যায় মোরে॥
সাগর জলেতে পড়ে গো রাক্ষসের ছায়া।
দশ মুণ্ড কুড়ি হস্ত রাক্ষসের কায়া॥
বসি ছিল কুকুয়া গো শুইল পালঙ্কেতে।
আবার সীতারে কয় রাবণ আঁকিতে॥
এড়াতে না পারি সীতা গো পাখার উপর।
আঁকিলেন দশমুণ্ড গো রাজা লঙ্কেশ্বর॥
শ্রমেতে কাতর সীতা গো নিদ্রায় ঢলিল।
কুকুয়া তালের পাখা গো বুকে তুলে দিল॥

মহর্ষি বাল্মীকিকৃত রামায়ণের সঙ্গে যে উত্তরকাণ্ড জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে এবং যাহা এ পর্য্যন্ত তাঁহারই নামে চলিয়া আসিয়াছে, তাহাতে সীতার প্রতি রামের কোন হীন সন্দেহ স্থান পায় নাই। "তিনি জগৎ মধ্যে শুদ্ধা, তিনি আমার প্রতি প্রীতা হউন" রাম এইরূপে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু সীতা-বনবাস বাঙ্গালা রামায়ণে যে সন্দেহের ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া আছে, তাহা জৈন রামায়ণ অবলম্বনে। হেমচন্দ্র আচার্য্য ষোড়শ শতাব্দীতে যে রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন, তাহা দাক্ষিণাত্যপ্রচলিত কতকগুলি প্রাচীন কিম্বদন্তী ও উপাখ্যানমূলক। এককালে বঙ্গদেশে জৈন-প্রভাব খুব বেশী ছিল, তাঁহারা রাম ও রাবণ সংক্রান্ত অনেক প্রাচীন আখ্যায়িকা এ দেশে লইয়া আসিয়াছিলেন—তাহাতেই সীতার প্রতি সন্দেহ জন্মাইবার জন্য রামায়ণে একটা ইয়াগুর মত চরিত্র অঙ্কন করার প্রয়োজন হইয়াছিল। জৈন-রামায়ণে সীতার সতিনী তাঁহাকে রাবণের আকৃতি অঙ্কন করিতে অনুরোধ করিয়াছিল। চন্দ্রাবতী কুকুয়াকে দিয়া তাহাই করিয়াছেন। সীতা নিদ্রিতা হইলে পর কুকুয়া রামকে ডাকিয়া আনিয়া দেখাইল এবং বলিল "দেখ, তোমার সাধ্বী সীতা এখনও রাবণকে ভুলিতে পারে নাই, তাহার ছবি আঁকিয়া বক্ষে লুকাইয়া রাখিয়াছে।" চন্দ্রাবতীর রামায়ণের একটি অংশ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি, পাঠক দেখিবেন, মাইকেলের সীতাসরমার কথোপকথনের উপাদান তিনি চন্দ্রাবতীর রামায়ণ হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন, পূর্ব্ববঙ্গের বহু স্থানে মেয়েরা চন্দ্রাবতীর রামায়ণ বিবাহ প্রভৃতি মঙ্গলোৎসবে গান করিতেন, মাইকেল নিশ্চয়ই তাহা শুনিয়া থাকিবেন। পাঠক দেখিতে পাইবেন, মাইকেলের গুরুগম্ভীর শব্দাড়ম্বর পূর্ণ বর্ণনা হইতে—চন্দ্রাবতীর করুণ বিলাপের সুরটি কত বেশী হৃদয়গ্রাহী।

"ঘুরিতে ঘুরিতে আইলাম গো আমরা তিন জন, গোদাবরী নদীর কূলে গো পঞ্চবটী বন। এইখানে রঘুনাথ গো কহিলা লক্ষ্মণে। কুটির বান্ধিয়া গো বাস করি এইখানে॥ লতাপাতা দিয়া গো কুটির বান্ধিল লক্ষ্মণ। কুটিরের মধ্যে গো থাকি মোরা দুই জন॥ বৃক্ষতলে দাণ্ডাইল গো দেবর লক্ষ্মণ। ধনু হাতে দিবানিশি গো রহে জাগরণ॥ দেবরের গুণ আমি গো না পারি কহিতে। অরণ্য ভাঙ্গিয়া গো ফল তুলি দেয় হাতে॥ রসাল বনের ফল গো পাতার কুটির পাইয়া। অযোধ্যার রাজ্যপাট গেলাম ভুলিয়া। লক্ষ্মণ কানন হইতে গো আনি দেয় ফল। পদ্মপত্রে আনি আমি গো তমসার জল॥ চরণ ধুইয়া প্রভুর গো তৃণ শয্যা পাতি। মনের আনন্দে কাটি গো বনবাসের রাতি॥ কি করিবে রাজ্য সুখ গো রাজ সিংহাসনে, শত রাজ্য পাট আমার গো প্রভুর চরণে॥ ভোরেতে উঠিয়া মালা গো গাঁথি বন ফুলে, আনন্দে পরাই মালা গো প্রভু রামের গলে। সুন্দর দীঘল প্রভুর গো বাহু উপাধান, প্রত্যেক রজনী গো সীতার এমতি শয়ান। মৃগ ময়ূর আর গো বনের পশু পাখী, সীতার সঙ্গের সঙ্গী গো তারা সীতার দুঃখের দুঃখী॥ শুক-সারী ছিল দুই গো পঞ্চবটী বন। বনে হইল প্রতিবাসী তারা দুই জন। কভুবা শুনায় গান গো শুক আর সারী, কাননে বেড়াই গো প্রভু রামের গলা ধরি। কায়ার সহিত যেন ছায়ার ঘুরণ। পর্ব্বত কানন ঘুরি বেড়াই তিন জন।"

শিবশঙ্কর নাম গো লইয়া আচম্বিতে, দণ্ডাইল যোগী এক আসিয়া দ্বারেতে। দণ্ড কমণ্ডলু ধারী গো অঙ্গে মাখা ছাই।

দুয়ারে আসিয়া বলে ভিক্ষা কিছু চাই॥ "কি দিব গো ভিক্ষা আমি শুনহে গোসাঞি। শূন্য গৃহে একাকিনী গো প্রভু সঙ্গে নাই॥ আজি যদি থাকিতাম গো অযোধ্যা ভবনে। ধামায় মাপিয়া দিতাম গো রত্নাদি কাঞ্চনে॥" যোগী বলে "ধনে মোর নাহি প্রয়োজন। ঘরে আছে বনের ফল তাই কর দান॥ ক্ষুধায় অবস অঙ্গ গো আইলাম তব দ্বারে। অতিথে না দিলে ভিক্ষা গো যাই তবে ফিরে॥ একটি বনের ফল গো অঞ্চলে বাধিয়া। কুটিরের বাহির হইলাম গো ভাবিয়া চিন্তিয়া॥ আমি কি গো জানি সখি কাল সর্প বেশে, এমনই করিয়া সীতায় ছলিবে রাক্ষসে। প্রণাম করিনু আমি গো পড়িয়া ভূতলে, উড়িয়া গরুড় পক্ষী সর্প যেমন গিলে। রথেতে তুলিল মোরে দুষ্ট লঙ্কা পতি, দেবগণে ডাকি কহিগো দুঃখের ভারতী। অঙ্গের আভরণ খুলি গো মারিনু রাক্ষসে। পর্ব্বতে মারিলে ঢিল কিবা যায় আসে॥"

আমরা এস্থলে সংক্ষেপে অপরাপর রামায়ণরচকদিগের উল্লেখ করিয়া যাইতেছি ;—

১। দ্বিজ মধু কণ্ঠের রামায়ণ—সরল কবিত্বপূর্ণ ; এই গ্রন্থের অনেক খণ্ডিত অংশ পাওয়া গিয়াছে। একখানি প্রতি-লিপি ১৬৬৪ খৃঃ অব্দে লিখিত।

২ ও ৩। ষষ্ঠীবর ও গঙ্গাদাস সেন—ইঁহারা পিতা পুত্র। ইঁহাদের বাসস্থান "দীনার দ্বীপ" বলিয়া পুঁথিতে পাওয়া যায়। স্বর্গীয় অক্রুরচন্দ্র সেন মহাশয়ের মতে এই দীনার দ্বীপও মহেশ্বরদি পরগণার অন্তর্গত সোনার গাঁর নিকটবর্ত্তী বর্ত্তমান 'ঝিনারদি' একই স্থান। ষষ্ঠীর ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। ২০০ বৎসর পূর্ব্বের হস্তলিখিত পুঁথিগুলিতেও ইঁহাদের উভয়ের রচনা পাওয়া যাইতেছে। ইঁহারা উভয়েই সাহিত্যব্রতে আজীবন বিব্রত ছিলেন। পদ্মাপুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি সমস্ত প্রসঙ্গেই ইঁহাদের প্রতিভা দেখিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের প্রাচীন হস্তলিখিত পুথিগুলির অধিকাংশেই এই উদ্যোগী কবিদ্বয়ের লেখার নমুনা আছে। একখানি প্রাচীন পদ্মাপুরাণে দেখা গেল—ষষ্ঠীবরের উপাধি ছিল "গুণরাজ।" মালাধর বসু, হৃদয়মিশ্র ও ষষ্ঠীবর বঙ্গসাহিত্যে এই তিন ব্যক্তির উপাধি "গুণরাজ" পাওয়া যাইতেছে। ষষ্ঠীবর, জগদানন্দ নামক কোন ব্যক্তির আশ্রয় লাভ করিয়া কাব্য লিখিয়াছেন, সেই পরিচয়ের অংশ ১২৩ পৃষ্ঠার পাদটীকায় উদ্ধৃত হইয়াছে। ষষ্ঠীবরের রচিত রামায়ণের অনেক উপাখ্যান পাওয়া গিয়াছে। ষষ্ঠীবরের রচনা সংক্ষিপ্ত, সরল ও পরিপক্ক, কিন্তু তৎপুত্র গঙ্গাদাসের রচিত পদ্য চঞ্চল ও সুন্দর, তাহা বেশ চিত্তাকর্ষক ; তত সংক্ষিপ্ত নহে, কিন্তু বিস্তৃত হইয়াও মনোরম—কোন অংশই বিরক্তিকর হয় নাই। গঙ্গাদাসের রচিত রামায়ণের উত্তরকাণ্ড হইতে নমুনা দেখাইতেছি ;—সীতার অযোধ্যায় প্রবেশের পর শ্রীরাম বলিলেন—"অগ্নিশুদ্ধা হইয়া সীতা পুরী মধ্যে যাউক। পাপিষ্ঠ অযোধ্যার লোক চক্ষু ভরি চাউক।" কিন্তু সীতার "মুক্তা জিনি বিন্দু বিন্দু চক্ষে পড়ে পানি। রাম সম্বোধিয়া বলে গদগদ বাণী॥ সংসারের সার তুমি অগতির গতি। আপনি জান যে আমি সতী কি অসতী॥ পৃথিবীনন্দিনী আমি তোমার ঘরণী॥ বিধাতা সৃজিল মোরে করি অলক্ষ্মীণী। বারংবার আনি আমা দোষ পুনি পুনি। নগরে চত্বরে যেন কুলটা রমণী॥ অপমান মহাদুঃখ না সএ পরাণে। মেলানি মাগিল সীতা তোমার চরণে॥ তবে তুমি পরে আর নাহি মোর গতি। জন্মে জন্মে স্বামী হউ তুমি রঘুপতি॥ এই বলিয়া সীতাদেবী অতি মনোদুখে। মা মা বলিয়া সীতা ঘন ঘন ডাকে॥ সাগর জঙ্গম ভার সহিবার পার। আমার ভার মা কেন সহিতে না পার॥" কবি গঙ্গাদাস সেন প্রায় প্রত্যেক পত্রেই পিতা ও পিতামহের নাম উল্লেখ করিয়াছেন—"পিতামহ কুলপতি পিতা ষষ্ঠীবর। যার যশঃ ঘোষে লোকে পৃথিবী ভিতর॥" ষষ্ঠীবর একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন, এরূপ অনুমান করিবার আরও অনেক কারণ আছে। আমরা মহাভারত আলোচনা করিবার সময়

ষষ্ঠীবর ও গঙ্গাদাস।

এই দুই কবির প্রসঙ্গ পুনশ্চ উত্থাপন করিব। গঙ্গাদাস সেন রচিত একখানি মনসার ভাসানের পুঁথিতে আমরা ইঁহাকে বণিক কুলজাত বলিয়া জানিতে পারিয়াছি। ইঁহাদের বাসস্থান ঝিনারদিতে এখনও অনেক সুবর্ণবণিক বাস করেন, সুতরাং ইঁহারা সুবর্ণ বণিক কুলে উৎপন্ন বলিয়া মনে হয়।

৪। ভবানী-দাস বিরচিত লক্ষ্মণ-দিগ্বিজয়। ভবানীদাস জয়চন্দ্র নামক কোন রাজার আদেশে এই পুস্তক রচনা করেন। লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন অনুষ্ঠিত নানা দেশবিজয়ের বৃত্তান্ত এই কাব্যে লিখিত হইয়াছে। লক্ষ্মণ-দিগ্বিজয়ে প্রায় ৫০০০ শ্লোক আছে সুতরাং ইহা আকারে বড়; কিন্তু গুণে বড় বলিয়া বোধ হয় না, রচনা শুষ্ক ও একঘেয়ে। এই কাব্যের কয়েকটি স্থলে রামচরণনামক কবির ভণিতা আছে। ভবানীদাস-বিরচিত "রাম-স্বর্গারোহণ" নামক আর একখানি কাব্য আমরা দেখিয়াছি। "লক্ষ্মণ দিগ্বিজয়" ও "রাম-স্বর্গারোহণ" একই ভবানীদাসের লিখিত কিনা বলা যায় না। শেষোক্ত পুঁথিতে গ্রন্থকারের এই একটু সামান্য পরিচয় আছে;—"নবদ্বীপ বন্দম অতি বড় ধন্য যাহাতে উৎপত্তি হৈল ঠাকুর চৈতন্য॥ গঙ্গার সমীপে আছে বদরিকাশ্রম। তাহাতে বসতি করে ভবানীদাস নাম॥ বামনদেব পিতা যশোদা জননী। সপুত্রে বন্দম যবে সর্ব্বলোক জানি॥" এই সমস্ত পরিচয় সম্বন্ধে একটি কথা এই যে, পরিচয়ের অংশ প্রায় সমস্ত প্রাচীন পুঁথিতেই পাঠ বিকৃতি দোষে দুষ্ট। গ্রাম এবং ব্যক্তিবিশেষের নাম কয়েকবার নকলের পরে যথাযথরূপে পাওয়া সুকঠিন।

ভবানীদাস।

৫। দ্বিজ দুর্গারাম প্রণীত রামায়ণ—অক্রুরচন্দ্র সেন মহাশয় উদ্ধার করেন। ইহা কৃত্তিবাসের পরে লিখিত, কবি নিজে তাহা অনেক স্থলে স্বীকার করিয়াছেন। কবির কোনও আত্মবিবরণ পাওয়া যায় নাই। আমি এই পুস্তক পড়ি নাই। অক্রুর বাবু লিখিয়াছেন "ইহার রচনা বড় মধুর। আমরা দ্বিজ দুর্গারামপ্রণীত কালিকাপুরাণের একখানি অনুবাদ পাইয়াছি।"

দুর্গারাম।

৬। জগৎরাম রায়ের রামায়ণ—কিঞ্চিৎ অধিক ১২৫ বৎসর হইল, বাঁকুড়া জেলার ভুলুই গ্রামে ব্রাহ্মণ বংশে জগৎরাম রায় জন্মগ্রহণ করেন। এই গ্রাম রাণীগঞ্জ রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে তিন মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে, ও বাঁকুড়ার ২০ মাইল উত্তরে। সাবেক ভুলুইগ্রাম নদীগর্ভে,—এখনকার ভুলুইগ্রামে জগৎরাম রায়ের বংশধরগণ বাস করিতেছেন। ভুলুই ও তৎসন্নিহিত স্থানগুলির দৃশ্য বেশ রমণীয়, কবির উপভোগ্য ও বাসস্থানের উপযুক্ত—"ভুলুই স্থানটি এখনও অতি রমণীয়। উত্তরে অদূরে বিহারীনাথ শৈল, পশ্চিমে কিছু দূরে পঞ্চকোট শৈলশ্রেণী ও অরণ্য, দক্ষিণে অতি নিকটে শীর্ণ দামোদর দুই পার্শ্বে বিস্তীর্ণ বালুকাস্তূপের মধ্য দিয়া তরল রজত রেখার ন্যায় ধীরে বহিয়া যাইতেছে।" (পাক্ষিক সমালোচক, ১২৯ বাং ভাদ্র)। কবির পিতার নাম রঘুনাথ রায় ও মাতার নাম শোভাবতী। পঞ্চকোটের রাজা রঘুনাথসিংহ ভূপের আদেশে ইনি রামায়ণের অনুবাদ আরম্ভ করেন, ১৭১২ শকে (১৭৯০ খৃঃ অব্দ) এই পুস্তক শেষ হয়। বিশ বৎসর পূর্ব্বে কবি "দুর্গাপঞ্চরাত্রি" নামক একখানা কাব্য রচনা করেন, ইহাতে রামচন্দ্র কর্তৃক কিষ্কিন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত দুর্গোৎসব বর্ণিত হইয়াছে। ১৬৯২ শকে (১৭৭০ খৃঃ অব্দে) ইহা সম্পূর্ণ হয়। এই কাব্যের ষষ্ঠী সপ্তমী ও অষ্টমীর পালা জগৎরাম রায়ের রচিত, অবশিষ্ট দুই পালা তৎপুত্র রামপ্রসাদ রচনা করেন। জগৎরাম রায়ের রামায়ণে মধ্যে মধ্যে বেশ সুন্দর বর্ণনা আছে, কিন্তু তাহা ততদূর প্রাঞ্জল নহে। মিষ্ট শব্দ ব্যবহারে কবি সর্ব্বত্র পটু নহেন; দুর্গাপঞ্চরাত্রি" কবির পরবর্ত্তী কাব্য, ইহার রচনা পরিপক্ব ও বেশ উপাদেয়। শিব ও গৌরীর কথাবার্ত্তা লইয়া মধুর ও তীব্র একটি দাম্পত্য কোন্দল লিখিত

জগৎরাম রায়।

হইয়াছে ; গোপীর মুখে শ্রীকৃষ্ণের 'রাখালী', 'পীতধটা' ও 'তিন ঠাঁই বাঁকার' খোঁটা ও শিবঠাকুরের সিদ্ধিধুতুরাপ্রিয়তা উপলক্ষে গৌরীর মিষ্টভৎ‍‍র্সন—সোহাগে ও গালিতে মিশ্রিত হইয়া বঙ্গসাহিত্যে রৌদ্রমিশ্রবৃষ্টির ন্যায় কৌতূহলকর হইয়াছে। জগৎরাম রায়ের কবিত্বের নমুন,—"তুমিহ যেমন, বলিলে তেমন, এমতি তোমার কাষ। তব দোষ নয়, ধুতুরাতে কয়, তেঞি সে এমন সাজ॥ এই করিয়া, সব খোয়াইয়া, হয়েছ দিগম্বর। তোমার গুণে বিঁধিল ঘুণে, আমার অন্তর॥ বিভূতি গায়, দেবের সভায়, যে যায় নেংটা বেশে। এমত কথা বলিতে হেথা, লাজ কি মুখে আসে॥ ভাঙ্গের ঘোরে নয়ন ফিরে, চলিতে ঠাহর নাই। জটার ঘটা বিভূতি ফোঁটা, দেখিলে ভয় পাই॥" রামপ্রসাদও পিতার অযোগ্যপুত্র নহেন,—'দুর্গাপঞ্চরাত্রি'তে তিনি এই ভাবে মুখবন্ধ করিয়াছেন,—"নবমী দশমী দুই দিবসের গান। বর্ণনা করিতে মোরে দিল আজ্ঞা দান॥ আজ্ঞা পেয়ে হর্ষ হয়ে কৈনু অঙ্গীকার। যেমন মশকে লয় মার্জ্জারের ভার॥ বামন বাসনা যেন বিধু ধরিবারে। পঙ্গু লংঘিবারে চায় সুমেরু শিখরে॥ তেন অঙ্গীকার কৈনু পিতার বচনে। আগু পাছু কিছুমাত্র না ভাবিলাম মনে॥" রামপ্রসাদ রচিত অপর একখানি বড় কাব্য আছে, তাহার নাম—"কৃষ্ণলীলামৃত রস।" শ্রীযুক্ত কাশীবিলাস বন্দ্যোপাধ্যায় নামক কবির জনৈক বংশধর এই পুস্তকখানির মধ্যে মধ্যে নিজের ভণিতা সূচক কবিতা দিয়া ইহা সম্প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা ভাষার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বলেন প্রকাশিত গোটা পুস্তকখানির যে কাপি তিনি ১৩২১ বঙ্গাব্দে সাহিত্য-পরিষদে দিয়াছিলেন, কাশীবাবুর প্রকাশিত পুস্তক তাহা হইতে অভিন্ন।

শিবচন্দ্র সেন।

৭। সারদামঙ্গল—শিবচন্দ্র সেন প্রণীত। গ্রন্থকারের পরিচয় এইরূপ—"বৈদ্যকুলে জন্ম হিঙ্গুসেনের সন্ততি। সেনহাটি গ্রামে পূর্ব্ব পুরুষ-বসতি॥ রামচন্দ্র গুণধাম প্রতিষ্ঠিত। যশে কুলে কীর্ত্তিতে বিখ্যাত বিরাজিত॥ রত্নেশ্বর গুণবান তাহার তনয়। রতন স্বরূপ কুলে হইলা উদয়॥ এ হেন তনয় হৈলা ভুবনে বিখ্যাত। রামনারায়ণ সেন ঠাকুর আখ্যাত॥ সেন ঠাকুরের পুত্র তুলনায় অতুল। রামগোপাল নাম উভয় শুদ্ধকুল। গঙ্গাদেব দত্ত পুত্র তাহার পবিত্র। শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ সেন নাম সুচরিত্র। বিক্রমপুরেতে বাঁটাদিয়া গ্রামে ধাম। ধন্বন্তরিবংশে জন্মে প্রাণনাথ নাম॥ সরকারে সুপাত্রে করিলা কন্যা দান। গঙ্গপ্রসাদ সেন ঠাকুর কীর্ত্তিমান॥ জন্মিল তাঁহার এই তৃতীয় সন্তান। শিবচন্দ্র, শম্ভুচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র নাম॥" 'সারদামঙ্গল' কাব্য বিক্রমপুর প্রভৃতি অঞ্চলে এককালে সর্ব্বত্র পঠিত হইত। এই শিবচন্দ্র সেন কবি ভারতচন্দ্রের কিছু পরে আবির্ভূত হন। শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গাপূজা রামায়ণে সারদামাহাত্ম্য জ্ঞাপক, এই জন্য কবি রামায়ণকে 'সারদামঙ্গল' আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। 'সারদামঙ্গল' অনেক দিন হইল মুদ্রিত হইয়াছিল, এখন সেই মুদ্রিত বহি দুষ্প্রাপ্য।

অদ্ভুতআচার্য্য।

৮। অদ্ভুতআচার্য্যের রামায়ণ—নিত্যানন্দ নামক এক ব্রাহ্মণ 'অদ্ভুতআচার্য্য' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত রামায়ণ অনুবাদ করিয়াছিলেন, এই রামায়ণখানিও এক সময়ে বিশেষরূপ আদৃত হইয়াছিল,—অনেক স্থলেই ইহার প্রাচীন পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বসু মহাশয় সংগৃহীত পুঁথিতে গ্রন্থকারের এইরূপ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে ; "প্রপিতামহো বন্দ্যো যাহার বাস খণ্ড। তাহার পুত্র নামেতে প্রচণ্ড॥ তাহার তনয় হ'ল নাম শ্রীনিবাস। গুণরাজ উপাধি মহাশয় তেঁহ রামচন্দ্রের দাস॥ তাহে পুত্র উপজিল মাণিক প্রচার। জন্মিল চারি পুত্র চারি সহোদর॥ চারি সহোদর পণ্ডিত গুণনিধি। ভারতীর প্রসাদে হইল অলক্ষিত সিদ্ধি। সোনা রাজ্যে নাম ছিল বড়বাড়ী গ্রাম। শুভক্ষণে হইল যে নিত্যানন্দ নাম। মহাপুরুষ তবে জন্মিল সংসারে। যত যত সৎকর্ম্ম তার পৃথিবী ভিতরে॥ দেবগণে মুনিগণে কর্ম্ম শুভাচার। অদ্ভুত নাম হইল বিদিত সংসার॥ মাঘ মাসে শুক্ল পক্ষ ত্রয়োদশী তিথি। ব্রাহ্মণবেশে পরিচয় দিলেন

রঘুপতি॥ প্রভুর কৃপা হইল রচিতে রামায়ণ। অদ্ভুত হৈল নাম সেই সে কারণ॥ যজ্ঞোপবীত নাহি বয়সে সপ্ত বৎসর। রামায়ণ গাহিতে আজ্ঞা দিলা রঘুবর॥ জন্মি নাহি জানে বিপ্র অক্ষরের লেশ। যত কিছু কহে বিপ্র রাম উপদেশ॥ পয়ার প্রবন্ধে পোথা করিল প্রচার। তপোবলে হইল তার এ তিন কুমার॥"

"সাকে বেদ রিতু সপ্ত চন্দ্রেতে বিম্বতে। সপ্তমি রেবতি যুত বার ভৃগুসুতে॥ কর্কটাতে স্থিতি রবিপঞ্চদশমীতে। কৃষ্ণপক্ষে সমাপ্তিকা প্রথম যামেতে॥" ১৭৬৪ শকের কথা নির্দ্দিষ্ট আছে, অথচ শ্রীরসিকচন্দ্র বসু মহাশয় ইহাতে "সম্বৎ" বলিয়াছেন। কিন্তু এ কার্য্য করা যে সঙ্গত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে তিনি নিজেই একটু সন্দিহান, এই জন্যই "বোধ হয় ১৭৬৪ সালে" এই ভাবে গ্রন্থকাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অদ্ভুত-আচার্য্যের রামায়ণ প্রায় ২০০ শত বৎসর হইল বিরচিত হইয়াছিল, আমরাও ইহা অনুমান করি। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের সংগৃহীত পুঁথিখানিরই বয়স অনুমানিক ১৫০ শত বৎসর। অক্রূরচন্দ্র সেন মহাশয় ইহার খুব প্রাচীন একখানি পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছেন, এতদবস্থায় "১৭৬৪ শক" সমর্থিত হওয়ার উপায় কি? এদিকে রসিকবাবুর মতানুসারে "শক" শব্দের অর্থ "সম্বৎ" করিয়া নূতন অভিধান সৃষ্টিপূর্ব্বক ঐতিহাসিক কাল নির্ণয় শুদ্ধ করিবার আমাদিগের অধিকার আছে কি না, তাহাও সন্দেহজনক। আমার বিবেচনায় ১৭৬৪ শক গ্রন্থ রচনার কাল নহে, উহা গ্রন্থ নকল করিবার কাল। "কৃষ্ণপক্ষে সমাপ্তিকা প্রথম যামেতে।" এই চরণ দ্বারা গ্রন্থের নকল সমাপ্ত হইল, এই অর্থগ্রহণই স্বাভাবিক হয়। প্রাচীন অনেক পুঁথিরই শেষাংশে নকল করিবার তারিখ এইরূপ সাঙ্কেতিক ভাবে নির্দ্দিষ্ট হইত। যাহা হউক আমরা রসিক বাবুর উদ্ধৃত অংশ অবলম্বন করিয়াই এই মত প্রকাশ করিলাম। শক স্থলে সম্বৎ অর্থ করিবার যদি অপর কোন কারণ থাকে, তবে তাহা শেষে বিবেচ্য। অদ্ভুতআচার্য্য সপ্তমবর্ষ বয়সে রামায়ণের অনুবাদ করিয়াছিলেন, একথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। বস্তুতঃ তিনি নিজেও এ কথা কোথাও বলেন নাই। রামচন্দ্র তাঁহার সপ্তমবর্ষ বয়ঃক্রমকালে তাঁহাকে স্বপ্নে দেখা দিয়াছিলেন, ও রামায়ণ গাহ গাহিতে আদেশ করিয়াছিলেন, তখন কবির যজ্ঞোপবীত হয় নাই। তৎপর সম্ভবতঃ উপযুক্ত বয়সেই কোনও সময় তিনি রামায়ণ রচনা করিয়া থাকিবেন। তিনি নিজে লেখা পড়া জানিতেন না, শুধু দৈবশক্তিবলে রামায়ণের অনুবাদ করিয়াছিলেন—এই জন্য তাঁহার উপাধি হইয়াছিল অদ্ভুতাচার্য্য। তিনি লেখা পড়া না জানিয়া রামায়ণের আচার্য্য হইয়া দাঁড়াইলেন, সুতরাং অদ্ভুত-আচার্য্য নন তবে কি? তিনি নিজেই এ কথা বলিয়াছেন, 'জন্মি নাহি জানে বিপ্র অক্ষরের লেশ। যত কিছু কহে বিপ্র রাম উপদেশ॥"

তাঁহার রামায়ণে আর একটী অদ্ভুত কথা আছে;—ইহাতে সীতাকে কালীর অবতার কল্পনা করিয়া বাল্মীকির সীতার উপর এক নূতন সীতা দাঁড় করান হইয়াছে।

৯। কবিচন্দ্র-কৃত রামায়ণ—ইঁহার বিবরণ মহাভারত প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

১০। শঙ্কর-বিরচিত রামায়ণ *—শঙ্কর প্রণীত আদি, অযোধ্যা, অরণ্য, কিষ্কিন্ধ্যা ও সুন্দরকাণ্ড পাওয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ ইনিও সমস্ত রামায়ণের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ইঁহার পরিচয় এইটুকু পাওয়া গিয়াছে,—

"সাগরদিয়ার বন্দ্য রবিকরী সর্ব্বানন্দ, গোবিন্দতনয় বিজয়রাম। তস্য পঞ্চ পুত্র দ্বিজ শঙ্কর। ভবানী শঙ্করাগ্রজ,"—ইত্যাদি। অপর এক স্থলে "বন্দিয়া জানকীনাথে শ্রীশঙ্কর গায়।"

শঙ্কর ও কবিচন্দ্র সম্ভবতঃ অভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন। উভয়ের একত্র ভণিতাযুক্ত দুই একখানি কাব্য পাওয়া গিয়াছে।

* অনন্ত-রামায়ণেও শঙ্করের উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে।

১১। লক্ষ্মণ বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত রামায়ণ—লক্ষ্মণকবি সম্ভবতঃ আধ্যাত্মরামায়ণের বঙ্গীয় অনুবাদ সঙ্কলন করিয়াছিলেন। এই রামায়ণের প্রায় ২০০ শত বৎসরের প্রাচীন পুঁথি পাওয়া গিয়াছে।

লক্ষ্মণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১২। রামমোহনের রামায়ণ—এই অনুবাদ একরূপ আধুনিক, ১৮৩৮ খৃঃ অব্দে এই পুস্তক সমাপ্ত হয়। রামমোহনের পিতার নাম বলরাম বন্দ্যোপাধ্যায়; বাড়ী নদীয়া জেলার গঙ্গার পূর্ব্বতীরস্থ মেটেরী গ্রাম। গ্রন্থকার পিতার আদেশে নিজ বাড়ীতে সীতারাম বিগ্রহ স্থাপন করেন। এই বিগ্রহদ্বয়ের নিকট খুব ভক্তির উৎস চলিত বলিয়া কবি বর্ণনা করিয়াছেন, "সে রামের দ্বারেতে সতত হুড়াহুড়ি। কেহ নাচে কেহ গায় দেয় গড়াগড়ি॥" পিতার আদেশে কবি সীতারাম বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন ও "কৃপা করি আদেশ করিলা হনুমান্। রামায়ণ রচি কর জীবের কল্যাণ॥" তদনুসারে—"রচিলাম তাঁর আজ্ঞা ধরিয়া মস্তকে। সাঙ্গ হইল সপ্তদশ শতষষ্টি শকে॥" এই রামায়ণ সর্ব্বত্র কৃত্তিবাসী রামায়ণের ন্যায় প্রাঞ্জল না হইলেও মধ্যে মধ্যে এরূপ অংশ আছে, যাহা আদি কবির প্রতিভার কণিকাপাতে স্নিগ্ধ ঔজ্জ্বল্যে মণ্ডিত হইয়াছে, যথা—"আষাঢ়ে নবীন মেঘ দিল দরশন। যেমত সুন্দর শ্যাম রামের বরণ॥ ঘন ঘন ঘন গর্জ্জে অতি অসম্ভব। যেমন রামের ধনু টঙ্কারের রব॥ রয়ে রয়ে সৌদামিনী চমকে গগনে। যেমন রামের রূপ সাধকের মনে॥ ময়ূর করয়ে নৃত্য নব মেঘ দেখি। রাম দেখি সজ্জন যেমত হয় সুখী॥ সদা জলধারা পড়ে ধরণী উপরে। সীতা লাগি যেমত রামের চক্ষু ঝুরে॥ সরসিজ শোভাকর হৈল সরোবরে। যেমন শোভিত রাম সেবক-অন্তরে॥ মধু আশে পদ্মে অলি বাস করে মোদে। যেমত মুনির মন রাঘবের পদে॥ জলপানে চাতকের তৃষ্ণা দূরে যায়। রাম পেলে যেমত বাসনা ক্ষয় পায়॥ পুলকিত হয়ে মেঘ ডাকে ঘনে ঘন। যেমন রামেরে ডাকে নামপরায়ণ॥ নদ নদী অতি বেগে সমুদ্রে মিশায়। যেমত রামের অঙ্গে জীব লয় পায়॥ অবিরত বৃষ্টিতে পৃথীর তাপ যায়। যেমত তাপিত রামনামেতে জুড়ায়॥' (কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড)। কবির বিদ্রূপ শক্তি বেশ ছিল। ভরত ও শত্রুঘ্ন অযোধ্যায় ফিরিলে পরে কুব্জা সকলের নিকট বড়াই করিয়া বলিয়াছিল, সে রাজপুত্রদের নিকট অনেক ভূষণ উপঢৌকন পাইবে। তৎপরিবর্ত্তে শত্রুঘ্নের প্রহারে কুব্জ দেহ ন্যুব্জ হইয়া পড়িল ও লজ্জায় কুব্জা পলাইবার পথ খুঁজিতে লাগিল। তখন—"নারীগণ কেহ বলে ভূষা দেখাইয়া যা। কুব্জা কহে ভাতার পুতের মাথা খা।" হনুমান লঙ্কাদগ্ধের পর বন্দী অবস্থায় ঢাক-ঢোল-বাদ্য সমন্বিত হইয়া লঙ্কার পথে পথে নীত হইতেছেন,—"হনুমান কন মোর বিবাহ না হয়। কন্যাদান করিবে রাবণ মহাশয়॥ রাবণের কন্যা মোর গলে দিবে মালা। রাবণ শ্বশুর মোর ইন্দ্রজিত শালা॥ চারিদিকে হাসয়ে যতেক নিশাচর। কেহ বা ইষ্টক মারে কেহ বা পাথর॥ হনুমান কন বিবাহের কাজ নাই। এমন মারণ খায় কাহার জামাই॥"—সুন্দরকাণ্ড। ইহা আধুনিক সংযত রহস্যের ওষ্ঠচাপা হাস্য নহে—ইহা ধূলি ও কাদা হস্তে উচ্চ হো হো শব্দমুখর সেকেলে হাস্যরস। রামমোহন কবির ভ্রাতুষ্পৌত্র শ্রীযুক্ত কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট এই পুস্তকের প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি আছে।

রামমোহন।

১৩। রঘুনন্দন গোস্বামি-রচিত রামায়ণ। রঘুনন্দনও বেশী প্রাচীন লেখক নহেন। ১০০ বৎসরের কিঞ্চিৎ অধিক কাল গত হইল তিনি বর্দ্ধমান জেলাস্থিত নাড় গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। রঘুনন্দন নিত্যানন্দবংশ-সম্ভূত; বংশতালিকা এইরূপ—১। নিত্যানন্দ, ২। বীরভদ্র, ৩। বল্লভ, ৪। রামগোবিন্দ, ৫। বিশ্বম্ভর, ৬। বলদেব, ৭। কিশোরিমোহন, ৮। রঘুনন্দন। কিশোরীমোহনের আর তিন

রঘুনন্দন গোস্বামী

পুত্র ছিল, বিশ্বরূপ, সঙ্কর্ষণ ও মধুসূদন ; রঘুনন্দন তাঁহার সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র। কিশোরীমোহন স্বয়ং এক জন প্রসিদ্ধ ভাগবত ছিলেন ও তিনি নিজে বহুবিধ বৈষ্ণবগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। রঘুনন্দনের গুরুর নাম গণেশ বিদ্যালঙ্কার 'সেকাল আর একাল,' পুস্তকে লিখিত আছে, রঘুনন্দন প্রায়শঃ প্রসিদ্ধ রামকমল সেন মহাশয়ের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিতে কলিকাতায় আসিতেছেন ; সেন মহাশয় ৭০ বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন।

রঘুনন্দনের মাতার নাম উষা ও বিমাতার নাম মধুমতী ছিল। 'রামরসায়ন' ব্যতীত রঘুনন্দনের শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার লীলা বিষয়ক 'শ্রীরাধামাধবোদয়' নামক একখানি বড় গ্রন্থ আছে। রঘুনন্দনের অপর নাম ভাগবত।

কৃত্তিবাসী রামায়ণের পর, অপরাপর যে সকল রামায়ণের অনুবাদ আমরা পাইয়াছি তন্মধ্যে 'রামরসায়ন' খানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কবি অনেকাংশে বাল্মীকিকে অনুসরণ করিয়াছেন, মধ্যে মধ্যে তুলসীদাসের হিন্দী রামায়ণ হইতেও কোন কোন অংশ গৃহীত হইয়াছে রামরসায়নের অধ্যায় বিভাগ ঠিক বাল্মীকির পথে করা হয় নাই, তবে পূর্ব্ববর্ত্তী রামায়ণগুলি হইতে এখানি অধিকতর বৈষ্ণবপ্রভাব চিহ্নিত সন্দেহ নাই। এই পুস্তকের অনেকাংশ ভাগবতের প্রতিচ্ছায়ার মত। অধ্যায়গুলি এইভাবে বিভক্ত হইয়াছে,—আদ্যকাণ্ড ১২, অযোধ্যা ৮, আরণ্য ৮, কিষ্কিন্ধ্যা ১০, সুন্দরা ১২, লঙ্কা ৩৬ ও উত্তরাকাণ্ড ১৮ অধ্যায়। কবির রচনায় সংস্কৃত শব্দ অতিরিক্তমাত্রায় পড়িয়াছে, মধ্যে মধ্যে তাহা শ্রুতিকটু হইয়াছে ; কিন্তু এরূপ-রচনাও বিরল নহে—"এথা রঘুবর, করিতে সমর, সুখেতে মগন হইয়া। অতি সুকোমল, তরুণ বাকল, পরিলা কটিতে আঁটিয়া॥ শিরে অবিকল, জটার পটল, বাঁধিলা বেড়িয়া বেড়িয়া। পরিলা বিকচ, কঠিন কবচ, শরীরে সুদৃঢ় করিয়া॥" রঘুনন্দনের পয়ারে ১৪ অক্ষরের নিয়ম কচিৎ লঙ্ঘিত হইয়াছে। এই কাব্যে নানা ছন্দের লীলা খেলা দৃষ্ট হয়, তাহা পরে আলোচনা করিব। কিন্তু কবির সংস্কৃতপরায়ণতা সত্ত্বেও হিন্দী-ভাষার ছিটা ফোঁটা তাঁহার কাব্যের প্রায় সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়। কহিতু, কৈলু, তিহ, তহঁ প্রভৃতি ক্ষুদ্র শব্দগুলি সংস্কৃতের সুশৃঙ্খল ও পরিশুদ্ধ প্রণালীর মধ্যে হিন্দী প্রভাবের পতনোন্মুখ ধ্বজা উড়াইতেছে।

কবি রামরসায়নের উত্তরকাণ্ডে করুণরসের অংশগুলি ছাড়িয়া দিয়াছেন। সীতাবর্জ্জন, লক্ষ্মণবর্জ্জন, সীতার পাতালপ্রবেশ রামরসায়ণে স্থান পায় নাই। যে ঘটনা মনকে দুঃখের তরঙ্গে ফেলিয়া যায়, যাহাতে প্রাকৃতিক বিধানের উৎকর্ষের উপর সন্দেহ জন্মে, যেখানে সত্য ও শুভের অসমর্থতা প্রমাণিত হয়—তাহাদের শশ্মানের উত্তাপে করুণার অশ্রুবিন্দু শুকাইয়া যায়, বৈষ্ণবগণ সেরূপ ঘটনা বর্ণনা করিতে ভালবাসিতেন না। সেইজন্যই চৈতন্য চরিতামৃত ও চৈতন্যভাগবতে গোরাঙ্গপ্রভুর তিরোধান বর্ণিত হয় নাই।

বিয়োগান্ত দৃশ্য অঙ্কন করিতে হিন্দুকবিগণ সততই অনিচ্ছুক, এইজন্য নায়ক নায়িকার দুঃখময় জীবন সমাপ্ত হইলে তাঁহারা শশ্মানের উপরে পটক্ষেপ করিয়া পাঠকের মনে ব্যাথা দেন না, কল্পনার স্বর্গরাজ্য গড়িয়া নায়ক নায়িকাকে তথায় পৌছাইয়া ক্ষান্ত হন, বিয়োগান্ত দৃশ্য কবির লিপি-কৌশলে সুখান্ত দৃশ্যের আভা ধারণ করিয়া পাঠকের দুঃখ ভুলাইয়া দেয়।

রঘুনন্দন তাঁহার রামরসায়ন গৃহপ্রতিষ্ঠিত শ্রীরাধামাধব' বিগ্রহের নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন—"করিলাম যেই রামবিলাস বর্ণন। শ্রীরাধামাধবে ইহা করিনু অর্পণ॥

পূর্ব্বোক্ত অনুবাদগুলি ছাড়া, দ্বিজ দয়ারামকৃত তরণীবধ, ফকিররাম কবিভূষণকৃত লঙ্কাকাণ্ড (বাং ১০০৮ সালের পুঁথি), ভিকন গুরুদাসকৃত আরণ্যকাণ্ড, দ্বিজ তুলসীকৃত "রায়বার", কাশীনাথ

কৃত ("বাস মোর লক্ষ্মীপুরে আছি টেরে") "কালনেমীর রায়বার" প্রভৃতি ও অপরাপর বহু কবিকৃত রামায়ণের বিচ্ছিন্নাংশ পাওয়া গিয়াছে।

বুদ্ধদেব কৃত রামায়ণ—উপাধি দেখিয়া পাঠকবর্গ চমৎকৃত হইবেন না। ইনি ইতিহাস-বিশ্রুত কপিলাবস্তুর বুদ্ধ নহেন। ইহাঁর নাম রামানন্দ ঘোষ, ইনি নিজকে 'শূদ্র' বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, এবং পুনঃপুনঃ সদর্পে নিজকে 'বুদ্ধ' বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন ; এমন কি তদীয় রামায়ণের ভণিতায় বহুস্থানে নিজের নামের স্থলে শুদ্ধ "বুদ্ধ" নামে পরিচয় দিয়াছেন। তিনি নিজ সম্বন্ধে কয়েকটি তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা এইঃ—(১) তাঁহার স্বীয় দানশীলতা ও কবিত্ব-যশ জগৎ-প্রসিদ্ধ, (২) তাঁহার বহু ভক্তমণ্ডলী তাঁহার আদেশ পালন করিতে প্রস্তুত। (৩) অরণ্যকাণ্ডের শেষে লিখিয়াছেন, তাঁহার শরীর জরাগ্রস্ত, তিনি যে রামায়ণ শেষ করিয়া যাইতে পারিবেন, তাহার সম্ভাবনা নাই। (৪) মুসলমানদিগের হস্ত হইতে দারুব্রহ্মকে উদ্ধার করিয়া সমস্ত রাজ্য তিনি তাঁহার অধিকৃত করিবেন—এই জন্যই তিনি "মহাকালীর" ইচ্ছায় বুদ্ধের দ্বিতীয় অবতার স্বরূপ জগতে আবির্ভূত হইয়াছেন। (৫) তিনি স্বয়ং বুদ্ধদেব—পৃথিবীতে পাপ প্রবল দেখিয়া করুণাপরবশ হইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছেন। (৬) দারুব্রহ্মকে মুসলমানের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া যেদিন রাজ্যের অধিকারী স্বরূপ সিংহাসনে অভিষিক্ত করিবেন, সেই দিন তিনি সেই বিগ্রহের সম্মুখে এই "রাম-লীলা" পাঠ করিবেন—এইজন্যই এ পুস্তক তিনি রচনা করিবেন। (৭) বৈষ্ণবদিগকে ও মুসলমানগণকে দমন করাই তাঁহার আবির্ভাবের অন্যতম উদ্দেশ্য।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায়সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় কর্তৃক সংগৃহীত কতকগুলি প্রাচীন বাঙ্গলা পুঁথি পরিদর্শন সময়ে আমি হঠাৎ এই অদ্ভুত "রামলীলা" গ্রন্থ আবিষ্কার করি এবং ইহার সম্পূর্ণ বিবরণমূলক একটি প্রবন্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ করি। তৎপরে নগেন্দ্রবাবুও এই গ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া প্রবন্ধ রচনা করেন। আমরা স্থানাভাবে সংক্ষেপে এই পুস্তক সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য লিখিয়া যাইতেছি।

পুথি খানি খণ্ডিত। আদিকাণ্ড ও লঙ্কাকাণ্ডের কতকগুলি পত্র নাই। উত্তরকাণ্ড আদৌ লিখিত হইয়াছিল, বলিয়া মনে হয় না। প্রথম ও শেষের পত্র না থাকাতে গ্রন্থকার সম্বন্ধে অন্য কোন কথা জানিতে পারা যায় নাই। পুস্তকখানি রামকানাই হাজরা নামক একব্যক্তির আদেশে তাঁহার ভাগিনেয় রামসুন্দর চন্দ নকল করিয়াছিলেন। রামসুন্দর অম্বিকাকালনার দক্ষিণে লাখুয়া বাসাই গ্রামের অধিবাসী ছিলেন, কিন্তু শেষে রানাঘাটের নিকট শিমুলবনাই নামক স্থানে বাসস্থাপন করেন। পুস্তকের মালিক রামকানাই বেকট্যা গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ১১৮৬ বাং সনের (১৭৭৮ খৃঃ) পৌষ মাসে লিপিকর পুস্তক নকল করিতে আরম্ভ করেন ; ১১৮৭ (১৭৭৯

খৃঃ) সনের ৩১ বৈশাখ আদিকাণ্ডের সকল শেষ হয়। অযোধ্যাকাণ্ড, ঐ সনের ৭ই, অরণ্য ১৬ই এবং কিষ্কিন্ধ্যা ২৭ শে পৌষ শেষ করা হয়। গ্রন্থকারের রচনা-কাল সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না, কিন্তু রচনা দেখিয়া মনে হয় না যে, উহা প্রতিলিপি গ্রহণের বহুপূর্ব্বে বিরচিত হইয়াছিল। মুসলমানগণের প্রতি গ্রন্থকারের যেরূপ আক্রোশ দৃষ্ট হয়, তাহাতে স্পষ্টই মনে হয় যে আওরাঙ্গেব প্রেরিত এক্রাম খাঁ যখন পুরী আক্রমণ করিয়া জগন্নাথ বিগ্রহের দুই চক্ষুস্বরূপ দুইটি বহুমূল্য মাণিক্য লুণ্ঠন করেন ও পুরীর দুই প্রধান স্তম্ভ ভগ্ন করেন, সেই সময় বৌদ্ধগণের মনে দারুণ প্রতিহিংসানল জ্বলিয়া উঠে। আকবর হইতে সাহাজাহানের সময় পর্য্যন্ত পুরীতে কোন মুসলমানকৃত বিপ্লব ঘটে নাই। রামানন্দ সম্ভবতঃ এক্রাম খাঁর আক্রমণের (১৬৯৭ খৃঃ) অব্যবহিত পরেই নিজকে বুদ্ধের অবতার বলিয়া ঘোষণা পূর্ব্বক মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে স্বীয় "ভক্ত"গণকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন।

উড়িষ্যার ষোড়শ শতাব্দীর কবিগণের মধ্যে গোবিন্দদাস, অচ্যুতদাস এবং বলরামদাস প্রভৃতির কাব্যে ভাবী বুদ্ধাবতারসম্বন্ধে স্পষ্টরূপ ভবিষ্যদ্বাণী পাওয়া যায়। অচ্যুতানন্দ কবি স্পষ্টাক্ষরে নিজেকে বুদ্ধের পঞ্চশক্তির অন্যতম বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। তদ্রচিত শূন্য সংহিতায় লিখিত আছে যে বৌদ্ধধর্ম্মের শত্রুগণকে দলন করিবার জন্য বুদ্ধদেব শীঘ্রই পুনরায় জন্মগ্রহণ করিবেন। ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত যশোমতীমালিকা গ্রন্থেও এই ভবিষ্যদ্বাণী লিপিবদ্ধ আছে। ইহাদের দলবল পরিণামে বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আপনাদিগকে বৈষ্ণবমতাবলম্বী বলিয়া পরিচয় দিলেও ইহাদের ধর্ম্মমতে শূন্যবাদ এবং মহাযান ধর্ম্মের অপরাপর বহু কথা প্রচুররূপে দৃষ্ট হয়।

সুতরাং রামানন্দ পুরাকাল হইতে প্রচলিত ভবিষ্যদ্বাণী আশ্রয় করিয়া সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে আপনাকে 'বুদ্ধ' বলিয়া পরিচয় দিয়া বহু ভক্তমণ্ডলীকে উত্তেজিত করিতে পারিয়াছিলেন। এই সময়ের কিছু পরে বৌদ্ধগণ কর্তৃক জগন্নাথ মন্দির ও বিগ্রহ অধিকারের একটি বিদ্রোহমূলক চেষ্টার কথা আমরা জানি, সুতরাং বুদ্ধরূপী রামানন্দের ঘোষণা যে শুধু ভীতি প্রদর্শনেই পর্য্যবসিত হইয়াছিল তাহা নহে, বৌদ্ধগণ তৎবিষয়ে সচেষ্ট ছিলেন—তাহা প্রমাণিত হইয়াছে।

এই সকল তথ্যের আলোচনায় একটি বিষয় স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগেও বঙ্গদেশে বৌদ্ধ শক্তি শির উত্তোলন করিবার স্বপ্ন দেখিতে পারিয়াছিল।

আমরা পূর্ব্বে যে সকল তথ্যের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহা হইতে জানা যাইতেছে যে, রামানন্দ ঘোষ একটি নাতিক্ষুদ্র বৌদ্ধ দলের নেতা ছিলেন এবং রামলীলা রচনার পূর্ব্বেই কবিতা লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া ছিলেন, ইঁহার অবস্থা বেশ সম্পন্ন ছিল এবং ইনি দানশীলতার জন্য যশঃ লাভ করিয়াছিলেন। ইনি তান্ত্রিক মহাযানের মতানুসারে মহাকালীকে পূজা করিতেন এবং বৌদ্ধের অন্যতম অবতার স্বরূপ রামকেও স্বীকার করিতেন। ষ্টারলিং কৃত উড়িষ্যার ইতিহাসে জানিতে

পারা যায় যে, উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের সভায় বৌদ্ধগণ প্রথমতঃ প্রবল ছিলেন কিন্তু পরিণামে বৈষ্ণবগণ উহাদিগকে পরাভূত করিয়া রাজাকে তাঁহাদের মতে দীক্ষিত করেন। সমস্ত বৈষ্ণব-সাহিত্যে প্রসঙ্গক্রমে আমরা বৈষ্ণবদিগের বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষের পরিচয় পাইতেছি এবং তাঁহারাই বৌদ্ধগণের জগন্নাথমন্দিরকে অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন, সুতরাং রামানন্দ, মুসলমান ও বৈষ্ণব উভয় দলেরই কেন বিরোধী ছিলেন, তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে।

রামানন্দী বা বুদ্ধদেবীয় রামলীলার রচনা সরস, কবিত্ব ও মনোহর, আদিকাণ্ডে একটি সুদীর্ঘ স্থান তিনি কালিদাসের রঘুবংশের অনুকরণে রচনা করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের পরাভূত শক্তির শেষ শিখা সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙ্গালাদেশে একবার জ্বলিয়া ছাই হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং সেই শ্মশান হইতে "রামলীলা" কুড়াইয়া আর কে তাহা রক্ষা করিবে? এই জন্যই বোধ হয় এই রামায়ণখানির প্রচার হইতে পারে নাই। রামলীলা কবির পরিণত বয়সের লেখা, কারণ তিনি তখন বিখ্যাত দলপতি ও অরণ্যকাণ্ডে নিজেকে জরাগ্রস্ত বলিয়া বিলাপ করিয়াছেন, সুতরাং পুস্তক-খানি ১৬৯৭ খৃঃ অব্দের (অর্থাৎ এক্রাম খাঁর পুরী আক্রমণের) কিছু পরে লেখা হইয়া থাকিলে, কবি সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এরূপ বলা যাইতে পারে। এই পুস্তকে বুদ্ধরূপী দারুব্রহ্মের স্তুতিবাদ অনেকস্থলে দৃষ্ট হয় (আদি, ১২, ৭৭, ৮৯ এবং ১৪৪ পত্র দ্রষ্টব্য) এখন রামানন্দ যে সকল স্থানে নিজকে বুদ্ধের অবতার বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, এবং তাঁহার আবির্ভাবের উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিয়াছেন, তাহা হইতে কয়েকটি স্থান মাত্র উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি।

১। রামানন্দ কহে ভাই সংসারের লোক।
বৌদ্ধ ভাষা শুনিঞা ঘুচায় দুঃখ শোক॥
সর্ব্বশক্তি মত আর ইচ্ছা কালিকার॥
কলিযুগে রামানন্দ বৌদ্ধ-অবতার॥" (আদি, ৮৫ পত্র)

২। কলিতে জাগ্রত হোল জগত জননী।
শাপ দিয়া বৌদ্ধদেবে আনিলা অবণী। (আদি ৮৫ পত্র)

৩। শূদ্রকুলে রামানন্দ জন্ম লৈয়া ছিল।
বৌদ্ধবেশ ধরি এই তত্ত্ব লিখি গেল। (আদি ৮৩—৮৪ পত্র)

৪। দারুব্রহ্ম রাজা হৈয়া করিবে শ্রবণ।
প্রকাশ হইল গ্রন্থ ইহার কারণ॥

৫। বৌদ্ধদেব কহে বৃথা জন্মিলে সংসারে।
লয়্যা যাহ মহাকালী ভৈরব নগরে॥
কৃপা করি দেহ মোরে মোর পূর্ব্ব ধাম।
নরদেহে নানা দুঃখ কণ্ঠাগত প্রাণ" (লঙ্কা ১০ পত্র)

৬। বৌদ্ধদেব কহে কালী না দেখি উপায়।
রক্ষ রক্ষ ভগবতী কালে কাটি খায়॥

৭। "বৈষ্ণবী পূজা জগতে ঘুচাইব।
পাপ কলি ক্ষিতি হৈতে দূর করি দিব॥
দানে যশে পৌরষের সীমা করি যাব।
এই ঘটে আর অস্ত্র শক্তি প্রকাশিব॥
জাগাব ত্রেতার ধর্ম্ম কলির ভিতরে।
এই দেহে বিশ্বরূপ দেখাব সংসারে॥
যবন ম্লেচ্ছের রাজ্য বলে কাড়ি লব।
একচ্ছত্র রাজা করি দারুব্রহ্মে দিব॥" (১৩৪—১৩৫ আদি)

এই পুস্তক খানির একমাত্র পাণ্ডুলিপি নগেন্দ্রবাবুর নিকট আছে।

মহাভারত, ভাগবত, চণ্ডী প্রভৃতি।

রামায়ণকাব্যে আদত উপাখ্যান ভিন্ন বাজে প্রসঙ্গ বেশী নাই; কিন্তু মহাভারতের মূলগল্পের সহিত বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপগল্প জড়িত হইয়া রহিয়াছে ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির ও দুর্য্যোধনাদির সঙ্গে যযাতি, নল ও দুষ্মন্ত দাঁড়াইয়াছেন, তাঁহাদের সঙ্গে উপমন্যু, আরুণি ও উতঙ্ক প্রভৃতি আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্ত্তিগুলি দাঁড়াইয়াছেন; মূল ঘটনা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সঙ্গে ইঁহাদের কোন সম্পর্ক নাই—ইঁহারা প্রাচীন শিলাখণ্ডে উৎকীর্ণ কেন্দ্রস্থ কোন দেব বিগ্রহের উর্দ্ধে ও নিম্নে ছোট ছোট অবান্তর চিত্রের ন্যায় মহাভারতের মলাট শোভিত করিতেছেন মাত্র। মহাভারতের উপগল্পের অবধি নাই, পাঠক পড়িতে পড়িতে ক্লান্ত হইয়া পড়িবেন—দ্রৌপদীর বস্ত্রের ন্যায় তাহারা একরূপ অফুরন্ত। জন্মেজয়ের ন্যায় অনুসন্ধিৎসু শ্রোতা ও বৈশম্পায়নের ন্যায় ধৈর্য্যশীল বক্তা পরস্পরের গুণের পরিচয় দিতে ইচ্ছুক হইয়াই যেন পুঁথি এত অপরিমিতরূপে দীর্ঘ করিয়া তুলিয়াছেন; রুরুর গল্পের অর্দ্ধভাগ শেষ না হইতেই সর্পযজ্ঞের গল্প, এই গল্পের আধখানা শেষ না হইতেই আবার সমুদ্রমন্থনের প্রসঙ্গ আরম্ভ, সমুদ্রমন্থনের কথা শেষ না হইতেই ইন্দ্রের লক্ষ্মীভ্রষ্ট হওয়ার বিবরণ,—এই গল্পের অকূল সমুদ্রে পড়িয়া পাঠকের দিশাহারা হইয়া যাওয়ার কথা।

মহাভারতের উপগল্প।

এরূপ কাব্যে গল্প জোড়া দেওয়ার বড় সুবিধা। জন্মেজয়কে দিয়া একটা প্রশ্ন করিলেই লেখক স্বীয় কল্পিত গল্পটি জুড়িয়া দিতে পারেন। বাঙ্গালা মহাভারতগুলি এই ভাবে ক্রমে ক্রমে বড় হইয়াছে;—মূল বহির্ভূত শ্রীবৎস ও চিন্তার উপাখ্যানের ন্যায় অনেক বাজে গল্প মহাভারতরূপ মহাবৃক্ষের আশ্রয় পাইয়া অমরত্বের দাবী করিয়াছে।

আমরা কাশীদাসের পূর্ব্বে রচিত সঞ্জয় মহাভারত, ও কবীন্দ্ররচিত (পরাগলী) মহাভারত সমগ্র পাইয়াছি, এবং নসরত সাহার আদেশে রচিত মহাভারতের সংবাদ পাইয়াছি, এই মহাভারত পরাগলী মহাভারতের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত ষষ্ঠীবরসেনরচিত স্বর্গারোহণ পর্ব্বের শেষপত্রে জানিতে পারা গিয়াছে, তিনিও সমগ্র মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন।

কাশীদাসের পূর্ব্বগামিগণ।

নিত্যানন্দ ঘোষ নামক জনৈক প্রসিদ্ধ কবি সমস্ত মহাভারতের অনুবাদ করিয়াছিলেন। এই মহাভারতই পশ্চিম বঙ্গের সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল। সঞ্জয় যেরূপ পূর্ব্ববঙ্গের প্রসিদ্ধ মহাভারত-অনুবাদকারক, নিত্যানন্দও পশ্চিম বঙ্গের পক্ষে সেইরূপ স্থানই অধিকার করিয়াছিলেন। গৌরীমঙ্গলকাব্যের মুখবন্ধে কবি পৃথ্বীচন্দ্র লিখিয়াছেন—"অষ্টাদশ পর্ব্ব ভাষা কৈল কাশীদাস। নিত্যানন্দ কৈল পূর্ব্বে ভারত প্রকাশ॥" নিত্যানন্দ ঘোষ রচিত মহাভারতের নানা অধ্যায় নানা স্থান হইতে সংগৃহীত হইয়াছে; কাশীদাসী মহাভারতের শেষ পর্ব্বগুলিতে নিত্যানন্দের রচনাই অনেক স্থলে অপহৃত হইয়া রক্ষিত হইয়াছে, আমরা পরে তাহা দেখাইব।

নিত্যানন্দ ঘোষ।

কিন্তু বোধ হয় নিত্যানন্দঘোষ হইতেও বিশিষ্টতর একজন কবি তাঁহার সমসময়ের মহাভারত অনুবাদ করিয়াছিলেন। ইঁহার নাম শঙ্কর এবং উপাধি ছিল 'কবিচন্দ্র'। পাদটীকায় ইঁহার রচিত ৪৬ খানি পুঁথির * নাম নির্দ্দেশ করা গেল। এই সমস্তগুলিই একই 'কবিচন্দ্র' রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

কবিচন্দ্র।

---

* অক্রুর আগমন শ্লোক সংখ্যা ১৫০, হস্তলিপি ১০৯০ বাং। ২। অজামিলের উপাখ্যান, হঃ লিপি ১০৮৭ বাং। ৩। অর্জ্জুনের দর্পচুর্ণ, শ্লোক ১০০, হঃ লিপি ১২৫৪। ৪। অর্জ্জুনের বাঁধবাঁধা পালা, শ্লোক ১৩ , হঃ লিপি ১১০১ বাং। ৫। উঞ্ছবৃত্তিপালা, ২৩০—১০৬১ বাং। ৬। উদ্ধবসংবাদ ৪০০,—১০৬১ বাং। ৭। একাদশীব্রতপালা, ২৫০,—১০৮৭ বাং। ৮। কংসবধ, ৪০০ শ্লোক। ৯। কর্ণমুনির পারণ ১২২০ বাং। ১০। কপিলামঙ্গল ২০০ শ্লোক। ১১। কুন্তীর শিবপূজা, ১০০,—১০৭৯ বাং। ১২। কৃষ্ণের স্বর্গারোহণ ১২৫,—১০৭৫ বাং। ১৩। কোকিল-সংবাদ, ১৪৫,—১২৬৬ বাং। ১৪। গেড় চুরি, ২০০,—১২৮০ বাং। ১৫। চিত্রকেতুর উপাখ্যান, ২৫০, শ্লোক। ১৬। দশম পুরাণ. ৫৫০,—১২১৪ বাং। ১৭। দাতাকর্ণ, ২০০ শ্লোক,—১০৬২ বাং। ১৮। দিবারাস, ১৮০,—১২৪৯ বাং। ১৯। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, ১১০৯ বাং। ২০। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর, ১৬০ শ্লোক। ২১। ধ্রুবচরিত্র, ২১১,— ২৬৬ বাং। ২২। নন্দবিদায়, ১১৬৫ বাং। ২৩। পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ, ১২৫ শ্লোক। ২৪। পারিজাতহরণ, ২৫০, শ্লোক ২৫। প্রহ্লাদচরিত্র, ৪০০,—১০৭১ বাং। ২৬। ভারত উপাখ্যান, ৬০০—১০৮০ বাং। ২৭। মহাভারত বনপর্ব্ব, ২৯০,—১০৮৫ বাং। ২৮। উদ্যোগপর্ব্ব, খণ্ডিত, ১৫০ শ্লোক। ২৯। ভীষ্মপর্ব্ব, দ্রোণপর্ব্ব, খণ্ডিত। ৩০। কর্ণপর্ব্ব, ২০০,—১০৮৩ বাং। ৩১। শল্যপর্ব্ব, ১৭০—১০৭৩ বাং। ৩২। গদাপর্ব্ব খণ্ডিত। ৩৩। রাধিকামঙ্গল, ২৩০—

যদিও পুঁথিগুলি সংখ্যায় বেশী, তথাপি একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই সাধারণতঃ উহা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে ;—(১) রামায়ণ (২) মহাভারত (৩) ভাগবত। তিনি এই তিন গ্রন্থের সমস্ত কিংবা অধিকাংশ ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন ; এবং লেখকগণ সুবিধা বুঝিয়া ঐ তিন গ্রন্থের ভিন্ন ভিন্ন পালা লইয়া পুঁথির আকারে নকল করিয়াছিলেন ; এইজন্য উক্ত তিন গ্রন্থের ভিন্ন ভিন্ন উপাখ্যান এক এক খানি পুঁথিস্বরূপ হইয়া মূল গ্রন্থগুলিকে বহুধা বিভক্ত করিয়াছে। ভাগবতের অনুবাদ হইতে যে সকল উপাখ্যান স্বতন্ত্রাকার ধারণ করিয়াছে, তাহার প্রায় প্রত্যেক-খানির শেষেই—"ভাগবতামৃত দ্বিজ কবিচন্দ্র গায়।" কিম্বা "গোবিন্দমঙ্গল কবিচন্দ্রের বিরচন।" এইরূপ ভণিতা আছে। এতদ্ব্যতীত প্রায় প্রত্যেক পালার শেষেই "সপ্তম স্কন্ধের কথা কবিচন্দ্র গায়।" "পঞ্চম স্কন্ধের কথা শুনিতে অমৃত॥" এই ভাবে ভাগবতের স্কন্ধ নির্দ্দেশিত আছে এবং কবিচন্দ্র ব্যাসের আদেশে ভাগবত অনুবাদ করিতেছেন, ইহা উল্লিখিত হইয়াছে। এইরূপ পরিচিত ভণিতা দৃষ্টে একজন কবিই সমস্ত পালাগুলি রচনা করিয়াছেন, স্বতঃই ইহা মনে হয়। গৌরীমঙ্গলকাব্যের ভূমিকায় বর্ণিত আছে যে, কবিচন্দ্র-উপাধিবিশিষ্ট এক ব্যক্তি গোবিন্দমঙ্গল নামক ভাগবতের ভাষানুবাদ প্রচার করিয়াছিলেন ; ইনিই সেই 'কবিচন্দ্র' বলিয়া আমাদের ধারণা। মহাভারত এবং রামায়ণও 'কবিচন্দ্র' সংক্ষেপে অনুবাদ করিয়াছিলেন, তাহাতেও সেই ব্যাসের আদেশের কথা ভণিতায় উল্লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়। আর একটি কথা এই যে, কবিচন্দ্রের অধিকাংশ পুঁথিই বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়ের এবং তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামগুলি হইতে পাওয়া গিয়াছে। সেই পুঁথিসমূহের অনেকগুলিরই হস্তলিপি বঙ্গীয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগের কিংবা কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী সময়ের। পাদটীকায় নির্দ্দিষ্ট ৪৬ খানি পুঁথির মধ্যে ৩৪ খানির তারিখ পাওয়া যায়, তন্মধ্যে ১৭ খানি বাঙ্গালা ১০৬১—১১০৯ সনের মধ্যে লিখিত। একদেশীয় ভিন্ন ভিন্ন লেখকগণ অনতিদূরবর্ত্তী সময়ের মধ্যে যে সমস্ত পুঁথি নকল করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একই কথায় একই ভাবের ভণিতা দৃষ্টেও আমরা তদুল্লিখিত 'কবিচন্দ্রকে' এক ব্যক্তি সাব্যস্ত করিয়াছি। এখন কবিচন্দ্রের একটু সামান্য পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। তৎসম্বন্ধে এই কয়েকটি ছত্র পাওয়া গিয়াছে ;—"কবিচন্দ্র দ্বিজ ভণে ভাবি রমাপতি। লেগোর দক্ষিণে ঘর পানুয়ায় বসতি॥ ভগবতামৃত বা

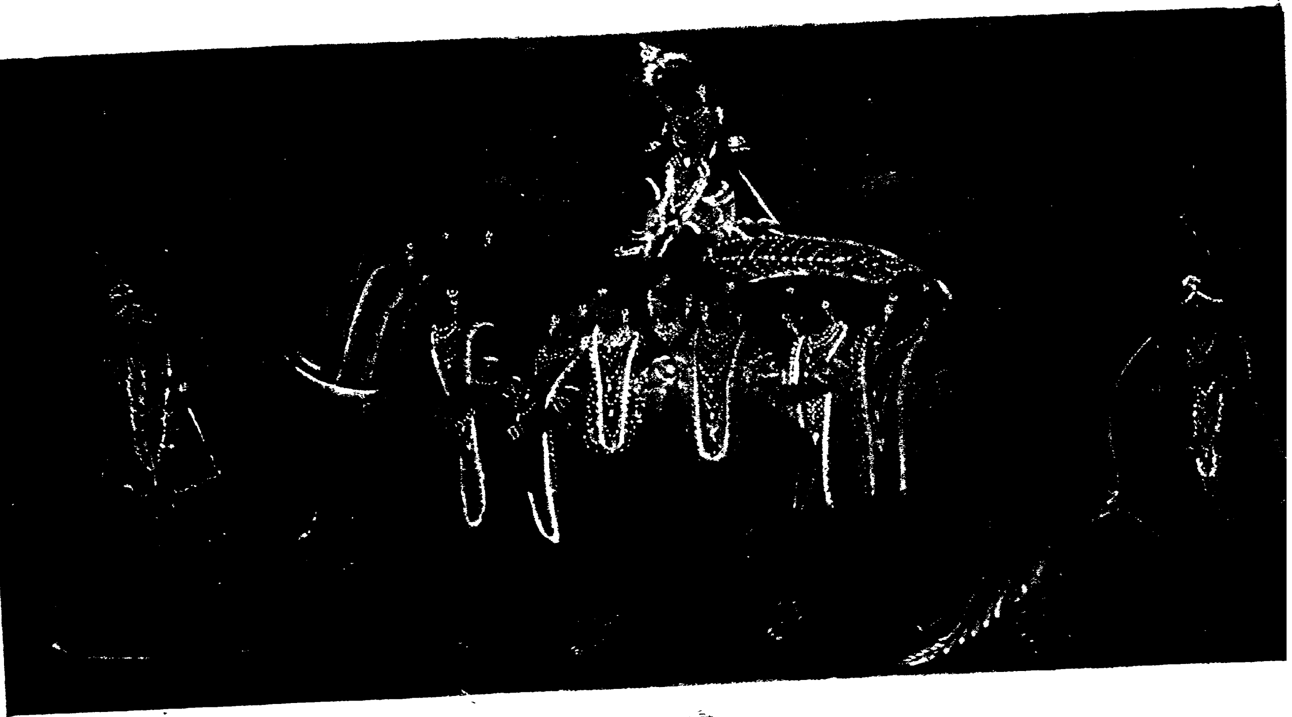
১০৯৭। ৩৪। রামায়ণ, লঙ্কাকাণ্ড, খণ্ডিত। ৩৫। রাবণবধ, ৫২—১২৪৬ বাং। ৩৬। রুক্মিণীহরণ, ২০০ শ্লোক। ৩৭। শিবরামের যুদ্ধ, খণ্ডিত। ৩৮। শিবিউপাখ্যান, ১০০,—১২৪৭ বাং। ৩৯। সীতাহরণ, ৮০,—১ ১৬ বাং। ৪০। হরিশ্চন্দ্রের পালা, ২৫০,—১২০৩ বাং। ৪১। অধ্যাত্ম রামায়ণ, খণ্ডিত, ১১৫০ বাং। ৪২। অঙ্গদরায়বার ১২৫৬ বাং। ৪৩। কুম্ভকর্ণের রায়বার ২২ শ্লোক। ৪৪। দ্রৌপদীর লজ্জানিবারণ, খণ্ডিত, ১১৯৪ বাং। ৪৫। দুর্ব্বাসার পারণ, খণ্ডিত, ১১৯৩ বাং। ৪৬। লক্ষ্মণের শক্তিশেল।

১৭। রামেশ্বর নন্দীর মহাভারত।
১৮। কাশীরামদাসের মহাভারত।
১৯। কাশীদাসের পুত্র নন্দরাম দাসের— ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণপর্ব্ব।
২০। ত্রিলোচন চক্রবর্ত্তীর মহাভারত।
২১। নিমাইদাসের মহাভারত।
২২। দ্বৈপায়নদাসের— দ্রোণপর্ব্ব।
২৩। বল্লভদেবের ভারত।
২৪। দ্বিজ কৃষ্ণরামের— অশ্বমেধ পর্ব্ব।
২৫। দ্বিজ রঘুনাথ প্রণীত— অশ্বমেধ পর্ব্ব।
২৬। লোকনাথ দত্ত প্রণীত— মহাভারতান্তর্গত নলোপাখ্যান।
২৭। মধুসূদন নাপিত প্রণীত— ঐ ঐ
২৮। বিক্রমপুর কাঁটাদিয়ানিবাসী শিবচন্দ্রসেন প্রণীত,— মহাভারতের সাবিত্রী ও অপরাপর উপাখ্যানের অনুবাদ।
২৯। ভৃগুরাম দাসের ভারত।
৩০। দ্বিজ রামকৃষ্ণদাসের— অশ্বমেধ পর্ব্ব।
৩১। ভারত-পণ্ডিতের— অশ্বমেধ পর্ব্ব।

সঞ্জয় ও কবীন্দ্র-রচিত ভারত ও ছুটিখাঁর আদেশে রচিত অশ্বমেধপর্ব্ব সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। অপরাপর যে সকল মহাভারতের উপাখ্যান আমরা কাশীদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া মনে করি, তাহাদের কয়েকটি সম্বন্ধে এস্থলে সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

রাজেন্দ্রদাস, গোপীনাথ দত্ত, ষষ্ঠীবর ও গঙ্গাদাসের রচিত মহাভারতের কতকগুলি অংশের অনুবাদ আমরা পাইয়াছি। সে গুলির হস্তলিপি কিঞ্চিন্ন্যূন দুইশত বৎসর পূর্ব্বের রচনা দেখিয়া বোধ হয়, এই সকল কবি অন্যূন ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে পুস্তক লিখিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে রাজেন্দ্রদাসকে আমরা শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য করি। ইঁহার রচিত আদিপর্ব্বের প্রায় সমস্ত অংশ পাওয়া গিয়াছে; তন্মধ্যে শকুন্তলা উপাখ্যানটি বড় সুন্দর হইয়াছে—ইহা কালিদাসের শকুন্তলার প্রতিচ্ছায়া ও মধ্যে মধ্যে মাঘ প্রভৃতি কবির উৎপ্রেক্ষামণ্ডিত। ভাষাটি পূর্ব্ববঙ্গের, অতি জটিল তাহাতে আবার এত প্রাচীন; কিন্তু এই জটিল অপ্রচলিত শব্দবহুল রচনা কবির তীক্ষ্ণ সৌন্দর্য্যবোধকে পরাভূত করিতে পারে নাই—পুরাতন বন্ধুরগাত্র বনদ্রুমের নিবিড় পত্র ভেদ করিয়া যেরূপ মধ্যে মধ্যে সৌরকিরণের আভা খেলিতে দেখা যায়, এই দ্বিশত বৎসরের জীর্ণ পুঁথির অদ্ভুত ভাষার মধ্যে মধ্যেও সেইরূপ প্রকৃতকবির উপযুক্ত সুন্দর ভাব আমাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

রাজেন্দ্রদাসের আদিপর্ব্ব



নবনারী

এই কাব্যে অনসূয়া, প্রিয়ম্বদা, বিদূষক প্রভৃতি কালিদাসের সমুদয় চরিত্রই গৃহীত হইয়াছে,

শকুন্তলা উপাখ্যান

দুষ্মন্ত মৃগয়ায় চলিতেছেন, তাঁহার অনুচরদল সঙ্গে সঙ্গে; রাজধানীর সুন্দরীগণ, গবাক্ষ হইতে,—"যার যার প্রিয়জন এই যান্ত বলি। প্রিয়জন সম্বোধিবা দেখায় অঙ্গুলি॥"—দুষ্মন্ত, মুনির তপোবনে পৌঁছিলেন, শকুন্তলা তখনও আসেন নাই, কিন্তু আসিবেন; বহিঃপ্রকৃতি যেন আসন্ন প্রেমলীলার সাহায্যার্থ দাঁড়াইল, প্রকৃতির বর্ণনাটি বেশ সুন্দর—"শীতল পবন বহে সুগন্ধি বহে বাস। ফল ফুলে বৃক্ষ সব নাহি অবকাশ॥ মন্দ মন্দ বায়ুএ বৃক্ষ সব নড়ে। ভ্রমরের পদভরে পুষ্প সব পড়ে॥ নব নব শাখা গাছি অতি মনোহর। থোপা থোপা পুষ্প নড়ে গুঞ্জরে ভ্রমর॥ নির্ম্মল বৃক্ষের তলে পুষ্প পড়ি আছে। লম্ফে লম্ফে বানর বেড়ায় গাছে গাছে॥ হেন জল না দেখিলুম নাহিক কমল। হেন পদ্ম না দেখিলুম নাহিক ভ্রমর॥ হেন ভৃঙ্গ নাহি যে না ডাকে মত্ত হৈয়া। কেবা মোহ না যায়ন্ত সে বন দেখিয়া॥" শেষের চারি পংক্তির কবিত্ব প্রশংসনীয়, কিন্তু উহা ভট্টিকাব্যের একস্থলের পুনরাবৃত্তি মাত্র। বর্ণিত সুন্দর প্রকৃতিটি ছবির চালচিত্রের মত, শকুন্তলা এই প্রকৃতির উপযোগী ছবি; তিনি যখন অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদার সঙ্গে আসিলেন, তখন কবি "চিত্রের পুত্তলী যেন পটেতে লিখিল" বলিয়া পটপূর্ণ করিলেন। রাজা শকুন্তলাকে বনদেবী ভাবিয়া ফার্ডিনেণ্ডের ন্যায় নানা কথা বলিতে লাগিলেন; শকুন্তলা ব্রীড়াবনতা, আবেশময়ী, সে সব শুনিয়া—"হইলা লজ্জিত। বসনে ঢাকিয়া মুখ হাসিলা কিঞ্চিৎ॥" তন্বী ঋষিকুমারীর বল্কলবাসে লজ্জা-রক্তিম গণ্ডের বোধ হয় সব অংশটুকু ঢাকা পড়ে নাই, এজন্যই মনে হয়, দুষ্মন্ত বলিয়াছিলেন "কিমপি হি মধুরাণাং মণ্ডনং না কৃতীনাম্।" তৎপর গন্ধর্ব্ববিবাহ শেষ। বিবাহের বার্ত্তা মুনিকন্যাগণ জানেন না, বিবাহের পর শকুন্তলাকে তাঁহারা দেখিলেন, তাঁহার সৌন্দর্য্য ঈষৎ পরিক্লিষ্ট, কিন্তু বড় মধুর হইয়াছে, তাঁহাদের সরল বাক্‌চাতুরী পড়িতে পড়িতে বাল্মীকির "প্রভাতকালেষু ইব কামিনীনাং" শ্লোকটি মনে হইয়াছে। দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে ত্যাগ করিয়া গেলেন। শকুন্তলার প্রতি দুর্ব্বাসার শাপ, কণ্বমুনির স্নেহ; পরে কাঁদিতে কাঁদিতে শকুন্তলা একদিন তাঁহার আজন্মসঙ্গিনী সখীগণ, উদ্যানের তরুলতা ও কুরঙ্গশাবকের গলা জড়াইয়া শেষ বিদায় লইলেন, রাজার সঙ্গে সাক্ষাতের পর অপমানিতা সুন্দরীর অভিমানপূর্ণ তীব্র বাক্যগুলি,—রাজসভা হইতে তাড়িতা শকুন্তলা একাকিনী "কুহুরি কুহুরি কাঁদে তাপিত হইয়া।"—প্রভৃতি অংশ বেশ সৌন্দর্য্যজ্ঞান বিশিষ্ট চিত্রকরের হস্তের অঙ্কনের ন্যায় সুন্দর হইয়াছে। শকুন্তলা অপমানিতা হইয়াও পতিতে অনুরক্তা; যিনি নিষ্ঠুর হইতেও নিষ্ঠুরের ন্যায় তাঁহার প্রতি ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাকে কাহারও সতীর নিকট নিষ্ঠুর বলিবার সাধ্য নাই; শকুন্তলা দুষ্মন্তদেবের পূজক; দুষ্মন্তের মুখে অনুশোচনা শুনিলে তাঁহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হয়—'শকুন্তলা বোলে শুন, নিঠুর না বোল পুনঃ, প্রাণ হৈতে পতি ভিন্ন নহে। যাইব তোমার সনে, কোন দুঃখ নাহি মনে, তুমি বিনে কেবা মোর হয়ে॥ ভাবি চাহ মনে মনে, চন্দ্ররশ্মিপান বিনে, বৃষ্টিজলে না জীয়ে চকোর। মীন যেন জল বিনে, পঙ্কজ মধু বিহনে, পতি বিনে নারীর কঠোর॥"

এই উপাখ্যান লইয়া পাপ পুণ্য সম্বন্ধে দীর্ঘ গবেষণা ও অন্য নানারূপ প্রসঙ্গ উত্থাপিত

হইয়াছে। কাশীরামের শকুন্তলার শ্লোকসংখ্যা, ১৭৮, রাজেন্দ্রদাসের শকুন্তলার ১৫০০ শ্লোক। ইহা প্যারাডাইস্ লষ্টের দুইটি বড় অধ্যায়ের তুল্য। আমরা এরূপ বলি না যে, রাজেন্দ্রদাসের কবিতা সর্ব্বত্রই সরল ও সুন্দর। ইহা যে সময়ের রচনা তখনকার ভাষা আধুনিক ভাষা হইতে যতটা বিভিন্ন, সেই সময়ের কথাবার্ত্তা, হাস্য পরিহাস এবং রুচিও বর্ত্তমান সময় হইতে সেইরূপ স্বতন্ত্র ছিল, তন্নিবন্ধন ইহা পাঠকালে স্থলে স্থলে পাঠকের বিরক্তি জন্মিতে পারে।

রচনার দোষভাগ

কবি ষষ্ঠীবর-রচিত স্বর্গারোহণপর্ব্ব আমার নিকট আছে। এবং উহার শেষ পত্রে এই কবির রচিত সমগ্র মহাভারতের কথা উল্লিখিত দেখিয়াছি। ষষ্ঠীবরেররচনা অনাড়ম্বর,—বক্তব্য বিষয় বেশ সুন্দরভাবে বলা হইয়াছে, তাহাতে কল্পনার জাঁকজমক নাই, মধ্যে মধ্যে দুই একটি মিষ্ট শব্দ ও সুন্দর উপমা বেশ ফুটিয়াছে, যথা—"স্বর্গ হৈতে নামিয়াছে দেবী মন্দাকিনী। পাতালে বহন্তি গঙ্গা ত্রিপথগামিনী। উত্তরে দক্ষিণে বহে সুরেশ্বরী-ধার। পৃথিবী পরেছে যেন মালতী" হার॥ এই লেখা পড়িয়া আমাদের কালিদাসের "মন্দাকিনী ভাতি নগোপকণ্ঠে। মুক্তাবলী কণ্ঠগতৈব ভূমেঃ॥ মনে পড়িয়াছিল, কিন্তু কবি বোধ হয় তাহা মনে করিয়া লিখেন নাই।

ষষ্ঠীবরের স্বর্গারোহণ পর্ব্ব

আমরা গঙ্গাদাস সেনের আদিপর্ব্ব ও অশ্বমেধপর্ব্ব পাইয়াছি। আদি পর্ব্বে তাঁহার রচিত দেবযানী-উপাখ্যান বেশ সুন্দর ; ইনি পিতা হইতে অধিক ক্ষমতাশালী। কাশীদাসের রচনা বটতলা কর্ত্তৃক মার্জ্জিত না হইলে গঙ্গাদাস সেন প্রায় তাঁহার সমকক্ষ হইতেন,—অনেক স্থলে বেশ সমকক্ষতা চলিতে পারিত। গঙ্গাদাস সেনের অশ্বমেধপর্ব্ব কাশীদাসের অশ্বমেধ পর্ব্ব হইতে আকারে বৃহৎ। রচনার কিছু নমুনা দেওয়া যাইতেছে ;—"যৌবনাশ্ব পুরী ভীম দেখিলেক দূরে। সুবর্ণপূর্ণিত ঘট প্রতি ঘরে ঘরে। বিচিত্র পতাকা উড়ে দেখিতে সুন্দর। দীপ্তমান শোভে যেন চন্দ্র দিবাকর। অতি বিলক্ষণ পুরী দেখিতে শোভিত। সহস্রকিরণ বেড়ি থাকে চারিভিত। যূপ আরোপিত পথে আছে সারি সারি। যজ্ঞধূমে অন্ধকার গগন আবরি। নানা বাদ্য নৃত্য গীত জয়জয় ধ্বনি। বেদধ্বনি নূপুরধ্বনি এই মাত্র শুনি। মণ্ডব প্রাসাদ মঠ বিচিত্র নগর। পুরী দেখি হরিষ হইল বৃকোদর। ফলিত কদলীবন দেখিতে শোভিত। ডাল সনে পুষ্পভরে হয়েছে নমিত। গন্ধে আমোদিত সব সুললিত ঘ্রাণ। নানা বৃক্ষ লতাতে বিচিত্র নির্ম্মাণ। খর্জ্জুর পাঞেলা যত ফলিত সঘন। দেখিতে জুড়ায় আঁখি দুঃখ বিমোচন। বিদারিত দাড়িম্বে বেষ্টিত পুরীখান। পুণ্যবন্ত দেখি যেন দেবতার স্থান। লেম্বু জাম্বীর আর নারাঙ্গার ফুল। অশোক চম্পক নঙ্গ কেশর বকুল। সুবর্ণ কেতকী আদি জাতি ক্রম লতা। মালতি চম্পক কুন্দ লতিকা পুষ্পিতা। পশুপক্ষী বেড়ি ক্রীড়া কয়রে সকলে। কোকিলের ধ্বনি আর ভ্রমরের বোলে।"

গঙ্গাদাসের আদি ও অশ্বমেধ পর্ব্ব

উদ্ধৃতাংশও এইরূপ নানা অংশের সঙ্গে কাশীদাস কবির সেই সেই স্থলের বর্ণনা তুলনা করিয়া দেখিলে, গঙ্গাদাস তাঁহার নিকট খর্ব্ব হইয়া পড়িবেন বলিয়া বোধ হয় না।

গোপীনাথ দত্তের দ্রোণপর্ব্ব আমরা পাইয়াছি। ইহাতে উক্ত পর্ব্বের অন্যান্য বিষয়ের সহিত বহুপত্র জুড়িয়া দ্রৌপদী-যুদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে ; অভিমন্যু বধে ক্রুদ্ধা রমণীদল কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করিয়াছিলেন—দ্রৌপদী সেনাপতি। ঘনরামের কাব্যে আমরা কানাড়ার যুদ্ধ-বিবরণ পড়িয়াছি ; ইতিহাসে দুর্গাবাই ও লক্ষ্মীবাইএর নাম পাঠক-মণ্ডলীর নিকট অবিদিত নহে ; আমরা কালী-দেবীর রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি গড়িয়া আজও পূজা করিয়া থাকি, সুতরাং মহাভারতের দ্রৌপদী-যুদ্ধে অসম্ভব কল্পনা কিছুই নাই। কিন্তু যে দেশের পুরুষই ললনার ন্যায় কোমল, সে দেশের ললনা স্বপ্নসৃষ্ট পুত্তলীর মত অঙ্গিনার রৌদ্রে ও বাতাসেই বিলীন হইয়া যাইবার কথা ;—যুদ্ধক্ষেত্রের ত কথাই নাই। বোধ হয় কাশীদাস বাঙ্গালীর নাড়ী টের পাইয়াই দ্রৌপদী-যুদ্ধের পালা জানিয়া থাকিলেও ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। গোপীনাথদত্তের দ্রৌপদীযুদ্ধে কোন আশ্চর্য্য কবিত্বের চিহ্ন নাই, তবে তাঁহার বর্ণিত পত্রগুলির শেষে কাশীদাসের ভণিতা দিয়া তাহা কাশীদাসী মহাভারতের যুদ্ধ-বর্ণনাগুলির সঙ্গে আঁটিয়া দিলে কোন সমালোচক তাহা অন্য কবির লেখা বলিয়া ধরিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ, মধ্যে মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গের দুই একটি শব্দ পরিবর্ত্তন করিলেই গোপীনাথ কাশীদাসের সঙ্গে মিশিয়া যাইতে পারেন।

গোপীনাথের দ্রোণপর্ব্ব

আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছি, কাশীদাসই ধারাবাহিকভাবে মহাভারতের শ্রেষ্ঠ অনুবাদক। এই কবির জীবন সম্বন্ধে আমরা অতি যৎসামান্য বিবরণ জানিতে পারিয়াছি। কাশীরাম বর্দ্ধমান জেলার উত্তরে ইন্দ্রাণী পরগণাস্থিত সিঙ্গিগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এই গ্রাম ব্রাহ্মনদীর তীরস্থ। কাশীরামদাসের প্রপিতামহের নাম প্রিয়ঙ্কর, পিতামহের নাম সুধাকর ও পিতার নাম কমলাকান্ত দেব। কমলাকান্তের ৩ পুত্র ছিল; কৃষ্ণদাস, কাশীদাস ও গদাধর। এই গদাধরের হস্তলিখিত সমগ্র মহাভারত রাইপুর রাজবাড়ীতে এখনও আছে, তাহা ১০৩৯ সালের লেখা ;—সে আজ ২৭৬ বৎসরের কথা। গদাধর কাশীদাসের কনিষ্ঠভ্রাতা ; সুতরাং কাশীদাস ন্যূনাধিক ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন ; এবং সম্ভবতঃ ২৭০ বৎসর পূর্ব্বে মহাভারতের অনুবাদ সাঙ্গ করেন। রামগতিন্যায়রত্ন মহাশয় বলেন, কাশীরামদাসের পুত্র আপন পুরোহিতদিগকে যে বাস্তভিটা দান করেন সেই দানপত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহা ১০৮৪ সালের লিখিত ; বলা বাহুল্য এই দানপত্রোক্ত সময় আমাদের অনুকূল।* সিঙ্গিগ্রামে "কেশেপুকুর" নামক একটি পুকুর আছে ও তথাকার লোকগণ "কাশীর ভিটা" বলিয়া একটি স্থান এখনও দেখাইয়া থাকেন।

কাশীদাসের জীবনী

* ১৩০৭ সালের ২য় সংখ্যার পরিষৎপত্রিকায় শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় একখানি কাশীদাসের বিরাটপর্ব্বের বিবরণ দিয়াছেন—তাহার শেষে লিখিত আছে—"চন্দ্র বাণ পক্ষ ঋতু শক সুনিশ্চয়। বিরাট হইল সাঙ্গ কাশীদাস কয়।" সুতরাং ১৫২৬ শকে (১০১০ বাং সন) কাশীদাস বিরাটপর্ব্ব সমাধা করেন।

কথিত আছে, কাশীরামদাস মেদিনীপুর আওসগড়ের রাজার আশ্রয়ে থাকিয়া পাঠশালার শিক্ষকতা করিতেন। রাজবাড়ীতে যে সমস্ত কথক ও পুবাণ-পাঠকারী পণ্ডিত আসিতেন, তাঁহাদেব মুখে তিনি মহাভাবত প্রসঙ্গ শুনিয়া ইহাতে অনুবক্ত হন; এই অনুবাগের ফল—মহাভারতের অনুবাদ। সে সময়ের অনুবাদ মূল কাব্যের ছায়া লইয়া লিখিত হইত, কাশীদাসীমহাভারত ঠিক সংস্কৃতের অনুযায়ী নহে, এই জন্য কবি সংস্কৃত জানিতেন না, এরূপ মত প্রচার করা বোধ হয় উচিত নহে। নানা পুবাণ হইতে তিনি উপাখ্যান সংগ্রহ করিয়াছেন, এইজন্য পুবাণ শুনিবাব কথা লিখিয়া থাকিবেন। কৃত্তিবাসের ভণিতার সঙ্গে সঙ্গেও পুবাণ শুনিয়া গীতবচনার কথা লিখিত আছে, অথচ কৃত্তিবাসের আত্ম-বিবরণে জানা যায়, তিনি সংস্কৃতে বিশেষ বুৎপন্ন ছিলেন। ভণিতার সঙ্গে মধ্যে পুঁথিলেখকগণও অনেক কথা যোজনা কবিয়া থাকেন।

"আদি সভা বন বিরাটের কতদূর। ইহা লিখি কাশীদাস গেলা স্বর্গপুর॥"—এই একটি চলিত বাক্য আছে।

কাশীদাস সমস্ত মহাভারত লিখিয়াছিলেন কি না?

কেহ কেহ অনুমান কবেন, স্বর্গপুর অর্থ কাশীধাম; কিন্তু যে ভাবে কবিতাটি লিখিত, তাহাতে উক্ত মুন্সীয়ানা অর্থ গ্রহণ করিলেও তিনি যে বাকী অংশ সমাধা কবেন, এরূপ বোধ হয় না। এই প্রবাদ-বাক্য সত্ত্বেও কাশীবামদাসই সমস্ত মহাভাবত অনুবাদ কবেন, এই মত সমর্থন অভিপ্রায়ে কেহ কেহ বলেন, মহাভারতের পূর্ব্ববর্ত্তী রচনায় কোন পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। কিন্তু গঙ্গাদাস সেন, বাজেন্দ্রদাস, গোপীনাথ দত্ত প্রভৃতি কবিব ভণিতা কাটিয়া যদি কাশীদাসী মহাভাবতে আঁটিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলেও বোধ হয় কোন পার্থক্য লক্ষিত হইবে না। বর্ণনাগুলি অনেক স্থলেই একরূপ; "জয়গোপালগণে"র প্রসাদে কাশীবামদাসেব কিছু কান্তি বৃদ্ধি হইয়াছে সন্দেহ নাই; এই নবযুগের প্রভাব চলিয়া গেলে কাশী, গঙ্গা, গোপী, রাজেন্দ্র প্রভৃতি অনেক স্থলে একদরে বিকাইবেন। কাশীদাসীমহাভারতের সর্ব্বত্র তাঁহার ভণিতা দৃষ্ট হয়,—যাঁহারা প্রাচীন পুঁথি নাড়া চাড়া করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন প্রাচীন পুঁথিগুলিতে একাধিক ভণিতা থাকিলে পরবর্ত্তী পুঁথি-লেখকগণ সর্ব্বাপেক্ষা বড় কবির ভণিতা বজায় রাখিয়া অপরাপর কবির নাম ক্রমে ক্রমে বাদ দিয়া যান; এই ভাবে কৃত্তিবাসীরামায়ণে, নারায়ণদেব ও বিজয়গুপ্তের পদ্ম পুরাণে এবং অপরাপর গ্রন্থে শ্রেষ্ঠ কবিগণের নামের ছায়ায় ছোট অনেক কবি লীন হইয়া গিয়াছেন। ১৫৮৩ খৃঃ অব্দের লিখিত একখানি কাশীদাসী মহাভারতেব শল্য ও নারীপর্ব্বে ভৃগুরামদাসের ভণিতা পাওয়া গিয়াছে। গদাধরলিখিত পুঁথি আমরা দেখি নাই—তাহাতে যদি সর্ব্বত্রই কাশীরামদাসের ভণিতা থাকে, তবে উহা প্রামাণ্য বলিয়া গণ্য হইবে, এবং তাহা হইলে "আদি সভা বন বিরাটের কতদূর।"—

ইত্যাদি শ্লোকের মুন্সীয়ানা অর্থ গ্রহণ করিতে কিংবা উহা অমূলক প্রবাদ-বাক্য বলিতে আমাদের কোনও আপত্তি থাকিবে না।*

কাশীরামদাসের মহাভারতের সঙ্গে পূর্ব্ববর্ত্তী মহাভারতগুলির রচনা তুলনা করিলে অনেকস্থলে বিশেষরূপ সাদৃশ্য দৃষ্ট হইবে। কিন্তু তৎপূর্ব্বে একটি কথা বলিতে চাই। কৃত্তিবাস যেরূপ পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গব্যাপক যশের অধিকারী হইয়াছিলেন, কাশীদাস তাহা হইতে পারেন নাই। আমরা পূর্ব্ববঙ্গে সঞ্জয় ও কবীন্দ্র পরমেশ্বরের প্রাচীন পুঁথিই বেশী পাইতেছি, ষষ্ঠিবর ও গঙ্গাদাসের পুঁথিও নিতান্ত অল্প নয়। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে কাশীদাসের মহাভারতের প্রাচীন পুঁথি বিরল। অবশ্য বর্ত্তমান কালে বটতলার সাহায্য লাভ করিয়া কাশীদাস উভয় বঙ্গ বিজয় করিয়াছেন। আমরা না বাছিয়া যথেচ্ছা কয়েকটি স্থল উদ্ধৃত করিয়া কাশীদাসী মহাভারতের সঙ্গে অপরাপর মহাভারতের ভাষার ঐক্য দেখাইতেছি।

কাশীদাসী মহাভারতের সঙ্গে অপরাপরে অনুবাদের ভাষার ঐক্য।

যযাতির পতন।

"অষ্টক বোলেন্ত তুহ্মি কোন মহাজন।
পরিচয় দিয়া কহ জানাইয়া আপন॥
অগ্নি প্রায় তেজঃপুঞ্জ দেখিতে সাক্ষাৎ।
কোন্ পাপে অধর্ম্মে হইল স্বর্গপাত।
*   *   *
যযাতি আমার নাম কহি শুনি তোকে।
নহুষ নৃপতিসুত পুরুর জনক॥
করিলে সুকৃতি নর যেবা নরে কয়।
নরকেতে বাস হয় পুণ্য হয় ক্ষয়॥
কহিলুম ইন্দ্রের ঠাঁই কথা সকল।
পুণ্য ক্ষয় হৈয়া মুই পড়িল ভুমিতল॥

—সঞ্জয়কৃত ভারত, আদি।

"অষ্টক বলিল তুমি কোন মহাজন।
কোন নাম ধর তুমি কাহার নন্দন॥
সূর্য্য অগ্নি প্রায় তেজ দেখি যে তোমার।
স্বর্গ হৈতে পড় কেন না বুঝি বিচার।

* ২৪ পৃষ্ঠার পাদটীকা দৃষ্টে বোধ হয় যেন কাশীদাস বিরাটপর্ব্ব নিজেই শেষ করিয়াছিলেন, কিন্তু মুদ্রিত কাশীদাসী মহাভারতের বনপর্ব্বের শেষে এই দুইটি ছত্র পাওয়া যায়,—"ধন্য হ'ল কায়স্থকুলেতে কাশীদাস। তিন পর্ব্ব ভারত যে করিল প্রকাশ॥" এই কথাটির মধ্যে যে ইঙ্গিত আছে, তাহা আমাদের সন্দেহ দৃঢ়ীভূত করিতেছে।

রাজা বলে নাম আমি ধরি যে যযাতি।
পুরুর জনক আমি নহুষে উৎপত্তি॥
পুণ্যবান্ জনের করিলাম অমান্য।
সেই হেতু আমার হইল ক্ষীণ পুণ্য॥"
—কাশীদাস, আদিপর্ব্ব।

কৃষ্ণের ক্রোধ।

"এ বলিয়া সাত্যকিরে করি সম্বোধন।
হস্তেত লইল চক্র দেব জনার্দ্দন।
সূর্য্যের সমান জ্যোতি সহস্র বজ্রসম।
চারিপাশে স্ফুরতেজ যেন কালযম॥
রথ হৈতে লাফ দিয়া চক্র লৈয়া হাতে।
ভীষ্মক মারিতে যায় দেব জগন্নাথে॥
পৃথিবী বিদার হএ চরণের ভারে।
ক্রোধদৃষ্টিএ যেন জগত সংহারে॥
কুরুকুলে উঠিল তুমুল কোলাহল।
ভীষ্ম পড়িল হেন বলে কুরুবল॥
পদভরে কৃষ্ণের কম্পিত বসুমতী।
গজেন্দ্র ধরিতে যেন যাএ মৃগপতি॥
সম্ভ্রম না করে ভীষ্ম হাতে ধনুঃশর।
নির্ভয়ে বোলেন্ত তবে সংগ্রাম ভিতর॥
আইস আইস কৃষ্ণ মোরে করহ সংহার।
তোহ্মার প্রসাদে মুঞি তরিমু সংসার॥
তোহ্মার চক্রেতে মুঞি যদি সংগ্রামেতে মরি।
ত্রিভুবনে রহিবে কীর্ত্তি পরলোকে তরি॥" *
কবীন্দ্র (পদাবলী)—ভারত, ভীষ্মপর্ব্ব।

অস্থির হইলা হরি কমললোচন।
লাফ দিয়া রথ হৈতে পড়েন তখন॥
ক্রোধে রথচক্র ধরি সৈন্যের সাক্ষাৎ।
ভীষ্মেরে মারিতে যান ত্রিলোকের নাথ॥

* ১৭২পৃষ্ঠায় এই অংশ একবার উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতে উদ্ধৃত স্থলটি একটু স্বতন্ত্র, দুইখানি ভিন্ন পুঁথি দৃষ্টে এই দুই প্রকার পাঠ উদ্ধৃত হইয়াছে।

গজেন্দ্র মারিতে যেন ধায় মৃগপতি।
কৃষ্ণের চরণভরে কাঁপে বসুমতী ॥
চমৎকৃত হয়ে চাহি দেখে সর্ব্বজন।
ভীষ্মেরে মারিতে যান দেব নারায়ণ ॥
সম্ভ্রম না করে ভীষ্ম হাতে ধনুঃশর।
নির্ভয়ে বসিয়া ভাবে রথের-উপর ॥
আসিছে ভুবনপতি মারিতে আমাকে।
মারুক আমারে যেন দেখে সর্ব্বলোকে ॥
শীঘ্র এস কৃষ্ণ মোরে করহ সংহার।
তোমার প্রসাদে তরি এ ভব সংসার ॥
তোমার বাণেতে যদি সমরে মরিব।
দিব্য বিমানেতে চড়ি বৈকুণ্ঠে যাইব ॥”

—কাশীদাস, ভীষ্মপর্ব্ব।

বৃষকেতুর পরিচয়।

আকর্ণ পুরিয়া ধনু টঙ্কার করিল।
উচ্চস্বরে রাজা বৃষকেতুরে বলিল ॥
অতি শিশু দেখি তুহ্মি বীর অবতার।
মোকে পরিচয় দেও শিশু আপনার ॥
কাহার পুত্র তুহ্মি কিবা তোমার নাম।
কোন্ দেশে বসতি কিবা মনস্কাম ॥
কি লাগিয়া লও ঘোড়া কারণ কিবা তার।
কি নিমিত্ত কর মোর সৈন্যের সংহার ॥

*　　　*　　　*

রাজার বচন শুনি হাসে কুমার।
পরিচয় লও অহে নৃপতি আহ্মার ॥
যাহার উদয়ে হএ তিমির নাশ।
যাহার উদয়ে হএ জগত প্রকাশ ॥
মোর পিতামহ সেই জেন দিবাকর।
তার পুত্র উপজিল কর্ণ ধনুর্দ্ধর ॥
ত্রিভুবনে বিখ্যাত বীর দাতার অগ্র।
যাঁর বলে দুর্যোধন ভুঞ্জিল মেদিনী ॥

তাঁর পুত্র বৃষকেতু হেন জান মোক।
কটাক্ষে নরপতি নাহি গণি তোক ॥"

—শ্রীকরণনন্দীর (ছুটিখাঁর আদেশে রচিত)
ভারত, অশ্বমেধপর্ব্ব।

"বৃষকেতু দেখিয়া বলিছে নৃপবর।
কাহার তনয় তুমি মহা ধনুর্দ্ধর ॥
কি নাম তোমার হে আসিলে কি কারণ।
পরিচয় দেও আগে তোমরা দুজন ॥
যুবনাশ্ব বচনেতে বৃষকেতু বীর।
পরিচয় দিল নৃপে প্রফুল্ল শরীর ॥
রবির তনয় কর্ণ জান এ জগতে।
জনম হইল যার কুন্তীর গর্ভেতে।
কর্ণের তনয় আমি নাম বৃষকেতু।
তুরঙ্গ লইনু যুধিষ্ঠির যজ্ঞহেতু ॥"

— কাশীদাস মহাভারত, অশ্বমেধপর্ব্ব।

গান্ধারী বিলাপের শেষাংশ।

"কৃষ্ণের প্রবোধবাক্য মনেতে বুঝিয়া।
উঠিয়া বসিল দেবী চেতন পাইয়া ॥
পুনঃ বলে কৃষ্ণকে গান্ধারী পতিব্রতা।
বিচিত্রবীর্য্যের বধূ রাজার বনিতা ॥
দেখ কৃষ্ণ এক শত পুত্র মহাবল।
ভীমের গদার ঘাতে মরিল সকল ॥
দেখ কৃষ্ণ বধূ সব উচ্চৈঃস্বরে কান্দে।
দেখিতে না পায় যারে সূর্য্য আর চান্দে ॥"
শিরীষ কুসুম জিনি সুকোমল তনু।
যাহার দেখিয়া রূপ রথ রাখে ভানু ॥
হেন সব বধূগণ আইল কুরুক্ষেতে।
মুক্তকেশ হীনবেশ দেখহ সাক্ষাতে ॥
ঐ দেখ নৃত্য করে নারী পতিহীনা।
কণ্ঠ শব্দ শুনি যার নারদের বীণা ॥

পতিহীনা কত নারী বীরবেশ ধরি।
ঐ দেখ নৃত্য করে হাতে অস্ত্র করি॥
সহিতে না পারি শোক শান্ত নহে মন।
মাএ এড়ি কোথা গেল পুত্র দুর্য্যোধন॥
ওহে কৃষ্ণ হের দেখ পুত্রের অবস্থা।
যাহার মস্তকে ছিল সুবর্ণের ছাতা॥
নানা আভরণে যার তনু সুশোভন।
সে তনু ধূলায় ঐ দেখ নারায়ণ॥
সহজে কাতর বড় মাএর পরাণ।
সুপুত্র কুপুত্র মাএর একুই সমান॥
এককালে এত শোক সহিতে না পারি।
কি মতে বুঝাহ মোরে মুকুন্দ মুরারি॥
পুত্রশোক শেল জেন বাজিছে হিয়ায়।
দেখাবার হৈলে দেখাতাম মহাশয়॥
সংসারের মধ্যে শোক আছএ যতেক।
পুত্রের সমান শোক নহে পরতেক॥
গর্ভধারী হয়্যা যেবা কর‍্যাছে পালন।
সেই সে জানিতে পারে পুত্রের মরম॥"

—নিত্যানন্দ ঘোষ, স্ত্রীপর্ব্ব।

গান্ধারী-বিলাপের শেষাংশ।

কৃষ্ণের প্রবোধবাক্য মনেতে বুঝিয়া।
উঠিয়া বসিল দেবী চেতন পাইয়া॥
কহে কিছু কৃষ্ণকে গান্ধারী পতিব্রতা।
বিচিত্রবীর্য্যের বধূ রাজার বনিতা॥
দেখ কৃষ্ণ এক শত পুত্র মহাবল।
ভীমের গদার ঘাতে মরিল সকল॥
দেখ কৃষ্ণ বধূগণ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদে।
দেখিতে না পায় যারে কভু সূর্য্য চাঁদে॥
শিরীষ কুসুম জিনি সুকোমল তনু।
দেখিয়া যাহার রূপ রথ রাখে ভানু॥

হেন সব, বধূগণ আইল কুরুক্ষেত্রে।
ছিন্ন কেশ মত্ত বেশ দেখি তুমি নেত্রে॥
ঐ দেখ নৃত্য করে পতিহীন বধূ।
মুখ অতি সুশোভন অকলঙ্ক বিধু॥
ওই দেখ গান করে নারী পতিহীনা।
কণ্ঠশব্দ শুনি যেন নারদের বীণা॥
পতিহীনা কত নারী বীরবেশ ধরি।
ওই দেখ নৃত্য করে হাতে অস্ত্র করি॥
সহিতে না পারি শোক শান্ত নহে মন।
আমা ত্যজি কোথা গেল পুত্র দুর্য্যোধন॥
হে কৃষ্ণ দেখহ মম পুত্রের দুর্গতি।
যাহার মস্তকে ছিল সুবর্ণের ছাতি॥
নানা আভরণে যার তনু সুশোভন।
সে তনু ধূলায় ওই দেখ নারায়ণ॥
সহজে কাতর বড় মায়ের পরাণ।
সুপুত্র কুপুত্র দুই মায়ের সমান॥
এককালে এত শোক সহিতে না পারি।
বুঝাইবে কিরূপে হে আমারে মুরারি॥
পুত্রশোক শেল যেন বাজিছে হৃদয়।
দেখাবার হইলে দেখিতে মহাশয়॥
সংসারের মধ্যে শোক আছয়ে যতেক।
পুত্রশোক তুল্য শোক নাহি তার এক॥
গর্ভধারী হয়ে যেই করিছে পালন।
সেই সে বুঝিতে পারে পুত্রের মরণ॥

—কাশীদাস, স্ত্রীপর্ব্ব।

এইরূপ সাদৃশ্য সর্ব্বত্রই দেখাইতে পারা যায়। মোটের উপর কাশীদাসই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু অংশবিশেষের তুলনা করিলে সর্ব্বত্র তাঁহার এই গৌরব রক্ষিত হয় না। অপরাপর কবিগণ অপেক্ষা নিত্যানন্দ ঘোষের রচনার সঙ্গেই কাশীদাসী মহাভারতের অধিকতর সাদৃশ্য, এবং সেই সাদৃশ্য যুদ্ধপর্ব্ব এবং তৎপরবর্ত্তী অধ্যায়গুলিতেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। নিত্যানন্দঘোষের রচনা বহু অংশেই কিছুমাত্র মার্জ্জন, পরিবর্ত্তন বা সংশোধন না করিয়া কাশীদাসী মহাভারতের অন্তর্নিবিষ্ট করা হইয়াছে; কাশীদাসের সৌভাগ্যশ্রীর ছায়ায় নিত্যানন্দ ঘোষের যশঃ বিলীনপ্রায়। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের ওকালতীর

ফলে বোধ হয় এত দিন পরে বঙ্গীয় পাঠকসাধারণের নিকটে কবি নিত্যানন্দ সুবিচার পাইবেন, এবং আশা করি সাহিত্যের ক্ষেত্রে তমাদী সূত্র উত্থিত হওয়ার কোন আশঙ্কা দাঁড়াইবে না। তবে এ কথাও এখানে বলা উচিত যে, নিত্যানন্দের মহাভারত কাশীদাসের আদর্শ হইলেও, সেই মহাভারতখানিই যে মৌলিক অনুবাদ, তাহা স্বীকার্য্য নহে।

বাঙ্গালা ভাষা পূর্ব্বে শিক্ষিতগণের দৃষ্টির বাহিরে অঙ্কুরিত হইয়া বিকাশ পাইতেছিল, তখন শক্তিশালী কবিগণ নয়নজল ও প্রাণের উষ্ণত্ব দিয়া ইহাকে পুষ্ট করিতেছিলেন; কিন্তু শিক্ষিতগণের হাতে পড়িয়া শব্দাড়ম্বরের প্রতি রুচি-প্রবণতাহেতু বাঙ্গালাসাহিত্যে প্রেমের প্রভাব তিরোহিত হইল; সংস্কৃত পুঁথির অলঙ্কার ও উপমারাশি দ্বারা ভাষা-সুন্দরী সজ্জিত হইতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাদের গুরুভারে ভাব নিপীড়িত এবং নির্জ্জীব হইয়া পড়িল। কাশীদাস এই দুই যুগের মধ্যবর্ত্তী; তাঁহার কাব্যে পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের উদ্দীপনা আছে এবং নবযুগের লিপিপ্রণালী এবং মার্জ্জিত ভাষাও দৃষ্ট হয়। শেষোক্ত বিষয়ে তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণ অপেক্ষা বিশেষ নিপুণ ও ভাবী যুগের অধিকতর নিকটবর্ত্তী।—"চলৎ চপলা রূপে কিবা বরকায়া।" "দ্বিকর কমল, কমলাংঘ্রিতল," "নিষ্কলঙ্ক ইন্দুজ্যোতি পীনঘনস্তনী," প্রভৃতি সংস্কৃতের টুকরা তাঁহার কাব্যের মধ্যে মধ্যে মুক্তার ন্যায় পড়িয়া আছে, ও 'মুগরুচি, কত শুচি,' 'সিংহগ্রীব, বন্ধুজীব,' 'অগ্নি অংশু যেন পাংশু'—প্রভৃতি পদে ভাবী অনুপ্রাসপ্রধান যুগের ছায়াপাত হইয়াছে। অনেক স্থলে সংস্কৃত উপমার অজস্র বর্ষণ হইয়াছে, কিন্তু উদ্দীপনার কোন হানি হয় নাই, যথা;—

কাশীদাসের ভাব ও ভাষা।

'মুখ তুলি বৃকোদর যেই ভিতে যায়। পলায় সকল সৈন্য তুলা যেন বায়॥ সিন্ধুজল মধ্যে যেন পর্ব্বত মন্দর। পদ্মবন ভাঙ্গে যেন মত্ত করিবর॥ মৃগেন্দ্র বিহরে যেন গজেন্দ্রমণ্ডলে। দানবের মধ্যে যেন দেব আখণ্ডলে॥ দণ্ড হাতে যম যেন বজ্র হাতে ইন্দ্র। খেদাড়িয়া লৈয়া যায় সব নৃপবৃন্দ॥ যেই দিকে বৃকোদর সৈন্য যায় খেদি। দুই দিকে তট যেন মধ্যে বহে নদী॥"—আদিপর্ব্ব।

লক্ষ্যভেদের উপলক্ষে সমাগত ব্রাহ্মণগণের চিত্র বঙ্গদেশীয় ভীরু অর্থলোভী ব্রাহ্মণগণ হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে,—উহা একখানি যথাযথ ছবি। কাশীরামদাসের বর্ণনাগুলি সুন্দর ও স্বাভাবিক; যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়নপর সৈন্য বর্ণনা—বঙ্গীয় কবির লেখনীর উপযুক্ত বিষয়, সুতরাং কবি ইহাতে আশাতীতরূপে কৃতকার্য্য;—"যে দিকে পারিল যেতে সে গেল সেদিকে। পলায় পশ্চিমবাসী রাজা পূর্ব্বদিকে॥ উত্তরের রাজাগণ দক্ষিণেতে গেল। পথাপথ নাহি জ্ঞান যে দিক পাইল॥ হুড়াহুড়ি ঠেলাঠেলি না পাইয়া পন্থ। একে চাপি আর যায় যেই বলবন্ত॥ রথের উপর বেগবন্ত আসোয়ার। অবস্থা হইল যত কি কব তাহার॥ ঠেলাঠেলি চাপাচাপি অর্দ্ধ সৈন্য মৈল। স্থানে স্থানে পর্ব্বত আকার শব হৈল। একপদ কাটা কার, কাটা দুই ভুজ। বুকের প্রহারে কেহ হইয়াছে কুব্জ॥ সর্ব্বাঙ্গে বহিয়া পড়ে শোণিতের ধার। মুক্তকেশ নগ্ন দেহ কাণ কাটা কার॥ আড়ে, ওড়ে, ঝাড়ে, ঝোড়ে অরণ্যে পশিয়া। জলেতে পড়িয়া কেহ যায় সাঁতারিয়া॥ ক্ষত্রি দেখি ব্রাহ্মণ পলায় উভরড়ে। দ্বিজে দেখি ক্ষত্রিয়

লুকায়ে ঝাড়ে ঝোড়ে॥ দ্বিজের ক্ষত্রিয় ভয়, ক্ষত্র দ্বিজ-ভয়। দ্বিজ ক্ষত্র বেশ ধরে ক্ষত্র দ্বিজ হয়॥ ধনুর্ব্বাণ ফেলিল হাতের গদা শূল। মাথার মুকুট ফেলি মুক্ত কৈল চুল॥ তুলিয়া লইল ছত্রদণ্ড কমণ্ডল। ধনুর্ব্বাণ তুলি নিল ব্রাহ্মণ সকল॥ প্রাণভয়ে কেহ গিয়া ডুবে রহে জলে। কেহ কাঁটাবনে পৈশে কেহ বৃক্ষডালে॥ মরার ভিতরে কেহ মরা হৈয়া রহে। দূর দূরান্তরে কেহ ভয়ে স্থির নহে॥' · কাশীদাস আদিপর্ব্ব।

মহাভারতের আদ্যন্ত এইরূপ সুন্দর ও জীবন্ত। এক এক খানি পত্র এক একটি চমৎকার চিত্র-পটের ন্যায়; পড়িতে পড়িতে জগৎপূজ্য, যুদ্ধবীর, ধর্ম্মবীর ও প্রেমিকগণের মূর্ত্তি মনশ্চক্ষের সমক্ষে উদ্ঘাটিত হয়; তাঁহাদের সরল বিবেক, দৃঢ় কামনা ও চরিত্রের সাহস, কবির সতেজ লেখনীর গুণে, ক্ষণকালের জন্য যেন আমাদের নিজস্ব হইয়া পড়ে। এই নিঃসম্বল, অর্দ্ধভুক্ত, পররোষকটাক্ষে পাণ্ডুবতাপন্ন বাঙ্গালীজাতিও ক্ষণকালের জন্য পৃথিবীজয়ী, উচ্চ আকাঙ্ক্ষাশালী, অভিমানস্ফীত পূর্ব্বপুরুষগণের কাহিনী পড়িয়া স্বীয় ক্ষুদ্রত্ব ভুলিয়া গর্ব্ব অনুভব করে। কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে এই মহাভারতপ্রসঙ্গ শুনিয়া দাক্ষিণাত্যে এক দেশহিতৈষী স্বধর্ম্মনিষ্ঠ বীরচরিত্র গঠিত হইয়াছিল, তিনি অর্জ্জুনতুল্য কীর্ত্তিলাভ করিয়া গিয়াছেন, মহাভারতের সঙ্গে তাঁহার নাম এখন ইতিহাসে অবিচ্ছিন্ন-ভাবে জড়িত। বঙ্গদেশে এই মহাভারত সমুদ্র হইতে এখনও 'শ্রীকৃষ্ণচরিত্র', 'রৈবতক', কুরুক্ষেত্র' 'চিত্রাঙ্গদা' প্রভৃতি অসংখ্য বুদ্‌বুদ উত্থিত হইয়া প্রাচীনভাবের অফুরন্ত আবেগ জ্ঞাপন করিতেছে। এই কাব্য লইয়া হিন্দুস্থানের ভাবী অধ্যায়ে আরও কত কবি, বীর ও চিত্রকর যশস্বী হইবেন, কে বলিতে পারে?

কাশীদাসের অপরাপর কাব্য।

কাশীদাস, মহাভারত ছাড়া আরও তিন খানি ছোট কাব্য রচনা করেন:—১। স্বপ্নপর্ব্ব, ২। জলপর্ব্ব, ৩। নলোপাখ্যান।

কাশীদাসের অপর দুই ভ্রাতা,—জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণদাস এবং কনিষ্ঠ গদাধরদাস, উভয়েই সুকবি ছিলেন। কৃষ্ণদাস অতি ধর্ম্মনিষ্ঠ এবং গোপালদাস নামক জনৈক ব্রহ্মচারীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। এই গোপালদাস আজন্ম কৌমার-ব্রত পালন করেন এবং ইহারই আদেশে কৃষ্ণদাস 'শ্রীকৃষ্ণবিলাস' নামক ভাগবতের একখানি অনুবাদ প্রণয়ন করেন।

কৃষ্ণদাসের 'শ্রীকৃষ্ণ বিলাস।'

কৃষ্ণদাস তাঁহার গুরুর নিকট হইতে "শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর" নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; (সেই ক্ষণে শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর নাম থুঞা। আজ্ঞা কৈল শ্রীনন্দনন্দনে ভজ গিঞা॥"—শ্রীকৃষ্ণবিলাস।) এই "কৃষ্ণকিঙ্কর" নামেও তিনি স্বীয় গ্রন্থের অনেক স্থলে ভণিতা দিয়াছেন। তাঁহার কনিষ্ঠ গদাধর তৎসম্বন্ধে জগন্নাথমঙ্গল গ্রন্থে এই দুইটি ছত্র লিখিয়াছিলেন:—"প্রথমে শ্রীকৃষ্ণদাস শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর। রচিল কৃষ্ণের গুণ অতি মনোহর॥" শ্রীকৃষ্ণবিলাসের রচনা প্রকৃতই অতি মনোহর হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রাখালদাস কাব্যতীর্থ মহাশয় এই পুস্তকখানি উদ্ধার করিয়া এতৎসম্বন্ধে ১৩০৭ সনের ৪র্থ সংখ্যার পরিষদ্‌পত্রিকায় একটি সন্দর্ভ লিখিয়াছেন।

ভবানীপ্রসাদ কর, জাতিতে বৈদ্য, বাড়ী কাঁটালিয়া, (এখন মৈমনসিংহের মধ্যে)—কিন্তু ইঁহার কনিষ্ঠ গদাধর দাসের "জগন্নাথমঙ্গল" একখানি উপাদেয় পুস্তক। এই পুস্তকের ভূমিকাটিতে ঐতিহাসিক অনেক নূতন তত্ত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়, আমরা এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করিলাম ঃ—

গদাধরের 'জগন্নাথমঙ্গল।'

"ভাগীরথীতীরে বটে ইন্দ্রাণী নাম। তার মধ্যে প্রধান গণি সিঙ্গিগ্রাম॥ অগ্রদ্বীপের গোপীনাথের বামপদতলে। নিবাস আমার সেই চরণ কমলে॥ তাহাতে শাণ্ডিল্যগোত্র দেব যে দৈত্যারি। দামোদর পুত্র তার সদা ভজে হরি॥ ভুবরাজ শুবরাজ তাহার নন্দন। ভুবরাজ পুত্র হইল মিলএ যতন। তাহার তনয় হয় নাম ধনঞ্জয়। তাহাতে জন্মিল শুন এ তিন তনয়। রঘুপতি, ধনপতি দেব নরপতি। রঘুপতির পঞ্চপুত্র প্রতিষ্ঠিত মতি॥ প্রসন্ন রঘু দেবেশ্বর, কেশব, সুন্দর। চতুর্থে শ্রীরঘুদেব পঞ্চমে শ্রীধর। প্রিয়ঙ্কর হইতে এ পঞ্চ উদ্ভব। অনু সুধাকর মধু রাম যে রাঘব॥ সুধাকর নন্দন এ তিন প্রকার। * * * * প্রথমে শ্রীকৃষ্ণদাস 'শ্রীকৃষ্ণ কিঙ্কর'। রচিল কৃষ্ণের গুণ অতি মনোহর॥ দ্বিতীয় শ্রীকাশীদাস ভক্ত ভগবানে। রচিলা পাঁচালী ছন্দে ভরত পুরাণে॥ জগতমঙ্গল কথা করিলা প্রকাশ। তৃতীয় কনিষ্ঠ দীন গদাধর দাস॥ নরসিংহ নামে দেখি উৎকলের পতি। পরম বৈষ্ণব জগন্নাথ ভজে নিতি॥ স্কন্দ পুরাণের মত শুনিয়া বিচিত্র। কত ব্রহ্ম পুরাণের প্রভুর চরিত্র॥ না বুঝয়ে পুরাণেতে ইত্যাদি লোকেতে। তেকারণে রচিলাম পাঁচালীর মতে॥ ইহা শুনি কৃতার্থ হইব যত জন। ইহলোকে সুখ অন্তে গতি নারায়ণ॥ সপ্তষষ্টি শকাব্দা সহস্র পঞ্চশতে (১৫৬৭ শক)। সহস্র পঞ্চাশ সন (১০৫০ বাং সন) দেখ লেখা মতে॥ মহালয়া তাপী হয় বেরিজ সহর। উৎকল উত্তম শুনি নিকট নগর॥ মাথনপুরেতে ঘর তাহার ভিতর। বিশ্বেশ্বর বাটী চিহ্নিত সেই স্থানবর॥ দুর্গাদাস চক্রবর্ত্তী পড়িল পুরাণে। শুনিয়া পুরাণ বড় হইল মনে॥ নাহি সন্ধিজ্ঞান মোর না পড়ি ব্যাকরণ। আমি অতি মূঢ়মতি কবির রচন॥"

যে পুঁথি * হইতে এই বিবরণটি উদ্ধৃত হইল তাহার হস্তলিপি ১১৬৫ সালের। এই পুস্তকের শ্লোকসংখ্যা ২৫০০। লেখক শ্রীঅনূপচন্দ্র ঘোষ, "সাং ঝেঞা, পরগণে বারহাজারী চৌকী কোতলপুর।"

'জগৎমঙ্গল' কাশীদাসের কনিষ্ঠের উপযুক্ত কাব্য; ইহার রচনা বেশ সুন্দর। রচনার ১০০ বৎসরের ঊর্দ্ধ কালের পরেও ইহা পুনশ্চ লিখিত হইবার আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল, এতদ্দ্বারা ইহ অনুমিত হয়, যে জগৎমঙ্গলের যশঃ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সে যাহা হউক, ১০৫০ সালে এ পুস্তকের রচনা হয়, এবং তৎপূর্ব্বেই কাশীদাসের মহাভারত রচিত হয়, উদ্ধৃত অংশ হইতে আমর ইহা স্পষ্টরূপে জানিতে পারিলাম।

কাশীদাস নিজে কবি, তাঁহার অপর দুই সহোদর কবি, কিন্তু এই স্থানেই প্রতিভাশালী পা বারের কবিত্ব যশের শেষ নহে। কাশীরামদাসের ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দরামদাস ১৫০০ শ্লোকে মহাভারতে দ্রোণপর্ব্বটি অনুবাদ করিয়াছিলেন; যে হস্তলিখিত পুঁথিখানি পাও গিয়াছে, তাহা ১১৬২ সনের লেখা। "লেখক শ্রীশ্রীনাথ গোস্বামী, য

নন্দরাম দাস।

কাশীদাসের কৃত দ্রোণপর্ব্বের অনুবাদটি থাকিত, তবে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র, পিতৃব্যের যশের লো

* বিশ্বকোষ আফিসের ২৯০ সংখ্যক পুঁথি।

চেষ্টায় এই অনুবাদকার্য্যে ব্রতী হইতেন বলিয়া বোধ হয় না। বিশেষ আর একটি কথা এই দেখা যায় যে, কাশীদাসের দ্রোণপর্ব্ব এবং নন্দরামদাসের দ্রোণপর্ব্ব,—একই গ্রন্থ। আমরা যে পর্য্যন্ত উভয় অনুবাদের রচনা অনুসরণ করিতে পারিলাম, তাহাতে কোন বিশেষ পার্থক্য অনুভব করিতে পারিলাম না,—এই কারণে এবং পূর্ব্বোল্লিখিত অপরাপর নানা কারণে মনে হয় যেন, কাশীদাস সমগ্র মহাভারতের অনুবাদটি সঙ্কলন করিয়া যাইতে পারেন নাই। কাশীদাস, গদাধর দাস এবং নন্দরাম দাস এই তিন জনের চেষ্টায় যে মহাভারতের অনুবাদ প্রণীত হইয়াছে, তাহাতে সাধারণতঃ কাশীদাসের ভণিতা বজায় রাখিয়া উহা "কাশীদাসী মহাভারত" নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। যদিও সমস্ত মহাভারতের মধ্যে একটি একভাবাত্মক ছন্দঃ ও বৈষম্যহীন সুন্দর সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, তথাপি বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে প্রতীয়মান হইবে, "আদি, সভা, বন, বিরাট" এই তিন পর্ব্বে যে সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি ও শব্দঝঙ্কারের পরিচয় আছে, পরবর্ত্তী অধ্যায়গুলিতে তাহার সমূহ অভাব। "দেখ দ্বিজ মনসিজ" প্রভৃতি অংশের শব্দসম্পৎ একঘেয়ে পয়ার ছন্দের মধ্য হইতে ভারতচন্দ্রীয় যুগের সহিত এই কাব্যের সম্পর্ক প্রতিপন্ন করিয়াছে। পরবর্ত্তী অধ্যায়গুলির শ্রেষ্ঠ অংশসমূহ নিত্যানন্দ ঘোষ, দ্বিজ রঘুনাথ * এবং অপরাপর পূর্ব্ববর্ত্তী মহাভারত রচকগণের রচনা হইতে অপহৃত হইয়াছে। কাশীদাসের মহাভারতে যদি কিছু মৌলিকত্ব থাকে, তাহা পূর্ব্বাংশেই পর্য্যবসিত। †

কাশীদাসী ভারতে কোন্ কোন্ কবির রচনা।

রামেশ্বর নন্দী নামক কবি সম্ভবতঃ কাশীদাসের পরে মহাভারত অনুবাদ করেন; যে হস্তলিখিত পুঁথি পাইয়াছি, তাহা ১০০ বৎসরের প্রাচীন। এই কবির রূপবর্ণনাতে ভারতচন্দ্রের মত স্বর্গ মর্ত্ত্য লইয়া ক্রীড়া ও যথেষ্ট বাক্যপল্লব আছে; ভাষাটি অনেক পরিমাণে বিশুদ্ধ—এই জন্য রামেশ্বরকে কাশীদাসের পরবর্ত্তী কবি বলিয়া মনে হয়,—

রামেশ্বর নন্দীর মহাভারত।

---

* এই অনুবাদটি উড়িষ্যাধিপতি মুকুন্দদেবের রাজত্বকালে বিরচিত হয়। পুস্তকের আবিষ্কর্ত্তা শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় লিখিয়াছেন,—"কাশীরামদাসের অশ্বমেধপর্ব্বের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলাম; কোন কোন স্থলে সুন্দর মিল আছে, কেবল দুই একটি শব্দ মাত্র পৃথক্।"—পরিষৎ-পত্রিকা, ২য় সংখ্যা, ১৩০৫ সন, ১৪১ পৃঃ।

† সম্প্রতি মহাভারতের একখানি প্রাচীন পুঁথির ভণিতায় পাওয়া গিয়াছে যে, কাশীরাম দাস মৃত্যুকালে তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দরামকে ডাকিয়া অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বলিতেছেন যে তাঁহার বড় দুঃখ রহিল যে তিনি মহাভারত সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারিলেন না। নন্দরামকে সেই অবশিষ্ট অংশ পূর্ণ করিবার জন্য তিনি কাতরভাবে অনুরোধ করিলেন। আমরা বাকী মহাভারতের অনেক প্রাচীন পুঁথিতে নন্দরামের ভণিতা পাইতেছি। নন্দরাম নিত্যানন্দের পুঁথি নকল করিয়া পিতৃব্যের রচিত মহাভারতের সঙ্গে নিজের নাম সই করিয়া জুড়িয়া দিয়াছেন। কালে তাঁহার নাম লুপ্ত হইয়া সমস্ত মহাভারতখানাই কাশীদাসের নামে বিকাইতেছে।

শকুন্তলার রূপ বর্ণনা—"চামরে চিকুরা কেশ হেন মনে লয়। চাঁচর তাহাতে নাই এইত বিস্ময়। চাঁদ কুন্দ দিয়া মুখ করিল নির্ম্মিত। তাহাতে কলঙ্কহেতু নহে পরতীত॥ অরুণ তিলক ভালে হেন লএ চিতে। সর্ব্বক্ষণ রক্তবর্ণ না থাকে তাহাতে॥ ভুরুযুগ নিরমল কাম শরাসনে। কঠিন দেখিয়া তারে নাহি লয় মনে॥ কুবলয়দলে কৈল আঁখি নিরমাণ। চঞ্চলতা নাহি তাহে কটাক্ষ সন্ধান॥ বিম্বফল জিনিয়া অধর যে দেখি। ঈষৎ মধুর হাস তাতে নাহি লক্ষি॥" একবার উপমা দিয়া আবার সে উপমাটিকে ধিক্কৃত করা, অলঙ্কার শাস্ত্রের পত্র লইয়া এবম্বিধ কৌতুকপূর্ণ ক্রীড়া কাশীদাসের পরবর্ত্তী যুগের বিশেষত্ব।

রামেশ্বর কবির স্বভাব-বর্ণনা প্রাচীন কবিগণের স্বভাব-বর্ণনার পুনরাবৃত্তি, কিন্তু ভাষা অনেকটা বিশুদ্ধ। যথা,—

লবঙ্গ কাঞ্চন নাগকেশর শোভিত। নানাজাতি বৃক্ষলতা সব পুলকিত। রক্তবর্ণে শ্বেতবর্ণে হৈছে বিকশিত। পুষ্পমধু পানে মত্ত মধুকরগণ। নানাস্থানে উড়ে পড়ে অস্থির সঘন॥ অন্যে অন্যে বাদ করি সতত ঝঙ্কারে। যাহারে শুনিলে কামে মুনি মন হরে॥ নানা জাতি পক্ষী নাদ করে সুললিত। বৃক্ষমূলে থাকিয়া খঞ্জন করে নৃত্য॥ কোকিল মধুরধ্বনি সঘনে কুহরে। তৃষ্ণায় চাতক পক্ষী পিউ পিউ বোলে॥ ময়ূর পেখম ধরি নৃত্য করে তথি। আশ্রম দেখিয়া তুষ্ট হইল নৃপতি॥
—রামেশ্বর নন্দীর ভারত, বে, গ, পুঁথি, ৮৫।৮৬ পত্র।

ইহা শকুন্তলা উপাখ্যানের পূর্ব্বভাগ। রাজেন্দ্রদাসের ন্যায় রামেশ্বরও কালিদাসের শকুন্তলা হইতে উপাখ্যান ভাগ গ্রহণ করিয়াছেন;—"কণ্টক লাগয়ে পথে আপন অঁাচলে। খসাইতে রাজারে ফিরিয়া চাহে ছলে॥" প্রভৃতি শকুন্তলার চেষ্টা কালিদাসের জগদ্বিখ্যাত চিত্রের স্পষ্ট অনুকরণে চিত্রিত হইয়াছে।

ত্রিলোচন চক্রবর্ত্তী।

ত্রিলোচন চক্রবর্ত্তী নামক অপর এক কবি মহাভারত অনুবাদ করিয়াছিলেন, ১৩০১ সালের বৈশাখ মাসের নব্যভারতে শ্রীযুক্ত বাবু রসিকচন্দ্র বসু মহাশয় ইঁহার বিষয় জানাইয়াছে, উক্ত প্রবন্ধ-লেখকের মতে ত্রিলোচন চক্রবর্ত্তী ২০০ বৎসর পূর্ব্বের কবি। মহাভারতের আরও অনেকগুলি অনুবাদ আমরা পাইয়াছি। (বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় গ্রন্থ দেখুন।)

ভাগবতের অনুবাদ।

ভাগবতের অনুবাদ তিন খানির বিষয় ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে:—১। গুণরাজ খাঁর শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়, ২। মাধবাচার্য্যে শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, ৩। লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস প্রণীত বিষ্ণুপুরীর 'বিষ্ণুভক্তিরত্নাবলী'র অনুবাদ। 'বিষ্ণুভক্তিরত্নাবলী' ভাগবতের সারসংগ্রহ মাত্র। কিন্তু এই অনুবাদত্রয় সমগ্র ভাগবতের অনুবাদ নহে,—শ্রীকৃষ্ণবিজয় ১০ম ও ১১শ স্কন্ধের এবং শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ১০ম স্কন্ধের অনুবাদ। লাউড়িয়া কৃষ্ণদাসের অনুবাদে অতি সংক্ষেপে ভাগবতের অংশবিশেষের পরিচয় আছে, কিন্তু গদাধরপণ্ডিতের শিষ্য ভাগবতাচার্য্য (রঘুনাথ) ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্বভাগে সমগ্র ভাগবতের অনুবাদ প্রচার করিয়া ছিলেন। এই অনুবাদখানি বেশ সুন্দর, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের নিকট ইহার প্রায় সমস্ত পুঁথিখানি সংগৃহীত আছে,—

অনুবাদ প্রায় ২০০০০ শ্লোকে পূর্ণ। সাহিত্যপরিষদ্ এই অনুবাদ প্রকাশিত করিয়াছেন। ১৫৬৭ খৃঃ অব্দে বিরচিত কবি কর্ণপুরের শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকায় এই পুস্তকের উল্লেখ আছে—"নির্ম্মিতা পুস্তিকা যেন কৃষ্ণ প্রেম-তরঙ্গিণী। শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্যো গৌরাঙ্গাত্যবল্লভঃ।" রঘুনাথ পণ্ডিতের ভাগবতানুবাদের নাম "কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী,"—ইহা সেই গ্রন্থের সর্ব্বত্রই উল্লিখিত আছে—"শ্রীভাগবত আচার্য্যের মধুরস বাণী। একমনে শুন কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী॥" "কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী শুন সাবধানে।" চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থেও এই অনুবাদকারকের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা—"শ্রীগদাধর পণ্ডিত শাখাতে মহত্তম। তাঁর উপ-শাখা কিছু করি যে গণন॥ শাখাশ্রেষ্ঠ ধ্রুবানন্দ, শ্রীধর কর্ম্মচারী। ভাগবতাচার্য্য, হরিদাস ব্রহ্মচারী॥"

রঘুনাথ পণ্ডিতের কৃষ্ণ-প্রেমতরঙ্গিণী।

কিন্তু আমাদের বিশ্বাস কবিচন্দ্রপ্রণীত গোবিন্দমঙ্গলাখ্য ভাগবতানুবাদই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। 'কবিচন্দ্র' সমস্ত ভাগবতের সুললিত পদ্যানুবাদ প্রণয়ন করেন, তাহা ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।—কবিচন্দ্রের ভাগবত-খানির নানা অংশের প্রাচীন পুঁথি বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র যেরূপ সুলভ ভাগবতাচার্য্যের অনুবাদ, সেরূপ সহজ প্রাপ্য নহে। তাহা ছাড়া ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে পাকুড়ের রাজা পৃথ্বীচন্দ্র কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীদাসের মহাভারত ও কবিকঙ্কণের চণ্ডী প্রভৃতি কাব্যের সঙ্গে কবিচন্দ্রের গোবিন্দ-মঙ্গলের উল্লেখ করিয়াছেন। রাজার পুস্তকাগারে নানারূপ পুস্তকই থাকার কথা,—তন্মধ্যে যেখানি যে বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ তাহারই উল্লেখ করা হইয়াছে, আমরা এরূপ অনুমান করিতে পারি।

কবিচন্দ্র।

কবিচন্দ্রের গোবিন্দমঙ্গল হইতে একটু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল; স্থানাভাববশতঃ অধিক রচনা উদ্ধৃত করিতে পারিব না;—

"রাধিকার প্রেমনদী রসের পাথার। রসিক নাগর তাহে দেন যে সাঁতার। কাজলে মিশিলে যেন নব গোরোচনা। নীলমণি মাঝে যেন পশিল কাঁচাসোনা॥ কুবলয় মাঝে যেন চম্পকের দাম। কালো মেঘ মাঝেতে বিজলী অনুপম॥ পালঙ্ক উপরে কৃষ্ণ রাধিকার কোলে। কালিন্দীর জলে যেন শশধর হেলে॥"

পূর্ব্বোক্ত অনুবাদগুলি ছাড়া অভিরামদাস নামক জনৈক সুকবি ভাগবতের সমস্ত কিংবা অধি-কাংশের অনুবাদ করিয়াছিলেন। ১৬৫৮ খৃঃ অব্দে সনাতন চক্রবর্ত্তী নামক অপর একজন কবি ভাগবতের অনুবাদ করেন। লেখক আওরঙ্গজীবের সঙ্গে সুজার যুদ্ধের সময় উল্লেখ করিয়া পুস্তকরচনার কাল-নির্দ্দেশ করিয়াছেন, বঙ্গবাসী-কার্য্যালয় হইতে উহার কতকাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভাগবতের উপাখ্যানভাগ অবশ্যই বহুসংখ্যক কবিই রচনা করিয়াছেন, জয়ানন্দের ধ্রুবচরিত্র, প্রহ্লাদচরিত্র, দ্বিজ কংসারির প্রহ্লাদচরিত্র, দ্বিজ

অপরাপর ভাগবতানুবাদকগণ।

ভবানন্দের নানা ভাগবতোক্ত উপাখ্যান, নারায়ণ চক্রবর্ত্তীর পুত্র জীবন চক্রবর্ত্তী প্রণীত 'কৃষ্ণমঙ্গল' প্রভৃতি এই স্থলে উল্লিখিত হইতে পারে। কাশীদাসের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণদাসের ভাগবতানুবাদের বিষয় ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

ভবানীপ্রসাদ ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন, ইহাঁরা মৈমনসিংহে বৈদ্যসমাজভুক্ত নহেন, বঙ্গীয় সমাজভুক্ত, ইহাঁদের উপাধি রায়। ইনি জন্মান্ধ,এইটুকুই তাঁহার বিশেষত্ব। শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বসু মহাশয় এই অন্ধকবিকে আলোকে আনিয়া আমাদের ধনবাদার্হ হইয়াছেন। কবিমহাশয়ের জ্ঞাতিগণের সঙ্গে সদ্ভাব ছিল না। জ্ঞাতিভ্রাতা কাশীনাথের পুত্রগণের বিরুদ্ধে তিনি অনেক অভিযোগ আনিয়াছেন। পাঠকগণ উভয় পক্ষের প্রমাণ না লইয়া অন্ধের প্রতি পক্ষপাতপরায়ণ হইয়া এক তরফা ডিক্রী দিতে পারেন, কিন্তু তাহা উচিত নহে। মুকুন্দরাম অঙ্কিত ডিহিদার মামুদসরিফ দেশের শত্রু, সুতরাং কবির বর্ণনার উপর আস্থা স্থাপন করিয়া তদ্বিরুদ্ধে বিচার চলে,—এস্থলে কিন্তু অভিযোগ নিতান্ত ব্যক্তিগত,—কবি স্বীয় পারিবারিক বিদ্বেষবশতঃ গ্রন্থের মুখবন্ধ লিখিবার সুযোগ লইয়া অপরের গ্লানি না করিলে তিনি সর্ব্বতোভাবে সাধারণের কৃপাপাত্র হইতেন, সন্দেহ নাই। তাঁহার অবতরণিকা কি ভাষা, রুচি কিংবা কবিত্ব ইহার কোন হিসাবেই প্রশংসা-যোগ্য হয় নাই।—"নিবাস কাঁটালিয়া গ্রাম বৈদ্যকুলজাত। দুর্গার মঙ্গল বোলে ভবানীপ্রসাদ॥ জন্মকাল হৈতে কালী করিলা দুঃখিত। চক্ষুহীন করি বিধি করিলা লিখিত॥ দাঁড়াইয়াছি আমি ভাবি কালীর চরণ। দাঁড়াতে আমার নাহিক কোন স্থান॥ জ্ঞাতি ভ্রাতা আমার আছে নাম কাশীনাথ। তাহার তনয় দুই কি কহিব সম্বাদ॥ জ্ঞাতি ভাই করি তেঁহ করেন আপ্যিত। তাহার তনয় গুণ কহিতে অদ্ভুত॥ কনিষ্ঠ পুত্রের গুণ ভুবন বিদিত। পরদ্রব্য পরনারী সদায় পীরিত॥ বিদ্যা উপার্জ্জন তার নাহি কোন লেশ। পিতা পিতামহ নাম করিলা নিকাশ॥ দীর্ঘ টানে সদা তেঁহ থাকেন মগন। জ্ঞাতিবন্ধু সহ তার নাহিক মরণ॥ তাহার চরিত্র গুণ কি কহিব কথা। খুড়া প্রতি করে তেঁহ সদায় বৈরতা॥ এহি দুঃখে কালী মোরে রাখিলা সদায়। তোমার চরণ বিনে না দেখি উপায়॥ দুষ্ট হাত হইতে কালী কর অব্যাহতি। তুমি না তরাইলে মোর হবে অধোগতি॥ মনে ভাবি তোমার পদ করিয়াছি সার। এ দুষ্টের হাত হৈতে করহ উদ্ধার॥ আমি অজ্ঞ ক্রিয়াহীন না দেখি উপায়। শরণ লৈয়াছি মাত রাখ তব পায়॥" অন্যত্র,—"ভবানীপ্রসাদ রায় ভাবিয়া আকুল। চক্ষুহীন কৈলা বিধি নাহি পাই কূল॥ কাঁটালিয়া গ্রামে কররবংশেতে উৎপত্তি। নয়নকৃষ্ণ নামে রায তাহার সন্ততি॥—জন্ম অন্ধ বিধাতা যে করিলা আমারে। অক্ষর পরিচয় নাই লিখিবার তরে॥" অন্ধকবি জীবনে অনেক কষ্ট সহিয়া গিয়াছেন, সেই কষ্ট বর্ণনায় যদি কিছু বিদ্বেষের চিহ্ন স্পষ্ট অপভাষায় প্রকাশিত হইয়া থাকে, তজ্জন্য তাঁহার প্রতি শ্লেষ প্রয়োগ করিয়া আমাদের কবির প্রেতাত্মাকে রুষ্ট করা সুরুচির পরিচায়ক (কিংবা ভূত-যোনিতে বিশ্বাস করিলে) নিরাপদ হইবে না। ভবানীপ্রসাদের রচনায় প্রসাদগুণ বেশ আছে, কিন্তু তিনি জন্মান্ধ থাকায় তাঁহার অক্ষর জ্ঞান ছিল না, তাহা "চণ্ডী"তে পরিষ্কারই ধরা যায়; এই উদ্ধৃত

মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অনুবাদ, অন্ধ ভবানীপ্রসাদ রায়।

অংশেই,—"প্রসাদ" সঙ্গে "জাত," "নাথ"এর সঙ্গে "সম্বাদ," "কথা"র সঙ্গে "বৈরতা" প্রভৃতি শব্দ দ্বারা মিল দিতে দেখা যায়, তাঁহার পুস্তক ভরিয়া "রাজন"এর সঙ্গে "পরাক্রম," "আমি"এর সঙ্গে "মুনি," "শ্রীরাম"এর সঙ্গে "জাম্বুবান," "অনুপম"এর সঙ্গে প্রজাগণ" মিল পড়িয়াছে; প্রাচীন অনেক কাব্যেই এরূপ দৃষ্টান্ত মধ্যে মধ্যে দৃষ্ট হয়; কিন্তু ভবানীপ্রসাদ এই ভাবের যেরূপ ঘন ঘন প্রয়োগ করিয়াছেন, অন্য কোন কবির রচনায় সেরূপ দেখা যায় নাই। শুধু শ্রুতিই তাঁহার পদের নির্ণায়ক সুতরাং লিখিত কথা অপেক্ষা তদ্দেশবাসিগণের উচ্চারিত কথাই তাঁহার কাব্যের অধিকতর আদর্শ হওয়া স্বাভাবিক হইয়াছিল।

ভবানীপ্রসাদের মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অনুবাদ সর্ব্বত্রই মূলের অনুবাদ নহে। মার্কণ্ডেয় মুনিকে ত্যাগ করিয়া গ্রন্থকার মধ্যে মধ্যে অন্যান্য মুনিগণেরও শরণাপন্ন হইয়াছেন। অনুবাদ বেশ সরল ও সুন্দর, নিম্নে চণ্ডীর সুপরিচিত একটি অংশের ভাষানুবাদ উদ্ধৃত করা হইল ঃ—

"যেহি দেবি বুদ্ধিরূপে সর্ব্বভূতে থাকে। নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার তাকে॥ যেহি দেবী লজ্জারূপে সর্ব্বভূতে থাকে। নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার তাকে॥ যেহি দেবী ক্ষুধারূপে সর্ব্বভূতে থাকে। নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার তাকে॥ যেহি দেবী তৃষ্ণারূপে সর্ব্বভূতে থাকে। নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার তাকে॥ যেহি দেবী দয়ারূপে সর্ব্বভূতে থাকে। নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার তাকে॥"

অন্ধকবি ভবানীপ্রসাদের ক্ষমতা বেশ ছিল। বামনের চাঁদ ধরিবার ও অন্ধের কাব্য লেখার সাধ একমাত্র ভগবানই পূর্ণ করিতে সমর্থ, ভবানীপ্রসাদের সে আশা তিনি চরিতার্থ করিয়াছিলেন; কিন্তু অন্ধকবি পাইলেই আমরা মিল্টন ও হোমার স্মরণ করিয়া উৎফুল্ল হইব, ইহা ঠিক নহে।

রূপনারায়ণ ঘোষকৃত চণ্ডীর অনুবাদ।

ভবানীপ্রসাদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর প্রতিভাশালী কবি রূপনারায়ণ প্রায় সমকালেই মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অপর একখানি অনুবাদ প্রণয়ন করেন। এই কবি আদিশূর-আনীত কায়স্থ মকরন্দ ঘোষের বংশীয়; যশোহর ইঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের বসতিস্থান ছিল। যশোহরে রাষ্ট্রবিপ্লব (সম্ভবতঃ মানসিংহের আক্রমণ-ঘটিত) হইলে, জগন্নাথ ও বাণীনাথ এই দুই সহোদর—স্বদেশ ছাড়িয়া মাণিকগঞ্জ-আমডালা গ্রামে উপস্থিত হন। সেখানকার জমিদার জনৈক করবংশীয় নিম্নশ্রেণীর কায়স্থ দুই ভ্রাতাকে আদরের সহিত অভ্যর্থিত করিয়া স্বীয় দুই কন্যার পাণিগ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন; জ্যেষ্ঠ বাণীনাথ এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হন না—উভয় ভ্রাতা পলায়ন করিয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু বাণীনাথ ধৃত হইয়া পদ্মার ক্রোড়ে নিক্ষিপ্ত হন,—মৃত্যুর পূর্ব্বেও তাঁহাকে করমহাশয়ের কন্যা বিবাহ করিয়া জীবনরক্ষার প্রস্তাব করা হইয়াছিল। তিনি 'জগন্নাথের দ্বারায় আমাদের বংশরক্ষা হইবে', এই অভিমত প্রকাশ করিয়া বীরের মত পদ্মার আবর্ত্তে প্রাণত্যাগ করিলেন; কিন্তু এই বঙ্গালীবীরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা জগন্নাথ বিস্তর যৌতুকের লোভে ময়মনসিংহ বাফলা গ্রামের জমীদার যাদবেন্দ্র রায়ের কন্যা বিবাহ করিয়া

আদাজান গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হন। যাদবেন্দ্র রায়ের মৃত্যুর পর বাফলার জমিদারগণ কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া কবি যে শ্লোকটি রচনা করিয়াছিলেন, তাহার একার্দ্ধ এখনও তদ্দেশে প্রচলিত আছে,—
"যাদবেন্দ্রবিহীনেয়ং বাফলা নিষ্ফলা গতা।"

শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বসু অনুমান করেন * জগন্নাথ-পুত্র রূপনারায়ণ খৃঃ ১৫৯৭ কিম্বা তৎসন্নিহিত কোন সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। কবি রূপনারায়ণের কৃত অনুবাদখানিতে তাঁহার সংস্কৃত শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তির যথেষ্ট পরিচয় আছে, ইহাতে দশনের সহিত দাড়িম্ব বীজের, কম্বুব সহিত কণ্ঠের এবং কর্ণের কুণ্ডলের সঙ্গে মদনের রথচক্রের উপমা আছে—"যো রথ আরোহি মদন বীর॥ জিনিল পিনাকপানি ধীর॥—শেষের উপমাটী একটু নূতন হইলেও উহা সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্র হইতেই আহৃত। কবি, কালিদাসের রঘুবংশ পড়িয়াছিলেন, মার্কণ্ডেয় মুনির খাতায় সে বিস্তারও উজ্জ্বল দীপ্তি পড়িয়াছে, যথা, —"গুণের গরিমা তার কে পারে বর্ণিতে। দুস্তর সাগর চাহি উডুপে তরিতে॥ প্রাংশুগম্য মহাফল লোভের কারণ। হাতে পাইতে ইচ্ছা করয়ে বামন॥ পরন্তু ভরসা এক মনে ধরিতেছে। বজ্রবিদ্ধ মণিতে সূত্রের গতি আছে॥" "পরন্তু" আমাদেরও বিশ্বাস এই যে রূপ বর্ণনা করিতে যাইয়া যদি মূলবহির্ভূত অতিশয়োক্তির আড়ম্বর একবারে পরিহার করিতেন, তবেই ভাল হইত, এবং তাহা হইলেও তাঁহার সংস্কৃত কাব্য-শাস্ত্রে প্রবেশ আছে, আমরা এ কথা কখনই অস্বীকার করিতে পারিতাম না। গৃহিণীগণ এত অলঙ্কার প্রদর্শনাভিলাষী হইয়া তো কখনও অন্নব্যঞ্জনের সঙ্গে দুই একটি স্বর্ণ-দানা কিংবা মুক্তা বাঁধিয়া বসেন না;—সেগুলি দেখাইবার স্থান ও সুবিধা বিবেচনা করা আবশ্যক, প্রাচীন কবিগণের অনেকেরই সেই জ্ঞানটির অভাব। "যেখানে যেটি"—ইহা কবি হইতে সামান্য মুটে মজুর সকলেরই কার্য্যের সূত্র হওয়া উচিত।

প্রভাসখণ্ড।

শিশুরামদাস নামক এক লেখক এই সময় প্রভাসখণ্ডের অনুবাদ করেন, তাঁহার পরে ঈশ্বরচন্দ্র সরকার প্রভাসখণ্ডের আর একখানি অনুবাদ সঙ্কলন করিয়াছিলেন।

অষ্টম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট।

সমাজের চিত্র।

অষ্টম অধ্যায়ে বর্ণিত কাব্যগুলিতে বাঙ্গালা দেশের আচার ব্যবহার সুচিত্রিত আছে। কবি-কঙ্কণের চণ্ডী সেই সমাজের একখানি সুনির্ম্মল দর্পণের ন্যায় পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে বঙ্গীয় গার্হস্থ্য জীবন প্রতিফলিত করিতেছে। সেই সময়ে যুদ্ধ-

* পরিষৎ পত্রিকা, ২য় সংখ্যা, ১৩০৪ সাল, পৃঃ ৭৭।

বিগ্রহাদি সর্ব্বদাই সংঘটিত হইত; এখন কবিগণ বীররসে মাতিয়া তোপের শব্দে আম্রবন কম্পিত ও মাতৃক্রোড়স্থ শিশুর শান্তিভঙ্গ করেন, ইহা সর্ব্বৈব কাল্পনিক; বস্তুতঃ যুদ্ধের কথা ইতিহাস ও কাব্য পড়িয়াই আমরা জানিতে পারি, কোন বাঙ্গালা লেখকের সেই দৃশ্য দেখিবার কোন আশঙ্কা নাই; কিন্তু ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশে যুদ্ধাদি সর্ব্বদাই ঘটিত এবং এই কৃশাঙ্গ ভীরু বঙ্গবাসীদের মধ্যেও সৈনিক পুরুষের অভাব ছিল না; মাধবাচার্য্যের চণ্ডীতে আমরা ব্রাহ্মণপাইক, কর্ম্মকারপাইক, চামারপাইক, নটপাইক, বিশ্বাসপাইক ও বাঙ্গাল পাইকগণের বিবরণ দেখিতে পাই; ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ অস্ত্রপ্রয়োগনিপুণ ও বলিষ্ঠ ছিলেন, কালকেতুর বল ও সাহস একজন উচ্চদরের সৈনিকের উপযুক্ত, কিন্তু বঙ্গীয় কাব্যসমূহে অতিমাত্রায় যুদ্ধাদির বর্ণনা পাঠ করিয়াও আমরা প্রকৃত বীররস দেখিতে পাই না; কৃত্তিবাসী রামায়ণে দৃষ্ট হয়, শ্রীরামচন্দ্র চাঁপা নাগেশ্বর জটায় বাঁধিয়া যুদ্ধ করিতেছেন, মাধবাচার্য্যের চণ্ডীতে আছে, চণ্ডীদেবী ভয়ানক যুদ্ধে মঙ্গল দৈত্যকে বধ করিয়া সহচরীগণের নিকট বিশ্রামজন্য একটি পান ও পাখা চাহিতেছেন ও কলিঙ্গরাজ স্বপ্ন দেখিয়া আকুল হইয়া পড়াতে—

বাঙ্গালী সৈনিক।

"রাজার প্রকৃতি দেখি রাণী সব কাঁদে। কর্ণে জপ করে কেহ শিরে শিক্ষা বাঁধে॥"

কাব্যে বীর রসের অভাব।

কবিকঙ্কণের কালকেতু এত বড় বীর হইয়াও যুদ্ধে পরাস্ত হওয়ার পর স্ত্রীর প্ররোচনায় ধনাগারে লুক্কায়িত হইয়া রহিল, কলিঙ্গাধিপের কোটাল এই বলিষ্ঠ কাপুরুষটিকে তথা হইতে টানিয়া বাহির করিলে ফুল্লরা কাঁদিয়া বলিতে লাগিল,—"না মার না মার বীরে শুনহে কোটাল। গলার ছিঁড়িয়া দিব শতেশ্বরী হার॥"—(ক, ক, চ)। পরন্তু যুদ্ধক্ষেত্রের বর্ণনায় এরূপ বর্ণনা বিরল নহে, 'ব্রাহ্মণে না মার, ব্রাহ্মণে না মার, পৈতা দেখাইয়া কাঁদে।"—(ক, ক, চ)। যতেক ব্রাহ্মণ পাইক পৈতা করি করে। দন্তে তৃণ করি তারা সন্ধ্যামন্ত্র পড়ে॥"—(মা, চ)।

এই বঙ্গদেশে তখন সীতারামের ন্যায় দুই একজন প্রকৃত বীর ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম স্বরূপ গণ্য হইবেন। লাউসেনের ভ্রাতা কর্পূরের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, লাউসেনের যুদ্ধাদি বর্ণনা হইতে কর্পূরের প্রাণরক্ষার চেষ্টায় বাঙ্গালী-চরিত্র বেশী সুন্দর ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রকৃত বীরত্বের অভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে বীরগণের শরের শন্ শন্ ও বাঁশের লাঠির ঠন্ ঠন্ একরূপ ভ্রমরগুঞ্জনের ন্যায় বোধ হয়।

হিন্দুরাজগণ সকালে বিকালে পুরাণ-পাঠ শুনিতেন, ভাগবতই তখন শ্রেষ্ঠ পুরাণ বলিয়া আদৃত হইত। বড় বড় রাজগণের অধীন রাজগণ "ভূঞা রাজা" নামে আখ্যাত হইতেন; কোন শ্রেষ্ঠ রাজার অভিষেকের সময় "ভূঞারাজগণ" তাঁহার মাথায় ছত্র ধরিতেন, রাজগণ অনেক সময় গ্রামনগরাদি সংস্থাপনের সময় বহুসংখ্যক দেবোত্তর ও

রাজা ও প্রজা।

ব্রহ্মোত্তর জমি দান করিতেন ও অনেক সময় কৃষকদিগকে লাঙ্গল ও চাষের বলদ প্রভৃতি দান করিয়া গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিতেন। রাজাদিগের দৌরাত্ম্যও রাজ-প্রসাদের তুল্যই অপরিমিত ছিল ; বাজারে পণ্যজীবিগণ রাজকর্ম্মচারীদিগের ভয়ে অস্থির থাকিত, আমরা ভাঁড়ুদত্তের প্রসঙ্গে তাহা দেখাইয়াছি। অনেক রাজার ধর্ম্মবিশ্বাস ও বিনয় ইতিহাসে দৃষ্টান্তস্থলীয়, সচরাচর ব্রহ্মোত্তর দানপত্রে এইরূপ বিনীত প্রার্থনা পাওয়া যায়,—"যদি আমার বংশের অধিকার লুপ্ত করিয়া অন্য কেহ এই রাজ্য লাভ করেন, তবে তাঁহার নিকট আমার এই প্রার্থনা আমি তাঁহার দাসানুদাস হইয়া থাকিব, তিনি যেন ব্রহ্মবৃত্তি হরণ না করেন॥" সাধারণতন্ত্র রাজশাসনে মোটের উপর অপেক্ষাকৃত ন্যায় বিচার অধিক লাভ করা যায়, কিন্তু স্বেচ্ছাচারী রাজা উৎকৃষ্ট চরিত্র হইলে তাঁহার শাসনে পৃথিবী স্বর্গের ন্যায় হয়। কবিকঙ্কণচণ্ডীতে

বাজার দর।

দুর্ব্বলার বাজার করার যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে দৃষ্ট হইবে, সে সময়ে জিনিষপত্র সমস্তই অতি সুলভমূল্য ছিল ; মাধবাচার্য্যের চণ্ডীতে প্রদত্ত ফর্দ্দে তদপেক্ষাও সুলভ মূল্য দৃষ্ট হয়, পূর্ব্ববঙ্গের বাজারে জিনিষের মূল্য আরও সস্তা ছিল বলিয়া বোধ হয়। ভদ্রলোকগণ তখন সাধারণতঃ পাদুকা ব্যবহার করিতেন না। ভদ্রলোক অতিথি

আচার ব্যবহার ও বেশ ভূষা।

কোন গৃহস্থের বাড়ীতে উপস্থিত হইলে প্রথমেই তাঁহাকে পা ধুইবার জল দিয়া সম্ভাষণ করিতে হইত ; বহু কষ্টে একটি জলপূর্ণ গাড়ুর সাহায্যে কাদা ধুইয়া ফেলিয়া ভদ্রলোকগণ "গাস্তারীর পীড়া" চাপিয়া বসিতেন, এবং কখনও আহারান্তে একটি অর্দ্ধখণ্ডিত গুবাক চর্ব্বণ করিয়া মুখ শুচি করিতেন। খুব ভাল অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ রাত্রিতে শয়ন-প্রকোষ্ঠে যাইবার পূর্ব্বে ভাল করিয়া পা ধুইয়া পাদুকা পরিয়া শয্যায় যাইতেন, ধনপতি লক্ষেশ্বর ব্যক্তি, তিনি শুইবার পূর্ব্বে—"চরণে পাদুকা দিয়া করিল গমন। পদ্মনাভ স্মরি সাধু করিল শয়ন॥" স্ত্রীলোকগণ অঙ্গদ, কঙ্কণ, কর্ণপুর প্রভৃতি নানারূপ সোণার অলঙ্কার পরিতেন, নানা ছন্দে খোপা বাঁধিতেন, ও "মেঘডুম্বুর" শাড়ী এবং কাঁচুলি পরিতেন ; নিকৃষ্ট শ্রেণীর স্ত্রীলোকগণ "ক্ষুঞা" বা ক্ষৌমবাস পরিত, ইহা একরূপ অল্পমূল্য পট্টবস্ত্র ; মাণিকচাঁদের গানে দেখিয়াছি গোপীচাঁদের রাজত্বকালে বাঁদীগণও "পাটের পাছড়া" পরিত না ; এই "পাটের পাছড়া" ও "ক্ষুঞাবাস" একই প্রকারের কাপড় বলিয়া বোধ হয়। ভারতচন্দ্র "খুঁয়ে তাঁতি হয়ে দেহ তসরেতে হাত" কথার এই "খুঞা" বস্ত্রের প্রতি নিগ্রহ দেখাইয়াছেন। স্ত্রীলোকগণের অঙ্গমার্জ্জনার জন্য আমলকীই সাবানের কার্য্য করিত ; স্বর্ণালঙ্কারের সঙ্গে ফুলও অঙ্গরাগের একটি বিশেষ উপকরণ ছিল, বাজারে নানারূপ ফুল বিক্রয় হইত, শ্রীকৃষ্ণবিজয় গোপীনীগণের বেশ করার প্রসঙ্গে "কিনিয়া চাঁপার ফুল কেহ দেহি কাণে" পাইয়াছি। কিন্তু একজন বড় ইংরেজ লেখক "Rude nations delight in flowers" এই উক্তি করিয়া উৎকৃষ্ট নাগকেশর, কুরুবক, চম্পক, পুন্নাগ ও মালতীর জাতি নষ্ট করিয়াছেন ;

সুন্দরীগণ এখন এই সব দেশীয় ফুল ছুঁইতে ভীত হইতে পারেন। পুরুষগণ বালা পরিতে লজ্জা বোধ করিতেন না, ও দরিদ্র ব্যক্তিও কর্ণে একটু সোণা পরিয়া কৃতার্থ হইত, গুজরাটপুরীর সৌভাগ্য বর্ণন করিয়া কোটাল বলিতেছে—"নগরে নাগরজনা, কাণে লম্বমান সোনা, বদনে গুবাক হাতে পান। চন্দনে চর্চ্চিত তনু হেন দেখি যেন ভানু, তসর রঙ্গন পরিধান॥"—(ক, ক, চ)। নিম্নশ্রেণীর লেখকগণ "খোসালা" নামক একরূপ শীতবস্ত্র গায় দিত। বাজারে জিনিষ খরিদ করিতে গেলে প্রথমেই কড়ি-প্রত্যাশী দুই ব্যক্তির সাক্ষাৎকার হইত; একজন লগ্নাচার্য্য,—ইনি পঞ্জিকা শুনাইয়া কিছু যাচ্ঞা করিতেন, অপর 'কুশারী' উপাধিবিশিষ্ট ওঝা, ইহার কাঁধে একটা বড় কুশের বোঝা থাকিত এবং ইনি বেদ পাঠ করিয়া অভ্যাগতকে আশীর্ব্বাদ করতঃ কিছু যাচ্ঞা করিতেন।

বিদ্যাচর্চ্চা।

তিনশত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশে শিক্ষার চর্চ্চা খুব বেশী ছিল, শ্যামানন্দ সদ্গোপ হইয়াও অতি অল্প বয়সেই ব্যাকরণ শাস্ত্রে কৃতী হইয়াছিলেন, ইহা তাঁহার বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণের পূর্ব্বে; চণ্ডীকাব্যে শ্রীপতিবণিকের শাস্ত্রে অধিকারের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাঁহার পিতা ধনপতি বণিকও—"নাটক নাটিকা কাব্যে যাঁহার উল্লাস।"—বলিয়া প্রশংসিত হইয়াছেন। সংস্কৃতটোলে বাঙ্গালা অক্ষরের সঙ্গে দেবনাগর অক্ষরেও পুস্তক লিখিত হইত, ধনপতি-বণিক সিংহলে "নাগরী বাঙ্গালা রায় পড়িবার জানি" বলিয়া স্বীয় বিদ্যার পরিচয় দিতেছেন। টোলে পাঠারম্ভ হইতে কি ভাবে অধ্যাপনা চলিত, মাধবাচার্য্য তাহার বিবরণ দিয়াছেন—"চ বর্গাদি বর্গ যত, পড়িলেক শ্রীমন্ত, কাগলয়ে প্রবেশিল মন॥ কেয় কয় কন আদি, কল ক্কোব অবধি, রেফযুক্ত পড়ে যত ফলা। কিরি কিলি আর্ক আঙ্ক, একাবধি যত অঙ্ক, কাগলয়ে পারগ হ'ল বালা॥ পূজা করি সরস্বতী, আরম্ভিলা পাঠ্য পুঁথি জানিবার সন্ধির প্রকার। স্বরসন্ধি পড়িয়া সুসম পল্লেতে গিয়া, শব্দ সন্ধি জানিলা অপার॥ চণ্ডিকার বর হেতু, পড়িলা সকল ধাতু, দ্বিবিকার জানিতে কারণ। ষত্ব ণত্ব জ্ঞান হয়, সংস্কৃতে কথা কয়, পারগ হইলা ব্যাকরণ॥" কিন্তু চৈতন্যভাগবতে দেখা যায় টোলের ঊর্দ্ধতন ছাত্রগণ ব্যাকরণকে 'শিশু শাস্ত্র' বলিয়া উপেক্ষা করিতেন। নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে অনেকে সংস্কৃতে ব্যুৎপন্ন হইতেন, কিন্তু তাঁহারা বাঙ্গালাই অনুশীলন বেশী করিতেন। ২০০—১০০ বৎসর পূর্ব্বের যতগুলি বাঙ্গালা পুঁথি পাইয়াছি, তাহাদের অনেকগুলি নিম্নশ্রেণীস্থ ব্যক্তির হাতে লেখা; কয়েকটির কথা উল্লেখ করিতেছি;—হরিবংশ (১১৯০ সন) লেখক শ্রীভাগ্যমন্ত ধুপি; নৈষধ (১১৯৭ সন) লেখক শ্রীমাঝি কাইত; গঙ্গাদাস সেনের দেবযানী উপাখ্যান (১১৮৪ সন), লেখক শ্রীরামনারায়ণ গোপ; ক্রিয়াযোগসার (সনের নির্দ্দেশ নাই, ১৫০ বৎসর পূর্ব্বের হস্তলিপি বলিয়া বোধ হয়), লেখক শ্রীকালীচরণ গোপ; রাজা রামদত্তের দণ্ডীপর্ব্ব (১৭০৭ শক), লেখক শ্রীরামপ্রসাদ দেএ। এইরূপ আরও অনেক পুঁথি আমাদের নিকট আছে। ত্রিপুরাজেলায় রাজপাড়া গ্রামে ১০০ বৎসরের প্রাচীন একখানি নলদময়ন্তী এক ধোপা-বাড়ীতে আছে,

উহা সেই ধোপার পিতামহের লেখা, লেখাটি মুক্তার ন্যায় গোটা গোটা, বড় সুন্দর। * আমরা মধুসূদন নাপিতরচিত নলদময়ন্তীর কথা উল্লেখ করিয়াছি এবং এই নাপিত-কবি যে তাঁহার পিতামহের কবিত্ব-যশের গর্ব্ব করিয়াছেন, সে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছি। গোবিন্দ কর্ম্মকার-রচিত কড়চা অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। আমি জেলায় জেলায় প্রাচীন পুঁথি খুঁজিয়া দেখিয়াছি, ভদ্রলোকগণের ঘরে বাঙ্গালা পুঁথি বড় বেশী নাই, কিন্তু নিম্নশ্রেণীর লোকের ঘরে উহা রাশি রাশি পাওয়া যায়; ইহাদের দ্বারা প্রাচীন পুঁথিগুলি যেরূপ যত্ন সহকারে রক্ষিত, তাহাতে বঙ্গীয়সাহিত্যসেবকগণ তাহাদের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবেন। বিশিষ্ট ব্রাহ্মণের টোলে সংস্কৃতের সঙ্গে বাঙ্গালা পড়ান হইত, "বারমাসী" ও "ফরমাইসী" পালা রচনারও চর্চ্চা হইত। (কঙ্ক ও লীলা দেখুন) চৈতন্য প্রভু গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে সংস্কৃত ও প্রাকৃতের সঙ্গে পালীও পড়িয়াছিলেন। ভারতচন্দ্র টোলে ও মকতবে সংস্কৃত, হিন্দী, আরবী, ফরাসী প্রভৃতি বিবিধ ভাষা শিখিয়াছিলেন, অন্নদা-মঙ্গলে তাহা উল্লেখ করিয়াছেন।

এখন লেখা পড়া শিখিলেই পৈতৃক ব্যবসায় ছাড়িয়া দিবার প্রবৃত্তি জন্মে; মধুসূদন নাপিত সংস্কৃত জানিতেন এবং স্বয়ং একজন কবি ও কবির পৌত্র ছিলেন, কিন্তু তিনি বোধ হয় স্বীয় ব্যবসায় ছাড়িয়া দেন নাই! সে সময় ধর্ম্ম, আমোদ ও আত্মার উন্নতি-কামনায় জ্ঞানের চর্চ্চা হইত; জ্ঞানচর্চ্চা যে শ্রেণীনির্ব্বিশেষে অর্থকরী, এ কথা তখন তাঁহারা জানিতেন না।

স্ত্রীশিক্ষা।

স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে লেখাপড়ার চর্চ্চা ছিল, পরবর্ত্তী অধ্যায়ে আমরা একজন শ্রেষ্ঠ স্ত্রীলোক কবির বিষয় আলোচনা করিব। কবিকঙ্কণচণ্ডীতে দৃষ্ট হয়, খুল্লনা স্বামীর অক্ষর চিনিতেন ও তাহা লইয়া সতিনীর সঙ্গে বাক্‌বিতণ্ডা করিতেছেন,—খুল্লনা বণিক্‌রমণী। বৈষ্ণব-সাহিত্যে জানা যায়, মহাপ্রভু যে সাড়ে তিন জন শ্রেষ্ঠ কৃপাপাত্রের কথা উল্লেখ করিতেন, তন্মধ্যে শিখিমাহিতীর ভগিনী মাধবী—আধ জন; এই মাধবী অতি শুদ্ধাচারিণী ছিলেন, পদকল্পতরুতে ইঁহার রচিত অনেকগুলি সুন্দর পদ আছে (৭৮৮, ১৮০৪, ২১৯২ এবং ২১৯৩ পদ দেখুন)। স্ত্রীলোকগণের মধ্যে ঔষধ করিবার প্রথা বড় বেশী ছিল, আমাদের খোট্টা ভ্রাতাদের গালি নিতান্ত অমূলক বলিয়া বোধ হয় না, জগন্নাথতীর্থে এখনও পাণ্ডারা গাহিয়া থাকে,—

"ভাল বিরাজহুঁ উড়িয়া জগন্নাথ। উড়িয়া মাঙ্গে ক্ষীর খিচুড়ী, বাঙ্গালী মাঙ্গে ডাল-ভাত। সাধু মাঙ্গে দর্শন পর্শন্‌ মহা পরসাদ॥ বাঙ্গালিনী রমণী, পরমাসুন্দরী, দেখ নয়নকতারা, ভজন সাধন নাহি জানেত, জানে বাঙ্গালিনী টোনা।"

স্ত্রীলোকের কুসংস্কার।

এই "টোনা" অর্থাৎ ঔষধ করার বৃত্তান্ত মুকুন্দকবি বিশেষরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি উপসংহারে নিজেকে বৃদ্ধ বলিয়া বাঁচাইয়াছেন,

* প্রায় ৩৩ বৎসর পূর্ব্বে আমি এসিয়াটিক সোসাইটির পক্ষ হইতে পুঁথিখানির জন্য ২৫৲ টাকা দিতে চাহিয়াছিলাম, ধুপি পুঁথি দিতে স্বীকার পায় নাই, কিন্তু তাহার এক বৎসর পরে অগ্নিদাহে ঐ পুঁথি নষ্ট হইয়া যায়।

ঔষধ প্রবন্ধে কহে মুকুন্দ বিশারদ। বুড়াকে না করে বশ দারুণ ঔষধ॥" এই ঔষধ দ্বারা বশীকরণ প্রথা বিলাতেও চলতি ছিল, সেক্ষপীয়রের ম্যাক্‌বেথ নাটকে যাদুর উপকরণের এক লম্বা লিষ্টি দিয়াছেন, মুকুন্দের তালিকায় তাহার অনুরূপ ; adders fork, eye of inewt, scale of dragon maw of shark wool of bat, gall of goat, lizard's legs, wings of owlet. প্রভৃতি বিলাতী যাদুর পার্শ্বে, "কচ্ছপের নখ, কাকের রক্ত ভুজঙ্গের ছাল, কুম্ভীরের দাঁত, বাদুড়ের পাখা কাল-কুকুরের পিত্ত, গোধিকার অ াত কোটরের পেঁচা," —ইত্যাদি কবিকঙ্কণোক্ত উপকরণগুলি স্থান পাইতে পারে। এই ছাই ভস্মের উল্লেখ দ্বারা প্রতীয়মান হইবে, মনুষ্যকল্পনা বীভৎস হইলেও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে একই ভাবে কার্য্য করে, একই দ্রব্য খুঁজিয়া বেড়ায় এবং নরপ্রকৃতি সর্ব্বত্র যে এক সাধারণ নিয়মাধীন তাহা প্রমাণ করে।

বৈষ্ণবপ্রভাব।

বঙ্গীয় সমাজ এই সময় বৈষ্ণবভাব দ্বারা সম্পূর্ণরূপে অধিকৃত হইয়াছিল, চণ্ডীকাব্যে শ্রীমন্তের সহচরগণ ও বিবাহোপলক্ষে আগত এয়োগণের নাম পড়িয়া দেখুন ; তাঁহাদের অধিকাংশ নাম আমাদের চির-পরিচিত গোপবালক ও গোপিণীগণের ; শ্রীমন্ত বাল্যকালে শকটভঞ্জন, পূতনাতৃণাবর্ত্তবধ প্রভৃতি খেলার অভিনয় করিতেছেন, নিরক্ষর কালকেতুব্যাধ পর্য্যন্ত কংস নদীর তীরে "হেথাই নরক স্বর্গ শুনি ভাগবতে।" (ক, চ,) বলিয়া ভাগবতের দোহাই দিতেছে।

পাপ-পুণ্য-বিচার।

পূর্ব্ববঙ্গের রাজেন্দ্রদাসকবি শকুন্তলোপাখ্যান প্রসঙ্গে সমাজে পাপপুণ্যের যে আদর্শ আঁকিয়াছেন, বঙ্গের পল্লীগুলিতে বোধ হয় এখনও ধর্ম্মাধর্ম্মের সে শাসন কতক পরিমাণে বিদ্যমান আছে,—"ভক্তি করি ব্রাহ্মণ সেবা করে যেই জন। তার পুণ্য ব্রহ্মা কৈতে না পারে আপন॥ গোধন জলেতে যদি জল পান করে। তার ফলে সেইজন যায় স্বর্গপুরে॥" কিন্তু পুষ্করিণী রিজার্ভ করিবার এই হুজুগের সময় গোধনের জলপান করায় কোন পুষ্করিণীর মালিক পুণ্য-সঞ্চয় ভাবিয়া সুখী হইবেন কি না সন্দেহ। মহাপাপগুলির ভয়ও ইদানী অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে, পূর্ব্বোক্ত কাব্যে এই সকল ব্যক্তি মহাপাপী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে,—'নিষেধ দিবসে যে মৎস্য মাংস খায়। মাঘে মূলা খায় যে নির্ম্মাল্য পুছে যায়॥ কুলাচার ছাড়ি যেবা অনাচার করে। কুলবিদ্যা ছাড়ি যেবা অন্য বিদ্যা ধরে॥ ভোজনান্তে ক্ষৌর করে না করে বিচার। উত্তম অধমে অন্ন একত্রে আহার॥ এই শতাব্দীতে ইহারই অনেকগুলি ধারা রদ হইয়াছে।

শব্দার্থ।

আমরা পূর্ব্ববৎ শব্দার্থের তালিকা দিয়া যাইতেছি, কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে,—জাঙ্গাল—সেতু ও বড় রাস্তা, নায়ক—যাঁহার বাড়ীতে গানের আসর বসিত। সূপ—ব্যঞ্জন, উতাড়িয়া—উত্তোলন করিয়া, উত্তরিল—পৌঁছিল, উধার—ধার, পিছিলা—পূর্ব্ববর্ত্তী (মাংসের পিছিলা বাকী ধারি দেড় বুড়ি")। জট—চুল, (জটে ধরি মাগ মোরে করিলা নিস্তার" "জটে ধরি বাঁধে মহাবীরে," এখন জট অর্থ "জটা" হইয়াছে), পিছে—প্রতি, ("হাল পিছে এক তঙ্কা"] নাবড়ো—শঠ, ক্রন্দনা—কান্না, নাটুয়া—রঙ্গভূমির

অভিনেতা ("স্নান করি নীলাম্বর, ধরে পূর্ব্ব কলেবর, নাটুয়া ফিরায় যেন বেশ।") উভরায়—উচ্চরবে, জেঠি (জেষ্ঠি)—টিক্‌টিকী, চিয়াইয়া—চেতন হইয়া, জাজি—যাজন, বাঁঝি—বন্ধ্যা, আহড়ে—আড়ে ("লুকায় গগনবাসী মেঘের আহড়ে")। বালা—বালক ("চারি বছরের হল বানিয়ার বালা" চণ্ডীকাব্য ব্যতীত অপরাপর অনেক পুঁথিতেই 'বালা' শব্দ বালক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা হিন্দীর অনুরূপ) ব্যাজে—ছলে (যৌবন করিয়া ডালি পো চাহিয়া ব্যাজে। কুলবতী জলাঞ্জলি দিল কুললাজে॥") এই ব্যাজ শব্দের অর্থ অনেক স্থলে গৌণ। দানা—দানব, জরারি—জরাগ্রস্ত, পুরোধা—পুরোহিত, মো—মমতা, লো—অশ্রু, কাতি—কাইস্তে, বোঢ়া—দন্তহীন, খণ্ড -গুড়, টাবা—নেবু, রায়বার—দৌত্য—প্রশংসাগীতি কঢ়া—শিশু ("বাড়ে যেন হাতী কঢ়া") দিয়ড়ি (দেউটী)—দীপ, তোক—অপত্য, শশা (শশারু)—খরগোস, বরিয়াতি—বরযাত্রী, বেসাতি—বাজারে সওদা, শাড়া (বা শাটা) শাড়ী, "শটক, ঘৃত, জল ও পিঠালী মিশ্রিত ছানা।" (অক্ষয় বাবুর চণ্ডী, ১৫৫ পৃঃ।) অপরাপর পুঁথিতে—দড়বড়—তাড়াতাড়ি, অনুবন্ধ—অবতারণা, গোড়াইল—সাথে সাথে চলিল, কাণি—ছেঁড়াবস্ত্র, হটে—বিবাদে ("মনসার হটে সাধু ভিক্ষা মাগি খায়।"—মনসার ভাসান)। ইটাল—ইট, নেউটিয়া—ফিরিয়া, গড়—প্রণাম, টোণ—তূণ সমাধান—শেষ ("নিমিষেক জীবন যৌবন সমাধান,"—মা, চ) সমসর—তুল্য, বুঝাইল—বুঝাইল, পাড়ে—ফেলে, ("অর্জ্জুন কাটিয়া পাড়ে মুকুট ভূমিতে পড়ে।" কাশী), বাট—পথ, আগুসারি—অগ্রসর হইয়া, সাবহিত—সাবধান, সহজে—স্বভাবতঃ (এই শব্দ পূর্ব্বে মূল অর্থেই ব্যবহৃত হইত, এখন অর্থচ্যুতি হইয়াছে।) আচরণ—ভ্রমণ, বিচরণ ("প্রেত কাক কুকুরাদি করে আচরণ।"—রসায়ন), চৌরস—সমতল, সুপ্রশস্ত (চাঁচর চিকুর রামের চৌরস কপাল,—" রামায়ণ), গন্ত—ঠাট্টা ("হেন বুঝি গন্ত মোরে করিল যুবতী" —মা, চ)। পাথর—পাপড়ি, নাট—নৃত্য, উলি—অবতরণ করা, উড়ন—পরিধান করা, খণ্ড—এই শব্দ পূর্ব্বে নানারূপ শব্দের সহিতই যুক্ত হইত যথা চিরাখণ্ড, দধিখণ্ড, চোরখণ্ড, ইত্যাদি, 'খণ্ড' কোন কোন সময় 'ভগ্ন "অর্থে প্রযুক্ত হইত, যথা "খণ্ড কপালিনী" ; উজা—সোজা, মেড়—প্রতিমা-পঞ্জর, আশ্বাস—আশঙ্কা ("উপায় করিয়া গেলে আশ্বাস ঘুচিবে" —জগৎরাম রায়ের রামায়ণ), শারি—নিন্দাবাদ।

বিভক্তিগুলি পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন রূপ ; সে সম্বন্ধে আমরা, পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, তাহা এ অধ্যায়েও অনেকাংশে খাটিবে ; পূর্ব্ববঙ্গের পুঁথিতে "সংক্ষেপে কহিল"—(অর্থ "সংক্ষেপে কহিলাম"), "একই দেখিল আমি তোমা যোগ্য বর।" ইত্যাদি ভাবের প্রয়োগ অনেক দৃষ্ট হয় ; জগৎরামের রামায়ণে—"সীতা ভেট দিয়া শিব মাগিব রাবণে। এইরূপ ব্যবহার দৃষ্ট হয় ; এইরূপ ব্যবহার পশ্চিমবঙ্গ হইতে এখন উঠিয়া গেলেও পূর্ব্ববঙ্গ প্রচলিত আছে কর্ত্তৃকারকের পর ক্রিয়ার নানা অদ্ভুত আকার উভয় স্থলের প্রাচীন পুঁথিতেই বিস্তর পাওয়া যায়, তৎসম্বন্ধে প্রাচীন পুঁথি হইতে উদ্ধৃত অংশগুলি পাঠ করিলেই জানা যাইতে পারে।

বিভক্তি।

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের কয়েকটি বাঁধা বিষয় ছিল, এ সম্বন্ধে পূর্ব্বের এক অধ্যায়ে একবার উল্লেখ করা হইয়াছে ; সেই বাঁধা বিষয়গুলি সংক্ষেপে এই ভাবে বিভাগ করা যাইতে পারে :—১। বারমাসী.—বাঙ্গালা দেশ ষড়ঋতুর প্রিয়লীলাক্ষেত্র ; বারমাসের বারটি রূপ প্রকৃতির পটে পরিষ্কার রেখায় অঙ্কিত হয়, কবিগণ বৎসরের বারখানি সুখ

কতকগুলি বাঁধা বিষয়।

দুঃখের চিত্র সুন্দররূপে আঁকিয়া দেখাইয়াছেন। ২। অবরোধক্লিষ্টা বঙ্গীয় সীমন্তিনীগণ যখন একটু মুক্তি পান, তখন তাঁহাদের কতকটা অসতর্ক ও চঞ্চল হইয়া পড়া স্বাভাবিক, কবিগণ শ্যামের বাঁশীর তান কি বিবাহ বাসর উপলক্ষ করিয়া ঘরের বউগুলির অনভ্যস্ত স্বাধীনতার মূর্ত্তি দেখাইয়াছেন। কাহারও কবরী অর্দ্ধমুক্ত, কাহারও সমস্ত অলঙ্কার পরা হয় নাই, অর্দ্ধ অঙ্গে অলঙ্কার পরা, অপরার্দ্ধ এলোথেলো যেন কোন চিত্রকরের তুলির অসম্পূর্ণ সৃষ্টি, ইঁহাদের উঁকি ঝুঁকি কতকটা অস্বাভাবিক ও—"হারাবতী একডাকে ভেঙ্গে আনে পাড়া" (ক, ক, চ) প্রভৃতির অসংযত স্ফুর্ত্তির অভিনয় বর্ণনায় কবিগণ সুন্দরীদিগের মোহিনীশক্তি দেখিতে সুবিধা দেন নাই; ভাগবতের একাংশে এই চিত্রের প্রথম ছায়াপাত হইয়াছিল। কিন্তু তৎপূর্ব্বেও মহাকবি কালিদাস কুমারসম্ভবে শিব বিবাহ উপলক্ষে এই এই সকল চিত্রের ছায়াপাত করিয়া গিয়াছেন। ৩। পুকুর ঘাটে রমণী। বঙ্গের পল্লীগ্রামবাসিনী রমণীগণ বাহিরের লোকদিগকে স্বীয় রূপ দেখাইবার একবারে সুবিধা দেন। পুকুরের জলে যখন পদ্মমুখ ভাসিয়া উঠে ও স্নিগ্ধকান্তি ফুটিয়া উঠে, তখন সেই রূপ কবির লেখনীর বিষয় হইতে পারে। বিদ্যাপতি হইতে আলওয়াল পর্য্যন্ত বহুসংখ্যক কবি আর্দ্রবস্ত্রে কুম্ভকক্ষে রমণীগণের গৃহপ্রত্যাগমনের মুগ্ধকর আলোকচিত্র উঠাইয়াছেন। ৪। দাম্পত্যকলহ—বিদেশ-বিদ্বেষী বাঙ্গালীগণের ঘরে বসিয়া স্ত্রীর গালি খাওয়া নিত্যকর্ম্ম, এই গালির স্বাদ সর্ব্বদা তিক্ত নহে, একটু মধুরত্ব আছে, তারপর বৃদ্ধ স্বামীর ঘাড়ে যুবতী ভার্য্যার ক্রোধবৃষ্টি, কুলীনদিগের কৃপায় কুলললনার বিড়ম্বনা—দাম্পত্য প্রেমে অম্লরোগ,—কবিগণ শিবপার্ব্বতী প্রসঙ্গ উপলক্ষ করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন। ৫। পতিনিন্দা, ইহা লইয়া অনেক অশ্লীলকথা বঙ্গসাহিত্য কলুষিত করিয়াছে, অশ্লীল বিষয়ের সঙ্গে আমাদের কোন সহানুভূতি নাই, কিন্তু এই পতি-নিন্দা এতগুলি কবি বর্ণনা করিয়াছেন, যে সমাজ ব্যাপিয়া ইহার কারণ ছিল বলিয়া বোধ হয়, ইহা নেহাৎ কল্পনা নহে, "কঠিন ব্যঞ্জন আমি যেই দিন রাঁধি। মায়ের পিড়ার বাড়ি কোণে বসি কাঁদি॥"—(ক, চ) প্রভৃতি উক্তি মর্ম্মের; পিতা মাতা অর্থাদির লোভে প্রাণপ্রিয় কন্যাগুলিকে জলে ভাসাইতেন, তাহারা সেই জলে পড়িয়া আজীবন ভাসিতে থাকিত, কিছু বলিতে পারিত না—তাহাদের অবস্থা চণ্ডীদাসের কথায় বলা যাইতে পারে—"বদন থাকিতে না পারি বলিতে, তেঞি সে অবোলা নাম।" ৬। হনুমান—এই সমুদ্র-লঙ্ঘন সেতুবন্ধন পটু বীরচূড়ামণি বঙ্গসাহিত্যের দেবদেবীগণের দক্ষিণহস্ত; সমুদ্রে ঝড় উঠাইতে হইবে, বড় প্রাচীর উঠাইতে হইবে, এ সমস্ত ব্যাপারেই দেবদেবীগণ হনুমানের শরণাপন্ন, কিন্তু বাল্মীকির এই মহাচরিত্র বঙ্গীয় সাহিত্যে শুধু একটি বানরে পরিণত হইয়াছে। ৭। শিশুকন্যাকে স্বামীর ঘরে প্রেরণের সময় পিতৃগৃহ যে কারুণ্যপূর্ণ বেদনার তরঙ্গে প্লাবিত হইত, তাহা লইয়া কবিগণ উমা ও মেনকা সংবাদ বর্ণন করিয়াছেন।

এই নির্দ্ধারিত বিষয়গুলি লইয়া বঙ্গীয় কবিগণের প্রতিভা খেলিয়াছে, এই বিষয়গুলি প্রাচীন

কবিগণের লেখনীর সাধারণ সম্পত্তি; দেবদেবীর ভাণ করিয়া কাব্যপটে বঙ্গীয় গৃহস্থালীর দৃশ্য উদ্ঘাটীত হইয়াছে; বঙ্গীয় প্রাচীন পুঁথির অনেকগুলি যখন মুদ্রিত হইবে, তখন পাঠক এই বাঁধা বিষয়গুলি কোন্ কবির হস্তে কিরূপভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা নিরূপণ করিতে সুবিধা পাইবেন।

কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগের পূর্ব্বাভাষ।

আমরা যে অধ্যায়ের সন্নিহিত হইতেছি, তাহার আভাস এই অধ্যায়বর্ণিত নানা পুস্তকেই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে; চণ্ডীর চৌত্রিশঅক্ষরা স্তুতি (চৌতিশা) অনেকগুলি প্রাচীন পুঁথিতে দেখা যায়; এই "চৌতিশা" শুধু শব্দ লইয়া খেলা,—উহা অনেক স্থলে শ্রুতিকটু হইয়াছে, যথা—টিটকারী টকারে হইনু পরাজয়ী। টঙ্কারিয়া রক্ষা কর মোরে কৃপাময়ী॥" এই কোমল গীতি কবিতার দেশে শ্রুতি-কটুতার অপরাধে কবির ফাঁসি হইতে পারে, জয়দেব এই আজ্ঞা দিতেন। যাহা হউক শ্রুতিকটুতা সত্ত্বেও এইরূপ শব্দ লইয়া খেলা হইতে ভাষা সাজাইবার চেষ্টা আরব্ধ হয়। মাধবাচার্য্যের চণ্ডীতে "ঘুচাও মনের রোষ, কর পতি পরিতোষ, দিয়াত বিরাটসুত দান।" পাওয়া যায়, এই মুন্সীয়ানা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই চেষ্টার বিকাশ পরবর্ত্তী অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য। প্রকৃত প্রেমরসের অভাব হইলে হীরামালিনীগিরি আরম্ভ হয়, কবিকঙ্কণ চণ্ডী হইতেই লিপিচাতুর্য্যের হস্তে কবিতাসুন্দরীর ভ্রষ্টামীর পূর্ব্বাভাষ পাওয়া যায় নিম্নলিখিত অংশটি দেখুন—"অশোক কিংশুক ফুল, হইল যেন চক্ষুশূল, কেতকী কুসুম কাল কুন্ত। বৈরি কুসুমবাণ, অস্থির করয় প্রাণ, ঝাট নাশ যাওরে বসন্ত॥ শুইলে নলিনীদলে, কলেবর মোর জ্বলে, জল দিলে নহে প্রতিকার। মলয়ের সমীরণ, অগ্নিকণা বরিষণ, পতি বিনে জীবন অসার॥" কবিকঙ্কণ চণ্ডীতেই আমরা ভারতচন্দ্রী উপমার প্রথমোদ্যম দেখিতে পাই—"গৌরীবদন শোভা, লিখিতে না পারি কিবা, দিনে চন্দ্র নাহি দেয় দেখা। ম্লানচন্দ্র এই শোকে, না বিচারি সর্ব্বলোকে, মিছে বলে কলঙ্কের রেখা॥ গৌরীর দশন রুচি, দেখি দাড়িম্ব বিচি, মলিন হইল লজ্জাভরে। হেন বুঝি অনুমানে, এই শোক করি মনে, পককালে দাড়িম্ব বিদরে॥" পরবর্ত্তী অধ্যায়ে এই বাক্য কলা ও লিপিচাতুরীর জাঁকালো বিকাশ দেখিতে পাইব।

———

নবম অধ্যায়

কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগ

অথবা

নবদ্বীপের দ্বিতীয় যুগ

১। নবদ্বীপ ও কৃষ্ণচন্দ্র
২। সাহিত্যে নূতন আদর্শ
৩। কাব্যশাখা
৪। গীতি-শাখা

১। নবদ্বীপ ও কৃষ্ণচন্দ্র।

নবদ্বীপের অবস্থান্তর।

নবদ্বীপ হইতে লক্ষ্মণসেন স্বাধীনতার পতাকা ফেলিয়া পলাইয়া গিয়াছিলেন ; নবদ্বীপের অঙ্কারূঢ় হইয়া জয়দেবকবি সুধাময় গানে বঙ্গদেশ পরিপ্লাবিত করিয়াছিলেন, তার পর নবদ্বীপ ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতচর্চ্চার স্থান হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। আধুনিক কালে মহাপ্রভুর পদধূলি দ্বারা ইহা বঙ্গদেশের শ্রেষ্ঠ তীর্থে পরিণত হইয়াছে,—নবদ্বীপের ধূলিরেণুতে হৃদয়বান্ বাঙ্গালী অশ্রুপাত করিবেন।

বঙ্গীয় সমাজের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। যুগে যুগে স্বর্গের শাসন লইয়া প্রতিভাবান ব্যক্তি পতিত সমাজকে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু দৈববরে দিগ্বিজয়ী রাজা যেরূপ সমস্ত বলপ্রয়োগ দ্বারাও কৈলাস পর্ব্বতকে কিঞ্চিৎ উত্তোলন করিয়াই অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন, এই গিরিতুল্য অচল সমাজের নিকট ধর্ম্মবীরের প্রাণান্ত চেষ্টাও সেইরূপ বিফল হইয়া পড়ে। যে নবদ্বীপে বৈষ্ণবগণ এক সময়ে মেঘদর্শনে কৃষ্ণভ্রম করিয়া প্রেমাবেশে পাগল হইতেন, সেই স্থানে ভারতচন্দ্রের শিষ্যগণ সমস্ত শ্লীলতার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া লালসারাক্ষসীকে ষোড়শোপচারে পূজা করিতে লাগিলেন—সাহিত্যের এই অংশ অতি কদর্য্য। এই সময় নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বঙ্গদেশের যুগাবতার। বঙ্গদেশ তখন বর্গীর হাঙ্গামে অস্থির ছিল। ইহার কিছু পরে নবদ্বীপে যে সংক্রামক ব্যাধির আবির্ভাব হয়, তাহাতে

এক তৃতীয়াংশ লোক নষ্ট হইয়া যায়, "১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ডাকাতের দল বঙ্গদেশে ৫০০০০ গৃহও ৫০০ লোক অগ্নিতে দগ্ধ করে। হোণ্টার, এনালস্ অব রুরাল বেঙ্গল, ৭০ পৃঃ)। এই সময় কবি ভারতচন্দ্র স্বীয় প্রভু—"সদা জ্যোৎস্নাময় দুই পক্ষ"-সেবী নৃপনন্দনের জন্য কামদ্দীপক বটিকা প্রস্তুত করিতেছিলেন; জাতীয় চরিত্রের এই হীনতায় ভাবী রাষ্ট্রবিপ্লবের পথ সুগম হইয়াছিল। এই বিপ্লববন্যায় "ডুবে মরে মৃদঙ্গী মৃদঙ্গ বুকে করি। কালোয়াত মরিল বীণার লাউ ধরি।"—দশাটি হইয়াছিল, অযোধ্যার ওয়াজেদ আলি তাহার সাক্ষী।

কিন্তু দোষে গুণে সৃষ্টি। পৌরুষতরুর ভগ্নকাণ্ড বেষ্টন করিয়া "ললিত লবঙ্গলতার" ন্যায় সুকুমার বিদ্যাগুলি লতাইয়া উঠিল। কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় বিশ্রাম খাঁ গায়েনের ওস্তাদি-গানের মূর্চ্ছনা, গদাধর তর্কালঙ্কারের পুরাণ পাঠ ও ভারতচন্দ্রের কবিতা দেশময় যে মধুর ভাব বিকীরণ করিতে লাগিল, তাহা এই রাজনৈতিক বাদলের মধ্যে মনোরম রৌদ্রের মত মৃদুহাস্য করিতেছিল। নবদ্বীপ হইতে একদা নিঃস্বার্থ ও নির্ম্মল প্রেমের রপ্তানি হইত, এখন নবদ্বীপাধিকার হইতে ভারতচন্দ্রের কবিতা, শান্তিপুরে ধুতি ও কৃষ্ণনগরের পুতুল বস্তায় বস্তায় বিক্রয়ের জন্য দেশে দেশে প্রেরিত হইতে লাগিল। ধূর্ত্ততা ও প্রতারণা—চরিত্র-হীনতার সঙ্গী, নবদ্বীপের রাজসভায় এই সব শিক্ষার জন্য টোল প্রতিষ্ঠিত হইল। আমরা এখানে যুগাবতার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের চরিত্র সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

কৃষ্ণচন্দ্র।

কৃষ্ণচন্দ্রের রাজনীতি।

১৭১০ খৃঃ অব্দে কৃষ্ণচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন; তাঁহার পিতৃব্য রামগোপালেরই রাজা হইবার কথা ছিল, কিন্তু তিনি পথে তাম্রকূটপ্রিয় পিতৃব্যমহাশয়ের বিলম্ব সংঘটন করিয়া নবাব-দরবারে অগ্রে উপস্থিত হন এবং বাক্‌চাতুরী দ্বারা রাজ্য দখল করেন। আলিবর্দ্দী খাঁ তাঁহাকে এতদূর ভালবাসিতেন যে, তাঁহাকে রাজসভায় না দেখিলে তাঁহার সম্বন্ধে সাগ্রহে অনুসন্ধান করিতেন এবং তাঁহাকে 'ধর্ম্মচন্দ্র' উপাধি দিয়াছিলেন; কিন্তু এই 'ধর্ম্মচন্দ্র'-মহাশয় প্রতারণাপূর্ব্বক আলিবর্দ্দী খাঁকে স্বীয় রাজ্যের অনুর্ব্বর ভূমিগুলি দেখাইয়া ২০ লক্ষ টাকা মাপ পান। যখন মীরকাশেমের হস্তে বন্দী, মৃত্যুর আজ্ঞা তাঁহার মস্তকের উপর, তখন তিনি পুত্র শিবরামকে লইয়া এক বিরাট পূজার ফাঁদ পাতিয়া উদ্ধার পাইয়া আসেন। কনিষ্ঠ পুত্র শম্ভুচন্দ্র দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দকে আয়ত্ত করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে প্রবঞ্চনা করিতে চেষ্টা করিলে, কৃষ্ণচন্দ্র হেষ্টিংস্ পত্নীকে একছড়া মুক্তার হার উপহার দিয়া পুত্রের উদ্দেশ্য বিফল করেন। ইংরেজ আনিতে যে ষড়যন্ত্র হয়, কৃষ্ণচন্দ্র তাহার গুরু। রাজবল্লভের হাতে "রাখি" বাঁধিয়া তিনি ঢাকার নবাবসরকারে

কয়েক লক্ষ টাকা মাপ লইয়া আসেন, অথচ রাজবল্লভের বিধবাবিবাহ প্রচলনের চেষ্টা চক্রান্ত করিয়া বিফল করেন। তাঁহার অনুচরগণের কেহ কেহ উপস্থিত ধূর্ত্ততায় তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন; নবাব যখন অগ্রদ্বীপে লোকজন বিনষ্ট হওয়ার সংবাদে ক্রুদ্ধ হইয়া প্রশ্ন করেন, "অগ্রদ্বীপ কাহার ?" তখন অগ্রদ্বীপের মালিকের মোক্তার বিপদ আশঙ্কা করিয়া চুপ হইয়া রহিল, কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রের মোক্তার উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "এ স্থল মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের", তৎপর উপস্থিত বুদ্ধি দ্বারা লোকহত্যার একটী কৈফিয়ৎ দিয়া উক্ত স্থান কৃষ্ণচন্দ্রের রাজ্যান্তর্গত করিয়া লইলেন। বীরোচিত সৎসাহসের অভাব থাকিলেও কূট রাজনীতিতে কৃষ্ণচন্দ্র অতি প্রাজ্ঞ ছিলেন। পরবর্ত্তী সময়ে মুসলমান শাসন কূট রাজনীতি-আশ্রিত হইয়াছিল। মুসলমান দরবারের দুর্নীতিগুলি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র অনেকাংশে অনুসরণ করিয়াছিলেন; এক সময় মোগলসম্রাট পুত্রের ব্যাধি নিজে গ্রহণ করিয়া নিজের প্রাণ দিয়া পুত্রকে বাঁচাইয়াছিলেন, এরূপ প্রবাদ আছে; কিন্তু শেষ সময়ে মুসলমানসম্রাটগণের রাজপ্রাসাদ অস্বাভাবিক নিষ্ঠুরতার ক্রীড়াক্ষেত্র হইয়াছিল—পিতার বিরুদ্ধে পুত্রের ষড়যন্ত্র, পুত্রের হস্তে পিতা বন্দী, ভ্রাতৃহনন প্রভৃতি পাতক মুসলমান-ইতিহাস কলুষিত করিয়াছে; হিন্দুর চক্ষে এই সকল পাপ অতি অস্বাভাবিক; কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রের যোগ্যপুত্র শম্ভূচন্দ্র পিতা এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু রটাইয়া নিজে রাজত্ব লইয়াছিলেন; কৃষ্ণচন্দ্র এই ব্যবহারে মর্ম্মপীড়িত হইয়া গঙ্গাগোবিন্দের নিকট দুই ছত্র কবিতা লিখিয়াছিলেন—"পুত্র অবাধ্য, দরবার অসাধ্য। যা করেন গঙ্গাগোবিন্দ॥" বস্তুতঃ পুত্রের বিশেষ দোষ নাই, তাঁহারও পড়া শুনা রাজসভার টোলেই হইয়াছিল॥

কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র রাজ্য শাসনে ও সংরক্ষণে যেরূপ ক্ষমতা দেখাইয়াছেন, তাহা অতীব প্রশংসনীয়; সিংহাসনারোহণের সময় তাঁহার ঋণ দশ লক্ষ টাকার উপর ছিল, ইহা ছাড়া বার লক্ষ টাকা নজরানার জন্য মহাবদ্‌জঙ্গ তাঁহাকে বন্দী করিয়াছিলেন, তিনি এই সমস্ত ঋণ হইতে মুক্ত হইয়া তাঁহার রাজ্য অনেক পরিমাণে বাড়াইয়াছিলেন। তিনি "শিব-নিবাসকে" ইন্দ্রপুরীর মত সাজাইয়াছিলেন, তাঁহার উৎসাহে স্থপতি বিদ্যার উন্নতি হইয়াছিল; তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কোন কোন দেবমন্দির এখনও বঙ্গদেশের গৌরব। একটির সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছেঃ—"এমন সুন্দর সুপ্রশস্ত ও সুদৃঢ় পূজার প্রাসাদ এবং এরূপ উন্নত ও দৃঢ়তর মন্দির বঙ্গদেশের অন্য কোন স্থানে দৃষ্ট হয় না"—(ক্ষিতীশবংশাবলী, ৬১ পৃঃ)। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের—বিশেষ তাঁহার—যত্নে কৃষ্ণনগরের কুম্ভকারগণ অপূর্ব্ব সুন্দর মূর্ত্তি গড়িতে শিখিয়াছিল, তাঁহার উৎসাহে শান্তিপুরের ধুতির যশঃ দেশবিখ্যাত।

তাঁহার রাজ্য শাসন।

কৃষ্ণচন্দ্র নিজে সংস্কৃতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁহার সভায় কেবল কবিগণের আদর ছিল

এমত নহে; দর্শন, ন্যায়, স্মৃতি, ধর্ম্ম—এ সমস্ত বিষয়েরই সেখানে চর্চ্চা হইত। তিনি এই সর্ব্বশাস্ত্র চর্চ্চায়ই নিজে যোগ দিতেন, এবং বিভিন্ন শাস্ত্রে পারদর্শী পণ্ডিতগণের গুণের আদর করিতে জানিতেন; তিনি হরিরাম তর্কসিদ্ধান্ত, কৃষ্ণানন্দ বাচস্পতি ও রামগোপাল সার্ব্বভৌমের সঙ্গে ন্যায়ের কূটবিচার করিতে পারিতেন; প্রাণনাথ ন্যায়-পঞ্চানন, গোপাল ন্যায়ালঙ্কার ও রামানন্দ বাচস্পতির সঙ্গে ধর্ম্মশাস্ত্রের তত্ত্ব নিরূপণ করিতেন এবং শিবরাম বাচস্পতি, রামবল্লভ বিদ্যাবাগীশ ও বীরেশ্বর ন্যায়পঞ্চাননের সঙ্গে ষড়্‌দর্শন সম্বন্ধে কথোপ-কথন করিতে সমর্থ ছিলেন; বাণেশ্বর তাঁহার সভার রাজকবি ছিলেন, কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার সঙ্গে সংস্কৃত কবিতা প্রণয়ন করিতেন। এই উচ্চ শিক্ষিত কূটরাজনীতিপ্রাজ্ঞ মহিমা-ন্বিত রাজচক্রবর্ত্তী একটি পল্লীগ্রামের সামান্য ব্যক্তির ন্যায় কৌতুক-প্রিয় ছিলেন; তাঁহার কৌতুকরাশিতে সুরুচি কি সংযত ভদ্রতা ছিল না, কিন্তু সেগুলি চার্লস্ দি সেকেণ্ডের পরিহাস হইতে বেশী দূষণীয় বলিয়া গণ্য হইবে না। কৌতুকার্থ রাজসভায় তিনটি লোক নিয়োজিত ছিলেন; ১ম—গোপলভাঁড়, এই ব্যক্তির নাম এখন দেশবিখ্যাত, গোপাল নরসুন্দর-কুলের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। ২য়—'হাস্যার্ণব'-উপাধিবিশিষ্ট জনৈক সভাসদ, ইঁহার বাড়ী বিল্বপুষ্করিণী, ইনি বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ, ইঁহার নকল করিবার অদ্ভুত শক্তি ছিল। ৩য়—মুক্তারাম মুখোপাধ্যায় ইঁহার বাড়ী বীরনগর, রাজার সঙ্গে ইঁহার কোন সম্বন্ধ ছিল না, সুরসিক দেখিয়া রাজা ইঁহাকে 'বৈবাহিক' বলিয়া ডাকিতেন। এই ব্যক্তিত্রয়ের কৌতুকাভিনয়ে রাজসভায় হাস্য ও বীভৎস রসের শ্রাদ্ধ হইত;—নমুনা এইরূপ,—গোপাল ভাঁড়ের সুন্দর ছেলেটি দেখিয়া একদিন রাজা বলিলেন, "এ যে রাজপুত্র দেখিতেছি!" গোপালের উত্তর—"ধন্য তুই ছেলে, তোর কল্যাণে আমি রাজপুত্রের বাপ হইলাম।" মুক্তারামের বাড়ী বীরনগরের কোন দুষ্ট লোক কৌশলে অন্য এক ব্যক্তির স্ত্রী বিক্রয় করাতে রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মুখুয্যে, তোমাদের ওখানে কি বউ বিক্রীত হয়?" তিনি উত্তর করিলেন, "হাঁ মহারাজ, গত মাত্রেই।" রাজা একদিন প্রাতে মুক্তারামকে বলিলেন—"মুখুয্যে, গতরাত্রে স্বপ্ন দেখিয়াছি যেন তুমি একটা নর্দ্দমায় ও আমি পায়েসের হ্রদে পড়িয়াছি।" তিনি উত্তর করিলেন—"ধর্ম্মাবতার আমিও এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছি, কেবল বিশেষ এই যে উত্থান করিয়া আমরা পরস্পরের গাত্র লেহন করিতেছি।" রাজসভায় এইরূপ রহস্যের ধূলি খেলা হইত, রাজা এই তিনটি ভাঁড় প্রতিপালন করিয়া তাঁহাদের নিক্ষিপ্ত মুষ্টি মুষ্টি ধূলি খাইতেন ও হাসিতেন।

বিদ্যানুরাগ।

কৌতুকপ্রিয়তা।

এই আমোদ প্রমোদ ভিন্ন রাজা শাস্ত্রালোচনা করিতেন, রাজ্য বিস্তারের নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন করিতেন, শিল্পের উন্নতি জন্য নানারূপ উৎসাহ দিতেন ও ভারতচন্দ্রকে দিয়া তোটক-ছন্দে

কবিতা লিখাইতেন। বিলাসের এই বিবিধ সম্ভারের মধ্যে নির্ম্মল প্রেমের কথা কেহ শুনাইতে গেলে উপহাসাস্পদ হইত; রাজা কেবল চৈতন্যোপাসক সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ করিতেন। (ক্ষিতীশবংশাবলী ২৯ পৃঃ।) কৃষ্ণচন্দ্র শিব ও শক্তির বিশেষ উপাসক ছিলেন, ভারতচন্দ্র যখন চণ্ডীর দশাবতার বর্ণন করিয়া লিখিতেন,—"ভারত কহিছে মাগো এই দশ রূপে॥" দশ দিকে রক্ষা কর কৃষ্ণচন্দ্র ভূপে॥" তখন আমরা কল্পনা নেত্রে দেখিতে পাই, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ভক্তিপূর্ণ গলদশ্রুনেত্রে প্রিয়কবির প্রতি অনুগ্রহ-হাস্য বিতরণ করিতেছেন।

এই শাস্ত্রচর্চ্চা সুকুমার বিদ্যায় অনুরাগ, কূটনীতি, কুরুচি ও বিলাসপ্রিয়তা এই যুগের সাহিত্যকে একরূপ মিশ্রিত ছাঁচে গঠিত করিয়াছে, তাহার দোষ গুণ পাঠকের বিচারাধীন করিতেছি।

২। সাহিত্যে নূতন আদর্শ।

বস্তুতঃ বাঙ্গালা কবিতা এখন আর 'কৃষকের গান' নহে; এখন বঙ্গভাষা স্বভাবসুন্দরী লজ্জাবতী পল্লীবধূটির মত শুধু পল্লীকবির আদরের জিনিষ নহে। ইহার প্রতি সংস্কৃত ও ফার্শীর বড় বড় পণ্ডিতগণের নজর পড়িয়াছে, অলঙ্কারের বাহুল্যে স্বভাবরূপ ঢাকা পড়িয়াছে; এখন বঙ্গভাষা রাজসভায় অনুগৃহীতা, পল্লীবাসিনীর সাদা জুঁইফুলের মত প্রাণটি ইহার আর নাই। সলজ্জ গ্রাম্য সৌন্দর্য্য ও নিষ্কাম প্রেমের আবেগ ইহা পল্লীগ্রামে ফেলিয়া আসিয়াছে, রাজসভাতে ইহার কামনাপূর্ণ ক্রীড়ায় দর্শকবৃন্দের চিত্তে উত্তপ্ত মদিরার উল্লাস প্রবাহিত হয়, এবং নীলনিচোলের অসংযত বিক্ষেপে নানা আভরণের জ্যোতি ফুটিয়া উঠে।

রাজসভায় বঙ্গভাষা।

কবিগণ এখন বুদ্ধি-সাগর মন্থন করিয়া রূপবর্ণনার উৎপত্তি করেন। যিনি কল্পনার কুহক সৃষ্টি করিতে যত পটু, তিনি তত প্রশংসনীয়; প্রকৃত রূপের আর কে খোঁজ করে! আমরা নৈষধ-চরিত হইতে একটি অংশ তুলিয়া দেখাইতেছি, পাঠক দেখিবেন বঙ্গভাষা কোন্ আদর্শের অনুসরণ করিতেছিল;—"হে রাজন্! দময়ন্তীর চুলের কথা কি, বলিব? পশু হরিণ যে চামর স্বীয় পুচ্ছরূপে পশ্চাৎভাগে রাখিয়া তিরস্কৃত করে, সেই চামরের সঙ্গে কি দময়ন্তীর চুলের তুলনা দিতে ইচ্ছা হয়? "দময়ন্তীর চক্ষু হরিণের চক্ষু হইতেও সুন্দর, তাই হরিণ ভূমিতলে ক্ষুরাঘাত করিয়া স্বীয় পরাজয় ও ক্ষোভ ঘোষণা করিতেছে।" "বিধাতা চন্দ্রের শ্রেষ্ঠভাগ গ্রহণ করিয়া দময়ন্তীর মুখ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, এই জন্য চন্দ্রমণ্ডলে একটা গর্ত্ত হইয়াছে, লোকে তাহাকে কলঙ্ক বলে। দময়ন্তীর মুখ দেখিয়া পদ্মগুলি পরাজয় চিহ্ন-স্বরূপ জলদুর্গে বাস করিতেছে, অদ্যাপি উঠিতে সাহস হইতেছে না।" দমন্তীর পূর্ব্বে বিধাতা যত রমণী সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা শিক্ষানবিসের মক্সের মত, তার পর যেগুলি সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা তুলনায় দময়ন্তীর রূপের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইবার জন্য।" বহুপত্র ব্যাপিয়া এই ভাবের বর্ণনা চলিয়াছে। বাঙ্গালী কবি শুধু সংস্কৃতের

রূপবর্ণনায় উপমার বিকৃতি।

অনুকরণ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, ফার্শী ও উর্দ্দু হইতেও ইচ্ছাক্রমে সংগ্রহ করিয়াছেন ; "তাঁহার কালো চুল বুদ্ধিমানদিগের বেড়ি স্বরূপ," "তাঁহার নখর জ্যোতিতে সমস্ত মনুষ্যের মন লগ্ন আছে, তাহা নূতন চন্দ্রের ন্যায়," "তাঁহার নিতম্ব আক্কা পাহাড়ের ন্যায়," "তাহার কটিদেশ চুলের ন্যায় সূক্ষ্ম, বরং তাহারও অর্দ্ধেক," (জেলেখা)। "সুন্দরী স্নানান্তে মেন্দীরঞ্জিত অঙ্গুলী দ্বারা চুল ঝাড়িতেছে, যেন মেঘ হইতে মুক্তা বর্ষণ হইতেছে" (বদরচাচ.)। এই শেষের কয়েকছত্র পড়িয়া বিদ্যাপতির—"চিকুরে গলয় জলধারা। মেহ বরিষে যেন মোতিম হারা।" স্বভাবতঃই মনে পড়িবে। এইরূপ অতিশয়োক্তি পড়িয়া পাঠকগণ কবির অতিবুদ্ধির অবশ্যই প্রশংসা করিবেন, কিন্তু কোন সুন্দরী রমণী দেখিলেন বলিয়া অঙ্গীকার করিতে পারিবেন না। উপমার অতিরঞ্জন সৌন্দর্য্যের বর্দ্ধক নহে,— ক্ষতিকারক।

করুণ রসের দুর্গতি।

বঙ্গসাহিত্যে সৌন্দর্য্যের আদর্শের খর্ব্বতার সঙ্গে করুণ প্রভৃতি রসের ধারা স্তিমিত হইয়া পড়িল। ভাবতচন্দ্রের রতি সামান্য গণিকার ন্যায় কৃত্রিম সুরে পতি-বিয়োগ বিলাপ করিতেছে—"আহা আহা হরি হরি, উহু মরি মরি, হায় হায়, গোসাঞি গোসাঞি।" ইহা করুণ রসের বিদ্রূপ ভিন্ন কি বলিব? সুন্দরকে দেখিবার ব্যগ্রতা বর্ণনা করিয়া কবি বলিতেছেন—"এ নীলকাপড়, হানিছে কামড়, যেন কাল নাগিনী॥" গম্ভীরভাব বিরচনে ভারতচন্দ্র অনভ্যস্ত, অন্নদামঙ্গল রূপ ধর্ম্মমণ্ডপে তিনি বাই নাচ দেখাইয়াছেন ; যে দেশে এক সময়ে গোকুল চক্রবর্ত্তী গায়ক, চণ্ডীদাস ও গোবিন্দদাসের গীত গাহিয়া শ্রোতৃকুলকে মোহিত করিতেন,—"বঁধু কলঙ্কী বলিয়া, ডাকে সব লোকে, তাহাতে নাহিক দুঃখ তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার, গলায় পরিতে সুখ॥ সতী বা অসতী, তোমাতে বিদিত, ভাল মন্দ নাহি জানি। কহে চণ্ডীদাস পাপ পুণ্য সম, তোমার চরণ মানি॥" ইত্যাদি সরস প্রেমের কথায় মর্ম্মের আবেগ ব্যক্ত হইত, সেই দেশে রামপ্রসাদের "বলে মুহু মুহু মুখে উহু উহু। যেন কোকিল কুজিত কুহু কুহু॥" ও তৎপথাবলম্বিত ভারতচন্দ্রের তোটক পড়িতে তরুণ সম্প্রদায় আগ্রহান্বিত হইলেন ; যে দেশে প্রেমের সরস মর্ম্মস্পর্শী কথাগুলি সাহিত্যের অতুল্য গৌরবের সামগ্রী, সেই দেশে প্রেমের অভাবে কুলবধূকে স্বামী একটা তোতা পাখীর ন্যায় প্রেমের পাঠ শিখাইতেছেন,—বিদেশে গমনোন্মুখ সাধু, স্ত্রীকে সাবধান করিয়া বলিতেছেন—"বাহিরে পদ রাখা জেন ফণিফণা পরে। দীপান্তর যাওয়া হেন মা'ন অন্ত ঘরে॥ পর পুরুষের বর বজ্রতুল্য কাণে। ভাল শয্যা কুসুমকণ্টক করি মনে॥ (জয়নারায়ণের চণ্ডী)।

কুট্‌নী দাসীর আমদানী।

এস্থলে বক্তব্য এই, বিদ্যাসুন্দরের হীরা, বিদ্ধু-ব্রাহ্মণী প্রভৃতি কুট্‌নী ও কামিনীকুমারের সোণামুখীর ন্যায় দাসী বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের খাঁটি চরিত্র নহে ; দুর্ব্বলাদাসীর ন্যায় চরিত্র এখনও ভদ্রলোকের বাড়ীতে থাকা সম্ভব, কিন্তু হীরার ন্যায় নাগর ধরিবার ফাঁদ বিদেশের আমদানী। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকায় এইরূপ নারী-চরিত্র কতকগুলি পাওয়া গিয়াছে। বটতলার নানা বিদেশী ভাবাপন্ন কেতাবে কুট্‌নীদাসী অনেক স্থলে দৃষ্ট হয়,

জেলেখার দাসী তাঁহাকে বলিতেছে ;—"কে তোমাকে ঠকাইয়াছে বল, তোমার ফুলের বর্ণ মুখ হরিদ্রার ন্যায় বিবর্ণ কেন? তুমি চন্দ্রের মত দিন দিন ক্ষয় পাইতেছ কেন? আমি বোধ করি, তুমি কাহারও প্রেমের ফাঁদে পড়িয়াছ, বল সে কে? যদি সে আশমানের চাঁদ হয়, তবে তাহাকে জমিনে ফেলিয়া তোমার নিকট বন্দী করিব। সে যদি পাহাড়বাসী দেবতা হয়, তবে মন্ত্রবলে তাহাকে শিশিতে পুরিয়া তোমার নিকট হাজির করিব। যদি সে মনুষ্য হয়, তবে তুমি যাহার দাসী হইতে ইচ্ছা করিতেছ, সে আমার কুহকে তোমার দাস হইয়া পদানত হইবে॥" (জেলেখা)। লয়ালীমজনুতে পড়িয়াছি—কুটনী আছিল এক সেই সহরেতে। তেমন কুট্নী কেহ না ছিল দেশেতে। মন ভুলাইত সেই কথায় কথায়। জমিনেতে চন্দ্রসূর্য্য করিত উদয়॥" (মুসলমানী কেতাব)।

ইহাদের চন্দ্রসূর্য্য ও বাঘের দুধ করায়ত্ত ছিল, ইহারা আকাশে ফাঁদ পাতিয়া নায়িকার কামাভিলাষ পূর্ণ করিতে পারিত; এই রমণীগণই হিন্দু সাহিত্যে হীরামালিনী ও সোণামুখী হইয়া উপস্থিত হইয়াছে, পাঠক তাহাদিগকে—নারদ ঋষির স্ত্রীসংস্করণ, কুব্জা কিংবা দুর্ব্বলতার সঙ্গে একশ্রেণীভুক্ত করিবেন না।

বিদ্যাসুন্দরের সিঁধকাটা বিলাসের অভিনয় ও কুট্নীসংযোগে গৃহস্থের বাড়ীর কন্যাকে বশীকরণ * —এ সমস্ত সম্ভবতঃ বিদেশী সাহিত্যের প্রভাবের পরিচায়ক। ফার্শী অনুরাগী ধর্ম্মভীরু কবিগণ চণ্ডী-পূজার বিল্বপত্র কাণে গুঁজিয়া বিদেশী কেচ্ছা শুনাইয়াছেন, তাঁহাদের বক্ষঃস্থলে লম্বমান পৈতা, চন্দনচর্চ্চিত-ললাট, কর্ণলগ্ন বিল্বপত্র ও মুখে "কালি কালি কালি কালি কালিকে! চণ্ডমুণ্ডি মুণ্ডখণ্ডি, খণ্ডমুণ্ড মালিকে॥" প্রভৃতি মন্ত্রপাঠ শুনিয়া শ্রোতৃগণ বিদ্যাসুন্দর পূজামণ্ডপে গাওয়াইয়াছেন। কিন্তু বিদ্যাসুন্দরের উপর বিদেশী সাহিত্যের ছায়া বড় স্পষ্ট, "চণ্ডীর চৌতিশায়"ই উহার চূড়ান্ত প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই। লায়লীর মাতা হইতে বীরসিংহের মহিষী বিদ্যাকে গালি দিতে শিখাইয়াছেন, বটতলার কেতাব হইতে তুলিয়া দেখাইতেছি—গোস্সা মনে লাল আঁখি, কহে লায়লীকে ডাকি কালামুখী হায় কি করিলি। এই কি বাসনা তোর, জাত কুল গেল মোর দেশমাঝে কলঙ্ক রাখিলি॥ কি পড়া পড়িতে গেলি, প্রেমে মন মজাইলি, কে শিখাল এমন ব্যাভার। লাজভয় গেল তোর, অখ্যাতি হইল ঘোর, কুলে কালি দিলি সবাকার।" (লয়লামজনু)।

বিদ্যাসুন্দরের মুসলমানী প্রভাব।

বিদ্যাসুন্দরের জয়লাভের একমাত্র কারণ ইহার অপূর্ব্ব শব্দযন্ত্র "তনু মোর হ'ল যন্ত্র, যত শিরা তত তন্ত্র, আলাপে মাতিল মন মাতালে নাচাও না। ওহে পরাণ বঁধু যাই গীত গেয় না॥" প্রভৃতি পদ পড়িতেই সংগীতের ন্যায় সুধাবর্ষী, উহাদের ভাব চিত্তে উপলব্ধি হইবার পূর্ব্বে কর্ণ মুগ্ধ হইয়া পড়ে। বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতি কাব্য নৈতিক জীবনের ভগ্ন-পতাকা, বিজাতীয় আদর্শ ও কুরুচি কলুষিত। কাচের মূল্যে বিকাইবার যোগ্য, কিন্তু

ভারতচন্দ্রের ভাষা ও রুচি।

* এই দূতিগণের সাহায্যে বশীকরণের চেষ্টা প্রাচীন বৌদ্ধ শাস্ত্রে কিছু কিছু পাওয়া যায়। বাৎস্যায়নের কাম-শাস্ত্রেও সকলের বিবৃতি আছে কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের পর সাহিত্যিক রুচি নির্ম্মল হয়। বৌদ্ধগণের অনেকেই মুসলমানধ

ইহাদের ছাঁচে-ঢালা সুন্দর মার্জ্জিত ভাষার জ্যোতিতে আদর্শের হীনত্ব পাঠকগণের উপলব্ধি হয় নাই, এক যুগ ভরিয়া এই কাব্যগুলি পাকা সোণার মূল্যে বিকাইয়াছে।

এই অশ্লীল মিষ্টভাষী সাহিত্য যখন রাজানুগ্রহে পুষ্ট হইতেছিল, তখন বঙ্গের দূর পল্লীতে সরল-ভক্তি ও প্রেমাশ্রুবিধৌত সংগীত পুনশ্চ আরব্ধ হইয়া শ্রোতার প্রাণের কামনা পরিতৃপ্ত করিতেছিল, অনুপ্রাসপ্রিয়তা ও কোমলভাষা ব্যতীত সেই সব সঙ্গীত কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগের অন্য কোন ঋণ বহন করে না। তাহারা সামান্য কবিওলার কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া অশিক্ষিত সমাজকেই বেশী আকর্ষণ করিয়াছিল—কিন্তু বোধ হয় তাহাদের ভাবের নির্ম্মলতা ও আবেগ—রুচিদুষ্ট বৃথা-শিক্ষাকে ধিক্কার দিয়া কালে স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিবে। আমরা পরে তাহাদিগের কথা সংক্ষেপে লিখিব।

কবি-গীতির সরল আবেগ।

৩। কাব্যশাখা।

বিদ্যাসুন্দরই এ অধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কাব্য। বররুচি নামক কবি সংস্কৃতে যে কয়েকটি শ্লোক রচনা করেন, তাহা বঙ্গীয় বিদ্যাসুন্দরের ভিত্তি নহে। পল্লীগ্রামের অন্যান্য গল্পের ন্যায় বিদ্যাসুন্দরের গল্পও সম্ভবতঃ বহুদিন পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল কিন্তু উহা কবিগণের ক্রমাগত চেষ্টায় বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে, এই আকারে উহা মুসলমানী প্রভাব দ্বারা বিশেষরূপে চিহ্নিত। বহু প্রাচীন ফার্শীতে বিরচিত একখানি বিদ্যাসুন্দর আমরা দেখিয়াছি, উহা ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের অনেক পূর্ব্বে প্রণীত হইয়াছিল। ভারতচন্দ্রীয় বিদ্যাসুন্দরের উর্দ্দু ভাষায় বিরচিত অনুবাদের বিষয় অনেকেই জানেন। মুসলমান ও হিন্দু দীর্ঘকাল একত্র বাস নিবন্ধন পরস্পরের প্রতি অনেকটা সহানুভূতি পরায়ণ হইয়াছিলেন। ক্ষেমানন্দ রচিত মনসার ভাসানে দৃষ্ট হয়, লখীন্দরের লোহার বাসরে হিন্দুস্থানী রক্ষাকবচ ও অন্যান্য মন্ত্রপূত সামগ্রীর সঙ্গে একখানি কোরাণও রাখা হইয়াছিল, রামেশ্বরের সত্যনারায়ণ, মুসলমান ফকির সাজিয়া ধর্ম্মের ছবক্ শিখাইয়া গিয়াছেন,—তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। মিরজাফরের মৃত্যুকালে তাঁহার পাপমোচনের জন্য কিরীটেশ্বরীর পাদোদক পান করিতে দেওয়া হইয়াছিল, ইহা ইতিহাসের কথা। হিন্দুগণ যেরূপ পীরের সিন্নী দিতেন, মুসলমানগণও সেইরূপ

বিদ্যাসুন্দর কাব্য।

হিন্দু ও মুসলমান।

গ্রহণ করিয়াছিলেন সেই প্রাচীন জিনিষের সাহিত্যে পুনরায় আমদানীর জন্য তাঁহারাই দায়ী। বঙ্গীয় প্রাচীন পল্লী-গীতিকায়ও আমরা এই সকল কুটনীর অনেক চিত্র পাইয়াছি, সুতরাং ইহা বলা শক্ত যে এই চিত্রগুলির আভাষ ভারতচন্দ্র নিজের দেশ হইতেই গ্রহণ করেন নাই।

মন্দিরে ভোগ দিতেন। উত্তর পশ্চিমে হিন্দুগণ এখনও মহরম উৎসব করিয়া থাকেন। অর্দ্ধ শতাব্দী হইল, ত্রিপুরায় মৃজাহুসেনআলি নামক জনৈক মুসলমান জমিদার নিজ বাড়ীতে কালীপূজা করিতেন এবং ঢাকায় গরিব হুসেন চৌধুরী সাহেব বিস্তর টাকা ব্যয় করিয়া শীতলা দেবীর পূজার অনুষ্ঠান করিতেন, আমরা এরূপ শুনিয়াছি। মুসলমানগণের 'গোপী' 'চাঁদ' প্রভৃতি হিন্দুনাম ও হিন্দুদিগের মুসলমানী নাম অনেক স্থলে এখনও গৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু চট্টগ্রামে এই দুই জাতি সামাজিক আচার ব্যবহারে যতদূর সন্নিহিত হইয়াছিলেন, অন্যত্র সেইরূপ দৃষ্টান্ত বিরল; চট্টগ্রামের কবি হামিদুল্লার ভেলুয়াসুন্দরীর কাব্যে বর্ণিত আছে, লক্ষপতি সদাগর পুত্রকামনায় ব্রাহ্মণমণ্ডলীকে আহ্বান করিলে,তাঁহারা কোরাণ দেখিয়া অঙ্কপাত করিতে আরম্ভ করিলেন ও সদাগরের পুত্র বাণিজ্য যাইবার পূর্ব্বে 'বেদপ্রায়' পিতৃবাক্য মান্য করিয়া "আল্লার নাম" লইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। ১৫০ বৎসরের প্রাচীন কবি আপ্তাবদ্দীন তাঁহার "জামিল দিলারাম" কাব্যে নায়িকা দিলারামকে পাতালে প্রেরণ করিয়া সপ্তঋষির নিকট বর প্রার্থনা করিতে নিযুক্ত করিয়াছেন ও তাঁহার রূপবর্ণনা প্রসঙ্গে 'লক্ষণের চন্দ্রকলা,' 'রামচন্দ্রের সীতা,' 'বিদ্যাধরি চিত্ররেখা' ও বিক্রমাদিত্যের 'ভানুমতীর' সঙ্গে তুলনা দিয়াছেন; * হিন্দু ও মুসলমানগণ এইভাবে ক্রমে ক্রমে পরস্পরের ভাব আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিল, সুতরাং বিদ্যাসুন্দরকাব্যে যে অলক্ষিতভাবে মুসলমানী নক্সার প্রতিচ্ছায়া পড়িবে, তাহাতে বিচিত্র কি। এই সময় নায়ক নায়িকার বিলাসকলাপূর্ণ প্রেমের গল্প উর্দ্দু ও ফার্শী বহুবিধ পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছিল; এই সব পুস্তকে প্রায়ই দেখা যায়, নায়কগণ নায়িকাদের পটে লিখিত মূর্ত্তি দেখিয়াই পাগল হইয়া অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়াছেন, তাজি ঘোড়া সমারূঢ় সুন্দরকে নায়িকার খোঁজে যাইতে দেখিয়া আমাদের সেই সব নায়কের কথাই মনে পড়িয়াছে।

মুসলমানী গ্রন্থে নায়কের পূর্ব্বরাগ।

পদ্মাবতী।

প্রায় ২৫০ বৎসর হইল কবি আলাওল পদ্মাবতী নামক একখানি কাব্য প্রণয়ন করেন। এই কাব্য কৃষ্ণচন্দ্র রাজার বহুপূর্ব্বে রচিত হইলেও ইহাতে এই যুগের মুখ্য চিহ্নগুলি বিদ্যমান, সুতরাং কবিকে কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগের পথপ্রদর্শক বলা

আলাওলের পাণ্ডিত্য।

---

* এই কাব্যের হস্তলিখিত পুঁথি আমার নিকট আছে; উহাতে উর্দ্দু শব্দ খুব অল্প, বাঙ্গালাটি ঠিক হিন্দুকবির ভাষার ন্যায়।

যাইতে পারে, আমরা এজন্য পদ্মাবতী প্রসঙ্গ দ্বারা কাব্যশাখার মুখবন্ধ করিতেছি। পাঠক দেখিবেন, কবি আলাওল সংস্কৃতে কিরূপ ব্যুৎপন্ন ছিলেন ও হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁহার কতদূর অভিজ্ঞতা ছিল। এই পুস্তক পড়িলে স্বতঃই মনে উদয় হইবে, মুসলমানের এতটা হিন্দুভাবাপন্ন হওয়া নিতান্তই আশ্চর্য্যের বিষয়। যাঁহারা ১১ জন মুসলমান বৈষ্ণবকবির কবিতা পড়িয়া চমৎকৃত, তাঁহারা কবি আওয়ালের এই সুস্বাদু কাব্যখানা পাঠ করুন।

৯২৭ * সালে মীর মহম্মদ নামক জনৈক কবি হিন্দী-ভাষায় 'পদ্মাবৎ' রচনা করেন † ইহা পদ্মিনী-উপাখ্যান। দিল্লীশ্বর আলাউদ্দিন চিতোর রাজ্ঞীর রূপ-তৃষ্ণায় যে সমরানল বা কামানল প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন, এই কাব্য তাহারই ইতিহাস। দুই এক স্থলে প্রচলিত ঐতিহাসিক মতের বিপর্য্যয় আছে—চিতোরাধিপ ভীমসেন

হিন্দী পদ্মাবৎ।

---

* "সন নবযৈ সত্তাইস অহৈ। কথা আরম্ভ বেন কবি কহৈ॥ মীর মহম্মদের পদ্মাবৎ।

"সেথ মহম্মদ যতি, যখন রচিল পুঁথি
সংখ্য সপ্তবিংশ নবশত।"—আলওয়ালের পদ্মাবতী।

† এই পুস্তক সম্বন্ধে আমার লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া 'ভারত জীবন' পত্রিকার সম্পাদক কাশীনিবাসী শ্রীযুক্ত ভরতচন্দ্র বর্ম্মা আমাকে লিখিয়া পাঠান—"মহাশয়, সাহিত্য নামক মাসিক পত্রে (১৩০১ বাঃ) মাঘ মাসের সংখ্যায় "মুসলমান কবির বাঙ্গালা কাব্য" শীর্ষক প্রবন্ধের ৬৯১ পত্রে ২১ পংক্তিতে আপনি লিখিয়াছেন যে, মীর মহম্মদের রচিত হিন্দী পদ্মাবতী পাওয়া যায় নাই। মহাশয়, ধন্যবাদ পূর্ব্বক জানাইতেছি যে, হিন্দী মীরমালিক মহম্মদ রচিত পদ্মাবতী-কাব্য কাশী ও লক্ষ্ণৌতে ছাপা হইয়াছে ও বাজারে পাওয়া যায়।" আমরা এবার মীরমালিক মহম্মদ-রচিত 'পদ্মাবৎ' গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আমাকে এই পুস্তকখানি উপহার দিয়া বাধিত করিয়াছেন—ইহা একখানি প্রসিদ্ধ হিন্দীকাব্য ৯২৭ সনে এই পুস্তক বিরচিত হয়, এরূপ উক্ত হইয়াছে—কিন্তু কবি সেরসাহে উল্লেখ করিয়াছেন, ৯৪৭ সনে সেরসাহ সম্রাট্ হন; সুতরাং শ্রীযুক্ত গ্রীয়ারসন্ সাহেব অনুমান করেন—৯২৭ সন ন হইয়া ৯৪৭ সন মুদ্রাকরের ভ্রমবশতঃ প্রকাশিত হইয়া থাকিবে! কিন্তু আমরা প্রাচীন আলওয়াল কৃত অনুবাদখানিতে যখন মুদ্রিত হিন্দীকাব্যের অনুযায়ী ৯২৭ সনই উল্লিখিত দেখিতে পাই, তখন উহা মুদ্রাকরের প্রমাদ বলিয়া অগ্রাহ্য করিতে পারি না। মালিক মহম্মদ একজন সাধু ফকির ছিলেন, আমেথির রাজা তাঁহার একজন নিতান্ত অনুরক্ত শিষ্য ছিলেন। সাধু কবির মৃত্যুর পর আমেথির রাজ-দুর্গের সমীপে তাঁহার সমাধি দেওয়া হয় এখনও সেস্থলে তাঁহা সমাধি মন্দির দৃষ্ট হয়। গ্রীয়ারসন সাহেব চৈতন্য লাইব্রেরীর এক অধিবেশনে হিন্দী সাহিত্য সম্বন্ধে যে পাণ্ডিত্য পূ প্রবন্ধটি পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাতে 'পদ্মাবৎ' গ্রন্থের বিশেষ প্রশংসা করেন। তাঁহার হিন্দী সাহিত্যের ইতিহা মালিক মহম্মদের কাব্য সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে, চিরাগত ধর্ম্ম ও সাহিত্যিক প্রথা হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া হি প্রতিভা কি পরিমাণে শক্তিশালী হইতে পারে,—মালিক মহম্মদের গ্রন্থে তাহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়;—এই আদর্শ অতি উজ্জ্বল এবং হিন্দী সাহিত্যে একান্ত বিরল।"—("Malik Mohomad's work stands out as a conspicuou

কবিকর্ত্তৃক রত্নসেন নামে অভিহিত হইয়াছেন, পুঁথির শেষে আলাউদ্দিনের পরাজয় লিখিত হইয়াছে; যাহা হউক কবির স্বাধীন কল্পনাকে ইতিহাসের সীমাবদ্ধ তুলাদণ্ড দ্বারা মাপ করা উচিত হইবে না। মীরমহম্মদ কৃত কাব্যের অনুবাদ করিয়াছেন—কবি আলওয়াল; সে আমলের অনুবাদ অর্থে অনেক স্থলেই নূতন সৃষ্টি।

আলওয়াল কবি ফতেয়াবাদ পরগণায় (ফরিদপুর) জালালপুর নামক স্থানের অধিপতি সমসের কুতুবের একজন সচিবের পুত্র ছিলেন। যৌবনারম্ভে ইনি পিতার সহিত জলপথে গমন করিতেছিলেন, পথে হার্ম্মাদগণ (পর্ত্তুগিজ জলদস্যু) তাঁহাদিগকে আক্রমণ করে; কবির পিতা যুদ্ধ করিয়া নিহত হন। এই সময় হার্ম্মাদগণের অত্যাচার সমুদ্রের প্রান্তভাগে সর্ব্বদা বিপদাশঙ্কা ছিল, কবিকঙ্কণচণ্ডীতেও আমরা ইহা দেখিয়াছি। কবি পিতৃবিয়োগের পর রোসাঙ্গের (আরাকানের) রাজার প্রধান অমাত্য মাগণঠাকুরের শরণাপন্ন হন। মাগণঠাকুর মুসলমান ছিলেন, এস্থলে আবার আমরা মুসলমানের হিন্দুনাম পাইয়াছি। সংগীত ও অপরাপর সুকুমার শাস্ত্রের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল; আলওয়ালের উৎকৃষ্ট কবিত্ব-শক্তি দেখিয়া তিনি তাঁহাকে মীরমহাম্মদ-কৃত পদ্মাবৎকেচ্ছার বঙ্গানুবাদ করিতে আদেশ করেন, তদনুসারে পদ্মাবতী রচিত হয়; পদ্মাবতী লেখার পর তিনি বৃদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন। কিন্তু মাগণঠাকুর তাঁহাকে আবার বৃদ্ধবয়সে "ছয়ফুল মুল্লুক ও বদিউজ্জমাল" নামক ফার্শীকাব্য অনুবাদ করিতে নিযুক্ত করেন। এই পুস্তক কতকদুর রচনার পর মাগণঠাকুরের মৃত্যু হয়,—গভীর দুঃখে কবি লেখনী ত্যাগ করেন। সহসা আরাকানে এক ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হইল। সুজাবাদসা তথায় আসিয়া আরাকানসেনাপতির সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া নিহত হন। আরাকানরাজ সুজার অনুচরগুলি বিনষ্ট করেন। মুসলমানগণের উপর উৎপীড়ন আরম্ভ হইল, মৃজানামক এক দুষ্ট লোকের মিথ্যা সাক্ষ্যে কবি আলওয়াল কারাগারে আবদ্ধ হইলেন; কারাগার হইতে মুক্তি পাইয়া কবি নয় বৎসর অতি দীন ভাবে অতিবাহিত করেন, এই দীর্ঘকাল পরে কবির উপর গ্রহগণ পুনরায় সুপ্রসন্ন হন; সৈয়দমুছা নামক এক সদাশয় ব্যক্তি তাঁহাকে আশ্রয় দিয়া তাঁহাকে "ছয়ফুলমুল্লুক ও বদিলজ্জমাল" পুঁথির অবশিষ্টাংশ রচনা করিতে আদেশ করেন; তখন কবি ভগ্নবীণায় পুনরায় তার যোজনা করিলেন,

আলওয়ালের পরিচয়।

---

and almost solitary example of what the Hindu mind can do when freed freed from the trammels of literay and religious custom" P. 18) কবির সাধু জীবনের পরিচয় তাঁহার গ্রন্থের অনেক স্থলেই দৃষ্ট হইবে। প্রারম্ভে প্রদত্ত ঈশ্বরবন্দনাটি অতি উদার দার্শনিক চিন্তায় পূর্ণ; গ্রন্থশেষে কবি তাঁহার বর্ণিত উপাখ্যানটি একটি ধর্ম্মের রূপক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—চিতোর অর্থে তিনি মানব-শরীর বুঝাইয়াছেন, রত্নসেন অর্থ জীবাত্মা; শুকপাখী—ধর্ম্মগুরু,—পদ্মিনী অর্থে বিবেক, ইত্যাদি।

কিন্তু তখন তিনি অতি বৃদ্ধ,—'বয়োগতে বনিতাবিলাসে'র গীতি কণ্ঠে উঠিতে চাহে না। আলওয়াল এই দায়িত্ব গ্রহণে প্রথমতঃ অসম্মত হইয়াছিলেন, কিন্তু সৈয়দমুছা তাঁহার দেশবিখ্যাত যশের কথা বলিয়া পীড়াপীড়ি করিলেন। ১৬৫৮ খৃঃ অব্দে সুজার মৃত্যু হয়, তাহার অন্যূন ২০ বৎসর পূর্ব্বে কবির ৪০ বৎসর বয়সে পদ্মাবতীরচনার কাল ধরিলে তিনি ১৬১৮ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এইরূপ অনুমান করা অন্যায় হইবে না। কবি আলওয়াল কবিকঙ্কণ ও কাশীদাসের পরবর্ত্তী কবি। পূর্ব্বোক্ত দুই খানি গ্রন্থ ছাড়া আলওয়াল, দৌলত কাজির 'লোর চন্দ্রানী' ও 'সতী ময়না'র উত্তরাংশ রচনা করেন,—রোসাঙ্গের রাজার অমাত্য সালেমানের আদেশে এই কাব্য রচিত হয়। তৎপর তিনি সৈয়দ মহম্মদ খানের আদেশে পার্শী কবি নেজামিগজনবীর "হস্তপয়করের" একখানি বাঙ্গালা অনুবাদ প্রণয়ন করেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার রচিত রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক কয়েকটি পদও পাওয়া গিয়াছে। একটি পদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

তদীয় গ্রন্থাবলী।

"ননদিনী রসবিনোদিনী ও তোর কুবোল সহিতাম নারি। ধ্রু।
ঘরের ঘরণী, জগত মোহিনী, প্রত্যূষে যমুনায় গেলি।
বেলা অবশেষ, নিশি পরবেশ, কিসে বিলম্ব করিলি॥
প্রত্যূষ বেহানে, কমল দেখিয়া, পুষ্প তুলিবারে গেলুম।
বেলা উদনে, কমল মুদনে, ভ্রমর দংশনে মৈলুম॥
কমল কণ্টকে, বিষম সঙ্কটে, করের কঙ্কণ গেল।
কঙ্কণ হেরিতে, ডুব দিতে দিতে, দিন অবশেষ ভেল॥
সিঁথের সিন্দুর নয়নের কাজল, সব ভাসি গেল জলে।
হের দেখ মোর, অঙ্গ জরজর, দারুণ পদ্মের নালে॥
কুলের কামিনী, ফুলের নিছনি, কুলে নাই সীমা।
আরতি মাগনে আলওয়াল ভণে, জগৎমোহিনী বামা॥"

পদ্মাবতী কাব্যে আলাওলের গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় আছে। কবি পিঙ্গলাচার্য্যের মগণ, রগণ প্রভৃতি অষ্টমহাগণের তত্ত্ব বিচার করিয়াছেন; খণ্ডিতা, বাসকসজ্জা ও কলহান্তরিতা প্রভৃতি অষ্টনায়িকার ভেদ ও বিরহের দশ অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়াছেন, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র লইয়া উচ্চাঙ্গের কবিরাজী কথা শুনাইয়াছেন, জ্যোতিষপ্রসঙ্গে লগ্নাচার্য্যের ন্যায় যাত্রার শুভাশুভের এবং যোগিনীচক্রের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন; একজন প্রবীণা এয়োর মত হিন্দুর বিবাহাদি ব্যাপারের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আচারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন ও পুরোহিত ঠাকুরের মত প্রশস্তবন্দনার উপকরণের একটি শুদ্ধ তালিকা দিয়াছেন, এতদ্ব্যতীত টোলের পণ্ডিতের মত অধ্যায়ের শিরোভাগে সংস্কৃত শ্লোক তুলিয়া দিয়াছেন। আল-

পদ্মাবতী।

ওয়াল, "ছয়ফুলমুল্লুক ও বদিউজ্জমাল" কাব্যে লিখিয়াছেন—"আজ্ঞা পাইয়া রচিলাম পুস্তক পদ্মাবতী। যতেক আছিল মোর বুদ্ধির শকতি॥" এই উক্তি অতি সত্য;—তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধিতে যতদূর কুলাইয়াছিল, তিনি পদ্মাবতীকাব্যে তাহার কিছু বাদ দেন নাই। তিনি বয়ঃসন্ধি বর্ণনায় একজন রসজ্ঞ বৈষ্ণব কবি, যথা,—"আড় আঁখি বক্র দৃষ্টি ক্রমে ক্রমে হয়। ক্ষণে ক্ষণে লাজে তনু আসি সঞ্চরয়॥ চোর রূপে অনঙ্গ অঙ্গেতে উপজয়। বিরহ বেদনা ক্ষণে ক্ষণে মনে হয়॥ অনঙ্গ সঞ্চার অঙ্গে রঙ্গ ভঙ্গ সঙ্গে। আমোদিত পদ্মগন্ধ পদ্মিনীর অঙ্গে॥ * * * অভেদ আছয়ে দুই কমলের কলি। না জানি পরশে কোন্ ভাগ্যবন্ত অলি।" অন্যত্র—"কুটিল কবরী কুসুমমাঝে। তারকামণ্ডলে জলদ সাজে॥ শশিকলা প্রায় সিন্দুর ভালে। বেড়ি বিধুমুখ অলকজালে॥ সুন্দরী কামিনী কামবিমোহে। খঞ্জনগঞ্জন নয়নে চাহে॥ মদন ধনু ভুরু বিভঙ্গে। অপাঙ্গ ইঙ্গিত বাণতরঙ্গে॥ নাসা খগপতি নহে সমতুল। সুরঙ্গ অধর বাঁধুলীফুল॥ দশন মুকুতা বিজলী হাসি। অমিয় বরিষে আঁধার নিশি॥ উরজ কঠিন হেমকটোর। হেরি মুনি মন বিভোর॥ হরি করিকুম্ভ কটিনিতম্ব। রাজহংস জিনি গতি বিলম্ব॥ কবি আলওয়াল মধু গায়। মাগন আরতি রহুক সদায়।" স্থলে স্থলে কথার বাঁধুনি জয়দেবের মত—"বসন্তে নাগরবর নাগরী বিলাসে। বরবালা দুই ইন্দু, স্রবে যেন সুধা বিন্দু, মৃদুমন্দ অধরে ললিত মধু হাসে॥ প্রফুল্লিত কুসুম, মধুব্রত ঝঙ্কৃত, হুঙ্কৃত পরভৃত কুঞ্জে রতরাসে॥ মলয়সমীর, সুসৌরভ সুশীতল বিলোলিত পতি অতি রসভাষে॥ প্রফুল্লিত বনস্পতি, কুটিল তমালদ্রুম, মুকুলিত চুতলতা কোরক-জালে। যুবজন হৃদয়, আনন্দে পরিপুরিত, রঙ্গমল্লিকামালতিমালে॥" অন্যত্র বিদ্যাপতিকে মনে পড়িবে,—"চলিল কামিনী, গজেন্দ্র গামিনী, খঞ্জন-গমন শোভিতা।"ঋতুবর্ণার পদগুলি মসৃণ ও ললিত, তাহা আমাদের বৈষ্ণব কবিকুলগুরুদিগের রচনার সঙ্গে গাঁথিয়া রাখার উপযুক্ত—"নিদাঘ সময় অতি প্রচণ্ড তপন। রৌদ্রত্রাসে রহে ছায়া চরণে শরণ, চন্দন চম্পক মালা মলয়া পবন॥ সতত দম্পতি পাশে ব্যাপৃত মদন।" বর্ষাকালে—"ঘোর শব্দ করিয়া মল্লার রাগ গায়। দর্দ্দুরী শিখিনীরব অতি মনে ভায়॥ স্বামিসঙ্গে নানা রঙ্গে নিশি বসি জাগে। চমকিলে বিদ্যুত চমকি কণ্ঠে লাগে॥ বজ্রপাতে কমলিনী ত্রাসিত হইয়া। ধরয় পতির গীমে অধিক চাপিয়া॥ কীটকুলকলরব কঙ্কণঝঙ্কার। শুনিয়া যুবক চিত্তে চমকিত মার॥" শরৎকালে—"আসিল শরৎ—ঋতু নির্ম্মল আকাশে। দোলয়ে চামর কেশ কুসুমবিকাশে॥ নবীন খঞ্জন দেখি বড়হি কৌতুক। উপজিত দামিনী দম্পতি মনে সুখ॥ কুসুমিত শ্বেত শয্যা অতি মনোহর। চন্দনে লেপিয়া কুঙ্কুম কলেবর॥ নানা আভরণ পটাম্বর পরিধান। যুবকের মরমে জাগায় পঞ্চবাণ" শিশিরকালে—"সহজে দম্পতি মজে শীতের সোহাগে। হেমকান্তি দুই অঙ্গ এক হৈয়া লাগে। হেমন্তে—"শীতলিত বাসে রবি ত্বরিতে লুকায়। অতি দীর্ঘ সুখ নিশি পলকে পোহায়॥ পুষ্প শয্যা মৃদু খেলা বিচিত্র বসন। বক্ষে বক্ষে এক হৈলে শীত নিবারণ॥" আলওয়াল কবির বারমাস্যা বর্ণনাটিও সুন্দর এবং নিপুণ তুলির উপযুক্ত। ভাদ্রে—"ভাদ্রেতে যামিনী ঘোর তমঃ অতিশয়। নানা অস্ত্র অনিবার মদন ক্ষেপয়॥ "আশ্বিনে প্রকাশ নিশি নির্ম্মল গগন। গৃহ অন্ধকার নাহি চাঁদের কিরণ॥ সকলের মতে চন্দ্র, রাহু মোর মতে। মুদিত কমল আঁখি চন্দ্রিকা উদিতে॥ কার্ত্তিকে—"পরব দেওয়ালি ঘরে ঘরে সুখভোগ। নিজপতি বিনে মোর ভোগ ভেল রোগ॥" ফাল্গুনে—"মোর অঙ্গ পরশি পবন যথা যায়। তরুকুল পত্র ঝরি পড়য় তথায়॥" বৈশাখে—"বিদরে মহী অরুণ প্রবলে। ভ্রষ্ট ভেল বায়ু

জল বিরহে অনলে॥ মিত্র হৈয়া কমল না সহে দিনমণি। পতি বিনে কেমতে সহিবে কমলিনী॥" জ্যৈষ্ঠে—"পুষ্প রেণু চন্দন ছিটায় সখিগণ। ভস্মবৎ হয় মোর অঙ্গ পরশন॥" মহাদেব বর্ণনায় আলওয়াল কবি শৈবের প্রশংসা পাইবেন, —"শিরে গঙ্গাধারা ঘটা গলে অস্থিমালা। অঙ্গে ভস্ম পৃষ্ঠেতে পরণ ব্যাঘ্র ছালা॥ কণ্ঠে কালকূট ভালে চন্দ্রমা সুচারু। কক্ষে শিঙ্গা ভূতনাথ করেত ডুমরু। শঙ্খের কুণ্ডলী কর্ণে হস্তেতে ত্রিশূল। ওড়ের কলিকা জিনি নয়ন রাতুল॥" * এতদ্ব্যতীত নানা বিচিত্র বিদ্যাসুন্দরী ধুয়াগুলির মত গীতভাঙ্গা পদ পুস্তকে সর্ব্বদা পাওয়া যাইবে। মধ্যে মধ্যে দর্শনাত্মক উচ্চভাবের বিকাশ আছে, তদ্দৃষ্টে বোধ হয় কবি পাণ্ডিত্য ছাড়িয়া দিলে অন্তর্দৃষ্টির রাজ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ ছিলেন, যথা—"কাব্য কথা সকল সুগন্ধি ভরপুর। দূরেতে নিকট হয় নিকটেতে দূর॥ নিকটেতে দূর যেন পুষ্পেতে কলিকা। দূরেতে নিকট মধুমাঝে পিপীলিকা॥ বনখণ্ডে থাকে অলি কমলেতে বশ। নিকটে থাকিয়া ভেক না জানয়ে রস॥" † এবং ছয়ফুলমুল্লুক ও বদউজ্জমালে—"উজ্জ্বল মহিমা নাহি অন্ধকার বিনে। অধম না হৈলে বল উত্তম কে চিনে॥ লবণ কারণে চিনে মিষ্ট জল সীমা। কৃপণ না হৈতো কোথা দাতার মহিমা॥ সত্য যে অসত্য দুই মতে হৈলো যত। ভাল মন্দ যে বলে না কর কর্ণগত॥ যেই পুঁজি আছে মাত্র হৃদয় ভাণ্ডার। লাজ ছাড়ি আলওয়াল ব্যক্ত কর তার॥"

মুসলমানী-ভাব।

পদ্মাবতী-কাব্যে মুসলমানী-ভাব না আছে, এমন নহে। এই কাব্য কল্পনার কতকটা অস্বাভাবিক আড়ম্বর আছে সেই সকল অংশ পড়িতে পড়িতে আরব্য ও পারস্য-দেশের গল্পগুলির কথা মনে হয়। রত্নসেন শুকমুখে পদ্মাবতীর রূপের কথা শুনিয়া আহার নিদ্রা ত্যাগ করিলেন, প্রায়ই মূর্চ্ছিত হইয়া থাকিতেন, শেষে রাজ্য ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে—"ষোলশত রাজার কুমার হৈল যোগী।"—রাজকুমারীর দুঃখ সংবাদ জানাইতে

---

* মূলে এইরূপ রহিয়াছে,—

তখন পঁহুছে আয় মহেশু। বাহন কৈহ কুষ্টিকর ভেশু। কাংথর কয়া হড়াবর বাংধে॥ মুণ্ডহার ঔ জনেউ কাংধে॥ শেষনাগ সোহে কুণ্ঠমালা। নতবিভূতি হস্তী করছালা॥ পহচী রুদ্র কমলকী কটা। শশী মাথে শিরপর জটা॥ চঁবর ঘংট ঔ ডমরু হাথা। গৌরী পার্বতী ধনী সাথা॥" সুতরাং আলওয়ালের অনুবাদটি আক্ষরিক নহে।

† মূলে এইরূপ আছে—

"কবি ব্যাস বস কঁবলা পুরী। দুরহিং নেরে নেরে দুরী॥ নেরে দুর ফুল জস কাংটা। দুর জে নেসে জস গুড় চাংটা॥" এখানে "নিকটেতে দূর যথা পুষ্পেতে কলিকা" অনুবাদটি ঠিক হয় নাই, মূলে পুষ্প এবং কণ্টকের সম্বন্ধ নিকট হইলেও ইহাদের দূরবর্ত্তিতা প্রদর্শিত হইয়াছে, কিন্তু পুষ্প এবং কলিকার উপমায় সে ভাবটি স্পষ্টরূপে বুঝা যায় না, তবে কষ্ট করিয়া একটা অর্থ করা যায়, কলি একবার ফুটিয়া ফুল হইলে আর তাহার কলিকার অবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবার উপায় নাই, সুতরাং ফুল এবং কলিকার সম্বন্ধ নিকট হইলেও দূর। 'কলিকা' স্থলে 'কণ্টিকা' পাঠ ধরিলেই গোল চুকিয়া যায়।

যে পক্ষী দূত হইয়া চলিল, তাহার বর্ণনায় রাজকুমারীর বিরহব্যথার পরিমাণ দত্ত হইয়াছে ;—"দুঃখের সংবাদ লয়ে বিহঙ্গ উড়িল। সেই দুঃখে জলদ শ্যাম বর্ণ হৈল॥ ফুলিঙ্গ পড়িল উড়ি চাঁদের উপর। অন্তরে শ্যামল তহি ভেল শশধর॥ উড়িতে নারিল পাখা শূন্যের উপর। উল্কাপাত হয় যেন বলে তারে নর॥ সমুদ্র উপর দিয়া করিল গমন। জলনিধি হৈল তহি পূর্ণিত লবণ॥" যখন মুসলমান কবিকে পাঠক কিঞ্চিৎ কালের জন্য হিন্দুকবি বলিয়া ভ্রম করিবেন, তখনই সহসা কল্পনার আকস্মিক অদ্ভুত আড়ম্বরের শৈশব শ্রুত পরীবানু কি দানহাসের বৃত্তান্ত স্মরণ হইবে, এবং পদ্মাবতীকাব্য মুসলমানীকেচ্ছার আকার ধারণ করিবে।

পদ্মাবতী কাব্য। সমালোচনা।

পদ্মাবতী মৌলিক কাব্য নহে, ইহা একখানি অনুবাদপুস্তক। কিন্তু আলওয়ালের সুগভীর সংস্কৃতশাস্ত্রের জ্ঞান এবং হিন্দুসমাজের সঙ্গে সহানুভূতি তাঁহার অনুবাদ গ্রন্থখানির উপর একটি মৌলিক সৌন্দর্য্যের প্রভা নিক্ষেপ করিয়াছে তাহা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। মূলকাব্য সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসীর রচনা, তাঁহার মানবীয় আখ্যানের ভিতর আধ্যাত্মিক তত্ত্বের সমাবেশ প্রচুর রহিয়াছে। ঈশ্বর সম্বন্ধে লিখিতে আরম্ভ করিলে মালিক মহাম্মদ যেন নিজ স্বাভাবিক রাজ্যে প্রবেশ করেন। সেই সকল স্থলে, পরমেশ্বরের অপার করুণা স্মরণ আর্দ্রচিত্ত হইয়া তিনি স্বীয় রচনার সুধামাখা তত্ত্বামৃত ঢালিয়া দিয়াছেন,—আলওয়াল-কবি সেই সকল অংশে মালিক মহাম্মদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ নিঃশব্দে অনুবর্ত্তী হইয়াছেন,—সাধুর সম্বন্ধীয় কথাগুলির তিনি আক্ষরিক অনুবাদ করিয়াছেন,—নিম্নে দুই গ্রন্থ হইতে যে সকল অংশ উদ্ধৃত হইল তাহা তুলনা করিয়া দেখুন।

(১) "অপ্রকট গুপ্ত আছে সবাকারে ব্যাপি।
ধার্ম্মিক চিনয়ে তারে না চিনয়ে পাপী॥"
আলওয়াল।

(১) "প্রকট গুপ্ত সো সর্ব্ব্যাপী।
ধর্ম্মী চিহ্ন ন চিহ্নৈ পাপী॥"
মালিক মহাম্মদ

(২) "ধনপতি বহী জেহক সংসারূ।
সব দেহ দুনিত ঘটক ভংডারূ॥"
মালিক মহাম্মদ।

(২) "সেই ধনপতি সব যাহার সংসার।
সকলেরে দেয় দান না টুটে ভাণ্ডার।"
আলওয়াল।

(৩) "সুমিরৌ আদি এক করতারু।
জেং জীব দীন্হ কীন্হ সংসারু॥
মালিক মহাম্মদ।

(৪) "প্রথমে প্রণাম করি এক করতার।
যেই প্রভু জীবদানে স্থাপিল সংসার॥"
আলওয়াল।

এই সকল ঈশ্বরের স্তব সূচক অংশ অনুবাদ করিতে যাইয়া আলওয়াল তাঁহার আদর্শের ভাব যথাসম্ভব সততার সহিত রক্ষা করিয়াছেন। উদার ঈশ্বর-স্তোত্রগুলি অনেক স্থানে মূলের মতই সুন্দর হইয়াছে, মূলের মতই তাহাতে সকরুণ ভক্তিভাব এবং ঈশ্বরের অসীম শক্তির প্রতি সবিস্ময় বন্দনাগীতি সরল উদ্দীপনায় প্রকাশিত হইয়াছে—আমরা নিম্নে আলওয়ালের সরল অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি,—"আপনার প্রচার হেতু সৃজিল জীবন। নিজ ভয় দর্শাইতে সৃজিল মরণ॥ সুগন্ধি সৃজিল প্রভু স্বর্গ বুঝাইতে। সৃজিলেক দুর্গন্ধ নরক জানাইতে॥ মিষ্ট রস সৃজিলেক কৃপা অনুরোধ। তিক্ত কটু কষা সৃজি জানাইলা ক্রোধ॥ পুষ্পে জন্মাইল মধু গুপ্ত আকার। সৃজিয়া মক্ষিকা কৈল তাহার প্রচার॥" কোন কোন স্থানে কবি ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য-চিন্তায় স্তব্ধ ও ভাবগম্ভীর, কুত্রাপি তাঁহার সসীম করুণা স্মরণে কৃতকৃতার্থ—"হেন দাতা আছে কোন শুন জগজন। সবারে খাওয়ায় পুন না খায় আপন॥" সাধারণ প্রণয়-প্রণয়ীর উপাখ্যান এরূপ ধর্ম্ম-তত্ত্ব-বহুল করা হইলে উহা প্রথম শ্রেণীর কাব্যে পরিণত করা কঠিন হয়, লেখক কোন ক্ষুদ্র কথা বা আখ্যানবর্ণিত ক্ষুদ্র প্রসঙ্গ লইয়া ধর্ম্মকথা শুনাইতে ব্যস্ত হন, সুতরাং উপাখ্যানটি কবির নিকট হইতে যথেষ্ট মনোযোগ প্রাপ্ত হইয়া বিকাশ পাইয়া উঠে না। আলওয়ালকবি 'পদ্মাবৎ' পুস্তকের ধর্ম্ম তত্ত্বের অনুবাদ করিতে যাইয়া নিজের কোন কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে চেষ্টা পান নাই, কিন্তু প্রণয়-প্রণয়িনীর ব্যাপারে তাঁহার নিজের অলঙ্কার শাস্ত্রের জ্ঞান ফলাইতে ত্রুটি করেন নাই। সাধারণ আখ্যানের অনেক স্থলে আলওয়াল মূলের ছায়া মাত্র অবলম্বন করিয়া নিজের অনেক কাব্যকথা পূরিয়া দিয়াছেন। কিন্তু তিনি গল্পটি ঠিক একটি সুন্দর কুসুমহারের ন্যায় গ্রন্থন-কৌশলে সুসম্বদ্ধ করিতে পারেন নাই। মালী যেন এক রাশ সুন্দর কুসুম লইয়া বাসয়াছিল, কিন্তু মালা গাঁথিয়া উঠিতে পারে নাই। আলওয়ালের কাব্যে নানারূপ ললিত ভাব ও কাবত্বপূর্ণ বর্ণনা—গল্পসূত্রে অর্দ্ধ-সংযুক্ত ও অর্দ্ধ-বিযুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়—মধ্যে মধ্যে সুন্দর সুন্দর কথায় চিত্ত তৃপ্ত হয়, কিন্তু কাব্যখানি অনুসরণ করিতে তাদৃশ কৌতূহলের উদ্রেক হয় না। ইহা ছাড়া প্রথম শ্রেণীর কাব্যে বড় কোন এক আদর্শ পরিষ্কার রেখায় অঙ্কিত থাকে, সেই আদর্শের চতুষ্পার্শ্বে ক্ষুদ্রতর সৌন্দর্য্যরাশি পল্লবিত হয়। পদ্মাবতীতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৌন্দর্য্যের অভাব নাই, কিন্তু বড় আদর্শের অভাব; অথচ ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর যেরূপ সর্ব্বত্র সুললিত ভাষা, উজ্জ্বল হাস্য রসের দীপ্তি ও কৌতুকাবহ প্রতিভার খেলা,

পদ্মাবতীর সর্ব্বত্র তাহা নাই, ক্বচিৎ ক্বচিৎ সেরূপ আছে এবং কচিৎ কচিৎ আলওয়াল ভারতচন্দ্রের সমকক্ষ। আলওয়ালরচিত "ছয়ফলমুল্লুক ও বদিউজ্জমাল" পদ্মাবতী হইতে নিকৃষ্ট; কিন্তু ইঁহার সকলগুলি কাব্যেরই ভাষা সংস্কৃত-প্রধান বাঙ্গালা, তাহাতে মুসলমানী ভাষায় মিশ্রণ অল্প; আলওয়াল কবি বঙ্গীয় সাহিত্যে হিন্দুকবিগণের সমাজে আদরের সহিত গৃহীত হইবেন। এই কবি সম্বন্ধে আমাদের শেষ বক্তব্য—চট্টগ্রামের মুসলমানগণের প্রথা অনুসারে আলওয়াল এই দুইখানি বাঙ্গালা কাব্য ফরাশী অক্ষরে লিখিয়া গিয়াছিলেন, সুতরাং সংস্কৃতানভিজ্ঞ প্রকাশক হামিদুল্লাসেখ ফরাশী অক্ষর বাঙ্গালায় প্রবর্ত্তিত করিতে যাইয়া অনেকগুলি গুরুতর ভ্রম করিয়াছেন,—তাহা সংশোধন করিয়া এই দুইখানি কাব্য উদ্ধার করা একান্ত আবশ্যক।

বিদ্যাসুন্দর, অন্নদামঙ্গল প্রভৃতির কাব্য।

এই যুগের বিশেষ প্রশংসিত কাব্য ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর; কিন্তু ইহাতে অপ্রশংসার কথা অনেক আছে।

বিদ্যাসুন্দরের দোষ।

এই কাব্যে হীরা মালিনী ভিন্ন অন্য কোন চরিত্র পরিষ্কাররূপে অঙ্কিত হয় নাই। আদিরসের ভূতাশ্রিত নায়ক-নায়িকার তোটকছন্দাত্মক রাত্রিজাগরণ বর্ণনায় তাঁহাদের চরিত্রের কোন অঙ্গ পরিস্ফুট হয় নাই। বিদ্যা ও সুন্দরের কামোন্মত্ততা ক্ষণস্থায়ী ইতর-প্রকৃতি-সুলভ উত্তেজনার ফল,—উহা চরিত্রের বিকাশ দেখায় না। বিদ্যার রূপবর্ণনায় রূপবতীর রূপ অপেক্ষা কবির লেখনী-লীলাই বেশী প্রদর্শিত হইয়াছে। সুন্দরের রাজসভায় বক্তৃতায়ও কেবল শব্দ লইয়া ক্রীড়া,—তাহাতে সুন্দরের চরিত্র খুঁজিলে অতিশয়োক্তির একটি নিবিড় ছায়া দেখিয়া ফিরিয়া আসিতে হয়। "শুন শ্বশুর ঠাকুর, শুন শ্বশুর ঠাকুর। আমার পিতার নাম বিদ্যার শ্বশুর॥" "বিদ্যাপতি মোর নাম, বিদ্যাপতি মোর নাম, বিদ্যাধর জাতি মোর, বাড়ী বিদ্যাপুর গ্রাম॥"—এ সমস্ত উক্তির অশিষ্টতা লিপিচাতুর্য্যের নামে মার্জ্জনীয় নহে। ভাবী শ্বশুর মহাশয়ের নিকট কোন জামাতা যে সত্য সত্যই এরূপ ছন্দ ও ভঙ্গীতে আত্মপরিচয় দিতে পারেন,—ইহা আমাদের ধারণার অতীত। মশানে যখন সুন্দরের শিরোর্দ্ধে কোটালের খরশান খড়্গ উত্থিত, তখন তিনি নিশ্চিন্তমনে অভিধান খুঁজিয়া চণ্ডীশব্দের প্রতিশব্দ বাহির করিতেছিলেন, অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রতি তাঁহার এই প্রাণান্ত অনুরাগ দৃষ্টে,—বিপজ্জালবেষ্টিত গণিতবিজ্ঞানে ঘোর নিবিষ্টচিত্ত, ভ্রূক্ষেপহীন আর্কমিডাসের কথা মনে হয়; হর্ষচরিতে পড়িয়াছি, আসন্নমৃত্যু রাজা জ্বরবিকারগ্রস্ত হইয়া "হারং দেহিমে হরিণি" প্রভৃতি ভাবে কেবল যমক মিলাইতেছেন, শিক্ষা-স্পর্দ্ধিত কবিগণ বিদ্যা বুদ্ধি দেখাইবার ব্যস্ততায়

বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলেন, মশানে পতিত সুন্দরকে দিয়াও ভারতচন্দ্র সেইরূপ সময়ানুচিত অলঙ্কার-শাস্ত্রের অভিনয় করিয়াছেন। সুন্দরের স্তবে ভক্তির কথা দুর্লভ—লিপিশক্তির পরিচয় সুলভ। সুন্দর ধরা পড়িলে বিদ্যা বিনাইয়া কাঁদিতে বসিল, তাহার ক্রন্দনে চক্ষুজল ব্যতীত সকলই ছিল—ছন্দের প্রতি সাবধানতা বিশেষ; রামপ্রসাদী বিদ্যাসুন্দরের রাণী ও তাহার গর্ভবতী কন্যার শ্লেষপূর্ণ বাক্‌বিতণ্ডা পড়িয়া বিজয়গুপ্ত-বর্ণিত পূর্ব্বদেশীয় বর্ব্বরগণের কথা মনে হইয়াছিল—"জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ তারা সব করে ঠাট্যা। ব্রাহ্মণ সজ্জন তারা বৈসে চর্ম্মকাটা॥" রামপ্রসাদী বিদ্যাসুন্দর হইতে সেই অংশ তুলিয়া দেখাইতেছি—'আলো গর্ত্তের লক্ষণ সর্ব্ব। বিদ্যা বলে বাতাসে কি জন্মে গর্ভ॥ আলো উদর ডাগর তোর। বিদ্যা বলে উদরী হয়েছে মোর॥ আলো স্তনে কেন ক্ষরে পয়। বিদ্যা বলে এ রোগে বাঁচা সংশয়॥ আলো শয়ন কেন ভূতলে। বিদ্যা বলে নিরন্তর দেহ জ্বলে॥ আলো মুখে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম। বিদ্যা বলে নিদাঘ কালের ধর্ম্ম॥" এই "মা ও মেয়ে" প্রহসনের আর অধিক উদ্‌ঘাটিত করিতে লজ্জা বোধ হয়।

হীরা মালিনী।

বিজাতীয় আদর্শ অনুসরণ করার দরুণই হউক, কি অন্য যে কোন কারণেই হউক, বিদ্যা ও সুন্দরের চরিত্র অস্বাভাবিক হইয়াছে। কিন্তু ভারতচন্দ্র, হীরা মালিনীর যে মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা জীবন্ত হইয়াছে।* এই চরিত্রের ভাব কতকটা তাঁহার স্বীয় প্রতিভার অনুরূপ, বিশেষ হীরা বিদ্যাসুন্দর কাব্যের শ্রেষ্ঠ চরিত্র রূপে কল্পিত না হওয়াতে, কবি তাহাকে উপলক্ষ করিয়া বাক্‌জাল বিস্তার করা আবশ্যক মনে করেন নাই। শিক্ষিত কবির চেষ্টা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া হীরামালিনী স্বাভাবিক বর্ণে অঙ্কিত হইয়াছে। বিদ্যার রূপ-বর্ণনায় কবির প্রাণান্ত চেষ্টাজালে খাঁটি মূর্ত্তি ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে, তৎপার্শ্বে হীরার রূপবর্ণনা স্থাপন করিলে পাঠক তারতম্য করিতে পারিবেন—"সূর্য্য যায় অস্তগিরি, আইসে যামিনী। হেন কালে তথা এক আইল মালিনী॥ কথায় হীরার ধার, হীরা তার নাম। দাঁত ছোলা, মাজা দোলা, হাস্য অবিরাম। গাল ভরা গুয়া পান, পাকি মালা গলে। কাণে কড়ি, কড়ে, রাঁড়ী কথা কয় ছলে। চূড়া বাঁধা চুল, পরিধান সাদা সাড়ী। ফুলের চুপড়ি কাঁখে, ফিরে বাড়ী বাড়ী। আছিল বিস্তর ঠাট, প্রথম বয়সে। এবে বুড়া, তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে॥ ছিটা ফোঁটা মন্ত্র তন্ত্র জানে কত গুলি। চেঙ্গড়া ভুলায়ে খায়, জানে কত ঠুলি॥ বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ কোন্দল ভেজায়। পড়সী না থাকে কাছে কোন্দলের দায়। মন্দ মন্দ গতি ঘন ঘন হাত নানা। তুলিতে বৈকালে ফুল, আইসে সেই পাড়া॥" ভারতচন্দ্র প্রকৃত কবির প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু অলঙ্কার শাস্ত্র তাঁহার মাথা ঘুরাইয়া দিয়াছিল। যে সকল স্থানে তিনি অলঙ্কার শাস্ত্রখানি হস্ত হইতে ফেলিয়া স্বভাবের আদত চিত্রের প্রতি মনোনিবেশ করিয়াছেন, সে সকল অংশে তাঁহার বর্ণনা জীবন্ত ও সুন্দর হইয়াছে।

---

* হীরামালীনির অনুরূপ বহু চরিত্র প্রাচীন পল্লীগায় পাওয়া গিয়াছে।

নানা দোষ সত্ত্বেও ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর এত আদরণীয় হইল কেন, তাহার কারণ আমরা পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করিয়াছি—ভারতচন্দ্রের অপূর্ব্ব শব্দমন্ত্র। বাঙ্গালা পৃথিবীর কোমলতম ভাষা বলিয়া গণ্য হইতে পারে, কিন্তু এই কোমলতার কিরূপ আকর্ষণী শক্তি আছে, তাহা ভারতচন্দ্রের বিদ্যা-সুন্দর না পড়িলে সম্যক্ উপলব্ধি হইবে না; বাঁশীর রবে হরিণ ফাঁদে পড়ে, হাতী কাদায় মগ্ন হয়, ভারতচন্দ্রের ললিত শব্দে মুগ্ধ হইয়া একসময় বঙ্গীয় যুবকগণ নৈতিক কূপে পড়িয়াছিলেন। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরে কবির অসাধারণ পাণ্ডিত্যের প্রভা পড়িয়া বইখানিকে সমুজ্জ্বল করিয়াছে। তিনি অন্নদামঙ্গলের এক স্থলে লিখিয়াছেন। তিনি হিন্দী, ফরাসী ও আরবী উত্তমরূপে জানেন, এবং সেই ভাষায় কবিতা রচনা করিতে পারেন। সংস্কৃতে অবশ্য তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। এই বহুভাষার সংযোগে তিনি মিশ্র-ভাষায় "চণ্ডী নাটক" লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাহার নমুনা তদীয় গ্রন্থা-বলীতেই আছে।

শব্দমন্ত্র।

কিন্তু সংস্কৃত কাব্য ও দর্শন যিনি ভালরূপ না পড়িয়াছেন, তিনি ভারতচন্দ্রের কাব্য আলোচনা কালে দিগ্দর্শনী হারা হইয়া কোন্ কবির নিকট ভারতচন্দ্রের কতটা ঋণ তাহা বুঝিতে পারিবেন না। ভারতচন্দ্রের সময় পণ্ডিতগণ ন্যায়-দর্শনের বঙ্গানুবাদ করিয়া রাজসভায় যশঃ অর্জ্জন করিতেন, বিদ্যা ও সুন্দরের তর্কে সেই সময়ে অধীত গ্রন্থগুলির প্রতি নির্দ্দেশ রহিয়াছে। "আত্মতত্ত্বে পূর্ব্বপক্ষ সুন্দর" করিল পদের "আত্ম-তত্ত্ব" শব্দের সহজ অর্থ আত্মা সম্বন্ধীয় তথ্য, কিন্তু শব্দটির আড়ালে "আত্মতত্ত্ববিবেক" নামক বিখ্যাত দার্শনিক গ্রন্থের প্রতি নির্দ্দেশ আছে। "বেদান্ত একাত্মবাদী ন্যাত্মবাদী তর্ক মীমাংসায় মীমাংসার না হয় সম্পর্ক॥ বৈশেষিকে বিশেষ কহিতে কিছু নারে। পাতঞ্জলে মাথায় অঞ্জলি বান্ধি হারে॥ সাংখ্যেতে কি হবে সংখ্যা আত্মনিরূপণ। পুরাণ সংহিতা স্মৃতি মনু বিজ্ঞ নন॥ স্ত্রীলোক করিতে নারে বিস্তার বিচার। শ্রুতি বিনা উপায় না পায় সামার॥"..................সুন্দর বলেন রামা কি হৈল সিদ্ধান্ত। বিদ্যা বলে সেই সত্য যা বলে বেদান্ত॥ অন্য শাস্ত্র যে সব সে সব কাঁটাবন। তত্ত্বন্তু বাদরায়ণে প্রমাণ লিখন॥"

এই সকল অংশে কবি অতি অল্প কথায়, বেদান্তের মত, ন্যায়শাস্ত্র, মীমাংসা, বৈশেষিক দর্শন এবং পাতঞ্জলের মত সম্বন্ধে দুই একটি কথায় যে ইঙ্গিত দিয়াছেন, তাহা ষড়্দর্শনের মর্ম্মজ্ঞ ভিন্ন অপর কেহ সম্যক্ উপভোগ করিতে পারিবেন না। শেষের দুইটি ছত্র উদয়নাচার্য্যের "ইদন্তু কণ্টকাবরণং তত্ত্বন্তু বাদরায়ণাৎ" শ্লোকটির অনুবাদ মাত্র। * সুন্দর ধৃত হইলে রাজসভায় তাঁহার পরিচয়প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত দুইটি চরণ দৃষ্ট হয়:—"এইরূপে পরিচয় যে কেহ জিজ্ঞাসে। বাক্ছলে সুন্দর উড়ায় উপহাসে।"

* ১৫শ বর্ষের ৪র্থ সংখ্যায় অর্চনায় "হিন্দু সাহিত্যে ভারতচন্দ্র" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। আমরা উক্ত প্রবন্ধ হইতে কোন কোন তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি।

এই কবিতার ন্যায়-দর্শনের "বাক্‌চ্ছল, সামান্যচ্ছল, ও উপচারচ্ছল, এই ত্রিবিধ-ছলের একটির প্রতি স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। ভারতচন্দ্র যে সমস্ত সংস্কৃত ছন্দ বাঙ্গালায় আনিয়াছেন, তাহা আমাদের ভাষায় ভ্রমশূন্যভাবে গৃহীত হইয়াছে দেখিতে পাই,—শব্দের মাধুর্য্যে তাহা অতুলনীয়, হিন্দীর ধন্যাত্মক কবিতার ভঙ্গী সেগুলিতে পূর্ণ সাফল্যের সহিত অনুসৃত, সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম তাহারা অনুমাত্রও লঙ্ঘন করে নাই। এ সকল বিষয়ে ভারতচন্দ্র বাহাদুর বটে। বাঙ্গালা শব্দে লঘু গুরু উচ্চারণ-ভেদ নাই, তাহাতে সংস্কৃত ছন্দ অনুকরণ করা যে কত দুরূহ, তাহা অলঙ্কার শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু ভারতচন্দ্র শুধু সংস্কৃত ছন্দগুলি নির্দ্দোষভাবে বাঙ্গলায় আমদানী করেন নাই, সংস্কৃতে যাহা নাই বাঙ্গলাতে ছত্রে ছত্রে মিল দেওয়ার নূতন গৌরব তিনি তাঁহার ভুজঙ্গ প্রয়াত ও তোটকাদি ছন্দে দিয়াছেন। কত বড় প্রতিভা লইয়া তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এই ব্যাপারে তাহা প্রমাণিত হইতেছে। কিন্তু এক যুগের ফ্যাসন-দুরস্ত পাণ্ডিত্যের প্রমাণ পাইলেই আমরা কবিকে অর্ঘ্য দিয়া পূজা করিয়া লইব না; যদি প্রকৃত কবিত্ব না পাই, তবে পাণ্ডিত্যের বাহাদুরী দেখিয়া সেই ভাবের মর্ম্মজ্ঞ পাঠকগণ তাঁহাকে যতটা হাতে তালি দিবেন, আমরা ততটা দিতে পারিব না। সম্প্রতি 'দশাননবধ মহাকাব্য' নামক একখানি বাঙ্গালা ভাষায় রচিত গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা বাঙ্গালা ভাষায় 'সংস্কৃত ছন্দ-বারিধি' বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; এই পুস্তকের পাণ্ডিত্য দেখিয়া বিস্ময়ে হৃদয় পূর্ণ হয়, কিন্তু কাব্য হিসাবে উহার কি মূল্য তাহা জানি না।

আমরা যে সমস্ত বিদ্যাসুন্দর পাইয়াছি, তন্মধ্যে মৈমনসিংহের কবি—চৈতন্যের সমকালবর্ত্তী কঙ্কের বিদ্যাসুন্দরই প্রাচীনতম। এই কাব্যে কোনরূপ অশ্লীলতার গন্ধ নাই—ইহার ভাষা ও কবিত্ব উভয়ের প্রধান গুণ সারল্য। সহজ সুন্দর ভাষার এই উপাখ্যান বিবৃত হইয়াছে। সেই কাহিনীর সঙ্গে ভারতের বিদ্যাসুন্দরের অনেক স্থলে গরমিল আছে। আমরা পল্লী-গাথা প্রসঙ্গে কবি কঙ্কের সম্বন্ধে পুনরায় আলোচনা করিব।

কবিকঙ্ক ব্রাহ্মণের সন্তান হইয়াও চণ্ডাল গৃহে পালিত হইয়াছিলেন। জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ-কুলোজ্জ্বল গর্গের কন্যা লীলার সহিত কঙ্কের যে অনাবিল ও অপার্থিব প্রেম হইয়াছিল, তাহা একান্ত দোষলেশ শূন্য, রঘুসুত প্রমুখ কবিরা সেই প্রেমের বিচিত্র অপূর্ব্ব কবিত্ব মণ্ডিত করিয়া আঁকিয়া দেখাইয়াছেন (পূর্ব্ব বঙ্গগীতিকা, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় ভাগ)। কবিকঙ্ক চৈতন্যের সম কালবর্ত্তী এবং ১৬শ শতাব্দীর প্রথমভাগে জীবিত ছিলেন। তাঁহার বিদ্যাসুন্দরের লীলা ক্ষেত্র বর্দ্ধমান নহে, চম্পাদেশ। সুন্দর কাঞ্চীনগরের গুণসিন্ধু রাজার পুত্র নহে, পূর্ব্বদেশীয় মাল্যবান নামক রাজার পুত্র। তৎকৃত বিদ্যাসুন্দরের যে আত্মজীবনী আছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"পিতা বন্দি গুণরাজ মাতা বসুমতী। যার ঘরে জন্ম লইলাম আমি অল্পমতি॥ শিশুকালে বাপ মইল মাও গেল ছাড়ি।

পালিলা চণ্ডাল পিতা মোরে যত্ন করি॥ জ্ঞানমানে খাই অন্ন চণ্ডালের ঘরে। চণ্ডালিনী মাতা মোর পালিলা আদরে॥ গঙ্গার সমান তার পবিত্র অন্তর। সেও ত রাখিল মোর নাম কঙ্কধর॥ জনম অবধি নাহি হেরি বাপ মায়ে। শিশু শুইয়া মোরে তারা স্বর্গপুরী যায়॥ মুরারী চণ্ডাল পিতা পালে অন্ন দিয়া। পালিলা কৌশল্যা মাতা স্তন দুগ্ধ দিয়া॥ মুরারী আমার পিতা ভক্তির ভাজন। বার বার বন্দি তাই তাঁহার চরণ॥ গর্গ পণ্ডিতে বন্দুম পরম গিয়ানী। যার আশ্রমে থাকিয়া ধেনু চরাইতাম আমি॥ পুনঃ পুনঃ বন্দি আমি গর্গের চরণ। যার সম জ্ঞানী নাই এ তিন ভুবন॥ বেদ পুরাণ সার কণ্ঠে তাঁর গাঁথা। সাধনায় ঘরে বান্ধা সরস্বতী মাতা॥ বেদ বিধি শাস্ত্রে যার ক্ষমতা অপার। আর বার বন্দি গাই চরণ তাহার॥ শ্মশানের বন্ধু মোর দুঃসময় পাইয়া। জীবন করিলা দান পদে স্থান দিয়া॥ দুই দিন নাহি খাই অন্ন আর পানি। হাতে ধরি আশ্রমে লইলা মোরে মুনি॥ ক্ষীর সর দিলা মোরে গায়ত্রী জননী। মরিবার কালে মোর বাঁচাইলা প্রাণী॥ কান্দিয়া কহিছে কঙ্ক সভার চরণে। শুধিতে মায়ের ঋণ না পারি জীবনে॥ নদী মধ্যে বন্দি গাই রাজ রাজ্যেশ্বরী। তিয়াস লাগিলে যার পান করি বারি॥ তাহার পারেতে বইসা সুন্দর গেরাম। জন্মভূমি বন্দি গাই নাম বিপ্রগ্রাম।"

এই বিদ্যাসুন্দরের ভাষা অতি সরল ও মধুর ইহার অনেক স্থানে বেশ কবিত্ব আছে। পুস্তক খানি এখনও প্রকাশিত হয় নাই; একখানি হস্ত লিখিত পুথি আমার নিকট আছে। কঙ্কের বিদ্যাসুন্দর কালীকামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল বা অন্নদামঙ্গলের অন্তর্গত নহে। ইহা সত্যপীরের মাহাত্ম্য জ্ঞাপক একটি কাব্যের অন্তর্গত। বিপ্রগ্রামের প্রবাসী এক পীরের আদেশে কঙ্ক বিদ্যাসুন্দর রচনা করিয়াছিলেন। তিনি যখন এই কাব্য রচনা করেন তখন তাহার শৈশব অতিক্রান্ত হয় নাই। কাব্যখানি পূর্ব্বাঞ্চলে বিশেষতঃ মৈমনসিংহ জেলায় অত্যন্ত সমাদৃত হইয়াছিল এবং সেই সময়ে তরুণ বয়স্ক কবিকে পূর্ব্বদেশ বাসী হিন্দু মোসলমানের নিকট সুপরিচিত করিয়াছিল। গর্গ কৃত কঙ্ককে জাতিতে তোলার যে আন্দোলন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল তৎবিরুদ্ধে মৈমনসিংহ বাসী গোঁড়া ব্রাহ্মণেরা অতি ক্রোধে ষড়যন্ত্র বাধাইয়াছিলেন। তাহার ফলে অনেক দুর্ঘটনা হয়। সে সকল কথা বিস্তারিত ভাবে পল্লীগীতিকায় বর্ণিত হইয়াছে। এই ষড়যন্ত্রের দরুণ কঙ্কের বিদ্যাসুন্দর সমস্ত দেশ হইতে বিতাড়িত হয় এবং গোঁড়া হিন্দুরা ঘরে ঘরে উহা জ্বালাইয়া ফেলিলেন। কবি কঙ্কের মলয়ার বারমাশী শীর্ষক একটি পল্লীকথা আছে। তাহা তিনি বাঁশীতে গান করিতেন এবং বিপ্রগ্রামের সন্নিহিত বিশাল প্রান্তর ভূমি সেই সঙ্গিত ধারায় পরিপ্লুত হইত। এই পালা গানটি সম্পূর্ণ রূপে পাওয়া যায় নাই, যে টুকু পাওয়া গিয়াছে তাহা অতি করুণ ও মধুর।

কবি কঙ্কের পরে ১৫৯৫ খৃঃ অব্দে বিরচিত কায়স্থ কবি গোবিন্দদাস কৃত কালিকামঙ্গলের অন্তর্গত বিদ্যাসুন্দর উল্লেখ করা উচিত। স্থাননির্দ্দেশ এবং চরিত্রবর্গের নামকরণ প্রভৃতি বিষয়ে গোবিন্দদাসের বিদ্যাসুন্দরে অনেকটা স্বতন্ত্রতা দৃষ্ট হয়। গোবিন্দ কবির বীরসিংহ রত্নপুরের রাজা। ভারতচন্দ্রের সুন্দর কাঞ্চিপুর নিবাসী; গোবিন্দদাসের সুন্দরের বাড়ী গৌড়রাজ্যের অন্তর্গত কাঞ্চননগর। ভারতচন্দ্রের হীরামালিনী স্থলে গোবিন্দদাসের রম্ভামালিনীর নাম প্রাপ্ত হওয়া

যায়। গোবিন্দদাস চট্টগ্রামের অন্তর্গত দেবগ্রামবাসী ছিলেন। তাঁহার রচিত উপাখ্যান চট্টগ্রামের দুর্ভেদ্য অরণ্য ভেদ করিয়া রাঢ়দেশে পঁহুছিতে পারে নাই; সুতরাং ভারতচন্দ্র রায় এক শতাব্দীর পরবর্ত্তী লেখক হইলেও তদীয় গ্রন্থের প্রভাব ভারতচন্দ্রী বিদ্যাসুন্দরের উপর বিস্তৃত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। গোবিন্দদাসের বিদ্যাসুন্দরের শ্লীলতার অভাব আদৌ নাই। উহা কালী-মহাত্ম্যজ্ঞাপক ও ধর্ম্মতত্ত্ব পরিপূর্ণ। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান বহুপূর্ব্ব হইতে এতদ্দেশে প্রচলিত ছিল; হিন্দুলেখকগণ উহা ধর্ম্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাখিয়া চণ্ডীকাব্যের ন্যায় উহাতেও দেবমাহাত্ম্যজ্ঞাপক উপাখ্যান বর্ণন করিয়াছে। মুসলমানী যুগে লেখকগণ নামে মাত্র ধর্ম্মসংস্রব রক্ষা করিয়া মুসলমানী উপাখ্যানসমূহের ভাবের দ্বারা উহা বিকৃত করিয়াছেন। বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থের অনেক-স্থলে গোবিন্দদাস কবিত্বশক্তির যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। নিম্নে একটী শিবস্তোত্র উদ্ধৃত হইল :—

"রাগ গৌরী—গান্ধার।
জয় শিব শঙ্কর তহু গতি
জয় দেবনাথ জগত-তারণ চরণ-সরোরুহে বহু মিনতি॥
সুরনদী-চন্দ্রিম-মুকুট মালভুষণ ফণিমাল কুণ্ডল
সোহে শ্রুতি।
টলমল ত্রিনয়ন জ্বাল আধ মিলন
রজত-ধরাধর-অঙ্গদ্যুতি॥
সুররিপু ত্রিপুর হরদাহন-অবলেহন-সীতবরণ
শিব যোগপতি।
বিলসতি যোগভোগ ভববাসন দীন শরণ
রাগ—তুরী॥
নৌমি নন্দিকেশ ঈশ- কণ্ঠে কালকূট বিষ,
নীলকণ্ঠ নাম রাম দেবদেব বন্দনী।
অর্দ্ধঅঙ্গ গৌরীসঙ্গ, মৌলী কেলি চতুরঙ্গ,
অনঙ্গভঙ্গ অতিরঙ্গ, সোহি জহ্নুনন্দিনী॥
রঙ্গনাথ লোকপাল, অর্দ্ধভঙ্গ বাঘছাল,
ব্যোমকেশশেষ মাল ভালে ইন্দুমোহিনী॥"

অন্যান্য কবির বিদ্যাসুন্দর।

ভারতচন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী আর দুইখানি বাঙ্গলা বিদ্যাসুন্দর পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে ভারতের পদলালিত্য ও অপূর্ব্ব শব্দমন্ত্র নাই, কিন্তু দোষগুলি সমধিক পরিমাণে বিদ্যমান। এই দুইখানি বিদ্যাসুন্দর-প্রণেতা—কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদ। প্রাণরাম নামক এক কবি ভারতচন্দ্রের পর আর একখানি বিদ্যাসুন্দর লিখিয়া ছিলেন, তন্মধ্যে এই

কয়েকটি কথা আছে,—"বিদ্যাসুন্দরের এই প্রথম বিকাশ। বিরচিল কৃষ্ণরাম নিমতা যার বাস॥ তাঁহার রচিত পুঁথি আছে ঠাঁই ঠাঁই। রামপ্রসাদের কৃত আর দেখা পাই॥ পরেতে ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গলে। রচিলেন উপাখ্যান প্রসঙ্গের ছলে॥"

কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর অবলম্বন করিয়া ভারতচন্দ্র বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন;— এই অবলম্বন অর্থে একরূপ চৌর্য্যবৃত্তি। কিন্তু প্রতিভাবান্ ব্যক্তির পক্ষে ইহা দোষ নহে, প্রতিভাশালী ব্যক্তির কৃতিত্বের মূলে সংগ্রহ,—প্রতিভাবান্ ব্যক্তি উৎকৃষ্ট সংগ্রাহক নামে বাচ্য। প্রকৃতিতেও নূতন সৃষ্টি কিছু দেখা যায় না; শুষ্ক পল্লবের স্থলে নূতন পল্লবটির উৎপত্তি হইতেছে—উহা অতীতের পুনরাবির্ভাব মাত্র। পূর্ব্ববর্ত্তী বিদ্যাসুন্দরগুলির ভাব ও ভাষা ঘষিয়া মাজিয়া ভারতচন্দ্র সুন্দর করিয়াছেন; দোমেটে মূর্ত্তিতে রং ফিরাইলে যেরূপ দেখায়, পূর্ব্ববর্ত্তী বিদ্যাসুন্দরগুলির পরে ভারতচন্দ্রী বিদ্যাসুন্দরও ঠিক সেইরূপ দেখাইবে—নিম্ন তুলনার জন্য কতকাংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি,—

তুলনায় সমালোচনা।

১। "কহে এক সতী, সেই ভাগ্যবতী, সুন্দর এ পতি যার লো ঘটে॥ হৃদয় মাঝারে, রাখিয়া ইহারে, নয়ন দুয়ারে, কুলুপ দিয়া। রূপ নহে কালো, নিরখিতে ভাল, দেখ সখি আলো, আঁখি মুদিয়া॥ কহে রামা আর, গলে পরি হার, এ হার কি ছার, ফেলিলো টেনে। সাধ পুরে তবে, হেন দিন হবে, কোন্ জন কবে ঘটাবে এনে॥ কহে কোন আই, আমি যদি পাই, পলাইয়া যাই, এদেশ থেকে। নারী-কলাফাঁদে, বাঁধি নানা ছাঁদে, প্রাণ বড় কাঁদে, দেনা লো ডেকে॥"—রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর; নাগরী-উক্তি।

১। "আহা মরি যাই, লইয়া বালাই, কুলে দিয়া ছাই, ভজি ইহারে। যোগিনী হইয়ে, ইহারে লইয়ে, যাই পলাইয়ে, সাগর পারে॥ কহে এক জন, সয় মোর মন, এ নব রতন ভুবন মাঝে। বিরহে জ্বলিয়া, সোহাগে গলিয়া, হারে মিলাইয়া পরিলো সাজে॥ আর জন কয়, এই মহাশয়, চাঁপা ফুলময়, খোঁপায় রাখি। হলুদী জিনিয়া, তনু চিকণিয়া, স্নেহেতে ছানিয়া হৃদয়ে মাখি॥"—ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর; নাগরী-উক্তি।

২। "ডুবিল কুরঙ্গশিশু মুখেন্দু সুধায়। লুপ্ত গাত্র তত্র মাত্র নেত্র দেখা যায়॥ নাভিপদ্ম পরিহরি মত্ত মধুপান। ক্রমে ক্রমে বাড়িল বারণ কুম্ভ স্থান॥ কিবা লোমরাজি ছলে বিধি বিচক্ষণ। যৌবন কৈশোর দ্বন্দ্ব করিল ভজন॥" "কোন বা বড়াই কাম পঞ্চশর তূণে। কত কোটী খর শর সে নয়ন কোণে॥"—বিদ্যার রূপবর্ণনা, রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর।

২। "কাড়ি নিল মৃগ মদ নয়নহিল্লোলে। কাঁদেরে কলঙ্কী চাঁদ মৃগ লয়ে কোলে॥ নাভিপদ্মে যেতে কাম কুচ শম্ভুবলে। ধরিল কুন্তল তার রোমাবলী ছলে॥" "কে বলে শারদশশী সে মুখের তুলা। পদনখে পড়ে তার আছে কতগুলা॥" কেবা করে কামশরে কটাক্ষের সম। কটুতায় কোটী কোটী কালকূট সম॥"—ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর বিদ্যার রূপবর্ণনা।

৩। "উত্তম ঘটক সুন্দরের গাঁথা হার। বরকর্ত্তা কন্যাকর্ত্তা চিত্ত দোঁহাকার॥ পুরোহিত হইলেন আপনি মদন বিদ্যালাপ ছলে বুঝি পড়ালো বচন॥ উলু দিছে ঘন ঘন পিক সীমন্তিনী। নয়ন চকোর সুখে নাচিছে নাচনী। বরযা মলয় পবন বিধুবর। মধুকর নিকর হইল বাদ্যকর॥ উভয়ত কুটুম্ব রসনা ওষ্ঠাধর। পরস্পর ভুঞ্জে সুধা মুখেন্দু উপর

নূপুর কিঙ্কিণী জালে নানা শব্দ হয়। দুই দলে দ্বন্দ্ব যেন চন্দনসময়॥ সস্ত্রীক আইল কাম দেখিতে কৌতুক। দম্পতীরে পঞ্চশর দিলেন যৌতুক॥"—গন্ধর্ব্ববিবাহ, রামপ্রসাদী বিদ্যাসুন্দর।

৩। "বিবাহ নহিলে হয় কেমনে বিহার। গন্ধর্ব্ব বিবাহ হৈল মনে আঁখি ঠার॥ কন্যাকর্ত্তা হৈল কন্যা বরকর্ত্তা বর। পুরোহিত ভট্টাচার্য্য হৈল পঞ্চশর॥ কন্যাযাত্র বরযাত্র ঋতু ছয় জন। বাদ্য করে বাদ্যকর কিঙ্কিণী কঙ্কণ॥ নৃত্য করে বেশরে নূপুরে গীত গায়। আপনি আসিয়া রতি এয়ো হৈল তায়॥ ধিক ধিক অধিক আছিল সখী তায়। নিশ্বাস আতসবাজি উত্তাপে পলায়। নয়ন অধর কর জঘন চরণ। দুহাঁর কুটুম্ব সুখে করিছে ভোজন॥"—গন্ধর্ব্ববিবাহ, ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর।

৪। "কেমন পণ্ডিত বাপা জানা কিছু চাই। রাজা বলে কাট চোরে মশানে বাধাই। আঁখি ঠেরে আর বার করে নিবারণ।"—রাজসভায় সুন্দর, রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর।

৪। "চাহে কাটিতে কোটাল চাহে কাটিতে কোটাল। নয়ন ঠারিয়া মানা করে মহীপাল॥"—ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর।

৫। "অগুরু চন্দন চুয়া চাইতে চাইতে। চক্ষু ঠিকরিয়া যায় আছে কি পাইতে॥ জায়ফল লবঙ্গ প্রসাদ মাত্র নাই। আনিয়াছি কিন্তু কিছু বলি আমি তাই॥"—মালিনীর বেসাতি; কৃষ্ণরামের বিদ্যাসুন্দর।

৫। আটপণে আধ সের আনিয়াছি চিনি। অন্য লোকে ভুরা দেয় ভাগ্যে আমি চিনি॥ দুর্লভ চন্দন চুয়া লঙ্গ জায়ফল। সুলভ দেখিনু হাটে নাহি যায় ফল॥"—ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর।

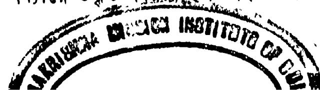
৬। বুঝিযা বিদ্যার মনে বাড়িল আহ্লাদ। হেনকালে ময়ূর করিল কেকানাদ॥ সুন্দর কেমন কবি বুঝিতে পদ্মিনী। সখীরে জিজ্ঞাসা করে কি ডাকে সজনি॥"—প্রথম মিলন, কৃষ্ণরামের বিদ্যাসুন্দর।

৬। "হেনকালে ময়ূর ডাকিল গৃহপাশে। কি ডাকে বলিয়া বিদ্যা সখীরে জিজ্ঞাসে॥"—ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর।

কৃষ্ণরামের হাতে বিদ্যাসুন্দর একমেটে, রামপ্রসাদের হাতে দোমেটে এবং ভারতচন্দ্রের হাতে বিদ্যাসুন্দরের রং ফিরান হইয়াছিল। কংস-সভায় শ্রীকৃষ্ণ কংসকে বধ করিতে গেলে তৎপ্রসঙ্গে ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন,—"কংসের গায়ন যারা, যে বীণা বাজায় তারা, বীণা যে গোবিন্দ গুণ গায়।" কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদের বীণায় যে গান উত্থিত হইয়াছিল, তদ্দ্বারাও সেইরূপ পদার্পণমাত্র অতুল সৌভাগ্য-শালী ভারতচন্দ্রের গুণ কথাই জ্ঞাপিত হইল। পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদ্বয় ন্যায্য প্রশংসা হইতে বঞ্চিত হইয়া হতাদৃত অবস্থায় শ্মশানে সুপ্ত হইলেন এবং সমালোচকবর্গের জন্য এই নীতি-সূত্র ফেলিয়া গেলেন,—ভাগ্যবৃক্ষই সর্ব্বত্র ফল ধারণ করে, পরিশ্রম অনেক সময় কাঁটা বনের ন্যায় পদতল বিক্ষত করে মাত্র। আমরা এস্থলে কৃষ্ণরাম, রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের জীবন সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

কৃষ্ণরামদাস ১৬৬৩ খৃঃ।

কবি কৃষ্ণরামদাস অনুমান ১৬৬৬ খৃঃ অব্দে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বেলঘরিয়া ষ্টেশনের আধ ক্রোশ পূর্ব্বে নিমৃতাগ্রামে কায়স্থকুলে জন্ম গ্রহণ করেন; তাঁহার পিতার নাম ভগবতীচরণ দাস। ১৬৮৬ খৃঃ অব্দে তিনি এক দিবস জনৈক গোয়ালের ঘরে রজনী অতিবাহিত করেন, সেই রজনীতে ব্যাঘ্রপৃষ্ঠে চড়িয়া দক্ষিণরায় নামক সুন্দর-বনবাসী দেবতা তাঁহাকে তৎসম্বন্ধীয় কাব্য-রচনা করিতে স্বপ্নে আদেশ দেন, আমরা "রায়মঙ্গল" হইতে সেই অংশ পূর্ব্বের এক অধ্যায়ে উদ্ধৃত করিয়াছি। এই কাব্যরচনার পর কবি বিদ্যাসুন্দর রচনা



করেন, ইহা তাঁহার 'কালিকামঙ্গলের' অন্তর্গত। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কৃষ্ণরামকবির বিদ্যাসুন্দরের যে হস্তলিখিত পুঁথি পাইয়াছেন, তাহা ১১৫৯ সালের লেখা। এই পুঁথি নকল করিবার সময়ও ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের রচনা শেষ হয় নাই,—সম্ভবতঃ কৃষ্ণরামের কাব্য ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত দুইখানি কাব্য ছাড়া কৃষ্ণরাম "অশ্বমেধপর্ব্বে"র একখানি অনুবাদ প্রণয়ন করেন। কবি কৃষ্ণরাম চৈতন্যোপাসক ছিলেন বলিয়া বোধ হয়, তিনি চৈতন্যবন্দনায় লিখিয়াছেন—"যথায় কীর্ত্তিত হয় চৈতন্য চরিত্র। বৈকুণ্ঠ সমান ধাম পরম পবিত্র॥ তাহে গড়াগড়ি দেয় (যেবা) প্রেমে নৃত্য করে। জীবন স্বকৃতি তার ধন্য দেহ ধরে॥ হেলায় শ্রদ্ধায় জীব কণ্ঠী ধরে যত। তাহা সবাকারে মোর প্রণাম শত শত॥" *

রামপ্রসাদ সেন।

বৈদ্যবংশোদ্ভব রামপ্রসাদ সেন হালিসহর অন্তঃপাতী কুমারহট্টগ্রামে ১৭১৮-১৭২৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রামরাম সেন। † রামরাম সেনের দুই বিবাহ; প্রথম পক্ষে নিধিরাম নামক পুত্র, ও দ্বিতীয় পক্ষে অম্বিকা ও ভবানী নাম্নী কন্যাদ্বয় এবং রামপ্রসাদ ও বিশ্বনাথ নামক পুত্রদ্বয় জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতানিবাসী লক্ষ্মীনারায়ণদাসের সঙ্গে রামপ্রসাদের দ্বিতীয়া ভগিনী ভবানীর পরিণয় হয়,—এই ভগিনীর দুই পুত্র জগন্নাথ ও কৃপারামের নাম কবি উল্লেখ করিয়াছেন। রামপ্রসাদের রামদুলাল ও রামমোহন নামে দুই পুত্র এবং পরমেশ্বরী ও জগদীশ্বরী নাম্নী দুই কন্যা হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত কবি তাঁহার পিতামহ রামেশ্বর এবং বংশের আদি পুরুষ কৃত্তিবাসের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার কাব্যে আরও জানিতে পারি যে রামপ্রসাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ধনাঢ্য ও প্রসিদ্ধ ছিলেন;—"শিশুকালে মাতা মৈল রাজ্য নিল চোরে" বলিয়া কবি আক্ষেপ করিয়াছেন। কবির প্রিয় পুত্র রামদুলালের বংশ লুপ্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় পুত্র রামমোহনের পৌত্র ও কবির বৃদ্ধপ্রপৌত্র শ্রীযুক্ত বাবু কালীপদ সেন কিছু দিন পূর্ব্বেও জীবিত ছিলেন। ইনি উড়িষ্যার অন্তর্গত আঙ্গুলে ইঞ্জিনিয়ারের কর্ম্ম করিতেন। তাঁহার দুই পুত্রের একজন ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও অপরটি সদাগরী অফিসে কর্ম্ম করেন। গত পনের বৎসর যাবৎ হালিসহরে কবির জন্মতিথিতে মেলা হইয়া থাকে। রামপ্রসাদ সেন কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজার সমসাময়িক। এই গুণজ্ঞ রাজা ১৭৫৮ খৃঃ অব্দে রামপ্রসাদকে ১০০/ বিঘা ভূমি নিষ্কর দান করেন, তাহাতে লেখা আছে "গড় আবাদি জঙ্গল ভূমি আবাদ করিয়া পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগ দখল করিতে রহ।" যে বৎসর ইংরেজগণ পলাশীক্ষেত্রে জাতীয় সৌভাগ্যধ্বজা প্রথম উত্থিত করেন, তাহার

* মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের "কবি কৃষ্ণরাম" শীর্ষক প্রবন্ধ, সাহিত্যে ১৩০০ সন, ২য় সংখ্যা ১১৭ পৃঃ।

† "রাম রাম সেন নাম, মহাকবি গুণধাম সদা যারে সদয় অভয়া। তৎসুত রামপ্রসাদে, কহে কোকনদপদে কিঞ্চিৎ কটাক্ষে কর দয়া"—কবিরঞ্জন।

এক বৎসর পরে এই দানপত্র লিখিত হয়। কৃষ্ণচন্দ্র অনেক সময় কুমারহট্টে আসিতেন, তিনি রামপ্রসাদকে 'কবিরঞ্জন' উপাধি দিয়াছিলেন ও তাঁহাকে রাজ সভায় আনিতে আগ্রহ দেখাইতেন, কিন্তু বিষয়নিস্পৃহ কবি স্বীয় পল্লীতে বসিয়া শ্যামা-সংগীত গানে নিজে মুগ্ধ থাকিতেন ও অপর সকলকে মুগ্ধ করিতেন, তিনি কৃষ্ণচন্দ্রের অনুরোধ পালন করেন নাই। কবি লিখিয়াছেন, কুমারহট্টে, রামকৃষ্ণের মণ্ডপে তিনি সিদ্ধিকামনায় যোগ অনুষ্ঠান করিতেন, কিন্তু কোন দৈব ঘটনাহেতু সম্পুর্ণ সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই। এ বিষয়ে নিজের অপেক্ষা তাঁহার স্ত্রীর পুণ্যবল বেশী ছিল বলিয়া কবি বারংবার উল্লেখ করিয়াছেন,—"ধন্য দারা, স্বপ্নে তারা, প্রত্যাদেশ তারে। আমি কি অধম এত বিমুখ আমারে॥ জন্মে জন্মে বিকায়েছি পাদপদ্মে তব। কহিবার নহে তাহা সে কথা কি কব।"

কথিত আছে, রামপ্রসাদ জনৈক ধনী ব্যক্তির সেরেস্তায় মুহুরিগিরি করিতেন। জমীদারী সেরেস্তার হিসাবের অরণ্যে পথহারা পান্থের ন্যায় কবি মধ্যে মধ্যে হিসাবপত্রের ধারে দুই একটি গান লিখিয়া শ্রম লাঘব করিতেন। একদিন জমীদার মহাশয় সেরেস্তা পরিদর্শনের সময় মুহুরির হিসাবের খাতায়,—"আমায় দে মা তসিলদারী। আমি নেমকহারাম নই শঙ্করী॥" প্রভৃতি পদ পড়িয়া চমৎকৃত হইলেন, ও কবিকে ৩০ টাকা পেন্সন দিয়া ঘরে যাইয়া শ্যামা সংগীত লিখিতে উপদেশ দিলেন। তদবধি কবি কুমারহট্ট গ্রামে তাঁহার সংগীতমুক্তাবলী ছড়াইতে লাগিলেন। শৃঙ্খল-বিমুক্ত পক্ষীর ন্যায় কবি প্রকৃতির ক্রোড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সুধামাখা গানে জগৎকে সুখী করিলেন।

প্রাগুক্ত ব্যক্তি ভিন্ন আর একজন ধনী ব্যক্তি তাঁহাকে কাব্য লিখিতে উৎসাহ দান করিয়াছিলেন, ইঁহার নাম রাজকিশোর মুখোপাধ্যায়। ইনি কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজার পিসা শ্যামাসুন্দর চট্টোপাধ্যায়ের জামাতা ছিলেন; কবি এই রাজকিশোর মুখোপাধ্যায়ের আদেশে "কালীকীর্ত্তন" রচনা আরম্ভ করেন; সে কথা তিনি নিজেই লিখিয়াছেন,—"শ্রীরাজকিশোরাদেশে শ্রীকবিরঞ্জন। রচে গান মোহান্ধের ঔষধ অঞ্জন॥" ভারতচন্দ্রও এই রাজকিশোর মহাশয়ের গুণ জ্ঞাপক এক পংক্তি কবিতা লিখিয়াছেন— "মুখ রাজকিশোর কবিত্ব কলাধার।"—(অন্নদামঙ্গল)। ১৭৭৫ খৃঃ অব্দে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যুতে সাত বৎসর পূর্ব্বে যে বৎসর রোহিলাদিগকে উৎসন্ন করিয়া ইংরেজ-সৈন্য প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছিলেন, সেই বৎসর রামপ্রসাদের মৃত্যু হয়।

কেহ কেহ বলেন রামপ্রসাদের রচিত 'বিদ্যাসুন্দর', তাঁহার 'কালিকামঙ্গলে'র অন্তর্গত। এরূপ হওয়া বিচিত্র নহে। কারণ বিদ্যাসুন্দরকাব্যখানি কবিগণের সকলেই কালীনামাঙ্কিত মলাটে পূরিয়া শোধন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কৃষ্ণরামের বিদ্যাসুন্দরের নাম 'কালিকামঙ্গল', ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর 'অন্নদামঙ্গলের' অন্তবর্ত্তী। এই মতের বিরুদ্ধে আমাদের একমাত্র ও অতি গুরুতর আপত্তি এই যে 'কালিকামঙ্গল' পাওয়া যায় নাই। 'কালীকীর্ত্তন' ও 'কালিকামঙ্গল' এক কাব্য

বলিয়া বোধ হয় না ; 'কালীকীর্ত্তন' একখানি গীতিকাব্য, ইহার মধ্যে বিদ্যাসুন্দরের পালার স্থা নির্দ্দিষ্ট থাকা সম্ভাবিত নহে।

রামপ্রসাদ কোন স্থলেই মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কি তাঁহার বৃত্তিদাতা জমীদার মহাশয়ের নাম উল্লে করেন নাই ; রাজকিশোর মুখোপাধ্যায়ের আজ্ঞাক্রমে কালীকীর্ত্তন লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলে সুতরাং বাধ্য হইয়া তাঁহার নামটি উল্লেখ করিয়াছেন ; কিন্তু তাহাও অতি সংক্ষেপে ও সম্পূর্ণভা উল্লিখিত হইয়াছে। যে সময় রায়গুণাকর প্রভৃতি কবিগণ আশ্রয়দাতাদিগকে কল্পনার স্ব খট্টায় স্থাপিত করিয়া স্বর্গ-মর্ত্ত্যের যাবতীয় উপমার উপঢৌকন দিতেছিলেন, সেই সম রামপ্রসাদের তোষামোদবৃত্তির প্রতি এই সরল সগর্ব্ব উপেক্ষা প্রশংসনীয় বলিয়া স্বীকা করিতে হইবে।

রামপ্রসাদের গানের এক শত্রু ছিল, তাঁহার নাম আজু গোসাঞি। ইনি রামপ্রসাদী গানে সময়ে সময়ে যে টিপ্পনী করিতেন, তাহা বেশ হাস্যরসোদ্দীপক, যথা রামপ্রসাদের গান,— "এ সংসার ধোকার টাটী। ও ভাই আনন্দ বাজারে লুটি। ওরে ক্ষিতি বহ্নি বায়ু জল শূন্যে অতি পরিপাটী॥"- তদুত্তরে আজু গোসাঞের গান,—"এই সংসার রসের কুটী, খাই দাই রাজত্বে বসে মজা লুটি। ওহে সেন নাহি জ্ঞা বুঝ তুমি মোটামুটি। ওরে ভাই বন্ধু দারা সুত, পিঁড়ি পেতে দেয় দুধের বাটী॥"

রামপ্রসাদের সঙ্গে সিরাজোদ্দৌলার সাক্ষাৎ এবং তাঁহার গান শুনিয়া নবাববাহাদুরের অনুগ্র প্রকাশ সম্বন্ধে প্রবাদ আছে। ধর্ম্মসম্বন্ধে কাহারও একটু প্রসিদ্ধি হইলে তৎসম্পর্কে কতক গুলি অলৌকিক প্রবাদের উৎপত্তি হওয়া স্বাভাবিক। কালী কন্যারূপে কবির বেড়া বাঁধিয় দিয়াছিলেন ; কাশীতে যাইতে অনুমতি দিয়া পথ হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন ; কালী নাম করিতে করিতে ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ হইয়া তাঁহার তনুত্যাগ হয় ;—এই সব জনশ্রুতিক বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়া ছাপাইতে অনেক সময় এবং ব্যয় আবশ্যক, তাহা আমাদের এখন আয়ত্ত নাই।

যাঁহারা তৎকালীন রাজ-সভার দূষিত রুচির সান্নিধ্যে ছিলেন, তাঁহাদের কেহ কেহ স্বভাবতঃ ধর্ম্মপ্রবণতা সত্ত্বেও কথঞ্চিৎ সংক্রামিত না হইয়া যান নাই,—ইহার সাক্ষী রামপ্রসাদ। আমরা রামপ্রসাদের নির্ম্মল ভক্তিবিহ্বলতায় মুগ্ধ, তাঁহার উন্নত-চরিত্রের সর্ব্বদা পক্ষপাতী ; কিন্তু ইহা সত্ত্বেও তৎপ্রণীত বিদ্যাসুন্দরের বীভৎস রুচির সমর্থন করিতে প্রস্তুত নহি ; ভারতচন্দ্রের রচনা যে গর্হিত রুচি-দোষ-দুষ্ট, রামপ্রসাদ তাহার পথপ্রবর্ত্তক। ভারতচন্দ্রের মত রামপ্রসাদ বীভৎস আদিরসপূর্ণ কবিতা আপাতসুন্দর করিয়া দেখাইতে পারেন নাই ; কিন্তু তাহা শক্তির অভাব জন্য,—ইচ্ছার ত্রুটি-হেতু নহে।

রামপ্রসাদী বিদ্যাসুন্দর।

রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরের অপর নাম 'কবিরঞ্জন'। 'কবিরঞ্জনে' রামপ্রসাদের সংস্কৃত-বিদ্যার যথেষ্ট পরিচয় আছে, কিন্তু তাঁহার সংস্কৃত বিদ্যার উত্তম পরিপাক হয় নাই ; বাঙ্গালা পদগুলির মধ্যে সংস্কৃত কথাগুলির উত্তম সমন্বয় হয় নাই, —উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি স্থল তুলিতেছি,—"সহজে কলঙ্কী সে তবাস্য সম নহে।" "জলে স্থলে চান্তরীক্ষে।" "ক্ষেপ করে দশদিক্ষু লোষ্ট্র বিবর্দ্ধন।" পূর্ণচন্দ্র শোভা যেন পিবতি চকোর।" কালীকীর্ত্তনে,—"বারে বারে ডাকে রাণী জননী জাগৃহি জাগৃহি। াগত ভানু রজনী চলি যায়। উঠ উঠ প্রাণ গৌরী, এই নিকটে গিরি, উঠগো এবমুচিতমধুনা তব নহি নহি। স্থ মাগধ বন্দী, কৃতাঞ্জলী কথয়তি, নিদ্রাং জহিহি জহিহি॥" এইরূপ সংস্কৃত পদের প্রভাবে বাঙ্গালা কবিতা একান্ত শ্রুতিকটু হইয়া গিয়াছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ এবং রামপ্রসাদ সংস্কৃতের সঙ্গে বাঙ্গালা মিশাইতে যাইয়া উৎকট পদাবলীর সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু রামপ্রসাদ যে স্থলে শিক্ষার অভিমান ত্যাগ করিয়াছেন,—সে স্থলে তিনি বাগ্দেবীর আদরের কবি ; তাঁহার গানে প্রাণের কথা সহজ ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে ; এই যুগের শিক্ষিত সমাজের রুচি মুন্সীয়ানা বিদ্যা বুদ্ধি দেখাইতে ব্যগ্র ছিল, এই দুষ্ট রুচির সংক্রমণে যখন রামপ্রসাদের ন্যায় ভাবপ্রধান কবিকেও আমরা লোকমনোরঞ্জনার্থ শব্দ লইয়া নিষ্ফল ক্রীড়া করিতে দেখি, তখন আমাদের ইডেন উদ্যানে এডাম এবং ইভেন মনোরঞ্জনার্থ হস্তীর চেষ্টা মনে পড়ে—

"The unwieldy elephant,
To make thei mirth used all his might and wreathed
His lithe proboscis"—Paradise Lost ; Book IV.

রামপ্রসাদ বিদ্যাসুন্দরের ভাষাকে অলঙ্কার পরাইয়া সুন্দরী করিতে চেষ্টা করিয়াছেন ; "গোযুগে গলিত ধারা তৃষ্ণা নিষ্ঠাগত" প্রভৃতি ভাবে অনুপ্রাস বন্ধন দেখিয়া মনে হয় যেন উন্মত্তা রাধিকার * ন্যায় তিনি পদের অলঙ্কার কণ্ঠে ও কণ্ঠের ফুল চুলে সংলগ্ন করিয়াছেন, ভারতচন্দ্র সেই সব অলঙ্কার লইয়া ভাষাকে সাজাইয়াছেন;—একটু সাধারণ সৌন্দর্য্যবোধের অভাবে রামপ্রসাদের বিরাট চেষ্টা পণ্ড হইয়া গিয়াছে, সেই পণ্ডশ্রমের শ্মশানে অদ্য ভারতচন্দ্রের যশোমন্দির উত্থিত হইয়াছে।

---

* "রাই সাজে বাঁশী বাজে না পড়িল উল। কি করিতে কি না করে সব হৈল ভুল॥ মুকুরে আঁচরে রাই বাঁধে কেশ ভার। পদে বাঁধে ফুলের মালা না করে বিচার॥ করেতে নূপুর পরে জঙ্ঘে পরে তাড়। গলাতে কিঙ্কিণী পরে কটিতটে হার॥ চরণে কাজর পরে নয়নে অলক্তা। হিয়ার উপরে পরে বঙ্করাজ পাতা॥ শ্রবণে পরয়ে রাই বেশর-সাজনা। নয়ন উপরে করে বেণীর রচনা॥ বংশীস বলে যাই বলিহারি। রাই-অনুরাগের বালাই লয়ে মরি॥"

কিন্তু শিক্ষার ধূম্রপটের পুঞ্জীকৃত আঁধার ভেদ করিয়া মধ্যে মধ্যে রামপ্রসাদের কতকগুলি সুন্দর কবিত্ব-পূর্ণ রচনা দৃষ্ট হয়। মেঘ-বিমুক্ত কিরণ-রাশির ন্যায় সেই সব স্থল তৃপ্তিপ্রদ; আমরা কালীকীর্ত্তন ও কৃষ্ণকীর্ত্তন হইতে দুইটি স্থল উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি,—

কালীকীর্ত্তন ও কৃষ্ণকীর্ত্তন।

(১) "গিরিবর আর আমি পারি না হে প্রবোধ দিতে উমারে। উমা কেঁদে করে অভিমান, নাহি করে স্তন পান, নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে॥ অতি অবশেষ নিশি, গগনে উদয় শশী, বলে উমা ধরে দে উহারে। কাঁদিয়া ফুলাল আঁখি, মলিন ও মুখ দেখি, মায়ে ইহা সহিতে কি পারে। আয় আয় মা মা বলি, ধরিয়া কর অঙ্গুলী, যেতে চায় না জানি কোথা রে॥ আমি বলিলাম তায়, চাঁদ কি রে ধরা যায়, ভূষণ ফেলিয়া মোরে মারে॥"—কালীকীর্ত্তন।

(২) "প্রথম বয়সে রাই রসরঙ্গিণী। ঝলমল তনুরুচি স্থির সৌদামিনী॥ রাই বদন চেয়ে ললিতা বলে। রাই আমার মোহন মোহিনী॥ রাই যে পথে প্রয়াণ করে, মদন পলায় ডরে। কুটিল কটাক্ষ শরে জিনিল কুসুম শরে॥ কিবা চাঁচর সুন্দর কেশ, সখি বকুলে বানাইল বেশ। তার গন্ধে অলিকুল, হইয়া আকুল, কেশে করেছে প্রবেশ। নব-ভানু ভালেতে বিকাশ, মুখপদ্ম করেছে প্রকাশ॥"—কৃষ্ণকীর্ত্তন।

রামপ্রসাদ বৈষ্ণব-বিদ্বেষী ছিলেন। বৈষ্ণব-নিন্দায় একটু-ক্ষিপশক্তি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা এইরূপ,—"খাসা চীরা বহির্বাস রাঙ্গা চীরা মাথে। চিকণ ধড়ী গায় বাঁকা কোঁৎকা হাতে॥ মুণ্ড গুম্ফ ছড়া গলে ঠাঁই ঠাঁই ছাব। দুই ভাই ভজে তারা সৃষ্টিছাড়া ভাব॥ পৃষ্ঠদেশে গ্রন্থ ঝোলে খান সাত আট। ভেকা লোকে ভুলাইতে ভাল জানে ঠাট। এক এক জনার সঙ্গেতে ধুমড়ী দুটি দুটি। দু চক্ষু লাল গাঁজাধুনিবার কুটি॥ ভুগিলামি ভাবে ভাব জন্মে থেকে থেকে॥ বীরভদ্র অদ্বৈত বিষম ডেকে উঠে॥ সে রসে রসিক নবশাক লোক যত। উঠে ছুটে পায়ে পড়ে করে দণ্ডবত॥ সমাদরে কেহ নিয়া যায় নিজ বাড়ী। ভালতে সেবা চাই পড়ে তাড়াতাড়ি॥ গোষ্ঠিশুদ্ধ খাড়া থাকে বাবাজীর কাছে। মনে মনে ভয় অপরাধী হয় পাছে॥"—বিদ্যাসুন্দর।—আধুনিক কালের এক জন সুপ্রসিদ্ধ কবি শৈব এবং শক্তি সন্ন্যাসিগণের যে বর্ণনা দিয়াছেন,—তাহা পূর্ব্বোদ্ধৃত কবিতাটির উত্তর বলিয়া গণ্য হইতে পারে, যথা—দিন দুপুরে সন্ন্যাসীদল এসে জুটি। "হর হর" এই রবেতে সে ঘর পুরিল॥ গুরু তাদের দীর্ঘাকৃতি নাম "অহংকার"। বিভূতিভূষিত অঙ্গ মাথায় টাক্তার॥ পদ্মের পলাশ নয়ন দুটি আরক্ত নেশায়। ঢালে, সাজে সাজে ঢালে,—সদাই গাঁজা খায়॥ হাতে চিমটে গলে গাঁথা রুদ্রাক্ষবিশাল। গাঁজায় দেয় দম্ বলে ব্যোম ব্যোম, সদা বাজায় গাল। অভিমানের হাঁড়ি জেন নরে হেয় জ্ঞান জ্ঞানের তত্ত্ব সেই বুঝেছে আর সবে অজ্ঞান॥ পাঁচটি চেলা পাঁচটি অসুর এমনি বলবান। চক্ষুগুলি কুঁচের মত, বয়সে জোয়ান॥ বাহুগুলি লোহার গোলা তাতে মাখা ছাই। খেয়ে উদম ধর্ম্মের ষাঁড় সম কিছুই চিন্তা নাই। ধর্ম্মের ধার কেউ ধারে, কাজের মধ্যে তিন। গাঁজা টানে, ভিক্ষা আনে, কুস্তীতে প্রবীণ। অপভাষায় ছাই কথা কয় শুনে সরম লাগে। পাশে পাশে, স্ত্রীলোক বসে, মনে তা না জাগে॥"

কালীকীর্ত্তনে রামপ্রসাদ কালীঠাকুরাণীকে দিয়া নৃত্যকরাইয়াছেন, তাঁহার রাসলীলা ও গোষ্ঠ বর্ণনা করিয়াছেন; তাঁহার আরাধ্যা দেবতা যে কৃষ্ণোচিত সকল কার্য্যই করিতে পারেন, কালীকীর্ত্তন দ্বারা তিনি এই তত্ত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কার 'রাসলীলা' ও 'গোষ্ঠ'-বর্ণনা পড়িয়া



বলরাম ও গাভী

শাক্তমহাশয়গণ অবশ্যই প্রীত হইয়াছিলেন, কিন্তু আজুগোসাঞি এই মধুরভাবে একটুকু বিদ্রূপের অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাদের গাঢ় রসসম্ভোগে বাধা দিয়াছিলেন ; যথা—"না জানে পরম তত্ত্ব, কাঁঠালের আমসত্ত্ব, মেয়ে হয়ে ধেনু কি চরায় রে। তা যদি হইত, যশোদা যাইত, গোপালে কি পাঠায় রে।" স্ত্রীলোকের যদি গোষ্ঠে যাইতে বিধান থাকিত, তবে স্নেহাতুরা যশোদা গোপালের গোষ্ঠ-গমনে সম্মত না হইয়া নিজেই যাইতেন। 'কৃষ্ণকীর্ত্তন' সম্পূর্ণ পাওয়া যায় নাই, যে দুই পৃষ্ঠা পাওয়া গিয়াছে, তাহা অতি মধুর।

কিন্তু রামপ্রসাদের যশঃ কাব্যরচনার জন্য নহে ; তিনি গান রচনা করিয়া এক সময় বঙ্গদেশ মাতাইয়াছিলেন, তাহাতে কালীদেবী স্নেহময়ী মাতার ন্যায় চিত্রিত হইয়াছেন, কবি মা-সম্বল শিশুর ন্যায় মধুর গুন্ গুন্ স্বরে কখন তাঁহার সহিত কলহ করিতেছেন, কখনও মায়ের কর্ণে সুধামাখা স্নেহকথা বলিতেছেন ; জননীর ক্ষিপ্ত ছেলের মত কখনও মাকে গালি দিতেছেন—সেই কপট গালি—স্নেহ, ভক্তি ও আত্মসমর্পণের কথা-মাখা,—এখানে রামপ্রসাদ সংস্কৃতে ব্যুৎপন্ন কবি নহেন, এখানে তাঁহার ধূলিধূসর নেংটা শিশুর বেশ, —শিশুর কথা,—তাহা পণ্ডিত ও কৃষকের তুল্য-বোধগম্য ; সেই সংগীতের সরল অশ্রুপূর্ণ আব্দারে সাধক-কণ্ঠের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। শিশু যেমন মায়ের হাতে মা'র খাইয়া 'মা', 'মা', বলিয়া কাঁদিয়া মায়ের কোলে যাইতে চায়, রামপ্রসাদও সেইরূপ সাংসারিক দুঃখ কষ্ট সমস্ত মায়ের দান জানিয়াও 'মা', 'মা', বলিয়া কাঁদিয়া তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াছেন, সেই নির্ভর-মিষ্ট সকরুণ গীতিমালা অত্যধিক হৃদয়াবেগে চিরপবিত্র হইয়া রহিয়াছে। আমরা গীতিশাখায় এই গানের বিষয় আবার সংক্ষেপে আলোচনা করিব। রামপ্রসাদ তাঁহার বিদ্যাসুন্দরে লিখিয়াছেন,—"গ্রন্থ যাবে গড়াগড়ি গানে হব ব্যস্ত।" তাঁহার রচিত কাব্য প্রকৃত পক্ষেই ভারতচন্দ্রীয় বিদ্যাসুন্দর দ্বারা পরাভূত হইয়া আজ ধূলায় গড়াগড়ি যাইতেছে,—তিনি তাহা ফেলিয়া গানে ব্যস্ত হইয়াছিলেন, বঙ্গের লোকগণও কাব্য ফেলিয়া তাঁহার গানগুলি লইয়া ব্যস্ত হইয়াছিল,—"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।"

প্রসাদী সংগীত।

ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর অনুমান ১৭১২ খৃঃ অব্দে ভুরসুট পরগণাস্থ হুগলীর অন্তর্গত পেঁড়ো বসন্তপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ রায় ভুরসুটের জমীদার ছিলেন, তিনি 'রাজা' উপাধি পাইয়াছিলেন। কথিত আছে কোন ভূমি-সংক্রান্ত সীমানির্ণয়ের তর্ক উপলক্ষে নরেন্দ্রনারায়ণ রায় বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রের মাতা মহারাণী বিষ্ণুকুমারীর প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করেন। মহারাণী এই সংবাদে ক্রুদ্ধ হইয়া আমলচন্দ্র ও ক্ষেমচন্দ্র নামক রাজপুত সেনাপতিদ্বয়কে নরেন্দ্রনারায়ণের বিরুদ্ধে পাঠাইয়া দেন ; তাহারা বহুসৈন্য লইয়া নরেন্দ্র রায়ের অধিকারস্থ 'ভবানীপুরগড়' ও 'পেঁড়োর গড়' প্রভৃতি স্থান বলপূর্ব্বক দখল করিয়া লয়।

ভারতচন্দ্র—১৭২২ খৃঃ।

নরেন্দ্র রায় ইহার পর অতি দরিদ্র হইয়া পড়িলেন। ভারতচন্দ্র তাঁহার মাতুলালয় 'নাওয়াপাড়া' গ্রামে যাইয়া তাজপুরস্থ টোলে কিছুকাল সংস্কৃত পড়িলেন, এবং অবশেষে মণ্ডলঘাট পরগণার সারদা-গ্রামে কেশরকুনি আচার্য্যদের বাড়ীর একটি কন্যার পাণিগ্রহণ করেন; তাঁহার পিতা মাতা ও ভ্রাতৃগণ এই বিবাহে তাঁহার উপর বিশেষ বিরক্ত হইয়াছিলেন, বিবাহের সময় তাঁহার ১৪ বৎসর মাত্র বয়স ছিল। গুরুগণ কর্তৃক তিরস্কৃত অভিমানী কবি গৃহত্যাগ করিয়া হুগলীর অন্তর্গত দেবা-নন্দপুরনিবাসী রামচন্দ্র মুন্সী নামক জনৈক ধনাঢ্য-কায়স্থের শরণাপন্ন হন, তাঁহার আনুকুল্যে তিনি ফারশি শিক্ষা করেন। এই মুন্সী মহাশয়ের বাড়ীতে সত্যনারায়ণের পুজোপলক্ষে পঞ্চদশ বর্ষীয় কবি স্বকৃত 'সত্যপীরের কথা' পাঠ করিয়া উপস্থিত শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করেন; এই সময় তিনি দুইখানি সত্যপীরের উপাখ্যান রচনা করিয়াছিলেন, তাহার একখানি চৌপদী ছন্দে রচিত হইয়াছিল; এই পুঁথির শেষে সময় নির্দ্দেশ করা আছে,—"ব্রতকথা সাঙ্গ পায় সনে রুদ্র চৌগুণা।" অর্থাৎ ১১৪৪ সালে (১৭৩৭)। ইহার পরে ভারতচন্দ্র পুনরায় বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন; এবার তাঁহার পিতা-মাতা ও ভ্রাতৃগণ তাঁহার পাণ্ডিত্য দেখিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন। ইতিমধ্যে নরেন্দ্র রায় পুনশ্চ বর্দ্ধমানাধিপতির নিকট হইতে কিছু জায়গা ইজারা লইয়াছিলেন। ভারতচন্দ্র রাজস্বাদি যথাসময়ে রাজসরকারে প্রদান করিতে উপদিষ্ট হইয়া বর্দ্ধমানে প্রেরিত হইলেন কিন্তু তথায় আকস্মিক কোন গোলযোগে পড়িয়া কারারুদ্ধ হন। কারা হইতে কৌশলে উদ্ধার পাইয়া ভারতচন্দ্র শ্রীক্ষেত্রে গমন করেন, তথায় শিবভট্ট নামক সুবাদারের অনুগ্রহে পাণ্ডাগণের কর হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া বিনা মূল্যে প্রতিদিন এক একটি 'বলরামী আট্‌কে' প্রাপ্ত হন। এই সময়ে তাঁহার বৈষ্ণব ধর্ম্মে অনুরাগ জন্মিয়াছিল বলিয়া কথিত আছে, কিন্তু তাঁহার লেখায় সেই অনুরাগ মধ্যে মধ্যে একটি ঈষদ্ব্যক্ত বিদ্রূপে পরিণত হইতে দেখা যায়,—"চল যাই নীলাচলে। খাইয়া প্রসাদ ভাত, মাথায় মুছিব হাত, নাচিব গাইব কুতূহলে॥" এই লেখায় শ্রীশ্রীজগন্নাথ-তীর্থের প্রতি কবির বেশ একটু সম্ভ্রমপূর্ণ পরিহাস লক্ষিত হয়। যাহা হউক, কবি বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি এতদূর কৃপাপরবশ হইলেন যে, তিনি বৃন্দাবন যাইয়া বৈরাগী সাজা ঠিক করিলেন, পথে হুগলীস্থিত খানাকুল গ্রামে শ্যালীপতির বাড়ী, এই মহাশয় নবীন সন্ন্যাসীকে ফিরাইয়া আনিলেন; অতঃপর বৃন্দাবনে না যাইয়া কবি শনৈঃ শনৈঃ পদব্রজে স্বীয় শ্বশুর-বাড়ী সারদাগ্রামে উপস্থিত হইলেন। তিনি স্ত্রীর আদরে বিশেষ আপ্যায়িত হইয়াছিলেন কি না বলিতে পারি না,—নিজের অভ্যস্ত ব্যঙ্গসহকারে একস্থলে লিখিয়াছেন—"দুই স্ত্রী নহিলে নহে স্বামীর আদর। সে রসে বঞ্চিত রায় গুণাকর॥"

কিছুকাল শ্বশুরবাড়ীতে থাকিয়া ও তাঁহার স্ত্রীকে সেস্থান হইতে নিজ বাটীতে পাঠাইতে নিষেধ করিয়া, কবি ফরাসডাঙ্গায় উপস্থিত হন; তথায় বিখ্যাত দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের

কবি জগদানন্দের হস্তাক্ষর। ২৮২ পৃঃ



বাং ১০৬৮ সালের লিখিত চৈতন্য ভাগবত পুঁথির মলাটে প্রদত্ত চিত্রের প্রতিলিপি। ৩০৯ পৃঃ

আনন্দময়ীর বংশোদ্ভবা ত্রিপুরাসুন্দরী দেবী কর্তৃক ৭০ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত
হরিলীলা পুঁথির এক পৃষ্ঠার প্রতিলিপি। ৫১৪ পৃঃ

শরণাপন্ন হইয়া কতকদিন অতিবাহিত করেন। এই ব্যক্তি ভারতচন্দ্রকে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট প্রেরণ করেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে ৪০৲ টাকা বেতনে সভাকবি নিযুক্ত করেন। এই রাজসভায় তাঁহার উচ্ছৃঙ্খল প্রতিভার বিকাশ পায় কিন্তু তাহা ব্যভিচারী হয়। চণ্ডীপূজার মাহাত্ম্য বর্ণনোপলক্ষে তাঁহার বিদ্যাসুন্দরের পালা বিরচিত হয় এবং তাঁহার বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ কতকগুলি স্নিগ্ধমধুর শ্লেষাত্মক ধূয়াতে পরিণত হইয়া যায়। বৃন্দাবনপ্রত্যাগত কবি বিদ্যাসুন্দর রচনা আরম্ভ করেন, ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে এই প্রসিদ্ধ পুস্তক শেষ হয়; ইতিমধ্যে রাজা কবিকে মূলাযোড়গ্রাম ইজারা দিয়া তাঁহার বাটী নির্ম্মাণ সম্বন্ধে আনুকূল্য করেন, কিন্তু সেইস্থান কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজকে শীঘ্রই বর্দ্ধমান রাজার কর্ম্মচারী রামদেব নাগের নিকট পত্তনি দিতে হয়। এই নাগমহাশয়ের অত্যাচার সহ্য করিয়া কবি অতি সুন্দর নাগাষ্টক রচনা করেন, এই সংস্কৃত কবিতাটির এক দিকে হাসি অপর দিকে কান্না,—উহা অম্ল-মিষ্ট; কৃষ্ণচন্দ্র উহা পড়িয়া হাসি রাখিতে পারেন নাই এবং দয়াপরবশ হইয়া কবিকে আনরপুরের গুস্তেগ্রামে ১০৫⁄ বিঘা এবং মূলাযোড়ে ১৬⁄ বিঘা ভূমি নিষ্কর প্রদান করেন। ৪৮ বৎসর বয়সে ১৭৬০ খৃঃ অব্দে, পলাশী যুদ্ধের তিন বৎসর পরে, মহাকবি ভারতচন্দ্র বহুমূত্র রোগে প্রাণত্যাগ করেন। কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ তাঁহার প্রিয় কবিকে "রায় গুণাকর" উপাধি দিয়াছিলেন।

অন্নদামঙ্গল।

রায় গুণাকরের "অন্নদামঙ্গল" তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এই অন্নদামঙ্গল তিন ভাগে বিভক্ত; প্রথমভাগে দক্ষযজ্ঞ, শিববিবাহ, ব্যাসের কাশীনির্ম্মাণ, হরিহোড়ের বৃত্তান্ত, ভবানন্দের জন্ম বিবরণ প্রভৃতি নানা প্রসঙ্গ বর্ণিত আছে। দ্বিতীয় ভাগে বিদ্যাসুন্দর পালা ও তৃতীয়ভাগে মানসিংহ কর্ত্তৃক যশোর-বিজয়, ভবানন্দ মজুমদারের দিল্লী গমন, সম্রাট জাহাঙ্গীরের সহিত তর্ক, দিল্লীতে প্রেতাধিকার ও ভবানন্দ মজুমদারের দেশে প্রত্যাবর্ত্তন ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে। অন্নদামঙ্গল ছাড়া তিনি 'রসমঞ্জরী', অসম্পূর্ণ 'চণ্ডীনাটক' ও বহুসংখ্যক হিন্দী বাঙ্গালা ও সংস্কৃত কবিতা রচনা করিয়াছিলেন।

দেবচরিত্রের দুর্গতি।

আমরা ভারতচন্দ্রের কবিতা ভাবের গুরুত্ব হিসাবে বিশেষ শ্রদ্ধেয় বলিয়া মনে করি না। বিদ্যাসুন্দর সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি; অপরাপর কাব্যেও কবি জীবনের কোন গূঢ় সমস্যা কি কঠোর পরীক্ষা উদ্‌ঘাটন করিয়া উন্নত চরিত্রবল দেখান নাই। 'নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার' ন্যায় মহাযোগী মহাদেবকে ভারতচন্দ্র একটা বেদিয়ার মত চিত্রিত করিয়াছেন,—শিশুগুলি তাঁহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়াছে,—"কেহ বলে জটা হৈতে বার কর জল। কেহ বলে জ্বাল দেখি কপালে অনল॥ কেহ বলে নাচ দেখি গাল বাজাইয়া॥ ছাই মাটি কেহ গায় দেয় ফেলাইয়া।" দেবাদিদেব মহাদেবের এই অবমাননা একজন শিবশক্তিউপাসক কবির যোগ্য

হয় নাই। তারপর নারদ ঋষি কলহের দেবতা, ঢেঁকি বাহনে আসিয়া সাপের মন্ত্র বকিতেছেন। যে নারদের নাম শুকদেব ও প্রহ্লাদ হইতে উচ্চে, তাঁহার এই দুর্গতি দেখিয়া ভাগবতগণ কবিকে প্রশংসা করিবেন না। মেনকা উমার মা, ইনি বঙ্গের ঘরের আদর্শ জননী; যশোদা ও মেনকার অশ্রুপূর্ণ অপত্য স্নেহে বঙ্গের স্নেহাতুরা মাতৃগণের প্রাণের ব্যগ্রতা একটি নির্ম্মল ধর্ম্মভাবে উন্নীত হইয়াছে। ভারতচন্দ্রের হস্তে মেনকা-চিত্র কি বিকটরূপ ধারণ করিয়াছে দেখুন,—"ঘরে গিয়ে মহাক্রোধে ত্যজি লাজ ভয়। হাত নাড়ি গলা ছাড়ি ডাক ছেড়ে কয়॥ ওরে বুড়া আঁটকুড়া নারদ অল্পেয়ে। হেন বর কেমনে আনিলি চক্ষু খেয়ে॥" যাহা হউক স্বর্গের উচ্চ আদর্শের সন্নিহিত না হইলেও ঘরের কতকগুলি দুঃখচিত্র এই সব দেববর্ণন উপলক্ষে চিত্রিত হইয়াছে; "উমার কেশ চামর ছটা। তামার শলা বুড়ার জটা॥ উমার মুখ চাঁদের চূড়া। বুড়ার দাড়ী শণের নুড়া॥' কিংবা "আমার উমার দন্ত মুকুতা গঞ্জন। বায়ে নড়ে ভাঙ্গা বেড়া বুড়ার দশন॥" প্রভৃতি পাঠ করিলে মনে হয় দ্বিতীয়ার শশিকলার ন্যায় সুন্দরী কুমারীগণ সামাজিক অত্যাচারে শিথিলদন্ত বৃদ্ধ স্বামীর হাতে পড়িয়া যে বিসদৃশ খেলার অভিনয় করিত, কবির চক্ষে সেই চিত্রের পূর্ণভাব বিরাজ করিতেছিল, তাই তিনি শিব-প্রসঙ্গ আশ্রয় করিয়া সমাজের একটি করুণ অধ্যায় উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। পিতা মাতা কিন্তু অর্থ পাইয়া অনেক সময় "বাঘ ছাল দিব্য বস্ত্র, দিব্য পৈতা ফণী" বলিয়া জরাগ্রস্ত বরের নব সৌন্দর্য্য আবিষ্কার করিতেন।

উপমার বাহুল্য।

কাব্য-সাহিত্যে উপমা একটি ইঙ্গিতের ন্যায়; উহাতে রূপের চিত্রখানি সুন্দর হইয়া উঠে, কিন্তু সুন্দর জিনিষ লইয়া বেশী নাড়া চাড়া করিলে সৌন্দর্য্যের হানি হয়; এজন্য উপমা যত অল্প কথায় ব্যক্ত হয়, ততই উহা সুন্দর হয়। সৌন্দর্য্য-সমুদ্রের তীরে দাঁড়াইয়া উহার প্রতি আভাসে ইঙ্গিত করিতে হয়; তাহাতে অসীম বিস্ময় জাগিয়া উঠে,—জলে নামিলে অনন্ত জলরাশির শোভা দর্শন ঘটে না, সম্মুখের কতকটা অংশ দৃষ্টি এবং গতি সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে। উপমার আতিশয্য ভাল নহে, উহাতে চিত্রগুলি কুজ্ঝটিকাপূর্ণ হইয়া পড়ে। বিদ্যার রূপ ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া ভারতচন্দ্র নিজের বিদ্যার ব্যাখ্যা করিয়াছেন মাত্র, আমরা তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অন্নপূর্ণার রূপবর্ণনাও বাহুল্য দোষ বর্জ্জিত নহে ঃ—

"কথায় পঞ্চমস্বর শিখিবার আশে।
দলে দলে কোকিল কোকিলা চারিপাশে।
কঙ্কণ ঝঙ্কার হৈতে শিখিতে ঝঙ্কার।
ঝাঁকে ঝাঁকে ভ্রমর ভ্রমরী অনিবার॥
চক্ষুর চলন দেখি শিখিতে চলনি।
ঝাঁকে ঝাঁকে নাচে কাছে খঞ্জন খঞ্জনী।"

দলে দলে কোকিল কোকিলা, ঝাঁকে ঝাঁকে ভ্রমর ভ্রমরী, এবং খঞ্জন খঞ্জনী কর্ত্তৃক অনুসৃতা ভগবতী শিক্ষয়িত্রীর পদে বরিত হইয়া এস্থানে কি বিড়ম্বিত হন নাই? বাল্মীকি রাবণের পুরীর নিদ্রিত সুন্দরীগণের প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন,—"ইমানি মুখপদ্মানি নিয়তং মত্তষট্পদাঃ। অম্বুজানীব ফুল্লানি প্রার্থয়ন্তি পুনঃ পুনঃ॥" এবং কালিদাস কর্ণান্তিকচর ভ্রমরকর্ত্তৃক উৎপীড়িত শকুন্তলার চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, অল্প কথায় সেই চিত্রগুলি কেমন সুন্দর হইয়াছে! কিন্তু "সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতং" ভারতচন্দ্র সেই রাগের অতিরঞ্জন চেষ্টা করিয়া ছবিগুলি বিবর্ণ করিয়া ফেলিয়াছেন।

শিব-পার্ব্বতীর কলহের আরম্ভে,—"শুনিলি বিজয়া জয়া বুড়াটির বোল। আমি যদি কই তবে হবে গণ্ডগোল" —হইতে শ্রীশিবের পরাজয়-সূচক—"ভবানীর কটুভাষে, লজ্জা হৈল কৃত্তিবাসে ক্ষুধানলে কলেবর দহে॥ বেলা হৈল অতিরিক্ত, পিত্তে হৈল গলা তিক্ত," ইত্যাদিরূপ ব্যাপারটিতে দরিদ্র স্বামী ও পাকাগিন্নির নিত্য ঘরকন্নার অভিনয় শ্লেষ ও বিদ্রূপের বর্ণে ফলিয়া বড় সুন্দর হইয়াছে। এই ভাবের আরও অনেক দৃশ্য কবির তুলিতে উৎকৃষ্টরূপে অঙ্কিত হইয়াছে; কিন্তু কোথাও ভাবের গুরুত্ব নাই, কোথাও কবি হৃদয় ছুঁইতে পারিতেছেন না; একখানি সুন্দর ছবি দেখিতে চক্ষুর যে তৃপ্তি, ভারতের কবিতাপাঠে সেইরূপ তৃপ্তি লাভ সম্ভব, কিন্তু চিত্রকর হইতে কবির উচ্চতর প্রশংসা প্রাপ্য; চিত্রকরের চিত্র কবির মন্ত্রপূত তুলির স্পর্শে প্রাণ যায়, ভারতচন্দ্রের তুলি প্রাণ দান করিতে পারে নাই। তাঁহার কাব্যে কোন স্থানেই হৃদয়ের ব্যাকুলতা নাই, হৃদয়ের মর্ম্মস্পর্শী দুঃখে কি স্নিগ্ধ সুখধারা তাঁহার কাব্যের কোন অংশ পবিত্র করে নাই।

গৃহস্থালীর এক অঙ্ক। "বৃদ্ধ লোকে ক্ষুধা নাহি সহে॥"

বর্ণনা প্রাণহীন।

কিন্তু বোধ হয় এই ভাবে ভারতের গুণবিচার করিলে তাঁহার প্রতি সুবিচার হইবে না। ভাব-যুগ গতে সাহিত্যে শব্দযুগ প্রবর্ত্তিত হওয়া স্বাভাবিক। ভারতচন্দ্রের ভাব বিচার না করিয়া ভাষা বিচার করিলে তাঁহাকে প্রাচীনকালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি বলিতে হইবে। তাঁহার মত কথায় চিত্ত হরণ করিতে প্রাচীনকালের অন্য কোন কবি সমর্থ হন নাই। তিনি উৎকৃষ্ট শব্দ-কবি। এই শব্দমন্ত্র কি পদার্থ তাহা নিম্নোদ্ধৃত পদগুলি পাঠে প্রতিপন্ন হইবে; 'ম'-কার, 'ল'-কার প্রভৃতি কোমল অক্ষর দ্বারা যে যাদু প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা শ্রুতির অমৃত, তাহা পক্ষীর কাকলীর ন্যায় স্থানবিশেষে অর্থশূন্য হইয়াও চিত্তবিনোদনে সমর্থ:—

শব্দমন্ত্র।

(১) "কল কোকিল, অলিকুল বকুল ফুলে। বসিলা অন্নপূর্ণা মণিদেউলে॥ কমল পরিমল, লয়ে শীতল জল পবনে ঢল ঢল, উছলে কূলে। বসন্তরাজা আনি, ছয় রাগিণী রাণী, করিলা রাজধানী অশোক মূলে॥ কুসুমে পুনঃ পুন ভ্রমর গুনগুন, মদন দিলা গুণ ধনুক হূলে॥ যতেক উপবন, কুসুমে সুশোভন, মধু মুদিত মন ভারত ভুলে॥"—অন্নদামঙ্গল।

(২) "শুনলো মালিনী কি তোর রীতি। কিঞ্চিৎ হৃদয়ে না হয় ভীতি॥ এত বেলা, হৈল পূজা না করি ক্ষুধায় তৃষ্ণায় জ্বলিয়া মরি॥ বুক বাড়িয়াছে কার সোহাগে। কালি শিখাইব মায়ের আগে॥ বুড়া হলি তবু না গে

ঠাট। রাঁড় হৈয়ে যেন ষাঁড়ের নাট॥ রাত্রে ছিল বুঝি বঁধুর ধুম। এতক্ষণে তেঁই ভাঙ্গিল ঘুম॥ দেখ দেখি চেয়ে কতেক বেলা। মেয়ে পেয়ে বুঝি করিস্ হেলা॥ কি করিবে তোরে আমার গালি। বাপারে বলিয়া শিখাব কালি। হীরা থর থর কাঁপিছে ডরে॥ ঝর ঝর জল নয়নে ঝরে॥ কাঁদি কহে শুন রাজকুমারী। ক্ষম অপরাধ আমি তোমারি॥ চিকণ গাঁথনে বাড়িল বেলা। তোমার কাজে কি আমার হেলা॥ বুঝিতে নারিনু বিধির ধন্দ। করিনু ভালরে হইল মন্দ। ভ্রম বাড়িবারে করিনু শ্রম। শ্রম বৃথা হৈল ঘটিল ভ্রম॥ বিনয়েতে বিদ্যা হৈল বশ! অন্ত গেল রোষ উদয় রস॥ বিদ্যা কহে দেখি চিকণ হার। এ গাঁথনি আই নহে তোমার॥ পুনঃ কি যৌবন ফিরে আইল। কিবা কোন বঁধু শিখায়ে গেল॥ হীরা কহে তিতি আঁখির নীরে। যৌবন জীবন গেলে কি ফিরে॥"—বিদ্যাসুন্দর।

(৩) "জয় কৃষ্ণ কেশব, রাম রাঘব, কংসদানব-ঘাতন। জয় পদ্মলোচন, নন্দনন্দন, কুঞ্জকানন রঞ্জন॥ জয় কেশিমর্দ্দন, কৈটভার্দ্দন, গোপিকাগণ-মোহন॥ জয় গোপবালক, বৎসপালক, পুতনা-বক-নাশন॥"—অন্নদামঙ্গল।

শেষ পদটিতে ও তদ্রূপ অপরাপর বহুপদে দেখা যাইবে, ভারতচন্দ্রের রচনায় সংস্কৃত ও বাঙ্গালার হরগৌরীমিলন হইয়া গিয়াছে। এই পরিণয় ঘটাইতে তিনি রামপ্রসাদের ন্যায় গলদঘর্ম্ম হইয়া পড়েন নাই; হাসিয়া খেলিয়া যাহা করিয়াছেন, রামপ্রসাদ এত পরিশ্রম করিয়াও তাহা পারেন নাই। ভারতচন্দ্রের লিপিচাতুর্য্যের গুহ্য এই, তাহাতে শ্রমজনিত একটি স্বেদবিন্দুও পাঠকের নেত্রগোচর হইবে না, শিশুর হাসি ও পাখীর ডাকের ন্যায় তাহা আয়াস ও আড়ম্বরশূন্য। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বর্ণনাগুলির মধ্যে স্নিগ্ধ ও উজ্জ্বল প্রতিভা ফুটিয়া ছোট ছোট ঘটনা ও চরিত্র, চিত্রের ন্যায় সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে। ব্যাসের কাশী নির্ম্মাণ, হরিহোড়ের বৃত্তান্ত, মানসিংহের সৈন্যে ঝড়-বৃষ্টি, ভবানন্দ মজুমদারের উপাখ্যান, তাঁহার দুই স্ত্রীর স্বামী লইয়া দ্বন্দ্ব—এই সমস্ত ছোট ছোট বিষয় পরিহাসরসে মধুর ও আমোদকর হইয়াছে। স্থানে স্থানে শুধু ছন্দ ও শব্দের ঐশ্বর্য্যে কোন মহামহিমান্বিত মূর্ত্তির অপূর্ব্ব অবতারণা হইয়াছে; নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিনিচয়ে মহাদেবের যে ভৈরব সুন্দর চিত্রখানি জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহা কাব্যসাহিত্যে শীর্ষদেশে স্থান পাইবার যোগ্য—ইহাতে কবির ভাষা ও ছন্দের উপর আশ্চর্য্য অধিকার প্রতিপন্ন হইতেছে;—

"মহারুদ্র রূপে মহাদেব সাজে।
ভভম্ভম্ ভভম্ভম্ শিঙ্গা ঘোর বাজে॥
লটাপট জটাজুট সংঘট্ট গঙ্গা।
ছলচ্ছল টলট্টল কলক্কল তরঙ্গা॥
ফণাফণ ফণাফণ ফণীফন্ন গাজে।
দিনেশ প্রতাপে নিশানাথ সাজে॥
ধকধ্বক ধকধ্বক জ্বলে বহ্নি ভালে।
ভভম্ভম্ ভভম্ভম্ মহাশব্দ গালে॥

*　　*　　*

ধিয়া তাধিয়া তাধিয়া ভূত নাচে।
উলঙ্গী উলঙ্গে পিশাচী পিশাচে॥

*　　*　　*

অদূরে মহারুদ্র ডাকে গভীরে।
অরে রে অরে দক্ষ দে রে সতীরে॥
ভুজঙ্গপ্রয়াতে কহে ভারতী দে।
সতী দে সতী দে সতী দে সতী দে॥"

ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলিতে যেন প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে—"ছলচ্ছল, টলটল, কলকল তরঙ্গা" এই ছত্রটিতে তরঙ্গের তিনটি গুণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, "ছলচ্ছল"—জলের প্রবাহব্যঞ্জক- "টলট্টল"—জলের নির্ম্মলতা-ব্যঞ্জক, 'কলকল'—জলের নিক্কণব্যঞ্জক,—গঙ্গাতরঙ্গের এরূপ সংক্ষিপ্ত ও সুন্দর বর্ণনা বোধ হয় আর কোন কবি দিতে পারেন নাই।

এই শব্দ ও ছন্দের ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ হইয়া জনৈক সমালোচক ভারতচন্দ্রের কাব্যগুলিকে "ভাষার তাজমহল" আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন।

এস্থলে বলা উচিত, বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান বররুচিকৃত কাব্যে উজ্জয়িনী নগরে সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া বর্ণিত আছে; কৃষ্ণরামও ঘটনা-স্থান বর্দ্ধমান বলিয়া বর্ণন করেন নাই। রামপ্রসাদ বীরসিংহকে বর্দ্ধমানের রাজা করিয়াছেন, তৎপথাবলম্বী ভারতচন্দ্রও বর্দ্ধমান স্থির রাখিয়াছেন, এই স্থান-নির্দ্দেশে প্রতারিত হইয়া কেহ কেহ এখনও সুড়ঙ্গ দেখিতে বর্দ্ধমান ভ্রমণ করেন। বর্দ্ধমানে বিদ্যার সুড়ঙ্গ নির্দ্দিষ্ট হইবার বহু পূর্ব্ব হইতে বিদ্যাসুন্দরের প্রবাদ দেশে প্রচলিত থাকা সম্ভব। আমরা প্রায় ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে কবি আলওয়ালকে এই সুড়ঙ্গের বিষয় উল্লেখ করিতে দেখিতেছি; যথা 'ছয়ফলমুল্লুক ও বদিউজ্জলমান' পুস্তকে —"বিদ্যার সুড়ঙ্গ আদি, সিন্ধু জগন্নাথ নদী, একে একে সব বিচারিল।" এস্থলে বর্দ্ধমানের উল্লেখ নাই। বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানের মূল ঘটনা ঠিক থাকিলেও কবিগণের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে অনৈক্য আছে, কৃষ্ণরাম মালিনীকে 'বিমলা' নামে অভিহিত করিয়াছেন,—সুন্দরের বীরসিংহ নগরীতে প্রবেশ সম্বন্ধেও তাঁহার গল্প একটু স্বতন্ত্র রকমের; রামপ্রসাদ 'বিদুব্রাহ্মণী' নামক একটি নব চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন ও চোরধরা উপলক্ষে ভারতচন্দ্রের মত উপায় বর্ণন করেন নাই। যাহা হউক, এরূপ পার্থক্য অতি সামান্য, মূল গল্পটি একরূপ। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর ডিঁউসাহীয় নীলমণি কণ্ঠাভরণ গায়েন-কর্ত্তৃক রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় সর্ব্বপ্রথম গীত হয়। ভারতচন্দ্রের পরে প্রাণারাম চক্রবর্ত্তী

বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যান।

নামক জনৈক কবি বিদ্যাসুন্দরে রচনা করিয়াছিলেন,—এই ব্যক্তি পাগলের ন্যায় নদীর তীরে বসিয়া কূপ খনন করিয়াছিলেন।

ভারতচন্দ্রের ছোট ছোট কবিতাগুলির সর্ব্বত্রই কথার বাঁধুনি প্রশংসনীয় ও পদ মধুমাখা; 'অনুকূল'শীর্ষক ক্ষুদ্র কবিতাটি তুলিয়া দেখাইতেছি, ইহা তাঁহার রসমঞ্জরীতে পাওয়া যাইবে,—"ওগো ধনি প্রাণধন, শুন মোর নিবেদন, সরোবরে স্নান হেতু যেয়োনা লো যেয়োনা। যদ্যপি বা যাও ভুলে, অঙ্গুলে ঘোমটা তুলে, কমল কানন পানে চেওনালো চেওনা॥ মরাল মৃণাল লোভে, ভ্রমর কমল ক্ষোভে, নিকটে আইলে ভয় পেওনালো পেও না। তোমা বিনে নাহি কেহ, ঘামে পাছে গলে দেহ, বায় পাছে ভাঙ্গে কটি যেওনালো যেওনা॥"

ছোট কবিতা।

এই বিকৃতরুচি ও পদলালিত্য কাব্য-সাহিত্যের আদর্শ হইল। গীতিকবিতারও একাংশ ব্যাপিয়া বিদ্যাসুন্দরের পালা স্থান পাইয়াছে, আমরা যথাস্থলে তাহা আলোচনা করিব। কিন্তু এই সময়ের যতগুলি বড় কাব্য পাওয়া যায়, তাহার একখানিতে ভিন্ন নির্ম্মলভাব কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। এই সাধারণ নিয়ম-বহির্ভূত, স্বীয় পবিত্রতা গৌরবে স্বতন্ত্র, কঠোর বিষয়-অনুসন্ধিৎসু কাব্যের নাম—"মায়াতিমিরচন্দ্রিকা"; এই পুস্তকখানি ক্ষুদ্র, কিন্তু সমাদরের যোগ্য, আমরা পরে ইহার সম্বন্ধে কিছু লিখিব। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের আদর্শে যে কয়েক খানা কাব্য লিখিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে "চন্দ্রকান্ত", কালীকৃষ্ণ দাসের "কামিনী-কুমার" এবং রসিকচন্দ্র রায়ের "জীবনতারা" এই কাব্যত্রয় লোকরুচির উপর বহুদিন দৌরাত্ম্য করিয়াছিল। এই কাব্যগুলির ভাষা খুব মার্জ্জিত, কিন্তু রচনা এত অশ্লীল যে উহা পাঠে স্বয়ং ভারতচন্দ্রও লজ্জিত হইতেন। শুধু কঠোর সমালোচনা করিয়া নিবৃত্ত হইলে উক্ত কাব্যলেখকগণের যথোচিত শাস্তি হয় না, তাঁহারা নৈতিক আদালতের বেত্রাঘাতযোগ্য। এই তিনখানি কাব্যেই কালীনামের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত আছে। কালীনামের সঙ্গে সংস্রব হেতু আমাদিগের বৃদ্ধগণ এই সব পুস্তকের শৃঙ্গাররসের মধ্যেও আধ্যাত্মিকত্ব দেখিয়াছেন, এবং প্রণিপাতপুরঃসর নিষ্কাম ধর্ম্ম পিপাসার সহিত উপাখ্যানভাগ পাঠ করিয়াছেন। দেবদেবীগণ যখন এই ভাবে কদর্য্যরুচির আবরণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তখন পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিতে মহাপুরুষ রামমোহনের আগমনের সময় হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। বর্ণিত নারীচরিত্রগুলিতে হীন প্রবৃত্তির অসভ্য উল্লাস দৃষ্ট হয়। ফুল্লরা খুল্লনা ও বেহুলার ন্যায় দুঃখসহনক্ষমা পতিপ্রাণা সুন্দরীগণ সাহিত্যক্ষেত্রে দুষ্প্রাপ্য হইয়াছিলেন। সহমরণ প্রথা নিবারণার্থ আইন করা প্রয়োজন কেন হইল তাহা সাহিত্যে আংশিক দৃষ্ট হইবে, কারণ সাহিত্যেই সমাজ প্রতিফলিত হইয়া থাকে। প্রায় একশত বৎসর হইল, 'কামিনী কুমার', 'চন্দ্রকান্ত' ও 'জীবনতারা' রচিত হইয়াছিল; এই পুস্তক গুলি জাতীয় অধোগতির শেষ চিহ্ন। কবি 'উইচারলীর'

সাহিত্যের বিকৃত আদর্শ।

নাম করিতে ইংরেজগণ যেরূপ লজ্জা বোধ করেন, এইসব কাব্যপ্রণেতৃগণের নাম করিতে আমাদের তেমনই লজ্জা হয়। কিন্তু ইঁহারা মধ্যে মধ্যে ভারতচন্দ্র অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর লিপিচাতুর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন, আমরা সেই ছাঁচে ঢালা ভাষার কিছু নমুনা দেখাইয়া ক্ষান্ত হইব। বসন্ত-আগমন,—"হিমান্ত হইল পরে বসন্ত রাজন। দলবল লৈয়া আইল করিতে শাসন॥ প্রথমে সংবাদ দিতে পাঠাইল দূত। আজ্ঞামাত্র চলিলেক মলয়া মারুত॥ বায়ু মুখে শুনি বসন্তের আগমন। সুসজ্জা করিল যত পুষ্প সেনাগণ॥ কেতক করাত করে করিয়া ধারণ। দন্তে দাঁড়াইল হৈয়া প্রফুল্ল বদন॥ শূলহস্তে করি শীঘ্র সাজিল চম্পক। অর্দ্ধচন্দ্র বাণ ধরি ধাইলেক বক॥ গোলার সেউতি পুষ্প সোনার প্রধান। প্রস্ফুটিত হৈয়া দোঁহে হৈল আগুয়ান॥ গন্ধরাজ ধাইলেক পরি শ্বেতবস্ত্র। ওড় জবা ধাইলেক ধরি তীক্ষ্ণ অস্ত্র॥ মল্লিকা মালতী জাতি কামিনী বকুল। কুন্দ আদি সাজে তারা যুদ্ধেতে অতুল॥ পলাশ ধনুক হস্তে ধরিয়া দাঁড়ায়। রঙ্গন তাহার বাণ হেন অভিপ্রায়। সরোরুহ ঢাল হয়ে ভাসিল জীবনে। এইরূপে সজ্জা কৈল পুষ্প সেনাগণে। মলয়ার মুখে শুনি রাজ আগমন। অগ্রগণ্য সেনাপতি সাজিল মদন॥ শরাসনে সন্ধান করিয়া পঞ্চশর। বিরহী নাশিতে বীর চলিল সত্বর॥ কোকিল ভ্রমরে ডাকি কহিল মদন॥ দেখ রাজ্যে বিরহিণী আছে কোন জন। প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া দেহ সমাচার। শীঘ্রগতি কর দিতে বসন্ত রাজার॥ বিশেষ রাজার আজ্ঞা কর অবধান। যে না দেয় কর তার বধহ পরাণ॥ আজ্ঞা পেয়ে দুই সেনা করিল গমন। রমণীমণ্ডলে আসি দিল দরশন॥ প্রথমে কোকিল গিয়া বসি বৃক্ষোপরে। রাজআজ্ঞা জানাইল নিজ কুহুস্বরে। পতি সঙ্গে রঙ্গে ছিল যতেক যুবতী। শব্দ শুনি কর তারা দিল শীঘ্রগতি॥ প্রথমে চুম্বন দিল প্রণামি রাজার। হাস্য পরিহাস দিল বাজে জমা আর॥"—কালীকৃষ্ণ দাসের কামিনীকুমার। মধ্যে মধ্যে অশ্লীলতার জন্য বাকী অংশের অনেক স্থল বিশেষ সুন্দর হইলেও উঠাইতে পারিলাম না। বসন্তরাজার রাজধানীর একটী সমগ্র সুন্দর চিত্রপট প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে রাজাগণের অধিকারে শাসন ও কর আদায়ের জন্য যে সব কৌশল অবলম্বিত হয়, তাহার কিছু বাদ পড়ে নাই। কবির হস্ত বেশ নিপুণ, সুসঙ্গতভাবে হউক, অসঙ্গতভাবে হউক, তাহা পরিপক্ক হইয়াছে স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু তাঁহার অবাধ লালসা ও অসংযত ভাষায় শীলতার অভাব লক্ষ্য করিয়া তাহাকে ন্যায্য প্রশংসাটুকু দিতেও ইচ্ছা হয় না। অপর দুইখানি কাব্যসম্বন্ধেও এই সমালোচনা অনেকাংশে প্রযুক্ত হইতে পারে।

তিনখানি গ্রন্থ।

কিন্তু বিদ্যাসুন্দরাদি কাব্য ও আলওয়াল কবির পদ্মাবতী ছাড়া বঙ্গদেশের এক প্রান্তে আর তিনখানি কাব্য রচিত হইয়াছিল। ইহাদের রচকগণ বিক্রমপুরবাসী ও একপরিবারভুক্ত। জয়নারায়ণ সেন ও তাঁহার বিদুষী ভ্রাতুষ্পুত্রী আনন্দময়ী দেবী উভয়ে মিলিয়া ১৭৭২ খৃঃ অব্দে 'হরিলীলা' নামক কাব্য রচনা করেন। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর রচনার ২০ বৎসর পরে এই কাব্য রচিত হয়। এই কাব্য রচনার পূর্ব্বে রামগতি সেন 'মায়াতিমিরচন্দ্রিকা' রচনা করিয়াছিলেন, ও পূর্ব্বোক্ত দুই কাব্যের রচনার পরে জয়নারায়ণকর্তৃক 'চণ্ডী

কাব্য প্রণীত হয়। এই মনস্বী পরিবার বিশেষরূপে শিক্ষিত ছিলেন, তাঁহাদের কাব্যগুলিতে সেই পাণ্ডিত্যের পরিচয় আছে। ইঁহাদের ইতিহাস এখানে সংক্ষেপে প্রদত্ত হইতেছে।

রামগতি ও জয়নারায়ণ।

বৈদ্যকুলোদ্ভব বেদগর্ভ সেন পাঠাভ্যাস জন্য নিবাসভূমি যশোর ইত্নাগ্রাম হইতে বিক্রমপুর আগমন করিয়াছিলেন। তিনি বিলদায়িনীয়া (রাজনগর), জপ্সা, ভোজেশ্বর প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রামের ভূসম্পত্তি অর্জ্জন করিয়া বিলদায়িনীয়াতে নিবাস স্থাপন করেন। সুপ্রসিদ্ধ রাজা রাজবল্লভ এই বেদগর্ভসেনের অধস্তম ষষ্ঠ-পুরুষ। যে শাখায় রাজবল্লভ জন্মগ্রহণ করেন, তাহার জ্যেষ্ঠ শাখায় উৎপন্ন এবং বেদগর্ভের পঞ্চমস্থানীয় গোপীরমণ সেন এবং তদ্বংশীয় হরনাথ রায়ের নাম মেঃ বেভারিজ্‌ সাহেবের বাখরগঞ্জের ইতিহাসে উল্লিখিত আছে। গোপীরমণের দ্বিতীয় পুত্র কৃষ্ণরাম "দেওয়ান" ও তৃতীয় পুত্র রামমোহন "ক্রোড়ী" উপাধি প্রাপ্ত হন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ফিপ্‌থ্‌ রিপোর্টে দেখা যায়, তাঁহারা চাঁদপ্রতাপ প্রভৃতি পরগণার রাজস্ব আদায়ে নিযুক্ত ছিলেন; কৃষ্ণরাম দেওয়ানের দ্বিতীয় পুত্র "লালা রামপ্রসাদ" বিক্রমপুরের সেই সময়ের অতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। লালা রামপ্রসাদের স্ত্রী সুমতিদেবী অতি গুণবতী ছিলেন। ইঁহাদের পাঁচটি পুত্র জন্মিয়াছিল—১ম লালা রামগতি, ২য়, লালা জয়নারায়ণ, ৩য়, লালা কীর্ত্তিনারায়ণ, ৪র্থ, লালা রাজনারায়ণ ও ৫ম, লালা নরনারায়ণ। রামগতি বাঙ্গালা ভাষায় "মায়াতিমিরচন্দ্রিকা" ও সংস্কৃতে "যোগকল্পলতিকা" প্রণয়ন করেন। জয়নারায়ণ "চণ্ডীকাব্য" ও "হরিলীলা" নামক বাঙ্গালা কাব্য রচনা করেন; রামগতি সেনের কন্যা আনন্দময়ী দেবী 'হরিলীলা' প্রণয়নে তাঁহাকে বিশেষ সহায়তা করেন, তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। রাজনারায়ণ 'পার্ব্বতীপরিণয়' নামক সংস্কৃত কাব্য-প্রণেতা, এই পুস্তক আমরা পাই নাই।

সর্ব্বজ্যেষ্ঠ রামগতি সেন ৫০ বৎসরের পর ধর্ম্মব্রত ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি যোগানুশীলন জন্য প্রথমে কলিকাতা কালীঘাটে ও পরে কাশীধামে অবস্থিতি করেন। ৯০ বৎসর বয়ঃক্রমে কাশীর মহাশশ্মানে তাঁহার দেহ ভস্মীভূত হয়; চিরানুগত সহধর্ম্মিণী সেই সঙ্গে অনুমৃতা হন। বাল্যকালে যে সব ভাবের লীলা চতুর্দ্দিকে লক্ষিত হয়, অজ্ঞাতসারে তাহা চিরকালের জন্য কোমল অন্তঃকরণে মুদ্রিত হইয়া যায়। রামগতি সেন শৈশবে তাঁহার খুল্লপিতামহ রঘুনন্দনের বাগানে আম চুরি করিয়া খাইতেন, একদিন ভৎর্সিত হইয়া রামগতি আবদার করিয়া বলিয়াছিলেন, "দাদা মহাশয়, এখন আমগুলি আমরাই খাই, তুমি কাশী যাও।" কিন্তু সেই শিশুর আবদারময় উক্তি বৃদ্ধের পক্ষে শাস্ত্রের ন্যায় কার্য্যকরী হইল। রঘুনন্দন এই কথা শুনিয়া নিরুত্তর রহিলেন, পরদিন প্রাতঃকালে সকলে দেখিল, গেরুয়া পরিয়া বৃদ্ধ রঘুনন্দন প্রফুল্লমুখে কাশী যাত্রা করিয়াছেন। খুল্লপিতামহের এই গেরুয়া-পরা দেবমূর্ত্তি বালক রামগতির মনে চিরজীবন অঙ্কিত হইয়া রহিল; তিনিও সর্ব্বদা বিষয়-

নিস্পৃহ সন্ন্যাসীর ন্যায় সংসারাশ্রমের কর্ত্তব্য পালন করিয়া গিয়াছেন। কনিষ্ঠ জয়নারায়ণের প্রকৃতি বড় উচ্ছৃঙ্খল ছিল। তৎকালে তিনি ব্যবস্থাশাস্ত্রানুসারে ।/১॥// অংশের মালিক ছিলেন, কিন্তু তিনি সমস্ত সম্পত্তির ॥০ আনা হিস্যা কলিকাতানিবাসী মাণিক বসুর নিকট বিক্রয় করিতে প্রতিশ্রুত হন। তচ্ছ্রবণে তাঁহার কনিষ্ঠ রাজনারায়ণ বলিলেন, তিনি তাঁহার অংশ হইতে সূচ্যগ্র ভূমিও ছাড়িয়া দিবেন না। অবিবেচক ও অসংস্থিতচিত্ত কবি জয়নারায়ণ প্রতিজ্ঞাভঙ্গে মর্ম্মাহত হইয়া সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন, তদ্দর্শনে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামগতি কনিষ্ঠকে সম্মত করিয়া ভ্রাতৃপ্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য ॥০ আনা অংশ বিক্রয় করিয়াছিলেন।

আনন্দময়ী ও তাঁহার পাণ্ডিত্য।

সেনহাটী, পয়গ্রাম, মূলঘর, জপ্সা প্রভৃতি স্থানে রামগতি সেনের বিদুষী কন্যা আনন্দময়ীর খ্যাতি শুনা যায়। পয়গ্রামনিবাসী প্রভাকরবংশীয় রূপরাম কবিভূষণের পুত্র অযোধ্যারাম সেনের সঙ্গে ১৭৬১ খৃঃ অব্দে ৯ম বর্ষ বয়সে আনন্দময়ীর পরিণয় হয়। লালারামপ্রসাদ পৌত্রী ও তাঁহার পতিকে যে বৃত্তি প্রদান করেন, তাহা কৌতুকচ্ছলে "আনন্দীরামসেন" বলিয়া অভিহিত হয়; পতি-পত্নীর নামের যোগে এই অদ্ভুত শঙ্কর নামের উদ্ভব হয়। অযোধ্যারাম সংস্কৃতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার পত্নীর বিদ্যার খ্যাতি তাঁহার যশঃ লোপ করিয়াছিল। রাজনগর-নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণদেব বিদ্যাবাগীশের পুত্র হরিদেব বিদ্যালঙ্কার আনন্দময়ীকে একখানি সংস্কৃত শিবপূজাপদ্ধতি লিখিয়া দেন। তাহার মাঝে মাঝে অশুদ্ধি থাকাতে তিনি বিদ্যাবাগীশ মহাশয়কে পুত্রের অধ্যযন সম্বন্ধে অমনোযোগী বলিয়া তিরস্কার করেন। রাজবল্লভ 'অগ্নিষ্টোম' যজ্ঞের প্রমাণ ও যজ্ঞকুণ্ডের প্রতিকৃতি চাহিয়া রামগতি সেনের নিকট পত্র লিখেন, রামগতি সেই সময় পূজায় ব্যাপৃত থাকায় আনন্দময়ী সেই প্রমাণ ও প্রতিকৃতি স্বহস্তে লিখিয়া পাঠাইয়া দেন। এই সম্বন্ধে অক্রূরচন্দ্র সেন মহাশয় লিখিয়াছেন—"সকলেই তাহা বিশ্বাস করিলেন, কারণ আনন্দময়ীর বিদ্যাবত্তা সম্বন্ধে সে সময়ে কাহারও অবিদিত ছিল না, বিশেষতঃ সভাস্থ পণ্ডিত কৃষ্ণদেব বিদ্যাবাগীশ আনন্দময়ীর অধ্যাপক ছিলেন।" আনন্দময়ীর রচনা হইতে আমরা যে সব অংশ উদ্ধৃত করিব, তাহাতে তাঁর পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে পাঠকগণের অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ থাকিবে না।

মায়াতিমিরচন্দ্রিকা।

রামগতি সেনের 'মায়াতিমিরচন্দ্রিকা' ধর্ম্মের রূপক; উহা সংস্কৃত 'প্রবোধচন্দ্রোদয়ে'র পথাবলম্বী। সংসারে মন ইন্দ্রিয় দ্বারা অন্ধ হইয়া সত্য কি বস্তু, বুঝিতে পারে না,—পথহারা হইয়া নানা কল্পনা জল্পনার স্রোতে ভাসিয়া বেড়ায়, বিবেক ও আত্মজ্ঞানের উন্মেষের সঙ্গে ধীরে ধীরে চিত্তে বোধের উদয় হয়; তখন কি করিতে যাইয়া কি করিয়াছি, মণি ভাবিয়া লোষ্ট্রখণ্ড আদর করিয়াছি, যাহার জন্য ভবে জন্ম—সেই লক্ষ্য স্থির না রাখিয়া ভূতের বেগার খাটিয়াছি,—এই সব তত্ত্ব অনুশোচনার অশ্রুতে পবিত্র হইয়া চিত্তে প্রকটিত

হয়,—তখন বানিয়ানের তীর্থযাত্রীর ন্যায় মন এই রাজ্য ছাড়িয়া তত্ত্বপথে প্রবিষ্ট হয়। তৎপর উদাসীনের কথা, যোগ কিরূপে হয়, তাহার নানারূপ কূট্‌ব্যাখ্যা, সেই সব শব্দের প্রহেলিকা ভেদ করিয়া প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে পারি, আমাদের এরূপ শক্তি নাই,—আমরা সে ভাবের ভাবুক নহি। যোগের অবস্থা বর্ণন করিতে যাইয়া কবি গোরক্ষসংহিতা প্রভৃতি পুস্তক হইতে অনেক দুর্ব্বোধ্য শ্লোক তুলিয়া দিয়াছেন। কবি—"পঞ্চাশ বৎসর বৃথা গেল বয়ঃকাল। কাটিতে না পারিলাম মহামায়াজাল॥" বলিয়া আরম্ভ করিয়াছেন, মনুষ্যের শোচনীয় অবস্থা স্মরণ করিয়া সহানুভূতি ও ভয় কম্পিতকণ্ঠে লিখিয়াছেন,—"ভ্রমের তুরঙ্গে জীব করি আরোহণ মায়ামৃগ লোভে সদা করেন ভ্রমণ।" তৎপর ক্ষণস্থায়ী জীবনের কথা, তন্মধ্যে ক্ষণভঙ্গুর যৌবনের মদগর্ব্ব স্মরণ করিয়া কবি কাতরভাবে লিখিয়াছেন, "যৌবন কুসুম সম প্রভাতে বিলীন।" এই অনিত্য জীবনে মায়ামুগ্ধ মনুষ্যের অবস্থা অতি বিষম, একদা সুপ্রভাতে মনের মায়াপাশ কাটিয়া গেল, তখন নিজের অবস্থাটি সম্পূর্ণভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিতে মনের শক্তি জন্মিল, কবি রূপকচ্ছলে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—

"কোপে অতি শীঘ্রগতি মন চলি যায়। যথা বসে নানারসে সদা জীব ধরায়॥ তনু যার সুবিস্তার দিব্য রাজধানী। হৃদি তারি রম্যপুরী তথায় আপনি॥ অহঙ্কার হয় যার মোহের কিরীটী। দম্ভপাটে বৈসে ঠাটে করি পরিপাটী॥ পুষ্পচাপ উগ্রতাপ লোভ অনিবার। দুই মিত্র সুচরিত্র বান্ধব রাজার॥ শান্তি, ধৃতি, ক্ষমা, নীতি, শুভশীলা নারী। মান করি রাজপুরী নাহি যায় চারি॥ পতিব্রতা ধর্ম্মরতা অবিদ্যা মহিষী। পতি কাছে সদা আছে রাজার হিতৈষী॥ নারী সঙ্গে রতি রঙ্গে রসের তরঙ্গে। এইরূপে কামকূপে জীব আছে রঙ্গে॥"

আমাদের প্রত্যেকের এক একটী রাজত্ব আছে, এই শরীরের বিদ্রোহী প্রবৃত্তিদিগকে শাসন করিয়া শিষ্টবৃত্তিগুলিকে পালন করার জন্য আমাদের দায়িত্ব আছে, তাহা আমাদের দ্বারা সুনির্ব্বাহিত হয় না; কবি পরিষ্কার একটি রূপক দ্বারা মনুষ্যের অবস্থা প্রতিবিম্বিত করিয়াছেন, এই প্রতিবিম্ব ক্রমশঃ আরও পরিস্ফুট হইয়াছে,—তৎপর যোগের পদ্ধতি বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিয়া কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন। সংস্কৃতকাব্যের ভাবে অধ্যায়গুলির উপসংহার করা হইয়াছে, যথা "ইতি মায়াতিমির-চন্দ্রিকায়াং জীবচৈতন্যপ্রসঙ্গে দ্বিতীয়-কলা নাম দ্বিতীয়োচ্ছাসঃ॥"

যে সময় দেশ ব্যাপিয়া বিদ্যাসুন্দরের পালার গান, পচা আদিরসের গন্ধ হেতু যে সময়ের কাব্যগুলি ছুঁইতেও ঘৃণা হইত সেই সময় জগ্গাপল্লীর এই প্রবৃত্তি-সংযম সম্বন্ধে কঠোর উপদেশগুলি সাহিত্যের বিবেকবাণীর ন্যায় উপলব্ধি হয়।

রামগতি সেন চক্ষু মুদিত করিয়া যে গৃহে যোগাভ্যাসে নিরত ছিলেন, সেই গৃহের এক প্রান্তে জয়নারায়ণ কল্পনার পুষ্পরথারোহণে আদিরসের রাজ্যে ঘুরিতেছিলেন; ইনি ভারতচন্দ্রের শিষ্য; ছন্দগুলি ইঁহার করায়ত্ত; নানারূপ ছন্দের সীমাবদ্ধ মণ্ডলীর মধ্যে কবিতা সুন্দরী আদিরসদুষ্ট হইয়া ইঁহার মনতুষ্টি করিতেছিলেন, কিন্তু ইঁহার

চণ্ডীকাব্য।

লেখনী ভারতচন্দ্রের লেখনী হইতে কতকটা সংযত। জয়নারায়ণের চণ্ডীকাব্যের প্রথম ভাগে শিববিবাহাদি ব্যাপার, এইস্থলে শিষ্য গুরুর ছবির উপর তুলি ধরিতে সাহসী ; ইহাতে তিনি কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, বলা যায় না, কিন্তু তাঁহার সাহস ধৃষ্টতা নামে বাচ্য হইবার যোগ্য নহে। মহাদেবের যোগ ভঙ্গ করিতে ঋতুবাজ আসিয়াছেন, কামদেব সেনাপতি। কবির বর্ণনা এইরূপ ;—

"মহেশ করিতে জয় রতিপতি সাজিল। দামামা ভ্রমররব সঘনে বাজিল॥ নব কিশলয়েতে পতাকা দশ দিশেতে। উড়িল কোকিল সেনা সব চারি পাশেতে। ত্রিগুণ পবন হয় যোগ গতি বেগেতে। ফুলধনু পিঠে, ফুলশর করপরেতে॥ ভ্রমাইয়া ভাঙ্গে আড় হেরি আঁখি কোণেতে। কুসুমের কবচ হাতে কিরীট সাজে শিরেতে॥ বামবাহু রতি গলে, রতিবাহু গলেতে। ভুবন মোহন কর হর মন মোহিতে॥ বায়ুবেগে সকলে উত্তরে হিমগিরিতে। আগমন মদন সকল ঋতু সহিতে॥ কুসুমে প্রকাশ গিরি বন উপবনেতে। নানা ফুল ফুটিল ছুটিল রব পিকেতে॥ ছুটিল মামিনী-মান, লাগিল ধ্বনি কাণেতে। মৃত তরু জীবিত নবীন ফুল পাতেতে॥ থরথর কেতকী কাঁপিছে মৃদুবাতেতে। অকালে অশোক ফোটে সেফালিকা দিনেতে॥ ললিত মালতী ফোটে যূথিকার ডালেতে। বকুল কদম্ব নাগকেশরের পরেতে॥ মধুকর রব বলি ডাকে মন মদেতে। কুহরিছে কোকিলসমূহ পাঁচ শরেতে॥ নব লতা মাধবীর নতশিরে ভূমেতে। পলাশ টগর বেল নত ফুলভরেতে॥"

ইহার পর পশু পক্ষীর ক্রীড়ার একটি পূর্ণ আবেশময় চিত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে অশ্লীলতার একটু গন্ধ আছে, এজন্য উদ্ধৃত করিতে বিরত হইলাম, কিন্তু তাহা এত সুন্দর যে আমাদের ইচ্ছা হইয়াছিল সেই অশ্লীলতাটুকু মুছিয়া ফেলিয়া কবির কবিত্ব-শক্তি দেখাই ; ভাবাবেশে হরিণী শূকরের সঙ্গে যাইয়া মিলিল, শূকরী হরিণের সঙ্গে খেলিতে লাগিল , স্বীয় শরপ্রভাবে এই প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় লক্ষ্য করিয়া—"চর চর রসেতে মোহন বাণ হাতেতে। সকলের ভাব দেখি মনে মনে হাসিতে।"—কামদেব শিবের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন ; কিন্তু কবি মহিমান্বিত শিবমূর্ত্তিটিকে ভাঙ্গিয়া একটি সুন্দর পুতুল গড়িয়াছেন ; তিনি কালিদাসের স্পষ্ট অনুকরণ করিয়াও সেই শিবের মহিমার ছায়া উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, এইজন্যই বিশাল দেবদারুদ্রুমবেদিকা হইতে তাঁহাকে উঠাইয়া আনিয়া রত্নবেদীর উপরে স্থাপিত করিয়াছেন,—কিন্তু তিনি কালিদাসের কুমারসম্ভব এরূপভাবে আয়ত্ত করিয়াছিলেন যে, অনেক স্থলে তাঁহার পদ কালিদাসের শ্লোক ভাঙ্গিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে, যথা—"নিরখিতে দেবগণ, ডাকে শুন ত্রিলোচন, রক্ষ রক্ষ দয়াল দীনেশ। যাবৎ এ দেববাণী, শিবকর্ণে হৈল ধ্বনি তাবৎ মদন ভস্মশেষ॥"

জয়নারায়ণের রতিবিলাপটি ভারতের রতিবিলাপ হইতে সুন্দর ; এই রতিবিলাপ অলঙ্কার শাস্ত্র হইতে অপহৃত ; কিন্তু কবি পাকা চোর, এমন সুন্দরভাবে আহৃত কথা যোজনা করিয়াছেন যে, তাহা ধরিবার উপায় নাই, যথা,—

"অন্য নায়িকার ঘরে, নিশীথে বঞ্চিয়া ভোরে, মোর কাছে এসেছিলা তুমি। খণ্ডিতা অধীরা হৈয়া, মন রাগ না সহিয়া,

মন্দ কাজ করিছিনু আমি॥ রঙ্গণের মালা নিয়া, দুহাতে বন্ধন করিয়া, কর্ণ-উৎপলে তাড়িছিলে। সেই অভিমান মনে, করিয়া আমার সনে, রস রঙ্গ সকলি ত্যজিলে॥ আর দুঃখ মনে জ্বলে, একদিন নৃত্যকালে, পদের নূপুর খসেছিল। ত্বরা তুমি দিতে পায়, বিলম্ব হইল তায়, দিতে দিতে তাল ভঙ্গ হৈল॥ তাতে আমি মান করি, নৃত্য গীত পরিহরি, বসিয়া রহিনু মৌনী হয়ে। যত সাধ কৈলা তুমি, পুনঃ না নাচিনু আমি, তাতে রৈলে বিরস শুইয়ে॥" ইত্যাদি।

পুস্তক ভরিয়াই এইরূপ কোমল পদাবলী,কোমল পুষ্পমালিকায় যেন কবি তাঁহার কাব্যপটখানি ছাইয়া ফেলিয়াছেন; কপট সন্ন্যাসী গৌরীর নিকট শিবনিন্দা করিতেছেন, পাঠক কালিদাসের কবিতা স্মরণ করিতে করিতে বঙ্গীয় কবির এই লেখা পাঠ করুন,—"করেতে বদন যবে তোমার ধরিবে। ঐরাবত শুণ্ডে কি কমলিনী শোভিবে॥ বাম উরে বসাইলে শোভিবে তেমন। শিরীষ-কলিকা হিমগিরিতে যেমন॥ আলিঙ্গনে শোভা পাবে কুমুদিনী মত। সমুদ্রের মধ্যে অতি তরঙ্গ দুলিত॥ আভরণে অঙ্গভূষা চিতা ভস্ম যার। সিদ্ধি দিতে পারিলে পাইবে মন তার॥

মূল চণ্ডীকাব্যের বিষয়ে জয়নারায়ণ মুকুন্দরামের চিত্র সংশোধন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এ সমকক্ষতার চেষ্টা বড় সহজ নহে; ভাষার জোরে তিনি কবিকঙ্কণকে পদচ্যুত করিতে প্রয়াসী; এস্থলে কবিকে আমরা নিতান্ত ধৃষ্ট বলিব। জয়নারায়ণের চণ্ডীতে সুলোচনা এবং মাধবের উপাখ্যান জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহা দীর্ঘ, কিন্তু শব্দবিন্যাসের লালিত্যে এই উপাখ্যানটি পাঠকের ক্লান্তিকর হয় নাই; নমুনা স্বরূপ কিছু তুলিতেছি,—"শরীর থাকিলে দেখা সথায় অবশ্য। কমল ভ্রমরে দেখ তাহার রহস্য॥ শিশিরে কমল মজি থাকে সুলক্ষণা। বর্ষাকালে পাই হয় জীবন বাসনা॥ দিনে দিনে লতা বারি ভেদিয়া উঠিয়া। হইয়া কলিকা, সথা সহায়ে ফুটিয়া॥ প্রফুল্ল হইয়া প্রেমে মনের উল্লাস। মিলে আসি পূর্ব্বভৃঙ্গ মনে বহু আশ॥ পুন পদ্মিনীর মধু মধুকর পিয়ে। অবশ্য যে দেখা হয় যদি দুই জীয়ে॥"

হরিলীলা।

"হরিলীলা"—সত্যনারায়ণের ব্রতকথা, কিন্তু জয়নারায়ণের হাতে ইহা ব্রতকথার ক্ষুদ্র সীমা লঙ্ঘন করিয়া একখানি সুন্দর বড় কাব্যে পরিণত হইয়াছে। আমরা প্রাচীন সত্যনারায়ণের ব্রতকথা অনেকগুলি পাইয়াছি, কিন্তু ইহার সঙ্গে সেগুলির তুলনা হয় না,—ইহা বিস্তীর্ণ, নানারসপুষ্ট বড় কাব্যকথা। এই পুস্তকে আনন্দময়ীর রচনা সন্নিবিষ্ট আছে,—সে গুলিতে তাঁহার ভণিতা নাই, স্ত্রীলোকের ভণিতা দেওয়ার রীতি ছিল না; বিশেষ পূর্ব্ববঙ্গের রমণী, তিনি লজ্জায় নিজের নাম ভণিতায় দিতে সম্মত হন নাই। আনন্দময়ীর পিতৃকুলোদ্ভব প্রাচীন ব্যক্তিগণ তাঁহার রচনাগুলির সঙ্গে বিশেষ পরিচিত, তাঁহারা একবাক্যে সেই সকল অংশ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। অশীতিপর বৃদ্ধ ফরিদপুর সেনদিয়ানিবাসী সুবিজ্ঞ শ্রীযুক্ত গুরুচরণ মজুমদার মহাশয় আমাদিগকে যে সকল অংশ আনন্দময়ীর রচিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, কবির বংশীয়েরাও ভিন্ন সময়ে ভিন্ন স্থানে আমাদিগের নিকট সেইগুলি তদীয় রচনা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। এ বিষয়টি স্থানীয় অনুসন্ধান দ্বারা সুলেখক অক্রূরচন্দ্র সেন ও আনন্দনাথ

রায় মহাশয়দ্বয়ও নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। পিতৃব্যের রচনা হইতে আনন্দময়ীর রচনায় আড়ম্বর ও পাণ্ডিত্য বেশী, আমরা তাহা পরে দেখাইব, এখন জয়নারায়ণের নিজ লেখার কয়েকটি অংশ হরিলীলা হইতে উদ্ধৃত করিতেছি,—

(১) "সভামধ্যে রত্ন সিংহাসনে নরপতি। শিরে শ্বেত-ছত্র ইন্দুকুন্দ জিনি ভাতি॥ ধ্বক্ ধ্বক্ জ্বলে ভস্ম ত্রিপল্লব ভালে। মিস্ মিস্ যজ্ঞভস্ম ভ্রূমধ্যে জ্বলে॥ * * * টল্ টল্ মুকুতা কুণ্ডল কাণে দোলে। চল্ চল্ গজমতি মালা দোলে গলে॥ কস্ কস্ কসাতা সটুকা কটিতে। ঝল্ ঝল্ ঝকমকে স্বর্ণ ঝালরেতে॥ ডগমগ সপ্ত কন্যা চামর লইয়া। ধীরে ধীরে দোলাইছে রহিয়া রহিয়া॥ ঝন্ ঝন্ লাগে কাণে কঙ্কণের ধ্বনি। ঝক্‌মক্ চামর দণ্ডেতে জ্বলি মণি॥" —রাজসভা-বর্ণন।

(২) "আঁচলে ধরিয়া টানিছে নাগর, টানিয়া ছাড়ায় সুন্দরী। মান ভঙ্গ করি সম্মুখে আনিল, নাগর যতন করি॥ সোণার নাগর নাগরী দ্বন্দ, হেরিয়া করিল রঙ্গ। স্বত্বত্যাগেতে করিলা দান, আপনার বর অঙ্গ॥ কাণে মুখ রাখি কহিছে নাগর, হৈল নাকি মান ভঙ্গ।"—নায়িকার মানভঙ্গ।

(৩) "ঘোরতর রজনী অতীত এই মতে। পূর্ব্বদিক রক্ত দিনকর কিরণেতে॥ আকাশে নক্ষত্রগণ ভাঙ্গি যায় মেলা। চক্রবাকী প্রবর্ত্ত পতির প্রেম খেলা॥ * * * পাখীগণ ইতি-উতি নিজ বাসা ছাড়ে। বিরলে ডাকিছে কাক ভূমে নাহি পড়ে॥ চন্দ্রভাণ করযুগ ধরি সুনেত্রার। যাই বলি বিদায় মাগিছে বার বার॥ উষাকালে যাত্রা করি যায় চন্দ্রভাণ। সজল নয়নে ধনী পাছেতে পরাণ॥ যতদূর চলে আঁখি চাহে দাঁড়াইয়া। সুধাকর যার ইন্দীবর ভাঁড়াইয়া॥ নিশি ভরি কুমুদিনী কৌতুকে আছিল। রবি অবলোকনে মুখ মলিন হইল॥"—সুখনিশি-প্রভাত।

মিষ্টশব্দপ্রয়োগপটু কবি জয়নারায়ণের কাব্যের একটি বৃহৎ দোষ আছে,—উহা সেই যুগের দোষ, এ অভিযোগ হইতে ভারতচন্দ্রেরও অব্যাহতি নাই। এই সব কাব্য কেবলই শব্দের কাব্য, ভাবের অভাবে শব্দের লালিত্য অনেক সময়ই নিষ্ফল হইয়া পড়ে। এত বড় কাব্যগুলি সমগ্র পাঠ করিয়াও চক্ষুর কোণে একবিন্দু অশ্রু নির্গত হয় না, একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিবার প্রয়োজন হয় না। কাব্য অর্থ কেবলই বাক্য নহে, "কাব্যং রসাত্মকং বাক্যং।" রসবিহীন বাক্যাবলী চিত্তে কোন স্থায়ীভাব মুদ্রিত করে না; ঘষা মাজা সুন্দর শব্দ কর্ণের তৃপ্তিসাধন করিতে পারে মাত্র, কিন্তু তাহার ধ্বনি মনে পৌঁছে না। সংস্কৃতে পাণ্ডিত্য ক্রমে বঙ্গভাষার উপর গভীরতর ছায়া নিক্ষেপ করিয়াছিল, ভারতচন্দ্রের পরে বঙ্গভাষাকে সংস্কৃত দ্বারা পুষ্ট করিবার চেষ্টা রহিত হয় নাই, ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়াছে,—আমরা আনন্দময়ীর রচনা হইতে দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি,—

"হের চৌদিগে কামিনী লক্ষে লক্ষে। সমক্ষে, পরক্ষে, গবাক্ষে, কটাক্ষে॥ কতি প্রৌঢ়ারূপা ওরূপে মজন্তি। হসন্তি, শ্বলন্তি, দ্রবন্তি, পতন্তি॥ কত চারু বক্ত্রা, সুবেশা সুকেশা। সুনাসা, সুহাসা, সুবাসা, সুভাষা॥ কত ক্ষীণমধ্যা, শুভাঙ্গা সুযোগ্যা। রতিজ্ঞা, বশীজ্ঞা, মনোজ্ঞা, মদজ্ঞা॥ দেখি চন্দ্রভাণে, কত চিত্তহারা। নিকারা, বিকারা, বিহারা, বিভোরা॥ করে দড়ি দৌড়া মদমত্ত প্রৌঢ়া॥ অনূঢ়া, বিমূঢ়া, নবোঢ়া, নিগূঢ়া॥ কোন কামিনী কুণ্ডলে গণ্ড ঘৃষ্টা। প্রহৃষ্টা, সচেষ্টা, কেহ ওষ্ঠদষ্টা॥ অনঙ্গাস্ত্রভিন্না,

আনন্দময়ীর রচনা।

কত স্বর্ণবর্ণা। বিকীর্ণা, বিশীর্ণা, বিদীর্ণা, বিবর্ণা॥ কারো ব্যস্ত বেণী নাহি বাস বক্ষে। কারো হার কুর্পাস বিত্রস্ত কক্ষে॥ গলদ্ভূষণা কেহ, নাহি বাস অঙ্গে। গলদ্‌রাগিণী॥ কেউ মাতিয়া অনঙ্গে॥ কারো বাহুবল্লী কারো স্কন্ধদেশ। রহিয়া সাধু বাক্য বক্তে প্রকাশে॥ * * * সুকক্ষে নিতম্বে উর হেমকুম্ভে। এভাবে ও ভাবে হাঁটিতে বিলম্বে॥ তাহে দোলিতা লাজভারি ভরেতে। পরে হেলি ঢুলি অনঙ্গ জ্বরেতে। সুনেত্রাকে কেহ, কেহ চন্দ্রভাণে। করে সেক তোরে সবে সাবধানে॥ সুহস্তে ঢালিছে সর্ব্ব বারি অঙ্গে। ঝণত্ ঝণত্ গলত্ গলত পড়ে নীর অঙ্গে॥ * * * সখী চন্দ্রভাণে বলে চাতুরীতে। এ রত্নের মালা কাকের গলাতে॥ শুনি চাতুরী দম্পতি হেটমাথে। ঢলাঢল গলাগল সখী সর্ব্ব তাতে॥"—চন্দ্রভাণ ও সুনেত্রার বাসি বিবাহ, (হরিলীলা)। বাঙ্গলা কবিতা এখন আর আপামর সাধারণের বুঝিবার বিষয় নহে। ইহার অর্থবোধের জন্য এখন অধ্যাপক নিযুক্ত করিতে হয়। এজন্য সহজ পদ্য রচনার প্রথা প্রবর্ত্তিত হওয়া আবশ্যক হইয়াছিল। সাহিত্যক্ষেত্রে আমাদের ইংরেজ গুরুগণ উপযুক্ত সময়েই আসিয়া গদ্য লেখার প্রণালী শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহা না হইলে সংস্কৃতাজ্ঞ বাঙ্গালিগণ বাঙ্গালা ভাষায়ও দন্তস্ফুট করিতে অক্ষম হইয়া এককালে সাহিত্যরসে বঞ্চিত হইতেন বলিয়া আশঙ্কা হয়।

আনন্দময়ীর সহজ রচনার একটু নমুনা দিতেছি—"আসি দেখহ নয়নে। হীন তনু সুনেত্রার হয়েছে ভূষণে। হয়েছে পাণ্ডুর গণ্ড, রুক্ষ কেশ অতি। ঘরে আসি দেখ নাথ এ সব দুর্গতি॥ রহিয়াছি চির বিরহিণী দীনমনে। অর্পণ করিয়া আঁখি তোমা পথ পানে॥ * * * ভাবি যাই যথা আছ হইয়া যোগিনী॥ না সহে এ দারুণ বিরহ আগুনি॥ যে অঙ্গে কুঙ্কুম তুমি দিয়াছ যতনে। সে অঙ্গে মাখিব ছাই তোমার কারণে॥ যে দীর্ঘ কেশেতে বেণী বাঁধিছ আপনি॥ তাতে জটাভার করি হইব যোগিনী॥ শীতভয়ে যে বুকেতে লুকায়েছ নাথ। বিদারিব সে বুক করিয়া করাঘাত॥ যে কঙ্কণ করে দিয়াছিলা হৃষ্ট-মনে। সে কঙ্কণ কুণ্ডল করিয়া দিব কাণে॥ তব প্রেমময় পাত্র ভিক্ষা পাত্র করি। মনে করি হরি স্মরি হই দেশান্তরী। তাতে মাতা প্রতিবন্ধ বাহিরিতে নারি॥ আর তব শ্লাঘ্যধন বিষম যৌবন। লুকাইয়া নিয়া ফিরি দরিদ্র যেমন॥"—বিরহিণী সুনেত্রা; (হরিলীলা)। কিন্তু ইহার অব্যবহিত পরেই রমণীকবির দৃষ্টি শব্দালঙ্কারের প্রতি পুনঃ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। অলঙ্কার দেখাইবার স্পৃহা রূপসীগণের স্বাভাবিক, আনন্দময়ী নূতন কোন অপরাধ করেন নাই,—কিন্তু নিম্নোদ্ধৃত রচনা পড়িয়া আনন্দময়ীর অলঙ্কারস্পৃহা পাঠক কি স্ত্রীলোকসুলভ রোগ বলিতে ইচ্ছা করিবেন?—"পতিশোক সাগরে, না দেখিয়া নাগরে, ফিরে যেন পাগরে ডাক ছাড়ি। হইয়ে জীব শেষা, বিগলিত বেশা, লটপট কেশা ভূমে পড়ি॥"

জয়নারায়ণের চণ্ডীতে দশ অবতার স্তোত্রের এই দুইটি পংক্তি আনন্দময়ী লিখিয়া দিয়াছিলেন;—"জলজ বনজ যুগ যুগ তিন রাম। খর্ব্বাকৃতি বুদ্ধদেব কল্কি সে বিরাম॥" এই পংক্তিদ্বয় একটি সংস্কৃত শ্লোকের অনুবাদ। ইহা বলা বাহুল্য, এই দুই ছত্রেই দশ অবতারের নাম সংক্ষেপে প্রদত্ত হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্তরূপ শব্দ বিন্যাসের কৌশল গিরিধরকৃত "গীতগোবিন্দের অনুবাদেও" বিশেষরূপে দৃষ্ট হইবে। এই গীতগোবিন্দানুবাদখানি ১৭৩৬ খৃঃ অব্দে—(ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের ১৬ বৎসর

পূর্ব্বে) সমাপ্ত হয়। রসময়দাসকৃত একঘেয়ে পয়ার ছন্দের অনুবাদে মূল গীতগোবিন্দের পদলালিত্যের চিহ্ন উপলব্ধি হয় না, তথাপি উহা বেশ প্রাঞ্জল ও শ্রুতিমধুর। প্রথমাংশ হইতে একটু উদ্ধৃত করিতেছি, পাঠক "মেঘৈর্মেদুরমম্বরং" স্মরণ করিতে করিতে পাঠ করুন ;—"মেঘ আচ্ছাদিলা সব গগনমণ্ডলে। মেঘাবৃত চন্দ্রমা হইয়াছে সেই কালে॥ বনভূমি তমালের বর্ণ সর্ব্ব স্থানে। শ্যাম হইয়াছে কেহো নাহি জানে॥ যদি বল মনুষ্যের গমনাগমনে। যেমনে চলিবে তার শুন বিবরণে॥ অন্ধকারে অভিসারের বেশ ভূষা করি। চলহ নিকুঞ্জে সব ভয় পরিহরি॥ আনন্দে নিদেশ পাইয়া চলে দুইজন। প্রতি কুঞ্জে কুঞ্জলীলা করে দুইজন। অধ্ব কুঞ্জ লক্ষ্য করি নানা লীলা করে। চলিলেন বৃন্দাবনে স্বচ্ছন্দে বিহারে॥ প্রিয়া মিলনের ইচ্ছা জানি সেইকালে। মেঘ আচ্ছাদিল গগনমণ্ডলে।" গিরিধর যথাসম্ভব সুন্দরভাবে জয়দেবকৃত গীতিগুলির মনোহারিত্ব বাঙ্গালা ভাষায় প্রতিভাত করিয়াছেন; গীত-গোবিন্দের এই অনুবাদে কেবল অনুস্বার বিসর্কগুলি নাই, কিন্তু শব্দের মিষ্টত্ব বেশ বজায় আছে; চতুর বাঙ্গালী লেখক, বঙ্গভাষাকে কতদুর সংস্কৃতের মত করা যায়, তাহা দক্ষ লিপিকৌশলের সহিত প্রমাণিত করিয়াছেন। আমরা কয়েকটি স্থল উদ্ধৃত করিলাম ;—

গীতগোবিন্দের অনুবাদ।

(১) "তবদন্ত অগ্রে ধরণীর রয়, যেন চন্দ্রে লীন কলঙ্ক হয়, জয় জগদীশ হরি অদ্ভুত শূকররূপ ধারি। হিরণ্যকশিপু ধরিয়া করে, দলিলে ভৃঙ্গের মত নখরে, জয় জগদীশ হরি, অদ্ভুত নরহরি রূপ ধারি॥"

(২) "এ সখি সুন্দরী যুবতী জনে হরি, নাচত কত প্রকার। পবনে লবঙ্গলতা, মৃদু বিচলিত, শীতল গন্ধ বহায়। কুহু কুহু করি, কোকিলকুল কূজিত, কুঞ্জে ভ্রমরীগণ গায়॥ বকুল ফুলে মধু পিয়ে মধুকরগণ, তাহে লম্বিত তরুডাল। পতি দূরে যার, তার প্রতি মনোরথ, মনমথনে হয় কাল। মৃগমদ গন্ধে, তমাল পল্লব, ব্যাপিত হইল সুবাস। যুবজন হৃদয় বিদারিতে, কামের নখ কিবা হইল পলাশ॥ মদন নৃপের ছত্র হেম-নির্ম্মিত কি নাগেশ্বর ফুল। শিলীমুখসদৃশ বাণ নিরমাওল, পাটলী ফুল অতুল॥ দেখি বিলক্ষণ, জগত ফুল ছল তরুণ করুণ কিয়ে হাসে। কেতকী কর সদৃশ করি নিরমিল বিরহীবিদারণ আশে॥"

(৩) "যমুনাতীরে মন্দ বহে মারুত, তাহাতে বসিয়া যুবরাজ। কর অভিসার, করি রতি রস, মদন মনোহর বেশে। গমনে বিলম্বন, না করু নিতম্বিনী, চল চল প্রাণনাথ পাশে॥ তুয়া নিজ নাম, শ্যাম করি সঙ্কেত, বাজায় মূরলী মৃদুভাষে। তুয়া তনু পরশি, ধূলিরেণু উড়ত, তাহে পুনঃ পুনঃ প্রশংসে॥ উড়াইতে পক্ষী, বৃক্ষদল বিচলিতে তুয়া আগমন হেন মানে। দ্রুতগতি শেষ করত, পুনঃ চমকই, নিরখত তুয়া পথপানে॥ শবদ অধীর, নূপুর দূরে, রিপুর সদৃশ রতিরঙ্গে। অতিতমপুঞ্জ, কুঞ্জবনে সখি চল, নীল ওড়নি নেহ অঙ্গে॥"

এখন আমরা আর একখানি পুস্তকের উল্লেখ করিয়া কাব্য-শাখার উপসংহার করিব, এই পুস্তকের নাম 'গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী'। 'গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী'-লেখক দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কৃষ্ণনগরান্তর্গত উলাগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ; ইঁহার পিতার নাম আত্মারাম মুখোপাধ্যায় ও মাতার নাম অরুন্ধতী। অনুমান ১০০ বৎসর পূর্ব্বে 'গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী লিখিত হয়। সকল দেবতাই ভাষাকাব্যরূপবাহনে আরোহণ করিয়া বঙ্গীয় গৃহস্থের ঘরে

গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

পূজা গ্রহণ করিতে আগমন করিলেন; বোধ হয় শিবের জটার কুটিল ব্যূহে আবদ্ধ গঙ্গাদেবী যথাসময়ে এ সংবাদ জানিতে পারেন নাই, বহু বিলম্বে তাঁহার ধারণা হইল, "ভাষায় আমার গান নাই।" তখন কালগৌণ না করিয়া উলাগ্রামে দুর্গাপ্রসাদের স্ত্রী হরিপ্রিয়ার স্কন্ধে আরূঢ় হইয়া স্বপ্ন প্রচার করিলেন—তোমার স্বামীকে কহিয়া আমার জন্য কাব্য লিখাও।" কিন্তু তখন ইংরেজের অভ্যুদয়ে দেবদেবীর আফিস বন্ধপ্রায়; যে বৎসর রাজা রামমোহন রায় "হিন্দুগণের পৌত্তলিক ধর্ম্ম-প্রণালী" রচনা করেন, সম্ভবতঃ সেই বৎসর স্ত্রীর মারফৎ প্রত্যাদেশ, প্রাপ্ত হইয়া দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 'গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী' লিখিতে প্রবৃত্ত হন। 'গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী'তে মধ্যে মধ্যে রচনার পারিপাট্য আছে। আমাদের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহীগণ যখন যুবতী ছিলেন, তখন তাঁহারা কি কি অলঙ্কার পরিয়া আমাদের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহগণের মন চুরি করিতেন, তাহা নিম্নোদ্ধৃত পংক্তি-নিচয়ে দৃষ্ট হইবে;—

"ঢেঁড়ি, চাঁপি, মাকড়ি কর্ণেতে কর্ণফুল। কেহ পরে হীরার কমল নহে তুল॥ নাসিকাতে নথ কারো মুক্ত চুণী ভালো। লবঙ্গ বেশরে কারো মুখ করে আলো॥ কিবা গজমুক্তা কারো নাসিকার কোলে। দোলে সে অপূর্ব্ব ভাব হাসির হিল্লোলে॥ কুন্দকলিকার মত কারো দন্তপাতি। দাড়িম্বের বীজ মুক্তা কারো দন্তভাতি॥ মাজ্জিত মজ্জনে দন্ত মধ্যে কালরেখা। মনে লয় মদনের পরিচয় লেখা॥ মুখ শোভা করে কারো মন্দ মন্দ হাসি। সুধার সাগরে ঢেউ হেন মনে বাসি॥ পরিল গলায় কেহ তেনরী সোনার। মুকুতার মালা কণ্ঠমালা চন্দ্রহার॥ ধুকধুকি জড়াও পদক পরে সুখে। সোণার কঙ্কণ কারো শঙ্খের সম্মুখে॥ পতির আয়ুৎ চিহ্ন সোহাগ যাহাতে। পরাণ-বাঙ্গান লোহা সকলের হাতে॥ পাতা মল পাশুলি আনট বিছা পায়। গুজরী পঞ্চম আর শোভা কিবা তায়॥"

এই অলঙ্কারের অনেকগুলি এখন মুসলমান-পাড়ায় খোঁজ করিলে পাওয়া যাইবে।

৪। গীতি-শাখা।

গীতি-সংস্কার।

মুসলমানী কেচ্ছার কলুষস্রোতের মুখে পড়িয়া বঙ্গসাহিত্য কলুষিত হইয়াছিল। বিদ্যাসুন্দর, পদ্মাবতী, হরিলীলা প্রভৃতি কাব্যের ভাষা খুব শ্রীসম্পন্ন; কিন্তু চিত্রের পদ্মে মধুমক্ষিকার তৃপ্তি হয় না, রসহীন লিপি-কৌশলেও শ্রোতার মন বহুক্ষণ মুগ্ধ থাকিতে পারে না; সাহিত্যের পঙ্ক উদ্ধার করিয়া নির্ম্মল ভাবের প্রবাহে পাঠকের কামনা পরিতৃপ্ত করিতে, পুনশ্চ প্রতিভাবান্ লেখকের লেখনীর প্রয়োজন হইল। এই প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে রাজদরবার ও তৎসংশ্লিষ্ট স্থান সমূহের কলুষিত হাওয়া হইতে অতি দূরে—পল্লীগ্রামের স্বভাবসিদ্ধ ছায়ায় অনেকগুলি কলকণ্ঠ কবির আবির্ভাব হইল। কিন্তু এই গীতিশাখা একবারে নির্দ্দোষ নহে, ইহার একাংশ বিদ্যাসুন্দরাদি কাব্যের রুচি কর্ত্তৃক অধিকৃত রহিয়াছে,—কিন্তু অপরাংশ

অতি সুনির্ম্মল। এই দেশের সাহিত্যে কাব্য অপেক্ষা গীতিই প্রশংসনীয়, কারণ এখানে কর্ম্ম অপেক্ষা ভক্তিই অধিক কার্য্যকরী, এই যুগের সাহিত্যেও গীতিরই শ্রেষ্ঠত্ব দৃষ্ট হইবে।

গীতি কবিতায় গার্হস্থ চিত্র।

বঙ্গদেশের কতকগুলি গভীর প্রাণের কামনা ছিল,—শিশু কন্যার পিতৃগৃহ হইতে গমন, দুধের মেয়ে অষ্টমবর্ষে গৌরী সাজিয়া গৃহ ছাড়িয়া যাইত, তাহাকে ধূলিখেলা সাঙ্গ করিয়া অবগুণ্ঠনবতী যুবতী বধূর অভিনয় করিতে হইত, মাতৃবিরহে বালিকা ঘোমটা-ঢাকা সুন্দর মুখখানি চক্ষুজলে প্লাবিত করিয়া পথের পানে তাকাইয়া থাকিত; মায়ের রাত্রিও সুখে প্রভাত হইত না,—ক্রোড়ের শিশু ছাড়া মা স্বপ্ন দেখিয়া পাগলিনীর ন্যায় কাঁদিয়া বলিতেন,—"উমা আমার এসেছিল। স্বপ্নে দেখা দিয়ে, চৈতন্ত করিয়ে, চৈতন্ত-রূপিণী কোথায় লুকাল।" বহুদিনের অশ্রুসিক্ত এই বিরহ-ব্যাপারের পর যখন বালিকা ফিরিয়া আসিত, তখন কত সুখ!—"আমার উমা এলো, বলে রাণী এলোকেশে ধায়।" এই সকল গানের সরল কথায় শ্রোতা অশ্রুজলে গলিয়া পড়িতেন, এগুলির রঙ্গভূমি বস্তুত কৈলাস বা হিমালয়পুরী নহে,—প্রতি গৃহস্থের হৃদয় ইহাদের অনুভূতিক্ষেত্র। এই পরম সুন্দর বাৎসল্যভাবকে আমাদের সাধকগণ ধর্ম্মের ছায়ায় স্থান দিয়াছেন, পুত্রের প্রতি স্নেহ যশোদা চিত্রে ধর্ম্মভাবে পরিণত হইয়াছেন। 'শুন ব্রজরাজ স্বপনেতে আজ, দেখা দিয়ে গোপালে কোথায় লুকালে। যেন সে চঞ্চল চাঁদে অঞ্চল ধরি কাঁদে, জননী দে ননী বোলে॥' প্রভৃতি স্নেহ-উদ্বেলিত ভাব মধুর গানগুলি শ্রোতার হৃদয় ছুঁইত ও চক্ষু অশ্রুপূর্ণ করিত—ইহা গৃহস্থের ধূলি-মাখা আঙ্গিনার কথা, কিন্তু ইহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত নির্ম্মল স্বর্গের প্রতি—কারণ স্বার্থশূন্য পবিত্র স্নেহ পৃথিবীর কথা হইয়াও স্বর্গের কথা। পুরুষের প্রতি রমণীর ভালবাসা এই দেশে উন্নত ধর্ম্মভাবাপন্ন হইয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের সঙ্গে একাঙ্গীভূত হইয়া রহিয়াছে, আমরা "বৈষ্ণবযুগ" অধ্যায়ে তাহা বিস্তারিত-ভাবে দেখাইয়াছি।

রামপ্রসাদের মাতৃভাব।

শিশুর প্রতি মায়ের স্নেহের মাধুর্য্য এক দিকে, নির্ভরান্বিত শিশুর স্নিগ্ধ অভিমানপূর্ণ আব্দার অপর দিকে। মায়ের প্রতি শিশুর সেই গঞ্জনাগুলি বড় মধুর—সেই গঞ্জনার বাহ্য কঠোরতা অশ্রুজলে ধৌত হইয়া কোমল হইয়া গিয়াছে। মায়ের প্রতি রামপ্রসাদের ক্রোধ অশ্রুগঠিত, উহা নামে মাত্র ক্রোধ—উহা নিগৃহীত বালকের স্নেহের স্বত্বস্থাপন। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য প্রেমভক্তির বিশেষ লীলাভূমি। এই প্রেমভক্তিই সময়ে সময়ে অঞ্জনশলাকার ন্যায় লোকচক্ষু উন্মীলন করিয়া দিয়াছে। রাজা রামমোহন রায় গভীর শাস্ত্রানুসন্ধানপূর্ব্বক যে সকল ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন, রামপ্রসাদ নির্ম্মল ভক্তিবিহ্বলতায় তৎপূর্ব্বেই সেগুলি হৃদয়ে অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি প্রেম-স্নিগ্ধ হৃদয়ের অনুভূতির বলে পুস্তকগত বিদ্যার অনেক ঊর্দ্ধে উঠিয়া নির্ম্মল সত্যরাজ্য ছুঁইতে পারিয়াছিলেন

"কি কাজ রে মন যেয়ে কাশী।" "নানা তীর্থ পর্য্যটনে শ্রম মাত্র পথ হেঁটে।" প্রভৃতি বাক্য তীর্থযাত্রার সম্বন্ধে লৌকিক আস্থার প্রতি কটাক্ষপাত নহে, তীর্থসমূহের চরমতীর্থে পৌছিলে বাহ্যিক কর্ম্মকাণ্ডের উপর মনে যে নির্ব্বেদ উপস্থিত হয়, ইহা তাহাই। "ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি জেনেও কি তা জান না। মাটির মূর্ত্তি গড়িয়ে মন তার করতে চাওরে উপাসনা॥ ধাতু পাষাণ মাটী মূর্ত্তি কাজ কিরে তোর সে গঠনে॥" এই সকল উক্তি খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজকগণের কুৎসা বলিয়া কেহ মনে করিবেন না। যিনি চরমতত্ত্ব পাইয়াছেন, ইহা তাঁহার সরল প্রাণের উক্তি, ইহা কোনক্রমেই উপায়কে হেয় প্রতিপন্ন করিতেছে না "বেদে দিল চক্ষে ধূলা, ষড়্‌দর্শনের সেই অন্ধগুলা"—বাক্যে রামপ্রসাদ ভক্তির বলে বলীয়ান্ হইয়া শাস্ত্রের প্রতি কটাক্ষপাত করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। ইহা ছাড়া তাঁহার নির্ম্মল অদ্বৈতবাদসূচক অসংখ্য পদ দৃষ্ট হয়। যে বৎসর রামপ্রসাদের মৃত্যু হয়, সেই বৎসরের শেষভাগে রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করেন। রামপ্রসাদের কণ্ঠে যে গানের অবসান হইয়াছিল, তাহা পুনরায় রামমোহনের কণ্ঠে উত্থিত হইয়া নব্য সমাজকে মাতাইয়া তুলিল। কিন্তু দুয়ের ভাব ভিন্ন, একজন মাতৃমন্ত্রের আত্মহারা সাধক, অপরজন প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে ধর্ম্ম-জগতের যোদ্ধা।

রামপ্রসাদ বিগ্রহপূজা করিতেন, কিন্তু তিনি সেই বিগ্রহের পদতলে বসিয়া অনন্তরূপের ছায়া অনুভব করিতেন। যে ভোগসম্ভার তৎপদপ্রান্তে প্রস্তুত রাখিতেন, তাহা দেখিয়া কখনও ঈষৎ হাস্য-পূর্ব্বক মনে মনে গাহিয়াছেন,—"জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা, সুমধুর খাদ্য নানা। ওরে কোন্ লাজে খাওয়াতে চাস্ তায়, আলচাল আর বুটভিজানা॥" কখনও পুষ্প, বিল্বপত্র পদে দিতে উদ্যোগ করিয়া সেই উৎসর্গ অসম্পূর্ণ জ্ঞানে বলিয়াছেন, "বনের পুষ্প, বেলের পাতা, মাগো আর দিব আমার মাথা।"

কালীমূর্ত্তি যে ভাবে তাঁহার মনশ্চক্রে প্রত্যক্ষ হইত, তাহা মহামহিম, গূঢ় রহস্যে ব্যক্ত—অতি সুন্দর ও ভৈরব; তাহা বর্ণনা করিতে যাইয়া কবি শব্দ ও উপমার জন্য লালায়িত হইয়াছেন; অপ্রস্ফুট সৌন্দর্য্যাবলী জড়িত হইয়া সেই মূর্ত্তি ক্ষণে ক্ষণে নবভাবে তাঁহার হৃদয়ে উদয় হইয়াছে,— "চলিয়ে চলিয়ে কে আসে দ্রুতগতি দলে দানবদলে, ধরি করতলে গজ গরাসে। কেরে—কালীর শরীরে, রুধিরে শোভিছে, কালিন্দীর জলে কিংশুক ভাসে॥" প্রভৃতি গান ভক্তের কণ্ঠে শুনিলে মানসপটে মাধুর্য্যমিশ্র এক গৌরব মণ্ডিত ছবি অঙ্কিত হয়।

সংসারক্লিষ্ট ব্যক্তিগণ এখনও রামপ্রসাদের গানগুলি শুনিয়া সাশ্রুনেত্রে সান্ত্বনা অনুভব করিবেন। আমার মনে পড়ে, গৃহপ্রাঙ্গণে বসিয়া গ্রাম-সন্ধ্যাকালে যখন চিরপরিচিত সুহৃদ-কণ্ঠে,— "নিতান্ত যাবে এদিন কেবল ঘোষণা রবে গো। তারা নামে অসংখ্য কলঙ্ক হবে গো॥" প্রভৃতি গান শুনিতাম, তখন বাল্যকালের সুকোমল অন্তঃকরণে কত বিষাদমাখা মহিমান্বিত ভক্তির কথা জাগিয়া উঠিত। "ভবে আসার আশা, কেবল আশা, আসা মাত্র সার হইল। চিত্রের পদ্মেতে পড়ি ভ্রমর ভুলি রৈল॥ নিম খাওয়ালি



গিরি-গোবর্দ্ধন

মা চিনি বলে কেবল কথায় কন্নি হল। মিঠার আশে তেতো মুখে সারাদিনটা গেল॥ খেলবি বলে আশা দিয়ে মা এনেছিলি এ ভূতল। যে খেলা খেলিলি শ্যামা আশা না পূরল॥ রামপ্রসাদ বলে ভবের খেলা যা হ'ল তা হ'ল। সন্ধ্যা হল, এবার কোলের ছেলে মা কোলে নিয়ে চল॥" প্রভৃতি গান সাংসারিক কষ্টবিড়ম্বিত চিত্তের পক্ষে মাতৃ-অবলম্বনজনিত সান্ত্বনায় সুধাতুল্য। রামপ্রসাদের বৈষ্ণববিষয়ক গানও কোন কোনটি বড় মধুর, একটি এখানে তুলিয়া দেখাইতেছি;—"ওহে নূতন নেয়ে। ভাঙ্গা নৌকা চল বেয়ে। দু-কূল রইল দূ ঘন ঘন হানিছে চিকুর, কেমন কেমন করেছে দেয়া, মাঝ যমুনায় ভাসে খেয়া, শুন ওহে গুণনিধি, নষ্ট হ'ক ছানা দ কিন্তু মনে করি এই খেদ, কাণ্ডারী যাহার হরি, যদি ডুবে সেই তরী, মিছা তবে হইবে হে বেদ।"

আমরা হালিসহরে রামপ্রসাদের স্মৃতিসভায় যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি

সাধক রামপ্রসাদ

"বেদের রুদ্রদেব বিনাশের দেবতা, তাঁহার জটাজুট অগ্নি শলাকার ন্যায়, তাঁহার নৃত্যের না তাণ্ডব, তাহাতে বিশ্ববিকম্পিত হয় ও গ্রহগণ কক্ষচ্যুত হইয়া ব্যোমপথে বিক্ষিপ্ত ভাবে ছুটিতে থাকে রুদ্রের নিশ্বাসের জ্বালা—জগতের শ্মশান; তাঁহার শূলাগ্রে বিদ্ধ হইয়া দিগহস্তীরা আর্ত্তনাদ করি উঠে। তাঁহার নেত্রশাসনে চিত্ত-শ্মশানে কামদেব পুড়িয়া ছাই হয়; তাঁহার মুখোচ্চারিত প্রণ প্রলয়ের গান—বিনাশের ঝঞ্ঝা,—তাহা জগৎকে পুঞ্জীভূত ধূলায় পরিণত করিয়া উড়াইয়া লইয়া যায় তাঁহার বিষাণবাদনের তালে তালে চতুর্দ্দশ মৃত্যু নৃত্য করিতে থাকে।

"বৌদ্ধযুগের শেষভাগে রুদ্র তাঁহার তেজ সম্বরণ করিলেন; সংহারের দেবতা অপূর্ব্ব সৌম্যত প্রতিষ্ঠিত হইলেন, যেন চিতা জ্বলিয়া পুড়িয়া গেল, কতকগুলি ছাই রহিয়া গেল। তাঁহার বিষাণ থামিয়া গেল,—তিনি যোগীর আদর্শ যোগীশ্বর, ক্ষমার আদর্শ ভোলানাথ, ত্যাগীর আদর্শ সর্ব্বত্যাগী হইলেন,—এক কথায় তাঁহার ভয়ঙ্করত্ব চলিয়া গেল, তাহার তাণ্ডব নৃত্য নৃত্যে পরিণত হইল।

"কিন্তু বৈদিক ঋষিরা প্রকৃতিকে যেরূপ ভয়ঙ্করী দেখিয়াছিলেন, তাহাতো এখনও আছে। এ জরা-মৃত্যু তাহাদের রক্তলোলুপ লেলিহান জিহ্বা ব্যাদান করিয়া আছে; এখনও ভীষণ মহামা প্রলয়কাণ্ড হইয়া থাকে, এখনও প্রকৃতির ক্রুদ্ধ নিঃশ্বাসে ফুলের বাগান শুকাইয়া যায় এবং শ্মশা চিতাগ্নি মাতৃহৃদয়ের হাহাকার উপেক্ষা করিয়া পদ্মের কুঁড়ির মত শত শত শিশুকে ধ্বংস করিয়া জ উঠে; এখনও কৃষকের বহুযত্নে উৎপন্ন সোনার ফসল নির্দ্দয় বন্যার স্রোতে ভাসিয়া যায় আকাশের প্রলয় মেঘের কোল হইতে ভীষণ সর্পের ন্যায় খরবিদ্যুৎ ছুটিয়া আসিয়া বিশাল প্রাসাদ ও মন্দিরের স্বর্ণচূড়া ভাঙ্গিয়া ফেলে;—এখনও অনন্তনাগের শিরোকম্পনে জগৎ ভূমিকম্পে শত শত দেশ বিধ্বস্ত হয়, এবং আগ্নেয় পর্ব্বত হইতে ভীষণ জ্বালা ও দ্রব অগ্নি

নিঃসৃত হইয়া সুরম্য হর্ম্ম্যময় নগরীকে ধ্বংসের স্তূপে পরিণত করে। এক কথায় প্রকৃতির যে তাণ্ডব নৃত্য দেখিয়া বৈদিক ঋষি রুদ্র-তাণ্ডব কল্পনা করিয়াছিলেন, সেই ভয়ঙ্করী লীলা তো জগত হইতে এখনও চলিয়া যায় নাই।

রুদ্রদেব শিবসুন্দরে পরিণত হইলেন। হিন্দুর কল্পনায় বুদ্ধদেবের ত্যাগের আদর্শের যে মনোজ্ঞ প্রতিবিম্ব পড়িল—সেই ত্যাগ,জীবের জন্য সেই অপার করুণা, সেই বিশ্বের কল্যাণ-চিন্তা দিয়া তাঁহারা রুদ্রদেবকে নূতন ছাঁচে গড়িলেন। বিশ্ববাসীর কষ্ট দূর করিবার জন্য বুদ্ধ রাজ-প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া ভিক্ষু হইয়াছিলেন, রুদ্রদেবের হস্তেও আমরা ভিক্ষাপাত্র ও কমণ্ডলু দিয়া তাহাকে দেব-ভিখারী সাজাইলাম।

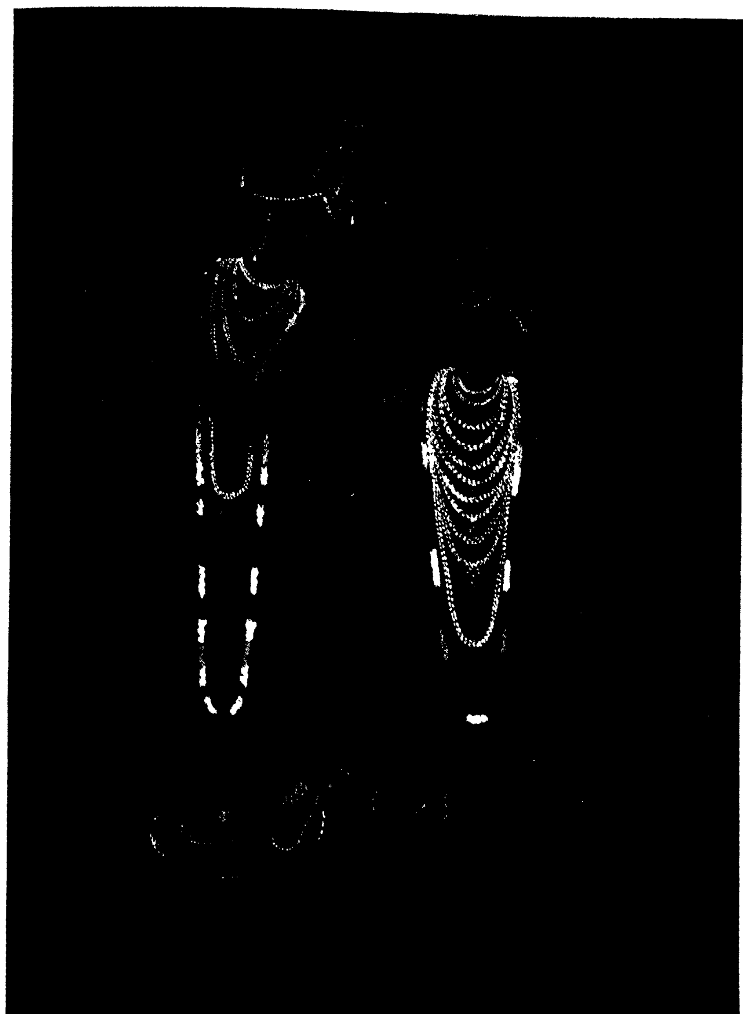
"কিন্তু জগতের যে ভীষণতা আছে, তাহাতো আমাদের জীবনযাত্রার পথে পথে। রোগ, শোক, মারীভয়, দুর্ভিক্ষ, মৃত্যু প্রভৃতি শতরূপে আমরা যে ভীষণতার—নির্ম্মমতার দর্শন পাই, তাহাতো সাধক একেবারে বাদ দিতে পারেন না। এই নির্ম্মম সত্যের কঙ্কাল হাসি যে আমাদিগকে নিত্যই দেখিতে হইবে। ফুল্লারবিন্দপ্রতিম শিশুর মৃদুহাসি মণ্ডিত মুখখানি যেরূপ সত্য, ভীষণ রোগশয্যার প্রেতপ্রতিম কঙ্কালও যে তেমনই সত্য। এই ভয়ঙ্করের দেবতাকে উপেক্ষা করা যায় না।

"যে স্থান এককালে রুদ্র গ্রহণ করিয়াছিলেন,—তিনি শিবত্ব প্রাপ্ত হইলে তাঁহার স্থান কে গ্রহণ করিবে? রুদ্রদেব ক্ষমার আদর্শ—সর্ব্বত্যাগী ভোলানাথে পরিণত হইয়া যুগব্যাপক চেষ্টার ফলে যে মনোজ্ঞমূর্ত্তি গ্রহণ করিলেন, তাঁহাকে তো আর ভীষণ ভাবে কল্পনা করা যায় না। গঙ্গাকে আর ফিরিয়া হরিদ্বারে লইয়া যাওয়া অসম্ভব, ভগীরথ স্বয়ং আসিলেও তাহা হইবার নহে।

"এই ভীষণতার স্থান পূরণ করিবার জন্য চারিদিক হইতে নব নব দেবতা আসিয়া বঙ্গদেশে শক্তি-ব্যূহ রচনা করিলেন,—বঙ্গের ঘরে ঘরে পূজিতা স্মেরাস্যা, হংসারূঢ়া, অরুণিতবসনা মনসা দেবী এই ব্যূহের অন্যতমা।

"কিন্তু এই শক্তিকেন্দ্রের প্রধান দেবতা হইলেন কালী। ইনি বৈদিক দেবতা নহেন। কিন্তু যে স্থান হইতেই ইঁহাকে আমরা গ্রহণ করিয়া থাকিনা কেন; আর্য্যকল্পনা, হিন্দুর সাধনা ইঁহাকে এমনই ধ্যানের মূর্ত্তি দিয়াছে যে, ইনি একাধারে ভয় ও বরাভয়ের অধিষ্ঠাত্রীরূপে এদেশের সর্ব্বপ্রধান মাতৃ-দেবতা হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

"আমরা বলিতে পারি না কেন, এই দেশ বিশেষভাবে কালীমাতার অধিকারভুক্ত। আর কোন্ দেশে এরূপ ভীষণ গর্জ্জন পূর্ব্বক পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্র ধরিত্রী কম্পিত করিয়া চলিয়া যায়? এরূপ নির্ম্মম-ভাবে কোন্ নদনদী-তরঙ্গ রাজনগরের মত কীর্ত্তিগ্রাস করিয়া লেলিহান ধ্বংসলোলুপ জিহ্বা প্রসারণ করে? আর কোন ভূমি এরূপ ভীষণ সিংহ ব্যাঘ্রের জননী? Royal tiger আর কোথায় এরূপ হস্তীর মস্তক চূর্ণ করিয়া রঞ্জিত নখর লেহন করে,—বঙ্গদেশের জঙ্গলের মত কোথায় এরূপ ভীষণ



রাধা-কৃষ্ণ

চন্দ্রবোড়া ও কেউটা জন্মিয়া থাকে? কৃষ্ণমেঘের মত বিশাল কায় হস্তী আর কোন্ দেশের তমাল-তালীবনরাজীনীলা সমুদ্র বেলা ও গিরিগুহায় বিচরণ করে? দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ, মহামারী, রক্ত-শোষণকারী দারিদ্র্য, নানা রোগ আর কোন দেশের লোককে এরূপ ঘন ঘন পীড়ন করে? এক বৎসর ভীষণ দুর্ভিক্ষ, অপর বৎসর ধরিত্রী সুজলা-সুফলা; এক ঋতুতে মেঘের গর্জ্জনে, বিদ্যুৎ স্ফুরণে কুটিরবাসী মুহুর্মুহুঃ জৈমীনির নাম স্মরণ করিয়া শতছিন্ন কন্থার মধ্যে ভয়ে কাঁপিতেছে; অপর ঋতুতে ফুলের বাগানে আনন্দ ধরে না; সরসীর সুনীল জলে রক্তপদ্মের উপর সৌরকর কি হাসিই না মাখাইয়া দিতেছে! এক ঋতুতে পদ্মা মহাজনের কাকুতি মিনতি অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহার সমস্ত সম্পদ উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে বুদ্বুদের ন্যায় ডুবাইয়া দিতেছেন, অপর ঋতুতে পদ্মার পুত্রপ্রতিম জেলেরা মাঝ-দরিয়াকে সিংহাসন মনে করিয়া তাহাদের ক্ষুদ্র ডিঙ্গা চালাইয়া দিতেছে, এবং করুণাময়ী মাতার নিকট হইতে ঝুড়ি ভরিয়া মৎস্য উপহার লইয়া বাড়ী ফিরিতেছে। এক ঋতুর গভীর তমিস্রার ন্যায় মেঘকুন্তলা দিক্-বধূগণ তাঁহাদের গাঢ় অন্ধকার-লহরীর বেণী দোলাইয়া দিয়া বিদ্যুৎ কটাক্ষের পৈশাচিক দীপ্তি দ্বারা পথিককে ভয় দেখাইতেছেন; অপর ঋতুতে শুভ্র জ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনী প্রেমাবেশে ঢুলুঢুলু চোখে চাহিয়া দম্পতী-হৃদয়ে আনন্দ ঢালিয়া দিতেছেন। একদিকে যেমন বঙ্গপ্রকৃতি খাঁড়া ও নরমুণ্ড দেখাইয়া আতঙ্কিত করিতেছেন, আর একদিকে তেমনই বিচিত্র আনন্দ ও শোভাসম্পদ লইয়া যেন আমাদিগকে বর দিতেছেন। এক হস্তে উত্তোলিত খড়্গে বিদ্যুতের ঝলক খেলিতেছে; অপর দিকে প্রসারিত করপদ্ম দ্বারা মাতা "মাভৈঃ" এই ইঙ্গিত করিতেছেন।

"সুতরাং আমাদের দেশ যে বিশেষভাবে এই করাল বদনা, মহিয়সী, মধুরহাসিনী মাতৃদেবতার অধিকারে, তাহা আর বেশী বুঝাইতে হইবে না। দাশরথীর সঙ্গীত ইঁহাকে একবার বলিতেছে "নিরমল নিশাকর করকপালিনী" আর বার সেই সুর বদলাইয়া বলিতেছে "নাগিনী জড়িত জটা বিভূষিণী" এক পংক্তিতে "নিরমল নিশানাথ নিভাননী" এবং অপর পংক্তিতে "লোল রসনা করাল বদনী"—"নিতম্বে নিচোল শার্দ্দূল ছাল, বামকরে শোভে খর করবাল" এই ভীষণ রূপের সহিত সুন্দরের সমাবেশ শাক্ত কবি ছাড়া আর কে করিতে পারিয়াছেন? একছত্রে তিনি বলিতেছেন "নীলনলিনী—জিনি ত্রিনয়নী"—অপর ছত্রেই বলিতেছেন "লোল রসনা করালবদনী।"

"এই উত্তাল, নির্ম্মম উদ্দাম প্রকৃতির মেরুদণ্ডে পুরুষ। তাঁহার কত বড় স্থৈর্য্য! প্রকৃতির ভীষণ লীলায় সরোবরের শত শত পদ্ম শুকাইয়া যাইতেছে, আবার পরদিন কোন চিরস্থায়ী ভাণ্ডার হইতে নূতন শত শত পদ্ম-কুঁড়ি ফুটিতেছে; প্রতিদিন শত শত শিশু শ্মশানের আগুনে জ্বলিয়া ছাই হইতেছে আবার পরদিন আঁতুড় হইতে শত শত শিশুর অধরে অমিয়-হাস্য ফুটিয়া উঠিতেছে! এই নিত্য ধ্বংস লীলার মধ্যে কে স্থির অচঞ্চল ও অবিনাশী ভাণ্ডার লইয়া বসিয়া আছেন? কাহার এ

অতুলনীয় ধৈর্য্য, যাহা প্রকৃতির অবিরাম ধ্বংস-লীলার মধ্যে নিত্যকে অপরূপ সুন্দর ও অবিচল করিয়া রাখিয়াছে ? সে ধৈর্য্য কি অসীম, তাহা এক মৃত্যুর সঙ্গেই তুলনীয়। মড়াকে মার, কাট, তাহার পাঁজর ভাঙ্গ, সে নড়িবে না! যে পুরুষপ্রবর এই তাণ্ডব লীলাময়ী প্রকৃতিকে আশ্রয় দিয়াছেন, তিনি সেই মৃতের ন্যায়ই ধৈর্য্যশীল ; তিনি যে কালসর্পকে বুকে করিয়া স্মিতবদনে শুইয়া আছেন। প্রকৃতি পুরুষের এই অপূর্ব্ব লীলা দেখিয়া পুরুষবরের প্রতি অপার করুণায় ভক্তহৃদয় গলিয়া গিয়াছিল, তাই তিনি গাইয়াছিলেন,—

"নেমে নাচগো ন্যাংটা নারী
বাজবে মহেশের বুকে"

"এই প্রকৃতির লীলা পুরুষই চিনিয়াছেন—তাই এই ধ্বংসকে তিনি আদর করিয়া বুকে লইয়াছেন। এই ধ্বংস দ্বারা তিনি জগতের নিত্য আনন্দ-লীলা সৃষ্টি করিয়াছেন, লীলাময়ীকে তিনি নিত্যলীলার সহায় মনে করিয়া অসীম ধৈর্য্যের সহিত তাঁহার পদপঙ্কজ বক্ষে রাখিয়া নিজে মৃতের ন্যায় পড়িয়া আছেন। ভক্তের ভয় বৃথা, তাঁহার পাঁজর ভাঙ্গিবে না, এই বজ্রনির্ম্মিত পাঁজর পোড় খাইয়া অমর হইয়াছে—অপার্থিব অলৌকিক আনন্দ এই পাঁজরের দৃঢ়তা জন্মাইতেছে পরম নির্ভয় দেবতা তাঁহার আনন্দ-সাধনায়—এই প্রাকৃতিক লীলাকে অনশ্বর সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়াছেন—তাঁহার স্পর্শে ক্ষণভঙ্গুর নিত্যচঞ্চল প্রকৃতি অমরতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

"রামপ্রসাদের সময়ে দেশব্যাপক অরাজকতা। তখন মোগল সাম্রাজ্য পতনোন্মুখ, সেই পতনোন্মুখ সাম্রাজ্যে বৈতরণীর পদ্মফুলের মত তাজমহল দাঁড়াইয়াছিল। গত যুগের প্রেম ও সৌন্দর্য লিপ্সার অমর স্মারকচিহ্ন এই তাজমহল। সেই শাসন যাহা একছত্র হইয়া সমস্ত ভারতবর্ষকে নিরাপদ রাখিয়াছিল—প্রজাবৃন্দের সৌন্দর্য্য জ্ঞান ও উদারতা বিকশিত করিয়া শিল্প ও ত্যাগে আদর্শকে দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, মোগল সাম্রাজ্যের অস্তিত্বের অবসানের দিনে তাহার সম মহিমা অন্তর্হিত হইল ; দেশময় দস্যু ও তস্করের ভাতি উপস্থিত হইল। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা দিল্লীশ্বরের শাসন-মুক্ত হইলেন, এবং যেন মেষশাবকেরা সিংহ হইয়া প্রজা পীড়ন করিতে লাগিলেন বঙ্গদেশেও অরাজকতা ও অত্যাচারের কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইল। প্রাতঃস্মরণীয় রাণী ভবানী স্ব দুহিতার পুত্তলী শ্মশানে পোড়াইয়া তাঁহাকে অত্যাচারের হাত হইতে বাঁচাইলেন, জীবন্ত ক্ষুদ্র স্ব রাজা ও জমীদারগণ "বৈকুণ্ঠ" নামধেয় জীবন্ত নরক ভোগের ভয়ে আতঙ্কিত হইয়া পড়িলেন, সু দুর্গাপুরের রাজকুমারদিগকে উলঙ্গ করিয়া বেত্রাঘাত করিবার আদেশ হইয়াছিল। কোন কে রাজার কন্যা মুর্সিদাবাদাধিপ চাহিয়া বসিতেন, না দিলে তাঁহাদের ধনসম্পত্তি অত্যাচারের ফুৎক উড়িয়া যাওয়া নিশ্চিত ছিল,—কাজিরা দস্যুদের সঙ্গে যোগ দিয়া প্রজাপীড়ন করিতে লাগি

যখন রাজারাজড়াদের অবস্থাই এরূপ, তখন সামান্য প্রজাদের দুর্দ্দশা যে কি তাহা পাঠকবর্গ কল্পনা করিতে পারেন।

"এই অত্যাচার ও বিপদের দিনে মানুষের চিত্তে দুঃখবাদের প্রাবল্য স্বাভাবিক। বুদ্ধদেব এই দুঃখবাদ জগৎকে দিয়া গিয়াছিলেন,—তাঁহার শিক্ষা—ধনজন মিথ্যা, দেহ মিথ্যা, পৃথিবী দুঃখময়। তপ্ত খোলা হইতে যেরূপ খই লাফাইয়া ভূঞে পড়ে, এই দুঃখবাদকে স্বীকার করিয়া বুদ্ধের পরে শত শত লোক সেইরূপ সংসারাশ্রমকে দুঃখপূর্ণ মনে করিয়া ভিক্ষুধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছিল। এই দুঃখবাদ হিন্দুকে যুগে যুগে সংসার নিবৃত্ত ও ভোগবিমুখ করিয়াছে। দুর্দ্দিনে যখন নিরাশার ঘনঘটা চারিদিক আঁধার করিয়া ফেলে, তখন দুঃখবাদ মনকে বিশেষরূপে অধিকার করিয়া বসে; বঙ্গের এই দুঃসময়ে বাঙ্গলার ভক্তি, বাঙ্গলার কর্ম্ম, বাঙ্গলার সাধনা এই দুঃখবাদকে আশ্রয় করিয়া বিকাশ পাইয়াছিল। মানুষ যখন জীবনকে দুঃখময় মনে করে; তখন ভোগমুখী ইন্দ্রিয়গুলিকে মানুষ শত্রু বলিয়া জ্ঞান করে। হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলিকে ভীতিকর বলিয়া ধারণা হয়, "দারাবন্ধু পরিবার" আমাদিগকে সংসারকূপে নিমজ্জিত করে—এই আশঙ্কায় সংসার-ত্যাগী মন শ্মশানের চিতাকেই পরম সম্পদ মনে করে। রামপ্রসাদের গানে এই দুঃখবাদের প্রাধান্য পরিদৃষ্ট হয়, রামপ্রসাদ গাহিলেন "রমণী বদনে সুধা নয়—সে বিষের বাটী, আগে ইচ্ছাসুখে পান করি, বিষের জ্বালায় ছটফটি।" "ভবের গাছে বেঁধে দিয়ে মা পাক দিতেছে অবিরত, ওমা কি দোষে করিলি আমায় ছটা কলুর অনুগত।"

"এই যে সংসার অনিত্য—ইহার বন্ধন—মায়াপাশ—তাহা ছেদন করাতেই বীরত্ব! এই দুঃখবাদ তো আজকালকার নয়। বহুযুগ যাবৎ ভারতীয় ধর্ম্মের ইতিহাসে পৃথিবীর এই কালো দিকটা হিন্দুর চোখে পড়িয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রামপ্রসাদ এই দুঃখের সুরটি পুনরায় জাগরিত করিলেন, তাঁহার সুরে সুর মিলাইয়া অসংখ্য ফকির, বাউল আবার এই দুঃখবাদের সুরে বঙ্গসমাজকে সংসার বিমুখতায় দীক্ষিত করিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর রামপ্রসাদের সুর অনুকরণ করিয়া উনবিংশ শতাব্দীতে ফিকির চাঁদ গাহিলেন—

"বাঁশের দোলাতে চড়ে কেহে বটে শ্মশান ঘাটে যাচ্ছে চ'লে
ঘুরে যে ঢাকার সহর, দিল্লী লাহোর, টাকা মোহর নিয়ে এলে,
খেলে না পয়সা শিকি, কওনা দেখি, তার কি কিছু সঙ্গে নিলে।"

"এই দুঃখময় জীবনের আঁধার দিকটার উপর জোর দিয়া যে বৈরাগ্যের যে সুরটা উঠিয়াছিল—এ যুগে তাহার প্রথম প্রেরণা দিয়াছিলেন রামপ্রসাদ। তিনি তাঁহার মায়ের উপর স্নেহের দাবী কাঁদিয়া এই দুঃখের জন্য তাঁহাকে স্নেহমিষ্ট গঞ্জনা করিতে কসুর নাই। মা আদরের ছেলের মুখে চুমো খাইয়া তাহাকে আবার শ্মশানে ডালি দিতেছেন কেন? ছেলেকে গৃহবাসী করিয়া কেন আবার

সন্ন্যাসী করিলেন, এই সকল অনুযোগ দিয়া তিনি তাহাকে "সর্ব্বনাশী" বলিয়া গালি দিতে ছাড়েন নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই সংসারের ত্রিতাপ ভোগ করিয়া মাকে সমস্ত বিধানের কর্ত্রী জানিয়াও তিনি মায়ের স্নেহের রাজ্যের বহির্ভূত হন নাই। তাঁহার সমস্ত অনুযোগ—আবদার মাত্র, তাহাতে কান্না আছে, "কেন মারছ?" বলিয়া আর্ত্তনাদ আছে, শিশু যেমন মায়ের মার খাইয়া তাঁহার আঁচল ছাড়ে না, রামপ্রসাদ বাহ্যিক বিদ্রোহসূচক শত শত অভিযোগ করিয়াও মায়ের প্রতি নির্ভর ছাড়েন নাই। তাঁহার সেই অভিযোগে সর্ব্বত্র বৈষ্ণব কবিদিগের মানের সুরটী পাওয়া যায়। ইহা শুধুই দুঃখবাদ নহে। বাউলের গানের দুঃখবাদের সঙ্গে রামপ্রসাদের গানের এই স্থলে প্রভেদ। বাউলের গানে নিছক বৌদ্ধ ভাব। বাউল শুধুই মড়ার কান্না গাহিয়া বিরাগ শিখায়। রামপ্রসাদের কান্নায় দুঃখ সৃষ্টির জন্য মায়ের প্রতি ভর্ৎসনা আছে কিন্তু তাহা বিরাগ নয়, অনুরাগের ছদ্মবেশ। শত গালাগালি দিয়াও তিনি মায়ের আঁচলটীতে বাঁধা আছেন। "নিতান্ত যাবে এ দিন ঘোষণা রবে গো—তারা নামে অসংখ্য কলঙ্ক রবে গো।" এই সুরে মায়ের স্নেহে পাছে ঔদাসীন্যের কলঙ্ক ছাপ পড়ে, আবদেরে ছেলে তাহারই জন্য কাঁদিতেছেন। এই দুঃখবাদ বিষ-কুম্ভ নহে। এই দুঃখবাদের মধ্যে প্রেম ও নির্ভর যথেষ্ট পরিমাণে আছে,—এই জন্য ইহা বৈষ্ণব কবির বিষ-মিশ্র অমৃত। ইহা মায়ের অসীম নিষ্ঠুরতা জানিয়াও মায়ের অসীম দয়ার প্রতি আস্থাবান। এক একবার ইহা নৃমুণ্ডমালিনী মায়ের অসি স্বীকার করিয়াছে সত্য—কিন্তু তাহার বরাভয়দায়ী করদ্বয়ও দেখিয়াছে; জগৎকে ভয়ানক জানিয়াও ইহার মূল শক্তির অভয়প্রদত্ব ও মঙ্গলত্ব স্বীকার করিয়াছে। শাক্ত ধর্ম্মের এইখানেই জোর। ইহা লোক চিত্তকে এই কারণে এতদূর আকর্ষণ করিয়াছে। ইহা ভগবানকে শুধু দয়াময়, প্রেমময় বলিয়া ক্ষান্ত হয় নাই, ইহা তাঁহার নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচার স্বীকার করিয়া লইয়াছে। অপরাপর ধর্ম্ম ভগবানের শ্রীমুখ দেখিয়া ভুলিয়াছে। তাঁহার স্নেহ ও প্রেমের বাঁশীর সুর শুনাইতে জগৎকে আহ্বান করিয়াছে। একমাত্র শাক্তধর্ম্ম বিশ্বের উলঙ্গ সত্যকে যথাযথভাবে দেখাইবার সাহস করিয়াছে—ইহা লোল-শোণিত-লোলুপ জিহ্বা ও কঙ্কালাকৃতিকে প্রণাম করিয়া বরাভয়দায়ী করদ্বয়ের পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছে। কালীমূর্ত্তি—ঝঞ্ঝা, উল্কাপাত, মহামেঘ ও চিতাভস্মের দেবতা—ইনি বৈদিক রুদ্রদেবের পরবর্ত্তী বিভূতি। এদিকে তাঁহার কৃষ্ণকান্তি অপূর্ব্ব উন্মাদনায়—"ধনি না বাঁধে কবরী না পরে বাস—ও বিধুবদনে মধুর হাস" এই ভীষণ ও সুন্দর উলঙ্গ সত্যকে সাহসিক সাধক ভিন্ন কে হৃদয়ের শোণিত দিয়া পূজা করিবে?

"বাউলের সুরের দুঃখবাদ ও রামপ্রসাদের দুঃখবাদে এই প্রভেদ। বাউল মানুষকে জীবনের প্রতিপদে শত দুঃখ দেখাইয়া শ্মশানের নির্ব্বানটাকে শেষাশ্রয়স্বরূপ মনে করিয়াছে

রামপ্রসাদের দুঃখবাদে সংসারের শত দুঃখের প্রতি ইঙ্গিত থাকিলেও তাহা যে মাতৃ-পাদপদ্মের শরণ লইলে দূর হয় তাহা জোরের সহিত বলা হইয়াছে। এই নিছক সত্য, এই নির্ভর আত্মোৎসর্গময় সঙ্গীত এককালে সমস্ত বাঙ্গালা দেশকে জয় করিয়াছিল। সংসার কাঁটার বন, ইহা সাফ করিয়া যদি ভক্তির চর্চ্চা করা যায় তবে মানবজীবন দুঃখময় না হইয়া স্বর্ণপ্রসূ হইতে পারে। রামপ্রসাদ পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন,—"এমন মানব জন্ম রৈল পড়ে, আবাদ কৈলে ফলত সোনা।" হাটে মাঠে বাটে এই সকল গানের সুধা হরিরলুটের মত তিনি বিলাইয়া গিয়াছেন।

"আমি তাঁহার বিদ্যাসুন্দরের কথা বিশেষ করিয়া বলিব না। পাঠক রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর মিলাইয়া পাঠ করিবেন, দেখিবেন রামপ্রসাদই ভারতচন্দ্রের আদর্শ। এমন একটি মৌলিক ভাব নাই, এমন কোন কবিত্বের কথা নাই, গোড়া যাহার রামপ্রসাদ গাঁথিয়া না দিয়াছেন, ভারতচন্দ্র সেই ভিত্তির উপর রং ফিরাইয়াছেন মাত্র। কিন্তু বিদ্যাসুন্দরের বিষয় রাজসভায় খুব প্রিয় হইলেও এবং কৃষ্ণচন্দ্রের পিশা শ্যামসুন্দরের পুত্র রাজকিশোর মুখোপাধ্যায় রামপ্রসাদের মুরুব্বি হইয়া পুস্তক রচনার আদেশ করিলেও যে এই কাব্যের ভাব রামপ্রসাদের ভক্তগণের মনের ভাবের সহিত সঙ্গতি পায় নাই, তাহা স্পষ্ট। এই কাব্যে কবি তাঁহার মুরুব্বিকে সুখী করিবার জন্য খুবই চেষ্টা করিয়াছেন—তাঁহার সমস্ত পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের ভাণ্ডার উলটপালট করিয়া এই কাব্যের গড়নে লাগাইতে যত্নপর হইয়াছেন; অনেক স্থানের অনুপ্রাস, বর্ণনা, পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব উচ্চদরের হইয়াছে। তথাপি মনে হয় উহা কতকটা কৃত্রিম, উহাতে স্বভাবজ সৌন্দর্য্য নাই—আয়াসজাত যত্ন আছে, বাহ্যিক সমৃদ্ধি আছে—কিন্তু ভিতরটা ফাঁকা। বোধ হয় এই পরিশ্রমের পর কবি গান রচনা করিতে যাইয়া স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি ফিরিয়া পাইয়া লিখিয়াছেন "গ্রন্থ যাবে গড়াগড়ি গানে হব ব্যস্ত।" সেই গ্রন্থ তাঁহার বৃথা পাণ্ডিত্যের অসার কীর্ত্তি—ঐ গানগুলিই যে তাঁহার ও সমস্ত বঙ্গদেশের প্রাণের বস্তু, তাহার মূল্য তিনি নিজে অবশ্যই বুঝিয়াছিলেন।

"আমরা দেখাইয়াছি রামপ্রসাদ পরবর্ত্তী গীতি-সাহিত্যের দুঃখবাদে কি অপূর্ব্ব-প্রেরণা দিয়াছিলেন, এবং তাঁহার দুঃখবাদ কি অপূর্ব্ব ভক্তি ও প্রেমের রসধারায় স্নাত। রামপ্রসাদের ন্যায় মা মা বলিয়া এরূপ করুণ কান্না, মায়ের সঙ্গে এরূপ দুষ্টুমি ও আবদার, মায়ের উপর অফুরন্ত নির্ভর, "ভয় করি না মা চোখ রাঙ্গালে" এই স্নেহের বীরত্ব ও মায়ের আঁচল ধরিয়া নৃত্য—মাতৃগতপ্রাণ শিশু-জগতের সাধনার রাজ্যে আর কোথায় মিলিবে?

"তারপরে রামপ্রসাদই আগমনী গানের প্রথম কবি। তৎপূর্ব্বে উমা ও মেনকা লইয়া বাৎসল্য রসের ধারা কোন কবি বঙ্গসাহিত্যে বহাইয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না। "গিরি, আমি প্রবোধ দিতে নারি উমারে, উমা কেঁদে করে অভিমান, নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে। অতি অবশেষ নিশি,

গগনে উদিত শশী, বলে উমা ধরে দে উহারে। আমি বলিলাম তায়, চাঁদ কিরে ধরা যায়—ভূষণ ফেলিয়া মোরে মারে।"

"বাঙ্গলার কুটিরের বালিকাদুহিতাদের স্বামীগৃহে যাওয়ার পর মাতৃহৃদয়ের বিরহের হাহাকারকে করুণ রসের অফুরন্ত উৎস করিয়া যে সকল আগমনী গান পল্লীতে পল্লীতে বহিয়া গিয়াছে, সেই আগমনী গানের আদিগঙ্গা—হরিদ্বার এই প্রসাদসঙ্গীত। আশ্বিন মাসের ঝরা শিউলি ফুলের মত এই যে মাতৃমিলনের প্রত্যাশায় বালিকা বধূদের চক্ষু জল দিন রাত্রি ঝরিত, এই সকল আগমনী গান সেই সকল অশ্রুরচিত হার, উহা তাৎকালিক বঙ্গজীবনের জীবন্ত বিচ্ছেদ রসে পুষ্ট।

"তৃতীয়তঃ যেমন কৃষ্ণরূপ, শিবের রূপ নানা স্তোত্র ও কবিতায় ধ্যানের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে, রামপ্রসাদের রচিত শত শত সঙ্গীতে কালী-মূর্ত্তি সেইরূপ উচ্চাঙ্গের সাধনার সহায়ক হইয়াছে। জগতের যাহা কিছু সুন্দর শুধু তাহাই নহে—যাহা কিছু ভৈরব—তাহাই দিয়া এই মূর্ত্তি তিনি রচনা করিয়াছেন, এ পর্য্যন্ত কোন চিত্রশিল্পী, ভাস্কর বা মৃন্ময়ী মূর্ত্তি রচক,—রামপ্রসাদ বর্ণিত রূপকে আদর্শ করিতে পারেন নাই। চিত্রে ও মৃন্ময় বিগ্রহে কালীমূর্ত্তি স্থিরা, তাঁহার লীলা নাই, তাঁহার রূপ সংযত কিন্তু কবি যেন তৎবর্ণিতরূপে জীবনের সমস্ত মাধুর্য্য ভীষণত্ব ও চাঞ্চল্য ঢালিয়া দিয়াছেন; তাঁহার ভাষায় যে জীবন্ত মূর্ত্তি পাই, এখনও মন্দিরে আমরা তাহা পাই নাই; কালীমূর্ত্তির চিত্রকর ও ভাস্কর এখনও জন্মায় নাই। রামপ্রসাদ ভাষায় যেরূপ আঁকিয়াছেন—তাহা শুধু রূপ নহে, তাহাতে তিনি প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন,—

"ঢলিয়া ঢলিয়া কে আসে,
গলিত চিকুর আসব আবেশে।
বামা রণে দ্রুতগতিতে চলে দাবানলে
ধরি করতলে গজগরাসে॥
কে রে কালীর শরীরে রুধির শোভিছে
কালিন্দীর জলে কিংশুক ভাসে।
কে রে নীলকমল, শ্রীমুখ মণ্ডল
অর্দ্ধচন্দ্র ভালে প্রকাশে॥
কে রে নীলকান্ত, মণি নিতান্ত
নখর নিকর তিমির নাশে।
কে রে রূপের ছটায়, তড়িত ঘটায়
ঘন ঘোর রবে উঠে আকাশে॥

দিতি সুতচয়, সবার হৃদয়
থর থর থর কাঁপে তরাসে।
মাগো কোপ কর দূর, চল নিজপুর,
নিবেদে শ্রীরামপ্রসাদ দাসে”

পুনশ্চ— “এলো চিকুর ভার, এ রমণী কার
মার মার রব বলে”

“এই সকল গান সুগায়কের কণ্ঠে শুনিতে শুনিতে এক অপূর্ব্ব উন্মাদনায় হৃদয় ভরিয়া যায়; করিগ্রাস অবধি যাহা কিছু অদ্ভুত ও ভয়ঙ্কর তাহা অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সঙ্গে মিশিয়া যেন লীলায়িত হইয়া উঠিয়াছে। গানগুলি কল্পনাকে অলৌকিক ভাবে প্রবুদ্ধ করিয়া এমন এক রাজ্যে লইয়া যায় যাহা বীভৎস ও ভীষণকে সুন্দর করিয়া দেখায় এবং সমস্ত জগতের প্রতিবিম্ব কবিত্ব মণ্ডিত হইয়া ভৈরব, মহান্ ও সুন্দরকে এক সূত্রে গাঁথিয়া ফেলে।

“সেই মহিয়সী মূর্ত্তি যাহা কালিন্দীর তরঙ্গে কিংশুকের ন্যায় শোভমান,—যাহার রূপ-জ্যোতি বিদ্যুতের মত সাধকের চিত্তকে বিভ্রান্ত করে—যিনি আসব পান করিয়া বিগলিতকেশা, দৈত্যসহ রণক্লান্ত হইয়া আসব আবেশে ঢলিয়া ঢলিয়া রণক্ষেত্রে বিচরণ করেন, তিনি তাঁহার পাত্রশূন্য করিয়া তাঁহার ভক্তির আসব রামপ্রসাদকে দিয়াছিলেন, তাহা আকণ্ঠ পান করিয়া রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন,—“আমার মন মাতালে মাতাল কৈল, মদ মাতালে বলে।” কোথায় সেই আসব? তাহা শুঁড়ির দোকানের নহে, তাহার জন্মস্থান সাধকের চিত্তে।

“একবার এই কুমারহট্টের মৃত্তিকার ধূলি লইয়া মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ দেব তাহা জগতের সার বস্তু মনে করিয়া তাঁহার কোঁচার খুঁটিতে বাঁধিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন—“কুমারহট্ট ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান। এ মৃত্তিকা আমার জীবনধন প্রাণ।”

“সেই কুমারহট্টের ধূলি লইয়া আসুন আমরা মস্তকে ছোঁয়াইয়া উত্তরীয়াগ্রে বাঁধিয়া রাখি। রামপ্রসাদের লীলাস্থান এই কুমারহট্টকে শত নমস্কার। এই স্থান হইতে ভক্তির যে মহাপ্রসাদ বিতরিত হইয়াছিল—বঙ্গদেশের দিগ্‌দিগন্তর হইতে কোটী কোটী লোক হাত পাতিয়া প্রসাদকবির সেই প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এখান হইতে যে মা মা রব উত্থিত হইয়াছিল তাহা দুই শত বৎসর যাবৎ বাঙ্গলার পথে ঘাটে প্রতিনিয়ত প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। পার্ব্বত্য ত্রিপুরা ও আসামে ও স্বচ্ছসলিলা ধলেশ্বরী বাহিত ঢাকা ও ফরিদপুর, ময়মনসিংহে, প্রকৃতির রম্য নিকেতন বাঁকুড়া ও বীরভূমে এবং সুরস্বতী ও দামোদর তটে, এক কথায় সমস্ত বঙ্গদেশে রামপ্রসাদের গান লোকেরা

গাহিয়া গাহিয়া এই দীর্ঘ সময় যাবৎ মাতৃপাদপদ্মে উপহার দিয়াছেন, এই সকল গানের এই আদিগঙ্গা—এই হালিসহর, আমাদের চক্ষে মহাতীর্থ, ইহাকে শত শত নমস্কার।"

রামপ্রসাদের পর শ্যামাবিষয়ক সংগীত রচনায় আরও কয়েকজন কবি বিলক্ষণ পটুতা দেখাইয়াছেন, আমরা এস্থলে সংক্ষেপে তাঁহাদের উল্লেখ করিয়া যাইব।

শ্যামাসংগীতকারগণ।

কবিওয়ালা রামবসু—(১৭৮৬—১৮২৮ খৃঃ) কলিকাতার পরপারস্থিত সালিকা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে, পাঁচ বর্ষ বয়ঃক্রমকালেই ইনি পাঠশালায় বসিয়া কলাপাতে কবিতা রচনা করিতেন, দ্বাদশবর্ষ বয়স্ক কবির রচিত গান, ভবানীবণিক নামক কবিওয়ালা আদরের সহিত গ্রহণ করিয়া নিজদলে গাওয়াইতেন। যে ফুলটি অতি শীঘ্র ফোটে, তাহা অতি শীঘ্র শুকায়; রামবসুর ৪২ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়। প্রথম বয়সে ইনি ভবানীবেণে, নীলুঠাকুর, মোহনসরকার প্রভৃতির দলে গান বাঁধিতেন, শেষে নিজেই এক দল সৃষ্টি করেন। রামবসুর বৈষ্ণবসংগীতগুলিই অধিক হৃদয়গ্রাহী, আমরা স্থানান্তরে তাহার উল্লেখ করিব। তাঁহার উমাসংগীতগুলিও স্নেহরসে উদ্বেলিত। মায়ের নয়নজলসিক্ত এই পবিত্র কবিতাটি দেখুন,—"তুমি যে কোরেছ আমায় গিরিরাজ, কত দিন কত কথা। সে কথা আছে শেল সম হৃদয়ে গাঁথা। আমার লম্বোদর নাকি, উদরের জ্বালায় কেঁদে কেঁদে বেড়াতো। হোয়ে অতি ক্ষুধার্ত্তিক, সোণার কার্ত্তিক, ধূলায় পোড়ে লুটাতো।" পরিবার ভরণপোষণে অসমর্থ ব্যক্তির হৃদয়ে এইরূপ গান শেলের ন্যায় বিঁধিবার কথা, গানের সময় গলদশ্রুনেত্রে দরিদ্র শ্রোতা ঘরের 'কার্ত্তিক', 'গণেশে'র কথা ভাবিতে থাকিতেন।

রামবসু—১৭৮৬ খৃঃ।

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য—১৮০০ খৃঃ অব্দে অম্বিকা-কালনা হইতে বর্দ্ধমান কোটালহাট নামক স্থানে আসিয়া বাস করেন; ইনি বর্দ্ধমানাধিপ তেজশ্চন্দ্রের সভাপণ্ডিত ও গুরু হইয়াছিলেন। ইঁহার রচিত শ্যামাবিষয়ক পদাবলী রামপ্রসাদের গানগুলির মত মধুর।

কমলাকান্ত।

রামদুলালরায়—(১৭৮৫—১৮৫১) ত্রিপুরার অন্তর্গত কালীকচ্ছ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন; ইঁহার কুলউপাধি নন্দী। কতকাল ইনি নোয়াখালির কলেক্টার হেলিডে সাহেবের সেরেস্তাদারী করেন ও পরে ত্রিপুরার মহারাজের দেওয়ান হন। ইঁহার গানগুলিতে বিষাদ, বিরাগ ও ভক্তির কথা আছে। আমাদের স্থানাভাব, একটি গান হইতে কিছু অংশ তুলিয়া দেখাইতেছি—"ধনাশা, জীবন-আশা গেল না সকলি গেল না। কৌমার যৌবন গত জরা আগমন হল। * * অক্ষির গেল মা জ্যোতিঃ, শ্রবণের গেল শ্রুতি, মনের গেল না স্মৃতি, চরণের গতি আছে কাজ্ঞা অভিলাষ, আদর্শনে দেখার আশ, মরণেসে জরা বলে কি দায় হল।"

রামদুলাল—১৭৮৫ খৃঃ।



মথুরার রাজা

দেওয়ান রঘুনাথ রায় (১৭৫০—১৮৩৬ খৃঃ)। বর্দ্ধমানস্থ চুপীগ্রামনিবাসী ব্রজকিশোর রায় দেওয়ানের পুত্র। ইঁহার কবিত্ব-শক্তি বেশ ছিল, বর্দ্ধমানরাজ তেজশ্চন্দ্র বাহাদুরের আদেশে ইনি দিল্লীর প্রসিদ্ধ সঙ্গীত-বিশারদদিগের নিকট ধ্রুপদ ও খেয়াল শিক্ষা করেন; তাঁহার শ্যামাবিষয়ক গানগুলি কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য ও রামদুলাল রায় প্রণীত গানসমূহের সঙ্গে একত্র উল্লিখিত হইবার যোগ্য।

রঘুনাথ রায়—১৭৫০ খৃঃ।

মৃজা হুসেন আলি ও সৈয়দ জাফর খাঁ,—এই দুইজন মুসলমান গীতরচক সমসাময়িক। ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির দশশালা বন্দোবস্তের কাগজে মৃজা হুসেন আলির নাম পাওয়া যায় সুতরাং ইহারা এক শতাব্দী পূর্ব্বের কবি। মৃজা হুসেন আলি ত্রিপুরার অন্তর্গত বরদাখাতের জমীদার ছিলেন, কথিত আছে, ইনি সমারোহ করিয়া কালী পূজা করিতেন। আমরা ১১ জন মুসলমান বৈষ্ণবকবির নাম উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহাদের সঙ্গে এই শাক্ত-ধর্ম্মে আস্থাবান্ মুসলমান কবির কথা বলা যাইতে পারে। মৃজা হুসেন আলির একটি গান এখানে উদ্ধৃত করিতেছি—"যারে শমন এবার ফিরি, এসো না মোর আঙ্গিনাতে! দোহাই লাগে ত্রিপুরারি, যদি কর জোর জবরি সামনে আছে জজ কাছারি, আইনের মত রসিদ দিব, জামিন দিব ত্রিপুরারি। আমি তোমার কি ধার ধারি, শ্যামা মায়ের খাসতালুকে বসত করি। বলে মৃজা হুসেন আলি, যা করে মা জয়কালী, পুণ্যের ঘরে শূন্য দিয়ে পাপ নিয়ে যাও নিলাম করি॥" এই দুই মুসলমান কবির পার্শ্বে আমরা আর একটি কবির স্থান নির্দ্দেশ করিব, ইঁহার নাম এণ্ট্নি। ফরাসী অধিকারভুক্ত গরিটীর নিকট এণ্ট্নি কবিওয়ালার বাগান-বাটীর ভগ্নাবশেষ এখনও দৃষ্ট হয়। এণ্ট্নি পর্ত্তুগিজ ছিলেন; তাঁহার ভ্রাতা কেলিসাহেব সেই কালের একজন ক্ষমতাপন্ন ও অর্থপ্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন। এণ্ট্নি একটি ব্রাহ্মণরমণীর প্রেমে পড়িয়া হিন্দুভাবাপন্ন হইয়া পড়েন; তিনি দোল-দুর্গোৎসবে সাগ্রহে যোগ দিতেন, এবং অবশেষে কবির দল বাঁধিয়া নিজে আসরে নামিয়াছিলেন। তখন ইংরেজ ও বাঙ্গালীতে সমাজগত পার্থক্য এত বেশী ছিল না; মনে করুন মাথার টুপি ও গায়ের কুর্ত্তি ছাড়িয়া ভদ্র ও ইতর শত শত শ্রোতার গুঞ্জরণে মুখরিত বিস্তীর্ণ আসরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ফিরিঙ্গি-কবি গানে তান ধরিয়াছেন। প্রতিপক্ষের দল-নেতা ঠাকুর সিংহ সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন:—

মুসলমান কবিগণ।

এণ্ট্নি ফিরিঙ্গি।

"বলহে এণ্ট্নি আমি একটি কথা জানতে চাই
এসে এ দেশে এ বেশে তোমার গায়ে কেন কুর্ত্তি নাই।"

এণ্ট্নি ইহার জবাব কি দিবেন, আপনারা বলুন। তিনি বিলাতি খাতায় লেখা সুরুচিসঙ্গত দুঃখের জবাব এখানে কুলাইতে পারিবেন না, তিনি কবিওয়ালার আসরে আসিয়া বোড়শকলায়

পূর্ণ কবিওয়ালাই সাজিয়াছেন; তিনি ঠাকুরসিংহকে 'শ্যালক' সম্বোধনে অভিহিত করিয়া এই আক্রমণের প্রতিশোধ লইলেন,—

"এই বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর বেশে আনন্দে আছি।
হ'য়ে ঠাকুরে সিংহের বাপের জামাই, কুর্ত্তি টুপি ছেড়েছি॥"

রামবসু আসরে দাঁড়াইয়া সাহেবকে গালি দিয়া পূর্ব্বপক্ষ করিলেন—

"সাহেব! মিথ্যে তুই কৃষ্ণপদে মাথা মুড়ালি।
ও তোর পাদরী-সাহেব শুনতে পেলে, গালে দেবে চূণ কালী॥"

সাহেবের উত্তর,—

"খৃষ্টে আর কৃষ্টে কিছু ভিন্ন নাই রে ভাই।
শুধু নামের ফেরে, মানুষ ফেরে, এও কোথা শুনি নাই।
আমার খোদা যে হিন্দুর হরি সে,
ঐ দ্যাখ শ্যাম দাঁড়িয়ে আছে,
আমার মানবজনম সফল হবে যদি রাঙ্গা চরণ পাই॥"

অণ্টুনি যে নিজের ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন, এরূপ বোধ হয় না;—শুধু আমাদের জন্যই এই মুক্তপ্রাণ, সামাজিক বৈষম্যগর্ব্ববর্জ্জিত, একান্ত অনাড়ম্বর বিদেশী ভদ্রলোকটি দেশীয় সাজে সজ্জিত হইয়া আসরে গাহিতেন,—

"আমি ভজন সাধন জানি না মা নিজে ত ফিরিঙ্গি।
যদি দয়া ক'রে কৃপা কর হে শিবে মাতঙ্গী॥"

এই অনন্যসাধারণ দৃশ্য দেখিবার জিনিষ ছিল বটে!

অপরাপর কবিগণ।

পূর্ব্বোক্ত কবিগণ ছাড়া বঙ্গদেশের কয়েকজন রাজা মহারাজাও শ্যামাবিষয়ক সংগীত রচনা করিয়াছেন। প্রচলিত সংগীতসংগ্রহগুলিতে কৃষ্ণনগরাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, শিবচন্দ্র, শম্ভুচন্দ্র, নাটোরাধিপতি রাজা রামকৃষ্ণ প্রভৃতি রাজন্যবর্গের রচিত অনেক গান পাওয়া যায়।

গোপাল উড়ে।

আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, এই সংগীতরচকগণের মধ্যে সকলেই নির্ম্মল রুচির পক্ষপাতী ও ধর্ম্মপিপাসু ছিলেন না। এই সময় বিদ্যাসুন্দরাদির পালা যাত্রার দলে গীত হওয়ার জন্য,—কতকগুলি ললিত শব্দবহুল, কদর্য্যভাবপূর্ণ গান রচিত হইয়াছিল; এই সকল গানের সর্ব্বসম্মতিক্রমে ওস্তাদ কবি গোপাল উড়ে; ইনি ভারতচন্দ্রের একবিন্দু ঘনরস তরল করিয়া এক শিশি প্রস্তুত করিয়াছেন; এই গানগুলির রচনার ভঙ্গী এতাদৃশ যে ইহা গাওয়ার সঙ্গে নাচাও চলিতে পারে; হাটে, মাঠে, ঘাটে এই সব গান পথিকগণ গাহিয়া

গাহিয়া পুরাতন করিয়া ফেলিয়াছেন, তথাপি এখন সমালোচনার অনুরোধে সেগুলি পুনর্ব্বার পড়িয়া গোপালচন্দ্র উড়ে মহাশয়কে একটি বেশ রসিক পুরুষ বলিয়া উপলব্ধি হইতেছে। বিদ্যাসুন্দরের প্রধান চরিত্র হীরা মালিনী; সুন্দর ইঁহাকে "মাসী" বলিয়া সম্বোধন করাতে ইনি ভগ্ন বীণার মত আওয়াজ দিতেছেন,—"যাদু এমন কথা কেন বল্লি। ভোরের বেলা সুখের স্বপন, এমন সময় জাগালি॥" ইনি নিজের রূপের ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেছেন, যখন বামুনপাড়া ফুলের যোগানে গমন করেন, তখন পূজাপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ এই পক্ককেশী রূপবতীকে দেখিয়া,—"রহে কোশাকুশী অমনি ধরে।" অনেক স্থলেই কেবল শব্দের মা'র,—"যামিনীতে কামিনীফুল নিত্যি নে যায় চোরে"—পড়িতে ভাল, গানে শুনিতে ততোধিক, কিন্তু কামিনীফুল ছুঁইতেই পড়িয়া যায়, চোরে লইবে কিরূপে? বিদ্যা হীরাকে দেখিয়া বলিতেছে—"ছেঁড়া চুলে বকুল ফুলে খোঁপা বেঁধেছ। প্রেম কি ঝালিয়ে তুলেছ॥" এই সব নাচিয়া গাহিয়া কহিবার কথা। হীরা যখন উত্তরে কিছু বলে, তখন তাহা মিঠেকড়া রসিকতা হয়; সন্ন্যাসীর সঙ্গে বিদ্যার পরিণয় হইবে, এই লইয়া ঠাট্টা করিয়া হীরা বলিতেছে—"ভাল ধ্বজা দিলি লো তুলে, এই রাজারি কুলে। সন্ন্যাসিনী হয়ে রবি, সন্ন্যাসী কুলে। আকড়াধারি মহৎ আশ্রম, অতিথ আসবে রকম রকম, গাঁজাতে লাগাবি লো দম 'বোম কেদার' বোলে॥" কৈলাসচন্দ্র বারুই ও শ্যামলাল মুখোপাধ্যায়—এই দুই কবি গোপালচন্দ্র দাস উড়ের চেলাগিরি করিয়াছেন। ইঁহারা দুই জনই অতি যোগ্য শিষ্য, কৈলাস বারুই কবির আবার চুটকি রাগিণী মিশাইয়া স্বভাব বর্ণনা করিবার হাতযশটুকু ছিল; নমুনা এইরূপ,—"গা তোলরে নিশি অবসান প্রাণ। বাঁশবনে ডাকে কাক, মালি কাটে কপিশাক, গাধার পিঠে কাপড় দিয়ে রজক যায় বাগান।" গোপাল উড়ের গানে যে ক্ষিপ্র গতি ও কবিত্ব টের পাওয়া যায়, তাহাতে মনে হয় যেন ভারতীর নূপুর সিঞ্জন শোনা যাইতেছে। এককালে এই কবিদের গানে বঙ্গদেশের হাঠ, মাঠ, বাট ছাইয়া পড়িয়াছিল।

কৈলাস বারুই ও শ্যামলাল মুখোপাধ্যায়।

এই শ্রুতিসুখকর কিন্তু কুরুচি দুষ্ট গীতরচকগণের মধ্যে দাশরথি রায় (১৮০৪—১৮৫৭) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। জেলা বর্দ্ধমানস্থিত বাঁদমুড়াগ্রামে দাশরথি রায়ের পিতা দেবীপ্রসাদ রায়ের বাসভূমি ছিল। কিন্তু দাশু শৈশবকাল হইতে পাটুলির নিকটবর্ত্তী পীলা নামক গ্রামে নিজ মাতুলালয়ে বাস করিতেন। তিনি প্রথমতঃ শাঁকাই নামক স্থানের নীল কুঠীতে কেরাণীগিরির পদ গ্রহণ করেন। কিন্তু আকাবাই নাম্নী ইতরজাতীয়া কোন রমণীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তিনি চাকুরী ত্যাগ করেন। আকাবাই এক ওস্তাদী কবির দল গঠন করে, তন্মধ্যে দাশুরায় গান বাঁধিয়া দিতেন, কিন্তু অপর কোন এক কবি-দলের সরকার দাশুকে ছড়া বাঁধিয়া বিশেষরূপ গালি দেন, সেই ভর্ৎসনার কথা তাঁহার মাতা শুনিয়া পুত্রকে যথেষ্টরূপ গঞ্জনা করেন।

দাশরথি রায়—১৮০৪ খৃঃ।

মাতার ভর্ৎসনায় দাশু প্রতিজ্ঞা করেন, আর কবির দলে গান বাঁধিবেন না ; তদবধি তিনি পাঁচালীর দল সৃষ্টি করেন, এই নূতন অস্ত্র হস্তে দাশু দিগ্বিজয়ী হইয়াছিলেন। প্রভাস, চণ্ডী, নলিনীভ্রমরোক্তি, দক্ষযজ্ঞ, মানভঞ্জন, লবকুশের যুদ্ধ, বিধবাবিবাহ প্রভৃতি তাঁহার রচিত অনেক পালা এখন ছাপা হইয়াছে। তাঁহার লেখনীকে একরূপ অবিশ্রান্ত বলিতে হয়,—ইতিপূর্ব্বে যত শব্দকবি জন্মধারণ করিয়াছে, দাশু তাঁহাদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষিপ্র-হস্ত। তাঁহার অশ্লীলতার পরিচয় পাঠক অনেক স্থলেই পাইবেন। কিন্তু পাঠক মনে রাখিবেন, উহা সেই যুগের পরিচায়ক, সুতরাং এই দোষের জন্য ব্যক্তিবিশেষকে দোষী করা সমিচীন হইবে না। বিশেষ বাঙ্গালা সাহিত্য তখন রাজ-প্রাসাদ হইতে অবতরণ করিয়া জনসাধারণের পদচিহ্নিত ধূলি কাদার রাস্তায় আসিয়া পড়িয়াছিল, তাহারা একটু স্থূলরকমের আদিরসঘটিত কথা না হইলে ততটা স্ফূর্ত্তি পাইত না। যে গুণে হোরেশ, বোকাসিও, বাইরণ ও ভারতচন্দ্র আদর পাইতেছেন,—দাশুও তদ্রূপ যশের কতকটা অংশী হইবেন সন্দেহ নাই। দাশুর রচনা ভ্রমরের মত—মুখে মধু, কিন্তু হুলে বিষ বহন করে ; উহা শিশুর নবোদ্গত দন্তের ন্যায়—দর্শনে সুন্দর, কিন্তু দংশনে তীব্র ; দাশু যেস্থলে গালি দিবেন,—সেখানে তাঁহার লেখনীসংযম অভ্যাস নাই। শত্রুর গালে চুণকালী দিয়া তিনি তামাসা দেখিবেন। বৈষ্ণব নিন্দাটি দেখুন,—"গৌরাং ঠাকুরের ভণ্ড চেংড়া, যত অকাল কুষ্মাণ্ড নেড়া, কি আপদ করেছেন সৃষ্টি হরি। বলে গৌর ডাক রসনা, গৌরমন্ত্রে উপাসনা, নিতাই বলে নৃত্য করে, ধূলায় গড়াগড়ি॥ গৌর বলে আনন্দে মেতে, একত্রে ভোজন ছত্রিশ জেতে, বাগ্দীকোটাল ধোপা কলুতে একত্র সমস্ত। বিল্বপত্র জবার ফুল, দেখ্‌তে নারেন চক্ষের শূল, কালী নাম শুন্‌লে কাণে হস্ত॥ * * * কিবা ভক্তি, কি তপস্বী, জপের মালা সেবাদাসী, ভজন কুঠরী আইরি কাঠের বেড়া। গোসাঞিকে পাঁচসিকে দিয়ে, ছেলেশুদ্ধ করেন বিয়ে, জাত্যাংশে কুলীন বড় নেড়া। ভজহরি শ্রীনিবাস, বিদ্যাপতি নিতাইদাস, শাস্ত্র ইহাদের অগোচর নাই কিছু। এক এক জন কিবা বিদ্যাবন্ত, করেন কিবা সিদ্ধান্ত, বদরিকাকে ব্যাখ্যা করেন কচু॥"

পাঁচালী।

কথিত আছে, কালিদাসের উপমা গুণ, নৈষধের পদলালিত্য গুণ, ও ভারবির অর্থগৌরব গুণ, এই সকল কবিগণের গুণের ইয়ত্তা আছে, কিন্তু দাশুরায়ের গুণের সীমা নির্দ্ধারণ করা যায় না ; যখন কবি উপমা দিতেছেন, তখন দিগ্বিদিক্ জ্ঞান না করিয়া তিনি কথার ঝোঁকে চলিয়াছেন, লেখনীর মুখে মসীবিন্দু না শুকাইলে তাঁহার স্থগিত হওয়া নাই—"পণ্ডিতের ভূষণ ধর্ম্মজ্ঞানী, মেঘের ভূষণ সৌদামিনী, সতীর ভূষণ পতি। যোগীর ভূষণ ভস্ম, মৃত্তিকার ভূষণ শস্য, রত্নের ভূষণ জ্যোতি॥ বৃক্ষের ভূষণ ফল, নদীর ভূষণ জল, জলের ভূষণ পদ্ম। পদ্মের ভূষণ মধুকর, মধুকরের ভূষণ গুন্ গুন্ স্বর, উভয়ে উভয় প্রেম বদ্ধ। শরীরের ভূষণ চক্ষু, যাতে জগত হয় দৃষ্ট। দাতার ভূষণ দান করে বলি বাক্য মিষ্ট।" কবিকে 'থাম' 'থাম' বলিয়া পরিত্রাহি চীৎকার না করিলে এই প্রবাহ স্থগিত হওয়ার নহে। 'নলিনীভ্রমরোক্তি' নামক ক্ষুদ্র পালা কবির বিদ্রূপ, কবিত্ব ও ভাষার অধি-

উপমা।

কারের এক অমর কীর্ত্তি বলা যায়।* পদ্মের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করিয়া মধুকর তীর্থযাত্রা করিয়াছেন, এ পালায় তাহার বর্ণনা,—"চলিলেন পদ্মিনী স্বামী, যেন শুকদেব গোস্বামী, ডাক্‌লে কথা কন না কারু সনে।" এইভাবে কবি কুসুম ও ভ্রমর জগৎ উপলক্ষ করিয়া তাঁহার ন্যায় নায়ক ও আকাবাইএর ন্যায় নায়িকার রসকোন্দল উদ্ঘাটন করিয়াছেন। রুচি ও পবিত্রতার অনুরোধে বলিতে হয়, এই চিত্র ঢাকা থাকাই উচিত ছিল, কিন্তু কবিত্বের আকর্ষণে তৎপ্রতি মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়।

উপাখ্যানভাগে অপটুতা।

নৈতিক প্রশ্ন ছাড়িয়া দিয়া দাশুকে সাহিত্যের তুলাদণ্ডে ধরিলে দেখা যাইবে, শব্দের বাঁধুনির জন্য যেরূপ প্রশংসাই দাশুর প্রাপ্য হউক না কেন, তাঁহার বিষয় ও চরিত্র বর্ণনের কৌশল আদৌ নাই। দাশুর প্রসঙ্গ-অপ্রসঙ্গ জ্ঞান নাই, সর্ব্বত্রই ইনি 'দন্তরুচি কৌমুদী' দেখাইয়া ঠাট্টার হাসি হাসিতেছেন; 'প্রভাস-মিলন' পড়িয়া দেখুন,—যে প্রভাসমিলনের কথা শুনিয়া বৃদ্ধ, যুবা, বালক এক স্থানে বসিয়া কাঁদিয়া বিভোর হইয়াছেন, যে প্রভাসমিলনের সঙ্গে হিন্দুর কত উন্মাদকর করুণ স্বপ্ন বিজড়িত, দাশু তাহা বর্ণনা করিতে যাইয়া একটি নিঃসম্বল ব্রাহ্মণ তদুপলক্ষে কৃষ্ণের নিকটে ভিক্ষা চাহিয়া কিরূপে গলধাক্কা লাভ করিয়াছিল, এইরূপ একটি মিথ্যা গল্প দ্বারা প্রবন্ধ পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। দাশুর পাগল প্রতিভা প্রসঙ্গাপ্রসঙ্গ গণ্য করে না। পাঁচালী পড়িতে পড়িতে স্বতঃই মনে হয়, যেন বহুসংখ্যক ইতর ও অর্দ্ধশিক্ষিত লোকমণ্ডলীর মধ্যে দাশু গাহিয়া যাইতেছেন, যে কথা শুনিয়া শ্রোতৃগণ বিমুগ্ধ হইতেছে, দাশু প্রসঙ্গ ভুলিয়া সেই দিকেই গল্পের স্রোত বহাইয়া দিতেছেন,—অপেক্ষাকৃত ভাবুক শ্রোতা মূল গল্প শুনিতে উৎসুক হইয়া মনে মনে সা, ঋ, গ, ম বাঁধিয়া সুর দিতেছেন এবং কোন্ সময় কবি মূল সুর ধরিবেন, তাহার অপেক্ষা করিতেছেন,—ইতিমধ্যে দেখিলেন, পালা শেষ হইয়া গিয়াছে।

শ্যামাসঙ্গীত।

দাশুর পাঁচালী সম্বন্ধে আমরা যেরূপ মন্তব্য প্রকাশ করি না কেন, তাঁহার রচিত শ্যামাবিষয়ক গানগুলির প্রাণ খুলিয়া প্রশংসা করিব; এখানে বাক্যচপল অসার আমোদপ্রিয় শব্দকুশল দাশু সহসা ধর্ম্ম-গম্ভীর গুরুত্ব দ্বারা স্বীয় গানগুলিতে এক আশ্চর্য্য বৈরাগ্য ও ভক্তিপ্লুত কাতরতা ঢালিয়া দিয়াছেন; "দোষ কারও নয় গো মা" প্রভৃতি গান প্রকৃত বৈরাগ্য ও অনুশোচনার অশ্রুতে পবিত্র। দোষ রাম-শ্যামের, আমি ত সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, প্রতিবাসী ও আত্মীয়বর্গের দোষ গাহিয়া গাহিয়া জীবনের অনেকাংশ অতিবাহিত করিয়াছি; কিন্তু এমন দিনও আসিতে পারে, যখন পরচ্ছিদ্র অনুসন্ধিৎসু চক্ষুর গতি ফিরিয়া যায়, এবং নষ্টযুক্তি দ্বারা স্বীয় কার্য্য সমর্থনের চেষ্টা সম্পূর্ণ পরাভূত হয়, তখন এই মায়াময় সংসারচিত্র চক্ষু হইতে সরিয়া

* নিতান্ত অশ্লীল বলিয়া এই পুস্তকের মুদ্রাঙ্কন নিষিদ্ধ হইয়াছে।

পড়ে, এবং নিঃসহায় হইয়া জগন্মাতার পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িয়া মানুষ নিজের মূর্ত্তি দেখিয়া ভয় পায়। এই পুণ্যক্ষেত্রে রিপুবশে নিজে কূপ কাটিয়া ডুবিয়াছি, কাহাকে দোষ দিব? "দোষ কারও নয় গো মা" বলিয়া সরল মর্ম্মভেদী ক্রন্দনে তখন দয়াব জন্য, ক্ষমার জন্য লালায়িত হইয়া পড়ি,--অভিমানস্ফীত মানুষ—প্রকৃতির মহাকরুণাময়ী মাতৃরূপিণী শক্তির নিকট তখন একটি নিঃসহায় শিশুর ন্যায় কৃপা ভিখারী; এই ভাবের গান দাশরথির অনেকগুলি আছে। একটি বৈষ্ণববিষয়ক সঙ্গীতে দাশু রাধাকৃষ্ণের রূপকের বড় সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়াছেন, সেই গানটি আমরা এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি—

বৈষ্ণব-ধর্ম্মের ব্যাখ্যা।

"হৃদি বৃন্দাবনে বাস কর যদি কমলা-পতি। ওহে ভক্তি-প্রিয়, আমার ভক্তি হবে রাধাসতী॥ মুক্তি কামনা আমার (ই) হবে বৃন্দা গোপনারী, আমার দেহ হবে নন্দের পুরী, স্নেহ হবে মা যশোমতী॥ ধর ধর জনার্দ্দন, পাপভার-গোবর্দ্ধন, কামাদি ছয় কংসচরে ধ্বংস কর সম্প্রতি॥ বাজায়ে কৃপা-বাঁশরী, মনধেনুকে বশ করি, গোষ্ঠের সাধ কৃষ্ণ পুরাও, পদে তোমার এই মিনতি। প্রেমরূপ যমুনার কূলে আশাবংশীবটমূলে, 'দাস' ভেবে সদয় হয়ে সদা কর বসতি॥ যদি বল সে রাখাল প্রেমে, বন্ধ আছ ব্রজধামে, জ্ঞানহীন রাখাল তোমার 'দাস' হ'তে চায় দাশরথি॥"

ইঁহার আর একটি শ্যামাবিষয়ক গানের কতকাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। ভক্তের নিকট মৃত্যুচিন্তাও কেমন সুখস্বপ্নময়, পাঠক গানটি পড়িয়া তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন;—

আর একটি গান।

"দুর্গে ক'র মা এ দীনের উপায়, যেন পায়ে স্থান পায়। আমার এ দেহ পঞ্চত্বকালে, তব প্রিয় পঞ্চস্থলে, আমার পঞ্চভূতে যেন মিশায়। শ্রীমন্দিরে অন্তর আকাশ যেন যায়। এ মৃত্তিকা যায় যেন ত্বৎপ্রতিমায়, মা মোর পবন তব চামর ব্যজনে যায়, হোমাগ্নিতে মমাগ্নি যেন মিশায়। আমার জল যেন যায় পাদ্যজলে, যেন ভবে যায় বিমলে, দাশরথীর জীবন মরণ দায়।"

দাশুর রুচি, দাশুর জীবন ও সাহিত্যের প্রতিভা আমাদিগকে জার্ম্মান কবি স্কুবার্ডের কথা স্মৃতিতে উদ্রেক করে। ভক্তির সঙ্গে অশ্লীলতার, স্থূল পরিহাসরসিকতার সঙ্গে উচ্চাঙ্গের ভাবুকতার আমরা সাহিত্যের এই যুগে যতটা বিরোধ কল্পনা করি, বোধ হয় ততটা প্রকৃত নহে'। কিংবা মনুষ্য মন অতীব জটিল বস্তু, উহাতে নির্ম্মলতার সঙ্গে আবর্জ্জনা, সারল্যের সঙ্গে কৌটিল্য, উভয়ই একত্র থাকিতে পারে।

কবির মৃত্যুর পর তাঁহার "ভাই তিনকড়ি" ও ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয় কিছুকাল তাঁহার দল রাখিয়াছিলেন। কিন্তু 'পাঁচালীর' দল তাঁহার মৃত্যুর পরে আর প্রতিপত্তি লাভ করে নাই—যাঁহারা তাঁহার অনুকরণ করিয়া 'পাঁচালী' লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে শ্রীরামপুরের নিকটস্থ বড়াগ্রামনিবাসী কায়স্থকুলোদ্ভব রসিকচন্দ্র রায়ের নাম উল্লেখযোগ্য।

কদর্য্য আদিরসের স্রোত হইতে দূর নির্ম্মল বৈষ্ণব সঙ্গীতের ধারা পুনঃ বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে প্রবাহিত হইয়াছিল, সেই সঙ্গীত প্রাণের কামনা ও নিঃস্বার্থতার আবেগে পূর্ণ। এই গীতিগুলি যাঁহারা রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কৃষ্ণকান্ত চামার, নীলমণি পাটুনী; নিত্যানন্দ বৈরাগী, ভোলানাথ ময়রা, মধুসূদন কিন্নর, গোজলা গুঁই, রঘুনাথ দাস তন্তুবায়, প্রভৃতি কবিগণ নিম্নশ্রেণী হইতে উদ্ভূত হন। বস্তুতঃ কবিওয়ালাগণের বহুসংখ্যক গীতি-রচকই হিন্দুসমাজের অধস্তন স্তর হইতে উৎপন্ন। যখন বড় বড় রাজগণ, সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও বিশিষ্ট ভদ্রলোকবর্গ বঙ্গসাহিত্যকে কৃত্রিম সৌন্দর্য্য দ্বারা শ্রীসম্পন্ন করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন ও বিলাসের পঙ্ক দ্বারা ইহাকে কাব্য পিপাসুর অসেব্য করিয়া তুলিয়াছিলেন, তখন নিম্নশ্রেণীর লোকবৃন্দ ভাষার বিশুদ্ধতা ও রুচির নির্ম্মলতা রক্ষা করিতে দাঁড়াইয়াছিলেন, ইহা কম আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। বৈষ্ণব-ধর্ম্ম নিম্নশ্রেণীর মধ্যেই বিশেষ কার্য্যকর হইয়াছিল, সন্দেহ নাই—যে দেশের সামাজিক পদবীতে নিতান্ত ঘৃণ্য ও অধঃপতিত ব্যক্তিগণ এরূপ উৎকৃষ্ট নিষ্কাম প্রেমের কথা বলিতে পারে—সে দেশ কোন একরূপ সভ্যতার উচ্চ আদর্শ আয়ত্ত করিয়াছে, স্বীকার করিতে হইবে।

পুনরায় বৈষ্ণব গীতি।

কবিওয়ালাগণের সম্বন্ধে আলোচনার পূর্ব্বে আমরা রামনিধি রায়ের উল্লেখ করা উচিত মনে করি। ইনি ১৭৪১ খৃঃ অব্দে পাণ্ডুয়ার নিকট চাঁপাতলা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন, পরে কলিকাতা কুমারটুলি আসিয়া বাস স্থাপন করেন। ইনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে কার্য্য করিতেন। ১৮৩৪ খৃঃ অব্দে ৯৩ বৎসর বয়সে ইঁহার মৃত্যু হয়। রামনিধি রায়ের গানগুলি সাধারণতঃ 'নিধুব টপ্পা' বলিয়া খ্যাত। প্রাচীন সাহিত্যে কবি নিধুরায় স্বতন্ত্রপথাবলম্বী; ইনি প্রেমসঙ্গীত রচনা করিয়াছেন, অথচ রাধাকৃষ্ণ কি বিদ্যাসুন্দর-প্রসঙ্গে হস্তক্ষেপ করেন নাই, নিজের ভালবাসা ও মনের ব্যথা স্বাধীনভাবে গাহিয়াছেন, ইহা বঙ্গসাহিত্যে তৎকালে নূতন প্রথা। তাঁহার প্রেমসংগীতে সঙ্গত রুচি ও আত্মসমর্পণের কথা অধিক,—"ভাল বাসবে বলে ভালবাসিনে। আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে॥" "সুরভি গরবে কে তব তুলনা হবে, আপনি আপন সম্ভবে, যেমন গঙ্গা পূজা গঙ্গাজলে।" "তোমার বিরহ সয়ে বাঁচি যদি দেখা হবে। আমি মাত্র এই চাই, মরি তাহে ক্ষতি নাই, তুমি আমার সুখে থাক, এ দেহে সকলি সবে॥" "যেও যেও প্রাণনাথ প্রেম নিমন্ত্রণ, নয়ন জলে স্নান করাব, কেশেতে মুছাব চরণ।" বিদ্যাসুন্দরাদির পঙ্কিল স্রোত হইতে সমুত্থান করিয়া পাঠক এই নিঃস্বার্থ উচ্চ-অঙ্গের প্রেমের রাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সুখী হইবেন, সন্দেহ নাই।

রামনিধি রায়—১৭৪১ খৃঃ।

এখানে আমরা সংক্ষেপে কবিওয়ালাগণের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিব। শ্যামাসঙ্গীতরচকগণের বিষয় পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি, এস্থলে শুধু বৈষ্ণব সঙ্গীতকারগণের প্রসঙ্গ লিখিতেছি।

কবিওয়ালাগণ।

কবিগণ প্রথমে "দাড় কবি" নামে পরিচিত ছিলেন, আসরে দাঁড়াইয়া কবিতা প্রস্তুত করিতেন বলিয়াই বোধ হয় তাঁহারা এই খেতাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রঘু, মতে, নন্দ, এই তিনজনই সর্ব্ব-প্রথম কবিওয়ালা বলিয়া পরিচিত হন। ইঁহারা বাঙ্গালা একাদশ শতাব্দীর লোক। রঘু চর্ম্মকার-জাতীয় ছিলেন বলিয়া কেহ কেহ প্রচার করিয়াছিলেন, অপর এক দলের মতে তিনি কায়স্থ ছিলেন।

রামবসু।

রামবসুর বিষয় পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে। ইঁহার রাধাকৃষ্ণবিষয়ক গানগুলিই বিশেষ প্রশংসনীয়। রাধা জলে প্রতিবিম্বিত শ্রীকৃষ্ণের স্নিগ্ধ রূপ দেখিয়া বিমুগ্ধা, অশ্রুনেত্রে করযোড়ে সেই রূপ দেখিতেছেন ও সখীগণকে বলিতেছেন,—"ঢেউ দিও না কেউ এ জলে, বলে কিশোরী। দরশনে দাগা দিলে, হবে পাতকী॥" এই দৃশ্য ছবির উপযুক্ত। রামবসুর বিরহে বঙ্গবধূর প্রেমপূর্ণ সলাজ হৃদয়টি অঙ্কিত হইয়াছে, বাঙ্গালী জানেন, এ দেশে সেই হৃদয়ের দাম নাই। "যখন হাসি হাসি সে আসি বলে। সে হাসি দেখে ভাসি নয়ন-জলে॥" তাঁহার বিদায়ের সময়ের এই নিষ্ঠুর হাসি দেখিয়া যত দুঃখ হইয়াছিল, তাহা মানিনী লজ্জায় জানাইতে পারেন নাই। "তার মুখ দেখে মুখ ঢেকে কাঁদিলাম স্বজনি। অনায়াসে প্রবাসে গেল সে গুণমণি॥" সে হাসিতে হাসিতে অনায়াসে চলিয়া গেল—কিন্তু নীরব অশ্রুপূর্ণ একখানা সুন্দর মুখ এবং বুকভাঙ্গা লজ্জা ও বিরহের একখানি ম্রিয়মাণ মধুর ছবি পাছে ফেলিয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়ভঙ্গে রাধিকা আবার কাঁদিতেছে—দাঁড়াও দাঁড়াও প্রাণনাথ বদন ঢেকে যেও না। * * * তুমি চক্ষু মুদে আমায় দুঃখ দিও না॥" পৃথিবীর উর্দ্ধভাগে অল্পকালশ্রুত চলন্ত স্বর্গবাসী পাখীর মধুর স্বরের ন্যায় এই সব কবির গীত সহসা মন মুগ্ধ করিয়া ফেলে। রামবসুর গানে মধ্যে মধ্যে অনুপ্রাসের লীলা আছে, যথা,—"এত ভৃঙ্গ নয় ত্রিভঙ্গ বুঝি এসেছে। শ্রীমতীর কুঞ্জে, গুন্ গুন্ স্বরে কেন অলি, শ্রীরাধার শ্রীপদে গুঞ্জে।"

হরু ঠাকুর—১৭৩৮ খৃঃ।

হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাড়ি ১৭৩৮ খৃঃ অব্দে কলিকাতা সিমুলিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। হরুঠাকুর প্রথমতঃ রঘুনাথ দাস নামক একজন তন্তুবায়ের নিকট কবিতা রচনা শিক্ষা করেন। কথিত আছে, একদিন হরুঠাকুর মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুরের বাড়ীতে এক পেশাদারী কবির দল সখ করিয়া গাহিতেছিল, রাজা তাঁহার গানে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে এক জোড়া শাল প্রদান করেন। হরুঠাকুর অপমান বোধ করিয়া সেই শাল-জোড়া তৎক্ষণাৎ ঢুলির মস্তকে নিক্ষেপ করেন। হরুঠাকুর রামবসুর ন্যায় প্রতিভাপন্ন না হইলেও স্নিগ্ধ ও মধুর কথা রচনায় দক্ষ; একটি গান এইরূপ,—"হরিনাম লইতে অলস হও না, রসনা যা হবার তাই হবে। ঐহিকের সুখ হল না বলে কি, ঢেউ দেখি তরী ডুবাবে।" বিরহ-বর্ণনায় হরুঠাকুর সিদ্ধহস্ত ছিলেন,—একটি গানের কতকাংশ উদ্ধৃত হইল;—

"সুধীর ধীর বহিছে এই ঘোরতরা রজনী।
এ সময়ে প্রাণসখীরে কোথায় গুণমণি, ঘন গরজে ঘন শুনি॥
ঐ ময়ূর ময়ূরী হরষিত, হেরি চাতক চাতকিনী,
এ কদম্ব কেতকী চম্পক জাঁতি সেউতি সেফালিকে,
ঘ্রাণেতে প্রাণেতে মোহ জন্মায় প্রাণনাথে গৃহে না দেখে,
বিদ্যুৎ খদ্যোত দিবা জ্যোতি মত প্রকাশে দিনমণি,
প্রিয় মুখে মুখ দিয়ে শারীশুক থাকে দিবস রজনী॥

১৮১৩ খৃঃ অব্দে হরুঠাকুরের মৃত্যু হয়।

রাসু ও নৃসিংহ—ইঁহারা দুই সহোদর, ফরাসডাঙ্গার অধীন গোন্দলপাড়া গ্রামে বাস করিতেন। ইঁহারা সখীসংবাদ গান রচনা করিয়া বিশেষ যশস্বী হইয়াছিলেন। অনুমান ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে ইঁহারা সঙ্গীত রচনা করেন। রচনার নমুনা যথা,—"শ্যাম তোমার চরিত, পথিক যেমত হোয়ে শ্রান্তিযুত বিশ্রাম করে। শ্রান্তি দূর হলে, যায় পুন চলে, পুন নাহি চায় ফিরে॥" এতদ্ব্যতীত প্রায় ২০০ বৎসর পূর্ব্বের কবি গোঁজলাগুঁই রচিত অনেকগুলি গান পাওয়া যাইতেছে। নিত্যানন্দদাস বৈরাগী (১৭৫১ খৃঃ—১৮২১ খৃঃ) চন্দননগরবাসী ছিলেন। ইনিও একজন প্রসিদ্ধ কবিওয়ালা। ইহাঁর দলে রচিত কোন কোন গান বড় মিষ্ট যথা—"বঁধুর বাঁশী বাজে বিপিনে। শ্যামের বাঁশী বুঝি বাজে বিপিনে। নহে কেন অঙ্গ অবশ হইল, সুধা বরষিল শ্রবণে॥ বৃক্ষডালে বসি, পক্ষী অগণিত, জড়বৎ কোন্ কারণে। যমুনার জলে, বহিছে তরঙ্গ, তরু হেলে বিনে পবনে॥" আমাদের আর স্থান কুলাইতেছে না, সুতরাং কৃষ্ণচন্দ্র চর্ম্মকার (কৃষ্ণে মুচি), লালু নন্দলাল, নিত্যানন্দ, ভবানী, নীলমণি পাটুনি, কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য, সাতুরায়, গদাধর মুখোপাধ্যায় জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঠাকুরদাস চক্রবর্ত্তী, রাজকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়, গোরক্ষনাথ, নসাইঠাকুর, গৌর কবিরাজ প্রভৃতি বহু কবিওয়ালার গান উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। কিন্তু এস্থলে যজ্ঞেশ্বরী নাম্নী রমণী কবি রচিত একটি সখীসংবাদ গানের কতকাংশ তুলিয়া দেখাইতেছি,—"কর্ম্মক্রমে আশ্রমে সখা হলে যদি অধিষ্ঠান। হেরে মুখ, গেল দুঃখ, দুটো কথার কথা বলি প্রাণ। আমায় বন্দী করি প্রেমে, এখন ক্ষ্যান্ত হলে হে ক্রমে ক্রমে, দিয়ে জলাঞ্জলি এ আশ্রমে। আমি কুলবতী নারী, পতি বই আর জানিনে॥ এখন অধীনী বলিয়া ফিরে নাহি চাও, পরের ধন ফেলে, প্রাণ, পরের ধন আগুলে বেড়াও। নাহি চেন ঘর বাসা, কি বসন্ত কি বরষা, সতীরে করে নিরাশা, অসতীর আশা পুরাও॥"

রাসু ও নৃসিংহ এবং অপরাপর কবিওয়ালাগণ

যজ্ঞেশ্বরী।

আমরা ভোলাময়রা কবির নাম একবার উল্লেখ করিয়াছি: ইনি হরুঠাকুরের চেলা ছিলেন, ইঁহার 'ভোলানাথ' নামে শিবত্ব আরোপ করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী দল ব্যঙ্গ করাতে ভোলা গালি খাইয়া বলিতেছে—"আমি সে ভোলানাথ নই, আমি সে ভোলানাথ নই। আমি ময়রা ভোলা, হরুর চেলা, শ্যামবাজারে রই, আমি যদি সে ভোলানাথ হই, তোরা সবাই,

ভোলাময়রা।

বিল্বদলে আমার পুষ্পাঞ্জলি কই।" পূর্ব্বোক্ত কবিগণ ছাড়া মধুসূদন কিন্নররচিত রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক অনেকগুলি পদ পাওয়া যায়।

এই সময় পূর্ব্ববঙ্গেও বহুসংখ্যক কবিওয়ালা উৎকৃষ্ট গান রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত কবিগণের পার্শ্বে দাঁড়াইবার যোগ্য। আমরা আপাততঃ তাঁহাদিগের নাম উল্লেখ করিতে পারিলাম না; সংগ্রহকার্য্য সম্পূর্ণ হইলে, পরে তাহা পাঠকগণের বিদিত করিতে ইচ্ছা রহিল। পূর্ব্ববঙ্গের কবিওয়ালা রামরূপঠাকুর-কৃত একটি সখী-সংবাদ গান মাত্র এখানে উদ্ধৃত করিতেছি—(চিতান) "শ্যাম আসার আশা পেয়ে, সখীগণ সঙ্গে নিয়ে, বিনোদিনী। যেমন চাতকিনী পিপাসায়, তৃষিত জল-আশায়, কুঞ্জ সাজায় তেমি কমলিনী॥ তুলে জাঁতি যূথি কুট্‌রাজ বেলি, গন্ধরাজ ফুল কৃষ্ণকেলী, নবকলি অর্দ্ধবিকশিত, যাতে বনমালী হরষিত। সাজাল রাই ফুলের বাসর, আসবে বলে রসিক নাগর, আসাতে হয় যামিনী ভোর, হিতে হল বিপরীত। ফুলের শয্যা সব বিফল হল, অসময়ে চিকণ কালা বাঁশী বাজায়। রঙ্গদেবী তায় বারণ করে দ্বারে গিয়ে। (ধুয়া) ফিরে যাও হে নাগর, প্যারী বিচ্ছেদে হয়ে কাতর, আছে ঘুমাইয়ে। ফিরে যাও শ্যাম তোমার সম্মান নিয়ে। (পর চিতেন) ছিলে কাল নিশীথে যার বাসরে, বঁধু তারে কেন নিরাশ করে, নিশি-শেষে এলে রসময়। বঁধু প্রেমের অমন ধর্ম্ম নয়। তুমি জান্‌তে পার সব প্রত্যক্ষে, দুই প্রেমেতে যে জন দীক্ষে, এক নিশিতে প্রেমের পক্ষে, দুইএর মন কি রক্ষা হয়। প্যারী ভাগের প্রেম কর্‌বে না, রাগেতে প্রাণ রাখবে না এখন মর্‌তে চায় যমুনায় প্রবেশিয়ে॥"

পূর্ব্ববঙ্গের রামরূপঠাকুর।

কবিওয়ালাগণের সঙ্গে যাত্রাওয়ালা দলেরও উল্লেখ আবশ্যক। সখীসংবাদগান অপেরার ন্যায়, কিন্তু যাত্রাগুলি দেশীয় নাট্যাভিনয়। এদেশে শ্রীকৃষ্ণযাত্রাই প্রথম অভিনীত হইত বলিয়া বোধ হয়,—শ্রীকৃষ্ণযাত্রার সাধারণ নাম ছিল 'কালিয়দমন'; কিন্তু এই যাত্রা শুধু নামের অর্থে সীমাবদ্ধ ছিল না, শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বপ্রকার লীলাই এই 'কালিয়দমন' যাত্রায় অভিনীত হইত। আমরা এস্থলে প্রাচীন-কালের বড় বড় যাত্রাওয়ালা অধিকারী মহাশয়দিগের নাম উল্লেখ করিয়া যাইব। গোপালচন্দ্র দাস-উড়ের নাম আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছি। যাত্রাগুলির সর্ব্বাদৌ "গৌরচন্দ্রিকা" পাঠ হইত, তাহাতে বোধ হয়, মহাপ্রভুর পরে যাত্রাসমূহ বর্ত্তমান আকারে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

শ্রীকৃষ্ণযাত্রায়,—বীরভূমনিবাসী পরমানন্দ অধিকারী নাম সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। তৎপর শ্রীদাম সুবল অধিকারী কৃষ্ণলীলা বিষয়ে যশ অর্জ্জন করেন। এই কবির সম-সাময়িক লোচন অধিকারী অক্রূরসংবাদ এবং নিমাইসন্ন্যাস গাহিয়া শ্রোতৃবর্গকে বিমুগ্ধ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, ইনি কুমারটুলির বিখ্যাত বনমালী সরকার ও মহারাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের বাড়ীতে গাহিয়া তাঁহাদিগকে এরূপ মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছিলেন যে তাঁহারা সংজ্ঞাশূন্য হইয়া কবিকে অপরিমিত-সংখ্যক মুদ্রা দান করেন। করুণ রসে বিপ্লাবিত হওয়ার আশঙ্কায় কলিকাতার অন্য কোন ধনী ব্যক্তি ইহাঁকে গান গাইবার জন্য আহ্বান করিতে সাহসী হন নাই।

শ্রীকৃষ্ণ যাত্রা।

জাহাঙ্গীরপাড়া—কৃষ্ণনগরনিবাসী গোবিন্দ অধিকারী ও কাটোয়াবাসী পীতাম্বর অধিকারী, ঢাকার অন্তর্গত বিক্রমপুরনিবাসী কালাচাঁদ পাল শ্রীকৃষ্ণযাত্রায় পরসময়ে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। পাতাইহাটের প্রেমচাঁদ অধিকারী, আনন্দ অধিকারী ও জয়চাঁদ অধিকারী রামযাত্রায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন। ফরাসডাঙ্গার গুরুপ্রসাদ বল্লভ চণ্ডীযাত্রা ও বর্দ্ধমানের পশ্চিমাংশ-নিবাসী লাউসেন বড়াল 'মনসার ভাসান' পালা গাহিতেন ও দুই জনেই স্ব স্ব বিষয়ে অদ্বিতীয় যশস্বী ছিলেন।*

কৃষ্ণকমল গোস্বামী।

পূর্ব্ববঙ্গ কৃষ্ণযাত্রার এক বিশেষ অভিনয়ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই সকল যাত্রালেখক কবিগণের নাম ও গ্রন্থাদির উল্লেখ আমরা এখন করিতে পারিলাম না—কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে যিনি পূর্ব্ববঙ্গের যাত্রাগুলির নেতৃত্ব গ্রহণ করেন, তিনি পূর্ব্ববঙ্গের লোক ছিলেন না। এই গীতি-কাব্য-শাখায় আমরা যে সকল কবির নাম উল্লেখ করিলাম, কৃষ্ণকমল গোস্বামী তাঁহাদিগের শীর্ষস্থানীয়। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পরে কৃষ্ণকমলের ন্যায় পদকর্ত্তা আর জন্মগ্রহণ করেন নাই—তিনি এই বৈষ্ণব-গীতি-সাহিত্যের পুনরুত্থানকালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি।

বংশাবলী।

কৃষ্ণকমল গোস্বামী মহাপ্রভুর প্রিয় পার্শ্বচর বৈদ্যবংশীয় সদাশিব কবিরাজের বংশোদ্ভব; বংশাবলী এইরূপ, ১। সদাশিব, ২। পুরুষোত্তম, ৩। কানাইঠাকুর, ৪। বংশীবদন, ৫। জনার্দ্দন, ৬। রামকৃষ্ণ, ৭। রাধাবিনোদ, ৮। রামচন্দ্র, ৯। মুরলীধর, ১০। কৃষ্ণকমল। সুখসাগর ইঁহাদিগের আদিম বাসস্থান ছিল, পরে যশোহর বোধখানা গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। বোধখানা গ্রাম হইতে এক শাখা নদীয়া ভাজনঘাট গ্রামে উপনিবিষ্ট হন। কৃষ্ণকমলের পিতা মুরলীধর ভাজনঘাটবাসী ছিলেন। এই বৈষ্ণব-বৈদ্যবংশের এক বিশেষ শ্লাঘার বিষয় এই,—পুরুষোত্তম গোস্বামী নিত্যানন্দ প্রভুর জামাতা মাধবাচার্য্যের গুরু ছিলেন, সুতরাং ইঁহারা নিত্যানন্দপ্রভুর কন্যা গঙ্গাদেবীর স্বামী ও সন্তান-সন্ততির গুরুকুল।

বাল্যজীবন।

কৃষ্ণকমল ১৮১০ খৃঃ অব্দে ভাজনঘাটে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতা সাধ্বী যমুনাদেবী পর দুঃখকাতরা আদর্শরমণী ছিলেন। সপ্তম-বৎসর-বয়স্ক বালককে মাতৃ-ক্রোড়বঞ্চিত করিয়া মুরলীধর ঠাকুর বৃন্দাবনে লইয়া যান। সেইখানে কৃষ্ণকমল ব্যাকরণ পাঠ আরম্ভ করেন,—কথিত আছে, তথাকার এক নিঃসন্তান ধনকুবের বালক কৃষ্ণকমলের স্নিগ্ধ রূপ ও হরিভক্তির উদ্দাম ভাবাবেশ দেখিয়া তাহাকে সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধি-কারী করিয়া পোষ্য পুত্র স্বরূপ রাখিতে ইচ্ছা করেন। মুরলীধর এই বিপদ হইতে নিষ্কৃতির জন্য

---

* ভারতী, মাঘ, ১২৮৮।

পুত্রসহ পলাইয়া গৃহে আগমন করেন। ছয় বৎসর পরে মাতা যমুনাদেবী পুনরায় শিশুর মুখচুম্বন করিতে সমর্থা হইয়াছিলেন।

কৃষ্ণকমল নবদ্বীপের টোলে পাঠ সাঙ্গ করিয়া 'নিমাইসন্ন্যাস' যাত্রা রচনা করেন ও তাহা অভিনয় করিয়া নবদ্বীপবাসীদিগকে মুগ্ধ করেন। ইহার পর তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। পঞ্চবিংশ বর্ষ বয়সে কৃষ্ণকমল হুগলীর সোমড়া বাঁকিপুর গ্রামের স্বর্ণময়ীদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। বিবাহের পর তিনি স্বীয় বদান্য শিষ্য রামকিশোরের সঙ্গে ঢাকায় আগমন করেন। এই সময় হইতে তাঁহার কবিত্বের বিকাশ পাইতে থাকে। সেই সময় ঢাকা সংগীতচর্চ্চার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল, যাত্রার নানা দল তথায় প্রতিযোগিতা করিতেছিল। কৃষ্ণকমলের "স্বপ্নবিলাস" রচিত হওয়ার পর সেই সব প্রতিদ্বন্দ্বী দলের সকলেই নূতন কবির শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিল। বৈরাগিগণ সারেং লইয়া স্বপ্নবিলাসের গান বাজাইতে লাগিল, বালকগণ পথে পথে চীৎকার করিয়া—"এ ঘর হতে ও ঘর যেতে, অঞ্চল ধরি সাথে সাথে, বল্‌ত দে মা ননী খেতে—সে ননী অবনীতে পড়ে র'ল গো" প্রভৃতি গাহিতে লাগিল। স্বপ্নবিলাস রচিত হওয়ার পর ৫০ বৎসর অতীত হইয়াছে, এখনও পূর্ব্ববঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে সেই সব সংগীত গাহিয়া প্রেমিকগণ তাহাদের নির্ম্মল রস আস্বাদন করেন,—সেই স্বার্থশূন্য স্বর্গীয় ভাবপূর্ণ বাণীগুলি মর্ত্ত্যধামের দুঃখপীড়িত লোকের মনে উৎকৃষ্ট নিষ্কাম প্রবৃত্তির উদ্রেক করিয়া দেয়। আবদুল্লাপুর গ্রামে 'স্বপ্নবিলাসের' প্রথম অভিনয় হইয়াছিল। তৎপর কবি 'রাই-উন্মাদিনী,' 'বিচিত্র-বিলাস,' 'ভরত মিলন,' 'নন্দ হরণ,' 'সুবল সংবাদ' প্রভৃতি পালা রচনা করেন। বিচিত্র-বিলাসের ভূমিকায় কবি 'রাই-উন্মাদিনী' ও 'স্বপ্নবিলাসের' কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন,—"বোধ হয় ইহাতে সাধারণেরই প্রীতি সাধিত হইয়াছিল, নতুবা প্রায় বিংশতি সহস্র পুস্তক স্বল্প দিনের মধ্যে নিঃশেষিত হইবার সম্ভাবনা কি?" ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় 'স্বপ্নবিলাস,' 'রাই-উন্মাদিনী' এবং 'বিচিত্রবিলাস' প্রভৃতি পুস্তক জার্ম্মনী, রাসিয়া প্রভৃতি দেশে সঙ্গে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন ও লণ্ডন হইতে এই তিন পুস্তক অবলম্বন করিয়া "The Popular Dramas of Bengal" নামক সুন্দর পুস্তক প্রণয়ন করিয়া ডাক্তার উপাধি লাভ করেন।

স্বপ্নবিলাস।

অন্যান্য গ্রন্থ।

কৃষ্ণকমল অসামান্য প্রসিদ্ধির সহিত ঢাকায় শেষজীবন অতিবাহিত করেন। প্রসিদ্ধ ডাক্তার সিম্‌সন্ সর্ব্বদা তাঁহাকে দেখিতে যাইতেন ও 'পণ্ডিত গোঁসাই' বলিয়া সমাদর করিতেন,—"বড়গোঁসাই" বলিলে ঢাকাবাসী লোক কৃষ্ণকমলকে বুঝিতেন। অশ্রুগদ্‌গদকণ্ঠে যখন বড়গোঁসাই ভাগবত পড়িতেন, তখন তাঁহার করুণ ব্যাখ্যায় কঠিন হৃদয় দ্রব হইত। জীবনে তিনি অনেক পাষাণ কোমল করিয়াছিলেন।

শেষ জীবন।

কবির বৃদ্ধ বয়সে জ্যেষ্ঠ পুত্র সত্যগোপাল গোস্বামীর মৃত্যু হয়। এই শোক ও নানারূপ জটিল

ব্যাধিতে তাঁহার শরীর ভগ্ন হয়,—১৮৮৮ খৃঃ ১২ই মাঘ—৭৭ বৎসর বয়ঃক্রমে চুঁচুড়ার নিকট গঙ্গা-তীরে তাঁহার লীলার অবসান হয়। তাঁহার পুত্র নিত্যগোপাল গোস্বামী এখনও ঢাকায় আছেন, এবং তাঁহার পৌত্র কামিনীকুমার গোস্বামী অল্প দিন হইল কলিকাতা হইতে, 'কৃষ্ণকমল গ্রন্থাবলীর' এক নব সংস্করণ বাহির করিয়াছেন। কৃষ্ণকমল গোস্বামীর অপরাপর বিষয় সম্বন্ধে ১৮৯৪ সনের মার্চ্চ মাসের 'ন্যাসনাল্ ম্যাগাজিনে' এবং পৌষ মাসের 'সাহিত্যে' আমরা বিস্তারিত ভাবে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম।

রাই-উন্মাদিনী।

কৃষ্ণকমল গোস্বামীর "রাই-উন্মাদিনী"ই বিশেষ প্রশংসনীয় কাব্য। এই পুস্তকের প্রতি পত্রেই চৈতন্যদেবকে মনে পড়িবার বিষয় আছে। যাঁহারা "চৈতন্যচরিতামৃত" প্রভৃতি পুস্তক পড়েন নাই, তাঁহারা "রাই-উন্মাদিনীর" স্বাদ ভাল করিয়া পাইবেন না। অঙ্কিত চিত্রখানি বৃন্দাবনের উন্মাদিনীর নামে নবদ্বীপের উন্মাদের। কৃষ্ণকমল পুস্তকের সূচনায় বলিয়াছেন,—"স্বাদিতে নিজ মাধুরী, * * * নাম ধরি গৌরহরি, হরি বিরহেতে হরি, কাঁদি বলে হরি হরি।" চৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্যখণ্ডে ৮ম পরিচ্ছেদে ঠিক এই কথাই আছে,—"আপন মাধুর্য্য হরে আপনার মন। আপনা আপনি চাহে করিতে আলিঙ্গন॥" আমরা নার্‌সিকাসের ন্যায় আত্মরূপে মুগ্ধ হইয়া প্রাণ দিয়া থাকি, বাহিরের বস্তুতে কে কবে আত্মসমর্পণ করিয়াছে! বাহিরের বস্তু উপলক্ষ করিয়া আমরা স্বীয় আদর্শরূপেরই সত্তা অনুভব করিয়া থাকি। এই রূপের আদর্শ ব্যক্তিগত; রূপ বস্তুগত হইলে সুন্দর ফুল কি স্নিগ্ধ পল্লবটি দেখিয়া মানুষের ন্যায় ইতর প্রাণিগণও মুগ্ধ হইত; জাতিগত হইলে চীনদেশের ক্ষুদ্র পদ দেখিয়া আমরা সুখী হইতাম; সমাজগত হইলে দুই প্রতিবাসীর রুচি স্বতন্ত্র হইত না। আমরা প্রত্যেকে 'নিজের মাধুরী' দেখিয়া পাগল, সুতরাং ভালবাসাকে একার্থে আত্মরমণ বলা যাইতে পারে; নিজের কামনার প্রতিবিম্বই রূপ ধারণ করিয়া আমাদিগের অনুসরণ করিয়া থাকে। * গৌর অবতারে এই প্রেম-লীলা অতি পরিস্ফুট—নিজেকে দুই ভাবিয়া এই প্রেমের উদ্ভব, তখন—"দুটি চক্ষে ধারা বহে অনিবার, দুঃখে বলে বারে বার, স্বরূপ দেখারে একবার,—নতুবা পরাণে মরি। ক্ষণে গোরাচাঁদ, হৈয়ে দিব্যোন্মাদ, উদ্দীপন ভাবে ভেবে কালাচাঁদ, ধরতে যায় করিয়া দৈন্য" (রাই-উন্মাদিনী)। কৃষ্ণকমলের চক্ষে এই বিরহী গৌরচন্দ্রের মধুর মূর্ত্তি প্রতিভাত হইয়াছিল, তাহাই তিনি "রাই উন্মাদিনী"-রূপ উৎকৃষ্ট রূপক চিত্রে পরিণত করিয়াছেন। কৃষ্ণকমল এই প্রেমস্নিগ্ধ গোরা রূপের তুলনায় অন্য

---

* লর্ড বাইরণের পদে এই কথার আভাস দৃষ্ট হয়;—

"It is to create and in creating live,
a being more intense, that we endow,
with form our fancy gaining as we give the life we enjoy."

সমস্ত রূপ অপকৃষ্ট মনে করিয়াছেন,—"চাঁদে যে কলঙ্ক আছে। ছি, ছি, চাঁদ কি গোরাচাঁদের কাছে!" প্রেমিক নিজেই পূর্ণ—তবে বিরহ কেন? গোস্বামী মহাশয় বলিয়াছেন,—"তবে যে গোপিকার হয় এতই বিষাদ। তার হেতু প্রোষিতভর্তৃকা রসাস্বাদ॥ স্ফূর্ত্তিরূপে মূর্ত্তি যখন দেখেন নয়নে। তখন ভাবেন বুঝি এল বৃন্দাবনে॥ অদর্শনে ভাবেন কৃষ্ণ গেছে মধুপুরী॥" (রাই উন্মাদিনী)। এই মিলন-বিরোধী পথের অন্তরায় যমুনা, যাহা অদ্বৈত ভাবটিকে দ্বৈতভাবে দ্বিখণ্ড করিয়া বিরহের সৃষ্টি করিতেছে,—তাহা আত্মবিস্মৃতি মাত্র। চৈতন্যচরিতামৃতের আদিখণ্ডে চতুর্থ পরিচ্ছেদে এই কথার বিশেষরূপ আলোচনা আছে।

কৃষ্ণকমলের রাধিকা।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, কৃষ্ণকমলের রাধিকা—চৈতন্যদেবের ছায়া। তাঁহার প্রেমের আবেগ—নির্ম্মল, নিষ্কাম ও আত্মবিস্মৃতিপূর্ণ। রাধিকা এই প্রেমের আবেশে জড় জগতের স্তরে স্তরে কৃষ্ণসত্তা অনুভব করিতেছেন, তাঁহার প্রেম-বিলাপ প্রলাপের ন্যায় অসম্বদ্ধ, মধুর ও আত্ম-বিহ্বলতার কারুণ্যে মাখা। কবি প্রেম-চিত্রের মোহিনীতে মুগ্ধ রাধিকাকে তিনি কৃষ্ণপ্রেমে সুন্দরী করিয়া গড়িয়াছেন। তাঁহার প্রেম-মাখা কণ্ঠধ্বনি ও প্রেমাশ্রু উদ্বেলিত চক্ষুর সৌন্দর্য্য বুঝাইতে কম্বু কি কমলের তুলনার আবশ্যকতা নাই। চন্দ্রাবলী মূর্চ্ছাপন্ন রাধিকার রূপ দেখিয়া বলিতেছে,—"যখন বঁধুর বামে দাঁড়াইত, আবার হেসে হেসে কথা কত, তখন এই না মুখে—মুখের কতই যেন শোভা হ'ত—তা নৈলে এমন হবে বা কেন, বঁধু থেকে আমার বক্ষঃস্থলে, কেঁদে উঠ্‌ত রাধা বলে।"—"বঁধু থেকে কুসুমশয্যায়, হৃদয়ে রাখ্‌তে যায়, সে ধন আজ ধূলায় গড়াগড়ি যায়।" "অতুল রাতুল কিবা চরণ দুখানি। আল্‌তা পরাত বঁধু কতই বাখানি—এ কমল চরণে যখন চলিত হাঁটিয়ে—বঁধুর দরশন লাগি গো অনুরাগে—হেন বাঞ্ছা হ'ত যে পাতিয়ে দেই হিয়ে।" পাঠক দেখিবেন, রাধিকা যখন কৃষ্ণের প্রীতি-পাত্রী, কিম্বা কৃষ্ণপ্রেমবিহ্বলা—চন্দ্রাবলী সেই সকল স্থলেই শুধু রাধিকাকে সুন্দরী দেখিয়াছেন,—শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যখন রাধিকা হাসিয়া কথা বলিতেন, সেই সময় তাঁহার হাসির মাধুর্য্যে চন্দ্রাবলী মুগ্ধ হইত—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে অতি যত্নে বক্ষে রাখিতেন, এই জন্য ধূলিলুণ্ঠিতা রাধিকার প্রতি চন্দ্রাবলীর এত কৃপা, বঁধু আল্‌তা পরাইতেন—এইজন্য সে পাদপদ্মযুগল চন্দ্রাবলীর চক্ষে সুন্দর—এবং যখন কৃষ্ণদর্শনের জন্য ব্যগ্র-হইয়া রাধিকা ছুটিয়া যাইতেন, তখন অনুরাগিণীর পদে কুশাঙ্কুর বিদ্ধ হওয়ার ভয়ে চন্দ্রাবলী বক্ষ পাতিয়া দিতে চাহিয়াছেন। এস্থলে রাধিকার প্রেমই তাঁহার সৌন্দর্য্য বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

বিরহ।

দিব্যোন্মাদের যে স্থলে বিরহিণী রাধিকা কুঞ্জকাননের কুন্দযূথিলতিকার নিকট দুঃখ-কথা কহিতেছেন,—সে স্থলটি কবিত্বময়,—"এই কদম্বের মূলে, নিয়ে গোপকুলে, চাঁদের হাট মিলাইত—সে রূপ র'য়ে র'য়ে মনে পড়ে গো।" ইত্যাদি স্মরণ করিয়া পাগলিনী মিলনের সুখ গাহিতেছেন; নানা অতীত সুখের কথা মনে হইতেছে, একদিন কৃষ্ণ চম্পককুসুম

দর্শনে রাধাকে স্মরণ করিয়া অজ্ঞান হইয়াছিলেন, দুপ্রহরে রাধা সুবল সাজিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট আসিলেন, দেখিলেন "নীলগিরি ধূলায় পড়ে, অমি তুলে নিলাম ধূলা ঝেড়ে, রাখিলাম শ্যাম হিয়ার উপরি—কত যতন ক'রে গো—আমার পরশে চেতন পেয়ে, বলে আমার মুখ চেয়ে, কোথা আমার পরাণ কিশোরী—সুবল বলরে। কইলাম আমি তোমার সেই দাসী, আমায় বুঝি চিন নাই নাথ,—অমি হৃদয়ে ধরিল হাসি, বঁধু কতই বা সুখে।" তার পরে কিরূপে তপস্যার ফলে শ্রীকৃষ্ণ লাভ হইয়াছিল, তাহা বলিতেছেন,—"প্রেম করে রাখালের সনে, ফির্‌তে হবে বনে বনে, ভুজঙ্গ কণ্টক পঙ্ক মাঝে—সখি, আমায় যেতে যে হবে গো—রাই বলে বাজিলে বাঁশী। অঙ্গনে ঢালিয়ে জল, করিয়ে অতি পিছল, চলাচল তাহাতে করিতেম, সখি আমার চল্‌তে যে হবে গো, বঁধুর লাগি পিছল পথে। হইলে আঁধার রাতি, পথ মাঝে কাঁটা পাতি, গতাগতি করিয়ে শিখিতেম, সদা আমায় ফিরতে যে হবে গো, কণ্টক কানন মাঝে।" ইহা কি নিষ্কাম দেব-আরাধনার কথা নহে! এই পদটি গোবিন্দ দাসের অমৃতময় ব্রজবুলিলিখিত একটি পদের অপূর্ব্ব বাঙ্গালা অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণ কত আদর করিতেন, এখন তাঁহার উপেক্ষা কি সহা যায়!—"আঁচরি চিকুর বানাইত বেণী, সখি সে বেণী সম্বরি, বাঁধিত কবরী মালতীর মালে বেড়াইত গো। কত সাজে সাজাইত, মুখ পানে চেয়ে র'ত, বঁধুর বিধু বদন ভেসে যেত, দুটি নয়নের জলপুঞ্জে॥" এই বিলাপাত্মক গীতির স্তরে স্তরে আসন্ন মূর্চ্ছার মূর্চ্ছনা; এই অবস্থায় সহসা পাখীর স্বরে কি মেঘোদয়ে মন উতলা হইয়া পড়ে,—উদ্‌ভ্রান্ত চক্ষের নিকট মেঘ কৃষ্ণের রূপপ্রাপ্ত হয় ও পাখীর স্বর রাধানামে সাধা বাঁশীর ধ্বনিতে পরিণত হয়; রাধা মেঘকে কৃষ্ণ মনে করিয়া যুক্ত করে বলিতেছেন, "ওহে তিলেক দাঁড়াও, দাঁড়াও হে, অমন করে যাওয়া উচিত নয়। যে যার স্মরণ লয়, নিঠুর বঁধু তারে কি বধিতে হয়। হেথা থাক্‌তে যদি মন না থাকে, তবে যেও সেথাকে। যদি মনে মন রত না হয় মনের মত, কাঁদলে প্রেম আর কত বেড়ে থাকে। তাতে যদি মোদের জীবন না থাকে—না থাকে, না থাকে, কপালে যা থাকে তাই হবে। বঁধু যথা যে না থাকে, তারে আর কোথা কে, ধ'রে বেঁধে কবে রেখে থাকে।" উন্মাদিনী কাঁদিয়া কাঁদিয়া বিনাইয়া বলিতেছেন,— "নেত্রপলকে যে নিন্দে বিধাতাকে, এত ব্যাজে দেখা সাজে কিহে তাকে, যাহৌক দেখা হ'ল, দুঃখ দূরে গেল—এখন গত কথায় আর নাই প্রয়োজন।"—গত কথা বলিতে কৃষ্ণের নিষ্ঠুরতার কথা আসিয়া পড়ে, সে কথায় তাই ক্ষমাশীলা বলিতেছেন,—"গত কথায় আর নাই প্রয়োজন।" তার পর আবার,—"বঁধু আমার মত তোমার অনেক রমণী, তোমার মতন আমার তুমি গুণমণি, যেমন দিনমণির অনেক কমলিনী, কমলিনীগণের ঐ একই দিন-মণি" "বঁধু আমার হৃদয়কমলে রাখিয়া শ্রীপদ, তিল আধ বস বস হে শ্রীপদ"—পাগলিনীর এই ভ্রমময় কৃষ্ণ-প্রীতিবিহ্বলতার চিত্রখানির সমগ্র পাঠক নিজে দেখিবেন। এই অবস্থায় ভ্রমেও কিছু সুখ আছে, উহা স্বপ্নে মিলনের ন্যায়, কিন্তু চৈতন্য হইলে এই সুখটুকু লুপ্ত হয়। রাধা এই ভাবে কাঁদিয়া কাঁদিয়া মেঘের অদর্শনে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সখীগণ এই মূর্ত্তিমতী পবিত্রতা—সাক্ষাৎ বিরহরূপিণী রাধিকার প্রেমাশ্রুমিশ্রিত প্রেমোক্তি শুনিয়া বিমূঢ়ভাবে দাঁড়াইয়াছিল; চৈতন্যপ্রভুর উন্মত্তাবস্থায় বিলাপ শুনিয়া এইভাবে গদাধর, মুরারি প্রভৃতি পার্শ্বচরগণ দাঁড়াইয়া থাকিতেন; এই ছবি এত সুন্দর ও

স্বর্গীয় বলিয়া বোধ হইত যে, তাঁহারা জগতের কথা বলিয়া তাঁহাকে নির্ম্মল বিস্মৃতির সুখ হইতে জাগাইতে সাহসী হইতেন না। রাধিকার—'নিশ্বাসে না বহে কমলের আস' এবং "গোবিন্দ বলিতে চাহে বারে বারে, মুখে নাহি সরে, শুধু গো গো করে, বিধুমুখ হেরি পরাণ বিদরে। আজ বুঝি রাধারে বাঁচান না যায়।" এই চিত্রের সঙ্গে আর একখানি চিত্র দেখুন—"প্রেমবশে মহাপ্রভু গরগর মন। নাম সঙ্কীর্ত্তন করি করে জাগরণ॥ * * * সর্ব্বরাত্রি করে ভাবে মুখ সংঘর্ষণ। গো গো শব্দ করে স্বরূপ শুনিলা তখন॥"—চৈ, চ, অন্ত ১৯ পৃঃ। উন্মাদিনী রাধিকার "ওগো মালতি জাতি কুন্দলতিকে, যূথি, কনকযূথিকে গো" প্রভৃতি গান চৈতন্য-চরিতামৃত-ধৃত ভাগবতের দশম স্কন্ধের নবম শ্লোকানুবাদ—"তুলসী, মালতি, যূথি, মাধবি মল্লিকে" প্রভৃতি অংশের সহিত মিলাইয়া পড়ুন। রাধিকার মেঘদর্শনে শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা—"কিবা সজল জলদ শ্যামল সুন্দর।"—গোবিন্দলীলামৃতের অষ্টম স্বর্গের চতুর্থ শ্লোকের কৃষ্ণরূপসূচক পদটির অবিকল অনুরূপ,—"কি হেরিব শ্যাম, রূপ নিরুপম" গানটিও জগন্নাথবল্লভ নাটকের একটি শ্লোকের অনুবাদ। এই সকল শ্লোক চৈতন্য বারংবার আবৃত্তি করিয়া পবিত্র করিয়া রাখিয়াছেন, এজন্য সেগুলি পড়িবার সময় তাঁহাকে মনে পড়ে স্বাভাবিক। রাধার সঙ্গে সখীগণ কাঁদিয়া অজ্ঞান হইল, তখন চন্দ্রাবলী আসিয়া সেই মুদ্রিত পদ্মসংকুল তড়াগের ন্যায় নীরব কুঞ্জবন দেখিয়া বলিতেছে—"মরি একি সর্ব্বনাশ আজ বিপিনে, এসব কনক পুতুলী, পড়িয়াছে ঢলি, বিপিনবিহারী শ্রীহরি বিনে। গজোৎপাতে যেন কমলকানন, মহাবাতে যেন হেম রম্ভা বন।" ইত্যাদি। রাধাকে চন্দ্রাবলী চিনিত, কারণ চন্দ্রা তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী,—ন্যায়পর শত্রু আজ রাধার প্রেম দেখিয়া বলিতেছে,—"মরি যে রাধার রূপ বাঞ্ছে শ্রীপার্ব্বতী, যার সৌভাগ্য গুণ বাঞ্ছে অরুন্ধতী" এ স্থলটি চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যম খণ্ডের অষ্টম পরিচ্ছেদের একটি অংশের পুনরাবৃত্তি।

মূর্চ্ছা ভঙ্গে রাধা ক্ষীণ বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে আধ-ভাঙ্গা স্বরে বিশাখাকে বলিতেছেন,—"কো কো কো কোথা গো, বি বি বি বিশাখে। দে দে দে দেখা, সে ব ব ব বঁধুকে॥ না না না না দেখে, বি বি বিধু মুখে। প প পরাণ যে যা যা যায় দুঃখে॥" চন্দ্রা মথুরা হইতে দাসখতের সর্ত্তানুসারে শ্রীকৃষ্ণকে বাঁধিয়া আনিবেন বলাতে, প্রেম-বিহ্বলা রাধিকা তাহাই বিশ্বাস করিয়া বলিতেছেন, "বেঁধ না তার কমল করে, ভর্ৎসনা ক'র না তারে, মনে যেন নাহি পায় দুঃখ। যখন তারে মন্দ কবে, চন্দ্রমুখ মলিন হবে, তাই ভেবে ফাটে মোর বুক॥" এইরূপ নির্ম্মল আত্ম-ত্যাগপূর্ণ প্রেমের কথা কৃষ্ণকমল গাহিয়া গিয়াছেন। অভিনিবেশ সহকারে বহু স্থান লক্ষ্য করিলে কৃষ্ণকমলকৃত পদাবলী পাঠকের চক্ষে এক নূতন শ্রীতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। উহা পড়িতে পড়িতে রাধিকা ছায়ার ন্যায় চক্ষু হইতে অপসৃত হইয়া পড়িবেন এবং তৎস্থলে এক উপবাসকৃশ দীন অথচ পরম সুন্দর, বিরহকাতর ব্রাহ্মণ বালকের মূর্ত্তি হৃদয়ে মুদ্রিত হইবে। এই পদাবলীবর্ণিত রাধা-চরিত্রে চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি পুস্তকে ব্যাখ্যাত গৌরলীলার সার সংগৃহীত। রাই-উন্মাদিনীতে তাঁহারই মধুর আখ্যান বৃন্দাবননিবাসিনীর নামে বর্ণিত; আমরা কৃষ্ণকমলের পদ অন্য ভাবে পড়ি নাই।

কৃষ্ণ কমল বাঙ্গলার কথিত ভাষার খণির মধ্যে যে ঐশ্বর্য্য আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা বিশেষ-রূপে প্রণিধান যোগ্য। বঙ্গভাষার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইহাঁর অন্তর্দৃষ্টি অতি প্রখর ছিল। ইনি সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন, তথাপি ইনি বাঙ্গলার প্রকৃতি (genius) যতটা বুঝিয়াছিলেন, অন্য কবির মধ্যে তাহার তুলনা বিরল।

কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিব, (১) "ভাল ভাল বঁধু ভাল তো আছিলে, ভাল সময় এসে ভালই দেখা দিলে।"—এই দুইটি ছত্রের মধ্যে প্রথম দুটি 'ভাল'র অর্থ "বেশ্ বেশ্" দ্বিতীয় 'ভাল'র অর্থ 'সুস্থ', তৃতীয় 'ভাল'র অর্থ "উপযুক্ত", চতুর্থ 'ভাল'র অর্থ 'উত্তম'।

(২) "হেথা থাক্‌তে যদি মন না থাকে, তবে যেও সেথাকে। যদি মনে মন-রত, না হয় মনের মত, কাঁদলে প্রেম আর কত বেড়ে থাকে। তাতে যদি মোদের জীবন না থাকে, না থাকে না থাকে কপালে যা থাকে তাই হবে। যথা যে না থাকে তারে আর সে থাকে, ধ'রে বেঁধে কবে রেখে থাকে।"

প্রথম "থাক্‌তে"=অবস্থান করিতে, দ্বিতীয় "থাকে"=রহে, লগ্ন হওয়া, তৃতীয় "সে-থাকে"=তথায়, চতুর্থ "থাকে"=হয়, (বেড়ে থাকে=বৃদ্ধি হয়), পঞ্চম 'থাকে'=অস্তিত্ব, থাকা, ষষ্ঠ "না থাকে না থাকে" 'থাকুক বা না থাকুক' "তৎপর 'সে-থাকে'="সেইস্থান" এবং সর্ব্বশেষ "রেখে থাকে",—এখানে "থাকে" শব্দটির বিশেষ কোন অর্থ নাই, শুধু 'রাখা' কথাটির উপর জোর দেওয়ার জন্য উহার প্রয়োগ। পাঠক দেখিবেন, প্রায় প্রত্যেকটি "থাকের" অর্থের একটুক একটুক সূক্ষ্ম বিভিন্নতা আছে। বাঙ্গলা খাটি শব্দগুলির মধ্যে যে কতরূপ অর্থ বৈচিত্র্য আছে—তাহা কৃষ্ণ কমলের মত কেহ এতটা চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখান নাই। অবশ্য বাঙ্গলা ভাষায় এই খণির আবিষ্কারক ভারতচন্দ্র। বাঙ্গলার একই শব্দের বিভিন্নার্থের দৃষ্টান্ত তিনিই বিশেষ ভাবে দেখাইয়াছেন, যথা বিদ্যাসুন্দর ;—"বেসাতি কড়ির লেখা বুঝরে বাছনি (বাছা), মাসী ভাল মন্দ কিবা করহ বাছনি (নির্ব্বাচন, বিচার). পাছে বল বুনপোর মাসী দেয় খোঁটা (কলঙ্ক) ষটি টাকা দিয়াছিলে সবগুলি খোঁটা (খুঁটো ওজনে কম) যে লাজ পেয়েছি হাটে কৈতে না জুয়ায় (যোগ্য হয়), এ টাকা উচিত দেয়া কেবল জুয়ায় (জুয়া খেলায়)। তবে হয় প্রত্যয় সাক্ষাতে যদি ভাজী (ভাঙ্গাই করি), ভাঙ্গাইনু। ভাঙ্গাইনু দুকাহণে ভাগ্যে বেনে ভাজী (ভাজ খোর)। সেরের কাহণ দরে কিনিনু সন্দেশ (মিষ্ট দ্রব্য), আনিয়াছি আধ সের পাইতে সন্দেশ (পুরস্কার, বার্ত্তা)। আট পণে আধ সের আনিয়াছি চিনি (মিষ্ট দ্রব্য বিশেষ) অন্য লোকে ভুরা দেয় ভাগ্যে আমি চিনি (গুণ জানি)। দুর্লভ চন্দন চুয়া লঙ্গ জায়ফল (একরূপ মস্‌লা জাতীয় ফল), সুলভ দেখিনু হাটে নাহি যার ফল (যার কোন প্রয়োজন বা উপকার নাই)। কত কষ্টে ঘৃত পাইনু সারা হাট ফিরে (ঘুরিয়া), যেটি কয় সেটি লয় নাহি লয় ফিরে (ফিরিয়া দিতে চাহিলে লয় না) দুই পণে এক পণ কিনিয়াছি পান (পর্ণ), আমি যেঁই তেঁই পেনু অন্যে নাহি পান (প্রাপ্ত হন)। দুঃখেতে আনিনু দুগ্ধ গিয়া নদী পারে (তটদেশ), আমা বিনা কার সাধ্য আনিবারে পারে (আনিতে সমর্থ)। শূন্য হইয়াছি বাছা চুন চেয়ে চেয়ে (সন্ধান করিয়া) শেষে না কুলায় কড়ি আনিলাম চেয়ে (চাহিয়া, বিনামূল্যে) যথার্থ দেখিয়া কথা না সরে উত্তর (জবাব)। যে বুঝি বাড়িবে দর উত্তর উত্তর (ক্রমে ক্রমে।") সুতরাং খাটি বাঙ্গলা শব্দের এই বিচিত্র অর্থ-

গৌরব ভারতচন্দ্রই বিশেষ ভাবে দেখাইয়া দেন। খাটি দেশী শব্দের এই বিভিন্ন অর্থ-বৈভবের সন্ধান পাইয়া অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী কবিরা মাতিয়া যান। নূতন কোন সম্পদ পাইলে তাহাতে একটু বাড়াবাড়ি অস্বাভাবিক নহে। যাত্রা ও কবির নেতাগণ—এই ক্ষেত্রে অনেকটা বাড়াবাড়ি করিয়া গিয়াছেন। দাশরথী রায়, গোবিন্দ অধিকারী প্রভৃতি কবিদের রচনায় যমক অলঙ্কারের এই ভাবের বাহুল্য দৃষ্ট হয়। কিন্তু কৃষ্ণকমলের খাটি বাঙ্গলা ভাষার সম্পদের প্রতি অন্তর্দৃষ্টি অনেক বেশী ছিল এবং তিনি এ সম্বন্ধে খুব মিতব্যয়িতায় পরিচয় দিয়াছেন,—কোন কোন স্থলে যে একটু বাড়াবাড়ি না হইয়াছে—তাহা নহে; তিনি শুধু নাম শব্দ গুলির দ্বারা যমক অলঙ্কারের সৃষ্টি করেন নাই, তাঁহার পদে বিভক্তি ও শব্দাংশ দ্বারা শত শত স্থানে যমক অলঙ্কারের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সৃষ্টিতে বাঙ্গলাভাষার মজ্জাগত শক্তি বিশেষ রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। অনেক স্থলে উচ্চারণ একই—অথচ শব্দগুলি ভিন্ন, যথা—"যদি না পাই কিশোরীরে, কাজ কি শরীরে"—পদে 'কিশোরীরে' ও "কি শরীরে" উচ্চারণ একই—উভয়ে ভিন্নার্থ বাচক। "শয়ন করিয়া সে কুসুম শেযে, হৃদয়ের মাঝে রেখে মোরে সে যে,কত না কৌতুকে সারা নিশি জেগে পোহাত।" এখানে প্রথম "শে যে"="শয্যায়" দ্বিতীয় অর্দ্ধ ছত্রের "সে" ও "যে" দুই পৃথক শব্দ। "বল সে রবে, ঘরে কে রবে" প্রথম রবে=স্বরে, দ্বিতীয় রবে=রহিবে। আর এক দুঃখ শুনকৈ তবে। অকৈতব ভাবে ঘটালে কৈতবে।" প্রথম কৈ তবে,=কহি তবে, দ্বিতীয় কৈতবে=কাপট্য। "চল্ গো যে যাবে, বিধু মুখে বাঁশী কতই বাজাবে" এখানে যাবে ও "বাজাবে"র 'জাবে' দুই ভিন্নার্থ বাচক। এইভাবে "অতুল রাতুল কিবা চরণ দুখানি। আলতা পরাত বঁধু কত না বাখানি" পদে দুইটি 'খানি' শব্দের প্রয়োগের প্রতি লক্ষ্য করুন। "যে ধনী আছিল শ্যামের হিয়ার হার, হরি-হারা হয়ে এখন কি দশা তাহার" প্রভৃতি শত শত পদে বাঙ্গালী খাটি প্রত্যয়ান্ত শব্দের সহযোগে বিভিন্ন অর্থের সৃষ্টি কৃষ্ণকমলের গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

কৃষ্ণকমল অগাধ সংস্কৃতশাস্ত্রের পাণ্ডিত্য লইয়া খাটি বাঙ্গলাভাষার মূলগত প্রকৃতির যে পরিচয় পাইয়া ছিলেন, তাহা আশ্চর্য্য। ভাবরাজ্যের খুটি নাটি বিভক্তি ও প্রত্যয়ান্ত শব্দের প্রতি তাঁহার অদ্ভুত অন্তর্দৃষ্টি ছিল। কবিওয়ালা ও যাত্রাওয়ালাদের মধ্যে তিনি এ সম্বন্ধে অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। দুঃখের বিষয় বাঙ্গলায় যাঁহারা অভিধান লিখেন, সংস্কৃত-অভিধানের নিগড়ে তাঁহাদের হাত পা একরূপ বাঁধা থাকে। তাহাঁরা কথিত বাঙ্গলার স্বরূপ আবিষ্কার করা তো দূরের কথা—তাহার যে অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য আছে, তৎসম্বন্ধে তাঁহাদের অভিধানে কোন সন্ধানই পাওয়া যায় না। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় স্বয়ং—বাঙ্গলা যমক অলঙ্কারের এই প্রাচুর্য্য যে তদীয় অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্যের ইঙ্গিত করে—তৎসম্বন্ধে প্রশংসা সূচক একটি কথা বলা দূরে থাকুক,—কবিওয়ালা ও যাত্রাওয়ালারা বৃথা যমক অলঙ্কারের খচ্ মচ্ সৃষ্টি করিয়া সাহিত্যের উপর দৌরাত্ম্য করিয়াছেন—

এরূপ অভিমত প্রচার করিয়াছেন। যমক অলঙ্কারের এই অপূর্ব্ব স্বরূপ প্রদর্শন ছাড়া কৃষ্ণকমল ও রামবসু প্রভৃতি লেখকেরা ভাবরাজ্যে যে রাজটীকা কপালে পরিয়া জনসাধারণের নিকট অজস্র প্রশংসার রাজস্ব লইয়া গিয়াছেন—তাহাও তিনি উপেক্ষা করিয়াছেন, এই যুগের সাহিত্যের ইহা অপেক্ষা আর কি দুর্দ্দৈব হইতে পারে?

উপসংহারকালে আমরা আর দুইখানি পুস্তকের নাম উল্লেখ করিব। ব্রহ্মভাষার রচিত সুপ্রসিদ্ধ 'থাড়ুথাঙ্' পুস্তকে বুদ্ধের জন্মাবধি নির্ব্বাণতত্ত্ব প্রচার পর্য্যন্ত সমস্ত কাহিনী বিবৃত আছে। নীলকমল দাস নামক জনৈক বঙ্গীয় কবি 'বৌদ্ধরঞ্জিকা' নামে এই পুস্তকের একখানি পদ্যানুবাদ প্রণয়ন করেন। চট্টগ্রাম পার্ব্বত্যপ্রদেশের রাজা ধর্ম্মবক্সের প্রধানা মহিষী রাণী কালিন্দীর আদেশে এই পুস্তক বিরচিত হয়। রচনার সময় জানা যায় নাই; কিন্তু এ গ্রন্থের যে পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাহা ১০০ বৎসরেরও অধিক প্রাচীন। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে এই গ্রন্থ ভিন্ন বুদ্ধদেবের জীবন-কাহিনী আর কোথাও দৃষ্ট হয় না।

বৌদ্ধরঞ্জিকা।

চৈত্র মাসে গাজনের উপলক্ষে এখনও হিন্দু-রমণীগণ নীলা বা লীলাবতী নাম্নী কোন মহিলার উদ্দেশে উপবাস করিয়া থাকেন। বঙ্গীয় পঞ্জিকা-সমূহে এই উপবাসের সময় নির্দ্দিষ্ট আছে। 'নীলার বারমাস' নামক যে ক্ষুদ্র পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, নীলা-নাম্নী কোন মহিলার স্বামী গৃহধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তখন নীলার বয়স দ্বাদশ বর্ষ মাত্র। এই বয়সে যে উৎকট কৃচ্ছ্রসাধন পূর্ব্বক নীলা বনে বনে স্বামীকে খুঁজিয়া বেড়াইয়াছিল, এবং বহুদিনের পর স্বামীকে পাইয়া যে সকাতর মিনতি করিয়াছিল, তাহা গ্রাম্য-কবির অমার্জ্জিত ভাষায় বর্ণিত হইলেও অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠ কবির আবেগ সেই বর্ণনায় সূচিত হইয়াছে। নীলা মাথার কেশ এলাইয়া স্বামীর কণ্টকক্ষত ধূলিপূর্ণ পদযুগল মুছাইয়া দিয়াছিল। চৈত্রমাসের গাজন-উপলক্ষে এই নীলার বারমাসী অনেক স্থলে গীত হইয়া থাকে। আমাদের বিশ্বাস, বঙ্গীয় পঞ্জিকায় যে নীলার উদ্দেশে উপবাস নির্দ্দিষ্ট আছে, এই নীলাই সেই পতিব্রতা রমণী। তাহার স্বামীর পরিচয় উপলক্ষে কবি লিখিয়াছেন, সুলুক নামক প্রদেশস্থ নন্দপাটন পল্লীতে তাহার বাড়ী ছিল, এবং তাহার পিতার নাম গঙ্গাধর এবং মাতার নাম কলাবতী। কিন্তু এই বৃত্তান্ত আমরা ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না।

নীলার বারমাস।

নবম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট।

কবিওয়ালাগণের মধ্যে আমরা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের (১৮১১ খৃঃ—১৮৫৮ খৃঃ) নাম উল্লেখ করি নাই। তাঁহার লেখা সম্পূর্ণরূপে ইংরেজীর প্রভাব বর্জ্জিত নহে—এজন্য আধুনিক সাহিত্যের

ইতিহাসই তাঁহার গ্রন্থাদি আলোচনার উচিত স্থল হইবে। বিম্‌স সাহেব ঈশ্বরচন্দ্রকে "হিন্দুস্থানী রেবিলেস" আখ্যা প্রদান করিয়াছেন; * ইনি অনেকগুলি সখীসংবাদ গান রচনা করিয়াছেন, কিন্তু বোধ হয় সখীসংবাদ গান অপেক্ষা ব্যঙ্গ কবিতা রচনাতে কবি সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার ব্যঙ্গগুলি কোন শ্রেণীবিশেষ কি ব্যক্তিবিশেষে সীমাবদ্ধ ছিল না,—পৃথিবীর যাবতীয় দ্রব্যের উপর সেই ব্যঙ্গের তীব্ররশ্মি নিপতিত হইয়াছে,—লক্ষ্মী-ঠাকুরাণীকে লইয়া ব্যঙ্গ * আইনের সূত্র লইয়া ব্যঙ্গ, † ইংরেজের বিবি লইয়া ব্যঙ্গ, ‡ গোস্বামিগণ লইয়া ব্যঙ্গ। § তাঁহার এই প্রখর ব্যঙ্গরাশি ও সখীসম্বাদগীতি কালে সাহিত্যের অধঃস্তরে পড়িয়া বিস্মৃত হইবে—কিন্তু তাঁহার অধ্যবসায়ের চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি প্রাচীন কবিগণের জীবন-সংগ্রহ বিলুপ্ত হইবার নহে। আমরা বর্ত্তমান সাহিত্যের ইতিহাস রচনাকালে ঈশ্বরচন্দ্রের বিষয় পুনরায় আলোচনা করিব।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

এই যুগের বঙ্গসাহিত্যে নানারূপ সংস্কৃত ছন্দ অনুকৃত হইয়াছিল। কৃত্তিবাস, বিজয়গুপ্ত প্রভৃতি লেখকগণের সময় হইতে সংস্কৃত ছন্দ বাঙ্গালাতে প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা দেখা যায়। এই অধ্যায়ের সাহিত্যে সেই চেষ্টার পূর্ণ পরিণতি দৃষ্ট হয়। আমরা নিম্নে সংক্ষেপে বিবিধ ছন্দের কিছু কিছু নমুনা দেখাইতেছি;—

ছন্দ

বৃত্তগন্ধী।

"কৌটার কি আছে দেখ খুলিয়া। থাকিয়া কি ফল যাই চলিয়া॥ বিদ্যা খোলে কৌটা কল ছুটিল। শর হেন ফুলশর ফুটিল॥—বি, সু (ভারতচন্দ্র)।

ত্রিপদী, লঘু ত্রিপদী।

"থাক, থাক, থাক, কাটাইব নাক, আগেতে রাজারে কহি। মাথা মুড়াইব, শালে চড়াইব, ভারত কহিছে সহি॥"—ঐ

---

* "Ishwor Chandra Gupta, a sort of Indian Rebelais."—Beames' Compartive Grammar Vol. I, p. 86.

* "লক্ষ্মীছাড়া যদি হও, খেয়ে আর দিয়ে। কিছুমাত্র সুখ নাই হেন লক্ষ্মী নিয়ে॥ যতক্ষণ থাকে ধন তোমার আগারে। নিজে খাও খেতে দাও সাধ্য অনুসারে॥ ইথে যদি কমলার মন নাহি সরে। প্যাঁচা লয়ে যাউন মাতা কৃপণের ঘরে॥"

† বিধবা বিবাহের আইন সম্বন্ধে—"সকলেই এইরূপ বলাবলি করে। ছুঁড়ির কল্যাণে যেন বুড়ি নাহি তরে॥ শরীর পড়েছে ঝুলি চুলগুলি পাকা। কে ধরাবে মাছ তারে কে পরাবে শাঁখা॥"

‡ "বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী মুখে গন্ধ ছুটে।"

§ "অনেক কথাই ভাল গোঁসায়ের চেয়ে।"

ভঙ্গত্রিপদী।

"ওরে বাছা ধুমকেতু, মা বাপের পুণ্য হেতু, কেটে ফেল চোরে, ছেড়ে দেহ মোরে, ধর্ম্মের বাঁধহ সেতু।"—ভা, বি, সু।

দীর্ঘ ত্রিপদী।

"কালীয়দহের জলে, কুমারী কমল দলে, গজ গিলে উগারে অঙ্গনা।"—ক, ক, চ।

দীর্ঘ চৌপদী।

"এক কাণে শোভে ফণিমণ্ডল, এক কাণে শোভে মণি-কুণ্ডল, আধঅঙ্গে শোভে বিভূতি ধবল, আধই গন্ধ কস্তুরীরে।"—অ, ম।

লঘু চৌপদী।

"আহা মরে যাই লইয়া বালাই, কুলে দিয়া ছাই, ভজি উহারে। যোগিনী হইয়া উহারে লইয়া, যাই পলাইয়া সাগর-পারে॥"—ভা, বি, সু।

মাল ঝাঁপ।

"কি রূপসী, অঙ্গে বসি, অঙ্গ খসি প'ড়ে। প্রাণ দহে, কত সহে, নাহি রহে ধড়ে॥—কবিরঞ্জন, বি, সু।

একাবলী—একাদশাক্ষরাবৃত্তি।

"বড়র পীরিতি বালির বাঁধ। ক্ষণে হাতে দড়ি, ক্ষণেকে চাঁদ॥"—ভা, বি, সু।

একাবলী—দ্বাদশ অক্ষরাবৃত্তি।

"নয়ন যুগলে সলিল গলিত। কনক মুকুরে মুকুতা খচিত॥"—কবিরঞ্জন, বি, সু।

তূণকছন্দ।

"রাজ্যখণ্ড, লণ্ডভণ্ড, বিস্ফুলিঙ্গ ছুটিছে। হুলস্থুল, কুল কুল ব্রহ্মডিম্ব ফুটিছে॥"—অ, ম।

দিগক্ষরাবৃত্তি।

"মৃদুমন্দ দক্ষিণ পবন, সুশীতল সুগন্ধি চন্দন, পুষ্পরস রত্ন আভরণ, আজু কেন হৈল হুতাশন।"—আলাওল।

তরল পয়ার।

"বিনা সূত, কি অদ্ভুত, গাঁথে পুষ্পহার। কিবা শোভা, মনোলোভা, অতি চমৎকার॥"—কবিরঞ্জন, বি, সু।

হীনপদ ত্রিপদী।

"হর মম দুঃখ হর। হর রোগ, হর তাপ, হর শোক, হর পাপ, হিমকর শেখর শঙ্কর॥"—অ, ম।

মাত্রা ত্রিপদী।

"ঝন ঝন কঙ্কণ, নূপুর রণ রণ, ঘুনু ঘুনু ঘুঙ্গুরে বোলে॥"—ভা, বি, সু।

মাত্রা চতুষ্পদী।

"হে শিব মোহিনী, শুম্ভ-নিসূদিনি, দৈত্য-বিঘাতিনি, দুঃখ-হরে॥"

তোটক।

"রমণী-মণি নাগর-রাজ কবি। রতি-নাথ বিনিন্দিত চারু ছবি॥"—কবিরঞ্জন, বি, সু।

ভুজঙ্গপ্রয়াত।

"অদূরে মহারুদ্র ডাকে গভীরে। অরে রে অরে দক্ষ দে রে সতীরে॥"—অ, ম।

পূর্ব্বোদ্ধৃত পদগুলিতে আমরা নানারূপ ছন্দের কিছু কিছু নমুনা দিলাম। সংস্কৃত ছন্দ বাঙ্গালাতে অনেক স্থলে সুন্দররূপে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এবং পদবিন্যাস সংস্কৃতের ন্যায়ই সুনিপুণ ও শ্রুতিমধুর হইয়াছে। কিন্তু প্রাচীন বিধান সর্ব্বত্রই নূতনকালের উপযোগী নহে, ঠিক সংস্কৃতের নিয়মানুসারে গুরু ও লঘু উচ্চারণে আবদ্ধ রাখিয়া বাঙ্গলা পদবিন্যাস করিতে গেলে শব্দগুলি সর্ব্বত্র সুললিত হয় না। ভারতচন্দ্রের রচনায় ছন্দোভঙ্গের দৃষ্টান্ত অল্প, কিন্তু একেবারে না আছে এমন নহে,—যথা তোটক ছন্দে,—"শুনি সুন্দর সুন্দরীরে কহিছে।" এখানে "রী" গুরু হওয়া উচিত হয় নাই। ভারতচন্দ্র ভিন্ন অন্যান্য কবির রচনায় ছন্দোভঙ্গের দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যাইবে, যথা রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরে,—তোটক ছন্দে—"ধনি মুখ চিবুক ধরে যতনে।" পদে "মু" ও "বু" লঘু হইয়াছে, এই দুই স্থলে উচ্চারণ গুরু হওয়া আবশ্যক; হরিলীলায় ভুজঙ্গপ্রযাত ছন্দে—"বসিলা সুবর্ণেরপীঠে হাসিছে। প্রবালাধরে মন্দ মন্দ ভাসিছে॥" "হাসিছে" ও "ভাসিছে" শব্দদ্বয়ের "সি"র গুরু উচ্চারণ রাখা উচিত। আর অধিক উদাহরণ দেওয়ার স্থান নাই। সংস্কৃতের ছন্দানুকরণ এখনও শেষ হয় নাই, আধুনিক সময়ে মাইকেলের সমসাময়িক কবি বলদেবপালিত 'ভর্ত্তৃহরি' কাব্যে এই চেষ্টার পূর্ণ বিকাশ দৃষ্ট হয়; আমরা কিঞ্চিৎ নমুনা এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি। মালিনী ছন্দ—"ফুল সম সুকুমারী, দীর্ঘকেশী কৃশাঙ্গী। অচপল তড়িতাভা সুন্দরী গৌরকান্তি॥ মধুর নববয়স্কা পদ্মিনী অগ্রগণ্যা। যুবক নয়নলোভা কামিনী কামশোভা॥" বংশস্থবিল,—"তথায় ভীমাসিত বর্ম্ম-ভূষিত। প্রচণ্ড আভাময় চক্র মস্তকে॥ সবিদ্যুতাগ্নি প্রলয়োমুখাভ্রবৎ। কৃপাণ-পাণি প্রহরী ব্রজ ভূমে॥" এই ছন্দের অনুকৃতি নির্ভুল হয় নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। এখন সংস্কৃতের পন্থা হইতে তির্য্যক্ গমন করিয়া নব নব ভাবুকগণ নূতন ছন্দে কবিতা লিখিতেছেন, তাহা এস্থলে আলোচ্য নহে।

পদ্যের নিয়ম।

পদ্যসম্বন্ধে আর একটি বিষয় এখানে উল্লেখযোগ্য। শুধু শেষ অক্ষরের মিল পড়িলেই পদ্য শ্রুতিমধুর হয় না; শেষ বর্ণের আদ্য বর্ণের স্বরে মিল থাকিলে দুইটি চরণে প্রকৃত মিল পড়িল বলা যায়। ভারতচন্দ্র ছাড়া প্রাচীন কালের কোন কবিই এ বিষয়টিতে মনোযোগ প্রদান করেন নাই;—স্থানে স্থানে শুধু শেষ বর্ণের মিল থাকিলেও, দুইটি চরণ নিতান্ত বিসদৃশ হইয়া পড়ে, যথা:—"দিবানিশি, থাকে বসি, ডানায় ঢাকিয়া। ইহাকেই বলে লোকে ডিমে 'তা দেওয়া॥" এখানে "ঢাকিয়া" এবং "দেওয়া" নিতান্তই শ্রুতিকটু শুনায়। কবিকঙ্কণ,

কাশীদাস প্রভৃতি সকল কবিই এ নিয়মটি উপেক্ষা করিয়াছেন। শুধু ভারতচন্দ্র এ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক ছিলেন, তাঁহার অতি অল্প বয়সের লিখিত 'সত্যপীরের' কথায় এ নিয়মের স্থানে স্থানে ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়,—উক্ত কবিতাটিতে 'বসি'—'আসি', 'গুণে'—'ত্রিভুবনে' 'স্তুতি'—'অব্যাহতি', 'উহরিল',—'পেল', 'কথা'—'গাঁথা' প্রভৃতি শব্দগুলির দ্বারা মিল দেওয়া হইয়াছে,—'সত্যপীরের কথা' ভারতচন্দ্রের পঞ্চদশ বৎসর বয়সের রচনা। এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি ছাড়িয়া দিলে, তৎপ্রণীত অন্য কোন কাব্যেই আমাদের নির্দ্দিষ্ট নিয়মের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় না,—ভারতচন্দ্রের কবিতায় অবলম্বিত এই অতীব প্রশংসনীয় গুণ প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে অনন্যসাধারণ। আর একটি কথা, প্রাচীন এবং আধুনিক কবিতায় "ন" এর সঙ্গে "ম", "ক" এর সঙ্গে "খ", "চ" এর সঙ্গে "ছ", "জ" এর সঙ্গে "ঝ" দ্বারা অবিরত মিল পড়িতে দেখা যায়। ইহা যথাসম্ভব পরিহার করিতে পারিলে যে কবিতা শ্রুতিমধুর হয়, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই। এই সকল নিয়ম দ্বারা কবিতাসুন্দরীর গতি ক্রমাগত সীমাবদ্ধ করিলে অবশেষে তাঁহার পঙ্গু হইয়া পড়িবার আশঙ্কা যাঁহারা মনে পোষণ করেন, তাঁহাদিগের নিকট নিবেদন,—স্বাভাবিকশক্তিসম্পন্ন কবিগণের শ্রুতিই তাঁহাদিগের কবিতাকে উৎকৃষ্ট নিয়মানুযায়ী রচনার দিকে প্রবর্ত্তিত করিবে, তাঁহারা এ সকল নিয়ম মনে করিয়া লিখিতে আরম্ভ করেন না,—নিয়মগুলি কাব্যকলার স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তিতে, তাঁহাদিগকে আপনা আপনিই অনুসরণ করিবে; অবশ্য কষ্টকবিগণ এই সকল নিয়ম দ্বারা বিড়ম্বিত হইতে পারেন, তাঁহারা গদ্য দ্বারা স্বীয় মনোগত ভাব প্রকাশের চেষ্টা করুন, কিংবা এরূপ কোমল ব্যবসায়ের অনুশীলন ছাড়িয়া দিয়া কার্য্যান্তরে লিপ্ত হউন, ইহাই আমাদের অনুরোধ।

আমাদের নির্দ্দিষ্ট শেষোক্ত নিয়মটি সম্বন্ধেও ভারতচন্দ্র সতর্ক। এ বিষয়ে তিনি প্রাচীন এবং আধুনিক কালের কবিগণের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ প্রশংসা পাইবার যোগ্য। এ স্থলে বলা উচিত প্রাচীন হিন্দীকাব্য সমূহে এই দুইটি নিয়মই সর্ব্বদা অনুসৃত হইতে দেখা যায়। ভারতচন্দ্র হিন্দীকাব্যগুলির আদর্শে হয়ত এই নিয়ম গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। ভারতচন্দ্রের পূর্ব্বে কবি গোবিন্দদাসও কবিতার নিয়ম সম্বন্ধে অনেকটা সতর্কতা দেখাইয়াছেন; তাঁহার কাব্য-সৌন্দর্য্যের অনুভূতি অতি প্রখর ছিল এবং শ্রুতি-শক্তি অতি সূক্ষ্ম ছিল—তথাপি পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদিগের সম্বন্ধে এ কথাটি সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে তাঁহাদের কবিতা গীত হইত। কবিতা ও সংগীতের নিয়ম স্বতন্ত্র। যাহা চোখে বাধ বাধ ঠেকে, অনেক সময় সুরে তাহা বাজে না।

গদ্য সাহিত্য।

এই পুস্তকে আমরা পদ্য সাহিত্যেরই আলোচনা করিলাম। গদ্য-রচনার নমুনা একেবারে না আছে, এমন নহে, কিন্তু তাহা একরূপ নগণ্য। কিন্তু আধুনিক বঙ্গ-ভাষায় আমরা গদ্য-সাহিত্যের বিকাশ দেখাইবার পূর্ব্বে যাহা কিছু প্রাচীন গদ্য রচনা পাওয়া

গিয়াছে, তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করা উচিত মনে করি,—সেই ক্ষুদ্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত গদ্য রচনাগুলি নব্য সাহিত্যের ভিত্তি বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

আমরা পদকল্পতরুতে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের 'গদ্য পদ্যময়' রচনার উল্লেখ পাইয়াছি, স্বর্গীয় পণ্ডিত হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয়ের মতে—এই 'গদ্যরচনা' পদ্যেরই এক প্রকার রূপভেদ। এই মত নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে গ্রহণ করা উচিত কি না বলিতে পারি না।

শূন্য পুরাণ।

প্রাচীন গদ্যের প্রথম নমুনা আমরা বৌদ্ধাধিকারের বঙ্গীয় অন্যতর প্রাচীনতম রচনা শূন্য পুরাণে প্রথম পাই। তন্নিদর্শন যথা—

"পশ্চিম দুয়ারে কে পণ্ডিত। সেত্তাই হে চারিসএ গতি আনি লেখ্যা। চন্দ্রকটাল জে জে বহুয়া ঘটদাসী দুত নাহি ডরায় তুমারে দেখিআ। চিত্রগুপ্ত পাঞ্জি পরিমাণ করে।"

ইহা ছাড়াও অনেকস্থলে শূন্য পুরাণের যে গদ্যাংশ পাওয়া যাইতেছে, তাহা দুর্ব্বোধ প্রহেলিকার ন্যায়। শূন্য পুরাণের পরে চণ্ডীদাসের গদ্যরচনার কিছু নমুনা পাওয়া গিয়াছে।

চৈত্যরূপ প্রাপ্তি।

'চৈত্যরূপ প্রাপ্তি' নামক চণ্ডীদাসকৃত একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা পাওয়া গিয়াছে, তাহা তান্ত্রিক উপাসনার কতকগুলি সাঙ্কেতিক চিহ্ন স্বরূপ। যথা—

"চৈত্যরূপের রা চ অধরূপ নাড়ি। রা অক্ষরে রাগ নাড়ি। চ অক্ষরে চেতনা নাড়ি। রএতে চ মিশিল। রাএতে বসিল। ইহা এক অঙ্গ নাড়ি ॥"

রূপগোস্বামীর 'কারিকা'।

চৈতন্য প্রভুর প্রিয় পার্শ্বচর রূপগোস্বামি-বিরচিত 'কারিকা' নামক ক্ষুদ্র গদ্যপুস্তক পাওয়া গিয়াছে। * প্রায় ৪০০ বৎসর পূর্ব্বের বাঙ্গালা গদ্য বেশ প্রাঞ্জল ও গুরুতর বিষয় রচনার সর্ব্বতোভাবে উপযোগী ছিল বলিয়া বোধ হয়। দুইটি স্থল তুলিয়া দেখাইতেছি—প্রারম্ভ-বাক্য,—"শ্রীরাধাবিনোদ জয়। অথ বস্তু নির্ণয়। প্রথম শ্রীকৃষ্ণের গুণ নির্ণয়। শব্দগুণ গন্ধগুণ রূপগুণ রসগুণ স্পর্শগুণ এই পাঁচ গুণ। এই পঞ্চ গুণ শ্রীমতী রাধিকাতেও বসে। শব্দগুণ কর্ণে গন্ধগুণ নাসাতে রূপগুণ নেত্রে রসগুণ অধরে ও স্পর্শগুণ অঙ্গে। এই পঞ্চগুণে পূর্ব্বরাগের উদয়। পূর্ব্বরাগের মূল দুই; হঠাৎ শ্রবণ ও অকস্মাৎ শ্রবণ।" ইত্যাদি। শেষ অংশ—"আগে তারে সেবা। তার ইঙ্গিতে তৎপর হইয়া কার্য্য করিবে আপনাকে সাধক অভিমান ত্যাগ করিবে। ইতি।"

কৃষ্ণদাসের 'রাগময়ীকণা'।

আমরা কৃষ্ণদাস কবিরাজ-বিরচিত "রাগময়ীকণা" নামক পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা পদ্যগ্রন্থ, কিন্তু যে স্থলে কোন সূত্রের ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়োজন হইয়াছে, সেই সব স্থল গদ্যে লিখিত। একটী অংশ এইরূপ—"রূপ তিন তিন। কি কি রূপ—

* বর্দ্ধমান রায়না নিবাসী শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র ঘোষ এই পুস্তকের কথা প্রথম প্রকাশ করেন। বান্ধব, ১২৮৯ সন অষ্টম সংখ্যা ৩৯৭ পৃঃ।

শ্যাম ১ শ্বেত ২ গৌর ৩ ধ্যান কৃষ্ণবর্ণ॥ কৃষ্ণ জীউর পঞ্চ নাম। গুণ তিন মত হয় কি কি গুণ। ব্রজলীলা ১ দ্বারকালীলা ২। গৌরলীলা ৩। দশা তিন কি কি দশা।" ইত্যাদি।

"দেহকড়চ" পুস্তিকা খানি ১৩০৪ সালের ১ম সংখ্যা পরিষৎ-পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছে,—ইহার রচনাও অতি সংক্ষিপ্ত, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে ভাবপ্রকাশক; যথা,—

দেহ কড়চা।

'তুমি কে॥ আমি জীব। আমি তটস্থ জীব। থাকেন কোথা। ভাণ্ডে। ভাণ্ড কিরূপে হইল। তত্ত্ব বস্তু হইতে। তত্ত্ব বস্তু কি কি। পঞ্চ আত্মা। একাদশেন্দ্র। ছয় রিপু ইচ্ছা এই সকল মেক যোগে ভাণ্ড হইল। পঞ্চ আত্মা কে কে। পৃথিবী। আপ। তেজঃ। বাউ। আকাশ। একাদশিন্দ্র কে কে। কর্ম্ম-ইন্দ্র পাঁচ। জ্ঞানীন্দ্র পাঁচ। আবরণ এক॥

১১৮১ বাং সনের হস্তলিখিত ভাষাপরিচ্ছেদ নামক গদ্যপুস্তকের আরম্ভ ও মধ্যভাগ হইতে কতকাংশ উদ্ধৃত করিতেছি। এই পুস্তকখানি সংস্কৃত 'ভাষাপরিচ্ছেদ' নামক গ্রন্থের অনুবাদ।

'ভাষাপরিচ্ছেদ'।

আরম্ভ—"গোতম মুনিকে শিষ্য সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাদিগের মুক্তি কি প্রকারে হয়। তাহা কৃপা করিয়া বলহ। তাহাতে গোতম উত্তর করিতেছেন। তাবৎ পদার্থ জানিলে মুক্তি হয়। তাহাতে শিষ্যেরা সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন, পদার্থ কতো। তাহাতে গোতম কহিতেছেন। পদার্থ সপ্তপ্রকার। দ্রব্য গুণ কর্ম্ম সামান্য বিশেষ সমবায় অভাব। তাহার মধ্যে দ্রব্য নয় প্রকার।"

মধ্যে—"মীমাংসা মতে কর্ত্তাত্মক শব্দ নিজে ধ্বন্যাত্মক শব্দ জন্য বর্ণাত্মক শব্দকে ঈশ্বর কহেন। মীমাংসকেরা পরমাত্মা মানেন না। অতঃপর কর্ম্মের পরিচয় কহিতেছি। * * * ব্যাপারবৎ কারণের নাম করণ। কারণজন্য হইয়া কার্য্যজনক যে হয় তাহার নাম ব্যাপার। * * অনুমিতির অপর কারণ পক্ষতা আছে। ইহাতে প্রাচীন পণ্ডিতেরা কহেন পর্ব্বতে বহ্নি সন্দেহের নাম পক্ষতা। একথা ভালো নহে কারণ যে হয় সে অবশ্য কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্ব ক্ষণেতে থাকে। প্রথম ক্ষণে সাধ্য সংশয় পরে ব্যাপ্তির স্মৃতি পরে পরামর্শ। তবে পরামর্শ কালে সংশয় নষ্ট হইলে অনুমিতির পূর্ব্বক্ষণ পরামর্শ ক্ষণ সে ক্ষণে সংশয় থাকিল না। জ্ঞান ইচ্ছাদ্বেষকৃত সুখ দুঃখ। ইহারা দ্বিক্ষণ স্থায়ী পদার্থ ত্রিক্ষণে নষ্ট হয় জানিবে।"

অল্পদিন হইল 'বৃন্দাবনলীলা' নামক একখানি ১৫০ বৎসরের প্রাচীন গদ্যপুঁথি (খণ্ডিত) আমার হস্তগত হইয়াছে, আমি নিম্নে এই পুস্তকখানি হইতে কতকাংশ উদ্ধৃত করিতেছি:—"তাহার উত্তরে এক পোয়া পথ চারণ পাহাড়ি পর্ব্বতের উপরে কৃষ্ণচন্দ্রের চরণচিহ্ন ধেনুবৎসের এবং উটের এবং ছেলির এবং মহিশের এবং আর আর অনেকের পদচিহ্ন আছেন, যে দিবস ধেনু লইয়া সেই পর্ব্বতে গিয়াছিলেন সে দিবস মুরলির গানে যমুনা উজান বহিয়াছিলেন এবং পাষাণ গলিয়াছিলেন সেই দিবস এই সকল পদচিহ্ন হইয়াছিলেন। গয়াতে গোবর্দ্ধনে এবং কাম্যবনে এবং চরণ পাহাড়েতে এই চারি স্থানে চিহ্ন এক সমতুল ইহাতে কিছু তরতম (তারতম্য?) নাঞী। চরণ পাহাড়ির উত্তরে বড় বেস শাহি তাহার উত্তরে ছোট বেস শাহি তাহাতে এক লক্ষ্মীনারায়ণের এক সেবা আছেন, তাহার পূর্ব্ব দক্ষিণে সেরগড়। * * * গোপী-নাথজীর যেরার দক্ষিণ পশ্চিম নিধুবন চতুর্দ্দিকে পাকা প্রাচীর পূর্ব্বপশ্চিমা বন পশ্চিমদিগের দরওয়াজা কুঞ্জের ভিতর

'বৃন্দাবনলীলা।'

জাইতে বামদিগে এক অট্টালিকা অতি গোপনিয় স্থান অতি কোমল নানান পুষ্প বিকশিত কোকীলাদি নানান পক্ষী নানান মত ধ্বনি করিতেছেন, বনের শৌন্দর্য্য কে বর্ণন করিবেক। শ্রীবৃন্দাবনের মধ্যে মহন্তের ও মহাজনের ও রাজাদিগের বহু কুঞ্জ আছেন। নিধুবনের পশ্চীমে কিছু দুর হয় নিভৃত নিকুঞ্জ যে স্থানে ঠাকুরাণীজী ও সখি সকল লইয়া বেশবিন্তাশ করিতেন, ঠাকুরাণীজীউর পদচিহ্ন অন্তাবধি আছেন নিত্য পুজা হয়েন।" অচেতন পদার্থের প্রতি গভীর সম্মানসূচক ক্রিয়ার ব্যবহার এবং "নাঞী" প্রভৃতি রূপ অদ্ভুত বর্ণবিন্যাসদৃষ্টে বিস্মিত না হইলে, অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, ঝুড়ি ঝুড়ি বর্ণাশুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও এ রচনা অনাড়ম্বর ও সহজ গদ্যের নমুনা। পরমভক্ত বৈষ্ণবলেখক যে শ্রীধাম বৃন্দাবনের অলিগলির প্রতি সম্মানসূচক পদ প্রয়োগ করিবেন, তাহাতে আমাদের আপত্তি করিবার বা আশ্চর্য্যান্বিত হইবার যথেষ্ট কারণ নাই। এই পুস্তক ভিন্ন কৃষ্ণদাস প্রণীত (১০৯৮ সনের হস্তলিপি) "আশ্রয় নির্ণয়," ১১১২ সনের হস্তলিপি "ত্রিগুণাত্মিকা", চৈতন্যদাসপ্রণীত "রসভক্তিচন্দ্রিকা", "দেহভেদতত্ত্বনিরূপণ", লীলাচলদাসপ্রণীত "দ্বাদশ পাট নির্ণয়," ১০৯২ সনের লিখিত "প্রকাশ্যনির্ণয়", এবং ১১৫৮ সনের হস্তলিপি) "সাধন কথা" প্রভৃতি পুস্তকে প্রাচীন গদ্য রচনার নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। এস্থলে বলা উচিত এই পুস্তকগুলির অধিকাংশই "সহজিয়া" সম্প্রদায় কর্তৃক লিখিত।

সহজিয়া পুঁথি।

শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদশাস্ত্রী মহাশয় 'স্মৃতিকল্পদ্রুম' নামক নিজ বাটীতে প্রাপ্ত একখানি প্রাচীন বাঙ্গালা গদ্যগ্রন্থের কথা উল্লেখ করিয়াছেন এবং, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কলঙ্কার মহাশয়ের বাটীতে (সেরপুর) প্রাপ্ত অপর একখানা বাঙ্গলা গদ্যে রচিত স্মৃতিগ্রন্থের বিষয় জানাইয়াছেন। * আমরা রাজা পৃথ্বীচন্দ্রের রচিত গৌরী-মঙ্গল কাব্যে "স্মৃতি ভাষা কৈল রাধাবল্লভ শর্ম্মণঃ" পদে স্মৃতির যে অনুবাদের উল্লেখ দেখিতে পাই, তাহা খুব সম্ভব পদ্যগ্রন্থ। আমরা 'ব্যবস্থা তত্ত্ব' নামক একখানি প্রাচীন গদ্যপুস্তক পাইয়াছি। ইহার লেখক কে, তাহা জানা যায় নাই।

স্মৃতিগ্রন্থ।

এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিদর্শন দ্বারা বোধ হয় দুরূহ সূত্রের ব্যাখ্যা সাধারণের বোধগম্য করিতে যাইয়া মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালা গদ্যগ্রন্থ রচিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু ধারাবাহিক গদ্যরচনার অনুশীলন হইতেছিল বলিয়া বোধ হয় না।

আমরা দেবডামরতন্ত্রে ভূতের মন্ত্রের ন্যায় কতকগুলি বাঙ্গালা গদ্যের নমুনা দেখিয়াছি। এই তন্ত্র খুব প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। বাঙ্গালাটি বোধগম্য হইল না; একটি ছত্র এইরূপ,—"গোঁসাই চেলা সহস্র কামিনী ডোমা চাঁড়াল পাই মুই অকাটন বিষ হাতে এ গুয়া পান খাইয়া।"—দেঃ, গঃ, হস্তলিখিত পুঁথি।

তন্ত্রে গদ্যভাষা।

* শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত, বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত, ১৫৯—১৭০ পৃষ্ঠা।

সূত্রের ব্যাখ্যায় সহজ বাঙ্গালার নমুনা দৃষ্ট হয়; বৈষয়িক পত্রাদির ভাষাও বেশ সহজ, আমরা কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজের সময়ে লিখিত কতকগুলি পত্র দেখিয়াছি, তাহার রচনা আধুনিক পদ্ধতি হইতে বিভিন্ন হইলেও সহজ, এবং ভাব-প্রকাশের সম্পূর্ণ উপযোগী বলিয়া বোধ হয়। ১৭৫৬ খৃঃ অব্দের আগষ্ট মাসে নন্দকুমার মহারাজ কনিষ্ঠ রাধা-কৃষ্ণ রায়ের ও 'দীননাথ সামন্তজীউ'র নিকট যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা পাওয়া গিয়াছে; মেঃ বেভারিজ সাহেব ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের ন্যাসন্যাল্ মেগাজিন্ পত্রিকায় তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। এই পত্র দুইখানির ভাষা সহজ কিন্তু মধ্যে মধ্যে উর্দ্দুর সহিত মিশ্রিত, যথা,—

নন্দকুমারের পত্র।

"অতএব এ সময়ে তুমি কমর বাঁধিয়া আমার উদ্ধার করিতে পার, তবেই যে হউক, নচেৎ আমার নাম লোপ হইল, ইহা মক্‌ররর, মক্‌ররর জানিবা। নাগাদি ওরা ভাদ্র তথাকার রোয়দাদ সমেত মজুমদারের লিখন সম্বলিত মমুস্ত কাসেদ এথা পৌঁছে তাহা করিবা, এ বিষয়ে এক পত্র লক্ষ হইতে অধিক জানিবা।" শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় ১৭ই ফাল্গুন ১২৫২ সনের লিখিত বৈষ্ণবদিগের যে একখানি প্রাচীন দলিলের প্রতিলিপি সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় (১৩০৬ সন, ৪র্থ সংখ্যা, ২৯৯ পৃষ্ঠা) প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহা পত্রাদিতে প্রচলিত তাৎকালিক গদ্য রচনার একখানি উৎকৃষ্ট নিদর্শন বলিয়া গণ্য হইতে পারে। এই দলিলে সহজিয়া মতের প্রাধান্য দৃষ্টে বৈষ্ণব সমাজের অধোগতির সূচনা উপলব্ধ হয়।

রাজদরবারে উর্দ্দু ও সংস্কৃতে মিশিয়া একরূপ বিকৃত বাঙ্গলা গদ্য গঠন করিয়াছিল; এখনও "কস্য কর্জ্জপত্রমিদং কার্য্যাঞ্চাগে," "টাল মাটালে টাকা আদায় না করাতে," "ওয়াদা কার্ত্তিক মাসে টাকা পরিশোধ করিব" প্রভৃতি দলিল প্রচলিত ভাষায় সেই বিকৃত রূপের নমুনা কিছু বিদ্যমান আছে। আমরা পাঠ্য পুস্তক ও উপন্যাসের ভাষা সংশোধনার্থ ঘোর কোলাহল করিতেছি, কিন্তু সরকারী কাছারী ও জমীদারের সেরেস্তায় প্রাচীন জটিল গদ্য বদ্ধ-মূল হইয়া রহিয়াছে, সেখানে সংস্কারের বীজ এখনও স্থান পাইতেছে না। আমরা নিম্নে ত্রিপুরেশ্বর গোবিন্দমাণিক্য প্রদত্ত একখানা তাম্রশাসনের প্রতিলিপি উদ্ধৃত করিতেছি,—"স্বস্তি শ্রীশ্রীযুত গোবিন্দ মাণিক্য দেব বিষম সমরবিজই মহামহোদয়ি রাজনামদেশোহয়ং শ্রীকারকোনবর্গে বিরাজতে হনতে রাজধানী হস্তিনাপুর সরকার উদয়পুর পরগণে মেহেরকুল মৌজে যোলনল অজ হামিলা ১৮/ আঠার কাণি ভূমি শ্রীনরসিংহ শর্ম্মারে ব্রহ্মউত্তর দিলাম, এহার পাঁঠা পঞ্চক ভেট বেগার ইত্যাদি মানা, সুখে ভোগ করোক। ইতি সন ১০৭৭ ১৯ কার্ত্তিক।"

দরবারী ভাষা।

১৪৮ পৃষ্ঠার ফুটনোটে উদ্ধৃত অনন্তরাম শর্ম্মার গদ্য রচনার কিছু অংশ দেখাইয়াছি, তাহাও প্রায় এই সময়ে রচনা। এই উর্দ্দু-মিশ্র ভাষাকে যথাসাধ্য সহজ করিয়া ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে এইচ্, পি, ফর্ষ্টার্ সাহেব কতকগুলি আইনের তর্জ্জমা করেন, তাহা এস্থলে আলোচ্য নহে। সেই তর্জ্জমার ভাষা অপেক্ষাকৃত সহজ হইলেও অন্বয় ইংরেজীর অনুকরণের সম্পাদিত হইয়া দুরূহ হইয়াছে, তাহাতে কর্ম্ম, কর্ত্তা ও ক্রিয়ার যথেচ্ছাচার সন্নিবেশ হেতু ছত্রগুলির পরিষ্কার রূপ অর্থ পরিগ্রহ করা যায় না।

যে ভাষায় টেকচাঁদ ঠাকুর "আলালের ঘরের দুলাল" রচনা করিয়াছিলেন, তাহা তিনিই প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন বলিয়া খ্যাতি আছে, কিন্তু অষ্টাদশ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে "কামিনীকুমার"-রচক কালীকৃষ্ণদাস "গদ্যছন্দের" যে নমুনা দিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে "আলালী ভাষা" তাঁহার সময়ও প্রচলিত ছিল বলিয়া বোধ হয়। আমরা "কামিনীকুমার" হইতে সেই অংশ উদ্ধৃত করিলাম।

আলালী ভাষার প্রাচীন আদর্শ 'কামিনীকুমার।'

রামবল্লভের তামাক সাজা।

গদ্যছন্দ। সদাগর অতিকাতরে এইরূপ পুনঃ পুনঃ শপথ করাতে সুন্দরী ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক সোনাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেক। ওহে চোপদার এই চোর এতাদৃশ কটু দিব্য বারম্বার করিছে ও নিতান্ত শরণাগত হইয়া আশ্রয় যাচিঞা করিতেছে অতএব শরণাগতে নিগ্রহ করা উচিত নহে, বরঞ্চ নিরাশ্রয়ের আশ্রয় দেওয়া বেদবিধিসম্মত বটে। আর বিশেষতঃ আপনার অধিক ভৃত্য সঙ্গেতে নাই, অতএব অন্য ২ কর্ম্ম উহা হৈতে যত হউক আর না হউক কিন্তু এক আধ ছিলিম তামাক চাহিলেও তো সাজিয়া দিতে পারিবেক। তাহার আর কোন সন্দেহ নাই তবু যে অনেক উপকার। সোনা কহিলেক হাঁ ক্ষতি নাই তবে থাকে থাক। কামিনী এইরূপ সোনার সহিত পরামর্শ করিয়া সদাগরকে কহিতেছে। শুন চোর তুমি যে অকর্ম্ম করিয়াছ তাহার উপযুক্ত ফল তোমাকে দেওয়া উচিত কিন্তু তোমার নিতান্ত নূনতা ও বিনয়ে কাকতি মিনতি এবং কঠিন শপথে এ যাত্রা ক্ষমা করিলাম। এইক্ষণে সর্ব্বদা আমার আজ্ঞাকারী হইয়া থাকিতে হইবেক আমি যখন যাহা কহিব তৎক্ষণাৎ সেই কর্ম্ম করিবে তাহাতে অন্যথা করিলে তদ্দণ্ডে রাজার নিকট প্রেরণ করিব তাহার আর কথা নাই কিন্তু যদি কর্ম্মের দ্বারায় আমাকে সন্তোষ করিতে পারহ তবে তোমার পক্ষে শেষ বিবেচনা করা যাইবেক। সদাগর এই কথা শুনিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেক যে রাম বাঁচা গেল আর ভয় নাই পরে কৃতাঞ্জলীপূর্ব্বক কামিনীর সম্মুখে কহিতেছে মহাশয় আপনি যে ঘোর দায় হৈতে এদাসের প্রাণ রক্ষা করিলেন ইহাতেই বোধ হয় আপনি জন্মান্তরে এদীনের কেহ ছিলেন তাহার কোন সন্দেহ নাই নতুবা এমত উপকার পর পরের যে তো কখন করেন না। সে যাহা হউক আজি হৈতে কর্ত্তা তুমি আমার ধরম বাপ হইলে যখন যে আজ্ঞা করিবেন এই ভৃত্য কৃতসাধ্য প্রাণপণে পালন করিব। কামিনী কহিলেক ওহে চোর তুমি আমার কি কর্ম্ম করিবে কেবল হুঁকার কর্ম্মে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকহ আর এক কথা তোমাকে চোর চোর বলিয়া সর্ব্বদা বা কাঁহাতক ডাকি আজি হৈতে আমি তোমার নাম রামবল্লভ রাখিলাম। সদাগর কহিলেক যে আজ্ঞা মহাশয়, এইরূপ কথোপকথনান্তে ক্ষণেক বিলম্বে কামিনী কহিলেক ওহে রামবল্লভ একবার তামাক সাজ দেখি। রামবল্লভ যে আজ্ঞা বলিয়া তৎক্ষণাৎ তামাক সাজিয়া আলবোলা আনিয়া ধরিয়া দিলেক। এই প্রকার রামবল্লভ তামাক সাজা কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন পরে ক্রমে ক্রমে তামাক সাজিতে সাজিতে রামবল্লভের তামাক সাজার এমত অভ্যাস হইল যে রামবল্লভ যদ্যপি ভোজনে কিম্বা শয়নে আছেন ও সেই সময়ে কামিনী যদি বলে ওহে রামবল্লভ কোথায় গেলেহে রামবল্লভের উত্তর আজ্ঞা তামাক সাজিতেছি।

১৮১১ খৃষ্টাব্দে রাজীবলোচন কৃত "মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র-চরিত" লণ্ডননগরে মুদ্রিত হয়; ইহা প্রাচীন কালের খাঁটি বাঙ্গলায় লিখিত, ইহার উপর ইংরেজী-গদ্যের কোন প্রভাব দৃষ্ট হয় না। প্রাচীন গদ্যের এই নিদর্শন দেখিয়া বোধ হয়, গদ্য রচনা পূর্ব্বে এতদ্দেশে বিশেষরূপ প্রচলিত না থাকিলেও ইহার বেশ বিকাশ হইয়াছিল। আমরা

রাজীবলোচনের 'কৃষ্ণচন্দ্র-চরিত্র'।

নিম্নে এই পুস্তকখানি হইতে কতকাংশ উদ্ধৃত করিতেছি। "মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রচরিত" শুধু গদ্য-সাহিত্যের হিসাবে নহে,—ইহা সেকালের একখানি তত্ত্ববহুল উৎকৃষ্ট ইতিহাস।

"পরে ইঙ্গরাজের যাবদীয় সৈন্য-পলাশীর বাগানে উপনীত হইয়া সমর আরম্ভ করিল। নবাবী সৈন্য সকল দেখিল যে প্রধান প্রধান সৈন্যেরা মনোযোগ করিয়া যুদ্ধ করে না এবং ইঙ্গরাজের অগ্নিবৃষ্টিতে শত শত লোক প্রাণত্যাগ করিতেছে কি করিব ইহাতে কেহ উম্মাক্রমে যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতেছে। যুদ্ধ ভাল হইতেছে না ইহা দেখিয়া নবাবের চাকর মোহনদাস নামে একজন সে নবাব সাহেবকে কহিলেন আপনি কি করেন আপনার চাকরেরা পরামর্শ করিয়া মহাশয়কে নষ্ট করিতে বসিয়াছে। শত্রুর সঙ্গে প্রণয় করিয়া রণ করিতেছে না অতএব নিবেদন আমাকে কিছু সৈন্য দিয়া পলাশীর বাগানে পাঠান আমি যাইয়া যুদ্ধ করি আপনি বাকি সৈন্য লইয়া সাবধানে থাকিবেন পূর্ব্বের দ্বারে যথেষ্ট লোক রাখিবেন এবং এইক্ষণে কোন ব্যক্তিকে বিশ্বাস করিবেন না। নবাব মোহনদাসের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভয়যুক্ত হইয়া সাবধানে থাকিয়া মোহনদাসকে পঁচিশ হাজার সৈন্য দিয়া অনেক আশ্বাস করিয়া পলাশীতে প্রেরিত করিলেন। মোহনদাস উপস্থিত হইয়া অত্যন্ত যুদ্ধ করিতে প্রবর্ত্ত হইল। মোহনদাসের যুদ্ধেতে ইঙ্গরাজ সৈন্য শঙ্কান্বিত হইল। মীরজাফরালি খান দেখিলেন এ কর্ম্ম ভাল হইল না যদ্যপি মোহনদাস ইঙ্গরাজকে পরাভব করে আর এ নবাব থাকে তবে আমাদিগের সকলেরি প্রাণ যাইবেক অতএব মোহনদাসকে নিবারণ করিতে হইয়াছে। ইহাই বিবেচনা করিয়া নবাবের দূত করিয়া একজন লোককে পাঠাইলেন। সে মোহনদাসকে কহিল আপনাকে নবাবসাহেব ডাকিতেছেন শীঘ্র চলুন। মোহনদাস কহিল আমি রণ ত্যাগ করিয়া কি প্রকারে যাইব। নবাবের দূত কহিল আপনি রাজাজ্ঞা মানেন না। মোহনদাস বিবেচনা করিল এসকল চাতুরী এ সময়ে নবাব সাহেব আমাকে কেন ডাকিবেন ইহা অন্তঃকরণে করিয়া দূতের শিরচ্ছেদ করিয়া পুনরায় সমর করিতে লাগিল। মীরজাফরালি খান বিবেচনা করিল বুঝি প্রমাদ ঘটিল পরে আত্মীয় একজনকে আজ্ঞা করিল তুমি ইঙ্গরাজের সৈন্য হইয়া মোহনদাসের নিকট গমন করিয়া মোহনদাসকে নষ্ট করহ। আজ্ঞা পাইয়া একজন মনুষ্য মোহনদাসের নিকট গমন করিয়া অগ্নিবাণ মোহনদাসকে মারিল। সেই বাণে মোহনদাসের পতন হইল। পরে নবাবি যাবদীয় সৈন্য রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল ইংরাজের জয় হইল।

পরে নবাব স্রাজেরদৌলা সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন কোনমতে রক্ষা নাই আপন সৈন্য বৈরি হইল অতএব আমি এখান হইতে পলায়ন করি। ইহাই স্থির করিয়া নৌকাপরি আরোহণ করিয়া পলায়ন করিলেন। পরে ইংরাজ সাহেবের নিকটে সকল সমাচার নিবেদন করিয়া মীরজাফরালি খান মুরসিদাবাদের গড়েতে গমন করিয়া ইংরাজী পতাকা উঠাইয়া দিলে সকলে বুঝিল ইঙ্গরাজ মহাশয়েরদিগের জয় হইল। যাবদীয় প্রধান প্রধান মনুষ্য ভেটের দ্রব্য দিয়া সাহেবের নিকট সাক্ষাৎ করিলেন। সাহেব সকলকে আশ্বাস করিয়া যিনি যে কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন সেই সেই কর্ম্মে তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়া রাজপ্রসাদ দিলেন। মীরজাফরালিকে নবাব করিয়া সকলকে আজ্ঞা করিলেন তোমরা সকলে সাবধানপূর্ব্বক রাজকর্ম্ম করিয়া রাজ্যের প্রতুল হয় এবং প্রজালোক দুঃখ না পায়। সকলে আজ্ঞানুসারে কার্য্য করিতে লাগিলেন।

পরে নবাব স্রাজেরদৌলা পলায়ন করিয়া যান। তিন দিবস অভুক্ত অত্যন্ত ক্ষুধিত নদীর তটের নিকটে এক ফকিরের আলয় দেখিয়া নবাব কর্ণধারকে কহিলেন এই ফকিরের স্থান তুমি ফকিরকে বল কিঞ্চিৎ খাদ্যসামগ্রী দেও একজন



মনুষ্য বড় পীড়িত কিঞ্চিৎ আহার করিবেক। ফকির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া নৌকার নিকটে আসিয়া দেখিল অত্যন্ত নবাব স্রাজেরদৌলা বিষণ্ণবদন। ফকির সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়াছে বিবেচনা করিল নবাব পলায়ন করিয়া যায় ইহাকে আমি ধরিয়া দিব আমাকে পূর্ব্বে যথেষ্ট নিগ্রহ করিয়াছিল তাহার শোধ লইব ইহাই মনোমধ্যে করিয়া করপুটে বলিল আহারের দ্রব্য আমি প্রস্তুত করি আপনারা সকলে ভোজন করিয়া প্রস্থান করুন। ফকিরের প্রিয়বাক্যে নবাব অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া ফকিরের বাটীতে গমন করিলেন। ফকির খাদ্যসামগ্রীর আয়োজন করিতে লাগিল এবং নিকটে নবাব মীরজাফরালিখানের চাকর ছিল তাহাকে সম্বাদ দিল যে নবাব স্রাজেরদৌলা পলায়ন করিয়া যায় তোমরা নবাবকে ধর। নবাব মীরজাফরালি খানের লোক এ সম্বাদ পাবামাত্র অনেক মনুষ্য একত্র হইয়া নবাব স্রাজেরদৌলাকে ধরিয়া মুরসিদাবাদে আনিলেক।"

আমরা নব পর্য্যায়ের বঙ্গীয় গদ্য সাহিত্যের অন্যতম স্রষ্টা রাম রাম বসু সম্বন্ধে বঙ্গবাণী পত্রিকায় (১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা) যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। টমাস ও কেরীর সঙ্গে রাম বসুর জীবন এরূপ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত যে আশা করি এই প্রবন্ধে উক্ত পাদ্রীদ্বয়ের সবিস্তার উল্লেখ কেহ কেহ অপ্রাসঙ্গিক মনে করিবেন না। টমাস সাহেবের জীবন চরিত হইতে এই সকল কথা সংগৃহীত হইয়াছে।

"১৭৫৭ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডের ফেয়ারফোর্ড নগরে টমাসের জন্ম হয়। টমাস ডাক্তারী পাশ করিয়া অস্ত্রচিকিৎসায় প্রাজ্ঞ হইয়া উঠেন।

"কিন্তু চিকিৎসা তাঁহার ধাতের জিনিষ নয়, ধর্ম্ম লইয়াই টমাস পাগল হইয়া পড়েন। ঠিক গোঁড়ামি বলিলে টমাসের ভাব বুঝা যায় না, ধর্ম্মরাজ্যের যে সীমানায় গেলে পাগলা-গারদটা খুব দূরে থাকে না, টমাস প্রায় সেই সীমানায় গিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন একজন স্বপ্ন বোদ্ধা, অর্থাৎ যাহা কিছু স্বপ্নে দেখিতেন, তাহারই মধ্য হইতে বাইবেলের কোন রহস্য কিম্বা যিশুর কোন আদেশ বুঝিয়া লইতেন। শুধু বুঝিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না,—সেই সিদ্ধান্তের অনুকূলে জীবনের কর্ম্মপ্রণালী বহাইয়া দিতেন। টমাস ডাক্তারী ছাড়িয়া ১৭৮৬ খৃঃ অব্দে পাদ্রী হইয়া আসেন। এখন যে ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ্চ এত বড় খ্যাত-নামা, টমাসই তাহার ভিত্তিস্থাপন করেন। তার পর কেরি, মার্সমান ওয়ার্ড প্রভৃতি এই কার্য্যে যোগ দিয়াছিলেন।

"খৃষ্টধর্ম্ম এদেশের লোক তখন তখনই দেব-নির্ম্মাল্যের ন্যায় হাত পাতিয়া লইল না; ভক্ত টমাস বড়ই ক্ষুব্ধ হইলেন। কিন্তু তিনি স্বপ্নে দেখিলেন যে, তাঁহার হাতের মুঠার মধ্যে একটা কাঁকড়া,—সেটা তীক্ষ্ণ হুল দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিতেছে এবং তারপরই আবার কাঁকড়াটা সদ্য সদ্য একটা পদ্ম-ফুলে পরিণত হইয়া গেল। এই স্বপ্নে টমাস নিশ্চয় করিয়া যিশুর মহিমা বুঝিলেন,—বাঙ্গালীরা তাঁহার পবিত্র ধর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে কষ্ট দিতেছে সত্য, কিন্তু অচিরাৎ তাহারা খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিবে, কাঁকড়া পদ্ম-ফুল হইয়া দাঁড়াইবে। এই স্বপ্ন দর্শনের পর হইতে তাঁহার সমস্ত অবসাদ ও নৈরাশ্য দূর হইল এবং খৃষ্টধর্ম্মের বিজয়-কেতন যে শীঘ্র এ দেশে প্রোথিত হইবে—তৎসম্বন্ধে

তাঁহার কেনই দ্বিধা রহিল না। শুধু স্বপ্ন নহে, মানুষের কথা-বার্ত্তা হইতে অতর্কে উচ্চারিত দুই একটি কথার মধ্যে তিনি যিশুর আদেশ বুঝিয়া ফেলিতেন। একদিন কোন গুরুতর বিষয়ে চিঠি লিখিয়া তাহা ডাকে ফেলিতে যাইবেন, এমন সময় পার্শ্ববর্ত্তী খালে মাঝিদের কথা-বার্ত্তা তাঁহার কর্ণগোচর হইল। টমাস বাঙ্গলা শিখিয়াছিলেন—তিনি শুনিলেন এক মাঝি আর এক মাঝিকে বলিতেছে, "জমিদার মারে—কাল যাবে।" এই অনির্দ্দিষ্ট বাক্য তাঁহাকে স্পষ্ট করিয়া যিশুর কি একটা আদেশ বুঝাইল। তিনি চিঠিখানি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন এবং সেই মাঝির উক্তিতে প্রভু তাঁহাকে যাহা বুঝাইয়াছিলেন, তদনুসারে নূতন এক চিঠির খসড়া প্রস্তুত করিলেন।

শঠের পাল্লায়।

"এমন লোককে প্রতারণা করা খুব সহজ। কেউ যদি তাঁহাকে আসিয়া বলিত "মহাশয়, প্রভু যিশু ভিন্ন আমার আর গতি নাই", কিংবা কোন স্বপ্নের উল্লেখ করিত—তবে টমাস ভক্তিতে গলিয়া যাইতেন এবং জানু পাতিয়া বসিয়া গলদশ্রুচক্ষে খৃষ্টের মহিমা স্মরণ করিতেন। তিনটি বাঙ্গালী ভদ্রলোক টমাসের এই দুর্ব্বলতা বুঝিতে পারিয়া তাহা তাহাদের সুবিধায় লাগাইয়া দিল।

একদিন পার্ব্বতীচরণ মুখোপাধ্যায় রাত্রি দুইটার সময় কাঁদিয়া আকাশ ফাটাইল, এবং তাহার হাত ধরিয়া বদনচন্দ্র অধিকারী কেবলই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "বল কি হইয়াছে?" বহু জিজ্ঞাসার পর মুখুজ্যা বলিল, "ঈশ্বরের দূত স্বরূপ টমাস পাদ্রীকে প্রত্যাখ্যান করিয়া কি কুকর্ম্মই না করিয়াছি! আমি স্বপ্নে দেখিলাম যেন নরকাগ্নি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে—এবং তাহা আমাকে অনুসরণ করিয়া ছুটিতেছে, এ সময়ে ঈশ্বরের একমাত্র জাত-সন্তান যিশু ভিন্ন কে আমাকে রক্ষা করিবে?" এই কথা শুনিয়া বদন অধিকারীর চক্ষুও অনার্দ্র রহিল না,—দুই জনে হাউ মাউ করিয়া কাঁদিয়া পাদ্রীধামে উপাস্থত হইল। পাদ্রীর সরল চক্ষের জল, ঐ দুই ব্যক্তির কপটাশ্রুর সঙ্গে মিশিয়া বিষামৃতের সৃষ্টি করিল। টমাস তদবধি এই দুই জনের বৃহৎ পরিবার প্রতিপালনের ভার নিজে লইলেন, এবং তাহাদিগকে ঋণমুক্ত করিতে যাইয়া নিজে এরূপই ঋণজালে আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন যে, একবার তাঁহার নামে ওয়ারেণ্ট বাহির হইল এবং দ্বিতীয় বার বিলাত হইতে রওনা হইবার সময় তাঁহার উত্তমর্ণ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া জাহাজ হইতে নামাইয়া লইয়া আসিল। অথচ প্রকাশ্যে খৃষ্টের নাম শুনিয়া দুটি বাঙ্গালী বন্ধুর দেহ যতই কণ্টকিত হউক না কেন, খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণের প্রস্তাব হইলে নানা ওজুহাতে তাহারা দিন পিছাইয়া দিতে লাগিল। মূল কথা, তাহারা পাদ্রীদের খরচায় দুর্গোৎসব, দোলযাত্রা প্রভৃতি পালন করিয়া চিরকালই মহাসুখে দিন গুজরাণ করিয়াছে, কোন কালেই খৃষ্টান হয় নাই।

রামবসু।

"কিন্তু তৃতীয় শঠের নাম বলিতে স্বতঃই আমাদের দ্বিধা হয়। তিনি বর্ত্তমান বঙ্গগদ্য সাহিত্যের স্রষ্টা। তিনি ষোলবর্ষ বয়সে আরবি ও পারশী পূর্ণমাত্রায় দখল করিয়াছিলেন। তিনি চুঁচড়ায় এক প্রধান কায়স্থ বংশে অনুমান ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। কেরি সাহেব লিখিয়াছেন, তাঁহারা এককালে বঙ্গদেশের জমিদারবর্গের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন এবং ওয়ারেন হেষ্টিংসের কোপানলে পড়িয়া এই বংশ সর্ব্বস্বান্ত হন। রামবসু ইংরাজিতেও বিশেষ অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। রাজা রামমোহন তাঁহার বন্ধু ছিলেন। কেরি সাহেব লিখিয়াছেন—রামবসুর মত একান্ত অধ্যয়ন-নিরত পণ্ডিত তিনি দেখেন নাই। টমাস তাঁহার জারনেলে লিখিয়াছেন, "এই বঙ্গদেশের নিঃসঙ্গ কষ্টকর জীবনের একমাত্র সুখ—রামবসুর সঙ্গ।" কেরি ও টমাসে গলায় গলায় ভাব ছিল। কিন্তু কেরি তাঁহার জারনেলের এক জায়গায় লিখিয়াছেন—"টমাস হইতেও রামবসুকে আমার ভাল লাগে।" রামবসু এত দূর মুক্তহস্ত ও বদান্য ছিলেন যে কেরি লিখিয়াছেন "তাঁহার একদিনের মুক্তহস্ততা দর্শন করিয়া আমি চমৎকৃত হইয়াছি। য়ুরোপের ভদ্রবংশের শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তিও যদি এরূপ মুক্তহস্ততা দেখাইতে পারিতেন, তবে তাঁহারও গৌরব বৃদ্ধি হইত।" রামবসুর কথা বলিবার কায়দা এমনই চমৎকার ছিল যে, টমাস এবং কেরি উভয়েই বহু স্থানে তাঁহার প্রত্যুৎপন্নমতির ও সূক্ষ্মবুদ্ধির প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, এই প্রতিভাবান লেখক পূর্ব্বোক্ত দুই শঠের সমব্যবসায়ী ছিলেন,—বিশেষ, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা দ্বারা রামবসু পাদ্রীদিগকে এমনই বশীভূত করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, তাঁহার শত শত শঠতা—যাহা আমাদিগের নিকট দিবালোকের মত পরিষ্কার বোধ হয়—তাহা পাদ্রীদের চক্ষু এড়াইয়া গিয়াছে। রামবসু বঙ্গসাহিত্যের অন্যতম মহারথ—গুরুস্থানীয়, কিন্তু তাহা আলোচনা করিবার পূর্ব্বে তাঁহার জীবনের কতকগুলি ঘটনা এখানে উল্লেখ করিব। একাধারে এত গুণের সঙ্গে ধূর্ত্ততা, বিশ্বাসঘাতকতা কি প্রকারে থাকিতে পারে—রামবসুর চরিত্র তাহারই একটী দৃষ্টান্ত স্থল। পদ্মলতা ও চন্দনতরুর গা জড়াইয়া যেরূপ ভীষণ অজগর থাকে, রামবসুর উৎকৃষ্ট গুণগুলির সঙ্গে সেইরূপ ভয়াবহ ও জঘন্য দোষের সমাহার হইয়াছিল।

কৃতঘ্নতা ও ব্যভিচার।

"যে বৎসর টমাস বঙ্গদেশে আগমন করেন, সেই বৎসরই অর্থাৎ ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে রামবসু তাঁহার মুন্সীপদে নিযুক্ত হন। রামবসু টমাসকে বাঙ্গালা শিখাইয়াছিলেন, এবং বাইবেলের সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা অনুবাদে পাদ্রী সাহেবকে বিশেষ সহায়তা করেন। পরবর্ত্তী সময়ে শ্রীরামপুরের কেরি সাহেব বাইবেলের যে বঙ্গানুবাদ সম্পাদন করেন, রামবসু এই সময় তাহার ভিত্তি গড়িয়া দিয়াছিলেন। টমাসকে

বিশেষরূপে হাত করিবার উদ্দেশে রামবসু খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি তাঁহার তথাকথিত অনুরাগ দেখাইতে সুরু করেন এবং যিশু সম্বন্ধে বাঙ্গলা ভাষায় এক গান রচনা করেন। গানটি আমার কাছে আছে। ঐ গানটি টমাস সাহেব ইংরেজীতে তর্জ্জমা করিয়াছিলেন। সে তর্জ্জমাটিও আমি পাইয়াছি। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী কাল এই যিশুস্তোত্রটি বঙ্গদেশের গির্জ্জাগুলিতে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া পৌত্তলিক ধর্ম্মের বিরুদ্ধে এক পুস্তক লিখিয়া রামবসু বাঙ্গালী সাধারণের মধ্যে প্রচার করেন এবং পাদ্রীসাহেবের বিশেষ পেয়ারের হন। তিনি টমাসের চোখের তারার মত প্রিয় হইয়াছিলেন। কেরি সাহেব পরবর্ত্তী সময়ে যেখানে খৃষ্টমহিমা প্রচার করিতেন, রামবসু তাঁহার দক্ষিণ হস্তের ন্যায় সেই সেই স্থানে জনবৃন্দকে বাঙ্গলা ভাষায় খৃষ্টধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝাইয়া দিতেন।

"কিন্তু এ সকলই ভূয়া। বদন অধিকারী ও পার্ব্বতী মুখার্জ্জির সঙ্গে ফন্দী আঁটিয়া রামবসু নানা ছুতায় সাহেবদিগের নিকট হইতে টাকা আদায় করিতেন। মৌখিক যিশু-ভক্তি সত্ত্বেও এই ত্রিমূর্ত্তি কখনই সাহেবদের সঙ্গে বসিয়া খাইতেন না, সাহেবের মড়া ছুঁইতেন না, এবং সাহেবদের স্পৃষ্ট জল স্পর্শ করিতেন না। যদি খৃষ্টধর্ম্মের দীক্ষার কথা উঠিত, তাহা হইলে তিন জনে একত্র হাত জোড় করিয়া বলিতেন "ব্যস্ত কেন? সেতো হবেই।" একবার বলিলেন "নবদ্বীপে যাইয়া দীক্ষা লইব।" কেরি ও টমাস তথায় যাইয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ভক্ত কোম্পানী চম্পট দিলেন।

"প্রতিবার এই ভাবে প্রতারিত হইয়াও সাহেবদের মোহ ভাঙ্গিল না,—তাঁহাদের আশা ফুরাইল না। প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়াও পাদ্রীরা পুনঃ পুনঃ রামবসু এবং-কোম্পানীকে বিশ্বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু বহু বৎসর পর যখন ইঁহাদের ভুল ভাঙ্গিল, তখন টমাস্ একদিন হাঁপাইতে হাঁপাইতে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "এদের কথা কি বলিব! এই সব বাহ্যিক খৃষ্ট-ভক্তি সত্ত্বেও স্বয়ং খৃষ্টও যদি উপস্থিত হন, তবে ইঁহারা তাঁহার হাতের ছোঁয়া জল খাইবে না।"

"একবার টমাস বিলাতে গিয়াছিলেন। তারপর তিনি কেরিকে সঙ্গে করিয়া ফিরিয়া আসিলে শুনিতে পাইলেন, রামবসু খৃষ্টভক্তিতে ইতি দিয়া দিব্য দুর্গোৎসব ও দোলোৎসব করিয়া বেড়াইতেছেন। কেরি সাহেব কৈফিয়ৎ চাহিলেন। তখন রামবসু ন্যাকা সাজিয়া বলিলেন—"খৃষ্ট-ধর্ম্মে যে বিগ্রহ পূজা নিষিদ্ধ, তাহাতো জানিতাম না—ক্যাথলিক খৃষ্টানেরা তো মন্দিরে যিশু ও মেরীর আরতি ও পূজা করিয়া থাকেন। বিশেষ আমার বড় আমাশা হইয়াছিল। আমি পূজা-আর্চ্চায় যোগ না দিলে আমার কুটুম্ব-স্বগণ কেউ আমার চিকিৎসা শুশ্রূষা প্রভৃতি করিতে রাজি হয় নাই।" টমাস সরলপ্রাণে তাহাই বিশ্বাস করিলেন এবং খৃষ্ট-ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব গুলি রামবসুকে কেন ভাল করিয়া বুঝান নাই, তজ্জন্য অনুতাপ করিতে লাগিলেন।

"কেহ কেহ বলেন, রামবসু তাঁহার বন্ধু রাজা রামমোহনের ধর্ম্মমত গ্রহণ করিয়াছিলেন। কখনই নয়। তাহা হইলে কি দেবদেবী পূজা তিনি এত ঘটা করিয়া করিতে পারিতেন?

"কিন্তু ইহার পরে তিনি আরও ভয়ানক শঠতা করিয়াছিলেন। এক কায়স্থ বিধবার গুপ্ত অনুরাগের ফলে তিনি ভ্রূণ হত্যা করিয়াছিলেন, তাহা প্রমাণিত হইয়া গেল। তখন তিনি টমাসের মুন্সীগিরি ছাড়িয়া কেরির মুন্সী হইয়াছিলেন। কেরি যথাসাধ্য নিজকে বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন যে, এই অভিযোগ মিথ্যা। কিন্তু যখন ঘটনা উৎকটভাবে প্রমাণিত হইয়া গেল, তখন আর তিনি কি করিবেন?—রাম বসুর মুন্সীগিরি আর টিঁকিল না। কেরি দুঃখের সহিত রামবসুকে বিদায় করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু রামবসুর এমনই পাণ্ডিত্য ও অসামান্য প্রতিভা ছিল যে, কেরি পুনরায় তাঁহাকে ডাকিয়া আনিয়া ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতী দিলেন। এই কার্য্যে রামবসু তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত বহাল ছিলেন। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের ৭ই আগষ্ট তারিখে রামবসুর মৃত্যু হয়, তৎপর কেরি তাঁহার পুত্র নরোত্তম বসুকে সেই কার্য্যে বহাল করেন।

টমাস কেন পাগল হইলেন।

"বস্তুতঃ টমাসের ন্যায় সরলবিশ্বাসী, খৃষ্ট-ভক্ত ব্যক্তি দুর্লভ ছিল। ১৪ বৎসর কাল ক্রমাগত উক্ত তিন বন্ধু ইঁহাকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ার লোভ দেখাইয়া আশা ও নিরাশায় এরূপ উত্তেজিত অবস্থায় রাখিয়াছিলেন যে, তাঁহার মন হর্ষবিষাদে ক্রমাগত দোল খাইতেছিল। তাঁহার মাথা কোন কালেই ঠিক ছিল না। কিন্তু ১৪ বৎসর পরে (১৮০০ খৃঃ) সত্য সত্যই তাঁহার চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করিয়া কৃষ্ণ পাল নামক এক ব্যক্তি সর্ব্বপ্রথম খৃষ্ট-ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করে। সেই দিনকার অসহ্য সুখ টমাস বরদাস্ত করিতে পারিলেন না। তিনি সারারাত্রি আনন্দের চোটে লাফাইতে লাগিলেন,—কোন সময় জানু পাতিয়া বসিয়া, কোন সময় দাঁড়াইয়া, কোন সময় অট্ট হাসিয়া কখনও বা ঝর ঝর চোখের জল ফেলিয়া, যিশু মহিমায় এমনই গদগদভাবে চীৎকার করিতে লাগিলেন যে, কোর প্রভৃতি বন্ধুগণ বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার মাথা বিগড়াইয়াছে। অতঃপর তাঁহারা তাঁহাকে হাতে হাতকড়ি পরাইয়া পাগলা গারদে লইয়া গেলেন।"

রাম বসুর বাঙ্গালা।

এটি স্থির কথা, বাঙ্গালা গদ্যের প্রাচীনতর নমুনা যতই থাকুক না কেন, রামবসুই আধুনিক গদ্য সাহিত্যের স্রষ্টা। তাঁহার পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় আধুনিক ছন্দের গদ্যে প্রতাপাদিত্যচরিত্রের মত একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুস্তক কেহ লেখেন নাই। পণ্ডিতেরা এই পুস্তকের একটা খুঁৎ ধরিয়াছেন,—রামবসু অনেক মুসলমানী শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় প্রভৃতি পণ্ডিত সংস্কৃত শব্দের ও

সমাসের যে বিকট ব্যূহের সৃষ্টি করিয়া অনেক স্থলে তাঁহাদের রচনা একেবারে সাধারণবুদ্ধির অগম্য ও অনায়ত্ত করিয়া তুলিয়াছেন,—সে তুলনায় রামবসুর মুসলমানী শব্দের ঘটা অতি অল্প। বিশেষ তিনি যুদ্ধ-বিগ্রহ বর্ণনা করিয়াছেন, দরবারের চিত্র দিয়াছেন,—সেখানে মুসলমানী শব্দ তখন চলিত ছিল, তিনি তাঁহার প্রভাব এড়াইবেন কি রূপে? একথা নিশ্চয় যে সংস্কৃতের পণ্ডিতদের মত তিনি তাঁহার উপহাসাস্পদ পাণ্ডিত্যের ভুঁড়ি বাহির করিয়া সাহিত্যের আসরে আসেন নাই। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতেরা যে যুগে বাঙ্গালা গদ্যটাকে সংস্কৃতে পরিণত করিবার উদ্‌ভ্রান্ত চেষ্টা করিতেছিলেন, সে যুগে মুসলমানী শব্দের উপর একটা বিদ্বেষ খুবই স্পষ্ট দেখা যায়। এই ছোঁয়াচে রোগের জন্য রামবসুর লেখা ততটা আদর সে সময়ে পায় নাই। কিন্তু পণ্ডিত-মহলে এ পুস্তকের প্রতিষ্ঠা যে বিশেষরূপ হয় নাই, তাহাও বলা যাইতে পারে না। যেহেতু জার্ম্মানিতেও পুস্তকখানির খোঁজ হইয়াছিল। পণ্ডিতেরা সাহেবদের মত কতকটা নিজেদের অনুকূল করিয়া লইয়াছিলেন, এজন্য লঙ্ সাহেব তাহার গ্রন্থ-তালিকায় এই পুস্তকের মুসলমানী প্রভাবের নিন্দা করিয়াছিলেন, এবং ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের কলিকাতা রিভিউ পত্রিকায় ঐ নিন্দা পুনরায় বিঘোষিত হইয়াছিল। পুস্তক খানির লেখা আগাগোড়া সাধু ভাষায় পরিণত করিয়া কয়েক বৎসর পরে হরিশ তর্কালঙ্কার আর একখানি পুস্তক রচনা করেন। কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও রামবসুর পুস্তকখানি আমাদের নিকট অতি উপাদেয় মনে হইতেছে। ইহার ঐতিহাসিক বিবরণ খাঁটি, বাহুল্যবর্জ্জিত, এবং সামাজিক ও পারিবারিক ঘটনার ইতিবৃত্তের অংশ সম্পূর্ণরূপে মুসলমানী প্রভাব-বর্জ্জিত। এই পুস্তক সেই যুগের বঙ্গসাহিত্যের শ্রেষ্ঠসম্পদ। রামবসুই বঙ্গবাণীর এই যুগের আদি সেবক। তাঁহার চরিত্রের ত্রুটির জন্য তিনি জীবনে অনেক নিন্দা সহিয়াছিলেন কিন্তু সাহিত্যের বিচারে আমরা তাঁহার চরিত্রের কথা তুলিব না, বরং বাগ্দেবীর পায়ের বড় পদ্ম-কুসুমের মালাটি তাঁহার গলায় পরাইয়া দিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করিব না।

রাম বসুর লিপিমালাও একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর প্রেস হইতে প্রতাপাদিত্য প্রকাশিত হয়। চ্যাটারটন হইতে লর্ড বায়রণ পর্য্যন্ত অনেক লেখকের চরিত্রের ত্রুটির জন্য তৎসময়ে সমালোচকগণ তাঁহাদের লেখার যথাযথ মূল্য দিতে কুণ্ঠিত ছিলেন, রাম বসুও ইঁহাদেরই পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইবেন।

জাতীয় চরিত্র।

এখানে একটী কথা বলা উচিত—রামবসু ও তাঁহার দুই বন্ধুর কথা স্মরণ করিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, ম্যাকলে আমাদিগকে সেই যুগে যে নিন্দাবাদ করিয়াছেন, তাহা ভিত্তিহীন নহে।

যে যুগের কথা হইতেছে সেই যুগেই আমাদের সমাজে রাজা রামমোহনের ন্যায় মহৎ ব্যক্তির আবির্ভাব হইয়াছিল। কেরি সাহেবের জীবনচরিতে উল্লিখিত হইয়াছে যে এক সদাশয় ব্রাহ্মণ একটি লোককে মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করেন; এই ব্যাপার আদালতের বিচারাধীন হয় এবং ব্রাহ্মণকে সাক্ষী মান্য করা হইয়াছিল। কিন্তু সাক্ষীকে আদালতে শপথ লইতে হয়: ব্রাহ্মণ শপথ লইতে অস্বীকার করেন, এই অপরাধে মহাত্মা ব্রাহ্মণের হাজত ভোগ করিতে হয়। তিনি একটি লোককে জীবন দান করিয়াছিলেন,—প্রতিদান স্বরূপ আদালত তাঁহার উপর এই উৎকট ব্যবস্থা করিলেন। ক্ষোভে ব্রাহ্মণ হাজতে ত্রিরাত্রি তিনদিন উপবাস করিয়া রহিলেন,—প্রাণত্যাগ করিবেন, তথাপি আদালতে শপথ করিবেন না,—এই তাঁহার পণ। এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সাধুচরিত্র ব্রাহ্মণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া কেরি সাহেব বিচারপতিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ পূর্ব্বক তাঁহাকে মুক্তি দান করেন। বঙ্গদেশে তখনও যেরূপ ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও সাধুতা বিরাজ করিতেছিল, তাহা দেখিয়া পাদ্রীরা অনেক সময় পরিতাপ করিয়া বলিয়াছেন,—"এই কুসংস্কার সত্ত্বেও হিন্দুরা তাঁহাদের ধর্ম্মের প্রতি যেরূপ অচলা ভক্তি ও ঐকান্তিকী নিষ্ঠা দেখাইয়া থাকে, আমাদের খৃষ্টানদের মধ্যে সেইরূপ অনুরাগের সিকি ভাগও দেখিতে পাই না।" এই সময়ে যেরূপ দৃঢ়তা ও প্রগাঢ় ভক্তি ও প্রেম দেখাইয়া সতীরা স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া হ্যালিডেপ্রমুখ বহু সম্ভ্রান্ত সাহেব বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। কেরি ও টমাস নবদ্বীপে যাইয়া তথাকার পণ্ডিতগণের যে আশ্চর্য্য চরিত্রবল, নির্ভীকতা ও প্রগাঢ় বিদ্যাবুদ্ধি দেখিয়াছিলেন, তাহাতেও তাঁহারা হিন্দু-সভ্যতার গৌরব চাক্ষুষ করিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। এই সমাজের সাধুতা অনেক সাহেবই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। সুতরাং বদন অধিকারী ও পার্ব্বতী মুখোপাধ্যায়ের ন্যায় দুটি পাড়াগেঁয়ে অশিক্ষিত শঠের ব্যবহার জাতীয় চরিত্রের নিদর্শন নহে। পৃথিবীর সকল সমাজেই এরূপ চরিত্র সুলভ। আমরা রামবসুর ন্যায় শিক্ষিত প্রতিভাশালী ব্যক্তির ব্যবহার স্মরণেই বিশেষ দুঃখিত, কিন্তু অন্যদেশেও সাহিত্যিকদের মধ্যে এরূপ চরিত্রের অভাব নাই।

রামবসু যে খৃষ্টীয় সমাজের অনেক উপকার করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই। এদেশীয় খৃষ্টীয় গির্জ্জা স্থাপনের প্রয়োজন দেখাইয়া তিনি বিলাতে যে চিঠি লিখিয়াছেন, সেই চিঠি ও তাহার উত্তর আমরা দেখিয়াছি এবং একথা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে বঙ্গদেশে আধুনিক ব্যাপটিষ্ট মিশনের প্রতিষ্ঠার মূলে রামবসুর সেই চিঠি অনেকটা কাজ করিয়াছিল। রামবসুর সাহায্য ভিন্ন টমাস ও কেরি কখনই বাইবেলের বঙ্গানুবাদ করিতে পারিতেন না। কলিকাতার ৪২ মাইল পূর্ব্বে দেহাটা নামক গ্রামের জমিদার রামবসুর খুল্লতাত ছিলেন। রামবসুর চেষ্টায় সেই অঞ্চলে পাদ্রীরা অনেক জমি অতি সুবিধায় পাইয়াছিলেন এবং রামবসুর সেই খুল্লতাতের কলিকাতাস্থিত মাণিকতলার বাসভবনে কেরি সাহেব বিনা খাজনায় অনেক দিন বাস করিয়াছিলেন।

সুতরাং রামবসু যে খৃষ্টান সমাজের নানারূপ উপকার করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কেরি ও টমাস শেষ পর্য্যন্ত একথা বিশ্বাস করিতে পারেন নাই যে, রামবসু তাঁহাদের সঙ্গে শঠতা করিয়াছেন, তাঁহাদের বিশ্বাস রামবসু হিন্দু-সমাজের ভয়ে ভীত হইয়া দীক্ষা লইতে পারেন নাই। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে রামবসুর বেতন ছিল ৪০৲ টাকা। সেই সময়ে এই বেতন নিতান্ত অল্প ছিল না, স্বয়ং কেরি বঙ্গদেশে আসিয়া বোধ হয় ইহার অধিক অর্থ মাসিক পাইতেন না। টমাস মাসে ২০০৲ শত টাকা খরচ করেন শুনিয়া তিনি অবাক্ হইয়া গিয়াছিলেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয়, যাহাকে কেরি এবং মার্স মান ডাঃ জনসনের সমকক্ষ মনে করিতেন, তাঁহারই বেতন ছিল মাসিক ২০০৲ টাকা!

ব্যাপ্টিষ্ট মিশন হইতে সি, বি, লুইস (C. B. Lewis) জন টমাসের যে জীবনচরিতখানি ১৮৭৩ খৃঃঅব্দে প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তাহাতে এই সন্দর্ভে লিখিত সমস্ত কথাই বিস্তারিতভাবে দেওয়া আছে। সেই পুস্তক এখন দুষ্প্রাপ্য। লণ্ডন মিউজিয়মে একখানি আছে। শ্রীরামপুর কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ হাওয়েল্‌স বলিয়াছেন, তাঁহাদের কলেজ লাইব্রেরীতে একখানি ছিল, এখন তাহা আছে কি না বলা যায় না। আমার নিকট এক কপি আছে।

অপরাপর গদ্য-গ্রন্থ।

'তোতা ইতিহাস', 'বত্রিশ সিংহাসন', 'পুরুষ-পরীক্ষার অনুবাদ' প্রভৃতি কয়েকখানি গদ্য-পুস্তক উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রচিত হয়,—উহাদের ভাষা কতকটা একই রকমের। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ইংরেজদিগকে বাঙ্গলা শিখাইবার উদ্দেশ্যে কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয়,—কয়েকজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বাঙ্গালা ভাষার অধ্যাপকের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক তাঁহারা কয়েকখানি পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করিতে নিযুক্ত হন। তাঁহারা ভাবিলেন—তাঁহাদের পাণ্ডিত্য দ্বারা বাঙ্গালা ভাষা অলঙ্কৃত করিতে হইবে,—সাধারণের দুরধিগম্য উৎকট সমাসবদ্ধ রচনা দ্বারা তাঁহারা বাঙ্গালা গদ্যকে যেরূপ বিড়ম্বিত করিয়াছিলেন,—তাহার নিদর্শন "প্রবোধ চন্দ্রিকা" প্রভৃতি পুস্তক পাঠ করিলে পাওয়া যায়। প্রাচীন একখানি শিশুবোধকে স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পরের নিকট পত্র লিখিবার যে আদর্শ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপকগণ।

শিশুবোধকের ধারা।

"শিরোনামা ঐহিক পারত্রিক ভবার্ণব নাবিক শ্রীযুক্ত প্রাণেশ্বর মধ্যম ভট্টাচার্য্য মহাশয় পদপল্লবাশ্রয়প্রদানেষু।"

"শ্রীচরণ সরসী দিবানিশি সাধন প্রয়াসী দাসী শ্রীমতী মালতীমঞ্জরী দেবী প্রণম্য প্রিয়বর প্রাণেশ্বর নিবেদনঞ্চাদৌ মহাশয়ের শ্রীপদসরোরুহ স্মরণমাত্র অত্র শুভবিশেষ। পরং মহাশয় ধনাভিলাষে পরদেশে চিরকাল কাল যাপন করিতেছেন যে কালে এ দাসীর কালরূপ লগ্নে পাদক্ষেপ করিয়াছে, সে কাল হরণ করিয়া দ্বিতীয়কালের কালপ্রাপ্ত হইয়াছে, অতএব

পরকালে কালরূপকে কিছুকাল সান্ত্বনা করা দুই কালের সুখকর বিবেচনা করিবেন। * * * অতএব জাগ্রত নিদ্রিতার ন্যায় সংযোগ সঙ্কলন পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীচরণযুগলে স্থানং প্রদানং কুরু নিবেদনমিতি।"

স্বামীর উত্তর—"শিরোনামা প্রাণাধিকা স্বধর্ম্মপ্রতিপালিকা শ্রীমতী মালতীমঞ্জরী দেবী সাবিত্রীধর্ম্মাশ্রিতেষু।"

"পরম প্রণয়ার্ণব গভীর নীরতীরনিবসিত কলেবরাঙ্গসম্মিলিত নিতান্ত প্রণয়াশ্রিত শ্রীঅনঙ্গমোহন দেবশর্ম্মণঃ ঝটিত ঘটিত বাঞ্ছিতান্তঃকরণে বিজ্ঞাপনাকাদৌ শ্রীমতীর শ্রীকরকমলাঙ্কিত কমলপত্রী পঠিতমাত্র অত্র শুভম্বিশেষ। বহুদিবসাবধি প্রত্যাবিধি নিরবধি প্রয়াস প্রবাস নিবাস তাহাতে কর্ম্মফাঁস ব্যতিরিক্ত উত্তক্তান্তঃকরণে কালযাপন করিতেছি। অতএব মন নয়ন প্রার্থনা করে যে সর্ব্বদা একতা পূর্ব্বক অপূর্ব্ব সুখোদ্ভব মুখারবিন্দ যথাযোগ্য মধুকরের ন্যায় মধুমাসাদি আশাদি পরিপূর্ণ হয়। প্রয়াস মীমাংসা প্রণেতা শ্রীশ্রীঈশ্বরেচ্ছা শীতান্তে নিতান্ত সংযোগ পূর্ব্বক কালযাপন কর্ত্তব্য, বিত্তোপার্জ্জন তদর্থে তৎসম্বন্ধীয় কর্ত্তৃক দুঃখিতা এতাদৃশ উপার্জ্জনে প্রয়োজন নাই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছি। জ্ঞাপনামিতি।"

অনুপ্রাসের বিকৃতি।

অনুপ্রাস বাহুল্যহেতু প্রাচীন গদ্যলেখা স্থলে স্থলে ঢকানাদের ন্যায় শ্রুতিকটু ও প্রহেলিকার ন্যায় দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়িত, যথা—"রে পাষণ্ড ষণ্ড এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড কাণ্ড দেখিয়াও কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হইয়া বকাণ্ড প্রত্যাশার ন্যায় লণ্ডভণ্ড হইয়া ভণ্ড সন্ন্যাসীর ন্যায় ভক্তি-ভাণ্ড ভঞ্জন করিতেছ এবং গবাপণ্ডের ন্যায় গণ্ডে জন্মিয়া গণ্ডকীস্থ গণ্ডশিলার গণ্ড না বুঝিয়া গণ্ডগোল করিতেছ?" অনুপ্রাস এস্থলে ভাষার অলঙ্কার হয় নাই, গলগণ্ড স্বরূপ হইয়াছে। পূর্ব্বোদ্ধৃত রচনার পার্শ্বে "কোকিল কালালাপ বাচাল যে মলয়াচলানিল সে উচ্ছলচ্ছীকরাত্যচ্ছ নির্ঝরাম্ভঃকণাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে।" (প্রবোধ-চন্দ্রিকা) প্রভৃতি উৎকট গদ্য সন্নিবেশ করা যাইতে পারে।

প্রাচীন গদ্য লিখিবার রীতি।

প্রাচীন গদ্যের কয়েকটি বিশেষ প্রণালী ছিল, তাহা এস্থলে উল্লেখযোগ্য। অনেক স্থলে গদ্য-রচনার পূর্ব্বে "গদ্যছন্দ" এই কথাটি লিখিত দেখা যায়। পদ্য রচনার যেরূপ ভণিতা দেওয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল, গদ্য পুস্তকেও মধ্যে মধ্যে সেরূপ ভণিতা দৃষ্ট হয়, যথা কালীকৃষ্ণদাস রচিত 'কামিনীকুমারে'—"কালীকৃষ্ণ দাস বলে পশ্চাৎ রামবল্লভের এমনি কণ্ঠ হইল যে, কামিনীকে আর পষ্ট রামবল্লভ বলিতে হয় না, রাম বলিবা মাত্রেই রামবল্লভ তামাক সাজাইয়া মজুত।"

রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের কৃষ্ণচন্দ্রচরিতে দৃষ্ট হয়, এক একটি প্যারাগ্রাফের শেষে দুইটি দাঁড়ি (॥) প্রদত্ত হইয়াছে এবং অধ্যায়াংশের মধ্যবর্ত্তী রচনায় যে সকল স্থানে সম্পূর্ণ বিরামচিহ্ন দেওয়া আবশ্যক হইয়াছে, সেই সকল স্থানে এক একটি দাঁড়ি (।) প্রদত্ত হইতে দেখা যায়। প্রাচীন

গদ্য পুস্তকে অপ্রচলিত শব্দ

গদ্যরচনাগুলিতে ব্যবহৃত অনেক শব্দ যে এখন অপ্রচলিত কিম্বা ভিন্নার্থ-বোধক হইবে তাহা স্বাভাবিক। গদ্য পুস্তকে আমরা "সমাধান"—গুছান; "প্রকরণ"—কার্য্য, ঘটনা, "খোদিত"—বিমর্ষ—"সমভিব্যবহৃত"—সঙ্গযুক্ত; অন্তঃকরণে করা"—মনে করা প্রভৃতি ভাবের অর্থে ব্যবহৃত শব্দের প্রয়োগ দেখিয়াছি। "দিগের" এই বিভক্তিটির পূর্ব্বে

প্রায়ই একটি 'র' প্রযুক্ত হইত, যথা "লোকের-দিগের", "ভৃত্যের-দিগের" "পণ্ডিতের-দিগের"; এইরূপ প্রয়োগ রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলীতে এবং প্রাচীন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সমূহেও অনেক পাওয়া যাইবে। প্রাচীন পুঁথির বর্ণবিন্যাসগুলির অদৃষ্টপূর্ব্বরূপ পরিদর্শন করিয়া এখন আমাদের আর বিস্ময় হয় না, মনোনীত শব্দের স্থলে "মনোন্বিত", থাকিবে না—"থাকিবে না", কুটুম্ব—"কুতুম্ব", বটে—"ভটে", এক—"য়েক", প্রভৃতি অনেক স্থলে দেখিতে দেখিতে আমাদের চক্ষে সহিয়া গিয়াছে। 'কৃষ্ণচন্দ্রচরিতে' কোন বিশিষ্ট পণ্ডিতের কথা উল্লেখ করিবার সময় প্রায়ই "মহামহোপাধ্যায়" শব্দ ব্যবহৃত দৃষ্ট হয়। সুতরাং গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক এই উপাধি সৃষ্ট হইবার পূর্ব্বেও সাবেকী বাঙ্গালায় ইহার যথেষ্ট প্রচলন ছিল, স্বীকার করিতে হইবে। পূর্ব্বোদ্ধৃত শিশুবোধকের পত্র লিখিবার ধারা সংস্কৃত-বিদ্যাভিমানী বিকৃতমস্তিষ্কের রচনা,—সাধারণ কাজকর্ম্মের জন্য এরূপ পত্রাদি প্রচলিত ছিল না। হাল্‌হেড্ সাহেব তাঁহার বাঙ্গালা ব্যাকরণের ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—সমস্ত বঙ্গদেশে কারবারের জন্য বাঙ্গালা পত্রাদি সর্ব্বদা লিখিত হইত। এইরূপ পত্রাদিরচনায় বাঙ্গালা গদ্য নিত্য ব্যবহৃত হইত, সে সকল গদ্য সহজ ভাষা ও সরল কথায় লিখিত হইত।

প্রাচীনকালের পত্র লিখিবার প্রণালী দেখাইবার জন্য আমরা এই স্থলে দুইখানি পত্রের কতকাংশ উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। প্রথম পত্রাংশ ৺দুর্গাপ্রসাদ মিত্রের লেখা। ১৮২৪ খৃঃ অব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারী এই পত্র লিখিত হয়। * দ্বিতীয় পত্রখানি ড্রেক্ সাহেবের নিকট সিরাজউদ্দৌলা লিখিয়াছেন, উহা রাজীবলোচন যে ভাবে অনুবাদ করিয়াছিলেন, তাহাই প্রদত্ত হইল।

প্রথম পত্রাংশ—

"সেবকস্য প্রণামা নিবেদনঞ্চাগে মহাশয়ের শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে সেবকের মঙ্গল পরন্তু।—

সম্প্রতি একজন দেশস্থ লোক দ্বারা জানিলাম যে, মহাশয় পুনর্ব্বার সংসার করিবেন এমত অভিলাষ করিয়াছেন, এবং শ্রীযুক্ত রামগোপাল চক্রবর্ত্তী পাত্রী অন্বেষণ করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন। এ বিবরণ শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত মনস্তাপ পাইয়া যে প্রকার অন্তঃকরণে উদয় হইল, তাহা নিষ্কপটে নিবেদন করিতেছি। ইহাতে যদি কিছু অপরাধ হয়, তাহা ক্ষমা করিতে আজ্ঞা হইবেক।"

দ্বিতীয় পত্র।

"ভাই সাহেবের পত্র পাইয়া সকল সমাচার জ্ঞাত হইলাম আপনি অনেক অনেক শাস্ত্র মত লিখিয়াছেন, এবং পূর্ব্বে যেমন যেমন হইয়াছে তাহাও লিখিয়াছেন, এ সকলি প্রমাণ বটে কিন্তু সর্ব্বত্রেই রাজাদিগের এই পণ যে শরণাগত ত্যাগ

---

* লিপি সংগ্রহ। আমরা এই পত্র এবং পরবর্ত্তী পত্র খানিতে বিরাম-চিহ্ন প্রদান করিলাম, মূলে বিরাম-চিহ্ন ছিল না, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

করেন না, তাহার কারণ এই রাজা যদি শরণাগত ত্যাগ করেন তবে তাঁর রাজ্যের বাহুল্য হয় না, এবং পরাক্রমেরও ক্রটি হয়। আপনি রাজা নহেন, মহাজন, কেবল ব্যাপার বাণিজ্য করিবেন, ইহাতে রাজার ন্যায় ব্যবহার কেন? অতএব যদি রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাসকে শীঘ্র এখানে পাঠান তবে ভালই নতুবা আপনকার সহিত যুদ্ধ করিব॥ আপনি যুদ্ধসজ্জা করিবেন, কিন্তু যদি যুদ্ধ না করেন তবে পূর্ব্বের যে নিয়মিত রাজকর আছে এইক্ষণ তাহাই দিবেন, আমি আপন চাকরেরদিগকে আজ্ঞা করিয়া দিলাম এবং শ্রীযুক্ত কোম্পানির নামে যে ক্রয় বিক্রয় হইবেক তাহারি নিয়ম থাকিবেক, কিন্তু আর আর সাহেব লোকেরা বাণিজ্য করিতেছেন তাঁহারদিগের স্থানে অধিক রাজকর লইব অতএব আপনি বিবেচক, সৎপরামর্শ করিয়া পত্রের উত্তর লিখিবেন।"

শব্দের পরিবর্ত্তন ও অর্থান্তর গ্রহণ।

প্রায় শতাব্দী পূর্ব্বে যে সব শব্দ বঙ্গসাহিত্যে খুব প্রচলিত ছিল, তাহাদের কোন কোনটির ব্যবহার ক্রমে ক্রমে উঠিয়া যাইতেছে। পুছিল, পেখিল, মেনে, (এই শব্দটি চণ্ডীদাসের কবিতা হইতে আরম্ভ করিয়া রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র পর্য্যন্ত বহু কবির রচনায়ই পাওয়া যায়, শেষোক্ত কবিদ্বয়ের পুস্তকে ইহার বিশেষ ছড়াছড়ি, কিন্তু অনেক স্থলেই এই শব্দের কোন অর্থ দৃষ্ট হয় না,—পাদপূরণার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়) নেহারে, ঘরণী, দোঁহে, (দুইজন), আচম্বিত, এথায়, এবে, এড়িল, প্রভৃতি শব্দের গদ্য-সাহিত্যে এখন আর স্থান নাই, ইহাদের কোন কোনটির প্রভাব পদ্যসাহিত্যেও অস্তগামী।

সংস্কৃত শব্দের অর্থ কোন কোন স্থলে বাঙ্গালায় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সংস্কৃত "প্রীতি" শব্দ বলিতে যাহা বুঝায় বাঙ্গালা "পীরিত" শব্দে, বোধ হয়, তাহা বুঝায় না। সংস্কৃত 'রাগ' শব্দ বাঙ্গালায় সম্পূর্ণ ভিন্নার্থ গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু চৈতন্যপ্রভুর সময়েও রাগের অর্থ ক্রোধ ছিল না,—গোবিন্দ দাসের কড়চায় "রাগে ডগমগ প্রভু দেয় সন্তরণ। পাড়ে দাঁড়াইয়া দেখে যত ভক্তগণ"—অংশে রাগ শব্দ মূল অর্থবিচ্যুত হয় নাই, এখন 'রাগ' এবং 'অনুরাগ' বাঙ্গালায় দুই ভিন্নার্থবোধক শব্দ। ভর্ত্তা হইতে যে শব্দটি উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা বাঙ্গালায় কেবলমাত্র অর্থদুষ্ট হয় নাই, বোধ হয় একটু অশ্লীল হইয়াছে। ভাণ্ডারী নামে পরিচয় দিতে এক সময়ে মহারাজ দুর্য্যোধনও কুণ্ঠিত হন নাই, এখন ইহার অর্থ তদ্রূপ গৌরবজনক নহে। দেব শব্দ হইতে 'দে' শব্দ উৎপন্ন হইয়া এখন ইহা ভাষায় নিতান্ত নিগৃহীত হইয়াছে, একটু মর্য্যাদাবিশিষ্ট হইলে "দে" গণ 'দাস' আখ্যা গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হন। 'দেব'-গণের বংশধর 'দাস হইতেও হীন হইয়াছেন। মনুষ্যের ভাগ্যচক্রের ন্যায় শব্দগুলির ভাগ্যচক্রও পরিবর্ত্তনশীল বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। "মহোৎসব" শব্দের অর্থ বাঙ্গলায় সীমাবদ্ধ হইয়াছে; বৈষ্ণবগণ এই শব্দের অর্থ সঙ্কুচিত করিয়াছেন। মহোৎসবের ন্যায় বোধ হয় "সঙ্কীর্ত্তন" শব্দও তাঁহাদের দ্বারা সঙ্কুচিতার্থ হইয়াছে।

খেঁউর গান।

পূর্ব্বে যাত্রাওয়ালা ও কবিওয়ালাগণের বিষয় আমরা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করিয়াছি। "খেঁউড়" গানে গালাগালির চূড়ান্ত করা হইত। দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে নদে ও শান্তিপুর 'খেঁউড়' গানের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। বিদ্যা তাঁহার স্বামী সুন্দরকে বর্দ্ধমানে ভুলাইয়া রাখিবার জন্য তাঁহাকে প্রলোভন দেখাইতেছেন,—"নদে শান্তিপুরে হৈতে খেঁড়ু আনাইব। নূতন নূতন ঠাটে খেঁড়ু শুনাইব।"—(ভা, বি)।

শিল্প ও বাণিজ্য।

কৃষ্ণনগরের পুতুল ও শান্তিপুরের ধুতির বিষয়ও ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। আমরা জয়নারায়ণের কাশীখণ্ডের পরিশিষ্টে দেখিতে পাইয়াছি, নবদ্বীপের কারিকরগণ পাথরের মূর্ত্তি গড়িতে বিশেষ পটু ছিল, কাশীধামেও তাহাদের আদর ও প্রতিপত্তি ছিল। ভক্তিরত্নাকরে আমরা হালিসহরনিবাসী নয়নভাস্কর নামক জনৈক প্রসিদ্ধ ভাস্করের উল্লেখ পাইয়াছি—("নয়ন ভাস্কর হালিসহর গ্রামে ছিল"—ভক্তিরত্নাকর, ১০ তরঙ্গ)। জয়নারায়ণ সেনের চণ্ডীতে দৃষ্ট হয়, বঙ্গদেশে শ্রীহট্টের ঢাল, লাহোরী কামান, কাশ্মীরী কুঙ্কুম, মুলতানের হিঙ্গ, চিনের পুতুল ও দক্ষিণ দেশের গুবাক, বিশেষরূপ আদৃত ছিল। এতদ্ব্যতীত "কাশ্মীর দেশের ভাল শাল গঙ্গাজলি" উক্ত পুস্তকে বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। দেশীয় বণিকগণ বাণিজ্য করিয়া বিপুল ধনোপার্জ্জন করিতেন; শ্রীপতি, লক্ষপতি, ধনপতি,—প্রভৃতি নাম ধনের মর্য্যাদাব্যঞ্জক। রাজপুত্র কি সদাগরের পুত্রকে নায়করূপে বরণ করিয়া নিত্য নব উপাখ্যানের সৃষ্টি করা হইত,—আমরা শৈশবকালে সেই সব উপাখ্যান শুনিয়া রাজপুত্র এবং সদাগরের পুত্র উভয়কে প্রায় তুল্যরূপ সম্মানীয়ই জ্ঞান করিতাম। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্য চণ্ডী ও মনসার গীতের নায়ক-নায়িকা—সদাগর-কুলোদ্ভব। এখন বণিকসম্প্রদায় য়ুরোপে সম্মানিত, আমাদের দেশে নিগ্রহভাজন।

স্ত্রীশিক্ষা।

অন্তঃপুরশিক্ষার প্রবাহ স্তিমিত ছিল বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। আনন্দময়ী দেবীর যেরূপ রচনা-পারিপাট্যের উদাহরণ দেওয়া গিয়াছে, তাহাতে তাঁহাকে আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারিণী শিক্ষিতা মহিলাদিগের অন্ততঃ সমকক্ষ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। অধ্যায়ভাগে আমরা যজ্ঞেশ্বরী নাম্নী এক রমণীর রচিত গানের কতকাংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি। বিক্রমপুর অঞ্চলে লালা জয়নারায়ণের ভগিনী গঙ্গামণি দেবী এক শতাব্দী পূর্ব্বে অনেক গান রচনা করিয়াছিলেন, তাহার কতকগুলি এখনও তদ্দেশে বিবাহোপ-লক্ষে গীত হইয়া থাকে। এক শত বৎসর পূর্ব্বে ফরিদপুর-নিবাসিনী সুন্দরী দেবী নাম্নী ব্রাহ্মণ রমণী ন্যায়শাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। রেভারেণ্ড জে, লং সাহেবের বাঙ্গালা পুস্তকের তালিকায় এই রমণীর নাম উল্লিখিত দৃষ্ট হয়। ইহা ছাড়া হটি বিদ্যালঙ্কার এবং কৈবর্ত্তের ব্রাহ্মণ চণ্ডীচরণের কন্যা দ্রবময়ী দেবী সংস্কৃতের বহু বিভাগে এরূপ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, যে ইহাঁরা

পণ্ডিত সমাজে অধ্যাপকের বিদায় পাইতেন। সংবাদ—প্রভাকর প্রভৃতি পত্রিকায় ইঁহাদের কথা উল্লিখিত আছে। ইহঁারা প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন।

যখন রমণীমহলে লেখাপড়ার এতদূর চর্চ্চা হইতেছিল, তখন পুরুষগণের অনেকেই যে সরস্বতীর বরপুত্র হইতে লালায়িত হইবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি! বাঙ্গালা ভাষায় ফারশী ও সংস্কৃত এই দুই ভাষা মাঝে মাঝে মিশিয়া গিয়াছিল। আমরা রামপ্রসাদের কবিতায় সংস্কৃতের সঙ্গে বাঙ্গালার সংযোগ চেষ্টা দেখাইয়াছি। সলিলে তৈলবিন্দুর মত উক্ত কবির কাব্যে এই দুই উপাদান ভালরূপ মিশ্রিত হয় নাই। ভারতচন্দ্র, কবি আলাওল প্রভৃতি এই বিষয়ে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন; ভারতচন্দ্র একস্থলে লিখিয়াছেন, "মানসিংহ পাতসায় হইল যে বাণী। উচিত যে পারশী, আরবী, হিন্দুস্থানী॥ পড়িয়াছি সেইমত বলিবারে পারি। কিন্তু সে সকল লোক বুঝিবারে ভারি॥ না রবে প্রসাদ গুণ না হবে রসাল। অতএব কহি ভাষা যবনী মিশাল॥" কেবল যবনীমিশ্রিত ভাষা ব্যবহার করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই। স্থলে স্থলে বিদ্যার দৌড় দেখাইতে যাইয়া সংস্কৃত, ফারশী, বাঙ্গালা, হিন্দী এই চতুর্বিধ উপকরণে এক বীভৎস অবয়বের ভাষা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা যজ্ঞান্তে পুনর্জীবিত দক্ষমূর্ত্তির ন্যায় উৎকট *—যথা, "শ্যাম হিত প্রাণেশ্বর, বারদকে গোয়দ রুবর, কাতর দেখে আদর কর, কাহে মররো রোয়কে। বক্তুং বেদং চন্দ্রমা, চু' লালা চে রেমা, ক্রোধিত পর দেও ক্ষমা মেটিমে কাহে শোয়কে।"

এই সময় বহ্বাড়ম্বরময় শিক্ষা প্রদর্শনের চেষ্টায় নিমন্ত্রিত সভাগৃহ আন্দোলিত হইত। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ কি ভাবে বিচার করিতেন জয়নারায়ণ সেন তাঁহার চণ্ডীকাব্যে তাহা অতি সুচারুভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা সেই অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। পাঠক ইহাতে সে সময়ে কি কি পুস্তক পঠিত হইত, তাহারও একটা তালিকা দেখিতে পাইবেন।

"ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণে, পাইয়া পত্র নিমন্ত্রণে, উপনীত সভা আরোহণে। কেবল অধিষ্ঠানমাত্র, দান নিতে নহে পাত্র, ধর্ম্ম সংস্থাপন কারণে। তেজপুঞ্জ রবিকিরণ, শুক্লবর্ণ সুবসন, ভালেতে গঙ্গা-মৃত্তিকা-ফোঁটা॥ শুক্ল যজ্ঞোপবীতে, রক্তজোট আসনেতে, বসিতেছি বিচারের ঘটা॥ অনুমান প্রত্যক্ষেতে, পরস্পর সম্বন্ধেতে, তার্কিক ঘটায় নানাতর্ক। প্রমাণ কুসুমাঞ্জলী, নানামতে ব্রহ্মবলি, একে আর ঘটায় সম্পর্ক। পদ পদার্থ বিচারেতে, এক দণ্ড সমাসেতে কায় কত নিন্দিত ঘটাইয়া। বৈয়াকরণিয়া সবে, বিচার করুণ রবে, গোপীনাথ পরিশিষ্ট লইয়া॥ মধুর বাক্যের বাণী, অলঙ্কার শুনি ধ্বনি, একদিকে কহিছে রসেতে। ধ্বনি বাক্য কয়ে কয়ে, ব্যঞ্জনাদিক লয়ে কাব্যপ্রকাশক উদাহরণেতে॥ নানা ছন্দে শ্লোক পাঠ, সাহিত্যে বিচার ঠাট, কত মত বর্ণনা ভাবের। রসিক বিবুধগণে, মধ্যস্থ পণ্ডিত মানে, রঘু, ভট্টি মাঘ, নৈষধের। পৌরাণিক পণ্ডিতে, নানামত প্রসঙ্গেতে, বিচার করিছে ভাবি মনে। বশিষ্ঠাদি বেদ জানে, শুনক ভাবগণে অস্তপ্রত্যন্তর লিখি। দশা বিদশা বসতি, জানায় সাধু প্রতি সূর্য্যসিদ্ধান্তের মত দেখি। সকলেতে

* ১৭৭৮ খৃঃ অব্দে বিরচিত বাঙ্গালা ব্যাকরণের ভূমিকায় গ্রন্থকার হালহেড সাহেব লিখিয়াছিলেন—'At present those persons are thought to speak this compound idiom with the most elegance who mix with pure Indian verbs the greatest number of Persian and Arabic nouns."

ব্রহ্মময়, বেদান্তে এমত কয়, পাপ-পুণ্যালয় নিরঞ্জন। শত্রু মিত্র ময় তিনি, জ্ঞানভেদে ভিন্ন মানি, শঙ্করার্য্যের এ লিখন॥ পড়িলে বিপত্তিকালে, দোষ যদি ঘটে বলে ধর্ম্মশাস্ত্র মতে পাপ নহে। স্মৃতিশাস্ত্রে লেখা এই, শূলপাণি মত এই, মুক্তকণ্ঠ হৈয়া মনু কহে॥"

পণ্ডিতগণ পরকালের তত্ত্ব নিরূপণ করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহারা দান গ্রহণ করিতেন না রাজপুত্রগণ এক হস্তে শুক পক্ষী ও অপর হস্তে রসকথাপূর্ণ কাব্য লইয়া বিলাস-কলায় দীক্ষিত হইতেছিলেন,—এই সময় ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ নবভাবে গঠিত হইতেছিল; তাঁহাদের শাস্ত্রকথা ও রসকথাও যে হঠাৎ প্রবল এক রাজনৈতিক ঝাপ্টা বাতাসে থামিয়া পড়িবে, ইহা তাঁহারা মনে করেন নাই।

এই স্থলে আমরা সংক্ষেপে বঙ্গীয় প্রাচীন মুদ্রা-যন্ত্রের একটি ইতিহাস প্রদান করিব। বাঙ্গলার প্রাচীন পুথিতে আমরা মুদ্রিত লিপির নমুনা পাইয়াছি। প্রায় দুই শত বৎসরের প্রাচীন একখানি বাঙ্গালা পুথিতে কাঠের উপর ক্ষোদিত লিপির সাহায্যে কাগজে মুদ্রিত লিপির নমুনা দেখিয়াছি। তদ্দ্বারা মনে হয় সাধারণের মধ্যে মুদ্রিত লিপির প্রচলন না থাকিলেও ব্যক্তিবিশেষের চেষ্টায় সেইরূপ মুদ্রণকার্য্য মধ্যে মধ্যে হইত। উহা অবশ্যই নিষ্কর্ম্মা লিপিকরের স্বীয় চিত্তবিনোদনের জন্যই সম্পাদিত হইত। সাহেবেরাই আমাদের এ বিষয়ে গুরু। ঢাকার অন্তঃপাতি ভাওয়াল নামক স্থানের ভাষায় বিরচিত বাইবেলের খানিকটা অনুবাদ লিবসন নগরে ১৭৪৩ খৃঃ অব্দে মুদ্রিত হয়, ঐ পুস্তকে যে ভূমিকা দৃষ্ট হয় তাহা ১৭৩৪ খৃঃ অব্দে লিখিত। লিসবনের বাঙ্গলা মুদ্রা-যন্ত্র যে এক-খানি বই ছাপাইয়া ক্ষান্ত হইয়াছিল, এমন বোধ হয় না। কিন্তু আপাততঃ এই একখানি পুস্তকেই পাওয়া যাইতেছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর উইলকিন্স্ সাহেব ১৭৭৮ খৃঃ অব্দে হুগলীতে একটি বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন, পঞ্চানন কর্ম্মকার এই মুদ্রাযন্ত্রের অক্ষর খোদাই করিয়াছিলেন। এই মুদ্রাযন্ত্রে সার ইলাইজা ইম্পের আইনের বঙ্গানুবাদ ও হ্যাল্‌হেডের বাঙ্গলা ব্যাকরণ মুদ্রিত হয়। কিন্তু হুগলীপ্রেস অচিরে বিলুপ্ত হয়; এবং শ্রীরামপুরের পাদ্রী কেরি সাহেব পঞ্চাননকে ধরিয়া পুনরায় বাঙ্গলা অক্ষর ঢালাই করিয়া ১৭৯৯ খৃঃ অব্দের জুলাই মাসে বাইবেলের বাঙ্গলা অনুবাদ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। এই মুদ্রাযন্ত্র হইতে ১৮০০ খৃঃ অব্দে রামবসুর প্রতাপাদিত্যচরিত, এবং হিন্দু আচার ব্যবহার সম্বন্ধে উক্ত লেখকের নিন্দাবাদপূর্ণ এক পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। রামবসু তদীয় বন্ধু রাজা রামমোহন রায়কে প্রতাপাদিত্যচরিতের পাণ্ডুলিপি দেখাইয়াছিলেন এবং উক্ত রাজা কর্ত্তৃক সেই পুস্তক পরিশোধিত হইয়াছিল। রামবসু নানা ভাষায়

বাঙ্গলা প্রাচীন মুদ্রাযন্ত্র।

১৭৩৪ খৃঃ।

১৭৭৮ খৃঃ।

১৭৯৯ খৃঃ।

সুপণ্ডিত ছিলেন, কেরি সাহেব ইঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন "রামবসুর অপেক্ষা অধিকতর বিদ্যানুরাগী পণ্ডিত আমি দেখি নাই" কেরী সাহেব ইঁহার নানা গুণের প্রশংসা করিয়া ইহাও লিখিয়াছেন—"ইঁহার ব্যবহার সৌজন্যপূর্ণ এবং ইঁহার সততা সর্ব্ববাদিসম্মত, কিন্তু কেহ অপকার করিলে ইনি তাহা জীবনে ভুলিতেন না। চিরকাল তাহার শত্রু হইয়া থাকিতেন।" কেরি সাহেবের মুদ্রাযন্ত্র হইতে রামবসুর আরও একখানি প্রসিদ্ধ পুস্তক প্রকাশিত হয়, তাহা তৎকৃত "লিপিমালা।" এই মুদ্রাযন্ত্র হইতে ১৮০১ খৃষ্টাব্দে কেরীর "কথোপকথন", ১৮০২ খৃঃ অব্দে গোলকনাথের "হিতোপদেশ", ১৮১২ খৃঃ অব্দে কেরি কৃত "ইতিহাসমালা" প্রভৃতি নানা গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত গ্রন্থখানি ১৮১৩ খৃঃ অব্দে প্রকাশিত হয়, এই পুস্তক মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মার "প্রবোধচন্দ্রিকা।" মৃত্যুঞ্জয় সম্বন্ধে মার্সমান সাহেব তৎকৃত শ্রীরামপুরের ইতিহাসে লিখিয়াছেন :—"ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন মৃত্যুঞ্জয়। ইঁহার বাড়ী উড়িষ্যায় ছিল (মেদিনীপুর তখন উড়িষ্যার অন্তর্গত ছিল) এবং ইনি বিদ্যার জাহাজ * স্বরূপ ছিলেন। ইনি ইঁহার অসামান্য বিদ্যাবত্তায় ও সিদ্ধান্তসমূহের সারবত্তায় ডাক্তার জনসনের সঙ্গেই তুলিত হইতে পারেন, এবং সেই প্রসিদ্ধ অভিধান-কারের মতই ইনি স্থূলদেহ এবং কদাকার ছিলেন। তাঁহার মত সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি আর কাহারও ছিল না এবং তাঁহার বঙ্গভাষায় রচিত পুস্তক কোন অংশে অপর কাহারও রচনা অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিল না। কেরি সাহেব ইঁহারই নিকট বাঙ্গালা শিখিয়া এত শীঘ্র শীঘ্র বাঙ্গালা রচনায় সুদক্ষ হইয়াছিলেন।" শ্রীরামপুর-কলেজে কেরি ও বঙ্গভাষায় ব্যবহার-শাস্ত্রের গদ্যানুবাদ-প্রণেতা পণ্ডিত লক্ষ্মীনারায়ণের একখানি ছবি আছে।

পঞ্চানন কর্ম্মকার বয়সে প্রাচীন হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহার সুযোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র মনোহর কর্ম্মকার অক্ষর ঢালাই কার্য্যে অতঃপর তৎস্থলে সম্পূর্ণরূপে অভিষিক্ত হইলেন।

১৮২৯ খৃঃ।

১৮২৯ খৃঃ অব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাঙ্গলা অক্ষরগুলি দেখিতে খুব সুন্দর ছিল না, মাত্রার সমতা ছিল না এবং যুক্তাক্ষরগুলি ছত্রের মধ্যে বিসদৃশ হইয়া থাকিত, রেফ ও ঊর্দ্ধ রেখাগুলির পরিমাণে সামঞ্জস্য ছিল না। কিন্তু ১৮২৯ খৃঃ অব্দের পর—মনোহরের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণের পর, বঙ্গাক্ষরের এক নব যুগ প্রবর্ত্তিত হয়। সেই সময় হইতে বাঙ্গলা অক্ষর মূলতঃ ঠিক আধুনিক আকারে পরিণত হইয়াছে। ১৮২৯ খৃঃ অব্দের পর ক্রমশঃ অনেকগুলি বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্রের আবির্ভাব হয়, তৎসম্বন্ধে এখানে আলোচনার স্থানাভাব। এই যুগের সাহিত্য এবং যুগ-প্রবর্ত্তক কেরি সাহেব ও তাহার সহকর্ম্মীদের সম্বন্ধে অপরাপর তথ্য যাঁহারা জানিতে ইচ্ছুক তাঁহারা মৎপ্রণীত ইংরেজী

* মূলে "কলোসাস্" শব্দ আছে, বাঙ্গলায় ঐ শব্দের প্রতিশব্দ দিলে ভালরূপ অর্থবোধ হইবে না, এই জন্য তৎস্থলে আমাদের দেশে প্রচলিত ঐ ভাবের অর্থ জ্ঞাপক একটি সহজ-বোধ্য শব্দ দিলাম।

"History of Bengali Language and Literature" এবং বঙ্গসাহিত্যপরিচয় প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাঠ করুন। এই পুস্তকের পরিশিষ্ট স্বরূপ লং সাহেবের ক্যাটালোগ মুদ্রিত হইল। তাহাতে ১৮০০ হইতে ১৮৫০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত সমস্ত বাঙ্গলা পুস্তকের তত্ত্ববহুল বিবরণী দেওয়া হইয়াছে। এই ক্যাটালোগ খানি এ যুগের বঙ্গ সাহিত্যের সর্ব্বপ্রধান আলোকবর্ত্তিকা। মৎপ্রণীত "Bengali Prose Style" পুস্তকেও এই সময়ের গদ্য সাহিত্যের অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় প্রদত্ত হইয়াছে। সম্প্রতি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে মহাশয় ১৮০০ ১৮২৫ খৃঃ পর্য্যন্ত (২৫ বৎসরের) বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস-সম্বলিত একখানি ৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ইংরেজী পুস্তক রচনা করিয়াছেন। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন এবং প্রিয়রঞ্জন সেনও বঙ্গীয় গদ্য সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন। প্রিয়রঞ্জনের পুস্তকখানি বিশেষ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতেছে।

নবভাবের সূচনা।

ইংরেজ-আগমনের সঙ্গে বাঙ্গলাদেশের সামাজিক জীবনে, রাজনৈতিক জীবনে, এবং পারিবারিক জীবনে নূতন চিন্তার স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে; নূতন আদর্শ, নূতন উন্নতি ও নূতন আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সমগ্র জাতি অভ্যুত্থান করিয়াছে। সাহিত্যে এই নবভাবের ফলে গদ্যসাহিত্যের অপূর্ব্ব শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে। বাঙ্গালী এখন বাঙ্গালা ভাষাকে মান্য করিতে শিখিতেছে, ইহা ভাবী শুভযুগের পূর্ব্বলক্ষণ। ক্রীড়াশীল শিশু যেরূপ সমুদ্রতীরে খেলা করিতে করিতে একান্ত মনে গভীর উর্ম্মিরাশির অস্ফুট ধ্বনি শুনিয়া চমৎকিত হয়, এই ক্ষুদ্র পুস্তক প্রসঙ্গে ব্যাপৃত থাকিয়া আমিও সেইরূপ বঙ্গসাহিত্যে অদূরবর্ত্তী উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির কথা কল্পনা করিয়া প্রীত ও বিস্মিত হইয়াছি। অর্দ্ধ শতাব্দীতে বঙ্গীয় গদ্য যেরূপ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে কাহার মনে ভাবী উন্নতির উচ্চ আশা অঙ্কিত না হয়! আমার ভগ্নস্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইলে ভবিষ্যতে নবভাবে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত, নব-আশা দৃপ্ত বঙ্গ-সাহিত্যের উন্নতিশীল চিত্র আঁকিয়া দেখাইব, আশা রহিল।

বঙ্গসাহিত্যের আদিস্থান

উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গই বঙ্গসাহিত্যের আদি তীর্থ। আমরা প্রাচীনতম মহাভারত (সঞ্জয় ও কবীন্দ্র পরমেশ্বর বিরচিত) পূর্ব্ববঙ্গ হইতে পাইয়াছি,—তাঁহাদের পরে ষষ্ঠীবর গঙ্গাদাস, রাজেন্দ্র দাস, রামেশ্বর নন্দী প্রভৃতি এক গোষ্ঠী ষোড়শ শতাব্দীর ভারতের অনুবাদকের গ্রন্থও পূর্ব্ববঙ্গেই পাওয়া গিয়াছে—ইঁহাদের অধিকাংশেরই পরে নিত্যানন্দ ঘোষ ও কাশীরাম দাস রাঢ় অঞ্চলে প্রাদুর্ভূত হন, কিন্তু দীপ জ্বালাইয়া বহুকাল এদেশ আলোকিত করিয়া রাখিয়াছিল—পূর্ব্ববঙ্গ। রামায়ণের অনুবাদক কৃত্তিবাসের বাড়ী ফুলিয়া, এই গ্রাম নদীয়া জেলায়, কিন্তু সে সময়ে ইহা পূর্ব্ববঙ্গের অন্তর্গত ছিল, কৃত্তিবাসের শিক্ষা দীক্ষা সমস্তই পূর্ব্ববঙ্গে হইয়াছিল, তাঁহার গুরুর নিবাস ছিল বড় গঙ্গার

পাড়ে—অর্থাৎ পদ্মার তীরে এবং তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা পূর্ব্ববঙ্গ হইতেই আসিয়াছিলেন। কিন্তু কৃত্তিবাসের পরে বহু সংখ্যক পূর্ব্ববঙ্গের কবি রামায়ণের অনুবাদ করেন, তন্মধ্যে ষষ্ঠীবর, গঙ্গাদাস, ভবানী দাস, শিবচন্দ্র সেন, চন্দ্রাবতী প্রভৃতি কবি শ্রেষ্ঠ। চন্দ্রাবতীর রামায়ণ সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করিয়াছেন। অবশ্য পূর্ব্ববঙ্গ হইতে যে আলো সঞ্চারিত হইয়াছিল, তাহা সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাঢ়ে প্রবেশ করিয়া তদ্দেশে কিরণ বিকীর্ণ করিয়াছিল; সপ্তদশ শতাব্দীতে বুদ্ধের অবতার রামানন্দ ঘোষ, রামরসায়ণ প্রণেতা রঘুনন্দন এবং আরো পরে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রাঢ় হইতে রামমোহন তাঁহাদের সুললিত রাম-চরিত আমাদিগকে দান করিয়াছেন।

কিন্তু মনসা দেবীর নামাঙ্কিত সাহিত্যের প্রায় সমস্তটাই পূর্ব্ববঙ্গের নিজস্ব। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কাণা হরিদত্ত মনসামঙ্গল রচনা করেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে নারায়ণ দেব, বিজয় গুপ্ত সমস্ত পূর্ব্ববঙ্গে রাজকীয় সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহার কিছু পরে বংশীদাস ও তাঁহার বিদুষী হতভাগিনী কন্যা চন্দ্রাবতী মনসামঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন (১৫৭৫ খৃঃ) ষোড়শ শতাব্দীতে ষষ্ঠীবর, গঙ্গাদাস, রায় বিনোদ, বৈদ্যজগন্নাথ, জীবন মৈত্রেয় (রাজসাহীবাসী) প্রভৃতি শত শত কবি মনসা-মঙ্গল রচনা করিয়া প্রতিষ্ঠা পাইয়া ছিলেন,—প্রায় প্রতিবৎসরই পূর্ব্ববঙ্গ হইতে মনসা-মঙ্গলের প্রাচীন কবি আবিষ্কৃত হইতেছেন। পশ্চিমবঙ্গে সপ্তদশ শতাব্দীতে একমাত্র কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ ঘিয়ের বাতি জ্বালাইয়া রাখিয়াছেন। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আদি কবি কমললোচন ও জনার্দ্দন প্রায় কাণা হরিদত্তের সমকালীন কবি। কবিকঙ্কণের কিছু পূর্ব্বে মাধবাচার্য্য চণ্ডীমঙ্গল রচনা করেন, তাহা পূর্ব্ববঙ্গের নিজস্ব বলা যাইতে পারে, যদিও কবির বাসস্থান ত্রিবেণীর তীর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। তখনও পশ্চিমবঙ্গে "চণ্ডীপূজা" পূর্ব্ববঙ্গের ন্যায় ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয় নাই।

আলো-মণ্ডলের কেন্দ্রবর্ত্তী সূর্য্য, আলোর আদি খুঁজিতে গেলে যেরূপ পূর্ব্বদিকেই মুখ ফিরাইতে হয়, বঙ্গ-সাহিত্যের আদি খুঁজিতে সেইরূপ পূর্ব্ববঙ্গেই আমাদিগকে লক্ষ্য করিতে হইবে। পূর্ব্ববঙ্গের পালা গান, এখন জগৎ-প্রসিদ্ধ, কবিত্বেও সাহিত্যিক আদর্শ গঠনে পূর্ব্ববঙ্গের কৃতিত্ব এই সকল পল্লীগীতিকায় বিশেষভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। উত্তরবঙ্গে অষ্টম নবম শতাব্দী হইতে পাল-রাজাদের মহিমা জ্ঞাপক গীতি প্রচলিত ছিল, অনেক তাম্রশাসনে তাহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ত্রিপুরা, কোচ-বিহার প্রভৃতি অঞ্চলে ও রাজন্যবর্গের গীতি এক সময় প্রজাপুঞ্জের অবকাশ-রঞ্জনের অবলম্বন ছিল। এখনও পূর্ব্ববঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে শত শত লোক দল বদ্ধভাবে প্রাচীন গান গাহিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিয়া থাকে।

চৈতন্যদেব বঙ্গদেশেরই লোক, তাহার পিতামাতা শ্রীহট্টবাসী; তাঁহার ভক্ত বৃন্দ, মুরারি গুপ্ত শ্রীবাস শ্রীরাম পণ্ডিত, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি অনেকেই শ্রীহট্ট বাসী। তাঁহার ভক্তাগ্রগণ্য পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি

(যাঁহাকে তিনি পিতা বলিয়া সম্বোধন করিতেন), চৈতনবল্লভ দত্ত ও বাসুদেব দত্ত—চট্টল বাসী। যশোহরে হরিদাসের জন্ম। সুতরাং চৈতন্যদেব স্বয়ং শ্রীহট্টের লোক, তাঁহার মাতৃকুল ও পিতৃকুল উভয়ই শ্রীহট্ট বাসী, এবং শ্রীহট্ট, চট্টল প্রভৃতি বঙ্গদেশের একগোষ্ঠী লোক লইয়া তিনি ভক্তি ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। অদ্বৈতাচার্য্য নিজে শ্রীহট্টের লাউড় নগর বাসী।

দুর্ভাগ্যের বিষয় তাঁহার ভক্তবৃন্দ লৌকিক গানগুলির প্রতি বিরূপ হইলেন। মনসা-মঙ্গল, চণ্ডী-মঙ্গল প্রভৃতির প্রতি বৃন্দাবন দাস তাহার ভাগবতে তীব্র কটাক্ষপাত করিলেন; সেই হইতে লৌকিক গানগুলি বঙ্গদেশে নিবিয়া গেল। মহাপ্রভুর কৃপাকটাক্ষ লাভ করিয়া মিথিলার কবি বিদ্যাপতি ও বীরভূমের চণ্ডীদাস নবশক্তি লাভ করিয়া রাঢ়ে বঙ্গে প্রতিষ্ঠা পাইলেন। পূবের আলো নিবিয়া গেল, তদবধি পশ্চিম দিগ্বলয় নবরাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিল।

হিমালয় যেদিন সমুদ্রগর্ভ হইতে শির উত্তোলন করিয়াছিল, সেদিন শত শত নদ নদী তাহার অঙ্ক হইতে অবতরণ করিয়া আর্য্যাবর্ত্ত সবুজ শস্যের আভরণে ভূষিত করিয়াছিল, কিন্তু ভারতবর্ষের সঙ্গে চীন সাম্রাজ্য, তাতার ও তুর্কিস্থানের যে নিবিড় সম্বন্ধ ছিল, সেই সম্বন্ধ তখন হইতে টুটিয়া গেল। মহাপ্রভুর অভ্যুদয়ে পূর্ব্ববঙ্গের মঙ্গল ও গীতি সাহিত্যের শুভদিন অন্তর্হিত হইল—পূর্ব্ব হইতে মুখ ফিরাইয়া এদেশ পশ্চিমাগত খোল ও করতাল বাদ্যে আকৃষ্ট হইয়া ভক্তিবন্যায় ঝাঁপাইয়া পড়িল। মহাপ্রভুর পিতৃভূমি শ্রীহট্ট, জন্মভূমি নবদ্বীপ ও পূর্ব্বপুরুষের নিবাস কটক জাজপুর,—সুতরাং তিনি বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যাকে তাঁহার স্বর্গীয় সুরে আকৃষ্ট করিলেন। বঙ্গসাহিত্যের এই ব্যাপক প্রসার ও ব্যাপক সাহিত্যের গৌরব আমরা করিতে পারিতাম না, যদি শুধু পশ্চিম বঙ্গ ইহাদের লীলাভূমি হইত।

পরিশিষ্ট

বঙ্গদেশে সম্প্রতি যে অপূর্ব্ব কবিত্বখনি পল্লীগাথায় আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে এ দেশ ভাবজগতে দ্বিতীয় গোলকুণ্ডার স্থান অধিকার করিবে। য়ুরোপের মণীষিবৃন্দ বঙ্গীয় অশিক্ষিত কৃষকের সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ এবং কবিত্বের মাদকতায় মুগ্ধ হইয়াছেন। জগতের আর কোন দেশের কৃষক কবি এরূপ উচ্চাঙ্গের কাব্য-শিল্পের পরিচয় দিতে পারিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না।

এই পল্লী-গীতিকাগুলির মধ্যে "মহুয়া" "মলুব মা" ও "ধোপার পাট" "কাজলরেখা," "শ্যামরায়" প্রভৃতি কয়েকটি এমন পালা-গান আছে, যাহা চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। সেগুলির মধ্যে এরূপ লক্ষণ আছে—যাহা চণ্ডীদাসের যুগচিহ্নাঙ্কিত।

কিন্তু পল্লীগীতিকায় বৈষ্ণবপ্রভাব আদৌ নাই। তাহাতে চূড়ান্ত প্রেমের কথা আছে—কিন্তু প্রেমের আধ্যাত্মিকতা নাই। দুশ্চর তপস্যা আছে—কিন্তু তুলসী বা বিল্বপত্রের অর্ঘ্য নাই। এক কথায় সেখানে পার্থিব প্রেম শতদলের মত মনোলোভা হইয়া বিকাশ পাইয়াছে, কিন্তু তাহা স্বর্গের পারিজাত কুসুম হইয়া ফোটে নাই। পল্লীগীতিকার প্রেম বিরাট আকাশের নীচে, নীলবনান্ত প্রদেশে, রক্তপুষ্পরঞ্জিত বনবীথিতে কংস, ধনু প্রভৃতি প্রবল নদ-সৈকতে স্বাধীন ভাবে বিকশিত হইয়াছে—কিন্তু তাহা মন্দির জুড়িয়া বসে নাই। এই প্রেম নর-নারীর প্রেম, ইহা উপাস্য-উপাসকের সাধনা নহে। তথাপি এই প্রেম স্বর্গের অতি সন্নিহিত—ইহাতে যেটুকু বাকী ছিল, বৈষ্ণবেরা তাহা পূরণ করিয়াছেন।

বৈষ্ণব কবিতার ললিতছন্দ, অপূর্ব্ব শব্দমাধুর্য্য, শিল্পীর কৌশলযুক্ত গাথুনি—প্রভৃতি শিক্ষালব্ধগুণ নিরক্ষর পল্লীকবি কোথায় পাইবে? পল্লীকবির ভাষা অমার্জ্জিত—কিন্তু অতি সরল, তাহার ছন্দহীন রচনা কবিত্বে ভরপুর। এই সকল নিরক্ষর কবি—অভিমানের পাদপীঠে বসিয়া—আড়ম্বরপূর্ণ বক্তৃতায় নিজেদের কথাই—সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা—জগজ্জয়ী কথা—বলিয়া ঘোষণা করে নাই। নিজের শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা তাহাদের অণুমাত্র ছিল না। তাহারা যে সকল দৃশ্য আঁকিয়াছে—তাহাতে তুচ্ছ করিবার কিছু নাই। তাহা বাঙ্গালী জাতিকে যত বড় করিয়া দেখাইয়াছে তদ্রূপ বড় করিবার সম্পদ বাঙ্গলার হাটে পথে পড়িয়া নাই। এই গীতিগুলি বাঙ্গালী জাতির চির-গৌরব। ইহাতে বাঙ্গলা দেশের যে পরিচয় আছে, সেরূপ পরিচয় আর কিছুতে নাই।

কতকগুলি পালা গানের কথার সঙ্গে চণ্ডীদাস প্রভৃতি পদাবলীর শব্দসম্পদের আশ্চর্য্য রকমের

মিল আছে। যথা :—ধোপার পাটে (১২।৩০) "জিহ্বার সঙ্গেতে দাঁতের পীরিতি আর ছলাতে কাটে" চণ্ডীদাসের "জিহ্বার সঙ্গেতে দাঁতের পীরিতি সময় পাইলে কাটে"—এ দুই একবারে অনুরূপ। ধোপার পাটের "তোমার চরণে আমার শতেক পরণাম" (২৪ তাঃ) চণ্ডীদাসের "তোমার চরণে বঁধু শতেক পরণাম। তোমার চরণে বঁধু লিখ আমার নাম" এ উভয়ও আক্ষরিক ভাবে মিলিয়া যাইতেছে। ঐ পালাগানটির "ঘর কইলাম বাহির রে বন্ধু পর কইলাম আপন" (২।৪) চণ্ডীদাসের "ঘর করলাম বাহির, বাহির কৈলাম ঘর। পর করলাম আপন আপন কৈনু পর।" এবং ধোপার পাটের "কাট্যা গ্যাছে কাল মেঘ চাঁদের উদয়। এই পথে যাইতে গেলে কুলমানের ভয়॥" এবং চণ্ডীদাসের "কহিও বঁধুরে সখি কহিও বন্ধুরে। গমন বিরোধী হৈল পাপ শশধরে।" প্রভৃতিও প্রায় একরূপ। জ্ঞানদাসের "ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণী—অবনী বহিয়া যায়", এর সঙ্গে পালাগানের অনেক ছত্রের মিল দেখা যায়। (পল্লী-গীতিকা দ্বিতীয় ভাগ, দ্বিতীয় খণ্ড—ভেলুয়া (৯।৪২) এবং দেওয়ান ভাবনা ২।১২ দ্রষ্টব্য। "ফুল যদি হৈতারে বন্ধু ফুল হৈতা তুমি। কেশেতে ছাপাইয়া রাখতাম ঝাইরা বানতাম বেণী"—মহুয়া (৮.২২) পদের সঙ্গে লোচনদাসের "ফুল নও যে কেশের করি বেশ" মিলিয়া যাইতেছে। শ্যামল-কুন্তলা বঙ্গভূমির চির-সুন্দর, মৃদু-মলয়-কম্পিত ধান্য-শীর্ষ-পরিপূরিত নদী সৈকতে রাখাল বালকের যে সুমধুর মর্ম্ম-স্পর্শী বাঁশীর সুর ভাসিয়া যায়—যে সুরের আদি উৎস—প্রেমের কথায়, ও পরিণতি প্রেমের আধ্যাত্মিকতায়—সেই বঙ্গ-পল্লীর শ্রেষ্ঠতম সম্পদ বাঁশীর গানের কথা অপূর্ব্ব উন্মাদনাজনিত উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করিয়া মহিষাল বঁধুর পত্রে পত্রে ভাসিয়া উঠিয়াছে—অনুরূপ কথা চণ্ডীদাসের যে কত পদে আছে—তাহা নির্ণয় করা কঠিন। ধোপার পাটের নায়ক রাজকুমার তাঁহার প্রেমিকার সঙ্কেতে গৃহের আঙ্গিনায় আসিয়া বৃষ্টিতে ভিজিতেছেন, নায়িকা গুরুজনের ভয়ে বাহির হইতে না পারিয়া যে বিলাপোক্তি করিতেছেন, তাহার মাধুর্য্যমিশ্র কারুণ্য চণ্ডীদাসের "এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা, কেমনে আইলা বাটে। আঙ্গিনার মাঝে বঁধুয়া ভিজিছে, দেখে যে পরাণ ফাটে॥" প্রভৃতি পদ স্বতঃই স্মরণ করাইয়া দিবে, পল্লীকবি যেন চণ্ডীদাসের ভাষ্য করিয়াছেন।

বস্তুতঃ বৈষ্ণব পদ-কর্ত্তাদের অনেক কবিত্বপূর্ণ ছত্রের সঙ্গে এই সকল পালা গানের কথার অবিসম্বাদিত নৈকট্য পাঠকের নিকট স্পষ্ট হইবে। ধোপার পাট, মহুয়া ও মহিষাল বন্ধু প্রভৃতি কতকগুলি পালা গানে এই নৈকট্য বিশেষরূপে প্রতীয়মান হইবে।

কিন্তু যাঁহারা পল্লীগান গুলি ভাল করিয়া পড়িয়া দেখিবেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন বৈষ্ণবপ্রভাব ঐ সকল গাথায় একবারে নাই। বৈষ্ণবেরা নরজগতের প্রেম-লীলা,—যাহা পল্লী-গীতিকার প্রতিপাদ্য বিষয়,—তাহাই আর এক ধাপ উপরে চড়াইয়া আধ্যাত্মিকতায় পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। পল্লীগাথার ভাষা ও ভাব স্বতন্ত্র, তাহাতে বৈষ্ণবগণের অনুকরণ আদৌ নাই।

কিন্তু তাহা হইলে ভাব ও ভাষার এই নিগূঢ় ঐক্যের কারণ কি, এই প্রশ্ন সহজেই মনে উঠিতে পারে।

পল্লীগাথার প্রেমের আদর্শ টা কি বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাই যে বঙ্গের গ্রামে-গ্রামে নগরে-নগরে চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে প্রেমের জন্য অসাধ্য সাধন হইতেছিল—চণ্ডীদাস লিখিয়াছেন "সহজ সহজ সবাই বলয়ে"—অর্থাৎ তাঁহার সময়ে নরনারীর অবাধ প্রেম সর্ব্বত্র প্রচারিত ছিল। পল্লীগানে যে স্বার্থশূন্য, পাপলেশ বিরহিত, অতুল্য, জীবন-পণ ভালবাসার কথা লিখিত হইয়াছে—তাহা ক্রমে ধর্ম্ম-তত্ত্ব স্বরূপ সহজিয়ারা গ্রহণ করিয়াছিলেন। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে এই প্রেমের বিচিত্র লীলা জ্ঞাপক কোমল ভাষা বঙ্গদেশে বিশেষরূপে পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। পল্লীপ্রকৃতির বেল জুথি জাতি যেরূপ একটা বিশিষ্ট সম্পদ, পল্লীগাথার কোমল শব্দগুলিও সেইরূপ আর একটি সম্পদ। দাম্পত্য গৃহের নিভৃত নিকেতনে, জনকজননীকৃত শিশুদের আদর আপ্যায়নে, অভিসারিকার মৃদু প্রেম-আলাপনে, খণ্ডিতার অভিমানজাত ক্ষুব্ধ আহত প্রেমের উচ্ছ্বাসে—শত শত প্রকারে এই কোমলকান্ত পদাবলী বঙ্গদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল! এই পদাবলী রমণীরা কথায় কথায় আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়া ছলেন,—এবং ইহার অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে পল্লীকবি ও পদকর্ত্তা উভয়েই তাঁহাদের কাব্যের উপাদান সংগ্রহ করিয়া লইয়াছিলেন, তজ্জন্যই এই আশ্চর্য্য ঐক্য। বঙ্গদেশের প্রেম-সাধনা যে কিরূপ ব্যাপ্তি ও প্রসার লাভ করিয়াছিল—তাহা এই পল্লীগাথাগুলি বিশেষ ভাবে প্রমাণ করিবে। সেই তপস্যাজাত নিঃস্বার্থ আত্ম সমর্পণের প্রচেষ্টা হইতে শত শত কথা—বায়ু-তাড়িত শত শত কুসুমের ন্যায়—বঙ্গের গৃহে-গৃহে, কুঞ্জে কুঞ্জে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। পল্লীগীতিরচক ও বৈষ্ণব কবি সেই স্বদেশী উপাদান হইতে তাঁহাদের কাব্যকথা আহরণ করিয়াছিলেন। এই জন্য তাঁহাদের রচনায় এই ঐক্য- ইঁহারা কেহ কাহারও নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে চণ্ডীদাসের কবিতার সঙ্গে পল্লীর যেরূপ যোগ দৃষ্ট হয়—সেরূপ অন্য কোন কবির কাব্যে পাওয়া যায় না। তাঁহার লেখায় আমরা প্রেমের অপূর্ব্ব সাধনা যেরূপ পাইয়া থাকি—পল্লীজীবনের সঙ্গে তেমনই ঘনিষ্ট সম্বন্ধও সহজে আবিষ্কার করিতে পারি। পল্লী অন্তরঙ্গতার দরুণ পল্লীগাথার সঙ্গে তাঁহার ভাব ও ভাষার এরূপ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। পল্লী কবিরা পল্লীর কথায়, পল্লীর গণ্ডীর মধ্যে প্রেমের দেবতাকে উদ্বোধন করিয়াছেন; কিন্তু চণ্ডীদাস পল্লীর কাব্য উপাদান সমস্ত কুড়াইয়া লইয়া পল্লী-প্রাচীরের বাঁধ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন। পল্লীর প্রাণেশ্বর তাঁহার নিকট জগদীশ্বর হইয়াছেন। গৃহস্বামী, হৃদয়স্বামী তাঁহার কাছে—সার্ব্বভৌম জগদেকাবলম্বন,—নিখিলবিশ্বের স্বামী হইয়াছেন। এই জন্য পল্লীগাথার আদর্শ যেখানে শেষ হইয়াছে—চণ্ডীদাসের আদর্শ সেই খান হইতে আরম্ভ হইয়াছে। পল্লী গাথার প্রেম সুরধুনী, বৈষ্ণব পদে প্রেম মন্দাকিনী।

পল্লীগাথার কথা দেশ বিদেশে—বঙ্গদেশ ও ভারতবর্ষের অপরাপর প্রদেশে, য়ুরোপে ও জাপানে সর্ব্বত্র আদৃত হওয়ার যোগ্য; কারণ তাহাতে মানুষেরই কথা আছে—দৈব লীলা নাই। যেখানে মানুষের হৃদয় আছে সেইখানেই পল্লী গাথা ঘা দিবে। এরূপ ত্যাগ, এরূপ বিশুদ্ধ উৎসর্গ সকলের হৃদয়ই মুগ্ধ করিবার সাধ্য রাখে। কিন্তু বৈষ্ণব পদ হিমাদ্রির নিভৃত কন্দরে,—জনকোলাহল হইতে বহুদূরে-স্থিত সমাহিত ভক্তি ও প্রেমের মন্দিরে আদৃত হইবে। চৈতন্যের কৃপায় এই সমস্ত বঙ্গদেশটা তেমনই একটা মন্দিরে পরিণত হইয়াছিল। বিশ্ব দেবতা জগতের সর্ব্বত্রই নীতির নিয়ন্তা; একমাত্র ভারতবর্ষে, বিশেষ বঙ্গদেশে—এদেশের বহু সুকৃতির ফলে—তিনি লীলাময়। সেই লীলামাধুর্য্য বুঝিতে তথাকথিত সভ্যদেশের লোকেরা এখনও অনভ্যস্ত। পল্লীগাথায় ভগবানের লীলার আভাষ কোনস্থানেই পাওয়া যায় না। অতি তুচ্ছ বৈষ্ণব কবিতায়ও তাহা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। একমাত্র এই কারণেই আমরা দৃঢ় ভাবে বলিতে পারি পল্লীগাথা ও বৈষ্ণবপদ—নানা কথার ঐক্য সত্ত্বেও—দুইটি স্বতন্ত্র জিনিষ এবং পল্লীগাথা বৈষ্ণব-গণ্ডীর বাহিরে ও বৈষ্ণব প্রভাব বর্জ্জিত।

ময়নামতীর গানে আমরা দেখিতে পাই—রাণী অদুনা চুল বাঁধিতেছেন। একবার বেণী বাঁধিবার এমনই কৌশল দেখাইলেন, যে তাহাতে পূজারী ব্রাহ্মণের ছবি ফুটিয়া উঠিল, কিন্তু সেই চুল বাঁধা পছন্দ হইল না। তখন আবার চুল বাঁধিতে বসিলেন, তাহাতে ক্রীড়াশীল শিশুদের মূর্ত্তি প্রকাশ হইল, আর একবার চুলের সজ্জায় বিকশিত কুসুম ও গুঞ্জরণশীল ভ্রমর পংক্তি দেখাইয়া দিলেন, এই ভাবে চিত্রকরের ছবি আঁকার মত কতবার যে আঁকিয়া মুছিলেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। শুধু ময়নামতীর গানে নহে, পালা গানের কোন কোনটিতে ও কোন কোন মনসা-মঙ্গলেও আমরা এই ভাবে চুল-বাঁধার ছবি দেখিতে পাই। অদুনা রাণী শাড়ী পরিতেছেন, প্রথম পরিলেন নীলাম্বরী,—নীলাভ নক্ষত্র খচিত কৃষ্ণ মেঘমালার ন্যায় স্বর্ণ খচিত নীলাম্বরী ঝলমল করিয়া উঠিল। তার পরে মেঘ-ডুম্বুর,—তাহা একবারে গাঢ় কৃষ্ণ,—ইহাও পছন্দ হইল না, তখন পরিলেন গঙ্গাজলী,—একবারে হরিদ্বারের নির্ম্মল শুভ্র গঙ্গাধারাকে জয় করিয়া সেই শাড়ীর স্বচ্ছতা প্রকাশ পাইল,—এইরূপ করিয়া কতবার পেটিকা খুলিলেন, এবং কত প্রকার দুর্লভ ও মহামূল্য শাড়ী বাহির করিয়া কোনটি ঠিক তাঁহার শ্রীঅঙ্গের উপযোগী তাহাই বিচার করিতে লাগিলেন। এইরূপ শাড়ীর বিচার আমরা অনেক পালাগানে পাইতেছি—বৈষ্ণব কবিতায় যদুনন্দন দাসের গোবিন্দ-লীলামৃতে রাধিকার পরিচ্ছদ পরিধান উপলক্ষে এই বিচারের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি দেখিতে পাইতেছি।

সুতরাং মনে হয় নারীগণের পেটিকার বহু শাড়ীর ন্যায় এবং চুল বাঁধিবার নানা কৌশলের মত,—বাঙ্গলা পল্লীভাষা ভাণ্ডারে, এরূপ সকল নির্দ্দিষ্ট সাজানো কথা ছিল যে কবিগণ পুনঃ পুনঃ

যথাসময়ে তাহাদের সাহায্য লইয়া তাঁহাদের নায়িকাগণের ছবি আঁকিয়াছেন। এইভাবে বেশ বিন্যাস ও চুল বাঁধা হইতে সুরু করিয়া বিবাহের ঘটকালী ও বঙ্গনারীর পুকুরঘাটে স্নান প্রভৃতি নানা বিষয়ে ঘরে ঘরে কতগুলি সাজানো কথা ছিল। যে কোন পল্লীকবি পালাগান রচনা করিতে বসিতেন, এই জাতীয় সম্পদের উত্তরাধিকারীরূপে তিনি ভাষায় এই চলিত কাব্য-কথাকে অগ্রাহ্য করিতে পারিতেন না।

সুতরাং পল্লীকবি ও বৈষ্ণবেরা—একই কথা-ভাণ্ডার হইতে বাঙ্গলার পল্লীসম্পদ লুণ্ঠন করিয়াছেন। কি চট্টগ্রাম, কি শ্রীহট্ট কি ময়মনসিংহ, কি রাঢ় কি বঙ্গ—সমস্ত প্রদেশে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রাদেশিক রূপ থাকা সত্ত্বেও—রচনাভঙ্গীতে এবং ভাবের ঐক্যে বাঙ্গলাভাষা একটা বিস্তৃত মহাদেশের সাধারণ ভাষা ছিল। আমরা সংক্ষেপে পালাগানগুলির কয়েকটি সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিব।

মহুয়া, ধোপার পাট, মলুয়া, শ্যামরায়, আঁধা বঁধু, প্রভৃতি কয়েকটি গীতিকা একপংক্তিতে স্থান পাইবে—ইহাদের মধ্যে বিশেষভাবে একটা নাট্যকৌশল আছে। কবিগণ বাদসাদ দিয়া শুধু সেই সকল ঘটনা ও দৃশ্য আনয়ন করিয়াছেন, যাহাতে কাব্যকথা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। পর পর ঘটনার বিবৃতিতে নাট্যকলা প্রস্ফুট হইয়াছে, বর্ণনীয় বিষয় মনোজ্ঞ হইয়াছে ও চরিত্রগুলি সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ঝড় যেমন ফুলের কুঁড়িটি উড়াইয়া লইয়া যায়, মহুয়া, কাঞ্চণমালা ও মলুয়া—এই তিন পরমা সুন্দরী রমণীকে ঘটনার আবর্ত্ত তেমনই জোরের সহিত তাহাদের অদৃষ্টের পথে লইয়া গিয়াছে। বেদের মেয়ের সংযম অসাধারণ—যে ব্রাহ্মণ কুমারের জন্য সে আহার নিদ্রা ছাড়িয়া মৃত্যুর মুখে পতনোন্মুখ—সে তাহারই ইষ্ট স্মরণ করিয়া তাঁহাকে প্রথমতঃ ধরা দেয় নাই। সে ভাবিয়াছিল তাহার প্রতি ভালবাসা রাজকুমারের একটা খেয়াল মাত্র। এই খেয়ালের প্রশ্রয় দিলে রাজকুমার বিপদের চূড়ান্ত সীমায় পৌছিবেন, অথচ যেদিন তাঁহার চোখে খেয়ালের ঘোর কাটিয়া যাইবে—সেদিন তিনি দেখিতে পাইবেন, তিনি জাতিছাড়া—সম্পত্তিহারা ফকির সাজিয়াছেন। রাজকুমারের ইষ্ট স্মরণ করিয়া বেদের বালিকা স্বীয় হৃদয়ের অসীমপ্রেম সংযত করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু যেদিন বুঝিল তাঁহার প্রেম খেয়াল নহে, তাহা প্রকৃতই মণি—কাচ নহে, পিত্তল নহে খাঁটি সোনা—সে দিন স্ফূর্ত্তির সহিত বেদের বালিকা পাহাড়িয়া ঘোড়ায় চড়িয়া অসীম ও জটিল বন্যপথে ছুটিয়া চলিল। চন্দ্রালোকিত নদীতীরে প্রেমিক প্রেমিকার মিলন কি মধুর, শেষরাত্রে উভয়ের ঘোটকারোহণে পলায়ন কি নির্ভীক! ঝরণার জল পান করিয়া রক্ত পুষ্পারণ্যে যখন প্রেমিকযুগল কংস নদের তীরে ঘুরিতেছে তখন বিশ্বের সমস্ত কাব্য-সৌন্দর্য্য তাহাদিগকে যেন আশ্রয় করিয়াছে। মহুয়া ভুজঙ্গজড়িত পদ্ম-লতার ন্যায় বিপৎকালে কি ভীষণ! স্বামীকে কাঁধে রাখিয়া পার্ব্বত্যপথে মহুয়ার আনন্দ যাত্রা, সতীদেহবাহী মহাদেবের উদ্দণ্ড নৃত্য হইতেও অধিক বিস্ময়-

কর। কি ক্ষিপ্রকারিতার সহিত সে বণিকের জাহাজ পরশুর আঘাতে দীর্ণবিদীর্ণ করিয়া ডুবাইয়া ফেলিতেছে! বণিকের মুখর ও চঞ্চল প্রেমের বাচালতার উত্তর না দিয়া সে কি অপূর্ব্ব চাণক্যনীতি অবলম্বন করিয়া পাণ সাজিতে বসিয়া গিয়াছে! মৃত্যুকালে পিতার নিকট সে প্রেমের কথা কি নির্ভীক কি তেজস্বী ও কি করুণ ভাবের উত্তর দিয়াছে! এই মহিয়সী রমণীর চরিত্র নানাগুণে বিস্ময়কর। যেখানে বিপদ সেইখানেই তাহার উদ্ভাবনী শক্তি। সে ব্রাহ্মণ কন্যা শুদ্ধা একব্রতা; সে বেদিয়ার পালিত কন্যা—এই জন্য সে বনে বনে বন্য-মার্জ্জারের ন্যায় ক্ষিপ্র, বিপদে বন্যব্যাঘ্রীর ন্যায় ভীষণ,—হায়! আমাদের গৃহে গৃহে এইরূপ কোমল ব্রততী অথচ এরূপ প্রলয় মেঘের বিদ্যুৎ কবে আবির্ভূত হইবে? মহুয়ার মত রমণী বঙ্গ-সাহিত্যে বিরল। সে যেমনই আরণ্যজীবনের উপযোগী তেমনই গৃহিণীর গুণপণায় অভ্যস্ত। এই বন্য সিমন্তিনীর গৃহস্থালীও আমাদিগকে কম চমৎকৃত করে না—নদের চাঁদকে ভাত খাইতে দিতে না পারিয়া ভাঙ্গা মন্দিরে বসিয়া সে যে দুঃখাশ্রু বর্ষণ করিয়াছিল, তাহাতে তাহার হৃদয়ের কোমলতা সুব্যক্ত। স্বামী যখন বাজারে যাইতেছে, তখন মহুয়া তাহার কাণে কাণে তাঁহার জন্য নথ আনিতে বলিয়া দিতেছে—স্বামী যে দিন পীড়িত সে দিন মহুয়া তাহার পার্শ্বে বসিয়া মাথায় হাত বুলাইতেছে—যেদিন নদের চাঁদের গলায় মাছের কাঁটা ফুটিয়াছে সে দিন মহুয়া তাঁহার আরোগ্য কামনায় দেবতার নিকট কালা ও ধলা ছাগ মানৎ করিতেছে। একদিকে বন্য, উদ্দাম তেজে ভরা একটা বিদ্যুৎ; অপরদিকে ব্রাহ্মণ্য নিষ্ঠা ও সারল্য;—দুর্ল্লভ। এই মহিষমর্দ্দিনী দশভূজা, উজ্জ্বলরূপা দাক্ষায়ণী সতী—এই পরদুঃখকাতরা অন্নপূর্ণার তুলনা বঙ্গসাহিত্যে কেন অপর কোন সাহিত্যেও সহজে মিলিবে না।

কিন্তু এই পালার গৌরব এক মহুয়া বা নদের চাঁদের চরিত্রেই শেষ হইয়া যায় নাই। পটক্ষেপ না হইতেই আর একটি নিরাভরণা অপ্সরীর ন্যায় সুন্দরী, দেবতার ন্যায় পরদুঃখকাতরা রমণীর ছবি আমরা এই বিয়োগান্ত রঙ্গমঞ্চে দেখিতে পাই! সেই নিঝুম বনপ্রদেশে সকলে নির্জ্জন সমাধিটি ফেলিয়া চলিয়া গেল, কিন্তু পালঙ্ক একটি পুষ্পিতালতিকার ন্যায় সমাধিটিকে জড়াইয়া ধরিয়া রহিয়া গেল। তাহার অশ্রুবিন্দু শরৎ-শেফালীর ন্যায় সেই সমাধির উপর নীরবে বর্ষিত হইত—সে একা একা গান গাহিত:—"নিষ্ঠুর বেদেয়া আর তোমাদের অনুসরণ করিবে না, এবার জাগিয়া উঠিয়া তোমাদের প্রেমলীলার অভিনয় কর, দেখিয়া চক্ষু সার্থক করি, আমি তোমাদের জন্য যে ফুলের চারা রোপণ করিয়াছি, তাহার ফুল ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে,—সেই ফুলের মালা তোমাদিগকে পরাইয়া চক্ষু জুড়াইব।" এই বিয়োগান্ত গীতিনাট্যের মর্ম্মবিদারক শেষ দৃশ্যে এই মহিয়সী মহিলার রূপ আমাদিগের হৃদয়ে চিরতরে মুদ্রিত হইয়া থাকিবে।

দ্বিতীয় ভাগে **'ধোপার পাট'** অনেকটা 'মহুয়ার' মতই গল্পের আট সাট বাঁধুনীতে ও

একান্ত বাহুল্য-বর্জ্জিত কলানৈপুণ্যে নাট্য-শ্রী পরিশোভিত হইয়াছে। মহুয়া ধোপার পাটের পরে রচিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় এবং ধোপার পাট চণ্ডীদাসের সমকালিক কিম্বা কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া অনুমান হয়—যেহেতু ধোপার পাটের ভাষা ও ভাব চণ্ডীদাসের যুগের বেশী নিকটবর্ত্তী ও ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধে আবদ্ধ।

প্রথম অধ্যায় পাঠ করিবার সময় আশঙ্কা হয়, বুঝি পল্লীকবি শীলতার সীমা কতকটা অতিক্রম করিলেন। কিন্তু এই কবিগণের নৈতিক আদর্শ এত উচ্চ যে ক্ষিপ্রগামী জেলে ডিঙ্গির নাবিকের ক্ষেপণী যেরূপ ডুবন্তপ্রায় নৌকাকে অবলীলাক্রমে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে রক্ষা করিয়া চলিয়া যায়, এই সকল পল্লীকবিরাও শীলতার বাঁধ অতিক্রম করিতে করিতে যেন অসামান্য সংযমের দ্বারা লেখনীকে সাবধান করিয়া নির্ম্মল রসধারা রক্ষা করিয়া থাকেন।

ধোপার পাটের কাঞ্চনমালা আশঙ্কার সহিত—ভয়ের সহিত দুর্গম প্রেমপথে অগ্রসর হইতেছেন। একদিকে দেখিতে পাই রাজকুমারের নির্ভীক সংযমহীন উদ্দাম চরিত্র। তিনি রাজার পুত্র, জীবনে তাঁহার কোন ইচ্ছাই বাধা মানে নাই; তাঁহার প্রবৃত্তিগুলি দুরন্ত বন্য ঘোটকের মত পথ বিপথ না মানিয়া—ভবিষ্যৎ গ্রাহ্য না করিয়া ছুটিয়াছে—তাহা রাশ মানে নাই, তাঁহার দুর্নিবারগতি প্রবৃত্তির মুখ বল্গা দিয়া ফিরান যায় না। অন্যদিকে ভীরু বালিকার দ্বিধাপূর্ণ পাদক্ষেপ—ভয়শঙ্কিত গতি, শঙ্কা-চকিতদৃষ্টি,—যাহাকে পাওয়া তাঁর পক্ষে শিশুর চাঁদ ধরা অপেক্ষাও অসম্ভব, সেই অসম্ভব সুখ হাতের মুঠোর মধ্যে আপনা-আপনি আসিয়া পড়িয়াছে, তখনও বালিকার বুক দুরু দুরু কাঁপিতেছে। বালিকার, এই সংযত অথচ দুরাশাপূর্ণ প্রেম আধ্যাত্মিক নিগূঢ় রসের ভাষায় মাঝে মাঝে অস্পষ্ট ইঙ্গিতে ব্যক্ত হইয়াছে।

রাজকুমার ও ধোপার মেয়ে গৃহত্যাগী হইলেন। মন্থরগামিনী, দ্বিধাচকিতা—শরাহতা হরিণীর মত গৃহত্যাগ-দুঃখকাতরা বালিকার নৈশ-পর্য্যটন কি সুন্দর! কি করুণ! বালিকা বলিতেছে—কাল প্রাতে সূর্য্য উঠিবে, কিন্তু আমাদের পল্লী-তরুরাজির শীর্ষ আলোকিত করিয়া সূর্য্যোদয় যেমন দেখিতাম—আর তেমনটি দেখিব না। খোয়াই নদীকে শেষ দেখা দেখিয়া আসিয়াছি। পল্লীর আত্মীয়গণের সঙ্গে শেষ আলাপ করিয়া আসিয়াছি, তাদের সঙ্গে সুখ-সম্পর্কের বাঁধন চিরতরে ছিঁড়িয়া আসিয়াছি। পিতামাতার কথা ভাবিতে কতবার কাঞ্চন প্রাণাধিক রাজকুমারের স্বর্গীয় সঙ্গ লাভ করিয়াও কাঁদিয়া উঠিতেছে।

রাজকুমারের খেয়াল বড়লোকের সখের মতই; সহসা জ্বলিয়া উঠে এবং সহসা নিবিয়া যায়। উহা খড়ের আগুনের মত, অতি ঘটা করিয়া প্রকাশ পায়—এবং শেষে ছাই হইয়া ধোঁয়া হইয়া,উড়িয়া যাইতেও দেরি হয় না। কুক্ষণে কাঞ্চন রুক্মিণীর কাছে নিজ পরিচয় দিয়াছিল—যে কুমার

একদিন ধোপার মেয়ের ধোওয়া কাপড়ে তাহার পাঁচটি আঙ্গুলের সুগন্ধি দাগ দেখিয়া ভ্রমরের মত মাতোয়ারা হইয়া গিয়াছিলেন, তিনি ভ্রমরের মতই কাঞ্চনপুষ্পটি ছাড়িয়া রুক্মিণীপুষ্পে আকৃষ্ট হইলেন।

তারপর কি নিদারুণ নৈরাশ্যের ইতিহাস—সে করুণ বারমাসী পাঠ করিতে পাঠকের চিত্ত বিগলিত হইয়া যায়। হতভাগিনী তখনও দুরাশা ছাড়ে নাই—রাজকুমার আমার জন্য কত হীরা মণি লইয়া আসিবেন, দরিদ্র, আমি তাহার প্রতিদানে কি দিব? আমার দুটি চোখের জলের দাম দিয়া তাহা কিনিয়া লইব। এক একটি মাস তাঁহার মন আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে বিদীর্ণ করিয়া, তাহার হৃদয় দাগিয়া দিয়া চলিয়া গেল, বার মাস অতিবাহিত হইল—তের মাসের শেষের দিনে কাঞ্চন নিজগৃহের প্রদীপটি ফুৎকারে নিবাইয়া অন্ধকারে নিজকে ঢাকা দিলেন।

তারপর তমসাগাজির বাড়ীর দৃশ্য,—সেখানকার এত স্নেহ যত্ন পাইয়াও বালিকার হৃদয়ের হারানো স্ফূর্ত্তি ফিরিয়া আসিল না। ছিন্নবৃন্ত কুসুমের কাছে মৃদু সমীরের স্নেহকথা, বা অরুণ কিরণের উষ্ণত্ব নিষ্ফল। তমসাগাজির পর্যাটন বৃত্তান্তটি অল্প কথায় কৌতূহলপ্রদ ও বিচিত্র, সেই প্রসঙ্গে হঠাৎ বালিকা যখন তাহার শোকার্ত্ত পিতার কথা শুনিল, তখন সে কাঁদিয়া কাটিয়া তমসাগাজির পায়ে ধরিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিল। বিরহ-বিধুরার করুণ শেষ দৃশ্য মর্ম্মান্তিক, নদীর জলে ডুবিয়া মরিবার জন্য সে গিয়াছে—তাহার তৎকালীন জীবনের চূড়ান্ত সুখ রাজকুমারের শেষ দর্শন সে পাইয়াছে—আর তার কোন সাধ নাই। সে রাজকুমার ও রুক্মিণীর মিলন দৃশ্য দেখিয়াছে একদিকে রাজপুত্র অপরদিকে রাজকন্যা, যোগ্যের সঙ্গে যোগ্যার মিলন—ধোপার মেয়ে হইয়া রাজরাণী হওয়ার আশা বৃথা, বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার প্রয়াস—বৃথা—গোবরের পোকা হইয়া পদ্মের আশা—বৃথা। সে মৃত্যুর প্রাক্কালে প্রার্থনা করিতেছে—তাহার মৃত্যুর কথা যেন রাজকুমার না শোনেন। নবসুখোন্মত্ত কুমারের চিত্তে কাঞ্চনের মৃত্যুসংবাদ হয়ত সামান্য একটু বিষাদ আনিতে পারে,—সে দুঃখটুকুও কাঞ্চন তাঁহাকে দিতে অনিচ্ছুক, এজন্য সে বায়ুকে ডাকিয়া বলিতেছে 'চুপ'—নদীর তরঙ্গকে ডাকিয়া বলিতেছে 'চুপ'—নদীর ধারে রাজকুমার যে এক সময় কাঞ্চনের জন্য পুষ্পশয্যা করিতেন, তাহার দাগ এখনও আছে, বংশীর সুরে তাহাকে ডাকিয়া আনিতেন—স্বর্ণপালঙ্কে অভ্যস্ত কুমার তাহার প্রেমে মাটীর উপর পাতার বিছানা এক সময়েও লোভনীয় মনে করিতেন, সারারাত্রি জাগরণের পর কাঁচা ঘুমে তিনি উঠিয়া যাইতেন, কাঞ্চন প্রভাতকালের ঘুমটুকু ভাঙ্গাইয়া তাহার কাছে বিদায় লইতে বাধ্য হইত, সেই শত অতীতের কথা মনে করিয়া কাঞ্চন একটিবার চোখের জল মুছিল, একটিবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। তারপর শত তরঙ্গোত্থিত বুদ্বুদের ন্যায় আর একটি বুদ্বুদ নদীনীরে মিশিয়া গেল।

এক একটি ছোট ছোট অধ্যায়ে এক একটি চিত্র সম্পূর্ণ, কাঞ্চনের পিতার উপদেশগুলি পলোনিয়াসের উপদেশের মত,—অল্প কথায় বহুদর্শী জীবনের অভিজ্ঞতা, কি সুন্দর ও হিতকর!

কাঞ্চনমালা ও কাজলরেখা—

এ দুইটি রূপ কথা। উভয়ই পূর্ব্বোক্ত পালা দুইটির সঙ্গে এক পংক্তিতে স্থান পাইবার যোগ্য—এই দুই রূপ কথায় প্রেমের চূড়ান্ত আদর্শ প্রদর্শিত হইয়াছে। রূপকথা হইলেও এই উন্নত আদর্শ আমাদের মাথা ডিঙ্গাইয়া যায় নাই। ভারতনারীর একনিষ্ঠ প্রেম, ও পাতিব্রত্য—এই দুই রূপ-কথায় প্রদর্শিত হইলেও ইহা শুধু গল্পের বিষয় নহে। যে দেশের মহিলারা স্বেচ্ছায় স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় স্বীয় দেহ আহুতি দিয়াছেন, যাঁহারা সেবার দৈন্য, উৎকট কষ্টে আত্মসংযম ও সহিষ্ণুতা বরণ করিয়া লইয়া আমাদের ঘরে ঘরে গৃহলক্ষ্মীর ন্যায় প্রতিষ্ঠিত, যাঁহাদের নিশ্বাস হোমানলের ন্যায় এ দেশের বাতাসকে পবিত্র করিয়া রাখিয়াছে, যাহাদের পদরজঃ এ দেশকে কাশী ও বৃন্দাবনের মাটীর পবিত্রতা দান করিয়াছে—সেই মহিলারা এ দেশের রূপকথার নায়িকা হইলেও—ঐতিহাসিক চিত্রের ন্যায়ই জীবন্ত। সুতরাং কাঞ্চনমালা ও কাজলরেখাকে কেহ যেন অসম্ভব আদর্শ মনে না করেন। রূপকথার কাঞ্চনকে যেন কেহ ধোপার পাটের কাঞ্চন বলিয়া ভুল না করেন। দুইটি ভিন্ন চরিত্র।

কাঞ্চনমালা শেষ অধ্যায়ে যে পরীক্ষায় জয়ী হইয়াছিলেন, সেরূপ পরীক্ষায় সীতা-সাবিত্রী হটিয়া যাইতেন কিনা জানিনা,—অন্ততঃ অগ্নি পরীক্ষা হইতে সে পরীক্ষা যে বড় তাহাতে সন্দেহ নাই।

সপত্নীর অত্যাচারে কাঞ্চনমালা নির্ব্বাসিতা—সপত্নী তাঁহাকে ডাইনী প্রতিপন্ন করিয়া রাজপ্রাসাদ হইতে তাড়াইয়া দিয়াছেন। স্বামী তাঁহার শোকে অন্ধ হইয়াছেন—সন্ন্যাসীর নিকট কাঞ্চনমালা স্বামীর চক্ষে দৃষ্টি দান চাহিল। "আমার সর্ব্বস্ব গ্রহণ কর—তাহাতেও যদি না সন্তুষ্ট হও, তবে আমার চক্ষু গ্রহণ করিয়া উঁহার চক্ষু ভাল করিয়া দাও।" সন্ন্যাসী বলিলেন "তুমি পারিবে? যাহা বলি তাহা করিতে পারিবে?"

নির্ভীক বীরত্বের সহিত কাঞ্চনমালা বলিল, "স্বামী চক্ষু পাইবেন, তজ্জন্য যাহা বলিবেন—তাহাই করিব, তাহা পারিব।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "এই ফলটি লও,—তোমার সপত্নী ঐখানে দাঁড়াইয়া আছে—তাহাকে ফলটি দিয়া আইস—কিন্তু এই ফলের সঙ্গে তোমার এই রাজপ্রাসাদ তাহাকে দিয়া বিদায় লইতে হইবে। আর ফিরিয়া এখানে আসিতে পারিবে না।" এ ত্যাগ—সহজ, কিন্তু সন্ন্যাসী বলিলেন, "আর একটু প্রতীক্ষা কর, শুধু রাজপ্রাসাদ নহে—তাহার সঙ্গে তোমার স্বামীকেও তাঁহাকে দিতে হইবে—

তুমি স্বামীকে আর পাইবে না,—তাহার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ এই শেষ।" কাঞ্চন কাঁপিয়া উঠিল। সন্ন্যাসী বলিলেন,—"এই দান তোমাকে করিতে হইবে, যদি দান করিবার সময় তোমার চক্ষের জল পড়ে, কিম্বা একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পতিত হয়—তবে তোমার স্বামী অন্ধ থাকিয়া যাইবেন—এই মহাদান যদি কারতে পার, তবে তোমার স্বামীর চক্ষু ভাল হইবে।"

স্বামীর ইষ্টকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন দিয়া ত্যাগশীলা বুকে পাষাণ চাপাইয়া ফল হস্তে সপত্নীর কাছে অগ্রসর হইতেছেন—তাহার পদ চলিতে চাহে না, সে পদ ভরে বুঝি মেদিনী কাঁপিয়া ফাটিয়া যাইত। কিন্তু সে পদক্ষেপ কি সংযত!—সুখ দুঃখের সীমার পরপারে যে নিস্তব্ধ ইন্দ্রিয়বিকারহীন পরম আত্ম-প্রাসাদ ও শান্তি কাঞ্চন সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ছুটিতেছেন, পাষাণের মত কঠোর হইয়া তিনি স্বামীর ইষ্টকে বরণ করিয়া নিজের সুখ দুঃখের কথা ভুলিয়া গিয়াছেন—তাঁহার মুখে প্রসন্নতা নাই, অপ্রসন্নতা নাই, তাঁহার চোখে এক বিন্দু জল নাই, তাঁহার নিঃশ্বাস রুদ্ধ—ইন্দ্রিয়ের অধিকার অতিক্রম তাহা দৈহিক সুখ পদদলিত করিয়া মানুষী কিরূপে দেবী হইতেছেন—একবার দেখুন। যে শিশু-স্বামীকে তিনি বুকে কারয়া রক্ষা করিয়াছেন, যে স্বামীকে তিনি বনে বনে ঘুরিয়া চোখে হারাইতেন, দুর্দ্দিনে কাঠের বোঝা মাথায় করিয়া ক্রোড়ে অতি যত্নে রক্ষা করিয়া—পথে হাঁটিতে হাঁটিতে আঁচল দিয়া তাঁহার কোমল দেহকে রৌদ্র হইতে রক্ষা করিয়া চলিতেন—নিজে ভিজিয়া যাহাকে বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিতেন—যাহাকে হারাইয়া তিনি বুদ্ধিশুদ্ধ হারাইয়া জীবন হারাইতে বাসয়াছিলেন—সেই স্নেহ-পাগলিনীর নয়ন পুত্তলী—কৃপণের গুপ্ত রত্ন ভাণ্ডার, পুনপ্রাপ্ত হারানিধিকে তিনি জন্মের শোধ সপত্নীকে দিয়া যাইতেছেন—এই মহাভিক্ষুণীর ত্যাগের দৃশ্য দেখুন, বুঝিবেন—বুদ্ধদেব বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে কতবার অবতীর্ণ হইয়া—নারীরূপে পুরুষরূপে ত্যাগের মহিমা দেখাইয়া গিয়াছেন।

বাঙ্গলা পুঁথির শালা খুঁজিলে দৃষ্ট হইবে, প্রাচীন পুঁথিগুলির মধ্যে দাতাকর্ণের পালা অনেকগুলি। শিশুর মস্তক নিশ্চল করে করাত দিয়া দানশীল পিতামাতা কর্ত্তন করিতেছেন। মহাভারতে কর্ণের এই দান-বৃত্তান্ত নাই। বৌদ্ধযুগে মানুষের মহৎ গুণরাশির চূড়ান্ত অনুশীলন হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ্যের পুনরভ্যুত্থানে জপ-তপের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হইয়াছে—নামের প্রভাব দেখাইতে আদর্শ ভক্ত ধ্রুব ও প্রহ্লাদ—এবং তৎসঙ্গে ক্ষুদ্রতর অনেক আদর্শ যথা লাউসেন, শ্রীমন্ত প্রভৃতির অবতারণা করা হইয়াছে। কিন্তু বৌদ্ধ যুগ ত্যাগের শীল-মোহর করা। মানুষ নিজের সুখকে ত্যাগ করিয়া ইষ্টকে বরণ করিয়াছে—কিন্তু এই যে কাঞ্চনমালার অনুরাগমূলক ত্যাগ ইহা শুধু সুখ ত্যাগ নহে, ইহা প্রিয়ের ইষ্টের জন্য সুখ দুঃখ উভয়ই ত্যাগ; চণ্ডীদাস রাধার মুখে বলিয়াছেন, "আমি নিজ সুখ দুঃখ কিছু না জানি। তোমার কুশলে কুশল মানি"—এত বড় কথা বাঙ্গালী ভিন্ন কেহ

বলিতে পারে নাই—কাঞ্চনমালা এই কথার দৃষ্টান্ত। ফলের সহিত নিজের রাজ্য,—এবং তৎসহ স্বামীকে দান করিয়া অশ্রুহীন চোখে কাঞ্চন ফিরিয়া যাইতেছেন—আর তাঁহাকে ফিরিয়া একটিবারও তাঁহাকে দেখিবার অধিকার নাই। যে স্বামীকে ছাড়া কাঞ্চনের কাছে জগত আঁধার—স্বর্গ শ্রীহীন, কাঞ্চন দেখাইয়া গেলেন—সেই স্বামীর ইষ্টই তাঁহার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা বড়, সেই ইষ্টের মধ্যেই তিনি অনন্ত আনন্দ আবিষ্কার করিলেন। কবি শেষ ছত্রে বলিতেছেন, এ পরীক্ষা বড় কঠিন পরীক্ষা, রমণী হইয়া কাঞ্চন তাহা পার হইলেন, পুরুষ হইলে হয়ত পারিতেন না—এই পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়ার যোগ্যতার জন্ম অবলা হওয়া স্বত্ত্বেও রমণীকে "শক্তি" নাম দেওয়া হইয়াছে।

যেখানে নিদ্রিতা কাঞ্চনমালাকে দেখিবার জন্ম কুমার চুপে চুপে দ্বারের ফাঁকে উঁকি মারিতেছেন, কখনও তাঁহাকে গোপনে বাতাস করিতেছেন, নিভৃতে সেবা গ্রহণ করিতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে রাজকন্যার ঈর্ষা প্রবলবেগে জ্বলিয়া উঠিতেছে—সেই সকল স্থানে কবি মনস্তত্ব বিচারের যে অসামান্ম পরিচয় দিয়াছেন, তাহা নিরক্ষর পল্লীবাসীর হস্তে আমরা প্রত্যাশা করি নাই।

এই শ্রেণীর আর একটি রূপ-কথা **কাজলরেখার গল্প।** জগতে দৈব বলিয়া একটি জিনিস আছে। অনেক সময় দেখা যায় পার্থিব প্রকাণ্ড শক্তিকে তুচ্ছ করিয়া এই দৈব তাহার জয়ধ্বজা উত্তোলন করে। সংসারের সমস্ত ক্ষমতাকে এই দৈব বিফল করিয়া ফেলে, এই দৈবের ক্রীড়া শুধু সূক্ষ্ম নহে—দুর্জ্ঞেয়। অনেক সময়ে নির্দ্দোষী ব্যক্তি চরম শাস্তি পাইতেছে। যাঁহার চরিত্রে কলুষ লেশ নাই তিনি দস্যু ও চোরের ন্যায় শাস্তি পাইতেছেন; কত ক্রাইষ্ট জগতকে ভালবাসিয়া জগতের হাতে দণ্ড পাইতেছেন। কত যুধিষ্ঠির, কত নল পাশায় হারিয়া সর্ব্বস্ব হারা হইতেছেন, কত দুঃশাসন, দুর্য্যোধন ও শকুনী এই দৈবের দ্বারা বলশালী হইয়া রাজসিংহাসন অধিকার করিতেছে। দেবোপম প্রতিপক্ষীয় ব্যক্তিরা চোরের ন্যায় অর্দ্ধচন্দ্র লাভ করিয়া চলিয়া যাইতেছেন। রামায়ণে লক্ষ্মণের আস্ফালনকে নিরস্ত করিয়া রাম বলিয়াছিলেন "এখন পুরুষাকার দেখাইবার সময় নহে—কারণ দেখিতেছ না দৈব আমাদের প্রতিকূল; যদি বল দৈব কি? তাহার উত্তরে বলিব—প্রত্যাশিত অবস্থা না ঘটিয়া—যাহা অপ্রত্যাশিত, যাহা কখনও সম্ভবপর নহে—তাহাই যদি ঘটে—তবে জানিবে তাহা দৈব। তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইও না, দাঁড়াইলেও কিছু করিতে পারিবে না। দশরথ রাজা আমাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসেন—কৈকেয়ী আমার নিজ মাতা কৌশল্যা অপেক্ষাও আমাকে অধিকতর স্নেহ করেন। ইহাঁদের মত উপকারী আমার জগতে নাই। তাহা সত্বেও ইহাঁদেরই দ্বারা আমার এরূপ অনিষ্ট কেন হইতেছে? লক্ষ্মণ বুঝিতে পারিতেছ না, প্রত্যাশিত ও স্বাভাবিক যাহা—তাহা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গেল—অপ্রত্যাশিত ও অসম্ভব হঠাৎ আসিয়া সমস্ত উলট পালট করিয়া গেল—ইহাই দৈব। এই দৈব একদিন বুঝিয়াছিলেন

মুদ্রারাক্ষসের রাক্ষস মন্ত্রী, এইজন্য শেষ অঙ্কে তিনি প্রবল ষড়যন্ত্রের মুখে পড়িয়া নির্ব্বাক হইয়া গেলেন, দিবালোকবৎ সত্য প্রমাণাভাবে মিথ্যা হইয়া গেল। বোধ হয় এইজন্যই ক্রাইষ্ট বলিয়াছিলেন —"Resist not evil." ইহা আশ্চর্য্য হইলেও জগতে এই দৃশ্য বিরল নহে। তুমি যাহা স্পষ্ট জান, তাহা প্রমাণ করিতে পারিবে না। পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্নাকে প্রতিপক্ষীয়গণ অমাবস্যা প্রমাণ করিবে। আদালতের বিচারে সর্ব্বথা এই অঘটন ঘটিয়া থাকে। এইরূপে দৈব প্রতিকূল হইলে শুভ মুহূর্ত্তের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিও—তাহার প্রতিবিধান করিতে যাইও না। দৈবদোষে সেফালিকা ও রজনীগন্ধা স্বীয় শুভ্রতা প্রতিপন্ন করিতে অসমর্থ হইয়া পড়ে।

কাজলরেখা পৃথিবীর অন্যায় এইরূপ বুক পাতিয়া সহিয়া ছিলেন। তিনি সত্যকে প্রমাণ করিবার জন্য একটুকুও চেষ্টা করেন নাই। যে বিপদ আসিয়াছে তাহা আপনা আপনি না কাটিয়া গেলে তাহার বিরুদ্ধে প্রতিকার চেষ্টা খাটিবে না। এই দৈবকে অন্ধশক্তি বলিয়া বোধ হইলেও—ইহা অন্ধ নহে। আমাদের প্রকৃতিগত কিম্বা জন্মজন্মান্তরাগত এমন কোন দোষ আছে—যাহার জন্য আমাদের এ দণ্ড পাওয়ার দরকার—এই দৈব—সেই দণ্ড। নিজের নির্দ্দোষিতার দ্বারা এক্ষেত্রে সুবিচার পাওয়া যাইবে না। যে ব্যক্তি কোন দিন এ জীবনে কাহাকে হত্যা করে নাই, বড় বড় বিচারক টুপি মাথায় পরিয়া বিচারাসনে বসিয়া প্রতিপন্ন করিয়া গেলেন যে সেই ব্যক্তিই হত্যা করিয়াছে— সুতরাং তাহারই ফাঁসির হুকুম হইয়া গেল। আমাদের ক্ষুদ্র দৈনন্দিন ঘটনায়ও এই দৈবের ক্রিয়া দেখিতে পাই—যে কাজ করি নাই—তাহারই অপরাধ আমাদের ঘাড়ে চাপিয়া বসিল, কিছুতেই বুঝাইতে পারিলাম না যে আমি দোষী নহি। পুরুষাকার দ্বারা বুঝাইতে গেলে ফল উল্টা হইয়া যায়—এইটি আরো বেশী প্রমাণ হইয়া যায় যে আমিই দোষী।

তখন সময়ের প্রতীক্ষা করিতে হয়—যখন দেখিলাম বুঝাইতে চেষ্টা করিলে ফল বিপরীত হয়— তখন সে চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়া বুক পাতিয়া সেই দণ্ড গ্রহণ কর। ওষ্ঠাধর চাপিয়া নিজ সমর্থনের কথা গোপন করিয়া যাও, তুমি যদি সহিয়া থাক—তবে দুঃখের রাত্রি এক সময়ে পোহাইবে, কিন্তু রাত্রি শেষ না হইতে হইতে সূর্য্যকে ডাকিয়া আনিতে পারিবে না। যে সহে সে রহে। কাজল-রেখার পালায় জগতের এই নীতির নিগূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ পাইয়াছে।

কাজল-রেখার সহিষ্ণুতা—আশ্চর্য্য, এই পরম কষ্টসহ অদ্ভুত এবং মহিমান্বিত নারী-প্রকৃতির নিকট স্বভাবতঃই আমাদের মস্তক নোয়াইয়া পড়ে। কাজল-রেখা শুধু কষ্টসহিষ্ণু নহে—তাহার মত ক্ষমাশীলা কে? কঙ্কন দাসী যখন তাহাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিতেছে, তখন কাজল-রেখা আঁচলে অশ্রু মুছিতে মুছিতে তাহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছে, দানবীর পায়ে দেবী লুটাইতেছে— অথচ তাহাতে এক বিন্দুও কপটতা নাই।

কাজল-রেখার চরিত্রের এই নিয়তির প্রতীক্ষাজনিত অতুলনীয় ধৈর্য্য আমরা **কমলার** চরিত্রে দেখিতে পাই। কমলার ধৈর্য্য যেরূপ অপূর্ব্ব, তাহার প্রতিভা, মনস্বিতা এবং নারীমর্য্যাদার অভিমানও সেইরূপ অপূর্ব্ব। মাতুলালয় হইতে দর্পিতা রমণী ঘনায়িত নৈশ-অন্ধকার ভেদ করিয়া একটি উল্কার মত চলিতেছেন, স্বয়ং পুড়িতেছেন এবং চলিতেছেন। একবার কমলা ভাবিলেন না—সেই নৈশ-আঁধারে নিবিড় হাওরের পথে—অজ্ঞাত ও দুর্জ্ঞেয় প্রদেশে সে পন্থাহীন আশ্রয়হীন—কে তাহার সহায় হইবে? কোথায় রাত্রি কাটাইবে—কোথায় কাহার শরণ লইবে? নৈশাকাশের নক্ষত্ররাজি তাহাকে একটুকু দীপ্তি দান করিয়া দেখাইল না—তথাপি সে চলিল- হায় বাঙ্গালী যদি শত অপমান মাথায় বরণ না করিয়া সেইভাবে চলিতে পারিত, তবে বোধ হয় আশ্রয় পাইত। আমরা প্রতি পদে ভীত, কমলা প্রতিপদে নির্ভীক, সে যখন বুঝিল যে গৃহে সে আছে – সেখানে আর তার থাকা চলে না, তখন লাথি গুঁতো হজম করিয়া পদদলিত কীট হইয়া সেখানে আর পড়িয়া থাকিল না। সে বুঝিল সমস্ত জগতটা গৃহের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে শেষ হইয়া যায় নাই। তাঁহার আরাধ্য বনদুর্গার অধিকার সেই মাতুলালয়ে নিবদ্ধ নহে—অত্যাচার অপমান না সহিয়া কমলা যে ভাবে অভিমান করিয়াছিল এবং বৃদ্ধ মহিষালের নিকট আশ্রয় চাহিয়াছিল তাহা যেমন করুণ তেমনই মহৎ।

এই ধৈর্য্যশালিনীর ধৈর্য্যের সীমা নাই। রাজগৃহে নরবলি হইবে। তাঁহার পিতা ও কনিষ্ঠ সহোদরের বলি হইবে। কমলা তাহা শুনিলেন; অন্য কোন রমণী হইলে চীৎকার করিয়া রাজপ্রাসাদ ফাটাইয়া দিতেন। কিন্তু কমলা পাষাণময়ী বিগ্রহ, কঠোর ধৈর্য্যের বর্ম্ম পরিয়া রাণীর পরিচারিকার কার্য্য করিয়া যাইতেছেন। তিনি রাজ্ঞীর গায়ে তৈল মাখাইলেন, তাঁহার স্নানের জন্য কলসী পূর্ণ করিয়া জল রাখিয়া দিলেন। কালীপূজার ঢাকের শব্দে যখন তাহার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল—তখনও তিনি বাহিরে স্থির গম্ভীর, এমন কি রাজকুমার কাছে আসিলেও এই নিদারুণ শোক-প্রসঙ্গের কোন কথা তুলিলেন না। রাজসভায় তিনি নিজের মকর্দ্দমার উকীল নিজে হইলেন, কিন্তু তাঁহার বিরুদ্ধে যে সকল জঘন্য ষড়যন্ত্র হইয়াছে—তাহা গৃহস্থ ঘরের লজ্জাশীলা রমণী কহিবেন কিরূপে? তিনি তাহা নিজে কিছুই কহিলেন না। কেবল শৈশব ও কৈশোরে পিতামাতা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে লইয়া যে সুখের জীবন কাটাইয়া ছিলেন তাহার মধুর কাহিনী করুণায় অভিষিক্ত করিয়া বর্ণনা করিয়া শ্রোতৃবর্গের মন বিগলিত করিয়া ফেলিলেন। তৎপর জীবনে যে ভীষণ দুর্য্যোগ আরব্ধ হইয়াছিল—তাহা প্রমাণ করিলেন—কতক সাক্ষীদিগের কথা দ্বারা—কিন্তু অধিকাংশ চিঠি পত্র দিয়া। রাজসভায় তিনি যে কাহিনী বিবৃত করিয়াছিলেন, সান্ধ্য তারা ও নিজের চোখের জলকে সাক্ষী মান্য করিয়া যেভাবে পাপিষ্ঠ কারকুণের ভীষণ প্রতারণা ও মিথ্যাচরণকে দিবালোকবৎ স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে আমরা একদিকে বড়ঘরের কুল-ললনার পদোচিত মর্য্যাদা ও সংযম অপর দিকে মহীয়সী প্রতিভাদীপ্তা

অলোকসামান্য রমণীর বুদ্ধি ও তেজস্বিতার মহিমা পদে পদে দেখিতে পাই। তাঁহার রাজবাড়ার অজ্ঞাতবাসটি তাহার চরিত্রকে অতি শোভন করিয়া দেখাইয়াছে। সেই জীবনের উপর বঙ্গের সমস্ত পল্লীসৌন্দর্য্য যেন প্রতিফলিত হইয়া উহা করুণার একখানি জীবন্ত চিত্রপটে পরিণত করিয়া দেখাইতেছে।

মলুয়া—গল্পটি আগাগোড়া সুসম্বদ্ধ নহে। ইহা একটি ধারাবাহিক কাহিনী, মহুয়া ও ধোবার পাটে যে নাট্যকৌশল দেখিতে পাই—মলুয়াতে তাহার একান্ত অভাব। কবি একটা গল্প বলিয়া গিয়াছেন, কাব্যের ধরণে—নাটকীয় ধরণে নহে। তিনি অনেক চিত্র গোপন করিয়া শুধু বাছিয়া সুন্দর সুন্দর উপাদান গুলি কৌশলে অবতারণা করেন নাই। চাঁদ বিনোদের বিবাহ পর্য্যন্ত পালা গানটির একটি অধ্যায়—কাজির অত্যাচার মলুয়ার মৃত্যু পর্য্যন্ত আর একটি অধ্যায়—এই দুই অধ্যায় কোন সুবর্ণসূত্রে আবদ্ধ নহে। এই দুই অংশ দ্বারা দুইটি পৃথক পালা গান রচিত হইতে পারিত। প্রথম অধ্যায় বর্ণিত ঘটনার খুটি-নাটিতে পূর্ণ, বাঙ্গলা প্রাচীন কাব্যগুলির অনেকগুলিতে যেরূপ বিবাহ বাসরের খুটি-নাটী দেখিতে পাই—এই অধ্যায়েও তাহাই পাওয়া যাইতেছে—ঘটক যাইয়া বিবাহের প্রস্তাব করিতেছেন, বিবাহের প্রস্তাব একবার ভাঙ্গিয়া পুনরায় গড়িয়া উঠিতেছে; নানা স্থান হইতে প্রস্তাব আসিতেছে, কন্যার পিতার মন উঠিতেছে না। বিবাহের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উৎসবের বর্ণনা, স্ত্রীলোক—বিশেষ এয়োদের সংঘট্ট এবং আলাপ,—এই সমস্ত বর্ণনায় কাব্যরস প্রচুর পরিমাণে না থাকিলেও কোন প্রসঙ্গই কৌতূহল-রস-বিহীন নহে।

কিন্তু কবির শক্তি যে অসামান্য তাহা এই প্রথম অধ্যায়েরও দুই তিনটি স্থানে বিশেষভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। চাঁদবিনোদ ধান্যক্ষেত্রে কাস্তে হস্তে যাইতেছেন, বারমাসী গান গুন্ গুন্ স্বরে গাইতে গাইতে চলিতেছেন, "পাঁচ গাছি বেতের ডুগুল হাতেতে লইয়া। মাঠের মাঝে যায় বিনোদ বারমাসী গাইয়া॥" এই দুইটি ছত্রে কৃষক নায়কের চিত্র জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। মেন্দির বেড়াতে ঘেরা কলাবনের কাছে—এঁধো পুকুর ঘাটে বর্ষায় কদম ফুল ফুটিয়া উঠিয়াছে, কেঁয়ার সুগন্ধ বাস প্রাণ পুলকিত করিতেছে—সেইখানে চাঁদবিনোদের সঙ্গে মলুয়ার প্রথম দেখা। হঠাৎ মনে হইল কবি কালীর দাগে মনের কথা না বুঝাইয়া এখানে একখানি স্বর্ণলিপি লিখিয়া ফেলিলেন। পূর্ব্বরাগের এমন মধুর দৃশ্য বঙ্গ-সাহিত্যে বিরল।

মলুয়ার মধুর মূর্ত্তি ক্রমশঃ মহিয়সী হইয়া উঠিল। বিপদ তাঁহার জীবনের প্রথম অঙ্কেই বিষম পরীক্ষার আগুন জ্বালিয়া দিল। সেই অগ্নি বিদগ্ধার নিকষিত হেম-কান্তি পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল না, আগুনের অপেক্ষা শতগুণ উজ্জ্বল হইয়া একখানি স্বর্ণ প্রতিমার মতই গৌরবান্বিত হইয়া উঠিল। কুটনীর মুখে কাজির প্রলোভন শুনিয়া সাধ্বী-মহিলা যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা সেই দেশেরই যোগ্য

যে দেশে কোন অতীত যুগে স্পর্দ্ধার তুঙ্গশৃঙ্গ সমাশ্রিত লঙ্কেশ্বরের প্রলোভনকে পদদলিত করিয়া অযোধ্যার সাম্রাজ্ঞী অশোকবনে স্বীয় চরিত্রগৌরবে জগতকে বিস্মিত করিয়া দিয়াছিলেন। মলুয়া বলিতেছেন :—

"কাজিরে কহিও কথা নাহি চাই আমি। রাজার দোসর সেই আমার সোয়ামী॥ আমার সোয়ামী সে যে পর্ব্বতের চূড়া। আমার সোয়ামী সে যে রণ-দৌড়ের ঘোড়া॥ আমার সোয়ামী যেমন আসমানের চান। না হয় দুষমন কাজি নউপের সমান। দুষমন্ কুকুর কাজি পাপে দিলা মন। ঝাটার বাড়ি দিয়া তারে করতাম বিড়ম্বন। ব্যাচা থাকুক স্বামী আমার লক্ষ পরমায়ু পাইয়া। খানের মোহর ভাঙ্গি কাজি পায়ের লাথি দিয়া। জাতের মুসলমান কাজী তার ঘরের নারী। মনের আপশোষ মিটাক তারা সাত নিথা করি॥ সেই মত আমারে যে ভাব্যাছে লম্পটা। কাজীরে জানাইও তার মুখে মারি ঝাঁটা॥"

যতই বিপদ বাড়িতেছে, ততই এই মূর্ত্তি বেশী উজ্জ্বল হইতেছে। এই স্বর্ণমূর্ত্তি এক সময়ে বাঙ্গলার ঘরে ঘরে ছিল; এখন পাশ্চাত্য-প্রভাবের দশমীর দিনে এই আদর্শ আমরা ঘাড়ে করিয়া নদীতে বিসর্জ্জন দিতে চলিয়াছি। প্রেম যে জগতের সমস্ত প্রতিকূল অবস্থা হইতে বড়, মলুয়ার চরিত্রে তাহার সমুন্নত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। স্বামী বিরহে দুঃখের চূড়ান্ত কষ্টে মলুয়া বারটি মাস কি ভাবে কাটাইয়াছিলেন—তাহার কতকটা বিবরণ আমরা দিতেছি।—

"নাকের নথ বেচ্যা মলুয়া আষাঢ় মাস খাইল। গলার যে মতির মালা তাহা বেচ্যা গেল॥ শায়ন মাসেতে মলুয়া পায়ের খাড়ু বেচে। এত দুঃখ মলুয়ার কপালেতে আছে। হাতের বাজু বান্ধ্যা দিয়া ভাদ্র মাস যায়। পাটের শাড়ী বেচ্যা মলুয়া আশ্বিন মাস খায়॥ কানের ফুল বেচ্যা মলুয়া কার্ত্তিক মাস খাইল। অঙ্গের যত সোনা দানা সকল বান্ধ্যা দিল॥ ছেঁড়া কাপড়ে মলুয়ার অঙ্গ নাহি ঢাকে। এক দিন গেল মলুয়ার দুরন্ত উবাসে॥ শতালি অঙ্গের বাস হাতের কঙ্কণ বাকী। আর নাহি চলে দিন মুঠি চাউলের খাকী॥ ঘরে নাই লক্ষ্মীর দানা এক মুঠ খুদ। দিন রাতই বাড়তে আছে মহাজনের সুদ॥" "জৈষ্ঠ মাসে আম পাকে কাকে করে রাও। কোন বা দেশে আছে স্বামী নাহি জানে তাও॥ আইল আষাঢ় মাস মেঘের বয় ধারা। সোয়ামীর চাঁদ মুখ না যায় পশরা॥ মেঘ ঢাকে গুরু গুরু দেওয়ায় ডাকে রইয়া। সোয়ামীর কথা ভাবে খালি ঘরে শুইয়া॥"

গ্রাম্য কবির লেখায় গ্রাম্য-পথের দু'ধারে বনজপুষ্পের ন্যায় উজ্জ্বল কবিত্বের ছটা প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়, যথা :—

"মেওয়া মিশ্র সকল মিঠা মিঠা গঙ্গার জল। তার থাকা মিঠা দেখ শীতল ডাবের জল॥ তার থ্যাকা মিঠা দেখ দুঃখের পর সুখ। তার থ্যাকা মিঠা যখন ভরে খালি বুক॥ তার থ্যাকা মিঠা যদি পায় হারাণো ধন। সকল থ্যাকা অধিক মিঠা বিরহে মিলন॥"

কাজীর পাজী হইতে মলুয়াকে যেখানে তার পাঁচ ভাই উদ্ধার করিয়া লইয়াছিল—তাহার চিত্রপট পাঠকের মনে অনেক দিন মুদ্রিত হইয়া থাকিবে।

"বিস্তার ধলাই বিল পদ্ম ফুলে ভরা। কোড়া শিকার করিতে দেওয়ান যায় দুপুরবেলা॥ সঙ্গেতে মলুয়া কন্যা পরমা সুন্দরী। পানসী লইয়া পঞ্চ ভাই লইলেক ঘেরি॥ পঞ্চ ভাইএর পানসীখানা দেখিতে সুন্দর। লম্ফ দিয়া উঠে কন্যা

তাহার উপর ॥ অষ্ট দাড়ে মারে টান জ্ঞাতিবন্ধুজনে। পঙ্খী উড়া করে পানসী ভাইঙ্গা পদ্মবনে।" অবশ্য আমরা অনেক বাদসাদ দিয়া উঠাইলাম।

মলুয়ার কাহিনী পাঠ করিতে কতবার যে পাঠকের চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইবে তাহার ঠিকানা নাই। এই সকল বঙ্গীয় কুলবধূদের একটা ছাপ আছে—তাহা সেই চিরদুঃখিনী অযোধ্যার রাজবধূর। সেই মহা আদর্শ বঙ্গীয় সমাজ ও সাহিত্যের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় পুনঃ পুনঃ জাগ্রত হইয়া বঙ্গবধূগণকে প্রেরণা দিয়াছে। আধুনিক শিক্ষার জোরে আমরা এই মহাচিত্রখানি মুছিয়া ফেলিতেছি—কিন্তু ভারতের সীতা-সাবিত্রী গেলে—ভারতের কাঞ্চনজঙ্ঘা খসিয়া পড়িবে। তাহাদের স্থল পূরণ করিতে বিদেশ হইতে কি আনিয়াছ? বারনার্ডসও মেটারলিঙ্গ যাহা দিতেছেন, তাহা কি যুগ যুগ ভরিয়া ভারতের তৃষ্ণা মিটাইতে পারিবে। নারী-হৃদয়ে ভালবাসা না থাকিলে—ভাবের পুষ্পোদ্যান না থাকিলে—যাহা থাকিবে, তাহা পদগৌরবে পুরুষের সমকক্ষতা করিতে পারিলেও সে সাহারায় সামাজিক ও পারিবারিক তৃষ্ণা মিটাইবার কিছুই নাই।

যে সর্ব্বস্বত্যাগী ভালবাসা দিয়া মলুয়া স্বামীকে ভালবাসিয়াছিলেন,—তাহা সামাজিক নিয়ম এবং পুরোহিত মুখ উচ্চারিত মন্ত্রবলে জন্মাইতে পারে না, তাহাতে কৃত্রিমতার বাষ্প নাই। মাটী খুঁড়িয়া শত পরিশ্রম করিয়া কেহ মাটীর নীচ হইতে একটি গোলাপ গড়িয়া তুলিতে পারে না। এই পালাগানের চরিত্রগুলি স্বাভাবিক অনুরাগ বিকশিত করিয়া দেখাইতেছে! ইহাদের মধ্যে কৃত্রিমতা নাই, ধর্ম্ম বা মত প্রচার নাই, কোন যুগোচিত সমস্যার সমাধান নাই—ইহাদের আদর্শ সনাতন প্রেমের আদর্শ—সহস্রবার নিন্দা করিলেও পদ্মের সৌরভ ও শোভা নষ্ট হইবে না। কোন বিশেষ যুগে মানুষ হয়ত একটা বিশেষ ভাবের উত্তেজনার পাছে পাছে ছুটিতে পারে - কিন্তু এই অফুরন্ত সুধাভাণ্ডার প্রেমপিপাসুর জন্য চির-সঞ্চিত। যেখানে মানুষ আছে, মানুষের হৃদয় আছে—সেখানে এই প্রেম সুধার চির-প্রয়োজন থাকিবে।

ভীষণ ঝড় উঠিয়াছে—সেই ঝড়ে তরুলতার মূল উৎপাটিত হইতে বসিয়াছে, উত্তাল তরঙ্গ ঝড়ের অগ্রগামী হইয়া প্রকৃতির পটে ধ্বংসের নিশান তুলিয়াছে। ভাঙ্গা মন-পবনের নৌকা মধ্যে গঙ্গায় মলুয়া ডুবিয়া যাইতেছেন, ঋষি অভিশপ্তা লক্ষ্মীর ন্যায় এই ডুবন্ত প্রতিমার সিন্দুরোজ্জ্বল কপাল ও আলুলায়িত কৃষ্ণ কেশদামের উপর মেঘাবৃত সূর্য্যরশ্মির শেষ রেখা পড়িয়াছে—এ কি বঙ্গলক্ষ্মীর শেষ নিমজ্জন চিত্র। এ চিত্র কি আর দেখিতে পাইব না! আমরা এই মলুয়ার পালা অতি যত্নে আমাদের নিভৃত ভাণ্ডারে রাখিয়া দিব। কালে যদি এই আদর্শ সমাজ হইতে তিরোহিত হয়, তবে হয়ত জাতীয় আদর্শ গড়িবার সময় এই পালাগানের চিত্রটির প্রয়োজন পড়িতে পারে। এই পালা গানটির রচয়িত্রী খুব সম্ভব কবি বংশীদাসের কন্যা চন্দ্রাবতী।

পূর্ব্বে যতগুলি পালা গানের উল্লেখ করিয়াছি—মদিনা চরিত্র ইহাদের কোনটি হইতে আদর্শ হিসাবে ন্যূন নহে। দেওয়ান মদিনা পালাটিতে কবির অসাধারণ সৌন্দর্য্য জ্ঞান এবং তৎসঙ্গে বাস্তবতার খুটি-নাটি মিশ্রিত হইয়া ইহাকে অতি চমৎকার করিয়া তুলিয়াছে।

এই পালাটিতে নাট্য-কলা ও বিষয়-নির্ম্মাণের রীতি দোষশূন্য নহে। কিন্তু ইহা করুণার একটি অফুরন্ত নির্ঝর,—মুসলমান মহিলা মদিনা—দূরাগত আদর্শ নহেন, ইনি সতী সাবিত্রী ও মলুয়ার ভগিনী। যে স্বামীর নিষ্ঠুর ব্যবহারের জন্য তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন, তাঁহার প্রতি একদিনের জন্যও তাঁহার অভিমান হয় নাই। বিশ্বাসঘাতককে তিনি শেষ পর্য্যন্ত বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছিলেন এমন কি তালাক-নামাখানি—তিনি একটা পরিহাস বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন। বজ্র মাথার উপরে ডাকিতেছে—তথাপি ফুলটি যেরূপ হাসিতে থাকে, মদিনার এই বিশ্বাস তেমনি একটা আশ্চর্য্য নির্ভর ও বিশ্বাসের নিদর্শন। স্বামী চলিয়া গিয়াছেন—অপর রমণীকে বিবাহ করিয়াছেন—তবু তাঁহার বিশ্বাস টলিতেছে না, এ যে সপ্ততাল-ভেদী শিকড়, ইহার মূল কোথায় কে খুঁজিয়া বাহির করিবে? কুঠারাঘাতে অশ্বত্থবৃক্ষ আমূল কাঁপিয়া উঠে, কিন্তু কুঠার হইতেও কঠোরতর আঘাতে পুষ্পবল্লীর ন্যায় এই রমণীর বিশ্বাস টলিতেছে না। তিনি আসিবেন বলিয়া পুকুরের জলে জাল ফেলিতে দিতেছে না, রোজ রোজ নানারূপ পিঠা ও পুলি তৈরী করিয়া স্বামীর পথপানে সে চাহিয়া আছে—

"ছিক্কাতে তুলিয়া রাখে গামছা বাঁধা দৈ। আইজ বনায় তালের পিঠা, কাইল বাণায় খৈ॥ শালী ধানের চিড়া কত যতন করিয়া। হাণ্ডীতে ভরিয়া রাখে ছিক্কাতে করিয়া॥"

ক্রমে আশা-হতা তম্বঙ্গী মদিনা শুকাইয়া যাইতে লাগিল। কেবলই সেই পুরাতন-স্মৃতি তাহাকে পাগল করিয়া তুলিল। প্রতিমাসের সঙ্গে প্রতি দৈনন্দিন ঘটনার সঙ্গে যাঁহার স্মৃতি অচ্ছেদ্য-বন্ধনে জড়িত, সেই কলিজার সার—হৃদয়ের হারকে সে কিরূপে ভুলিবে? অগ্রহায়ণ মাসে স্বামী ধান কাটিয়া আনিয়া আঙ্গিনায় ফেলিতেন, মদিনা কত উৎসাহে ধান ঝাড়িয়া বাড়ীতে তুলিতেন! দুইজনে একত্রে বসিয়া ধানে "উনা" দিতেন অর্থাৎ কুলা দিয়া ঝাড়িয়া খড়ের টুকরা দূর করিয়া ফেলিতেন; পৌষমাসে ক্ষেত ছাইয়া ধানের চারা বড় হইতে থাকিত, কত উৎপাত সহ্য করিয়া মদিনা রাত্রে ধানের পাহারা দিতেন। বাড়ীতে হুক্কাতে জল ভরিয়া কখনও কখন স্বামীর প্রতীক্ষায় তামাক সাজাইয়া রাখিতেন। স্বামী ক্ষেতের কাজ সারিয়া কখন বাড়ীতে ফিরিবেন, ভাত রাঁধিয়া মদিনাবিবি তাহার প্রতীক্ষা করিতেন। যখন ছোট ছোট ধানের চারা এক স্থান হইতে তুলিয়া স্বামী অপর স্থানে তুলিতেন, তখন মদিনা চারাগুলি নিজে আগাইয়া স্বামীর হাতে দিতেন, স্বামী তাঁহার ক্ষিপ্রকারিতার কত

প্রশংসা করিতেন। মাঘ মাসের শীতে হাড় কাঁপিতে থাকিত, প্রাতে উঠিয়া এই ঘোর শীতে স্বামী ক্ষেতে জল দিতে যাইতেন, মদিনা পেছনে পেছনে হাঁড়িতে আগুন লইয়া যাইতেন। স্বামী খড় কাটিতেন, মদিনা জল আনিতেন। দিন রাত্রে উভয়ে মিলিয়া সংসারের কার্য্য করিতেন। চাষা ও তাঁহার স্ত্রী—উভয়ের সম্বন্ধ শুধু দৈনন্দিন কার্য্যের শেষে বিরামকুঞ্জে আবদ্ধ ছিল না। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তে ইহাঁরা দু'জনে পরস্পরের সহযোগী। এই কার্য্যক্ষেত্রে দু'য়ের প্রতি দু'য়ের অনুরাগ পুষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু এই ভালবাসার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে কাব্যরসও নিহিত ছিল। শৈশবে যখন দুলালকে ছাড়া ছয় বৎসরের মদিনা একদণ্ড থাকিতে পারিত না, সেই সময় হইতে এই প্রেমের অঙ্কুর। কোন এক বৈশাখ মাসে মদিনার বুলবুলির বাচ্চা উড়িয়া গিয়াছিল, দুলাল তাহা ধরিয়া দিয়া একটা পিঁজরায় পুরিয়া দুইজনে মিলিয়া তাহা পালন করিয়াছিল—সেই হইতে এই প্রেমের অঙ্কুর। কোন এক জ্যৈষ্ঠ মাসে দুইজনে ভাল একটা আমের চারা বুনিয়া জল সেক করিয়া বড় করিয়া তুলিযাছিল, তদবধি এই প্রেমের অঙ্কুর। তাহার অবশেষে কি ভীষণ পরিণতি। ভালবাসা কখনও নিষ্ফল হয় না, মেকীর লোভে মানুষ কতদিনের জন্য খাটীকে ভুলিতে পারে? খাটির জন্য আবার হৃদয় হাহাকার করিয়া উঠিবে—যে দিন মেকী ধরা পড়িবে। পালাগানের মধ্যে জয়চন্দ্র ও দুলালের তাহাই হইয়াছিল। দুলালের শেষকালের আর্ত্তি লৌহ শাবলের ন্যায় শ্রোতার বক্ষে আঘাত করিবে। যখন নিদারুণ নৈরাশ্যে,—অনুতপ্ত দুলাল নিজের কুটিরে ফিরিয়া আসিয়া মদিনা কোথায় বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, তখন শোকে মৃতপ্রায় দ্বাদশবর্ষ বয়স্ক সুরুজ জামাল ঘরের মৃত্তিকা-শয্যা হইতে উঠিয়া আসিয়া উন্মত্ত পিতার নিকট দাঁড়াইল—"দুলাল জিজ্ঞাসে সুরুজ মদিনা কোথায়। চোখে হাত দিয়া সুরুজ কবর দেখায়।" বালক কথা উচ্চারণ করিতে পারিতেছিল না। তাহার চোখে অশ্রু গঙ্গা ঝরিয়া পড়িতেছিল, সেই চোখের জল এক হাতে আবৃত করিয়া অপর হস্ত নির্দ্দেশ পূর্ব্বক সে মাতার কবর দেখাইয়া দিল।

প্রবল পরাক্রান্ত বানিয়া চঙ্গের দেওয়ান দুলালের শেষকালে যে শোক হইয়াছিল—তাহা হৃৎপিণ্ডের রুধিরে লিখিত, তাহা চোখের জলের অফুরন্ত প্রস্রবণ—প্রায়শ্চিত্তের অগ্নি পরীক্ষা। দুলাল ও ভালবাসিয়াছিল, কিন্তু সেই ভালবাসা তাহার হৃদয়ে কতটা বদ্ধমূল, তাহা সে নিজেই জানিত না। এই অপরাধ করিয়া সে বুঝিল সে কত বড় প্রেমের সাধনা করিয়াছিল—সেই কৃষক রমণীর শোকে সে তৃণবৎ তাহার সমস্ত ঐশ্বর্য্য ও গৌরব পদতলে দলিত করিয়া প্রিয়তমা মদিনার কবরের পার্শ্বে কুটির নির্ম্মাণ করিয়া অবশিষ্ট জীবন কাটাইয়া দিল। সেই কৃষক রমণীর প্রেম, তাহার বিপুল রাজ-প্রাসাদের ঊর্দ্ধে স্বীয় গৌরব নিশান তুলিয়া ভালবাসার জয় ঘোষণা

করিল। সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী সাহিত্যিক রোমাঁ রোঁলা মদিনার পালাটির অজস্র প্রশংসা-বাদ করিয়াছেন।

এই সমস্ত প্রেমবিষয়ক পালার পার্শ্বে কেনারামের গান একটা অদ্ভুত ও স্বতন্ত্র স্থানের দাবী করিতেছে। ভীষণ নরহন্তা কি ভাবে একজন ভক্ত ও সুগায়কে পরিণত হইয়াছিল—কেনারাম তাহারই একখানি জীবন্ত চিত্র। আমরা জগাই, মাধাই, নারোজি, ভীলপন্থ প্রভৃতি অনেক দস্যুর জীবনে এইরূপ অদ্ভুত পরিণতির কথা পড়িয়াছি। কিন্তু চন্দ্রাবতী প্রতিভার তীব্র আলোকপাত করিয়া দস্যুর মনস্তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন—এই চরিত্রের ভয়াবহ নির্ম্মমতা এবং আভ্যন্তরীণ সুপ্ত সরলতা, যাহা সাধু-সংসর্গে জাগ্রত হইয়াছিল, তাহার কঠোর ও জটিল নৃশংসতা—সমস্তই অদ্ভুত। এরূপ আর একটি চরিত্র অন্য কোথাও পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না। "কাফেন চোরা" নামক আর একটি পালা গানেই আমরা মনসুর ডাকাতের যে চিত্র পাইয়াছি, তাহা কতকটা কেনারামের অনুরূপ বটে। ভিক্টর হিউগোর হাঞ্চ ব্যাকের কথা কেনারামের-পালা পাঠ করিবার সময় মনে পড়িবে—কোন্ কোন্ বিষয়ে এই দুই চরিত্রের সাদৃশ্য আছে—তাহা ঠিক বলিতে পারি না,—কিন্তু উভয়ের চরিত্রের বিরাট জটিলতা কতকটা এক ধরণের বলিয়া মনে হয়।

কেনারাম এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ দম্পত্তির বহু সাধনা-লব্ধ সন্তান। ময়মনসিংহ জালিয়ার বাঁধ নামক বিস্তৃত 'হাওরের' পারে বাকুলিয়া গ্রামে খেলারাম নামক ব্রাহ্মণের ঔরসে এবং যশোধরার গর্ভে কেনারাম জন্মগ্রহণ করে। জন্মের অব্যবহিত পরে যশোধরার মৃত্যু হয়। খেলারাম শোকে পাগল হইয়া কেনারামকে দেবপুর গ্রামে তাহার মাতুলদের নিকট রাখিয়া স্বয়ং বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া চলিয়া যান। খেলারাম যখন চার পাঁচ বৎসর বয়স্ক সেই সময় মৈমনসিংহ জেলা ভীষণ দুর্ভিক্ষের কবলিত হয়। অনাবৃষ্টির দরুণ ধরণী শস্যহীনা হইলেন,—একমুষ্টি ধান্য তখন এক স্বর্ণমুষ্টির মতন,—যখন তাহা একান্ত দুর্লভ হইল—তখন লোকে গাছের ফল—তৎপর পাতা এবং যখন তাহাও জুটিল না, তখন ঘাস খাইয়া জীবনরক্ষা করিতে চেষ্টা পাইল! কিন্তু দারুণ আতপ তাপে ঘাস পর্য্যন্ত শুকাইয়া গেল—তখন লোকে গরু বাছুর বিক্রয় করিয়া খাইল—অতঃপর গৃহস্থ গৃহিণীকে বিক্রয় করিল, জননী নিজ সন্তান বিক্রয় করিল। এই নিদারুণ দুর্ভিক্ষ-পীড়িত হইয়া খেলারামের মাতুলেরা পাঁচ কাঠা ধান মূল্যে তাহাকে এক হেলে কৈবর্ত্তের নিকট বিক্রয় করিয়া ফেলিল।

গাড়ো পাহাড় হইতে দক্ষিণে সমুদ্র পর্য্যন্ত ধনু-কংশ-ভৈরব প্রভৃতি নদরাজি প্রক্ষালিত ও বিস্তৃত হাওর ও বিলময় ভূখণ্ড জুড়িয়া সেই কৈবর্ত্তের সাত পুত্র ডাকাতি করিয়া বেড়াইত। দস্যুর দলে যাইয়া কেনারাম দস্যু হইয়া দাঁড়াইল। ইহারা সেই নৃশংস ব্যবহারের দ্বারা যে অর্থ উপার্জ্জন করিত, তাহা নলখাগড়া বনের মধ্যে লুকাইয়া রাখিত।

কেনারাম ক্রমে ডাকাতের সর্দ্দার হইয়া উঠিল, সে দাঁড়াইলে মনে হইত যেন কোন কৃষ্ণ পাহড় আকাশ ছুঁইয়া আছে। "হাত পার গোছা তার গো কলাগাছের গোড়া। আসমানে জমিনে ঠেকে যখন হয় খাড়া।" সে রাবণের মত প্রভাবশালী হইয়া উঠিল। ক্রমে সে কৈবর্ত্তের বাড়ীতে যাওয়া আসা ছাড়িয়া দিল। বন্য-ভল্লুকের মত বনেই সে বাস করিত। তাহার ধূলিমণ্ডিত বিশাল দেহ বনে বন-বৃক্ষের নিম্নে সুপ্ত অজগরের ন্যায় পড়িয়া থাকিত। তাহার বৃহৎ দলের নামে সেই সুবৃহৎ জনপদ কাঁপিয়া উঠিত।

স্ত্রীপুত্র ও গৃহহীন এই মহিষাসুরকল্প দস্যু অর্থ উপার্জ্জন করিয়া লুকাইয়া রাখিত। সে অর্থের কোন ব্যবহার করিত না। বিস্তৃত জালিয়াবন্দের তীরে শত সহস্র গরু ও মহিষ চরিয়া বেড়াইত, তাহাদের অজস্র দুগ্ধ পান করিয়া এই দস্যুদল ভয়ঙ্কর বলিষ্ঠ হইয়া উঠিল। ধনু নদের স্রোতে বণিকেরা ডিঙ্গাযোগে যাত্রাকালে যদি এই দলের পদোত্থিত ধূলিরাশি দেখিতে পাইত, তাহা তাহারা ঝড়বৃষ্টি সম্বলিত ভীষণ দুর্য্যোগ ও "হাড়িয়া মেঘ" অপেক্ষা ভীষণতর মনে করিত। বণিকের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া ইহারা তাহার গলায় ও হাতে পায়ে দড়ি বাঁধিয়া জলে ডুবাইয়া দিত। সন্ধ্যাকালে কেহ ঘরে দীপ জ্বালিতে সাহস করিত না। রাত্রে দীপ নিবাইয়া গৃহস্থেরা চুপি চুপি কথা বলিত, এবং নিতান্ত নির্ভীক ও দুরন্ত শিশুরাও কেনারামের নাম শুনিলে ঘুমাইয়া পড়িত।

এই বিস্তৃত হাওরের পার দিয়া একদিন কবি এবং সাধু বংশীদাস চলিতেছেন। তাঁহার গায়ে নামাবলি, কপালে তিলক ও মস্তক জুড়িয়া দীর্ঘ কেশ-পাশ। তাঁহার দলের ভক্তগণ কেহ খোল কেহ কর্ত্তাল, এবং কেহ বা একতারা বাজাইতেছে।

ভক্তেরা মনসাদেবীর প্রেমে তন্ময় হইয়া বাজাইতেছে—কারণ স্বয়ং ঠাকুর দেবীর নামকীর্ত্তন করিতে-ছেন। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে—সম্মুখে ভীষণ শ্বাপদসঙ্কুল নল খাগড়ার বন, কিন্তু বংশীদাস ভক্তিতে বিভোর হইয়া সমস্ত ভুলিয়া গিয়াছেন—তাঁহার মুখনিঃসৃত মধু-নিস্যন্দিনী মাতৃ-ভক্তি সূচক গীতিকায় বনের মধ্যে যেন গঙ্গাধারা ছুটিয়াছে—সেই রবে আমন্ত্রিত হইয়া ভীষণ কেনারাম দল সহ তাহার পথ আগুলিয়া সেখানে দাঁড়াইল। তাঁহারা যখন শুনিলেন, দস্যুর নাম কেনারাম, তখন সেই দলের লোকের মুখ শুকাইয়া গেল। ঠাকুর তাঁহার ঝুলি খুলিয়া দেখাইলেন, কয়েকটা কড়ি ও ছিন্নবস্ত্র—"ইহা তুমি লইয়া যাও। অর্থোপার্জ্জন আমার ব্যবসায় নহে। আমি মায়ের নাম গাইয়া বেড়াই।" কেনারাম বলিল—"আমি অর্থ উপার্জ্জন করি বটে, কিন্তু তাহা গৌণ উদ্দেশ্য—আমার মুখ্য উদ্দেশ্য মানুষের প্রাণ নষ্ট করা। বাঘ যেরূপ তাহার শিকারটা খেলিয়া খেলিয়া মারে, মনুষ্য হনন কার্য্যে আমি তেমনই একটা তীব্র আনন্দ পাই—তাহাই আমার নেশা—তোমরা প্রস্তুত হও।" ঠাকুর বলিলেন "অর্থ উপার্জ্জন করিয়া তুমি কি কর।" কেনারাম বলিল "কিছুই করি না,"—

"নিজে ভোগ করনা কেন ?"

"ধন ভোগ করিলে বিলাসী হইব, আমি এখন সম্পূর্ণ স্বাধীন, বিলাসে-অভ্যস্ত হইলে সেই স্বাধীনতা লুপ্ত হইবে।"

"অর্থ পরকে দান করনা কেন ?"

"অর্থ পরকে দান করিলে সে লোভী হইবে—এবং সর্ব্ব-অধর্ম্মের মূল অর্থ হাতে পাইলে তাহার মনুষ্যত্ব লুপ্ত হইবে।"

"তবে মানুষ মারিয়া পাপ অর্জ্জন কর কেন ?"

"কি পাপ কি পুণ্য তাহা আমি জানিনা ; মানুষ মারিয়া আনন্দ পাই, ইহাই আমার লাভ। আমি আশৈশব এই কার্য্য করিয়া আসিতেছি, এখন প্রৌঢ়াবস্থায় তোমার মুখে ধর্ম্মের পাঠ শুনিতে চাই না।" এই বলিয়া কেনারাম 'জয় কালী' বলিয়া খাণ্ডা হস্তে চীৎকার করিয়া উঠিল—তাহার দলের লোকেরা সেই চীৎকারে যোগ দিল ; বংশীদাসের সহকারী লোকদের অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল—কিন্তু কেনারাম বিস্ময়ের সহিত দেখিতে পাইল, বংশীদাসের মুখে কোন ভীতির চিহ্ন নাই—শ্রীঅঙ্গে নামাবলী, মাথায় তিলক—দেববিগ্রহের ন্যায় বংশী দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি সম্পূর্ণ অকুতোভয় এবং তাঁহার মুখ প্রীতি ও করুণাময়। পৃথিবীতে এমন ঝড় নাই, যাহাতে এই প্রশান্ত সাগরে ঢেউ তুলিতে পারে।

বংশী বলিলেন, "তুমি হত্যা করিবে, কর—তাহাতে আমার ভয় নাই, একটিবার আমাকে বল অর্থ দিয়া তুমি কি কর।"

কেনারাম বলিল—"আমার যত অর্থ আছে—তাহা অনেক সম্রাটেরও নাই। এই সমস্ত অর্থ যাহার, আমি তাহাকেই দিয়াছি।"

"এ অর্থ কাহার ?"

"এ অর্থ পৃথিবীর, আমি সমস্ত অর্থ পৃথিবী তলে লুকাইয়া রাখিয়াছি। সমস্ত জিনিষেরই পরিণতি—মৃত্তিকা—আমি সেই মৃত্তিকাকেই তাহা উপহার দিয়াছি। কিন্তু কে তুমি যাহার এতবড় দুঃসাহস যে আমার সম্মুখে মুখোমুখি দাঁড়াইয়া এরূপ ভাবে তর্ক করিতেছ ? তোমার আশ্চর্য্য সাহস—তোমার জোড়া লোক ত আমি দেখি নাই, আমাকে দেখা দূরের কথা আমার নাম শুনিলে লোকে মৃতপ্রায় হইয়া পড়ে।"

"আমার নাম বংশীদাস"

"তুমি সেই বংশী; শুনিয়াছি যার গানে পাষাণ গলিয়া নদী হইয়া যায়—শুনিয়াছি ভাটীর পাগলা নদী তোমার গানে উজান বহিয়া থাকে—আকাশের মেঘ হইতে ঝর ঝর করিয়া জল বিন্দু বর্ষিত হয়।

শুনিয়াছি নাকি পাখী ও পশু তোমার গান শুনিলে তোমার কাছে চলিয়া আসে, এবং উদ্যত ফণা নোয়াইয়া কালভুজঙ্গ গান শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া থাকে—তুমি সেই বংশীদাস ?"

"আমি সেই বংশীই বটে, কিন্তু পাষাণ দ্রব হইলেও দস্যুর মন দ্রব করিবার মন্ত্র আমি জানি না।"

"ঠিক বলিয়াছ—তুমি বংশীদাসই হও বা যেই হও। তোমার দলবল সহ আমি এখনই তোমাকে বধ করিব।"

সন্ধ্যা সমাগত প্রায়—নল-খাগড়া বনের উপর সূর্য্যের শেষ রশ্মি ডুবিয়া যাইতেছে, ভক্তদের জীবনের শেষ আশা সেইভাবেই তিরোহিত হইতে উদ্যত।

বংশী বলিল—"তুমি মারিবে—কোন ভয় নাই, মার হাতে এই জীবন পাইয়াছি, মায়ের কোলে ফিরিয়া যাইব ভয় কি, তোমাকে একটি মাত্র অনুরোধ, মৃত্যুকালে একবার মায়ের নাম শেষবার গান করিব।"

মুহূর্ত্তকাল কি চিন্তা করিয়া কেনারাম বলিল—"এই আমার হাতের খাঁড়া মাটিতে রাখিলাম, যে পর্য্যন্ত আমি আবার ইহা হাতে না লই—সেই সময় পর্য্যন্ত তুমি তোমার আরাধ্যের নাম লইতে পার।"

"আকাশ চাঁদোয়া হইল শুনে পশুপাখী।
কেনারাম বসিল যে হাতের খাণ্ডা রাখি।"

সে কণ্ঠ এমনই ভক্তিপুত এমনই মধুর যে পাখীরা আকাশপথে উড়িয়া যাইতেছিল—তাহারা নিকটবর্ত্তী গাছের ডালের উপর বসিয়া গান শুনিতে লাগিল। নিস্তব্ধ হাওর, দূর্ব্বার বিছানা, আকাশ চাঁদোয়া, ভক্তকণ্ঠের অমৃতবর্ষী সুর ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর গ্রামে উঠিল। গাইতে গাইতে সন্ধ্যা অতীত হইল,—ডাকাতেরা বেহুঁস হইয়া মায়ের নাম শুনিতে লাগিল। কেনারামের আদেশে ডাকাতের দল প্রদীপ্ত মশালের আলোতে সেই নির্জ্জন অন্ধকার জনপদ আলোকিত করিল—শত শত মশাল সেই স্থানটিকে দিবালোকবৎ প্রদীপ্ত করিল। সহসা কেনারাম খড়্গ ফেলিয়া বংশীদাসের পা জড়াইয়া ধরিল, তাহার চক্ষু হইতে দর দর অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। সে তাহার সমস্ত ধন বংশীদাসকে দান করিয়া তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে ইচ্ছা জানাইল। রাজরাজেশ্বরের অতুল ঐশ্বর্য্য সে কবিকে দিতে চাহিল কিন্তু তিনি নর-রক্ত-কলঙ্কিত সেই অর্থ গ্রহণ করিলেন না। অনুতাপে দস্যু উন্মত্তবৎ হইয়া ঘড়া ঘড়া ধন ফুলেশ্বরীর গর্ভে নিক্ষেপ করিল, এবং নিজের হাত পা কামড়াইয়া মাথার চুল ছিঁড়িতে লাগিল। এই অবস্থায় সে তাহার ভীষণ খড়্গ আবার হাতে তুলিয়া লইয়া ছিন্নমস্তার ন্যায় নিজের মুণ্ড কাটিতে উদ্যত হইল। বংশীদাস বুঝিলেন, তাহার প্রকৃত অনুতাপ হইয়াছে—তখন তিনি তাহাকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিলেন। যদিও সে কুৎসিত, কদাকার, তাহার স্বরটি ছিল কোকিলের

মত। যে যখন কর্ত্তাল বাজাইয়া ঘরে ঘরে মনসামঙ্গল গাহিয়া ফিরিত, তখন ভক্তি গদ্‌গদ কোকিল-কণ্ঠ দস্যুর গানে পাষাণ বিগলিত হইত। যাহারা এক সময়ে তাহাকে যম সদৃশ মনে করিত, এখন সে তাহাদের অন্তরঙ্গ হইল। যে সকল শিশু তাহার নাম শুনিলে আতঙ্কিত হইয়া চক্ষু বুজিত, তাহারা গান শুনিতে যাইয়া তাহার কাছ ছাড়া হইত না। তাহার গায়ের হাওয়ার স্পর্শে এক সময়ে বৃক্ষপত্র ভয়ে শিহরিত হইত, এখন তাহার সান্নিধ্য লাভ করিয়া সেই সকল বৃক্ষপত্রের মধ্যে একটা আনন্দের সাড়া পড়িয়া যাইত। এই পালাটি স্বয়ং চন্দ্রাবতী লিখিয়াছেন যদিও কবিতার ভাষায় লিখিত হইয়াছে, তিনি তাঁহার পিতার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস যোগ্য।

সমস্ত পালাগানের রাজ্যে "কঙ্ক ও লীলা"—যেন স্বর্গের নন্দন বন। বংশীবর মুগ্ধা হরিণীর ন্যায় লীলা, সে সরলতার খনি—প্রেম সরসীর একটি নিষ্কলঙ্ক পদ্ম। ভ্রাতৃপ্রেম, সখ্য ও দাম্পত্য লীলাচরিত্রে এক হইয়া গিয়াছে। তাহার মনের ভাবকে স্নেহ, প্রেম, সখ্য ও দাম্পত্য—যে নামেই অভিহিত কর না কেন, তাহা একান্ত পক্ষে নিষ্কলুষ,—ইন্দ্রিয়ের ঊর্দ্ধ। পাড়ার লোকেরা যদি নিন্দাবাদ করে—তবে তাহাদিগকে ততটা দোষ দেওয়া যায় না। বালিকা যখন যৌবনে পাদক্ষেপ করিল, তখন কঙ্কের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠভাবে মেশামেশি লোকে ভালচক্ষে দেখিবে কেন? তারা চিরকাল বাড়ীর কাছে কূপ ও পুকুর দেখিয়া আসিয়াছে, সমুদ্র দেখে নাই। যে স্রোতে পঙ্কিলতা দূর হয়—যাহা চির অনাবিল—যাহা কখনও অশুদ্ধ হয় না—যাহা পরকে শুদ্ধ করে—এমন স্বর্গীয় সামগ্রীর গৌরব তারা বুঝিবে কিরূপে?—কঙ্কের চরিত্র আকাশের ন্যায় উদার,—তাহাতে হিন্দু-মুসলমানের ভেদজ্ঞান নাই, সে বালক হইয়াও প্রবীণের মত। গর্গ যখন তাহার ভাতে বিষ মাখাইয়া দিয়াছিলেন—তখন সে বলিয়াছিল—"হঠাৎ উত্তেজনার ফলে গুরুদেবের ভ্রান্তি হইয়াছে—কিন্তু তাঁহার ন্যায় মহামনা লোকের এ ভ্রান্তি বেশী দিন থাকিবে না।" যে ব্যক্তি তাহার মৃত্যু কামনা করিয়া খাদ্য দ্রব্যে বিষ মাখাইয়া দিতেছে—বালক তাহার বিচার কিরূপে ধীরতার সঙ্গে করিতেছে! এই পালা গানটি বিবিধ কবির রচনা,—কিন্তু সকলের প্রতিভাই এক ছন্দের। ইহার অনেক পংক্তি কবিত্বের হীরক দ্যুতিতে উজ্জ্বল। "হাতেতে সোনার ঝাড়ি বর্ষা নেমে এসে" পদটিতে আলুলায়িতা মেঘ-কুন্তলা বর্ষার সুবর্ণ পাত্র হস্তে পৃথিবীতে নামিয়া আসিবার কেমন সুন্দর ও সুস্পষ্ট ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে—তদপেক্ষা সুন্দর, অতুলনীয় কবিত্ববিশিষ্ট আর একটি পদ—"শাউনিয়া ধারা শিরে বজ্র ধরি মাথে। বউ কথা কও বলি কান্দে পথে পথে।" ঊর্দ্ধে শ্রাবণের ধারা বহিয়া যাইতেছে—মাথার উপরে ঘন ঘন বজ্র নির্ঘোষ—কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নাই, বিরহ-বিধুর কান্তাভিমানাহত পাখী পথে পথে "বউ কথা কও" বলিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতেছে। লীলার কাহিনী, এইরূপ বারমাসীর করুণ কবিত্বে ভরপুর। কবি রঘুসুত

চারিটি ছত্রে গৌরাঙ্গ দেবের যে চিত্র আঁকিয়াছেন—তাহা স্বর্গীয় মাধুরী ও করুণায় ভরপুর। কঙ্ক ঘোর বিপদে পড়িয়া স্বপ্ন দেখিতেছেন—যেন অমানিশি পৃথিবীকে গ্রাস করিয়াছে, যেন কেহ তাঁহাকে শ্মশানে ফেলিয়া দিয়াছে—অগ্নির শিখার সঙ্গে পিশাচদের লেলীহান জিহ্বা তাহার দিকে প্রসারিত, পিশাচেরা তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে—দুঃসহ কষ্টে ও ভয়ে কঙ্ক পরিত্রাহি ডাকিতেছেন—এমন সময় কে এক রক্ত-গৌরবর্ণ মহাপুরুষ কাঞ্চন-বিগ্রহের ন্যায় ধীর ও স্থির তাঁহাকে আসিয়া বাঁচাইয়া দিলেন এবং তাহার সহিত দেখা করিবার স্বপ্নাদেশ দিয়া অদৃশ্য হইলেন। কঙ্ক চৈতন্যের পায়ের নূপুরধ্বনি শুনিবার জন্য সমস্ত ত্যাগ করিয়া প্রবাসী হইলেন।

কঙ্ক ঐতিহাসিক ব্যক্তি, তাহার আত্ম-বিবরণ তদীয় বিদ্যাসুন্দরে প্রদত্ত হইয়াছে—তাহার বর্ণিত ঘটনার সহিত এই পালা গান রেখায় রেখায় মিলিয়া যায়। তিনি চৈতন্যের সমকালবর্ত্তী।

এই পালা গানগুলির মধ্যে মধ্যে যে কবিত্ব আছে, তাহা বঙ্গের সমস্ত পল্লী-সৌন্দর্য্যকে মনোজ্ঞ আকার দিয়া দেখাইতেছে। আমরা উল্লেখ করিয়াছি, বর্ষা বর্ণনা করিতে যাইয়া এক কবি লিখিয়াছেন—মাথার উপর বজ্রপাত হইতেছে—বর্ষণের বিরাম নাই—সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, "বউ কথা কও" বলিয়া অনুনয় করিয়া পাখীটা তাহার মানিনী স্ত্রীর মান ভাঙ্গাইবার জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া পথে পথে ঘুরিতেছে। আর একজন লিখিয়াছেন শুভ্র জোছনায় পৃথিবী ভরিয়া গিয়াছে, যেন কেহ আকাশ হইতে মুঠি মুঠি বেল ফুল ভূতলে ফেলিতেছে। কেহ লিখিতেছেন বিদ্যুৎ ছটায় সোনার খোদকারী করা ভৃঙ্গ হাতে লইয়া বর্ষা পৃথিবীতে নামিতেছে। এইরূপ সুন্দর উপমার অবধি নাই। আমাদের ক্ষুদ্রায়তন অধ্যায়ে এই পল্লীগাথার জন্য আর বেশী স্থান করিতে পারিলাম না। এ পর্য্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় মৎসংগৃহীত ও মৎসম্পাদিত ৫৩টি পালাগান প্রকাশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে "আঁধা বঁধু"র সুরে যে অপূর্ব্ব মাদকতা ও স্বাধীনতার বৈকুণ্ঠধাম পরিকল্পিত হইয়াছে—তাহার উদাহরণ জগতে বিরল। কুল, শীল, জাতি, মান, ধর্ম্ম ও শাস্ত্রের অনুশাসন,—এই সকল লৌকিক সংস্কারের অজেয় দুর্গ,—পুষ্প-ধনুর কোমল শরে ভিত্তি সহ ধ্বসিয়া পড়িয়াছে—অথচ ইহাতে রণ দুন্দুভি বাজে নাই, সহজ ও কোমল ভাবের আকর্ষণ যে ভাবে লৌহ প্রাচীর ভেদ করিতে পারে—সেইভাবে প্রেম সমস্ত লৌকিক সংস্কার ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। যেমন পাষাণ ভেদ করে ক্ষুদ্র গুল্ম, দুর্জ্জয় স্রোতের বিরুদ্ধে যায় শফরী। "আঁধা বঁধু" ছাড়া, রাণী কমলা, শ্যামরায়, সুরস্নেহা, এবং বিশেষ করিয়া "মাণিক তারা" এই পূর্ব্ব বঙ্গ গীতিকায় হীরার খনির মধ্যে কোহিনুর সদৃশ।

এই সমস্ত পল্লীগাথার উদ্ধারকল্পে যাঁহারা বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন তন্মধ্যে ময়মনসিংহ কেন্দুয়া পোষ্টের অধীন আইথর গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দে মহাশয়ের প্রাণান্ত চেষ্টা ও

অধ্যবসায় বিশেষরূপ উল্লেখযোগ্য। এই পল্লীগাথাগুলির বিশেষ বিবরণ পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকার ভূমিকায় সুবিস্তার লিখিত হইয়াছে।

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী এই ক্ষেত্রে যেরূপ পরিশ্রম করিতেছেন, তাহা অতুলনীয়। তাঁহার নিবাস চৌধুরী পাড়া লেন, তামাকু মুণ্ডা, চট্টগ্রাম। তিনি পল্লী-গীতিকার উদ্ধার কল্পে জীবন পণ করিয়া বসিয়াছেন। তাঁহার সংগৃহীত বহু পালা গান বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রতি ছাপাইতেছেন।

এই সকল পল্লী-গীতিকা সম্বন্ধে বিশিষ্ট য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ যে উচ্চ ধারণা পোষণ করেন, তাহা গ্রন্থশেষে প্রদত্ত "মত" শীর্ষক নিবন্ধে দ্রষ্টব্য,—এখানে সুপ্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী মিসেস হগম্যানের চিঠি হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত হইল।

গ্রন্থভাগে অনুল্লিখিত প্রাপ্ত হস্তলিখিত পুঁথির

সংক্ষিপ্ত বিবরণী।

১। অদ্বৈততত্ত্ব—শ্যামানন্দপুরী। "ধরেন্দা, বাহাদুরপুর"-বাসী দুরিকানন্দন প্রসিদ্ধ শ্যামানন্দ এই পুস্তকে অদ্বৈতপ্রভুর প্রতি মাধবেন্দ্রপুরীর উপদেশবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

২। অন্তপ্রকাশ খণ্ড—শ্রীনিবাস-পুত্র গতিগোবিন্দ প্রণীত। শ্লোক ১২৫।

৩। অভিরামবন্দনা—রাইচরণ—দাস। অভিরামগোস্বামী ও জাহ্নবীঠাকুরাণী সম্বন্ধে অনেক কথা ইহাতে আছে। শ্লোক ৪২০। হঃ লিঃ ১০৯৫ বাং সন।

৪। অমৃতরত্নাবলী—মুকুন্দদাস। বৈষ্ণবধর্ম্মের রূপক গ্রন্থ।

৫। অমৃতরসাবলী—শ্রীমুকুন্দ দেবের আদেশে কোন অজ্ঞাত লেখক দ্বারা লিখিত। ইহাতে সহজ-ভজনের ব্যাখ্যা আছে। গ্রন্থকার স্বপ্ন, প্রত্যাদেশ প্রভৃতির দোহাই দিয়া সহজ-ভজনাকে ধর্ম্মের উচ্চ-অঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াসী। শ্লোকসংখ্যা ৩২০।

৬। আটরস—গোবিন্দদাস প্রণীত।

৭। আত্মজিজ্ঞাসা—গদ্যপুস্তিকা। কৃষ্ণদাসপ্রণীত। দেহতত্ত্ব সম্বন্ধীয় হঃ লিঃ ১২৩৮ বাং।

৮। আত্মনিরূপণ—কৃষ্ণদাসপ্রণীত। আত্মতত্ত্ববিষয়কপুঁথি। শ্লোকসংখ্যা ২১১। হঃ লিঃ ১২২১ সাল।

৯। আত্মনিরূপণ—খণ্ডিত।

১০। আত্মসাধন—কৃষ্ণদাসপ্রণীত। হঃ লিঃ ১২২২ সাল।

১১। আনন্দভৈরব—প্রেমদাস প্রণীত।

১২। আনন্দলহরী—খণ্ডিত।

১৩। ইতিহাসসমুচ্চয়—খণ্ডিত।

১৪। উদ্ধবদূত—মাধবগুণাকরপ্রণীত। "তাড়িত নামেতে গ্রাম অতি অনুপাম। কবিশেখরের পুত্র কবিচন্দ্র নাম॥
তাহার পুত্র মাধব নামেতে গুণাকর। পরম পণ্ডিত ছিল সর্ব্বগুণধর॥
গজসিংহ নাম রাজা ছিল বর্দ্ধমানে। তার সভাসদ্ ছিল দ্বিজ সর্ব্বগুণে॥"

১৫। উদ্ধবসংবাদ—দ্বিজ নরসিংহ প্রণীত। শ্লোকসংখ্যা প্রায় ২৫০।

১৬। উপাসনাতত্ত্বসার—হঃ লিঃ ১২৪৭ সাল।

১৭। উপাসনাপটল—নরোত্তমদাসপ্রণীত। শ্লোকসংখ্যা ৮১৲।

১৮। উপাসনাপটল—শ্লোক ১২৫।

১৯। উপাসনাসারসংগ্রহ—শ্যামানন্দ দাস।

২০। একাদশীব্রতকথা—শ্যামদাসপ্রণীত। শ্লোকসংখ্যা ২৮০।

২১। কণ্‌মুনির পারণ—কৃষ্ণদাসপ্রণীত, হঃ লিঃ ১১৩৪ সাল। শ্লোকসংখ্যা ১৫০।

২২। কণ্‌মুনির পালা—কৃষ্ণদাসপ্রণীত।

২৩। কপিলামঙ্গল—ক্ষুদিরামদাস ও কেতকাদাস প্রণীত। হঃ লিঃ ১২২৮ বাং।

২৪। কবচাবলী—সত্রস্বরূপ। হঃ লিঃ ১০৮২। শ্লোক ১৪০।

২৫। কালনেমির রায়বার—কাশীনাথপ্রণীত। ১২৫৯ সাল। হঃ লিঃ।

২৬। কালকেতুর চৌতিশা—শ্রীচাঁদদাসপ্রণীত।

২৭। কালিকাপুরাণ—দ্বিজদুর্গারামপ্রণীত।

২৮। কালিকাষ্টক—শম্ভুপ্রণীত।

২৯। কালিকাবিলাস—কালিদাসপ্রণীত, খণ্ডিত পুস্তক, যে অবধি আছে, শ্লোকসংখ্যা ১৭৪০।

৩০। কালীয়দমন—দ্বিজপরশুরামপ্রণীত। হঃ লিঃ ১৭৬১।

৩১। কাশীখণ্ড—ময়মনসিংহের অন্তঃপাতী কেদারপুরনিবাসী কেবলকৃষ্ণবসুকর্তৃক এই অনুবাদখানি ১২২২ সালে রচিত হয়।

৩২। কিরণদীপিকা—দীনহীনদাস—কবিকর্ণপুরপ্রণীত গৌরগণোদ্দেশদীপিকার অনুবাদ।

৩৩। কুঞ্জবর্ণন নরোত্তমদাসপ্রণীত। "শ্রীলোকনাথগোসাঞি-পাদপদ্ম করি আশ। কুঞ্জবর্ণন গায় নরোত্তম দাস॥" শ্লোকসংখ্যা ১৫০।

৩৪। ক্ষণদাগীতচিন্তামণি—পদসংগ্রহ গ্রন্থ।

৩৫। কৃষ্ণলীলামৃত—বলরামদাস।

৩৬। কৃষ্ণের একপদ চৌতিশা—ভবানন্দ।

৩৭। ক্রিয়াযোগসার—রামেশ্বর নন্দী প্রণীত, বৈষ্ণবদিগের নিত্য-নৈমিত্তিক পাঠ্য গ্রন্থ। পুঃ নঃ ১২১৯ বাং।

৩৮। গঙ্গামঙ্গল—জয়রামপ্রণীত। শ্লোকসংখ্যা ৩৫০ ; সন ১২৪৮।

৩৯। গজেন্দ্রমোক্ষণ—ভবানীদাস প্রণীত। শকাব্দা ১৬১৫ হঃ লিঃ।

৪০। গীতগোবিন্দ—(অনুবাদক)—অজ্ঞাত লেখক। "হেন জয়দেব-বাক্যরচনা সংস্কৃতে। ভাঙ্গিয়া করিল আমি সংস্কৃত প্রাকৃতে॥ এই দোষ আমায় ক্ষেমিবে শ্রীকৃষ্ণভক্তগণ। বৈষ্ণবের আজ্ঞাহেতু আমার রচন॥ সমাপ্ত করিল গজইক্ষুরস সোমে।" কৃষ্ণপক্ষ আষাঢ়ের দিবস পঞ্চমে॥ পটের তৃতীয় কর মধ্যেতে আকার। সেই নদীর নিকটে কেবল পূর্ব্বাধার॥ ইন্দ্রের বাহন পরে দময়ন্তীপতি। বিরচিল সেই গ্রামে করিয়া বসতি॥"

৪১। গীতগোবিন্দসার—গীতগোবিন্দের অনুবাদ।

৪২। গীতগোবিন্দরতিমঞ্জরী—ঘনশ্যামদাস (দিব্যসিংহের পুত্র)।

৪৩। গুরুদক্ষিণা—অযোধ্যারামপ্রণীত। হঃ লিঃ ১২২২ সন। শ্লোক ১৫০।

৪৪। গুরুদক্ষিণা—পরশুরামপ্রণীত। শ্লোক ১৫০। হঃ লিঃ ১২৫৬ সাল।

৪৫। গুরুদক্ষিণা—স্বরূপরাম। হঃ লিঃ ১২৫৩ বাং।

৪৬। গুরুদক্ষিণা—শঙ্করপ্রণীত। হঃ লিঃ ৪৪৪৪ সাল, শ্লোক ৩০০।
৪৭। গুরুশিষ্যসংবাদ—নরোত্তমদাসপ্রণীত, হঃ লিঃ ১২২২।
৪৮। গুরুশিষ্যসংবাদ—হঃ লিঃ ১২৫৩ বাং
৪৯। গোপালবিজয়—কবিশেখর প্রণীত। শ্লোকসংখ্যা ২৫০০। হঃ লিঃ শকাব্দা ১৭০১।
৫০। গোপীভক্তিরস বা কৃষ্ণলীলা—খণ্ডিত। শ্লোকসংখ্যা (প্রাপ্ত) ২১০০।
৫১। গোবিন্দরতিমঞ্জরী—ঘনশ্যামদাসপ্রণীত। সুন্দর পদাবলী।
৫২। গোলোকবস্তুবর্ণন—গোপালভট্টপ্রণীত। শ্লোকসংখ্যা ১০০।
৫৩। গৌরগণাখ্যান—দেবনাথপ্রণীত, ভক্তগণের বিবরণ। শ্লোকসংখ্যা ৩২৫।
৫৪। গৌরগণোদ্দেশদীপিকা—দ্বিজ রূপচরণ দাস, কর্ণপূরকৃত সংস্কৃতের অনুবাদ।
৫৫। ঐ হৃদয়ানন্দ দাস—গ্রন্থকার খণ্ডবাসী রঘুনন্দন বংশীয়। এখানিও কবিকর্ণপূরকৃত সংস্কৃতের অনুবাদ।
৫৬। গৌরীবিলাস—দ্বিজ রামচন্দ্র প্রণীত।
৫৭। ঘুঘুচরিত্র—ভবানন্দপ্রণীত। হঃ লিঃ ১২১২ সাল।
৫৮। চন্দ্রচিন্তামণি—প্রেমানন্দ দাস প্রণীত, গদ্যপদ্যময় গ্রন্থ। "কনকমঞ্জরী পাদপদ্ম অভিলাষে। চন্দ্রচিন্তামণি কহে প্রেমানন্দ দাসে॥"
৫৯। চমৎকারচন্দ্রিকা—শ্রীমুকুন্দদাস—হঃ লিঃ ১২৪২ সাল।
৬০। ঐ—নরোত্তম দাস—হঃ লিঃ ১১৪৫ সাল।
৬১। চম্পক-কলিকা—গদ্যাংশযুক্ত পদ্যগ্রন্থ, শ্রীরসময় দাস প্রণীত।
৬২। চাটুপুষ্পাঞ্জলী—রূপগোস্বামী-বিরচিত খণ্ডিত পুঁথি।
৬৩। চিন্তামণিটীকা—খণ্ডিত। হঃ লিঃ ১২৪৩ সাল।
৬৪। চৈতন্যচন্দ্রামৃত—প্রবোধানন্দ সরস্বতীকৃত সংস্কৃত চৈতন্যচন্দ্রামৃতের অনুবাদ।
৬৫। চৈতন্যচন্দ্রোদয়কৌমুদী—প্রেমদাস বিরচিত, জীবনাখ্যায়িকা গ্রন্থ। শ্লোকসংখ্যা ৩৮২৫। হঃ লিঃ ১১০৬ সাল।
৬৬। চৈতন্যতত্ত্বসার—রামগোপালদাস প্রণীত, হঃ লিঃ ১০৮১। "শ্রীমধুমতীচরণে যার অভিলাষ। চৈতন্যতত্ত্বসার কহে রামগোপাল দাস॥"
৬৭। চৈতন্যপ্রেমবিলাস—লোচনদাসপ্রণীত। শ্লোক ১০০।
৬৮। চৈতন্যমহাপ্রভু—হরিদাস প্রণীত। হঃ লিঃ ১২২০ সাল। শ্লোক ২৫০।
৬৯। চৈতন্যরসকারিকা—যুগলকিশোর দাস প্রণীত। ৩০।
৭০। জগন্নাথমঙ্গল—দ্বিজ মুকুন্দ প্রণীত। হঃ লিঃ। শকাব্দা ১৭৩৫। শ্লোকসংখ্যা ২০৪০।
৭১। জয়গুণের বারমাস্যা—প্রায় ১৫০ বৎসর গত হইল চট্টগ্রামস্থ আনোয়ার নিবাসী মহম্মদ হারি কর্ত্তৃক বিরচিত, সংস্কৃতাত্মক মধুর পদাবলী।
৭২। জ্ঞানরত্নাবলী—কৃষ্ণদাসপ্রণীত।
৭৩। ঝাড়ন মন্ত্র সংগ্রহ—খণ্ডিত।
৭৪। তত্ত্বকথা—যদুনাথ দাস প্রণীত। খণ্ডিত পুঁথি।

৭৫। তত্ত্ববিলাস—বৃন্দাবন দাস প্রণীত। হঃ লিঃ ১০৮৭। শ্লোক ৮৫০।

৭৬। তামাকুচরিত্র—সীতারাম কর প্রণীত।

৭৭। তুলসীচরিত্র—দ্বিজভগীরথ প্রণীত। হঃ লিঃ ১২৫৩ সন। শ্লোকসংখ্যা ১৮০।

৭৮। ত্রিগুণাত্মিকা—ক্ষুদ্র গদ্য-ব্যাখ্যাময় পুস্তক। সন ১১১২।

৭৯। দধিখণ্ড—বৃন্দাবন বিরচিত। হঃ লিঃ সন ১২১৩।

৮০। দণ্ডীপর্ব্ব—কবি মহীন্দ্র প্রণীত। হঃ লিঃ ১২৫৯ সন। শ্লোকসংখ্যা ১৫০০।

৮১। দর্পণচন্দ্রিকা—নরসিংহ দাস প্রণীত। হঃ লিঃ ১২৬৭ সাল। শ্লোক ২৫০।

৮২। দময়ন্তীর চৌতিশা—বিষ্ণুসেন প্রণীত।

৮৩। দানখণ্ড—জীবন চক্রবর্ত্তী প্রণীত। শ্লোকসংখ্যা ২২৫।

৮৪। দাসগোস্বামীর সূচক—রাধাবল্লভ দাস প্রণীত, হঃ লিঃ ১২৫৬ সাল। শ্লোকসংখ্যা ৫০।

৮৫। দ্বাদশপাট নির্ণয়—নীলাচল দাস প্রণীত, গদ্যপদ্যময় পুঁথি। শ্লোক ১১০; শেষ এইরূপ:—"দ্বাদশ পাটের নির্ণয়। আদৌ ঠাকুর অভিরামের পাট খানাকুল কৃষ্ণনগর ১। অম্বিকা গৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুর ২। আকনা মহেশ পণ্ডিত ঠাকুর ৩। ঠাকুর সুন্দরানন্দ হলদা মহেশপুর ৪। উদ্ধরণ দত্ত সপ্তগ্রাম ৫। কাল্যা কৃষ্ণদাস আকাইহাটের ৬। এই ছয় পাঠ। নবদ্বীপ পুরুষোত্তম পণ্ডিত ঠাকুর ১। কমলাকর পিপলাই ২। ধনঞ্জয় পণ্ডিত ৩। পরমেশ্বরীদাস ঠাকুর ৪। মুকুন্দদাস ঠাকুর ৫। কাশীশ্বরদাস ঠাকুর ৬। জোজানে মালীদাস ঠাকুর নবদ্বীপে ছয় পাট (?) উপমহান্ত গোবিন্দ ঘোষ ঠাকুরের পাট অগ্রদ্বীপ ১, তমলুকে বাসুদেব ঘোষ ঠাকুর ২, গৌরীপুর। ৩।

৮৬। দ্বারকাবিলাস—দ্বিজ জয়নারায়ণ প্রণীত। হঃ লিঃ ১২৫২। শ্লোক সংখ্যা ২০০০।

৮৭। দিনমণিচন্দ্রোদয়—মনোহর দাস "শ্রীযুক্ত অনঙ্গমঞ্জরীর পদে আশ। দিনমণিচন্দ্রোদয় কহে মনোহর দাস।"

৮৮। দীপকোজ্জ্বল—বংশীদাস প্রণীত, (বৃহৎ পুঁথির অবশেষ বলিয়া বোধ হয়)।

৮৯। দেহনিরূপণ—লোচন দাস প্রণীত, শ্লোকসংখ্যা ১০০।

৯০। দেহভেদতত্ত্বনিরূপণ—গদ্যপদ্যময় ক্ষুদ্র পুঁথি।

৯১। দুই দশার ব্যাখ্যা—হঃ লিঃ ১২৬৭ সাল।

৯২। দুর্গামঙ্গল—দ্বিজরামচন্দ্র প্রণীত।

৯৩। ধর্ম্মমঙ্গল—দ্বিজরামচন্দ্র প্রণীত "দ্বিজরামচন্দ্র গায় নিবাস চাযটে।"

৯৪। ধ্রুবচরিত—ভারত পণ্ডিত। শ্লোক ৫৯০।

৯৫। ঐ—চট্টগ্রামনিবাসী লক্ষ্মীকান্ত দাস বিরচিত।

৯৬। নবদ্বীপপরিক্রমণ—ক্ষুদ্র পুঁথি।

৯৭। নামামৃতসমুদ্র—নরহরি দাস প্রণীত। শ্লোকসংখ্যা ২৯০।

৯৮। নারায়ণদেবের পাঁচালী—দীনরাম লিখিত।

৯৯। নারদপুরাণ—কৃষ্ণদাস, হঃ লিঃ ১১০৮ সাল। গ্রন্থশেষে কবির পরিচয় এইরূপ, "অতঃপর কহি শুন নিজ সমাচার। সুবর্ণবণিক-কুলে উৎপত্তি আমার। পৈত্রিক বসতি পূর্ব্বে অম্বিকানগর। হাঁসপুকুর নাম যথা

তাহার উত্তর॥ পিতামোহ নাম ছিল মদনমোহন। পিতা তারাচাঁদ নাম ধর্ম্মপরায়ণ॥ এ সকল পুণ্যবান্ আছে পূর্ব্বকীর্ত্তি। এ অধমের সংসারে রহিল অপকীর্ত্তি॥ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম ছিল রামনারায়ণ॥ ভেক আশ্রয় হয়্যা তীর্থ করেন ভ্রমণ॥ রঘুনাথ মধ্যম ভাই অধিক পুণ্যবান। স্বর্গবাসে গেলা তিঁহ চাপিয়া বিমান॥ আপনি কনিষ্ঠ মোর রামকৃষ্ণ নাম। সাকিম কলিকাতা বহুবাজারেতে ধাম॥ দশ দশ শত নিরেনব্বুই সালে। মাহ জ্যৈষ্ঠ মাসে এই পুস্তক রচিলে।

১০০। নিকুঞ্জরহস্যস্তব গীতাবলী—শ্রীরূপ এবং সনাতনাকৃত মূল এবং বংশীদাস কৃত অনুবাদ হঃ লিঃ ১২০৬ সাল।

১০১। নিগম—শ্লোক ১৬০। হঃ লিচ ১২২২ সাল।

১০২। নিগমগ্রন্থ—গোবিন্দদাস প্রণীত, হঃ লিঃ ২৫৫ বাং। ১৪০।

১০৩। নিগমগ্রন্থ।

১০৪। নিগূঢ়ার্থ-প্রকাশাবলী—গৌরীদাস প্রণীত। শ্লোক ১৫৫৫। বৈষ্ণব ধর্ম্মের রূপক গ্রন্থ।

১০৫। নিগূঢ় তত্ত্ব—হঃ লিঃ ১২৪২ সাল।

১০৬। নিত্যবর্ত্তমান—শ্রীজীব গোস্বামী।

১০৭। নিমাইচাঁদের বারমাস্যা।

১০৮। নিষ্কামী আশ্রয় নির্ণয়—এই পুস্তকে রূপ ও রঘুনাথ গোস্বামীর কথায় ভক্তির ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে।

১০৯। নৌকাখণ্ড—জীবন চক্রবর্ত্তী, হঃ লিঃ ১২০২ সাল, শ্লোক ১২০।

১১০। পাষণ্ডদলন—কৃষ্ণদাস।

১১১। প্রার্থনা—লোচনদাস ঠাকুর।

১১২। প্রেমদাবানল—নরসিংহ—শ্লোকসংখ্যা ৩০০।

১১৩। প্রেমবিলাস বিলাপ—যুগলকিশোর দাস। শ্লোক ৫৪২।

১১৪। প্রেমভক্তিসার—গুরুদাস বসু প্রণীত।

১১৫। প্রেমামৃত—গুরুচরণ দাস। শ্রীনিবাস আচার্য্যের জীবনকাহিনী। গ্রন্থকার শ্রীনিবাসাচার্য্যের দ্বিতীয়া পত্নী গৌরপ্রিয়ার আদেশে পুস্তক রচনা করেন। শ্লোকসংখ্যা ৪৪০০।

১১৬। বাণ-যুদ্ধ—শ্রীগৌরীচরণ গুহ বিরচিত।

১১৭। বিক্রমাদিত্য উপাখ্যান—খণ্ডিত।

১১৮। বিদ্যাসুন্দর—শ্রীনিধিরাম কবিরত্ন প্রণীত।

১১৯। বিলাপকুসুমাঞ্জলি—শ্রীরঘুনাথ ও রাধাবল্লভ দাস প্রণীত। রাধিকার স্তব।

১২০। বিলাপবিবৃত্তিলাতা—খণ্ডিত।

১২১। বীররত্নাবলী—গীতিগোবিন্দ।

১২২। ব্রজতত্ত্বনিবর্ত্ত—হঃ লি ১০৮২ সাল।

১২৩। বৃন্দাবন ধ্যান—খণ্ডিত।

১২৪। বৃন্দাবন-পরিক্রমা—দুইখানি পাওয়া গিয়াছে—একখানি কৃষ্ণদাস প্রণীত ও অপরখানি শ্যামানন্দ পুরী প্রণীত। বৃন্দাবনের স্থান মাহাত্ম্য।

১২৫। বৈষ্ণববন্দনা—শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর। হঃ লিঃ ১০৮৮।

১২৬। বৈষ্ণবামৃত—খণ্ডিত।

১২৭। ভজনমালিকা—কৃষ্ণরাম দাস।

১২৮। ভক্তি উদ্দীপন—নরোত্তম দাস।

১২৯। ভক্তি চিন্তামণি—বৃন্দাবন দাস—শ্লোক ৬০০। হঃ লিঃ ১০৬৯ সাল।

১৩০। ভক্তিরসাত্মিকা—অকিঞ্চন দাস—শ্লোক ১৭৫।

১৩১। ভক্তিরসাত্মিক—খণ্ডিত।

১৩২। ভগবদ্গীতা—বিদ্যাবাগীশ ব্রহ্মচারী প্রণীত। গীতার অনুবাদ। পুঃ নঃ ১২৪৬ বাং।

১৩৩। ভ্রমরগীতা—দেবনাথ—দাস—শ্লোকসংখ্যা ২৫০।

১৩৪। ভ্রমরগীতা—খণ্ডিত।

১৩৫। ভাণ্ডতত্ত্বসার—রসময় দাস—হঃ লিঃ ১২৭৬ সাল। শ্লোক ২৫০।

১৩৬। মঙ্গলচণ্ডী—রঘুনাথ দাস—হঃ লিঃ ১২২৪ সন, শ্লোক ১৫০।

১৩৭। মঙ্গলচণ্ডী—শ্রীমদন দত্ত বিরচিত।

১৩৮। মদনমোহনবন্দনা—জয়কৃষ্ণ দাস—হঃ লিঃ ১২৬৭ সাল।

১৩৯। মনঃশিক্ষা—গিরিবর দাস—হঃ লিঃ ১১৪৮ সন, শ্লোক ৩৫০।

১৪০। মনসামঙ্গল—জগন্নাথ (বৈদ্য)। খণ্ডিত পুঁথি।

১৪১। মনসামঙ্গল—জগমোহন মিত্র প্রণীত। শেষাংশে গ্রন্থকার তাঁহার বংশের সুবিস্তৃত পরিচয় দিয়াছেন। আমরা সেই দীর্ঘ বিবরণ এখানে উদ্ধৃত করিবার একান্ত স্থানাভাব স্বীকার করিতেছি। বালাণ্ডার গোহপুরে তাঁহার বংশীয় ব্যক্তিগণ বহুপুরুষ পূর্ব্ব হইতে বাস করিতেছিলেন। কবির পিতার নাম রামচন্দ্র। নিজের নাম সম্বন্ধে কবি সাধু বৈষ্ণবের ন্যায় বিনয় করিয়া লিখিয়াছেন, "নাম রাখিয়াছে সবে শ্রীজগমোহন। অন্ধের যেমন নাম কমললোচন॥" কবি জগমোহন ১৭৬৬ সালে মনসামঙ্গল রচনা করেন। তিনি নিজে পণ্ডিত ছিলেন বলিয়া বোধ হয়; সাঙ্কেতিক ভাবে পুস্তকরচনার কাল নির্দ্দেশ করিয়া "মূর্খের হইবে দুঃখ সূক্ষ্ম ভাবনায়" বিবেচনা করত মূর্খগণের প্রতি কৃপাপরায়ণতার একশেষ দেখাইয়া নিজের সংস্কৃতের ব্যাখ্যা নিজেই করিয়াছেন। প্রাপ্ত পুঁথির শ্লোকব্যাখ্যা ৬৭০০।

১৪২। মনসামঙ্গল—জীবন চক্রবর্ত্তী প্রণীত।

১৪৩। মাধব মালতী—দ্বিজরাম চক্রবর্ত্তী প্রণীত।

১৪৪। মুক্তাচরিত্র—নারায়ণ দাস প্রণীত। ১০৪৬ শকে বিরচিত, হঃ লিঃ ১১০৪ সাল। শ্লোকসংখ্যা ২০০০।

১৪৫। মোহমুদ্গর—পুরুষোত্তম দাস প্রণীত। হঃ লিঃ ১১৯৯ সন।

১৪৬। যম উপাখ্যান—শঙ্কর দাস, হঃ লিঃ, ১২৫৩ সাল. শ্লোক ১২৫।

১৪৭। যোগাগম—যুগলদাস—শ্লোক ২২৫।

১৪৮। রতিবিলাস—রসিক দাস প্রণীত, শ্লোক ২৯০।

১৪৯। রতিমঞ্জরী—হঃ লিঃ শকাব্দা ১৬৯০ শ্লোক ১০০।

১৫০। রতিশাস্ত্র—গোপাল দাস প্রণীত, শ্লোক ১৫০।

১৫১। রত্নমালা—পদ্যসংগ্রহ।

১৫২। রসকদম্ব—কবিবল্লভ প্রণীত। কবিবল্লভের পিতার নাম রাজবল্লভ, মাতার নাম বৈষ্ণবী, নরহরি দাস কবির দীক্ষা-গুরু। মুকুটরায় নামক ব্রাহ্মণ বন্ধুর অনুরোধে ১৫২০ শকে তিনি এই কাব্য রচনা করেন। কবিবল্লভের বাসস্থান "করতোয়াতীরস্থ মহাস্থানের সমীপবর্ত্তী আমবাড়া গ্রাম।" বর্ণনা মধ্যে মধ্যে বেশ সুন্দর। বৈকুণ্ঠ বর্ণনা হইতে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত হইল।

"গীতছন্দে কথা যাতে নৃত্যাচ্ছন্দে গতি। সহজ কথনে যাতে বেদের উৎপত্তি॥
না ভোগিলে সর্ব্ব রস ভোগে সর্ব্বজন। না দেখিয়া সর্ব্বরূপ করে নিরীক্ষণ॥
না বলিলে সর্ব্ব কথা বোঝে অনুমানে। না শুনিলে সর্ব্ব ধ্বনি শুনে সর্ব্বজনে॥
না জানিঞা জানে সবে না রমিঞা রমে। মনের সকল কর্ম্ম পূরে বিনিশ্রমে॥"

১৫৩। রসকল্পসার—নিত্যানন্দ দাস প্রণীত, হঃ লিঃ শক ১৭০১, শ্লোক ৮০।

১৫৪। রসভক্তিচন্দ্রিকা—নরোত্তম দাস প্রণীত, শ্লোক ১২৫।

১৫৫। রসসাগর,—কৃষ্ণনগরের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভাসদ্ কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ীর উপাধি। তৎপ্রণীত বিবিধ উদ্ভট্ কবিতার অন্য কোন সংজ্ঞা না পাইয়া আমরা উহা "রসসাগর" নামে অভিহিত করিব। রসসাগরের উদ্ভট্ কবিতাগুলি তদীয় উপস্থিত বুদ্ধি ও তীক্ষ্ণ রহস্য শক্তির পরিচায়ক। "বড় দুঃখে সুখ," "গাভীতে ভক্ষণ করে সিংহের শরীর," "কাট পাথরে প্রভেদ কি?" প্রভৃতি সমস্যা তাঁহার নিকট উপস্থিত করাতে তিনি নিম্নলিখিতভাবে তাহার পূরণ করিয়াছিলেন—

"বড় দুঃখে সুখ।"

"চক্রবাক চক্রবাকী এক (ই) পিঞ্জরে,
নিশিতে নিষাদ আনি রাখিলেক ঘরে॥
চখা কহে চখী প্রিয়ে এ বড় কৌতুক।
বিধি হ'তে ব্যাধ ভাল বড় দুঃখে সুখ॥"

"গাভীতে ভক্ষণ করে সিংহের শরীর।"

"কৃষ্ণের নগর কৃষ্ণনগর বাহির।
বার (ই)য়ারী মা ফেটে হয়েছেন চৌচীর॥
ক্রমে ক্রমে খড় দড়ি হইল বাহির।
গাভীতে ভক্ষণ করে সিংহের শরীর।"

"কাঠ পাথরে প্রভেদ কি ?"

"তোমার চা'ল না চুলো ঢেঁকি না কুলো
পরের বাড়ী হবিস্থি।
আমি দীন দুঃখী, নাই লক্ষ্মী,
কতকগুলি কুপুষ্যি॥
আমার কাঠের না, দিলে পা
না' হবে মোর মুনিষ্যি।
আমি ঘাটে থাকি, বুদ্ধি রাখি,
কাঠপাথরে প্রভেদ কি ?"

১৫৬। রসোজ্জ্বল—জগন্নাথ দাস প্রণীত, শ্লোক ৬৬০, হঃ লিঃ ১২৮৯ সাল।

১৫৭। রসোদ্ধার—প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তৃপক্ষগণের ৩৬টি পদ সংগ্রহ।

১৫৮। রাগমালা—নরোত্তম দাস প্রণীত, শ্লোক ১৮০। হঃ লিঃ ১১৪৩।

১৫৯। রাগমার্গলহরী—শ্লোক ১২৫।

১৬০। রাগরত্নাবলী—কৃষ্ণদাস প্রণীত, শ্লোক সংখ্যা ২০০। হঃ লিঃ ১২৪৭ সাল।

১৬১। রাগরত্নাবলী—মুকুন্দ গোস্বামী।

১৬২। রাধাকৃষ্ণলীলারসকদম্ব—যদুনন্দন দাস বিরচিত, বিদগ্ধমাধবের অনুবাদ। যদুনন্দন দাস কৃত অপরাপর পুস্তকের ন্যায় এই পুস্তকেও "শ্রীল হেমলতা ঠাকুরাণী"র প্রতি বন্দনাদি আছে। প্রাপ্ত পুঁথির হঃ লিঃ ১০৯০ সাল।

১৬৩। রাধাচৌতিশা—দেবদাস প্রণীত।

১৬৪। রাধারাগসূচক—(রঘুনাথ দাস গোস্বামী-কৃত মূলের বঙ্গানুবাদ) রাধাবল্লভ দাস প্রণীত। শ্লোক ৫০; হঃ লিঃ ১২৭৫ সাল।

১৬৫। রামায়ণ—গোবিন্দ দাস প্রণীত। আদি, অযোধ্যা, সুন্দরা, কিষ্কিন্ধ্যা, লঙ্কা, উত্তর কাণ্ড পাওয়া গিয়াছে। এই কয়েক কাণ্ডের শ্লোকসংখ্যা এইরূপ,—আদি, ১৫০০। অযোধ্যা ৭৫০। কিষ্কিন্ধ্যা, ১০০০। সুন্দরা, ৩৪০০। লঙ্কা, ৯৯০০। উত্তরাকাণ্ড, ৮৩৫০। গ্রন্থকারের পরিচয় এই—"কুঞ্জবিহারী পিতামহ সিদ্ধ অভিলাষ। তাহার তনয় বটে শোভারাম দাস। গাইল গোবিন্দ দাস তাহার অনুজ। কে যাবে বৈকুণ্ঠপুরী শ্রীরামেরে ভজ॥ গোবিন্দ দাসের মন রাম গুণনিধি। কি দোষ পাইয়া তবে বাদ সাধে বিধি॥ যে কর সে কর মোরে নিল মুনিরাম। শেষ হৈলে পরমায়ু বিধি হৈল বাম॥ শিশু গোবিন্দ দাস গায় রামনাম। আমি কি গাওয়াব মোরে গাওয়ান যে রাম॥"

১৬৬। রামরত্ন গীতা—ভবানীদাস রচিত হঃ লিঃ ১২৭৫ সাল।

১৬৭। রায়বার—দ্বিজ তুলসী। শ্লোক ১২৫।

১৬৮। রাসপঞ্চাধ্যায়—গঙ্গাধর দাস।

১৬৯। রূপমঞ্জরী—কৃষ্ণদাস প্রণীত। শ্রীরূপ গোস্বামীর অন্তর্দ্ধানে বিলাপ। অনুবাদক বৈষ্ণবদাস। হঃ লিঃ ১২৪৪।

১৭০। লক্ষ্মীব্রত পাঁচালী—শ্লোক সংখ্যা ১০৮। দ্বিজ অভিরাম প্রণীত।

১৭১। লীলামৃতসার—বৃন্দাবন দাস।

১৭২। বস্তুতত্ত্ব—সহজিয়া গ্রন্থ।

১৭৩। শতস্কন্ধবধ—কৃত্তিবাস—হঃ লিঃ ১২৫০।

১৭৪। শাখাবর্ণন—রসিক দাস।

১৭৫। শ্যামাপদ প্রকাশ—কৃষ্ণদাস—হঃ লিঃ ১২১১ বাঃ শ্যামানন্দের প্রসঙ্গ।

১৭৬। শিবায়ন রামকৃষ্ণ দাস কবিচন্দ্র—হঃ লিঃ ১০৯১ সাল।

১৭৭। শুক পরীক্ষিৎ-সংবাদ—হরিচরণ—৯ পত্র খণ্ডিত পুঁথি। গ্রন্থকারের পিতার নাম দাশরথি, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম মুনিরাম।

১৭৮। সংকীর্ত্তনামৃত—দীনবন্ধু দাস। পত্রসংখ্যা, ১২৭; লিপিকাল, ১৬৯৩। শকাব্দা। পঁয়ত্রিশ জন পদকর্ত্তার পদ সম্বলিত পুঁথি শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয়ের গ্রন্থাগারে ছিল।

১৭৯। সত্যনারায়ণ—ফকিররাম দাস। গ্রন্থকারের নামটি যেমন, রচনায় ভাষাও সেই প্রকার যাবনিক ভাষার সংমিশ্রণে সিদ্ধ। সত্যনারায়ণ ও সত্যপীরের সঙ্গে সম্মিলিত। ভাষার নমুনা—"দেব থাকে পুরাণ কোরাণ থাকে দেখো। জোই রাম রহিম দোনহি হোয়ে একো॥ "ফকির রাম কবিরাজে কয়। যাক্ দেখি বড় মঙ্গলময়॥ ইতি সন হাজার সতর ১০১৭ জ্যৈষ্ঠ মাসে। সাঙ্গ কৈল পুস্তক ফকিররাম দাসে॥" শ্লোক ৮৫০॥

১৮০। সত্যনারায়ণ—নরহরি। শ্লোক ১৩৫।

১৮১। সত্যনারায়ণ—দ্বিজ রামকৃষ্ণ, হঃ লিঃ ১১৪১ সন।

১৮২। সত্যনারায়ণ—দ্বিজ বিশ্বেশ্বর—শকাব্দা ১১৫১। শ্লোক ২৭০।

১৮৩। সত্যপীর-কথা—শঙ্করাচার্য্যে—হঃ লিঃ ২০৬২ সাল।

১৮৪। সদ্ভাবচন্দ্রিকা—নরোত্তম দাস—খণ্ডিত পুঁথি, শ্লোক ৪৩২।

১৮৫। সনাতন গোস্বামীর সূচক—রাধাবল্লভ দাস—সাল ১২০০ হঃ লিঃ।

১৮৬। সরকার ঠাকুর-শাখা বর্ণন—রামগোপাল দাস।

১৮৭। সহজতত্ত্ব—রাধাবল্লভ দাস। হঃ লিঃ ১১৯৫ সাল।

১৮৮। সাধন লক্ষণ—খণ্ডিত।

১৮৯। সাধন কথা—গণ্ডপুস্তক, হঃ লিঃ, ১১৫৮।

১৯০। সাধনোপায়—মুকুন্দদাস।

১৯১। সাধ্যপ্রেমচন্দ্রিকা—নরোত্তম দাস, শ্লোক ১৮২।

---

* সম্প্রতি মুকুন্দরামের ভ্রাতা কবিচন্দ্রকে "অযোধ্যারাম" প্রতিপন্ন করিয়া শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফি মহাশয় একটি গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিতেছেন।

১৯২। সাধ্যবস্তুসাধন—হঃ লিঃ ১২৫২ সাল, শ্লোক ৩১২।

১৯৩। সারসংগ্রহ—কৃষ্ণদাস কবিরাজ। হঃ লিঃ ১১৮৫ সন।

১৯৪। সারাৎসার কারিকা—হঃ লিঃ, ১২৬৬ সাল।

১৯৫। সিদ্ধসার—গোপীনাথ দাস, হঃ লিঃ সন ১২২৫, শ্লোক ১৮০।

১৯৬। সিদ্ধান্তচন্দ্রিকা—রামচন্দ্র দাস, হঃ লিঃ সন ১০৮২ শ্লোক ২৬০।

১৯৭। সিদ্ধিনাম—কৃষ্ণদাস কবিরাজ, হঃ লিঃ শকাব্দা ১৭১৮, শ্লোক ১২।

১৯৮। সুদামচরিত্র—বিপ্র পরশুরাম, হঃ লিঃ সন ১২৩ সাল শ্লোক ২০০।

১৯৯। সুধন্বার চৌতিশা—রামানন্দ।

২০০। সূর্য্যব্রত পাঁচালী—১৬১১ শকাব্দাতে শ্রীরামজীবন কর্ত্তৃক প্রণীত।

২০১। স্মরণ-দর্পণ—রামচন্দ্র দাস—হঃ লিঃ সন ১০৮৩, শ্লোক ১৫০।

২০২। স্মরণ মঙ্গল—নরোত্তম দাস—শকাব্দা ১৬৪০ হঃ লিঃ।

২০৩। স্মরণ মঙ্গল সূত্র—গিরিধর দাস।

২০৪। স্বরূপ বর্ণন—কৃষ্ণদাস, গদ্যপদ্যময় পুস্তক হঃ লিঃ সন ১০৮১।

২০৫। হংসদূত—নরসিংহ দাস—হঃ লিঃ সন ১২০১।

২০৬। হংসদূত—দাস গোস্বামী—হঃ লিঃ সন ১০৭৫, শ্লোক ১০০০।

২০৭। হরপার্ব্বতীবিবাহ—তিলকচন্দ্র, হঃ লিঃ সন ১১০৭।

২০৮। হরপাঁচালী—দ্বিজ বৈষ্ণবদাস।

২০৯। হরিনামকবচ—গোপীকৃষ্ণ দাস—হঃ লিঃ সন ১১৬৫। শ্লোক ১০৪।

২১০। হাটবন্দনা—বলরাম দাস—হঃ লিঃ ১১৭৫। শ্লোক ১২৫।

ইহার পরে আরও এত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, যাহার বিবরণী দিতে গেলে পুস্তক খানি অতি বৃহদায়তন হইয়া পড়িবে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পুঁথি শালায় ৭০০০ পুঁথির ক্যাটালোগ ছাপা হইতেছে। ইহা ছাড়া সাহিত্য-পরিষদ্ লাইব্রেরী এবং অপরাপর স্থানে বহু পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে। বঙ্গদেশে প্রাচীনকালে সাহিত্য-চর্চ্চা যে কতটা প্রসার লাভ করিয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা করা কঠিন।

A

DESCRIPTIVE CATALOCUE

OF

BENGALI WORKS

CONTAINING A CLASSIFIED LIST

OF

FOURTEEN HUNDRED BENGALI
BOOKS & PAMPHLETS

WHICH
HAVE ISSUED FROM THE

PRESS

During the last sixty years
with occasional notices of
the subjects, the prices
& where printed

BY

J. Long

CALCUTTA

PRINTED BY

SANDERS, CONES & CO.

No. 65, Cossitollah.

1855

PREFACE

THE object of this work is to be a guide to those who wish to procure Bengali Books, either for educational purposes, or for gaining an acquaintance with the Hindu manners, customs, or modes of thought. Popular Literature is an Index to the state of the popular mind.

While we have "Sir H. Elliot's Index to the Muhammadan Historians of India," "Adelung's Gude to Sanskrit Works," edited by Professor Wilson, "Sprenger's Catalogue of the Lucknow Oriental Libraries,' published at the expense of the Government of India, and Garcin De Tassi's "History of Hindustani Literature," published by the Oriental Translation Fund, and dedicated to the Queen, we have hitherto had no list of Bengali works to shew what has been done, what is doing, what ought to be done.

This Catalogue is an extract from a larger one, which the author is preparing for the press, and which will enter more into detail on various points.

The learned native by observing the comparative poverty and richness of the literature of his native tongue, will see the sphere of usefulness that lies before him, in translation or original composition.

As such a number of works has been noticed, about 1,400, the remarks on each must be necessarily very brief. Those works obtainable, and suitable for general circulation, have numbers affixed to them, and are procurable, through Messrs. Rozario and Co., or Hay and Co., on condition of cash payments.

The greater part of these books can be seen at the Public Library, where a Vernacular Library has been established, through the munificence of Babu Jaykissen Mukerjyea.

ABBREVIATIONS.

(A. B.) Printed in English and Bengali.
(As.) Annas.
(A. I. U.) Anglo Indian Union Press.
(B. C. P.) Bishop's College Press.
(Bh. P.) Bhaskar Press.
(Bi. B. P.) Bindu Basini Press.
(Ch. P.) Chandrika Press.
(C. K. S.) Christian Knowledge Society.
(E. T.) Translation from the English.
(Ed.) Edition.
(G. B. A.) Government Book Agency.
(Jy. A.) Jyan Akar.
(Kal.) Kamal Alay Press.
(K. R.) Kabita Ratanakar.
(M. L) Mohendra Lal Press.
(P.) Press.
(P. T.) Translated from the Persian.
(P. P.) Purnachandraday Press,
(P) Prabhakar Press.
(Roz. Co.) Rozario Co's Shop.
(Rs.) Rupees.
(S B. S) School Book Society.
(Ser. P.) Serampur Press, (Marshman.)
(S. T.) Translated from the Sanskrit.
(S B.) Sanskrit and Bengali.
(S. P.) Sanskrit Press.
(Su. P.) Superior Press,
(Tr.) Translation.
(T. S.) Tract Society.

A DESCRIPTIVE CATALOGUE of BENGALI BOOKS.

PART 1.

EDUCATIONAL.

ARITHMETICS.

The Rules of Common Arithmetic, set to doggrel rhyme, by a Khaystha, one SUBHANKAR, the Cocker of Bengal, have been chaunted for 150 years in some 40,000 Vernacular schools—thus the Hindus took the lead in a practice which has been since introduced into our English infant schools. See the London Asiatic Journal for 1817 for an excellent account of the Hindu mode of teaching Arithmetic.

In 1817 appeared at the Serampore Press, in three parts, Smyth's JAMINDARI PAPERS, pp.150, a very useful work for Village Schools, which gave the whole system of keeping Zemindar's accounts. It deserves a reprint, as a knowledge of Zemindary accounts affects the interests of all in a country where the land is so sublet, and such minute calculations have to be kept of the trees, &c., on it. In 1817 Mr. May, a most successful teacher of Vernacular Schools, published a collection of ARITHMETICALTABLES, selected from those employed in the Native Schools. "It is remarkable that many coincidences may be traced between them, and the most improved kind of Arithmetical Tables adopted in the schools in Britain on the new model." The Natives of all ranks soon bought up this edition. Since that period, through the almost universal neglect of an improved Vernaculor education, little has been done in this department. In 1840 the Tatwabodhini Sabha published Anakasa Sikikasa, 2 as, Arithmetical Tables on annas and sikis; the same year was published for the Hindu College Patshala an Arithmetic, pp. 55.

1. CHATTURJEA'S ARITHMETIC, S. B. S. 1854, pp, 145, 6 as. Ganita Sar. Taken from Keith, Bonnycastle's Arithmetic, the Universal Calculatŏr, *Subhankar.* Gives the Rule of Three, Practice, Interest. the Square Root, Practical Geometry. The most complete system of Arithmetic yet published.

2. HARLEY'S ARITHMETIC, Ganitanka, Ist ed., Chinsura, 1819; 5th ed. 1846 ; pp. 96, 4 as, S. B. S., 3,000 copies sold. Combines the European and Native systems, gives the five chief rules, boat measurements, weights, the symbolical tables applicable to Integers, Fractions, the Rule of Three Direct and Inverse, Native Rules for calculating Areas and Solids, Rules in Verse—the author was Assistant in the Chinsurah Government schools.

3. KHETTRAMOHAN'S ARITHMETICAL TABLES, Dharàpàt, St. P., 1 an., 6th ed, 1853, pp. 21, used in the Hindu College Patshala, of which the author was headmaster.

4. MAY'S ARITHMETIC, Meganita, 2½ as, Ist ed, 1818; 4th ed., 1852. 2 as. S B. S., pp. 50. According to the native system, in verse, selected from those employed in the native schools. Many coincidences may be traced between these and the most improved kind adopted in schools in. England. Met with a rapid sale among natives.

DICTIONARIES.

The first Bengali Dictionary was by Foster, a Civilian and Sanskrit Scholar, Printed in 1799, in 2 vols, containing 18.000 words and sold for Rs. 60. The various applications of English words, idioms and phrases are given in this, which have not been inserted in any subsequent Dictionary. In 1801 MILLER'S DICTIONARY was published by subscription containing matter equal to an 8vo. of 50 pp. for Rs. 32. In 1809 Pitambar Mukhurjea. of Utarpara, published the SHABDA SINDHU, or meanings in Bengali of the AMARA KOSH,a Sanskrit Dictionary. The same year a Dictionary of 3,600 Sanskrit words used in Bengali, with their meanings, pp. 200, was :published at the Hindustani press. In 1817, the Serampore Vernacular School Society, in order to give youths an idea of the formation of their language, published

the Dhatushabdaja, pp. 8. "1,000 of the more common Bengali words are given, arranged in etymological order ; the root being given first and various words in common use, formed from it by the different prepositions and formative terminations, sixty of the most common roots originate the whole 1,000. The method is as pleasing to a native as an alphabetical classification of words to us." In 1821 was published Ram Kissen's VOCABULARY, ENGLISH, LATIN and BENGALI. In 1824 LAVANDIER a teacher of Rammuhan Ray's Anglo Hindu school, translated Mylius' School Dictionary, A. B. pp. 300. In 1825 Haughton published a GLOSSARY, or meaning in English, of 2,500 Bengeli words used in the Batrish Singhasan, Krishna Ray Charitra, Purush Parikhya, Hitopadesha. In 1818 was published at Serampore an Abhidan, or Alphabetical Vocabulary of difficult words. CAREY'S DICTIONARY came out in 1815-25, in three 4 to, vols,. containing 80,000 words, the work of thirty years, which gave us compound words of the editor's own coining ad-libitum, the original price was Rs. 120—but the work is entirely superseded by Haughton's admirable Dictionary—which ought to be in the hands of all school-teachers, scholars, translators, &c. Marshman published in 1827, an Abridgment of Carey's English and Bengali, a work very useful, containing 25,000 words. In 1827 TARACHAND CHAKRABATI published an Anglo Bengali Dictionary of 7,500 words, 6 Rs , pp. 25, B. M. P. meagre, a mere Vocabulary. In 1829 Marshman published a BENGALI AND ENGLISH DICTIONARY of 26,000 words, 10 Rs., and also a reverse one of 24,000 words. But HAUGHTON'S BENGALI and ENGLISH DICTIONARY is the magnum opus, the Johnson of Bengal, a cheap reprint of this, which was published at the expense of the Court of Directors, would be a great desideratum. For translators WILLIAMS' ANGLO SANSKRIT DICTIONARY is invaluable, and ought to be in the hands of all who wish to convey knowledge through Bengali. In 1831 Jagannath Mullick published the Shabda Kalpa Latika, pp. 387, a translation of the Amara Kosha.

Rev. J. Pearson published in 1829, for the School Book Society, a SCHOOL DICTIONARY, English and Bengali, but it was a mere Vocabulary. In 1831 appeared Walker's Dictionary, abridged by Swift, 24,000 words, pp. 376. RAMCOMUL SEN gave a work of great research, the result of 15

years' labor, in 1834, a translation of Todd and Johnson, containing the meaning in Bengali of 58,000 English words, it cost Rs. 50 a copy, "a perfect chaos of materials for future lexicographers," and an example of equal industry, with Radhakant's famous Sanskrit Dictionary. MORTON'S DICTIONARY, was published in 1828, pp. 600, Rs. 6 with Bengali Synonyms and an English translation—it is very valuable, containing 10,700 words, it omits however all exotics. JOY GOPAL'S PERSIAN AND BENGALI DICTIONARY, 1838, 2,500 words, has fallen with the decay of the Persian language. In 1838, two Persian and Bengali Vocabularies were published. One by Lakhmi Narayan, Sudar Amin of Purnea, he wished to substitute Bengali for Persian terms in the Court, and gave 200 copies of his work with this view to Government, for distribution in the zillahs, but the rapid decay of the Persian renders them almost useless now, except for Court terms. In 1834 Jagannath Mallik a zemindar, published his Shabdakalpa Tarangini, B. M. P. The same year JAGANARAYAN SHARMA published a Dictionary, pp. 435, 16,000 words, excluding all exotics. In 1839, RATNA HALDAR, in order to teach the correct spelling of words, published Bangabhidhan, pp. 102, an alphabetical list of 6,264 Sanskrit words used in Bengali. The same year RAMESHWAR TARKALANKAR published a Dictionary of 18,000 words. pp. 473, 24mo. In 1840, A VOCABULARY OF SCRIPTURE PROPER NAMES. B. M. P., English and Bengali, pp. 200, appeared ; the names are spelled according to the Arabic mode and not according to the Hebrew. It was designed to form the basis of an uniform method of spelling the proper names of Scripture in the language of India. In 1840, JAGANARAYAN MUKARJYEA. published a Dictionary of 12,000 words. P. C. P., pp. 120, excluding exotics. In 1845, W. Morton published a BIBLICAL, THEOLOGICAL VOCABULARY, pp. 31, of 800 Bengali terms.

5. ADEA'S ANGLO BENGALI DICTIONARY, Roz. & Co., 1854 pp. 761, 5 Rs., 23,000 words. Gives English definitions, synonyms, and a Bengali interpretation,—a work the result of years of investigation, and of consulting various authorities,—based on Todd's Jopnson's Dictionary and Marshman's Bengali Dictionary.

6. ANGLO BENGALI VOCABULARY, Ch. P., 1850, pp. 48. The

Bengali and English meanings, with the Parts of Speech of Reader NO. I, Part 2nd.

7. ABHIDAN, Adea's New Dictionary, P. C. P. in the press, will contain about 20,000 words for 1 Re.

8. ANGLO BENGALI DICTIONARY, Ch. P., 1850, pp. 90, Chandernath's, gives the English pronunciation in Bengali letters.

9. ANGLO BENGALI DICTIONARY, published by Radhanath Dey and Co, 1850, pp. 185. A Vocabulary giving the meaning of words relating to Grammar, Heaven, Earth, Body, Natural Objects. Fruit, Apparel, Minerals, Farming ; the English pronunciation is given in Bengali letters.

10. ANGLO BENGALI DICTIONARY, Ingràj Bangala Abhidhan, S. B. S., 1853, pp. 256, 14 as. An useful explanation of 16,000 English words in Bengali.

•11. BENGALI AND ENGLISH DICTIONARY, Ist ed., 1852, 1,000 copies, S. B. S. 2nd ed. in the press.

12. HAUGHTON'S BENGALI DICTIONARY, explained in English, 1833, pp. 1,461, Rs. 80, London. Roz. & Co. Published at the charge of the E. I. Company, it serves as a Sanskrit Dictionary also, and has an Index of 80 pp., serving as a reversed Anglo Bengali Dictionary, it is rich in scientific and Technical terms, gives 40,000 Bengali words, with their derivations from Persian, Urdu, or Sanskrit ; a cheap edition of this Dictionary would be invaluable,—it might be reprinted for 10 Rs. Sir C. Haughton was an able critical scholar and a Professor of Sanskrit at Haileybury for ten years.

13. JOHNSON'S DICTIONARY abridged by Lavandier, Ist ed., 1830, last ed. 1851, St. P., pp 305. 2 Rs. Has an Anglo Bengali Grammar prefixed to it : besides the Bengali meanings of English words, it gives a list of abbreviations and of Latin and French phrases.

14. LAW TERMS—Robinson's Dictionary of ; pp. 46, Ser. P., 1854. Proposes the Bengali explanations of 4, 500 terms used in the Courts and law books of the Lower Provinces ; the object is to aim at fixing an uniform legal terminology, now so various and puzzling, some words are derived from Persian, but the greater part are Bengali.

15. MALLIK'S ANGLO BENGALI VOCABULARY, of the

English Reader, No. 3, pp, 115, 8 as,, 1852, A. I. U. Explains the words and gives the meanings, both in Bengali and English.

16. MENDIE'S ABRIDGMENT OF JOHNSON'S DICTIONARY, Bengali and English, Ist ed., 1822, last ed., 1851, Roz. and Co., 5 Rs, pp. 386, 30,000 words; Persian and Arabic words are distinguished by an asterisk which is very useful; there is a valuable list of terms used in Botany and Zoology.

17. MENDIES' ABRIDGMENT OF JOHNSON'S DICTIONARY, Anglo Bengali, Ist ed., 1828, last ed., 1851, pp. 390, 5Rs, 28,000 words. Roz. and Co.; the author was for 40 years corrector of the Serampur press, and has used much research in this work.

18. MUKERJYEA'S ANGLO BENGALI VOCABULARY, pp. 98, P. C. P. 1851. Explains the Poetical Reader, No. 2, both in English and in Bengali. The author is an ex-student of the Hugly College.

19. PERSIAN AND BENGALI DICTIONARY, by Nilkamal Mustaphi, P. C. P., 1838 pp. 76, Parseabhidhan. Gives the Bengali meaning of 2,800 Persian words used in business and Courts in Bengal. The author was Serishtadar to the Judge of Nuddea; the work is scarce. Persian is now in the sere and yellow leaf.

20. PERSIAN AND BENGALI DICTIONARY, Jay Gopal's, Parsik Abhidhan, Ser. P, 1840, pp. 84, contains about 2,500 Persian words, arranged alphabetically, with their Bengali meanings.

21. RAMCHANDRA'S VOCABULARY, 1st ed, 1818, last ed, 1852, pp. 141, 8 as. Popular, but meagre, gives the meaning of 6,600 difficult words in Bengali, (now scarce.) The author was a Pandit connected with the Calcutta School Book Society, and the first native who composed a Bengali Dictionary. The author excludes "all these inharmonious and disfiguring exotics, which are such blots in ordinary Bengali discourse.

22. ROZARIOS ENGLISH, BENGALI AND HINDUSTANI DICTIONARY, 1837, pp. 525, 6 Rs. In the Romanized character; very useful. The Bengali part was composed by a very able scholar, the late Rev. W. Morton, the Urdu, by Maulavi Haseyn. The English words, 23,000, are followed by an English interpretation, then by a Bengali one printed in Italics, then by the Urdu in Roman type.

23. SCHOOL BOOK SOCIETY'S BENGALI DICTIONARY,3rd ed,. 1852 ; pp. 234, 12 as., 12,000 words, S. B. S. Skul Buk Abidhan.—A very good Dictionary for beginners—the meanings are in Bengali and are very concise.

24. Shabdàrtha Pràkàshàbhidhàn, Digambar Bhatterjea's Dictionary, K. Al. pp. 216, 6 as, gives 900 words.

25. VOCABULARY of Elegant Words, Barnamàlà Abidhan. 3rd pt. Pr. P., pp. 52, 1,200 words.

26. Shabdàmbudhi, ADEA'S BENGALI DICTIONARY. 1854, pp, 604, 2 Rs. 8as Roz. & Co. The whole of this edition of 2,000 copies has been nearly exhausted in a year, it contains 28,000 Bengali words with their meanings taken from Morton's, Carey's, Radhakant Deva's and Ram Chandra's Dictionaries. This Dictionary is a noble monument of the copiousness and expressiveness of the Bengali language, and ought to be in the hands of every student of Bengali, though the meanings are only in Bengali, yet it may be useful as a work of synonyms to a European.

27. SANSKRIT DICTIONARY, Amarerartha Didithi, P. C. P., in the press : will contain about 300 pp., on the plan of Colebrooke's Amar Kosh.

28. SANSKRIT AND BENGALI DICTIONARY, Amar Kosh, St.P., pp. 138, 1854. Innumerable editions of this have been published, it is the Johnson of Bengali, composed 1,000 years ago by a Buddhist, gives the words according to the subjects and is very useful for supplying synonyms. T. Colebrooke in 1813 translated the Sanskrit original into English, In 1831 Jagannath Mullik, a Zemindar, published this at his own expense.

29. SANSKRIT ROOTS AND BENGALI DERIVATIONS, Dhatu Mala, Roz. & Co. In the press. Designed to make natives better acquainted in a short time and in a rational way with their own language, by giving them the Etymology of the language from Sanskrit, in the same way as boys in England learn the Latin Etymology of English words. A number of technical terms used in Mathematics, Natural Philosophy, Botany, Medicine are given.

30. THAKUR'S BENGALI AND ENGLISH VOCABULARY, Ist ed., 1805, 3rd ed., 1852. Sanders, Cones Co., pp. 166, 8 as.; compiled originally for Fort William College, at the suggestion of Dr. Carey. It gives terms on the following subjects : Theology, Physiology, Natural History, Domestic Economy in Bengali and the Romanised Bengali character. It also

gives the names of plants used in the Materia Medica, and of useful trees and plants. The author was Assistant Librarian to Fort William College.

31. THEOLOGICAL TERMS, MILL'S VOCABULARY OF B. C. P. pp. 36. Roz. & Co. Though Sanskrit, yet as the Theological terms in Bengali are drawn from the Sanskrit, it is very useful in Bengali, there are valuable criticisms in it, by Dr. Mill and Professor Wilson—it was written with a view to uniformity of Theological terms in translations of the Bible in the Indian languages. It gives the English, the original words, remarks on its meanings, proposed rendering in Sanskrit.

ETHICS AND MORAL TALES.

The first Ethical Work published was the Hitopadesh, in 1801, of which an expurgated edition by a native appeared in 1841. The same year came out the Batrish Sinhasan. In 1803, Dr. Gilchrist published in Urdu, Persian, Arabic, Brija Bhasha and Bengali, translations of Æsop's and other Fables, all in the Romanized character, the Bengali was made by Tarini Charan Mittra. In 1820 came out Stewart's Upadesh Katha or Moral Tales of History A. B. giving historical anecdotes to illustrate—respect to parents ; friendship, falsehood, industry, pride, anger, ingratitude. In 1829 appeared from the Serampore press, an excellent work, Sadgun o-birjea, ANECDOTES OF VIRTUE, VALOR, 1 Re. 8 as., illustrating Moral Virtues, by 95 anecdotes selected from Ancient and Modern History, from Greece, Africa, Russia, Prussia and India. In 1826 was published by the S. B. S. the Kabitamritakup pp. 44 : 8 as., a choice collection of 106 Sanskrit couplets, with a Bengali translation designed for scholars. The Bhramarastak appeared in 1830. Bhartrihari's Centoes were published in 1831 ; Bhartrihari was the brother of King Vikramaditya, and wrote many fine moral sentences, mixed with exceptionable passages ; a Latin translation has been published in Germany—Lord Chesterfield's Advice to his son was translated about this time. In 1830 appeared the Kautak Sarbaswa Natak, by a Pandit of Harinabhi, a collection of Sanskrit slokes on various Ethical subjects, with a Bengali translation. In 1833, at the suggestion of Bishop Turner, who wished to see good English ethical works translated into pure Bengali, Rajah Kali Krishna

translated JOHNSON'S RASELAS. In 1838, the Gyanaday, edited by Ramchandra Mittra, appeared in numbers, a Miscellany of Anecdotes; Moral and Historical, containing besides subjects of Natural History. In 1834 Nil Ratan Haldar published Dampati Shikha on the duties of husband and wife taken from the Shastras. In 1834 Sharad Bose published Upadesh Katha, or Moral Tales in Romanized Bengali, the story of killing the goose is altered, to meet Hindu prejudices, to stuffing the goose until it burst. ÆSOP'S FABLES were published in 1834, by J. Marshman. In 1836 Raja Kali Krishna published a translation of GAY'S EABLES, which gained for him a gold medal from the King of the Netherlands. In 1840 Ram Chandra Videabagish published a series of Ethical Discourses called Niti Darshan, which had been delivered to his pupils of the Hindu College Patshala then opened, they gave with his own observations, quotations in proof from the Hindu writings—on the need of study, on truth, of falsehood; necessity of gratitude; the Bengali language, Hindu literature; the use of study; on Ethics; our duty to our parents—it was designed to continue those lectures in the Vernacular, but as no encouragement was given to Vernacular Education, they dropped through; they were designed to embrace such subjects as love of country, the benefits of travelling, gambling, the necessity of laws, evils of polygamy: need of gratitude; mutual duties of parents, and children. The same year was published the Niti Darshak, pp. 22, for the use of the Hindu College Patshala, treating of early rising, cleanliness, behaviour in school, industry, learning, duty to parents, truth, humility. In 1834 W. Morton, one of the ablest Bengali Scholars ever produced in this country, published an elegant translation of SOLOMON'S PROVERBS, pp. 76, by its beauty of composition, doing full justice to the ethical wisdom of the royal bard. In 1846 was published the Gyanakar, pp. 16, K. R. by S. Mukerjea, contained various moral fables; advice on the duties of children to their parents, on avoiding bad company, covetousness.

32. (E. T.) ANECDOTES, MORAL AND RELIGIOUS, Sàdachàr Dipak, pp. 48, T. S. ½ an. Ist ed. 1836; last 1855. Anecdotes on the fear of death, of a boy respecting the Bible, of a boy afraid to tell a lie or steal, an upright woman, generous sailor, forgiving slave, reconciled peasants, escape from a lion in battle &c. &c.

33. (P. T.) Anwàr Shoheli, or MORAL FABLES, tr. by Gopimohan Chatterjea, pt. I. A. I. U. 1855, pp. 284, 12 as. Illustrates by tales and anecdotes, the following points :—Trust not the cruel, friendship, idleness, judgment, forgiveness, not trusting liars. The Bengali written in prose and verse is translated from the Persian, which is itself a translation of the Sanskrit Hitopadesh.

34. (S. T.) Bànàryastak, pp. 4, 1854, or a Female Ape's question to the Rajah Vikramaditya. The answer of the King's pundits to the following questions : what is meant by gentleness, science, health, variety ? Who is an ignorant Brahman or physician ? What is conviction. What is a tree ? The ethical replies are pithy. Translated into English, by Raja Kali Krishna.

35. Banarashtak, pp. 3, a Man disguised as a Male Ape questions Raja Vikramaditya. Pert replies to the following questions : How may envy, vigilance pure sacrifice, beauty, insensibility, dry wood, swiftness and bad advice be described ; translated into English, by Raja Kalikrishna 1834.

36. Batrish Sinhasan, 32 Tales of Vikramaditya, S. C., pp. 209, 12 as, By Nil Mani Basak.

37. BATRISH SINHASAN, translated by the Editor of the Purnachandraday 1.000 copies, 320 pp. I. Re., P. C., 1854 ; translated from the Hindi ; in prose ; 32 Tales illustrative of Vikramaditya the Hindu Solomon's good qualities, designed to show that he has not been equalled. Tales are given illustrative of Vikramaditya's liberality to a begger, to a Brahman, to a scholar ; to the poor ; to a pandit ; to an enemy ; romantic self-denial ; 14 of the tales are in Yate's Selections, Vol. 2 ; numerous editions of this have been published in the bazar.

38. Batrish Sinhasan in Poetry, BH. S., 1848, pp. 204, by Raj Krishna Neogir.

39. CHANAKYEA, 1st ed., 1817. 108 Brief sayings in a proverbial style, praising learning and good morals, extracted from various old Sanskrit works, a useful book, with the exception of a few passages. Innumerable editions of this have been published, and it is committed to memory in the village schools, holding the same place there as Watt's Songs do in England. It is seldom met with separately being incorporated into the Shishubodhak or village School Manual. Digambar Ray published in 1840 a translation of it into English and Bengali. It has been translated also into modern Greek and Italian.

40. (E. T.) CHAMBERS MORAL CLASS BOOK, Nitibodh, 3rd ed, 1853, by Rajkrishna Banerjea. S. P., pp. 107, 8 as. On behaviour to animals: to our family: to low and high persons: industry: self-reliance: humility: temperance, health: contentment: frugality: mercy: forgiveness: mildness: honesty: debt: promises: truth: patriotism, &c. &c. The remarks on each of these virtues is illustrated by one or more historical anecdotes. The style is elegant and in 3 years the work has passed through 3 editions, a 4th is in the press.

41. (S. B.) CHATAK ASHTAK. Moral Allegory, pp. 5, 1854, ½ anna. Roz, and Co. Kalidas's beautiful Allegory drawn from the Chàtak a bird like a cuckoo, which is fabled to drink no water, but that from the clouds—used as a symbol of the soul aspiring only after heavenly enjoyments. This has been translated into German. The Brahmar Astak is one of much the same class.

42. (S. B.) FIVE ETHICAL SAYINGS, Pancha Ratna, pp. 5, 1854, Roz. and Co. Br. B. ½ anna, by Nabakanta of Bahirgachhi. Answers to the following questions given by King Vikramadityea :—Who is a liberal man? What is avarice? Who is a warrior? What does patience consist in? The answers are very pithy. Raja Kali Krishna published an English translation of it.

43. FEMALE EDUCATION, Gaur Mohan's Defence of; Stri Shikhya Bishayak, 1st ed., 1818, 4th ed., 1854, S. B. S. 2 as. Gives in simple language evidence in favor of the Education of Hindu females from the examples of illustrious ones both ancient and modern, and particularly of Indian females, such as Rukhmini, Khana, Vidyealankar who gave lectures at Benares on the Shastras, Sundari of Firudpur skilled in logic, Ahalya Bhai who conversed in Sanskrit and erected many public buildings. It shews the use of learning to women in settling their accounts, corresponding with their husbands and teaching their children. This work excited the fierce ire of some of the native papers, and in 1840 was published in opposition to it Stri Durachar pointing out the evil deeds of women.

44. FEMALE EDUCATION, Tara Shankar's Prize Essay; Striganer Videa, 1851, pp. 58, 2nd ed. Roz. & Co. An edition of 6,000 copies of this was published. The writer in elegent Bengali treats of the ignorance of females now; that Hindu literature is not opposed to female education, the advantages of female education, on the best mode of educating females, it gives informa-

tion on the wretched condition of native females, of Kulinism ; widows ; nine learned Hindu females ; what educated females can do ; instances in England ; female dress ; schools for females ; books ; teachers ; Ladies' Society. This Essay won the prize given by the Hare Prize Fund, in 1850, for the best Bengali Essay on Female Education.

45. Gyan Pradip, MORAL TALES, by Gauri Shankar Bhuttacharjy, Bh. P. L. 1st ed., 1848, 2nd ed. 1853. pp. 7, 8 as. pt. 1. In elegant language, tales from Hindu Scenes—requires pruning.

46. Gyan Pradip, MORAL TALES, by Gauri Shankar Bhuttacharjya, part 2, pp. 78, 8 as., 1853. Bh. P. These tales were originally published in the Bhàskar Newspaper.

47. (S. B.) HITKATHA, 100 Ethical Slokes P. CH., pp. 14, 1840, by Rajkishar of Pullashali. A Sanskrit with a Bengali translation. The following are some of the subjects. Learning is as a pearl in common shell, the tongue though soft and boneless yet is strong and powerful : on anger without a cause, a rich miser is like clouds without rain : King's favor changes as the wind, &c.

48. HITOPADESH, 1st ed. 1801, Ser P., last ed. 1855. Morals taught by apologues. Sir W. Jones says of these, "they are the most beautiful, if not the most ancient collection of Apologues in the world, they are extant under various names in more than twenty languages.' This work requires pruning. Sir W. Jones' translation of it may be had at the P. C. P. for 1 Rupee. Next to the Bible this work has been translated into the greatest number of languages ; there are two separate Bengali translations of it, one by Golaknath, another by Mritunjay, besides an edition Sanskrit, English and Bengali, 1830, pp. 424 by Lakshmi Narayan. At least 200,000 copies have been printed in Bengali. It treats of friendship, discord, war and peace, in 42 fables, in which after the manner of Æsop, animals are introduced to teach Ethics. The original, like Telemachus, was written for the Ethical instruction of a King's son at Palibothra.

49. Hitopadesh, expurgated by Yates, 1st ed. 1841, last ed, 1851, pp. 128, 7 as. pp. 158. S. B. S. a capital school book, gives 33 Moral Apologues.

50. JOSEPH'S HISTORY. T. S., pp. 51, ½ as. This subject is popular both with Musalmans and Christians,—shewing a bright example of chastity and filial love.

51. Jyàn Arnab, SELECTION OF MORALS, by Prem Chand Roy, 1842, 2nd ed., Sàr Sangraha, P., pp. 194, 1 Re. 8 as, translated and compiled from the best Sanskrit and other works. Gives tales and anecdotes to illustrate the following subjects ; duty to parents and teachers : knowledge : folly : company : truth : subduing the passions : mercy : anger : covetousness : youth, age.

52. Jyàn Chandrikà, SELECTION OF ETHICAL PIECES, pp, 192 I Re. 12 as., 1838, by Gopal Mittre, an ex-Student of the Hindu College,—the Council of Education subscribed for it. Gives extracts from the Prabodh Chandrika, Hitopadesh and Purush Parikhya. Containing Moral Essays on attention, the means of gaining knowledge, Perseverance and politeness, gambling, truth, gratitude, covetousness.

53. Jyànollas, by Ishwar Chandar Mallik, of Burra Bazar, Bi. B., 1854, pp. 18, Das. P. ·On gifts, hospitality, mercy, knowledge, patience, covetousness, gratitude to God, truth,—it requires pruning.

54. KULIN POLYGAMY RIDICULED, Kulin Kul Sarbaswa Nàtak, S. P., 1854, pp. 127. I Re., by Ràm Narayan Sharma. Head Pundit of the Metropolitan College. This gained the prize of Rs. 50 offered by Kalichandra, a Zemindar of Rangpur, for the best Essay, pointing out the evils of Kulin Polygamy. It shews how daughters are kept to be married to old profligate Kulins ; the hypocrisy of the marriage arrangers ; the behaviour of the women ; girls are as it were sold. Designed like Uncle Tom's Cabin, by pointing out the evils of a system to lead to a remedy being applied. The author shows a thorough mastery of the style and subject. The book is calculated to be very useful.

55. LITTLE HENKY AND HIS BEARER, Chota Henry, Ist ed, 1824., last ed. 1849. TS. pp. 60. I an. Mrs. Shearwood's beautiful Indian tale of an Orphan, intermixed with instruction relative to Christianity ; there is much interesting advice given in the guise of fiction, on the relation between a bearer and children.

56. (S. T.) Moha Mudgar, 1854, pp. 8, ½ as. Roz. & Co. An admirable little Ethical Poem ON HUMAN VANITY, it has been translated into English, by Sir W. Jones. Two editions have been published this year in Bengali, (besides many previously) one Bengali, the other Sanskrit and Bengali. Like Solomon's chapter on Old Age, it treats of the vanity of the

world, and was composed 6 centuries ago by the famous Sangkar Acharjya. It has been translated also into German and French : esteemed by the natives as "the first lesson received by infancy as the Guide of Life, the last counsel given by old age as the result of long experience."

57. (A. B.) Rajdut o Saralatar Puruskar, MORAL TALES, Roz. & Co., 1849. pp. 310 by K. Benerjea. Copies are scarce of the Anglo-Bengali edition. The Rajdut or King's Message is a beautiful tale, by Adam, the author of the lovely tale "The Shadow of the Cross." Saralatar Puruskar or the Reward of Honesty is by Miss Edgeworth, and in some parts of it the scenes are laid in India. Both Adam and Edgeworth stand high for the moral power of their tales, and this work is a great boon to Bengali literature. A small Bengali edition of this was published, which is now being re-printed.

53. (E. T.) NEGRO SERVANT, Kaphri Das, pp. 33, ½ as. 1851, T. S. A tale of humble life by Leigh Richmond, the English has had an immense circulation in England.

59. Niti Katha—part 1. MORAL FABLES, 1 an., 1st ed. 1818, last ed. 1854. Roz. & Co. Translated from the English and Arabic, by T. C. Mittre and Radhakant Deb ; at least 100,000 copies have been sold from various presses. Gives Anecdotes of the deer and lion : hare and tiger : Woman : goose : fly : bull : man ; corpse : tortoise : hare : thorn : black man : lion and fox : sun and wind ; belly and members : boys and frogs : cowherd and farmer : farmer and snake : dove and honey.

60. Niti Katha,—part. 2. MORAL TALES, 1 an. 1st ed. 1818, pp. 48, last ed. 1854, Roz. & Co. Innumerable editions of this have been published in various presses, which contains Easy Bengali Lessons, by Mr. PEARSON, Superintendent of the Government Vernacular Schools of Chinsurah, in 1818. 14 Moral Sayings, with Fables and Anecdotes, illustrative of them—on pride ; friendship : poor man and fool : covetousness : knowledge : evil words : idle man : the old man, and his two sons : written in a simple style, well adapted for females or youth.

61. Niti Katha—part 3. MORAL TALES, prepared by Ram Komul Sen, at the suggestion of the Rev. T. Thomason, father of the late Lieut-Governor of the North Western Provinces, who on his visit to the Burdwan Schools in 1818 was forcibly struck with the advantages practically resulting

from the mode of instruction by narratives with morals annexed. They are translations from the English and from the Serampore Bengali Æsop. Contains forty-eight fables and moral anecdotes.

62. (S. T.) NINE ETHICAL SAYINGS, Nabaratna, pp. 7, ½ an., 1854. Some very striking Ethical Aphorisms in these, which embrace a variety of moral subjects and sayings expressed in a very sententious manner.

63. (E. T.) ROBINSON CRUSOE—1st part, Robinsan Krushu, pp. 261. 8 as., Roz. & Co. This "master-piece of fiction" was translated into plain Bengali by the Rev. J. Robinson, for the Vernacular Literature Committee—a second edition is now in the press. It is calculated to teach many moral lessons to the Hindus, the use of a mechanical taste : the importance of self-reliance : the evils of disobedience to parents : faith in God. It is illustrated by 18 wood cuts.

64. • (S. T.) Shakantalà, TALE OF SHAKUNTALA, S. P., 1854, pp. 112, 12 as. By Ishwar Chandra Videasagar. An interesting tale of the affections introducing us to forest scenery, and the mode of life of Hindu damsels 1,800 years ago. The original drama is the master-piece of Kalidas.

65. (S. T.) Shakantalar Upàkhyeàn, TALE OF SHAKUNTALA, A. I. U., 1854, pp. 59, by Ramlal Mittra. 4 as., gives in prose the substance of the beautiful tale of affection, the Sanskrit Drama Sakantala translated into English, by Sir W. Jones, its author was Kalidas, the English Shakespear ; this drama has been translated into German, and French.

66. (S. B.) Shànti Shatak, 1850, Roz. & Co., pp. 46, 1st ed. 1817. ONE HUNDRED VERSES ADVOCATING PEACE OF MIND, pointing out like Ecclesiastes, the vanity of human things, and the benefits of solitude. Many Editions have been published. A translation of this into English was published by Raja Kali Krishna. It requires pruning.

67. (S. T.) Shànti Shatak, pp. 19, 1852. 1 anna, Roz. & Co., by Madhav, a Prize translation in the Sanskrit College ; in high Bengali ; omits exceptionable passages.

68. (S. B.) Prachin Padeàvali, or MORAL SAYINGS, pp. 24, contain the Chàtakàshtak, Bhramar Ashtak, Pancha Ratna, Naba Ratna, Bànayeashtak, Bànaràshtak.

69. PARENTS, THEIR DUTY TO THEIR CHILDREN, Santan

Pratipâlan, Pr. P., 1853, pp. 6. Treats regarding the health of children, their morals, their learning ; a discourse delivered in the village of Jyânàngi.

70. PATRIOTISM. Address on ; Svadeshanuràg, Bi. P., I an. delivered in 1853, at a Philanthropic Association in Chota Jàgulia.

71. (E. T.) PERSIAN FABLES, KEANE'S, Parsik Itihas pp. 28, 3 as, 1853, Roz. & Co. Moral apologues on the lying hare, covetous monkey, cock, pigeon, jackal, drum, mouse, and friends, wolf and jackal and young ass, just king, scorpion, tortoise, jackal, ass, truth-speaking king, greedy fox, camel, thorn, the farrier and camel, mouse, crane, crab, shepherd's dog, crane, fox and wolf, crow and monkey, peacock, sea fowl, rose, mud, devotee, raven.

72. Phulmani and Karunà, T. S., by Mrs. Mullens, 1852, pp. 306, 4 as. Roz. & Co. In the guise of fiction, written for native Christian women, to shew the practical effects of Christianity in the forming marriage connections, behaviour to husbands, moral training of children and women's duty to the poor and sick, the bad effects of debt, and of secluding females ; of domestic economy, cleanliness, cheerfulness, industry, attending God's house, reading the Bible. Appended to it is a very useful list of suitable names for Native Children, it has been translated into English.

73. PLEASING TALES, Manoranjan Itihàs, by Tarachand Dut, Ist ed. 1819, last ed. 1854, S. B. S., pp. 36, 1½ an. Also in Anglo Bengali, S. B. S., 3 as. Stories and Anecdotes designed to improve the understanding and direct the conduct of young persons, treating of generosity, ingratitude, knowledge. industry, envy, covetousness, flattery, the tongue, company. Many editions of this work have been published at differnt presses, in Chinsura, and Calcutta ; the School Book Society alone have sold 18,000 copies. The writer was in the employ of the late Capt. Stewart, of Burdwan, a warm friend to Vernacular Education.

74. (E. T.) SHEPHERD OF SALISBURY PLAIN, tr. by Sarup. Meshpàlak Bibaran, pp. 52, 1852, 1½ an. Hannah Moor's beautiful Moral Tale, exhibiting contentment and moral beauty in the lowly life of a Christian Shepherd, a tale well adapted for the rural population of this country teaching them many lessons on cleanliness and the simple manners of English rustics. To be had at the Christian knowledge Society's Depot.

75. SOLOMON'S PROVERBS, Sulimàn Hitopodesh, 1849, pp. 54. J. S., I anna, tr. by Yates. The School Book Society has adopted the Sanskrit translation of Solomon's proverbs as a class book ; the Bengali is equally worthy of being considered such. The style is elegant and simple.

76. (P. T.) Tota Itihàs, or MORAL TALES, 1st. ed. 1801, last ed. 1853. Tales said to have been told by a parrot, to occupy a lady's time, treats of a variety of stories, as of a soldier's wife, the tiger and Brahman, cat and mice, frog and snake, of four friends, of the jakal made king, of the serpent preserved, of the elephant, ass and deer, the compassionate tiger, of the low man made king. 18 of these are given in Yates' Selections.

77. WIDOW RE-MARRIAGE, in favour of, by Ishwar Chandra Videà-sagar. Vidhavà Bibàha Prachalita, S. P., 1855, pp. 22. The learned Principal of the Sanskrit College brings his learning here to shew that the prohibition of widow-marriage is not supported by the Shastras. Three pamphlets have been recently published in reply to this which is circulated gratis.

78. (E. T.) Young Cottager, Chhota Jen, Leigh Richmond's, T. S., pp. 71. An interesting narrative of a Christian girl in a retired English village "the plain and simple annals of the poor"

GEOGRAPHY

The First attempts at communicating Geography in Bengali were made by the Serampore Copy Books, and the Serampore Geography and Astronomy in 1819, which were a compendium of Geography taught by dictation—In 1824 Pearson published Bhugol ebung Jyatish, A. B., pp. 311, DIALOGUES ON GEOGRAPHY AND ASTRONOMY, which gave a general description of the Earth, the Zillahs of Bengal, General History of Hindustan, description of other countries in Asia, General Geography of Europe and America—the solar system, comets, eclipses, tides, lightning, rainbows, compass, meteors ; a map of the world was executed the same year by G. Herklotts, Esq. Pearson's Geography, came out in 1825. In 1825 a Map of India, price 10 Rs., was published, the engraving was done in England. In 1826 Raja Kali Krishna published a lithography of an Orrery and in 1836 a work on Geography and

Eclipses. In 1834 the Society for Translating European Sciences, under the direction of J. Sutherland, Esq., published a GEOGRAPHY OF INDIA, compiled and translated from Hamilton's Hindustan and other works. In 1839 appeared a Geography of Asia, by the Hindu College Authorities. In 1840 the Tatvabodhini Sabha published an Elementary Geography, and subsequently their able Secretary, Akhoy Kumar Dut, composed another, pp. 40, 24mo. In 1839 the Hindu College Patshala authorities published the Geography of Asia, Pragya, P., 8 as., pp. 150, treating of the size, motion, form of the earth, its divisions, particularly of India, its districts, mountains, plains, rivers, islands, the English conquest, trade, revenues, independent states, with a similar account of Russia, Arabia, China, Tartary, Persia. The next year the same authorities published a Bhugol Sutra, General Geography, pp. 63. Giving definitions, the chief divisions of the quarters of the globe, articles of trade—an useful compendium.

79. GENERAL GEOGRAPHY, by Gauri Shankar, Bh. P., 1853, pp. 50 ; 8 as. Notice of the principal divisions of the Earth, its Rivers &c., meagre and dear.

80. GENERAL GEOGRAPHY, by Khettra Mohun Dut, Khettra Mohun Bhugol, 1st ed. 1840, 3rd ed. 1852, 4 as. pp. 61, Roz. & Co. The definitions and rivers, mountains, cities, seas, articles of trade, outlines of the divisions of the Earth,—prepared for the Hindu College Patshala.

81. GENERAL GEOGRAPHY, Pearce's, Bhugol Britanta, pp. 149, S. B. S., 1st ed. 1818, last ed. 1846. 12 as. Treats of the earth as a planet, its motion, shape, gives the Geography of Asia and India, with a summary of Indian history, and enlarges especially on Bengal and its several Zillahs. 9,000 copies have been sold of this, it was compiled chiefly from the Serampur Geography. It has a small map of the world, and a map giving an outline of the chief geographical features of a country, and is interspersed with information, historical and miscellaneous.

82. GENERAL GEOGRAPHY, Sandy's, Hay & Co, 1842. pp. 66 ; 4 as, gives in catechetical form General Geography, England, Palestine, Judea, the 23 Zillahs of Bengal, their population, trade—the book is now scarce, and ought to be reprinted,—putting the questions at the end.

83. (A. B.) GEOGRAPHY OF ASIA AND EUROPE by the Rev. K,

M. Banerjea, 1848, pp. 336, Roz. & Co. 1 Re. Compiled from Murray's Encyclopedia of Geography, Malte Brun and others. Gives the history and progress of geographical discovery, Hindu notions of geography, definitions, 14 divisions of India; it is full on India ; notices remarkable places, character of the people, natural history ; Asia, its chief countries ; Europe ditto. The Bengali edition is out of print. The price of this work has been reduced from 2 Rs. 8 as. to 1 Re.

84. INDIAN GAZETTEER, Sandeshàbali, pp. 356. 1 Re., S. B. S. by Ram Nursing Ghose, a writer in the School Book Society's Office. Descriptions of some of the principal places in India, from Hamilton and other authorities, an useful accompaniment to the Map of India, the writer gives the chief districts, cities, mountains, rivers of India, alphabetically arranged, with notice also of the manners and customs, and productions of the different parts.

85. INDIA, GEOGRAPHY OF, Hindusthan Bhugol, pp. 20, 1854, A. I. U., 2 as. The chief divisions of India, with the boundaries of the zillahs in Bengal, an useful Introduction to the Map of India.

86. MAP OF AMERICA, by Ram Chandra Mittre, Roz. & Co. 3 Rs. 4 as., published by the Council of Education.

87. MAP OF ASIA, by R. C. Mittre,—in the press.

88. MAP OF BENGAL AND BEHAR. by Smith. Hay and Co., reduced from Tassins 3 Rs. 4 as.

89. MAP OF EUROPE, 3 Rs. 4 as. Roz. & Co., by R. C. Mittre, published by the Council of Education.

90. MAP OF INDIA, RAJENDRA'S, Roz. & C., 4 Rs. 8 as., 900 copies of this have been sold, and it has been Lithographed also in Urdu.

91. MAP OF THE WORLD, 1st ed., 1821, new ed. 1852. S. B. S. The first specimen of a Map engraved in Bengali, executed by a native, one Kasinath, under the Superintendence of the late C. Montague, Esq.

92. MAP OF THE WORLD, PHYSICAL, by Rajendra Lal Mittra, in the press, designed as an accompaniment to his physical geography.

93. PHYSICAL GEOGRAPHY, Prakrita Bhugol Roz. & Co., 1855, pp. 161 ; 12 as. by Rajendra Lal Mittra. Treats of the earth, its zones, continents, proportion of land and water ; different kinds of rocks, mountain heights ; earthquakes, their causes, effects, directions, durations, mud volcanoes, changes

in the earth's surface by running water, delta of the Ganges, Damuda embankments, drifting sands, division of land ; ocean's depth, color ; icebergs, tides, bores, rivers, their length, size, velocity, currents of air geographically distributed, laws of storms, climate changes, rains, fogs, dew, glaciers, distribution of vegetables, centres of vegetation, distribution of animals, varieties of the human race, influence of climate on man.

GEOMETRY.

94. (A. B.) GEOMETRY, by K. Banerjea, 1846, pp. 594 ; 2 Rs. Roz. & Co. Playfair's Euclid with Wallace's additions, and a symbolical demonstration of each proposition, gives also an extract from Lord Brougham's Essay on the objects of Science, and a compendium of Algebraical Rules from Whewell's Mechanical Euclid.

GRAMMAR.

The first Bengali Grammar was published by an Englishman, Halhed, a Civilian, and Oriental Scholar, who was so well acquainted with the language as sometimes to pass in disguise as a Native : it was printed at Hugly in 1778, and is a work of great value. Carey's appeared in 1801, which has passed through 4 editions. It was not till 1816 that a Native, Gangakishore Bhattacharjyea, published one, a diglot in the form of question and answer. In 1819 was published the Mugdabodh, in Sanskrit with a Bengali translation by Mathurmohun Dutt, of Chinsura, pp. 55, extending to the rules of Sandhi. This Grammar, for ages, formed throughout Bengal the study of young boys who read a Grammar in a language they did not understand, the value of the Mugdabodh is in inverse ratio to its size, as the rules of Sanskrit Grammar have been comprized in 1,000 short and very admirably constructed sentences. Dr. Carey and Mr. Forster have translated this work into English, as has also Mr. Wollaston. In 1820 Rev. J. Pearson published MURRAY'S ENGLISH GRAMMAR in Bengali, pp. 103, 2 Rs. Sir C. Haughton published a Grammar

in 1821, clear but meagre, 15 Rs. per copy, very good on the prepositions and the connection of Sanskrit with Bengali. In 1822 appeared the Inglish Darpan pp. 201, Hindustani P., an Anglo Bengali Grammar by Ram Chandra; one third of it treated of the variations in English pronunciation. The same year produced also a Grammar by Gangakisser. In 1823 appeared the Bhasha Vyeakaran, pp. 66. the writer wished to his countrymen "to pass quietly over the sea of words in order to read the Shastras." The same year was published an English Grammar in Bengali. In 1824 the School Book Society published the Vyeakaran Sàr, pp. 171, a GRAMMAR OF SANSKRIT in Bengali, by Madhav Chandra, a Nuddea Pandit, who wished to facilitate the study of Sanskrit, but it was written too much after the model of the old Grammars.

In 1826 Rammohan Roy published a Grammar in Englsh, which he circulated gratis, in order to help Englishmen to study Bengali. In 1833 J. C Marshman published a translation of an abridgment of Murray's English Grammar. In 1834 Joy Gopal Tarkalankar published the Chandar Manjari, Ser p., 4 as. In 1840 Bhagavadchandra a Sàr Sangraha, or Grammar of Elegant Bengali, which passed quickly into a second edition, composed after the Sanskrit model. In 1846 J. Robinson published a trauslation of Carey's Anglo Bengali Grammar, pp. 109; 1 Re. It simplifies Carey's and gives a list of 500 Sanskrit roots used in Bengali, with their meaning in Bengali.

95. BHAGAVCHANDRA'S GRAMMAR OF BENGALI, Sar sangraha 12 as., 2nd ed. 1845, pp. 186. Pr. P. An excellent Grammar of Classical Bengali, shewing its Grammatical connection with the Sanskrit; it is particularly good in explaining the rules of Sandhi.

96. BRAJAKISHOR'S BENGALI GRAMMAR, Brajakishor Byeakaran, pp. 145, 1st ed. 1840, 2nd ed. 1853, S. B. S., 8 as. the author was a Pandit of Halishar of the Medical Caste. he professes to make his Grammar "the shadow of the Sanskrit Grammar," learned but not as easy for beginners as other Grammars.

97. ENGLISH GRAMMAR IN BENGALI, Ingraji Byeakaran, pp. 82. It gives the English pronunciation in Bengali letters—here are specimens; Hoayi iyudu; bitmi : ai labhs riding : ai sa hi yeand shi.

98. KEITH'S BENGALI GRAMMAR, Ket Byeakaran, pp. 59, 2 as., 1st ed. 1820, last ed. 1854, S. B. S. In extensive use since 1820; written in a

catechetical form, upwards of 15,000 copies have been sold · it was composed by one who know what Vernacular schools required.

99. KHETTRA MOHAN'S GRAMMAR, 5th ed. 1854, pp. 48. Roz. & Co., Prepared for the Hindu College Patshala ; gives a good outilne of Grammar.

100. NANDA KUMAR'S GRAMMAR IN VERSE, Byeakaran Darpan, 500 copies, Bengal Society, P. 1853, pp. 107. 8 as. Taken from the Mugdhobodh Chandomangari, the book is written after the model of English Grammars, it is used in several schools and "wedded to immortal verse." treats of the rules of orthography, declensions, conjugations, versification, an account of the ras, or sentiment of passion. The author is a clerk in the Military Accountant's Office, and an ex-Student of the Hugly College,—when the Hindus have Arithmetics and Dictionaries in verse they may well have Grammars also.

101. PURNACHANDRA DAY'S GRAMMAR, 1st ed., 1839, 2nd ed., 1850, 1,000 copies, pp. 78, 4 as. A reprint of an old work—scarce ; contains a pretty full view of Grammar.

102. (E. T.) RAM MOHAN ROY'S BENGALI GRAMMAR, pp. 116, 1st ed., 1833, last ed., 1851, S. B. S., 3,000 copies sold. A translation into Bengali of what the Raja first wrote in English in 1826 ; treats with considerable critical power of the various parts of Grammar ; "a work that indicates much philological acuteness and philosophical research."

103. SANSKRIT GRAMMAR IN BENGALI, Mugdabodh Sar Chandraday, Pr. 1847, 12mo. pp. 226. A guide to the young students of the Sanskrit and Vernacular languages. This contains the Sanskrit text with a useful Bengali Commentary, which will enable the pupil to be less dependent on the teacher and to master the grammar in one-third the time. "Whenever a system of vernacular education shall be established, it will be important to give the higher classes a knowledge of the rules of Sanskrit Grammar without which they will not be able to write their own tongue with purity and confidence. In that case the plan of this Grammar must necessarily be adopted ; that is, the rules must be given to the scholar and the examples worked in his own mother tongue." The author Taraknath Sharmana, writes from Utarpara and states his object to be to vernacularize Sanskrit Grammar among those of his country-

men who know English but are not acquainted with Sanskrit, "Which opens unbounded resources to all that wish to improve the native idiom."

104. SANSKRIT GRAMMAR IN BENGALI, Upakraminika, 1st ed., 1851, 4th ed., 1855, by Ishwar Chandra. S. P., pp. 118, 8 as. A Sanskrit "Grammar made easy," given without technical difficulties, the declensions, conjugations of Sanskrit, with short Sanskrit sentences to parse at the end—a person three months after reading this Grammar will be enabled to begin translating simple Sanskrit sentences ; it it used in the Sanskrit College, and is gradually superseding in other institutions the old Mugdabodh Grammar.

105. SANSKRIT GRAMMAR IN BENGALI, Kaumadi, by Ishwar Chandra, 1854, S. P., 8 as., pt. 1. A more advanced Sanskrit Grammar, but framed on the European plan of making Grammar a means not an end, gives the rules of euphony, declensions and pronouns, and is a counterpart in Bengali to what William's excellent Sanskrit Grammar is in English. Many natives now are applying to Sanskrit, owing to the facilities offered by this Grammar.

106. SANSKRIT GRAMMAR IN BENGALI, by Debendranath Tagore, 8 as., T. P., pp. 70, pt. 1, 1845, extends to the pronouns : gives the Rules of Sandhi and the declensions—written after the European system of philology, simple—well illustrated by examples. Published by the Tatvabodhini Sabha.

107. SHYEAMACHARAN'S ANGLO BENGALI Grammar, Roz. & Co, 1850, pp. 408, 5 Rs. The most elaborate Grammar that has yet appeared. Goverment patronised it liberally taking 100 copies, at 10 Rs. per copy, it is designed for students who know English. Very copious on the usual Grammatical subjects and on idioms. Much information besides on the prosody of Bengali poetry ; it gives colloquies, and rules for common conversation. No European studying Bengali ought to be without this Grammar. A cheap edition is much wanted.

108. SHYEAMACHARAN'S BENGALI GRAMMAR, Roz. & Co 1852, pp. 269, 1 Re. 2 as., a translation of the one in English, a good Grammar far advanced students.

102. WENGER'S BENGALI GRAMMAR, pp. 156, 1 Re. 4 a. S. B. S, Very simple ; two good chapters on Syntax and Prosody.

HISTORY AND GEOGRAPHY

The first Prose Work and the first Historical one that appeared, was the Life of Pratapadityea the last king of Sagar Island, by Ram Bose, Ser. P., 1801, pp. 156. A work the style of which a kind of mosaic shewed how much the unjust ascendency of the Persian language had in that day corrupted the Bengali. This was followed in 1806, by the LIFE OF THE RAJAH OF KRISHNAGHUR, pp. 120, both works undertaken ; at the suggestion of Dr. Carey, the Shastra Padvati or names of the most eminent Sanskrit writers and their works appeared in 1817, designed to gratify the Hindu taste for writing names at the same time conveying to them some useful historical knowledge. GOLDSMITH'S HISTORY OF ENGLAND come out in 1819, pp. 412, by Felix Carey, an able Bengali scholar, the History closes with the peace of Amiens in 1802. A useful Glossary of technical and difficult words was appended, though some names are rendered curiously—thus Admiral of the Blue is Nil-pataka-dhyearnàb, Whig is Svatantreapakhapàti. A History of England on the plan of Dicken's, giving the history of the people, the progress of civilisation, morals, arts, religion, is a great desideratum. In 1819 we had Captain Stewart's MORAL TALES OF HISTORY, with selections of historical subjects, notice of England's rise from barbarism, with moral instruction, historical anecdotes, illustrative of friendship, industry, justice, pride, anger—the arrival of the English in India, the Rules of the Permanent Settlement. In 1830 was published the Asam Buranje, HISTORY OF ASAM, and its famous shrines, by Hatiram Dakiyal, pp. 86, CH. P., who distributed it gratis. One of the few local Histories, we have. In 1829 was published at Serampur, Sadbirjea Gun, ANECDOTES OF VIRTUE AND VALOR, A. B., pp. 239. Giving 95 Anecdotes relating to the virtues connected with the leading characters of ancient and modern history of various countries and creeds. ROBINSON'S GRAMMAR OF HISTORY, pp. 242, appeared in 1832, under the patronage of the Committee of Public Instruction, translated by a literary club of 12 natives ; it gave in the form of short paragraphs, to be committed to memory, notices of the chief ancient and modern kingdoms. In 1839 Govind Sen wrote an ESSAY ON THE HISTORY OF INDIA, pp. 32. In

1840 Govind Sen published a HISTORY OF BENGAL, pp. 337, 2 Rs., a translation of Marshman's; gives from the Moslem invasion of 1203 down to 1835. The Bengali was too literal, and stiff. In 1842 we had the Life of Bhavani, editor of the Chandrika and the great leader of the Pro Sati party, a curious piece of biography.

110. ANCIENT HISTORY, Pearson's Epitome. Itihas Samuchay, pp., 364. 1 Re. S. B. S., Gives a concise Account of the History of Egypt, Assyria, Babylon, Medea, Persia, Greece, Rome.

111. (E. T.) ANCIENT HISTORY, Prachin Itihas, Pearson's Epitome, S. B. S., 1830, pp. 623, compiled from Rollin and Anquetel, gives a brief account of the Egyptians, Assyrians, Babylonians, Medes and Persians, Grecians, Romans, treating of the manners, customs, buildings, natural productions, laws, government, and history of those states.

112. (E. T.) BENGAL, HISTORY OF, Bangala Itihas, 1st ed. 1849, 3rd ed., pp. 152. 8 as. Roz. & Co. S. P. by Ishwar Chandra Videasagar. From the battle of Plassey down to Lord W. Bentinck's time. A translation of Marshman's excellent work, the Bengali is elegant; we understand, the history of the Ante-English period is in preparation taken from the first Chapter of Marshman.

113. (E. T.) BENGAL, MARSHMAN'S HISTORY OF, Bangadesh Purabrita, Wenger's translation, pp. 284: 12 as. S. B. S. Roz. & Co., Gives in simple language a full account of the History of Bengal from the earliest period to the present time.

114. (E. T.) BIBLE STORIES BARTH'S, Dharmapustuk Britanta, by Mrs. Hœberlin, 1846, T. S. pp. 252. Gives in an interesting form, 104 of the most striking facts of the Old and New Testament, with 27 wood cuts. The German original has passed through 100 editions and 100,000 copies have been sold in Germany alone, besides translations, into 30 different languages. The miracles, parables of Christ, Jewish history down to Daniel's captivity. and New Testament History to Paul's imprisonment in Rome, are told in a simple condensed form, well adapted to arouse the curiosity of young persons.

115. (E. T.) BIBLE AND GOSPEL HISTORY, PINNOCK'S Kalkramik Itihas, tr. by G. Pearce, 1st ed. 1838, 2nd ed. 1852, 4 as., B. M. P., pp. 89, ten wood cuts. Gives in the form of question and answer the chief

historical events of the Scriptures, from the Creation to the Resurrection of Christ.

116. (E. T.) BIBLE HISTORY, MRS. TRIMMER'S, 1843, B. C. P., pp. 282, tr. by Dwarkanath Banerjea, 8 as. Roz. & Co. Short view of the whole Scripture History, including an account of the Jews from Nehemiah's time to that of Christ's, in 24 lectures, with question and answer on each lecture.

117. CELEBRATED CHARACTERS, Sketches of, Satya Itihas, Ist ed. 1830, pp. 239, 12 as. S. B. S. Sketches of Semiramis, Sesostris, Homer, Lycurgus, Romulus, Cyrus, Confucius, Pythagoras, Miltiades, Socrates, Demosthenes, Alexander,—a translation of stories in ancient history ; on the model of Plutarch's Lives.

118. (S. T.) CHRIST, LIFE OF, Muir's, tr. by K. Bannerjea, Christa Mahmatmea, 2nd ed. T. S., 1851, 1½ as. Composed by, J. Muir, Esq., of the Civil Service, in Sanskrit verse, has been translated into Hindu and English ; gives a summary of Jewish history, the Prophecies relating to Christ's coming, the tenor of His Life, Death, Miracles, Discourses. Doctrines, detailed in a narrative expository way, adapted to the native mind, and calculated to attract the attention of Hindus ; the Sanskrit edition of this has been widely circulated. Dr. Mill published a similar work in Sanskrit thirty years ago. In this and Paul's Life Mr. Muir has taken up two Christian biographies which are much valued. In 1810, one Ram Bose, a Hindu composed a LIFE OF CHRIST, in verse which passed through two editions, and was translated into Uriya and Hindu. The Tract Society has also published a Life of Christ.

119. (E. T.) CHURCH HISTORY, BARTH'S 1840, Christian Mandali Bibaran, T. S., pp. 355, 3½ as. Has been translated into various Indian languages,—gives the spread of Christianity in Apostolic days.—The ten persecutions.—The constitution of the primitive Churches—Constantine's life and times—Missionary exertions - Muhammadanism—Decline of Christianity —Waldenses—Middle Ages—the Reformation and Modern Missions. A very useful sohool book.

120. (A. B.) DANIEL'S LIFE Daniel Charitra, by Morton, T. S., pp. 345, 3½ as. 1836. Printed at the charge of the American Sunday School Union—Treats, in elegant Bengali of the History of the Kingdoms of Judah and Israel—Daniel refuses wine in Babylon—Nebuchadnezzar dreams of the

great image—Jerusalem destroyed—the golden image—destruction of Tyre—the wonderful buildings of Babylon—dream of the great tree—hanging gardens—Daniel's dreams of the great Empires—Babylon taken by Cyrus—Daniel made Prime Minister—Daniel in the lion's den ; Jews restored to their own country ; Daniel's character.

121. (E. T.) EGYPT, HISTORY OE ANCIENT, Igypt Purabrita, by K. Bannerjea, 1857, pp. 338, 1 Re. Roz. & Co. Taken from Rollin, and the Encyclopædia Britannica. It treats of the Ancient Cities, Pyramids, Ptolemy's Canal, Nile, the Delta. Egyptian rulers, religion, military power, arts, Ancient History down to the Moslem conquest, fertility of the soil, funerals.

122. (A. B.) GALILEO'S LIFE, by K. Banerjea, Galileo Charitra. Roz. & Co., 1851, pp. 132, 10 as. ; Notices the ancient and modern philosophy, Galileo's discovery of the pendulum, his opposition to Aristotle, discovery of the thermometer and telescope, his treatment by the Inquisition, abridged from Bethunc'e Life of Galileo, in the Library of Useful Knowledge. Adapted to encourage Hindus in opposing the prejudices of their age.

123. GREECE, HISTORY OF, Grish Itihas, Pragya, P. 5 as., 1840, pp. 101. Prepared for the Hindu College Patshala, treats of the rise of Greece, Athens, Sparta, Troy, Pelopponnesian War, Philip and Alexander, Grecian learning, games, arts, religion, Government.

124. GREECE, HISTORY OF, Grik Itihas, by Mukerjyea, a student of the Hindu College, pp. 396, 1 Re. S. B. S. The translation is well, it is taken from Goldsmith's Greece. Treats of Lycurgus, Solon, Miltiades ; the Persian Invasion.

125. (E. T.) EMINENT CHARACTERS, Jiban Charitra, pp. 138, 8 as., by Ishwar Chandra Sharma, 1st ed., 1849, S. P. 4th ed. is in the press. Gives the lives of Copernicus : Galileo : Newton : Herschell : Grotius : Linnœus : Duval : Thomas Jenkins : Sir W. Jones ; translated from Chamber's Biography. Its sketches of famous astronomers, naturalists, travellers, philologists, are calculated to be very useful.

126. (A. B.) HISTORY, BRIFE SURVEY OF, by J. Marshman, Purabrita Sankhep. Ber. 1833, pp. 515, 3 Rs. Roz. & Co. Gives a history of the world from the Creation of Man to the Birth of Christ, an account of the

Trojan War, Greek Colonies, Egypt, Persia, Mesopotamia, Greece, Rome, Alexandria. Cyprus, Judea, Carthage—notices of Adam, Noah, caste and its influence.

127. INDIA, BAIDANATH BANERJEA'S HISTORY of, Bharatbarshiya Itihas, Sar, 2vols., pp. 352, 1848, Ch. P., 1 Re. 8 as. Compiled from Manu, Jagyavalka, the Ramayan, Mahabharat, Rajabali, Brooke's Gazetteer, Marshman's History of Bengal. One object of the book is to oppose the views given in Marshman's India which the author thinks are too much against the Brahmans and in favor of Christianity. This book treats of—a defence of Hindu Chronology, ancient Hindu kings, their residences, mode of Government, origin of castes; solar and lunar races: Vikramaditya: Kulinism introduced: Moslem invasion: Portuguese in India: English arrival and conquests down to 1843. To those wishing to gain a summary of Hindu history, as given by an "orthodox Hindu," from the Ramayan, Mahabharat and Puranas, this book is very useful.

128. INDIA, HISTORY OF, by Gopal Lal Mittra, Bharatbarshiya Itihas, pp. 201, J. P., 1840, published under the patronage of the Committee of Public Instruction. Treats of Ancient India, and of events previous to the Portuguese Conquests. On the plan of Marshman's—an account of the early inhabitanis of India—the Solar Race—Ram—the Pandavs—Buddhists—Alexander—Magadh—Moslems—Patans—Portuguese,—leaves out those parts of Marshman's against Hinduism.

129. INDIA, J. MARSHMAN'S HISTORY OF, Bharatbarshiya Itihas, 1831, Ser. P., 2. vols., S B. S., Treats from the arrival of the English in India to the Marquis of Hastings' Administration, originally published at 8 Rs., now sold for 2 Rs.

130. INDIA, HISTORY OF, Rajabali, 1808. last ed. 1838. By Mritunjay, head Pandit in Fort William College, a native view of Indian history, see an analysis of this work in Ward on the Hindus; gives the Hindu and Moslem Rulers of India down to Timur.

131. INDIA, HISTORY OF, by Nabin Pandit, Sarabali, 1846, 1 Re., pp. 162, Roz. & Co. Taken from the Mahabharat, Keightley's History of India, Marshman's Ditto, Indian Youth's Magazine, Stewart's Bengal. Treats of the Ancient History of India in the times of the Pandavas, of Krishna, Vikra-

maditya, Alexander's invasion, the Moslem ditto, the English ditto,—bringing events down to the taking of Multan ; the style is high but good.

132. INDIA, HISTORY OF, in Hindu and Moslem times, Rajavali, by Shyeamdhan Mukerjea, 1845, Ch. P., pp. 112, gives a brief view of the Hindu, Musalman and English periods, down to Clive. meagre.

133. (E. T.) JEWS, HISTORY OF, TUCKER'S, translated by J. Campbell, pp. 257, 1845, Hay & Co. The author of the English original is Commissioner of Benares, has written another excellent work, "Notes on Education." This work gives a plain Analysis of Old Testament History, Adam to the dispersion of the Ten Tribes.

134. (E. T.) LORD CLIVE, LIFE OF, by Har Chandra Dut, Klaiv Charitra, pp. 79, 4 as., 1st ed, 1853, 2nd ed., 1854, Roz. & Co. A translation of Macaulay's celebrated work, published by the Vernacular Literature Committee—illustrated by a dozen plates of Madras, Benares, the Mahrattas, &c. &c.

135. Krishna Chandra Charitra by Rajib Lochan, 1st ed., 1805, last 1834, Ser P., 8 as., pp. 58, Roz. & Co. The life of a man who last century was a great friend to Sanskrit learning in Krishnaghur, the Augustus of his day, in this life it is stated that he induced various chiefs to join the English against the Moslems—the style is remarkable for elegancy and simplicity, there are intermingled in connection with the Rajah various references to the state of Bengal at the time of the battle of Plassey, blended here and there with mythological accounts. It was compiled at the request of Dr. Carey, for the use of the students of Fort William College, and though the price was 5 Rs. for 120 pp. it barely paid its expenses then, so limited was the demand for Bengali books. It was re-printed in London in 1830.

136. (A. B.) MISCELLANEOUS BIOGRAPHY, Jiban Britanta, K. Banerjyea, pp. 330, Roz. & Co. Lives of Yudishtir, of Confucius from Duhaldes ; of Plato, from Stanley ; of Vikramaditya ; of Alfred from Turner ; of Sultan Mahmud from Elphinstone. The life of Yudishtir gives a good summary of an important period in Hindu history, while that of Vikramaditya throws light on a more recent time: that of Alfred on the state of England 1,200 years ago, while in Sultan Mahmud we have the invasion of India by the Moslems ; and in Plato's life some notice of Greek Philosophy.

137. Naba Nari or Lives of nine eminent Hindu Females, by Nil Mani Basak, S. P., 1852, pp. 298, 1 Re. 8 as. Roz. & Co. Lives of Sita, wife of Ram, a pattern of female fidelity and devotedness.—Savitri of Oude—Shakuntala, famed in the Hindu Drama for amiability and affection.—Damayanti, who adhered to her husband in all his misfortunes after he had lost his throne through gambling.—Draupadi, mother of the Pandavs, rulers of India ;—Lilavati known for her mathematical acquirements.—Khana, skilled in astronomy. Some of her questions are given in this book.– Ahalyea Bhai, the benevolent Mahratta Princess. A second edition is in the press. This book gives a variety of interesting information hitherto scattered in various books.

138. MUHAMMAD'S LIFE, pt. 1, by J. Long, Muhammad Jiban Charitra, T. S., 1854, pp. 121, 3 as. Roz. & Co. Founded exclusively on Arabic authorities, as given in the works of Sprenger, Weile, and Caussin de Percival —Treats of the Geography, Natural History and religious state of Arabia previous to Muhammad's time, Muhammad's youthful days, his trading, 40 years old announces a new faith, opposition of his relatives : becomes a warrior, his polygamy, messages to foreign rulers, regulations for his followers ; death in the midst of his plans. The second part, now in the press, will take in the spread of Moslamism, the Koran, Moslamism as at present, the festivals, and sects of the Muhammadans.

139. (E. T.) NEWTON'S LIFE, Niotan Charitra, by Rev. C. Kruckeberg, 2 as. pp. 186, T. S., Roz. & Co. Newton was an African slave-trader for several years ; in this Autobiography he gives a vivid account of the horrors of the African slave-trade, how he himself became freed from connection with it and the steps by which at length he gained great influence in Society, and became a Clergyman of the English Church, his history in this work is a varied and interesting one.

140. (S. T.) PAUL, MUIR'S LIFE OF, translated by K. Bannerjea, 1850, T. S., pp. 97, 1 an. Treats in a simple style and manner accommodated to Hindu literary taste of the coversion of Jesus Christ's murderer ; Paul's conversion, his three journeys, his discussions, events during them, his abode in prison, his arrival in Rome and events consequent on it ; a description of Paul's devotedness and other virtues—summary of the Christian doctrine established by Paul, taken from his Epistles. Exhortation to imitate Paul's example, Mr.

Muir of the B. C, S. has been well known for his skill in Sanskrit composition, which has been well employed in this biography. This has been translated also into English and Hindi.

141. PUNJAB, HISTORY OF THE, Punjab Itihas. by Rajnaroyain Bhattacharjea, 1st ed., 1847, Bp. p., 2nd ed., 1854, pp 194, 8vo. 1 Re. 8 as. Roz. & Co. Gives in good Bengali much information respecting the Punjab, Kashmir, Kabul, Kandahar,—the Sikh kingdom, the recent battles in the Punjab, derived from the Rajtarangini, Ain Akhbari, Seyar Mutakherim, Prinsep's Life of Runjit Singh, Lawrence's adventures in the Punjab, Macgregor's Sikhs. Natives subscribed for 325 copies, as the fate of the Sikh kingdom was deeply interesting to them.

142. (P. T.) PERSIAN KINGS, HISTORY OF, Shah Nama, Sindhu. P., 1847, pp. 458, Tr. by Bisheshwar Dut who gives us in the title page a portrait of himself, with his paita and puthi. This is the Homer of the Persians, gives the history of their native kingdom previous to the Moslem conquest, compiled from old documents ; as in Roman History there is a great blending of fact and romance.

143. Pratapaditya Charitra, Last King of SAGARISLAND, Life, by Harish Tarkalanker, pp. 63, Roz. & Co., 2 as. 1853. Published by the Vernacular Literature Committee. Raja Pratapaditya lived in the reign of Akbar in the Jessore District, and founded a splendid city in a place which is now part of the Sunderbunds. His Biography, one of the few historical ones we have in Bengali, was compiled 50 years ago as a text book for the College of Fort William,—a mosaic of Persian Bengali ; the present memoir retains the subject of the former but in a totally different style. The work has been sought after in Germany as throwing some light on the condition of a Hindu Raja under the Musalmans. It mentions that the Raja's immediate ancestors lived at Satgan, then a great emporium of trade, now an obscure village. They went to Gaur, obtained influence there with the king ; Raja Pratapaditya received a grant of land in what is now the Sunderbunds, then a fertile populous district, but refusing subsequently to pay tribute, the Emperor Akbar sent an army against him ; he was taken prisoner and carried in an iron cage to Benares, where he died.

144. RAM, King of, Ayodhya, Life of, by Rakhal Das Haldar, pp. 41,

1854, 4 as. Roz. & Co. Professes to separate the mythical part from the historical, on a similar plan to that of a civilian, R. Cust, Esq, in the N. W. P., who has just published a life of Ram on the same principle for native schools in English. The author brings to his task an acquaintance with some of the best English and native writers. His efforts to rescue an important period of Hindu history from the inventions of poets and priests, deserve encouragement. We have in this memoir Ram's skill in archery and his marriage at Tirhut: the virtues of his wife: his invasion of Ceylon, and his introduction of Brahminical colonies into the south of India.

145. (A. B.) ROMAN HISTORY, Rome purabrita, by K. Banerjea, 2 vols., pp. 610, 2 Rs. Roz. & Co., 1848. Eutropius is the chief authority, with quotations from Arnold, Hooke, Gibbon, Niebuhr, gives an introductory essay on the study of history: the chief events in Roman History are given from the foundation of the city to the destruction of the Western Empire. Published in Bengali also, which is out of print.

146. (E. T.) ROME, Mukerjie's tr. of Pinnock's and Goldsmith's Rome, P. P., 1854, pp. 559, 6 Rs. An useful work, but too high priced for schools, Gives examination questions at the end of each chapter.

MEDICINE

The establishment in 1851 of a Bengali Class in the Medical College, with 50 Government scholarships of 5 Rupees each per mensem. in which lectures are delivered in Bengali, on Anatomy, Materia Medica, the Practice of Medicine—will we hope soon lead to a considerable increase of Bengali Medical class works. Wise in his commentary on Hindu Medicine, shows the amount of knowledge of the Hindus on this point, and Royle proves that the Hindus knew medicine before the Greeks did. In 1818 appeared the Videa Ninda, a treatise ridiculing physicians, according to the old adage, "the destruction of 100 lives makes a physician, of 1,000 a doctor." Ram Komul Sen anxious to spread medical knowledge in the Vernacular, published in 1819, (E. T.) Aushadh Sar Sangraha. pp. 95, in which he gave the names, origin, use and mode of application of 56, different medicines, such as jalap, rhubarb, castor oil, chiretta, calomel, mercury, &c. &c.,—in mentioning a decoction of

the pomegranate root as useful for worms, he states the case of a man cured by it after 9 months' illness and discharging a worm 30 feet long. In 1823, the Rogantak Sar, 3 Rs., was published by subscription ; the Editor promised the readers of it as an inducement to their taking the work, that they would acquire the power of healing diseases. There was also published about the same time the Nidan atma Prakasha. Dr. Breton published a VOCABULARY OF MEDICAL TERMS in Persian, Sanskrit and Bengali, a woɪk showing much research. In 1826 was published and circulated gratuitously by the S. B. S. Ula uta Bibaran, pp. 26, i. e., Dr. Breton on Cholera. About the same tlme appeared Utpati Nirbaha ; on the fetus ; extracted from the Ayur Veda. In 1833 the Ratnabali or Medical Manual was published by Prankrishna Bishwas, of Kharda. About 1833 was published Dr. Ramsay's Roganta Sar or native materia medica.

147. Bramly Baktrita, published by Uday C. Adea, 1836, pp. 99, tr. of a discourse at the opening of the Medical College, by Dr. Bramley. Treating of the nature and cause of diseases and the Europeɔn mode of treating them. Some of the best writers in Bengali have been the Vaideas or medical caste.

148. (E. T.) ANATOMY CAREY'S Videa Haravali, pp. 638, 6 Rs. SER. P. 1820, Roz. & Co. Designed in 1818, to form the first part of a Bengali Encyclopædia to consist chiefly of translations of esteemed compendiums of European art and science, there were 300 native subscribers to it– dut only this part on Anatomy was published, which is a translation of the treatise ,or that subject in the 5th edition of the Encyclopædia Britannica. The glossary of technical terms by the translators Felix Carey, a good Bengali scholar, is of use to translator—the work treats of Anatomy, human and comparative, and a history of the science : the bones, ligaments, teeth, spine, extremities, shoulder, arm, bones, thigh, leg, skin, nails, hair, muscles, abdomen, intestines, liver, digestion, chyle, generative organs, chest, lungs, heart, brain, senses, comparative anatomy ; anatomy of a dog, cow, bird, cock, reptile, fishes, insects, worms.

149. (E. T.) ANATOMY, Sharir Videa, Madhusudan's Manual of Physiology, 1853, pp. 56. pt. 1, Roz. & Co. 8 Re. Osteology. Treats of the bones, their formation—the vertebræ—the bones of the various parts of the body—the teeth—ribs—stomach—legs—hand. The author is well skilled in

Hindu Medical Science, as well as in the European system, and his selection of Bengali Anatomical terms shews great knowledge.

150 (S. T.) Ayur Veda Darpan, 1852, Nos. 1, 2, 3, each number 1 Re., P., S. B. by Srinarayan Ray, giving extracts from the Ayur Veda. Charak, Susruta, in Sanskrit and Bengali, on the various diseases, their cure, with quotations from the Sanskrit, the Medical formulæ of which are in verse. The original is said to be the production of Brahma himself, and contains 100,000 slokes. Shri Nath proposed to give a translation in 100 nos., at 1 Re. per each.

151. DISEASES, Their Cure, Chikitsarnab, 2 as, pp. 73, 1855 Roz. & Co many thousand copies of this have been sold. It is taken from the Nidan, a Sanskrit medical work : treats of a number of diseases,their symptoms, remedies, —it may be usefully consulted for certain articles in the Native Materia Medica. Contains symptoms of diseases : decoctions : medicines. Designed to give knowledge to those physicians who receive a fee of 4 annas for a visit.

152. (S. B.) DISEASES AND THEIR CURE, Chikitsa, Ratnakar, No. 1, 2, 3 ; 4 as. per No. Su. P., 1853, by Haladar Sen. Gives from the Sanskrit Nidan or Medical Shastras, the causes, symptoms, remedies of diseases.

153. DISEASES, Their Symptom and Cure, Chikitsa Sangraha, in the press, by Madhusudan Gupta. Treats of the various stages of disorders and the medicines applicable to them at these periods.

154. HEALTH, Rules for, Atmarakhya, by Raj Krishna Mukarjya, Ch. P. 1849, pp. 69, 8 as. Taken from the Nidan Shastra. Treats of various ways of preserving health, of labour, bathing, oiling, food, sleep and the causes of the diseases in the country.

155. (S. T.) MATERIA MEDICA, Native , Sar kaumadi, by Ananda Chandra Barman. R. V, 1855, pp. 210, 6 as. Translated from the Ayur Veda, one of the Medical Shastras. More than 20,000 copies of this work have been sold—it treats of the various diseases, their symptoms and cure,—doubtless various vegetable medicines are referred to here, which may be of use in diseases, as Wise, in his work on Hindu medicine shows is the case with various native remedies. The price has come down from 4 Rs. to 6 as.

156. (E. T.) MEDICINE, PRACTICE OF, translated by P. Kumar, M. L. P., 1854. Aushadhbyeabahárak, pp. 280, 5 Rs. Roz. & Co. The author is lecturer in medicine to the Bengali class in the Medical College, and has

made this translation from the most distinguished recent Engiish writers on medicine, in order to rescue his countrymen from native quacks, by exhibiting to them in plain Bengali the leading principles of medicines as taught and practised in Europe. The work is disfigured by numbers of English words being introduced when vernacular ones could be easily obtained, it is also very dear. It treats of fevers, peritonites, spleanites, jaundice, cancers, colic dysentery, cholera, rheumatism, apoplexy, nervous diseases, lung diseases, skin diseases ; their definition. symptoms, stages, remedies.

157. (S. T.) NATIVE MEDICINES, the qualities of, Drabyea Guna, by Ishwar Chundra Bhattacharjyea, 1st ed. 1835. Sar. S. pp. 97, 2 as. Roz. & Co. Treats of practices affecting health, and of several hundred remedies useful for curing diseases, with quotations from the Shastras in proof.

158. MEDICAL GUIDE, Bachelor's, 1854, pp, 358, B. M. P., 1 Re. Roz. & Co., designed to answer for natives what Buchan's Domestic Medicine has for Englishmen, gives a description of the body, diseases ; their cause, symptoms, different remedies, both European and Native, the mode of preparing Medicine, Surgery,—every School library and Mofussil resident should be furnished with a copy of this.

159. MATERIA MEDICA, by S. C. Karmakar. For the use of the students of the Bengali Medical Class, Roz. & Co.

160. (E T.) PHARMACOPÆIA, London, of 1836, Aushadh Kalpabali. Roz. & Co , 1849, pp. 244, 3 Rs. 8 as. by Madhu Sudan Gupta. Gives with the English, Latin, and Bengali names the mode of preparation of Acids, Alkalis Cerates, Confections, Decoctions, Plasters, Infusions, Liniments, Metals, Pills, Powders, Syrups, Tinctures, Ointments, &c.

161. PHARMACY, Pt. 1, Aushudh Prastut Videa, by S. C. Karmakar, S. B. P. 1854, No. 1, pp. 19. 4 as. Treats of the Thermometer, of making infusions, decoctions, pills, plasters, resin, tinctures, &c. &c.

162. (E. T.) WATER CURE, Jal Chikitsa, by Prem Chand Chaudry, 1850, pp. 47, 4 as. Roz. & Co. The translator professes having experienced wonderful benefits from hydropathy, points out its advantages to others in the various uses of water applied internally and externally to different parts of the body for costiveness, fever, rheumatism, measles, small pox, dysentery, &c. He fortifies his arguments by quotations from the Hindu Medical Shastras.

MENSURATION.

In the N. W. P. Mensuration forms an important item of instruction as it so deeply concerns the rights of the peasants : simple works have been brought out on this subject—but here in Bengal owing to nothing having been done for the education of the masses, though a work on Mensuration came out in 1841, yet it is only of late it has met with any kind of a sale.

163. LAND SURVEYING, Elements of, on the Anglo-Indian plan, Brajamohan Pr. Mirzapur, 1841, 2nd ed. 1846. pp. 85, 14 as. S. B. S. Bhumi Pariman Vidya The author Prasanna Kumar Tagore states that owing to the settlement of Europeans and the decrease of wars more attention is paid to land which has increased in value. The author is now Clerk to the Legislative Council ; it contains tabl s of land measures, 21 diagrams of various areas to be measured, measuring rivers, and uneven land, there are numerous diagrams to illustrate the various modes of measurement. In Chaturjya's Arithmetic will be found a very good introduction to Mensuration.

164. MENSURATION, Robinson's bhumi Pariman, pp. 24, 1850. Asam Sibsagar P, Extensively and most successsfully used in the Asam Vernacular Schools, the author is one of the Inspectors of Government Schools in Asam and the neighbouring districts. This work gives the elements of Land Surveying and rules for finding the areas of sixteen plain figures. In contains ten problems—to find the area of a square : of a rectangular parallelogram : an oblique angled parallelogram : a trapezium : a circle : two sides of a right angled triangle : a triangle : a right angled triangle.

165. (E. T.) REVENUE BOARD'S CIRCULAR ORDERS of 1850, 4to., pp. 16, 8 as, Roz. & Co. Rules for the conducting surveys in the Lower Provinces, with 5 Diagrams and specimen Maps pointing out the mode of Protracting fields from the khusrah measurment papers as carried on by Native Amins, with surveying compass and chain. This work is likely to be very useful to Amins, and has been published for their guidance by the Revenue Board.

166 (E. T.) Guide to the GOVERNMENT LAND MEASUREMENT, pp. 106, Roz. & Co., 1 Re., with Maps as specimens of field measurements and directions how Amins are to proceed.

MENTAL PHILOSOPHY.

It is singular with the Metaphysical taste of the Bengalis, that we should hitherto have only two works on Mental Philosophy by them, though in the Prabodh Chandraday, now translated from Sanskrit into Bengali, we have a magnificent specimen of a metaphysical drama in which the various passions, anger, pride, &c., from the personæ dramæ. "The Probodh Chandraday, one of the most perfect physcological allegories in any language—representing the struggle in the human soul between king intellect and king passion, two brothers and sons of sense, the mother of the first being abstraction and of the second action. Cupid and his wife sexual enjoyment, are friends of king passion, his subjects are hypocrisy, self-sufficiency materialism, avarice, falsehood, &c. On the side of intellect are religion, tranquillity, retirement, understanding, penance and mortification. The plot is somewhat involved, arising from the author's desire to canvass the doctrines of different sects, whose representations are introduced into the drama. In the end intellect gains a complete victory. The object of the whole is to celebrate the triumph of Vedantism and Quietism over the Buddha and jaina systems. Bombay Quarterly, II. v. 13. J. Muir., Esq. B. C. S. delivered in 1845, (a series of lectures in Sanskrit on Mental Philosophy to the Benares College Pandits, which were published) based on Abercrombie's work on the mental powers—treating of our sources of knowledge and of the faculties of memory, conception, abstraction. imagination, the employment of reason in the search after truth, the sources of error in reasoning ; a Bengali translation of this would be a desideratum.

167. (A. B.) MIND, WATTS ON THE, Chitotkarsha Vidhan. 2 vols., pp. 600, 2 Rs. 1849-50. by K. Banerjea, Roz. & Co. Treats of rules for the improvement of knowledge, observation, reading, instruction by lectures, conversation, and study compared ; of learning a language ; of books, teachers, learners ; improvement by conversation, by discussion, by study or meditation on fixing the attention, enlarging the mind : improving the memory : of determining a question. On the sciences, their rise ; methods of teaching ; style ; prejudices of men : on writing books ; of authority, its use and abuse. A work that may be read with much profit by teachers and advanced pupils.

168. (E. T.) PHRENOLOGY, by Radhaballab Das, P. C. 1850, pp. 93, 1 Re. From Combe's and Spurzheim's Phrenology, four Phrenological Maps. In 1845 a Phrenological Society was established by natives in Calcutta. In treating of Phrenology of Dr. Gall and the faculties according to phrenological classification, an account is given of the following mental subjects,—the various affections or propensities, the mental impulses, the reasoning faculties of comparison and causation.

NATURAL HISTORY.

The village population shew great powers of observation on objects of Natural History, which we trust will form an indispensable subject of study in all Vernacular Schools ; Natural History has been lately introduced into the Government English Schools, and a recent educational despatch recommends the formation of Agricultural Schools. There are two of this kind commenced in the Calcutta Botanical Garden. The Calcutta School Book Society at an early period directed its attention to Zoology. In 1819 they published Lawson's History of the Lion, with a picture which excited such alarm, that one school, where it was placed, was at once emptied of its scholars—the Hindus believe there is only one lion in the world : to this book succeeded in 1822-3 separate pamphlets on the bear, elephant, rhinoceros, tiger and cat, by Mr. Lawson, who was well skilled in wood engravings. In 1821 the London Missionary Society began a series of reward books for schools, combining Natural History, with religious instruction. In 1832 appeared Anecdotes of the Dog, pp. 65, in English and Romanized Bengali, giving the different species of the animal, but the romanized Bengali met with no success among natives. The Agri-Horticultural Society published in 1830, the Mashnabad, a treatise on the cultivation of flax, with four wood cuts to illustrate the mode of cleaning it, as also a hand sheet on the cultivation of CELERY.

169. AGRICULTURE AND FARMING, Manual of, Krishi Darpan, 1853, pp. 48. Sanders, Cones & Co. By Munshi Kyafat Alla. Taken from Fenwick's Urdu work on gardening published by Captain Rowlatt, at his own expense, for the use of the people of Asam : treats of soils : manure : seeds :

mode of cultivating wheat and sugar-cane, peas, hemp, tobacco, lac, potatoes, pepper. melons, turmeric, &c.

170. AGRI-HORTICULTURAL MISCELLANY, Krishi Sangraha, edited by Peary Chand Mittra, 5 Nos., pp. 183. 8vo. Roz. & Co. 1854 55. 2 as. per no. Written in colloquial Bengali, in order to give information on popular subjects. Published by the Agri-Horticultural Society. The work meets with a good sale. The following are the subjects in it—on cultivating arrow-root: cultivating potatoes : trimming peach trees : a method of quickly propagating cauliflowers : guinea grass, tobacco : artichokes : asparagus : plain rules for cultivating some of the most approved European and native vegetables : tapioca : directions for cultivating teak : best mode of propagating plants ; cultivating melons : on cultivating and prepariag senna : do. potatoes, do. grape vine, do exotic vegetables and flowers, on certain varieties of sugar cane : do. vegetable marrow, do, safflower : do. peaches : do. strawberries at Cawnpur : do. pot herbs : do. celery : do. flax : list of Indian plants and their native and scientific names : on the date tree : fibres of Asam, do. rhea fibre : fibrous substitutes for hemp and flax.

171-2. (E. T.) AGRI-HORTICULTURAL TRANSACTIONS, Khetra Bhaganbibaran, 2 vols., 1831 and 1836, pp. 730, by J. Marshman. The Agri-Horticultural Society spent 2,000 Rs. on this translation of some volumes of their transactions ; the papers were injudiciously selected, as a number of papers were trans lated not likely at all to interest natives—among the subjects of interest in these volumes, are the following : agriculture in the 24-Pergunnahs. Asam, Behar, and Kashmir ; fruit trees : sugar-root. silk, coffee, tobacco, hemp potatoes, peaches, rice, artichokes,—correspondence and addresses on various agricultural and horticultural subjects. These volumes may be obtained gratis on application to the Secretary of the Agri-Horticultural Society.

173. ANIMAL BIOGRAPHY, Pashvabali, pp. 162, 10 as., 1852, S. B. S. An old work by Lawson, re-written in elegant language, with additions by a Pandit of the Sanskrit College, Tara Shankar, who wrote a Prize Essay on female education four years ago. It gives anecdotes illustrative of the following animals, and their habits, lion, jackal, bear, elephant, rhinoceros, hippoptamus, tiger, and cat ; cuts also accompany the accounts ; the previous edition of 1828 was compiled by J. Lawson, and translated by W. Pearce.

174. (A. B.) ANIMAL BIOGRAPHY, R. C. Mittra's Pashvabali, pp. 663, 1834. S. B. S. 1 Re. taken from Bingley and other writers, suggested by the late J. Prinsep. Written by the Professor of Vernacular in the Hindu College—gives the history of the following animals—dog, horse, ass, ox, buffalo sheep, goat, camel, wolf, leopard, monkey, beaver, seal, bat, hare, rat. with a great number of illustrative anecdotes—it is Anglo Bengali, which has limited its sale. but it is now sold very cheap and ought to be in every Vernacular Library and School.

175. BIRDS, Account of some, Pakhi Bibaran, pp. 48, 2 as., by R. C. Mittra, S. B. S. only the first part appeared, treats of birds generally : of birds of prey, eleven kinds, as condors : vulture : falcon : bearded eagle : golden eagle : the osprey, &c,

176. (E. T.) CAMEL. Stories of, S. B. S., 1851, 2 as. colored 4 as. 8 pictures of the camel, with descriptions, viz., mounted near a tent—in a Bedouin encampment—a caravan moving in the desert, ditto resting at night, proceeding to Mekka ; camel fights, boys playing with a camel.

177. (E. T.) ELEPHANTS, Stories of, Hasti Itihas, S. B. S., 1851, pp. 11. 2 as., colored 4 as. A translation from "Grandmama's stories about the Elephant," the plates were procured from England by the late J. D. Bethune ; gives nine pictures, and descriptions of the elephant with a howdah—in the jangles : mode of catching wild ones : the elephant taken prisoner ; the elephant in procession ; hunting a tiger ; elephant fighting with a tiger ; do drawing cannon, ditto squirting water.

178. MAN, CONSTITUTION OF, as adapted to Nature, vol. 1, Vajea Vastu, T. P., 2nd ed, pp. 244, by Akhay-kumar Dut, Roz. & Co. Takes Combe's line of argument but using Indian similies and illustrations to shew the evils resulting from violating the laws of nature. Treats of the laws of nature regarding mind and body : relating to happiness : the evils from violating the laws of nature shewn respecting the mind, body, strngth, long life, child birth, marriage, evils of foolish marriages, qualities of parents transmitted to their children, against marrying too early, or with deformed, diseased or old persons ; on vegetable diet, the author argues against the use of animal food, and seems quite familiar with all the writings of the vegetarians on this subject.

179. MAN, CONSTITUTION OF, Vajeay Vastu, pt. 2. T. P., 1852, pp. 288. Roz. & Co. A continuation of the former argument, treating of the evils resulting from violuting the laws of nature ; pointing out a number of cases and practices in this country as illustrative—he enlarges on the subject of spirit drinking in a way that would quite satisfy any of Father Matthew's followers. The style is high as the subject requires.

180. (E. T.) OBJECT LESSONS, or Infant School Teacher's Manual, by J. Weitbrecht. Shishu Shikhah, 1852, pp. 141. Hay and Co. 12 as. Translated into colloquial Bengali from Mayo's excellent Manual for Infant Schools, treats of Lessons on Objects, flint, water, wool, bark, feathers, lead,loaf sugar, milk, paper, leather, chalk, coal, a match, the rose leaf, honeycomb, butterfly, cow,hare : Lessons on Colors,red,green, mixed : Lessons on the Human Body, the members, legs, arms, eyes, nose, lips, teeth, tongue, ears, head, ribs, blood. Lessons on the Creation, light, sea, plants, sun, animals, man, the sabbath, Infant School Rhymes. This work ought to be in every Vernacular School. The subjects are broken up into the interrogative form.

181. (E. T.) PLANTS, SIMPLE LESSONS ON, Udbhij Videa, 2nd ed. 1855, translated by Braja Mahan, pp, pp. 100, 4 as, Roz. & Co., Hay & Co. Designed to make the pupils of schools acquainted with the general features of the vegetable kingdom around them. It is a translation with adaptations to this country of two English works. "The Child's Botany" and "The Young Botanists." Treats of—(1) Plants defined, Number, Size, Plants and Animals, Eleven uses of Plants, (2) Botany, its use, Herbarium, Walking to seek Flowers, Glass Houses, Botanical Cardens, Linnæus, (3) Six habitats of Plants, Parasites, Light on Plants, Herbaceous and Woody Plants, three Divisions of Plants according to Age,Exotics,(4) Four different kinds of Roots, Buds, Leafstem, Midrib, thirteen different Shapes of Leaves,three Surfaces of ditto, seven parts of a Flower, three parts of a Stamen, ditto of Pistil,diffusion of Seeds,(5) Roots,Seeds,Germination,Spongioles,Changing Soil round Roots, Roots extending, Eyes of Potatoe,Edible Roots,Tubers,Bulbs,Creeping Roots, (6) Stem-cells, Medullary Rays, Bark, Age of Trees, Quinine, Cork, Tannery Chinese Paper, Sago, Juices in Stems, Varnissh, Cow Tree, Mahogany, Fir, (7) Leaf-veins, Pores of Plants, Evaporation, Prussic Acid, Use of Leaves, Evergreens, Fall of Leaf, (8) Climbing Plants, Water Plants, Stinging Nettle,

Thorns are Buds, Buds, Balls on Trees, Smell of Flowers varies, (9) Flower contains Seeds, Corolla, Calyx, Stamens, Pistil, Pollen, Bees, Honey, Flower opening (10) Seed in Pulp, Pod, Nutmeg, Passion Flower, Fir Cones, Oil from Seeds, (11) Grass, its peculiar Leaves, Use in Embankments, Oats, Flint in Straw, Sugar-cane, Bambu.

182. QUESTIONS, 258, ON NATURAL HISTORY, Roz. & Co., Prashnavali, pp. 16, 1 an. Roz. & Co by J. Long. Questions on the animal, vegetable and mineral kingdoms, taken from objects in this country—designed to call forth the curiosity of young people and shew them the wonders existing in common objects arround them.

NATURAL PHILOSOPHY.

In 1816 was published at Scrampore, Jyeautish, a Work on Astronomy, In 1833 a very useful serial, was started by a Society called the European Science Translating Society, under the superintendence of Professor Wilson, J. Sutherland, and others, called the Vigyan Sebadhi, comprising the following subjects in NATURAL PHILOSOPHY—ASTRONOMY, HYDROSTATICS, MECHANICS, OPTICS, PNEUMATICS: the work was patronised by Government, and by a number of natives, but no encouragement was given at that day to popular education, and the Publication stopped after reaching 15 nos. In 1833 Maha Raja Kali Krishna published, in Anglo Bengali, an INTRODUCTION TO THE ARTS AND SCIENCES, pp. 122, compiled and translated, by himself, giving in Catechetical form definitions and short explanations of the following subjects—logic, physics, meteorology, tides, the Belles Letters, fine arts, astronomy, geography, &c. &c. In 1834 he gave a Diagram of the Solar System for the use of schools, compiled and translated by himself.

183. ASTRONOMY, Ferguson's Abridgment of, by Yates, 1st ed. 1810, 2nd ed. 1833, S. B. S., pp. 157. By the Brothers Palit and Brajamohan Majumdar, a friend of Ram Mohan Roy's. Treats of the earth's motion, shape, size, the sun, plants, gravity, light, Venus' transit. length and breadth of the earth, tides, the stars, eclipses. A work of a similar kind was published in 1834,

by the European Science Translating Society, a translation of the Library of Useful Knowledge publication on that subject. In 1836, Monsieur Guerin, the Catholic Cure of Chandernagar, published a list of all the solar and lunar eclipses from 1836 to 1944.

184. Charu pat, pt. 1, by Akhaykumar Dut, T. P., 1853, pp. 104, 8 as. Roz. & Co., with miscellaneous information on knowledge, and its pleasures, on philanthrophy, the passions, treats of the following subjects : volcanoes, the walrus, beaver, Russian mice, polypus, laws of vegetation, attraction, atoms, fire-flies of South America, ourang outang, cataract, boiling springs with wood cuts of Vesuvius, the river horse, beaver, flowers, fire-fly, ourang-outang.

185. Charu Pat. pt, 2, T. P., pp. 102, 8 as. 1853. Besides Literature and Ethics, treats of Corals, Icebergs, Balloons, the Compass, the Moon, Solar System, Thermometer, Comets.

•186. (A. B.) CHEMISTRY, MACK'S Kimiya Videa Sar, Roz. & Co., 2 Rs. 8 as., pp. 337. Treats of chemical forces, caloric, light, electricity, chemical substances, oxygen. chlorine, bromine, hydrogen, nitrogen. sulphur, phosphorus, carbon, boron, selenium, the steam engine : designed to have been the first of a series of treatises in Bengali on scientific subjects. The author was an able Bengali scholar.

187. EXPERIMENTS IN SCIENCE, Kautuk Tarangini, by Bh. M. Mittra, 1852, Roz. & Co., 1 Re. 2 as., pp. 96, 2nd ed. A drawing of the steam engine, with a very good account of it, and 95 entertaining and useful chemical experiments such as on metals, invisible ink, putting an egg into a small mouthed bottle, arithmetical puzzles, balloon making, eating fire, making paper that will not ignite : the experiments are simple, not expensive, and the practising them would interest village people much, and free their minds from many fears. A copy of this book ought to be in every school.

188. MECHANICS, Padartha Videa, T. P., pp. 59, 8 as., gives a number of diagrams in illustration, treats of the common qualities of matter : gravity : motion and its different kinds : action, re-action : elastility : divisibility of matter, attraction : circular motion : mechanical powers : levers of various kinds :—requires simplifying, but contains much useful information. In 1833, the Useful Knowledge Society's Introduction to Mechanics was translated by

the European Science Translating Society, it is now very scarce, 300 copies were subscribed for by different parties.

189. NATURAL PHILOSOPHY, by P. C. Mittra, Padartha Videa. Ch. P., 1847, pp. 57. On the air, sun, wind, rain, earth, sea, man, body, spirit.

190. (A. B.) NATURAL PHILOSOPHY AND HISTORY, Yates' Padarthe Videa Sar, 1st ed. 1825, S. B. S., 1834, pp. 183. Compiled from Martinet's Catechism of Nature, Williams' Preceptor's Assistant and Bayley's Useful Knowledge, designed as an easy entrance to the path of science. Treats of the properties of matter—the firmament and heavenly bodies; air, wind, vapor, rain, earth, man, animals, birds, fishes, insects, worms, plants, flowers, grass, grain, minerals, miscellaneous productions. A work well adapted for schools. Explains in a simple way the common phenomena of nature. Also a Bengali edition of NATURAL PHILOSOPHY, Yates' Padartha Videa, pp. 91, 1834, 8 as. S. B. S., 1st ed., 1824.

191. NATURAL THEOLOGY ILLUSTRATED, Bastu Bichar, T. P., 1845, pp. 36, 8 as. On God's Goodness, wisdom, and power as illustrated by the seasons, by the changes of day and night, as also by the earth's motion, attraction, circulation of the blood, air, fire, water, sound, vision, the senses,

192. NATURAL THEOLOGY ILLUSTRATED, Parameshwar Mahima, T. P., 1845, pp. 36, 8 as. Similar to the foregoing, illustrating God's goodness and wisdom by the various objects and laws of the visible world, and also of man himself.

POLITICAL ECONOMY.

On this subject one work appeared in Anglo Bengali, about 15 years ago, the parishram Bishay, which treated of labor and capital,—we understand that Wheatley's excellent work, Easy Lessons on Money Matters is now being translated.

SCHOOL SYSTEM.

The Rev. J. Pearson, Superintendent of the Government Vernacular Schools at Chinsura, published in 1819, Patshala Bibaran, 2nd ed. 1827, S. B. S., a translation of the most important parts of Dr. Bell's instructions

for modelling and conducting schools ; a re-print with modifications of this work would be very useful in giving advice to native teachers relative to improved modes and means of tuition, It treats of the shape of school houses ; rules for classes ; rules for teaching reading : examples of questioning in teaching ; on spelling and the various rules of Arithmetic : bad practices in a school ; a teacher's duties. W. C. Tucker, Esq., Commissioner of Benares, has published an excellent work NOTES ON EDUCATION, a translation of the chief portion of which would be of great use as a guide to teachers of village schools.

SPELLING LESSONS.

In 1816 was published Lipi Dhara. Ser P., pp., 12. The alphabet is given according to the shape of the letters thus, those angular are put together : the consonants and compound consonants : 760 characters. In 1818 Captain Stewart published short reading lessons, the same year J. Pearson published a similar work. In 1820 Raja Radhakant Deb published a spelling Book, pp. 256 ; in it the various names used by the different castes were given, Ethical reading lessons, words exactly the same in sound, but differing in spelling, signification or spelt ; pronounced alike, but different in meaning. Words of a double meaning : figurative terms ; rules for spelling—one of the best Spelling Books ever published. In 1822 an ANGLO BENGALI GUIDE to the reading and pronunciation of English was published, pp. 152. The pronunciation of English words was given in Bengali letters—a sad confusion. In 1825 an Alphabet was published, with a picture illustrating each letter. In 1834 Shara Prased Basa published a Romanized Spelling Book, pp. 14, has a drawing of Mr. Trevelian, teaching a class under whose auspices it was published, but the Bengalis would not read the foreign character. The same year was published the ENGLISH SELF-INSTRUCTOR, pp. 64. In 1835 Ishwar Chandra Basa published the Shabda Sar on Spelling. In 1836 was published by the T. S. Pratham Paribarbahi, pp. 32, containing short easy historical lessons on Scriptural subjects, with the meaning of the more difficult words attached to the lessons. The opening of the Hindu College Patshala, in 1839 led to the compilation of a series of useful class books for it, the Bernamala, pt. 22 and the Hindu College Pàtshala Spelling

Book, pp. 56, 2nd pt. were published ; giving exercises on sandhi, the names of castes, learned titles, &c.

193. ANGLO-BENGALI PRIMER, Pratham Shikha, S. B. S., 1833, pp. 30, 1 as. Chiefly on the pronunciation of English words—with their anomalies and arbitrariness.

194. ANGLO-BENGALI PRIMER, Pratham Shikha Pustuk, Mrs. Lockes ; for Hindu Females, B. M. P., 1850, pp. 118, 8 as. Gives 72 pictorial illustrations of the Alphabet, with simple colloquial reading lessons in English and Bengali.

195. Banga Barnamala, Ser. T. P., 1835, pp. 24, 1 an. Introductory Bengali Spelling Book, with reading lessons.

196. Barnamala, B. B, 1855, pp. 24, 16mo. 1 an. A Spelling Book.

197. (E. T.) ENGLISH SPELLING BOOK, Ingragi Spelling. No. 1, A. J. U., 1854, pp. 39, 1½ as. Simple lessons in plain language—a translation.

198. (A. B.) ENGLISH SPELLING BOOK, No. 1. Ingarji Barnamala, P. P, 1853, pp. 102, 12 as. Gives in Bengali letters the pronunciation of English words, a translation of the Spelling Book, No. 1 of the S. B. S.

199. INTRODUCTORY BENGALI SPELLING BOOK, Bangabhasha Barnamala, pp. 24. 1853, 1 an.

200. Jyanarunaday, 1st Spelling Book, Hay and Co.. 3rd ed. 1850, pp. 47, gives with each Spelling Exercise Scripture extracts,—on the earth ; Moses : Amalek : Jews : Cannan : Samuel : David : Solomon : Elisha : Naman : Nabath.

201. KHETTRA MOHAN'S SPELLING BOOK, pt. 1. pp. 16. 1 an. 10th ed. Used in the Hindu College Patshala, gives the alphabets. compound letters, &c.

202. KHETTRA MOHAN'S SPELLING BOOK, 2nd part. Barnamala, 8th ed., St. P., 1853, pp. 19, 1 an., used in the Hindu College Patshala. on words of two and three letters.

203. PICTURE ALPHABET, in sheets, 1st ed., 1824, new ed., 1855. S. B. S., 2 as. per dozen. The Alphabet illustrated by a neat picture to each letter, which impresses the letters more strongly on the mind and renders the learning the alphabet much more easy and agreeable.

204. PICTURE ALPHABET in Toy Boxes, 6 as. Very useful for tea-

ching simultaneously to a class the letters, which are illustrated by a picture pasted on to a card board.

205, PICTURE BOOK, CHILD'S, Shishu Chittra, pp. 12. L. B. S., 72 pictures, to illustrate each letter of the alphabet.

206. PRIMER, BENGALI, Barnamala, pp. 18, S. B. S., ½ an. Contains a picture alphabet. compound letters, and the usual tables of numerical notation.

207. PHONETIC SYSTEM, Dhani Dhara, pp. 61, 4 as. Roz. & Co., 1853, by C, Bomwetsch. This system of teaching the Bengali alphabet and reading according to the Pestallozian system, has effected wonders in the Krishnaghur district, enabling children to learn the Bengali in less than half the usual time, and giving them a view of the nature of sound and of the organs of speech that must tend very much to enlarge their mind. The book is used in various schools now, and with eminent success. Even the old teachers admit the advantages it gives in learning the language over the old monotonous rote system : the children write every thing they read ; the black board is used. 30 reading lessons are given to illustrate the application of the system of sounds as applied to vowels and consonants.

208. PHONETIC SYSTEM, MANUAL OF THE, by C. Bomwetsch, pp. 50, 1 Re. Roz. & Co. Hay and Co. A work, the result of years of hard teaching, in which the author fully expounds his system and makes it plain to the humblest capacity : Illustrating in with diagrams.

209. SCHOOL BOOK SOCIETY'S SPELLING BOOK, pt. 1, Barnamala, S. B. S. pp. 36, 1 an., 1853, 7th ed., Alphabet : Spelling Lessons.

210. SCHOOL BOOK SOCIETY'S SPELLING BOOK, pt. 2 Barnamala, S. B. S., 1854, pp. 56, 1½ as. Incorporates the substance of the Upadesh Katha, gives short moral sayings and then moral lessons with anecdotes illustrative of industry, mercy, gartitude, truth. &c., the life of Lady Jane Grey, Dionysius, Joseph.

211. Shabdabali, Introductory Spelling Book, B. C. P., 1850, pp. 36, 2 as., extends to words of 7 letters, with reading lessons on moral subjects.

212. Shishu Shikha, pt. 1 by Madan Mahan, 1st ed. 1849, pp. 28, 10th ed. 1855, S. P., pp. 27, 1 an. A good elementary work, containing spelling to 3 syllables, simple reading lessons—the author was a Professor in the Sanskrit College.

213. Shishu Shikha. pt. 2, or Child's Reading, by Madan Mohan Tarkalankar, S. P., 1st ed, 1850, pp. 20. 6th ed., 1854. 26. L. P. 1 an., gives short sentences to illustrate the compound letters, and on a very useful new plan, a description of the six seasons.

214. STEWART'S ELEMENTARY TABLES, SPELLING, 1st ed., 1818, S. B. S. 6 as., a set: Begins with the alphabet, and ends with words of 3 syllables. With short lessons intermixed: the compiler was Adjutant of the Provincial Batalion of Burdwan, and the founder of the Burdwan Church Mission.

215. Tatvabodhini SPELLING BOOK, pp. 13, part 2, 1844.

216. Tatvabodhini's Spelling Book, pp. 40. 3 as. T. P., gives reading lessons on attending to teachers; the excellency of knowledge; on God; man's duty: forgiveness, idleness, falsehood; knowledge a great treasure. After every lesson is an alphabetically arranged vocabulary.

217. YULE'S SPELLING BOOK, Shishubodhaday, 1854, pp. 24, I an, Hay & Co. A spelling book, with short sentences and verses for reading, taken from Scripture.

READERS.

Learning the Practice of Letter Writing has always been a favorite study of Hindus: 1,800 years ago a book with this object was compiled in Sanskrit at the Court of Vikramadityea by Bara Ruchi. In 1802 Ram Bosu of Serampur wrote the Lipi Mala, a guide to letter writing, containing a number of models, for letters, treats also of business, religion, and Arithmetic, the style shows how corrupted by Persian the Bengali was then; 4 editions have been published. In 1818-20 at Serampur were published Nitibakea, A. B. pt. I and 2. containing select Extracts from Scripture. In order to teach writing by dictation well the Serampur Missionaries published a litle work in 1818, containing in an aphoristic form short sentences involving important facts in Geography, Astronomy, Natural History, Ethics—to be written by dictation. In 1822 was published HAUGHTON'S SELECTIONS, pp. 198, 10 Rs. containing 10 stories, from the Tota Itihas, 4 from the Batrish Sinhasan and 4 from the Purush Parikha, with an English translation and Vocabulary.

About 1833, appeared the English Reader No. 1, with a Bengali translation, containing 28 lessons on moral subjects, useful to boys for the matter, but quite literal and unidiomatic. In 1833 was published BLAIR'S READING EXERCISES, pp. 156, with the Bengali meaning of the difficult words prefixed to each lesson. In 1834 came out the English Self-Instructor, Ingraji Atma Shikhartha, pp. 64, giving the meaning and pronunciation in Bengali of English lessons, an interlinear translation and Scripture Reading Lessons. In 1838 Baidanath Acharjea of Kanchrapara composed a work Agyan Timir Nasak, pp. 107, 2 Rs. which treated of Hindu castes, the Shastras, Astronomy, Geography. History of England, he blends together Puranic, and European knowledge. In 1840 appeared the Balbodhini, pp. 237, containing Spelling lessons with the names of all the castes and titles of different Brahmins, as Exercises, along with Arithmetical tables and a short vocabulary. In 1842 appeared the Prashaskti Prakashika by Krishna Lal Deb, compiled originally in Sanskrit by Bararuchi at the Court of Vikramadityea ; gives rules according to the Shastras : for writing letters—the color and size of the paper, the titles of letters, mode of address ;—some curious things are in this work such as a person is to write to a young girl on red paper with red ink, to a great man on gold colored letters, to a man of middle rank on silver, to a common man on copper or tin colored paper : before marriage on vermilion : a letter to a great man is to be 6 finger breadths long, to a person of the middle class 18 inches : receiving a letter from a raja or guru it is to be layed on the head, from a friend on the fore-head, from a wife on the breast. In 1843 the Calcutta Christian School Book Society published a translation of the ENGLISH INSTRUCTOR No. 4, pp. 200, 8 as. It treated of 40 subjects, among them, were God as our Creator and Redeemer : India : Discovery of America : Farmer and Stork : Lies : Moon : Discontented Pendulum : Earth, its size and shape ; God's Omnipresence : Printing : Christianity : human body : Musalman power, &c.

218. HINDU COLLEGE PATSHALA READER, 1839, pp. 56, pt. 2nd. Roz. & Co. Gives for reading exercises names in astronomy, grammar, sandhi, of castes, on subduing the senses and on truth.

219. Jyan Dipika. or Introductory Reading Book, S. B. S., 1855, pp. 63, 2 as. Gives the alphabets, short moral sentences, arithmetical tables,

Subhankar's arithmetical tables in verse, moral fables, Chanakyas Ethical Slokes, forms of letters for leases, addresses. A good and cheap book.

220. Jyan Kaumadi, Letter writing on, by Rameshwar Banerjya of Gopalpur, K. L., 1st ed., 1835, pp. 188, 3 as., 1850. Gives forms of letters, leases, petitions, receipts. A book useful for Europeans in the Mofussil, and also for native boys in English schools, who are often very ignorant of Mofussil routine.

221. INSTRUCTOR, BENGALI, No. 2, Jyan Kirunaday, pp. 92, Hay and Co., 2 as. Gives 40 subjects such as—Anecdotes, Musalman Conquest of Bengal, the wind, on the Jews, Rivers, Muhammad, India, Asam, Riddles, Victoria, division of Scripture Books.

222. (A. B.) MISCELLANEOUS READINGS, Bibidh Pat, by K. Banerjya, pt. 1, pp. 310, 1846. 1 Re. Roz. & Co. Treats of the earth, its shape, dimensions, support, divisions. NARRATIVES, the Pandavs, Herodotus, Cyrus, Socrates, Archimedes, Hannibal's marches and history, Cannœ, Fabius, story of the Vengeur : APOTHEGMS. Of Kings, of Philosophers, Kalidas and the King ;—Lamentation of Gandhary : Bharat to Ramchandra : Socrates' Defence :—the selection is well adapted to native comprehension.

223. (A. B.) MISCELLANEOUS READINGS, Bibidh Pat, by K. Banerjya, pt. 2, C. P, 1847, pp. 328. Roz. & Co. 1 Re. Gives moral tales and legends, as the legend of Kalayavada, of his marriage and education of Sagara, Kalidasa, the fall of the Pandavas : the origin of Buddhism : the elephant and blind man : cameleon, thief. Historical—Hannibal's Life and Campaigns from Arnold, a full detail. Voyages and Travels—Norway, its law of succession, houses, manners, female society, peasants, judges' education—from Laing : Magellan's Circumnavigation and Discoveries in the Pacific : Asiatic Origin of the Scandinavians.

224. LETTER WRITING TO GREAT MEN, forms of ; pp. 48, Patra Chintamani. 1845, C. P., Roz. & Co., 6 as.

225. LETTER WRITER, Patra Dhara, Ser. 1821, 3rd ed., 3 Rs, pp. 88, by Jay Gopal Tarkalankar. Contains forms of letters, agreements, the mode of superscribing a letter to different persons, on writing petitions, and leases ; to it are added Chanakyas' Slokes and Subhankar's arithmetic. It gives Subhankar's famed metrical directions for addressing the various ranks of men.

226. LETTER WRITING, Patra Kaumadi, 1st ed. 1819, 6th ed. 1852, 4 as., S. B. S., 8,500 copies sold. Compiled by the late Rev. J. Pearson, contains 286 letters on familiar subjects, commercial and familiar correspondence, forms of leases, zemindary accounts and other forms in common use ; appended is a glossary of Persian and other terms used in law deeds &c.—very useful for village schools or for Europeans who live in the Mofussil, as the colloquial terms and technical phrases of correspondence are given.

227. Patabali, NO, 3, BENGALI INSTRUCTOR. by J. Long, Hay and Co., 1854, pp. 177,8 as., extracts chiefly from native works—on the Life of a Shepherd Astronomer : Punjab salt mines : silk worms : Moslem saints : frog In a stone : printing,wonderful vefl : transparent watch.Tower of Pandua : Ghat Murders : Steam Engine : Women devoted to Christ ; wonderful spring : gold & silver of scripture : balloons : Ram Mohan Ray, Productions of India : tin, lead and copper of Scripture : Human Body : Siamese Twins : Breathing : Sagacity of Elephants : with list of Bengali prepositions appended, their primary and secondary meanings.

228. Patabali, No. 4, BENGALI INSTRUCTOR, Hay and Co., by J. Long, 1852, pp. 200, 8 as., gives 42 extracts chiefly from native writers : the following are some of the subjects, discovery of America ; Akbar ; lies—changes of Hindus ; Heman's better land ; Laws of motion ; Creation ; Musalmans ; Christianity in England ; Steam Engine ; Paul's conversion ; Chinese proverbs ; moral anecdotes ; balloon ; snakes ; Rajputs ; Polycarp ; Kalidas' poem of the seasons ; the human body : Races of man—appended is an introduation to Etymology, being a list of 70 Sanskrit words and their Bengali derivatives.

229. POETS, Selections from the Bengali, pt. 1, by Mahendra Ray, Kusumabali, 1852, pp. 175, 13½ as. Roz. & Co. Gives extracts from the Annada Mangal, Shiva's marriage and the tragedy of Sita, Hara Gauri ; Shiva gone a-begging · the Rishis gone to Benares : Veas Muni aud Benares, Sundara seeking a wife at Burdwan, and description of Burdwan, its town and fort : Man sing goes from Delhi to Jessore, and fights with Pratapaditya. Gives extracts of a mythological kind from the works of Bharat, the greatest Bengali poet, he lived last century : these extracts give specimens of fine poetry, the licentious passages being left out : the book is of use to those Europeans who wish to be acquainted with the beauties of the most popular poet in Bengal.

230. POETS, Ray's Selections from the Bengali ; Kusumabali, pt. 2, S. P., 1852, pp. 176, 13½ as. Roz. & Co. Taken from Chandimangal, Kabiranjan and Basavdatta, relates solely to mythological subjects, invocation of the Hindu deities, the life of Kali, the events which led to the founding of Kalighat : Kalketu's life : Extracts from the Vidya Sundara : notice of Burdwan and its fort. The extracts are all from books very common. The author designs his book as a class book, and it is used as such in some schools, but he selects from only 2 or 3 poets : we want selections of poetry from the native magazines and Newspapers, such as from the Prabhakar, &c.

231. (S.) PRESS, SELECTIONS FROM THE NATIVE, Sanbad Sar, by J. Long. 1853, pp. 198, 6 as. Roz. & Co. Printed for the Vernacular Literature Committee. Contains extracts from the Bengali Periodical Press, from 1818 to 1853. The following are some of the subjects—the former condition of the English and of Bengalis—Anecdote of Akbar, of the Begum Sumru, Sir W. Jones, Alfred, Addison, the Burmese ; Dialogues on Natural Philosophy : curious rain : the wild Bushman : rise of cholera : Victoria Regina lotus : the Khands of Orissa ; on Asam : the philosopher's stone : mesmerism : proverbial sayings : the Taj of Agra : mummies : sun's distance · kulin polygamy : 4 wood cuts are given.

232. Prabodh Chandrika, 2nd ed., Ser. P. 1845, pp. 189, 1st ed. 1813, 2 Rs., Roz. & Co. By Mritunjay, chief Pandit of Fort William College, written for the students of that institution—gives all sorts of style from that of fisherwomen to dissertations on rhetoric, chiefly narratives from the Shastras. Treats of various sorts of knowledge and its advantages : grammatical peculiarities : Indian languages, rhetoric, prose, riddles, &c. &c.

233. PROSE SELECTIONS, YATES', 1847, S. B. S. pp. 428, 5 Rs, vol. 1. Contains a Grammar by J. Wenger, select sentences, easy colloquies, 75 fables, 50 anecdotes, moral and historical, 28 moral stories, 10 historical extracts from Scripture, with copious explanatory notes.

234. PROSE SELECTIONS from Bengali Literature, Yates', vol. 2nd, 8vo., S. B. S. pp. 407, gives 18 Tales of a Parrot, nine letters from the Lipi Mala, 14 stories from the Batrish Sinhasan, notices of 6 Indian Kings from the Rajavali, or History of India. The history of Raj krishna Ray of Krishnaghur, 16 moral Tales from the Parush Parikhya, 5 chapters of the

Hitopadesh. Nine Moral Essays, from the Gyanchandrika, 9 ditto from the Gyanarnaba, 4th chapter of the Prabadhchandrika, chapters against idolatry from the Tathyeaprakash. History of Nala from the Mahabharat. Specimens of Rammohan Ray's Hymns, Selections from two Native Newspapers.

235. Shisubodhak, CHILD'S INSTRUCTOR, 1854, pp. 81, 2 as. 18mo. This work, the Lindley Murray of Bengali, has passed through innumerable editions, and at various prices, from 8 as. to 4 pice, giving letters, multiplication tables, land measure arjyea, praises of the Ganges, and guru, praises of Datakarna, Chanak's Slokes, 108 in number, Prahlad Charitra; on mensuration, with the rules in poetic language, directions for letter writing. The Guru Dakhina describes the fee Krishna gave to his master, and is sung by boys when they go from house to house to beg for donations for their master. The Datakarna shews the hospitality of Karna, the prime minister of Duryodhana, who, in order to feed a Brahmin killed his own son, the Brahmin was Krishna, who came in disguise to try his faith similar to Abraham's trial in Isaac's case. This book has been for centuries the key to Bengali reading.

236. Shishu Shikha, part 3, Juvenile Reader, by Madan Mohan, 1st ed. 1849, 6th ed. 1855, pp, 42, 3 as., Roz. & Co. Reading lessons on moral subjects, such as the good boy is beloved : do not covet : pity the blind : the merciless are like beasts : on lying :—on natural history, as the owl : dog : ant : crane : lion : elephant : tiger : bear : rhinoceros : elephant.

237. Shishu Shikha, part 4, Rudiments of Knowledge, by Ishwar Chandra Videasagur. S. P., 1st ed., 1851, pp. 79, 4th ed. 1854, 4 as., pp. 68. Lessons in elegant Bengali on God's works : the senses ; human race : colors : speech : time : numbers : coins : industry : divisions of water : metals : plants.

238. (A. B.) IDIOMATICAL EXERCISES, Vakyeabali, by J, Pearson, 1st ed. 1819, 5th ed., pp. 294, 1 Re. S. B. S. A phrase book with examples of words alphabetically arranged, very useful for either natives wishing to learn colloquial English idioms, or for Europeans wishing to know Bengali dialogues, forms of letters and notes. Dr. Carey also published Colloquies, which passed through 4 editions, and deserve re-printing with certain corrections—giving dialogues in Anglo Bengali in the pure colloquial

on the hiring of servants, journeying, eating, land-letting, mode of living, marketing, beggars,—throwing much light on idiomatic phraseology, native domestic hadits and modes of thought.

239. (E. T.) VERNACULAR CLASS BOOK, Yates,' Sar Sangraha, 1st ed. 1845, S. B. S., 2nd ed. 1847, pp. 202, 8 as. The English was compiled by Dr. Grant, at the request of the committee of Education, translated into Bengali, by Dr. Yates. The Council of Education designed it to be the first of a series of Vernacular Class Books, but as in other vernacular matters this their first was the last also. Treats of 74 subjects such as—travelling, of Natives and Europeans, good manners, commerce, knowledge, God's work, light, heat, sea, compass, microscope, circulation of the blood, gravitation, 6 extraets on Bengal history, notices of 13 cities in India, 5 extracts on chemistry ; birds, animals, genius, cheerfulness, progress of literature, observation, curiosity, aqueous vapor.

END OF PART I.

PART II

LITERARY AND MISCELLANEOUS.

LAW.

We give a list of more than 40 Law Books in English which have been published at different periods in Bengali, and these all sold pretty well. But no work has yet appeared treating of the principles of Law. The first work was the translations of the Regulations for 1793, made by Forster, a Civilian, and good Bengali Scholar, a work of about 400 pp., a curiosity both as to style and typography. Dr. Carey was appointed translator to Government in 1824, in which year this office was instituted. A most important one. In 1794 appeared (E. T.) GOVERNMENT REGULATIONS for 1793. 26 Rs., 2nd ed., 1826, pp. 600, by Forster. In 1795, (E. T.) Ditto, 1794—8, 25 Rs. 2nd ed., 1828, pp. 500, by Forster. In 1802, (E. T.) Ditto, 1796—1801, 25 Rs. In 1810, (E, T,) Ditto, 1802—1809, 25 Rs., pp. 504, 2nd ed.,

1830, by Mackenzie and Turnbull. In 1816, (E. T.) Ditto, 1810—1815, 25 Re., pp, 616, 2nd ed., by Turnbull and Sutherland. In 1822, (E. T.) Ditto, 1816—1821, 20 Rs., 2nd ed., 1833, by Wynch. In 1828, (E. T.) Ditto, for, 1822—for, 1826, for, In 1831 (E. T.) 1827—1830, pp. 507, 20 Rs. by Carey, 4to., In 1843, (E. T.) 1831 –1833, 20 Rs. About 1805, (S. T.) HINDU LAW OF INHERITANCE, Dayratnabali, by Mritunjay Videalankar. In 1818, HINDU LAWS OF INHERITANCE, ABSTRACT OF, Dayakram Sangraha.—RENT, arrears of papers for, Talabbaki, Ser. P.—AGREEMENTS, FORMS OF, Khattsan, Ser. P.—BONDS, FORMS OF, Akual, Ser. P. SETTLEMENT PAPERS, A, B.—Jamabandhi, Ser. P. In 1824. REVENUE GUIDE BOOK, pp. 1,002 ; 20 Rs., Ser. P.—INHERITANCE, LAW OF, Mitakshar, pp, 436, 12 Rs., a compendium from Yagyavalkya tr. by Lakshmi Narayan, Librarian of the Sanskrit College, Colebrooke had translated this into English in 1810. Treats of interest, oaths, servants, covenants, gambling, scolding, returning things purchased. In 1825, (E. T.,) CIVIL REGULATIONS from 1793 to 1824. Dewani Khalasa.—(S. T.) INHERITANCE AND ADOPTION, LAWS OF, pp. 28 Rs. Dayadhikarkram and Datak Kaumadi, by Lakhmi Narayain, Librarian to Fort William College, IN 1826, the Sadhu Santoshini to prove that AFFIDAVITS on the Ganges water are forbidden by the Hindu Law, by Kashinath Tarkapanchanan, Ch. P., pp. 26.—(E. T.,) CRIMINAL POLICE REGULATIONS, Abstract of, from 1793 to 1825. 5 Rs. by W. Blunt, and H. Shakespeare ; gives a resume of the Regulation of each year with a copious index. In 1827. DECREES, COLLECTION of, Byeabastha, Sangraha, pp. 314. C. M. P. by Ramjay Tarkalankar. In 1828, POLICE AND CRIMINAL REGULATION from 1793 to 1823, Traiydari Ain, pp. 155. Collected from Blunt and Shakespeare. (E. T.) CIVIL AND REVENUE REGULATIONS, from 1793 to 1826, Vividh Ain Kholasa : on trade, customs, salt, opium. abkari, stamps.—(E. T.) REGULATIONS, MISCELLANEOUS, Abstract of, from 1793 to 1824, Navabidh Ain, 5 Rs., compiled by W. Blunt, embraces the departments of customs, salt, abkari, stamps, commerce. (E. T.) LAND REVENUE, regulations on, Jamadari Ain Sar. 5 Rs. Ser. P.—In 1830, (E. T.) REVENUE REGULATIONS, Abstract of, Jamidari Ain, Ser. P., 5 Rs. (E. T.) CIVIL REGULATIONS, abstract of, from 1793 to 1824, Dewani Ain Sar, Ser. F., 5

Rs., compiled by W. Blunt and H. Shakespeare. (E. T.) STAMP REGULATIONS of 1829, Ishtamp Ain, Ser. P,—2 Rs. (S. T.) HINDU LAW. "Made easy," Byabastha Ratna Mala, by Lakshmi Narain, Sh. P. pp. 130. Question in Bengali, answers in Sanskrit, from the Daybhag and Mitaskshara, on inheritance.—(E. T) INDIGO REGULATIONS, Niler Ain, Ser. P., 4 as. In 1831, (E. T.) CRIMINAL POLICE REGULATIONS, from 1825 to 30. Supplement to, Faujdari Khalasa.—(E. T.) CIVIL REGULATIONS from 1825 to 1830, Dewani Khalasa, Ser. P., 12 Rs. MANU, the laws of, in the original Sanskrit with Bengali and English Translations, Calcutta Church Mission Press, 1832. Government liberally contributed to this and the greater part of the gentlemen of the Calcutta bar supported it by their subscriptions. The work was to be completed in 30 numbers, at 1 Re. each but it stopped at the 5th for want of support. In 1833, (E. T.) CIVIL REGULATIONS, abstract of, from 1824 to 1830 Faujdari Ain, 12 Rs. Ser. P.—(E. T.) INDIGO REGULATIONS, Nil Ain, 4 as., S. E. P. In 1834, (E. T.) COMPANY'S CHARTER ACT of 1834. Kampani Sananda, pp. 24.—STAMP ACT, SER. P., 2 Rs. In 1835. (E. T.) LAND MEASURER'S GUIDE, Amin Pathdarskath, 10 Rs., SER. P. About 1836 the Byeabastha Ratnakar, and Hindu Laws of ADOPTION, Dattaratnakar, 1 Re. In 1840 SADAR DEWANY NIZAMUT CIRCULAR ORDERS, 1795 to 1839, pp. 221 Abstract of, translated by Radharaman Bose : patronised by the Sadar. In 1842 was published a continuation of it for 1840, 1841, pp. 100, by the same writer. SADAR DEWANY CIRCULAR ORDERS, from 1793 to 1839, by Bishwanath Sharma, gives also the Nijamut's orders.—SADAR ADALAT'S CIRCULAR ORDERS, from 1795 to 1839, pp. 142, translated by G. K. Bhattacharjyea. In 1841 SADAR DEWANY NIZAMUT ADALAT CONSTRUCTIONS OF, from 1793 to 1840, by Radhamohan Bose, SER. P. 308. The work speedily passed through three editions.—(E. T.) MUNSIFF'S GUIDE, Munseph Gyananjan, by G. C. Basu of Bainchi, pp. 276 A. I. U. a collection of Acts, Orders of the Sudder, constructions for Munsifs.—(E. T.) LAND SALES, laws on, Bhumi Nilam, pp. 24, Ser. p. Thirty five laws passed in Council in 1841. In 1842, Sadar Decisions, Ain Sar Sangraha, by Shambachandra Chatturjyea, Munsif of Shantipur.—In 1846, (E. T.) ACTS of the Government of Bengal, Ain S. P, 8 as. pp. 46. Gives 12 Acts taken from the

Bengali Gazette, the object is to make the natives in the Mofussil acquainted with the Laws by which they are governed. In 1849, Sadar Adalat Thasale, pp. 225, 4 as.

240. (E. T.) ASSISTANT'S KATCHARI COMPANION, Mal Sankranta Ain. M. O. P. 1853, pp. 171. By Jadanath Mullick, Pleader,—A cram Book for the Revenue Examination to enable Vakils to pass.

241. (E. T.) REGULATIONS from 1829 to 1839, abstracts of the; Bibidha Ain Sar, R. Bose, Jy. R. 1839. 8 as.

242. TWENTY REGULATIONS, Binshati Ain, Bi. B. 1854, pp. 150, 4 as. useful for Darogahs.

243. CIVIL LAW, Marshman's Guide to, Dewani Ain Sar, 2 vols. 1st ed. 1843, 2nd ed. 1849, pp. 973, gives the Laws from 1793 to 1849, the Circular Orders and Sadar Courts decisions.

244, (E. T) CONSTRUCTIONS, Kanstreksan, by Benimadav De, R. V., 1854 pp. 226. 1 Re. Gives the interpretation of the Jamidari and Faujdari Regulation of the Sudder from 1793 to 1843.

245. (E. T.) CRIMINAL REGULATIONS, from 1793 to 1843, by Radha Mohan Sil, J. R., 1843, pp. 331, Dewani Ain.

246. (E. T) DAROGAH'S GUIDE. Ser, 1851, pp. 395 by J. Marshman, gives in 72 sections all the duties of a Darogah and Zemindar, with reference to the Police and Government,—all candidates for a Darogaship now pass an examination.

247. (S. T.) HINDU LAW, OCEAN OF, Byabastharnab, 1st ed. 1846 2nd 1852 Susi 5 as pp. 186 by Madhu Sudhan of Harinabhi. Extracts from Raghanandan, on atonements marriages, the ceremony of piercing the ears, the atonements required for the sin of cutting down a tree, for eating with a Sudra, for uncleannesses.

248. (S. T.) HINDU LAW OF INHERITANCE, Daya Bagha Bi. B. 1851, pp. 105, 2 as. 1st ed. 1817, Many editions—this work is the great authority in Bengal, and is favorable to widows inheriting.

249. (S. T.) INHERITANCE, LAW OF, Daybhag Sar, Ch. C., 1847, pp. By the pandit of the Raja of Krishnagur. published at the expense of Mahesh chundra of Durgapur, Nuddea.

250. (S. T.) HINDU LAW OF INHERITANCE, Daybycaratnabali,

Chinsura, Jyanratnakar, P. 1845, pp. 27, by Rajkrishna Mukerjyea, collected from various Sanskrit works.

251. (E. T.) LANDHOLDERS' Act relating to, Rajbyeabastha Ser Ch. pp. 25. A translation by Hem C. Mukerjea of Janai, of that part of Beaufort's Magistrate's Guide relating to Zemindars, giving the interpretation of the Acts, the Circular Orders, Nizamat Adalat's Reports, the Circular Orders of the Police Superintendants. The babu distributed it gratuitously to Zemindars.

252. (E. T.) MAGISTRATES' GUIDE, 4to., pp. 320, Dacca, P. 10 Rs. Magistret Upadesh, contains an abridgment of the Criminal Regulation Acts, Circular Orders, Constructions, and of the cases decided by the Nizamut Adalut from 1793 to 1849, a translation from Skipworth's Magistrate's Guide, by Abhay Chandra Das, Abkari Serishtadar of Chittagan.

253. (E. T.) MAGISTRATES' GUIDE, by Radha Raman Bose, Bi. M pp. 183, 1840. A translation of Skipworth's work, relates to appeals, prisoners, destraint. theft, dangahs, punishments, landholders, magistrates, oaths, murder.

254. (S. B.) MENU, Vol I. SU. P. pp. 164. 1854. The original was composed in Sanskrit 2,700 years ago, and gives a curious view of the state of Hindu society, laws, ceremonies, Metaphysics at that period. Sir W. Jones has translated it into English ; it has been published in French also. This with the commentary of Kulluk Batta gives the first two chapters, with a Bengali translation by Ramdhan Halder and the English Edition of Sir W. Jones.

255. (S. B.) MENU, Vol. I., 1st and 2nd chaps., Ser Jy. A. P., pp. 159, gives Kalluke Bhatta's comment.

256. (E. T.) MUNSIFS' AND AMINS' GUIDE BOOK, Munsif path Pradarshak, Ser P., 1832, 10 Rs., pp. 375. All the laws methodically arranged, which are necessary for conducting lawsuits.

257. (E. T.) NEW ACT for the Government of India, Nutan Vidhi, Bh. P., 1853, pp. 31, 4 as., tr. by Tara Charan Sikdar, gives the Act passed in April 1845, for the regulation of the E. I. Company's affairs, with its 43 Clauses. Another translation of this act has been published.

258. (E. T.) Parikha Upadesh, by Maulvi Ismail, A. S. U., 1852, 1st Vol. Rs., pp. 522. The author is a Vakil of the Sadar, and gives all the unrepealed Civil and Revenue Regulations, Government Acts, Constructions

Circular Orders and Select reports on precedents of the regular and summary cases determined in the Calcutta Sadar Dewani.

259. Parikha Upadesh, 2nd Vol., 3 Rs., pp. 570.

260. POLICE LOOKING GLASS for the Country, Mofussil Palis Darpan. 1851, pp. 16, Ch. P.

261. POLICE Looking Glass, Palis Darpan. Sa S., 2nd ed. 1853, pp. 206, gives the Nizamut Adalut, Police Superintendents and Government Orders on Police Matters, from 1793 to 1845. This book states at the end it has been composed by Shyamanath Chaudri. "the excellent Zemindar, darkness destroying, treasury of good qualities, benefactor of the country."

262. (E. T.) POLICE REGULATIONS for Calcutta, twenty, 1852,pp. 158, 4 as. C. C. P., Ingraji Palis Ain.

263. (E. T.) REGULATIONS, Marshman's Guide to, up to 1836, Raj Samparkya Ain, P., 1836, 2 vols., pp. 388, Rs. 14.

264. (E. T.) REVENUE LAWS, Abstract of, Ain Darpan, Jyk., 1852. pp 72, by Thakur Das Ghose—on Lakhraj, rent, leases.

265. (E. T.) REVENUE REGULATIONS, Ain Sar Malgujari, 1793 to, 1843, Analysis of, by Radha Madhab, Ser, Jy., R. 1844, pp. 304, 4to.

266. REVENUE, SADAR BOARD OF, Circular Orders of, Sarkular Order, 1843, pp. 156, tr. by Radha Kanta Basu, J. R. P., 2nd ed., 1849.

267. (E. T.) SADAR, DECISIONS OF THE, Sadar Dewani Nishpati, No. 1, 2, 3. 1850, Roz. & Co., gives reports of the Sadar, &c. their decisions on various Cases.

268. (E. T.) SADAR DEWANI DECISIONS, 1849-50-51, Sadar Dewan Sar., R. T., 1853, pp. 418, gives 954 Decisions on Appeals, and the substance of the pleadings is added. The compiler J. Baptist was assistant in the Office, Maimansing.

269. (E. T.) SADAR DEWANI DECISIONS. from 1810 to 1813, by Madhab Chandra. pp. 196. Cases determined in the Sadar, with the names of cases and principal matters tabulated, published before in Persian, the profit to go to the support of a school in Rajshahi.

270. (E. T.) SADAR DEWANI, Decisions of, Sadar Nishpati, N. P., 1852, Nos. 1, 2, 3, pp. 313.

271. (E. T.) SADAR DEWANI, NIZAMAT'S ORDERS from 1796 to 1839. by Radharaman Bosu, 1242. J. R., 1849, 2nd ed., pp. 206.

272. SADAR DEWANI, Regulations from 1840 to 1848, Ch. T., pp. 380, 8 Rs. by Gangacharan Mittre, of Bhawanipur, who warn his readers against pirating his book.

273. Sadar Dewani Regulations, from 1793 to 1846, by Ram Tarak Ray, of Chinsura, pp. 76.

274. STAMP LAWS, the 12 Acts of 1826, a tr. by Dr. Carey.

265. SALT, Regulations on, Nimak Darpan, by Rajnarayan Banerjyee, J. R. 1849, pp. 118.

PERIODICALS—ALMANACS.

In villages where no other Bengali book ever penetrates, there is the Almanac to be found ; the Hindu cannot marry, make a journey or execute any important work without its aid, as lucky days are given in it, when the child is first to eat rice, put on the paita, have the ear pierced, go to school, begin marriage negotiations, hence we need not be surprised that 100,000 copies of Almanacs are published annually in Calcutta, and spread by book hawkers over the country. Nuddea, Bali, Chandradip, Janai, Baxa, Bali, Khanakhul, Krishnaghur, Kodalyea, Digsa, Vishnupur, are places famous in former days for Almanacs. There is an Almanac in existence now whioh dates a century and a half ago. We have no space to enumerate all the Almanacs which have been published, we give a few—ex uno disce omnes. In 1818 came out Ramhari's Almanac, pp. 135, with a tolerably good picture of a goddess drawing the chariot of the sun. In 1824 the CALCUTTA NEW ALMANAC, pp 168. In 1825 came out Bishwanath Devas ALMANAC, 1 Re., then the Chandrika one, 12 as. In 1835 GOBARDAN SHARMA'S ALMANAC, pp. 144. In 1836 came out MENDIE'S ALMANAC, giving the moon's digits, Hindu and Musalman festivals, tides, sunrise, table of wages, Police Courts, Trade, Postage, also MADAV MAHAN DAS' ALMANAC, pp. pp. 183, edited by Ganga Gobinda of Mahanad. In 1840 the VIDANMOD ALMANAC, pp. 300. The Calcutta TRACT SOCIETY, published an Almanac yearly from 1846 to 1852, containing about 130 pp., for 4 as., illustrated with neat lithographic drawings

of some of the heavenly bodies ; it contained information on the following subjects, the solar system : comets, earth and moon, the various modes of calculating time by the Hindus, English and Musalmans, Eclipses, Calendar of sunrise, sunset, moon's phases, holidays, tides, Jewish epochs, coins, weights, stamp duties, the human body, missionary statistics. In 1847 EPISCOPAL ALMANAC, B. C, P., pp. 26, giving the daily lessons and Church festivals, sunrise and setting—ceased in 1850.

276. CONES' ALMANAC, pp. 296, 8 as., for 1855-6, by Ramchandar Mukerjea, begun in 1846, has a circulation of 6,000 copies—neatly got up with 19 pictures ; on good paper and type and sold at the rate of 40 pages for an anna—a guide to Hindu popular mythology and astrology for the Europeans.

277. CONES' ALMANAC, pp. 178, 4 as., 1855-6, has a circulation of 5,000 copies, an abridgment of the larger one.

278. COSSIPUR ALMANAC, 1855-6, pp. 116.

279. GOPAL CHANDRA'S ALMANAC, pp. 144.

280. MADHAV CHANDRA'S ALMANAC, pp. 144,

281. NEW ALMANAC 1855-6, SU. S. 1, pp. 88, 1½ as.

282. RAMKSHWAR'S ALMANAC, 1855-6, pp. 96, 1½ as.

283. SERAMPUR ALMANAC, began 1840. Ser Ch. C., pp. 234, 8 as. 4,000 copies sold, circulates as far as Asam, Rangpur, Benares, follows the Nuddea Almanac, has a number of mythological pictures.

284. SIDESHWUR GHOSE'S ALMANAC for 1855-6, A. I. N., 1855, pp. 96., 9,000 copies : 3 as.

285. VERNACULAR LITERATURE COMMITTEE'S ALMANAC, 1855-6, pp. 119, 5 as., Roz. & Co., Started in 1854, with the design of giving all that was true in Native Almanacs with much additional information of a nature Interesting to natives in the Mofussil, such as sun rising and setting, moon's ditto, tide for each day in the year—the various melas through Bengal, where and when held—munsifs and vakils' examinations, small cause court, agricultural work for each month in the year ; Indian diseases and their cure : railway fares and rules : Deputy Magistrates and Collectors.

PERIODICALS–ENCYCLOPÆDIAS.

In 1818, an Encyclopædia was commenced at Serampur, but only one part was completed, CAREY'S ANATOMY. In 1828 the Society for translating European Sciences, H. Wilson, President, started the Vigyan Sebadhi, a serial on the plan of the Library of Useful Knowledge, it reached 15 Nos., embracing Indian Geography, Hydrostatics, Mechanics, Optics, Pneumatics and Brougham's Discourse on the advantage of Science, the latter tr. by Kasi Prasad Ghose. In 1846 was started, under the patronage of Government, BANERJEA'S ENCYCLOPÆDIA, designed as a series of publications on history, science, literature, compiled from various sources. Two editions were published, an Anglo Bengali one, of about 330 pp., for 2 Rs. 8 as. (now reduced to 1 Re.,) and a Bengali edition,—the publishing a diglot was a mistake. The subjects embraced the HISTORY OF ROME, 2 Vols., GEOMETRY, 2 Vols., MISCELLANEOUS EXTRACTS, 2 Vols.; BIOGRAPHY 1 Vol. HISTORY OF EGYPT 1 Vol. GEOGRAPHY 1 Vol. MORAL TALES 1 Vol.; WATTS ON THE MIND, 2 Vols.; LIFE OF GALILEO, 1 Vol.

PERIODICALS–MAGAZINES.

Serampur published in 1818, the first Magazine in Bengali, the Digdarsan, which treated in a popular style on subjects of science, history, literature. In 1819 came out the GOSPEL MAGAZINE, A. B., 16 pp., each, No. 4 as., continued till 1823, designed for Sircars and Keranies, 500 copies were sent monthly to heathens in Calcutta, and 2,000 copies were distributed in the villages. One edition was published in Anglo-Bengali and another in Bengali; it embraced biography, diaries, anecdotes, expressions of dying Christians, ecclesiastical history, Jewish and Christian antiquities, select poems, natural philosophy.—controversy was excluded. "The Sword of the Spirit loses its edge if dipped in the waters of strife, to become quick and powerful it must be bathed in the oil of love." In 1821, the BRAHMINICAL MAGAZINE, A. B., by Ram Mohun Roy, a vindication of the Vedas against the attacks of Missionaries and an attack on the Trinity. In 1831, Shastra Prakash, on the Yugas, solar race, Sangkar Acharjea and extracts from the

Puranas—Gyanaday, by R. C. Mittre, a miscellany of Historical, Biographical, Natural History, and Scientifc subjects, 20 Nos. printed. In 1832, Vigyan Sebadi, by Gangacharan Sen, a monthly miscellany for the young, conducted by Hindu College students. The Jyansindhu Taranga, Rasik Mallik, on Ethics and Literature. In 1833, the FOUR-ANNA MAGAZINE, A. B., Ethical Essays and Historical Anecdotes, continued for 12 months. In 1834 Vidya Sar Sangraha, A. B. Literature, Science, Biography, History. In 1842. Videa Darshan, by Akhay Kumar Dut, on Ethics, Literature,—Videa Darshan, by Prasanna Kumar Ghose, treated of Ethics, History, Science, lasted 6 months—Shashadhar, by Kalidas Maitreya. In 1843, the EVANGELIST, A. B., Mangal Upakhyean. Edited by J. Robinson, started for Native Christians at the suggestion of the Baptist Association, continued for 3 years. Contained articles on Church History, Muhammedanism, Christian duties, Sermons, Religious and Missionary Intelligence. The Sarbarasranjika, w. PR. P. On history, ethics, customs. In 1846, the Kaustabh Kiran, Rajnarayan Mittre, much recondite information from the Puranas on Astrology—the Jagadbanda Patrika edited by students of the Hindu College, on literature, lasted two years ; gave translations of their class exercises,—Satyea Sancharini, by Shyeamachoran Bose, advocated female Education, the organ of a Vedantic Sabha, the profits to go to the support of a charity school. The Kaista Kiran, gave translations from the Puranas and advocated the claims of the Khaistas to wear the Brahminical thread.—The Durjan Daman Navami, by Thakurdas Basu : tri-monthly, opposed Young Bengal, defended idolatry, had as its symbol the picture of a cross fastened by a chain, to signify it would restrain Christian influence. In 1847, Hindu Dharma Chandraday, Mo. by Harinarayan Goshwami—a defence of Hinduism, the Organ of the Vishnu Sabha founded to oppose the Vedantists.—The Gyansancharini, the organ of a Sabha of that name in Kanchrapara, lasted 3 years. The Kabearatnakar, W., edited by a student of the Hindu College. In 1848, Muktabali. W., by Kali Kanta Bhattacherjea of Sibpur commenced at the instigation of Rajnarayan of Andul, opposed the right of the Khetriyas to wear the Brahminical thread, gave translations from the Kalika Purana—Bhaktisuchak by Ramnidhi, W. In 1849, Rasaratnakar, Pr. P. by Jadunath Pal. Sajjanronjan, P. P. by Gobinda Chandra Gupta, continued for 3 years.—Satyea Dharma Prakashika advocated

the tenets of the Karta Bhojas—not a persevering one ; only one No. appeared. In 1850, Durbikhanika, by Dwarkanath Majumdar, 4 as. monthly.—The Sarbashubhakari, 4 as. monthly, pp. 10. Essays on the suppressing early marriages, female instruction, man's equality : spirit drinking : ghat murders : the charak. The organ of one of these societies which have been formed in such numbers by natives in Calcutta : brilliant as a meteor and as short-lived ; —the Dharma Marma Prakashika the organ of a Sabha at Konnagar. In 1851, Jyandarshan on useful knowledge. Jyanarunaday Nos. 1 to 11 Ser Ch. C. gave many translations from the Puranas besides literary articles. Midnapur and Hijili Guardian. Mo., A. B., started under the patronage of H. V. Bayley, Esq., when Collector of that station ; gave literature and news interesting to natives in the Mofussil.—Gyanaday, by Ch. S. Banerjea. The Jyan Darshan, Ch. P., 4 as. Mo., on social improvements, literary articles.

286. Dharmaraj, 1854, M. L. P., 4 as. Mo., pp. 48 tr. by Taraknath Dutt. A defence of Hinduism and translations from the Shastres, 500 copies circulated.

287. Dharmatatva, pp. 12., Pr. P., Mo. 2 as., a defence of Hinduism.

288. Masik Patrika, 1854, Nos. 1 to 9, Mo. 1 an, Roz. & Co., by P. C. Mittra, and Radhanath Sikdar, written in Colloquial Bengali to enlighten women and the common people. The Government have lately subscribed for 500 copies for Assam. It advocates female education, the abolition of various superstitious practices among Hindus, gives historical anecdotes, and dialogues on various useful subjects.

289. Niteadharmaranjika, begun 1846, by Nandakumar, 2 Rs. An opponent of Vedantism and a stanch defendant of idolatry "the daughter of the Chandrika."

290. Prakrita Mudgar, an opponent of the Masik Patrika.

291. Satyearnab, begun 1849, 2 as. per No.; S. P., Edited by Church of England Missionaries, contains literary information, Christian Biography, Anecdotes, Natural History subjects with pictorial illustration from England and descriptions of the objects.

292. Sulabh Patrika 1853, 2 as. Mo., N. P. Treats of Hindu aboriginal races, Natural History subjects ; Ethical Anecdotes ; Historical extracts ; literature.

293. Tatvabodhini Patrika, monthly, by Akhay Kumar Dutt. T. P. 5 Rs. annually. Begun in 1843, and has maintained a steady circulation since, it contains besides a series of articles on natural history, philosophy, biography, extensive translations from the Vedas, Mahabharat, 700 copies monthly are circulated. It is the organ of the Vedantists, and holds a high place for the ability of its articles.

294. Upadeshak, begun 1846, by J. Wenger B. M. P., monthly, 2 as. Started by the Baptist Association, for the Native Christians of their communion, who pledged themselves to its support ; gives religious biography, comments on Scripture, Missionary information and subjects of literature.

295. Vividartha Sangraha, 1851, annually 1 Re. 8 as., by Rajendra Lall Mittra. Roz. & Co. Published by the Vernacular Literature Committee, each monthly No. contains 16 pp. 4to., and is illustrated by 3 or 4 plates, procured from Knight in England, on subjects of history, science, or natural history : the work is carried out on the plan of the London Penny Magazine.

296. Vidutsahini Patrika, monthly, pp. 9, 1 an, Ser. P., 1855, Essays.

PERIODICALS—NEWSPAPERS.

The History of the Bengali Newspaper Press, shews that the love of "something new" exists among the Bengalis as among the Athenians of old. In 1816, the BENGAL GAZETTE was started by Gangadhar Bhattacharjea, who had gained much money by popular editions of the Vidya Sundar Betal and other works, illustrated with wood cuts, the paper was short lived. The Serampur Darpan, on August the 21st, 1818, broke through the stagnation of ages. The Governor General, Lord Hastings, at once patronised it by letting it pass at ¼ the post charge of the English newspapers, and his successor, Lord Amherst, subscribed for 100 copies, which were sent to the Government offices. It elicited a vast amount of correspondence from natives on mofussil society and circulated in every Zillah in Bengal and in 60 stations. In 1840. the Editor, J. Marshman, owing to other duties, was obliged to give it up. The following year several natives revived it, but it soon sunk in their hands. The Kaumadi, 1819 was started by Bhabani Banerjea and Ram Mohun Ray, it advocated female education and an improved medical treatment, but on Sati

being opposed in it, the Chandrika, and superstition came out in opposition, in 1822 the Chandrika was for many years the Native Times of Calcutta, (started as the advocate of idolatry and the Sati,) a bi-weekly. In 1823 the Timir Nashak, by Krishnamohan Das. W., lasted several years. About 1825 the Banga Dut, by Nil Ratna Haldar Dewan the Salt Board, many able extracts from the Shastras, lasted till 1839. In 1830, Sudhakar, W., by Premchand Ray. In 1831, Sabharajendra, by Moulvi Ali Mola, in Persian and Bengali—Sukhakar, The Gyananeshwan, A. B., W., edited by Rasik Mallik and Dakhin Mukerjea, Hindu College Students : liberal and literary in its tendency, advocated social and political reforms, continued 9 years.—The Ratnakar, by Brajamohan Sing, 1 year, W.—The Sar Sangraha, Benimadhab De, 1 year, gave the chief contents of the Bengali Newspapers. The Anubadika W., gave a translation of the substance of the Reformer, an English paper, edited by Natives. In 1832, Ratnabali, by Jagannath Mallik, a warm Advocate for Sutteeism, an appeal having been made to England to restore the practice, and the appeal proving unsuccessful, this Journal remarked, "The king of England is not in charge of the Government, the people make an individual king just as in our country an earthen-pot is put up and worshipped," lasted 4 years. In 1835, Sateabadi, A. B.—Sudhasindhu, by Kali Shankar Dutt, 1 yr., W. In 1837, Dibakar W., by Ganga Narayan Basu. In 1838, Saudamini, D. B., by Kali C. Dut, on the plan of the Darpan,—Gunakar, by Grish C. Bose, an ex-student of the Hindu College.—The Mritunjay, by Parbaticharan Das, nearly all in verse. "The conqueror of death soon fell in the valley of death." In 1839, Banga Dut, by Rajnarayan Sen : a liberal paper, yet the only one published, on Sunday, even the daily papers, do not publish on that day.—The Arunaday, by Jagannarayan Mukerjea, 6 mos. In 1840, Murshidabad Patrika, under the patronage of the late Rajah of Berhampore, who wished to improve his tenants by it.—The Jyandipika, by Bhagabat Charan, W., lasted 1 year.—The Sujanranjan by Gobinda Chandra Gupta, bi-weekly, written to defend persons attacked by the slanders of the Rasaraj. In 1841, Bharatbanda, W., by Syeamacharn Banerjea. —Nishakar, by Nilkamal Das. In 1842, Bengal Spectator, A. B. Useful news, edited by educated Babus, R. G. Ghose. P. C. Mittra lasted two years.—The Bhringa Dut, by Nilkamal Das. In 1844, Rajrani, by Ganga Narayan Bosu, the Sarbarasranjina, W. In 1846, Jyadadipak, by Maulvi Ali in English,

Bengali, Hindi. Persian.—The Martanda or Sun in 5 languages—shone only for a month.—The Gyandarpan, by Umakanta Bhattacharjea, Bh. P. The Pashandapiran, by Ishwar Chunder Gupta, W., satirical. In 1847, Jyansancharini Organ of a Sabha at Kanchrapara. W.—Hindubandu, by Umachurn Budra, got up, in opposition to Christianity, the Akkal Gurum, by Brajanath, A. B., 4 months, took the side of the Prabhakar, against the Bhaskar.—The Digbijay, by Dwarkanath Mukerjea.—The Kabearatnakar bi-weekly, by Umakanta Bhattacharjea, contained satires and lampoons. The Jyananjan, A. B., by Chaitanea Charan Adhikari—The Sujanbandu, by Nabinchandra Dey.—The Manaranjan, by G. C. De. In 1848, Jyanratnakar by Bishwambar Ghose, W.,—Dinamani, scandalous, W.—The Ratnabarshan, by Madhav Chander Ghose of Bhawanipur.—The Rasasagar, 6 years, triweekly, by Rangalal Banerjea of Kidderpur, contained besides general news, many able literary articles.—The Gyanchandraday.—W.—The Arunaday, by Panchanan Banerjea, W.—The Baranasi Chandraday, by Umakanta Bhattacharjea. In 1849, Rasamudgar, by Khettramahan Banerjea advocated Hinduism with the Chandrika. A rival of the Rasaraj, and teeming with abuse of it, for abusing respectable people.—The Mahajan Darpan, by Jay Kali Basu, weekly, mercantile.—The Sateadharma. Kashika, Pr. P, by Govinchandra Dey, advocated the sentiments of the Karta Bhojas, only one number appeared—The Bhairabdanda, in Benares, by Umakanta Bhattacharjea, waged a fierce war with the Rasamudgar.—Banarasi Chandraday, by Umakanta Bhattacharjea. The Sujanbandu; by Nabin Chunder Dey, weekly.—The Kaustabh Kiran, by Mahesh Chunder Ghose, weekly.—The Jyanchandraday. In 1850, the Sarba Shubakari by Matilal Chatterjea. A censor morum, lasted 1 year. The Satya Pradip, by Mr. Townsend, weekly, a most useful paper, gave a precis of news, correspondence, woodcuts with descriptions of objects in art and nature: weekly, 24 columns 4to. for 6 Rs. yearly. The Sudhansu continued 1 year, Edited by Rev. K. M. Banerjea to advocate Christian influence in the press, gave news and literature. The Burdwan Chandraday, by Ram Taran Bhattacharjea, lasted 1 year. The Burdwan Sanbad weekly, under the patronage of the Raja. In 1851, Jyanoday, by Chandrasikhar of Konnagar. The Jyandarshan, C. H. P. by Shripati Mukarjea, lasted 1 year. was published in Benares at a lithographic press.

297. The Banga Bartabaha, bi-monthly—by some educated young men, to give a precis of news with comments on the events of the day.

298. Bhaskhar, by Gauri Shankar. begun 1839, tri-weekly, 8 Rs., admired for its elegant yet simple style and the ability of its articles and its news: its first editor for an article he wrote against a Zemindar, was carried off a prisoner. Its ethical tales have been in high repute

299. BENGAL GOVERNMENT GAZETTE, Ser P., 1840, A. B., 8 Rs., J. Robinson, W., contains the Acts of the Legislative Council, the Circular Orders of the Sadar, Civil Appoints, 1,500 copies sent gratuitously to Government functionaries.

300. Burdwan Gyanpradaini, 8 Rs.' bi-weekly.

301. Chandrika, Ch. P. 1822, bi-weekly, 8 Rs. annually. The oldest newspaper, started in 1822, as "the Goliah of Hinduism.," in opposition to Vedantism and in advocacy of widow burning and idolatry: it enrolled on its list 800 subscribers.

302. Prabhakar, Pr. P., by I. Ch. Gupta, daily, begun 1830, 10 Rs. At first a weekly under the patronage of some of the Tagores, its Editor is famed for his fine poetry; gives news.

303. Purnachandraday, P. P. daily, begun in 1835, by Ad. Ch Adea, per annum 8 Rs. It has maintained a steady circulation and a respectable tone. The Editor is distinguished for his literary abilities which are often displayed in this paper in articles of permanent interest.

304. Rangpur Bartabaha, begun 1847, by Nil Ratna Mukerjyea, w., 4 Rs. Commenced under the patronage of an enlightened Zemindar there Kali Chandra Ray,—the first native paper that took interest in the rural population: Female Education is advocated in it.

305. Rasaraj, 1839, 4 Rs, bi-weekly. The Punch and Weekly Despatch of Bengal. It was famous formerly for its original metrical composition.

306. Sadhuranjan, 1847, by Ishwar Chandra Gupta, W. Literary news. Some very able translation and original compositions appeared in this.

307. Sanbad Burdwan, 4 Rs. annually, W.

308. Sudha Barshan, begun, 1854, a Commercial and Daily Advertiser in Hindi and Bengali.

POETRY AND THE DRAMA.

Poetry forming such a large staple of Hindu Books, to give all books in poetry would be equivalent to giving under this head three-fourths of Bengali Literature. almost all of which is executed by natives. Bengali poetry embraces two subjects chiefly,religion and love : the poems relating to the former will be found under the heads of their respective subjects,—our selection of poetry on general subjects is therefore very limited. The Vaishnabs were the first poets, their poems were in praise of Chaitanya and his religion, next came Kasi Das and Kriti Bas who a century and a half ago, composed the Mahabharat and Ramayan ; last century we had Bharat the Horace of his day, his themes were war, and love. At the present day few of the educated natives have ventured on the ocean of poetry. There appeared in 1805, Virgils Œneid, 1st Book, pp. 65 tr. by J. Sergeant, a civilian, a student of Fort William College, Monckton, another student, executed a translation of Shakespeare's Tempest.—In 1836. Gayan krit Kaumadi, Hymns to the different gods, with an account of various musical instruments.—In 1837, HOMER'S ILIAD, 1st Book, tr. by Grish C. Bose pp. 30. A. B. About 1840, Gita, Mala, 60 love songs, by Kali C. Chundria, Rangpur Zemindar.

309. (S. B.) Chor Panchash, pp. 91. 1848, a Poet attempting to marry the daughter of the Raja of Burdwan, against her father's consent, was condemned by him to death, and laments his fate in 50 verses, "notes of the dying Swan."

310. 1852, Chhandabali, by Girish Chundra Deb, Scraps of poetry on different subjects, Shiva's marriage, Ritu-bilap, Mrs. Heman's Better Land translated.

311. (S. B.) Bhagavat Gita, a Philosophical Poem. The translation of this into English, Latin, French, German shews the value attached to it as a highly philosophical poem,giving the high mysteries of the Hindu philosophers. Treats of the soul's nature : the superiority of faith to works ; on forsaking works and their fruits ; serving God in his visible and invisible forms. A fine edition of it in Sanskrit, Latin, English and Canarese with Humbold's preface has been lately printed at the Mangalore Mission Press.

312. (S. B.) Chaitanyea Chandraday Natak, Chaitanyea's History dramatised, Translated by Prem Das, R. A., 1853, pp. 400, 1 Re. 8 as. Throws much light on the doctrines and life of Chaitanyea, a Vaishnab reformer, who flourished 4 centuries ago ; the Asiatic Society have lately unnecessarily printed this drama in their Bibliothica Indica.

313. Kirti Bilas, Step-mothers, evils of ; a Drama in 5 Acts, by G. C. Gupta, pp. 70, B. S. P., 12 as. The subjeet : a king's son near the Jumna committed suicide, owing to the cruelties of his step-mother,—the work shews considerable talent.

314. (S. B.) Mahanatak, Ram Chandra's History dramatised, 1851, pp. 229, 6 as.. Su. S. 1849 pp. 229, by Ramgati Kabiratna. Tr. into English by Rajah Kali Krishna.

315. (T.) Mahabharat, by Kasi Das, 1st ed., 1802, C. C. 1852, 1855, 4 Rs. pp. 911, P. C. P The Odyssey of Bengal. The translator was Kasi Das. a Sudra,who for translating this book was cursed by the Brahmans with his kith and kin to all eternity. This work treats of the wars of two rival races for ascendancy in India : and presents a complete panorama of India, as it was in its topography, manners, mythology, 2500 years ago—the original has been the great store-house from which Lassen drew the materials for his elaborate word Indische Alterthums Kunde.

316. (S. B.) Meghdut, C. B. 1850. pp. 136. 1 Re. Kalidas the Indian Shakespeare wrote the original—a husband banished to the forests seeks to send a message to his wife and does it by a cloud,—in this poem is embodied much local description and mythological reterence adorned by a poetical pen. Translated into English verse by Professor Wilson. "The poem affords a pleas ing confirmation of the strength of the domestic virtues among the Hindus and that the relation between man and wife is viewed with tenderness as well on the banks of the Ganges as of the Thames"—the reader has spread before him in its perusal a panoramic scene connected with the principal mythological and traditional local associations of the Hindus in North India. It has been translated into German also.

317. (E. T.) Milton Kabea, Milton's Paradise Lost, 1st book, Ser. J. A. By Bacharam Ray and Bisambhar Dut, students of Serampur College. Various

useful explanatory notes are appended. Milton and Shakespeare have been rendered successful into German, why not into Bengali ?

318. MUSIC, Sangit Taranga, 1848, pp. 251. K. R. On melody, the gamut, musical scales, gives plates of the different ragas or musical modes which are personified as females. In 1820, was published Rag Mala on musical modes, a repetition of this was said to bring down rain in a time of drought, about the same time appeared the Bichar Sar Sangita, the Ragragini and Sangita Rag Kalpadrum all on Music.

319. (S T.) Nala Damayanti, N. P., 1852, pp. 74, 2 as, Milman pronounces this "a beautiful tale full of the most pathetic interest." The king of Berar loses his kingdom through gambling,—he wanders through the forests,—description of the scenery there, the wife clings to her husband amid all misfortunes. At length recognises her husband at Oude, by his mode of driving ; the throne at length regained. This work needs pruning. The original has been translated into Persian, Russian, German, French, Latin and English, it has passed through many editions in Bengali.

320. (S. T.) Ramayan, tr. by Kriti Bas, 1st Ed. SE. P., 1803. P. C. P., 2 Rs. 1853, pp. 506, The Iliad of the Benaglis ; giving Ram's march from Oude through the South of India, aided by aboriginal tribes, his conquest of Ceylon, his rescue of his wife like another Agamemnon : it depicts the religion, literature, and manners of the Hindus 2,000 years ago. The original has been recently translated into Italian, and published in Paris at the expense of the King of Tuscany : innumerable editions have been printed in Bengali ranging in price from 1 to 10 Rs. An Edition of the Ramayan is coming out under the patronage the Raja of Burdwan.

321. Ratnabali, a Drama, by Hurshar, King of Kashmir, in the 11th century, pp. 216., T. P.

322. (S. B.) Ritu Sanhar, by Kalidas, the Indian Shakespeare, Bi. B., 1848, pp. 71. Many Editions. The Thompson's Seasons of India, it has been translated into Greman, Latin and English, and abounds with passages of exquisite beauty, showing a thorough love of nature, Sir W. Jones says of it "every line is exquisitely polished and every couplet exhibits an Indian landscape always beautiful, sometimes highly coloured but never beyond

nature," many editions have been published in the bazar, but like Horace and Juvenal, there are indelicate passages in it which require excision.

323. (S. T.) Ritu Sanhar, by Madhab, Roz. & Co., a prize translation of the Sanskrit College : expurgated ; the style is high.

324. (S. T.) Ratnabali, pp. 216, 1 Re. 8 as., T. P., tr. by Nilmani Pal, from the Sanskrit Drama, written by a Kashmir poet. Requires pruning.

235. (E. T.) SHAKESPEARE'S Merchant of Venice, translated with adaptations. Bhanumati Chitabilas, pp. 220, PC. P., by Hara Chandra Ghose. Shakespeare's ideas, but given in a Bengali dress : well and ably done.

POPULAR SONGS.

The Bengali Songs do not inculcate the love of wine or like the Scotch, the love of war, but are devoted to Venus and the popular deities ; they are fithy and polluting : of these the most known are the Panchalis, which are sung at the festivals and sold in numerous editions and by the thousand.— Some on good paper, well got up, others on the refuse of old canvas bags. The Panchalis are recitations of stories chiefly from the Hindu Shastras, in metre, with music and singing, they relate to Vishnu, and Siva, intermixed with pieces in the style of Anacrœon. Dasarathi Ray is the most famous composer of them, by which he has gained much money ; 50 years ago Antony, a Portuguese, composed many songs. Rasik Chandra Ray is another of these composers and Nidhu, a century ago, composed poems sung to this day ; he was said to have written the best when he was drunk SONGS are in abundance on love subjects, as the Bichar Sar Sangita 1832. Sangitrasmadhuri 1844, pp. 214, the Gitratna, by Ram Nidhi : the Sangitabali, pp. 133, by the Rajah of Burdwan. Rasik Tarangini, tr. by Madan Mohan Tarkalankar, fragments of erotic poems on love.

The Yatras are a species of Dramatic Action, filthy, in the same style with the exhibition of Punch and Judy, or of the Penny Theatres in London, treating of licentiousness or of the amours of Krishna. A mehtre with a broomstick in his hand always cuts a figure in them. We have the Nala Damayanti Yatra Gan, Nala's history dramatised in this form.

On Erotic subjects there are various books which have passed through many editions in prose and poetry and have a wide circulation, as the Adi Ras, Beshea Rahasyea, Charu Chita Rahasea, Hemlata ratikanta ; Kam Shastra 1820, Kunjari bilas, Lakhmi Janarda Bilas, Prem Ashtak ; Prem Bilas ; Prem Natak, Prem Taranga ; Pulakkan Dipika ; Prem Rahasyea ; Shringar Tiluk, 1st ed. 1817. Ratibilas ; Sambhog Ratnakar with 16 filthy plates. Ramani ranjan ; Ras Munjari ; Ras Sagar ; Rasrasamrita ; Rasatarangini ; Rasomanjari ; Rassindu Prem Bilas ; Rati Kali, 1st ed. 1820 ; Rati Shastra, Ras ratnakar ; Shringar Ras ; Shringar tilak ; Stri Charitra ; Stri Pulakhon Dipika ; These works are beastly equal to the worst of the French School.

TALES.

Tales abound in Bengali, "thick as leaves in Vallambrosa." like those in England last century love with all its difficulties and agitations from the chief subject. We shall notice in the numbered catalogue only those fit for general circulation, those out of print or unfit for general circulation are now given, they are all love tales. Abhilas Ras Sindhu, J. K., 1849, pp. 127, 3 as. by Jagachandra Bhattacherjea of Madarall. The original is in the Mahabharat. Apurbapakhyean, 1842 pp. 124, relates the adventures of a king's son. ARABIAN NIGHTS, Beauties of the : by Hari Mohan Sen, 1839, P. T., Bahar Danish, N. P. 1854. pp. 225. "The tales exhibit a highly colored picture of Asiatic manners displaying in particular the sentiments and superstitions of the Hindoos." They were translated into English, in 4 vols., by J. Scott, Esq., in 1797. They require pruning. Bandu Bilas, 1851, J, R., pp. 102, a fairy tale scene the forest, the devices of travellers who have lost their way there. Chandrabansa, 1841, pp. 122. (P. C.) Chandrakanta, a merchant travels and falls in love, 1st ed., 1829., 1854, pp. 206, 6 as. 18mo. By Kali Prasad a Vaidea, gives a picture of a woman riding on an ass, as a punishment—Chetan Kaumadi, R. C. Bosu of Gundulpara, 1847, pp. 120, illustrates the evil consequences of wickedness. (S. B.) Chitotmagna, 1853, pp. 58, the Book has poetry on amatory subjects. Duti Bilas, pp. 60. Harischundra's Life, 1847, the great benefactor of the Brahmans, who to raise money for them sold his

wife and then himself. Jangari bilas, Bi B. pp. 88. 1853, Jiban. Tara Bi. B., pp. 90, 6 as., a love tale with Durga on the tapis. Kabi Rahasea, by Ram Prasad, of Halishwar relates to Videa Sundara. Kali ranjan, by Ram Prasad Sen, the tale of Videa Sundara in a differentform. (S. T) Kamini Kumar, 1st. ed. 1836, 8 as. A. J. U. 1854. 5 as. pp. 235, the original by Kali Das. The original translated by Kali Krishna Das, the scene is connected with a travelling merchant, notices of Tribeni, Kalighat, Patna, Nuddea, his wife confined for an intrigue, she escapes and they meet In Benares. Kanak Latika, Tales from the Shastras, pp. 147, 1830. Kandarpa Kaumadi. 1834, love tales about a king of Bahar. Kautuk Sarbasa Natak, Ch. P., 1830, a drama, by R. Chundra Tarkalankar of Harinabhi. Khos Galpa Sar, 1839, pleasing tales by Gungadhar Tarkavhagis, of Halishwar. Kunjari Bilas, Bi., B, pp. 88. a love tale, scene among the Rajkumars. (P. T.) Layla Majnu, A. I. U, 2nd ed., 1854, pp. 199, by Dwarkanath Ray. Describes the strong attachment of the son and daughter of two Arab chieftains to each other. Sir W. Jones edited the Persian original.

(S. T.) Madhub Malati, a Fairy Tale. Mahani Mahan, by Sambhu Chundra Chakrabarti, an Episode taken from the Brahma Baiberta Purana, the scene laid in Surat. Manmath Munjari, Sh., P. 1851, pp. 172, the scene laid in Surat. Nabarassindhu, 1840, pp. 116, Rahasea Bilas, K. L. 1850 pp 80, by Uma Prasad Banerjea the scene laid in Dacca. a tale of a childless king who had eventually a daughter who refused to marry a man she had not seen and subsequently led a happy life with the man of her choice. Rasik Tarangini, by Panchanun Banerjea, pp. 45. Jy. A. P., 1855, 1 as. very popular. Rasamunjari Bi. B. 1853, pp. 64, by Bharat Chundra. Rassindu prembilas pp. 96, 2½ as. Sati Dharma, Bhr. D., 1849, pp. 14, 1½ as., from the Kashi Khanda, an account of a widow who preserved her chastity. Sati Ranjan, by Gobindo Das, 1845, pp. 48, 1 as. tale of a wicked son of a king of Oude. Sativa Sudha Sindhu, A. J. U., 1855, pp. 83, 4 as., by Svarup Chandra Shur, of Chandranagore. Shuk Bilas, K. As., pp. 135, 1851, 3 as., 1st ed., 1836, by Nanda Kumar, relation to Vikramadatyea's marriage in the Mahratta country, visits Bhoje advised by a Parrot. Shukh Etihas, pp. 91 Pr. T. 1852, parrot tales by Nal Comul Badury. Sukumar Bilas, Pr. P., 1852, pp. 17 4 as., a prince travels to gain knowledge, rescues a king's daughter from robbers, marries her in spite of the father. Shukh Shambad, 1838, pp. 132,

tales by Dwarkanath Kunda, from the Persian Tota Nama, (S. T.) Vasabdutta, 1837, by Madun Mohun Tarkalunkar, a prince falls in love with a princes in a dream, she had rejected all other suitors—their wanderings and happy union. Vishva Mangal Natak, 1844. Jy. R., pp. 67, by Dwarkanath Ray, of Garibha. licentiousness and devotion are mixed up in the tale. Vidyea Sundar, "a book that will serve to amuse those who are but little acquainted with the Hindu system of courtship. It is perhaps the most classic poem we now possess in the Bengali language : but is disfigured in some places by licentious allusions." Kasi Prasad Ghose has given an English translation of several poetic stanzas. Parts of this tale have been acted as a play in private houses of Babus and listened to by crowds, on the most popular tale in Bengal, and though not fit for general circulation is worth reading by Europeans for the style and the account of native customs given—this year there are editions of it from three separate presses, the Bhaskar, Ratnavidyea, Kabitaratnakar.—Yojan Gandha, by Bonewari Lal Ray.

326. (E. T.) ARABIAN NIGHTS, No, 1, 2, 3, pp, 900, 3 Rs., P. C., 1855, by the editor of the Purnachandraday. Taken from Forster's translation, 1,500 copies of the first two parts have been sold.

327. (E. T.) ARABIAN NIGHTS, tr. by N. M. Baisak, 1st ed. 1850, 2nd ed,, S. P., 1854, pp. 576. Tales 52 in number written in a simple style, giving much innocent amusement in the perusal, besides making the Hindus better acquainted with Moslem manners, and modes of thought.

328. ARABIAN NIGHTS, by Rev. W. O. Smith, pt. 1, 1850, pp. 65, 1 Re. From Lane's edition.

329. Betal Panchabinsati, 1st ed., 1818, S. P., 5th ed. 1855. S. P. 8 as. Tales relating to Vikramadityea, king of Ujein : composed 1,800 years ago. Very popular,—this is an expurgated edition translated from the Hindi by Ishwar C. Vidyeasagar. The ordinary editions are very abundant and range in price from 3 as. to 8 as.

330. Chhar Darvesh, tr. by Umachurn Mittre, A. J. V, 1854, pp. 169, tales of a merchant in Damascus, and Bosra : the Urdu is well known to every young officer in Fort William College, as the Bagh Baher which has been translated into English : the tales much like those of the Arabian Nights.

331. (P. T.) Gole Bakaoli, by Umachurn Mittre. Bi. B. P. 1855, pp.

113, 2 as. A very popular work, a fairy tale : adventure of a blind Persian king, in search of a rose, said to have the property of restoring the sight.

332. (S. T.) Kadambari, by Tara Shankar Shirma S. P. pp. 192. The Story of a Heavenly Nymph who loved an earth-born prince.

333. (P. T.) Hatim Tai, 2nd ed. pp. 306, 1 Re. R. V. P. the John Howard of the Arabs as famous for his generosity as Don Quixote was for his Knight-errantry, he killed his own horse to feed an ambassador.

334. Parsea Itihas, Persian Tales, tr. by Nil Mani Baisak, 1st ed., 1834, last ed., 1850.

335. (E. T.) SHAKESPEARE, LAMBS TALES from ; tr. by O. C. Adea, Sekspear Apurbopakhyean, P. C. P., 1852, pp. 500. Gives 20 Tales—the Council of Education subscribed for this work.

336. (E. T.) SHAKESPEARE, LAMB'S TALES from ; tr. by Dr. Roer, Roz. & Co., 1853, pp. 212, 6 as. Contains the Tempest : Midsummer Night's Dream : Winter's Tale : Much Ado about Nothing : As You Like It : Merchant of Venice : King Lear : Macbeth : Hamlet. Published by the Vernacular Literature Committee.

MISCELLANEOUS.

Beauty, Human, marks of, Panchanga Sundra, 1822, points out how the different parts of the body are beautiful, and what lines indicate future fortune. Byeabahar Darpan pp. 48. Two Essays on Colonisation, on Persian in the Courts. Byeabahar Mukur on Ceremonies, 1853. CASTE, ON, tr. by Harachandra Ghose, pp. 13. CEREMONIES, DAILY, Nityea Karmapadvati. Charter Act, on, pp. 26. DAYS, PARTICULAR, observance of, Din Kaumudi, 1823. DOCTORS, IGNORANT, dawn of knowledge on, Abodh Baidyea Bodhaday, 1830, pp. 40. To show rhat the Brahmans are superior to the Vaideas, in the Medical Art. DOCTORS, fallen, deliverance for, Patit Baidhyoday, 1822. Some of the Vaideas wore the paita, this gave rise to a schism. DOCTORS, A SUPERIOR CASTE, Vaidhatpati, 1830, a defence of the caste of the Vaidyea. DOCTORS, their right to the Brahminical thread, Vaidullas, pp. 24, 1832. DREAMS, 1836, Bodharnav. (S. B.) by Ramkrishna

of Baradpur : On the interpretation of a curious book.—gives also Meral sentences. DUTIES religious on, Dharmanjan, by Govin Kanta Bhattacharjea, pp. 52, 1845. On truth, covetousness, anger, purity, temperance, definitions of the 10 virtues enumerated by Manu. DUTIES on, Karmanjan, do., pp. 202. EAST INDIA PROPRIETORS' Speeches ; J. Sullivain, Sir J. Lushington, E. W. B. Bailey's Speeches on the subject of native agency. Drikal Darpan. On Grammar, dreams, Songs, the laws, Khaistas a Khagiskill, other Anecdotes. EARTH, account of, according to the Purans, Bhu Darpan, 1843, gives a notice of the seven continents, seas of buttermilk, curds. FUNERAL OBSEQUIES on, Tarpan, 1824. IDOLATRY, defended by Mritunjay, 1820. IDOLATRY, opposed by a Telinpara Zemindar. IDOLATRY defended, Dibanba Norasang. INTRUCTION, SALUTARY, Dialogues on, Prashnotar Kaumadi, 1845, pp. 32. JAGANATH, its history, ceremonies ; by Bhabani Banerjea. Purushottam Chundrika, 1845, pp. 76. Kalikata Kamalalay, 1823, Ch. P., pp. 91, a curious account of Calcutta, as the abode of the goddess Lakhmi, its castes, knowledge, and the Sahibs. Kali Shankar Ray, Life of Aschargea Upakyean, pp. 20, 1834, Khaystha Dipika, Khayastha Rasayan, pp. 32, 1848, on the right of the Khayasthas to wear the Brahminical thread. Karma Lochan, Ser. 1821, pp. 32. (S. B.) after the printing of this work the publisher found the people were afraid to purchase it, as the instances of their religious omissions were so numerously recorded in it, that they were afraid of deing reduced to beggary by the imposition of fines from the Brahmans, on account of the neglect of religious rites. Konnagar, DISCOURSE on the present and past condition of India, pp. 54. Kamakhayea Jatra, account of the famous places of pilgrimage in Assam. KINGS AND PRIESTS, Satires on, by Kalidas, Hasyearnab, 1 Rp. 8 as., 1822. KNOWLEDGE, on the advantage of, Jyanakar, K. R., 1848, pp. 15, inculcated in the form of fables. KNOWLEDGE, an address on, by Ramnarayan Chatterjea, to the students of the Metropolitan College, pp. 20, 1853. Knowledge, on, 1839. Kriyajog Sar on the Gunga Tulsi plant, and various gifts to procure holiness. KULINS, belonging to the Khaysthas, account of. Kul Pradip, 1832, pp, 24. LANDHOLDERS Meeting, Proceedings of, 1838, pp. 76. LANDHOLDERS Meeting at Town Hall, 1848, pp. 93. Niteananda Sabha, account of, pp. 24. PALMESTRY, on, Karprodip. Pilgrimage, on, Tirtha Kaibalyea Dayini, 1829, pp. 48, account of the seven

places of pilgrimage which secure salvation. Mathura, Mayapur, Kasi, Kanchipur, Avanti, Dwarka, Gunga ; Panch Upadesh, 1839, 4 as., a book prepared for young people, by J. Macfarlane. POETRY, Hindu defence of. by R. L. Banerjea, pp. 52, 1852, an able Essay. PRACTICES, HINDU, Achar Darpan, 1845 The orthodox mode of shaving, bathing, cleaning the teeth. PROVERBS, Bahu Darshan. by Nil Ratna Haldar, Ser. 1826. pp. 147. Proverbs in Sanskrit, Arabic, Persian, Latin, English, with their meaning in Bengali, the corresponding Proverbs in Sanskrit, and Persian ; proverbs with corresponding ones in English and Sanskrit "the auther has dived into the ocean of knowledge to fetch up these gems, which serve so much to adorn social intercourse." RAJA KRISHNA'S EAMILY, Genealogy, pp. 21, in English and Persian. RAILWAY, East India, on Stephenson's letter, 1848. Rasa Sagar, 1846, pp. 48, by Prasanna Chandra Gupta, on the influence of women, their grief in separating from their husbands. SANSKRIT LITERATURE, Essay on, by I. Videasagar, pp. 54, 1854, an able review of the various branches of Sanskrit Studies. Sati Dharma, a defence of WIDOW BURNING.

SATI, Ram M. Roy's opposition to, Sahamaran Sambad, 1810, which he had the courage then to call murder. Sahamaran Sambad, 1819, a continuation of the same subject, Sati DEFENDED, from Anghira, Parasure, Harita, the latter says the woman must get rid of her feminine body in the flames. SATI, petition in defence of, to Lord W. Bentinck, 100 pp., 1830. Sadhu Santoshini, by Kasinath Tarka Punchanan, Cal., Ch. 1826. The object of this pamphlet is to show that swearing by Ganges water is against the Shastras, the author was the Law Professor in the Sanskrit College, Calcutta, the only authority however the author adduces on his side is that of Ragunandan, who denounces punishment in hell for seven generations against him who swears after having touched the Ganges water, on the other side it is alleged that when the life of a cow or a Brahman would be endangered, there is no sin in an oath. SCOTCH AND IRISH, destitute, appeal for, Sat Karma Biraatna, 1847, pp. 30, the English, by C. Cameron Esq., the Bengali tr. by K. Banerjyea Shradva the manner, and time of observing. Shradva Mahatmea, S. B. 1848, SER. Ch. C. shows how the practice of observing Shradvas is declining. Sushil Charitra, pp. 150, 1827 by Guru P. Roy of Kanchrapara, on Ethics, with

tales to illustrate them. Svoabhab Darpan, on self knowledge, the structure of the body, futurity had a blessing, on Atheism, different food for different creatures. Shasti Puja, 1832, Bh. S., pp. 32. Sansar Sar 1852, 1st ed., 1829, Ch. pp. 12, treats of the Guru, the cream of the world and the benefits of revering him. In Süshil Montri, 1836, by Guru Prasad Ray, Dewan to the Malliks, good counsel to a Raja enraged with his children. TREES, worship of, Bilva Charitra, pp. 49, the bel, champak, tulsi, durbha. Tulsi plant, on its worship. Tulsi Mahatmea, a nymph having exerted the jealousy of Krishna, was changed into this plant, which may be seen as an object of worship in every village in Bengal. WEALTH, rules for acquisition of, by Ishwar Ch. Bhattachergea Lakshmi Charitra, 1st ed., 1820, 1842, rules from the Padma Purana, for winning the favor of Lakshmi, the goddess of luck. Witticism, Kautak Bilas, 1849, 7 as, told at Kishnaghur by Bharat Chandra, for the amusement of the Raja of Nuddea, clever,but indecent, an account of the Raja and his buffon, Gopal, or Kirti Bas, the book says the Raja was born on earth, for having violated a women in heaven. WOMEN, evll deeds of, Stri Durachar,1840,a king of Ujeyn asks Kali Das to give him account of woman's faults. WIDOW RE-MARRIAGE, Bidhaba Bibaha Nishadh 1846, pp. 28. Advocates Sati, reckons those widows who re-marry as beasts and deserving death. WORSHIP of the Goddess Durga, Shasti Santishini, 1832, pp. 30, with a picture of the goddess, mounted on a cat.

337. (S. B.) ATONEMENTS, Hindu, for venial sins, Karma Bipak, 1st ed., 1820, Ser. P. Jy. A., 1855, pp. 61, 4 as. by Ram Chandra Tarkalankar. Shews various diseases from various sins : and special diseases as the result of special sins.

338. BENGALI Language, Discourse on, Jyanopadesh. by I. C. Chaturjea,1853, pp. 14,1 an. On the importance of studying Bengali Grammar.

339. INSTRUCTION for boys, by Bani Madhav Chatterjea, 1854, pp. 100. Moral instruction with fables or anecdotes in illustration.

340. (S. B.) CASTES, account of the origin of, Jati Mala, J. R. 1850, pp. 22, a curious work on the Mythological rise of castes, why some of them were degraded.

341. (S. T.) CASTE, refuted by a Buddhist ; Bajra Suchi, composed in Sanskrit and tr. into English by B. Hodgson. Shows great knowledge of

Hinduism and subtlety of reasoning : an edition was published in 1842, by W. Morton, with notes and an English translation.

342. CHARMS, Gayatri, 2nd ed., 1849, pp. 24. A Mantra or charm whispered into the ear of every young Brahman when consecrated to the priesthood to the following effect. "We meditate on that excellent light of the divine sun, may he illluminate our minds."

343. (S. B.) CHIROMANCY, the Hindu fortune- tellers' guide Samudrik, pp. 48, B. B., 1855, 2 as. Gives the fortunes predicted by the various lines on the hand, forehead, arms, loins, feet, navel, breast.

344. (S. T.) COOKING, Pakrajeshahar, according to the Shastras, BH. P., 2d ed., 1854, pp. 93, 8 as., by Gauri Shankar Tarkabagish. Published under the patronage of the Rajah of Burdwan, treats of the cooking of rice, vegetables, fish, eggs, and pease, giving compositions that would rival French cookery, to it is appended a poem on cooking. Those receipts were made 1,800 years ago.

345. (S. B.) DREAMS, Swapnadhyea, pp. 16, 3 pice, 1st ed., 1820. On Dreams and their interpretations.

346. FABLES for Students, Balak Bodhak Itihas, By Kesab C. Karmakar. Ch. C. Ser., 1850, pp. 36, 2 as.

347. GANGES CANAL, account of, with a Map, 1855, pp. 44. 2 as. Roz. & Co., by the Vernacular Literature Committee.

348. GANGES, ITS DESCENT and COURSE, Ganga Bhakti, pp. 181. 4 as., Ser. Jy. A., 1854, by Durga Prasad Mukerjyea. Many editions of this have been published—notices the course of the Ganges, the mythological account of it, and the place such as Nuddea and others along its banks.

349. GURUS EXPOSED, Gurutatva, by Gobinda Ghiri, 1852, pp. 68, 3 as. Points out the Mantras, or charms used among the Hindus on building a house, for snake bites, cholera, and the means of Gurus realising large sums of money. The author was a Sanyiasi and well acquainted with the tricks of Gurus, In 1836, appeared the Gyanandra Pramadini, by Bana Mali Sen.

350. HARLOTS PROGRESS, Naba Bilas, See S. P., 1852, pp. 82, 1½ as. Points out the career of a frail woman as a servant, a devotee, a pimp, a beggar, at first a blossom, then perverted by a barber's wife, becomes a nach girl and finally practices the Vasanti Puja. This book gives a key to the history of seduction. Many editions of it.

351. HINDU SOCIETY AND RELIGION, THEIR CONDITION, PROSPECTS, Dharma, Marma, Prakashika, pp. 46.

352. IDOLATRY refuted from the Shastras, Tathea Prakash, 1842, pp. 60. Braja Mohan, a friend of Rammohun Ray, refutes Idolatry from the Hindu Shastras, with all the pungency of Lucian, an edition of this work with notes was published in 1842, by the Rev. W. Morton.

353. INDUSTRY, the fruits of, Parishram Prayog, Pr. P., 8 pp., by Shyeamacharan Banerjea. Published at the repuest of Major Hannington.

354. JUSTICE AND MERCY, Discourse on, at Jagulia, 1853, Bi. B., pp. 16.

355. Kajir Bichar, 75 Anecdotes of a Judge's Decisions, Beng. Su. P. 1854, pp. 65, very clever, witty.

356. Kali Ghat Temple, origin of, Pita Mala, pp. 11, the mythological history of the origin of this and many other Sivite shrines in Bengal.

357. (S. B.) KNOWLEDGE, Self, Atmanatmabibek, by Shankar Acharjea, on the body, sense, difference between matter and spirit: the cause of pain, on sleeping, dreams.

358. KNOWLEDGE, Miscellancy of, Gyanangkur, 1846, pp. 64

359. (E. T.) Manahar Mala, 1840, by G. Galloway. Anecdotes of clever dicisions by kazis, shrewd remarks by kings.

360. Manaramea Itihas, N. P, 1853, by Akhay Charan Das. Tales of a conversation between a mouse and a snake. It abounds in native proverbs.

361. INCARNATIONS, 10 Hindu ones, Narad Sambad, K. Al., 1855, pp. 46, 1½ as. To those who wish to have a popular account of the ten Hindu incarnations of Vishnu into a fish, tortoise, this book gives information.

362. Man Singha, by Bharut C. Ray, the famous poet, F. C. P. Gives curious details of the Emperor Akbar sending his general Man Sing to conquer Pratapadityea, the last King of Sagur island, the latter was caged and when dead, some of his remains were fried with Ghi, by Man Sing,—account of Man Sing's pilgrimage to Jagannath.

363. MODERN BABU, Sketch of, Naba Babu Bilas, 1st ed., 1823, 1853, pp. 50, 2 as. V. V. One of the ablest satires on the Calcutta Babu, as he was 30 years ago, new editions of the work are constantly issuing from the press, the Babu is depicted as germinating, blossoming, in flower, in fruit.—

The Babu under the Guru Mohashay, under the Munshi, devoted to licentiousness and his lament for his past folly. It is a kind of Hogarth's Rake's progress, the book was analysed at length in the Quarterly Friend of India, 1826.

364. Omarahasyea, 4 as., in this the origin of the popular Hindu festival the Durga Puja is given.

365. PICTURES, MYTHOLOGICAL, can be had from 1 to 4 pice each : illustrating the different subjects in Hindu Mythology, they meet with a large sale.

366. (S. T.) Purush Parikha, MORAL TALES, 1st ed., 1814, Ch. Ch. 1853, 1 Re, pp. 186, Day and Co., illustrates by a Tale for each, the following subjects, 53 in number, charity, sympathy, integrity, valor, cowardice, niggardliness, indolence, ready wit, quick apprehension. Swindling, wickedness, ignorance, knowledge of the Vedas, secular knowledges, science of drawing, use of singing, laughing, repentance, covetousness. At the suggestion of Bishop Turner an English translation of this work was made and published by Maha Raja Kali Krishna, in 1830.

367. PILGRIMAGES, abominations of, exposed, by a Sanyeasi, Tirthabibaran, pp. 115, 1842, 8 as., 2nd ed., 1854, 15 places visited and all their mysteries, wickedness exposed by one in the secret, the dancing girls, extortions, false miracles are shown up.

368. (B. M.) PROVERBIAL PHRASES, Vakea Vineas, pp. 62, 4 as., K. As., 1854, by Mathur Mohan Biswas, many editions, gives the origin and meaning of many quotations and sayings in common use by the Hindus.

369. PROVERBS, 873 Bengali, by W. Morton 1832, with an English translation and explanation, gives Europeans an insight into the character and modes of thought of natives.

370. (S. B.) Probodh Chandraday, a Metaphysical Drama, 1852, 1 Re. tr. by Gangadhar Nyearatna of Rajpur Many Editions have been translated into English and German : Dr. Taylor's English translation is re-published this year for 1 Re. at P. C. P.

371. (E. T.) RAILWAY TRAVELLERS, directions for, 1855, pp. 18 : 1¼ as. translated by Akhay Kumar Dut.

372. (S. B.) RITUAL PRACTICES, Byeabhar Munjari, pp. 12, 12 as.

1848, S. B., by Karma Lochan, advice on the position of the body in sleeping at night, on the kind of respect to be paid to the Brahmans on pilgrimage.

373. SNAKE GODDESS, Manasa Bhasan, by Khemananda, pp. 111, 1½ as, 1847, BL. B. The goddess of snakes is invoked in the Manasa Sij or Euphortra ligularies—this work treats of this goddess so formidable to the simple peasants of the villages, it was written a century ago, gives an account of the sufferings of a merchant who refused to worship the goddess.

374. SANSKRIT QUOTATIONS, Kabitaratnakar, pp. 62, 2 as. K. As., Mr. Marshman published it with an English translation—sayings from the Sanskrit, with a Bengali commentary in verse.

375. SOOTH-SAYING, Hanuman Charitra, Kak Charitra, pp. 96, on augury by certain circles, by the fight and sound of crows.

376. WIFE, FAITHFUL, duties of a, according to the Shastras Potibratopakhyean, won the prize offered by Kali Chaudri, Zemindar of Rangpur, P. P. 1854, pp. 72, 2nd ed.

377. WIDOW Re-marriage, against, 1855, CH. S. pp. 21.

378. WIDOW Re-marriage, against, 1855, P. C., pp. 16.

PART III

THEOLOGICAL.

THEOLOGY—CHRISTIAN.

SERAMPORE AND EARLY PRINTED TRACTS.

In 1800, Ram Bose's Gospel Messenger ; Pearce's Letter to the Lascars ; Hymn Book pp. 259 :—Catechism of Scripture names, Sermon on the mount : —in 1801, Ram Bose's Gyanaday against the Brahmans : Missionaries Address to the Hindus ;—in 1802, Carey's Summary of the Gospel ; Krishna and Christ compared ; address to the Hindus ; Watts' Historical Catechism ;—Sure

Refuge, this tract led to the conversion of three natives. In 1805, Life of Christ in Verse : Good Advice ; The Enlightener ; from 1800 to 1806, a million Tracts were distributed by the Serampore Missionaries. In 1807, Chamberlain's Watt's Catechisms in verse. Do. Mental Reflection. Do. Ten Commandments. Do. Penitent's Prayer, Tarachand's Examination of Hinduism :—In 1810, Alphabetical lines and verses. Glad Tidings, a poem : Creation of the World, a poem : Jagannath worship, folly.—About 1812, Essence of the Scriptures : Extracts from the Bible on God : Kangali's Hymns ;—in 1818, Aratoon's Catechism ; a Hindu pantheon : Fatik Chand's Life.—Satya Darshan, —School Lessons ; Tract on God's nature ;—1819. Dialogue between a priest and an offerer ; Krishna Prasad's Life, Harmony of the Gospels. (A. B.) Schmid's Divine Sayings ; 1820. Scotchman and Babu ;—in 1821. William Kelly's Life ; in 1822, F. Carey's Pilgrim's Progress ; Picture-room, Christian Religion, Dut on Christianity and Hinduism, pp. 70. Williamson's Instructor ; in 1824, Happy Deaths, Little Henry and his bearer ; Scripture Extracts, Dying Words of Jesus.—In 1824, Carey's Best Gift,—in 1828, Paul at Athens, Buckingham's Way of Life—1829, Williamson's Evidences of Christianity. Carey on Repentance, Buckingham's Letter discovering Error. Prophet's Testimony of Christ—1830, Faith and Hope—1831, Gods and Idols ; Praises of the Self Existent ; God's Punishment of Sin ; In 1833. Buckingham's Works of God,—in 1835, Refutation of the first lie, Dialogue between a Missionary and a Pilgrim.

LATER TRACTS AND OUT OF PRINT

Balak balikar prashnotar—Bengali Reward Books a most useful Series of Biographies, 1849, pp. 24, mo., 8 pages each ; Life of Abraham pp. 47, 1842—knowing the Scriptures—account of Mritunjoy—Abhaycharan,—The Orphan Girl,—Mary, the attentive child—God sees every thing,—Hannah Coates,—Mary's Lesson about Jesus,—Rabi.—The Pious Villager,—Ramgati,—Jagannath,—a New Zealand Story,—Death of Susannah—Christ's Garden. BIBLE, Substance of, in verse, Dharmapustuk Sar, 1840, pp. 20. BIBLE, Substance of, in prose, pp. 84, to David's time—Bunyan's Holy War, Dharmajudha, tr. by

J. Robinson, Ser P. 1849, pp. 353—CHURCH CATECHISM, tr. by A, Alexander, 2nd edition, 1844 :—CHRIST, Discourses of, B. C. P., pp. 23.— Christ's Sermon on the mount A. B. pp. 29—Christianity, Leechman's Summary of, 1836—Commandments, two,—Dipak Reichardt's Catechetical body of Divinity, on Doctrinal, and moral subjects, 1825, pp. 133,—Deer's exposition of the Christian Religion, 1838, pp. 103—Drishtanta doha, 1842.—Drunkenness, Fruits of, Madeapan pratiphal, pp. 22, 1842,—Drunkard, career of, Matal Gati, pp. 10.—Dukhamay Jagat, Serle's Way of Happiness pp. 47, 1844.— EPHESIANS, New Translation of, by Street and Smith, 1851, pp. 13.— Galatians, Kishnaghur version of, 1853.—GOOD ADVICE, pp. 16—Heathen, duty of, seeking their salvation. Hymn Books, many have been published ; we shall give the different ones, Ser. P., 1800, pp, 258 —Do. 1804, 1818, Ser. P. —Do. London Missionary Society, 1820 ; T. S. 1829, 1830, pp. 146—1835.— Do—Do. 1846—Do, 1841 Ser. P.—Do. Watts, 1843. Do. (A. B.) Hymns for Infant Schools, pp. 22, 1846. Hymns, 1847. INFANT BAPTISM, defence of, 1841, pp. 25,—JOHN, GOSPEL OF, Ellerton's 1815, printed at the expense of the Countess of Loudon, for the use of the School she had established at Barrackpore.—Ellerton's New Testament, 1820, the translator was an Indigo Planter,—John Gospel of, Kishnaghur version—1854, Kena, Kena Misibaba, pp. 11.—Khailas, Memoir, pp. 60, 1846. Lady Jane Grey's Life, pp. 17, 1829. LIFE, Way of, Jibanpath, pp. 48. Mark, Catechetical Exposition of, by Mundy, 1828, pp. 423. Mathew and John, tr. by Ellerton, ed. 1819, 1826, 1832, 18,000 copies printed.—Natives of Calcutta, Address to, in Bengali, Hindi and English, pp. 11. New birth on :—New Testament, Carey's tr. 1801, last ed. 7th, 1832. New Testament. Ellerton's tr. 1819, pp. 993. Padri and Pilgrim, Conversation between, pp. 9. Patra Kaumadi, pp. 68, letters on Christianity. Piffard's Life, 1842, pp. 46, a Missionary who served without pay. (A. A.) Pilgrim's Progress, pt. 1, 1835, pp. 400, T. S.—PRAYERS, Pearson's Manual of, 1830, pp. 58 : Do. of another kind, 1825. Riddles, 24 Scripture, in verse, by Bareiro, 1849, pp. 51. ROCHESTER, EARL, Conversion of, 1829, pp. 4.—Romanism, Banerjyea's Preseryative against, pp. 31, 1842.—Roman Catholic Prayers, pp. 16,tr. by M. Crow—Romans, Commentary on, 1825, by E. Carey, pp. 218.—Satyea Sukh pp. 12, 1842.—Sermon, Banerjyea's, on Timothy, 1 C. 15 vs. 1847.—Scripture, Schmid's Summary of,

1820, pp. 295.—St. Andrew's Church Baripur, opening of, pp. 8, with a drawing.—St. Peter's Church, Baripur, opening of,—Supadesh, pp. 16.—Tamanashak by Capt. Stewart, 1829, on Hindu practices, and Siva's conduct. TEXTS FOR CHRISTIANS, 1844, pp. 26, Pratidin Karma,—Texts, to commit to memory, pp. 24, Padavali.—Texts, Daily, for a year, 1846, pp. 366, by Mrs. Voigt.—Theology, Outlines of, by Wenger, on the Bible and God, 1848, B. M. P., pp. 165—Verse, 24 answers in, on the chief Scripture doctrines.—Vulgar errors, refutation of, pp. 28.

TRACT SOCIETY'S TRACTS.

FIRST SERIES.—Comprising those Tracts, which are best adapted for general circulation among the Heathen and Musalman population of the country :—

Atonement, Great, 20 pp., 1st ed. 1837. Bible, Essence of the, 20 pp. Catechism, 12 pp. Christ's Sermon on the Mount, 12 pp., 1st ed. 1830. Christian, The True, a Conversation between Ramhari and Sadhu, 20 pp. Christ, The Life of, 42 pp. 1st ed. 1831. Christian Duties, Compendium of, 38 pp. Consideration, Subjects for, 26 pp. Caste, On, 30 pp. Come to Jesus, 12 pp., 1st ed. 1851, ½ a million copies of the English original have been sold. Drunkenness, On, 2 pp. Durwan and Mali, 20 pp. 1st ed., 1828. Error, The Destroyer of, 14 pp. Errors, Vulgar Refutation of, 32 pp., 1st ed. 1832. Error, The Revealer of, 28 pp. Fornication, 20 pp., 1st ed. 1837. Hindu Religion, Wilson's Exposure of the, 84 pp. Hymns, Select Christian, 48 pp. Hindu Objections Refuted, 82 pp. Incarnation, The Holy, 42 pp., 1st ed. 1830, 9th ed. 1853. Idolatry, The Voice of the Bible concerning, 70 pp. Jesus Christ, Glory of, 114 pp. Letters on Christianity and Hinduism, 70 pp. Miracles of Christ, 36 pp. Musalman, Reasons for not being a 40 pp. Muhammadan Ceremonies, 26 pp., 1st ed. 1852. Mother and her Daughter, Conversations between a, 20 pp., 1st 1828. Pitambar Singh, Memoir of, 14 pp., 1st ed. 1835. Pandit and Sirkar, 24 pp. Pilgrimage, The True, 8 pp. Pilgrims, Address to, 16 pp., 1852. Pandits, Missionaries' Letter to, 8 pp.,

4 to., 1852. Prophet of God, Marks of a, 36 pp.. 1st ed. 1852. Parables of Christ, 36 pp., 1st ed. 1828. Religion, An Epitome of the True, 40 pp., 1st ed. 1830. Refuge, The True, 30 pp. Repentance, On, 20 pp, Scriptures, What, should be regarded, 16 pp. 1st ed. 1830. Salvation, The Mine of, 16 pp., 1st ed. 1830. Salvation, On, 40 pp., 1st ed. 1840. Salvation, Way of, 12 pp. Ten Commandments, with a Commentary, 36 pp. The Destroyer of Darkness, 24 pp., 1st ed. 1835. Texts, Scripture, 24 pp.

SECOND SERIES.—Consisting of those publications which in the first instance were prepared for the special benefit of Native Christians, and are therefore less adapted than those of the former Class for distribution among Heathen readers.

Anna, Memoir of Little, 40 pp. Children, A Word about the, 24 pp., 1st ed. 1852. Commandments, The Two Great, 12 pp. Covetousness, On, 24 pp., 1st ed. 1844. Debt, On being in, 16 pp. Devotedness. On, 16 pp. God, Existence and Attributes of, 24 pp. Godliness, Profit of, 10 pp. God is a Spirit, 12 pp. Good Counsel, 4 pp. Judgment, The Last, 8 pp. Jesus the Saviour; and the Penitent Theif, 22 pp. Life, The Way of, 14 pp. Madhu, Conversion and Death of, 12 pp. Popery, On, 27 pp., 1st ed. 1844. Rabi, Memoir of, 32 pp. Reconciliation with God, 8 pp. Remembrancer, Christian, 26 pp. Sabbath Day, On the. 14 pp. Satan's Devices, 24 pp., 1st ed., 1844. Scriptures, On Searching the, and the Profit of Godliness, 25 pp. Sermons, Bengali, Nos. 1 and 2. Ditto ditto Nos 3 and 4, Ditto ditto Nos 5 and 6 Ditto ditto Nos 7 and 8 Ditto ditto Nos 9 and 10, Ditto ditto Nos 11 and 12, Short Questions on True Religion; from the Assembly's Catechism, 14pp. The Duty of Christians to seek the Salvation of the Heathen, 12 pp. The Man that killed his Neighbours, 38 pp. The Necessity of Prayer, and the Excellency of Love, 20 pp. Tongue, On the Government of the, 20 pp. Virtue and Vice, On, 12 pp.

379. (E. T.) ARTICLES of the Church of England, with Scripture Proofs, 3rd ed., 1854, pp. 29, 2 as., A. D. by Krishnaghur Missionaries.

380. (E. T.) AGATHOS, or the Christian Armor, tr. by W. Smith;

1st pt. pp. 17, 1 as. 2nd ed. 1855, Roz. & Co., from Wilberforce's beautiful Sunday Stories.

381. BANERJEA'S Refutation of Tarkapanchanan, C. K. S., 1841, pp. 34., reply to a Sanskrit tract in defence of Hinduism, contains an able defence of the reality of moral distinctions. In 1834 a book had appeared against Christianity chiefly a translation of Payne's Age of Reason.

382. (E. T.) BIBLE, Companion to, Patupakarak, pp. 400, 4 as., T. S. gives an Analysis of each of the books of Scripture, and of Scripture History, Jewish Sects, Chronology, Prophecies, Parables, figurative language, the evidences, weights, coins, customs.

383. BIBLE, tr. by Yates, 1852, pp. 978, 10th ed., 5 Rs., revised by J. Wenger. 250,000 copies of this in whole or in part have been circulated. It superseded Carey's translation, which had passed through seven editions, but which was considered inferior to Yates's in idiom and elegance.

384. BIBLE, Evidences of, by J. Wenger, Dharmapustuk pramanea, 1851, pp. 174, 2 as. T. S., on the writers of the New Testament, their accounts of Christ true : Christ's teaching a proof of His Mission, Old Testament inspired, Do. New Testament, various proofs of inspiration, objects of Bible for men, the Bible the test of religion : the clearness of the Bible ; right of all to read the Bible.

385. (E. T.) BIBLE, TRAVELS of, 1851, pp. 58, by J, Campbell, the Bible travels to Judea and America : conversion of an European and Negro by it.

386. (E. T.) CATECHISM CHURCH, B. C. P., re-printed from the Prayer Book.

387. CATECHISM, CHURCH, Introduction to, by Rev. W. O. Smith, 1842, pp. 18, C. K. S.

388. (E. T.) Catechism Church, explanation of, by D. Banerjyea, 1841, pp. 115, on the Christian Covenant, Creeds, Prayer, Sacraments, Confirmation, Baptism, Church Government and Orders.

389. CATECHUMENS, short Catechism for, by K. Banerjyea, 1842, pp. 16.

390, CATECHISM of the Catholic Church, 1842, pp. 24, on the Church, Priesthood, &c.

391. CHRISTIANITY and HINDUISM Contrasted, by G. Mundy, 1st ed., 1828, 2 ed., 1852, 3 as.

392. CONFIRMATION, on, by Bp. Wilson, Drare Bishay, tr. by Banerjyea, 1841, pp. 60, C. K. S. Points out the spiritual benefits connected with the due reception of the rite of confirmation.

393. DISCOURSES OF CHRIST, B. C. P.

393½. DOCTRINE, SCRIPTURE, Catechism of, B. M. P. 4 as.

394. ELLERTON'S DIALOGUES on Scripture; Guru Shishu, 1st ed., 1817, pp. 205, on the historical facts of Genesis. The author, though an Englishman, thought in Bengali like a native, he wrote this work amid the ruins of Gaur. It has passed through many Editions.

395. HINDU RELIGION, Wilson's Exposure of, 1852, pp. 84, points out the bad character of the different Hindu gods, the Christian and Hindu incatnations contrasted : test of idolatry : need of a revelation.

396. (E. T.) HINDUISM AND CHRISTIANITY, pp. 204, 6 as. Sadvarma nirupan, 1854, by J. Paterson, a translation of the Benares Prize Essay on this subject : treats of God's attributes : man's origin : relations between God and man : mlracles : a contrast is instituted on all those points between the Bible and the Hindu Shastra :—an excellent manual.

397. HYMN BOOK, Baptist, pp. 227, 6 as. 1846, contains 306 hymns adapted to Native or English tunes, the composition of 15 Natives, and 3 Europeans.

398. HYMNS, Select Christian, pp. 48, ½ as. T. S.

399. HYMNS, Krishnaghur, pp. 427, 1852, 334 Hymns for Episcopal Congregations, 226 in European and 108 in Bengali metres, arranged according to 21 different subjects.

400. HINDU OBJECTIONS refuted, 2 as., by G. Mundy, Apatinashak, pp. 82, replies to the most popular objection against Christianity.

401. Joseph, Life of, pp. 45, T. S.

402. (A. B.) JOSEPH'S LIFE. Bp. C., 1839, pp. 169, gives an interlinear version with the difficult English words explained in Bengali at the head of each chapter.

403. (E. T.) LINE UPON LINE simple Scripture narratives. tr. by

Heberlin, pp. 207, T. S. From the creation to the death of Joshua, with questions at the end of each chapter.

404. (E. T.) LORD'S SUPPER, Wilson's Address on, tr. by C. K. Banerjea, pp. 52, 1851, C. K. S., Sahabhag grahan, An account of the Institution, objects, benefits and way of receiving this Sacrament, qualifications &c.

405. LORD'S SUPPER, Treatise on, with devotional remarks, T. T.

406. MATTHEW, Gospel of, tr. by Heberlin, pp. 97.

407. MATTHEW, Gospel of, Barnes' Comment on, tr. by J. Robinson. Ser. P., 1855.

408. (E. T.) MEDITATIONS AND PRAYERS, Wilson, 142, pp. 206, C. K S., tr. by K. Banerjea, Wilson Bishop of Sodor, and Man's well known devotional Treatise, the Sacra Privata.

409, (E T.) NATURAL HISTORY of the Bible. 1st pt. the Metals of the Bible, C. K. S., pp. 54. 2 as. 1854, tr. by Srarup. Gives a description, of gold, silver, lead, brass, iron and the similies used in reference to those in the Bible and the historical events with which they are connected, thus with gold, we have the calf of gold, Nebuchadnezzar's image of gold.

410. NEW TESTAMENT, Yates', diamond ed., pp. 865, 1853, B. M. P. 8 as. An exquisite specimen of Bengali typography, the smallest type yet used and very distinct.

411. PARABLES OF CHRIST, pp. 43., B. C. P.

412. (E. T.) PEEP OF DAY, pp. 137, 1 as., T. S, Arunaday. Some of the important events of Scripture interspersed with examination questions.

413. (E. T) PILGRIM'S PROGRESS, 1st ed., 1818, last ed. 1854, T. S., pp. 452, 12 as. The tinker's tale complete, with eighteen beautiful cuts.

414. (E. T.) PRAYER BOOK, B, C. P., Hay and Co., 1852, pp. 276, 8 as., the first translation was made in 1822, by Schmid, pp. 267, a portion of the Prayer Book, was translated by Morton, 1833. One by the Bishop's College Syndicate, 1846, pp. 194, the present one by the same body, but the Epistles, Gospels, and Psalms are not translated.

415. PRAYER BOOK, abridged by Dr. Heberlin, pp. 48, in a simple style, brief.

416. PRAYERS, Manual of, for the use of Native Christians, Parthana

Samuha, 2nd ed., 1852, pp. 110, 2 as., T. S., Contains 23 prayers for various states and conditions in life, 31 prayers for morning and evening, prayers for every day in the week, and for special seasons.

417. PREACHER'S COMPANION, Susamachar Sahachar, by J. Wenger 1851, pp. 192, T. S., 2 as. Intended for Native preachers to village congregations, gives a few plain directions for the composition of Sermons, illustrated by one discourse in full, and by a series of 70 skeleton sermons embracing 12 historical subjects, and 9 sketches explanatory of the Lord's Prayer.

418. (E. T.) PROVIDENCE, Anecdotes of, by G. Mundy. Ishwar Aihik tatvabadharan, 1854, pp. 278. T. S. Historical and other Anecdotes to illustrate God's Providence in the punishment of sin : in preserving life : in preserving from sorrow and suffering : in changing the hearts of sinners : in answering prayer : in delivering from persecution.

418. (A. B.) RELIGION, Doddridge's Rise and Progress of, 1840, Dharmerutpati, T. S., pp. 300, abridged and altered. The original is well known as a valuable text book on experimental Chistianity.

419. (S. T.) REVELATION, Course of, by J. Muir, tr. by K. Banerjyea, 1847, pp. 62. A brief outline of the communication of God's will to man, of the evidences and doctrines of Christianity with allusion to Hindu tenets. Published also in Sanscrit, Hindi and English.

420. ROMANISM, Pierce's censure of, Vaidharma nibarak, 1844, pp. 59 T. S.

421. RELIGIONS, Test of, Dharma Bichar, by Gobinda Giri, 1851, pp. 15, T. S.

422. (E. T.) SATAN'S DEVICES, Brooke's Remedies against, Shaitan Kalupana T. S., pp. 228, 3 as., tr. by Kailas Chandra Mukerjyea. A work by its Metaphorical illustrations well suited to the native mind.

423. SERMONS, by K. Banerjea, 1840, pp. 212, C. K. S. 5 Sermons on Christian evidence suited to those who cannot understand the nature of historical evidence, the other Sermons are on the Ten Commandments, and on Christian patience.

424. (E. T.) SERMONS by Wilson, tr. by K. Banerjea, pp. 108, 1844, C. K. S., 3 as., on the true way of profiting by the Bible.

425. SERMONS, twelve plain ones, for the use of Native Christians,

by J. Osborne, Dvadash Upadesh 1845, pp. 351, T. S., 2 as, on Christ, the Penitent Thief's Prayer, Love, Satan, the Sabbath : the Tongue : the Spirit : Covetousness : Believers : Scriptures : Godliness.

426. SERMONS, Twelve, T. S., on select passages of Scripture, 1843, pp. 78, on John iii. 19, iv. 24, v. 16, and iii. 3, Matthew xxii. 37, ix. 28, xviii. 12, Ephesians ii. 14, Jeremiah xvii. 9, 2 Cor. v. 17 ; Acts xvii. 30.

427. (E. T.) SIN AND SALVATION, Neff's conversations on, pp. 123, 1849, 10 as., T. S., Neff was the well known pastor of the Alps, the friend of the ignorant peasant.

428. TEXT BOOK, Daily ; 1854, T. S, 1 as., Ratnabali, compiled by Miss F. Currie, two Bible texts for each day in the year in Chronoligical order.

429. Tracts Bound, Vol. I, for Hindus only ; T. S., 1854, contains the following Tracts addressed to Pilgrims : True Refuge, Salvation. Revealer of Error : Hindu objections refuted : Voice of the Bible on Idolatry. What Scriptures should be regarded, Pandit and Sirkar, way of Salvation.

430. Tracts Bound, for Hindus only : T. S. Vol. 2.—Wilson's exposure of Hinduism : Test of Religion : Destroyer of Darkness : Holy Incarnation : Great Atonement : True Pilgrimage : Destroyer of error : Caste, Essence of the Bible.

431. Tracts Bound, Vol. 3, for Hindus and others. T. S. Parables of Christ ; Commandments : conversation between a mother and daughter : subjects for consideration : second Catechism : God is a Spirit : two great commandments : True Christian ; Pitambar Singh : Mine of Salvation : Fornication : Joseph : word about children.

432. Tracts Bound, Vol. 4, for Hindus and others : T. S., drunkenness : way of life : epitome of true religion : first Catechism : last Judgment : miracles of Christ : Kailas Chandra : Select Hymns : Scripture Texts : Debt : Come to Jesus : Sermon on the Mount ; the man that killed his neighbour.

433. (A. B.) UNCONVERTED, Baxter's call to, Nibedan pustuk, pp. 264, 3 as., T. S., the original is considered one of the most powerful appeals to sinners in the English language.

MUSALMAN-BENGALI LITERATURE.

The Musalmans have always been noted for the tenacity with which they have clung to their own ideas and language, and for the obstinacy with which they have resisted foreign influence. The Persian, their great prop, has been shorn of its honours in India, and the Musalmans are adverse to learn the Vernaculars ; hence, as the Urdu has been formed by a mixture of Persian and Hindi, so the Musulmans have formed in Bengali, a kind of lingua franca, a mixture of Bengali and Urdu, called the boatmen's language. This must eventually give way to the overwhelming influence of the Bengali, but in the meantime, as illustrative of the phases of mind of the people, is appended a list of the principal books in this dialect, printed at Musulman presses in Calcutta, which have a wide circulation, and particularly among boatmen and the Musulman population of Dacca. They are chiefly translations from the Persian or Urdu :—

Names.	Pages.	Descriptions.
Abu Sama········	27···	The Life of the Kaliph Omar's Son.
Ajabol Kubar ···	64···	Punishment in the Grave.
Amir Hamja······	444···	On the Murder of Muhammad's Uncle.
Bahar Dayes······	206···	Amusing Tales ridiculing women.
Bkcbhmola ········	48···	On the Awakening of the Careless.
Bedarol Gaphelin	167	
Bhabalabh Shuat	192	Songs, &c. &c.,
Chhar Darvis ···	288···	Tale of the four Dervishes.
Golabokaoli ······	218···	A Love Tale.
Hajarater toallad	25···	Muhammad's Birth.
Hajar Machhla···	108···	One Thousand Proverbs on Religion.
Hatim Tae ······	299 ··	Life of a noted Arab Chief.
Iblichh Nama ···	72···	On Satan's Temptations.
Ichhlam Gati ···	100 ··	On the Behaviour of Musalmans.
Iman Churi ·· ···	31···	On Infidels.
Jaygum ··· ·······	262···	The Life of a Female Warrior,
Kaji Hayran······	92···	The Judge confounded.

Kunji Behari......	28...	A Tale.
Keyamat Nama...	188...	On the Judgment Day.
Lalmon Kechha...	20...	Tale of a King's Daughter.
Maulad Adam...	86...	The Life of Adam.
Maulad Sherif...	186...	Birth of Muhammad.
Maktal Hachhen...	276...	The Death of Haseyn.
Mephtahul Jenat...	...	The Key of Paradise.
Meyaraj Nama...	64...	Muhammad's Ascent to Heaven.
Muchhe Raybar ..	15...	History of Moses.
Mursid Nama...	23...	
Nijamal Ichhlam ..	52...	Rules of Islamism.
Nurel Iman......	99...	On Devotion.
Ophat Nama	24...	Muhammad's Death.
Rada Monkera...	104 ..	Refutation of Unbelievers.
Shah Nama......	304 ..	A History of the Persian Kings.
Shurju Ujal...... ..	40...	Account of a Female Warrior.
Siphata Selat......	47 .	On Prayer.
Saphaytol Momenin	144...	On the Salvation of Believers.
Sona Bhan.........	39 ..	Account of a Female Warrior.
Tajhiz Takphin	112 ..	On Burial.
Tombihal Jahelin...	102 ..	Punishment of the Ignorant.
Tota Itihas...... ...	133...	Tales.
Tumbihul Gaphelin	...	The Punishment of the Wicked.
Yujuff Zuleika...	126...	The loves of Joseph and Zuleika.

The Bible Society have printed the Gospel of Luke in this dialect, a are proceeding with other portions of the Scriptures. The Tract Society ha published several Tracts in it.

PAURANIC WORKS

The Ramayan and Mahabharat are the great store-houses for Paura works, they are circulated entire or in parts very extensively at the cost of or 70 pages, 8vo, for 1 anna. Many parts are also incorporated into the f

of tales : the Ramayan was translated a century ago, and was denounced by the pandits of Nuddea, because not written by a pandit. The original of the Mahabharat contains 100,000 verses.

Adabhut Ramayan, by Dwarkanath Kundu, 1854, pp. 90, A. J. ½. 7 as. Relates to Amburish, Ram's Birth, Sitas Do. the Kalinga Raja, the owl teaches Narad to sing, Parushu Ram's pride broken by Krishna, Oude, Ravan ; the Hindus say this book came down from heaven.—Adhatma Ramayan, S. B., edited by Raja Satyea Charan Ghosal.—Adi Khanda, pp. 174, Bh. P., published at the expense of the Rajah of Burdwan, a new translation.—Adi Khanda. bazar ed.—Adi Parba, pp. 414, birth of the Pandavs and Parushu Ram.—(A. B.) Apology for the present system of Hindu worship, pp. 47.—Aranyea Khanda.—Ashvamedh Parba, or the great horse sacrifice, the river Vaitarini and Ban Raja, Kamdeva's birth, account of Assam temples.—Ashtotar Sat Nam, 108 names of Vishnu and Durga,—Ashramik Parba, pp. 37 —Asuchi Byeabastha, 1818, pp. 140, ceremonial uncleanness.—Ayudhea Kandah, 1881, pp. 64.—Ban Parba, on Nala and Damayanti.—Bata Yantra.—Bhadrarjun, the taking away of Bhadra by Arjun, pp. 142, 1851.—Bhima Parba, pp. 67, Bhimas battles with the Pandavas.—Bhuban Prakash, 1836, pp. 96, Puranic account of the World, i. e., Brahma's egg, and the 14 worlds in it —Brahmanya Chandrika. 1832 a defence of the Puranas against a Buddhist.—Bipra Bhakti Chandrika, 1832, pp, 20, argues that all Vaishnabs and Sudras must serve the Brahmans. Brahma Khanda, pp. 94, the creation and nature of diseases from the Bramha Baibarta Purana—Chamatkar Chandrika—Chandrabaushoday, 1 Re., 1829,—Dandi Parba, respecting Dandi Raja.—Darshan Dipika, the Puranas superior to the Bible.—Debbansha Barnan, pp. 8,—Debi Yudha, pp. 196.—Dharma Gan, sung by lepers at the festival of the God of death.—Dhrava Charitra, pp. 48, account of Raja Dhrava.—Drona Parba, pp. 124, fights between the Kurus and Pandavas.—Gada Parba, club fight between Kurus and Pandavas.—Gauri Bilas, 1824.—Ganga Mahatmea, 1823.—Ganga Stab, 1830.—Ganga Stotra, praises of the Ganges.—Goshtapati Kariha, pp. 23, in verse.—Hindu or Christian.—Jagannath Mangal, pp. 284, account of Jagannath.—Jatra bibaran, omens for travelling.—Jyanarjan, defence of the Puranas, by Gaurikanta, 1839.—Jyan Chandrika, or Creation and Destruction.—Jyan Ras tarangini, pp. 76, 1830, on the virtues of Ganges-water, on watering the Ashwath tree, the

value of a Brahman's dust.—Jyeautish Sangraha—Kali Raj. or the evils of the Iron Age, the signs of it, increase of sensuality, women not subject to their husbands, wine and tobacco sent as messengers of evil to the earth.—Kalki Purana.—Kamakhyea Yatra Padvati, 1831, guide to the shrines in Assam.—Karnamrup Parba, death of Karna in battle.—Kishindiya Khanda, Ram's wandering in the forest.—Lakshmi Janardan bilas, 1848, pp. 20.—(S. B.) Lakshmi Charitra,—Laskshmi Digbijay, pp. 312, Ram's brother's conquests.—Lalita Saptami, a woman's prayers.—Lanka, Kanda, pp. 272.—Maha Dadhi on astrology, 1820—Mahanashak Chandrika.—Mul Kali Purana.—Maha Dadhi on Astrology 182.—Manga Mangal.—Mushal Parba.—Laba Kush Yudah—brith of Ram's sons.—Nari Parba, On women, Draupadi, Kunti, Gandhari.—Niladri Lohari, account of Govardan Mountain, Punchanan Gita, by a Sudra, an account of Dakshina Ray, Shasti and other village deities.—Pancha Kalyeani, the five deities, Gonesh, Surjyea, Vishnu, Siva, Shakti and the qualities of 5 women, Ahalyea, Draupadi, Kunti, Tara, and Mendadhari.—Panji Madla, 1844, Puranic account of Jagannath.—Paramdharma suprakasika, 1847.—Pashanda piran.—Pritipadvati.—Ratna Mala, 2 Rs.—Ram Niladay.—Ramrasyan, tr. by a native of Burdwan.—Sabha Parba, pp 194, Yudishtit's Life,—Salye Parba, battle of the Kurus.—Satyea Narayan, 1859, from the Skanda Purana.—Santik of Ashtik Parba.—Santi Parba.—Sharada Mangal, praises of the Goddess of wisdom.—Sharadyea tatva.—Shib Ram Yudha, pp. 11—Shitalar Gan, from the Kalki Puran, Shitala is the goddess of the Small Pox.—Shrinath tatva—Sudva tatva.—Sundara Kanda, Ram Chandra's residence in the forest.—Svapnapakyean—Sapnapatal, from the Aikea Kanda, pp. 236.—Singkan takar hing.—Svarga Parba, a description of hell, heaven.—Udjoy Parba, preparation for war between the Pandus, Kurus.—Usha Haran, pp. 155, Abduction of Usha.—Utara Khanda, Ram's last days.—Vali Pinda, pp. 21, the monkey king killed by Ram.—Vichhed Taranga, pp. 106, on Judishtir and Draupadi.—Vidanmod Tarangini, pp. 97, 1825, discussions on popular religion, a tr. into English was made by Raja Kalikrishna.—Vigyan Kusumakar, pp. 75, on the Khetryas, and Brahmans, written against the view of the Brahma Baibarta Purana.—Yajati raj Upakyean, a king of Delhi.—Yashor barnana, 1848, Bi. B.

SIVITE WORKS.

The Sivites neglected communicating their views through the Vernacular and hence their literature is poor compared with that of the Vaishnavs.—Agamani pad, Durga's birth—Chandi Sar, from the Markandya Puran, repeated daily in Durgas temples.—Durga Mangal, 1839, pp. 279, Victories of Durga.—Hara Gauribilas 1814—Hari Har Mangal.—Har Parvati Mangal, J. A. 1852, pp. 340, on Siva, Durga, Brahma's love for Sandyea, Satis birth.—Kamala Mangal, 1843, praise—Paramartha Sangit Sar, pp. 105. Kali's praises in 400 songs by various poets—Rudra Chandi on Siva and Durga.—Sarada Mangal, Durga's praises.—Sangitai Gaurishar, pp. 153, Gauri and Siva at Benares,—Sangita Ananda Lahari.—Sangita Chandrika, pp. 35, 1854—Sati Dharma, from the Kashi Khanda, pp. 14.—Shasti Santoshini, praises of Kali as the patroness of children—Shiva, Gana, Shiva's adventures as a mendicant. Shiva Sankirtans—praises of Shiva, P. C., 1853, pp. 328, pp. 1 Re. Durga's war,—Shivastab,—Vishvalakshan Mangal—Durga's Manifestation in Burdwan. Yogadhea Mangal.

434. (S. B.) Ananda Lahari, 1st ed. 1826, pp. 72, praises of Parvati, 1 as., by Sankar Acharjyea, the great champion of Sivism—this work written 1,000 years ago, teems with matter relating to the Arcana of that system—it has been translated into French and contains curious information on certain mystical rites, a description of the different parts of Kali's body.

435. Annada Mangal, Durga's Life, Bh. R., 4 as, pp. 166, written by Bharat Chundra, the Burnes of Bengal, who flourished last century as poet Laureate at the Court of the Raja of Krishnagur, the first native book ever printed, very popular, and in it we have a notice of Vyas opposing in Benares the worship of Siva and the origin of Kalighat.

436. (S. A.) Bhagavati Gita, 3 as., B. B., 1850, pp. 74, from the Durga Mahatmea, a dialogue between Sharad and Siva.

437. (S. T.) Durgabhakti Chintamani, Sh. P. 1853, 12 pp., by Din-doyal Gupta, from the Shrimat Bhagavat, Durga's History and Dakhyea's Sacrifice.

438. Kabikangkan Chandi, Durga's Life, pp. 466, 1 Re. this poem is recited at the Durga Puja, we have Kalinga and Ceylon introduced on the scene.

439. (B. S.) Kali Bilas, KALI'S HISTORY, 1855, pp. 164. A. J. U., 6 as. composed from the Markandya Purana, Kumar Sumbhab, Kali Purana, Yoni Tantra, relates to Dakhyea's feast, Sati's death, Uma, Himalayas, Chunda Munda, Rakta Bij, Menaka.

440. Kali Kaibulyea Daini, Jy. A. 1848, pp. 321, relates about the Vasanti Puja, Gaya, the Vindya mountains.

441. Kali Kirtan, pp. 20, 1845. Kali's Praises, by Ram Prasad, a Sudra.

442. Kalika Mangal. Kali's Life, composed by Krishna Ram a Sudra and Kavi Vallabha, a Brahman, it is sung at festivals.

443. (S. T.) Kali Purana, translated by Ram Chandra Tarkalankar, an account of Assam, and its sacred places, and of the Bhagavat Puja.

444. (S. T.) Kasi Khanda, mythological account of Benares, of the origin of the sanctity of various temples and tanks there, a portion of the Skanda Purana, gives various local legends, notices the depression for a time of the Sivite system.

445. Mahimna Stab, Shiva's Praises. 1852, 1 an; even Sudras are permitted to recite this. It was translated into English by the Rev. K. Banerjyea.

446. (S. B.) Padanka Dut, pp. 24, a work very popular, Krishna's wife is in search of him, composed last century by a pandit at the request of the Raja of Krishnaghur.

447. Pramath Mahini, pp. 156, 2 as., gives the Churning of the Ocean, the Kali Yang, the Amrita, Tarak Asur, from the Durga Purana.

VAISHNAV.

Chaitanyea arose in Nuddea 5 centuries ago, representing himself as an incarnation of the God Krishna: like another Muhammad, he introduced a revolution which drew to his standard one-fourth of the population of Bengal

he denounced the Brahminical priesthood, sacrifices, caste, admitted all classes into his community, using the Vernacular as the medium of appeal, his followers were the first advocates of Vernacular literature.—Their literature is very extensive ; among their works are the following : Akrur Sambad Krishra robs a dhobi and kills Kansa—Ananga manjari—loves of Krishna and Radha—Bhagavat Purana Dipika.—Bhakti bartma pradarshak, pp. 215, 1 Re. 1854, K. R.—Bidagda Muhk Mandal, on Krishna and Radha—Bilva Mangal, 1st. ed., 1817. pp. 52, Songs on Krishna's youthful tricks.—Chaitanyea Chandrika.—Das Abatar Katha, Krishna's ten incarnations—Dwarka Bilas—Krishnas residence in Guzerat.—Gauranga Bandana, praises to Krishna.—Gita Govinda, Ser P. Jy. A. pp. 144, 8 as, 1855, the loves of the god Krishna and Radha, his wife, a pastoral drama, composed in Sanskrit, 5 centuries ago, by Jaydeva, a Burdwan poet, tr. into Latin by Lassen, and into English by Sir W. Jones, a work very popular but very indecent.—Gobinda Lilamrita, Krihna's worship the only salvation.—Gobinda Mangal, account of Krishna,—Gopal Stotra, praise of Krishna—(S.B.) Haribasar Dipika, pp. 54, on the Ekadosi, or monthly lent of the Hindus.—Hari Bhakti Rasamrita. pp. 215, Krishna and the Gopis. Karuna Nidhan Bilas, pp. 364, Krishna's residence at Brindabun 12 years, by Joy N. Ghosal, the founder of the Benares Church Mission College.—(S. T.) Krishna Keli, pp. 157, sports of Krishna.—Krishna Mangal—Krishna and the Gopis.—Krishna Lila Rasadoy, Ser Joy A., 1854, pp. 54. 6 as, Krishna's Courtship.—Lalita Madhav, on Krishna. —Mani Haran or the valuable jewel stolen : from the Bhagavat Purana, pp. 17, 1838.—Mon Bhanjan, pp. 76, 1 as., Krishna's removing his wife's jealousy.—Muktalatabali, by Durgaprasad, 1855, S. U. P., pp. 35, from the Kalika Purana, Krishna mounts the Mukta tree, Krishna's life and marriage to Radha.—Man shika, pp. 54, 4 as., K. AS., 1853, the mind's address to Krishna—Narad Sambad, on the Yuga : ten incarnations. Guru Lilamrita—Krishna Karnamrita, pp. 213, 12 as., R. R., 1853, on Krishna's praises.—Kriya Yog Sar, on attaining merit in the Kali Yog, from the Padma Purana.—Narottam bilas, 1811, 5 as. life of Chaitanyea by a Jessore disciple.—Narrottum Prarthana, prayer to Krishna for deliverance from the body.—Padkalpalatika, pp. 136, Krishna and Rabha.—Pandav Gita, Krishna's praises.—Paramdharma Suprakashini, 1847, defence of Krishna's divinity.—Pashanda Dalan, pp. 20, a Vaishnav's refutation of other sects.—Prahlad Charitra,

delivery of Krishna's followers.—Prem Bhakti Chandrika, pp. 14, love to Kreshna.—Radhika Sahasra Nam, from the Bhagavat Puran.—Rag Maya Kona, on subduing the passions by a Vaishnavite.—Ramstab, Ram's praise by the Monkey King.—Ram Charita.—Ras Bilas, Krishna and the Gopis, pp. 96.—Ras Panchadyea, the Ras festival.—Rasrasamrita, Krishna and the Gopis —Rati Bilap, Rati's lament for her husband reduced to ashes.—Rasamay Kalika, faith in Krishna.—Sanyeas Khanda, pp. 34, Chaitanyea as a Sanyeasi, his miracles and travels to Brindabund.—Satyea Bhama Panchali, to commemorate the reconciliation of Krishna to his, wife.—Satya Narayan, pp. 16, 1852, by Jagannath Mallik.—Sangit Ananda Lahari, 1848, pp. 66. Songs in praise of Krishna.—Smriti Sangraha, by Ragunundan of Santipur—Shri Nath tatva from the Yog Shastra.—Udab Dut, by Rupa Goswami, the messenger to bring Krishna back from Guzerat.—Udvab Sanbad Krishna's restoration to the milkmaids, Ni, P., pp. 42, 4 as. From the Brahma Baibarta Purana— (S. B.) Upasana Chandramrita, on Chaitanyea.—Upasana Khanda, 1848, pp. 37. S. B. Vaishnab Manaranjika, pp. 24, 1 an., on the Vaishnav mark on the forehead, from what earth to be made, with quotations from three Puranas.— Vaishnav Bandhana, Krishna's praises—Vaishnav Sarbashyea.—Vishnu Sahasra Nam, 1st ed., 1822, from the Mahabharat Vishnu's thousand names, this is one of the early school manuals put into the hands of boys of the Vaishnob sect.

448. Aparadh Bhanjan, pp. 12, 1852, 1 an., Ch. C., the way of atoning for offences against Krishna.

449. (S. T.) Bhagavat Amrita Sar, 12 as, pp. 397, Life of Krishna from the Bhagavat Purana, 10th section.

450. (S. B.) Bhagavat Ekadash, pp. 391, Rs. 2, St, P. 1852. Praises of Krishna.

451. (S. B.) Bhagavati Gita, by Ramratna Bhattacharjyea, a Nuddea pandit, Bi. B., 1854, 18mo., pp. 71, 3½ as.

452. Bhagavat Sar, Life of Krishna, by Madhav Acharjyea, of Nuddea Ch. h., 1855, pp. 488.

453. Bhakta Mala, Jy. R., pp. 392, 1 Re. 4 as., lives of Vaishnav saints as Kabir, Sangkar Acharjea, Tulsi Das, Prahlad, Hari Das, Jay Deva. A standard work. Professor Wilson has made much use of the original in his

"Sects of the Hindus." The author was a basket-maker and composed the work in Hindi in Akbar's days.

454. Bhakta Mala, 2nd part. pp. 124, 2 as. Lives of Vaishnav saints.

455. Bhakti Tatva Sar, Jy. R, 1854, pp. 82, 3 as. Contains Chaitanyea Ashtak, Chaitanyea's eight names, Hat patan, establishment of assemblies. Chauttishi padabali, 34 names of Chaitanyea, Vaishnav Bandana, praises to Chaitanyea, Krishnar Ashtotar Shatnam, Krishna's 108 names; Narrottam Das prarthana, a devotee's prayers to Chaitanyea; Prembhakti, Chandrika; Pashanda Dalan.

456. Chaitanyea Bhagavat, Ser. Jy. A., 1855, pp. 396, 1 Re. 8 as. Life of Chaitanyea, his travels in Panihati and Baranagar near Calcutta, are mentioned in it as places visited by Chaitanyea.

457. Chaitanyea Chandramrita, pp. 82, 1852, British India, P. Life of Chaitanyea.

458. Chaitanyea Charitamrita, pp. 452, 1 Re. 12 as. the Vaishnav's bible. Chaitanyea was born in 1484, and gave a powerful impulse to the Vaishnav faith in Bengal—his followers consider him an incarnation of Krishna—this work abounds in quotations from the Bhagavat and other Vaishnav works, and was written in 1557.

459. Chaitanyea Mangal, by Lochananda Das. Chief incidents in the Life of Chaitanyea, 1852, pp. 232, Sar. S. P.

460. Chaitanyea Sangita, 1852, Ser. P., pp. 44, by Bhagirath Bandu, K. R., 1855, pp. 80 2½ as., 16mo. Life of Chaitanyea of Nuddea, his marriage, pilgrimage to Gaya and Jagannath, discussion on his faith.

461. Duti Sambad, Krishna's marriage to his spouse Radha. 1854, pp. 49, from the Brahmabaibarta Purana.

462. (S. B.) Nastik Niras, pp. 121, 6 as. Sudharkar P, On faith in Vishnu, and the need of ceremonies in the Kali Yug.

463. Nigur Tatva, pp. 48, 2 as., mysteries of Krishna's Life.

464. (S. B.) Niyam Seba, a Vaishnav's duties in Kartik Month, pp. 56, Kartik is the Vaisnnav Lent—taken from the Hari Bhakti Bilas.

465. (S. T.) Radha Krishna Bilas, by Jay Narayan Mukerjyea, P. P., 1855, pp. 122, 2 as, Bh, O. From the Shrimat bhagavat, gives Krishna and Radha's Life,

466. (T.) Sutyeanarayan, Krishna, the true Vishnu, by Rameshwar Acharjyea, Bi. B. 1855, pp. 24, ½ as.

467. Srimat bhagavatamrita, Ni. P., 1855, the original by Goswami, relates to the 14 worlds, the eight quarters, Vaikantha, Brindaban, tr. by Jay Gobinda Chandria, Zemindar.

VEDANTIC WORKS.

(S. B.) Abataranika, 1829, pp. 12, by Ram Mohan Ray, on 12 questions, with their answers and proofs from the Bhagavat Gita, on worship, God's spirituality.—Bhedgyan timir Mihira day, 1848, pp. 72, by Ram Gopal Tarkalankar.—Brahma Putalika Sambad, 1820, by R. Ray. Conference between an idolator and true believer.—Guru Paduka, by R. Ray, pp. 6, 1823, reply to the Chandrika's defence of idolatry. (S. T.) Ishopanishat, by R. Ray, 1816, pp. 26, last ed. 1835. One of the chapters of the Yajur Veda on God's unity, the mystery of his nature showing that eternal happiness is only from his worship. Tr. into English by Dr. Roer. (S. T.) Kena Upanishad, 1st ed. 1818. God's unity from the Shyam Veda, tr. by R.M. Ray. (S. T.) Mundak Upanishad, by R. Ray, 1819, An extract from the Atharva Veda, which treats of mystic theology and metaphysics, has been translated into Persian, Latin, French German and English. Prasanna Kumar Thakur's Prarthana, 1823, pp. 4, a call to tolerant views towards Christians and idolaters on the part of Vedantists by Prasanna Kumar Tagore, Ram Chandra's 14 Vedantic Discourses, 183[illegible] Pratyeakha Jyan Dipika, by K. C. Bose, 1829, pp. 23. Argues that the air i[illegible] God. (S. B.) Ram Gita, 1846, 63. Pr. P., A metaphysical disquisitio[illegible] on the world and God, according to Vedantic principles. Pathea Pradai[illegible] medicine for the sick, by R. M. Ray, 2nd ed, S. P., 1849, pp. 238. 1 R[illegible] Shikha Pancha, by Shangkar Acharjea. (S. T.) Sankhyea Bhasha, by Ram Ja[illegible] Tarkalankar Ser. 1818, pp. 168, Vedanta, 1815, R. M. Ray's resolution on t[illegible] Vedas, contains the Isha, Kena, Katoa, Mundika Upanishads compendio[illegible] digest with notes, Vedanta Chandrika, 67 pp. explanation of the Vedant[illegible] system. Vedanta Kaustabhakhyean, 1850, Shangkar Acharjea on Vedantis[illegible]

Vedantasutra, 1843, pp. 180. (S. B.) Yog Vashishta Sar by Paramananda Neayaratna, 1848, pp. 112. with a Sanskrit comment : contains 10 chapters.

468. (S. B.) Atmabodh, 1849, P. P., pp. 41,. 4 as., points out that knowledge is as necessary for obtaining salvation as fire is for cooking : the world is a delusion like the silvery appearance of mother o'pearl. All spirit is alike. An English translation by Dr. Taylor was lately reprinted at P. P.

469. (S. B.) Atmanatmabibek 1847. pp. 32. 1st ed. 1819, from Sangkar Acharjyea on divine knowledge ; the difference between matter and spirit, the worship of God, of things permanent.

470. Atmatatvabidea, on spirit, by Debendranath Tagore, against the tenets of the Vedantic Philosophy on the soul.

471. (S. B.) Brahma Dharma, 4 as., 1852. one Re. A collection from Sanskrit writings on theism and ethics.

472. Brahma Gita, Hymns to God, T. P., 1835, pp. 35. Seventy-two, Vedantic Hymns used at the Tatvabodhini Sabha.

473. Brahma Sangita, Hymns to God, 4 as., By Rammohan Ray and other Vedantists.

474. Churnak, on Idolatry, pp. 91, 6 as. 1852, T. abstracts from Rammohan Ray's writings against idolatry and on the Vedas

475. Gitabali, pp. 28, 82 Vedantic Songs, by Rammohun Roy and others, by Sanders, Cones and Co., 1846, 2 as.

476. (S. B.) Hasta Malak, by Ananda Chandra Vidyeabagish T. P., 1852, pp, 25, on Brahma and Spirit.

477. Katopanishat, 1850, God's unity, pp. 31, 2 as. T. P., from the Yajur Veda. A tr. in English by Dr. Roer, has been published in the Bibliotheca Indica.

478. Nirgun Stotra, 1843, pp. 38, Hymn to the one God, by different persons. (S. B.)

479. Panchadashi, Vedantic Philosophy, pp. 780, 4 as. By the Pandit of the Tatvabodhini Sahha, Anand Chandra Vedanta Bagish. On God and Creation.

480. Pautalik Prabodh, or refutation of Idolatry, pp. 48, 6 as., T. P., 1846. By Braja Mohan a friend of Rammohan Ray's. In a dialogue form, discusses the question of image worship with quotations from the Shastras.

481. Parameshwar Upasana, 17 discourses on the Spiritual Worship of God, delivered in 1828. treats of idol worship, on ritual as inferior to spiritual worship.

482. Prashnachatushta, T. P., 1848. pp. 26, 2nd ed., by Annaprasad Banerjyea, 2nd ed., 1822, four questions with their answers on associating with hypocritical enquirers after truth, on ceatain parties wearing the paita,&c. killing goats not in sacrifice, on those who drink spirits, cut their top nots.

483. Rig Veda Sanhita, 2 Rs., pp. 170, Hymns of the Rig Veda, Th Rig Veda is one of the 4 sacred books of primitive Hinduism, composed o the banks of the Indus.

484. Shatringshatopakhyean, discourses on God, pp. 259, 1 Re., T. P 1854, 36 Sermons according to the Vedantic philosophy.

485. Tatvabodhini Sabhar Baktrita, 4 as., pp. 34, 1841, Sermons on Go and his attributes. (S. T.)

486. Vedanta Sar, 1835, pp. 282, translated by Ananda Chandra Bra mon, the soul of the world, ceremonies not necessary.

487. Vedanta Darshan, 1854.

488. (S. B.) Yoga Vasishta Ramayan, pp. 598, 2 ed. 1851., A gre philosophical poem, forming part of the Ramayan, giving an account of t education of Ram, and his discourses with the sages on the unreality material existence the merits of works, devotion, and the supremacy spirit, Raja Satyea Churn Ghosal reprinted and distributed this work at l own expence.

END OF PART III.

INDEX.

শব্দ-সূচী



সমাপ্ত

OPINIONS

"HISTORY OF THE BENGALI LANGUAGE AND LITERATURE" (IN ENGLISH)

BY

RAI SAHIB DINESH CHANDRA SEN, B.A.

PUBLISHED BY

CALCUTTA UNIVERSITY

Demy 8vo, pp. 1067, with illustrations. Price—Rs. 16.

HIS EXCELLENCY LORD HARDING OF PENSHURST in his Convocation Address, dated the 16th March, 1912, as Chancellor of the Calcutta University :—

"During the last four years also the University has, from time to time, appointed Readers on special subjects to foster investigation of important branches of learning amongst our advanced students. One of these Readers, Mr. Sen, has embodied his lectures on the History of Bengali Language and Literature from the earliest times to the middle of the 19th century in a volume of considerable merit, which he is about to supplement by another original contribution to the history of one of the most important vernaculars in this country. May I express the hope that this example will be followed elsewhere, and that critical schools may be established for the vernacular languages of India which have not as yet recieved the attention that they deserve.

HIS EXCELLENCY LORD CARMICHEL, GOVERNOR OF BENGAL, in his address, on the occasion of his laying the Foundation stone of the Romesh Chandra Saraswat Bhawan, dated the 20th November, 1916.—

"For long Romesh Chandra Dutt's History of the Literature of Bengal was the only work of its kind available to the general reader. The results of further study in this field have been made available to us by the publication of the learned and luminous lectures of Rai Sahib Dineschandra Sen. * * In the direction of the History of the Language and the Literature, Rai Sahib Dineschandra Sen has created the necessary interest by his Typical Selections. It remains for the members of the Parishad to follow this lead and to carry on the work in the same spirit of patient accurate research."

SIR ASUTOSH MOOKERJEE, in his Convocation Address, dated the 13th March, 1909, as Vice-Chancellor of the Calcutta University :—

"We have had a long series of luminous lectures from one of our own graduates, Babu Dineschandra Sen, on the fascinating subject of the History of the Bengali Language and Literature These lectures take a comprehensie view of the development of our vernacular, and their publication will unquestionably facilitate the historical investigation of the origin of the vernacular literature of this country, the study of which is avowedly one of the foremost objects of the New Regulations to promote."

SYLVAIN LEVI (Paris)—"I cannot give you praises enough—your work is a Chintamani—a Ratnakara. No book about India would I compare with yours......Never did I find such a realistic sense of literature......Pundit and Peasant, Yogi and Raja, mix together in a Shakespearian way on the stage you have built up."

BARTH (Paris)—"I can approach your book as a learner, not as a judge.

C. H. TAWNEY—"Your work shows vast research and much general culture."

VINCENT SMITH—"A work of profound learning and high value."

F. W. THOMAS—"Characterised by extensive erudition and independent research."

E. J. RAPSON—"I looked through it with great interest and great admiration for the knowledge and research to which it bears witness."

F. H. SKRINE—"Monumental work—I have been revelling in the book which taught me much of which I was ignorant"

E. B HAVELL—"Most valuable book which every Anglo-Indian should read. I congratulate you most heartily on your very admirable English and perfect lucidity of style."

D. C. PHILLOT—"I can well understand the enthusiasm with which the work was received by scholars, for even to men unacquainted with your language, it cannot fail to be a source of great interest and profit."

L. D. BARNETT—"I congratulate you on having accomplished such an admirable work."

G. HULTZUH—"Mr Sen's valuable work on Bengali literature, a subject hitherto unfamiliar to me, which I am now reading with great interest."

J. F. BLUMHARDT—"An extremely well-written and scholarly production, exhaustive in its wealth of materials and of immense value."

T. W. RHYS DAVIDS—"It is a most interesting and important work and reflects great credit on your industry and research."

JULES BLOC (Paris)—"Your book I find an admirable one and which is the only one of its kind in the whole of India."

WILLIAM ROTHENSTEIN—"I found the book surprisingly full of suggestive information. It held me bound from beginning to end, in spite of my absolute ignorance of the language of which you write with obviously profound scholarship."

EMILE SENART (Paris)—"I have gone through your book with lively interest and it appears to me to do the highest credit to your learning and method of working"

HENRY VAN DYKE—(U. S A)—"Your instructive pages which are full of new suggestions in regard to the richness and interest of the Bengali Language and Literature."

C. T. WINCHESTER—(U S A.) "A work of profound learning on a theme which demands the attention of all Western scholars."

From a long review in the TIMES LITERARY SUPPLEMENT, London, June 20, 1812—"In his narration, as becomes one who is the soul of scholarly candour, he tells those, who can read him with sympathy and imagi-

nation more about the Hindu mind and its attitude towards life than we can gather from 50 volumes of impressions of travel by Europeans. Loti's picturesque account of the rites practised in Travancore temples, and even M. Chevrillon's synthesis of much browsing in Hindu Scriptures, seem faint records by the side of this unassuming tale of Hindu literature—Mr. Sen may well be proud of the lasting monument he has erected to the literature of his native Bengal."

From a long review in the ATHENÆUM, March, 16, 1912—"Mr. Sen may justly congratulate himself on the fact that in the middle age he has done more for the history of his national language and literature than any other writer of his own or indeed any time."

From a long review in the SPECTATOR, June 12, 1912—"A book of extraordinary interest to those who would make an impartial study of the Bengali mentality and character—a work which reflects the utmost credit on the cardour, industry and learning of its author. In its kind his book is a masterpiece—modest, learned, thorough and sympathetic. Perhaps no other man living has the learning and happy industry for the task he has successfully accomplished."

From a review by MR. H. BEVERIDGE in the Royal Asiacic Society's Journal, Jan, 1912—"It is a very full and interesting account of the development of the Bengali Literature. He has a power of picturesque writing...his descriptions are often eloquent."

From a long review by S. K. RATLIFF in India, London, March 15, 1912 —"There is no more competent authority on the subject than Mr Dineschandra Sen. The great value of the book is in its full and fresh treatment of the pre-English era and for this it would be difficult to give its author too high praise."

From a long review by H. KERN in the Bijdragen of the Royal Institute for Taal (translated by Dr. Kern himself)—"Fruit of investigation carried through many years...highly interesting book...the reviewer has all to admire in the pages of the work, nothing to criticise. for his whole knowledge is derived from it."

From a review by DR. OLDENBERG in the Frankfurter Zietung. December 3, 1911 (translated by the late Dr. Thibaut)—"It is an important supple

mentation of the history of modern Sanskrit Literature. The account of Chaitanya's influence on the poetical literature of Bengal contributes one of the most brilliant sections of the work."

From a review in DEUTSCHE RUNDSCHAN, April, 1912—"The picture which this learned Bengali has painted for us with loving care of the literature of his native land deserves to be received with attentive and grateful respect."

From a review in LUZAC'S ORIENTAL LIST, London, May-June, 1912—"A work of inestimable value, full of interesting information, containing complete account of the writings of Bengali authors from the earliest time...It will undoubtedly find a place in every Oriental Library as being the most complete and reliable standard work on the Bengali Language and Literature."

From a review in the INDIAN MAGAZINE, London, August, 1912—"For Mr. Sen's erudition, his sturdy patriotism, his instructive perception of the finer qualities in Bengali life and literature, the reader of his book must have a profound respect if he is to understand what modern Bengal is."

From a long review in the MADRAS MAIL, May 9, 1912—"A survey of the evolution of the Bengali letters by a student so competent, so exceptionally learned, can hardly fail to be an important event in the world of criticism."

From a long review in the PIONEER, May 5, 1912—"Mr. Sen is a typical student such as was common in mediæval Europe—a lover of learning for learning's sake...He must be a poor judge of characters who can rise from a perusal of Mr. Sen's pages without a real respect and liking for the writer, for his sincerity, his industry, his enthusiasm in the cause of learning."

Extract from a long review by Sylvain Levi (Paris) in the REVUE CRITIQUE, Jan. 1915 ; (translated for the Bengalee)—

"One cannot praise too highly the work of Mr. Sen. A profound and original erudition has been associated with a vivid imagination. The works which he analyses are brought back to life with the consciousness of the original authors, with the movement of the multitudes who patronised them and with the landscape which encircled them. The historian, though relying on his documents, has the temperament of an epic poet. He has likewise inherited the lyrical genius of his race. His enthusiastic sympathy vibrates through all his descriptions. Convinced as every Hindu is of the superiority of the Brahmanic civilization, he exalts its glories and palliates its shortcomings, if he

does not approve of them he would excuse them. He tries to be just to Buddhism and Islam ; in the main he is grateful to them for their contribution to the making of India. He praises with eloquent ardour the early English missionaries of Christianity.

The appreciation of life so rare in our book-knowledge, runs throughout the work ; one reads these thousand pages with a sustained interest ; and one loses sight of the enormous labour which it presupposes ; one easily slips into the treasure of information which it presents. The individual extracts quoted at the bottom of the pages offers a unique anthology of Bengali. The linguistic remarks scattered in the extracts abound in new and precious materials. Mr. Sen has given to his country a model which it would be difficult to surpass ; we only wish that it may provoke in other parts of India emulations to follow it.'

From a review in the ENGLISHMAN, April 23, 1912—"Only one who has completely identified himself with the subject could have mastered it so well as the author of this imposing book."

From a review in the EMPIRE, August 31, 1918—"As a book of reference Mr. Sen's work will be found invaluable and he is to be congratulated on the result of his labours. It may well be said that he has proved what an English enthusiast once said that 'Bengali unites the mellifluousness of Italian with the power possessed by German for rendering complex ideas.'"

From a review by F. G. PARGITER in the INDIAN ANTIQUARY, December, 1912—"This book is the outcome of great research and study, on which the author deserves the warmest praise. He has explained the literature and the subjects treated in it with such fulness and in such detail as to make the whole plain to any reader. The folk-literature, the structure and style of the language, metre and rhyme, and many miscellaneous points are discussed in valuable notes. The tone is calm and the judgments appear to be generally fair."

OPINIONS

BANGA SAHITYA-PARICHAYA.

OR

TYPICAL SELECTIONS FROM OLD BENGALI LITERATURE.

BY

Prof. Dineschandra Sen, Rai Bahadur, B. A., D. Litt,

2 vols, Royal 8vo, pp. 1914, with an Introduction in English running over 99 pages, published by the University of Calcutta.

(*With 10 coloured illustrations. Price* Rs. *18.*)

SIR GEORGE GRIERSON—"Invaluable work......That I have yet read through its 1900 pages I do not pretend, but what I have read has filled me with admiration for the industry and learning displayed. It is a worthy sequel to your monumental History of Bengali Literature, and of it we may safely say 'finis coronat opus.' How I wish that a similar work could be compiled for other Indian languages, specially for Hindi."

E. B. HAVELL—"Two monumental volumes from old Bengali Literature. As I am not a Bengali scholar, it is impossible for me to appreciate at their full value the splendid results of your scholarship and research, but I have enjoyed reading your luminous and most instructive introduction which gives a clear insight into the subject. I was also very much interested in the illustrations, the reproduction of which from original paintings is very successful and creditable to Swadeshi work."

H. BEVERIDGE—"Two magnificent volumes of the Banga Sahitya-Parichaya····· I have read with interest Rasa Sundari's autobiography in your extracts."

F. H. SKRINE—"The two splendid volumes of Banga Sahitya-Parichaya I am reading with pleasure and profit. They are a credit to your profound learning and to the University which has given them to the world."

From a long review in THE TIMES LITERARY SUPPLEMENT, London, November 4, 1915—"In June, 1912, in commenting on Mr. Sen's History of Bengali Language and Literature, we suggested that work might

usefully be supplemented by an anthology of Bengali prose and poetry. Mr. Sen has for many years been occupied with the aid of other patriotic students of the mediæval literature of Bengal in collecting manuscripts of forgotten or half-forgotten poems. In addition to these more or less valuable monuments of Bengali poetic art, the chief popular presses have published great masses on literary matter, chiefly religious verse. It can hardly be said that these piles of written and printed matter have ever been subjected to a critical or philological scrutiny. Their very existence was barely known to the Europeans, even to those who have studied the Bengali Language on the spot. Educated Bengalis themselves, until quite recent times, have been too busy with the arts and sciences of Europe to spare much time for indigenous treasures. That was the reason why we suggested the compiling of a critical chrestomathy for the benefit not only of European but of native scholars. The University of Calcutta prompted by the eminent scholar Sir Asutosh Mookerjee, then Vice Chancellor, had already anticipated this need it seems. It had shrunk (rightly, we think) from the enormous and expensive task of printing the MSS. recovered by the diligence and generosity of Mr. Sen and other inquirers and employed Mr. Sen to prepare the two bulky volumes now before us. The Calcutta Senate is to be congratulated on its enterprise and generosity."

From a review in The ATHENÆUM, January 16, 1915—"We have already reviewed Mr. Sen's History of Bengali Language and Literature and have rendered some account of his previous work in Bengali entitled Banga Bhasa O Sahitya. Mr. Sen now supplies the means of checking his historical and critical conclusions in a copious collection of Bengali verse......Here are the materials carefully arranged and annotated wlth a skill and learning such as probably no one else living can command."

From a review by Mr. F. G. PARGITER—in the Royal Asiatic Society's Journal—"These two portly volumes of some 2,100 pages are an anthology of Bengali poetry and prose from the 8th to the 17th century and are auxiliary to the same author's History of Bengali Language and Literature which was reviewed by Mr. Beveridge in this Journal for 1912......The Vice-Chancellor of the Calcutta University who was consulted, decided that the best preliminary measure would be to make and publish typical selections. The University then entrusted that duty to Babu Dinesh Chandra Sen; this work is the

outcome of his researches. There can be no question that Dinesh Babu was the person most competent to undertake the task and in these two volumes we have without doubt a good presentment of typical specimens of old Bengali literature......The style of the big book is excellent, its printing is fine, and it is embellished with well-executed reproductions in colour of some old paintings. It has also a copious index.

THE VAISNAVA LITERATURE OF MEDIÆVAL BENGAL

Being lecturs delivered as Reader to the University of Calcutta.

BY

RAI SAHIB DINESH CHANDRA SEN, B. A.

Demy 8vo, 257 pages

WITH A PREFACE BY

J. D. ANDERSON, Esq., I. C. S. (Retired)

Price. Rs. 2

SIR GEORGE GRIERSON—"Very valuable book......I am reading it with the greatest interest and am learning much from it."

WILLIAM ROTHENSTEIN—"I was delighted with your book, I cannot tell you how touched I am to be reminded of that side of your beloved country which appeals to me most—a side of which I was able to perceive something during my own too short visit to India. In the faces of the best of your countrymen I was able to see that spirit of which you write so charmingly in your book. I am able to recall these faces and figures as if they were before me. I hear the tinkle of the temple-bells along the ghats of Benares, the voices of the women as they sing their sacred songs crossing the noble river in the boats at sunset and I sit once more with the austere Sanyasin friends I shall never, I fear, see more. But though I shall not look upon the face of India again, the vision I had of it will fill my eyes through life, and the love I feel for your country will remain to enrich my owu vision of life, so long as I am capable of using it. Though I can only read you in

English, the spirit in which you write is to me so true an Indian spirit, that it shines through our own idiom, and carries me, I said before, straight to the banks of your sacred rivers, to the bathing tanks and white shrines and temples of your well-remembered villages and tanks. So once more I send you my thanks for the magic carpet you sent me, upon which my soul can return to your dear land. May the songs of which you write remain to fill this land with their fragrance ; you will have use of rhem, in the years before you, as we have need of all that is best in the songs of our own seers in the dark waters through which we are steering."

The Vaisnava Literature of Mediæval Bengal. By Rai Sahib Dineschandra Sen. (The Calcutta University.)

"Though the generalisation that all Hindus not belonging to modern reform movements are Saivas or Vaisnavas is much too wide, there are the two main divisions in the bewildering mass of sects which make up the 217,000,000 of Hindus, and at many points they ovarlap each other. The attempts made in the 1901 Census to collect information regarding sects led to such unsatisfactory and partial results that they were not repeated in the last decennial enumeration. But it is unquestionable that the Vaisnavas—the worshippers of Krishna—are dominant in Bengal, owing to the great success of the reformed cult established by Chaitanya, a contemporary of Martin Luther The doctrine of Bhakti or religious devotion, which he taught still flourishes in bengal and the four lectures of the Reader to the University of Calcutta in Bengali here reproduced provide an instructive guide to its expression in the literature of the country during the sixteenth and seventeenth centuries. The first part of the book is devoted to the early period of Vaisnava literature, dating from the eleventh century.

The Rai Sahib is filled with a most patriotic love of his nation and its literature, and has done more than any contemporary countryman to widen our knowlege of them. His bulky volume recording the history of Bengali Language and Literature from the earliest times to the middle of the nineteenth century is accepted by Orientalists as the most complete and authoritative work on the subject.

Chaitanya clearly taught, as these pages show, that the Krishna of the Mahabharata, the great chieftain and ally of the Pandava brothers, was not the

Krishna of Brindaban. The latter, said the reformer, to Rupa, the author of those masterpieces of Sanskrit drama, the Vidagdha Madhava and the Lalita Madhava, was love's very self and an embodiment of sweetness ; and the more material glories of Mathura should not be confused with the spiritual conquests of Brindaban. The amours of Krishna with Radha and the milkmaids of Brindaban are staple themes of the literature associated with the worship of the God of the seductive flute. But Mr. Sen repeatedly insists that the love discussed in the literature he has so closely studied is spiritual and mystic, although usually presented in sensous garb. Chaitanya who had frequent ecstasies of spiritual joy, 'Rupa', who classified the emotions of love in 360 groups and the other authors whose careers are here traced were hermits of unspotted life and religious devotion. The old passionate desire for union which they taught is still dominant in modern Bengali literature not directly Vaisnava in import. As Mr. J. D. Anderson points out in his preface, the influence of Chaitanya's teaching may be detected in the mystical verses of Tagore."

From a long review in the TIMES LITERARY SUPPLEMENT, 26th April, 1918 :—(Mediæval Vaisnab Literature.)

"This delightful and interesting little book is the outcome of a series of lectures supplementing the learned discourses which Mr. Sen made the material of his 'Vaisnava Literature of Mediæval Bengal' reviewed by us on August 2, 1917.

It is an authentic record of the religious emotion and thought of that wonderful land of Bengal which few of its Western rulers, we suspect, have rightly comprehended, not from lack of friendly sympathy but simply from want of precisely what Mr. Sen better than any one living, better than Sir Rabindranath Tagore himself, can supply.

It is indeed, no easy matter for a Western Protestant to comprehaud, save by friendship and sympathy with just such a pious Hindu as Mr. Sen, what is the doctrine of an *istadevata*, a 'favourite deity' of Hindu pious adoration. In his native tongue Mr. Sen has written charming little books, based on ancient legends, which bring us very near the heart of this simple mystery, akin, we suppose, to the cult of particular saints in Catholic countries. Such for instance, is his charming tale of 'Sati,' the Aryan spouse of the rough

Himalayas ascetic God Siva. The tale is dedicated, in words of delightfully candid respect and affection, to the devoted and loving wives of Bengal, whose virtues as wives and mothers are the admiration of all who know their country. Your pious Vaisnava can, without any hesitation or difficulty, transfer his thoughts from the symbolical amorism of Krishna to that other strange creation-legend of Him of the Blue Throat who, to save God's creatures swallowed the poison cast up at the Churning of the Ocean and bears the mystic stigma to this day. Well, we have our traditions, legends, mysteries, and as Underhill and others tell us, our own ecstatic mystics, who find such ineffable joy in loving God as, our Hindu friends tell us, the divine Radha experienced in her sweet surrender to the inspired wooing of Krishna. The important thing for us, as students of life and literature, is to note how these old communal beliefs influence and develop that wonderful record of human thought and emotion wrought for us by the imaginative writers of verse and prose, the patient artists of the pen.

When all is said, there remains the old indefinabe charm which attaches to all that Dinesh Chandra Sen writes, whether in English or his native Bengali. In his book breathe a native candour and piety which somehow remind us of the classical writers familiar to our boyhood. In truth, he is a belated contemporary of, say, Plutarch, and attacks his biographical task in much the same spirit. We hope his latest book will be widely (and sympathetically) read."

J. D. ANDERSON, Esq., retired I. C. S., Professor, Cambridge University :—"I have read more than half of it. I propose to send with it, if, circumstances leave me the courage to write it, * a short Preface (which I hope you will read with pleasure even if you do not think it worth publication) explaining why, in the judgment of a very old student of all your works, your book should be read not only in Calcutta, but in London and Paris, and Oxford and Cambridge. I have read it and am reading it with great delight and profit and very real sympathy. Think how great must be the charm of your topic and your treatment when in this awful year of anxiety and sorrow, the reading of your delightful MS. has given me rest and refreshment in a time when every post, every knock at the door, may bring us sorrow."

---

* এই সময়ে মহাযুদ্ধে এণ্ডারসন সাহেবের এক পুত্র মারা যান, ও অপর পুত্র আহত হন।

JULES BLOCH—"I have just finished the romantic story of Chandravati (given in the Bengali Ramayanas). May I congratulate you on the good and well deserved luck of having discovered her after so many others and having added that new gem to the crown of Bengali Literature.

I cannot speak to you in detail of your chapters on the characteristics of the Bengali Ramayanas and on Tulsidas. I had only to learn from what you say and thank you for helping me and many others to get a little of that direct understanding and feeling of the literary and emotional value of those poems in general and Krittivas in particular. I hope your devotion to Bengali Literature will be rewarded by a growing popularity of that literature in India and in Europe ; and also that young scholars will follow your example and your direction in continuing your studies, literary and philological."

SIR GEORGE GRIERSON—"I must write to thank you for your two valued gifts of the "Folk Literature of Bengal" and "The Bengali Ramayanas." I delayed acknowledging them till I had read them through. I have been greatly interested by both, and owe you a debt of gratitude for the immense amount of important information contained in them.

I add to this letter a few notes which the perusal of your books has suggested to me. Perhaps you will find them useful.

"I hope that you will be spared to us to write many more such books."

DR. WILLIAM CROOKE, C. I. E., EDITOR OF "FOLK LORE". LONDON—"I have read them ('Folk Literature of Bengal' and 'The Bengali Ramayanas') with much interest. They seem to me to be a very valuable contribution to the study of the religion and folk-lore of Bengal. I congratulate you on the success of your work and I shall be glad to receive copies of any other work whlch you may write on the same subjects."

H. BEVERIDGE—"Of the two books I must say that I like best the Bengali Ramayanas. Your book on Bengali folk lore is also valuable" (from a letter of 12 pages containing a critical review of the two books).

Rai Bahadur Dineshchandra Sen's Folk Literature of Bengal.

From the "Revista Trimestrale di studi Filosofici a Religiosi"—"The University of Calcutta continues with every alacrity, the fine series of its publications thus testifying to the high scientific preparation (issuing out) of those indigenous teachers. This volume devoted to the popular tales of Bengal also constitutes

a contribution of the first rank to such a subject. The tracing of the History of the Bengali language and literature in this University is one of the most well-deserved studies of Bengal. To it is due, in fact, the monumental and now classical History of the Bengali Language and Literature (1912) ;—in which, so far as our studies go, we value most the accurate estimate of the influence of Chaitanya on that literature—accompanied by the grand Bengali Anthology Banga Sahitya Parichaya, 1914, and then above all the pleasing and erudite researches on Vaishnab literature and the connected religious reform of Chaitanya.

A world wholly legendary depicted with the homely tenderness in most secluded locality of Bengal and half conceived in the Buddhistic epoch with delicate phantasy and fondness ; the world in which Rabindranath Tagore ultimately attained his full growth is revived with every seduction of art in the luminous pages of this beautiful book. The author came in touch with this in his first days of youth when he was a village teacher in East Bengal and he now wishes to reveal it by gathering together the most secluded spirit and also the legend collected in four delicious volumes of D. R Mazumdar, yet to be translated.

A spirit of renunciation in the devotion of wives in the love of tender and sorrowful ladies in eagerness for patient sacrifice carry us back, as we have said, to the Buddhistic epoch of Bengal ; it rises as an ideal of life and is transmitted to future generations traversed by the Mussalmani faith which also is pervaded by so many Buddhistic elements. Malancha, the sublime female incarnation of such an ideal—whose legend is translated in the last pages of this volume—the Lady wholly spiritual, a soul heroic in its devoted renunciation, mistress of her body who reveals in herself qualities that essentially belong to idea, a creature of the soul, shaped by the aspiration to come into contact with the external world. Malancha loses her eyes and her hands, but so strong is her desire to see her husband that her eyes grow again and such is her desire to serve him that her hands also grow again.

In the popular narration the prose often assumes a poetic movement and metrical form. The archaic language that reminds us of remote antiquity is converted into lyric charm and becomes knotty in the prose, making us think pensively of the Vedic hymnology that entered the epic of Mahavarat."
(Translated from the original Italian).

Extract from the Times Literary Supplement, April, 1921.

THE BENGALI RAMAYANAS

BY PROF. DINESCHANDRA SEN, RAI BAHADUR, B. A., D. LITT.

(Published by the University of Calcutta. Rs. 4 As. 2).

The Indian epics deserve closer study than they have hitherto received at the hands of the average Englishman of culture. Apart from the interest of the main themes, the wealth of imagery and the beauty of many of the episodes, they are storehouses of information upon the ancient life of India and a key to the origin of customs which still live. Moreover, they show many curious affinities to Greek literature, which suggest the existence of legends common to both countries. The Ring of Polycrates is reproduced in other conditions in the "Sakuntala," the Alcestis has its counterpart in the story of Savitri, and the chief of the Pandavas descends into hell in the manner of Odysseus, though on a nobler errand.

The main theme of these lectures is the transformation of the old majestic Sanskrit epic as it came from the hands of Valmiki to the more familiar and homely style of the modern Bengali versions. The Ramayana, we are told, is a protest against Buddhist monasticism, the glorification of the omestic virtues, proclaiming that there is no need to look for salvation outde the home. The Bengali version, while reducing the grandeur of the eroic characters to the level of ordinary mortals, bring the epic within ie reach of the humblest peasant; thay have their own virtues, just s the simple narrative of the Gospels has its own charm, though it be ifferent in kind from that of Isaih's majestic cadences. Thus in the Sanskrit oem 'Kaucalya", Rama's mother, is sacrificing to Fire when she hears of her on's exile; she does not flinch, but continues the sacrifice in the spirit of ireek tragedy, merely altering the character of her prayer. In the Bengali ersion she becomes an ordinary Bengali woman, giving vent to lamentations uch as one hears every day in modern India. In the Nibelungenlied one sees he same kind of transformation from the old Norse sages to the atmosphere of medieval chivalry.

The author approaches his subject in that spirit of reverence which is

the due of all the great literature, and to him Valmiki's Ramayana is the greatest literature in the world. The fact does not blunt his critical faculty; rather does it sharpen it, for, as he says in the preface, "historical research and the truths to which it leads do not interfere with faith," neither do they stand in the way of admiration. He sees more in the Ramayana than the mere collection of legends into a Sanskrit masterpiece from which various versions have been made from time to time. He shows us how, as the centuries proceeded, each successive version was influenced by the spirit of the age, how the story became adapted to the purposes of religious propaganda, how in the interests of the Vaishnava cult the hero Rama became the divine avatar of Vishnu, even at the risk of absurd situations. He takes us through the age of the Sakti influence, of Ramananda's philosophy and its revolt against Mahomedan iconoclasm, of the flippant immorality of the eighteenth century. "These Bengali Ramayanas," he says, "have thus quite an encyclopædic character, comprising, along with the story of Rama, current theologies, folk-tales, and the poetry of rural Bengal of the age when they were composed." To him the Ramayana is a yellow primrose, but it is something more; and if some of his theories seem over-fanciful, at least they have the merit of sincerity. To the student of folklore these lectures are to be recommended as an earnest and loving study of a fascinating subject.

From a Review in the "Folk-Lore."

"THE BENGALI RAMAYANA": LECTURES DELIVERED AT THE CALCUTTA UNIVERSITY IN 1916. BY RAI SAHIB DINESCHANDRA SEN, B. A. Published by the University of Calcutta, 1920.

THE FOLK-LITERATURE OF BENGAL: LECTURES DELIVERED AT THE CALCUTTA UNIVERSITY IN 1917. By the same Author Published by the University of Calcutta, 1920.

It is a matter of congratulation that the author of these two volumes of lectures, an eminent Bengali scholar and author of an important work, the History of Bengali Language and Literature, has devoted his attention to the folklore of his country, and that a lectureship on this subject has been founde in the University of Calcutta. In the first series of lectures he considers th

questions connected with the Bengali versions of the great Indian epic, the "Ramayana" the work of Valmiki. The first result of his analysis of the poem is that, as might have been anticipated, the poet used much of the current folk-tradition. Many incidents, in the epic closely resemble tales in the Buddhist Jatakas. The second theory suggested is that originally the cycle of legends connected with the demi-god Rama and the demon Ravana were distinct, and that it was left for the poet, to combine them into one consistent narrative.

The second course of lectures deals with a series of folk tales current among Musalmans in Bengal, which evidently embody early Hindu tradition. The influence of woman in preserving these tales, and particularly the scraps of poetry embodied in them, is illustrated in an interesting way, and he makes an important suggestion that tales of the Middle Kingdom, or the Upper Ganges Valley, were conveyed by the crews of ships sailing from the coast of Bengal to Persia and thus were communicated to the people of the West long before any translations of collections like the Panchatantra or Hitopodesa were available.·· ···

The learned author of the lectures is doing admirable work in a field hitherto unexplored, and the University of Calcutta deserves hearty commendation in its efforts to encourage the study of India folklore.

Times Literary Supplement, May 13, 1923.

THE FOLK-LORE OF BENGAL.

THE FOLK-LITERATURE OF BENGAL : BY RAI SAHIB DINESH CHANDRA SEN. (Calcutta University Press)

Those who are acquainted (we hope they are many) with Mr. Sen's other works, the outcome of Lectures delivered to Calcutta undergraduates in the author's function, as Ramtanu Lahiri Research Fellow in history of Bengali Language and Literature, will know exactly what to expect of his present delightful excursion into Bengali Folk-lore. There is some humour, to begin with, in the odd fact that he should be lecturiag to Bengali lads on Bengali nursery tales in English. Mr. Sen is not, and does not profess to be, one of those remarkable Bengalis who like Sir Rabindranath Tagore, for

example, are perfectly bilingual to the extent of being able to think with equal ease, and write with equal felicity and justness of expression, in both languages. Let not this be regarded as a sin in the Ramtanu Lahiri Fellow. He thinks in Bengali, he thinks Bengali thoughts, he remains a pious Hindu, though his Hindu ideas are touched and stirred by contact with many kindly and admiring English friends. He is the better fitted to explain Bengal to the outer world. For he loves his native province with all his heart. He has no doubts as to the venerable origins, the sound philosophy, the artistic power, the suggestive beauty, all the many charms of the Bengali Saraswati, the sweet and smiling goddess, muse and deity alike, the inspirer and patron of a long line ot men of literature and learning too little known to the self-satisfied and incurious West.

A Hindu he remains, thinking Hindu thoughts, retaining proud and happy memories of his childhood and of the kind old men and women who fed his childish imagination with old world rhymes, with the quaintly primitive Bengali version of the stately eqics of Sanskrit Scriptures, with tales even more primitive, handed down by word of mouth by pious mothers, relics perhaps, of a culture which preceded the advent of Hinduism in Bengal. What makes Mr. Sen's books so delightful to us in Europe is precisely this indefinable Hindu quallty, specifically Bengali rather than Indian, something that fits itself with exquisite aptness to what he knows of the scenery and climate of the Gangetic delta where Mr. Sen was born and where he has spent the whole time of his busy life as a student of his native literature. He began life as a village school master in Eastern Bengal, a land of wide shining meres and huge slow moving rivers, where the boatman sings ancient legends as he lazily plies the oar, and the cowherd lads on the low grassy banks of Meghna or Dhaleswari chant plaintive rhymes that Warren Hastings may have heard as he "proceeded up country" in his spacious "budgerow."

All these pleasant old rhymes and tale Mr. Sen loves with a more than patriotic emotion and admiration, and this sentiment he contrives to impart to his readers; even through the difficult and laborious medium of a foreign language. We can imagine his lectures to be pleasant by conversional than eloquent in the academical fashion. He tells the lads before him what life-long plesure he has taken in the hereditary legends he shares with them. But

in the present volumes, for example, he is driven to assume from time to time the austerity of a professional student of a comparative folk-lore, and so strays (unwittingly, we may be sure) into the region of heated controversy. Mr. Gourlay, distinguished administrator and student of the history of Bengal, has given Mr. Sen a friendly foreword. It is evident that this professional element in Mr. Sen's work has a little frightened his kindly sponser. "When I read the author's enthusiastic appreciation," he says. "of Bengali folk tales, the thought crossed my mind that perhaps the Rai Sahib's patriotism has affected his judgment ; but after I had read the translation of the beautiful story of Malanchamala, I went back to the first lecture, and I know that what he said was true."

Mr. Gourlay has expressed a hope that Mr. Sen will make a collection of Bengali folk-tales, It must be admitted that the late Rev. Lalbehari Dey's tales may well be supplemented. But surely Mr. Gourlay knows Daksina Ranjan Mazumdar's four wonderful and wholly delightful volumes, one of them with a preface of appreciation by Sir Rabindranath Tagore himself. Mr. Mazumdar may well claim to be the Grimm of Bengal, and Mr. Sen has repeatedly acknowledged his debt to his unwearied diligence in collecting Bengali folk tales, The wonder is that no one has yet translated the marvels of "Thakurdadar Jhuli." "Thakurmar Jhuli" "Thandidir Thale" and "Dadamahasayer Thali." Appropriately illustrated, sympathetically rendered, they may yet be the delight of Western nurseries, and from the best, the most natural and easy introduction to Indian thought and literature. There are other admirable works for the nursery in Bengali, such as Miss Sita Devi's "Niret Gurur Kahini" and the volume of Hindustani Fairy tales translated by her sister. But there is only one Mazumdar, and we heartily hope that Mr. Sen's version of his Malanchamala in this volume will draw the attention of European students of Indian folk-lore to the four excellent collections we have mentioned. Their style, subtle, archaic yet colloquial, may well puzzle the translator, for not every one of us has the pen of a Charles Perrault. But the task is well worth attempting. Meanwhile Mr. Sen does well to remind us that two of the best of La Fontaine's Fables are taken from the "Panchatantra."

Bengali Ramayanas by D. C. Sen. From a review in the Journal of Royal Asiatic Society by SIR GEORGE GRIERSON—

"This is the most valuable contribution to the literature on the Ramayana which has appeared since Professor Jacobi's work on the Ramayana was published in 1893. The latter was confined to Valmiki's famous epic, and the present volume, from the pen of the veteran of the History of Bengali Language and Literature, carries the inquiry on to a further stage, and throws light both on the origins of the story and on its later developments.

The subject covers so wide a ground, and its treatment exhibits so wide a field of Indian learning that, within the limited space available, it is impossible to do more than indicate the mere salient points adduced by the author, and, perhaps, to add a few new items of information.

It has long been admitted that the core of the Sanskrit Ramayana—the portion written by Valmiki himself—consists (with a few interpolations) of the second to the sixth books. The first and the seventh, in which Rama is elevated from the stage of a heroic mortal to divinity, are later additions. The Rai Saheb, accepting these conditions, has been able to dispel part of the darkness which has hitherto enveloped the sources of Valmiki's poem, and to trace its origin to three distinct stories, which the great poet combined into a single epic.

The oldest version is that contained in the Dasaratha Jataka, in which Sita is said to be Rama's sister. Rama is banished to the Himalaya, being accompanied by her and Laksmana—under much the same story of palace intrigue as that told by Valmiki,—and returns to reign after twelve years. He then marries his sister Sita, and they live happily ever afterwards. She is not abducted by any one, and there is no mention either of Hanuman or Ravana. [1]

The second strand of the epic belongs to Southern India, where there grew up a cycle of legends about a grand noble Brahmana. [2] Most of these stories are said to be collected in the Jain Ramayana of Hemachandra, a work which I have not seen, and which is described by our author as far more a history of Ravana than of Rama. On the other hand, a Buddhist work—the

---

1. This was long ago recognized by A. Weber. See *Indian Antiquary*, Vol. i, p. 121.

2. We find much of this in that portion of the Uttara Kanda which Jacobi calls the Ravanois

Lankavatara Sutra—narrates a long discourse which Ravana [1] held with the Buddha, and claims him as a follower of Mahayana Buddhism ! He was thus revered by Hindus, Jainas and Buddhists alike.

The third strand was the floating group of legends related to ape-worship once widely current in India. In these Hanuman was at first connected with Saivism, and there are still extant stories telling how Siva made him over to Laksmana for service under Rama. Even at the present day it is not only the devotees of Visnu who ador him, and Saivas, but the crypto-Buddhists of Orissa claim him as a powerful divinity.

From materials taken from each of these three sources Valmiki welded together his immortal poem. He refused sanction to the ancient legend that the Sita whom Rama married was his sister, but gave no hint as to her parentage. This was supplied in later works, such as the Adbhuta Ramayana—a wonderful collection of old and fantastic traditions—in which she is described as the daughter of Mandodari, the wife of her abductor.[2]

After thus discussing the origins of the Rama-saga and its development by Valmiki, the Rai Saheb proceeds to the main subject of his work—the Ramayanas of Bengal. None of them are translations of the Sanskrit epic, Like the celebrated Ramacaritamanasa of Tulasi Dasa, each author tells his story in his own way, weaving into it his own thoughts and ancient traditions current in his neighbourhood. They secured their general popularity by the thorough Bengalization of their theme. The scenery, the manners and customs, the religious rites, the very food, although placed in Lanka, are all those familiar to Bengal. The most famous, and one of the oldest, of these Ramayanas is that of Krttivasa (fourteenth century). All these features are already found there, but later writers, falling under the influence of the

---

1 Numerous temples in Southern India are said to have been founded by Ravana (see Bombay Gazetteer, I, i, 190 454 n. 1 ; XV ii 76, 290 ff. 341). He is said to have performed his celebrated austerities at Gokarna in Kanara (Bombay Presidency), a district which abounds in legends about him. Some of these have spread to very distant parts of India. For instance, the story of the loan to him of Siva's *"self-linga"* ((Gaz, XV, 290)

2 Vide J. R. A. S,. 1921, p 422. This story appears to have been widely spread. It reappears in the Kashmiri Ramayana popular in Kashmir. According to the Jaina *Uttara Purana*, quoted by our author she was a daughter of Ravana himself.

Vaisnava revival of Chaitanya, not only filled their poems with Vaisnava doctrine and with theories about *bhakti*, but even transferred legends concerning Chaitanya to pseudo-prototypes in the war before Lanka.[1] Space will not permit me to mention all Krttivasa's successors. Each had his own excellencies and his own defects. I therefore confine myself to calling attention to the incomplete Ramayana of the Mymensingh poetess Candravati. In one of her poems she tells her own beautiful and pathetic story, and there can be no doubt but that her private griefs, nobly borne, inspired the pathos with which her tale of Sita's woes is distinguished. It is interesting that, like one or two other authors, she ascribes Sita's banishment to Rama's groundless jealousy. A treacherous sister-in-law, daughter of Kaikeyi, named Kukua, persuaded Sita, much against her will, to draw for her a portrait of Ravana. She then showed this to Rama as a proof that his wife loved, and still longed for, her cruel abductor. This story was not invented by the poetess. It must have been one of those long orally current, but not recorded by Valmiki or by the writer of the seventh book of the Sanskrit poem, for it reappears in the Kashmiri Ramayana to which I have previously alluded.

A few words may also be devoted to another curious version of the old tradition. Under various orthodox names Buddhism has survived in Orissa to the present day, and, in the seventeenth century, one Ramananda openly declared himself to be an incarnation of the Buddha and, to prove it, composed

1 The Bengali version of the conversion of the hunter Valmiki is worth nothing for the light it throws on the connexion of Bengali with Magadhi Prakrit. Narada tried to teach him to pronounce Ram's name, but he could not do so owing to sin having paralysed his tongue. Narada succeeded in getting him to say *mada* (pronounced *mara*, meaning "dead." This is the Magadhi Prakrit *mada* (Vr. xi 15) It is peculiar to the Bengali language, the more western word being *mara*. Narada next got him to use this western pronunciation, and to repeat the word rapidly several times—thus, *maramaramaramara*. It will be seen that in this way Valmiki without his paralysed tongue knowing it, uttered the word *Rama*, and thus became sufficiently holy to become converted. *Apropos* of the *bhakti* influence, on page 127 there is a story about Nizamu'd din Aulia and a robber, which recalls the finale of the Tannhauser. The robber is told he cannot hope for forgiveness till a certain dead tree bears leaves. In process of time he does feel true repentance, and the dead trunk becomes at once covered with green leaves from top to bottom.

a Rama-lila or Ramayana. I have already alluded to the fact that Hanuman was worshipped by this Orissa Buddhists. It need not therefore surprise us that Ramananda stated that he wrote his book under the ape-god's inspiration.

I have drawn attention to only a few features of this excellent work in the hope that my remarks will induce those interested in the subject to buy the book and study it for themselves. It deserves attention, even if we do not accept all that its author wishes to prove. As a collection of hitherto unknown facts bearing on the development of the Rama-saga in Bengal it is unique.

BENGALI PROSE STYLE
AND
CHAITANYA AND HIS AGE

F. W. THOMAS—(Library, India Office, London) :

"I have now, however, given myself the pleasure of perusing the two volumes, which are worthy additions to your already great contributions to the study of your country's language, literature and history. The story which you tell of the development of Bengali as a language of modern prose has an interest which is much more than local. It shows how at different times different tendencies may be deliberately fostered and yet in the end the language may succeed in deriving profit from them all and ultimately arrive at a style which exactly corresponds to its needs, and it also shows how important may be in such a development the influence of individual writers. The Sanskrit provided an admirable model of a classical speech, strong in logical structure and precision but by itself it was, no doubt, rather too cumbrous and inflexible for the variety and multifaraity of modern experience. I think that Bengali has been successful in its assimilation both of Sanskrit and of European influences. The points which you make concerning the non-verbal character of the rustic language and the old prose writings and concerning the varieties of grammatical forms admissible even in early writings of the nineteenth century are curious. Of course the nominal style became characteristic of Sanskrit also in its later developments and was no doubt due to ethnic factors. That the modern Bengali has returned to a full use of the verb and that it has made a

choice among the varieties of inflexional forms, thereby fixing a literary norm, and that it took place in less than a century—these are facts highly creditable to the intellectuality and taste of the people, and of course, you have gone on to the finer developments and made your prose writings a real art, capable of reflecting not only the general level of thinking, but also the subtleties of the indiosyncracy of particulars.

I have also found your 'Chaitanya' of great interest. Although I myself am by nature inclined to the Jnana-marga and little drawn to the Bhakti-cult for which reason I had hitherto regarded Chaitanya only from the outside—your book has enabled me to realize somewhat the intensity of his religious emotions, his goodness and the deep effect which these combined to produce. The fact that he commenced as a Pandit is highly important, since it shows that not undeveloped intellectuality but the overpowering impulses of his nature were what determined his mission.

M. Levi justly congratulates you on preserving your critical judgment, in the presenee of so highly emotional an atmosphere, and inspite of the fact that your own feeling strongly responds thereto. I have taken note of some eloquent passages in which your personal sentiment is in fact distinctly helpful to the readers by enabling him to realize the matter from the inside. And your book seems to me indispensible both for those who approach Chaitanya from the scholarly side and for those who wish to understand the mind and history of Bengal."

CHAITANYA AND HIS AGE.

Elaborate notices of these works have appeared in many journals of Europe and India.

From a long review in Journal Asiatique for January to March 1923: "Among books published entirely under one signature and not noticed up to now, it is necessary to mention first those of the indefatigable Dinesh Chandra Sen. Everywhere we find the proof of the profound knowledge which Mr. Sen possesses of a subject which he has renovated by his discoveries and of his enthusiasm for that mysticism which borrows the language of terrestrial love to express the diverse phases of the Divine love. In the last book (Chaitanya and his Age) which is the most agreeable to read and without doubt the most

important, after having described the life of Chaitanya...... ....
Mr. Sen has added a very interesting supplement on the various sects which according to him are only Vaishnavite in name.........the Sahajias, the Bauls, etc.' These he believes to be the sects of disguised Mahajanism...... .. "
("Translated from French").

EMILE SENART, PRESIDENT, ASIATIC SOCIETY, PARIS :—I thank you for the two volumes that you have sent me. I was getting ready in accordance with your wish to bring them to the notice of the readers of the Asiatic Journal. But I was anticipated by M. Jules Bloch : you will see his article in the forth-coming issue of the journal. But at least I want to tell how greatly I appreciate the powerful art which for many years you have put at the service of Bengali Literature and how much I really felt the charm of the biography of Chaitanya. Your warm enthusiasm for the mystic side of religion and the cult of Krishna expressed themselves in such a touching manner ! You have not conceived it in a narrow way—in the manner of the West. So that for us it does not lose the interest and seems a continuation of the remarkable and emotional action of this man of religious contemplation.

Believe, dear co-worker, in the expression of my deep gratitude and devotion. (Translated from French.)

From a long review in the Pioneer—12th August, 1923.

The author displays zeal, energy, and learning of no common order. He is filled with a passionate conviction of the truth of what he writes. Further, he is familiar with the apparatus criticus of modern scholarship ; gives full references and weighs his authorities with solemn impartiality ....Much care, learning and scholarship have been directed to the task of separating the historic from the legendary element in the many sources with which the author concerns himself. The result is a picture which, so far as the data from which it is constructed are concerned, leaves little to be desired...... "

HIS EXCELLENCY LORD RONALDSHAY wrote a letter of appreciation. He pointed out some errors ; his letter is, however, quoted here with some omission. It will show the deep interest with which His Excellency reads all publications of the Calcutta University of which he was once the Chancellor.

"I need hardly say that I have read 'Chaitanya and his Age' with the utmost pleasure. It seems to me to give a vivid account of the time when

there was a great flowering of the emotional temperament of Bengal, due in large measure, no doubt, to a reaction against the frigid intellectualism of the monistic school of Vedanta Philosophers—or as you call them—pantheists. We see the same things, do we not, in the case of Ramakrishna Paramahamsa, of Dakhineswar, in that he laid stress upon the supreme value of the Bhakti-cult ?

Your chapter on Sahajia is extremely interesting and recalled with great vividness the talk which we had at Barrackpur on that subject. But until I read your recent volume, I had not realised that there were so many sects of Sahajias or that the cult was so wide-spread. Nor, I think, had I realised how wide is the gulf between the mass of the people who have been untouched by western education and their western-educated fellow countrymen. Babu Parvaticharan Kabishekhar's 'Charu Darshan' must be an interesting novel from this point of view, and I agree with you that it ought to be translated into English. Why not encourage some of your pupils to undertake this ? In case you may be bringing out a further edition of 'Chaitanya and his Age' at any time, I note down a few printer's errors that happened to catch my eye as I read it. (Here His Excellency refers to some mistakes.)

There are also some little discrepancies in connection with the date of Chaitanya's birth. Thus on page 102 you say that Jagannath Misra was 48 years old at the birth of Chaitanya and was himself born in 1435. This would make the date of Chaitanya's birth 1483. On page 103 you mention a copy of Mahabharata made in 1468 by Jagannath or 17 years before Chaitanya's birth. This would make the date of the latter 1485. Again on page 106 you say that Jagannath died of fever in 1505 when Chaitanya was only 20, which makes the date of Chaitanya's birth 1486. This latter date is the one which you tell us on page 109 is accepted by the Vaisnaba historians. These are all trifling matters and I only mention them in case it may be of use to you."

THE EASTERN BENGAL BALLADS

WITH A FOREWORD BY THE RIGHT HON'BLE LAWRENCE JOHN LUMLEY DUNDAS, EARL OF RONALDSHAY.

From a Review in the Oriental List, London (Jan.-March, 1924).

"Eastern Bengal Ballads: Mymensingh": Ramtanu Lahiri Research Fellowship Lectures for 1922-24 in two parts.

In these two volumes Dr. Dineschandra Sen has for the first time made available, both for English and for Bengali readers, ten typical ballads (gathas) sung by professional minstrels in the district of Mymensing. The words of the ballads have been taken down in writing from the lips of those who sung them by one Chandrakumar De, who has travelled into many out-of-the-way places in East Bengal for this purpose. It was an extremely difficult task to which he set himself; he often found the professional singers whom he approached unwilling to disclose to a stranger the text of these songs, which had been handed to them as a private family possession; to recover the whole of a ballad he often had to make special journeys to several different places and to consult a number of different singers; and throughout his work he was handicapped by ill-health. It is to be hoped that the collaboration between him and Dr. Sen will continue and result in the preservation of many more of those ballads, which are of immense value both to the student of folk-lore and to the philologist.

The ballads mostly date from the 16th and 17th centuries, and throw a flood of light on the social, religious and political condition of Eastern Bengal in those days. The first volume (Vol. I, Part I) contains a valuable introduction by Dr. Sen, and an English translation (or more strictly a paraphrase) of the ten ballads. There is also a separate introduction to each ballad. The second volume (Vol. I, Part II) contains a Bengali introduction, the full Bengali text of each ballad, and a number of footnotes explaining obsolete words and provincialisms. There are eleven illustrations, and a literary map of Eastern Mymensingh. Embodied in some of the ballads are several interesting specimens of 'baramasi' poems—poems describing the twelve months of the

year in relation to the experiences of the hero and heroine of the poem. The language throughout is the common village speech of the Mymensingh district, and is in delightful contrast to the artificial style of such writers as Bharatchandra, with its farfetched conceits and high-sounding Sanskrit expressions.

Great as Dr. Sen's other services to the cause of Bengali literature have been, it is doubtful whether any of his previous work is a more valuable contribution to our knowledge of Bengali life and thought than this collection of ballads, which, but for his enterprise and the praiseworthy efforts of his collaborator, would in all probability in the course of the next few years, have been lost beyond recovery.

From a review in the Times Literary Supplement of 7th August 1924.

"A writer needs more than merit in himself if his work is to attract wide notice; his subject-matter must have a quality of general appeal. Probably no scholar alive in India to-day has such a record as Dr. Dineschandra Sen, a record of patient, enthusiastic pioneer research, whose results have been valuable and full of interest. Fifty years ago, very little was known, even by Bengalis, of old Bengali literature, and if such ignorance no longer prevails to-day, it is largely because of one man who, in spite of poverty and obscure beginnings and ill-health, has toiled through many years to bring his own land's history and literature to light. His journeyings should become a legend, and the Bengali imagination, centuries hence, should see one figure eternally traversing the Gangetic plain, now beaten upon by the fierce sun as he makes his way across the red, deeply fissured fields of Vishnupur, now floating on the rain-swept rivers of East Bengal. He has coaxed a cautious peasantry into opening their store of traditions and memories, and he has persuaded them to part with hundreds of old manuscripts that were stuffed into palm-leaf roofs or between bamboo rafters. If he has not made a nation's ballads he has discovered a great many of them. If a small part of this service had been rendered to a better-known literature it would have made him famous. But Bengal is popularly supposed to have had no history; and it has certainly been without the dramatic or catastrophic events which strike the imagination in the history of many lands. Plassey, despite Nabin Sen's song of lament over

it, was not a disaster to Bengali arms though fought in Bengal, Agra and Lahore, Delhi and Seringapatam, evoke more romantic associations than Dacca or Murshidabad. Aurangzeb and Akbar, Pratap Singh and Tipu Sultan, mean a good deal even to a European ; but Lakshman Sen and Hambir Singh mean nothing at all.

Yet the records brought to light by Dr. Sen concern a population of fifty millions, who speak as expressive and beautiful a language as there is anywhere in India, and whose literature is a thing that Indians outside Bengal regard with pride, as an enrichment of their common heritage. That literature has been flowering with amazing exuberance for nearly a century now ; and as the Bengali mind grows in consciousness of itself and its achievement, it must increasingly be interested in the beginnings of that achievement. In his latest book, Dr. Sen has reclaimed a whole province for scholarship and study, the ballads of the Mymensingh borderland. As we know, a debatable land, where races and interests meet and sometimes clash, has a vivid life which often takes on spontaneous and vigorous expression. And the Mymensingh swamps and spreading rivers, a refuge to fugitive kings and struggling independences, a region where Bengal and Assam, Aryan and Mongolian meet and merge, have sheltered through the centuries much more than moving and beautiful stories. A great deal of Bengal's forgotten and neglected history lies hidden in these ballads.

In his introduction Dr. Sen tells how his notice was first drawn to the ballads. Nearly a dozen years ago he was interested by articles in an obscure and local Magazine, and on inquiry found that they were by one Chandra Kumar De, a young man of no English education, in frail health and wretchedly poor. He had been employed by a village grocer, on a salary of one rupee (sixteen pence) a month, "but was dismissed on the plea of incompetence and inattention." Probably the employer had reason for his action, for the boy was dreaming of his own country and her past. He got new work, this time munificently paid by two rupees a month, the work of a rent-collector he had to travel widely, and during his travel heard the old ballads. Dr. Sen persuaded Calcutta University to employ him ; and by an expenditure of fifty rupees a month for three years over 17,000 lines of Old Bengali poetry have been recovered. Dr. Sen exultantly remarks :

"I would not have been more pleased if these lines were all gold. The songs perfectly artless, written mostly by Hindu and Muhammadan peasants, often show the real heart of poetry, and some of them at least, I believe, will rank next only to the most beautiful of the Vaisnava songs in our literature."

He has found European scholars who share his enthusiasm. If other friends, both in England and Bengal, renew the charge that his enthusiasm for what is old is often like the uncritical joy of a man madly in love, he is unmoved. The charge is familiar to him, and he puts it by with a smile. The mass of work that he has now brought forward is too large for hasty assessment, and even on a first view much of it is manifestly poorer than he thinks it. But among these ballads are some tales so simple and appealing that they need only a more cunning literary presentation to win recognition outside Bengal, and Dr. Sen, throughout his long and successful career as discoverer, has never done his land greater service than by saving these stories that would so soon have faded out from the world."

Paris, 10th April, 1924.

MY DEAR FRIEND,

I am sorry I could not answer earlier your lovely letter, dated 10th January, 1924. I am growing more and more busy day by day since my coming dack home. Still I cherished the hope of reading all your Ballads before writing you, and I kept them faithfully on my desk all the time. But I had to content myself with the first one and with your learned Introduction. To-day I am on the eve of Easter vacations, and I am confident I can now make time to enjoy a full reading of your delectable work. But I have read enough of it to anticipate the pleasure I can derive from it. Your enthusiasm at the discovery was fully justified. Your Eastern Bengal, you are so proud of, is positively an earthly replica of Indra's Nandan, a paradise of vegetation, sky, running water, a sporting place of Apsarases and Gandharvas, and you are another Narada coming to the world to repose above these celestial beauties, and in a way how attractive! This is the wonder of art that, owing to you, I could in the sad, dull, dim days of winter dream of a blue sky, of lovely rivers, of evergreen woods, of couples of lovers wandering amidst the wild beasts, indifferent to all dangers, raptured by their mutual love.

There is one dark side, the news you give me about your bad health. It

may be that after such an unceasing strain of labour you had to suffer from a nervous depression. Even before I could meet you, I could guess that you are working in a constant strain of imagination and passion which overtaxes your bodily strength. I know that no sacrifice is of account to you for the love of your country. But India has not such a plenty of worthy worshippers that the loss of one of them may be indifferent. The work that you can do no one else can do or will do. Think of it and keep yourself ready for more work. This is a friend's wish and prayer.

But do not miss to send me a word that you are feeling better, and stronger, that you are recovering after this tremendous shock.

Believe me, my dear friend,

Ever yours,

SYLVAIN LEVI.

DEAR SIR,

Thank you very much for your kindness in sending me the first volume of your Mymensingh Ballads. My sister and myself (she is my interpreter in English) have read it with great interest. The subject it deals with touches all mankind ; the differences with European stories are due to reasons which are much more social than racial. The good æsthetic taste that is felt in most of these ballads is also one of the characteristics of popular imagination in many of our Western countries : "Womeder Wehmuth" as a beautiful song of Goethe's, put into music by Beethoven, expresses it "The Pleasure of Tears."

It is true that with us French people, the people of Gaul, it reacts against this with our bold and boisterous joyful legends. Is there none of this kind of thing in Indian literature ? I was specially delighted with the touching story of Madina which although only two centuries old, is an antique beauty and a purity of sentiment which art has rendered faithfully without changing it. Chandravati is a very noble story and Mahua, Kanka and Lila are charming (to mention only these ones).

The patient researches of Mr. Chandra Kumar De and your precious collaboration with him have brought to the historical science a valuable contribution to its efforts to solve the problems of popular literary creations. From where have these great primitive epics and ballads come ? It seems very likely that they have always come from some poetic genius whose invention

has struck the popular imagination. But the question is how much people deformed his idea in putting it into the shape in which we find it? Which is the part of the collaboration of the multitude in this work of re-casting, which is continuous and spontaneous? Rarely has any one had the happy opportunity to seize an epic as one might say on the lips of the people who have given birth to it before writing had fixed it in some shape as you and Mr. Chandra Kumar have succeeded in doing in this case. I congratulate you sincerely for this beautiful work and I ask you, dear Sir, to believe in my high esteem and admiration. *

4th March, 1924. ROMAIN ROLLAND

From a review by MR. E. F. OATEN, LL. B., M. A.,
published in the Englishman, dated the
7th of February, 1924.

It is not easy for an Englishman to hazard an opinion as to the reception which the ballad poetry of Eastern Bengal, recently rescued from oblivion by Dr. Sen, and now given by him to the world in the form of an English translation, will receive at the hands of literary Bengal. But one thing is certain. The measure of Bengal's appreciation of these ballads, not as mere historical or literary curiosities, but as living literature, will be some index of the extent to which her spirit is escaping from the trammels of artificiality in its effort to express itself not only in literatnre but in life. To the western critic, stumbling by good fortune upon Dr. Sen's book, these ballads, straight from the unsophisticated people's heart, come fresh and stimulant as the breeze that revives the jaded traveller from Calcutta as he sits in steamer and ploughs across the monsoon gusts of Eastern Bengal. In them we escape, as regards the subject matter almost entirely from the priest, as regards the most universal of human passions, altogether from that ideal of chastity which caused a poet of an earlier age to place the following words in the mouth of Sita, as a defence to her character: "Even when I was a mere child, I never came too close to a male play-fellow."

In the introduction which Dr. Sen prefixes to his translation, we learn that these ballads cover a period of 300 years from sixteenth century

* Translated from French by Captain J. W. Petavel.

onward, that they were known only and that orally only, solely to the class, rapidly decreasing, of professional village-singers or rhapsodists ; and that he collected the ballads through the agency of a poverty-stricken and uneducated literary enthusiast, named Chandra Kumar De, to whom the real credit for first bringing these ballads to literary notice must be ascribed, though Dr. Sen's work in introducing them to a wider literary world, and inspiring the discovery of others, has been infinitely valuable.

Briefly stated, these ballads contain a picture of the state of society and the conditions of life, prevailing in Eastern Mymensingh in the 16th century and onward. The area in which the ballads rose and flourished was one into which the Sen Rajas with the Brahminic canons and arbitrary conventions were unable to penetrate ; it was therefore for generations ruled by different standard of moral and communal life ; its culture was indigenous, natural, fresh, unartificial, in short, true original Bengali. It was a society not of dogmas, but of real life.

There are a dozen aspects from which these ballads, thus redeemed from rapidly approaching oblivion, are important. Lord Ronaldshay in his introduction emphasises their importance as the seed from which modern Bengali has sprung. They will certainly also prove valuable as a source of historical information. But one cannot but dwell here on their intrinsic value as literature, since it is to be hoped that Bengal will eventually value them most as such. As Dr. Sen writes, "these songs have features in them which have a universal appeal." Their language is that of a despised "patois," they describe the great human passions, and chiefly the passions of love, working in social conditions that were, as compared with conditions to-day, strangely unrestricted by conventions. In these ballads women fall in love, and in no case blindly follow the selection of the guardian. They go through fire and water for the sake of the man they choose. They devise stratagems and slay his foes. They converse with strange young men at the ghat and arrange future meetings. They receive love-letters. Yet ever they prefer death to dishonour, properly so regarded. Malua's scorn of the Kazi's overtures to her through a go-between, in her husband's absence, is characteristic. "The wicked Kazi has not the worth of my husband's toe. Take this insult from me and go to your Kazi and tell him all, I take him to be my foe and hold him as a dog. I hit his face with a broom from here."

In fact it may be said that woman, the Bengali woman, is the general hero of these ballads, so far as those hitherto published are concerned. By the side of her devotion, heroism and self-renunciation, the male characters are sometimes poor creatures, devoid of personality. In Mahua, Malua, Sunai and several others, not solely Hindu, the literature of Bengal receives on its roll many names of which it may be proud. It is therefore distressing to learn from Dr. Sen that these songs are losing public favour every day. Bengal needs these literary heroines, even though, or even possibly because their conventions are not those of to-day. Possibly Dr. Sen's book, and especially his enthusiastic and triumphant introduction to them, will restore them to public favour, and give them wider currency. It is clear at least from Dr. Sen's enthusiasm for the unconventionality of the characters of the ballads, that it is not without meaning that he prefaces to his book the quotation that "if a man were permitted to make all the ballads, he need not care who should make the laws of a nation."

Lord Ronaldshay in an article entitled "What is it Nationalist India wants" published in "the Nineteenth Century and After" (July 1924) refers to Dr. Dineshchandra Sen's "Eastern Bengal Ballads" in terms of high praise, with copious extracts from the book.

From review by Mr. F. E. PARGITER, (I.C. S. retired)
in the Royal Asiatic Society's Journal (October, 1924) :

"Songs and ballads have been handed down orally and recited among the peasantry in the district of Mymensingh in North-East Bengal, and Chandra Kumar De, a poor man who had been fascinated by them during his local visits as rent-collector, began writing about them in the local Journal Sourabha in 1912. His notices attracted Dr. Dineschandra Sen, who then helped him and engaged him in 1919 to recover all the ballads that could be discovered there. This was done, often with great difficulty, because reciters did not always know the whole of a ballad, so that the portions were discovered piecemeal and sometimes confusedly. Dr. Sen has now edited ten ballads as a first instalment in this work, the ballads (Maimansingha Gitika) in Pt. II and English translations in Pt. I.

The Bengali of the ballads is the peculiar dialect of East Bengal, which differs from that of Calcutta in various respects, and is of real interest and value in phonology and vocabulary, as the reviewer can vouch from personal know-

ledge, some results of which are shown in his Vocabulary of Peculiar Vernacular Bengali Works, published by the Bengal Asiatic Society. The English version is not a close translation, but a free rendering which gives the matter and spirit of the original. The ballads belong to the last three or four centuries. The dramatis personæ are Hindu and Mohammedan, chiefly Hindu yet not Hindu of the orthodox type, for the conditions are those of freer country life, and youth and maiden meet in true love episodes. The stories are charming, both happy and tragic, and are told generally in simple language, fresh with country scenes and feelings, and illustrated with pretty sketches by a Bengali artist. The characters are finely and often nobly delineated, and the heroines display the highest ideals of Bengali womanhood. Dr. Sen has discussed each ballad in a preface, and has prefixed to the whole a long introduction investigating their origin, variety, nature, recitation and value, and the political condition of that district. The ballads should stimulate interest among students of Bengali, and the English version will charm all readers.

Luzac's Oriental List, London, Jan-March, 1926.

Glimpses of Bengal Life. By Rai Bahadur Dinesh Chandra Sen, B.A. D. Litt. (Hon.), "To many readers the most interesting part of the book will be the chapter devoted to humour in Old Bengali literature; and the description of Bharat Chandra's character of the sage Vyasa, which is in the best style of comedy, may be recommended to all who are inclined to disparage Indian humour. The supplement is an excellent specimen of literary controversy, in which Dr. Sen convincingly champions the authenticity of the Karcha of Govinda Das."

Extracts from a letter addressed by H. E. Lord Lytton, Governor of Bengal to Maharaja Sir Prodyot Kumar Tagore

Government House, Calcutta, 25th June, 1924.

"It is clear from these publications (Eastren Benaal Ballads) that the line of research now being pursued by Dr. Sen is of great interest and importance. If, as Dr. Sen states, these poems range in date from the 16th to the 19th century, they must obviously possess great literary and historical significance. A glance at the poems so far published shows that they throw

much light on the social history of that part of Bengal, where they took their rise. Their importance as additional material for the history of the rise and development of modern Bengali needs no emphasis.

Dr. Sen asserts that he has evidence that a considerable volume of ballad-poetry still remains to be collected from the singers, and other sources, not only in Mymensingh but also in other districts of Bengal. The financial difficulties of the University, however, make it impossible for Dr. Sen to arrange for a systematic search for these ballads on reasonable scale. It is obvious that, with one solitary worker in the field collecting the ballads, progress must be slow. Dr. Sen has, therefore, appealed to me for financial assistance to enable him to prosecute these researches with additional agents and on a systematic plan. For this purpose a sum of Rs. 5000 is required immediately, while a larger amount still will be required to meet the cost of printing the ballads subsequently. A total sum of Rs. 15000 would place the work on a sound footing for some time, enabling Dr. Sen to carry out systematic researches on a wider scale, and subsequently to edit and publish the poems in a worthy manner.

After a life-time of devotion to his mother tongue Dr. Sen assures us that nothing but the limited financial resources available to him prevents him from enriching the Bengali language by a large volume of hitherto unknown poems of a remarkable and important character. I am sure that the wealth and culture of Bengal will regard it as a pious and patriotic duty to assist Dr. Sen to complete what may prove to be the most remarkable of his many services to his mother tongue, and they will regard it as a point of honour that the proposed extension of his work should be financed not from official sources but from the private generosity of those whose literature his researches are enriching. As the sum is a comparatively small one, I do not think that a general appeal to the public is necessary or desirable. If the facts are brought to the notice of a limited number of gentlemen interested in the language, literature and history of Bengal, I am sure they will readily provide the amount that is necessary for the prosecution of Dr. Sen's researches. I know that an interest in literature and the arts is traditional in your family, and that you personally appreciate the value and importance of Dr. Sen's work. I, therefore, feel that I can confidently appeal to you to undertake the duty of collecting the Rs. 15000 required."



